বনফুল উপন্যাস সমগ্র

(অষ্টম খণ্ড)

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

সূচীপত্র

।। সাহিত্যিক বনফুল ।।

।। সাহিত্যজীবনের শেষ পর্ব ।।

উত্তর বিহারের পুর্ণিয়া জেলার মণিহারী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ও মৃণালিনী দেবীর যে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই—তিনিই পরবর্তীকালে অন্যতম কথাসাহিত্যিক 'বনফুল' রূপে বহু সম্পদে ঋদ্ধ করে গেছেন বাংলা সাহিত্যকে। নাম বলাইচাঁদ। মণিহারী, সাহেবগঞ্জ, হাজারিবাগে স্কুল ও প্রাথমিক কলেজ পাঠ সমাপ্ত করে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ থেকে চিকিৎসক হয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন তিনি। তার আগেই কবি হয়ে উঠেছিলেন তিনি। 'প্রবাসী', 'ভারতী', 'পরিচারিকা', 'কল্লোল'-এ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে—কিন্তু 'বনফুল' ছদ্মনামে। নামটি তিনি নিজেই নির্বাচন করেছিলেন কিশোর বয়সে। এই ছদ্মনাম গ্রহণ করবার কারণ ছিল দুটি। এক পড়াশোনায় অমনোযোগ দেখা দেবে এই আশঙ্কায় স্কুলের হেড পণ্ডিতমশাই-এর কবিতা লিখতে নিষেধ করার সমস্যা এড়ানো। ছন্দনামে লিখলে তিনি জানতে পারবেন না। দুই "বনজঙ্গল আমি খুব ভালবাসি। বন চিরকালই আমার নিকট রহস্য-নিকেতন। এইজন্যই বোধ হয় ছদ্মনাম নির্বাচনের সময়ে 'বনফুল' নামটা আমি ঠিক করিলাম।"

চিকিৎসক রূপে চাকরিতে যোগ দিয়ে বলাইচাঁদ দেখলেন দলাদলি, তোষামোদ এবং দুর্নীতির সঙ্গে প্রতিমুহূর্তে চলতে হবে আপস করে। তখন ঠিক করলেন প্রধানত ডাক্তারির চাকরি বা প্র্যাকটিস না করে প্যাথলজি-র প্রশিক্ষণ নিয়ে ল্যাবরেটরি স্থাপন করবেন কোনো বড়ো শহরে। ফলে উপার্জন তুলনায় কিছু কম হলেও সময় পাবেন সাহিত্য-সাধনার। তেমনই হল। ল্যাবরেটরি করবার সিদ্ধান্ত হল নিকটবর্তী বড়ো শহর ভাগলপুরে। বাংলার পাঠককুল চিনতে শুরু করলেন 'বনফুল' নামের অন্তরালে এক শক্তিমান ও আত্মবিশ্বাসী লেখককে। তখন থেকেই বনফুলের জীবনযাপন ও লিখন-কর্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভাগলপুর। তখন শনিবারের চিঠি-র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস ও সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় রূপান্তরিত হবার পথে।

বিহারের প্রবল ভূমিকম্প হল ১৯৩৪-এর জানুয়ারি মাসে। চূর্ণ হয়ে গেল অনেক কিছু। কিন্তু অনির্বাপ্য মানুষ চিরকালই ভস্ম-শয্যা ছেড়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে। নতুন করে গড়ে উঠল আবার বনফুলের বাড়ি ও পরীক্ষাগার। ঠিক তার পরেই ঔপন্যাসিক বনফুলের আবির্ভাব—১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে 'তৃণখণ্ড' নামের উপন্যাস নিয়ে। রঞ্জন

পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত এক টাকা দামের বইটির নবীন লেখক তখনই জয় করে নিলেন বাঙালি পাঠকের হৃদয়। জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত সে জনপ্রিয়তায় ভাঁটা পড়েনি কোনোদিন। সেই শেষ পর্যায়ের অন্তিমকাল-চিহ্ন হল ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে।

দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরের এই পরিসীমায় প্রধানত ১৯৭০ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত প্রকাশিত কিছু উপন্যাস নিয়ে 'বনফুল উপন্যাস সমগ্র'-র এই অষ্টম খণ্ডটি পরিকল্পিত। প্রধানত বলবার কারণ এই যে, এই খণ্ডে স্থান পেয়েছে লেখকের সুপরিচিত উপন্যাস 'জঙ্গম'-এর চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়। সুবিস্তৃত দেশ-কালের পটে অবিভক্ত বঙ্গভূমির এবং সন্নিহিত বিহারের জনজীবনকে তুলে ধরবার অভিপ্রায় নিয়ে বনফুল উপন্যাসটির প্রথম খণ্ডটি লিখেছিলেন এবং সেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৩-এ (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স্)। প্রথম খণ্ডে সন্নিবিষ্ট ছিল পাঁচ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ উপন্যাসটির প্রথম অধ্যায়। কিন্তু উপন্যাসটির কথাবস্তু ও কাঠামো এমনভাবেই তাঁকে নিলীন করে নেয় যে, পরবর্তী দু-বছরের মধ্যেই তিনি লিখে ওঠেন 'জঙ্গম'-এর দ্বিতীয় খণ্ড—যার অন্তর্গত হল দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স্) এবং তৃতীয় খণ্ডও—যে খণ্ডে স্থান পেল চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস)। এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশকাল ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ। কাজেই এই অষ্টম খণ্ডে আমরা প্রথমেই পাব ১৯৪৫-এ প্রকাশিত 'জঙ্গম' উপন্যাসের শেষ দুটি অধ্যায় এবং তারপর খণ্ডটিতে থাকছে ১৯৭০ থেকে ১৯৭৯-এর মধ্যে রচিত ও প্রকাশিত তাঁর ছয়টি উপন্যাস। এ-ছাড়াও আমরা তাঁর শেষ অসম্পূর্ণ উপন্যাসটি এই খণ্ডে পাব— যেটি তিনি নিজের কলমে সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। শেষ করেছেন সেই সময়ের অপর দুই দিক্‌পাল ঔপন্যাসিক বিমল মিত্র ও বিমল কর। মোটের উপর বলা যায়—বনফুলের অন্তিমপর্বের উপন্যাসের পরিকল্পনা ও রচনা-বৈশিষ্ট্যের সন্ধানই আমরা এই খণ্ডে পাব। বাড়তি পাওয়া যাবে লেখকের মধ্য বয়সে ও খ্যাতির মধ্যগগণে বিরাজিত থাকা অবস্থায় রচিত সুবৃহৎ ও সুবিখ্যাত উপন্যাস 'জঙ্গম'-এর শেষ দুটি অধ্যায়।

পাঁচ অধ্যায়ে রচিত একটি উপন্যাসের শেষ দুটি অধ্যায়কে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিস্থাপন করলে পাঠকের পক্ষে তার রসগ্রহণে ব্যাঘাত হবারই সম্ভাবনা। তবে 'জঙ্গম' উপন্যাসের ক্ষেত্রে ঠিক তেমন ঘটে না। তার কারণ উপন্যাসটির গঠনে এক ধরনের মহাকাব্য সুলভ আদল আছে। অনেক শাখা-প্রশাখায়, বহুমুখী বিস্তারে, বহু কথাবৃত্তে গাঁথা উপন্যাসটিকে যে-কোনো জায়গা থেকেই পড়া যেতে পারে। তবে দেশকালের ধারণা সহ কাহিনির কাঠামোটি পাঠককে জেনে রাখতে হবে। 'জঙ্গম' উপন্যাসের দেশ হল অবিভক্ত বাংলা এবং তার পশ্চিম-প্রান্তিক বিহারের গ্রাম ও মফস্‌সল। ভেবে নিতে ইচ্ছে করে সে অঞ্চল ভাগলপুরের অভিজ্ঞতা-সঞ্চিত উপাদান থেকেই গড়ে তোলা হয়েছে। বঙ্গীয় অংশটির কেন্দ্রভূমি কলকাতা। সময় স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী ভারতের চতুর্থ দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পঞ্চম দশকের শুরু অবধি। অর্থাৎ মোটের উপর ১৯৩৬-৩৭ থেকে ১৯৪০-৪১ ধরা যেতে পারে।

উপন্যাসের শেষে কেন্দ্রীয় চরিত্র শঙ্করের বন্ধু উৎপলের 'কিংস কমিশন' পেয়ে যুদ্ধে যোগ দেবার প্রসঙ্গ আছে। এই যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—যার সূত্রপাত ১৯৩৯-এ। এসেছে গান্ধীজির চরকা নীতি, কমিউনিস্টদের প্রসঙ্গ। কিন্তু 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, জনযুদ্ধ নীতি, মন্বন্তর-এর বিষয় আসেনি। কাজেই ধরে নেওয়া যায় ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১—উপন্যাসের কালসীমা। চার বছরের একটি পরিসরের কথা উল্লিখিতও হয়েছে।

উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে বিহারের রিটায়ার্ড ডেপুটি এবং রাশভারি অম্বিকাচরণ রায়ের পুত্র শঙ্করসেবক রায়। কলকাতায় হস্টেলে থেকে কলেজের পড়া শেষ করেছে। কিন্তু পিতার অমতে গিয়ে পণ ছাড়াই বিবাহে স্বীকৃত হয়েছে বলে বাবা তার মাসের খরচ পাঠানো বন্ধ করেছেন। এ-ঘটনা ঘটেছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে। অতঃপর শঙ্কর নববিবাহিতা পত্নীসহ জীবনযুদ্ধে নেমে পড়েছে।

শঙ্করকে অনুসরণ করেই উপন্যাস প্রবাহিত হয়। কলকাতায় প্রথম এসে সর্বস্তরের নাগরিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে হতে খুলে যেতে থাকে তার মনের জানালাগুলি। চিনতে শেখে সমগ্র স্বদেশ। পথের ভিক্ষুক থেকে ধনী ব্যবসায়ী; পানওয়ালি থেকে সোসাইটি লেডি। কেবল বিত্ত-ভিন্নতার স্তর নয়, বিচিত্র মানুষ দেখতে দেখতেও পরিণত হয় সে। বনফুলের পাঠক মাত্রেই জানেন মানবচরিত্রের বহু বর্ণময়তা অনুভব করতে ও রূপায়িত করতে কত আগ্রহ ছিল তাঁর। বালক বয়স থেকে যে বনজঙ্গল ভালোবাসতেন তার বৈচিত্র্যও তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর উপন্যাসে, স্মৃতিকথায় বৃক্ষলতা, ফুল, পাখি, প্রজাপতির অপরূপ সমাহার। মানব-সংসারও তাঁর কাছে ওই বনভূমির মতোই ছিল ব্যাপ্ত ও বিচিত্র। তিনি মশগুল থাকতেন সেই সৌন্দর্যের জগতে। সেই সঙ্গে জীবন সম্পর্কে ছিল তাঁর এক ধরনের দৃঢ় নীতিবোধ। আজ হয়তো কোনো কোনো দিক থেকে সেই নৈতিকতাকে কিছু রক্ষণশীল বলে মনে হয়। কিন্তু তাঁর মনে এ নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল না। এই সু-নীতি আর বিচিত্রের প্রতি আকর্ষণের সহাবস্থানেই গড়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্য-ভান্ডার।

যে দুটি অধ্যায় (চতুর্থ ও পঞ্চম) এই খণ্ডের অন্তর্গত তাতে স্থান পেয়েছে সাময়িক পত্রিকার দপ্তরে শঙ্করের কর্মজীবন। এবং শঙ্করের জীবনের পরিণাম—যেখানে সে নাগরিক জীবন ত্যাগ করে এক বন্ধুর জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পেয়ে গ্রামে ফিরে এসেছে এবং আত্মনিয়োগ করেছে গ্রামোন্নয়নে।

চতুর্থ অধ্যায়ে শঙ্করের কর্মজীবনের যে চিত্র পাই তাতে ১৯২০-২১ থেকে শুরু করে বাংলার, বিশেষভাবে কলকাতার সাংস্কৃতিক পটভূমিতে সাহিত্য ও সাময়িকপত্রের জগৎটি চমৎকার ফুটে উঠেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের উত্তরকালে পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্য-চিন্তনের ধারায় যে পর্যান্তর দেখা দিয়েছিল তার শরিক হতে চেয়েছিলেন বাংলার শিক্ষিত তরুণেরা। 'কল্লোল', 'কালিকলম', প্রগতি', 'বিচিত্রা', 'পরিচয়', 'পূর্ব্বাশা', 'কবিতা', 'নিরুক্ত'-র সেই সমুজ্জল সমাহার! পাশাপাশি ছিল 'শনিবারের চিঠি'—যে পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন বনফুল নিজেই। 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ' জাতীয়

পরম্পরাবাহী পত্রিকাও ছিল। শঙ্করকে একজন সাহিত্যিক রূপেও এঁকেছেন বনফুল। শঙ্করকে অবশ্য তাঁর আত্ম-প্রতিকৃতি ঠিক বলা যায় না। কিন্তু যে-অর্থে একজন লেখক তাঁর প্রিয় চরিত্রদের মধ্যে মিশে থাকেন—সে-অর্থে শঙ্করসেবক রায় নামের এই যুবকটিকে বেশ খানিকটা তার স্রষ্টার জীবনের প্রতিচ্ছায়া মনেও করা যায়। শঙ্করও বনফুলের মতোই বিহারের গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে এসেছে; সাহিত্য-চর্চা করেছে। তার সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তনও বনফুলেরই অনুরূপ। সক্রিয় রাজনীতি করবার বদলে দ্রষ্টা অবস্থানেই সে স্বচ্ছন্দ। গান্ধী-পন্থী রাজনীতির প্রতি তার শ্রদ্ধা ও তৎকালীন কমিউনিস্টদের প্রতি বিরাগ, অন্তত অনাস্থা পরিস্ফুট—বনফুলের মতোই।

শঙ্করের কর্মজীবনকে অবলম্বন করে ১৯২০-১৯৪০ মধ্যবর্তী বাংলা পত্রিকার জগৎটিকে তুলে ধরেছেন লেখক। পারস্পরিক প্রতিযোগিতা, দলাদলি, মালিকের ইচ্ছায় চলতে বাধ্য হওয়া, পৃষ্ঠার শেষে লাইন গুনে মাপমতো কবিতা ঢুকিয়ে দেওয়া—ছবিগুলি খুবই জীবন্ত এবং মনোহারী। একজন সাহিত্য-মনস্ক চিকিৎসকের একটি চিঠি চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত হয়েছে শঙ্করের উদ্দেশে। সেই চিঠিতে আমরা বাংলা সাহিত্য তথা বাংলার মানুষের সমাজবোধ ও রাজনীতি সম্পর্কেও বনফুলের ভাবনা ও অভিমতের সন্ধান পাই। — "সেকালের সাহিত্য বা পলিটিক্স যা ছিল, একালেও ঠিক তাই আছে,— বাইরের চেহারাটায় একটু অদল-বদল হয়েছে মাত্র। দান্ডি-মার্চ বা সণ্টরোডের সাবলাইম বা রিডিকুলাস কারোর কল্পনা উদ্বুদ্ধ করল না। বিহার ভূমিকম্প কারোর কাব্যের খোরাক জোগাল না। এবার অতীতের দিকে চেয়ে দেখি—সিরাজ এবং ইংরেজ যখন বঙ্গদেশের বুকে সমুদ্রমন্থন করছিল, তখন বই বেরিয়েছিল—রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনচরিত।"

'জঙ্গম' শব্দের অর্থ' যা চলমান, প্রবাহিত, অনড় নয়। এই জঙ্গমতা লেখক অনুভব করেছেন জাতীয় জীবনে, বাংলার জনজীবনে, শঙ্করের ব্যক্তিগত জীবনে। কলকাতা শহর শঙ্করকে যেমন অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ করেছে, তেমনই তার সামনে খুলে দিয়েছে নগরজীবনের তথাকথিত চাকচিক্যের অন্তরালবর্তী শ্বাসরুদ্ধ ও কলুষ-পূর্ণ রন্ধ্রগুলির হাঁ-মুখ। নগর-সভ্যতার এই কৃত্রিম নির্মাণের মাঝখানে দাঁড়িয়েই শঙ্কর অনুভব করেছে তার জন্মভূমির গ্রামকে। অনুভব করেছে নিরক্ষর, দরিদ্র, অসহায়, অ-বোধ গ্রামের মানুষ কীভাবে বঞ্চিত হয়ে চলেছে চিরকাল। এমনই দোলাচল মানসিক পরিস্থিতিতে একদিন যখন তার প্রেমময়ী পত্নী অমিয়াকে বাড়িতে একা পেয়ে শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত করে তার গয়না নিয়ে চলে গেল তারই পরিচিত ও স্নেহভাজন নিতাই তখন সে স্থির করল ফিরে যাবে গ্রামেই। তার বাল্যবন্ধু উৎপল জমিদারি কিনেছে গ্রামে। সে অগাধ বিত্তবান। আবার বড়ো চাকরিও করে। গ্রামের উন্নয়নের জন্য সে তার কিছু অর্থ ব্যয় করতে ইচ্ছুক। সেই কাজের ভার সে দিতে চায় শঙ্করকে। এই প্রস্তাব এতদিন শঙ্কর গ্রহণ করতে দ্বিধা করছিল। কিন্তু এখন মন স্থির করে এই দায়িত্ব গ্রহণ করে গ্রামে ফিরে যায়। এখানেই চতুর্থ অধ্যায়ের সমাপ্তি।

পঞ্চম অধ্যায়ের পটোত্তোলন হয় চার বছর পরে। শঙ্কর তখন দু-বছরের একটি কন্যার পিতা। অনুরাগিনী ও সর্বার্থে সহধর্মিনী পত্নীকে নিয়ে তার সুখের সংসার। গ্রামের সেবায় সে কায়মনোবাক্যে নিয়োজিত। কিন্তু তার চেষ্টায় গ্রামের পরিস্থিতি প্রত্যাশিত পথে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে — এমন সরল অঙ্ক কষেননি বনফুল। এই গ্রাম তিনি প্রকৃতপক্ষেই চিনতেন; জানতেন গ্রাম-জীবনের প্রতিটি পরতে কত গভীর সংস্কার জমে আছে; কী পর্বত প্রমাণ বাধা দাঁড়িয়ে আছে প্রতিটি উন্নয়ন-প্রয়াসের পথে। রোগ, অশিক্ষা, দারিদ্র এবং গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কী তুমুল সমন্বয় একটি আপাত শান্ত গ্রামে। সেই সঙ্গে মিলেছে সমকালীন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। বনফুল তাই কেবল শঙ্করের প্রচেষ্টার বিভিন্ন বিবরণ তুলে ধরেছেন। গ্রামে কলেরার মড়ক লাগার বিস্তৃত চলচ্চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর কলমে। এই অভিজ্ঞতা চিকিৎসক পিতার চিকিৎসক সন্তান বনফুলের যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। এই কর্মযোগের মধ্য দিয়ে চলতে চলতেই শঙ্করের চিত্তলোকে শুদ্ধতার অগ্নিদহন চলতে থাকে। সব কাজ, দায়-দায়িত্ব, স্ত্রী-কন্যার প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা সত্ত্বেও তার মনের গহনে উৎপলের পত্নী সুরমার জন্য তার যে মুগ্ধতা—তারও মুখোমুখি হয় সে। ছিন্ন করবার চেষ্টা করে সেই বন্ধনও। যদিও এই আকর্ষণের মধ্যে কোনো অন্যায়ের স্পর্শ ছিল না। শঙ্করের মনের এই মুগ্ধ দুর্বলতাটুকু গোপনও ছিল না উৎপল বা সুরমা—কারো কাছেই। তাতে শঙ্করের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা হ্রাস পায়নি বিন্দুমাত্র। শঙ্করের প্রতি তার সমস্ত বিশ্বাস চিরকাল অর্পণ করেছে উৎপল। তবু শঙ্কর আত্মজিজ্ঞাসার সামনে দাঁড়ায়। হৃদয়কে করে তুলতে চায় অগ্নিশুদ্ধ। 'জঙ্গম' উপন্যাসের জঙ্গমতা তাই সর্বব্যাপ্ত। সময় প্রবাহিত হয়; সমাজ ও সভ্যতা বিবর্তিত হতে থাকে। মানুষের চিত্তলোকেও অনির্বাণ থাকে শুদ্ধতার সন্ধান। এখানেই উপন্যাস সমাপ্ত হয় পঞ্চম অধ্যায়ের অন্তে। উপন্যাসের অন্তিম ঘটনাটি কিছু অপ্রত্যাশিত ও অদ্ভুত।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা কুন্তলা স্বেচ্ছায় বিবাহ করেছিল রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-পন্ডিত হরিহরকে। স্বামীর প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীলা ছিল সে। কলেরায় হরিহরের মৃত্যু হলে ঘর বন্ধ করে খাটের উপর কাঠ আর কাপড়চোপড় সাজিয়ে ঘি ঢেলে মৃতদেহের সঙ্গে সে-ও সহমরণে গেছে। শঙ্কর খবর শুনে সেদিকেই এগিয়ে গেল কারণ পুলিস এসেছে। এরকম একটি ঘটনা দিয়ে উপন্যাসের ইতি টানার তাৎপর্য—আমাদের অনুমান—পাঠককে বুঝিয়ে দেওয়া—এই দেশে কত শিক্ষিত ও দৃঢ় চরিত্রের মানুষও কী অতল মধ্যযুগীয় সংস্কারে আবদ্ধ ও অন্ধ হয়ে আছে। সেদিকে যখন এগিয়ে যায় শঙ্কর তখন অনুভূত হতে থাকে তার স্বেচ্ছবন্ধ কর্মভারের প্রকৃত ওজন।

বনফুলের 'জঙ্গম' উপন্যাসটিতে গল্পের আকর্ষণ এবং ঔপন্যাসিকের অভিপ্রায়—এই দুই-এর মধ্যে একটা চমৎকার সঙ্গতি গড়ে উঠেছে। আমরা লক্ষ করি ১৯৩০-৩১ থেকে শুরু করে ১৯৪৫-৪৬ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি বাংলা উপন্যাস লেখা হয়েছিল যেগুলিতে দেখা যায় গ্রামের যুবক শহরে শিক্ষিত হয়ে এসে গ্রামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে। তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' ও 'কালিন্দী'—দুটি উপন্যাসেই নাগরিক শিক্ষা

ও মননের স্পর্শে গ্রামে এসেছে নতুন ভাবনার আলো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' -য় (১৯৩৬) গ্রাম থেকে কলকাতায় গিয়ে শিক্ষিত হয়ে আসা শশী গ্রামের মানুষের বন্ধন থেকে নিজেকে আর ছাড়িয়ে নেয় না। গ্রামেই স্থাপন করে হাসপাতাল। দূর করবার চেষ্টা করে গ্রামের মানুষের অন্ধ সংস্কার এবং অশিক্ষা। 'জঙ্গম' উপন্যাসের বিন্যাসটিও মূলগতভাবে এরকমই। যদিও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বনফুল—দুই লেখকের জীবনকে দেখবার ভঙ্গি একেবারেই একরকম নয়।

'জঙ্গম' উপন্যাসে অনেকেই সন্ধান পেয়েছেন মহাকাব্যিকতার। এই অভিমতের সমর্থন করা যায় এই অর্থেই—মহাকাব্য জীবনের বাস্তবতারই পরিস্ফুটন। যে-বাস্তবের দিনলিপি লেখা হয়েছিল প্রাগৈতিহাসিক প্রাচীনতায়। 'জঙ্গম'-ও সেই বাস্তবেরই পটকথা। মহাকাব্যের মতোই তা জীবন-বাস্তবের অনু-কণাগুলিকেও নির্মোহভাবে ধারণ করেছে। তবে এই বাস্তব একান্তভাবেই উপনিবেশিকতা-শাসিত ভারতের বিশ শতকের প্রথমার্ধের দেশ, কাল ও মানুষকে নিয়ে গড়ে তোলা কথাশিল্প।

'জঙ্গম' উপন্যাসের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ের পর এই খণ্ডে যে আখ্যানগুলি স্থান পেয়েছে সেগুলি, আগেই বলেছি, ১৯৭০ থেকে ১৯৭৯-র মধ্যে লিখিত। প্রকাশকালের হিসেবে প্রথমে আসে 'রূপকথা এবং তারপর' (১৯৭০) উপন্যাস। কিন্তু আমরা এই আলোচনায় প্রথমে ১৯৭৪-এ প্রকাশিত 'প্রথম গরল'। উপন্যাসের আলোচনা সেরে নেব। তার দুটি কারণ। প্রথমত এই 'প্রথম গরল' ছাড়া অন্য যে উপন্যাসগুলি এই অষ্টম খণ্ডে স্থান পেয়েছে সেগুলির মধ্যে পরিকল্পনাগত এক ধরনের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। সেগুলিতে বাস্তব জীবন এবং কল্পলোকের সীমারেখা গেছে লুপ্ত হয়ে। সেগুলি রূপকথা, উদ্‌ভট কল্প-কাহিনি, রূপক এবং বাস্তবের এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ। বাস্তবের সঙ্গতিবোধ এই আখ্যানগুলিতে ঘটবে না। এই ধরনের সাহিত্যের লেখার প্রক্রিয়া আলাদা, রস আস্বাদনের অভ্যাসও এখানে স্বতন্ত্র হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু 'প্রথম গরল' ভিন্ন গোত্রের রচনা। সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসের একটি কালখণ্ড এই উপন্যাসের অবলম্বন। কেউ কেউ একে বিজ্ঞাননির্ভর উপন্যাসও বলতে পারেন।

'প্রথম গরল'কে আলাদাভাবে আলোচনা করে নেবার অপর কারণ হল—এই উপন্যাসটিও বস্তুত পূর্ব-রচিত বনফুলের বহুখ্যাত উপন্যাস 'স্থাবর'-এর উত্তর-উপাখ্যান। 'স্থাবর' প্রকাশিত হয় ১৯৫১-তে। তার ভূমিকায় লেখক লিখেছিলেন—"মানবজাতির যে কাহিনী ইতিহাসের অন্ধকারে স্থাবর হইয়া আছে, তাহার সম্পূর্ণ রূপ এখনও অজ্ঞাত। যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহারই প্রাথমিক পর্ব লইয়া এই উপন্যাস রচিত হইল।" স্থাবর রচনা করবার জন্য বনফুল পাঠ করেছিলেন মানবজাতির আদি ইতিহাস। চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়নের ফলে নৃতত্ত্বের জ্ঞান তিনি আগেই অর্জন করেছিলেন। উক্ত ভূমিকাতেই তিনি লিখেছেন— "মানবজাতির ইতিহাস বিষয়ে ইংরেজি ভাষায় বহু বিখ্যাত গ্রন্থ আছে। সেই সব গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার সময়ই আমার এই ধরনের একটি আখ্যায়িকা লিখিবার ইচ্ছা হয়।" যে বিদ্বদ্‌জন তাঁকে বই দিয়ে

এবং আলোচনা করে সহায়তা করেছিলেন তাঁদের কাছেও লেখক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন ওই ভূমিকায়। তাঁরা হলেন স্বনামধন্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীলকুমার দে এবং নির্মলকুমার বসু।

'প্রথম গরল' উপন্যাসের সূচনায় লেখক 'স্থাবর'-এর অনুষঙ্গই টেনে এনেছেন। দুটি উপন্যাসের রচনারীতির মধ্যেও সাদৃশ্য আছে যদিও ঠিক এক নয় সেই রীতি। 'স্থাবর' উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে মানব-সভ্যতার বহু শতাব্দীর ইতিহাস। যে উত্তম পুরুষের কথনে আখ্যান বিবৃত হয়েছে—সেই ব্যক্তি—তাকে নায়ক না বলে কেন্দ্রীয় চরিত্র বলা যায়—সে যেন বারবার পুনর্জাত হয়েছে সভ্যতার বিবর্তনের স্তরে স্তরে। এক এক জন্মে তার নতুন সত্তা; এমনকি কোথাও সে নারী এবং কোথাও বালকের ব্যক্তিত্ব নিয়েও আবির্ভূত। কিন্তু এই কথনের লক্ষ্য হল বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের জীবন-যাপনের পরম্পরার ধারাভাষ্য দান করা। যখন পশুর মতোই যূথবদ্ধ জীবন লোমশ মানুষের, ভাষা আবিষ্কৃত হয়নি—তখন থেকে উপন্যাসের শুরু। তার বহু যুগ পরে গোষ্ঠী-জীবন; আগুন, ঘষা পাথরের অস্ত্র, গুহা-বাস। নর-নারী সম্পর্কে আধিপত্যের চেতনা। ক্রমে বংশগতির ধারণা, টোটেম, তুষার যুগ পার হয়ে আসা, শিকার, নৃত্য, গুহাচিত্র। এক ধরনের বিবাহ-ও স্বীকৃত। তারপর চামড়া ও বাকলের পোশাক, বীজ বপনের শিক্ষা, ঘর ও নৌকো বানানো, বিনিময় প্রথার ধারণা, মন্ত্র, দেবতার আরাধনার বিভিন্ন প্রক্রিয়া, বিভিন্ন শিল্পকলার উন্মেষ। নর-নারী সম্পর্কের বিচিত্র বর্ণাভা— প্রেম, ঈর্ষা, হিংস্রতার মিশ্রণ।

এভাবেই 'স্থাবর' উপন্যাসটি শেষ হয়। গোষ্ঠী-দ্বন্দ্বের পাশাপাশি গোষ্ঠীর নেতৃত্ব পদের অধিকারের সংঘাতও উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসটির একেবারে শেষ পর্বে কথক চরিত্র নিজেকে 'জংলা' নামে অভিহিত করে। অন্য চরিত্রগুলির বিচিত্র নামমালা—এবং ইতিহাস ও কল্পনার অপূর্ব সংমিশ্রণে টান টান আকর্ষণের আখ্যান 'স্থাবর'। মানব-সভ্যতার বিবর্তনেব মূর্ত চলচ্চিত্র।

'স্থাবর' প্রসঙ্গে আমাদের আসতেই হল কারণ লেখক স্বয়ং ১৯৭৪-এ প্রকাশিত 'প্রথম গরল' উপন্যাসের সূচনা ঘটিয়েছেন ১৯৫১-তে প্রকাশিত 'স্থাবর'-এর উল্লেখ দিয়ে। সেখানেই সুর বাঁধা হয়ে গেছে উপন্যাসটির। আমরা বুঝে নিই সভ্যতার বিবর্তন-ইতিহাসের অনুসরণেই গড়ে উঠতে চলেছে 'প্রথম গরল', উপন্যাসও। তাই আলোচনার সময়ে এই লেখাটিকে একান্তভাবে বনফুলের শেষ পর্বের লেখার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে লগ্ন করা সঙ্গত বলে মনে হল না।

'প্রথম গরল'-এর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ শুরু হয়েছে এই ভাবে— "নদীর ক্রোড়েই মানব-সভ্যতা লালিত হইয়াছে। কখনও সে নদীর নাম নীল, কখনও ইউফ্রেটিস, কখনও তাইগ্রিস, কখনও আমাজন, কখনও ভল্‌গা, কখনও গঙ্গা। বহু নামহীন নদীও মানব-সভ্যতাকে লালন পালন করিয়াছে। এক জন্মে—যখন আমাব নাম জংলা ছিল—আমরা কন্যানদীর তীরে তৃণ বপন করিয়া জীবন-ধারণ করিতাম। ধবল আমাদের দলপতি ছিল।"

এরপরেই বনফুল অনেক শতাব্দী অতিক্রম করে 'প্রথম গরল'-এর কাল-পর্বে চলে আসেন এবং সংক্ষেপে হলেও পনেরো ছত্রের মধ্যে বেশ সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেছেন সেই কৃষিনির্ভর জীবনের। 'প্রথম গরল' উপন্যাসটিতে বহু প্রজন্ম নয়, এক প্রজন্মের আখ্যানই বিবৃত হয়েছে। 'স্থাবর'-এর সঙ্গে শৈলীগত পার্থক্য সেইটুকুই।—

"এখন আমার নূতন নাম টালা। এখন আমাদের সে দুর্দশাও আর নাই। আমরা চাষবাসের প্রভূত উন্নতি করিয়াছি, গৃহস্থ হইয়াছি, মানুষের বাঁচিবার তাগিদই মানুষকে নিত্য নব উদ্‌ভাবনে নিযুক্ত করিয়াছে। লৌহ তাম্র প্রভৃতি ধাতু আবিষ্কার করিয়া মানব সমাজ এখন প্রকৃতির নির্যাতন হইতে মুক্তি পাইয়াছে। ... এখন আমরা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছি, নৌকাযোগে বিদেশের হাটে বাজারে যাতায়াত করিতেছি। এসব করিতে বহু যুগ লাগিয়াছে, নিরন্তর চেষ্টাই মানুষকে আগাইয়া লইয়া চলিয়াছে। এখন আমাদের শস্যক্ষেত্র দিগন্তবিস্তৃত। ছোট ছোট গ্রামে আমাদের পরিবারবর্গ সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে। সকলেই— বিশেষ করিয়া মেয়েরা, এমন কি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত চাষবাসের কর্মে নিযুক্ত।

আমাদের অনেক গরু, অনেক মহিষ, অনেক ছাগল, অনেক ভেড়া। কুকুর আমাদের পরিজনের মতো হইয়া গিয়াছে। জন্তু জানোয়ার এবং পক্ষী শিকারে আমরা দক্ষ হইয়াছি। বল্লম বর্শা তীর-ধনুক ছোরা কুঠার এবং খড়্গ এখন আমাদের নিত্যসঙ্গী। আমাদের গরু-মহিষ-ছাগল-ভেড়া বিরানি নামে বিরাট জঙ্গলে থাকে।...অনেক দুধ হয়।"

'প্রথম গরল' 'স্থাবর'-এর মতো সভ্যতার বিবর্তন-ধারার চিত্রায়ণ নয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে গ্রামবাসী, কৃষিজীবী, পশুপালক, বাণিজ্য-বুদ্ধি ও ব্যবসায়-পদ্ধতির প্রথম স্তর আয়ত্ত করা মানুষ যেভাবে বসবাস করত—সেই সেই সমাজ-জীবনকেই তুলে ধরেছেন লেখক। 'প্রথম গরল' নামকরণের সার্থকতা এসেছে অন্য দিক থেকে। মোটামুটি ভাবে স্থিতিশীল ও সচ্ছল সমাজ-জীবনে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে চিত্তবৃত্তির যে অধিকারবোধ জনিত হিংস্র-কুটিল বক্রতার রূপ দেখা যায় সেই নক্‌শা তুলে ধরাই লেখকের উদ্দেশ্য। মানুষের সঙ্গে মানুষের অধিকার-প্রবৃত্তির অনন্ত সংঘাত। কখনও গোষ্ঠী-নেতৃত্বের পদের লোভ, কখনও দুই গোষ্ঠীর ভূমি অধিকারের প্রবণতা, কখনও সম্পদ করায়ত্ত করবার আকাঙ্ক্ষা, কখনও প্রভূত শক্তি অর্জন করে অপরকে বশীভূত রাখবার বাসনা, কখনও নরনারী-সম্পর্কের কামনা-ঈর্ষা-ক্রোধ। মানব-সভ্যতার গরল উত্থিত হয়েছে এই চিৎসমুদ্র মন্থনেই। সেই মনস্তাত্ত্বিক আখ্যানই রচনা করেছেন বনফুল। কিন্তু মানুষের অবস্থান যেহেতু দেশ-কাল নিরপেক্ষ নয়, তাই যে জনগোষ্ঠীকে তিনি অবলম্বন করেছেন তার আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডল আশ্চর্য সংহত ঘনত্বে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন প্রথমেই। যে উদ্ধৃতিটি আমরা আগে দিয়েছি তাতেই আঁকা হয়ে আছে সেই ছবি।

মানব-সভ্যতার একটি পরিচয় আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে। অপর গুরুত্বপূর্ণ মানস-চিহ্ন হল তার ধর্মবিশ্বাস, দৈব উপলব্ধি, আধ্যাত্মিক চেতনা। ঈশ্বর না থাকলেও

অ-লৌকিক সম্পর্কে মানুষের ভয় ও নির্ভরতার মনস্তত্ত্ব থেকেই ধর্মচেতনা, দেবদেবী-ধারণা, ঈশ্বরবোধের উদ্ভব। তার শিকড় এতই গভীর-প্রোথিত যে আজও, একবিংশ শতাব্দীতেও, মানব-সমাজের ধর্মীয় গোষ্ঠী-পরিচয় সভ্যতায় ও রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে। বিজ্ঞান-মনস্ক, গবেষক লেখক বনফুল এই সত্যটি বিস্মৃত হননি বলেই 'প্রথম গরল'-এর প্রথম দুই তিন পৃষ্ঠার মধ্যেই গোষ্ঠীর ও ব্যক্তির ধর্ম-বিশ্বাসের দিকটি তুলে ধরেছেন এবং সম্পূর্ণ করেছেন মানব-মনস্তত্ত্বের সার্বিক পরিচয়—

"আমাদের চারিদিকের প্রকৃতি, আকাশ, বাতাস, জন্তু-জানোয়ার, পাখি, মেঘ ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ, আমাদের মাঠের ফসল, আমাদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সবই যেন একটা অদৃশ্য সূত্রে বাঁধা আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতাম। বিশ্বাস করিতাম আমরা যেন কোনো অদৃশ্য শক্তি দ্বারা চালিত। সেই শক্তিই আমাদের নিয়ামক, তাহার বিধান অব্যর্থ, তাহার আইন ন্যায়সঙ্গত।...আমরা সর্বদাই সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতাম, পাছে সে আইন লঙঘন করিয়া ফেলি। মাঝে মাঝে ফেলিতামও, কারণ সব সময় সম্পূর্ণভাবে ন্যায়পথে চলা কি সম্ভব মানুষের পক্ষে? এমন কি যাহা জীবনধারণের পক্ষে অনিবার্য তাহা তো করিতেই হইত। সম্পূর্ণ ন্যায়পথে চলা যে অসম্ভব। বন্যপশুকে যখন শিকার করি তখন কি অন্যায় করা হয় না? ফসল কাটিয়া যখন আহার করি তখন কি সেটা ন্যায়সঙ্গত হয়? অন্তরের অন্তস্থলে আমরা অনুভব করিতাম অন্যায় করিতেছি, কিন্তু না করিয়াও বা বাঁচিব কি প্রকারে। তাই মনের মধ্যে একটা অপরাধ-বোধ জাগ্রত হইয়া থাকিত। মনে মনে একটা ভয়ও হইত। ভাবিতাম যাহাকে আমরা হনন করিতেছি তাহার আত্মা কোনো না কোনো ভাবে ইহার প্রতিশোধ লইবে। আমরা বিশ্বাস করিতাম মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব লোপ পায় না, আত্মা বাঁচিয়া থাকে, সে আত্মা দুর্বল নয়, শক্তিশালী, ভয় হইত হয়তো সে প্রতিশোধ লইবে। তাহার ক্রোধ প্রশমনের জন্য আমরা তাই তাহাকে নানাভাবে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতাম।"

'প্রথম গরল' উপন্যাস থেকে গৃহীত উল্লিখিত দুটি উদ্ধৃতিতে আমরা যে মানব-সমাজের অবয়বটি দেখতে পেলাম, উপন্যাসের বাকি অংশ জুড়ে আছে সেই সমাজের নরনারীর বিচিত্র কথা-বৃত্ত সমূহ। ব্যক্তি-সম্পর্কের সমান্তরালে বিভিন্ন গোষ্ঠীর যুদ্ধ ও সন্ধি সম্পর্কিত একাধিক পরিস্থিতিও তুলে ধরা হয়েছে। সমগ্র উপন্যাসটিতে বনফুলের কল্পনা-শক্তির ব্যাপ্তি ও সূক্ষ্মতা আমাদের বিস্মিত করে দেয়। বিচিত্র মানুষ, তাদেব বিশ্বাস, আচরণ— যা আমাদের কাছে অদ্ভুত মনে হয়, অথচ বনফুলের লেখার স্বচ্ছন্দ দাপটে মনে হয়—মানুষগুলি জীবন্ত চলাফেরা করছে আমাদেরই সামনে—এবং স্বাভাবিক মানুষ তারা সকলেই। উপন্যাসটির পৃষ্ঠায় আমরাও উপস্থিত হই সেই প্রাচীন জনপদে। মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে, শত্রুর সঙ্গে আর মানুষের জাগ্রত রিপুগুলির সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধ করে বেঁচে আছে সেখানে।

উপন্যাসটির দৈশিক বিস্তারও উপেক্ষাযোগ্য নয়। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে কোন অঞ্চলটি এখানে উঠে এসেছে তার নির্দিষ্ট কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠের

বর্ণনায় দেখতে পাই— দেশটি তুষার-রাজ্য বা মরুভূমি নয়। উর্বর ও নদীবাহিত মৃত্তিকার দেশ। সেখানে অরণ্য নিবিড়, কৃষি সহজসাধ্য, গবাদিপশু প্রচুর। আমাদের কল্পনায় প্রাচীন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলই ভেসে ওঠে। আর্যদের প্রাক্‌-পুরুষ যেন এই মানুষেরা। ঘোড়া-র উল্লেখ আছে। আরও উত্তর-পশ্চিম থেকে আগত জনগোষ্ঠীর বর্ণনা আছে যাদের নাম ও ধর্মাচরণ আলাদা। পরবর্তীকালের ইসলাম-ধর্মাবলম্বীদের প্রাক্‌-প্রজন্ম তারা। 'হুন' গোষ্ঠীরও নামোল্লেখ আছে।

'প্রথম গরল' উপন্যাস বনফুলের একটি প্রিয় অধ্যয়ন-ক্ষেত্র থেকে উঠে এসেছে। তা হল নৃ-বিজ্ঞানের ইতিহাস। 'স্থাবর' উপন্যাসটিকে উজ্জ্বলকুমার মজুমদার চিহ্নিত করেছেন 'বিজ্ঞানোপন্যাস' রূপে। 'স্থাবর' সম্পর্কে তাঁর অভিমত—" বৈজ্ঞানিক তথ্যকে ভিত্তি করে সম্ভাব্য মানবিক সম্পর্কের জটিলতা কল্পনা করে এবং মানবচেতনার উদ্ভাস এনে ঔপন্যাসিক এমন একটি কাহিনী নির্মাণ করেছেন যাকে কল্পনাশক্তি প্রয়োগের দুরূহ ও দুঃসাহসিক চেষ্টাই বলব।" (বনফুল শতবর্ষের আলোয়; প্রবন্ধ ঃ বনফুলের বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস;উজ্জ্বলকুমার মজুমদার; কলকাতা, প্রকাশক ঃ বনফুল জন্ম শতবর্ষ সমিতি, ১৯৯৯, পৃ. ১৮৬)। 'প্রথম গরল' সম্পর্কেও একই অভিমত প্রযোজ্য। নৃবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের এমন বিরল-সুন্দর সমন্বয় সত্যিই অভাবিতপূর্ব। সেই সঙ্গে উপন্যাসটির সুখপাঠ্যতাও অসাধারণ। ঔপন্যাসিক বনফুলের অন্যতম সিদ্ধি-শিখর 'প্রথম গরল' উপন্যাস।

অতঃপর আমরা পৌঁছে যাই প্রকৃত অর্থে বনফুলের লেখক-জীবনের অন্তিম দশ বছরের লেখায়। এই পর্বের রচনার বৈশিষ্ট্যকে সংক্ষেপে বলা যায়— বাস্তব ও কল্পনার অবাধ সংশ্লেষ। ঠিক 'রূপকথা' বলব না। রাজা-রানি-রাক্ষস-সোনার কাঠি-রূপোর কাঠি-সাত সমুদ্র, প্রাণ-ভোমরা নেই এসব গল্পে। আছে অভাবিতপূর্ব কল্পলোকের সঙ্গে পার্থিব মানুষের অবাধ সংযোগের অদ্ভুত সব দৃশ্য এবং ঘটনা। লেখাগুলিকে নাম দেওয়া যায়—'বস্তু-কল্পকথা'। কল্পনার অঢেল জোগান আছে— কিন্তু বাস্তবের মানুষ তাদের দোষ-গুণ, জীবন-যাপনও লেখক দেখিয়েছেন একই সঙ্গে। দুই-এর মধ্যে নিমেষে স্থাপিত হয় সেতু। চোখের পলকে চলে আনাগোনা। কল্পনা চিরকালই বনফুলের লেখক মনের বিশেষ শক্তি। পূর্ববর্তী পর্যায়ের বাস্তব কাহিনিগুলিতেও তিনি স্বপ্ন, নিদ্রাচ্ছন্নতা, জ্বরবিকার, উপমা-প্রতীকের সূত্র ধরে কল্পলোকের দরজা খুলে দিতেন তাঁর লেখায়। ছোটোদের জন্য লেখা গল্পগুলিতে এই রূপকথা-কল্পনা রঙিন হয়ে উঠত। সেই লাগাম খুলে নেওয়া কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের মানুষের জীবনকে মিশিয়ে দিয়ে আখ্যান রচনা করেছেন সত্তর-উত্তীর্ণ বনফুল।

'রূপকথা এবং তারপর' (১৯৭০) কিঙ্কিণী নামের এক কৃষ্ণা রূপসীর জীবন-কথা। মাতাল, স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করা, অন্য নারীতে আসক্ত, অর্থলোভী এক ব্যক্তি তার পিতা। মা-র প্রতি নির্যাতনের প্রতিবাদ করেছে কিঙ্কিনী। সে ভালোবাসে জ্যোতির্বিজ্ঞানী রঘুপতিকে কিন্তু প্রেম তার কাছে ভরসা হয়ে ওঠে নি। এক বিপন্ন মুহূর্তে উদ্‌ভ্রান্ত কিঙ্কিনী এক পরম মুহূর্তে সহসা পৌঁছে যায় এক অলৌকিক দেশে।

সেখানে অধীশ্বর মহাদেব। সেখানে নিজেদের দুর্বলতাকে জয় করবার সাধনাই শিক্ষা। সেখানে যত্ন-পরিচর্যার কোনো অভাব নেই। অসম্ভব সব ঘটনা ঘটতে থাকে চোখের পলকে। পুরাণের চরিত্ররা মানুষের অবয়ব নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আবার বাস্তবের জীবনও ধরা দিয়ে যায় যখন তখন। শেষ পর্যন্ত কল্পলোকের কিঙ্কিণী হয়ে যায় নিজের রক্ত পান করা ছিন্নমস্তা। বাস্তবের কিঙ্কিণী পিতৃহত্যার দায়ে কারারুদ্ধ, তার ফাঁসি হবে। তথাকথিত স্বাভাবিক মানুষদের চোখে সে উন্মাদ। এই বস্তু-কল্প কথাটিতে ঘটনা-পারম্পর্যের যুক্তি খুঁজে পাওয়া না গেলেও অনুভব করা যায়, বনফুল বর্তমান পৃথিবী ও সমাজের অন্যায়-কলুষিত পরিমণ্ডলের ট্র্যাজেডিকে তুলে ধরতে চাইছেন। প্রবৃত্তির সংযম ছাড়া এই পাপ-চক্রের কোনো পরিশোধন নেই—এই অনুভবই উঠে এসেছে প্রবীণ লেখকের ব্যথিত হৃদয়ের গভীর থেকে।

'রঙ্গতুরঙ্গ' (১৯৭০) সেই তুলনায় কিছু প্রসন্ন মনের রচনা। প্রথম অনুচ্ছেদেই কল্পনাদেবীর আরাধনা, স্বপ্নকে আবাহন, তেপান্তরের মাঠের স্মৃতি। কল্পনার তুরঙ্গ এসে লেখককে নিয়ে যায় সেই বস্তু-কল্পলোকে। রচনাটি উৎসর্গ করা হয়েছে 'রঙ্গ-তুরঙ্গের বিখ্যাত সওয়ার' শিবরাম চক্রবর্তীকে।

উপন্যাসে আছেন দুই প্রৌঢ় বন্ধু চঞ্চল মৌলিক ও সরোবর সান্যাল। চঞ্চলের নাতনি, মেধাবী ছাত্রী সোহাগার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা সরোবরের নাতি, প্রতিভাবান গবেষক নহুষের। এমন সময়ে সোহাগা হঠাৎ চলে গেছে এক আগামী যুগে। তার খোঁজে দুই বন্ধুও চলে যান আগামী যুগের গ্রহ ক্ষ-৪৯-এ। গেলেন কল্পলোকের দূতের সঙ্গে গুলতিতে চড়ে। সে-এক আজব দেশ।

সে-দেশের কীর্তি-কথা পাঠকেরা নিজেরা না পড়লে বলে বোঝানো অসম্ভব। সেখানে ইন্দ্র, চন্দ্র, সপ্তর্ষি, লোপামুদ্রা, উর্বশী, ইলেকট্রন-প্রোটন, গ্যালিলিও, নিউটন, জোনাথান সুইফ্‌ট্‌, ব্রবডিংন্যাগ, লিলিপুট-এর সহাবস্থান। সেখানে আছে ইচ্ছে বড়ি, খ্যাতির বিস্কুট। শেষ পর্যন্ত সোহাগা ও নহুষকে পাওয়া যায়। সপ্ত ঋষি সোনার পালকি বহন করে পৌঁছে দেন তাদের মর্তলোকে। দুই বন্ধু ফিরে আসেন হনুমানের পিঠে চড়ে। এই হল গল্প। খুব গভীর কোনো দর্শন সন্ধানের প্রয়োজন নেই। কিন্তু পাঠকেরা নির্মল আনন্দ পাবেন লেখাটি থেকে।

'আশাবরী'-র প্রকাশ ১৯৭৪-এ। এই উপন্যাস অবশ্য বাস্তবের মাটিতেই দাঁড়িয়ে আছে। বনফুলের মনের একটি পরিচয় বাঙালি-প্রীতিতে। বাঙালিকে ভালোবাসতেন বলেই এই জাতিসম্প্রদায়ের স্খলন তাঁকে পীড়া দিত। মাঝে মাঝে বাঙালির অলসতা, মিথ্যা-অভিমান, ধূর্ততা, অসাধুতা তাঁকে করে তুলত ক্রুদ্ধ; কখনও হতেন বিষণ্ণ।

'আশাবরী' উপন্যাসের বেকার যুবক সত্যেন লেখকের মনের বাঙালি-ভাবনাকে ধারণ করেছে। উপন্যাসটি সরল ও একরৈখিক। সত্যেন বেকার। মামা-মামির আশ্রয়ে থাকতে আত্মমর্যাদায় বেধেছিল। কিন্তু পথে নেমে সে ভিক্ষে করে, এবং কবিতা লেখে। পথেই সঙ্গী জুটেছে কুকুর টোটো। ক্রমে সত্যেন বাজারের মুটেদের সহায়তায় মাল বইতে শুরু করে। অনুভব করে কর্মবিমুখ বাঙালিকে কর্মপথে ফিরিয়ে আনতে

হবে। এই তার জীবনের কর্তব্য। এই সময়ে পথ-দুর্ঘটনায় আহত হয়ে তাকে যেতে হয় হাসপাতালে। হাসপাতালের দরজায় বসে থাকে উদ্‌গ্রীব, উদ্‌বিগ্ন কুকুর টোটো। এখানেই উপন্যাস সমাপ্ত। ঠিক উপন্যাসও হয়তো বলা যায় না একে। লেখকের একটি প্রস্তাব যেন। কিন্তু বনফুলের ভাষার আকর্ষণে, আর তাঁর উপলব্ধির আন্তরিকতায় এই সরল নীতিকথাটিও আমাদের মন স্পর্শ করে যায়।

'সাত সমুদ্র তেরো নদী'-র প্রকাশ ১৯৭৬-এ। এই লেখাটি সম্পূর্ণই কল্প-কথা—রূপকথারই মতো। লেখকই সূত্রপাতে রচনার পরিকল্পনাটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।—"অদ্ভুত একটা যোগাযোগ হয়েছে এ গল্পটাতে। এই গল্পে যাঁরা প্রধান অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে সাতজন পুরুষ আর তেরো জন নারী। পুরুষদের নাম—সব সমুদ্রের নাম আর নারীদের নাম সব নদীর। কেন এরকম হোল তা কল্পনা দেবীই বলতে পারেন—তাঁর খামখেয়ালীর তো আদি অন্ত নাই।"

লেখাটিতে কল্পনার রং, সুর, মণি-মাণিক ছড়ানো। বণিকতন্ত্রের সম্পন্নতার যুগে নর-নারীর জীবন ও মনোবিলাসের গল্প। লেখাটি শেষ হয়েছে পুরাণ-যুগকে স্পর্শ করে। সমুদ্র মন্থনের পরিণামে উত্থিত বিষ ও মহাদেবের তা গ্রহণ করা—এইভাবে এখানেও সভ্যতার কলুষ-মুক্তির সাঙ্কেতিকতায় উপন্যাসের সমাপ্তি। বোঝা যায়, বনফুলের প্রাণের দেবতা ছিলেন—পর্বত ও শ্মশান-বাসী, সর্পভূষণ, ভোগ-উদাসীন দেবাদিদেব শিব।

এই পর্বের সর্বাধিক হৃদয়-স্পর্শী রচনা 'লী', সম্ভবত সর্বাধিক পঠিত ও আদৃত। উৎসর্গ— "লী/লীলা/লীলটু/লীলাবতী তোমাকেই দিলাম/ যে তুমি এখন/ কোথায় আছ/জানি না"। এই লেখার ন্যাসের কেন্দ্র-চরিত্র লীলাবতী—বনফুলের পত্নী, তাঁর দীর্ঘকালের জীবনসঙ্গিনী—রচনাকালে প্রয়াত। লীলা ও লীলার স্মৃতি নিয়ে এই কথাবয়ন। উপন্যাস যদি বলতেই হয়, বলব 'স্মৃতি উপন্যাস।'

আত্মকথা 'পশ্চাৎপট'- (১৯৭৮)-এ বনফুল লেখেন— "হঠাৎ আমার জীবনে এই সময় একটি নিদারুণ বজ্রাঘাত হইল। ২৭শে জুলাই ১৯৭৬ সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিটের সময় লীলা চিরতরে আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তাহার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল। সেদিন হইতে মৃত্যুদিন পর্যন্ত তাহার সহিত আমার ক্বচিৎ ছাড়াছাড়ি হইয়াছে। সে আমার সহধর্মিণী ছিল, সহমর্মিণী ছিল। ... আমার ন্যায় খামখেয়ালী পাগলকে দিয়া সে যে কী মন্ত্রবলে সাহিত্য সৃষ্টি করাইয়াছে তা জানি না।... তাহার উপর বড় নির্ভর ছিল এখন সে নির্ভর চলিয়া গেল।"

লীলাদেবী ছিলেন বর্মা-প্রবাসী অ্যাডভোকেট গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। বেথুন কলেজে আই. এ. পড়তে পড়তে তাঁর বিবাহ—একত্র জীবন উনপঞ্চাশ বছর। এই লেখাটিকেও অন্যের ভাষায় উপস্থাপিত করা অসম্ভব। বনফুল যেভাবে এই নারীকে পেয়েছিলেন— প্রেমে, স্নেহে, সন্তানের জননী এবং মনের সঙ্গিনীরূপে তার বাইরেও লীলাবতীর ভিন্ন ব্যক্তিত্ব ছিল। তাঁর সংসারের আশ্রিত, পোষ্য, পরিচারক, পরিচারিকা, পাড়া-প্রতিবেশী এবং গৃহপালিত পশু-পাখিগুলিও তাঁকে নিজেদের মতো

করে পেয়েছিল। বনফুল এই স্মৃতি-কথনে সেই সত্য বিস্মৃত হননি। দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের স্মৃতি সম্ভার লেখাটিকে সুবাসিত করেছে। কোনো বড়ো ঘটনা নয়— সম্পন্ন বাঙালি পরিবারের গৃহকর্ত্রীর জীবন-যাপনের টুকরো কথাগুলি সজীব ফুলের মতো ফুটে উঠেছে এই লিখনে। বনফুল শুরু করেছেন মৃত্যু-অন্তিক মিলনের ভাবনায়— *"লী শব্দটির মানে, মিলন। মিলনের কথাই লিখব আজ।"*

লেখাটির মধ্যে আছে কল্প-সংলাপ, আছে স্মৃতির তর্পণ। কিন্তু সেই তর্পণকে ছাপিয়ে আছে স্মৃতির দর্শন। যে মানুষ হারায়, সে তো জীবিতদের মন থেকে হারায় না। আপাত বাস্তবতায় প্রয়াত যে, তার অস্তিত্ব মিশে থাকে জীবিতের যাপন-মুহূর্তগুলির সঙ্গে।

কিন্তু আমার মনকে সর্বাধিক স্পর্শ করে বনফুলের অনুভবের সেই ক্ষণগুলি— যখন তিনি মখমল-সবুজ, বিশাল-চক্ষু এক পতঙ্গের স্পর্শে তাঁর লী-কে খুঁজে পান; জোনাকি-র আলোকগুচ্ছে, নদীর বাঁকের নৌকোয় তাঁকে দেখতে পান।—কল্পিত কিন্তু প্রত্যক্ষ। তখনই যেন লীলাবতী মূর্ত হন। বনফুল ভালোবাসতেন নিসর্গ। মৃত্যুর পর মানুষ আর নিসর্গ নিলীন হয়ে যায়—এই সত্য মিথ্যা করে দেয় সব পরলোক-তত্ত্বকে।

'লী' স্মৃতি-উপন্যাস বহু পাঠকের মনের বহু স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলবে। তুলবেই। এখানেই এই রচনার সার্থকতা।

এই অষ্টম খণ্ডের শেষ লেখাটি বনফুলের একটি অসমাপ্ত উপন্যাস। 'আকাশবাসী' নামের লেখাটি তিনি শুরু করেছিলেন ১৯৭৮-এর শেষে, অথবা ১৯৭৯-এর প্রথম দিকে। তিনি প্রয়াত হন ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি। অতঃপর 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার পরবর্তীকালের এক শারদ সংখ্যায় এই অসমাপ্ত উপন্যাসটি সমাপ্ত করেন সেই সময়ের দু-জন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কথাকার। উপন্যাসের প্রথম অংশের লেখক বনফুল; দ্বিতীয় অংশটি লিখেছেন বিমল মিত্র; তৃতীয় ও শেষ অংশটি লিখেছেন বিমল কর। এক আদর্শবাদী অধ্যাপকের নাম আকাশবাসী। সেবা করতে চায় সমাজের। মঙ্গল করতে চায় তার চারিপাশের সকলের। তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এই বিশ্বাসই তার প্রাপ্ত উত্তরাধিকার।

কিন্তু সমাজর অবনমনে, দুর্নীতির বিস্তারে তার আদর্শ বার বার বিড়ম্বিত হয়। কেউ তাকে বোঝে না। যাদের মানুষ করতে চেয়েছিল তারা হয়ে যায় সমাজ-বিরোধী। আকাশবাসী উপহসিত হয় সকলের কাছে। কিন্তু সে ধীরস্বভাব ব্যক্তি। বুঝতে চেষ্টা করে সমাজকে, সন্ধান করে— কোথায় এই সমাজের দুর্বলতা, কোথায় তার ত্রুটি।

তারপর এক সময়ে হতাশা ও অবসাদকে ঝেড়ে ফেলতে সক্ষম হয় সে। স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পায় অগ্নিকাণ্ড। সেই আগুনের শিখার মধ্যে এসে দাঁড়ান তার প্রপিতামহের প্রপিতামহ। দীপ্ত জ্যোতির্ময় মূর্তি তাঁর—তিনিই আকাশবাসীর আদর্শ। "আকাশ পরাজয় স্বীকার করবে না"।—এই শেষ বাক্য উপন্যাসের। বিমল করের

কলমে অভিব্যক্ত—কিন্তু বনফুলেরই আদর্শ। সেদিক থেকে উপন্যাসটি অন্য লেখকের হাতে সম্পূর্ণ হলেও বনফুলের অন্তর-ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়নি।

বনফুলের উপন্যাস-সমগ্র-র এই অষ্টম ও শেষ খণ্ডটি পাঠকদের কাছে মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। কারণ এই খণ্ডে একদিকে যেমন পাব তাঁর বিচিত্র-বিষয়ী উপন্যাসের পরিচয় ('জঙ্গম' ও 'প্রথম গরল'), তেমনই আছে তাঁর অন্তিম পর্বের 'বস্তু-কল্পকথা' জাতীয় রচনাগুলির স্বাদ। সর্বোপরি পাঠকের মনকে তৃপ্ত, পূর্ণ, বিষণ্ণ কিন্তু উদাত্ত করে দেবে বনফুলের স্মৃতি উপন্যাস 'লী'। প্রয়াত পত্নীর জীবন-সঙ্গ আর স্মৃতির সঙ্গের সম্মিলনে উপন্যাসটি কেবল হৃদয়-স্পর্শীই হয়নি; হয়ে উঠেছে এক ধরনের 'সাবলিমিটি'-র আধার।

সুমিতা চক্রবর্তী

জঙ্গম

চতুর্থ অধ্যায় ও পঞ্চম অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

।। এক ।।

সাহিত্যিক জীবন। ইহার নাম সাহিত্যিক জীবন? 'সংস্কারক' আপিসের দ্বিতলের ঘরটিতে বসিয়া প্রুফ সংশোধন করিতে করিতে শঙ্কর মনে মনে নিজের সাহিত্যিক জীবনের হিসাব-নিকাশ করিয়া যাহা অনুভব করিল, তাহা গৌরবজনক নহে। সাহিত্যিক মানে কেরানি? সাধারণ কেরানির মত সেও তো দশটা-পাঁচটা আপিস করিয়া পরের ফরমাস অনুযায়ী কলম পিষিয়া চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। গোটা দুই বাজে উপন্যাস, চলনসই কয়েকটি গল্প এবং চানাচুর-মার্কা কয়েকটি কবিতা লেখা ছাড়া আর কি এমন সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে সে! ভালো লেখা দূরে থাক, ভালো বই পড়িবারই তো অবসর পায় নাই। চাকরি বজায় রাখিতেই সমস্ত শক্তি ও সময় চলিয়া যাইতেছে। 'সংস্কারক'-সম্পাদকের শুচিবায়ুগ্রস্ত মনের রুচি অনুযায়ী লেখা নির্বাচন করিতে এবং সেই দুর্বল রচনাগুলিকে যথাসম্ভব নির্ভুল করিয়া মাসের ঠিক পয়লা তারিখে প্রকাশ করিতেই তাহার অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, নিঃসন্তান সম্পাদক মহাশয়ের পরম স্নেহভাজন ভাগিনেয় নিলয়কুমারকে সমীহ করিয়া চলিতে হয়, তাহার যে-কোনো রচনাকে প্রথম শ্রেণির সাহিত্য-মর্যাদা দিয়া ছাপিতে হয়, তাহার বন্ধুদের অন্তঃসারশূন্য সাহিত্যিক চালিয়াতি নীরবে সহ্য করিতে হয়। ইহাই তাহার বর্তমান চাকরি এবং ইহাই তাহার সাহিত্য-চর্চা। অথচ এই চাকরি বজায় রাখিবার জন্য কত কৌশল, কত প্রচেষ্টা! ডাক্তার মুখার্জির সুপারিশে প্রুফ-রিডার হইয়া মাসে চল্লিশ টাকা বেতনে সে 'সংস্কারক' আপিসে ঢুকিয়াছিল, তাহার পর এই দুই বৎসরের মধ্যে, নিজের দক্ষতাগুণেই হউক বা ডাক্তার মুখার্জির গোপন সুপারিশ-বলেই হউক, তাহার পদোন্নতি ঘটিয়াছে। সে এখন প্রুফ-রিডার নয়, সহকারী সম্পাদক। দুই বৎসর পূর্বে হীরালাল মজুমদারের সহকারী হইবার কল্পনা তাহার পক্ষে কল্পনা-বিলাস হইত, কিন্তু এখন সেই সহকারী-পদ পাইয়া অস্বস্তি ভোগ করিতেছে। তাহার কেবলই মনে হইতেছে, কিছু হইল না, কিছু হইল না, সময়টা বৃথা নষ্ট হইয়া গেল। মনে হইতেছে, অহরহ মনে হইতেছে, কিন্তু চাকরি ছাড়িবার উপায় নাই। কলিকাতা শহরে অর্থই একমাত্র বল। মাস শেষ হইলে অন্ততপক্ষে দেড় শত টাকা চাই-ই। চাকরি ছাড়া চলিবে না, বরং চাকরিটা যাহাতে আরও পাকা হয় সে প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করিতেছে। আপিসে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়াছে, চণ্ডীচরণ দস্তিদার, নিলয়কুমারের বন্ধু। অনেকে বলেন, নিলয়কুমারের চর। মামার আপিসের সমস্ত হালচালের সম্পূর্ণ খবর রাখিবার জন্যই নাকি নিলয়বাবু চণ্ডীচরণবাবুকে আপিসে ঢুকাইয়াছেন। তিনি আপিসে আসিয়াই একটি দল পাকাইয়াছেন। দলটি শঙ্করকে শত্রু-পক্ষীয় বলিয়া মনে করে। মনে করে, শঙ্কর হীরালালবাবুর গুপ্তচর ছাড়া আর কিছু নয়। শঙ্করের আশঙ্কা, এই চণ্ডীচরণবাবুর চক্রান্তেই হয়তো তাহার একদিন চাকরি যাইবে। কারণ, কাগজে কলমে

হীরালালবাবু মালিক হইলেও আসল মালিক নিলয়কুমার। তাই নিলয়কুমারকে তুষ্ট করিবার জন্য শঙ্কর ব্যগ্র। এই ব্যগ্রতার জন্য মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতেছে, কিন্তু বাহিরে ব্যগ্র হইতেছে। আজই তো সমস্ত দিন ধরিয়া সে সদ্যবিবাহিত নিলয়কুমারের জন্য সস্তায় একটি বাড়ি ঠিক করিয়া আসিল। নিলয়কুমার নববিবাহিতা পত্নীকে লইয়া মাতুলের বাড়িতে থাকিতে চান না। এতদিন মাতুলের কাছেই ছিলেন; কিন্তু বিবাহ করিবামাত্র তাঁহার আত্মসম্মানবোধ সম্ভবত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে; তিনি অন্য বাসায় উঠিয়া যাইতে চান, হীরালালবাবুও নাকি ইহাতে মত দিয়াছেন। চণ্ডীচরণবাবু ও নিলয়বাবু নিজেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও ভদ্রপল্লীতে সস্তায় বাড়ি আবিষ্কার করিতে পারিতেছিলেন না, আজ শঙ্কর বাড়িটা খুঁজিয়া দিয়া চণ্ডীচরণ দস্তিদারের উপর টেক্কা দিয়াছে। নিলয়কুমার এবং তৎপত্নী রেণুকা যদি সুপ্রসন্ন থাকেন, শঙ্করের চাকরি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। হীরালালবাবু বৃদ্ধ হইয়াছেন, নিজে কিছু দেখিতে পারেন না। নিলয়কুমার অফিস-ডিরেক্টর হিসাবে মোটা মাসোহারা লইয়া আপিসের সর্বময় কর্তা। ইঁহাকে সন্তুষ্ট না করিলে চাকরি থাকিবে না।

নিলয়কুমার উপর-চালাক-গোছের লোক। হঠাৎ কথাবার্তা শুনিলে দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই বোঝা যায়, ভিতরে কোনো শাঁস নাই। শঙ্কর ইহা জানে, কিন্তু ভুলিয়াও কখনও তাহা প্রকাশ করে না, বরং আচার-ব্যবহারে এমন একটা সশ্রদ্ধ ভাব দেখায় যে, সে যেন নিলয়কুমারের বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ। বাড়ি খুঁজিয়া দিয়া শঙ্কর তাঁহাকে আজ আরও খুশি করিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, রেণুকাদেবীর একটি অতি-সাধারণ কবিতার এমন উচ্ছ্বসিত অনর্গল প্রশংসা করিয়াছে যে, নিজের আচরণে সে নিজেই বিস্ময়বোধ করিতেছে। তাহার বিরুদ্ধে চণ্ডীচরণ দস্তিদারের দলের ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে এ কি করিতেছে? ইহাই কি সাহিত্য-চর্চা? সহসা তাহার মন আত্মগ্লানিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সহসা মনে হইল, বিবাহ করিয়া এমনভাবে জড়াইয়া না পড়িলে হয়তো তাহার এ অধঃপতন ঘটিত না, অতিশয় যুক্তিহীনভাবে সহসা অমিয়ার উপর রাগ হইল, আবার তখনই মনে হইল—না, না, সে বেচারির দোষ কি? তাহাকে সে-ই তো নিজে যাচিয়া জোর করিয়া বিবাহ করিয়াছে এবং বিবাহ করিয়া সম্ভবত তাহারই প্রতি ঘোরতর অবিচার করিয়াছে।

কিছুদিন পূর্বের একটা ঘটনা শঙ্করের সহসা মনে পড়িল। সমস্ত চিত্রটা মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। রাত্রি দ্বিপ্রহর, হাওড়ার পুল খোলা, রাত্রেই গঙ্গা পার হইয়া কলিকাতা ফিরিতে হইবে। সঙ্গীরা সবাই মাতাল, একজন রাস্তায় শুইয়া পড়িয়াছে। অনেক ডাকাডাকি করিয়া একজন মাঝির ঘুম ভাঙাইল, বেশি পয়সার লোভে সে তাহাদের গঙ্গা পার করিয়া দিতে রাজিও হইল; কিন্তু গঙ্গার এমন অবস্থা যে ডিঙি তীর পর্যন্ত আসিতে পারে না। শঙ্কর সঙ্গীদের প্রত্যেককে কাঁধে করিয়া নৌকায় তুলিল। গঙ্গার জলে বিষ্ঠা ভাসিতেছে, চতুর্দিকে কর্দম ও আবর্জনা। সমস্ত অতিক্রম করিয়া শঙ্কর সঙ্গীদের লইয়া নৌকায় চড়িয়া বসিল; হু-হু করিয়া একটা হাওয়া উঠিয়াছে, ওপারে কলিকাতা শহরের আলো-আঁধারির রহস্য, রগের শিরাগুলা দপদপ করিতেছে, হুইস্কির নেশাটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। নৃত্যপরা তন্বীর যৌবন-মাদকতায় কল্পনা আবিষ্ট—মেয়েটার নামটা কি ছিল?—ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শঙ্কর খানিকক্ষণ ভাবিল, কিন্তু মনে করিতে পারিল না।

'উড়িষ্যার বনে জঙ্গলে'র পর ইঞ্চি তিনেক ফাঁক থেকে যাচ্ছে, কোনো কবিতা-টবিতা থাকে তো দিন।

প্রিন্টার শীতলবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন।

শঙ্কর রেণুকাদেবীর কবিতাটা দিয়ে দিল।

রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুকরণ। এ ধরনের কবিতা তো প্রতি মাসেই ছাপিতে হয়, রেণুকা দেবীরটা ছাপিতেই বা দোষ কি? ছাপিলে তাহার লাভ বই ক্ষতি নাই। ছন্দ মিল সবই তো ঠিক আছে, ভাবটিও বেশ উদাস-করা উদাস-করা গোছের। মন্দ কি? শীতলবাবু চলিয়া গেলেন।

শঙ্কর নিজের আচরণে নিজেই অবাক হইয়া বসিয়া রহিল।

।। দুই ।।

'ক্ষত্রিয়' অবশ্য এখনও জীবিত আছে।

কিন্তু কোনোক্রমে। কোনো আয় তো হয়ই না, মাঘের পত্রিকা চৈত্রে বাহির হয়, তাও ভালো লেখা জোটে না। 'ক্ষত্রিয়ে'র পুরাতন দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। হিরণদা ইরিগেশন বিভাগে বড় চাকরি করিতেছেন, জ্যোতির্ময়বাবু একটা ইংরেজি দৈনিক-পত্রিকার সাব-এডিটার, সুরেন সোম শিক্ষকতা উপলক্ষে কলিকাতায় ছিলেন, কিছুদিন পূর্বে কর্মে অবসর লইয়া দেশে গিয়াছেন, সেখান হইতে মাঝে মাঝে দুই-একটা ভারি ওজনের উদ্ভটগোছের প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। ছবি রায় একাধিকবার প্রেমে পড়িয়া, অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া, ক্রমবর্ধমান পরিবার লইয়া একটা আশঙ্কাজনক অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে; পরিচিত কেহ তাহাকে দেখিলেই সরিয়া পড়ে, কারণ দেখা হইলেই সে ধার চায়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সে সাহিত্যচর্চা ত্যাগ করে নাই, শুষ্ক রুক্ষ কেশভার ও উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি লইয়া সে শঙ্করের কাছে মাঝে মাঝে আসে এবং শেলি ব্রাউনিং কিটস আওড়াইয়া কাঁদিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া শঙ্করকে বিব্রত করিয়া তোলে। মাঝে মাঝে রোমান্টিক ধরনের প্রবন্ধ বা কবিতাও লিখিয়া আনে ক্ষত্রিয় পত্রিকার জন্য। 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার আরও দুই জন লেখক জুটিয়াছেন, একজন ডাক্তার মুখার্জি এবং আর একজন লোকনাথ ঘোষাল। ডাক্তার মুখার্জির এমন কলমের জোর আছে, তাহা শঙ্কর ইতিপূর্বে জানিত না। লোকনাথ ঘোষাল লোকটিও অদ্ভুত প্রকৃতির। এমন একনিষ্ঠ সাহিত্যিক শঙ্কর আর দেখে নাই। সাহিত্যই তাঁহার জীবনের ধ্যান জ্ঞান, সাহিত্য ভিন্ন তিনি আর কিছু জানেন না, আর কিছু জানিতে চান না। বিহারের এক পল্লীগ্রামে তিনি স্কুল-মাস্টারি করেন এবং মাস্টারি করিবার পর যেটুকু সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহা সাহিত্য-সাধনায় ব্যয় করেন। তাঁহার সাহিত্য-সাধনা ঠুনকো শৌখিন ব্যাপার নয়, জীবনের মর্মমূলে সে সাধনা রস-পরিবেশন করে, আলো-বাতাসের মত তাহা তাঁহার নিকট সত্য ও প্রয়োজনীয়। 'সংস্কারক' পত্রিকার সহকারী-সম্পাদকরূপে লোকনাথবাবুর সহিত শঙ্করের আলাপ হইয়াছে। আলাপ করিয়া শঙ্কর মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার মুখার্জি এবং লোকনাথবাবুর লেখায় 'ক্ষত্রিয়' সত্যই সমৃদ্ধ। শঙ্করের আশা, তাহার 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকা সত্যই একদা আদর্শ সাহিত্য-পত্রিকায় পরিণত হইবে, তাই এত

অসুবিধার মধ্যেও সে 'ক্ষত্রিয়'কে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এখনও সে আদর্শ বহু দূরে, এখনও কেবল নিন্দা এবং গালাগালি দিয়াই কাগজের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিতে হয়। গালাগালির বিষয়ও সেই এক, প্রতিভাহীন বামনদের স্পর্ধিত চন্দ্র-লোলুপতা। এই প্রসঙ্গে ডাক্তার মুখার্জি দিল্লি হইতে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, শঙ্কর তাহাই পড়িতেছিল, ডাক্তার মুখার্জি আজকাল দিল্লিতে, কারণ তাঁহার একমাত্র পুত্র দিল্লিতেই চাকরি করেন।

ডাক্তার মুখার্জি লিখিতেছেন—

শঙ্কর,

আধুনিক লেখকদের ওপর তুমি চটেছ। আমি তোমার চেয়ে বেশিদিন বাংলা দেশে বাস করেছি, আমি তোমার চেয়ে বেশি দেখেছি, তাই চটবার কারণ পাচ্ছি না।

সেকালে রবিবাবুর নাম করলে ঢিল খেতে হত। আমাদের প্রাণ বাঁচানো দায় ছিল। রবিবাবুর ছন্দ নেই, মিল নেই, গাম্ভীর্য নেই, ভাষার মাধুর্য নেই—এই রকম কত দোষ যে দেখতে পেয়েছিল হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের ভাষা ও ছন্দমুগ্ধ সাহিত্যিকেরা—তা বলবার নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রে রবিবাবুর ভাষাকে চেস্ট বাংলায় রূপান্তরিত করবার জন্যে নম্বর দেওয়া হত।

এখন সেদিন গেছে। এখন রবিবাবু নাকচ হয়েছেন পিচের গন্ধ আর পেট্রলের গন্ধ কবিতায় ঢোকাননি বলে।

সেকালে টিকি আর তিলকের মধ্যে ম্যাগ্‌নেটিজিম ইলেকট্রিসিটি, বিধবার অলঙ্কারের স্বর্ণে উত্তেজক তাড়িত এবং শূদ্রের চোখের দুষ্ট ম্যাগ্‌নেটিজম নিয়ে বড় বড় প্রবন্ধ বেরুত। এর জন্য অনেকেরই ফিজিক্স পড়বার দরকার হয়নি, এমন কি যাঁরা ফিজিক্স চর্চা করতেন তাঁরাও ওই রকম বক্তৃতা দিতেন কেউ কেউ।

সেকালে গল্প বেরুত—ডাকাতরা বৃক্ষকোটরে প্রবেশ করলে, আর ডিটেকটিভ মাইক্রোস্কোপ লাগিয়ে তাদের ধরে ফেললে।

একালে ইলেক্‌ট্রিসিটির বদলে এসেছে ফ্রয়েডিজ্‌ম আর সাইকোলজি। এখন মা চুমু খেলে বেবির মুখ লাল হয়ে ওঠে, মামা ভাগনীর রিপ্রেশন তাড়াবার জন্যে বক্তৃতা করে। সেকালে যাঁরা মামি-কাকিকে কাশী পাঠাতেন, তাঁদের কাব্যের একমাত্র বিষয় ছিল সতীত্ব। একালে সতীত্ব নেই। যুবারা সেক্সের বিজ্ঞাপন পড়া (অনেক সময় আবার সেটা কন্টিনেন্টাল নভেল বা সিনেমার মারফত) আর রতিবিলাস খাওয়ার অবসরে রাস্তায় মেয়েদের হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে, আর তাদের ঘুমন্ত মুঠোয় টাকা গুঁজে দিয়ে চলে আসছে। সেকালের প্রবলেম ছিল ক-খ-জানা মেয়ের হাতে স্বামীর লাঞ্ছনা। এখনকার প্রবলেম হয়েছে লেবার-এর দুঃখ। যেখানে ভিক্ষা পেলেই পেট ভরে খেতে পাওয়া যায়, যেখানে অতি অধমেরও কাকা দাদা প্রভৃতি আশ্রয়স্থল আছে—সেখানকার লেবার প্রবলেম কি মর্মান্তিক!

এক খামচা লঙ্কাবাটা বা একটা পেঁয়াজ দিয়ে যারা এক থালা ভাত খায়, তাদের পাড়ায় যেতে হয় ডিমের খোলা মাড়িয়ে। গিয়ে দেখতে হয়, দরমার দেওয়ালে খবরের কাগজের ওয়াল-পেপার আর বালিশের তলায়—দি ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড।

সেকাল আর একাল পাশাপাশি বসিয়ে দেখ, ইউক্লিডের ফোর্থ থিয়োরেমের মত মিলে যাবে।

এখনকার অধঃপতনে দুঃখ বা রাগ হতে গেলে প্রি-সাপোজ করতে হয় যে, এর আগে এক সময় এর চেয়ে ভালো কিছু ছিল।

সেকালে দেখেছিলুম একজন মহাত্মা ভদ্র কুলবধূর নাম করে কেচ্ছা করলেন আর চারিদিকে বাহবা বাহবা পড়ে গেল। শেষে তাঁর জেল হল। কিন্তু যেদিন জেল থেকে বেরুলেন, কলেজের ছেলেরা মাথায় করে তাঁকে নিয়ে এল। একালে দেখি সিবিল-ডিস্ওবিডিয়েন্স মুভমেন্টে দলে দলে লোক জেলে যাচ্ছে, নিজেদের ডিফেন্ড করছে না। জেলে গিয়ে কিন্তু মালিশের তেল বা পানের চুন কম হলে আকাশফাটা আর্তনাদ করছে, আর হরলিক্স মিল্ক না পেলে হাঙ্গার-স্ট্রাইক করছে। সেকালের সাহিত্য বা পলিটিক্স যা ছিল, একালেও ঠিক তাই আছে,—বাইরের চেহারাটায় একটু অদল-বদল হয়েছে মাত্র। দাণ্ডি-মার্চ বা সল্ট-রোডের সাবলাইম বা রিডিকুলাস কারোর কল্পনা উদ্বুদ্ধ করল না। বিহার ভূমিকম্প কারোর কাব্যের খোরাক জোগাল না। এবার অতীতের দিকে চেয়ে দেখি—সিরাজ এবং ইংরেজ যখন বঙ্গদেশের বুকে সমুদ্রমন্থন করছিল, তখন বই বেরিয়েছিল—রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনচরিত। কি আর বলি! তোমরা সবাই ভালো?

ইতি শুভার্থী

নীলমাধব মুখোপাধ্যায়।

ডাক্তার মুখার্জির পত্রখানা পড়িয়া শঙ্কর বিস্মিত হইয়া গেল। তাঁহার ঠিক এই রূপ সে এতদিন দেখে নাই। আধুনিকনামা এই অপদার্থ লোকগুলোর সম্বন্ধে তাহার দৃষ্টিভঙ্গিই যেন বদলাইয়া গেল। ইহারা যে এই পরাধীন দেশের সনাতন মনোবৃত্তিরই নব রূপ, তাহা এতদিন তাহার ধারণাতে আসে নাই। সহসা তাহার মনে হইল, সেকি নিজেও তাহাদেরই দলভুক্ত নয়, না হয় তাহার ধরনটা একটু ভিন্ন রকমের। সে 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকায় উহাদের রচনাকে লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছে বটে, কিন্তু সে ব্যঙ্গ কি সত্যই সাহিত্যিক ব্যঙ্গ? তাহাতে বিন্দুমাত্র ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কি নাই? আধুনিক লেখকদের হঠাৎ-জনপ্রিয়তা কি তাহার চিত্তকে ঈর্ষাক্ষুব্ধ করিয়া তোলে নাই? এই ঈর্ষা এবং এই ঈর্ষা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া মহত্ত্বের অভিনয় করা কি পরাধীন জাতির মজ্জাগত প্রবৃত্তি নয়? যে পরাধীনতার প্রকোপে এই আধুনিকেরা নকল-নবিশ, সেই পরাধীনতার প্রকোপে সেও ঈর্ষাক্লিষ্ট নকল-সংস্কারক। কিন্তু না না... সহসা শঙ্করের যেন সব গোলমাল হইয়া গেল। নিজেকে এতটা হীন সে ভাবিতে পারিল না। ঈর্ষা? ঈর্ষার জন্যই সে এত সব করিয়াছে? আর একটা কথা তাহার মনে হইল। উহাদের সঙ্গে মেলামেশা করিতে তো তাহার বাধে নাই। একই হোটেলে একই ধরনের আহার্য ও মদ্য সেবন করিয়া একই বারবনিতার বাড়িতে রাত্রি কাটাইতে তাহার কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয় নাই;এমন কি যাহাদের সঙ্গে এই সূত্রে বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাহাদের সম্পর্কে তাঁহার উগ্রতাটা যেন অনেকটা কম হইয়া আসিয়াছে। মানসিক শুচিতাই যদি তাহার ব্যঙ্গের কারণ হইত, তাহা হইলে সে ইহাদের সহিত বন্ধুভাবে মিশিতে পারিত কি? কিন্তু না না, কোথায় যেন ভুল হইতেছে—সাহিত্যিক বিরোধের সহিত সামাজিক প্রীতি-অপ্রীতির কোনোও সম্পর্ক নাই। তাহার নিকটতম বন্ধুর রচিত সাহিত্যও তাহার বিচারের মানদণ্ডে হীন হইতে পারে এবং তাহা লইয়া নিষ্ঠুরতম ব্যঙ্গ করিতেও সে পশ্চাৎপদ হইবে না।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া সে স্বস্তি পাইল এবং পুনরায় মনোযোগ সহকারে প্রুফ দেখিতে আরম্ভ করিল। তাহার 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকারই প্রুফ সে দেখিতেছিল। ঘড়ির দিকে একবার চাহিয়া দেখিল—নয়টা বাজিয়া গিয়াছে; একটু পরেই আপিসের জন্য উঠিতে হইবে। একজন বেয়ারা প্রবেশ করিয়া একটা চিঠি দিয়া গেল! শৈলর চিঠি, শৈল ডাকিয়াছে।

।। তিন ।।

আপিসে ভণ্টু আসিয়া হাজির।

এখনও প্রুফ লদকাচ্ছিস? ওঠ।

কেন, কি করতে হবে?

লবস্টারিং।

সে আবার কি?

লবস্টার মানে জানিস না? গলদা চিংড়ি। ইটিং আপিসে ঢুকব আজ, এখন না কিনলে তো পাওয়াই যাবে না। ওঠ।

এটা শেষ করে দিই, থাম্, মেশিন না হলে বসে থাকবে। তা ছাড়া এখন আমার ঢের কাজ বাকি—বাজারে যাওয়ার সময় নেই, বস।

ভণ্টু মুখ সুচালো করিয়া তাহার দিকে একবার তাকাইল এবং চেয়ার টানিয়া বসিল।

হঠাৎ গলদা চিংড়ি খাবার শখ কেন?

বিয়ে করে সিংকিং আপিস খুলছি।

অর্থাৎ?

দরাঞ্চে ব্যাপার।

কি রকম?

বিড়্ডিকারের নাকে লবস্টার-ফ্রাইং গন্ধ এন্টারিং আপিস খুলেছে।

শঙ্কর কোনো মন্তব্য না করিয়া স্মিতমুখে প্রুফই দেখিতে লাগিল। ভণ্টু বলিয়া চলিল, বুঝতে পারলি না তো? পারবার কথাও নয়, বুঝিয়ে বলি তা হলে শোন্। আমার মাইনে যদিও একটু বেড়েছে—কিন্তু চাল বাড়াইনি আমি, বিড়্ডিকারকে সেই সাবেক চালে নৌকোর হালটিতে বসিয়ে রেখেছি। প্রাচীন কলাইয়ের ডাল, পোস্ত আর মৌরলামাছের বাসি টক, প্লাস একটা জাবদা-গোছের ভেজিটেবিলের তরকারি—এই মামুলি ফর্মুলা চলছিল। এমন সময় হঠাৎ একদিন বিড়্ডিকারের নাকে চিংড়িমাছ ভাজার গন্ধ ঢুকল।

পাশের বাড়ি থেকে?

না, দোতলা থেকে। বিড়্ডিকার দোতলায় উঠে জানালার ফাঁক দিয়ে দেখল, ঘরে খিল বন্ধ করে ইন্দুমতি স্টোভে লবস্টার ফ্রাই করছে। তাও মাত্র দুটি—একটি বোধ হয় নিজের জন্যে, আর একটি আমার জন্যে।

শঙ্কর হাসিয়া ভণ্টুর পানে চাহিয়া আবার প্রুফে মন দিল।

ভণ্টু বলিল, বোঝ, ভালো করে তলিয়ে বুঝে দেখ ব্যাপারটা।

এতে আর বোঝবার কি আছে?

ঝিকে দিয়ে লুকিয়ে চিংড়িমাছ আনিয়ে গোপনে ইটিং আপিস খুলেছে—বোঝবার কিচ্ছু নেই?

যাঃ।

তুই দেখছি বিড়ডিকারের এক কাঠি ওপরে গেলি। বিড়ডিকারও প্রথমে ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

শঙ্কর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল।

বিড়ডিকারের যা স্বভাব, দোষটা এখন আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছে। বলছে, ও বড়লোকের মেয়ে, যা-তা জিনিস কি রোজ রোজ মুখে রোচে বেচারির, তোমারই কিপ্টেমির জন্যে এসব হচ্ছে, আজ বেশি করে গলদা চিংড়ি আনাও, সবাই মিলে খাওয়া যাক।

একটু থামিয়া ভণ্টু পুনরায় বলিল, বোঝ।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল।

এখনও ধার শোধ করে উঠতে পারিনি, দাদার আবার জ্বর হচ্ছে, ডাক্তাররা বলছে ফের চেঞ্জে পাঠাতে।

শঙ্কর আবার হাসিল।

মুচকি মুচকি হাসছিস যে বড়? মরিয়া হয়ে উঠেছি আজ, লবস্টারের চরম করে ছাড়ব আমি। ওঠ।

আমি এখন উঠতে পারব না, অনেক কাজ বাকি আছে আমার। তাহার পর নিম্নকণ্ঠে বলিল, চণ্ডীচরণ দস্তিদার শ্যেনচক্ষু মেলে চেয়ে আছে, কাজে ফাঁকি দেওয়া চলবে না।

ভণ্টু মুখ সূচালো করিয়া কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, তা হলে রাত্রে যেও এবং ওইখানেই ইটিং আপিস খুলো। কটি লবস্টার খাবে তুমি?

গোটা চারেক।

বলিস কি রে?

ভণ্টু উঠিয়া দাঁড়াইল।

চললাম, মৃন্ময়কেও বলে যাই। ক্যান্ডেলকে নিয়ে কিন্তু মহা মুশকিলে পড়েছি ভাই; ও আপিসের কাজ একদম কিচ্ছু করে না, অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে খালি। এমন থক্‌বকিয়ে গেল কেন বুঝতে পাচ্ছি না।

কেন, কি করে?

কিচ্ছু করে না। কিছু বললেই ফ্যালফ্যাল করে লুকিং আপিস খোলে খালি। ও কি রে, তুই আবার আংটি লদ্‌কালি কবে? দেখি দেখি, এ যে দামি খুজ্‌লু দেখছি।

আমার নয়, অপরের।

ফের মোল্লা জুটিয়েছিস নাকি?

না।

আমি চললাম। আর দেরি করলে পাওয়া যাবে না।

ভণ্টু চলিয়া গেল।

আংটির কথা উঠিতেই শঙ্করের মনে পড়িয়া গেল, কুমার পলাশকান্তি আজ যাইতে বলিয়াছেন। তাঁহাকে একটি গল্প লিখিয়া দিতে হইবে। এই জমিদারপুত্রটির সাহিত্য-বাই চাগিয়াছে। নিজের কোনোও প্রতিভা নাই, অপরের দ্বারা গল্প লিখাইয়া নিজের নামে প্রকাশ করেন এবং ভালো কাগজে ভালো লোক দিয়া ভালো সমালোচনা লিখাইয়া লইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। বলা বাহুল্য, সবই টাকার জোরে। এই দামি হীরার আংটিটা তাঁহারই। শঙ্কর শখ করিয়া আঙুলে পরিয়াছিল, তিনি আর খুলিয়া লন নাই। বলিয়াছিলেন, ব্যস্ত কি, বেশ মানাইয়াছে, থাক না, পরে লইলেই হইবে। 'সংস্কারক' পত্রিকার সহকারী সম্পাদককে, বিশেষত 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার উগ্র সমালোচককে—খুশি করিয়া রাখিতে তিনি ব্যগ্র। একটি গল্প লিখিয়া দিবার জন্য তিনি শঙ্করকে দুইশত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। একটি উপন্যাস লিখিয়া দিতে পারিলে হাজার টাকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। কুমার পলাশকান্তি লক্ষ্মীর দৌলতে সরস্বতীর দরবারেও আসর জমাইতে চাহেন। এককালে রেসের শখ ছিল, এখন সাহিত্যের শখ হইয়াছে।

ভণ্টু চলিয়া যাইবার পর শঙ্কর আরও খানিকক্ষণ প্রুফ দেখিল, কিন্তু হঠাৎ একটা 'ফোন' আসাতে তাহাকে উঠিয়া পড়িতে হইল।

ফোনে চুনচুন বলিল, আসবেন একবার? যদি আপনার অসুবিধা না হয়, আমি মনুমেন্টের কাছে থাকব।

শঙ্করের মনে হইল, অবিলম্বে যাওয়া দরকার। ড্রয়ার টানিয়া আপিসেরই কয়েকটা টাকা সে পকেটে পুরিয়া লইল এবং অতিশয় উত্তেজনাভরে বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে তাহার মনে পড়িল, আরও দুই স্থানে যাইতে হইবে।—প্রথম শৈলর বাসায়, দ্বিতীয় আস্‌মি-দার্‌জির পিতা নিবারণবাবুর কাছে। কুমার পলাশকান্তি যদিও আজ যাইতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে আজ যাওয়া হইবে না, সময় নাই। চুনচুন, শৈল এবং নিবারণবাবু সারিয়া ভণ্টুর বাসায় পৌঁছিতে এমনিই অনেক রাত হইয়া যাইবে।

অমিয়ার মুখখানা মনে একবার উঁকি দিয়া গেল। পথে হঠাৎ পলাশকান্তিরই সহিত দেখা। তিনি তাঁহার মূল্যবান মোটরখানি নিঃশব্দে থামাইয়া জানালা দিয়া গলা বাড়াইলেন। কুমার পলাশকান্তি (বন্ধু ও পরিষদবর্গ তাঁহাকে আদর করিয়া 'কুমার' বলিয়া ডাকেন, সত্যই তিনি রাজপুত্র নহেন) এখনও যৌবনসীমা অতিক্রম করেন নাই। তাঁহার মুখমণ্ডলে একটা নারীসুলভ কমনীয়তা এবং সেই ধরনের দীপ্তি বিদ্যমান, যাহার মূল কারণ প্রতিভা নহে, আর্থিক সচ্ছলতা এবং অভিজাত-সমাজ-সঙ্গ। প্রিয়দর্শন ব্যক্তি তিনি।

শঙ্করবাবু, আমার কাছেই যাচ্ছেন নাকি?

না, জরুরি দরকারে আর এক জায়গায় যেতে হচ্ছে। আপনার কাছে কাল যাব।

আমার গল্পের কত দূর?

অর্ধেকের ওপর হয়ে গেছে।

আচম্বিতে শঙ্করের মুখ দিয়া মিথ্যাই বাহির হইয়া পড়িল।

মুহূর্তকাল নীরবতার পর পলাশকান্তি বলিলেন, আজ কাগজ পড়েছেন?

না।

অচিনবাবুর দশ বছর জেল হয়ে গেল। আজ রায় বেরিয়েছে।

সংবাদটার জন্য শঙ্কর প্রস্তুত ছিল না। সহসা তাহার মনে বহুদিন আগেকার একটা চিত্র ফুটিয়া উঠিল। অচিনবাবুর সহিত সে একবার ওই বৃদ্ধ ম্যানেজারটার নিকট গিয়াছিল টাকার চেষ্টায়। অচিনবাবু বলিয়াছিলেন যে, বুড়োকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে অনায়াসেই হাজারখানেক টাকা ধার পাওয়া যাইতে পারে, বেশি সন্তুষ্ট করিতে পারিলে সুদ পর্যন্ত লাগিবে না। তিনি টাকা দিতে রাজি হইয়াছিলেন; কিন্তু পরিবর্তে যে প্রস্তাবে শঙ্করকে রাজি হইতে বলিয়াছিলেন, তাহা শঙ্কর পারে নাই।

পলাশকান্তি বলিলেন, সমস্ত ডিটেল্‌স্‌ আজ কাগজে বেরিয়েছে, পড়ে দেখবেন; উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর। ওই ম্যানেজারটি সাঙ্ঘাতিক লোক ছিল মশাই। আর সবচেয়ে মজার খবর হচ্ছে এই যে, লোকটা অনেকদিন থেকে অসমর্থ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তবু তার কামনা মরেনি।

শঙ্করের নিকট ইহা নূতন খবর নহে। তবু সে বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল, তাই নাকি?

এই যে কাগজে বেরিয়েছে, দেখুন না, সৌদামিনী আর তার মেয়ে সাক্ষী দিচ্ছে, কাগজটা আপনি রাখুন, আমার পড়া হয়ে গেছে।

শঙ্কর কাগজখানা লইয়া দেখিতে লাগিল। সমস্ত খবরই বাহির হইয়াছে। অচিনবাবু বৃদ্ধ ম্যানেজারকে যে চিঠিখানা লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়া খগেশ্বর অচিনবাবুর কন্যাকেই ভুলাইয়া আনিয়া ম্যানেজারের কবলে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিল। ইহা জানিতে পারিয়া অচিনবাবু ম্যানেজারকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের হাতে ধরা পড়েন। পলাশকান্তি বলিলেন, আমার এ গাড়িখানা অচিনবাবুই কিনে দিয়েছিলেন, তখন কে জানত যে ভদ্রলোক এমন ধারা—

কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া শঙ্কর বলিল, ভদ্রলোকের ওয়ারিশ কেউ নেই?

না, অথচ টাকার কুমির। একটা উইল নাকি করে গেছেন, এখনও তা কোর্টের জিম্মায়।

ও।

এ রকম নরপিশাচ দেখা যায় না মশাই, কত মেয়ের যে সর্বনাশ করেছে তার আর সীমা-সংখ্যা নেই। কাগজে একটা ফর্দ দিয়েছে দেখেছেন? সি. আই. ডি. বেচারাদের কম খাটতে হয়নি। লোকটার ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল।

একটু থামিয়া পলাশকান্তি পুনরায় বলিলেন, এতে হয়তো উপন্যাসের খোরাকও পাবেন আপনি। এই নিয়ে একটা উপন্যাস লিখে দিন না আমাকে, দেবেন? বেশ সাইকোলজিক্যাল-গোছের একটা—

আচ্ছা, পরে দেখব। এখন একটু তাড়া আছে, চলি।

আচ্ছা।

কাগজটা পকেটে পুরিয়া শঙ্কর পলাশকান্তির নিকট বিদায় লইল। অচিনবাবুর কথাই ভাবিতে ভাবিতে সে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। মোটরের দালাল অচিনবাবু! কতটুকুই বা তাহার সঙ্গে পরিচয় ছিল? লোকটার জীবনে যে এত জটিলতা এবং তাহার পরিণতি যে শেষ পর্যন্ত জেলে—তাহাই বা কে জানিত! সহসা শঙ্করের মনে হইল, কাহার সহিতই বা তাহার এতদপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর পরিচয় আছে? কাহার জীবনের সম্পূর্ণ রহস্য কে জানে? এমনকি,

নিজের বিষয়েও তাহার জ্ঞান কতটুকু? এই প্রসঙ্গেই তাহার মনে পড়িল যে, যদিও তাহার মনের মধ্যে একটা নারীমাংসলোলুপ পশু বাস করে, কিন্তু কই, সেদিন ম্যানেজারের প্রস্তাবে সে তো সম্মত হইতে পারে নাই? পশুটার মাংসলোলুপতা হঠাৎ বিলুপ্ত হইয়া গেল কি করিয়া?... অচিনবাবুর সহিত প্রথম পরিচয়ের কথা মনে পড়িল। রিনির জন্মদিনে মিষ্টিদিদি আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন। কোথায় রিনি! তাহার ডাক্তার স্বামীকে লইয়া সে হয়তো সুখেই আছে। শঙ্করের কথা হয়তো তাহার মনেই পড়ে না। কোথায় রিনি, কোথায় অচিনবাবু, কোথায় মিষ্টিদিদি। জীবনে একদিন যাহারা কত বড় ছিল, আজ তাহাদের কথা মনেও পড়ে না। বেলার মুখখানিও মনের মধ্যে ভাসিয়া আসিল—গ্রীবা বাঁকাইয়া অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া ভ্রূভঙ্গিভরা হাসি হাসিতেছে। একখানা চিঠি পর্যন্ত লেখে না।

।। চার ।।

ট্রাম হইতে নামিয়াই শঙ্কর দেখিতে পাইল, চুনচুন মাঠে ঘাসের ওপর তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। শঙ্কর মিসেস স্যানিয়ালের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিল বটে, কিন্তু চুনচুনকে ত্যাগ করিতে পারে নাই। যতদিন সে অব্যবস্থিত ছিল, ততদিনই সে চুনচুনের সহিত দেখা করে নাই। কিন্তু 'সংস্কারক' আপিসে চাকরি হওয়ামাত্র সে মিসেস স্যানিয়ালের দৃষ্টি এড়াইয়া চুনচুনের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিল। কলিকাতা শহর এবং বর্তমান যুগের স্ত্রী-স্বাধীনতার কল্যাণে তাহা অসম্ভব হয় নাই। চুনচুনের অবস্থা এখনও ঠিক পূর্ববৎ। এখনও সে ঠিক আগের মতই মিসেস স্যানিয়ালের নিষ্পাপ গৃহস্থালিতে মিসেস স্যানিয়ালের উপদেশাবলী, মিসেস স্যানিয়ালের পুত্রদ্বয়ের অনুকম্পা, মিসেস স্যানিয়ালের বৃদ্ধ দেবর পীতাম্বরবাবুর নিষ্পলক দৃষ্টি সহ্য করিয়া নীরবে বাস করিতেছে, এতটুকু বিদ্রোহ করে নাই। আজকাল শঙ্করের সহিত তাহার সম্পর্ক অনেকটা গুরু-শিষ্যার সম্পর্কের ন্যায়। শঙ্কর তাহাকে বই দেয়, সে তাহা পড়িয়া ফেরত দেয়। ফেরত দিবার সময় পঠিত পুস্তক লইয়া হয়তো মাঝে মাঝে আলোচনাও হয়। এই আলোচনার মধ্যে একজন গ্রন্থকার অদৃশ্যভাবে বর্তমান থাকিলেও সাধারণ নিয়ম অনুসারে অনায়াসে ইহা এতদিনে তাহাদের ব্যক্তিগত আশা-আশঙ্কা-আকূতিময় আলাপে পরিণত হইতে পারিত, শঙ্করের সেদিকে প্রবণতা যে কিছু কম তাহা নহে, কিন্তু চুনচুন মেয়েটি সত্যই অদ্ভুত। সে কোনোদিন কোনো আচরণ দ্বারা ইহার সম্ভাবনাকে পর্যন্ত প্রশ্রয় দেয় নাই। একটা সুন্দর শুভ্র ফুলে খানিকটা কালি ঢালিয়া দিবার চেষ্টা যেমন সুস্থ সহজ মানুষ করে না, তেমনই শঙ্করও চুনচুনের সহিত কোনোদিন প্রেমালাপ করিবার চেষ্টা করে নাই। শঙ্করের মনে হয়, চুনচুনও তাহাদের সম্পর্কটাকে বোধহয় এই একই মনোভাব লইয়া দেখে—যদিও কি যে তাহার মনোভাব তাহা শঙ্কর বুঝিতে পারে না। ইহার অস্বাভাবিকতা, ইহার রহস্যময়তা তাহাকে অনুসন্ধিৎসু করে, কিন্তু বাহিরে শঙ্কর শোভন সংযত ভাবটা বজায় না রাখিয়া পারে না। তাহার মনে হয় এই দুর্ভেদ্য আবরণ একদিন স্বাভাবিক নিয়মে খসিয়া পড়িবেই, কিন্তু কি করিয়া কখন কাহার জন্য যে পড়িবে, তাহা তাহার কল্পনাতীত। শঙ্কর যখনই চুনচুনের সহিত দেখা করিতে আসে, সঙ্গে করিয়া কিছু টাকা আনে। চুনচুনের ফোন

তাহার মনে হয়, নিশ্চয়ই সে কোনো বিপদে পড়িয়াছে, মিসেস স্যানিয়াল হয়তো তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন, কিংবা হয়তো নিজেই সে উত্ত্যক্ত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু প্রতিবারেই সে গিয়া হতাশ হয়। স্মিত নম্র হাসি হাসিয়া চুনচুন বই ফেরত দেয়, কিংবা হয়তো কোনো দুর্বোধ্য অংশের অর্থ জিজ্ঞাসা করে—কিংবা অমনই একটা কিছু। নাটকীয় কোনো কিছু ঘটে না। অথচ শঙ্করের মনে হয়, ভিতরে ভিতরে মেয়েটি না জানি কোন্ রহস্যময় লোকের অধিবাসিনী, সঙ্গোপনে কি যেন ভাবিতেছে কিন্তু এসবের কোনো বাহ্যিক প্রমাণ শঙ্কর কোনোদিন পায় নাই। কালো রঙ, ছিপছিপে গড়ন, স্বপ্নময় চোখ, এতদিন আলাপ, মেয়েটি শঙ্করকে কল্পনায় আকৃষ্ট করিতেছে, অথচ কাছে আসিলে ইহার সম্বন্ধে তাহার সমস্ত মোহ যেন ফুরাইয়া যায়।

কি খবর?

খবর আছে একটা, আমি কলেজে ভর্তি হব, কোন্ কলেজ ভালো বলুন দিকি—বেথুন, না ডায়োসেশন?

শঙ্কর অবাক হইয়া গেল।

এতদিন পরে হঠাৎ কলেজে পড়ার শখ?

শখ অনেকদিন থেকেই ছিল, খরচ জুটছিল না।

এখন জুটল কোথা থেকে?

খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে—অন্তত শঙ্করের তাহাই মনে হইল—চুনচুন বলিল, পীতাম্বরবাবু দেবেন।

পীতাম্বরবাবু? হঠাৎ তাঁর এত দয়া?

চুনচুন এ কথার জবাব দিল না। ক্ষণকাল নীরবতার পর পুনরায় প্রশ্ন করিল, কোন্ কলেজটা ভালো, বলুন না?

তা পীতাম্বরবাবুই ঠিক করে দেবেন না?

পীতাম্বরবাবু নিজে বিশেষ লেখাপড়া জানেন না, তিনি আমাকেই ঠিক করতে বলেছেন।

মিসেস স্যানিয়াল তো আছেন।

তিনি বেথুন কলেজের পক্ষপাতী। তবে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, বেথুন কলেজে যদি আমার আপত্তি থাকে, তা হলে আমার স্বাধীন ইচ্ছায় তিনি বাধা দেবেন না।

ওঃ।

ক্ষণকাল নীরবতার পর চুনচুন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ কলেজটা ভালো?

এখন ঠিক বলতে পারছি না, খোঁজ নিয়ে কাল বলব।

বেশ। চলুন, অনেকক্ষণ বাড়ি থেকে বেরিয়েছি।

এ কথাটুকু ফোনে বললেই পারতে।

আপনি অবসর দিলেন কই, আপনাকে আসতে বলে তখনই ভাবলাম—ফোনেই জিজ্ঞেস করি, কিন্তু আপনি তখন কেটে দিয়েছেন।

উভয়েই নীরবে পাশাপাশি খানিকক্ষণ হাঁটিল। চুনচুন একটু পরে মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আপনি কাজ ক্ষতি করে এসেছেন বুঝি? আমি—

শঙ্কর ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল, অকৃত্রিম কুণ্ঠাভরে চুনচুন যেন মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে চাহিতেছে।

শঙ্কর কোনো উত্তর দিল না।

নীরবে খানিকক্ষণ পথ অতিবাহন করিবার পর শঙ্কর প্রশ্ন করিল, 'চোখের বালি' কেমন লাগছে?

খুব ভালো লাগছে না।

লাগছে না?

আমি বুঝতে পারছি না বোধ হয়।

সহসা শঙ্করের মনে হইল, হয়তো ইহার রসবোধ নাই এবং সেইজন্যই বোধ হয় ইহার জীবনে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে না। হয়তো—

হর্ন দিতে দিতে একটা ট্যাক্সি আগাইয়া আসিল। শঙ্করের চিন্তাধারা ভিন্ন পথ ধরিল।

চল, তোমাকে ট্যাক্সি করে পৌঁছে দিই.

চলুন।

ট্যাক্সিতে উভয়ে চড়িয়া বসিল।

।। পাঁচ ।।

শঙ্কর যখন শৈলর বাসায় পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ড্রইং-রুমে ঢুকিতেই মিস্টার এল. কে. বোসের সহিত দেখা হইয়া গেল। তিনি নিখুঁত সাহেবি পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া বাহিরে যাইতেছিলেন। শঙ্করকে দেখিয়া থামিলেন এবং ফেল্টের টুপিটি মাথা হইতে ঈষৎ আলগা করিয়া শঙ্করকে অভিবাদন-করত হাসিয়া বলিলেন, হঠাৎ পথ ভুলে না কি?

শঙ্কর একটু মৃদু হাসিল।

বহুদিন আপনার দেখা নেই, আগে যা-ও বা আসতেন, খ্যাতিলাভ করার পর থেকে তো একেবারে বর্জন করেছেন আমাদের। আজ হঠাৎ কি মনে করে?

শৈল ডেকে পাঠিয়েছে।

সো সিলি অব হার! আপনার মত 'বিজি' লোককে ডেকে পাঠানো!

শঙ্কর পুনরায় হাসিল, মিস্টার বোসও হাসিলেন। তাহার পর পকেট হইতে চামড়ার সিগার-কেস বাহির করিয়া শঙ্করের সামনে সেটি খুলিয়া ধরিলেন, আমরা আর বেশি দিন এখানে নেই, বদলির খবর এসেছে।

কোথা যাচ্ছেন?

এলাহাবাদ।

শঙ্কর একটি সিগার তুলিয়া লইল, মিস্টার বোস একটি চকচকে সিগারেট-লাইটার বাহির করিয়া সেটি ধরাইয়া দিলেন, নিজেও একটি ধরাইলেন। এক্স্কিউজ মি, আমাকে বেরুতে হচ্ছে, ক্লাবে ব্রিজ টুর্নামেন্টে জয়েন করেছি, আজ আমার খেলার দিন, উইল্সনের সঙ্গে খেলতে হবে, সে সোজা লোক নয়, সুতরাং একটু—

অর্থপূর্ণ একটা মুচকি হাসি হাসিয়া মিস্টার বোস অসম্পূর্ণ বাক্যটাকে পূর্ণতা দান করিলেন। তাহার পর দাঁতে সিগার চাপিয়া বাম চক্ষুটা ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া অন্তরঙ্গের মত আন্তরিক সহৃদয়তার সহিতই প্রশ্ন করিলেন, শুধু খ্যাতিই হচ্ছে, না পকেটেও কিছু আসছে? দ্যাট ইজ হোয়াট ম্যাটার্স ইন দি লং রান, ইউ নো—

শঙ্কর কিছু না বলিয়া আর একটু হাসিল। মিস্টার বোস হাতঘড়ি দেখিলেন। তাহার পর ঘরের কোণে গিয়া ছড়ি রাখিবার র‍্যাক হইতে একটি ছড়ি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, হেঁটেই যাওয়া যাক। শঙ্করের পানে চাহিয়া হাসিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। বিশেষ কোনো ভঙ্গি ভরে গেলেন না, কিন্তু তবু শঙ্করের মনে এই অনুভূতিটুকু জাগাইয়া দিয়া গেলেন যে, তিনি পদব্রজে ক্লাবে গমন করিয়া একটা অসাধ্যসাধনই বুঝি-বা করিলেন। শঙ্করের কেন এরূপ মনে হইল তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে হয়তো বলিতে পারিত না, কিন্তু তাহার মনে হইল।

শঙ্কর ভিতরে ঢুকিয়া নীচে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। নীচের দালানে কম পাওয়ারের একটা বাল্‌ব বিমর্ষভাবে জ্বলিতেছে, চতুর্দিকে কেমন যেন থমথমে ভাব। কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় একজন ভৃত্য প্রবেশ করিল এবং বলিল মাঈজি উপরে আছেন। উপরে উঠিতে উঠিতে তাহার নিজেরই কেমন যেন একটু লজ্জা করিতে লাগিল। সত্যিই অনেকদিন সে শৈলর কাছে আসে নাই। শৈলর কথা আজকাল তাহার মনেই পড়ে না।

শৈল দালানেই ছিল, পদশব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইয়া একবার চাহিয়া দেখিল। কোনো প্রশ্ন করিল না।

তুই এসব কি করছিস?

শৈল তবু উত্তর দিল না। কাঁচি দিয়া কি একটা কাটিতেছিল, নীরবে তাহাই কাটিতে লাগিল।

শৈল দালানে ছোটখাটো একটি দর্জির দোকান খুলিয়া বসিয়াছিল যেন। কাঁচি, কল, ফিতা, ফ্রিল, ছিট, প্যাটার্ন—চতুর্দিকে ছড়ানো। শঙ্কর নিকটের চেয়ারটায় বসিয়া আরও বিস্মিত হইয়া গেল। সবই ছোট ছেলের জামা, একেবারে শিশুর গায়ের।

এত জামা করছিস কার জন্যে, তোর দাইয়ের কটা ছেলেমেয়ে—

কেন, দাই ছাড়া আর কারও ছেলেমেয়ে হতে নেই?

শঙ্কর লক্ষ্য করিল, যদিও পা-কল, তবু শৈল হাত দিয়া ঘুরাইয়া সেলাই করিতেছে। আরও লক্ষ্য করিল, শৈলর মুখে একটা পাণ্ডুর সুন্দর শ্রী ফুটিয়া রহিয়াছে। মাতৃত্বের পূর্বাভাস। শঙ্কর বুঝিল, কিন্তু কিছু বলিল না। শৈলও নীরবে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

হঠাৎ আজ ডেকে পাঠিয়েছিস কেন?

শৈল কিছু বলিল না, সেলাই থামাইয়া উঠিয়া গেল। মিনিট কয়েক পরে ঘর হইতে একটা খাতা আনিয়া বলিল, এই নাও।

কি এ?

শঙ্কর খাতাখানা চিনিতে পারিয়াছিল, তবু প্রশ্নটা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

তোমার কবিতার খাতাখানা ফিরিয়ে দিলুম।

শঙ্কর খাতাখানা হাতে লইয়া নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, কি যে বলিবে সহসা ভাবিয়া

পাইল না। শৈল আবার কলে আসিয়া বসিল এবং নীরবে সেলাই করিতে লাগিল। শঙ্কর শৈলর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়া রহিল; তাহার মনে হইল, শৈল যেন বড় বেশি ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে, মুখখানা যেন শ্বেতপাথরের তৈরি, চুনির দুলটা আলোকবিদ্ধ একবিন্দু রক্তের মতো কাঁপিতেছে।

এতদিন পরে খাতাখানা ফিরিয়ে দেওয়ার মানে?

ও খাতা রাখবার আর আমার অধিকার নেই।

শৈল কল ছাড়িয়া আবার উঠিল এবং ঘরের ভিতর ঢুকিয়া ধীরে ধীরে কপাট বন্ধ করিয়া দিল। পর মুহূর্তেই কপাটটা একটু খুলিয়া গলা বাড়াইয়া বলিল, আর আমার কিছু বলবার নেই শঙ্করদা, তুমি আর তোমার সময় নষ্ট করে বসে থেকো না, তোমার অনেক কাজ। আমার শরীরটা ভালো নেই, একটু শুই আমি, বড় ক্লান্ত লাগছে।

আবার দ্বার বন্ধ হইয়া গেল।

শঙ্কর নির্বাক হইয়া আরও খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। শৈল তাহার মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। সেই শৈল। একবার তাহার মনে হইল, শৈলকে ডাকে; কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হইল, ডাকিয়া কি হইবে? দুই-চারিটা মৌখিক মিষ্ট বচনে আর কতকাল তাহাকে ভুলাইবে সে? এ ভণ্ডামির প্রয়োজনই বা কি?

শঙ্কর উঠিয়া নামিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে কাগজ পোড়ার গন্ধ পাইয়া শৈল তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল। দেখিল, কবিতার খাতাখানা সিগারের আগুনে পুড়িতেছে। অন্যমনস্ক শঙ্কর খাতাখানার উপর জ্বলন্ত সিগারটা নামাইয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে।

।। ছয় ।।

মৃন্ময়ের বাসায় থাকিবার সময় আস্‌মি-দার্জির পিতা নিবারণবাবুর সহিত শঙ্করের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। ইহার ফলে নিবারণবাবু যেন বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। ভণ্টুর ব্যবহারে নিবারণবাবু মর্মাহত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্বাপেক্ষা আহত হইয়াছিলেন তিনি ভণ্টুর অন্তর্ধানে। সেই হইতে ভণ্টু আর নিবারণবাবুর বাসায় পদার্পণ করে নাই। ভণ্টুর লজ্জা করিত।

প্রতিবেশী হিসাবে কিছুদিন বাস করিয়া শঙ্কর ভণ্টুর স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিছুদিনের মধ্যেই শঙ্করের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে নিবারণবাবু শুধু আকৃষ্ট নন, বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শঙ্কর মুকুজ্জেমশাইয়ের স্নেহভাজন, শঙ্কর নিজে চাকরি না লইয়া মৃন্ময়কে তাহা ছাড়িয়া দিয়াছে, শঙ্কর বিদ্বান একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী, সর্বোপরি সে ইচ্ছা করিলে অসাধ্য সাধন করিতে পারে—এই সকল ধারণা থাকাতে নিবারণবাবু শঙ্করের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিলেন। আজকাল কোনোরূপ বিপদে পড়িলে শঙ্করের কথাই তাঁহার সর্বাগ্রে মনে পড়ে। তাঁহার চিররুগ্ন স্ত্রীর কি সেবাটাই না শঙ্করবাবু করিয়াছিলেন! যদিও তাঁহার স্ত্রী শেষ পর্যন্ত বাঁচেন নাই, কিন্তু লোকটির যে পরিচয় তিনি পাইয়াছিলেন তাহা কোনোদিন ভুলিবার নয়।

শঙ্কর আসিয়া প্রবেশ করিতেই নিবারণবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আসুন শঙ্করবাবু, আপনার অপেক্ষাতেই বসে আছি, দোকানে বেরুইনি এখনও।

গলির মধ্যে নিবারণবাবুর চায়ের দোকানটি এখনও ঠিক আছে, প্রত্যহ তিনি সেখানে গিয়া বসেন।

কেন, ব্যাপার কি?

আস্‌মির খোঁজ পাওয়া গেছে, মুকুজ্জেমশাই ধুবড়ি থেকে এই চিঠি লিখেছেন দেখুন।

শঙ্কর পত্রখানি লইয়া পড়িয়া দেখিল। অনেক অনুসন্ধানের পর মুকুজ্জেমশাই ধুবড়িতে আস্‌মি এবং মাস্টারকে আবিষ্কার করিয়াছেন। আই. বি. ডিপার্টমেন্টের একজন পরিচিত পদস্থ কর্মচারীর সহায়তায় এ কার্য সফল হইয়াছে। মুকুজ্জেমশাই কেবল তাহাদের আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহাদের দুইজনের বিবাহও দিয়াছেন। লিখিয়াছেন—এ ক্ষেত্রে বিবাহ দেওয়াই সর্বাপেক্ষা সমীচীন। পাছে নিবারণবাবু কোনোরূপ আপত্তি তোলেন, তাই তাঁহাকে এ কথা জানানো হয় নাই। বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, মাস্টারের একটি চাকরিও তিনি চা-বাগানে জুটাইয়া দিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার পরিচিত একটি ম্যানেজারের সহিত দেখা হইয়া যায়, তিনি অবিলম্বে মাস্টারকে তাঁহার অধীনে ভর্তি করিয়া লইয়াছেন, মাসিক বেতন পঞ্চাশ টাকা। নিবারণবাবু যেন বিবাহ-ব্যাপারে ক্ষুব্ধ না হন, কপিলবাবু (অর্থাৎ মাস্টার) কুলীন না হইলেও তাঁহার স্বজাতি এবং মোটের ওপর লোক মন্দ নয়। মানুষ দেবতা নয়, তাহার ত্রুটি-বিচ্যুতি সহ্য করিতে হইবে বৈকি।

শঙ্কর পত্রখানি পাঠ করিয়া নিবারণবাবুকে ফেরত দিল।

বুঝলেন, কদিন থেকে আমার ডান চোখের ওপর পাতাটা ক্রমাগত নাচছিল।

শঙ্কর মৃদু হাসিয়া বলিল, ভালোই তো হয়েছে।

ভালো! একে ভালো বলেন আপনি! ওই নচ্ছারটার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে, এ কথা ভাবতেও যে গা শিউরে ওঠে মশাই।

যাক, সে তো যা হওয়ার হয়ে গেছে, এইবার তাদের আসতে লিখুন।

আসতে লিখব? আমি? নিবারণ শর্মা সে বান্দাই নয়। ওদের আর মুখদর্শন করব না আমি।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, বুঝলেন, মুখদর্শন করব না। ওই কালসাপকে আবার নেমন্তন্ন!

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আর নয়। এখন আপনাকে যে জন্যে ডেকেছি, তাই বলি, তাদের কোনো খবর পেলেন?

শঙ্কর মিথ্যা কথা বলিল।

না, এখনও তারা খবর দেয়নি, আমি খোঁজ করব কাল।

করবেন দয়া করে একটু। মেয়েটার একটা গতি করে আমি সোজা কাশী চলে যাই মশাই, আর পারি না।

যে পাত্রটি সেদিন দার্জিকে দেখিয়া গিয়াছিল—(শঙ্করই তাহাকে জোগাড় করিয়া আনিয়াছিল) সে দার্জিকে পছন্দ করে নাই। শঙ্কর ইহা জানিত, কিন্তু রূঢ় সত্যটা সে বলিতে পারিল না।

আচ্ছা, আমি উঠি এখন, আমাকে আর এক জায়গায় যেতে হবে।

কাল খবরটা নেবেন?

নেব।

মাঝে একদিন আর এক ছোকরা দেখে গেল, তার পছন্দ হয়নি।

শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

নিবারণবাবু বলিলেন, পছন্দ হলেও তার সঙ্গে আমি দিতুম না, ঠোঁটে ধবল, তিন কুলে কেউ নেই।

ও, তাই নাকি?

আর বলেন কেন? যত ব্যাটা কদর্য লোফার শ্বশুরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙবার চেষ্টায় আছে।

শঙ্কর একটু হাসিল।

আমি আজ যাই, তাড়া আছে।

আসুন, আপনার নানা কাজ, আমার কথাটা মনে রাখবেন।

আচ্ছা। শঙ্কর বাহির হইয়া পড়িল।

রাস্তা হইতে শুনিতে পাইল, নিবারণবাবু বলিয়া উঠিলেন—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

।। সাত ।।

ভণ্টুর বাসায় যখন শঙ্কর গিয়া পৌঁছিল, তখন রাত্রি প্রায় দশটার কাছাকাছি। মাহিনা বাড়াতে ভণ্টুর দৈন্যদশা অনেকটা ঘুচিয়াছিল। মুখে সে যা-ই বলুক, চাল সে বদলাইয়াছে। আগে বাড়িতে ঢুকিলেই ময়লা বিছানা, ছেঁড়া জুতা, ছেঁড়া মাদুর, দড়ির আলনায় স্তূপীকৃত মলিন জামাকাপড়, দালানের কোণে ভাঙা তক্তপোশ প্রভৃতিতে যে দারিদ্র্য প্রকট হইয়া থাকিত, এখন তাহা আর নাই। বাড়িতে এখন বেশ একটু লক্ষ্মীশ্রী দেখা দিয়াছে। সে বাড়িও এখন নাই, ভণ্টু বাড়ি বদলাইয়াছে, বেশ ভদ্রগোছের দ্বিতল একটি বাড়ি। দ্বিতলের ছোট দুইখানি ঘর লইয়া ভণ্টু থাকে, একটি শুইবার বসিবার ঘর—অপরটি বাথরুম। বাথরুম না হইলে ইন্দুমতীর চলে না। একতলার শ্রেষ্ঠ ঘরখানি অবশ্যই বাকু লইয়াছেন। ঢুকিতেই প্রথমে বাকুর ঘর।

ঢুকিয়াই শঙ্কর বাকুর দরাজ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল, উপদেবতা নন! তা হলে বাঁচা গেল। কিন্তু অবিশ্বাস করো না, ওঁরা আছেন।

বউদিদির সহিতই কথা হইতেছিল। বউদিদি ঘরের মেঝেতে পান সাজিতে সাজিতে শ্বশুরের সহিত ঘাড় নাড়িয়া সায় দিতে দিতে গল্প করিতেছিলেন। ঘাড় নাড়িয়া যখন কুলাইতেছিল না, তখন উঠিয়া গিয়া শ্বশুরের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া আস্তে আস্তে কথা কহিতেছিলেন। বধির বাকু তাহা না হইলে কিছুই শুনিতে পান না। শঙ্করকে দেখিয়া বউদিদি একমুখ হাসিয়া সংবর্ধনা করিলেন।

এস, বড় রাত করলে, কিন্তু, ঠাকুরপো বোধ হয় তোমার অপেক্ষায় থেকে থেকে ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে, মৃন্ময় ঠাকুরপোও আসেনি এখনও।

ভূতের গল্প হচ্ছিল না কি?

বউদিদি হাসিলেন।

নণ্টুর অসুখ করেছিল কি না, তার পথ্যের দিন ঠাকুরপোর আপিসের এক বন্ধু কিছু জ্যান্ত কইমাছ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মাছগুলো দালানের কোণটায় ঢালা হয়েছিল, তার মধ্যে একটা মাছ কখন যে লাফাতে লাফাতে ওই পুরনো বড় তোরঙ্গটার পেছনে গিয়ে ঢুকেছিল তা আমরা কেউ টেরও পাইনি। ক্রমে সে মাছ মরে.পচে বাড়িময় দুর্গন্ধ, ঠাকুরপো চারিদিকে ফিনাইল ছেটাচ্ছে, কিছুতেই গন্ধ যায় না। বাবা বললেন, পত্রপাঠ এ বাড়ি বদলাও, নিশ্চয় কোনো উপদেবতা আশ্রয় করেছে। আজ ঘর ধোয়া হচ্ছিল, তোরঙ্গটা সরাতে গিয়ে সেই পচা মাছ বেরুল।

বউদিদি হাসিতে লাগিলেন।

শঙ্কর বলিল, যত আজগুবি কাণ্ড আপনাদের, এ যুগে ভূত আছে না কি?

বউদিদি উঠিয়া বাকুর কানে চুপিচুপি বলিলেন, শঙ্কর ঠাকুরপো ভূতটুত একদম বিশ্বাস করে না, বলছে—আপনাদের যত সব আজগুবি কাণ্ড।

বাকু তামাক খাইতেছিল। এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার গড়গড়ার ডাক বন্ধ হইয়া গেল। তিনি নলটি মুখ হইতে নামাইয়া গম্ভীরভাবে ক্ষণকাল শঙ্করের দিকে তাকাইয়া রহিলেন; তাহার পর নল দিয়াই সামনের মোড়াটা দেখাইয়া বলিলেন, বস। তোমরা, আজকালকার ছোকরারা, দুপাতা ইংরেজি পড়ে কিছুই তো মানতে চাও না। একটা গল্প বলি শোন।

বৃদ্ধ গড়গড়ায় একটা মধ্যম গোছের টান দিয়া শুরু করিলেন, শোন। তখন আমি ঝরিয়া কলিয়ারিতে কন্ট্রাক্টারি করি। ঠিক দুপুরবেলা, বোশেখ মাস, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর চারিদিকে, কোল রেজিং হচ্ছে, আমি শোলার হ্যাট মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দেখলুম, ভণ্টুর গর্ভধারিণী আমার সামনে দাঁড়িয়ে, পরনে টকটকে লালপেড়ে কাপড়, মাথায় চওড়া সিঁদুর। আমি অবাক হয়ে গেলুম, এখানে এল কি করে, কথা কইতে যাব, মিলিয়ে গেল।

বাকু গড়গড়ায় টান দিলেন।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, তারপর?

খানিকক্ষণ পরে টেলিগ্রাম পেলুম, মারা গেছে। তোমার সায়েন্স কি বলে?

কোথায় ছিলেন তিনি?

দেশের বাড়িতে, দুশো মাইল দূরে।

শঙ্কর কি বলিবে, চুপ করিয়া রহিল। বউদিদি বহুবার শ্রুত এই কাহিনীটি আর একবার শুনিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া মুচকি হাসিতে হাসিতে পানের খিলিগুলিতে লবঙ্গ গাঁথিতে লাগিলেন। এই হাসি বাকু যদি দেখিতে পান, তাহা হইলে অনর্থ ঘটিয়া যাইবে। তাড়াতাড়ি খিলিগুলি মুড়িয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

তুমি বস, আমি ঠাকুরপোকে ডেকে দিই।

বাকু গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ তাম্রকূট চর্চা করিয়া প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিলেন।

বউমাটিকে নিয়ে এস একদিন, দেখি।

তাহার পর একটু থামিয়া হাসিয়া বলিলেন, মিলিয়ে দেখেছিলে?

শঙ্কর স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িল।

ঠিক মিলে গেছে তো? জানি, মিলবেই।

শঙ্কর হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। বাকুর বদ্ধ ধারণা—স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের মুখ এক ছাঁচের হইবেই। ভণ্টুর বিবাহের পরও বাকু শঙ্করকে গোপনে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—লক্ষ্য করে দেখ তুমি, ভণ্টুর আর নতুন বউমার মুখের 'কাট্' হুবহু এক রকম, হতেই হবে যে! ভণ্টুর গর্ভধারিণীর ফোটোগ্রাফ আছে, আমার মুখের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ—নাক মুখ চোখ গড়ন সমস্ত এক রকম। শঙ্কর ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়াছিল, কারণ প্রতিবাদ করা বৃথা। বাকু এ বিষয়ে এমন গোঁড়া যে, যদি কোনো স্বামী-স্ত্রীর মুখ এক রকম না হয়, তাহা হইলে তাঁহার ধারণা স্বামী-স্ত্রী নয়, কোনোরূপ গোলমাল আছে। এই প্রসঙ্গে একটি গল্পও তিনি করেন। একবার ট্রেনে যাইতে যাইতে তিনি নাকি একটি বেখাপ্পা দম্পতি দেখিয়াছিলেন। স্বামীর মুখ গোলাকার, কিন্তু স্ত্রীর সোজা লম্বা। বাকুর ঘোরতর খটকা লাগে। দুই-চারি স্টেশন পরেই খটকা ভাঙিল, পুলিশ আসিয়া হাজির হইল, ছোকরা আর একজনের স্ত্রীকে লইয়া সরিতেছে।

মৃন্ময় আসিয়া প্রবেশ করিল।

বউদিদি আসিয়া বলিলেন, ঠাকুরপো তোমাদের ওপরেই যেতে বললে। তোমরা ওপরে বসগে, আমি গরম-টরম করি ততক্ষণ।

বাকু দরাজ গলায় আদেশ করিলেন, বউমা, এ কলকেটায় আর কিছু নেই, তুমি আর একটা কলকে ঠিক করে দিয়ে যাও।

মৃন্ময় ও শঙ্কর ওপরে উঠিয়া যাইতেছিল। শঙ্করের বগলে একটা পুলিন্দা ছিল, শঙ্কর তাহা যথাসম্ভব সঙ্গোপনেই রাখিয়াছিল, তবু তাহা বউদিদির দৃষ্টি এড়াইল না।

বগলে ওটা কি, শঙ্কর ঠাকুরপো?

শাড়ি একখানা।

অমিয়ার জন্যে কিনলে বুঝি?

শঙ্কর কেবল মুচকি হাসিয়াই উত্তর দিল।

মৃন্ময়ও হাসিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার হাসিটা কেমন যেন প্রাণবন্ত হইল না, বরং মুখখানা যেন আরও বিবর্ণ হইয়া গেল। হাসিকে শাড়ি কিনিয়া দেওয়ার ঘটনাটা তাহার মানস পটে ফুটিয়া উঠিল বোধ হয়। ঘটনাটা অনেক দিনের হইলেও সে ভোলে নাই।

শঙ্কর ও মৃন্ময় ওপরে উঠিয়া গেল।

ভণ্টু বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল। ইন্দুমতী ঘরের কোণে বসিয়া উলের কি যেন একটা বুনিতেছিল। শঙ্কর ও মৃন্ময় প্রবেশ করিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল ও আধুনিক কায়দা অনুযায়ী নমস্কার করিল।

আসুন।

ঘরে খানকয়েক মোড়া ছিল, শঙ্কর ও মৃন্ময় উপবেশন করিল। ভণ্টু বিছানায় উপুড় হইয়াই রহিল এবং বলিল, শঙ্কর, তুই এসে আমার কোমরটার ওপর চড়ে বস্ তো।

কেন, কি হল কোমরে?

জখম হয়েছে।

ইন্দুমতী মুখ টিপিয়া হাসিল এবং বলিল, আমি যাই নীচে, দেখি গে, দিদি কি করছেন।

ভণ্টু উঠিয়া বসিল এবং বলিল, লব্স্টারমেধ যজ্ঞের হোতাকে আর খুঁজলে লাভ কি, তিনি একাই একশো।

ইন্দুমতী বলিল, চা করে আনব?

শঙ্কর বলিল, এখন আর চা খেয়ে কি হবে? আপনি বসুন।

ভণ্টু মুখ সূচালো করিয়া বলিল, ওঁকে অত সমীহ করে লাভ কি? উনি একটি চামাটু, লুকিয়ে চিংড়িমাছ ভাড়া খেতে চান।

ইন্দুমতী বড় বড় চোখ দুইটি ভণ্টুর মুখের ওপর স্থাপন করিয়া বলিল, তুমি সবাইকে ওই কথা বলে বেড়াচ্ছ বুঝি?

ভণ্টু গলার ভিতর হইতে গোঁক গোঁক শব্দ করিল।

মৃন্ময় ভণ্টুর সান্নিধ্যে কখনও স্বাচ্ছন্দ্য-বোধ করে না, হয়তো সে এই নিমন্ত্রণেও আসিত না কিন্তু ভণ্টুকে এড়াইয়া চলা এখন তাহার পক্ষে অশোভন, ভণ্টু এখন তাহার উপর-ওয়ালা কেরানি। শঙ্করের পকেট হইতে কুমার পলাশকান্তির দেওয়া খবরের কাগজটা দেখা যাইতেছিল। মৃন্ময়ের তাহা চোখে পড়িতে সে যেন বাঁচিয়া গেল।

আজকের কাগজ নাকি ওটা?

হ্যাঁ।

দিন তো, দেখাই হয়নি আজকের কাগজ।

কাগজখানা লইয়া সে এক ধারে সরিয়া বসিয়া পড়িতে শুরু করিয়া দিল।

শঙ্কর ইন্দুমতীকে বলিল, ভণ্টুর কথা বিশ্বাস করি না আমরা। বসুন আপনি।

অনুযোগ-ভরা সুরে ইন্দুমতী বলিল, দেখুন তো কাণ্ড, শণ্টু নণ্টু ওরা দু'জনে রোজই আমাকে বলত, কাকিমা, গলদা-চিংড়ি ভাজা খাব, পয়সা দাও, দোকানে কেমন ভাজা হচ্ছে গরম গরম। আমি তাদের বললুম, দোকানের ভাজা খাবার দরকার কি—গলদা-চিংড়ি তোরা কিনে আন, আমি স্টোভে লুকিয়ে ভেজে দেব তোদের দুপুরে।

লুকিয়ে কেন?

ফনতি মিনুর যে আবার পেট ভালো নয়, দেখতে পেলে কাঁদবে।

ভণ্টু মন্তব্য করিল, থিফ কোথাকার!

নিজেদের খাবার ইচ্ছে হয়েছে তাই বল, আমার নামে দোষ দেওয়া কেন শুধু শুধু?

অভিমানভরে ঠোঁট ফুলাইয়া ইন্দুমতী বাহির হইয়া গেল। শঙ্কর একটু হাসিল এবং বলিল, কেন বেচারিকে রাগালি শুধু শুধু?

ভণ্টু পুনরায় গোঁক গোঁক করিয়া শব্দ করিল। বিছানার ওপর একটা রেজিস্টার্ড খাম পড়িয়া ছিল।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, ওটা কি রে?

পানউলির পরামর্শে কানা করালীকে একটা রেজিস্টার্ড চিঠি লিখেছিলাম, চিঠিখানা ফিরে এসেছে।

সত্যি, কি করা যায় বল তো? আমি তো উইলের কথা মাকে কিছু বলিনি।

বলবার দরকার কি?

আবার অত টাকা মাঠে মারা যাবে?

ব্যাঙ্ক মাঠ নয়।

কানা করালী যদি না ফেরে?

টাকাটা সুদে বাড়ুক না। তুই হাত দিলেই তো সব উপে যাবে, তোর হাত তো জাদুকরের হাত!

তবু একটা কিছু—

বছর কয়েক ঢোক গিলে বসে থাক এখন। পরে কোনো উকিলের পরামর্শ নিলেই হবে।

সেই কাকটা আছে এখনও?

সেটা ডাইং আপিস খুলেছে। পানউলি আর একটা এনে পুষেছে, ওর ধারণা, করালী ফিরে এসে যদি কাক দেখতে না পায় খুন করে ফেলবে ওকে।

বলিস কি?

লদ্‌লদে ব্যাপার! পানউলি শবরীফাইং!

সহসা মৃন্ময় চিৎকার করিয়া উঠিল, এ কি?

মনে হইল, কেহ যেন তাহার মাথায় ডাঙশ মারিয়াছে।

কি?

এই দেখুন, স্বর্ণলতার নাম রয়েছে।

ম্যানেজারের কবলে অচিনবাবুর সহায়তায় যে সব নারী কবলিত হইয়াছিল, কাগজে পুলিশ তাহাদের যে ফর্দটা বাহির করিয়াছে, শঙ্কর দেখিল, তাহাতে সত্যই স্বর্ণলতার নাম রহিয়াছে। মৃন্ময় বিবর্ণ মুখে চাহিয়া রহিল, তাহার দৃষ্টি বিহ্বল, ঠোঁট দুইটা কাঁপিতেছে।

।। আট ।।

গভীর অন্ধকার রাত্রি।

বিনিদ্র শঙ্কর একা বিছানায় শুইয়া আছে। অতিশয় দ্রুত ছন্দে আজ সন্ধ্যা হইতে যে যে ঘটনাগুলি তাহার মানসপটে রেখাপাত করিয়া গেল, তাহাদেরই কথা সে ভাবিতেছিল। অচিনবাবু, চুনচুন, নিবারণবাবু, শৈল, মৃন্ময়, ভণ্টু, পলাশকান্তি, ম্যানেজার, কপিলবাবু, আস্‌মি, দার্জি—সকলেই একই জীবনের বিকাশ, অথচ প্রত্যেকেই কত বিভিন্ন! সে গত কয়েকদিন হইতে কাব্যরচনার উপযোগী বিষয় খুঁজিতেছিল, এই তো এত বিষয়। জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই তো নতুন বস্তুর পরিচয় মিলিতেছে, ইহাদের কয়েকটিকে একত্র করিয়া গাঁথিলেই তো কাব্য হয়, জীবনই তো কাব্য, প্রত্যেক জীবনের হাসি-কান্না, হতাশা-বৈরাগ্য প্রকৃতির পীড়ন এবং সেই পীড়ন হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস, ইহাই মানব-জীবন এবং ইহাই মানব-জীবনের কাব্য। সমস্ত অন্তর দিয়া জীবনের সত্যকে অনুভব করিতে হইবে, কল্পনার বর্ণচ্ছটায় বিভূষিত করিয়া তাহাকে বাণীলোকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, সার্থকভাবে ইহা করিতে পারিলেই তো কাব্য হইল। মৃত্তিকায় দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে চাহিতে হইবে। সহসা কবি লোকনাথের কথাগুলি শঙ্করের স্মরণ হইল। তিনি এই সাহিত্যসৃষ্টি প্রসঙ্গে একদিন

বলিয়াছিলেন, কল্পনার ভঙ্গিতে ও রসসৃষ্টির আদর্শে লেখকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা চাই, আরও থাকা চাই বাস্তব সংসার ও সমাজের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি। মানুষকে ভালোবাসিতে হইবে, সৎ-অসৎ উচ্চ-নীচ সকলকেই অন্তরের মধ্যে স্থান দিয়া মানব-জীবনের বিচিত্র বিকাশ হিসাবে দেখিতে হইবে। তাহাদের মহত্ত্ব-ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে, তাহাদের জীবন-চরিতের অন্তরালে অজ্ঞাত সেই প্রাণশক্তির দুর্জ্ঞেয় পিপাসার সন্ধান করিতে হইবে, যে পিপাসা নানা জনকে নানা পথে লইয়া যাইতেছে। ছোট খাঁচায় বড় পাখির পাখা-ঝাপটানির যে রক্তারক্তি—মনুষ্য-জীবনের চিরন্তন ট্র্যাজেডি, প্রকৃতিশাসিত মানুষের দুর্দশা, মূঢ়-প্রবৃত্তি ও অমৃতের আকাঙ্ক্ষা, এই উভয়ের দ্বন্দ্বই কাব্যলোকের আলো-ছায়া।

...সহসা অমিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল এবং ঘুমের ঘোরে শঙ্করকে জড়াইয়া ধরিল। রঙিন শাড়িখানি পাইয়া আজ সে ভারি খুশি হইয়াছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অমিয়াকে মনে করিয়া শঙ্কর শাড়িখানা কিনে নাই, শাড়িখানা দেখিয়াই অমিয়ার কথা তাহার মনে পড়িয়াছিল। নানরূপ ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া সে অমিয়ার দিকে মন দিতে পারে না। মনে হয়, তাহার প্রতি সে অবিচার করিতেছে, বাহিরের ঐশ্বর্য দিয়া তাই সে অমিয়াকে ভুলাইতে চায়। মাঝে মাঝে তাহার সন্দেহ হয়, সত্যই কি অমিয়া ভোলে? ভোলে কি না তাহা শঙ্কর জানে না, কিন্তু ইহা সে জানে যে, অমিয়া কখনও বিচলিত হয় না, তাহার আচরণ সম্বন্ধে কখনও কোনো প্রশ্ন করে না। শঙ্করের মাঝে মাঝে মনে হয়, হয়তো তাহার মহত্ত্ব সম্বন্ধে কখনও কোনো সন্দেহ তাহার মনে জাগে না, স্বামীর সম্বন্ধে কোনোরূপ হীন ধারণা পোষণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। নীরবে শান্তমুখে সে পত্নীর কর্তব্য করিয়া যায়। শঙ্কর নিজে কি তাহাকে ভালোবাসে? বাসে বইকি। যুবতী পত্নীকে কোন্ যুবক-স্বামী ভালো না বাসে।

।। নয় ।।

শঙ্করের মা দেশে থাকেন। শঙ্করের অনুরোধ সত্ত্বেও শঙ্করের নিকট আসিয়া তিনি থাকিতে রাজি হন নাই। নানা অসুবিধা সহ্য করিয়াও তিনি পল্লীগ্রামে থাকিতে চান। স্বামীর ভিটা আঁকড়াইয়া তাঁহার স্মৃতি ধ্যান করিবার জন্য নয়, তাঁহাকে দেখিয়া ঠিক তাহা মনে হয় না, বরং মনে হয় যে বিধবা হইয়া তিনি যেন সুস্থতরই হইয়াছেন। অম্বিকাবাবুর প্রখর প্রবল ব্যক্তিত্বের চাপে নিষ্পিষ্ট হইয়া তাঁহার মনের স্বাস্থ্য যেন বিকল হইয়াছিল, চাপমুক্ত হইয়া তিনি যেন সুস্থ বোধ করিতেছেন। তিনি পল্লীগ্রামে থাকেন পল্লীপ্রীতির জন্যও নয়। অবশ্য নিরীহ-প্রকৃতির মানুষ তিনি, নিজের পূজা আহ্নিক লইয়া অনাড়ম্বর নিরুপদ্রব পল্লীজীবন যাপন করা কষ্টকর নয় তাঁহার পক্ষে। কিন্তু এজন্যও তিনি পল্লীগ্রামে থাকেন না। একমাত্র পুত্রকে ছাড়িয়া দেশে থাকার হেতু অন্য। তিনি দেশে থাকেন শঙ্করের জন্যই। দূর হইতেই তিনি পুত্রের মহিমাচ্ছটা নীরবে উপভোগ করেন, নিকটে আসিয়া তাহাতে ছায়াপাত করিতে তাঁহার বড় শঙ্কা হয়, নিকটে আসিলে তাঁহার দুর্ভাগ্যের ছায়া পাছে পুত্রকেও স্পর্শ করে। তাঁহার অন্য কোনো প্রকার পাগলামি নাই, কিন্তু তাঁহার এই একটা বদ্ধ ধারণা যে, যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিবে তাহার ধ্বংস অনিবার্য। তাঁহার এক পুত্র গিয়াছে, স্বামী গিয়াছে, তাঁহার ধারণা, তাঁহার সংস্পর্শে ছিল

বলিয়াই গিয়াছে। তাই ভয়ে ভয়ে তিনি শঙ্করের নিকট হইতে দূরে সরিয়া আছেন।

কালীঘাটে একটা মানত ছিল, তাহাই শোধ করিতে তিনি কলিকাতায় আসিয়া শঙ্করের কাছে কয়েকদিন ছিলেন। অমিয়া যদিও তাঁহার কাছে ইতিপূর্বে কিছুকাল ছিল, কিন্তু তিনি তাহাকে তখন তেমন ভালো করিয়া দেখেন নাই। রঙিন-কাপড়-পরা নতমুখী বধূটি তখন তাঁহার কৌতূহল উদ্রিক্ত করে নাই। এই কয়দিনে অমিয়াকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার মনে কেমন যেন একটা অনুকম্পামিশ্রিত কৌতূহল জাগিয়াছে। অমিয়া শঙ্করের বধূ বলিয়া নয়, অমিয়া শঙ্করের অনুপযুক্ত বলিয়া অমিয়াকে তিনি লক্ষ্য করিতেছেন। কিন্তু কিছু বলেন নাই। যখন তাঁহার মত্ততা থাকে না, তখন তিনি অতিশয় নীরব প্রকৃতির লোক, নিজেকে লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন এবং প্রায় অধিকাংশ সময় ঠাকুরঘরেই কাটান। অমিয়াকে তিনি লক্ষ্য করিলেন, একটা অনুকম্পামিশ্রিত স্নেহও জাগিল, ইচ্ছা হইল যে, তাহাকে বকিয়া ঝকিয়া সংশোধন করিয়া শঙ্করের উপযুক্ত করিয়া দেন; কিন্তু তাহা হইলে শঙ্করের কাছে থাকিতে হইবে, তাহা তো অসম্ভব। তিনি মানত শোধ করিয়া চলিয়া গেলেন। ট্রেনে চড়িয়া শঙ্করকে শুধু মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, বউটাকে দেখিস একটু, সব সময় নিজেকে নিয়ে থাকলেই কি চলে?

আচ্ছা।

ট্রেন চলিয়া গেল। হঠাৎ শঙ্করের মনে হইল, মা এ কথা বলিলেন কেন? ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মায়ের কথাটা সে তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিল। কোনো নিগূঢ় অর্থ আছে নাকি? পর-মুহূর্তে হুইলারের স্টলের পুস্তকসম্ভার তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং সব ভুলিয়া সে সেই দিকেই আগাইয়া গেল।

ক্ষণকাল পরে কয়েকখানা বই কিনিয়া সে বাড়ি ফিরিল। ভালো বই দেখিলে সে লোভ সামলাইতে পারে না, ধার করিয়াও কিনিয়া ফেলে। জানে, সে সব বই পড়িতে পারিবে না, পড়িবার সময় নাই; তবু কেনে।

বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া সে থামিয়া গেল, চোখে পড়িল, দোতলার জানালায় অমিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুখের একটা পাশ, কবরীর খানিকটা অংশ, রঙিন শাড়ির বিস্রস্ত প্রান্তটুকু আর কিছু নয়—অমিয়ার এ রূপ সে তো কখনও দেখে নাই। মুগ্ধ হইয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল।

।। দশ ।।

অনেকদিন পরে শঙ্কর একা মাঠে গিয়া বসিয়াছিল। বসিয়া বসিয়া সে নিজেরই অতীত জীবনটার পর্যালোচনা করিতেছিল। ভাবিতেছিল, যাহা তাহার কাম্য, তাহার সন্ধান মিলিয়াছে কি? সারা জীবন সে কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে? বাল্যকালের কথা মনে পড়িল। তখন ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকাব করিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল, সকলে তাহাকে ভালো ছেলে বলুক—এই কামনায় তাহার চিত্ত সতত উন্মুখ হইয়া থাকিত। বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া সে সাধ তাহার মিটিয়াছিল। আজও তাহার সহপাঠীরা এবং শিক্ষকেরা তাহার ভালো-ছেলেত্ব লইয়া সগর্বে আলোচনা করেন। পরীক্ষায় প্রথম হইবার আকাঙ্ক্ষা কিন্তু অন্তরে চিরস্থায়ী হইল না। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার পরই তাহার মনে দেশসেবা করিবার আগ্রহ জাগিল, মনে হইল,

ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া, কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার হইয়া, বন্যাদুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সেবাশুশ্রূষা করিয়া, চরকা চালাইয়া, খদ্দর পরিধান করিয়া রাজনৈতিক সংগ্রাম চালানোই প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য। অনন্যকর্ম হইয়া কিছুকাল এ কর্তব্য সে পালনও করিয়াছিল, কিন্তু যেই খবর বাহির হইল যে, সে ম্যাট্রিকুলেশনে বৃত্তি পাইয়াছে, অমনই তাহার মত বদলাইয়া গেল, অমনই অবলীলাক্রমে সে কলেজে ভরতি হইয়া বিদেশি ভাষায় বিজ্ঞান পড়িতে লাগিল। শুধু পিতার আদেশেই নয়, তাহার নিজেরও মত বদলাইয়াছিল বইকি! চরকা ঘাড়ে করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কিন্তু সে বুঝিয়াছিল যে, কিছুই হইতেছে না, দেশের লোকের সত্যকার কোনো উপকারই সে করিতে পারিতেছে না, কেবল হুজুগে মাতিয়া হৈ-হৈ করিয়া বেড়াইতেছে মাত্র। ক্রমশ সে বুঝিয়াছিল যে, বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের সাধনাই প্রকৃত দেশসেবা, বৈজ্ঞানিক যুগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দেশের উন্নতি না করিয়া চরকা চালাইতে গেলে দেশের প্রকৃত অগ্রগতি হইবে না। একটা নতুন আদর্শ চোখের সম্মুখে রাখিয়াই যেন সে আই. এস-সি এবং বি.এস-সি পাস করিয়া ফেলিল। তাহার এই ব্রহ্মচর্য এবং বিজ্ঞান সাধনার আদর্শ মফস্বলে অটুট ছিল, কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া তাহা ভাঙিয়া পড়িল। সুরমা, রিনি, মিষ্টিদিদি, সোনাদিদি, বেলা, শৈল, মুক্তোরা আসিয়া তাহার মনে যে আলোড়ন তুলিল, তাহাতে তাহার পূর্ব জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাধ-স্বপ্ন আদর্শ-কর্তব্যের সমস্ত মানদণ্ড উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বিপর্যস্ত হইয়া গেল। মনে হইল, জীবনকে উপভোগ করাই মানবজীবনের একমাত্র কর্তব্য, চার্বাক-দর্শনই শ্রেষ্ঠ দর্শন। কিন্তু সে দর্শন অনুসরণ করিয়াই বা লাভ কি হইল? কত রামী বামী ক্ষেন্তি, কত বীণা আশা রাধা, কত মিষ্টিদিদি তেতোদিদি আসিল এবং গেল—সকলের নামও মনে নাই; কিন্তু কি হইল? জীবনকে উপভোগ করা হইল কি? পীবরবক্ষ, চটুল চাহনি, লাস্য-হাস্য, ভাব-ভঙ্গি কিছুরই তো অভাব ছিল না; তবু মনে এখনও অতৃপ্তি কেন? কেন মনে হইতেছে, জীবনটা বৃথায় গেল? জীবনকে সে তো কম উপভোগ করে নাই! কিন্তু এখন আর ওসব কিছুই ভালো লাগিতেছে না। চুনচুন কল্পনাকে অধিকার করিয়া আছে বটে, কিন্তু তাহাতেও আর তেমন মাদকতা নাই। চুনচুনের নিকট হইতে আহ্বান আসিলে সে উত্তেজিত হইয়া উঠে বটে, কিন্তু তাহার কাছে গেলেই সে উত্তেজনা নির্বাপিত হইয়া যায়, মনে হয়, ভ্রাতা ভগিনীর নিকট আসিয়াছে।

যে বিজ্ঞানের মোহে মুগ্ধ হইয়া সে একদিন চরকা-নীতিকে উপহাস করিয়াছিল, সে বিজ্ঞানও তাহাকে বেশিদিন ভুলাইয়া রাখিতে পারে নাই। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের অনিবার্য প্রভাবকে অস্বীকার সে করে না, বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া কোনোরূপ প্রগতি যে অসম্ভব তাহা সে জানে, দেশের উন্নতি করিতে হইলে বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়াই যে করিতে হইবে, ইহাও সর্বতোভাবে সে স্বীকার করে, তবু সে বিজ্ঞানচর্চা ত্যাগ করিয়াছে। সুযোগ পাইয়াও ত্যাগ করিয়াছে। কেন? সহসা তাহার মনে হইল, আমাদের চিন্তার সহিত আমাদের কার্যের কি সত্যই কোনো যোগ আছে? চিন্তা করিয়া যাহা কর্তব্য বলিয়া মনে হয়, তাহাই কি আমরা সব সময় করি? কোন্ সময়ে কি করি? তাহার মনে হইল, চিন্তা করা শিক্ষিত মনের বিলাস মাত্র, আমাদের কার্যের সহিত তাহার কচিৎ সম্পর্ক থাকে। আমরা যাহা করি, তাহা চিন্তাপ্রণোদিত হইয়া করি না, নিজের সুখের জন্য করি। সে সুখের পিপাসা অন্তরের যে অন্ধকার কন্দর

হইতে উৎসারিত হয়, তাহার সন্ধান আজও আমরা পাই নাই। চিন্তা করিয়া সৎ-অসৎ ভালো-মন্দ উচিত-অনুচিতের একটা আদর্শ আমরা খাড়া করি বটে, কিন্তু তদনুসারে আমরা চলি না, আমরা চলি নিজেদের আন্তরিক প্রেরণায়। সে প্রেরণার সহিত যদি কেতাদুরস্ত নীতির মিল থাকে ভালোই, যদি না থাকে তাহা হইলেও আমরা নিরস্ত হই না, যাহা করিবার আমরা ঠিক করিয়া যাই, কোনো অদৃশ্য অজ্ঞাত শক্তি তখন যেন আমাদের উপর ভর করিয়া আমাদের নীতিজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

এই শক্তিই তাহাকে হয়তো বিজ্ঞানের পথ হইতে সাহিত্যের পথে আনিয়াছে সুগম সুপরিচিত পথ হইতে টানিয়া দুর্গম অপরিচিত পথে আনিয়া ফেলিয়াছে। এই শক্তির প্রভাব স্বীকার করিয়াও কিন্তু আর একটা যুক্তির মোহ হইতে শঙ্কর কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল যে, দেশের মনে বিজ্ঞানের কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করা যদি সত্যই প্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে সাহিত্যের মধ্যস্থতাতেই তাহা করিতে হইবে। সাহিত্যই যে বিজ্ঞানের একমাত্র উপযুক্ত বাহন। বিজ্ঞানকে সম্যকরূপে গ্রহণ করিবার মত সুস্থ মনোবৃত্তিও দেশের সাহিত্যই গঠন করিবে। তাই সাহিত্যের পথকেই সে জীবনের পথ রূপে বাছিয়া লইয়াছে, এই পথ ধরিয়াই তাহাকে চলিতে হইবে।

হঠাৎ যেন আর একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। ছাত্র-জীবনে স্কুলের হেডপণ্ডিত ধরণীধর ভট্টাচার্য তাহার মনে যে দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, 'আনন্দমঠ' পাঠ করিয়া যে দেশকে সে জননী-জন্মভূমি বলিয়া জানিয়াছিল, সেই দেশাত্মবোধই তাহাকে জ্ঞাতসারে-অজ্ঞাতসারে এতদিন পরিচালিত করিয়াছে, তাহার সকল কর্মে প্রেরণা যোগাইয়াছে। এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা—রবীন্দ্রনাথের এ সঙ্কল্পকে সেই তো মূর্ত করিবে। সাহিত্যের পথই তাহার পথ, এই পথেই তাহাকে চলিতে হইবে। কিন্তু ইহার নাম কি সাহিত্য-পথে চলা? 'সংস্কারক' আপিসে চাকরি করা মনে কি সাহিত্য-চর্চা? শঙ্করের রগের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল। 'নারীস্তোত্র' নামে সে যে কবিতাটি লিখিয়াছিল, মজুমদার মহাশয় তাহা 'সংস্কারক' পত্রিকায় ছাপিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সে নিজে সহকারী-সম্পাদক, অনায়াসেই সে লেখাটা তাঁহাকে না দেখাইয়াও ছাপিতে পারিত। কিন্তু অদ্যাবধি সে কোনোও লেখা সম্পাদকের বিনা অনুমতিতে ছাপে নাই, সম্পাদক মহাশয়ও এ যাবৎ তাহার কোনোও লেখায় আপত্তি প্রকাশ করেন নাই, আজ হঠাৎ 'নারীস্তোত্র' কবিতাটা তাঁহার খারাপ লাগিয়া গেল? অশ্লীল? কি এমন অশ্লীলতা আছে উহাতে? 'শৃঙ্গার' 'স্তন' 'স্বচ্ছবসনা' 'নীবিবন্ধ' প্রভৃতি কয়েকটা কথায় দাগ দিয়া তিনি আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কোনো ভালো কবির কবিতাতে এসব কথা নাই? কালিদাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি এমনকি রবীন্দ্রনাথও—শঙ্করের হাসি পাইল—ওই বেরসিক শুচিবায়ুগ্রস্ত হীরালাল মজুমদারের নির্দেশ অনুসারে কাব্যরচনা করিতে হইবে নাকি? চণ্ডীচরণ দস্তিদারের কথা মনে পড়িল। ওই লোকটি হয়তো হীরালাল-বাবুর হৃদয় হরণ করিতে পারিবে। কাব্যরস-বিবর্জিত খাঁটি কর্মক্ষম ব্যক্তি। কম কথা বলেন। ঠিক সময়ে—কখনও কখনও ঠিক সময়ের পূর্বেও—আপিসে আসেন এবং রাত্রি দশটা পর্যন্ত মুখ বুজিয়া কাজ করিয়া যান। নিলয়কুমারের সহকারী হিসাবে বাহাল হইয়াছেন, 'সংস্কারক' পত্রিকার ব্যবসায়ের দিকটা দেখাই না কি তাঁহার একমাত্র কার্য। শঙ্করের কিন্তু সন্দেহ হয়, নীরবে তাহার

গতি-বিধি লক্ষ্য করাই তাঁহার প্রধান কার্য। সর্বদাই যেন একটা মুখোস পরিয়া আছেন। একটি বাজে কথা বলেন না, রসিকতা করিয়াও তাঁহাকে বিচলিত করা যায় না। চণ্ডীচরণ অতীত জীবনে পড়াশুনার বিশেষ ধার ধারেন নাই। থার্ড ক্লাস পর্যন্ত নাকি পড়িয়াছিলেন এবং তাহার জোরেই নাকি তিনি কুড়ি বৎসর পূর্বে কোনো সওদাগরি অফিসের কেরানিগিরি জোগাড় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ছয়মাস পূর্বে তাঁহার কেরানিজীবন শেষ হইয়াছে; কিন্তু সামর্থ্য এবং চাকুরিস্পৃহা এখনও শেষ হয় নাই বলিয়া পুনরায় তিনি কাজে লাগিয়াছেন। এই ইতিহাসটুকুটই শঙ্কর জানিত, আজ সে হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছে যে, চণ্ডীচরণ শুধু কেরানিমাত্র নহেন, তিনি একজন প্রত্নতাত্ত্বিকও। অর্থাৎ সাহিত্যের দরবারে তাঁহারও কিঞ্চিৎ দাবি আছে। তাঁহার প্রত্নতত্ত্বও আবার এমন বিষয়ে, যে সম্বন্ধে শঙ্করের কোনো জ্ঞান নাই। প্রাচীন মিশর তাঁহার বিষয়। সবজান্তা নিলয়কুমার নাকি ইজিপ্টোলজির একজন সমঝদার, তিনি চণ্ডীচরণকে খুব উৎসাহিত করিতেছেন। খবরটা শুনিয়া অবধি শঙ্করের মনে একটা অস্বস্তি জাগিয়াছে, তাহার মনে হইতেছে, হয়তো এই দাবির জোরেই চণ্ডীচরণবাবু একদিন তাহাকে পদচ্যুত করাইয়া নিজেই 'সংস্কারক' পত্রিকার সম্পাদক হইয়া বসিবেন এবং ভিতরে ভিতরে হয়তো তাহারই ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

অনেক রাত্রে শঙ্কর বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, মৃন্ময়ের স্ত্রী হাসি তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। যাহা শুনিল, তাহাতে সে অবাক হইয়া গেল। মৃন্ময় আপিসের টাকা ভাঙিয়া ধরা পড়িয়াছে। সে নাকি এখন জেলে। অতিশয় শান্ত কণ্ঠে হাসি সংবাদটি দিল। বিস্ময়ে শঙ্করের বাক্যস্ফূর্তি হইল না,সে চুপ করিয়া হাসির মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃন্ময় চুরি করিয়া জেলে গিয়াছে! এ যে অসম্ভব ব্যাপার! কিন্তু ইহার সম্ভাব্যতা লইয়া বিচার করিবার সময় নাই, শঙ্করের মনে হইল, অবিলম্বে কিছু একটা করা প্রয়োজন।

আপনি বসুন, আমি ভণ্টুর কাছে যাই, দেখি, কত দূর কি করা যেতে পারে! হয়তো কোথাও কোনো ভুল হয়েছে—

কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। ভণ্টুবাবু অনেক চেষ্টা করেছেন, কিছু হবে না। কিছু ভুলও হয়নি, উনি নিজের মুখে দোষ স্বীকার করেছেন, টাকাও ফেরত দিতে রাজি নন। ওঁর জেল হবেই।

কত টাকা?

দশ হাজার।

দশ হাজার! এত টাকা কি করে পেলে?

আপিসের সিন্দুকে ছিল, ক্যাশিয়ারের টেবিল থেকে চাবিটা সরিয়ে টাকাটা নিয়েছেন।

টাকাটা কোথায়?

হাসি চুপ করিয়া রহিল।

সহসা তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। বড় বড় কয়েকটা ফোঁটা টপটপ করিয়া গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

বিনিদ্র শঙ্কর একা বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়া ছিল। ভাবিতেছিল, কি করিয়া এই নূতন সমস্যাটির সমাধান করিবে। মৃন্ময়ের যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, হাসিই সমস্যা। হাসির

আপনজন কেহ নাই। মৃন্ময়ই তাহার একমাত্র আশ্রয়স্থল। যে পরিবারে তাহার বাল্যকাল কাটিয়াছে, সেখানে সে আর ফিরিয়া যাইতে চাহে না। সংবাদ পাইলে মুকুজ্জেমশাই অবশ্য আসিবেন, ইহা লইয়া মাতিয়া উঠিবেন এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো একটা ব্যবস্থাও করিবেন, কিন্তু হাসির তাহা ইচ্ছা নয়। হাসি শঙ্করকে বারংবার অনুরোধ করিয়াছে, মুকুজ্জেমশাইকে যেন খবর না দেওয়া হয়, তিনি তাহার যে উপকার করিয়াছেন সে ঋণই সে জীবনে কখনও পরিশোধ করিতে পারিবে না, ঋণের বোঝা আর সে বাড়াইতে চাহে না। কিন্তু সে ঠিক কি করিতে চায় তাহাও এখনও পর্যন্ত খুলিয়া বলে নাই।

তুমি এখনও ঘুমোওনি?

অমিয়া শঙ্করকে জড়াইয়া ধরিল।

না। হাসিকে নিয়ে কি করা যায় তাই ভাবছি।

আমাদের কাছেই থাক্, কি আবার করবে!

আমাদের কাছেই থাকবে?

আমাদের কাছেই এসেছে যখন, কোথায় আর যাবে, যেতে বলাটা কি ভালো দেখায়?

তা বটে। তা হলে থাক্।

শঙ্কর পাশ ফিরিয়া শুইল। অমিয়া তাহার চুলের ভিতর আঙুল চালাইয়া চুল কুরিয়া দিতে লাগিল।

ঘুমোও তুমি।

ঘুমুচ্ছি।

শঙ্করের কিন্তু ঘুম আসিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, অমিয়া না হইয়া যদি অপর কোনো মেয়ে হইত, তাহা হইলে হাসির অভ্যাগমে সে শঙ্কিত হইয়া পড়িত। হাসি সুন্দরী এবং যুবতী। অমিয়ার মনে কিন্তু এতটুকু শঙ্কা নাই। শঙ্কর সম্বন্ধে সে এত নিশ্চিন্ত এবং নির্ভয় যে, শঙ্কর তাহার আচরণে অবাক হইয়া যায়। মাঝে মাঝে তাহার সন্দেহ হয় যে, অমিয়া বোধ হয় অতিশয় নির্বোধ। আবার মনে হয়, কই, বুদ্ধিহীনতার আর কোনোও লক্ষণ তো সে দেখিতে পায় না! কেবল এই বিষয়েই—যে বিষয়ে নারীবুদ্ধি সর্বাপেক্ষা বেশি প্রখর—সে বিষয়েই সে নির্বোধ?

।। এগারো ।।

তখনও ভালো করিয়া সকাল হয় নাই। শঙ্কর নীচের ঘরটায় বসিয়া 'কাব্য বাস্তবতা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিতেছিল। রবীন্দ্রনাথ 'বাস্তব' কথাটা যে অর্থে লইয়া বাস্তববাদীদের বিদ্রূপ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার দৃষ্টি দিয়া দেখিলে উপহাসযোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু উপহসিত সমালোচকদের পক্ষ লইয়া নানা উদাহরণ দিয়া শঙ্কর ইহাই প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছিল যে, সমালোচকগণ কাব্যে যে বস্তুর সন্ধান করিয়াছেন, তাহা সাধারণ বস্তু নহে। সে বস্তুর সংজ্ঞা ভিন্ন। কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথবা ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থ কাব্যবস্তু হইতে পারে না—যদি না সঙ্গে সঙ্গে তাহা রসিকজনের মর্মগ্রাহ্য হয়। যে সব সমালোচক কাব্যে বস্তুর

সন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা সেই বস্তুরই সন্ধান করিয়াছেন যাহা রসিকচিত্তগ্রাহী। কাব্যলোকের কুসুম এবং উদ্ভিদবিদ্যার কুসুমে আকাশ-পাতাল তফাত—ইহা যে নিয়মে সত্য, বিদেশাগত অবাস্তবতা অথবা অতিবাস্তবতা সেই একই নিয়মে এই সমালোচকগণ কর্তৃক অবাস্তব-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে যাহা 'অকাব্য', তাহাই কাব্যবিচারে অবাস্তব, কারণ কাব্যের বস্তু তাহাতে নাই।

শঙ্কর আছ নাকি ভাই?

দ্বার ঠেলিয়া দাড়িতে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে অপ্রত্যাশিতভাবে ভণ্টুর মেজকাকা প্রবেশ করিলেন।

এ কি, আপনি কবে এলেন?

কঠিন বন্ধন ভাই, বুঝলে, মায়ার বন্ধন বড় কঠিন বন্ধন।

বসুন।

উপবেশন করিয়া মুক্তানন্দ পুনরায় বলিলেন, রঙিন চশমাটা নাকে এমন এঁটে বসেছে যে, খোলা দুষ্কর।

কবে এলেন?

এলাম মানে! গেলুম কবে?

শঙ্কর স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল। বুঝিল, মুক্তানন্দ এখন প্রতি কথারই দার্শনিক জবাব দিবেন।

তোমরা যেতে দিচ্ছ কই ভাই, বার বার যাচ্ছি আর ফিরে আসছি।

কাল ভণ্টুর সঙ্গে দেখা হল, সে তো কিছু বললে না!

আমি বিনোদের বাসাতেই উঠেছি। মানে, ভণ্টুর কাছে যেতে সাহস হচ্ছে না।

মিটিমিটি চাহিয়া দাড়িতে আঙুল চালাইতে লাগিলেন। তাহার পর যেন মরিয়া হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, সেইজন্যই তো তোমার ঠিকানা জোগাড় করে এই ভোরে তোমার কাছে আসা। তুমি একটা উপায় বাতলে দাও ভাই।

কিসের উপায়?

ভণ্টুর কাছে যাবার।

কেন, ভণ্টুর কাছে যাবার বাধাটা কি?

ওই দেখ, তুমি বুদ্ধিমান লোক হয়ে বুঝতে পারছ না—বাধাটা কি? আমি সন্ন্যাসী মানুষ, গৃহীর বাড়িতে যেতে এমনিতেই তো কত বাধা, তার উপর ভণ্টু নিজের ভাইপো, মোটা মাইনের চাকরি করে শুনেছি, বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে করেছে। গেলেই ভাববে, ওই রে, বাবাজি কোনো মতলবে এসেছে নিশ্চয়। আজকাল সন্ন্যাসী দেখলেই লোকে ভাবে, ব্যাটার কোনো মতলব আছে।

মুক্তানন্দ চক্ষু বুজিয়া দাড়িতে আঙুল চালাইতে লাগিলেন। শঙ্কর হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। সহসা চক্ষু খুলিয়া মুক্তানন্দ বলিলেন, আমি একটা উপায় ভেবে এসেছি, তুমি যদি রাজি হও।

বলুন।

তোমাকে কিন্তু একটা মিথ্যা কথা বলতে হবে। বলতে হবে যে, আমার সঙ্গে রাস্তায় তোমার হঠাৎ দেখা, তুমি যেন জোর করে আমাকে ভণ্টুর কাছে নিয়ে এসেছ।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, বেশ। বিকেলে আসবেন তা হলে, এখন ব্যস্ত আছি একটু।

ইহাতে মুক্তানন্দ যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন। উঠিয়া বলিলেন, বিকেলে? আচ্ছা তাই আসব। লেখক হিসেবে তোমার নামডাক খুব শুনছি। আনন্দের কথা, তোমার নামডাক হবে না তো কার হবে। লিখছ নাকি কিছু এখন?

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। মুক্তানন্দ একবার ঝুঁকিয়া তাহার খাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, লেখ, তোমাকে আর বিরক্ত করব না তা হলে।

তাহার পর মুচকি হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু একটা কথা মনে রেখ, সবই মায়া, কিছুই কিছু নয়।—বলিয়া চলিয়া গেলেন। শঙ্করের মনে পড়িল, আজ বৈকালে হাসির জন্য একবার প্রফেসার গুপ্তের নিকটও যাইতে হইবে। প্রবন্ধটা এখনই শেষ করা প্রয়োজন। লিখিতে যাইবে, নিপু আসিয়া প্রবেশ করিল। হিরণদার আড্ডায় নিপুর সহিত শঙ্করের আলাপ হইয়াছিল। হিরণদার আড্ডার অধিকাংশ সভ্যের সহিত এখন আর দেখাই হয় না, কেবল নিপু আর ছবি টিকিয়া আছে। নিপুও সাহিত্য-রসিক। সে নাকি গোপনে সাহিত্য-রচনাও করে, কিন্তু কাহাকেও তাহা দেখায় না। সহসা সকলকে তাক লাগাইয়া প্রভাত-সূর্যের মত অনিবার্য দীপ্তিতে একদিন বঙ্গসাহিত্য-গগনকে উদ্ভাসিত করিয়া সে সমুদিত হইবে—ইহাই তাহার আকাঙ্ক্ষা। এখন অন্ধকারে তাহার তপস্যা চলিতেছে। দরিদ্রের সন্তান। এখনও বিবাহ করে নাই। আত্মীয়স্বজন কেহই তাহাকে তাহার বিদ্যা অথবা সাহিত্য-সাধনার জন্য শ্রদ্ধা করে না। সে বেকার, অসামাজিক। একমাত্র শঙ্করই তাহাকে আমল দেয়, তাই সে শঙ্করের কাছে আসে। কিন্তু শঙ্করের কাছে আসিয়াও সে স্বস্তি পায় না। মনটা কেমন যেন বিষাইয়া ওঠে।

কিছু লিখছ নাকি?

শঙ্কর যাহা লিখিয়াছিল দেখাইল।

কিছু হয়নি। তুমি যা লিখেছ, তা রবীন্দ্রনাথ অনেকবার অনেক জায়গায় বলেছেন—

ঠিক এমনি করে কোথায় বলেছেন?

নিপু কয়েকটা প্রবন্ধের নাম করিল। শঙ্কর তাহার একটাও পড়ে নাই। পড়িবে কখন? চাকরি করিতেই সমস্ত সময় চলিয়া যায়।

ছেঁড়া জামার পকেট হইতে পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া নিপু বলিল, ধারটা শোধ করতে এসেছি। কেরানিগিরি জুটেছে একটা।

তাই নাকি, শুনি নি তো।

তথাপি ইহা সত্য।

নিপু হাসিল। তাহার হাসির মধ্যে কেমন যেন একটা চাপা ঈর্ষা চকমক করিয়া উঠিল।

চলি এখন।

নিপু চলিয়া গেল।

শঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিল রহিল। তাহার পর প্রবন্ধটা কুচিকুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

।। বারো ।।

প্রফেসার গুপ্ত একটু বিপদে পড়িয়াছিলেন। পত্নী সুলেখা তাঁহার গতি-বিধির উপর লক্ষ্য রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শুধু লক্ষ্য নয়, গতি প্রতিরোধ করিতেও তিনি উদ্যত। পুত্রকন্যাকে লইয়া তিনি ব্যস্ত থাকিতেন, স্বামীর প্রতি এমন করিয়া মনোযোগ দিবার অবসর, এমন কি প্রবৃত্তিও তাঁহার এতদিন ছিল না। স্বামীকে অবশ্য তিনি চিনিতেন। বেলার সহিত তাঁহার সম্পর্কটা চোখের সম্মুখেই ঘনাইয়া উঠিয়াছিল। আধুনিক শিক্ষা দীক্ষা রুচি, এবং এম.এ. ডিগ্রি সত্ত্বেও এইজন্য তাঁহাকে নিতান্ত সেকেলে ধরনের অহিফেনও গলাধঃকরণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এতদিন তাঁহার মনের অন্য অবলম্বন ছিল—পুত্র-কন্যা। কন্যাটির বিবাহ হইয়া গিয়াছে, পুত্রটি মারা গিয়াছে। আর সন্তান নাই, বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে নিজেই তিনি অধিক সন্তানের জননীত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন, অন্য কোনো বন্ধনও নাই, স্বামীই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন।

তিনি নিজে যদিও স্বামীকে চিনিতেন, কিন্তু পাঁচজনের কাছে যাহা বলিয়া বেড়াইতেন তাহা ঠিক বিপরীত। পরিচিত মহলে আকারে ইঙ্গিতে তিনি এতদিন এই কথাই প্রচার করিয়া আসিয়াছেন যে, স্বামী তাঁহার দেবচরিত্র ব্যক্তি, কাব্য লইয়া আত্মহারা হইয়া থাকেন এবং তাঁহার পত্নী-প্রীতি অনন্যসাধারণ। তাঁহার ধারণা ছিল যে, লোকে তাঁহার কথা বিশ্বাস করে, কিন্তু সহসা সেদিন তিনি জানিতে পারিয়াছেন, কেহই তাঁহার কথা বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করিবার ভান করে মাত্র। আসল কথাটা সকলেই জানে। এক নিমন্ত্রণ বাড়িতে স্বকর্ণে সেদিন তিনি আড়াল হইতে শুনিয়াছেন—একটা ঘরে মিষ্টিদিদির সহিত তাঁহার স্বামীর নাম জড়াইয়া একদল মেয়ে হাসাহাসি করিতেছে। মিষ্টিদিদি নাকি তাঁহার স্বামীকে ফেলিয়া কোনো এক মুসলমান যুবকের সহিত কাশ্মীর-ভ্রমণে গিয়াছেন। তাঁহার মেয়ের বয়সী মেয়েরা ইহা লইয়া হাসাহাসি করিতেছে। প্রফেসার গুপ্ত সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইতেছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি তাঁহার আলাদা বাসাটিতে চলিয়া যান, আজও যাইতেছিলেন, সুলেখা আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কোথা যাচ্ছ?

প্রফেসার গুপ্ত একটু বিস্মিত হইলেন। এ রকম প্রশ্ন সুলেখা সাধারণত করেন না।

যেখানে রোজ যাই।

কোথায়?

প্রফেসার গুপ্ত দাঁড়াইয়া পড়িলেন, রিমলেস চশমাটা একবার ঠিক করিয়া লইলেন। জবাবদিহি করতে হবে না কি?

হবে।

সুলেখার গলার স্বরটা একটু কাঁপিয়া গেল, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে যাহা ফুটিয়া উঠিল, তাহা করুণ বা কোমল কিছু নহে, তাহা আগুন। একটু ইতস্তত করিয়া প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, হঠাৎ আজকে এ সবের মানে?

মানে, সন্ধের পর তুমি আর কোথাও বেরুতে পারবে না, যদি কোথাও যাও আমাকে নিয়ে যেতে হবে।

বিয়ের সময় এরকম কোনো শর্ত ছিল বলে তো মনে পড়ছে না।

ছিল বইকি, তুমি আমাকে সুখে রাখতে বাধ্য।

ও। আচ্ছা, চেষ্টা করা যাবে।

সুলেখার দৃষ্টি অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। প্রফেসার গুপ্ত তাঁহার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, দেখ, কেউ কাউকে সুখী করতে পারে না, নিজে সুখী হতে হয়। তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে, তাতে জীবনে তুমি কখনও সুখী হতে পারবে না। আমি অবশ্য চেষ্টা করব।

আমাকে সুখীই যদি না করতে পারবে, তা হলে বিয়ে করেছিলে কেন?

ঠিক ওই একই প্রশ্ন আমিও তোমাকে করতে পারি, কিন্তু তা আমি করব না। আমার উত্তর, সমাজে থাকতে গেলে একটা বিয়ে করা প্রয়োজন, তাই করেছি। ভেবেছিলাম—যাক সে কথা।

কি ভেবেছিলে?

এখনই বলতে হবে সেটা?

বলই না শুনি।

ভেবেছিলাম, তুমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পেয়েছ, তখন তোমার সঙ্গে আমার মনের খানিকটা মিল হবে। এখন দেখছি, সেটা মহা ভুল। পরীক্ষা পাস করলেই মিল হয় না।

তুমিই কি মিল হওয়ার মতো লোক?

সেটা তো নিজের মুখে বলা শোভা পায় না। তোমার সঙ্গে মিল হচ্ছে না, এইটুকু শুধু বলতে পারি। যতদূর দেখছি, উচ্চশিক্ষা তোমার দেহকে রুগ্ন, বিগতযৌবন, এবং মনকে অহঙ্কারী করেছে, আর কিছুই করেনি। সাধারণ মেয়ের মতই তুমি বিলাসী, লোভী, স্বার্থপর। ডিগ্রিটা তোমার নতুন প্যাটার্নের আর্মলেট বা নেকলেসের মত আর পাঁচজনকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার আর একটা অলঙ্কার মাত্র, ওতে তোমার মনের কোনো উন্নতি হয়নি। তোমার কাছে যে কালচার আশা করেছিলাম, তা তোমার নেই।

আমার কালচার আছে কি নেই, সেই বিচার তোমাকে করতে হবে না। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি—

প্রফেসার গুপ্ত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

আমার সঙ্গে কেবল কাব্য আলোচনা করবে, এই আশা করেই আমাকে বিয়ে করেছিলে নাকি? তা যদি করে থাক, তা হলে হতাশ হওয়ার কারণ আছে। তোমার মত কাব্য-রোগ আমার নেই, তা স্বীকার করছি।

প্রফেসার গুপ্ত হাসিয়া উত্তর দিলেন, আমার যেসব পুরুষ বন্ধু আছে, তাদের কারও কাব্য-রোগ নেই, কিন্তু তবু তাদের মনের সঙ্গে আমার মনের সুর ঠিক মেলে। দেখ, এসব কথা তর্ক করে বোঝানো যায় না।

আসল কথাটা চাপা দিচ্ছ কেন? আমি পুরুষ বন্ধুদের কথা বলছি না, মেয়ে বন্ধুদের কথা বলছি। যাদের সঙ্গ পাওয়ার জন্যে তুমি কাঙালের মত ঘুরে বেড়াও, তারা কি আমার চেয়ে বেশি কাব্য-রসিকা?

তা কেন হবে?

তা হলে যাও কেন?

সব কথা কি খোলাখুলি আলোচনা করা যায়?

গোপন তো আর কিছুই নেই, সবাই তো সব কথা জেনে ফেলেছে। আমি জানতে চাই, আমাকে বার বার এমন অপমান কেন করবে তুমি?

আমার তো মনে পড়ছে না, জ্ঞাতসারে কখনও তোমাকে অপমান করবার চেষ্টা করেছি। আমি বরং বরাবর বাঁচিয়েই চলেছি তোমাকে। তুমিই বরং আফিং-টাফিং খেয়ে আমাকে অপদস্থ করেছ।

আমি কি সাধে আফিং খেয়েছিলাম? বাধ্য হয়ে খেয়েছিলাম।

আমিও যা করছি, বাধ্য হয়ে করছি।

বাধ্য হয়ে করছ! তাই নাকি? কি রকম?

সুলেখার চোখের দৃষ্টি ব্যঙ্গশাণিত হইয়া উঠিল।

প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, তবে শোন। আমার মনের একটা অবলম্বন চাই। তুমি তা হতে পারনি। তুমি—শুধু তুমি নয়, তোমাদের অনেকেই দুয়ের বার হয়ে গেছ। কাব্যলোকের প্রিয়া কিংবা গৃহলোকের লক্ষ্মী কোনোটাই তোমরা হতে পারনি। সেকালের মত তুমি 'পতি পরম গুরু' এই কথা বিশ্বাস করে যদি আমার ঘরের লক্ষ্মী হতে পারতে, তা হলে হয়তো—

ঘরের লক্ষ্মী মানে?

মানে, সেই মেয়ে, যে আমার সুখের জন্যে সর্বতোভাবে দেহ-মন-প্রাণ উৎসর্গ করেছে, যে শুধু আমার শয্যাসঙ্গিনী নয়, আমার সর্বপ্রকার তৃপ্তিবিধায়িনী, যে আমার জন্যে নিজের হাতে রান্না করে, আমি কি কি ভালোবাসি তার খোঁজ রেখে তদনুসারে চলে, আমি যাতে অসুখী হই কখনও এমন কাজ করে না, আমি অসুস্থ হলে যে দিবারাত্র আমার সেবা করে, আমার পিকদানি বা কমোড পরিষ্কার করেও যে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে, আমার পুত্রকন্যার জননী হয়ে যে নিজেকে বিব্রতা মনে করে না—গর্বিতা হয়, নিজের সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়েও যে আমাকে সুখী করবার জন্যে সতত উন্মুখ—

অর্থাৎ, যে তোমার দাসী—

শুধু দাসী নয়, সর্বতোভাবে কায়মনোবাক্যে দাসী। এ রকম দাসীর পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতে আমার আপত্তি নেই, কোনো পুরুষেরই নেই বোধ হয়। এরা দাসী নয়, এরাই লক্ষ্মী, এরাই রানী। কিন্তু এখন তোমরা পুরুষের দাসত্ব করতে চাও না, সে ক্ষমতাই নেই তোমাদের, এখন তোমরা চাও স্বাধীনতা।

চাই-ই তো।

বেশ, স্বাধীন হও, আমাকেও স্বাধীন হতে দাও।

আমি যদি তোমার মত স্বাধীন হই, তা হলে কি ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো যাবে?

ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো যাবে কি না, এই ভেবে যারা কাজ করে, তারা স্বাধীনচিত্ত নয়, তারা সুবিধাবাদী। তোমাদের স্বাধীনতার মানে কি জান? তোমাদের স্বাধীনতার মানে, স্বামীর অর্থে শাড়ি, গাড়ি, গয়না কিনে ভদ্রতার মুখোশ পরে সমাজের পাঁচজনের কাছে ফ্লারিশ করে

বেড়ানো। ঠাকুর রান্না করুক, চাকর বিছানা করুক, বেয়ারা ফরমাশ খাটুক, বয় হাতে হাতে সব জিনিস এগিয়ে দিক, দাই বোতল খাইয়ে ছেলে মানুষ করুক, স্বামী রাশি রাশি টাকা রোজগার করে তোমার পদানত হয়ে থাকুক, তোমার সুবিধার জন্যে সবাই সব করুক, কেবল তুমি নিজে কুটোটি নাড়বে না। এই হল তোমাদের আদর্শ স্বাধীনতা। মাঝে মাঝে রান্না সেলাই অবশ্য তোমরা যে না কর তা নয়, কিন্তু তা শৌখিন রান্না সেলাই, তাতে গৃহস্থের কোনোও উপকার হয় না, তারও একমাত্র উদ্দেশ্য ফ্লারিশ করা; এত স্বার্থপর তোমরা যে, মা হতেও রাজি হও না, পাছে ফিগার খারাপ হয়ে যায় এই ভয়ে।

আমাদের সবই খারাপ বুঝলাম, কিন্তু যাদের পিছনে পিছনে তুমি ঘুরে বেড়াও, তারা কিসে আমাদের চেয়ে ভালো? তাদের কি আছে?

রূপ আছে, যৌবন আছে। পুরুষের কাছে এগুলোও কম লোভনীয় জিনিস নয়। তোমার তাও নেই। দেহের খোরাক, মনের খোরাক—কিছুই জোগাতে পার না, কি লোভে থাকব তোমার কাছে?

সুলেখা হঠাৎ হাসিয়া উঠিলেন।

মিষ্টিদিদির যৌবন আছে নাকি?

যৌবন না থাক, এমন একটা মাদকতা আছে, যা তোমার নেই। আসল কথা কি জান? আমরা মুগ্ধ হতে চাই। রূপ, যৌবন, প্রেম, প্রেমের অভিনয়, সেবা, রান্না, আত্মত্যাগ—যা হোক একটা নিয়ে আমরা মেতে থাকতে চাই। তুমি আমাকে কি দিয়েছ? তোমার সঙ্গে আমার অতি স্থূল টাকাকড়ির সম্পর্ক এবং সে সম্পর্ক আশা করি কড়ায় ক্রান্তিতে ঠিক আছে।

মিষ্টিদিদিও তো তোমাকে আর আমল দিচ্ছে না শুনছি। এক মুসলমান ছোঁড়ার সঙ্গে চলে গেছে—

এক মিষ্টিদিদি গেছে, আর এক মিষ্টিদিদি আসবে। পৃথিবীতে মিষ্টিদিদিদের অভাব ঘটবে না কখনও।

বেয়ারা আসিয়া প্রবেশ করিল।

শঙ্করবাবু এসেছেন।

শঙ্কর অনেকক্ষণ আসিয়াছিল, বাহিরে কেহ ছিল না বলিয়া এতক্ষণ সংবাদ পাঠাইতে পারে নাই। শয়নকক্ষের ঠিক পাশের ঘরই বাহিরের ঘর। শঙ্কর সব শুনিয়াছিল।

কি খবর?

প্রফেসার গুপ্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

শঙ্কর হাসির জন্য আসিয়াছিল। হাসি কোনো বোর্ডিংয়ে থাকিয়া লেখাপড়া করিতে চায়। বাড়িতে নিজের চেষ্টায় সে ম্যাট্রিক স্ট্যান্ডার্ড পর্যন্ত পড়িয়াছে, এখন সে স্কুলে ভর্তি হইতে চায়। প্রফেসার গুপ্তের সাহায্যে তাহাকে একটি ভালো স্কুলে ভর্তি করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেই শঙ্কর আসিয়াছে। প্রফেসার গুপ্ত এ কার্য যত সহজে ও সুষ্ঠুরূপে পারিবেন, অপরে তাহা পারিবে না। শিক্ষয়িত্রী-মহলে প্রফেসার গুপ্তের খাতির আছে, তাহা ছাড়া তিনি নিজেও শিক্ষা বিভাগের লোক, কোন্ স্কুলটা ভালো তাহা হয়তো ঠিকমত বাছিয়া দিতে পারিবেন।

সব শুনিয়া প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে লাভ আছে কোনো?

আমি তো যতদূর দেখেছি, লেখাপড়া-জানা মেয়েরা ঠিক খাপ খাচ্ছে না সমাজের সঙ্গে।

লেখাপড়া-জানা ছেলেরাই কি খাপ খাচ্ছে? আপনি খাপ খেয়েছেন?

প্রফেসার গুপ্ত স্মিতমুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, পুরুষরা বেখাপ্পা হলে ততটা এসে যায় না। মেয়েরা বেখাপ্পা হলে বড় মুশকিল।

আমার তো ধারণা, মেয়েরা কিছুতেই বেখাপ্পা হয় না। ওদের প্রকৃতি জলের মতো, যে পাত্রেই রাখুন ঠিক সেই পাত্রের আকার ধারণ করবে।

করবে—যদি ওদের প্রকৃতিতে শিক্ষা দিয়ে বদলে না দাও। শিক্ষা পেলেই জল জমে বরফ হয়ে যায়।

একটু উত্তাপ পেলে কিন্তু গলেও যায় আবার। জল কতক্ষণ বরফ হয়ে থাকবে, বলুন।

কিন্তু আমরা উত্তাপ দিই কি করে, বল? আমাদের নিজেদেরই যে উত্তাপ প্রয়োজন, আমরা নিজেরাই যে বরফ হয়ে গেছি—বিলিতি রেফ্রিজারেটারে ঢুকে।

ওদেরও আপনারাই ঢুকিয়েছেন। একটা কথা ভেবে দেখছেন না কেন, ওরা প্রাণপণে আমাদের মনের মত হবারই তো চেষ্টা করছে। যখন যা বলেছেন, তখনই তাই করেছে। ন'বছরে গৌরীদান করতেন যখন, তখনও ওরা আপত্তি করে নি। চিতায় পুড়িয়ে মারতেন যখন, তখনও বেচারিরা দলে দলে পুড়ে মরেছে। যখন পালকি করে নিয়ে গেছেন পালকি করে গেছে, যখন হাঁটিয়ে নিয়ে গেছেন হেঁটেই গেছে। ও বেচারিদের দোষ কি? আজ আপনারা চাইছেন, ওরা স্কুলে-কলেজে পড়ুক, নাচ গান শিখুক—ওরা প্রাণপণে তাই করছে। কাল যদি আপনাদের চাহিদা বদলায়, ওদেরও রূপ বদলাবে।

সব ঠিক। কিন্তু আমি সমাজ-সংস্কারক নই, আমি সামান্য মানুষ, যে ক'দিন বাঁচি একটু সুখে থাকতে চাই। I am fed up with the present lot. I would like to have—

প্রফেসার গুপ্ত কথাটা শেষ করিলেন না, একটু থামিয়া বলিলেন, মেয়েটির নাম কি বললে? হাসি? আচ্ছা, আজ আমি ফোনে কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে রাখব, তুমি কাল এস। তোমার সাহিত্যচর্চা কেমন চলছে? তোমার 'জীবন-পথে' বইখানা তত ভালো লাগেনি আমার কিন্তু। বড় পানসে।

ভালো হবে কি করে বলুন, চাকরি করতে করতে সাহিত্যচর্চা করা যায় না।

তার কোনো মানে নেই; উনুনের ভেতর পুড়লেও আগুন আগুনই থাকে, ওস্‌্ লেম এক্সকিউজ।

শঙ্কর মুচকি হাসিল বটে, কিন্তু মনে মনে সে খুব দমিয়া গেল। সে আশা করিয়াছিল, 'জীবন-পথে' বইটা পড়িয়া প্রফেসার গুপ্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবেন।

তুমি বসবে, না যাবে এখুনি?

আমাকে যেতে হবে।

চল তা হলে, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

উভয়ে বাহির হইয়া গেলেন।

সুলেখা পাশের ঘরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

।। তেরো ।।

আমাকে চিনতে পারেন?

কই মনে পড়ছে না—

চিবুকের ডান দিকে কালো তিলটা দেখেও মনে পড়ছে না?

শঙ্করের সহসা মনে পড়িল। সে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

আমার সম্বন্ধে অত কথা আপনি জানলেন কি করে?

কল্পনা করেছি।

সইটা কিন্তু অলীক কল্পনা বলে মনে হয় না।

অলীক কে বললে? কল্পনাতেই সত্য বলে অনুভব করেছি বলেই লিখেছি।

আমার সম্বন্ধে ওই সব অনুভব করেছেন সত্যি সত্যি?

করেছি বলেই তো লিখেছি।

আমার সব কথা জানেন?

জানি বৈকি।

ত্রিশ বছরের একটা মেয়ের মনে সংসার সম্বন্ধে অতখানি বৈরাগ্য এসেছিল হঠাৎ? ডাক্তারকে পেলাম না বলেই ক্ষিদে চলে যাবে? পোলাও পেলাম না বলে ভাত খাওয়াও বন্ধ করে দেব?

পোলাও না পেলে মনের যে ভাবটা হওয়া স্বাভাবিক, তাই আমি লিখেছি। ভাত খাওয়ার খবর দেওয়া আমার বিষয়ের বাইরে।

বুভুক্ষাই যখন আপনার বিষয়, তখন ও-খবরটা বাদ দিলে চলবে কেন?

ওই নোংরা খবরটা দেবার দরকার কি?

ইচ্ছে করলেই তো আপনারা নোংরাকেও সুন্দর করে তুলতে পারেন?

স্বামীকে ত্যাগ করে চলে আসার খবরটাও কম নোংরা নয় কিছু।

মেয়েটি মুচকি হাসিতে লাগিল। তাহার পর বলিল, জানেন? ডাক্তারকে পাইনি বলে দুঃখ হয়েছিল অবশ্য আমার, কিন্তু তা বলে তার কম্পাউন্ডারটিকে ছাড়তে পারিনি আমি। পরের সংস্করণে যোগ করে দেবেন খবরটা। আরও রিয়ালিস্টিক হবে।

শঙ্করের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে উঠিয়া বসিল। আশেপাশে চাহিয়া দেখিল। সত্যই স্বপ্ন তাহা হইলে! অদ্ভুত স্বপ্ন! তাহার 'পান্থনিবাস' পুস্তকের নায়িকা যমুনা স্বপ্নে দেখা দিয়া গেল।

আশ্চর্য!

।। চোদ্দো ।।

বিনিদ্র নয়নে হাসি একা শুইয়া ছিল।

কাঁদিতেছিল না, ভাবিতেছিল। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা নয়, দুর্মতির কথা ভাবিতেছিল। স্বর্ণলতার চিঠিগুলি আবিষ্কার করিবার পর মৃন্ময়কে সে কত অপমানই না করিয়াছে। মৃন্ময়

কিন্তু সে অপমান গায়ে মাখে নাই। অসংলগ্ন ভাষায় অসহায়ভাবে কেবল তাহাকে বুঝাইতে চাহিয়াছে যে, ইহা তাহার কর্তব্য, তাহা হইতে সে যদি বিচ্যুত হয়, তাহা হইলে হাসিই বা তাহার ওপর নির্ভর করিবে কোন্ ভরসায়? মৃন্ময় এত কথা এমনভাবে গুছাইয়া বলিতে পারে নাই, কিন্তু বার বার এই কথাই বলিয়াছে। হাসি বুঝিতে পারে নাই, বুঝিতে চাহে নাই। ঈর্ষার কৃষ্ণধূমে তাহার আকাশ-বাতাস তখন অস্বচ্ছ হইয়াছিল।

আমাকে অনুমতি দাও তুমি।

মৃন্ময়ের কথাগুলি এখনও তাহার কানে বাজিতেছে। আমাকে সত্যিই যদি ভালোবেসে থাক, সত্যিই যদি শ্রদ্ধা করতে চাও, আমার মনুষ্যত্বকে খর্ব করো না। এই ঘৃণিত পশুজীবন থেকে অব্যাহতি পেতে দাও আমাকে।

মৃন্ময়ের মুখখানা মনে পড়িল। প্রশস্ত উন্নত ললাট, রক্তাভ গৌরবর্ণ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ নাসা। ক্ষণিকের জন্য হাসি যেন এক মহাপুরুষের দর্শনলাভ করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছিল।

চিন্ময়ের কথাও মনে পড়িল। সেও আর ফিরিবে না। সহসা হাসি উঠিয়া বসিল। আলুলায়িত কুন্তল দুই হাত দিয়া ঠিক করিতে করিতে আবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, তোমার সহধর্মিণী হইবার যোগ্যতা আমি লাভ করিবই। আমি যত ছোট ছিলাম; সত্যই তত ছোট আমি নই।

আলো জ্বালিয়া সে মৃন্ময়কে চিঠি লিখিতে বসিল। এ চিঠি মৃন্ময় কোনোদিন পাইবে না জানিয়াও লিখিতে বসিল। আজ সে সমস্ত অন্তর দিয়া বুঝিয়াছিল, কেন মৃন্ময় স্বর্ণলতাকে চিঠি লিখিত!

।। পনেরো ।।

হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি রমজানের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, তুমি এটা ঠিক জান তো যে, সে বাড়িতে বড়সড় বিবাহযোগ্যা আর কোনো মেয়ে নেই?

না।

মেয়েটির নাম সেলিমা?

হ্যাঁ।

বাড়ির ঠিক পিছনেই পুকুর আছে?

ঠিক পিছনেই।

সামনে পাশাপাশি দুটো আমগাছ?

হ্যাঁ।

বাস, আর কিছু দরকার নেই, ঠিক দেখে আসব আমি। তোমার যাবার দরকার নেই, আমি নিজেই চিনে বার করতে পারব। তোমার হবু শ্বশুরের নাম আলিজান—ঠিক মনে থাকবে আমার। তুমি যাও।

মুকুজ্জেমশাই আর একবার সহাস্য দৃষ্টি রমজানের মুখের উপর নিবদ্ধ করিলেন।

পাশেই কাজিগ্রাম, সেখানে তোমার পিসির কাছে চলে যাও তুমি।

আচ্ছা।

একটু অনিচ্ছা সহকারেই যেন রমজান রাজি হইল।

উভয়ে নীরবে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

কিছু দূর গিয়া একটা গোলমাল শোনা গেল। দেখা গেল, একজন লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে লোকটা আসিয়া পড়িল।

পালান শিগ্গির, একটা পাগল একটা লাঠি নিয়ে সকলের মাথা ফাটিয়ে বেড়াচ্ছে, দু'জন খুন হয়ে গেছে। ওদিকে যাবেন না, পালান।

সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়া গেল, কোনো প্রশ্ন করিবার অবসর দিল না। মুকুজ্জেমশাই মুচকি হাসিয়া রমজানের দিকে চাহিলেন।

রমজান বলিল, চলুন, এই গলিটার ভেতর ঢুকে পড়ি।

আগে থাকতেই? এই লোকটাই পাগল কি না তার ঠিক কি? একটু এগিয়ে দেখাই যাক না।

মুকুজ্জেমশাই গলিতে ঢুকিলেন না, থামিলেনও না, যেমন চলিতেছিলেন চলিতে লাগিলেন। বাধ্য হইয়া রমজানকে অনুসরণ করিতে হইল। একটু পরে সত্যই কিন্তু পাগলকে দেখা গেল, মোটা লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সগর্জনে ছুটিয়া আসিতেছে। দৈত্যের মত চেহারা, ভীষণদর্শন। রমজান তাড়াতাড়ি পাশের একটা দাওয়ার উপর উঠিয়া পড়িল; আশেপাশের কপাট জানালা সব নিমেষের মধ্যে বন্ধ হইয়া গেল। মুকুজ্জেমশাই রাস্তার মাঝখানেই দাঁড়াইয়া পড়িলেন, কোথাও পলাইবার চেষ্টা করিলেন না। পাগলটাও এক অদ্ভুত কাণ্ড করিল। সেও মুকুজ্জেমশাইয়ের সামনে আসিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। রক্তচক্ষু মেলিয়া ক্ষণকাল তাঁহার মুখের পানে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ হেঁট হইয়া প্রণাম করিল এবং যেমন আসিয়াছিল তেমনই আবার লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেল।

রমজান দাওয়া হইতে নামিয়া আসিল। মুকুজ্জেমশাই হাসিয়া বলিলেন, তোমার বউ বিপত্তারিণী হবে বোঝা যাচ্ছে। এতবড় একটা ফাঁড়া কেটে গেল। লাঠিটা মাথায় বসিয়ে দিলেই হয়েছিল আর কি!

রমজান অবাক হইয়া গিয়াছিল।

ও-রকম করলে কেন বলুন তো?

তবে আর পাগল বলেছে কেন?

আপনি দাওয়ায় উঠলেন না কেন?

ফুরসত পেলাম কই, এসে পড়ল যে। তা ছাড়া পালালেই যে সব সময় নিস্তার পাওয়া যায়, তা ভেব না। সিঙ্গাপুরে একবার একটা মাতাল গোরা পিস্তল দিয়ে রাস্তায়—

গল্প করিতে করিতে উভয়ে পথ চলিতে লাগিলেন।

আস্‌মিকে খুঁজিয়া বাহির করিবার পর মুকুজ্জেমশাই কিছুদিন মনোরমার খোঁজ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পান নাই। এখন তিনি রমজানের হবু-বধূকে দেখিতে চলিয়াছেন। রমজানকে তিনি বড় স্নেহ করেন। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখিয়া রমজান এখন একটি ভালো চাকরি পাইয়াছে। রমজানের বাপের সহিতই মুকুজ্জেমশাইয়ের বহুকাল হইতে হৃদ্যতা, রমজানের পড়ার খরচও মুকুজ্জেমশাই কিছুকাল চালাইয়াছেন। একথা

অবশ্য রমজান অথবা রমজানের বাবা জানে না, তাহারা জানে যে, মুকুজ্জেমশাইয়ের কোনো ধনী বন্ধু মুকুজ্জেমশাইয়ের অনুরোধে এই সাহায্যটুকু করিয়াছিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে মুকুজ্জেমশাই দুই দিন আগে রমজানের বাড়ি গিয়াছিলেন। গিয়া শুনিলেন, আলিজানের কন্যা সেলিমার সহিত রমজানের বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছে। গোঁড়া মুসলমান সমাজে নাকি মেয়ে-দেখানোর প্রথা নাই। ইংরেজি লেখাপড়া শিখিয়া রমজানের গোঁড়ামি ঘুচিয়াছে, প্রথা কিন্তু বদলায় নাই। রমজানের মুখ দেখিয়াই মুকুজ্জেমশাই বুঝিলেন, রমজান মনে মনে ক্ষুব্ধ। রমজানের বাবাকে লুকাইয়া তাই উভয়ে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। মুকুজ্জেমশাই ঠিক করিয়াছেন, আলিজানের বাড়ির পশ্চাতে যে পুষ্করিণী আছে, তাহারই ঝোপে-ঝাড়ে আত্মগোপন করিয়া সেলিমাকে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিবেন। সমস্ত দিনের মধ্যে সে নিশ্চয়ই দুই একবার ঘাটে আসিবে। রমজানেরও মুকুজ্জেমশাইয়ের সহিত যাইবার ইচ্ছা, কিন্তু পাছে জানাজানি হইয়া যায়—এই ভয়ে মুকুজ্জেমশাই তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক নহেন। রমজান সুতরাং মুকুজ্জেমশাইকে শ্বশুরবাড়ির গ্রামের রাস্তাটা দেখাইয়া দিয়া কাজিগ্রামে পিসির বাড়িতে চলিয়া যাইবে। আলিজানের বাড়ি রেল স্টেশন হইতে দশ ক্রোশ। কাঁচা রাস্তা, হাঁটিয়া যাইতে হইবে, বৈশাখের দারুণ দ্বিপ্রহর। মুকুজ্জেমশাই কিন্তু দমিবার লোক নহেন।

।। ষোলো।।

চুনচুন বেথুন কলেজে ভর্তি হইয়াছে, হাসিও বেথুন স্কুলে ভর্তি হইয়া গেল। চুনচুনের খরচ পীতাম্বরবাবু দিবেন, হাসি নিজের খরচ নিজেই চালাইবে। দুইটা ব্যাপারই শঙ্করকে বিস্মিত করিয়াছে। মনে মনে সে যেন একটু আহতও হইয়াছে। যদিও তাহার নিজের আয় যৎসামান্য—চুনচুন কিংবা হাসির পড়ার ব্যয়ভার অংশত বহন করাও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য, তথাপি তাহা যদি বাধ্য হইয়া তাহাকে করিতে হইত, তাহা হইলে সে যেন মনে মনে তৃপ্তি লাভ করিত। দুইটি জটিল ব্যাপারেই এমন সহজ সমাধানে সে একটুও খুশি হয় নাই। কিন্তু এ অস্বস্তি যে কিসের জন্য, তাহাও সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। চুনচুন কিংবা হাসির কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়া অবশেষে তাহাদের প্রেমাস্পদ হওয়ার বাসনা তাহার আর নাই, তাহার মনের সে বহ্নি নিবিয়া গিয়াছে। বস্তুত নারী বলিয়াই যে তাহাদের সম্বন্ধে তাহার চিত্ত সমুৎসুক এ কথা সত্য নহে, উহারা নারী না হইয়া পুরুষ হইলেও সে হয়তো এই অস্বস্তি ভোগ করিত। অবহিতচিত্তে আত্মবিশ্লেষণ করিলে সে বুঝিতে পারিত যে, বাহাদুরি দেখাইবার দুই-একটা সুযোগ এমনভাবে হাতছাড়া হইয়া যাওয়াতেই সে অস্বস্তি ভোগ করিতেছে। কিন্তু এই মনস্তত্ত্ব লইয়া বেশিক্ষণ সময়ক্ষেপ করিবার মত সময় সে পাইল না, লোকনাথবাবু আসিয়া পড়িলেন।

কবি লোকনাথ ঘোষালের সহিত তাহার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে। কি একটা ছুটিতে তিনি কয়েকদিনের জন্য কলিকাতা আসিয়াছেন। গৃহিণীর নিকট কলিকাতা আসিবার কয়েকটি গুরুতর কারণ অবশ্য তিনি দেখাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু কলিকাতায় আসিবার তাঁহার একমাত্র কারণ শঙ্কর। কন্যার জন্য পাত্র অথবা নিজের গণ্ডমালার জন্য চিকিৎসক অন্বেষণ করা তাঁহার অজুহাত মাত্র। সাহিত্যিক ছাড়া জগতে আপনার বলিতে তাঁহার কেহ নাই, থাকিলেও তাহাদের তিনি গ্রাহ্য করেন না। কন্যা পাত্র অথবা গণ্ডমালার চিকিৎসক জুটিবার হইলে ঠিক

সময়ে আসিয়া জুটিয়া যাইবে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস, এ সবের জন্য ব্যস্ত হইয়া লাভ নাই। পৃথিবীতে মনুষ্যপদবাচ্য সভ্য ব্যক্তির যাহা লইয়া সত্যই ব্যস্ত হওয়া উচিত, তাহার নাম সাহিত্য। সাহিত্যিক মাত্রেই তাঁহার প্রিয়, অসাহিত্যিক মাত্রেই তাঁহার শত্রু। লোকনাথ সুদর্শন ব্যক্তি নহেন। কালো রঙ, খর্বাকৃতি, কদমছাঁট চুল, আরক্ত চক্ষু, চোখের কোণে পিঁচুটি। চোখে মুখে একটা দর্প প্রচ্ছন্ন থাকিয়াও পরিস্ফুট।

কিছুদিন পূর্বে শঙ্কর কয়েকটি সনেট লিখিয়াছিল। বিভিন্ন মাসিকপত্রে সেগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। লোকনাথবাবু তাহার প্রত্যেকটি পড়িয়াছিলেন। যে সব লেখকের সম্বন্ধে তিনি কিঞ্চিৎমাত্র আশা পোষণ করেন, তাহাদের কোনো লেখা তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় না। সনেট লইয়াই আলোচনা চলিতেছে।

লোকনাথবাবু সাধারণত মৃদু হাসিয়া আস্তে আস্তে কথা বলেন। তিনি বলিতেছিলেন, আপনার সনেটগুলি গীতিকবিতা হিসেবে উৎকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু সনেট হয়নি।

শঙ্কর সবিস্ময়ে বলিল, সনেট কি একজাতীয় গীতিকবিতা নয়?

কিন্তু গীতিকবিতা মাত্রেই সনেট নয়।

লোকনাথবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, তাঁহার চোখে একটি দীপ্তি প্রখর হইয়া উঠিতে লাগিল। শঙ্কর বুঝিতে পারিল, তাঁহার মনে বেগ আসিয়াছে। সে চুপ করিয়া রহিল।

না, গীতিকবিতা মাত্রেই সনেট নয়, দুধ মানে যেমন ক্ষীর নয়। বুঝুন ব্যাপারটা ভালো করে, লিরিকের সমস্ত উপকরণই ওতে থাকবে, অথচ স্বাতন্ত্র্যও যথেষ্ট থাকা চাই।

শঙ্কর বলিল, তার মানে, সনেটে কোনো রকম বাহুল্য থাকবে না, এই তো বলতে চান?

যে কোনো রস-রচনাতেই বাহুল্য বর্জনীয়, কেবল সনেটেরই বিশেষত্ব নয় তা। সনেটের ব্যাপারটা কি জানেন?

লোকনাথবাবু খাকিকক্ষণ চক্ষু বুজিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, রসেটি বলেছেন,

A sonnet is a moment's monument
Memorial from the soul's Eternity
To one dead deathless hour–

এই হল সনেটের পরিচয়। অন্যান্য লিরিক কবিতার মত সনেটে আবেগ থাকা চাই, গভীরতা থাকা চাই, গভীর রসবোধের পরিচয় থাকা চাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাই একটা বিশিষ্ট বাঁধন, কেন্দ্রীভূত ঘনীভূত একটা জিনিস, যাতে বাঁধন সত্ত্বেও অথবা বাঁধনের জন্যেই একটা চমৎকার রসরূপ ফুটে ওঠে। সেইজন্যেই যে কোনো লিরিক ভাবকেই সনেটের রূপ দেওয়া যায় না।

ও।

লোকনাথবাবু বলিলেন, সুতরাং বুঝতে পারছেন, আপনার ওগুলো সনেট হয়নি।

বুঝতে পারছি।

শঙ্কর কিন্তু বুঝিতে পারে নাই। পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হওয়াতে লোকনাথবাবুকে কিন্তু সে বুঝিয়াছিল, তাই কোনোরূপ প্রতিবাদ করিল না, করিলেই তাঁহার সহিত হৃদ্যতা আর থাকিবে না।

লোকনাথবাবু বলিয়া চলিলেন, অন্তরের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত গভীর ভাবধারা একটা বিশিষ্ট শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হয়েও, অর্থাৎ ছন্দমিলের বিশিষ্ট বন্ধনে বন্দী হয়েও যখন রসোত্তীর্ণ হবে, তখনই

তাকে সনেট বলব। আগেই বলেছি, তাই যদি হয়, তা হলেই বুঝতে পারছেন—যে কোনো ভাব সনেটের উপযোগী নয়। অর্থাৎ মিলবন্ধনের কৃত্রিমতা এবং ভাবোচ্ছ্বাসের অকৃত্রিমতা যেখানে স্বাভাবিক প্রবণতাবশত রসকেন্দ্রে ঘনীভূত হচ্ছে—

একই ভাবকে নানা ভাষায় নানা কথায় বারম্বার রূপান্তরিত করিয়া বক্তৃতা করা লোকনাথবাবুর স্বভাব। আজ কিন্তু বক্তৃতায় বাধা পড়িল, অপূর্বকৃষ্ণ পালিত আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদ বা প্রসাধনে কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই, কিন্তু লক্ষ্য করিলে শঙ্কর দেখিতে পাইত, তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে পূর্বে ভীত লুব্ধ যে অনিশ্চয়তা ক্ষণে ক্ষণে আত্মপ্রকাশ করিয়া লোকটিকে সকলের নিকট খেলো করিয়া তুলিত, তাহা এখন আর নাই। তাঁহার হাবভাবে বেশ একটা সপ্রতিভতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বেশ ভঙ্গিভরে নমস্কার করিয়া অপূর্বকৃষ্ণ বলিলেন, আপনাকে ঠিক এ সময়ে বাড়িতে পাব ভাবিনি, যদিও এ সময় ঠিক অফিস-আওয়ার নয়, তবু, মানে—

লোকনাথ উঠিয়া পড়িলেন। বক্তৃতায় বাধা পড়িলে তিনি আর বসেন না। বলিয়া গেলেন, সন্ধ্যাবেলা আবার তিনি আসিবেন এবং যদি পান কয়েকটি বিখ্যাত সনেটও জোগাড় করিয়া আনিবেন।

আমি আরও আগেই আসতাম, কিন্তু মোড়ে প্রিয়বাবুর উকিল জগদীশ সেনের সঙ্গে দেখা হওয়াতেই—, অথচ—

ব্যাপারটা কি খুলেই বলুন না। বসুন।

বিখ্যাত শক্তিমান লোকের সম্মুখে বসিতে পাইলে অবিখ্যাত অশক্ত ব্যক্তি যেমন কাঁচুমাচু হইয়া পড়ে, অপূর্বকৃষ্ণও সেই নীতি অনুযায়ী অতিশয় সসঙ্কোচে শঙ্করের নির্দিষ্ট আসনটিতে উপবেশন করিলেন।

একটি অনুগ্রহ আমাকে করতে হবে।

বলুন।

আমার বিয়ে, আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। আপনি যদি দয়া করে, মানে, যদিও এটা আমার দুঃসাহস, তবু অনেক দিনের পরিচয়ের জোরে—

এর সঙ্গে প্রিয়বাবুর উকিল জগদীশ সেনের সম্পর্ক কি?

এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, মানে, তাঁর সঙ্গে মোড়ে দেখা হওয়াতেই দেরি হয়ে গেল। অবশ্য আর এক দিক দিয়ে দেখলে বিয়ের চেয়ে সেটাও কম ইম্‌পরট্যান্ট নয়, কিন্তু—

কেন, হয়েছে কি?

অপূর্বকৃষ্ণের চোখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল।

শোনেননি? প্রিয়নাথ মল্লিক এক কাণ্ড করে বসেছেন যে! কাগজে বেরিয়েছে তো খবরটা।

আমি পড়িনি। প্রিয়নাথ মল্লিক কে?

বেলা মল্লিকের দাদাকে এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? মানে, আমি একস্‌পেক্ট করেছিলুম— যদিও অবশ্য আপনার—

কি হয়েছে তাঁর?

অপূর্বকৃষ্ণ ক্ষণকাল থামিয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন। বোধ হয় চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, খবরটা শঙ্করকে বলা সমীচীন হইবে কি না। কিন্তু ব্যাপারটা খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে মনে পড়িয়া যাওয়াতে তাঁহার দ্বিধা বিদূরিত হইল।

কি হয়েছে প্রিয়বাবুর?

তিনি এক অদ্ভুত রগচটা মেজাজের লোক, মানে, তা না হলে আপিসের মধ্যে অমন করে প্রফুল্লবাবুকে—, তা ছাড়া ভদ্রলোকের দোষও এমন কিছু—

কি করেছেন প্রফুল্লবাবুকে?

রুল-পেটা করেছেন।

কেন, হঠাৎ?

হ্যাঁ, হঠাৎই। প্রফুল্লবাবুর দোষ ছিল না তত, তিনি এমনিই ঠাট্টার ছলে, ঠিক ঠাট্টার ছলেও নয়—ভালোভাবেই কথাটা বলেছিলেন অথচ প্রিয়বাবু, মানে, বোধ হয়—

শঙ্কর অধীর হইয়া উঠিতেছিল, আশ্চর্য স্বভাব ভদ্রলোকের। কিছুতেই কোনো কথা সোজা করিয়া বলিতে পারেন না।

কি কথা বলেছিলেন?

আমরা সকলেই জানতাম, অর্থাৎ আমার অন্তত তাই ধারণা ছিল যে, বেলাদেবীর ওই সব কাণ্ড-কারখানার ফলে প্রিয়বাবু আজকালকার লেখাপড়া জানা মেয়েদেরই ওপর চটা। তাই প্রফুল্লবাবু তাঁকে খুশি করবেন ভেবে—অবশ্য তিনি যে খুশি হবেনই একথা প্রফুল্লবাবুর ইম্যাজিন করাটা একটু, মানে, ফারফেচেড বলতে পারেন, কিন্তু—

কি বলেছিলেন তিনি?

তেমন কিছু নয়, এই একটু, মানে, ভাষাটা অবশ্য একটু ইয়ে গোছের, মানে, অশ্লীলই বলতে হবে, কিন্তু প্রিয়বাবু, ইচ্ছে করলে স্বচ্ছন্দে ওভারলুক করতে পারতেন।

এর জন্যে রুল-পেটা করলেন তিনি প্রফুল্লবাবুকে?

সে এক ভীষণ রক্তারক্তি কাণ্ড, ভদ্রলোক মাথা ফেটে অজ্ঞান, পুলিস কেস—

কি বললেন তাঁর উকিল?

খুব বেশি আশা দিলেন না—দেওয়া শক্ত, মানে—

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। প্রিয়নাথ মল্লিকের মুখখানা তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

আমার বিয়েতে যাবেন তো? আপনি এরকম নিমন্ত্রণ রোজই পান নিশ্চয়, তবু যদি দয়া করে—

হ্যাঁ নিশ্চয়ই যাব।

সেই জন্যই চিঠি না পাঠিয়ে পার্‌সোনালি এলাম, জানি আপনি বিজি লোক, অর্থাৎ ইচ্ছে থাকলেও হয়তো—

যাব।

জায়গাটা চিৎপুরের গলি, এই চিঠিতেই ঠিকানা দেওয়া আছে।

সুদৃশ্য কার্ডে ছাপানো নিমন্ত্রণ লিপিটি অপূর্বকৃষ্ণ বাহির করিলেন। তাহার পর পকেট হইতে সুগন্ধি রুমাল বাহির করিয়া নাক মুখ কান মুছিয়া অপূর্বকৃষ্ণ বলিলেন, লোকে বসতে পেলেই, মানে, প্রোভার্বটা জানা আছে নিশ্চয়ই আপনার—। এবং হাসিলেন।

লোকনাথবাবুর নিরন্ধ্র সমালোচনার পর অপূর্বকৃষ্ণ পালিতের তোষামোদ শঙ্করের বড় ভালো লাগিতেছিল। সে প্রসন্ন দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, আবার কি?

কাঁচুমাচু মুখ করিয়া অপূর্বকৃষ্ণ বলিলেন, শুধু আমার নয়, মীনুরও অনুরোধ—দয়া করে একটি

কবিতা যদি লিখে দেন! বেশি বড় নয়, একটি সনেট শুধু, সেদিন কি একটা কাগজে আপনার সনেট একখানা পড়লাম, ওয়ান্ডারফুল, সিমপ্লি ওয়ান্ডারফুল।

শঙ্করের চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

দেবেন লিখে?

আচ্ছা, চেষ্টা করা যাবে।

অপূর্বকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন। শঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর সহসা তাহার মনে হইল, এ কি শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে তাহার। অপূর্বকৃষ্ণ পালিতের প্রশংসার জন্য সে লালায়িত!

পিওন চিঠি দিয়া গেল! আর একটি বিবাহের নিমন্ত্রণ। পড়িয়া শঙ্কর বিস্ময় বোধ করিল। চুনচুনের সহিত পীতাম্বরবাবুর বিবাহ।

বিস্মিত হইল, কিন্তু ইহা লইয়া তাহার অন্তরে তেমন কোনো আলোড়ন জাগিল না। তাহার সমস্ত অন্তর জুড়িয়া লোকনাথবাবুর কথাগুলিই কেবল ধ্বনিত- প্রতিধ্বনিত হইতেছিল—আপনার ওগুলো সনেট হয়নি।

।। সতেরো ।।

শঙ্কর সবিস্ময়ে চণ্ডীচরণ দস্তিদারের বিদ্যাবত্তার কথা চিন্তা করিতে করিতে আপিস হইতে বাড়ি ফিরিতেছিল। লোকটাকে সে এতদিন অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এ মাসে 'সংস্কারকে'র জন্য যে প্রবন্ধটি তিনি দিয়াছেন, যাহার প্রুফ সে এইমাত্র সংশোধন করিয়া ফিরিতেছে, তাহা পড়িবার পর লোকটির প্রতি শ্রদ্ধাবিষ্ট না হইয়া পারা যায় না। 'প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে দুটি কথা' প্রবন্ধের নাম। কিন্তু দুইটি নয়, অনেক জ্ঞাতব্য কথাই তিনি লিখিয়াছেন। আর যাহারই থাক শঙ্করের অন্তত এসব কিছুই জানা ছিল না। আবিসিনিয়ার পর্বত-কন্দর হইতে নীল নদের উৎপত্তি-বৃত্তান্ত, নিম্ন-মিশরের সহিত ব অক্ষরের সাদৃশ্য, পেলুশিয়ান কেনোপিকের উদ্ভব, প্রাচীন ইজ্‌রেলাইটস্‌দের কাহিনী, জোসেফের ইতিবৃত্ত, ফারাওদের পূর্ববর্তী রাখাল রাজগণের ইতিহাস, হিলিওপোলিস ফিনিক্স সম্বন্ধে তথ্য, আলেকজান্ড্রিয়া নগরীর অতীত মহিমা—শঙ্কর সত্যই অভিভূত হইয়া গিয়াছে। সে এসব কিছুই জানিত না, অথচ চণ্ডীচরণ দস্তিদার—

আমাকে চিনতে পারেন দাদা?

একটি রোগা লম্বাগোছের যুবক প্রণাম করিয়া শঙ্করের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। শুষ্ক শীর্ণ চেহারা দেখিলেই মনে হয়, তাহার শরীরের সমস্ত রস কে যেন শোষণ করিয়া লইয়াছে, অস্থি এবং চর্ম ছাড়া দেহে আর কিছু অবশিষ্ট নাই। শঙ্কর চিনিতে পারিল না।

আমি আপনার মামাতো ভাই নিত্যানন্দ।

ও।

উভয়ে পরস্পরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আপনার পড়ার খরচ বন্ধ করে পিসেমশাই আমাকেই এম. এ পড়ার খরচ দিয়েছিলেন।

ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তোমাকে সেই কোন্ ছেলেবেলায় একবার দেখেছিলাম, তাই চিনতে পারছি না। কোথায় আছ, এখন কি করছ?

কিছুই করছি না।

কতদিন এম. এ. পাস করেছ?

পাস করতে পারিনি। বার তিনেক চেষ্টা করেও পারিনি। করলেও বা কি হত বলুন?

হাসিল। এবড়ো-খেবড়ো পানের ছোপ-ধরা বিশ্রী দাঁতগুলো বাহির হইয়া পড়িতেই নিত্যানন্দের স্বরূপ যেন উদঘাটিত হইয়া গেল।

কোথায় আছ এখানে?

দেশ থেকে আজই এসেছি, একজন ফ্রেন্ডের বাড়িতে উঠেছি।

আমার বাসায় এস, ঠিকানাটা হচ্ছে—

ঠিকানা জানি। আপনার ঠিকানা কে না জানে, আপনি আজকাল বিখ্যাত লোক।

তারপর হাসিয়া বলিল, কাল যাব। এখন অন্য জায়গায় কাজ আছে একটু। বউদি এখানেই আছেন তো?

আছেন।

নিত্যানন্দ চলিয়া গেল।

শঙ্কর তাহার প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিল। তাহার আপন মামাতো ভাই, অথচ কত অপরিচিত।

।। আঠারো ।।

ভণ্টু আপিস হইতে ফিরিতেছিল। আজ তাহার অনেক পূর্বেই ফেরা উচিত ছিল, কিন্তু কাজ সারিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। কাজ কি একটা যে, তাড়াতাড়ি শেষ হইবে? মৃন্ময়ের জেল হওয়ার পর হইতে কাজের চাপ আরও বাড়িয়াছে। সমস্ত খুঁটিনাটি নিজে দেখিয়া ক্যাশ মিলাইয়া সমস্ত টাকা জমা দিয়া তবে তাহার ছুটি। ইন্দু কেমন আছে কে জানে? ইন্দুমতী আসন্নপ্রসবা, ক্রমাগত ভুগিতেছে। আজ সকালে বার দুই বমি করিয়া চোখ উল্‌টাইয়া এমন কাণ্ড করিয়া বসিয়াছিল যে, পট করিয়া চল্লিশটি টাকা খসিয়া গেল। তাহার বাপের বাড়িতে যে ডাক্তার চিকিৎসা করিতেন, তাঁহাকেই ডাকিতে হইল, তিনি নাকি উহার নাড়ি এবং ধাত ভালো বুঝেন। তাঁহার ফি বত্রিশ টাকা এবং যে সকল ঔষধ পথ্য তিনি ব্যবস্থা করিয়া গেলেন, তাহার দামও আট টাকা। মুখটি বুজিয়া দিতে হইল। তিনি বলিয়া গেলেন যে, প্রসবের পূর্বে প্রসূতির যেসব পরিচর্যা প্রয়োজন, তাহার কিছুই করা হইতেছে না। আসন্ন-প্রসবার যে পরিমাণ দুধ ফল খাওয়া উচিত, যতটা বিশ্রাম এবং ব্যায়াম করা দরকার, তাহার কিছুই হয় নাই। সত্যই হয় নাই। কি করিয়া হইবে? সংসারের নানাবিধ খরচ। দাদা আবার চেঞ্জে গিয়াছেন, তাঁহাকে খরচ পাঠাইতে হয়; দাদার ছেলেরা স্কুলে পড়িতেছে, তাহাদের সব খরচ দিতে হয়; বাকু অহিফেন এবং দুধের মাত্রা বাড়াইয়াছেন; বাবাজি আসিয়া জুটিয়াছেন, তাঁহার জন্য খাঁটি গব্যঘৃত কিনিতে হইতেছে। ইহার উপর প্রসূতি-পরিচর্যার খরচ কি করিয়া জুটাইবে সে! তাহার মাহিনা বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু সংসার খরচ তদপেক্ষা ঢের বেশি বাড়িয়াছে। ইন্দু এ বেলা কেমন আছে, কে জানে? একবার ডাক্তারবাবুর সহিত দেখা করিয়া

গেলে কেমন হয়? কিন্তু ইন্দুর এ বেলার খবরটা না জানিয়া যাওয়া বৃথা। হঠাৎ ভণ্টুর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল, বাইকের ব্রেকটা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া সে নামিয়া পড়িল। এ কি কাণ্ড! এ তো স্বপ্নেও ভাবে নাই।

বল হরি হরিবোল—

করালীচরণ বক্‌সি মড়া বহিয়া লইয়া যাইতেছেন। করালীচরণ বক্‌সি! কাহার মড়া? করালীচরণ দ্রাবিড় হইতে ফিরিয়াছেন নাকি? কবে? ভণ্টু কিছুই তো জানে না! সে গত ছয় মাস করালীচরণের কোনো খোঁজই রাখে নাই। অবসরও ছিল না, প্রয়োজনও হয় নাই। দুই বৎসর পূর্বে সে হয়তো আগাইয়া গিয়া কুশল প্রশ্ন করিত, এমন কি তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্মশান পর্যন্ত গিয়া সমস্ত রাত কাটাইয়া আসিতেও হয়তো তাহার বাধিত না, আজ কিন্তু এসব করিবার কল্পনাও সে করিল না, পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িল। বরং এই চিন্তাই মনে উদিত হইল, চাম্‌লদ্ আমাকে দেখিতে পায় নাই তো!

।। উনিশ ।।

অনেক রাত্রে চিৎপুর রোড দিয়া শঙ্কর একা ফিরিতেছিল। এমন আনন্দময় উন্মাদনা তাহার জীবনে বহুকাল আসে নাই। তাহার দেহের প্রতি শিরায়-উপশিরায় যেন সুরা তরঙ্গিত হইতেছিল। মনে হইতেছিল, লোকনাথ ঘোষালের বিচারই কি ঠিক? প্রফেসার গুপ্তের শুচিবায়ুগ্রস্ত সাহিত্য-রুচিই কি সাহিত্য-বিচারের একমাত্র মানদণ্ড? তাহার মনের অস্বাভাবিক অবস্থা সম্বন্ধে সে হয়তো জ্ঞাতসারে সচেতন ছিল না, থাকিলে লোকনাথ ঘোষাল অথবা প্রফেসার গুপ্তের রসবোধে সন্দিহান হইতে সে হয়তো ইতস্তত করিত। কিন্তু অবিমিশ্র প্রশংসার মদিরায় তাহার সমস্ত চিত্ত বিহ্বল, লোকনাথ ঘোষাল, প্রফেসার গুপ্ত সব তখন তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। অপূর্বকৃষ্ণ পালিতের বিবাহ-বাসরে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে একজন ভক্ত পাঠিকার সহিত দেখা হইয়া যাইবে, ইহা কে কল্পনা করিয়াছিল। কুমারী নীরা বসাক সত্যই তাহাকে অবাক করিয়া দিয়াছে। সে তাহার সমস্ত লেখা শুধু যে পড়িয়াছে তাহা নয়, যত্ন সহকারে বারংবার পড়িয়াছে। তাহার কবিতা তো বটেই, কিছু কিছু গদ্যও তাহার কণ্ঠস্থ, অনায়াসে মুখস্থ বলিয়া গেল! 'জীবন-পথে' পুস্তকের নীহার তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, 'উদ্বন্ধন' গল্পের নায়িকার দুঃখে সে অশ্রুপাত করিয়াছে, 'নাম-না-জানা' গল্পের সূক্ষ্ম রসে সে অভিভূত। তাহার রুচি তুচ্ছ করিবার মত নয়। টলস্টয়-গোর্কি-পড়া মেয়ে। তাহার রসবোধ নাই—এ কথা বলা চলে না। অতিশয় দক্ষতার সহিত সে 'পান্থ-নিবাসে'র যমুনা-চরিত্র বিশ্লেষণ করিল, তাহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সমন্বয় দেখাইল। শঙ্কর সত্যই অবাক হইয়া গিয়াছে। কুমারী নীরা বসাকের মুখখানা বারম্বার মনে পড়িতে লাগিল। মেয়েটি দেখিতে কুৎসিত। সামনের দাঁতগুলি বড় বড়, গায়ের রঙ কালো, সামনের চুলগুলি প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে, চক্ষু দুইটিতেও তেমন কিছু সৌন্দর্য নাই। কিন্তু সাহিত্য-আলোচনা করিতে করিতে সে যখন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সমস্ত কদর্যতাকে অবলুপ্ত করিয়া দিয়া তাহার চোখে মুখে যে রূপ উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহা দেহাতীত এবং সত্যই অনবদ্য। শঙ্করকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছে।

শঙ্করের জীবনে অনেক নারী আসিয়াছে, কিন্তু ঠিক এমন মেয়ে শঙ্কর আর দেখে নাই। অধিকাংশ নারীর দেহটাই সর্বপ্রথমে চিত্তকে আকৃষ্ট করে, কিন্তু নীরা বসাক রূপের অভাব সত্ত্বেও মনকে আকর্ষণ করে। সে যে নারী, এ কথাটাই মনে থাকে না। এ কোথায় ছিল এতদিন? এই প্রসঙ্গে চুনচুনের কথাও শঙ্করের মনে পড়িল। চুনচুনেরও সাহিত্যপ্রীতি আছে, কিন্তু তাহা এত বেশি নীরব যে, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। চুনচুনেরও আজ বিবাহ হইয়া গেল। শঙ্কর যায় নাই, তাহার প্রবৃত্তিই হয় নাই। চুনচুন যে স্বেচ্ছায় পীতাম্বরবাবুকে বিবাহ করিতে পারে, ইহা তাহার কল্পনাতীত ছিল। এই লোভী লোমশ বৃদ্ধটার মধ্যে সে কি এমন দেখিতে পাইল? যদি কোনোদিন চুনচুনের সঙ্গে নির্জনে দেখা হয়, তাহা হইলে তাহাকে সে জিজ্ঞাসা করিবে, পীতাম্বরবাবুর মাধুর্যটা কোথায়? হয়তো কিছু আছে, যাহা শঙ্করের অনধিগম্য। সহসা শঙ্করের মনে হইল, চুনচুনের সহিত এতদিনের পরিচয়, অথচ তাহার সম্বন্ধে সে কত কম জানে! যতীন হাজরার শোচনীয় মৃত্যুর রাত্রিটা মনে পড়িল।—সেই গভীর রাত্রে গোপনে খিল খুলিয়া দেওয়া! সেদিনও চুনচুন যেমন রহস্যময়ী ছিল, আজও তেমনই রহস্যময়ী আছে। তাহার অন্তরলোকের দ্বার আজও শঙ্কর খুলিতে পারে নাই। হঠাৎ তাহার মনে হইল, খুলিবার প্রয়োজনটাই বা কি? সকলের অন্তরলোকের খবর যে তাহাকে রাখিতেই হইবে, এমনই বা কি কথা আছে? সিগারেট বাহির করিবার জন্য সে পকেটে হাত পুরিল। হাত পুরিতেই বিবাহের প্রীতি-উপহারখানা হাতে ঠেকিল। একটা ল্যাম্প-পোস্টের নীচে দাঁড়াইয়া বহুবার-পঠিত সনেটটা সে আবার পড়িল। চমৎকার করিয়া ছাপাইয়াছে। অপূর্ববাবুর রুচিটা যে সুমার্জিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। অপূর্বকৃষ্ণের উপর শঙ্করের বরাবরই বিতৃষ্ণা, আজ এ উপলক্ষে বিতৃষ্ণাটা যেন অনেক কমিয়া গেল। মনে হইল, তাহার উপর এতদিন সে অকারণে অবিচার করিয়াছে। তাহার উপর রুষ্ট হইয়া থাকিবার ন্যায়সঙ্গত কোনো কারণই তো নাই। কৃতবিদ্য মার্জিতরুচি ভদ্রলোক, অতিশয় নিরীহ, কাহারও সাতে-পাঁচে থাকিতে চান না, কাহারও উপকার ভিন্ন অপকার করেন না, সঙ্গীত-বিষয়ে সত্যই গুণী। নারীজাতির সম্বন্ধে অবশ্য কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে। কিন্তু সে দুর্বলতা কাহার নাই? বউটিও বেশ হইয়াছে। চমৎকার মেয়েটি। যেমন রূপ, তেমনই গুণ। মেয়েটি কিছুকাল পূর্বে অপূর্বকৃষ্ণেরই ছাত্রী ছিলেন। গরিব ব্রাহ্মঘরের মেয়ে অপূর্বকৃষ্ণের সহায়তাতেই নাকি ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়াছেন, গান-বাজনাও শিখিয়াছেন। হয়তো উহারা সুখেই থাকিবে।

কিছুদূরে গিয়াই শঙ্কর কিন্তু অপূর্বকৃষ্ণের কথা ভুলিয়াই গেল। পকেট হইতে সনেটটা বাহির করিয়া আর ল্যাম্প-পোস্টের নীচে দাঁড়াইয়া আবার সেটি পড়িতে লাগিল। সকলেই কবিতাটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছে। ক্ষণকাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ বিডন স্ট্রিটে ঢুকিয়া পড়িল। বিডন স্ট্রিটের একটা গলিতেই লোকনাথবাবু থাকেন।

রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গিয়াছিল, তবু লোকনাথবাবু জাগিয়াই ছিলেন। 'বঙ্কিমচন্দ্র' সম্বন্ধে বিরাট একটা প্রবন্ধ লিখিবেন, বহুদিন হইতেই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। মফস্বলে সব বই পাওয়া যায় না বলিয়া লিখিতে পারেন নাই। কলিকাতায় আসিয়া লাইব্রেরি হইতে পুরাতন মাসিক ও নানা পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তিনি প্রয়োজনীয় অংশগুলি টুকিয়া লইতেছিলেন। শঙ্করের ডাকে কপাট খুলিয়া দিলেন এবং এত রাত্রে শঙ্করকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন।

এত রাত্রে কি মনে করে?

একটা বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছিলাম, ভাবলাম, আপনি কি করছেন দেখে যাই।

আসুন আসুন। আমি বঙ্কিমকে নিয়ে পড়েছি। বঙ্কিম আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের পুরোধা, অথচ তাঁর সম্বন্ধে ভালো করে কোনো আলোচনাই হয়নি এখনও। আমি ভাবছি, আমার যতটুকু সাধ্য তা আমি করে যাব। বঙ্কিমের ভাষার লিপিচাতুর্য প্রথমে দেখাতে চাই, বুঝলেন? বঙ্কিমের ভাষাটা—

বঙ্কিম-আলোচনা শুরু হইয়া গেল।

প্রায় ঘন্টা দুই পরে শঙ্কর বাড়ি ফিরিল। বঙ্কিম সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া ফিরিল বটে, কিন্তু মন তাহার অপ্রসন্ন। লোকনাথবাবু সনেটটি প্রশংসা তো করেনই নাই, বরং ভর্ৎসনা করিয়াছেন। কবিতা লইয়া এ রকম খেলা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

অমিয়া মেঝেতে আঁচল পাতিয়া ঘুমাইতেছিল। পাশে থালায় পরটা ঢাকা দেওয়া। শঙ্করের ডাকে অপ্রতিভমুখে সে উঠিয়া বসিল। শঙ্করও অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার যে আজ সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ ছিল, এ কথা সে অমিয়াকে বলিতেই ভুলিয়া গিয়াছিল।

যাই, পরটাগুলো গরম করি। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

মেঝেতে শুয়ে ঘুমোচ্ছ কি করে, যা মশা!

মশারির ভেতর আলো ঢোকে না। এখানে শুয়ে শুয়ে পড়ছিলাম।

তাহার পর মিটিমিটি চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিল, তোমারই বই পড়ছিলাম একখানা।

কোন্‌টা?

'পান্থনিবাস' খানা।

কেমন লাগল?

বেশ।

শঙ্কর কোটটা খুলিয়া চেয়ারে রাখিল।

আবার ওখানে রাখছ? আলনা রয়েছে তা হলে কেন? অমিয়া কোটটা তুলিয়া যথাস্থানে রাখিল। তাহার পর পাশের ঘর হইতে একটা কাপড় আনিয়া বলিল, কাপড়টাও ছেড়ে ফেল, সমস্তটা দিন ওই এক কাপড়ে রয়েছে।

কাপড় ছাড়া হইয়া গেলে অমিয়া বলিল, হাত পা মুখ ধোবে না? বারান্দার কোণে জল গামছা সব ঠিক করে রেখেছি।

শঙ্কর হাত মুখ ধুইয়া আসিল।

'পান্থনিবাস' খানা ভালো লাগল তা হলে তোমার?

হ্যাঁ, বেশ তো। তবে—

আবার তবে কি—

আমি সব বুঝতে পারনি ভালো। আমার বিদ্যের দৌড় আর কতদূর।

কোন্‌খানটা বুঝতে পারনি?

ওই যমুনাকে। ও-রকম মেয়ে আছে নাকি? কি বিচ্ছিরি কাণ্ড, ও রকম করে নাকি কেউ?

করে বইকি।

রাম রাম!

যমুনা মাতাল দুশ্চরিত্র স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া নানা বিপদ-আপদের মধ্যে পড়িয়া অবশেষে নার্স হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে এবং কালক্রমে একজন ডাক্তারের প্রেমে পড়িয়া উপলব্ধি করিয়াছে যে, পৃথিবীতে প্রেমই একমাত্র কাম্য ধন। কিন্তু উক্ত ডাক্তার যখন তাহার প্রণয়-ফাঁদে ধরা দিল না, তখন যমুনার মনে হইল—কিছুই কিছু নয়, পৃথিবীটা একটা পান্থনিবাস মাত্র। ইহাই 'পান্থনিবাসে'র গল্প। এ সম্বন্ধে শঙ্কর নীরা বসাকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া আসিয়াছে, লোকনাথ ঘোষালের চুলচেরা সমালোচনাও শুনিয়াছে। তাহার ইচ্ছা হইল, অমিয়াকেও এই গল্পের আর্ট সম্বন্ধে সচেতন করে। কিন্তু অমিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, তোমার গাল-বালিস করেছি আজ, দেখবে? এক দিকে টকটকে লাল শালু আর এক দিকে কালো সাটিন—ঐ দেখ। ভালো হয়নি? আমার ইচ্ছে ছিল, এ দিকটা নীল রঙের দিয়ে—

বেশ হয়েছে। পরটা গরম কর।

এই করি। ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি? পাবে না, সেই কোন্ সকালে খেয়ে বেরিয়েছ। এতক্ষণ ছিলে কোথা?

লোকনাথবাবুর কাছে।

আবার সনেটের কথাটা তাহার মনে পড়িয়া গেল।

।। কুড়ি ।।

অপরাহ্ন।

'সংস্কারক' আপিসে শঙ্কর যথারীতি প্রুফ দেখিতেছিল। একটি নয়-দশ বৎসরের বালক সসঙ্কোচে প্রবেশ করিল।

শঙ্করবাবু কোথায়?

আমি শঙ্কর। কেন?

বালক একটি চিঠি দিল। ছবির চিঠি। ক্ষুদ্র পত্র।—

ভাই শঙ্কর,

তিন দিন থেকে জ্বরে পড়ে আছি। শয্যাসঙ্গিনীও সঙ্গ নিয়েছেন। ঝি পলাতকা। সুতরাং বুঝতেই পারছ। তোমাকে লিখছি, কারণ তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই লেখবার নেই। কেউ ঠিক বুঝবেও না। সময় নষ্ট করে তোমাকে আসতে বলছি না, কিন্তু যখন হয় একবার এস ভাই। এটি আমার বড় ছেলে। যদি অসম্ভব না হয়, এর হাতে, এক টাকা না পার, গণ্ডা আষ্টেক পয়সা দিও অন্তত। কাল থেকে সকলের অনাহার চলছে।

পত্রপাঠ শঙ্কর বালকের দিকে চাহিল। ফরসা রঙ, শীর্ণ শরীর, জীর্ণ মলিন বেশবাস। পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া দেখিল, একটি মাত্র টাকাই আছে।—এই নাও। বাবাকে বলো, একটু পরেই যাচ্ছি আমি।

বালক চলিয়া গেল। প্রুফটা শেষ করিয়া শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। চণ্ডীচরণবাবুর নিকট গিয়া বলিল, গোটা দশেক টাকা আমার এখনই চাই।

চণ্ডীচরণ বিনা বাক্যব্যয়ে শঙ্করের নামে খরচ লিখিয়া দশটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন। শঙ্করের মনে পড়িয়া গেল যে, সে আপিসের নিকট হইতে প্রায় দেড় শত টাকার ওপর ধার করিয়া ফেলিয়াছে।

আমি একটু বেরুচ্ছি, বুঝলেন? ছবির খুব অসুখ।

চণ্ডীচরণবাবু চাহিয়া দেখিলেন মাত্র, 'হ্যাঁ'-'না' কোনোও জবাব দিলেন না। শঙ্করের মনে হইল, চণ্ডীচরণবাবুর কাছে সে বৃথা জবাবদিহি করিতে গেল কেন? নিজের উপরই এজন্য সে চটিয়া গেল এবং আর কালবিলম্ব না করিয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং যেমন তাহার স্বভাব, অন্যমনস্ক হইয়া পথ চলিতে লাগিল। সহসা বেথুন কলেজের গেটের সম্মুখে চুনচুনের সহিত দেখা। চুনচুন ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। শঙ্করকে দেখিয়া চুনচুন মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিল, একটি অতি ক্ষীণ মৃদু হাস্যরেখা অধরপ্রান্তে ফুটিল কি ফুটিল না বোঝাও গেল না। শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল। না দাঁড়াইয়া উপায় ছিল না, কিন্তু কি বলিবে, সহসা সে ভাবিয়া পাইল না। চুনচুনই কথা কহিল।

অনেক দিন পরে দেখা হল। আজই ভাবছিলাম, আপনাকে ফোন করব। সন্ধের দিকে আপনার কবে অবসর আছে বলুন তো?

কেন?

উনি বলছিলেন, একদিন আপনাকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে।

আমার অবসর নেই।

চুনচুন ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহার পর ঘাড় ফিরাইয়া লইল। কিছুক্ষণ পাশাপাশি নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর শঙ্করের মনে হইল, দৃশ্যটা শোভন হইতেছে না। বেশিক্ষণ অবশ্য এভাবে থাকিতে হইবে না, অদূরে চুনচুনের ট্রাম দেখা যাইতেছে।

বলিল, আচ্ছা, চলি তবে আমি।

আপনি মিছিমিছি রাগ করে আছেন।

কি করে বুঝলে, রাগ করে আছি?

চুনচুন চুপ করিয়া রহিল।

শঙ্করও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর দিল, তোমার মত মেয়ে যখন পীতাম্বরবাবুব মত লোককে স্বেচ্ছায় বিয়ে করে, তখন রাগ হয় না, আশ্চর্য লাগে, একটু দুঃখও হয়।

আমার মতন সাধারণ একজন মেয়েকে আপনি অত বড় করে দেখছেন কেন, বুঝতে পারছি না।

পীতাম্বরবাবুর কি আছে যে, তাকে বিয়ে করলে তুমি?

টাকা।

শঙ্কর ভালো করিয়া চুনচুনের মুখের পানে চাহিয়া দেখিল। না, ব্যঙ্গ নয়, উহাই তাহার মনের কথা। অবাক হইয়া গেল।—টাকা! টাকার জন্যে তুমি বিয়ে করেছ?

শঙ্করের মুক্তোকে মনে পড়িল।

চুনচুন উত্তর দিল না, সম্মুখের দেওয়ালটার পানে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল। শঙ্করের, কি জানি কেন, হঠাৎ যতীন হাজরার মুখটাও মনে পড়িয়া গেল, তাহার শেষ কথাগুলিও।

যতীনবাবুকে নিশ্চয় তুমি টাকার জন্যে বিয়ে করনি?

টাকার জন্যেই করেছিলাম। কিন্তু তিনি আমায় ঠকিয়েছিলেন, তাঁর সত্যি কিছু ছিল না।

টাকার জন্যেই বিয়ে করেছিলে তাঁকে?

মনে করুন, করেছিলাম! তাতেই বা লজ্জা পাবার কি আছে? টাকা না হলে সংসার চলে না, আমাদের মত মেয়ের—যার না আছে রূপ, না আছে গুণ—বিয়ে করা ছাড়া ভদ্রভাবে টাকা সংগ্রহের আর কি উপায় আছে, বলুন?

তোমার সম্বন্ধে ঠিক এ ধারণা ছিল না আমার।

কি ধারণা ছিল?

আমার ধারণা ছিল, একটা উচ্চ আদর্শের জন্য তুমি অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন করতে পার।

আদর্শ বজায় রাখবার মত সঙ্গতি নেই আমার। শুধু আমার কেন, অনেকেরই নেই। এই দেখুন না, আপনার মত লোককেও টাকার জন্যে তুচ্ছ একটা চাকরি করতে হচ্ছে। ও কাজ কি আপনার উপযুক্ত? কিন্তু উপায় কি বলুন, সংসারে টাকাটা দরকার যে।

ট্রাম আসিয়া পড়িল।

আমি যাচ্ছি। আসবেন একদিন।

ট্রাম চলিয়া গেল।

।। একুশ ।।

শঙ্কর কিছুদিন পূর্বে 'হাতুড়ি' নাম দিয়া একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিল। আধুনিক কাব্য হিসাবে পুস্তকটি অনেকের প্রশংসা লাভও করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই সম্পর্কে ডাক্তার মুখার্জির একটি পত্র আসিয়াছে, শঙ্কর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহা পড়িতেছিল।

শঙ্কর,

বল্‌শেভিজম্‌ নিয়ে কবিতা লিখে তুমিও আধুনিক হবার চেষ্টা করছ দেখে কষ্ট হল। অনেকের কাছে বাহবা পেয়েছ নিশ্চয়। বাংলা দেশে সমঝদার জোটা একটা দুর্বিপাক। এই সমঝদারের গুঁতোয় সত্যেন্দ্র দত্ত 'বাঙালী পল্টন' আর শরৎ চাটুজ্জে বোধ হয় 'শেষপ্রশ্ন' লেখেন। রবীন্দ্রনাথও আত্মরক্ষা করতে পারেননি। তোমার লেখা যে সব জায়গায় খারাপ হয়েছে তা বলছি না, কিন্তু পপুলার এবং আধুনিক হবার 'আপ্রাণ' প্রয়াস রসিকের নিকট হাস্যকর। নিন্দা শুনতে যদি ভালোবাস, তবলা বাঁধা হবার আগে গান আরম্ভ করে লম্বকর্ণ শ্রোতাদের তাক লাগাবার প্রবৃত্তি যদি কম থাকে তো তোমার উচিত আমার কাছে এসে খানিকক্ষণ হাতুড়ির ঠকঠক সহ্য করা। কারণ আমার বিশ্বাস, তোমার অন্য সমঝদারেরা একটু আধটু বেসুরে বিক্ষুব্ধ হন না এবং তুমিই সেই কুসংসর্গে পড়ে বেসুরে সুর-সাধনা আরম্ভ করেছ। কিন্তু এ আমি করছি কি? নাঃ—

চিঠিতে আর কাব্য সমালোচনা করব না। লিখতে লিখতে হঠাৎ ভয় পেয়ে যাই। বয়স পঞ্চাশোর্ধ্ব হল। শাস্ত্রের উপদেশ—এখন বনং ব্রজেৎ। বনে যেতে হয়নি, চারদিকে আপনা-আপনি বন গজিয়ে উঠল। কালো চুল সাদা হল, সাদা দাঁত কালো হল, স্বচ্ছ চোখের মণি

ঝাপসা হয়ে এল ক্রমশ। যে পৃথিবীতে পঞ্চাশ বৎসর কাটালুম, সে তার রূপ বদলে ফেললে। পুরনো যা ছিল তা আর হাতের কাছে নেই, নতুন যা এল তাকে চিনি না। সব বদলে গেল, বদলাল না শুধু 'সোহং দেবদত্ত'—এই জ্ঞান। তাই মাঝে মাঝে হঠাৎ বক্তৃতা করে ফেলি। তারপর চমকে থেমে গিয়ে হাতড়ে দেখি, আশে-পাশে কেউ নেই। অতএব বক্তৃতা করব না। যদি কখনও দেখা হয়, আমার কথা বোঝবার চেষ্টা করবে। ইতি—

শুভার্থী

নীলমাধব মুখোপাধ্যায়

।। বাইশ ।।

ছবির এবং ছবির স্ত্রীর টাইফয়েড হইয়াছে।

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি, শঙ্কর একা জাগিয়া বসিয়া আছে। শঙ্কর ছাড়া ইহাদের দেখিবার কেহ নাই। শঙ্করই ডাক্তার ডাকিয়াছে, ঔষধ-পত্র আনিতেছে, বেশি বাড়াবাড়ি হইলে রাত্রি জাগিয়া সেবাও করিতেছে। সমস্ত খরচও তাহারই, ছবি কপর্দকহীন। ধার বাড়িতেছে। সেজন্য শঙ্কর ক্ষুব্ধ নয়, তাহার প্রধান ক্ষোভ—লিখিবার সময় পাইতেছে না। রাত্রিটুকুই লিখিবার সময়, কিন্তু ছবিকে এমন অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া যায় না। ছবির স্ত্রীও শয্যাগত। এ বাড়ির কেহই সুস্থ নয়। সাতটি সন্তান—কাহারও সর্দি, কাহারও জ্বর, কাহারও চোখ উঠিয়াছে, কাহারও সর্বাঙ্গে পাঁচড়া, একজনের হাঁপানি—অনাহারক্লিষ্ট রুক্ষ শীর্ণ সকলেই। দারিদ্র্যের ঠিক এই মূর্তি বড় করুণ। যাহারা সমাজে সোজাসুজি গরিব বলিয়া পরিচিত, তাহাদের দীনতা এমন মর্মান্তিক নয়। কারণ তাহা প্রত্যাশিত সরল দীনতা। ইহা শুধু দীনতা নয়, ইহা দীনতা এবং দীনতাকে অপটু ভাবে ঢাকিবার ব্যর্থপ্রয়াস বলিয়া অতিশয় করুণ। পচা জিনিসকে সুদৃশ্য আবরণ দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করিলে যাহা হয় ইহা তাহাই। তোশকের ছিটটি সুন্দর, সুরুচির পরিচয় দিতেছে, কিন্তু সেই সুরুচির মর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া দ্বিতীয় তোশক প্রস্তুত করানো সম্ভবপর হয় নাই। এখন তাহা মলমূত্রে ভিজিয়া উঠিয়াছে; বাড়িতে দ্বিতীয় তোশক নাই, মলিন অংশটুকু কাপড় চাপা দেওয়া আছে, মাছি ভন্ ভন্ করিতেছে। এমনই সব জিনিসেই। যে কাপটি দিয়া ঔষধ-পথ্য খাওয়ানো হইতেছে, তাহা এককালে সুদৃশ্য ছিল, কিন্তু এখন তাহা হাতলহীন, ফাটা, ফাটার ফাঁকে ময়লা জমিয়া আছে। স্ত্রীর হাতে চুড়ি ঝকমক করিতেছে, কিন্তু একটিও স্বর্ণের নহে, সমস্ত গিলটি করা।

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি, শঙ্কর একা বসিয়া ভাবিতেছিল। লেখকেরা কাগজ কলম লইয়াই যে সর্বদা লেখে তাহা নয়, তাহারা মনে মনেও লেখে, শঙ্করও একা বসিয়া মনে মনে লিখিতেছিল। নূতনতম এক কাব্য-নীহারিকা তাহার মনের আকাশে ধীরে ধীরে মূর্তি পরিগ্রহ করিতেছিল।

ছবি প্রলাপ বকিতে লাগিল—ব্রাউনিংয়ের কবিতা। অসুখে পড়িয়াও বেচারি কবিতা ভোলে নাই। সহসা শঙ্করের মনে হইল, এত সাহিত্যরস পান করিয়াও তাহার এই দুর্দশা কেন? সব দিক দিয়াই সে তো অমানুষ। মনে প্রশ্ন জাগিল, সাহিত্য দিয়া সত্যই কি কাহারও

উপকার করা যায়? অন্ধকারে আলেয়ার পিছনে অথবা উষর মরুভূমিতে মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া যাহারা পথ হারাইয়া ফেলে, সেও তাহাদেরই মত একটা মিথ্যা আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে না তো?

।। তেইশ ।।

ইন্দু সামলাইয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সারে নাই। ইন্দুর মুখেই ভণ্টু শুনিল যে, এই সময়ে তাহার নাকি একটা কঠিন ফাঁড়াও আছে। ভণ্টু আর স্থির থাকিতে পারিল না। করালীচরণের উদ্দেশ্যে বাইকে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল। ঝামাপুকুরের গলিতে ঢুকিয়া সে দেখিতে পাইল, পানওয়ালীর দোকানটা খোলা নাই। খোলা থাকিলে সুবিধা হইত, তাহার নিকট হইতে করালীচরণের সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়া তদনুসারে নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিত। এতদিন পরে দেখা, বেফাঁস কিছু বলিয়া ফেলিলে চাম্ লদ হয়তো ক্ষেপিয়া উঠিতে পারে। যা লোক, কিছুই বলা যায় না। ভণ্টুর সাংসারিক অবস্থা যখন মন্দ ছিল, তখন সে করালীচরণকে অতিশয় ভয় ও সমীহ করিয়া চলিত। এখন অবশ্য তাহার মনের ঠিক সে ভাব নাই, তবু করালীচরণের সম্মুখীন হইতে সে কেমন যেন ইতস্তত করিতেছিল। ইন্দুমতীর ফাঁড়ার খবরটা কর্ণগোচর না হইলে সে হযতো আসিতই না।

সে ঢুকিতে ইতস্তত করিতেছিল, তাহার কারণ, সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই। সে করালীচরণকে কথা দিয়াছিল যে, তাহার বাসার তত্ত্বাবধান করিবে; কিন্তু সে বহুকাল এদিকে আসে নাই। করালীচরণের কুড়িটা টাকাও তাহার কাছে আছে। আছে মানে, পাওনা আছে। সঙ্গে নাই।

খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক চাহিয়া অবশেষে ভণ্টু আগাইয়া গেল। দেখিল, দরজা বন্ধ। ঠেলিবামাত্র কিন্তু খুলিয়া গেল।

কে?

ভণ্টু সবিস্ময়ে দেখিল, করালীচরণ টেবিলটাকে ঘরের এক কোণে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। বোতলের মুখে মোমবাতি জ্বলিতেছে, টেবিলের একধারে একগাদা বই স্তূপীকৃত করা আছে। করালীচরণ ঝুঁকিয়া কি যেন করিতেছিলেন, শব্দ পাইয়া ঘাড় ফিরাইয়াছেন।

আমি ভণ্টু।

করালীচরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া এক চক্ষুর দৃষ্টি দিয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। চিবুকটা একবার কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইল।

ভণ্টু? ভণ্টু কে?

ভণ্টু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাই নারায়ণ. দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, এগিয়ে আসুন না, মুখখানা দেখি একবার। ভণ্টু তাঁহার কথাগুলি ঠিক যেন বুঝিতে পারিতেছিল না।

তবু একটু আগাইয়া গেল।

ভণ্টুর মুখের উপর এক চক্ষুর দৃষ্টি আরও ক্ষণকাল নিবদ্ধ রাখিয়া করালীচরণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে শঙ্কা ও ক্রোধ যুগপৎ ঘনাইয়া উঠিল।

ও, আপনি। বসুন।

এইবার ভণ্টু বুঝিতে পারিল, কেন সে করালীচরণের কথা বুঝিতে পারিতেছিল না। করালীচরণের দাঁত নাই, সমস্ত মুখটাই যেন তুবড়াইয়া গিয়াছে।

ভণ্টু প্রশস্ত চৌকিটির এক ধারে উপবেশন করিল।

কিছু মনে করবেন না, নামটা আপনার মনে ছিল না। আপনি যদি শেক্সপিয়ার, মিলটন, ডার্‌বিন, ফ্যারাডে বা ওদের মত কেউ হতেন, তা হলে হয়তো থাকত।

একটু থামিয়া অস্ফুটকণ্ঠে পুনরায় বলিলেন, বাই নারায়ণ! বিড়বিড় করিয়া আরও খানিকটা কি বলিলেন, ভণ্টু বুঝিতে পারিল না। সে মনে মনে স্বগতোক্তি করিল, চাম্‌লদ ভীম জালে ফেলবার অ্যারেঞ্জমেন্ট করছে দেখছি।

প্রকাশ্যে বলিল, আমার নতুন বাসার ঠিকানা পানউলী জানত। আপনি যদি একটু খবর—

আমি যখন এলাম, তখন ঠিকানা বলবার মত অবস্থা ছিল না পানউলীর। সে তখন বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকছিল এই চৌকিতে পড়ে পড়ে। মুখে এক ফোঁটা জল দেওয়ার লোক ছিল না কাছে।

করালীচরণ যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

ভণ্টু কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। করালী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা আবার বলিয়া উঠিলেন, বেশ হয়েছে, বেশ্যা মাগীর কাছে আসবে কে?

চিবুক কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইল। এক চক্ষুর প্রখর দৃষ্টি পুনরায় তিনি ভণ্টুর মুখের ওপর নিবদ্ধ করিলেন। ভণ্টুর মনে হইল, যেন তাহার কপালে কেহ শলাকা বিদ্ধ করিয়া দিতেছে।

ভণ্টু বিস্ময় প্রকাশের ভান করিয়া বলিল, পানউলীর কাছে কেউ ছিল না?

বিব্রত ভাবটা সামলাইয়া লইয়া কোনওক্রমে প্রশ্নটা করিল।

মোস্তাক ছিল, কিন্তু মোস্তাক তখন একপাল কুকুরবাচ্চা সামলাতে ব্যস্ত। চৌকির অপর প্রান্তে পুঞ্জীভূত অন্ধকারটা হঠাৎ নড়িয়া উঠিল।

না না, তুমি ঘুমোও, তোমায় কোনও দোষ দিচ্ছি না। তুমি ঠিকই করেছিলে। একটা মরমর বুড়ি বেশ্যার মুখে দু ফোঁটা জল দেওয়ার চেয়ে কচি কচি কুকুরবাচ্চা ঘাঁটা ঢের বেশি আর্টিস্টিক। তুমি একজন আর্টিস্ট। ঘুমোও তুমি, উঠ না।

মোস্তাক গুটি মারিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল, উঠিল না।

ভণ্টু চুপ করিয়াই রহিল, এই পরিবর্তিত করালীচরণ বক্‌সিকে কোনোও কথা বলিতে তাহার সাহসেই কুলাইতেছিল না। অথচ একদিন ইহার সহিত তাহার কত হৃদ্যতাই ছিল। অনেকদিন আগেকার একটা ছবি ভণ্টুর মনে পড়িল। নৈহাটি স্টেশনে বসন্ত রোগাক্রান্ত ভিড়-পরিবৃত অসহায় করালীচরণের ছবিটা। কত অসহায়; ভণ্টুই দয়াপরবশ হইয়া সেদিন তাহাকে তুলিয়া আনিয়া হাসপাতালে দিয়া আসিয়াছিল। অথচ ইহারই সহিত এখন কথা কহিতে সাহসে কুলাইতেছে না। তাহার মনে হইতে লাগিল, চেহারা বদলাইয়া গেলে মানুষটাই বদলাইয়া যায় হয়তো। যাহার গোঁফদাড়ি ছিল না, সে যদি বহুকাল পরে একমুখ গোঁফদাড়ি লইয়া হাজির হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত পূর্বেকার সহজ সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করিতে কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকে। করালীচরণের দন্তহীন তোবড়ানো মুখের পানে চাহিয়া ভণ্টু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

করালীচরণই কথা কহিলেন, আচ্ছা, ভণ্টুবাবু, কল্পনা বলে কোনো বালাই আছে আপনার মধ্যে?

আজ্ঞে?

আপনি কল্পনা করতে পারেন?

একটু একটু পারি হয়তো।

পারেন? কল্পনা করতে পারেন, একটা কঙ্কালসার কদাকার বুড়ি বেশ্যা অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মরছে, তার মৃত্যুর সময়ে মুখে এক ফোঁটা জল দেওয়ার লোক কেউ কাছে নেই। কদাকার মুখ ভালো করে দেখেছেন কখনও? গালের হাড় উঁচু, কপালের শির বার করা, বড়বড় দাঁত, তাতে আবার মিশি লাগানো—

করালীচরণ হয়তো বর্ণনাটা আরও ফলাও করিয়া করিতেন, কিন্তু কুঁই-কুঁই করিয়া একটা শব্দ হওয়াতে তাঁহাকে থামিয়া যাইতে হইল। মোস্তাক তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল এবং নিঃশব্দে ঘরের কোণে আলমারির পাশটায় গিয়া ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিল। তারপর কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোনোদিকে না চাহিয়া রুদ্যমান বাচ্চাগুলিকে বগলদাবা করিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

মা-টা আবার বোধ হয় পালিয়েছে। বাই নারায়ণ!

করালীচরণের চিবুক কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইল।

ভণ্টু ভাবিতেছিল, কোনো ছুতায় এই ভীম জাল ছিন্ন করিয়া এইবার পলায়ন করা উচিত! কোষ্ঠীগণনা করাইবার আশা সে বহুপূর্বেই বিসর্জন দিয়াছিল। আর একদিন আসা যাইবে। আজ চাম্ লদ বিরক্তি-মাউন্টেনের তুঙ্গে আরোহণ করিয়া বসিয়া আছে।

হঠাৎ কর্কশ কণ্ঠে করালীচরণ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, দেখেছেন কখনও কদাকার মুখ? শুধু কদাকার নয়, তৃষিত মুমূর্ষু, যে তার কুৎসিত হাসি ও কদর্য কটাক্ষ দিয়ে আজীবন লোকও ভোলাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু একজনকেও ভোলাতে পারেনি, একটা লোকও তার আপন হয়নি, তার মৃত্যুকালে কেউ কাছে আসেনি—দেখেছেন এ রকম কখনও?

মানে, অবশ্য তাকে—

মিছে কথা বলবেন না, আমি জানি, আপনি দেখেননি, আমিও দেখিনি। চোখ থাকলেই দেখা যায় না, চোখের সামনে থাকলেও না।

পানউলীর কথা বলছেন তো?

ঠিক ধরেছেন। তা হলে শুধু আমার চোখে নয়, আপনার চোখেও সে কুচ্ছিৎ ছিল। বাই নারায়ণ, পৃথিবীতে কেউ ভালো চোক্ষে দেখত না মাগীকে।

মরিচা-ধরা একটা টিনের কৌটা খুলিয়া করালীচরণ একটি আধ-পোড়া বিড়ি বাহির করিলেন এবং সেটি মোমবাতির শিখায় ধরাইয়া লইয়া নীরবে টানিতে লাগিলেন। তাহার পর সেটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, ভালোই হল, চলে যাওয়ার আগে আপনার সঙ্গে দেখাটা হয়ে গেল।

কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

ঠিক করিনি এখনও।

কবে যাবেন?

তাও ঠিক করিনি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

করালীচরণই পুনরায় কথা কহিলেন, আজ হঠাৎ এলেন যে, কোনো দরকার ছিল নিশ্চয়।

একটি কোষ্ঠী দেখাতে এনেছিলাম।

গণনা করা আজকাল ছেড়ে দিয়েছি। ও-শাস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই। 'জ্যোতিষ-শাস্ত্রের ব্যর্থতা' নাম দিয়ে একখানা বই লিখছি, এই দেখুন।

একটা খাতা তুলিয়া দেখাইলেন।

জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস নেই?

না।

করালীচরণের চক্ষুটা দপদপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

আপনি দ্রাবিড় থেকে ফিরলেন কবে?

করালীচরণ গুম হইয়া রহিলেন।

হাত দেখে জন্মতারিখ বের করতে পারে, এ রকম জ্যোতিষী কলকাতায় বেশি নেই। আপনি যদি—

চুপ করুন।

অপ্রত্যাশিত ধমক খাইয়া ভণ্টু থামিয়া গেল।

করালীচরণ বলিয়া উঠিলেন, কুষ্ঠি-ফুষ্ঠি দেখে কচু হয়। ওসব ছিঁড়ে কুচিকুচি করে নর্দমায় ফেলে দিন গে যান। সব মিথ্যে, বাজে, রাবিশ—

করালীচরণ প্রায় চিৎকার করিয়া উঠিলেন। টেবিলের বইগুলি দুই হাত দিয়া ঠেলিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিতে দিতে রুদ্ধ আক্রোশে তর্জন করিতে লাগিলেন, মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যের স্তূপ সব, জঞ্জাল—

ভণ্টু ভয় পাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

কি করছেন আপনি, বক্সি মশাই?

বকবক করবেন না, বাড়ি যান।

ভণ্টু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এখনও দাঁড়িয়ে আছেন যে?

একটি কথা শুধু জানতে চাই, যদি দয়া করে বলেন।

না, বলব না।

তাহার পর কি মনে করিয়া বলিলেন, আচ্ছা, কি বলুন?

জ্যোতিষশাস্ত্রে আপনার অবিশ্বাস হল কেন?

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের আবার কেন আছে নাকি?

না, এতদিন যাতে আপনার অগাধ বিশ্বাস ছিল, যা আরও ভালো করে শেখবার জন্যে আপনি দ্রাবিড় গেলেন, আজ হঠাৎ—

করালীচরণ বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন।

বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান বলছি।

করালীচরণের চোখ-মুখ এমন হইয়া উঠিল যে, ভণ্টু আর ঘরের ভিতর থাকা সমীচীন মনে করিল না, সভয়ে বাহির হইয়া গেল। করালীচরণ দড়াম করিয়া কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন। ভণ্টু বাহিরে আসিয়া দেখিল, মোস্তাক একটা ল্যাম্পপোস্টের নীচে একটা কালো কুক্কুরীকে জোর করিয়া চাপিয়া শোয়াইয়া রাখিয়াছে, বাচ্চাগুলি মহানন্দে স্তন্যপান করিতেছে। ভণ্টু ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহার পর বাইকে চড়িয়া গলি হইতে বাহির হইয়া গেল। অপমানে তাহার কানের দুই পাশ গরম হইয়া উঠিয়াছিল। করালী যে তাহার সহিত এমন ব্যবহার করিতে পারেন, ইহা তাহার স্বপ্নাতীত ছিল।

কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া করালীচরণ দ্বারে কান লাগাইয়া রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়াইয়া ছিলেন। রাগ নয়, তাঁহার ভয় হইতেছিল। ভণ্টু হয়তো যাইবে না, এখনই হয়তো ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের নিগূঢ় রহস্যটি জোর করিয়া তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া লইবে। কিছুতেই তিনি হয়তো বাধা দিতে পারিবেন না। দ্রাবিড়ে গিয়া করকোষ্ঠী হইতে নিজের জন্মতারিখ উদ্ধার করিয়া তিনি নিঃসংশয়রূপে জানিয়াছেন যে, তাঁহার মা বেশ্যা ছিলেন। এই নিদারুণ কথা পৃথিবীতে আর কেহ জানিবে না। না, আর দেরি করা নয়, এখনই কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইবে। এখনই হয়তো ভণ্টুবাবু একদল চেনা লোক লইয়া হাজির হইবে। ভণ্টুকে তিনি মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন, তাহার নাম মোটেই তিনি বিস্মৃত হন নাই, তাহারই আগমন-আশঙ্কায় অতি ভয়ে ভয়ে দিনপাত করিতেছিলেন। বাড়িটা বিক্রয় করিবার জন্যই কলিকাতায় আসা। নিদারুণ অর্থাভাব ঘটিয়াছে। সে ব্যাপার তো আজ চুকিয়া গেল। আর দেরি করিয়া কি হইবে? করালীচরণ হাতের কাছে যাহা পাইলেন, একটা পুঁটুলিতে বাঁধিয়া লইলেন। তাহার পর সন্তর্পণে দ্বার খুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, কোথাও কেহ নাই, মোস্তাকও চলিয়া গিয়াছে। তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন এবং প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন।

এই ট্যাক্সি!

ছুটন্ত ট্যাক্সিটা থামিতেই করালীচরণ তাহাতে চড়িয়া বলিলেন, হাওড়া, জলদি।

হাওড়া পৌঁছিয়া দেখিলেন একখানা ট্রেন ছাড়িতেছে। বিনা টিকিটেই তাহাতে তিনি চড়িয়া বসিলেন।

।। চব্বিশ ।।

দিন কয়েক পরে ভণ্টুর মনে পড়িয়া গেল, শঙ্করের বাবার উইলটা তো করালীচরণের কাছে আছে। শঙ্করকে খবর দিয়া উইলটা অবিলম্বে উদ্ধার করিয়া আনা প্রয়োজন। তাহার নিজের আর করালীচরণের বাসায় যাইতে সাহস হইতেছিল না, প্রবৃত্তিও হইতেছিল না। লোকটার উপর সে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। লোকটা বিদ্বান হইতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত অভদ্র। ভণ্টু এখন আর সে ভণ্টু নাই। আপিসে তাহার পদোন্নতি হইয়াছে, নিম্নতম অনেক কেরানি তাহাকে দুইবেলা ঝুঁকিয়া নমস্কার করে। যেখানে-সেখানে যখন-তখন আগেকার মত অদ্ভুত বাক্যাবলী উচ্চারণ করিয়া সে আর ভাঁড়ামি করে না। তাহার চরিত্রে পরিবর্তন ঘটিয়াছে। হাজার হোক সে একটা ডিপার্টমেন্টের বড়বাবু, জুলফিদার-কন্যা ইন্দুমতীর স্বামী।

করালীচরণের সেদিনকার অপমানটা তাহার গায়ে লাগিয়াছিল। উইলটা কিন্তু উদ্ধার করিতে হইবে যেমন করিয়াই হোক। শঙ্করকে অন্তত খবরটা দেওয়া দরকার। ইন্দুর জন্য এক বাক্স ওভালটিন-বিস্কুটও কিনিয়া আনা দরকার। ভণ্টু বাইকে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল।

শঙ্করের বাড়ির দরজায় নামিয়া ভণ্টু খানিকক্ষণ বাইকের ঘণ্টা বাজাইল। শুধু ভণ্টু নয়, অনেকেরই ধারণা, বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া বাইকের ঘণ্টা বা মোটরের হর্ন বাজাইলেই বাড়ির ভিতর হইতে লোকজন ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিবে; ডাকিবার প্রয়োজন নাই। অনেকে বাহির হইয়া আসেও। শঙ্কর আসিল না, কারণ শঙ্কর বাড়িতে ছিল না। ভণ্টুকে অবশেষে বাইকটি দেওয়ালে ঠেসাইয়া বারান্দার ওপর উঠিয়া কড়া নাড়িতে হইল। অমিয়া দ্বিতল হইতে জানালা ফাঁক করিয়া দেখিল এবং নিত্যানন্দকে মৃদুকণ্ঠে বলিল, ভণ্টুবাবু এসেছেন।

নিত্যানন্দ কয়েকদিন হইতে শঙ্করের বাসায় আসিয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর ছবির বাসা হইতে ফেরে নাই।

দাদা বাড়ি নেই।—নিত্যানন্দই গলা বাড়াইয়া বলিল।

কোথা গেছে, কখন ফিরবে?

ঠিক জানি না। যদি কিছু বলবার থাকে, বলে যান।

সে অপরকে বললে চলবে না, তাকেই বলতে হবে। আচ্ছা, আমি পরে আসব।

ভণ্টু চলিয়া গেল।

নিত্যানন্দ অমিয়াকে বলিল, কি যে একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে দাদা সময় নষ্ট করছেন! ক্রমাগত লোক এসে ফিরে যাচ্ছে।

অমিয়া শুধু একটু হাসিল।

কিছু ভালো লাগছে না, একটু চা কর দিকি বউদি।

করি।

ওভালটিন-বিস্কুট কিনিয়া ভণ্টুর মনে হইল, ঝামাপুকুরটা একবার ঘুরিয়া গেলে হয়। ভিতরে না ঢুকিলেই হইল, বাহির হইতে চাম্‌লদের হালচালটা দেখিয়া যাইতে ক্ষতি কি? করালীচরণের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া কিন্তু ভণ্টুকে বাইক হইতে নামিতে হইল—বাড়িতে তালা বন্ধ. সম্মুখে 'টু লেট' ঝুলিতেছে। মোড়ের পানের দোকানটা খোলা আছে বটে, কিন্তু সেখানে পানউলী নাই—ছোকরা-গোছের আর একজন বসিয়া পান বেচিতেছে। তাহারই নিকট ভণ্টু সংবাদ পাইল, দোকানটা পানউলীর নিজস্ব ছিল না, অপরের দোকানে সে চাকরি করিত। কিছুদিন পূর্বে অসুখ হওয়াতে দোকানের মালিক তাহাকে ছাড়াইয়া দেয়। তখন পানউলী করালীচরণের বাসাতেই আশ্রয় লইয়াছিল। করালীচরণ যেদিন আসিয়া পৌঁছিলেন, সেই দিনই তাহার মৃত্যু হয়। করালীচরণ-প্রসঙ্গে ছোকরাটি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

অমন লোক হয় না বাবু, বুঝলেন, কি ধূমধাম করে ছাদ্দটা করলে পানউলীর! লোকজন কাঙাল গরিব কত যে খাওয়ালে! পানউলী মরে যাওয়াতে হাউহাউ করে সে কি কান্না মশাই, যেন আপনার লোক মরেছে কেউ, নিজে কাঁধে করে নিয়ে গেল,— লোক ছিল বটে!

তাহার নিকটই ভণ্টু শুনিল, করালীচরণ বাড়ি বিক্রয় করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন, কেহ জানে না।

।। পঁচিশ ।।

ছবির শ্বাস উঠিয়াছে। পাশের ঘরে তাহার স্ত্রী কাদম্বিনীও অচৈতন্য হইয়া রহিয়াছে। ছবির শিয়রে শঙ্কর জাগিয়া বসিয়া আছে, কাদম্বিনীর কাছে আছেন তাঁহার বৃদ্ধ পিতা হরিনাথবাবু। ছেলে-মেয়েদের অন্য একটি বাসায় সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ছবির শ্বশুর হরিনাথবাবু কলিকাতার বাহিরে থাকেন, ইহাদের অসুখের সংবাদ শুনিয়া সপরিবারে আসিয়া অন্য একটি বাসায় উঠিয়াছেন। ছবির ছেলেমেয়েরা সেই বাসায় গিয়াছে। হরিনাথবাবু ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। আবক্ষ পাকা দাড়ি, কম কথা বলেন, উচিত কথা বলেন এবং যেটুকু বলেন বেশ গুছাইয়া বলেন। তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস হয় না। হোমিওপ্যাথিতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, সুতরাং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চলিতেছে। শঙ্করের বার বার মনে হইতেছিল যে, বোধ হয় দারিদ্র্যের জন্যই হরিনাথবাবু অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা বন্ধ করিয়া দিলেন—সে নিজে প্রয়োজন হইলে টাকা দিতে প্রস্তুতও ছিল—কিন্তু স্পল্পভাষ এবং মুখভাবে একটা নিষ্ঠার দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ করিয়া শঙ্কর জোর করিয়া কিছু বলিতে পারে নাই। তাঁহার মতেই মত দিতে হইয়াছে। হরিনাথবাবুই ছবির আপন লোক, শঙ্কর ছবির কে? শঙ্কর এ কয়দিন বাড়ি যায় নাই, দিবারাত্রি কেবল ছবিকে লইয়াই আছে। তাহার কেমন যেন ধারণা হইয়া গিয়াছে, এ বিপদে ছবিকে ফেলিয়া যাওয়া বিশ্বাসঘাতকতা হইবে। ছবির যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, শঙ্করের ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিল। তাহার শ্বশুর আসিয়াছে, এই অজুহাতে অজ্ঞান অবস্থায় এখন তাই তাহাকে ফেলিয়া যাইতে পারিল না। বিনা বেতনে এমন একজন সহৃদয় একনিষ্ঠ নার্স পাইয়া হরিনাথবাবুও অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্ম হরিনাথবাবুর সহিত ব্রাহ্ম নিলয়কুমারের ধর্মগত যোগাযোগ থাকাতে আপিসের ছুটিও সহজেই মিলিয়াছিল।

গভীর নিস্তব্ধ রাত্রি। মুমূর্ষু ছবির শিয়রে একা বসিয়া শঙ্কর ছবির কথাই ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল, ছবির সহিত তাহার পরিচয় কতটুকু? তাহার পূর্বজীবনের কতটুকু সে জানে, উত্তর-জীবনের কতটুকুই বা জানিবে? ছবির সাহিত্যপ্রীতি আছে, তাহারও আছে। পরিচয়ের সূত্র মাত্র এইটুকু। মনে পড়িল, ছবির সহিত তাহার দেখাও খুব যে ঘন ঘন হইত তাহা নহে, কচিৎ কখনও হইত। মাঝে মাঝে আসিয়া সে টাকা ধার চাহিত, হয়তো বা কখনও কোনো দিন মদ খাইয়া ঈষৎ মত্ত অবস্থায় আসিত, শেলি কিট্‌স ব্রাউনিং রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করিতে করিতে উত্তেজনার আবেগে টেবিল চেয়ার উল্টাইয়া হাসিয়া কাঁদিয়া অস্থির করিয়া তুলিত, কখনও বা নিজের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিয়া সংসারের নিত্য-উদীয়মান অভাবের তালিকা দেখাইয়া পরামর্শ চাহিত এবং পরমুহূর্তেই আবার নিম্নকণ্ঠে জানাইত যে, রামবাগানে একটি মেয়ের গান শুনিয়া সে তাহার প্রেমে পড়িয়াছে—মাইরি বলছি, অন্য কোনো কারণে নয়, কেবল গানের জন্যে। তাহার মনের শিল্পবোধ ছিল, সৌন্দর্যের প্রতি পিপাসা ছিল এবং সেইজন্যই বোধ হয় তাহাকে এত ভালো লাগিত! শুধু তাই কি? সুখদুঃখ-নিষ্পিষ্ট মানুষটাকেও কি কম ভালো লাগিত! ছবির অতীত জীবনের যে ঘটনাগুলির খবর শঙ্কর জানিত, ছায়াছবির মত সেগুলি তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। খামখেয়ালী দুশ্চরিত্র মাতালটার এইবার শ্বাস উঠিয়াছে। আর কিছুক্ষণ পরেই সব শেষ হইয়া যাইবে।

লোকটা সাহিত্যিক ছিল! পরাধীন দেশের শৌখিন সাহিত্যিক! কবিতা আওড়াইত, মদ খাইত, প্রেমে পড়িত! আস্পর্ধা কম নয়!

সহসা শঙ্করের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। এ কি অকালমৃত্যু! প্রতিভার এ কি শোচনীয় অপচয়! এই ছবি কি না হইতে পারিত!...শ্বাস উঠিয়াছে। কি কষ্ট, কি নিদারুণ কষ্ট! শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য সমস্ত পেশীগুলি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, চতুর্দিকে বাতাসের অভাব নাই, কিন্তু তাহার ব্যায়ত আনন, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, নীল ওষ্ঠাধর, ঘর্মাক্ত কলেবর, আর্ত ম্লানায়মান দৃষ্টি যেন সমস্বরে বলিতেছে—পাইলাম না, পাইলাম না, আকাশভরা এত বাতাস, আমি কিন্তু এতটুকু পাইলাম না।

কপাট ঠেলিয়া পাশের ঘর হইতে হরিনাথবাবু আসিলেন, আসিয়া সন্তর্পণে কপাটটি আবার বন্ধ করিয়া দিলেন।

কি রকম বুঝছেন?

যাহা বুঝিতেছিল, তাহা কি ব্যক্ত করা যায়? শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। হরিনাথবাবু ক্ষণকাল ছবির মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। ক্ষণপরে যখন তিনি প্রবেশ করিলেন, শঙ্কর সবিস্ময়ে দেখিল, তাঁহার হাতে পিতলের তৈয়ারী প্রকাণ্ড ভারী 'ওঁ'।

ওটা কি হবে?

ওটা ওর বুকের ওপর রেখে দেব। আমরা আর কি করতে পারি বলুন—সবই তাঁর ইচ্ছা।

একে বেচারার এই শ্বাসকষ্ট, তাহার উপর বুকে এই ভারি জিনিসটা চাপাইয়া দিতে হইবে! কিন্তু সে বাধা দিতে পারিল না, বরং তাড়াতাড়ি বুকের চাদরটা সরাইয়া দিল। হরিনাথবাবু বুকের উপর পিতলনির্মিত 'ওঁ'টি স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন এবং বাহির হইতে সন্তর্পণে কপাটটি ভেজাইয়া দিলেন।

।। ছাব্বিশ ।।

নিপু আসিয়াছিল। কয়েকদিন পূর্বে আসিয়া সে শঙ্করকে স্বরচিত একখানি উপন্যাস দিয়া গিয়াছিল। সেই প্রসঙ্গেই কথা হইতেছিল। নিপুই বক্তা।

নিপু বলিতেছিল, আমি চাই না যে, তুমি আমার লেখাটার প্রশংসা কর। প্রশংসা পেতে ইচ্ছে করলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাই আমি পেতে পারতাম। গবু সেবার যখন শান্তিনিকেতনে গিয়েছিল, তখন সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল লেখাটা, অবশ্য আমার অজ্ঞাতসারে—

গবু কে?

গবুকে চেন না! ওরাই তো কামিং লাইট। 'মজদুর-দর্পণ' বলে একখানা কাগজও করেছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম—রবিবার এর গোড়ার দিকটা শুনেছিলেন, ভালোই বলেছিলেন শুনলাম। ইচ্ছে করলে তাঁর প্রশংসা পেতে পারতাম, কিন্তু ওসবে রুচি নেই আমার। তোমাকেও প্রশংসার জন্যে দিইনি, আমি এটা তোমাকে দিয়েছি নতুন যুগের নতুন সাহিত্যের নমুনা

হিসেবে। আমি উপন্যাসে দেখাতে চেয়েছি, নতুন যুগের নতুন সাহিত্যের রূপ কি—মানে, নবতম রূপ কি—হয়তো হঠাৎ বেখাপ্পা বেসুরো মনে হবে তোমার—আমি জিনিসটা দেখাতে পেরেছি কি না, তাও জানি না। ভালো করে পড়ে তবে সমালোচনা কর। মাঝখানটা একটু হয়তো জটিল বলে মনে হবে—মার্কসিজম সোজা জিনিস নয়। কত দূর পড়েছ?

সবটা পড়িনি এখনও।

শঙ্কর মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিল।

না না, তাড়াতাড়ি পড়বার দরকার নেই। আমি এত তাড়াতাড়ি ছাপাতামও না—বঙ্গদেশের সাহিত্য সমাজে স্থান পাওয়ার লোভ আমার মোটেই নেই। কিন্তু ঘটনাচক্রে স্থান হয়ে গেল দেখছি। বিশ্বেশ্বরবাবুকে পড়তে দিয়েছিলাম, তাঁর প্রেস আছে, তিনি এরকম জোর করেই ছাপিয়ে ফেললেন। ছাপার ভুলও বিস্তর থেকে গেছে—এ দেশের যেমন পাঠকসমাজ, তেমনই ছাপাখানা—

ঠোঁট বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া তিক্ত হাসি হাসিতে হাসিতে নিপুর কথা বলার একটা বিশেষ ধরন আছে। কথা শোনারও বৈশিষ্ট্য আছে তাহার। অপরে যখন কথা বলে, তখন সে মুখে একটা হাসি ফুটাইয়া অন্য দিকে চাহিয়া থাকে, বক্তার দিকে নয়। শঙ্কর একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। নিপুর চোখের দৃষ্টিতে খ্যাতি-লোলুপতা এবং তাহা গোপন করিবার ব্যর্থ প্রয়াস। গায়ে আধময়লা টুইলের শার্ট, পায়ে বার্নিশহীন গ্রিসিয়ান স্লিপার, মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, মুখময় ব্রণ ও মুখভাবে বুভুক্ষার চিহ্ন। বেরসিক অশিক্ষিত জনতার প্রতি অসীম অবজ্ঞার ভান, অথচ বই ছাপাইয়া তাহাদেরই দ্বারস্থ হইবার আকুল আগ্রহ! দ্বারস্থ হইয়াও নিজের স্পর্ধিত গর্বটাকে আস্ফালন করিবার হাস্যকর আড়ম্বর! সবই মানাইয়া যাইত, যদি প্রতিভা থাকিত। কিন্তু হায় হায়, সেই বস্তুটিরই একান্ত অভাব। তাই কেবল নানা কৌশলে, নানা ছুতায়, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সর্বত্র হুল ফুটাইয়া, কালি ছিটাইয়া, সকলকে ক্ষতবিক্ষত বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া পরোক্ষে-অপরোক্ষে নিজের নকল নূতনত্বের ঢাকটা পিটাইবার এই অদম্য অভিযান! কিন্তু ঢাকটাও ফাটা, বীভৎস বিকট আওয়াজ বাহির হইতেছে। সুর যে জমিতেছে না তাহা ইহারা জানে, তাই ইহাদের বুলি—আমরা বেসুরের সাধক, আমরা বিদ্রোহী, আমরা উল্টা কথা বলি, আমাদের এই নূতন ঢঙের অভিনব মর্যাদা, পুরাতনপন্থী তোমরা বুঝিবে না। কিন্তু ইহা যে ইহাদের আসর-জমানো মৌখিক বুলিমাত্র, মনের কথা নয়, তাহার প্রমাণ ইহারা বই লিখিয়া সর্বাগ্রে সেটি পুরাতন-পন্থীদেরই হাতে তুলিয়া দেয় এবং তাহাদের প্রশংসাবাক্য শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকে।

এ শ্রেণীর অনেক লেখকের সংস্পর্শে শঙ্করকে আসিতে হইয়াছে, কিন্তু 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার সমঝদার হিরণদার বন্ধু নিপুদাও যে এই দলের, তাহা শঙ্কর জানিত না, কল্পনাও করে নাই। নিপুদার সাহিত্যিক বুদ্ধির প্রতি তাহার আস্থা ছিল। তাহার ধারণা ছিল, নিপুদা গোপনে গোপনে একটা বিরাট কিছুর সাধনা করিতেছেন। অন্ধকারে তাঁহার তপস্যা চলিতেছে। বাংলা ভাষার ইতিহাস অথবা অভিধান অথবা ওই জাতীয় কিছু একটা সুসম্পন্ন করিয়া তিনি একদিন তাক লাগাইয়া দিবেন! নিপুদা যে শেষে এই কমিউনিস্টিক কসরত দেখাইবেন তাহা শঙ্কর প্রত্যাশা করে নাই। কমিউনিজম লইয়া প্রবন্ধ সহ্য হয়, কাল্পনিক কাব্যও হয়তো চলিতে পারে,

কিন্তু রাশিয়ার সামাজিক ব্যবস্থাকে ভারতবর্ষের, বিশেষত বঙ্গদেশের বাস্তবজীবনে মনে করিয়া উপন্যাস অসহ্য। যেন কতকগুলি বল্‌শেভিক মতবাদ মনুষ্য-মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তর্কবিতর্ক করিতেছে এবং অবশেষে মার্কস-লেনিনের জয়গান করিয়া ক্যাপিটালিজ্‌মকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতেছে। নিপুদার উপন্যাসে মহারাজা মেথর সব সমান। মন্দির মসজিদ কিছু নাই, চতুর্দিকে কেবল জনগণ-পরিচালিত অসংখ্য ফ্যাক্টরি। সিনেমা এবং লাউডস্পিকারে এন্তার শিক্ষা বিতরণ চলিতেছে। লাঙলের বদলে ট্রাক্টার, ধর্মের বদলে কর্ম, বিবাহের বদলে প্রেম এবং সন্তান। বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে বিংশ শতাব্দীর রামহীন রামরাজত্ব শুরু হইয়া গিয়াছে! যে আদর্শ নিপুদা খাড়া করিয়াছেন, তাহা নিন্দনীয় নয়, কারণ সে আদর্শ মার্কস-লেনিনের প্রতিভায় প্রদীপ্ত। নিপুদার তাহাতে কোনোও কৃতিত্ব নাই। নিপুদার যাহা নিজস্ব কৃতিত্ব—এই জগদ্দল উপন্যাসখানি—তাহা একেবারে রাবিশ। তাহার একটি চরিত্র জীবন্ত নয়, তাহাতে এতটুকু কবিত্ব নাই, জীবনদর্শন নাই, কল্পনার প্রসার নাই। আছে কেবল বল্‌শেভিজম।

সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ব্যাপার, শঙ্করকে ইহার প্রশংসা করিতে হইবে। যে 'ক্ষত্রিয়' কাগজের আদর্শ ছিল অ-সাহিত্যকে তাড়না করা, সেই 'ক্ষত্রিয়' কাগজেরই পৃষ্ঠায় ইহার প্রশংসা করিতে হইবে। উপায় নাই। হিরণদার বন্ধু নিপুদা। তাহার সম্বন্ধে সত্য কথা বলা চলিবে না। বলিলেও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে হইবে। তিক্ত সত্যটাকে প্রশংসার মিষ্ট প্রলেপে ঢাকিয়া দিতে হইবে।

।। সাতাশ ।।

নীরা বসাক ও তাহার বান্ধবী কুন্তলা মুখোপাধ্যায় হাস্যপরিহাস সহকারে যে আলাপে ব্যাপৃত ছিল, তাহাকে ঠিক সাহিত্যালাপ বলা যায় না, যদিও আলাপের মূল বিষয় একজন উদীয়মান সাহিত্যিক—শঙ্করসেবক রায়।

নীরার মুখ হাস্যোদ্ভাসিত, কুন্তলা গম্ভীর।

সেদিন সামান্য একটু প্রশংসা করা মাত্র লোকটা এমন গদগদ হয়ে পড়ল যে, মনে হল, সার্টিফিকেট কেন, লোকটাকে দিয়ে ঘানি পর্যন্ত টানিয়ে নেওয়া যায়। তার ওই ট্র্যাশ বইখানার এমন বাগিয়ে প্রশংসা করেছিলাম আমি যে, আমার নিজেরই তাক লেগে গিয়েছিল।

সার্টিফিকেট জোগাড় করেছিস?

প্রথম দিনেই কি সার্টিফিকেট চাওয়া যায়? জমিটা তৈরি করে রেখেছি, এইবার বীজ ছড়ালেই গাছ গজাবে।

নীরা বসাকের চোখ মুখ পুনরায় হাস্য-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কুন্তলা বলিল, আমার কিন্তু লোকটাকে অত বোকা বলে মনে হয় না। তা ছাড়া এও আমার মনে হয় না যে, সত্যি সত্যি তুমি ওর লেখাকে ট্র্যাশ বলে মনে কর।

কি তোমার মনে হয় শুনি?

আমার মনে হয়, শঙ্করবাবুর লেখা সত্যি সত্যি তোমার খুব ভালো লাগে, কিন্তু যেহেতু আমার ভালো লাগে না এবং যেহেতু কুমার পলাশকান্তি আমার সম্বন্ধে সম্প্রতি কিঞ্চিৎ

দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন, সেই হেতু তুমি আমার মন রেখে বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথাগুলো বলছ।

নীরা বসাকের সমস্ত মুখ ক্ষণিকের জন্য বিবর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে নিজেকে সামলাইয়া বিস্ময়ের সুরে বলিল, আচ্ছা, কি তুই কুন্ত!

কুন্তলার গাম্ভীর্য এতটুকু বিচলিত হইল না। সে বাতায়ন-পথে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একফালি রোদ বাঁ গালে পড়িয়া তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রীকে সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছে--টানা-টানা চোখ দুইটি যেন আবেশবিহ্বল হইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। এই অপরূপ সৌন্দর্যের পানে চাহিয়া নীরা বসাকের সমস্ত অন্তঃকরণ সহসা যেন বিষাইয়া উঠিল। এ মেয়েটার সহিত কিছুতেই পারা গেল না। স্কুলে কলেজে এতদিন একসঙ্গে কাটিল, কিছুতেই কোনোও বিষয়ে ইহাকে আঁটিয়া উঠা গেল না। কুন্তলা যদি অহঙ্কারী হইত, তাহা হইলে সেই ছুতায় ইহার সহিত মনোমালিন্য করা চলিত। কিন্তু সে মোটেই অহঙ্কারী নয়। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বংশগরিমায়—সর্ববিষয়ে সে অনেক বড় অথচ তাহার নীচতা নাই, আত্মম্ভরিতা নাই, আস্ফালন নাই। আর নীরা বসাক? তাহার রূপ নাই, গুণ নাই অর্থও নাই। অর্থাভাবেই তাহার এম. এ. পড়াটা হইল না, অথচ কুন্তলা স্বচ্ছন্দে এম. এ. পড়িতেছে। কুন্তলার প্রেমের জন্য কুমার পলাশকান্তির মত লোক উন্মুখ, আর সে অনিল সান্যালকেও ভুলাইতে পারিতেছে না। তাহার সমস্ত চিত্ত বিরূপ হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি চললাম। কুমার পলাশকান্তিকে তোমার কিছু বলবার দরকার নেই।

আমি বলেছি। কিন্তু আমার বলায় তোমার অনিলবাবুর চাকরি হবে না।

এই কথা শুনিবামাত্র নীরা বসাকের মনের মেঘ কাটিয়া যেন আলো ঝলমল করিয়া উঠিল। সে আবার বসিয়া পড়িল।

তুই বলেছিস! হবে না কি করে বুঝলি?

কুমার পলাশকান্তিকে আমি বিদেয় করে দিয়েছি—ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে 'রিফিউজ' করেছি।

নীরা যেন নিজের কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। কুমার পলাশকান্তিকে কুন্তলা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, যে পলাশকান্তিকে গাঁথিবার জন্য শত শত সভ্য-ছিপ সর্বদা সমুদ্যত, যাহার করুণাকণা লাভ করিবার জন্য, যাহার দামি মোটরে একবার চড়িবার জন্য অভিজাতবংশীয় যুবতী কন্যারা লালায়িত, তাহাকে কুন্তলা বিদায় করিয়া দিয়াছে।

সবিস্ময়ে সে প্রশ্ন করিল, কেন, কি হল হঠাৎ?

হবে আবার কি! তুই কি আশা করেছিলি, আমি ওকে বিয়ে করব?

করেছিলুম বইকি।

করেছিলি? আমার সম্বন্ধে তোর ধারণা এত হীন, তা জানা ছিল না।

কেন, বিয়ে করতে আপত্তিটা কি?

আমি অভিজাত ব্রাহ্মণ-বংশের মেয়ে, হস্টেলে থেকে না হয় এম. এ. পড়ছি, পাঁচজনের সঙ্গে মিশছি, হেসে কথা কইছি—তা বলে যাকে-তাকে বিয়ে করব!

কুমার পলাশকান্তি যে-সে লোক নয়।

ও তো একটা বেনে। ওর স্পর্ধা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি আমি। টাকা ছাড়া আর কি আছে ওর? সে টাকাও আবার স্বোপার্জিত নয়।

তুই কাকে বিয়ে করবি তা হলে?

আমার বাবা মা পছন্দ করে যাঁর হাতে আমাকে সম্প্রদান করবেন, তাঁকে। তাঁরা অভিজাতবংশীয় ব্রাহ্মণকেই পছন্দ করবেন আশা করি।

ও বাবা, এত লেখাপড়া শিখেও তোর এখনও এত জাতবিচার আছে, তা তো জানতাম না!

জাত যখন আছে তখন তা মানতেই হয়। সোনার পাত দিয়ে মোড়া থাকলেও বাবলাগাছকে আমগাছের মর্যাদা দিতে পারি না।

সেকালে কুলীনরা একশো, দুশো বিয়ে করত শুনেছি, তোর বাবা যদি সে রকম কোনো এক কুলীনকে পছন্দ করেন, বিয়ে করবি তুই?

নীরার দৃষ্টি সকৌতুকে নাচিতে লাগিল।

কুন্তলা গম্ভীরভাবেই উত্তর দিল।

সে রকম কুলীন আজকাল দুষ্প্রাপ্য। তর্কের খাতিরে যদি ধরাই যায় যে, সে রকম কোনো কুলীনের হাতে বাবা আমাকে সম্প্রদান করবেন ঠিক করেছেন, তা হলেও আমি আপত্তি করব না। বিবাহ সামাজিক ধর্ম, ওতে নিজের মত চালাতে যাওয়া অন্যায়।

ওরকম স্বামীকে ভক্তি করতে পারবি?

ভক্তি করতে পারা না-পারা নিজের ক্ষমতা-অক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। পাথরের নুড়ি, কদাকার বিগ্রহ—এসবকেও তো লোকে ভক্তি করতে পারছে।

নীরা বুঝিল, তর্ক করা বৃথা। কুন্তলাকে সে তর্কে হারাইতে পারিবে না। তাহাকে সে কোনোদিন বুঝিতে পারে নাই, আজও পারিল না।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কুন্তলা বলিল, এক স্বামীর এক স্ত্রী হওয়া আজকালকার রেওয়াজ, কিন্তু আমার মনে হয় ওটা দারিদ্র্যের চিহ্ন। সত্যি সত্যি যদি কোনো পুরুষ একাধিক স্ত্রীর ভরণ-পোষণ মনোরঞ্জন করতে পারে, তা হলে মানতেই হবে সে শুধু পুরুষ নয়, পুরুষ-প্রবর। সে শ্রদ্ধেয়, হেয় নয়। একটি মাত্র স্ত্রী নিয়ে ন্যাতাজোবড়া হয়ে যারা প্রতিপদে হিমশিম খেতে খেতে নাকে কেঁদে মরে, তারা অসমর্থ পুরুষের দল, ওই একটিমাত্র স্ত্রীকেও তারা সম্পূর্ণ মর্যাদা দিতে পারে না—তারা অক্ষম, তারা কৃপার পাত্র।

আগেকার ওই কুলীনরা কি তা হলে—

আগেকার কুলীনেরা কি ছিলেন, তর্কের বিষয় তা নয়। যে পুরুষ একাধিক বিয়ে করে, সে হেয়, না শ্রদ্ধেয়—তাই নিয়েই কথা হচ্ছিল।

মুসলমানদের হারেম তোর মতে তা হলে ভালো?

সভ্যসমাজে আজকাল যা হচ্ছে তার চেয়ে ঢের ভালো। আজকালকার সভ্যসমাজের মেয়েরা সেজে-গুজে রূপ-যৌবন দুলিয়ে হাটে-বাজারে সস্তা পণ্যসামগ্রীর মত নিজেদের যাচিয়ে বেড়াচ্ছেন। কাক, কোকিল, ময়না, শালিক সবাই একবার করে ঠুকরে যাচ্ছে। বাদশার হারেমে, আর যাই থাক, এ দুর্দশা নেই। সেখানে একশো থাক্, দুশো থাক্, প্রত্যেকেই বেগম,

প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে, প্রত্যেকের কাছেই বাদশা আসেন—হয়তো বছরে একবার, কিন্তু সেই একবারের মহিমাই এত যথেষ্ট যে তার স্বপ্নে বাকি বছরটা কাটিয়ে দেওয়া যায়। একাধিকবারও তুমি বাদশাকে আকর্ষণ করতে পার, যদি তোমার নিজের গুণ থাকে। সত্যিকার গুণের কদর হারেমে বাদশার কাছেই হয়। বাদশা বুভুক্ষু দরিদ্র নয়, যা পাবে, নির্বিচারে হ্যাংলার মত গিলে ফেলবে। বাদশা সমঝদার, সূক্ষ্ম রসের রসিক, তার কাছে ফাঁকি চলে না, মেকি চলে না—

বাবা বাবা! থাম্, এত বাজে বকতেও পারিস!

নীরা হাসিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু তাহার একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িল। সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইল।

সত্যি চললি নাকি?

হ্যাঁ।

অনিল সান্ডেলকে এত ভালো লেগেছে যে, বিয়ে না করলে আর চলছে না? ও যে তোর চেয়ে ছোট।

বিয়ে করব কে বললে! কুমার পলাশকান্তি যদি ওকে প্রাইভেট সেক্রেটারি করে নেন, তা হলে—মানে, মিসেস স্যানিয়েল বড় কষ্টে পড়েছেন আজকাল—তা ছাড়াও—

বুঝেছি।

কুন্তলার গম্ভীর মুখে হাসির আভাস ফুটিয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া নীরা বসাক ছেলেমানুষের মত কিল তুলিয়া বলিল, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। তাহার পর কণ্ঠস্বরে যতোটা আন্তরিকতা ফোটানো সম্ভব, তাহা ফুটাইয়া বলিল, পাগল নাকি, আমি বিয়ে করব ওই অনিলটাকে, কি যে ভাবিস তোরা আমাকে!

কুন্তলা কিছু বলিল না, শুধু একটু হাসিল।

বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা?

হচ্ছে।

আমি যাই তা হলে। শঙ্করবাবুর কাছে যেতে হবে একবার।

সত্যই যে কুন্তলার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে এমনই একটা মুখভাব করিয়া নীরা বাহির হইয়া গেল। সে নিজে জানে যে, অনিল সান্যালের একটা চাকরি যদি সত্যই জুটিয়া যায়, তাহা হইলে অনিল তাহাকে বিবাহ করিবে। বেকার অবস্থায় মায়ের আদেশের বিরুদ্ধে যাইবার সাহস তাহার নাই। নীরাকে সে ভালোবাসিয়াছে, নীরাকে সে বিবাহ করিবে, কিন্তু তৎপূর্বে একটা চাকরি পাওয়া দরকার। কিন্তু আই. এ. ফেল অনিলের কিছুতেই চাকরি জুটিতেছে না। কুমার পলাশকান্তি মাসিক একশত টাকা বেতনে একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি রাখিবার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। নীরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, এই চাকরিটা অনিলের যাতে হয়। শঙ্করের সার্টিফিকেট এবং কুন্তলার সুপারিশ কুমার পলাশকান্তির নিকট মূল্যবান, তাই বেচারা এত ছুটাছুটি করিতেছে। সে নিজেও বেকার। ইচ্ছা করিলে একটা শিক্ষয়িত্রীর চাকরি অবশ্য সে জোগাড় করিতে পারে, কিন্তু সেরূপ ইচ্ছাই তাহার হয় না। সে সংসারী হইতে চায় নীড় বাঁধিতে চায়। চাকরি করিবার প্রবৃত্তিই তাহার নাই। ভগবান তাহার রূপ দেন নাই, যৌবনও

বিগতপ্রায়। পাত্র খুঁজিয়া তাহার বিবাহ দিবে এমন কোনো অভিভাবকও তাহার নাই। তাহাকে নিজেই খুঁজিয়া লইতে হইবে। সে অনেক খুঁজিয়াছে, অনেক ছলনা, অনেক অভিনয় করিয়াছে—কেহই তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হয় নাই, এক এই অনিল ছাড়া। কিন্তু তাহার প্রতিজ্ঞা—চাকরি না জুটিলে কিছুতেই বিবাহ করিবে না। নীরা, যেমন করিয়া হোক, তাহার চাকরি জুটাইয়া দিবে। অনিলকে সে কিছুতেই হাতছাড়া করিবে না। বিবাহ হইয়া গেলে লোকে যদি নিন্দা করে করুক, কুন্তলা যদি টিটকারি দেয় দিক, সে গ্রাহ্য করিবে না। এখন কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে লজ্জা করে, কুন্তলার কাছেও লজ্জা করে। আহা, অনিলের চাকরিটা যদি হইয়া যায়! নীরার সমস্ত দেহমন যে পিপাসায় হাহাকার করিতেছে, কুন্তলা তাহার কতটুকু বোঝে!

নীরা দ্রুতবেগে পথ চলিতে লাগিল।

।। আটাশ ।।

সকাল হইতে শুরু হইয়াছে। বেলা বারোটা বাজিয়া গেল, আর কত বাকি আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিবারও উপায় নাই। করিলেই লোকনাথ ঘোষালের আত্মসম্মান আহত হইবে। আহতপুচ্ছ গোক্ষুরকে বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু আহত-সম্মান লোকনাথকে সহ্য করা কঠিন। তাহা ছাড়া ভালোও লাগিতেছে, তাই শঙ্কর নিবিষ্টচিত্তেই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি শ্রবণ করিতেছে। সুদীর্ঘ হইলেও প্রবন্ধটি সুচিন্তিত এবং সুলিখিত। অমিয়ার কথা স্মরণ করিয়া এবং নিজের নানাবিধ কাজের কথা ভাবিয়া সে মাঝে মাঝে একটু অস্বস্তি বোধ করিলেও অবহিত মুগ্ধ চিত্তেই সে প্রবন্ধটি শুনিতেছে এবং ভাবিতেছে, এই সুপণ্ডিত ও সুরসিক ব্যক্তিটিকে কেহ চিনিল না কেন? 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় শঙ্কর ইহার মূল্যবান প্রবন্ধ আজকাল বাহির করিতেছে, কিন্তু পাঠকসমাজে তেমন কোনো সাড়া পড়ে নাই তো! দুই-চারিজন বিদগ্ধ ব্যক্তি প্রশংসা করিয়াছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকাই লোকনাথ ঘোষালের নাম দেখিলেই পাতা উল্টাইয়া যায়। অথচ...দ্বার ঠেলিয়া একজন যুবক আসিয়া প্রবেশ করিল। যুবককে দেখিয়া শঙ্কর একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। লোকনাথবাবুর সম্মুখে ভদ্রলোক না আসিলেই যেন ভালো হইত। কিন্তু আর উপায় নাই। স্মিতমুখে আহ্বান করিতে হইল। যুবক প্রশ্ন করিল, আপনি যাচ্ছেন তো তা হলে?

আপনাদের সভা কবে?

আগামী মঙ্গলবার।

সেদিন আমার ছুটি নেই।

কবে যেতে পারবেন বলুন, সেই রকমই ব্যবস্থা করব আমরা।

রবিবারের আগে আমার অবসর নেই।

বেশ, তাই হবে। রবিবারেই একেবারে 'কার' নিয়ে আসব তা হলে। সভা পাঁচটায় হবে, বারোটা নাগাদ আসব, এতদূর যেতেও তো হবে।

বেশ, তাই আসবেন।

নমস্কারান্তে যুবক চলিয়া গেল।

লোকনাথবাবু প্রশ্ন করিলেন, কিসের সভা?

কোন্নগরে একটা সাহিত্য সভা হবে, তাতেই আমাকে সভাপতি করতে চান ওঁরা।

ও।

লোকনাথ ঘোষালের মুখে কিসের যেন একটা ছায়া সহসা ঘনাইয়া আসিল। অনেকক্ষণ তিনি কোনো কথাই বলিলেন না। তাহার পর হঠাৎ বলিলেন, আজ উঠি। এটুকু আর একদিন হবে, বেলা অনেক হয়েছে আজ।

উঠিয়া পড়িলেন এবং অধিক বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার পক্ষে আর বসিয়া থাকা সম্ভবপর ছিল না। তাঁহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে কি যেন একটা মোচড় দিয়া উঠিতেছিল। জীবনে সাহিত্য ছাড়া তিনি আর কিছুই চাহেন নাই। ইহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র আকর্ষণ। ইহার জন্য সংসার সমাজ পাপ পুণ্য পরলোক আত্মা—এমনকি ভগবান পর্যন্ত তিনি তুচ্ছ করিয়াছেন, সাহিত্য ছাড়া আর কোনও কিছুতে তাঁহার আস্থা নাই, আর কোনো বিষয়ে তিনি আনন্দ পান না। এই সাহিত্যের মধ্যেই তিনি জীবন রহস্যের যে লীলাময় দেবতাকে, রসমূর্ত যে সচ্চিদানন্দকে উপলব্ধি করিয়াছেন, আজীবন বাণীসাধনায় আত্মহারা হইয়া তাহারই মহিমা কীর্তন তিনি করিতেছেন। কিন্তু কই, তাঁহার কথা তো কেহ শুনিল না। কোনো সাহিত্যসভা হইতে তাঁহার আহ্বান আসিল না তো! নাবালক শঙ্করের কথা সকলে শুনিতে চায়, অথচ তাঁহাকে সকলে এড়াইয়া চলে—অধিকাংশ লোক চেনেই না। এই ছোকরা তো তাঁহাকে একটা নমস্কার পর্যন্ত করিল না! এই দেশে, এই সমাজে, আত্মীয়-স্বজন পরিত্যক্ত হইয়া কাহার জন্য, কিসের জন্য তিনি এই দুরূহ তপশ্চর্যা করিতেছেন? কেহই তো তাঁহার কথা শোনে না, জোর করিয়া শুনাইলেও শুনিতে চায় না। প্রবন্ধ পড়িতে পড়িতে শঙ্করের অস্বস্তি তিনি লক্ষ্য করিতেছিলেন। শঙ্করও স্থিরভাবে তাঁহার লেখা শুনিতে অপারগ! তবে এসব কেন—কেন—কেন?

দ্বিপ্রহর, প্রখর রৌদ্র মাথায় করিয়া লোকনাথ ঘোষাল কলিকাতার ফুটপাথ দিয়া চলিতে লাগিলেন। হাতে বিরাট প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি—চোখে বিদ্যুদ্দীপ্তি।

লোকনাথবাবুর আকস্মিক অন্তর্ধানে শঙ্কর একটু হাসিল। লোকনাথবাবুর ব্যথা যে কোথায়, তাহা তাহার অবিদিত নাই; কিন্তু সে ব্যথা দূর করা তাহার সাধ্যাতীত। কিছুক্ষণ শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হইতে লাগিল। আগে অনেকবার মনে হইয়াছে, আবার মনে হইল, যে নিষ্ঠা সহকারে সাহিত্যসেবা করা উচিত, সে নিষ্ঠা তাহার নাই—সে আদর্শভ্রষ্ট হইতেছে। মনে হইল, লোকনাথ ঘোষালই নিষ্ঠাবান সাহিত্যিক—সে পল্লবগ্রাহী সুবিধাবাদী ব্যবসাদার। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ মনে পড়িল, অমিয়া তাহার অপেক্ষায় এখনও অভুক্ত বসিয়া আছে। উঠিতে যাইবে, এমন সময় আর এক বাধা—নীরা বসাক আসিয়া প্রবেশ করিল। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, মাথার সামনের কেশবিরল অংশের অবিন্যস্ত চুলগুলি হাওয়ায় উড়িতেছে। মুখে হাসি ফুটাইয়া বলিল, আসতে পারি?

আসুন।

মুখমণ্ডলে শ্রদ্ধার আভাস বিচ্ছুরিত করিতে করিতে চেয়ার টানিয়া নীরা বসিল।

এ সময় হঠাৎ?

না এসে পারলাম না। এ মাসের 'সংস্কারে' 'অভ্যুদয়' কবিতাটির জন্যে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি।

বসুন।

কি চমৎকারই লিখেছেন! সত্যি, আপনিই আধুনিক যুগের যুগপ্রবর্তক কবি।

নীরা বসাকের চোখের দৃষ্টিতে ভক্তি শ্রদ্ধা যেন মূর্ত হইয়া উঠিল। শঙ্কর অমিয়ার কথা ভুলিয়া গেল। কণ্ঠস্বরে একটু আবদারের আমেজ মাখাইয়া নীরা আবার বলিল, কি করে আপনি এমন লেখেন বলুন না, অবাক লাগে, সত্যি!

শঙ্কর স্মিতমুখে বসিয়া রহিল—প্রতিবাদ বা সমর্থন কোনোটাই করা শোভন নয়।

নীরা 'অভ্যুদয়' কবিতার খানিকটা আবৃত্তি করিয়া সোচ্ছ্বাসে বলিল, এসব কি করে লিখেছেন আপনি! এ যে আগুন!

ওই ধরনের আর একটা কবিতা লিখেছি কাল।

একটু শুনতে পাই না?—সাগ্রহ মিনতি-ভরা কণ্ঠে নীরা অনুরোধ জানাইল।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

ড্রয়ার টানিয়া শঙ্কর কবিতাটি বাহির করিল এবং পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। সুদীর্ঘ কবিতা। শেষ হইয়া যাইবার পর নীরার মুখ দিয়া খানিকক্ষণ কোনো বাক্যস্ফূর্তি হইল না। ক্ষণকাল পরে মৃদুকণ্ঠে কেবল নিঃসৃত হইল—চমৎকার! খানিকক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

আচ্ছা, এবার উঠি তা হলে, নমস্কার।

নমস্কার।

দ্বার পর্যন্ত গিয়া হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়িয়া গেল।

হ্যাঁ, ভালো কথা, শুনেছি, কুমার পলাশকান্তির সঙ্গে আলাপ আছে আপনার?

আছে।

যদি দয়া করে তা হলে একটা কাজ করেন, একটি দরিদ্র পরিবারের বড় উপকার হয়।

কি, বলুন?

আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিয়া শঙ্কর বলিল, আমিও ওদের ভালো করে চিনি। অনিল অখিলকে পড়াবার জন্যে মিসেস স্যানিয়ালের বাড়িতে আমি ছিলাম যে কিছুদিন।

নীরা সব জানিত, তবু বিস্ময়ের ভান করিল।

ওমা, তাই নাকি! তা হলে দিন একটা চিঠি।

আমার আপত্তি ছিল না; কিন্তু কুমার পলাশকান্তির একটি অনুরোধ আমি রাখিনি, তিনি যদি আমারটা না রাখেন?

ঠিক দুই দিন পূর্বে কুমার পলাশকান্তির তাগাদায় অস্থির হইয়া শঙ্কর অবশেষে তাহাকে জানাইয়া দিয়াছে যে, সে গল্প লিখিয়া দিতে পারিবে না, কুমার তাহাকে যেন ক্ষমা করেন, তাহার মোটেই সময় নাই। সে ব্যস্ততার দোহাই দিয়াছিল বটে, কিন্তু আসলে তাহার গল্প লিখিয়া দিবার ইচ্ছা ছিল না, বিবেকে বাধিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে আংটিটাও ফেরত দেওয়াতে প্রত্যাখ্যানটা একটু রূঢ়ই হইয়াছে। এত কথা সে অবশ্য নীরাকে বলিল না, চুপ করিয়া রহিল।

দিতে পারবেন না তা হলে?

সম্ভব হলে দিতাম।

নীরা বসাকের সমস্ত সপ্রতিভতা যেন দপ করিয়া নিবিয়া গেল।

সে নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

।। ঊনত্রিশ ।।

পরদিন একটা গল্পের পাণ্ডুলিপি লইয়া শঙ্কর কুমার পলাশকান্তির বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটিতেছিল। তাহার কেবলই ভয় হইতেছিল, তিনি যদি বাড়িতে না থাকেন—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এমন সময় প্রায়ই তিনি বাহির হইয়া যান। নীরা বসাকের বিবর্ণ ম্লান মুখচ্ছবি সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। তাহার সমস্ত কাহিনী সে শুনিয়াছিল। কুন্তলার কাছে গোপন করিলেও শঙ্করের কাছে নীরা কিছুই গোপন করে নাই। কুন্তলা ঠিকই ধরিয়াছিল, নীরা সত্যই শঙ্করের ভক্ত। লেখা পড়িয়াই সে শঙ্করকে এত ভক্তি করিত যে, তাহার মহত্ত্ব সম্বন্ধে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাহার রচনার ভিতর দিয়া সে যে সহৃদয় ব্যক্তিটিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহার নিকট অকপটে সমস্ত কথা ব্যক্ত করিতে সে দ্বিধা করে নাই।

শঙ্কর দ্রুতপদে পথ চলিতেছিল। হঠাৎ একটা কাপড়ের দোকানে চোখ পড়িতে সে একটু বিস্মিত হইয়া গেল। প্রফেসার গুপ্ত ও সুলেখা কাপড় কিনিতেছেন—একটি চমৎকার শাড়ি পাট খুলিয়া উভয়ে সেটি নিরীক্ষণ করিতেছেন। সুলেখার উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল দেখিয়া মনে হইতেছে না যে, স্বামীর সহিত তাঁহার কিছুমাত্র অসদ্ভাব আছে। অত অপমানের পরও সুলেখা ঠিক আগেকার মতই স্বামীর ঘর করিতেছেন, বিদ্রোহ করিয়া গৃহত্যাগ করেন নাই। হয়তো তাঁহারই আদরে আবদারে বিগলিত হইয়া প্রফেসার গুপ্ত তাঁহারই জন্য শাড়ি কিনিতে আসিয়াছেন। প্রফেসার গুপ্তের চরিত্রও যে বিশেষ পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। তাঁহার নিজেরই একটি ছাত্রীর সহিত তাঁহার নাম জড়াইয়া প্রফেসার-মহলে যে কানাঘুষা চলিতেছে, তাহা শঙ্কর শুনিয়াছে। সুলেখাও হয়তো শুনিয়াছেন। সুলেখার হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে আর একবার চাহিয়া শঙ্কর আগাইয়া গেল। একটু হাসিয়া মনে মনে বলিল, ইহাই জীবন।

অন্যমনস্ক ছিল বলিয়া শঙ্কর জীবনের আর একটি ছবি দেখিতে পাইল না। আস্‌মি-দার্জির পিতা নিবারণবাবু শঙ্করকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি পাশের গলিতে ঢুকিয়া আত্মগোপন করিলেন। তিনি বাজার করিতে বাহির হইয়াছিলেন। কাঁকড়া, ভেটকিমাছ, মাটন প্রভৃতি নানারূপ সুখাদ্য তিনি কিনিয়াছেন। আস্‌মি-সহ পলাতক মাস্টার ফিরিয়াছেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নয়, নিবারণবাবুর আহ্বানে। সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া শুধু চিঠি নয়, তিনি টেলিগ্রাম পর্যন্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্করের কাছে তাহা স্বীকার করা অসম্ভব। সুতরাং শঙ্করকে দেখিয়া তাঁহাকে অন্ধকার গলিটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িতে হইল।

অনিলের চাকরি জুটাইয়া দিবার জন্য শঙ্কর ঊর্ধ্বশ্বাসে কুমার পলাশকান্তির বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটিতে লাগিল।

।। ত্রিশ ।।

আস্‌মিকে লইয়া তবলাবাদক মাস্টার কপিলবাবু ফিরিয়া আসিয়াছেন। নিবারণবাবুর অন্তরের কথা নিবারণবাবুই সম্যকরূপে জানেন, বাহিরে তাহার যতটুকু প্রকাশ দেখা যাইতেছে, তাহা পরিচিত-মহলে কিঞ্চিৎ বিস্ময়েরই উদ্রেক করিয়াছে। আস্‌মি ও মাস্টারকে ঘিরিয়া নিবারণ-গৃহে প্রতিদিন একটা না একটা ছোট বড় উৎসব লাগিয়াই আছে। নিবারণ যে ইহাদের বিরুদ্ধে পুলিসে নালিশ করিয়াছিলেন অথবা কখনও ইহাদের মুখদর্শন করিবেন না বলিয়া উচ্চকণ্ঠে প্রতিজ্ঞা-বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বর্তমান আচরণ দেখিয়া অনুমান করা কঠিন। দার্জির আচরণও ঠিক পূর্ববৎ আছে। দার্জি সর্বদা স্বল্পভাষিণী, সর্বদা কর্তব্যপরায়ণা। সে সহসা মিষ্ট কথায় গলিয়াও পড়ে না, রুষ্ট কথায় ফোঁস করিয়াও উঠে না। যাহা তাহার ভাগ্যে জোটে, তাহাই সে মানিয়া লয়। অদৃষ্টকে শান্ত মুখে মানিয়া লইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে অনাড়ম্বর জীবনযাপন-কৌশল সে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। মনে হয়, তাহার যেন কোনো অভাব-বোধই নাই। থাকিবে কি করিয়া? যে আনন্দের অভাব জীবনকে শুষ্ক করিয়া দেয়, সে আনন্দ তাহার প্রচুর পরিমাণে আছে। সে শিল্পী। সূচিশিল্পে সে তন্ময় হইয়া থাকে, বাবাকে সে প্রাণ ভরিয়া ভালোবাসে। আর কি চাই? তাহার বিশ্বাস, সে ছাড়া তাহার বাবাকে আর কেহ চেনে না, বোঝে না। আস্‌মি আসার পর হইতে সে সর্বদা সশঙ্কিত হইয়া আছে—কখন শঙ্করবাবু হঠাৎ আসিয়া পড়েন! শঙ্করবাবুর নিকট নিবারণবাবু আস্‌মি ও কপিলবাবুর সম্বন্ধে যেসব গর্জন করিয়াছিলেন, তাহার দার্জির অবিদিত নাই। তাই তাহার সর্বদা ভয় হয়, শঙ্করবাবু এখন যদি আসিয়া পড়েন, কি ভাবিবেন! বাহিরের কোনো লোকের নিকট তাহার বাবা অপমানিত বা অপ্রস্তুত হইলে তাহার বড় কষ্ট হয়। এই একটি জিনিসই তাহার পক্ষে সত্য সত্যই কষ্টদায়ক। অথচ বাবা এমন সব কাণ্ড করিয়া বসেন! সেদিনও একটি লোককে তিনি তাহার বিবাহের জন্য কি খোশামোদই না করিতেছিলেন—সে পাশের ঘর হইতে স্বকর্ণে শুনিয়াছে। কি দরকার তাহার বিবাহ করিবার? সে বাবাকে বলিয়া দিয়াছে যে, তাহার জন্য আর পাত্র খুঁজিতে হইবে না। সে বিবাহ করিবে না। আস্‌মি বিবাহ করিয়াছে, সেও যদি বিবাহ করে, তাহার অসহায় বাবাকে দেখিবে কে? না, সে বিবাহ করিবে না।

সেলাইয়ের ফোঁড় তুলিতে তুলিতে সে ভাবিতেছিল, শঙ্করবাবুর নিকট কি করিয়া বাবার মান বাঁচানো যায়? সহসা তাহার মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে ঠিক করিয়া ফেলিল, শঙ্করবাবু যদি আসেনই, তাঁহাকে আগেই আড়ালে ডাকিয়া সে বলিয়া দিবে যে, বাবার নয়, তাহারই আগ্রহাতিশয্যে আস্‌মিরা আসিয়াছে। তাহারই অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া বাবা তাহাদের আসিতে লিখিয়াছিলেন এবং তাহারই মুখ চাহিয়া তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেছেন। ব্যাপারটার সমাধান করিয়া তাহার মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল, হেঁট হইয়া সেলাইয়ের বাক্সের ভিতর উড্ডীয়মান শুকপক্ষীর পালকের উপযোগী সবুজ রঙের সুতা অন্বেষণে সে ব্যাপৃত হইল।

আস্‌মি, মাস্টার ও নিবারণবাবু আলিপুর চিড়িয়াখানায় গিয়াছেন। দার্জি যায় নাই। সে কোথাও যায় না। নিস্তব্ধ দুপুরে একা বসিয়া সেলাই করিতেই তাহার ভালো লাগে।

করালীচরণের আকস্মিক অভ্যাগম ও অন্তর্ধানে ভণ্টু শঙ্করের বাবার উইল সম্বন্ধে প্রথমে হঠাৎ যতটা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, পরে ততটা উদ্বিগ্ন সে আর রহিল না। প্রথম কারণ—শঙ্করের নাগাল সে পাইল না—,শঙ্কর বাড়িতেই থাকিত না, মুমূর্ষু ছবিকে লইয়া ব্যস্ত থাকিত। দ্বিতীয় কারণ—ইন্দুমতী, ইন্দুমতীর বাবা, বাবাজি ওরফে মুক্তানন্দ স্বামী এবং আপিসের কাজকর্ম তাহাকে এমন ব্যাপৃত করিয়া রাখিল যে, শঙ্করের কথা তাহার আর মনেই রহিল না। অন্তর এবং বহির্লোকের নানা ঘটনা-পরম্পরা এমন একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি করিল, যাহাকে উপমার সাহায্যে পরিস্ফুট করিতে হইলে বলিতে হয়—ঘূর্ণাবর্ত।

ইন্দুমতী বড়লোকের মেয়ে, চিরকাল সুখে মানুষ হইয়াছে, বাপের বাড়িতে সর্বদা তাহার সহিত ঝি-চাকর ঘুরিত। সম্প্রতি সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে, ঝি-চাকরের সংখ্যা দ্বিগুণিত হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু ভণ্টু একটি চাকর ছাড়াইয়া দিয়াছে অর্থাৎ দিতে বাধ্য হইয়াছে। অসুস্থ বেতনহীন দাদার চেঞ্জের খরচ, শন্টু-নন্টুর পড়ার খরচ, বিশাল বাড়িভাড়া, এতগুলি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন, ঔষধপত্র, লোক-লৌকিকতা—এসব তো আছেই, তাহার ওপর চাপিয়াছে বাবাজির গব্যঘৃত আলোচাল এবং বাকুর দুধ ও ঔষধ। বাকু অসুস্থ, তাঁহার শোথ হইয়াছে, কবিরাজি চিকিৎসা চলিতেছে। কবিরাজ মহাশয় অন্য পথ্য নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং ভণ্টুকে চাকর ছাড়াইয়া দিতে হইয়াছে। ইন্দুমতীকেই সদ্যপ্রসূত শিশুর কাঁথা কাপড় স্বহস্তে কাচিতে হইতেছে। ইন্দুমতী অবশ্য কাচিতে আপত্তি করে নাই, হাসিমুখেই সে সব করিতেছে, কিন্তু ওই হাসির অন্তরালেই কি যেন একটা ক্ষণে ক্ষণে বিচ্ছুরিত হইতেছে, যাহাতে বাবাজি ক্রুদ্ধ, বউদিদি ভীত এবং ভণ্টু উতলা হইয়া পড়িয়াছে। বউদিদির অসংখ্য কাজ। তিনি ওঠেন ভোর পাঁচটায়, শুইতে যান রাত্রি এগারোটায় কিংবা তাহারও পরে—ইহার মধ্যেও সময় করিয়া ইন্দুমতীর কাঁথা কাপড় কাচিয়া দিতে তিনি রাজি আছেন; কিন্তু ইন্দু কিছুতেই তাহা করিতে দিবে না, নিজেই কাচিবে। তাহার গোঁ দেখিয়া বউদিদি হাসেন, একটু ভয়ও পান—বড়লোকের মেয়ে মনে মনে না জানি কি ভাবিতেছে!

সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বাবাজি একদিন আপিস-গমনোন্মুখ ভণ্টুকে অন্তরালে ডাকিয়া বলিলেন, তোর কি চোখ নেই? দেখতে পাস না? মেয়েটা খেটে খেটে ম'ল যে!

ভণ্টু একটু হাসিল। তাহার পর বলিল, কি আর এমন খাটছে ও! বউদি ওর চেয়ে ঢের বেশি খাটেন।

একটা মহিষের পক্ষে যা সহজ, বুলবুলির পক্ষে তা সহজ নয়! তুমি বিবাহ করেছ একটি বুলবুলিকে, তাকে দিয়ে ঘানি টানালে চলবে কেন বাপু?

ভণ্টু চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটিল।

বাবাজি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, তবু খুব করছে। খুব—

আবার কিছুক্ষণ নীরবতার পর বলিলেন, একটি কথা সর্বদা মনে রাখা দরকার—জী[illegible]কে কষ্ট দিলে ভগবচ্চরণে অপরাধী হতে হয়। ও না হয় গ্রহ-নক্ষত্রের যোগাযোগে কর্মফলবশত তোমার স্ত্রী হয়েছে, তাই বলেই যে তাকে নির্যাতন করতে হবে, এ একটা কোনো যুক্তি নয়।

গত কয়েক দিন হইতে ভণ্টুর মনেও ঠিক এই কথাগুলি জাগিতেছিল, হঠাৎ বাবাজির মুখে তাহার প্রতিধ্বনি শুনিয়া বাবাজির প্রতি সহসা তাহার যেন একটু শ্রদ্ধাই হইল।

বলিল, কি করব, আপনিই বলে দিন।

আমি কি বলব বল, আমি সন্ন্যাসী মানুষ। আমার কাছে তুমিও যা, তোমার দাদা বিষ্ণুও তাই। উভয়েরই মঙ্গল আমি কামনা করি, কিন্তু তাই বলে যা ন্যায্য বলে বুঝেছি, মনে-প্রাণে যেটা সত্য বলে অনুভব করছি, তা যদি না বলি, তা হলে বিবেকের কাছে অপরাধী হতে হবে আমাকে। তাই বলছি, বউমাকে কষ্ট দিও না।

আমি কি ইচ্ছে করে কষ্ট দিচ্ছি?

তোমার এমন ব্যবস্থা করা উচিত, যাতে উনি কষ্ট না পান।

কি করব, বলুন?

তোমার দাদাকে চিঠি লেখ, কাজে এসে জয়েন করুক। সে সমুদ্রের ধারে বসে বসে সিনারি দেখবে আর তুমি তার সংসার ঘাড়ে নিয়ে নিজের স্ত্রী-পুত্রের প্রতি অবিচার করবে, এটা তো ন্যায্য কথা নয়।

ভণ্টু চুপ করিয়া রহিল।

বাবাজি তাহার মুখের পানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, পাঁকে যে পড়বে, তা আগেই বোঝা উচিত ছিল তোমার। আমি কতকাল ধরে আশা করেছিলাম যে, তোমাকে সঙ্গী করে নিয়ে কোনো তীর্থস্থানে বাকি জীবনটা নাম-জপ করে কাটিয়ে দেব। ও ছাড়া আর কি করবার আছে, বল? সংসারে এসে তাঁর মহিমাই যদি না কীর্তন করতে পারলাম, শূয়োরের মত পাঁকে নাক থুবড়েই যদি মানব-জীবনটা কাটিয়ে দিতে হল, তা হলে আর হল কি? কিন্তু কথা নেই, বার্তা নেই, তুমি ফট করে বিয়ে করে বসলে, এইবার মজাটা বোঝ।

ভণ্টু সহসা সচেতন হইল—বাবাজি যে পথে এইবার তাঁহার চিন্তাধারাকে চালিত করিয়াছেন সে পথ অন্তহীন। তাহার আপিসের বেলা হইয়া যাইতেছে। সে বাইকে সওয়ার হইয়া পড়িল। তাহার আজ অনেক কাজ। আপিসের অনেকগুলি ফাইল ক্লিয়ার করিতে হইবে, খোকার জন্য সোয়েটার কিনিতে হইবে, বাকুর জন্য কবিরাজের বাড়ি যাইতে হইবে, একজন স্বর্ণকারের নিকট ইন্দুর জন্য একটি হাল ফ্যাশানের হার গড়াইতে দিয়াছে, তাহাকে একবার গিয়া চুমরাইতে হইবে, কারণ তাহাকে এখন নগদ টাকা সে দিতে পারিবে না। হার হইলে আবার এক ফ্যাসাদ আছে, বউদিদি ও বাকুর নিকট মিথ্যা করিয়া বলিতে হইবে যে, হারটা তাহার শ্বশুর দিয়াছেন। হঠাৎ ভণ্টুর মনে হইল, এত সব ছল-চাতুরির কি প্রয়োজন, সে তো কোনো অন্যায় কার্য করিতেছে না! বাবাজির কথাগুলি তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

।। একত্রিশ ।।

হাসি অপেক্ষা করিতেছে।

পড়াশোনায় সে ক্লাসের মেয়েদের ও শিক্ষয়িত্রীদের তাক লাগাইয়া দিয়াছে। তাহাদের ধারণাই ছিল না যে, একজন গৃহস্থ-ঘরের বউ হঠাৎ স্কুলে ভর্তি হইয়া অতটা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবে। গৃহস্থালির নানা কাজকর্মের অবসরে নিশ্চয়ই সে পড়াশোনার চর্চা রাখিয়াছিল, তাহা না হইলে হঠাৎ এতটা উৎকর্ষ লাভ করা অসম্ভব ব্যাপার। তাহার যে হাতের লেখা সে

একদিন প্রবাসী মৃন্ময়কে চিঠি লিখিবার জন্য চিন্ময়ের সহায়তায় শুরু করিয়াছিল, যে হাতের লেখার জন্য মৃন্ময়ের চাকরি গিয়াছিল, যে হাতের লেখায় আজও মৃন্ময়কে প্রত্যহ পত্র লেখে, সর্বাপেক্ষা সেই হাতের লেখাই সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে। সত্যই মুক্তার মত লেখা। পড়াশোনায় কোনো বিষয়ে তাহার সমকক্ষ কেহ নাই। অথচ ব্যবহারে সে অতিশয় অনাড়ম্বর ও সপ্রতিভ। অহঙ্কারী নয়, গম্ভীর নয়, স্বামী চুরি করিয়া জেলে গিয়াছে বলিয়া বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়, আসন্ন মাতৃত্বের লক্ষণ সর্বাঙ্গে প্রকটিত হইয়া উঠিতেছে বলিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত নয়। অতিশয় সহজভাবে সে সকলের সঙ্গে মেশে, হাসে, কথা কয়। কাহারও সহিত তাহার শত্রুতা নাই, সকলেই তাহাকে ভালোবাসে। অনেকেই বিস্মিত হয়। যাহার স্বামী জেলে, সে কি করিয়া এমন সহজভাবে থাকে, যেন কিছুই হয় নাই। হাসি নিজেই মাঝে মাঝে নিজেকে চিনিতে পারে না, নিজের এই বিবর্তন দেখিয়া নিজেই সে বিস্মিত হইয়া যায়। বাল্যকালে সে পিতৃমাতৃহীন হইয়া যখন দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে মানুষ হইতেছিল, তখন সে সঙ্কোচে মরিয়া থাকিত, মুকুজ্জেমশাইয়ের চেষ্টায় যখন মৃন্ময়ের সহিত তাহার বিবাহ হইল সে যেন বাঁচিয়া উঠিল—রাজপুত্রের স্পর্শে যেন ঘুমন্ত রাজকন্যার নিদ্রাভঙ্গ হইল—ভীরু নয়ন তুলিয়া সে দেখিল, সম্মুখে দেবতা দাঁড়াইয়া আছে—যে দেবতা তাহারই, আর কাহারও নয়। তারপর দিনে দিনে মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে আপন মহিমায় বিকশিত হইয়া আপন অধিকারে প্রমত্ত হইয়া ভীরু রাজকন্যা যখন রাজেন্দ্রাণী হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহার সমস্ত স্বপ্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া সহসা আবির্ভূত হইল নেপথ্যবাসিনী মৃত স্বর্ণলতার প্রেতাত্মা ও তাহার বিস্ময়কর ইতিহাস, আকস্মিক বজ্রপাতের নিদারুণ প্রহারে তাহার সুখ-প্রাসাদ নিমেষে যেন দীর্ণ-বিদীর্ণ হইয়া গেল। সে অবলুণ্ঠিত হইল, অদৃষ্টকে ধিক্কার দিল। যাহাকে ঘিরিয়া তাহার হৃদয়ের শতদল বিকশিত হইয়াছিল, তাহাকেই ক্ষোভে দুঃখে লাঞ্ছিত করিল, ক্রোধে ঈর্ষায় সমস্ত অন্তর পুড়িয়া গেল, মনে হইল, এই বুঝি শেষ, সমস্ত মহিমার ওপর অন্ধকারের যবনিকা নামিল। কিন্তু অন্ধকার ভেদ করিয়া আবার নূতন জ্যোতি দেখা দিয়াছে। সহসা সে মৃন্ময়কে—চিন্ময়ের অগ্রজ মৃন্ময়কে, নূতন রূপে নূতন মহিমায় আবিষ্কার করিয়াছে।

সমস্ত অন্তর দিয়া সে অপেক্ষা করিতেছিল। অপেক্ষা করিতেছিল, কবে তাহার পরম গৌরব ও চরম সর্বনাশের সংবাদ বহন করিয়া তাহার জীবনের সেই স্মরণীয় দিবসটি আসিবে, যেদিন সে বুঝিতে পারিবে যে, জীবনের প্রদীপটি জ্বলিল কি না!

দ্বারপথে শব্দ হইল।

হাসি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, সুচারু প্রবেশ করিয়াছে। তাহার হাতে একখানা কাগজ।

কি সুচারু?

সুচারু কোনো কথা বলিতে পারিল না। অথচ সে খবরটা দিতেই আসিয়াছিল, কিন্তু হাসিকে দেখিয়া তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

ওটা কি আজকের কাগজ?

হ্যাঁ।

দেখি।

কাগজ দেখিয়া সে মন্ত্রমুগ্ধবৎ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরার

রক্তধারা যেন হিমানী-স্রোতে রূপান্তরিত হইল। প্রথম পাতাতেই বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল। মৃন্ময়ের তপস্যা সফল হইয়াছে, এতদিনে ধর্ষিতা স্বর্ণলতার আত্মা তৃপ্তিলাভ করিল, মৃন্ময় জেলে নৃশংসভাবে অচিনবাবুকে হত্যা করিয়াছে। হাসির মুখ ক্ষণিকের জন্য বিবর্ণ হইয়া আবার প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

প্রদীপ জ্বলিল।

।। বত্রিশ ।।

সংবাদটা শুনিয়া শঙ্কর বিহ্বল হইয়া পড়িল। মৃন্ময়ের মধ্যে যে এ সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা কে জানিত! আমরা মানুষকে কতটুকু চিনি!

পুরাতন পুস্তকের দোকানে বই ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে মৃন্ময়ের মুখখানাই বারংবার তাহার মনে পড়িতে লাগিল। গত কয়েক দিন নীরা বসাক ও অনিল তাহার সমস্ত চিত্ত অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছিল। অনিল সান্যালের উপর সে প্রসন্ন ছিল না, কিন্তু নীরার সংস্পর্শে আসিয়া সে অপ্রসন্নতা কাটিয়া গিয়াছিল। To know all is to forgive all. সমস্ত শুনিবার পর আর রাগ করিয়া থাকা চলে না। কি করিলে ইহারা সুখী হইবে, এই চিন্তাই তাহার মনকে অধিকার করিয়া তাহাকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিল। সহসা ইহাদের অবলুপ্ত করিয়া মৃন্ময় ও হাসি আসিয়া দাঁড়াইল। নীরা বসাক ও অনিলের সহিত তাহার যে সম্পর্ক, মৃন্ময় ও হাসির সহিতও তাহাই। এখন কিন্তু মনে হইতে লাগিল, উহারা তাহার বেশি আপন। উহাদের সহিত বেশি আত্মীয় অনুভব করিয়া তাহার সমস্ত চিত্ত অজ্ঞাতসারে গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

...হঠাৎ এক কোণে একগাদা পুরাতন মাসিকপত্র নজরে পড়িল—নাম 'বান্ধব'। কৌতূহল হইল। উবু হইয়া বসিয়া সে উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। সহসা দেখিতে পাইল, একটি প্রবন্ধের নাম 'প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে দুটি কথা'—সহসা কে যেন তাহাকে চাবুক মারিল। চণ্ডীচরণ দস্তিদার চোর! ইহারই ঐতিহাসিক জ্ঞানের গভীরতা লইয়া সে সভায় সভায় গর্ব করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার সমস্ত উৎসাহ যেন নিবিয়া গেল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন শিথিল শক্তিহীন হইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। বাড়ি ফিরিয়া অমিয়ার নিকট শুনিল, তাহার মামাতো ভাই নিত্যানন্দ টাকা লইয়া বাজার করিবার জন্য বাহির হইয়াছিল, মদ খাইয়া ফিরিয়াছে, পাশের ঘরে অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছে। শঙ্কর এমন মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল যে, চুপ করিয়া চাহিয়াই রহিল। তাহার পর হঠাৎ যেন তাহার মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। সক্রোধে পাশের ঘরের দ্বার ঠেলিয়া ঢুকিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। উলঙ্গ নিত্যানন্দ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। শঙ্করের মনে পড়িল, সেও তো কিছুদিন আগে মদ খাইত। কিছু বলিল না, সন্তর্পণে কপাটটা ভেজাইয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

গভীর রাত্রি।

শঙ্কর লেখনী-হস্তে একা জাগিয়া আছে, পাশের ঘরে অমিয়া ঘুমাইতেছে। চতুর্দিকে নিবিড় নীরবতা তাহাকে এমন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে যে, সে একটি কথাও লিখিতে পারিতেছে না,

লেখনী-হস্তে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মনে হইতেছে, গভীর রাত্রির নিবিড় নীরবতার মধ্যে এমন একটা কিছু প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, যাহা নীরব বলিয়াই উপেক্ষণীয় নহে; মনে হইতেছে, অদৃশ্য অসংখ্য চক্ষু যেন নির্নিমেষে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, নামহীন নির্দেশহীন অগণ্য অনুভূতিপুঞ্জ আশে-পাশে উর্ধ্বে নিম্নে চতুর্দিকে যেন স্পন্দিত হইতেছে, ধরণীর ধূলিকণা ও মহাকাশের নীহারিকাপুঞ্জ শ্রুতি-অগম্য যে বিরাট ছন্দে ছন্দিত, অন্ধকারে তাহার কিছু আভাস যেন পাওয়া যাইতেছে, অন্ধকার-অবলুপ্ত সৃষ্টি অদৃশ্য অন্তরলোকে নব রূপে মূর্তি পরিগ্রহ করিতেছে, নিদ্রামগ্ন পৃথিবীর আত্মা স্বপ্নের পাখায় ভর করিয়া জ্যোতির্ময় আকাশলোকে যাত্রা করিয়াছে, অস্ফুট হাসি-কান্নার অসংখ্য অমূর্ত তরঙ্গ নিঃশব্দে চতুর্দিক সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে—নির্বাক শঙ্কর নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া আছে।

পাশের ঘরে চুড়ির শব্দ হইল। সহসা সমস্ত মায়ালোক যেন মিলাইয়া গেল। সে মর্ত্যলোকে নামিয়া আসিল। মনে হইল, অমিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল; তাহার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পতনের শব্দও যেন শোনা গেল। খোলা জানালা দিয়া একটা দমকা বাতাস ঢুকিল, টেবিল হইতে একটা কাগজ উড়িয়া গেল। শঙ্কর তুলিয়া দেখিল, বাড়ি-ভাড়ার বিল। দুই মাসের ভাড়া বাকি পড়িয়াছে।

শঙ্কর লেখনী লইয়া আবার লিখিবার উদ্যোগ করিল, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিল, কি লেখা যায়? অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল—কিছুই লেখা গেল না। কি লিখিবে? গতানুগতিক নিয়ম বজায় রাখিয়া কতকগুলো চটুল কথার জাল বুনিয়া যাইবে? এতদিন তো ইহাই করিয়াছে, সাহিত্য-সেবার ছুতায় মনিহারী দোকান সাজাইয়া লোক ভুলাইয়াছে। জীবনের কোন্ নিগূঢ় রহস্য তাহার কবিদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়াছে? সাহিত্যের ভিতর দিয়া জীবনের কি আদর্শ সে দেশের লোকের সম্মুখে ধরিতে চায়? সে আদর্শের পথে সে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে? সে আদর্শের জন্য সে কতটা স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছে? সে তো এতকাল কেবল লোকের মনোরঞ্জন করিয়া, সাহিত্যের নামে অনুষ্ঠিত যত সব বাজে সভার সভাপতিত্ব করিয়া, হাততালি, মালা এবং প্রশংসা কুড়াইয়া অতি সস্তা মেকি জিনিসের বেসাতি করিয়াছে মাত্র।

মৃন্ময়ের কথা মনে পড়িল। আদর্শ রক্ষা করিতে গিয়া সে অবলীলাক্রমে ফাঁসি-কাঠে উঠিয়াছে। তাহার টাকা চুরি করার উদ্দেশ্য ছিল জেলে গিয়া অচিনবাবুর নাগাল পাওয়া। আদর্শের জন্য মৃন্ময় স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করিল। সে পারিবে কি?

।। তেত্রিশ ।।

অনিল ও নীরা বসাক, মৃন্ময় ও হাসিকে লইয়া শঙ্করের কয়েক দিন বেশ কাটিয়া গেল, অর্থাৎ এ কয়দিন উহাদের লইয়া শঙ্কর নিজেকে বেশ ভুলিয়া রহিল। ইহার পূর্বে ভুলিয়াছিল ছবিকে লইয়া। সহসা সে আবিষ্কার করিল, কোনো কিছু লইয়া নিজেকে ভুলিয়া থাকিবার উপলক্ষ পাইলে সে যেন বাঁচিয়া যায়, তা সে উপলক্ষ যতই না কেন তুচ্ছ হউক। বস্তুত, কিছুদিন হইতে এই উপলক্ষই সে যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। সে লোকনাথবাবুর সুদীর্ঘ প্রবন্ধ শ্রবণ করে, নিপুদার সহিত সোৎসাহে কমিউনিজম-বিষয়ক আলোচনায় যোগ দেয়, যেখানে-

সেখানে সভাপতিত্ব করিতে ছুটিয়া যায় কেবল অন্যমনস্ক হইয়া থাকিবার জন্য। যে প্রশ্নটা কিছুদিন হইতে বারংবার তাহার মনে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে, যে প্রশ্নের তীক্ষ্ণতায় তাহার সমস্ত অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল, যে প্রশ্নের সদুত্তর সে কিছুতেই নিজেকে দিতে পারিতেছে না—সেই দুরূহ প্রশ্নটাকে এড়াইবার জন্যই সে বাহিরের একটা কিছু লইয়া মাতিয়া থাকিতে চায়। লোকনাথবাবুর প্রবন্ধ মনোহারী, নিপুদার সহিত তর্ক-যুদ্ধ করিয়া আনন্দ আছে, নীরা বসাকের প্রশংসা মাদকতাময়, সাহিত্য-সভার হাততালি শিরা-উপশিরায় উন্মাদনা সঞ্চার করে—সবই ঠিক; কিন্তু কেবল ওই সব কারণেই সে যে উহাদের লইয়া উন্মত্ত হইয়া ওঠে, তাহা ঠিক নয়। সে নিজেকে ভুলিয়া থাকিতে চায়, নিজের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া বাহিরের ভিড়ে আত্মগোপন করিতে চায়, নিজের মনের অনিবার্য প্রশ্নটাকে বাহিরের কোলাহলে নীরব করিয়া দিতে চায়। তাহার একা থাকিতে ভয় করে।

অনিলের চাকরি হইয়া গিয়াছে। তিন আইন অনুসারে নীরা বসাকের সহিত তাহার বিবাহও হইয়া গেল। উপস্থিত হাতে উত্তেজক কোনো কাজ নাই। এ মাসে 'সংস্কারক' পত্রিকার কাজও যাহা ছিল, তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে, আপিস হইতে শঙ্কর বাড়ি ফিরিতেছিল। সুতীক্ষ্ণ প্রশ্নটি সহসা শতমূর্তি ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। ইহার নাম কি সাহিত্য-সাধনা? আর যদি সত্যই সে সাধনা করিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলেই বা কাহার কতটুকু উপকার করিতে পারে? বড় জোর তাহা কতকগুলি প্রকৃষ্টমনা ব্যক্তির মানসিক বিলাসের উপকরণ জোগাইবে। কিন্তু তোমার যে উদ্দেশ্য ছিল দেশসেবা করা! দেশের উন্নতিকল্পেই একদা তুমি চরকা ঘাড়ে করিয়াছিলে, চরকা ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞান পড়িতে গিয়াছিলে, বিজ্ঞান ছাড়িয়া এখন সাহিত্য-সেবা করিতেছ! ইহাই কি সেই সাহিত্য-সেবার নমুনা? তোমার ও-সাহিত্য কয়টা খাজনা-পীড়িত কৃষকের দুঃখমোচন করিবে, কয়জন নিরন্নকে আহার জোগাইবে, কয়জন রোগীর ঔষধ-পথ্যের সংস্থান করিবে, কয়জন অশিক্ষিত ব্যক্তির সুশিক্ষার সহায়ক হইবে, কয়জন দুঃখীকে সুখী করিবে? তুমি বলিতেছ, আধিভৌতিক নয়, আধ্যাত্মিক দুঃখ মোচনই উহার উদ্দেশ্য। তাই যদি হয়, বলিতে পার, তোমার এ সাহিত্য দেশের কয়জনের আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে? ইহা কয়জনের আত্মগোচর হইতে পারে? যে দেশের শতকরা পাঁচজনের শুধু অক্ষর-পরিচয় মাত্র আছে, সে দেশের কয়জন সাহিত্যরস পান করিতে সক্ষম? যাহারা সক্ষম, তাহারাও কি তোমার ও-সাহিত্যের ভাষা বোঝে? ও-সাহিত্যের ভাববিলাসের সহিত কি তাহাদের কিছুমাত্র সম্পর্ক আছে? দেশসেবার অজুহাতে তুমি যাহা করিতেছ, তাহা আত্মরতি মাত্র। তুমি এবং তোমার মত ভাববিলাসী কয়েকজন পরস্পর আত্মপ্রশংসা করিবার অছিলায় মিথ্যা মায়ালোক সৃজন করিয়াছ, তাহার সহিত দেশের জনসাধারণের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। তোমরা যাহাদের ছোটলোক বল, তাহারা তাড়ির আড্ডায় বসিয়া যাহা করে, তোমরাও তোমাদের সাহিত্যসভায় বসিয়া তদপেক্ষা মহত্তর কিছু কর না। তাহাদেরও উদ্দেশ্য চিত্তবিনোদন, তোমাদেরও উদ্দেশ্য তাই। চিত্তবিনোদন করিতে বসিয়া তাহারাও গালাগালি মারামারি চিৎকার করে, ভিন্ন ভাষায় তোমরাও তাহাই কর। ইহার সহিত দেশের অথবা দশের কোনো সম্পর্ক নাই—ইহা নিতান্তই তোমাদের গোষ্ঠীগত ব্যাপার। যাহারা তোমাদের গোষ্ঠীর লোক—সাহিত্য-সম্পৃক্ত হওয়াতে তাহারাই বা কি এমন মহত্তর ব্যক্তি হইয়াছে? তাহাদের জীবনের কতটা আধ্যাত্মিক সুখসাধন

করিয়াছ? কতটা দুঃখমোচন সম্ভব হইয়াছে? তোমাদের দলের সকলেই তো দুঃখী। শুধু তাই নয়, সাধারণ সামাজিক মানদণ্ড দিয়া বিচার করিলে অধিকাংশই পাপিষ্ঠ নরাধম। ছবি, প্রফেসার গুপ্ত, লোকনাথ ঘোষাল, নিলয়কুমার, নীরা বসাক, নিপুদা, চণ্ডীচরণ দস্তিদার, হীরালাল মজুমদার, সে নিজে, অর্থাৎ সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট যাহারা, তাহারা একজনও কি মনুষ্য-হিসাবে শ্রদ্ধেয়? তবে? সে যে কয়জনকে জীবনে সত্য-সত্যই শ্রদ্ধা করিতে পারিয়াছে তাহাদের কাহারও তো সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ নাই। সহসা তাহার স্কুলের হেডপণ্ডিত ধরণীধর ভট্টাচার্যকে মনে পড়িল। তিনি, মুকুজ্জেমশাই, বেলা মল্লিক, ভণ্টুর বউদি, মৃন্ময়, হাসি, তাহার নিজের বাবা—ইহারা কেহই সাহিত্যের স্রষ্টা বা সমঝদার হিসাবে উল্লেখযোগ্য নহেন।

বহুদিন পূর্বে গ্রামে গ্রামে চরকা ও খদ্দর প্রচার করিতে করিতে তাহার যেমন মনে হইয়াছিল যে, সে ভুল পথে চলিতেছে। তাহার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়িতে পড়িতে সে যেমন উপলব্ধি করিয়াছিল যে, বিজ্ঞানেব পথ তাহার পথ নহে—সাহিত্যের পথে চলাই তাহার পক্ষে শ্রেয়, সাহিত্যের পথেই সে দেশের প্রকৃত উপকার করিতে পারিবে,—আজও তেমনি আবার অনিবার্যভাবে তাহার মনে হইতে লাগিল, দেশের দুঃখ ঘুচাইব—ইহাই যদি তাহার জীবনের আদর্শ হয়, তাহা হইলে সাহিত্যের পথও ভুল পথ। অন্যান্য নানারূপ বিলাসের মত ইহাও একরূপ বিলাস।

আরে! কে, শঙ্কর নাকি?

চলন্ত ট্রাম হইতে যে ব্যক্তিটি লাফাইযা নামিল, তাহাকে সে এ সময়ে এখানে মোটেই প্রত্যাশা করে নাই।

উৎপল বম্বে হইতে কবে আসিল?

।। চৌত্রিশ ।।

শঙ্করের উচ্ছ্বাসহীন প্রশংসা নিপুকে প্রতারিত করিতে পারে নাই। নিপু বুঝিয়াছিল, ওই কয় ছত্র মামুলি সমালোচনার মূল্য কি এবং অর্থ কি! মুখে কিছু বলিতে না পারিলেও সে মনে মনে জ্বলিতেছিল। সে জ্বালা আরও বাড়িয়া গেল, যখন দৈনিক কাগজগুলি শঙ্করের গুণগান করিয়া সাড়ম্বরে তাহার অভিভাষণটি বাহির করিল। অভিভাষণে যাহা ছিল, তাহা সুরুচিসঙ্গত সাহিত্যিক আলোচনা। শাশ্বত সাহিত্যের লক্ষণগুলির বিচার এবং বাংলা সাহিত্যে তাহাদের প্রকাশ লইয়া আনন্দ অথবা অভাব লইয়া দুঃখ। নিরপেক্ষ যে কোনো সাহিত্যিকের নিকট অভিভাষণটি নিঃসন্দেহে উপাদেয়; কিন্তু নিপুর মনে হইল, উহা তৃতীয় শ্রেণীর চর্বিতচর্বণ। উহাতে নূতন কথা কি আছে? মানবের ইতিহাসে যে নবযুগ সূচিত হইতেছে, রুশ দেশের জার-প্রপীড়িত জনসাধারণ সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের জন্য বিদ্রোহ করিয়া পুরাতন বিধিবিধান উল্টাইয়া দিয়া যে বৈজ্ঞানিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, শঙ্করের অভিভাষণে তাহার কিছুমাত্র আভাস নাই। সুতরাং উহা বাজে। শাশ্বত সাহিত্যের সনাতন বুলি অনেকবার অনেক লোকের নিকট শোনা গিয়াছে, উহা শুনিবার আর প্রবৃত্তি নাই। মানবের অগ্রগতির, মানবের আধুনিকতম প্রতিভার নব জয়যাত্রার বাণী যদি শুনাইতে পার, তবেই তাহা শ্রাব্য; রুশ দেশের

সহিত আমাদের দেশের মিল আছে। রুশ দেশ কৃষিপ্রধান, আমাদের দেশও কৃষিপ্রধান। তাহারাও একদিন ঠিক আমাদেরই মত দুর্দশাপন্ন ছিল। আমাদেরই মত নিরক্ষর, আমাদেরই মত রোগে অনাহারে জীর্ণ, ঋণভারে, করভারে প্রপীড়িত। আমাদেরই মত তাহারা ধীরে ধীরে লয় পাইতেছিল, যে সঞ্জীবনী মন্ত্রে তাহারা পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে, আমাদেরও সেই মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিতে হইবে। আমাদের সাহিত্যে সেই মন্ত্রের ধ্বনি যে কবির বীণায় ঝঙ্কৃত হইবে, সে-ই নবযুগের কবি।

ঠোঁট বাঁকাইয়া নিপু যাহাদের নিকট বক্তৃতা করিতেছিল, তাহারা সকলেই তরুণ বয়স্ক, সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চডিগ্রিধারী এবং রুশসাহিত্যে কৃতবিদ্য। প্রায় সকলেই বেকার, সকলেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সকলেরই নিজেদের সম্বন্ধে ধারণা এত অত্যুচ্চ যে, সে উচ্চতার নিকট হিমালয়ও হীন হইয়া যায়, সকলেই স্বদেশহিতৈষী এবং সকলেরই ধারণা, যাহা করিলে স্বদেশের হিত হয় তাহা কেবল তাহাদেরই জানা আছে, অপরের নয়। দেশের নিকট যাঁহারা স্বদেশহিতৈষী বলিয়া বিখ্যাত। স্বদেশের মুক্তির জন্য যাঁহারা জীবনব্যাপী সাধনা করিয়াছেন, স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন—ইহাদের মতে, তাঁহারা ভ্রান্ত এবং বুদ্ধিহীন। নূতন যুগের নূতন প্রেরণার খবর রাখেন না। এরোপ্লেনের যুগে গরুর গাড়ির জয়গান করিয়া বেড়ান। তাঁহারা অধিকাংশই ক্যাপিটালিস্ট অথবা পেটি-বুর্জোয়া। তাঁহারা যাহা করিতেছেন অথবা বলিতেছেন, তাহা ক্যাপিটালিজম্-গন্ধী, তাহাতে সমগ্র দেশের উপকার হইবে না, তাহা মুষ্টিমেয় ধনিকের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল, শ্রমিকদের অথবা কৃষকদের নয়।

তাই ইহারা নূতন করিয়া দেশকে গঠন করিতে চায়। সাহিত্য যেহেতু লোকশিক্ষার প্রধান বাহন এবং সংবাদপত্র যেহেতু জনমত গঠন করে, সেই হেতু ইহাদের সকলেই প্রায় সাহিত্য অথবা সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে ব্যগ্র। ইহাদের নিজেদেরও সাহিত্য-পত্রিকা আছে, যদিও তাহার প্রচার খুব কম, কারণ লোকে যে রসের লোভে সাহিত্য-পত্রিকা কেনে, ইহাদের পত্রিকা সে রসে বঞ্চিত। ইহাদের পত্রিকা 'থিওরি' প্রচার করে, কিন্তু তাহা সাহিত্য হইয়া ওঠে না। নিপুর যুগান্তকারী উপন্যাসটি প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহারা নিপুকে নেতৃত্ব বরণ করিয়াছে। যে নিপুকে আত্মীয়স্বজন কেহই কোনো দিন আমল দেয় নাই, হিরণদার 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার সম্পর্কে আসিয়াও যে কিছুতেই নিজেকে পাদপ্রদীপের সম্মুখীন করিতে পারে নাই (কোথাকার অজ্ঞাতকুলশীল শঙ্কর আসিয়া সেখানে আসর জমাইয়া বসিল), সেই নিপু নিজেকে সহসা একটা দলের শীর্ষভাগে দেখিয়া মনে মনে ভারি একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিল। কিন্তু ঠোঁট বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া সে এমন একটা ভাব প্রকাশ করিতেছিল, যাহা তাহার প্রকৃত মনোভাবের বিপরীত। ভাবটা এই যে, আঃ, তোমরা আমাকে এ কি বিপদে ফেলিলে! আমি তো এসব চাই না, আমি চাই নির্জনে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া মন্ত্রের সাধনা করিতে। আমি সামান্য কেরানি বটে, কিন্তু আমি তপস্বী।

শঙ্কর সম্বন্ধেই আলোচনা চলিতেছিল। একজন বলিল, লোকনাথবাবুর মত একটা জ্ঞানী লোক শঙ্করবাবুর পিছনে আছেন বলেই ওঁর সাহিত্য-সমাজে যা কিছু প্রতিপত্তি। আর একজন বলিল, কাল কিন্তু লোকনাথবাবুর সঙ্গে দেখা হল, তিনি দেখলাম, শঙ্করের উপর একটু চটেছেন, বেশ একটু অপ্রসন্ন মনে হল।

তাই নাকি?

সংবাদটাকে নিপু উপেক্ষা করিতে পারিল না।

তা হলে চল না, লোকনাথবাবুকে দিয়েই শঙ্করের অভিভাষণের একটা স্কেদিং সমালোচনা লেখানো যাক্। কণ্টকেনৈব কণ্টকম্—

একজন ভক্ত বলিল, লোকনাথবাবু কি আপনার মত লিখতে পারবেন?

আমি নিজের নাম দিয়ে ওটা আর লিখতে চাই না।

সদলবলে সকলে লোকনাথবাবুর বাসায় গিয়া হাজির হইল। লোকনাথবাবু বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন, নিপুকে দেখিয়া সোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন, শঙ্করবাবুর অভিভাষণটা পড়েছেন? চমৎকার হয়েছে। আমি যাচ্ছি তাকে অভিনন্দন জানাতে, এতটা আমি আশা করিনি।

নিপুকে হতাশ হইতে হইল। সদলবলে সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যাবেন আপনি?

না। আমার অন্য কাজ আছে একটু এখন।

আমি চললাম তবে।

তিনি বাহির হইয়া গেলেন। শঙ্করের অভিভাষণ পড়িয়া সাহিত্য-প্রেমিক লোকনাথ ঘোষালের মনের সমস্ত গ্লানি কাটিয়া গিয়াছিল।

নিপু সেই ছোকরাটির দিকে চাহিয়া বলিল, ওঁরা সবাই পেটি-বুর্জোয়া। আমাদের সঙ্গে ওঁদের সুর মিলতেই পারে না।

ঠিক হইল, অভিভাষণের স্কেদিং সমালাচনা নিপুই লিখিবে, কিন্তু বেনামীতে।

স্কেদিং সমালোচনা লিখিতে বসিয়া নিপু কিন্তু প্রথমটা একটু বিপদে পড়িল। শঙ্করের অভিভাষণটা পুনরায় আগাগোড়া পড়িয়া তাহার মনে হইল, কিসের বিরুদ্ধে সে সমালোচনা করিবে? শঙ্কর যাহা লিখিয়াছে, তাহা এতই যুক্তিযুক্ত, তাহার ভাষা এতই জোরালো এবং ভঙ্গি এমনই চিত্তাকর্ষক যে, তাহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে ভদ্র অন্তঃকরণ স্বভাবতই একটু সঙ্কুচিত হয়, হাজার হোক, সে একদিন 'ক্ষত্রিয়'-দলের একজন সমঝদার সভ্য ছিল তো, সাহিত্যস্রষ্টা না হইলেও অন্তরের অন্তস্তলে সে সুসাহিত্যের রসগ্রাহী, মুখে তাহা স্বীকার করুক আর না করুক।

অনেকক্ষণ সে কলম হাতে করিয়া বসিয়া রহিল। প্রবন্ধ ত্যাগ করিয়া তাহার চিন্তা অতীতে ফিরিয়া গেল। হিরণদাকে মনে পড়িল। বড়লোকের খামখেয়ালি ছেলে হিরণদা, পিতার সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া নানারূপ খেয়াল চরিতার্থ করিতে করিতে হঠাৎ একদিন 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন, এবং তাহারা (সে নিজেও তাহাদের মধ্যে একজন) ওই উচ্ছৃঙ্খল বড়লোকের ছেলেটার তোষামোদ করিবার জন্য বিদূষক-বেশে তাহার চতুর্দিকে সমবেত হইয়াছিল। সমঝদার হিসাবে ততটা নয়, যতটা নিজের স্বার্থসিদ্ধির আশায়। হিরণদা দিলদরিয়া লোক ছিলেন। কখনও কাহাকেও এক টুকরো রুটি ছুঁড়িয়া দিয়া, কখনও কাহারও পিঠ চাপড়াইয়া, এমনকি কখনও কাহারও মদের খরচ জোগাইয়াও তিনি তাহাদের অনেককে মাঝে মাঝে অনুগৃহীত করিতেন। তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি অনুগ্রহ করিয়াছিলেন শঙ্করকে। কারণ, শঙ্করই সর্বাপেক্ষা বেশি পদলেহী ছিল। লেখা-ব্যাপারে যতটা না হোক, লেহন-ব্যাপারে সে

সত্যই একজন বড় আর্টিস্ট। বেশি কথা না বলিয়াও সর্বাপেক্ষা বেশি খোশামোদ করিতে পারে, তাহার গালাগালির মধ্যেও খোশামোদ প্রচ্ছন্ন থাকে। শাঁসালো ব্যক্তির খোশামোদ করাই তাহার পেশা। ইদানীং শঙ্কর যেসব পুস্তক অথবা প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়াছিল, তাহা নিপুর মনে পড়িতে লাগিল। প্রত্যেকটি সমালোচনায় খোশামোদের সুর ধ্বনিত হইয়াছে, এমনকি যাহাদের পুস্তকের বিরুদ্ধে সমালোচনাও করিয়াছে, তাহাদেরও এক অদ্ভুত উপায়ে খোশামোদই করিয়াছে, তাহাদের অন্তরঙ্গ হিতৈষী সাজিয়া কটুভাষণের অন্তরালেই তাহাদের তুষ্টিবিধান করিতে চাহিয়াছে। নিপুর বইটার যে এই ছদ্ম-প্রশংসা করিয়াছে, ইহা তাহার ওই হীন মনোবৃত্তিরই পরিচয়। ভালোই যদি না লাগিয়াছিল, সোজা ভাষায় গালাগালি দিলেই পারিত, তাহাতে বরং ন্যায়নিষ্ঠা প্রকাশ পাইত। কিন্তু এ কি!

সহসা নিপুর মনে হইল, ইহাই পেটি-বুর্জোয়া মনোবৃত্তি, ইহারা ক্ষমতাবানের খোশামোদ করিয়া অক্ষমের উপর তাহার প্রতিশোধ লয়। খোশামোদ করিতে পারে না বলিয়া নিপুর এই দুর্দশা।

সহসা তাহার মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল।

সে লিখিতে শুরু করিল।

।। পঁয়ত্রিশ ।।

উৎপল ও সুরমার সহিত অনেক দিন পরে দেখা হইয়া শঙ্কর যেন তাহার পূর্বজীবনের স্বাদ খানিকটা ফিরিয়া পাইল, যে পূর্বজীবনে সুরমার সান্নিধ্যে তাহার মনে প্রথম রঙ ধরিয়াছিল, রিনিকে ঘিরিয়া প্রথম প্রণয়ের উদ্বোধন হইয়াছিল, মিষ্টিদিদির মাদকতায় প্রথম পদস্খলন ঘটিয়াছিল, কলিকাতা শহরের প্রথম স্পর্শে যে জীবন মাধুর্য-আবিলতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, সেই পূর্বজীবনের অনুভূতি তাহার মনে আজ আবার সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল স্মিতমুখী সুরমাকে দেখিয়া। আজ যেন শঙ্কর নূতন করিয়া আবার উপলব্ধি করিল, বিংশ শতাব্দীর যে প্রকাশ আমরা নারী-প্রগতিতে কামনা করি, যে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির স্বপ্ন দেখিয়া আমরা আমাদের মেয়েদের স্কুল-কলেজে পাঠাই, তাহা যেন শোভনভাবে সার্থক হইয়াছে সুরমা-চরিত্রে। সুরমা সুশিক্ষিতা, সুন্দরী, ধনীর কন্যা, ধনীর বধূ। কিন্তু তাহার ব্যবহারে কোনোরূপ উগ্রতা নাই, তাহা অতিশয় বিনম্র ও সুমধুর। কথায় বার্তায়, আকারে ইঙ্গিতে সে ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ করিতে ব্যগ্র হয় না যে, অধুনা-প্রকাশিত বিদেশি পুস্তক সে সর্বদাই পড়িয়া থাকে অথবা তাহাদের চারখানা মোটরকার আছে। অথচ অতি বিনয়ের অভিনয়ও তাহার নাই। তাহার এই সহজ সপ্রতিভ সুমার্জিত রূপ শঙ্করকে বিস্মিত করিয়াছে, তাহাতে কোনোরূপ আড়ষ্টতাও নাই, উচ্ছ্বাসও নাই, সংযম আছে। সে পরপুরুষের সঙ্গে মেশে, আলাপ করে, হাসি-ঠাট্টাতেও যোগ দেয়, কিন্তু তাহার চরিত্রে কোথায় কি যেন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা কিছুতেই শোভনতার সীমারেখা অতিক্রম করে না। শঙ্করের কবিতা উপন্যাস গল্প লইয়া সে অনেক আলোচনা করিল। নীরা বসাকের মত সোচ্ছ্বাসে নয়, নিপুদার মত অবজ্ঞাভরেও নয়, যাহা বলিল, সবিনয় শ্রদ্ধাসহকারেই বলিল। তাহাতে বাচালতা নাই, নিজের বিদ্যা জাহির করিবার চেষ্টা নাই, কিন্তু

আন্তরিকতা আছে। সব লেখার প্রশংসা করিল না, কিন্তু যেগুলির অপ্রশংসা করিল, তাহা অন্তরকে ব্যথিত করে না; কারণ তাহা ঠিক নিন্দা নয়, তাহা যেন 'আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই,' অথবা 'আমার রুচি একটু আলাদা রকমের' জাতীয় মন্তব্য।

উৎপলের বয়স কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু মন বদলায় নাই। সে এখনও ঠিক তেমনই দুষ্ট বুদ্ধি, তেমনই খামখেয়ালি আছে। আগের মতই এখনও সে নূতন কিছু করিবার জন্য সর্বদাই উন্মুখ। দুই বৎসর কাগজ চালাইয়া শঙ্করের মত সেও নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছে যে, সাহিত্য-ব্যবসা ভদ্রলোকের কর্ম নহে। এ দেশে ভদ্রভাবে সাহিত্য-ব্যবসা করিতে গেলে দেশটাকে সর্বাগ্রে প্রস্তুত করিতে হইবে। জমি প্রস্তুত না করিয়া বীজ বপন করা মূর্খতারই নামান্তর।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, কি করে জমি প্রস্তুত করবে তুমি?

শিক্ষা দিয়ে।

কোথায়, কাকে শিক্ষা দেবে?

ও, তুই বুঝি শুনিসনি, আমি আমাদের গ্রামের জমিদারিটা কিনে ফেলেছি? সেখানেই ভাবছি—

কিনে ফেলেছিস? রাজবল্লভবাবুরা কোথা গেলেন?

কলকাতা চলে এসেছেন বোধ হয়। আজকাল অধিকাংশ জমিদারই তো কলকাতায় চলে আসছেন। পাড়াগাঁ আর ভালো লাগছে না তাঁদের।

কি করে কিনলি তুই?

কেনারামবাবুর মারফত।

শঙ্কর ও উৎপল এক গ্রামেরই ছেলে। উৎপল গ্রামের জমিদার হইয়াছে। সংবাদটা শুনিয়া শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

উৎপল সোৎসাহে বলিতে লাগিল, রাজবল্লভবাবুর জমিদারি শুধু আমাদের গ্রামখানি নিয়েই নয়, পাশাপাশি দশখানা গ্রাম আছে। ভাবছি সমস্তটা নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করব। শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি—সব রকমের যাতে উন্নতি হয়, তার চেষ্টা করার ইচ্ছে আছে।

অনেক টাকার দরকার তাতে।

অনেক টাকা আমার আছে। শ্বশুরমশাই যে টাকা আমায় দিয়েছিলেন, তার খানিকটা অবশ্য আমি জার্নালিজম করতে গিয়ে নষ্ট করেছি—খুব বেশি অবশ্য নয়, হাজার দশেক; কিন্তু বাকিটা শ্বশুরমশাইয়ের পরামর্শমত ব্যবসাতে খাটিয়ে অনেক লাভ হয়েছে। টাকার জন্যে আটকাবে না, তা ছাড়া আমি হয়তো প্রথমে একখানা গ্রাম নিয়ে আরম্ভ করব, কেনারামবাবুকে আমার প্ল্যান লিখেও পাঠিয়েছি।

তিনি—

শঙ্কর একটু হাসিল।

তিনি ছাড়া গ্রামে আর তো কোনো বুদ্ধিমান লোকই দেখতে পাই না। তাঁকে দিয়ে যে চলবে না, তা বুঝতে পারছি, ভালো লোকের চেষ্টাতেও আছে; দেখ যদি—

সহসা উৎপল থামিয়া গেল। খানিকক্ষণ শঙ্করের মুখের দিকে সোৎসাহে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, তুই যাবি? তোকে বলতে ভয় করে। তোর আত্মসম্মান যে রকম প্রখর,

হয়তো হঠাৎ চটে উঠবি। চল্ না, দুজনে মিলে নিজেদের গ্রামটার উন্নতি করা যাক। তোর কথার সুরে মনে হচ্ছে আমার মতন তোরও ভুল ভেঙেছে। সাহিত্য-টাহিত্য করে কিছু হবে না এখন এ দেশের। বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ নেই।

তুই কি তোর অধীনে চাকরি নিয়ে যেতে বলছিস আমাকে?

তা ঠিক বলছি না, আমি তোমার সাহায্য চাইছি। তুমি ইচ্ছে করলে স্বাধীনভাবেও থাকতে পার। জ্যাঠামশাই যা রেখে গেছেন, তাতে তোমার স্বচ্ছন্দে চলে যাওয়া উচিত।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। বাবার উইলের কথা সে উৎপলকে বলিতে পারিল না। তাহার মনে পড়িল করালীচরণকে। করালীচরণের আগমন ও নির্গমন বার্তা সে জানিত না। ভণ্টুর সহিত তাহার দেখাই হয় নাই। এই সূত্রে তাহার মনে পড়িল, ভণ্টুর বউদিদি কাল আপিসে শণ্টুকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি একবার তাহার সাক্ষাৎ চান। কাল নানা গোলমালে যাওয়া হয় নাই। সময় করিয়া একবার যাইতেই হইবে। শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল।

উঠছিস? আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখিস একটু।

আচ্ছা।

।। ছত্রিশ ।।

উপন্যাসে যাহা লিখিলে সমালোচকরা নাসা কুঞ্চিত করিয়া মনে করেন যে, আর্ট ক্ষুণ্ণ হইল, লেখক যেন নিজের সুবিধার জন্য জোর করিয়া ঘটনাটা এই স্থানে ঘটাইয়া দিলেন; জীবনে কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে অনেক সময় সত্য সত্যই তাহা ঘটে। শঙ্করের জীবনে ইতিপূর্বে এ রকম একাধিকবার ঘটিয়াছে, আবার ঘটিল।

শঙ্কর অন্যমনস্ক হইয়া তাহার বাবার উইলের কথাই ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতেছিল। হঠাৎ নজরে পড়িল, ফুটপাথের একধারে মোস্তাক বসিয়া আছে। তাহার বগলে একগাদা কাগজ, এক কানে জবাফুল, অন্য কানে বিড়ি, নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া শাঁকালু ভক্ষণ করিতেছে। মোস্তাককে দেখিয়া শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল। হয়তো করালীচরণের খবর এ বলিতে পারে। অন্তত জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে ক্ষতি নাই।

মোস্তাক, কি হচ্ছে এখানে?

মোস্তাক শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মিলিটারি কায়দায় স্যালুট করিল। বগল হইতে কাগজের গাদা ফুটপাথের ওপর পড়িয়া গেল।

আহা, তোমার সব পড়ে গেল যে! দাঁড়াও তুলে দিচ্ছি।

তুলিয়া দিতে গিয়া কিন্তু যাহা তাহার হাতে পড়িল, তাহা যে এখানে এভাবে পাওয়া যাইতে পারে, ইহা তাহার কল্পনাতীত ছিল। তাহার বাবার উইল এবং করালীচরণকে লেখা তাঁহার সেই চিঠিখানা।

এ তুমি কোথা থেকে পেলে?

মোস্তাক তাহার কর্তব্য সমাপন করিয়া পুনরায় শাঁকালুতে মন দিয়াছিল। কোনো জবাব দিল না।

বক্‌সি মশাই কি ফিরেছেন?

এই কথায় মোস্তাক হঠাৎ ফিক করিয়া হাসিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি নাড়িয়া দিল।

আমি এই কাগজ দুখানা নিয়ে যাই, কেমন?

মোস্তাক আপত্তি করিল না, ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। শঙ্কর ভণ্টুর বাড়ি যাইতেছিল, হঠাৎ মোড় ঘুরিয়া ঝামাপুকুরের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার মনে হইল, করালীচরণের খোঁজটা লইয়া যাওয়াই ভালো।

গলিটা ধোঁয়ায় ধূলায় আচ্ছন্ন। পানের দোকানের সামনে একজন কাবুলিওয়ালা একজন পাওনাদারকে লাঞ্ছিত করিতেছে, কয়েকজন লোক দূরে দাঁড়াইয়া সকৌতুকে ঋণগ্রস্ত লোকটার দুর্দশা দেখিতেছে। কাবুলিওয়ালার টকটকে লাল মখমলের জরি বসানো ওয়েস্ট কোটটা স্বল্পালোকেই চকমক করিতেছে। তাহার অন্তরের লোলুপতা নিষ্ঠুরতা যেন উহাতেই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। দূর হইতে শঙ্কর দেখিতে পাইল, করালীচরণের বাসার সম্মুখে আলো জ্বলিতেছে, কে যেন দাঁড়াইয়াও আছে। কাছে গিয়া দেখিল, করালীচরণ নয়—একটি বারবনিতা, সাজসজ্জা করিয়া খরিদ্দারের প্রতীক্ষা করিতেছে। শঙ্কর স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। মুখটা চেনা চেনা বলিয়া মনে হইতেছে। হ্যাঁ, চেনাই তো! এ যে ঊষা—মুক্তোর প্রতিবেশিনী ঊষা। কেরানিবাগান হইতে উঠিয়া আসিয়া এইখানেই ঘরভাড়া করিয়াছে নাকি? করালীচরণ কোথায় গেল?

আসুন বাবু, অনেকদিন পরে যে. পথ ভুলে নাকি?

ঊষাও শঙ্করকে চিনিতে পারিয়াছিল. একমুখ হাসিয়া সংবর্ধনা করিল, শঙ্কর কিন্তু আর দাঁড়াইল না, দাঁড়াইতে পারিল না। সেই ঊষার হাসি আজ এত বীভৎস!

শঙ্কর প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া গলি হইতে বাহির হইয়া গেল।

।। সাঁইত্রিশ ।।

বউদিদি ঘরে খিল দিয়া স্বামীকে পত্র লিখিতেছিলেন। অন্যান্য নানা কথার পর লিখিতেছিলেন, তুমি আর দেরি কোরো না, তাড়াতাড়ি চলে এসে কাজে জয়েন কর। সংসারে খরচ দিন দিন বাড়ছে। ঠাকুরপো এত খরচ একা আর চালাতে পারছে না। কাল তার শ্বশুর এসেছিলেন, তিনি ঠাকুরপোকে নাকি বলেছেন যে, তিনি না হয় মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করবেন, যতদিন না তুমি চেঞ্জ থেকে ফিরে আস। ঠাকুরপো একটু দোনোমনো করছিল, আমি কিন্তু তাতে মত দিলাম না। কুটুমের কাছ থেকে এ ভাবে টাকা নেওয়াটা কি ভালো দেখায়! কিন্তু এটাও ঠিক যে, ঠাকুরপো বেচারা একা আর পেরে উঠছে না। তুমি আর ওখানে থেক না, চলে এস। এখানেই নিয়ম করে থাকলে শরীর সেরে যাবে। নন্টুরও কদিন থেকে রোজ জ্বর আসছে সন্ধেবেলা, কুইনিন খেয়ে গেল না, ডাক্তারবাবু বলেছেন, ওরও নাকি বুকের দোষ জন্মাচ্ছে। ভগবান কপালে কি লিখেছেন, জানি না।

বউদি!

বউদিদি তাড়াতাড়ি কলম নামাইয়া খাতার তলায় চিঠিটা চাপা দিলেন, গায়ের কাপড়-চোপড় ঠিক করিয়া লইলেন, তাহার পর খিল খুলিয়া বাহিরে আসিলেন।

শঙ্কর ঠাকুরপো নাকি? এস, এত রাত্রে যে?

নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে রাত হয়ে গেল। ভণ্টু ঘুমিয়েছে নাকি?

সে শ্বশুর-বাড়ি গেছে ইন্দুকে নিয়ে, জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্ন খেতে।

ও। আমাকে ডেকেছিলেন কেন বলুন তো?

বস, বলছি, দালানেই এস।

বাকুর ঘরের বন্ধ দ্বারের দিকে তাকাইয়া শঙ্কর বলিল, বাকুও আজ বড্ড শিগ্‌গির শুয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে।

ওঁর শরীরটা খুব খারাপ। শোথটা কিছুতেই কমছে না।

অন্য সময় হইলে হয়তো শঙ্কর বাকুর অসুখের বিষয়ে দুই-চারিটি প্রশ্ন করিত। এখন কিন্তু তাহার মনের অবস্থা এরূপ যে, এ সম্বন্ধে সে কিছুই বলিল না। মোস্তাকের নিকট হইতে বাবার উইলের যে নকলটা সে পাইয়াছিল, তাহা সে কুঁচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। বাবার আসল উইলটা দেশে দেরাজের মধ্যে আছে। উইলের কোনো সাক্ষী নাই, উইল রেজিস্টারি করা নাই। সেটাকেও অবলুপ্ত করিয়া দিলে উইলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ কিছু জানিতেই পারিবে না। কিন্তু শঙ্করের মনে হইতেছিল, কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিলেই কি উইল নষ্ট হইয়া যায়? আইনত যাহাই হউক, ধর্মত বাবার বিষয় সে কি লইতে পারে? বাবা তো তাহাকে কিছুই দিয়া যান নাই। সে যদি কখনও নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে, তাহা হইলে অমিয়াই সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইবে, সে নয়—ইহাই তাহার বাবার অন্তিম ইচ্ছা।

বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

শঙ্করকে একটি মোড়া আগাইয়া দিয়া বউদিদি নিজে একখানি আসন টানিয়া বসিলেন। শঙ্কর হঠাৎ যেন বউদিদি ও পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে সচেতন হইল। মোড়াতে বসিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল, বাবাজি কোথায়?

তিনি আজ চলে গেছেন।

চলে গেছেন! কোথায় গেলেন?

তা জানি না। ঠাকুরপোর সঙ্গে আজ সকালে বাইরের ঘরে বসে অনেকক্ষণ কি যে কথা হল, তাও জানি না। ঠাকুরপো আপিস চলে যাবার পর উনিও নিজের জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাইরের ঘরের টেবিলে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছেন দেখলাম।

কি লেখা আছে তাতে?

মুচকি হাসিয়া বউদিদি বলিলেন, মাত্র একটি লাইন—আমার আর ভালো লাগছে না, চললাম।

বউদিদি চুপ করিয়া গেলেন। একটা বিষাদের ম্লান ছায়ায় তাঁহার হাসি যেন বিবর্ণ হইয়া গেল।

আমাকে ডেকেছিলেন কেন?

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া বউদিদি বলিলেন, ঠাকুরপোকে একটা কথা বুঝিয়ে বলতে পারবে তুমি? তুমিই যদি পার, আমি তো বলে বলে হার মেনেছি।

কি কথা?

ইন্দুকে নিয়ে ও আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকুক। এমন করে আমাদের সব্বাইকে নিয়ে ও আর পেরে উঠছে না। ওর মুখের পানে চাইলে কষ্ট হয় আমার। আজকাল জলখাবার খাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের সবাইকে জড়িয়ে কষ্ট পাবার কি দরকার ওর? উনি এসে কাজে জয়েন করুন। তা হলেই আমাদের এক রকম করে চলে যাবে। আমার কথায় ও মোটে কান দেয় না।

শঙ্কর ইহাও প্রত্যাশা করে নাই। ভণ্টুকে ও বউদিদিকে পৃথক পৃথক কল্পনা করিতে সে অভ্যস্ত নহে। বউদিদি এ কি বলিতেছেন।

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কেন, কি, হল কি?

বউদিদি সবিস্তারে সব বলিতে লাগিলেন। ইন্দু অথবা ভণ্টু কাহারও দোষ দিলেন না, কিন্তু অবস্থা যাহা সত্যই দাঁড়াইয়াছে, তাহাই বলিতে লাগিলেন। শঙ্কর চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

।। আটত্রিশ ।।

শঙ্কর যখন বাড়ি ফিরিল, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঢুকিয়া প্রথমেই চোখে পড়িল, লেটার বক্সের ভিতর একখানা মাসিক-পত্রিকা রহিয়াছে। বাহির করিয়া দেখিল 'মজদুর-দর্পণ'। উল্টাইতেই চোখে পড়িল, তাহার সম্বন্ধে একটা সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহার সম্বন্ধে কে কি লিখিল? নিরতিশয় ক্লান্তি সত্ত্বেও সে নীচের ঘরে বসিয়া সাগ্রহে প্রবন্ধটি পড়িতে শুরু করিয়া দিল, নিজের সম্বন্ধে এত বড় দীর্ঘ প্রবন্ধে কে কি লিখিয়াছে, তাহা অবিলম্বে জানিবার লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না। পড়িতে পড়িতে কিন্তু তাহার সমস্ত মন ক্ষোভে গ্লানিতে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। অন্য নাম দেওয়া থাকিলেও নিপুদার লেখা চিনিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। এই ঈর্ষা-তিক্ত যুক্তি, পাণ্ডিত্য প্রকাশের ছলে সকলকে হীন করিয়া দিবার এই প্রয়াস, সহজ ভাবকে দুর্বোধ্য ভাষায় প্রকাশ করিবার এই বক্র ভঙ্গি—নিপুদা ছাড়া আর কাহারও হইতে পারে না। সে যেন মানসপটে নিপুদার মুখখানা দেখিতে পাইল। গালের হাড় উঁচু, চোখের দৃষ্টিতে ঘৃণা, গালে কপালে মেচেতার দাগ, ঠোঁট বাঁকাইয়া কথা বলিবার ভঙ্গি। গ্রন্থকীট লোকটা জীবনে কোথাও কিছু সুবিধা করিতে না পারিয়া অবশেষে 'মজদুর'দের উদ্ধার করিবার ছুতায় যেখানে-সেখানে নিজেকে জাহির করিয়া বেড়াইতেছে।

সহসা পিছনে পদশব্দ শুনিয়া শঙ্কর ঘাড় ফিরাইল। অমিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সমস্ত মুখ বিবর্ণ, সে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। তুমি এত রাত করে ফিরলে?

কেন, কি হয়েছে?

নিতাই ঠাকুরপো—

অমিয়া আর বলিতে পারিল না, তাহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। মেঝের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া চেয়ারে উপবিষ্ট শঙ্করের কোলে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কি করেছে নিতাই?

অনেক জেরার পর শঙ্কর জানিতে পারিল, চাকরটা সন্ধ্যার সময় ছুটি লইয়া চলিয়া

গিয়াছে, অমিয়া বাড়িতে একা ছিল। নিতাই কোথা হইতে মদ খাইয়া আসিয়া হঠাৎ তাহাকে পিছন দিক হইতে জাপটাইয়া ধরে। অনেক ধস্তাধস্তির পর নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া সে পাশের ঘরে খিল দিয়া বসিয়া ছিল। নিতাই টেবিলের ড্রয়ার হইতে চাবির রিং লইয়া আলমারি খুলিয়া তাহার গয়নার বাক্সটা লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

শঙ্কর হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল।

সহসা সে ঠিক করিয়া ফেলিল, গ্রামে ফিরিয়া যাইবে। সাহিত্যের স্বপ্ন তাহার ভাঙিয়া গিয়াছে, কলিকাতায় আর সে থাকিতে পারিবে না।

।। উনচল্লিশ ।।

পরদিন সকালে উঠিয়াই সে উৎপলের সহিত দেখা করিল। বলিল যে, সে তাহার সহিত গ্রামেই ফিরিয়া যাইবে ঠিক করিয়াছে। পল্লী-উন্নয়ন-প্রচেষ্টাতে সে তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু একটি শর্তে।

শর্তটা কি?

আমি তোমার অধীনে চাকরি করব।

বেশ, আমার কোনো আপত্তি নেই তাতে। একজন ভালো লোক তো আমি খুঁজছিই।

কিন্তু আসল শর্তটা হচ্ছে, কথাটা গোপন রাখতে হবে। তুমি এবং আমি ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি এ কথা জানবে না।

তা হলেই তো মুশকিলে ফেললে দেখছি। তৃতীয় একটি ব্যক্তির নিকট আমি ইতিপূর্বেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, তার কাছে কোনো কিছুই গোপন রাখব না।

উৎপল মুচকি হাসিল।

সুরমা। ওর কাছে আমি সব বলি, এমন কি নিজের দুষ্কৃতি পর্যন্ত। তবে ও একটি লোহার সিন্দুকবিশেষ। একবার যা প্রবেশ করবে, তা আর সহজে বেরুবে না। যদি ইচ্ছে কর, ওকেও তুমি বিশ্বাস করতে পার।

শঙ্কর ক্ষণকাল ভাবিল। তাহার পর বলিল বেশ। এইবার আমি উঠি তা হলে, ওই ঠিক রইল।

মাইনে কত নেবে, তা বললে না?

সে তুমি ঠিক কর। যা দেবে, তাতেই আমি রাজি। তবে আর একটা কথা আছে, সেটাও বলে রাখা ভালো। মাইনে আমি কম নিতে রাজি আছি, কিন্তু আমার কাজে তুমি যখন-তখন বাধা দিতে পারবে না। তা হলে কিন্তু বনবে না ভাই।

উৎপল হাসিয়া বলিল, বাধা দিতে হলে যে উদ্যম প্রয়োজন, তা যদি আমার থাকত, তা হলে আমি অন্য লোক খুঁজতাম না, নিজেই সব করতাম। সুতরাং সে বিষয়েও তুমি নির্ভয় থাকতে পার।

।। চল্লিশ ।।

হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ছাড়িতেছিল।

জিনিসপত্র-সহ অমিয়াকে একটা গাড়িতে চড়াইয়া দিয়া শঙ্কর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া ছিল। গতকল্য উৎপল সপরিবারে চলিয়া গিয়াছে, আজ সে যাইতেছে। সকলের সঙ্গেই তাহার প্রায় দেখা হইয়াছে, কেবল ভণ্টুর সঙ্গে হয় নাই। বউদিদি ভণ্টুকে যাহা বলিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও পর্যন্ত অনুক্ত রহিয়াছে। কাল ভণ্টুকে তাহার আপিসে ফোন করিয়া জানাইয়াছে যে, সে বোধ হয় চিরদিনের মত কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইতেছে, বাড়িতে গিয়া তাহার সহিত দেখা হয় নাই, বউদিদিকেও সে বলিয়া আসে নাই যে, হঠাৎ চাকরি ছাড়িয়া দিয়া সে গ্রামে ফিরিয়া যাইতেছে, কেমন যেন চক্ষুলজ্জা হইল, বলিতে পারিল না। অথচ ইহাই বলিতে সে গিয়াছিল। ভণ্টু যদি স্টেশনে আসিয়া তাহার সহিত দেখা না করে, তাহা হইলে হয়তো আর দেখাই হইবে না। আরও একটা প্রয়োজনীয় কথা আছে তাহার সঙ্গে। শঙ্কর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া ভণ্টুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল... সিগারেট পুড়িয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া গেল, কিন্তু ভণ্টু আসিল না। সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে চুনচুন আসিয়া হাজির হইল। চুনচুনের সহিতও সে দেখা করিয়া আসে নাই। শঙ্কর প্রত্যাশা করিতে লাগিল যে, চুনচুনই আসিয়া প্রথমে কথা কহিবে, কিন্তু চুনচুন সেসব কিছুই করিল না। অন্য দিকে চাহিতে চাহিতে, যেন সে শঙ্করকে দেখিতেই পায় নাই এমন ভাবে, প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চলিয়া গেল। শঙ্কর খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর ডাকিল। মনে হইল, চুনচুন যেন ডাকটাও শুনিতে পাইল না। সামনের প্ল্যাটফর্মে আর একটা প্রায়-খালি প্যাসেঞ্জার ট্রেন দাঁড়াইয়া ছিল, বোধ হয় কোনো লোকাল ট্রেন, তাহারই একটা কামরায় গিয়া চুনচুন উঠিয়া পড়িল। শঙ্করের মনে হইল, হয়তো কোথায় যাইবে, আমাকে দেখিতে পাইল না! আগাইয়া গিয়া আলাপ করিবে কি না ভাবিতেছে, এমন সময় ভণ্টুর ভাইপো শন্টু আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভণ্টু কোথায়?

কাকা এখানে আসবেন বলেই বেরিয়েছিলেন বাইকে করে। রাস্তায় হঠাৎ একটা গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে তিনি পড়ে গেছেন। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাকে পাঠিয়ে দিলেন আপনাকে খবরটা দিতে।

খুব বেশি লেগেছে নাকি?

পায়ের হাড় ভেঙে গেছে।

ও!

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, যাওয়ার সময় তার সঙ্গে আর দেখাটা হল না দেখছি। আচ্ছা, তুমি যাও। আমি গিয়েই চিঠি লিখব, কেমন থাকে খবরটা দিও আমাকে।

আচ্ছা।

প্রণাম করিয়া শন্টু চলিয়া গেল। শঙ্কর হাতঘড়িটা একবার দেখিল, ট্রেন ছাড়িতে এখনও কিছু বিলম্ব আছে। অমিয়াকে বলিল, তুমি বস, আমি আসছি। শঙ্কর দ্রুতপদে চলিয়া গেল। স্টেশনে সকলের ব্যবহারের জন্য যে ফোন আছে, তাহারই সহায়তায় মেডিকেল কলেজ

ইমারজেন্সি রুমের একটি ডাক্তারের সহিত সে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল।

ভণ্টু নামে আমার একজন বন্ধু এখুনি বাইক থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে আপনাদের ওখানে গেছে। তাকে যদি দয়া করে একটু বলে দেন যে, শঙ্করবাবু ফোন করেছিলেন। নিতান্ত দরকারে আমাকে আজ চলে যেতে হচ্ছে, জিনিসপত্র সব ট্রেনে তুলে দিয়েছি, তা না হলে আমি এখনি তাকে দেখতে যেতাম। বলে দিন যে, আমি হাওড়া স্টেশন থেকে ফোন করছি। আজ্ঞে হ্যাঁ, এখুনি যদি বলে দেন, বড় ভালো হয়। মর্ফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে? ও, আচ্ছা, উঠলে বলবেন। আচ্ছা, থ্যাঙ্ক্‌স।

ফোনটা করিয়া শঙ্কর যেন খানিকটা তৃপ্তিলাভ করিল। কিছু করিতে না পারিয়া সে যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিতেই শঙ্কর একরূপ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিল। আসিয়াই দেখে চুনচুন দাঁড়াইয়া আছে। শঙ্কর কিছু বলিবার পূর্বেই সে হেঁট হইয়া শঙ্করকে প্রণাম করিল। ট্রেন চলিতে শুরু করিয়াছে, আর দাঁড়াইয়া থাকা চলে না, শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি খবর তোমার? ভালো আছ তো?

চুনচুন স্মিতমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, কোনো উত্তর দিল না, ট্রেন চলিয়া গেল।

।। একচল্লিশ ।।

গ্রামে যখন শঙ্কর পৌঁছিল, তখন প্রভাত হইতেছে। সে পূর্বে কোনো খবর দেয় নাই। সব জিনিসপত্র লইয়া এমন হঠাৎ আসিয়া পড়িল কেন, তাহা শঙ্করের মা বুঝিতে পারিলেন না। সবিস্ময়ে শুষ্কমুখে নীরবে চাহিয়া রহিলেন। তুই হঠাৎ এসে পড়লি যে?

শহর আর ভালো লাগছে না, তোমার কাছেই থাকব এবার ঠিক করেছি।

আমার কাছে থাকবি?

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সহসা তিনি আর্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, আমি রাক্ষসী, তোর ভাইকে খেয়েছি, বাপকে খেয়েছি, তোকেও খেয়ে ফেলব। পালা, পালা, পালা আমার কাছে থেকে।

সেইদিন রাত্রেই তিনি সম্পূর্ণরূপে আবার পাগল হইয়া গেলেন। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন, এখানে ঠিক সুচিকিৎসা হওয়া সম্ভব নয়, রাঁচি পাঠানো উচিত।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়

।। এক ।।

চার বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।

প্রভাত হইতেছে, বাতায়নের ফাঁকে ফাঁকে আলো দেখা যাইতেছে। শঙ্করের ঘুম এখনও ভাঙে নাই, কিন্তু দুই বৎসরের শিশুকন্যাটির ঘুম ভাঙিয়াছে এবং সে বুকের উপর চড়িয়া চোখের ভিতর ছোট ছোট আঙুল ঢুকাইয়া ডাকিতেছে, বাবা ওত, ও বাবা, ওত।

শঙ্কর হাসিয়া চোখ খুলিল। অমিয়া আগেই উঠিয়া রান্নাঘরে আঁচ দিতে গিয়াছিল, সে ঘরে ঢুকিল। মেয়ের কাণ্ড দেখিয়া মুচকি হাসিয়া বলিল, মেয়ের বেলায় হাসা হচ্ছে, আর আমি ওঠাতে গেলে ধমক খেয়ে মরি।

শঙ্কর আর একটু হাসিয়া চোখ বুজিয়া আবার পাশ ফিরিল।

পাশ ফিরে শুচ্ছো যে, তোমার আজ ছবিগঞ্জে যাবার কথা নয়?

মনে আছে।

কন্যা ডাকিল, বাবা, ওত।

শঙ্কর উঠিয়া বসিল। সত্যই তাহার অনেক কাজ, শুইয়া থাকিলে চলিবে না। ছবিগঞ্জে আজ একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিবার কথা। তা ছাড়া আরও অনেক কাজ আছে। বাহিরের ঘরে হয়তো ইতিমধ্যেই জনসমাগম হইয়াছে। কন্যা গলা জড়াইয়া গালে গাল রাখিয়া শুইল। অমিয়া চা করিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

ছাড়, এবার আমাকে উঠতে হবে।

না।

ভারি আদুরে দুষ্টু হয়েছ তুমি।

তুমি দুত্তু।

আরও নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ধরিল। শঙ্করের মনে হইল, এমনভাবে তাহাকে আর কেহ বোধ হয় কখনও বাঁধে নাই। জীবনে অনেকের বাহুপাশে সে বাঁধা পড়িয়াছে, কিন্তু এ নিগড়ের নিকট সেসব অকিঞ্চিৎকর। তাহারই নিজের অন্তরের নিগূঢ় কামনা, যাহা বারংবার বহু নরনারীকে বাঁধিতে চাহিয়াছিল কিন্তু পারে নাই, তাহাই যেন তাহার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

ভৃত্য আসিয়া প্রবেশ করিল এবং বলিল, বাহিরের ঘরে কেনারামবাবু কয়েকজন লোককে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন।

চল, যাচ্ছি। একে নাও।

না, দাব না।

যাও লক্ষ্মীটি।

না—না—না।

জোর করিয়া চাকরের কোলে তাহাকে দিয়া শঙ্কর উঠিয়া পড়িল।

বাহিরের ঘরে কেনারাম চক্রবর্তীর সঙ্গে আসিয়াছিল ফরিদ এবং কারু। উভয়েরই উদ্দেশ্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করা। কেনারাম চক্রবর্তী ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি, সুপারিশ করিতে আসিয়াছেন। উৎপলের .এবং কয়েকজন বর্ধিষ্ণু প্রজার টাকায় গ্রামে একটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। গভর্নমেন্টও কিছু টাকা তাহাতে দিয়াছেন, ঋণস্বরূপই দিয়াছেন। এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য, মহাজনদের হাত হইতে গরিব প্রজাদের রক্ষা করা। গরিব প্রজারা মহাজনদের নিকট হইতে অতিশয় চড়া সুদে টাকা কর্জ করিয়া সর্বস্বান্ত হয়। এই ব্যাঙ্ক কম সুদে টাকা ধার দেয় এবং ফসল উঠিলে কিস্তিতে কিস্তিতে তাহা শোধ করিয়া লয়। কেনারাম চক্রবর্তীর কর্তব্য, অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাহাতে ব্যাঙ্কের টাকা মারা না পড়ে। তিনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, ঋণপ্রার্থীর বিষয়সম্পত্তি এমন আছে কি না, যাহা হইতে টাকা উদ্ধার হইতে পারে এবং লোকটা বিশ্বাসযোগ্য কি না; টাকা লইয়া সরিয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে কি না! কেনারামবাবু ভূতপূর্ব জমিদার রাজবল্লভের নায়েব, এ অঞ্চলে সমস্ত প্রজার প্রকৃত অবস্থা তাঁহার জানিবার কথা, সুতরাং তাঁহাকেই সেক্রেটারি করা হইয়াছে। শঙ্কর অবশ্য সর্বময় কর্তা। তাহার অনুমতি ছাড়া কিছুই হইবে না, ইহা কেনারামবাবুর সম্মতিক্রমেই উৎপল নির্ধারিত করিয়াছে।

কেনারাম চক্রবর্তী যদিও সারাজীবন নায়েবি করিয়া কাটাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে নায়েব বলিয়া মনে হয় না, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বলিয়া মনে হয়। হাব-ভাবে পোশাক-পরিচ্ছদে কথায়-বার্তায় তাঁহার যে মার্জিত রূপটি বিচ্ছুরিত হয়, তাহা সম্ভ্রম উদ্রেককারী। তাঁহার ঢিলা-হাতা এন্ডির পাঞ্জাবি, ধবধবে সাদা বাঁধানো দাঁত, ক্ষৌরীকৃত মুখমণ্ডলে বুদ্ধিদীপ্ত গাম্ভীর্য, অতিআধুনিক বুকনি-সমন্বিত আলাপ—সমস্ত মিলিয়া এমন একটা সুষ্ঠু প্রকাশ যে, ভিতরের আসল মানুষটিকে চিনিতে দেরি লাগে, অনেক সময় চেনাই যায় না। কেনারামবাবু শঙ্করের পিতৃবন্ধু, সুতরাং শঙ্কর তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলে। উৎপলও দূর হইতে তাঁহাকে যতটা তুচ্ছ করিয়াছিল, নিকটে আসিয়া দেখিল, তিনি ততটা উপেক্ষণীয় নহেন। এমন কি এ বিশ্বাসও তাহার হইল যে, তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে তাহার এই পল্লী-উন্নয়ন চেষ্টা হয়তো ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সুতরাং একটা বড় বিভাগের শীর্ষদেশে তাঁহাকে স্থাপন করিতে সে ইতস্তত করিল না। কেনারামবাবু এ ব্যাপারে প্রথমে কোনো দায়িত্বপূর্ণ কর্ম লইতে স্বীকৃতই হন নাই। তাঁহার ভাবটা ছিল, তোমরা ছেলে-ছোকরার দল, দেশের কাজ করিতে চাহিতেছ, এ তো বেশ ভালো কথা, তোমরা নিজেদের নিয়মে, নিজেদের বুদ্ধি অনুসারেই চল না—আমাদের মত বুড়াকে আবার ওসবের মধ্যে টানিতে চাও কেন? উৎপলের অনুরোধেই তিনি যেন অবশেষে খানিকটা অনিচ্ছা সহকারে এবং খানিকটা আবদারের খাতিরে শঙ্করের অধীনে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি হইতে রাজি হইয়াছেন।

শঙ্কর বাহিরে আসিতেই কেনারামবাবু বলিলেন, দুটো গরিব প্রজাকে টাকা ধার দিতে হবে, তারা এসেছে, তোমার যা জিজ্ঞেস করবার করতে পার।

আমি আর কি জিজ্ঞেস করব? আপনি যখন এনেছেন—

কেনারামবাবু স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, তোমার এটা কর্তব্য বলেই বলছি।

আমি কি আর আপনার চেয়ে ভালো বুঝি? কত টাকা চায়?

প্রত্যেকেই চায় হাজার খানেক করে, দেবে কি না ভেবে দেখ। ফরিদের দশ বিঘে জমি আছে, কারুর আছে আট বিঘে। এ ছাড়াও বাস্তুভিটেও আছে অবশ্য দুজনের।

বেশ তো, আপনি যদি ভালো বোঝেন—

ভালোমন্দ বোঝবার ভার তোমার, তুমিই ফাইনাল অথরিটি—

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। কেনারামবাবুও চুপ করিয়া রহিলেন। কেবল তাঁহার চক্ষু দুইটি হইতে কৌতুকপূর্ণ একটা নীরব হাস্য যেন উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। চতুর দাবা খেলোয়াড় চাল আগাইয়া দিয়া যেমনভাবে বিপক্ষের মুখের দিকে চায়, অনেকটা তেমনিভাবেই তিনি চাহিয়া রহিলেন।

শঙ্কর বলিল, বেশ তো দেওয়া যাক। গরিব প্রজাদের উপকারের জন্যেই তো ব্যাঙ্ক।

কথাটা লুফিয়া লইয়া কেনারাম বলিলেন, উপকার কথাটাই যদি ব্যবহার করছ, তা হলে বেশি কড়াক্কড়ি করাটা অনুচিত। করলে তোমাদের সঙ্গে নেকিরামের অথবা রাজীববাবুর কোনো তফাত থাকে না।

তা তো বটেই। প্রজাদের উপকার করাই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে টাকাটা যাতে মার না যায়, সেটা যথাসম্ভব দেখতে হবে।

সে তো একশোবার। তবে 'যথাসম্ভব' কথাটা মনে রেখ। নেকিরাম-রাজীববাবুর টাকাও মারা যায়, এমনকি কাবুলিওয়ালারাও সব সময়ে টাকা আদায় করতে পারে না, তাই ওদের সুদ অত চড়া—

আপনি যদি ভালো মনে কবেন, ওদের টাকা দিন না, আমার আপত্তি নেই।

বেশ।

পকেট হইতে কেনারামবাবু একটি ছাপান অনুমতি পত্র বাহির করিলেন।

সই করে দাও তা হলে।

শঙ্কর সই করিয়া দিল। কেনারামবাবু উঠিয়া পড়িলেন, শঙ্কর উঠিয়া তাঁহার সহিত বারান্দা পর্যন্ত আসিল। বারান্দায় ফরিদ ও কারু জোড়হস্তে বসিয়াছিল। একজন হিন্দু, একজন মুসলমান। উভয়ের মধ্যে কিন্তু কোনো তফাত নাই। উভয়েরই অনাহারক্লিষ্ট মূর্তি, পরিধানে শতছিন্ন মলিন বসন, উভয়েরই দৃষ্টি ম্লান ভীতচকিত, উভয়েই ঋণে জর্জরিত, রোগে জীর্ণ, নানা অভাবে নিষ্পিষ্ট দরিদ্র চাষী।

।। দুই ।।

আহারাদির পর শঙ্কর ছবিগঞ্জের দিকে গরুর গাড়ি চাপিয়া রওনা হইল। সেখানে মুকুন্দরাম পোদ্দারের বৈঠকখানায় নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। মুকুন্দরাম একজন ধনী মহাজন, ছবিগঞ্জের মাতব্বর ব্যক্তি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, নতুন জমিদার উৎপলের এই সকল

জনহিতকর কার্যের প্রতি তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন, শঙ্করের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধাশীল। ছবিগঞ্জে কিছুদিন পূর্বে যে নতুন পাঠশালাটি স্থাপিত হইয়াছে, তাহার ঘরটিও তিনি দিয়াছেন। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে একটি বালিকা বিদ্যালয় করিবার সহায়তাও তিনি করিবেন।

কলিকাতা পরিত্যাগের পর দেখিতে দেখিতে চার বৎসর কাটিয়া গেল। যে উদ্দেশ্য ও আদর্শ লইয়া সে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছিল, তাহা অনেকটা সফল হইয়াছে বইকি। দশটি পাঠশালা, একটি বালিকা বিদ্যালয়, গোটা দুই দাতব্য চিকিৎসালয়, দুইটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। দরিদ্র চাষীদের জলকষ্ট নিবারণের জন্য প্রতি গ্রামে গ্রামে নতুন ইঁদারা প্রস্তুত করানো হইয়াছে, পুরাতন কূপগুলির সংস্কার-সাধন করা হইতেছে। ইহা ছাড়া অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, সহজ-প্রতিষেধ্য সংক্রামক ব্যাধি নিবারণ প্রভৃতির জন্যও চেষ্টার ত্রুটি নাই।

এই শেষোক্ত কার্য দুইটির ভার সে নিপুদাকে দিয়াছে। মাস ছয়েক পূর্বে নিপুদা নিজে নিতান্ত দুরবস্থার সুদীর্ঘ বিবরণ দিয়া শঙ্করকে একখানি পত্র লিখিয়াছিল। লিখিয়াছিল যে, আত্মীয়স্বজন কাহারও সহিত তাহার বনিতেছে না। কাকা-কাকির অনুগ্রহপ্রদত্ত অন্ন এবং সদিচ্ছা-প্রণোদিত উপদেশ আর সে হজম করিতে পারিতেছে না। যে কেরানিগিরি সে কিছুকাল পূর্বে জোগাড় করিয়াছিল, তাহাতে সে টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। টিকিয়া থাকিতে পারিলে হয়তো জীবনের শেষে মাসিক পঁচাত্তর টাকার গ্রেডে উন্নীত হইতে পারিত; কিন্তু তাহার জন্য প্রত্যহ যে পরিমাণ হীনতা স্বীকার করিতে হইত, তাহা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং সে চাকুরি গিয়াছে। প্রাইভেট টিউশনি করিয়া কিছুদিন চলিয়াছিল, একটি ভালো ছাত্রও জুটিয়াছিল। ছাত্রের অভিভাবকেরাও ভদ্রলোক ছিলেন অর্থাৎ সামান্য কারণে প্রাইভেট টিউটরকে কড়া কথা শুনাইয়া কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের ছিল না। বেতনও ভালো দিতেন। কিন্তু সে চাকরি বেশিদিন রহিল না, কারণ ছাত্রটি একবারেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করিয়া ফেলিল। আরও দুই-এক স্থানে টিউশনি জুটিয়াছিল, কিন্তু অভিভাবকদের অভদ্রতা অথবা অতিশয় কম বেতন অথবা ছাত্রের ধৈর্যচ্যুতিকর নির্বুদ্ধিতা—একটা না একটা কারণের জন্য তাহাকে সে সব ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। শূন্য বখরাদার হইয়া অর্থাৎ নিজের পরিশ্রম এবং বুদ্ধি ক্যাপিটালস্বরূপ দান করিয়া সে একজন বন্ধুর সহিত ব্যবসায়ে যুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়াতে ব্যবসাটি ফেল করিয়াছে। এইসব বর্ণনা করিয়া অবশেষে সে লিখিয়াছিল যে, দুর্ভাগ্যক্রমে এমন দেশে এমন সময়ে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে যে, কিছুতেই ভদ্রভাবে এক মুঠা অন্ন জুটিতেছে না, অথচ সে কাজ করিতে প্রস্তুত, তাহার বুদ্ধির অভাব নাই, বিদ্যাও যৎকিঞ্চিৎ আছে। সোবিয়েত রাশিয়াতে জন্মগ্রহণ করিলে তাহার এমন দুর্দশা নিশ্চয়ই হইত না। সাহিত্য-পথেও সে চেষ্টা কম করে নাই। ইংরেজি বাংলা কয়েকটা প্রবন্ধ লিখিয়া সে নামজাদা সম্পাদকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছে। কিন্তু কোথাও সেগুলি ছাপা হয় নাই। সর্বত্রই একটা না একটা দল নিজেদের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া বসিয়া আছে, কিছুতেই বাহিরের লোককে সেখানে ঢুকিতে দিবে না। যদিও বা অতি কষ্টে কোথাও প্রবেশাধিকার মেলে, প্রবন্ধের ন্যায্য পারিশ্রমিক মিলিবে না। 'মজদুর-দর্পণ' কাগজের এমন আয় নাই যে, বেশি মূল্য দিয়া তাহার প্রবন্ধ কিনিতে পারে। কাকা-কাকির সংস্রব সে ত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং এখন হয় অনাহারে, না হয় আত্মহত্যা করিয়া তাহাকে

মরিতে হইবে। শঙ্কর নাকি তাহার এক উদার বন্ধুর অর্থে পল্লী-উন্নয়ন করিতেছে, সে যদি তাহাকে কোনো একটি—ইত্যাদি।

শঙ্করের সহিত নিপুদা যদিও ভালো ব্যবহার করে নাই, তবু শঙ্কর তাহাকে আহ্বান করিয়া অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও স্যানিটেশনরে কাজে লাগাইয়া দিয়াছে। নিজেও সে একদিন অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিল, এ অবস্থায় দুঃখটা যে কত গভীর ও শোচনীয়, তাহা তাহার অবিদিত ছিল না। যে হিরণদার অনুগ্রহে সে উদ্ধার-লাভ করিয়াছিল, সেই হিরণদারই বন্ধু নিপুদা। চক্ষুলজ্জাবশতই শঙ্কর প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই। উৎপলও আপত্তি করে নাই। কোনো বিষয়ে সে আপত্তি করে না। সে টাকা দিয়াই নিশ্চিন্ত, শঙ্করকেই সে সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ মালিক করিয়া দিয়াছে। পাঁচ বৎসর পরে সে কেবল হিসাব-নিকাশ লইবে, কার্য কতদূর অগ্রসর হইল। ইতিমধ্যে শঙ্কর যা ভালো বোঝে করুক, সে কোনো কথা বলিবে না।

বালিকা বিদ্যালয়টির জন্য শঙ্কর কলিকাতা হইতে হাসিকে আনাইয়াছে। সাধারণত সেই সব শিক্ষিতা মহিলারা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীপদে বাহাল হন, যাঁহারা কুরূপের জন্য অথবা অর্থাভাবে সমাজে স্বামী সংগ্রহ করিতে পারেন না। হতাশ প্রণয়িনীও মাঝে মাঝে আসিয়া জোটেন। শঙ্করের ধারণা—শিক্ষয়িত্রী হিসাবে ইঁহারা অযোগ্য। শিক্ষয়িত্রী হইতে হইলে মনের যে সমতা ও প্রসন্নতা থাকা উচিত, তাহা ইঁহাদের না থাকিবার কথা। ইঁহারা বঞ্চিত ক্ষুধিত, ইঁহাদের সমস্ত মনপ্রাণ পড়িয়া থাকে সেই সব ভোগৈশ্বর্যের দিকে যাহা তাঁহারা পান নাই, অথচ যাহাদের সম্বন্ধে তাঁহাদের বৈরাগ্যও জন্মে নাই। মাতৃত্বই নারীত্বের পূর্ণ পরিণতি। তাহা লাভ না করিলে চিত্তের স্বাভাবিক বিকাশ হয় না। তাই হাসিকে সে আনিয়াছে। হাসির শুধু যে বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা আছে তাহাই নহে, স্বামী-চরিত্রের বৃহৎ আদর্শের সংস্পর্শে আসাতে সে অভিজ্ঞতা মহত্ত্বপূর্ণ। তাহার নারীমনের অবলম্বন স্বরূপ একটি পুত্রও আছে। হাসি প্রথমে আসিতে চায় নাই। অনেক অনুরোধ করিয়া তাহাকে সে আনিয়াছে এবং বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভার তাহার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত আছে।

গরুর গাড়ি চলিয়াছে। রাস্তার দুই পাশে চাষের জমি। দূরে দূরে চাষারা টোকা মাথায় দিয়া লাঙল চষিতেছে। কত দরিদ্র অথচ কত মহৎ উহারা! উহাদের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়া শঙ্কর মনে-প্রাণে ইহাই বুঝিয়াছে যে, মানব-চরিত্রে যেসব গুণকে আমরা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি, তাহা উহাদের চরিত্রেই প্রচুর পরিমাণে আছে। তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকদের 'চরিত্র' বলিয়া এমন কোনো কিছু নাই, যাহাকে শ্রদ্ধা করা যায়; যাহা আছে, তাহা স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল একটা হীন-ধরনের চতুরতা মাত্র। এই শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা সত্যই বড় দুর্দশাপন্ন। ইহারা ভালো করিয়া ভোগও করিতে পারে না, ত্যাগও করিতে পারে না। ইহারা আর পাঁচজনকে দেখাইয়া ভোগের একটা অভিনয় করে মাত্র, এবং সেই লেফাপা বজায় রাখিবার জন্য আজীবন প্রাণপণ করে। সত্যকার ত্যাগের নাম শুনিলে ইহারা ভয় পায়। তবে ত্যাগের অভিনয় করিয়াও অনেক সময় লেফাপা বজায় রাখিতে হয়, সে রকম ত্যাগ ইহারা করে মাঝে মাঝে। কিন্তু মুখোশ কিছুদিন পরেই খসিয়া যায় এবং তখন ইহাদের কদর্য স্বরূপ দেখিয়া সকলে আতঙ্কিত হইয়া ওঠে।

সহসা তাহার মনে হইল, এই সব লইয়া একটা উপন্যাস লিখিলে কেমন হয়? ম্যাক্সিম গোর্কিক 'মাদারে'র মত উপন্যাস সে কি লিখিতে পারে না? না, সময় নাই, তাহার অনেক

কাজ। অনেক কাজ সত্ত্বেও কিন্তু তাহার মন সাহিত্যবিমুখ হয় নাই। সাহিত্যকে সে ত্যাগ করিতে পারে নাই। যাহা তাহার অন্তরের বস্তু তাহাকে ত্যাগ করিবে কি করিয়া? সময় পাইলে, এমনকি সময় নষ্ট করিয়া এখনও সে সাহিত্যচর্চা করে। ছোট গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ এখনও সে মাঝে মাঝে লেখে বইকি, সাময়িক পত্রিকাদিতে সেসব প্রকাশিতও হয়। 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার সঙ্গে অবশ্য এখন তাহার পূর্বের সে সম্বন্ধ নাই। 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকা সে লোকনাথবাবুকে দান করিয়া দিয়াছে—লোকনাথ স্বেচ্ছায় যাচিয়া স্বয়ং সে ভার লইয়াছেন। সে পত্রিকার কাজ এখন—লোকনাথবাবুরই সাহিত্যিক মতামত লিপিবদ্ধ করা। বাহিরের কোনো লেখকের নিকট তিনি লেখা ভিক্ষা করেন না, বিজ্ঞাপনদাতাগণের মুখ চাহিয়া আত্মমর্যাদা নষ্ট করেন না, কোনো বড়লোকের খাতিরে নিজের সাহিত্যবুদ্ধিকে একচুলও বিচলিত করেন না। তাঁহার সারস্বতসাধনার ত্রিসীমানায় তিনি লক্ষ্মী অথবা লক্ষ্মীর বাহনদের সামান্য ছায়াপাতও সহ্য করিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং 'ক্ষত্রিয়' কাগজের চাহিদা নাই। বিক্রয়ের জন্য সজ্জিত হইয়া স্টলে স্টলে তাহা খরিদ্দারের আশায় মাসে মাসে পথ চাহিয়াও থাকে না। তাহা মাঝে মাঝে বাহির হয়। ঠিক মাসে মাসে নয়, সাহিত্য রসিকদের নিকট বিনামূল্যে বিতরিত হয়। লোকনাথ ঘোষালের অথ-সামর্থ্য কতটা তাহা শঙ্কর ঠিক জানে না। শুধু জানে যে, তিনি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকরা সাধারণত দরিদ্র, লোকনাথবাবু কি করিয়া যে নিজ ব্যয়ে 'ক্ষত্রিয়' ছাপাইয়া বিতরণ করেন, তাহা ভাবিয়া শঙ্কর বিস্মিত হয়। তাঁহাকে চিঠিতে এ সম্বন্ধে সে প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু তিনি এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দেন নাই। 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকায় শঙ্কর এখনও মাঝে মাঝে লেখে, কিন্তু সে লেখা লোকনাথ ঘোষালের অনুমোদন লাভ করিলে তবে প্রকাশিত হয়। বাজে লেখা লোকনাথ ঘোষাল ছাপে না, শঙ্করের অনেক লেখা তিনি ফেরত দিয়াছেন। লোকনাথ ঘোষালকে শঙ্কর একটি বিদ্যালয়ের ভার লইয়া তাহার পল্লী উন্নয়ন কার্যে সাহায্য করিবার জন্যও আমন্ত্রণ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি নিজের যে মাইনর স্কুলে এতদিন কাটাইয়াছেন, প্রথম যৌবনে চেষ্টা চরিত্র করিয়া যাহা তিনি নিজেই একদিন স্থাপন করিয়াছিলেন, সে স্কুল ছাড়িয়া কোথাও তিনি যাইবেন না।

'সংস্কারক' পত্রিকাতেও শঙ্কর মাঝে মাঝে লেখে। এ পত্রিকাটিও হস্তান্তরিত এবং রূপান্তরিত হইয়াছে। সেখানে আজকাল হীরালাল মজুমদার অথবা নিলয়কুমার নাই, কুমার পলাশকান্তিই বর্তমান স্বত্বাধিকারী। অর্থাৎ অনিল এবং নীরাই বর্তমান 'সংস্কারব' পত্রিকার কর্ণধার। কুমার পলাশকান্তির উপন্যাস, অনিল সান্যালের বৈজ্ঞানিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ধর্মনৈতিক সামাজিক প্রবন্ধ এবং নীরার গল্প-কবিতাই এখন 'সংস্কারকে'র অধিকাংশ পৃষ্ঠা পূর্ণ করিতেছে। নিলয়কুমারের কবিপত্নী রেণুকাদেবীও 'সংস্কারক' পত্রিকায় নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। তিনি প্রায়ই প্রেমের কবিতা লেখেন এবং তাহা 'সংস্কারকে'র প্রথম পৃষ্ঠাতেই ছাপা হয়। নীরার অনুরোধে শঙ্করও মাঝে মাঝে লেখে।

হীরালাম মজুমদারের 'সংস্কারক' কি করিয়া কুমার পলাশকান্তির হইয়া গেল, সে ইতিহাস বড় করুণ। একদা ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যভাষণের জন্য, নিরপেক্ষ সমালোচনার জন্য, সততা ও সাহিত্যিক নিষ্ঠার জন্য 'সংস্কারক' পত্রিকার যে সুনাম ছিল, সেই সুনামের সুবিধা লইয়া ভাগিনেয় নিলয়কুমার বিলাসব্যসন চরিতার্থ করিতে করিতে পত্রিকাখানিকে এমন অবস্থায়

আনিয়া ফেলিলেন যে, তাহার গৌরবময় অগ্রগতি আর সম্ভব ছিল না। ভালো পত্রিকায় ভালো লেখকমাত্রেই লিখিতে চায়। আরও প্রলোভন ছিল 'সংস্কারকে'র বিজ্ঞাপনে লেখা থাকিত—ভালো লেখা সমুচিত মূল্য দিয়া গ্রহণ করা হয়, এবং রচনা-নির্বাচনে সাহিত্যিক মানদণ্ড ছাড়া অন্য কোনো প্রকার মানদণ্ড ব্যবহৃত হয় না। এই উচ্চাদর্শে উৎসাহিত হইয়া অনেক ভালো লেখক তাঁহাদের রচনা 'সংস্কারক' পত্রিকায় প্রেরণ করিতেন। ক্রমশ কিন্তু এই কথাটাই সকলের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, বিজ্ঞাপনে যাহাই লেখা থাক্, লেখার মূল্য সহজে কেহ পাইবেন না এবং লেখার মূল্য লইয়া বেশি কড়াকড়ি করিলে সে লেখা ছাপা হইবে না। ইহাও বুঝিতে কষ্ট হইল না যে, 'সাহিত্যিক মানদণ্ড'ও বিজ্ঞাপনের বুলি মাত্র, চালিয়াত নিলয়কুমার স্বকীয় মানদণ্ডই আসল মাপকাঠি এবং সে মাপকাঠিই স্থূল কথা—অর্থ, মানে, সেই অর্থ যাহা দিয়া মোটর কেনা যায় অথবা ঋণ শোধ হয়। পত্রিকার কর্মচারীগণ সময়ে বেতন পাইতেন না। শুধু লেখক এবং কর্মচারীগণই নয়, একটা পত্রিকার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে অন্যান্য যেসব ব্যক্তি জড়িত থাকেন, তাঁহারাও 'সংস্কারকে'র সুনামে আস্থা স্থাপন করিয়া শেষ পর্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিলেন। কাগজওয়ালা, টাইপ সরবরাহকারী, কালির দোকানদার, ব্লক প্রস্তুতকারক—কেহই কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, 'সংস্কারক' পত্রিকার টাকা আদায় করিবার জন্য তাঁহাদের আদালত পর্যন্ত ছুটিতে হইবে। হীরালাল মজুমদার সত্যই বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার নিকটে গেলে তিনি সত্য কথাই বলেন, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, কিছুই দেখতে শুনতে পারি না, আপনারা নিলয়ের কাছে যান, সে-ই সব ব্যবস্থা করবে। নিলয়ের কাছে যাইতে তাঁহাদের আপত্তি নাই, গিয়াছিলেনও। কিন্তু সাহেবি প্রকৃতির নিলয়কুমারের দেখা পাওয়াই শক্ত, তিনি প্রায় সর্বদাই 'নট অ্যাট হোম'। অনেক হাঁটাহাঁটির পর দৈবাৎ তাঁহার দর্শন মিলিলে টাকার পরিবর্তে তিনি তারিখ দিতেন এবং প্রায়ই সে তারিখের মর্যাদা রক্ষা করিতেন না। সুতরাং বাধ্য হইয়া সকলে আদালতের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। কুমার পলাশকান্তি উদ্ধার না করিলে হয়তো 'সংস্কারক' পত্রিকা অবলুপ্ত হইয়া যাইত। কুমার পলাশকান্তির এবম্বিধ হিতৈষণা নিশ্চয় প্রশংসনীয়। যদিও দুষ্টলোকে রটাইয়াছে যে, সাহিত্য-প্রীতিবশত ততটা নহে, যতটা নিলয়কুমারের পত্নী রেণুকার জন্যই তিনি নাকি এই জনহিতকর কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন। রেণুকার ন্যায় জনৈকা বিদুষী কবি অর্থাভাবে কষ্ট পাইবেন, তাহা পলাশকান্তির ন্যায় মহাপ্রাণ নাকি সহ্য করিতে অক্ষম। পাওনাদারদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া প্রচুর অর্থ দিয়া 'সংস্কারক' পত্রিকার সমস্ত স্বত্ব কিনিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, হীরালাল মজুমদার এবং নিলয়কুমারকে মাসে মাসে মাসোহারাও দিয়া থাকেন। রেণুকাদেবীর মধ্যে তিনি অসাধারণ কবি প্রতিভা লক্ষ্য করিয়াছেন এবং সেই জন্যই তাঁহাকে নাকি 'পুশ' করিতেছেন।

দেখিয়ে হুজুর।

গাড়োয়ান মুশাই হঠাৎ কথা কহিয়া উঠিল। গাড়িটাও হঠাৎ একটু একপেশে হইয়া পড়িল।

কি?

বয়েলকো বদমাশি।

শঙ্কর উঠিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, বাঁ ধারের কালো গরুটা জোয়াল খুলিয়া ফেলিয়া

রাস্তার পাশ হইতে দূর্বা ছিঁড়িয়া খাইতে শুরু করিয়াছে। ডান ধারের সাদা গরুটা বোকার মত দাঁড়াইয়া আছে।

কহাথা না?

তাই তো।

গরু জোড়া সম্প্রতি কেনা হইয়াছে। মুশাই গাড়োয়ান কয়েকদিন হইতে শঙ্করকে বলিতেছে যে, ইহাদের জোড় ঠিক মেলে নাই। কালো গরুটা বেশি চালাক এবং বেশি পেটুক, সাদাটা কিঞ্চিৎ নির্বোধ এবং স্বল্পাহারী। মুশাইয়ের অভিপ্রায় এবং উপদেশ—কালো গরুটাকে বিক্রয় করিয়া তাহার স্থানে মুশাইয়েরই বাদামি রঙের গরুটাকে নিযুক্ত করা। কারণ মুশাইয়ের মতে তাহার এই বাদামি গরুটির স্বভাবও উক্ত সাদা গরুটিরই অনুরূপ, বেশি চালাকি নাই এবং খুব কম খায়। বাবু যদি অনুমতি করেন, মুশাই বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছে। উহার জোড়াটা মরিয়া গিয়াছে, একটা গরু লইয়া সে আর কি করিবে, তাহা ছাড়া তাহার ক্ষেত এখন চষিবেই বা কে, ছেলেটা তো কলে চাকরি লইয়া চলিয়া গেল, গরুটা বেচিয়াই ফেলিতে হইবে। হাটে লইয়া গেলে ভালো দামেই সে বিক্রয় করিতে পারে, কিন্তু বাবু যদি কেনেন, তাহা হইলে সে—ইত্যাদি।

বেচ দিজিয়ে শালেকো।

কালো গরুটাকে জোয়ালে বাঁধিতে বাঁধিতে মুশাই পুনরায় স্বীয় অভিমত ব্যক্তি করিল।

এখন তাড়াতাড়ি নে, ছবিগঞ্জে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে দেখছি। অনেক কাজ সেখানে আমার।

হো গিয়া।

গরুটাকে ভালো করিয়া বাঁধিয়া মুশাই তড়াক করিয়া স্বস্থানে উঠিয়া বসিল এবং দ্রুতবেগে গাড়ি হাঁকাইতে লাগিল। শঙ্কর মুশাইয়ের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা দিয়া তাহার সমস্ত ঋণ শোধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, ফ্যাক্টরিতে তাহার পুত্র বিষুণের চাকরি করিয়া দিয়াছে; তবু তাহার অভাব মেটে নাই। তাহার অভাব মেটে না। তাহার এই গো-চরিত্র বিশ্লেষণের মূলে যে অর্থাভাব, তাহা শঙ্করের বুঝিতে কষ্ট হয় নাই। তাহার বার বার মনে হইতে লাগিল, কেন, এত অভাব কেন ইহাদের? আর কি করিলে ইহাদের দুঃখ দূর হয়?

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাহারা হীরাপুর গ্রামে ঢুকিল।

হীরাপুরে নিমাই ঘটক থাকে। হীরাপুরের নব-প্রতিষ্ঠিত মাইনর স্কুলের হেড-পণ্ডিত সে। গ্রামেরই ছেলে, আই. এ. ফেল করিয়া বসিয়াছিল, শঙ্কর তাহাকে স্কুলের হেড পণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। হেড-পণ্ডিতি করিবার যোগ্যতা ছেলেটির নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু ঠিক ওই জন্যই যে শঙ্কর তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছে তাহা নয়, আসল কারণ—শঙ্কর তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। আকর্ষণের প্রধান কারণ রূপ। রূপ জিনিসটার এমন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে যে, স্ত্রী-পুরুষ ফল-পুষ্প জন্তু-জানোয়ার আকাশ-সমুদ্র যেখানেই তাহার আবির্ভাব ঘটুক না, তাহা মানুষকে মুগ্ধ করে। রূপ দেখিয়াই শঙ্কর প্রথমে মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহার পর আরও মুগ্ধ হইয়াছে তাহার সাহিত্য-প্রীতি এবং সাহিত্য-বিষয়ে চিন্তার অভিনবত্ব দেখিয়া। শঙ্কর আজকাল

যাহা কিছু লেখে, তাহা সর্বাগ্রে নিমাই ঘটকের নিকট পাঠাইয়া দেয় এবং তাহার অভিমত গ্রাহ্য করে। নিমাই ঘটক সাহিত্য স্রষ্টা নয় বটে, কিন্তু উঁচুদরের রসিক সমঝদার—অন্তত শঙ্করের তাহাই বিশ্বাস।

হীরাপুর গ্রামে ঢুকিয়াই শঙ্করের মনে পড়িল, তাহার 'জাতীয় সাহিত্য' নামক প্রবন্ধটা ঘটকের কাছে অনেকদিন পড়িয়া আছে। প্রবন্ধটি লিখিবার অব্যবহিত পরেই ঘটকের সহিত দেখা হইয়াছিল, সে প্রবন্ধটি পড়িবে বলিয়া লইয়া গিয়াছিল, এখনও ফেরত দেয় নাই। যদিও ছবিগঞ্জে তাড়াতাড়ি যাওয়া প্রয়োজন, তবু সে হীরাপুরে নামিয়া পড়িল। প্রবন্ধটি নিমাই ঘটকের কেমন লাগিয়াছে, তাহা জানিবার লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না। সে সাহিত্যপথ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু সাহিত্য তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। মনের প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে যে ভাবনা তাহার অন্তরতম সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। তাহা সাহিত্য-ভাবনা। ওই ভাবনাই সে সর্বদা করিতেছে, উহা ছাড়া অন্য কোনো ভাবনায় তাহার সুখ নাই। ইহার জন্য তাহার কর্তব্যকর্মে ত্রুটি ঘটিতেছে ইহা সে বোঝে। সেবার যে কাঁটাপোখর গ্রামে স্কুলটা গভর্নমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইল না। তাহার কারণ, সে সময়মতো স্কুল-ইন্সপেক্টরের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে তোয়াজ করিতে পারে নাই। দেখা না করিতে পারার কারণ, সে তখন প্রকাণ্ড একটা কবিতা লইয়া এমন তন্ময় হইয়া ছিল যে, ইনস্পেক্টরের কথা তাহার মনেই ছিল না। অনুরূপ ঘটনা আরও কতবার ঘটিয়াছে। আজও ছবিগঞ্জে যাইবার পথে সে হীরাপুরে নামিয়া পড়িল।

নিমাই ঘটক বাড়িতেই ছিল।

স্মিতহাস্যে নিমাই তাহাকে সম্বর্ধনা করিল। নিমাইয়ের দোহারা চেহারা, বর্ণ যে খুব টকটকে ফর্সা তাহা নয়, কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টিতে, চোখ-মুখের গড়নে, মৃদু হাস্যে এমন একটা রূপ আছে, যাহা সচরাচর দেখা যায় না। নিমাইয়ের একমাত্র পার্থিব বন্ধন ছিলেন মা, তিনি বছরখানেক পূর্বে মারা গিয়াছেন। এখন নিমাই একা। নিজেই রাঁধিয়া খায়, ঘরের একটি গাই আছে, সেটির পরিচর্যা করে, নিজের কাজকর্ম নিজেই করিয়া লয়। তাহার খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘরটি বেশ পরিষ্কার করিয়া নিকানো তকতকে ঝকঝকে। কোঁচার খুটটি গায়ে দিয়া নিমাই বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া ছিল, শঙ্করের গাড়ি থামিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

আসুন, স্কুল আজ বন্ধ।

স্কুল দেখতে আসিনি, তোমার কাছে এসেছি।

নিমাই তাড়াতাড়ি একটি কম্বলের আসন বিছাইয়া দিল। শঙ্কর উপবেশন করিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল। নিমাইয়ের মত নিমাইয়ের ঘরটিরও বেশ একটি নিরাভরণ সৌন্দর্য আছে। চমকপ্রদ নয়, কিন্তু দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। একটি অতি সাধারণ চৌকি এবং বই রাখিবার শেলফ ছাড়া ঘরে অন্য কোনো প্রকার আসবাবই নাই, তাহার সামান্য কাপড়-জামা দড়ির আলনাতে পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো। শেলফ্ গুলি কেরোসিন কাঠের, প্রত্যেকটিতে বই ঠাসা, প্রত্যেকটি বই মলাট দেওয়া।

ছবিগঞ্জে মুকুন্দ পোদ্দারের বাড়ি যাচ্ছি। ভাবলাম, অনেক দিন তোমাকে দেখিনি, একবার দেখে যাই। একটু স্বার্থও যে নেই তো নয়, আমার সেই প্রবন্ধটা—

হ্যাঁ, আমার পড়া হয়ে গেছে।

উঠিয়া একটি খাতার ভিতর হইতে একটি লম্বা খাম বাহির করিল এবং খামের ভিতর হইতে প্রবন্ধটি বাহির করিয়া শঙ্করকে দিল। বেশ যত্নসহকারেই প্রবন্ধটি রাখিয়াছিল, বোঝা গেল।

কোনো বক্তব্য আছে এ সম্বন্ধে?

আমার বেশ ভালোই লেগেছে। তবে—

স্মিতমুখে নিমাই চুপ করিয়া গেল।

তবে কি?

কেবল একটু, মানে—

অত ইতস্তত করবার দরকার কি, বলেই ফেল না।

সাহিত্যের পূর্বে কোনোরকম বিশেষণ বসাতে আমার যেন কেমন একটু লাগে। এমন কি জাতীয়, স্বদেশী—এই সব বিশেষণও।

প্রত্যেক জাতির সাহিত্যে যখন এক-একটি করে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তখন তা অস্বীকার করি কি করে, বল?

আমার অবশ্য বেশি বিদ্যে নেই, কিন্তু আমার বিশ্বাস প্রত্যেক সাহিত্যেরই আসল বৈশিষ্ট্য—তা চিরন্তন মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার সহৃদয় আলোচনা, কোনো বিশেষ দেশের মানুষের নয়।

তা ঠিকই। ঠিক বলেছ তুমি। কিন্তু প্রত্যেক দেশের মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা মূলত এক হলেও বাইরে সে সবের প্রকাশ দেশে দেশে একটু ভিন্ন নয়? এই যেমন ধর, আমাদের দেশের একজন নারী আর পাশ্চাত্য দেশের একজন নারী। উভয়েই নারী বটে; কিন্তু একজনের কালো রূপ, মাথায় খোঁপা, পায়ে আলতা, পরনে শাড়ি, নাকে নাকছাবি, মুখে পান, চোখের কালো তারায় সভয় সলজ্জ দৃষ্টি; আর একজনের ধপধপে সাদা রঙ, মাথার চুল ছাঁটা, পায়ে জুতো, পরনে স্কার্ট, নাকে পাউডারের গুঁড়ো, ঠোঁটে লিপস্টিক, চোখের নীল তারায় নির্ভয় কৌতূহল-দৃষ্টি। দু'জনেরই মন বিশ্লেষণ করলে উভয়ে ক্ষেত্রেই হয়তো চিরন্তনী নারীকে দেখা যাবে; কিন্তু দু'জনের বাইরের রূপ আলাদা। সাহিত্যেরও তেমনই একটি বাইরের রূপ আছে। তা ছাড়া, যে মানুষ সাহিত্যের প্রধান উপাদান, সেই মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-আদর্শ সব দেশে সমান নয়, ভালো-লাগা মন্দ-লাগার রূপ নানা দেশে নানা রকম, তাই—

আপনি বাংলায় জাতীয় সাহিত্যের এমন কিরূপ দেখতে পেয়েছেন, যা অন্য দেশের সাহিত্যে নেই? আপনি মধুর রসের কথা বলেছেন, তা কি অন্য সাহিত্যে বিরল?

মধুর রস আমাদের সাহিত্যের বিশেষ রস। ওইটেই আমাদের বৈশিষ্ট্য। আমরা বীররস চাই না, অদ্ভুত রস চাই না, বীভৎস রস চাই না—যদি মধুর রসও তার সঙ্গে সঙ্গে না থাকে। ওই মধুর রসটাই আমরা ভালোবাসি। বৈষ্ণব-সাহিত্যে, বৈষ্ণব-ধর্মে যে মাধুর্য একদিন আপামর ভদ্রসকলের মনে-প্রাণে সঞ্চারিত হয়েছিল, তাই এখনও আমাদের সাহিত্যের মূল সুর। শুধু রাধা-কৃষ্ণ নয়, যশোদা-গোপাল, সুবল-কানাই, বৃন্দা-চন্দ্রাবলী, এমন কি জটিলা-কুটিলা-আয়ান ঘোষও আমাদের প্রিয়—মানবপ্রেমের নানা রস-রূপের সাধনাতেই আমরা তন্ময়। ও ছাড়া

আমরা আর কিছুতেই আনন্দ পাই না। কালীর মতন ভীষণাও আমাদের আদরে আবদারে বিগলিতা, মহাদেবের মতন সন্ন্যাসীকেও আমরা জামাই সাজিয়েছি, দুর্গার যে রূপে আমরা মুগ্ধ তা তাঁর মহিষমর্দিনী রূপ নয়, তা তাঁর কন্যা রূপ। দুর্গা আমাদের ঘরের মেয়ে। মধুর-রস-সমুদ্রেই সোনার তরী ভাসিয়েছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় কবি, রাবণকে রিয়ালিস্টিক রাক্ষস-রূপ দিলে মাইকেলের কাব্য এতটা আদর পেত কি না সন্দেহ। রাবণ শুধু যে মানুষ তা নয়, সে রীতিমত বাঙালি—

নিমাই হাসিয়া বলিল, কিন্তু এত সব উদাহরণ আপনি আপনার প্রবন্ধে দেননি—

উদাহরণ না দিলেও যা বলেছি, তাতে—আচ্ছা, উদাহরণ দিয়ে দেব—বড় হয়ে যাবে বলে দিইনি।

সহসা এই রস-আলোচনার মাঝে একটা বেসুর বাজিল। মলিন-বসন-পরিহিত জীর্ণ-শীর্ণ একটা লোক আসিয়া শঙ্করকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

এ আবার কে?

নিমাই ঘটক চিনিত—গ্রামেরই একজন কৃষক। উহাদের পল্লীতে শঙ্করের ব্যবস্থাতেই কিছুদিন পূর্বে একটি ইঁদারা প্রস্তুত করানো হইয়াছিল, কিন্তু ইঁদারাটি ইহারই মধ্যে অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়াছে, পুনরায় সংস্কার করা প্রয়োজন।

কতদিন আগে ইঁদারা হয়েছিল?

মাস ছয়েক আগে।

পাকা ইঁদারা?

হ্যাঁ।

ছমাসের মধ্যেই নষ্ট হয়ে গেল কি করে? হয়েছে কি?

বাঁধানো পাড় ধসে ধসে পড়ে যাচ্ছে।

এ রকম হবার মানে?

মানে যে কি, তাহা নিমাই ঘটক জানিত, কিন্তু সে কিছু বলিল না। সে নির্বিবাদী লোক, কাহারও নামে লাগানো তাহার স্বভাব নয়। সে চুপ করিয়া রহিল। দরিদ্র চাষাও সভয়ে করজোড়ে চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার পর শঙ্কর বলিল, আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা করব। মাটির পাড় দিয়েই বাঁধিয়ে দেওয়া যাবে আপাতত। তোমরাও কিছু চাঁদা তুলতে পার যদি, ভালো হয়। আমরা তো একবার করে দিয়েছি, মেরামতটা অন্তত তোমাদের নিজেদের করা উচিত। আরও কয়েক জায়গা থেকে ইঁদারা ভাঙার খবর এসেছে, আমরা আর কত করি, বল?

চাষা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে বাঙালি না হইলেও বাংলা বোঝে। পুরুষানুক্রমে হাতজোড় করিয়া থাকাই তাহাদের অভ্যাস। বহু কটূক্তি, বহু উপহাস, বহু প্রহার, বহু অত্যাচার সত্ত্বেও তাহারা হাতজোড় করিয়া থাকে। উহা করা ছাড়া আর কিছু করিবার উপায় তাহাদের নাই।

শঙ্কর বলিল, আচ্ছা, যাও তুমি, আমি ব্যবস্থা করব।

খুব ঝুঁকিয়া প্রণাম করিয়া সে চলিয়া গেল। শঙ্কর পকেট হইতে ডায়েরি বাহির করিয়া ইঁদারার কথাটা লিখিয়া লইল।

ইহার পর রস সাহিত্যের আলোচনা আর জমিল না।

শঙ্কর উঠিবার উপক্রম করিল।

আমাকে এক গ্লাস জল দাও দিকি, খেয়ে বেরিয়ে পড়ি।

নিমাই উঠিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে ছোট একখানি চকচকে কাঁসার রেকাবিতে চারটি গুড়ের বাতাসা ও এক গ্লাস জল লইয়া আসিল।

এ আবার কেন?

ঈষৎ হাসিয়া নিমাই বলিল, কুন্তলাদি বলেছেন, শুধু জল কাউকে দিতে নেই।

কুন্তলাদিদিটি কে?

আমাদের হরিদার স্ত্রী। কুন্তলাদির কথা শোনেননি?

খুব শুনেছি। তাঁর শিষ্য হয়েছ নাকি?

স্মিতমুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর বলিল, শিষ্য না হয়ে উপায় নেই। বড় ভালো লাগে তাঁকে, সত্যিই ভক্তি হয়।

কেন, কি দেখলে তাঁর মধ্যে?

তিনি সংস্কৃতের প্রথম শ্রেণীর এম. এ., অথচ তাঁর জীবন এত সরল অনাড়ম্বর যে এমন আর আমি দেখিনি, কল্পনাও করিনি।

উৎপলের স্ত্রী সুরমাও খুব সরল অনাড়ম্বর, সেও লেখাপড়া কিছু কম জানে না।

তিনি বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বউ, তাঁর কথা ছেড়ে দিন।

কেন, বড়লোক বলে অপরাধটা কি হল?

অপরাধ নয়। বড়লোকের পক্ষে অহমিকাটা ত্যাগ করা সহজ, কিন্তু দারিদ্র্যের অহমিকা ত্যাগ করা সত্যিই বড় শক্ত। কারণ ওইটুকু অবলম্বন করেই দরিদ্রেরা মাথা উঁচু করে থাকে। আমার মনে হয়, কুন্তলাদির সেইটুকুও বোধ হয় নেই। অথচ তাঁর যা গুণ, তাতে অহঙ্কারী হলে বেমানান হত না।

কি গুণ? এম. এ. ডিগ্রিটা?

তা তো আছেই। কিন্তু ডিগ্রি সত্ত্বেও তিনি সংসারের সব কাজ হাসিমুখে করেন—রাঁধেন, বাসন মাজেন, বড়ি দেন, চরকা কাটেন, পিসিমার সেবা করেন, আবার ওর মধ্যে একটু লেখাপড়াও করেন।

তা যদি হয়, তা হলে তো—

সত্যিই অদ্ভুত। আলাপ নেই আপনার সঙ্গে?

আলাপ করতে সাহস করিনি।

নিমাই আবার খানিকক্ষণ স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, চলুন একদিন আমার সঙ্গে। তাঁর পর্দা নেই, আর হরিদাকে তো চেনেনই।

আচ্ছা, পরে দেখা যাবে, এখন চলি।

শঙ্কর আর দেরি করিল না, ছবিগঞ্জের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল।

।। তিন ।।

ছবিগঞ্জের মুকুন্দ পোদ্দার একজন বর্ধিষ্ণু মহাজন। বেশ বিস্তৃত তেজারতি কারবার আছে। দরিদ্র বিপন্ন চাষীদের চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়াই তাঁহার ব্যবসায়। উৎপল ও শঙ্করের এই সব জনহিতকর প্রচেষ্টা সহিত তাঁহার সহানুভূতি না থাকিবারই কথা, কিন্তু বাহির হইতে মনে হয়, তিনি যেন এসব ব্যাপারে অত্যুৎসাহী।

কিন্তু তাঁহার প্রকৃত মনোভাবটি—সম্ভবত তাঁহার অজ্ঞাতসারেই—তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সে দৃষ্টি অগ্নিবর্ষী। মুখে তিনি অতি বিনয়ী। শঙ্করের সহিত দেখা হইবামাত্র গদগদ স্বাগত-সম্ভাষণের আতিশয্যে তাহাকে অস্থির করিয়া তোলেন, কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টি যাহা ব্যক্ত করে, তাহা মোটেই সম্মানজ্ঞাপক নহে। সে দৃষ্টিতে ভাষায় অনুবাদ করিলে অনেকটা এইরূপ দাঁড়ায়—থাম ব্যাটা, তোকে দেখাচ্ছি! বেশ উদ্ধার করতে এসেছেন, ইস্, ভারি আমার লায়েক!

যদি ইহাই মুকুন্দ পোদ্দারের মনের কথা হয়, তাহা হইলে বাহিরের আচরণের সহিত তাহার সামঞ্জস্য কোথায় এ কথা যাঁহারা ভাবিবেন, তাঁহারা মুকুন্দ পোদ্দার জাতীয় লোকদের সম্যকরূপে চেনেন না। চিনিলে ইহা তাঁহাদের অজ্ঞাত থাকিত না যে, ইঁহাদের মনের কথার সহিত বাহিরের আচরণের প্রায়ই গরমিল থাকে। শত্রুকে পরাজিত করিবার জন্যে সৎ-অসৎ কোনো প্রকার কার্য করিতেই ইঁহারা পশ্চাৎপদ হন না। এ ক্ষেত্রে মুকুন্দ পোদ্দারের মনোভাব অনেকটা এই রকম—ও, তোমরা মহত্ত্ব আস্ফালন করিয়া আমাকে নিষ্প্রভ করিয়া দিবে ভাবিয়াছ—দেখা যাক্, কে কাহাকে নিষ্প্রভ করিয়া দিতে পারে—টাকা আমারও কিছু কম নাই—টাকা দিয়া স্কুল পাঠশালা আমিও করিয়া দিতে পারি এবং করিয়া দিবও। তোমরাই যে উদারতার অভিনয় করিয়া সকলের ভক্তিশ্রদ্ধা অর্জন করিবে—আর আমি পিছনে পড়িয়া থাকিব, তাহা কিছুতেই হইতে দিব না। দেখাই যাক না, তোমাদের দৌড়টা কতদূর!

মুকুন্দ পোদ্দার নাতিস্থূল পুষ্টকান্তি ব্যক্তি। বেশ কুচকুচে কালো রঙ, মাথায় এককালে ঢেউ-খেলানো অ্যালবার্ট টেরি ছিল, এখন টাক পড়িয়াছে। গলায় সোনার হার, বাহুমূলে সোনার তাবিজ, অনামিকায় নীলা বসানো সোনার আংটি, এমন কি সামনের কয়েকটি দাঁতেও সোনা-লাগানো।

শঙ্কর যখন ছবিগঞ্জে পৌঁছিল, তখন প্রায় অপরাহ্ণ। মুকুন্দ তাকিয়া ঠেস দিয়া নিত্যসঙ্গী কাঠের হাত-বাক্সটির নিকট বসিয়া ছিলেন। শঙ্করকে দেখিবামাত্র সোচ্ছ্বাসে সম্বর্ধনা করিলেন।

আসুন দেবতা, আসুন আসুন, সকাল থেকে আপনার কথাই ভাবছি বসে বসে। ওরে, গোবরাকে খবর দে—বল্, বাবু এসেছেন, চা-টা আনুক।

আমার একটু দেরি হয়ে গেল।

এমন আর কি দেরি হয়েছে দেবতা! আপনারা পাঁচ কাজের মানুষ, আমাদের মত নিষ্কর্মা তো নন—হে হে হে হে—পাঁচ জায়গায় ঘুরতে গেলেই দেরি একটু-আধটু হয়েই থাকে।

মুকুন্দের চোখের দৃষ্টিতে অগ্নি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল, মুখে বিনীত হাস্য।

আপনাদের পাঠশালা কেমন চলছে, বলুন?

চলছে। ভালোই চলছে—বলতে হবে, গতকাল গুটি দশেক ছাত্তর জুটেছিল, না হে ভজহরি?

পাশের ঘর হইতে ভজহরি উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, তা জুটেছিল।

মাত্র দশজন?

শঙ্কর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

এতেই অবাক হচ্ছেন দেবতা। আমার বিবেচনায় ওই দশজনই যথেষ্ট আপাতক—ওই শেষ পর্যন্ত টেকে কি না দেখুন।

এখানে এত কম ছেলে হবার কারণ কি, অন্য অন্য গ্রামে তো এত কম হয়নি?

এটা যে চাষার গ্রাম দেবতা, এ বেটা ছাতুখোর চাষারা লেখাপড়ার মর্ম কি বুঝবে বলুন? বলে কি জানেন, বলে যে, ছেলেকে যদি পাঠশালায় পাঠাই, তা হলে আমাদের গরু চরাবে কে?—এই যাদের মতিগতি, তাদের আর কতদূর কি হবে বলুন?

মুকুন্দ পোদ্দারের মুখে হাসি এবং চোখে অগ্নির আভা ফুটিয়া উঠিল।

তবু চেষ্টা করতে হবে বইকি।

আজ্ঞে হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই—চেষ্টা করব বইকি—চেষ্টা তো করছিই। নাইট-স্কুল খোলবার ঘর সব সাফ-সুতরো করিয়ে রেখেছি। মাস্টারের জন্যে একটা মোড়া, ছাত্তরদের জন্যে মাদুর শতরঞ্জি—সব ব্যবস্থা ঠিক আছে। কথা দিয়েছি যখন, তখন সে কথার নড়চড় কবর না। আসুন না, দেখবেন।

এমন সময় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনায় কথাবার্তায় বাধা পড়িয়া গেল। পিছনের বারান্দায় কে যেন ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ভজহরি সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করিল, শোনা গেল, আরে মোলো, রোতা কাহে?

কাঁদছে নাকি মাগী? এতো আচ্ছা এক ফৈজত হল দেখছি!

তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া মুকুন্দ বলিলেন, গরিব চাষাদের উদ্ধার করবার জন্যে আপনারা ব্যাঙ্ক খুললেন, কিন্তু এ ব্যাটারা আমাদের পাছ ছাড়বে না। আমাদের সুদ বেশি, সোনা রূপা বন্ধকি না রেখে আমরা ধার দিই না, তবু আমাদের ছাড়বে না। ওদের যত বুঝিয়ে বলি—তুম লোগকা উদ্ধারকা বাস্তে উৎপলবাবু ব্যাঙ্ক খুলা হ্যায়, হুঁয়াই যাও। কিছুতেই যাবে না।

মুকুন্দ পোদ্দারের চোখের দৃষ্টিতে যেন আগুনের হল্কা ছুটিতে লাগিল।

যায় না কেন?

যাবে কি করে? আপনারা তো জমি-জিরাত না থাকলে টাকা দেবেন না। এ মাগীর না আছে জমি, না আছে জিরাত। জন খেটে খায়।

স্বামী নেই?

স্বামীটিকে পূর্বেই খেয়েছেন। সে দিকে সৌভাগ্যবতী। একটি কাঠ-ব্যাটা ছিল, তিনি বিয়ে করে বউ নিয়ে সরেছেন শহরে।

কাঠ-ব্যাটা কি?

সৎছেলে। এতদিন এ দেশে আছেন, কাঠ-ব্যাটা কাকে বলে জানেন না, অথচ আপনারা এ দেশ উদ্ধার করতে চান!

শঙ্কর একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। মনের কথা হঠাৎ মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়াতে মুকুন্দও ঈষৎ অপ্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তিনি পাকা লোক, তৎক্ষণাৎ হাসিয়া বলিলেন, আপনারা তো সেদিন এসেছেন, আপনাদের আর কি দোষ দোব! আমি সারা জীবনটাই এ অঞ্চলে কাটালাম, 'খাবুনি' কাকে বলে আমিই জানতাম না, সেদিন শিখলাম ভজহরির কাছে। ছট পরবের সময় ওরা ময়দা আর চালের গুঁড়ি দিয়ে যে 'ঠেকুয়া' তৈরি করে, তাকে বলে 'খাবুনি'! জানতেন?

শঙ্করকে স্বীকার করিতে হইল যে, সে জানিত না। ভজহরি আবার পাশের ঘরে রুদ্যমানা রমণীটিকে সান্ত্বনা দিল, রোও মৎ, রোকে কি হোগা? জেবর জোগাড় কর, তব রুপিয়া মিলে গা।

জেবর কথাটা শঙ্কর জানিত, জেবর মানে—গহনা। জিজ্ঞাসা করিল, কিসের জন্য ও টাকা চায়?

একটা ন্যাংনেঙে ছেলে আছে, তার বিয়ে দেবে, সেইজন্যে হাঁসুলিটি বাঁধা দিয়ে টাকা নেবার জন্যে দমাদ্দমি করছে। এদের উদ্ধার করা কি সহজ আপনি ভেবেছেন? হারামজাদিরা বিয়ে দেবার জন্যে এত ব্যস্ত হয় কেন তাও তো বুঝি না! বিয়ে দিলেই তো ছেলে শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। ওর কাঠ-ব্যাটা বেশ ছিল এতদিন, আমারই এখানে খাটত-খুটত। যেই গওনা করে বউটি নিয়ে এসেছে—বাস্, অমনই উধাও। গওনা মানে বোঝেন তো? দ্বিরাগমন। হাঁসুলিটা ওজন করে দেখেছ ভজহরি?

পাশের ঘর হইতে উত্তর আসিল, বিশ ভরি সাড়ে ন' আনা।

গোটা দশেক টাকার বেশি দেওয়া যায় না। মাসে টাকা পিছু দু'আনা করে সুদ দিতে হবে।

ভজহরি বলিল, সুদ দিতে ও রাজি আছে, কিন্তু কুড়িটা টাকা চায়।

চাইলেই কি দেওয়া যায়? আমার পোষানো চাই তো!

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মুকুন্দ বলিলেন, টাকায় তিন আনা করে সুদ দিতে রাজি আছে?

আছে।

তা হলে দাও। কিন্তু তিন মাস যদি সুদ না দেয়, তাহলে হাঁসুলি আর ফেরত পাবে না। বাকি টাকাটা খেটে শোধ করতে হবে। রাজি হয় দাও—ছাড়বে না যখন উপায় কি?

বুঝা?

ভজহরি তাহার নিজস্ব হিন্দিতে মেয়েটিকে মুকুন্দর প্রস্তাব বুঝাইতে শুরু করিল।

মুকুন্দ বলিল, চলুন। আমরা ততক্ষণ ঘরটা দেখে আসি। একটা লণ্ঠন দরকার হবে, সেটা এখনও জোগাড় হয়ে ওঠেনি। আপাতক তেলের ডিব্‌রিই জ্বলুক একটা—অ্যাঁ, কি বলেন আপনি?

লণ্ঠন আমি কালই পাঠিয়ে দেব।

মহত্ত্ব-দ্বন্দ্বে পরাজিত হইবার লোক মুকুন্দ নন।

পাঠিয়ে দেবার দরকার নেই। এতই যখন করতে পেরেছি, একটা লণ্ঠনও দিতে পারব। ও ভজহরি, লণ্ঠন একটা চাই, বুঝলে?

পাশের ঘর হইতে উত্তর আসিল, যে আজ্ঞে।
উভয়ে উঠিয়া নৈশ-বিদ্যালয়ের ঘরটি দেখিতে গেলেন।

।। চার ।।

কয়েক দিন পরে শঙ্কর মুরারিপুর নামে এক গ্রাম হইতে ফিরিতেছিল। সেখানে শঙ্করের স্থাপিত ডিসপেনসারির নূতন ডাক্তারবাবুটির সহিত স্থানীয় কয়েকজন বেহারির মনোমালিন্য হইয়াছিল। বেহারিদের ইচ্ছা ছিল, এখন বেহারিই নিযুক্ত করা। বাঙালি ডাক্তারবাবুটির সহিত নানা ছুতায় তাই তাহারা কলহ করিতেছে। ডাক্তারবাবুটিও কলহপ্রবণ এবং বেহারিদের অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত, সুতরাং কিছুতেই নিজেকে তাহাদের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছেন না। মুরারিপুরের স্থানীয় অধিবাসীরা সমবেতভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিয়াছে। শঙ্কর তাহারই তদন্ত করিতে গিয়াছিল। সাময়িকভাবে মিটমাট হইয়া গেল বটে। আসল সমস্যার সমাধান হইল না।

...রাত্রি হইয়াছে। শুক্লা অষ্টমীর চন্দ্র পশ্চিমদিগন্তে হেলিয়া পড়িয়াছে, তাহার কাছে দু-একটা উজ্জ্বল নক্ষত্রও জ্বলিতেছে। চক্রবালরেখা-সংলগ্ন বৃক্ষশ্রেণী পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারের মত দেখাইতেছে, মেঠো সুরে কোথায় যেন একটা বাঁশের বাঁশি বাজিতেছে! মুশাই নীরবে গাড়ি হাঁকাইতেছে। শঙ্কর ভাবিতেছে।

ভাবিতেছে, এই বেহারে তাহার এবং উৎপলের বাবা বহুকাল পূর্বে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। বেহারই তাহাদের জন্মভূমি এবং তাহারাও নানা দেশ ঘুরিয়া অবশেষে বেহারে আসিয়াই পুনরায় নিজেদের জীবন আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের কি বাংলা দেশে ফিরিয়া যাওয়া উচিত ছিল? অনেক হিতৈষী তাহাকে এবং উৎপলকে উপদেশ দিয়াছিলেন, দেশের উপকার করিতে হইলে বাংলা দেশের উপকার কর গিয়া। এ দেশে জনহিতকর কিছু করা ভস্মে ঘি ঢালার মতই নিরর্থক। বেহারের প্রতি শহরে শহরে, প্রতি গ্রামে গ্রামে খোঁজ করিয়া দেখ, যেখানেই বাঙালি গিয়াছে, সেখানেই তাহারা কিছু না কিছু জনহিতকর কার্য করিয়াছে। কিন্তু বেহারিরা কি তজ্জন্য বাঙালিদের প্রতি কৃতজ্ঞ? মোটেই না। 'বাঙালি-বেহারি ফিলিং' নামক বিষটি ক্রমশ উগ্রতর হইয়া বরং প্রবাসী বাঙালিদের জীবন দিন দিন দুঃসহ করিয়া তুলিতেছে। ভবিষ্যতে আরও তুলিবে। সুতরাং এখানে নূতন করিয়া জীবন পত্তন করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

শঙ্কর কথাটা ভাবিয়া দেখিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-বেহারি, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য প্রভৃতি নানা বিভাগে জাতিকে বিভক্ত করিয়া খণ্ড-কলহ করিলে আমাদের কোনো দিনই মঙ্গল নাই। যাহা অমঙ্গলজনক বলিয়া মনে-প্রাণে বুঝিয়াছি, তাহাকে কেন প্রশ্রয় দিব? বেহারে বাঙালি-বেহারি 'ফিলিং' আছে বলিয়াই প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালির কর্তব্য সেই ফিলিং-সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করা। তলপি-তলপা গুটাইয়া প্রস্থান করিলে সমস্যার সমাধান হইবে না, কাপুরুষতা প্রকাশ করা হইবে মাত্র। প্রতিশোধ বাসনায় যদি বঙ্গদেশ হইতে বেহারি বিদূরিত করিবার আন্দোলন করা যায়, তাহাতে এই 'ফিলিং' বৃদ্ধিই পাইবে, কমিবে না। ভাবিয়া দেখা

উচিত, কি করিয়া এই 'ফিলিং' দূর করা যায়। ইহার উত্তর, ভালোবাসিয়া। তুমি যদি সত্যই ইহাদের ভালোবাসিতে পার, তাহা হইলে এ 'ফিলিং' আর থাকিবে না। উপকার করিলেই লোক কৃতজ্ঞতা অনুভব করিবে—ইহা নীতিশাস্ত্রের উপদেশ বটে, কিন্তু মানুষ সব সময় নীতিশাস্ত্র মানিয়া চলে না, সে মানিয়া চলে নিজের হৃদয়কে। সেই হৃদয় যদি জয় করিতে পার, তাহা হইলেই এ সমস্যার সমাধান হইবে। হৃদয় জয় করিবার মন্ত্র ধর্মনীতি নহে, রাজনীতি নহে—ভালোবাসা। এই 'ফিলিং' প্রসঙ্গে আর একটা কথাও বিবেচ্য। এই ফিলিং কাহাদের মধ্যে? চাকুরিপ্রার্থী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে। তাহারাই এই বিষ চতুর্দিকে ছড়াইতেছে। আমরা—বাঙালিরা যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে, আমরা কেহ চাকুরি করিব না, তাহা হইলে বোধ হয় আপাতত অবিলম্বে এ সমস্যার মূল ছিন্ন হয়। চাকুরি জীবিকা অর্জনের একটা উপায় বটে, কিন্তু একমাত্র উপায় নয়, প্রশস্ত উপায় তো নয়ই। মাড়োয়ারি, সিন্ধি, কচ্ছি, গুজরাটি—ইহারা তো নানা প্রদেশে গিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিতেছে, বেহারি-মাড়োয়ারি কিংবা বেহারি-কচ্ছি 'ফিলিং' তো কোথাও হয় নাই। চাকর হইবার জন্য সে সব তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালি-বেহারি রাজদরবারে ভিড় করে, এই ফিলিং তাহাদের মধ্যে।

অনেকে প্রশ্ন করেন, চাকুরি না করিলে বাঙালির ছেলে করিবে কি? চাকরি ছাড়া আর কোন কর্ম করিবার তাহারা উপযুক্ত? তাহা ছাড়া, অন্যায়-ভাবে (এমনকি কংগ্রেস মিনিস্ট্রির সময় বিশেষ করিয়া) তাহারা চাকুরির ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইবে কেন? চাকুরির সপক্ষে তাঁহাদের আরও যুক্তি আছে। তাঁহারা মনে করেন, চাকুরি না থাকিলে আমাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি থাকিবে না এবং তাহা না থাকিলে যে কালচারের গর্বে আমরা স্ফীত তাহার চাকচিক্যও ক্রমশ নিষ্প্রভ হইয়া আসিবে। এমন কি তাঁহারা এ আশঙ্কাও করেন যে, আমাদের সাহিত্য, আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সংস্কার সমস্তই নাকি বিনষ্ট হইবে, যদি আমাদের চাকুরি না থাকে।

বাঙালি-সন্তান চাকুরি ছাড়া অন্য কোনো প্রকার কাজ করিতে অপারক, এ কথা স্বীকার করিতে লজ্জা হয় এবং সম্ভবত সে কথা সত্যও নহে। জীবিকা-অর্জনের ভিন্ন পন্থায় এখনও তাহারা চলিতে অভ্যস্ত হয় নাই, সে সব পথে চলিবার জন্য যে ধরনের চরিত্র প্রয়োজন বর্তমানে হয়তো তাহাদের সে চরিত্র নাই। কিন্তু সেজন্য হতাশ হইলে চলিবে না। কেরানিগিরি করিবার মত চরিত্রও যে বাঙালির ছিল না, ইতিহাসেই তাহার প্রমাণ মিলিবে। সাধনার দ্বারাই তাহারা উৎকৃষ্ট কেরানি হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। সাধনা করিলে আবার তাহারাই উৎকৃষ্ট বণিক অথবা চাষী হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি! বণিক অথবা চাষীর কাজ যে ঘৃণ্য নয়, বরং দাসত্ব অপেক্ষা অধিক গৌরবজনক, এই সুস্থ মনোবৃত্তি শুধু ছেলেদের নয়, ছেলেদের অভিভাবকদের মধ্যেও গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহা সময়সাপেক্ষ সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্যস্ত হইলে চলিবে না, হয়তো দুই এক পুরুষকেই এজন্য কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু ইহাই একমাত্র সদুপায়। বাঙালির ছেলে চাকুরি ছাড়া আর কিছু করিতে পারিবে না, অতএব চাকুরি লাভ করিবার জন্য সর্বপ্রকার হীনতা সহ্য কর, সকলের সঙ্গে কলহ কর, নানাপ্রকার জাল-জুয়াচুরির আশ্রয় লও—এ মনোভাব মোটেই প্রশংসনীয় নয়। বাঙালির ছেলে অন্যায়ভাবে চাকুরির ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইতেছে? সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে পার, কিন্তু চাকুরি ছাড়া

গ্রাসাচ্ছাদন জুটাইবার অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করিতে আমরা অক্ষম—একথা স্বীকার করিতে লজ্জিত হও। বরং অন্য ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জনের সামর্থ্য যদি তোমার থাকে, তাহা হইলেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমাদের আন্দোলন সফল হইবার আশা আছে। হীনমনোবৃত্তি চাকরের কোনো আন্দোলনকেই কেহ কখনও গ্রাহ্য করে না। যাঁহারা এই অন্যায়কে মূলধন করিয়া আমাদের মধ্যে বিদ্বেষের বীজ বপন করিতেছেন, তাঁহারা শক্তিকেই খাতির করেন, অন্য কিছুকে নয়। সুতরাং স্বদেশবাসীর সহিত কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া শক্তি সংগ্রহে মন দাও। হয়তো স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের পথেও ভবিষ্যতে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, সে বিঘ্ন শক্তির সহায়তাতেই উৎঘাটন করিতে হইবে। কিন্তু সে সব দূর ভবিষ্যতের কথা। এখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের নিমিত্ত নিজেদের প্রস্তুত করা। পারতপক্ষে চাকুরি আমরা করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিলে মনে স্বতঃই শক্তি আসিবে। এই সুস্থ সবল মনোভাবই আমাদের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। যাঁহারা মনে করেন যে চাকুরি না থাকিলে আমাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি থাকিবে না।, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, আজকাল সমাজে অর্থেরই প্রতিপত্তি, চাকুরেদের নয়। যে কালচার লোপ হইবার ভয়ে তাঁহারা অস্থির, সেই সোফা-সেটি মোটর-রেডিও-সমন্বিত পোশাক-পরিচ্ছদ-সর্বস্ব ঝুটা কালচার আমাদের কালচার নয়। ওই বিদেশি বস্তু সত্যই যদি লোপ পায়, তাহাতে আতঙ্কিত হইবার কিছু নাই। ওই বাহ্যিক কালচার আঁকড়াইয়া ধরিতে গিয়াই আমাদের আন্তরিক কালচার হারাইতে বসিয়াছি। আতিথেয়তা, দয়া, উদারতা, আন্তরিকতা, বিনয়, শিক্ষা, সাধনা, গুণের প্রতি শ্রদ্ধা, সামাজিকতা প্রভৃতি যে সব মহৎ গুণাবলী আমাদের ভারতীয় কালচারের অঙ্গ, তাহা কি এই চাকুরিপ্রার্থী অথবা চাকুরিজীবী সম্প্রদায়ের আছে? স্বার্থ ছাড়া আর কি বোঝেন তাঁহারা? তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা দুষ্ট বলিয়া সকলেই স্বার্থপর। যাঁহারা চাকুরি করেন, তাঁহাদের স্বার্থপরতা অধীনতা-দুষ্ট বলিয়া আরও ভয়ঙ্কর। আমাদের চাকুরি না থাকিলে আমাদের সাহিত্য পর্যন্ত নষ্ট হইবে, এমন আশঙ্কাও অনেকে করেন। সাহিত্য প্রতিভাবান গুণীদের সৃষ্টি। প্রতিভাবান ব্যক্তি কখন সমাজের কোন্ স্তরে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। সমাজের দুঃখ-দারিদ্র্যেই অনেক সময় বহু প্রতিভাবানদের প্রতিভাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। প্রতিভাকে লালন করা অবশ্য সমাজের কর্তব্য। কিন্তু চাকুরিজীবীরা কি আমাদের দেশের প্রতিভাবানদের সত্যই লালন করেন?

কয়জন চাকুরিয়া বই কিনিয়া পড়েন? কয়জনের সামর্থ্য আছে? কয়জনের বুদ্ধি আছে? বাংলা সাহিত্যকে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত কয়জন স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন? বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার স্কট ছিলেন অথবা রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাইয়া বাঙালির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, এই গর্বে তির্যকপথে আপন অহঙ্কারের রসদ সংগ্রহ করা ছাড়া চাকুরিয়া বাঙালি বাংলা সাহিত্যের সহিত আর কিভাবে যে সম্পৃক্ত, তাহা শঙ্করের বুদ্ধির অগম্য।

বেহারের উপর রাগ করিয়া যাঁহারা বাংলা দেশে ফিরিয়া যাইতে চান, তাঁহাদের কি ধারণা যে, বাংলা দেশে চাকুরি অফুরন্ত? সেখানেও তো হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। সেখানেও তো চাকুরির জন্য লাঠালাঠি ধস্তাধস্তি এবং অবশেষে অপমান। না, চাকুরির মোহ পরিত্যাগ না করিলে বাঙালির মঙ্গল নাই। ভারতবর্ষের যে প্রদেশেই সে থাকুক, আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া

মানুষের মত যদি থাকিতে পারে, তবে আর কোনো সমস্যাই আপাতত থাকিবে না। এতদিন সে যেখানে গিয়াছে, চাকুরিয়া-বেশে গিয়াছে, শাসক-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে হাকিমি চালে হুকুম চালাইয়াছে, লোকে তাহাদের ভয় করিয়াছে, কিন্তু ভালোবাসে নাই; তাহার যে উপকার করিয়াছে, সে উপকারকেও কেহ অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করে নাই। ভালোবাসা না থাকিলে কিছুই হৃদয়গ্রাহ্য হয় না।

শঙ্করের নটবর ডাক্তারের কথা মনে পড়িল। লোকটা পাশ-করা ডাক্তারও নয়। চরিত্রে অনেক দোষ আছে। মদ খায়, চরিত্র খারাপ। চরিত্রহীনতার জন্য বহুবার বহুস্থানে লাঞ্ছিত হইয়াছে। কিন্তু সকলে তাহাকে ভালোবাসে। আপামর ভদ্র সকলেই তাহার প্রিয়, কেহ তাহার পর নয়। এই ভালোবাসার জোর যে কতখানি, তাহা সেবার নির্বাচনদ্বন্দ্বে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। প্রতিপত্তিশালী 'ফিলিং'-ওয়ালা অনেক বেহারি প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, তাহারা চেষ্টাও কম করে নাই, কিন্তু নটবর ডাক্তারের সহিত কেহ পারিল না। নটবর ডাক্তার দাঁড়াইয়াছেন—এ কথা প্রচারিত হইবামাত্র সকলে তাঁহাকেই ভোট দিতে উদ্যত হইল। কয়েকজন বেহারি বন্ধুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য শঙ্করকে অবশেষে গিয়া অনেক তোষামোদ করিয়া নটবরকে এই দ্বন্দ্ব হইতে নিবৃত্ত করিতে হইয়াছে। উইথড্র না করিলে সে-ই নির্বাচিত হইত। কই, বেহারি-বাঙালি 'ফিলিং' তো নটবরকে স্পর্শ করিতে পারে নাই!

সহসা মুশাই কথা কহিল।

বিশঠো রুপিয়াকা বড়া জরুরৎ পড়লো ছে—

কি জরুরৎ?

মুশাই চুপ করিয়া রহিল।

কিসের জরুরত রে?

মুশাই এবারও কোনো উত্তর দিল না, জিহ্বা ও তালু সহযোগে টকটক শব্দ করিতে করিতে গরু হাঁকাইতে লাগিল।

শঙ্কর বুঝিল, প্রকৃত কারণটা বলিতে মুশাই রাজি নয়, বিশ্বাসযোগ্য একটা মিথ্যাও সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাই চুপ করিয়া আছে।

শঙ্করও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর দিল, তোকে নিয়ে তো মহা মুশকিল দেখছি, রোজ রোজ টাকা পাব কোথায়?

মুশাই নিরুত্তর। সে জানে, বাবু টাকা দিবেই; এবং শঙ্করও জানে যে, টাকা যখন চাহিয়াছে তখন না দিয়া উপায় নাই, দিতেই হইবে। না দিলেই কামাই করিতে শুরু করিবে। হঠাৎ এমন আত্মগোপন করিবে যে, কিছুতেই ধরা-ছোঁয়া যাইবে না। একবার তো অনেক কষ্টে তাহাকে ধরিয়া আনিতে হইয়াছিল। গ্রামের প্রান্তে যে অশ্বত্থ গাছটাকে সকলে উপদেবতার আশ্রয়স্থল ভাবিয়া ভয় করে, সেই গাছটারই মগডালে মুশাই উঠিয়া বসিয়াছিল, সেইখানেই নাকি দিবারাত্রি বসিয়া থাকিত, কেবল রাত্রে যখন তাহার বউ যমুনিয়া তাহার জন্য খাবার লইয়া যাইত, তখনই সে একবার খাইবার জন্য নামিত। যমুনিয়াকে খোশামোদ করিয়াই শঙ্কর তাহার নাগাল পাইয়াছিল। মুশাইয়ের সহিত সম্পর্ক এরূপ যে, তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া তাহার সাধ্যাতীত। মুশাই না থাকিলে তাহার কাজকর্ম সব অচল, সে-ই তাহার দক্ষিণহস্ত। নিরক্ষর

হইলে কি হয়, এমন তাহার বুদ্ধি এবং শঙ্করের পছন্দ-অপছন্দ সে এমনভাবে আয়ত্ত করিয়াছে যে, শিক্ষিত কোনো ভদ্রলোকের পক্ষেও তাহার স্থান পূরণ করা অসম্ভব। সে একাধারে গাড়োয়ান, খানসামা, পাচক, ম্যানেজার এবং হিতৈষী। তা ছাড়া শঙ্করকে সে ছেলেবেলায় খেলাইয়াছিল, অর্থাৎ তাহার রক্ষণাবেক্ষণকারী ভৃত্য ছিল, কোলে করিয়া বেড়াইত। তখন তাহার বয়স বোধ হয় বছর দশেক ছিল এবং শঙ্কর ছিল বছর খানেকের। এখন উভয়ের বয়স বাড়িয়াছে, কিন্তু সম্পর্ক বদলায় নাই। এখনও সে যেন শঙ্করের রক্ষণাবেক্ষণকারী ভৃত্য এবং শঙ্কর যেন দুরন্ত দামাল শিশু।

গাড়ি আসিয়া বাড়ির নিকট থামিল।

অমিয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়াছিল। খুকি ঘুমাইয়াছে।

ভাগ্যে আজ তোমার আসতে দেরি হল, আমি এইমাত্র রান্নাঘর থেকে আসছি।

এতক্ষণ রান্নাঘরে ছিলে! কেন!

খুকিকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে তরকারিটা পুড়ে গিয়েছিল। বড্ড বায়নাদার হয়েছে বাপু, কিছুতে কি ঘুমুতে চায়! চাপড়ে চাপড়ে হাত ব্যথা হয়ে যাবে, তবু ঘুমুবে না। চাপড়ানো বন্ধ করলেই বলবে, চাপলাও।

অমিয়া হাসিল, শঙ্করও হাসিল।

এই তাহার ঘর। এখানে বাঙালি-বেহারি সমস্যা নাই, দেশোদ্ধারের দুশ্চিন্তা নাই। এখানে আছে কেবল অমিয়া এবং তাহার কন্যা। কোনো উগ্রতা নাই, কোনো উন্মাদনা নাই, কোনো অভিনবত্ব নাই। ইহাই তাহার নির্ভরযোগ্য আশ্রয়-নীড়, বাহিরের সর্বপ্রকার চাঞ্চল্য হইতে রক্ষা করে, সর্ববিধ স্বাচ্ছন্দ্য দিয়া পরিচর্যা করে, সকলপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি সহ্য করে। খিল লাগাইয়া দিলেই সব ঝঞ্ঝাট চুকিয়া গেল, বাহিরের পৃথিবী তাহার কলরব-কোলাহল লইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল, ভিতরে রহিল সহজ সরল অনাড়ম্বর শান্তি। সহসা তাহার মায়ের কথা মনে পড়িল। মা রাঁচিতে কেমন আছেন কে জানে!

।। পাঁচ ।।

ঝুম্‌মর আসিয়া বসিয়া ছিল।

ভাঙা গলায় মাঝে মাঝে হাঁকিতেছিল, এ খোখিদিদি—

অমিয়া পূজার ঘরে ছিল, জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া হাসিমুখে বলিল, ঝুম্‌মর, আজ যে মানুষের ভাষায় কথা কইছ বড়?

ঝাপসা কণ্ঠে ঝুম্‌মর উত্তর দিল, গল্‌লা বুঝি গেলেইছে মাইজী।

অর্থাৎ গলা ধরিয়া গিয়াছে। তাহা না হইলে সে তাহার স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী কুকুর, বিড়াল, মহিষ, মুরগি—না হয় অন্য কোনো প্রকার জানোয়ারের ডাক ডাকিয়া তাহার আগমন-বার্তা ঘোষণা করিত। আজ তাহার গলা ধরিয়া গিয়াছে বলিয়া কিছুই করিতে পারিতেছে না। মুখ দেখিয়া মনে হইল, এজন্য যেন সে লজ্জিত।

ঝুম্‌মর ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করে। বেঁটে লোকটি, ছোট মুখখানি। পাতলা একজোড়া

গোঁফ তৈলাভাবে রুক্ষ। থুতনির কাছে কাঁচা-পাকা ছাগলদাড়ি, তাহাও তৈলাভাবে শ্রীহীন। গালের লোলচর্মে বলিরেখা। ছোট ছোট চক্ষু দুইটি কোটরগত এবং পীতাভ। একটি পা কাটা। নিজেই এখান-ওখান হইতে কাঠের টুকরো, চামড়ার বেল্ট প্রভৃতি জোগাড় করিয়া লইয়া একটি কাঠের পা বানাইয়া লইয়াছে। তাহারই উপর ভর দিয়া একটি লাঠির সাহায্যে সে চলাফেরা করে। মাথায় একটি টিনের বাটি—সম্ভবত কোকোজেমের খালি টিন, টুপির মত করিয়া পরিয়াছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে সংক্ষেপে নিজের জীবনের যে পরিচয় দেয়, তাহা এই—

দক্ষিণে তাহার বাড়ি। সেইখানেই এক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে সে চাষবাসের কাজ করিত। লাঙল চষিত, 'কামৌনি' 'দৌনি' সব করিত। তাহার বিবাহও হইয়াছিল। তিনটি পুত্র আছে। একটি বেশ সাবালক আর দুইটি ছোট ছোট। প্রভুর জন্য কাষ্ঠসংগ্রহার্থে সে একদিন একটা বড় গাছে ওঠে। সেখান হইতে পা ফসকাইয়া পড়িয়া গিয়া তাহার পা-টি ভাঙিয়া গিয়াছিল। তাহার প্রভু অবশ্য তাহার জন্য যথেষ্ট করিয়াছিলেন, নিজের গরুর গাড়ি করিয়া তাহাকে সরকারি হাসপাতালে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ডাক্তারবাবুও চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু তাহার অদৃষ্ট খারাপ, পা কিছুতেই বাঁচিল না। হাঁটুর ওপর হইতে কাটিয়া না দিলে, ডাক্তারবাবু বলিলেন, তাহার প্রাণও নাকি বাঁচিত না। পা-টি সুতরাং কাটিয়া ফেলিতে হইল। কাটা পা লইয়া চাষের কাজ চলে না, সুতরাং ন্যায্যভাবেই প্রভু তাহাকে ছাড়াইয়া দিলেন। খঞ্জ বেকার স্বামীর সহিত থাকা নিরর্থক বুঝিয়া স্ত্রীও আর একটি সমর্থ লোকের সহিত 'চুমানা' করিল। তাহার এই আচরণকেও ঝুম্মর অন্যায় বলিয়া মনে করে না। প্রভুর নিকট ঋণ করিয়া সে জ্যেষ্ঠ পুত্রটির বিবাহ দিয়াছিল, পুত্র খাটিয়া সেই ঋণ শোধ করিতেছে। নাবালক ছেলে দুইটি তাহার সঙ্গেই আছে। স্ত্রী তাহাদের নাকি বড় মারধোর করে, তাই তাহারা পলাইয়া আসিয়াছে। তাহারাও ভিক্ষা করে, তাহাদেরও সে জানোয়ারের ডাক ডাকিতে শিখাইতেছে। ভাগ্যে ছেলেবেলায় একজন ওস্তাদের কাছে এই বিদ্যাটা শিখিয়াছিল, তাই বাবু-ভেইয়াদের মনোরঞ্জন করিয়া কোনোরূপে দিন গুজরান করিতেছে। অমনই ভিক্ষা চাহিলে রোজ রোজ লোকে দিবে কেন? অন্ন-সংস্থানের এই উপায়টিও সম্প্রতি কিন্তু বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, ঠাণ্ডা লাগিয়া গলা বসিয়া গিয়াছে।

ঝুম্মর অমিয়ার একজন পোষ্য। প্রায়ই আসে। অমিয়ার আর একজন পোষ্যও আছে—সুরদাস। সে জন্মান্ধ। ভজন গায়। দাইটিও কিছুদিন হইতে চারিটি ছেলেমেয়ে লইয়া অমিয়ার পরিবারভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। মাসখানেক হইতে ক্রমাগত আমাশয়ে ভুগিতেছে, ভুগিয়া ভুগিয়া শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছে। কাজ করিতে পারে না। অমিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিতে পারে নাই। তাড়াইয়া দিলে চারিটি শিশু-সহ রোগে অন্নাভাবে হয়তো রাস্তায় মরিয়া পড়িয়া থাকিবে। স্বামীটা পাগল, কোথায় কখন থাকে ঠিক নাই। মাঝে মাঝে আসিয়া উদয় হয়, খিড়কির দরজায় দাঁড়াইয়া স্ত্রীর উপর তম্বী করে। ভাবার্থ : খবরদার, যেন সে কোনোক্রমে বেচাল না হয়, সতীত্বই আসল ধর্ম, ইজ্জৎ যেন ষোল আনা বজায় থাকে—ইত্যাদি। ছোট ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া চুমাও খায়। আবার কোথায় উধাও হইয়া যায়। এককালে শঙ্করের বাবার গাড়ি-ঘোড়া ছিল, এখন সে সব কিছু নাই, আস্তাবলটা খালি পড়িয়া আছে। তাহাতেই দাইটা সন্তান-সন্ততি লইয়া থাকে।

এতগুলি পোষ্য প্রতিপালন করিতে হয় বলিয়া অমিয়া এতটুকু বিরক্ত নয়। শঙ্কর সাহিত্য লইয়া যখন মাতিয়া ছিল তখন অমিয়া যথাসাধ্য নিজের বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে সেই সাহিত্যেরই রসগ্রহণ করিতে চেষ্টা করিত। তাহার মনে হইত, সাহিত্যরসিক না হইতে পারিলে শঙ্করের মন পাওয়া যাইবে না। কিন্তু রস যে সে না পাইত তাহা নয়, কিন্তু তাহা তাহার প্রাণ-মনকে তেমন নাড়া দিত না। অনেকটা যেন কর্তব্যবোধেই সে শঙ্করের এবং সমসাময়িক লেখক-লেখিকাদের রচনার সহিত পরিচয় লাভ করিবার চেষ্টা করিত। এখন সে সব দিন গিয়াছে। শঙ্কর মাতিয়াছে পল্লী উন্নয়ন লইয়া। গরিব দুঃখীদের কিসে ভালো হয়, ইহাই এখন তাহার ধ্যান-জ্ঞান। অমিয়াও তাই যথাসাধ্য গরিব-দুঃখীদের দুঃখ মোচন করিবার চেষ্টা করে। তাহার আয়ত্তের মধ্যে যতটুকু, ততটুকুই করে। স্বামীকে সুখী করাই তাহার উদ্দেশ্য। সাহিত্যচর্চা অপেক্ষা এসব করিয়া ঢের বেশি আনন্দও পায়। আনন্দের আর একটা গোপন কারণও আছে। কলিকাতায় শঙ্কর যেমন ছিল, এখানে আসিয়া আর তেমনটি নাই। তাহার স্বভাব অনেক বদলাইয়াছে। মুখে অবশ্য সে শঙ্করকে কখনও কিছু বলে না। কলিকাতায় যখন সে মদ খাইয়া অধিক রাত্রে বাড়ি ফিরিত, তখনও যেমন সে নীরব ছিল এখনও তেমনই নীরব আছে। কিন্তু সে সব বোঝে। শঙ্কর তাহাকে যতটা নির্বোধ মনে করে, ঠিক ততটা নির্বোধ সে নয়। উৎপলবাবুর স্ত্রী সুরমার মত হয়তো সে বিদুষী নয়, কিন্তু স্বামীর সম্বন্ধে তাহার মন কখনও ভুল করে না। শঙ্কর যখন কুপথে যায়, তখন সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ না পাইলেও তাহার অন্তর্যামী মন যেমন আসল সত্যটি বুঝিতে পারে, কুপথ হইতে সুপথে যখন ফিরিয়া আসে তখনও তেমনই পারে। কিছুই তাহার মনের অগোচরে থাকে না। কলিকাতায় শঙ্কর যখন বিপথগামী হইয়াছিল, তখন তাহার মনে একটু কষ্ট হইয়াছিল বইকি, কিন্তু খুব বেশি বিচলিত সে হয় নাই, তাহার কারণ, শঙ্করের মহত্ত্বের প্রতি তাহার গভীর আস্থা ছিল। সে জানিত, সোনাতে কখনও কলঙ্ক লাগিবে না। সাময়িকভাবে একটু ছাই বা ধূলা যদি লাগেও, তাহা যথাকালে আপনি উঠিয়া যাইবে। উহা লইয়া বেশি হৈ-চৈ করিলে সুবর্ণ-অধিকারীর সুবর্ণ-চরিত্রে জ্ঞানে অভাবই সূচিত করে। এখন আবার স্বর্ণের স্বাভাবিক দীপ্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। যে সব দীন-দরিদ্রের প্রতি মনোযোগ দিয়া তাহার স্বামীর স্বাভাবিক মহত্ত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সব দীন-দরিদ্রদের সে-ও সেবা করিতে উৎসুক। তাহার এই মনোভাব যদিও কলিকাতায় সাহিত্যচর্চা করিবার মত শুষ্ক কর্তব্যবোধ-মাত্রই নয়, কিন্তু তাহা শঙ্করের প্রেরণার মত আবেগপূর্ণও নয়। অমিয়ার প্রধান লক্ষ্য—শঙ্কর, অন্য কিছু নয়।

খোখিদিদি—এ খোখিদিদি—আব—

দাত্‌তি।

খোখিদিদি উঠানে বাঘা কুকুরটার ঘাড়ে চড়িয়া তাহার কান মোচড়াইতেছিল। বলিষ্ঠ বাঘা অস্ফুট কুঁ-কুঁ শব্দ করিতে করিতে তাহার এই স্নেহের অত্যাচার সহ্য করিতেছিল। ঝুম্‌মরের প্রতি খোখিদিদির মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়াতে সে নিস্তার পাইয়া বাঁচিল। দাত্‌তি—বলিয়া খোখিদিদি প্রবীণ গিন্নীর মত ঝুম্‌মরের দিকে আগাইয়া গেল। কিছুদূর গিয়া তাহার হুঁশ হইল যে, রিক্তহস্তে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। তখন সে ফিরিয়া মাকে ডাকিল।

মা, ঝুম্‌মু—তাল দাও।

যাচ্ছি।

অমিয়া পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। একটু তাড়াতাড়িই আসিল, তাহার ভয়—পাচ্ছে খুকি ঝুম্‌মরকে ছুঁইয়া ফেলে। মেয়ের তো সকলের সঙ্গে ভাব, এখনই হয়তো উহার ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

বাঘাকে ছুঁয়েছ?

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া খুকি বলিল, না।

'হ্যাঁ' কে খুকি 'না' বলে।

তবে দাঁড়াও, গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিই মাথায়।

অমিয়া পুনরায় পূজার ঘরে ঢুকিল এবং গঙ্গাজল আনিয়া মেয়ের মাথায় ছিটাইয়া দিল।

গঙ্গা—গঙ্গা—গঙ্গা।

খুকি মাথা পাতিয়া গঙ্গাজল লইয়া বলিল, গগ্‌গা গগ্‌গা—এবং হাসিল।

সর্দিতে নাক বন্ধ, 'গঙ্গা' উচ্চারণ হয় না।

আলো দাও।

জলের ছিটা চোখে মুখে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা চমৎকার লাগে।

না, আর দিতে হবে না।

তাহার পর ঝুম্‌মরের দিকে ফিরিয়া অমিয়া বলিল, তুই আর চাল নিয়ে কি করবি? দুপুরে বরং ছেলে দুটোকে নিয়ে এখানেই খাস।

ঝুম্‌মর সেলাম করিল। তাহার পর সসঙ্কোচে হাসিয়া ধরা-গলায় পুনরায় আবেদন জানাইল, এক টুকরো পাঁওরোটি মিলতিয়ে মাঈজি, রাতিসে ভুখলো ছি—

গ্রামের দুইটি বেকার বাঙালি যুবককে উৎসাহিত করিয়া শঙ্কর এখানে একটি বেকারি স্থাপন করিয়াছে। শঙ্কর সেখান হইতে রোজ পাঁউরুটি লয়। ঝুম্‌মর শঙ্করেরই উচ্ছিষ্ট পাঁউরুটি মাঝে মাঝে দুই-এক টুকরা খাইয়া দেখিয়াছে। চমৎকার খাইতে। একটু চা দিয়া ভিজাইয়া লইলে তো আরও চমৎকার, চিবাইতে হয় না, ভিজিবামাত্র নরম তুলতুল করে।

গরিব মানুষের আবার পাঁউরুটি খাওয়ার শখ কেন রোজ রোজ? মুড়ি খাও না চারটি।

ঝুম্‌মর একটু অপ্রস্তুত মুখে চুপ করিয়া রহিল।

খুকি বলিল, পালুটি কাবে? পালুটি? দিত্‌তি।

খুকি ভাণ্ডারঘরের দিকে অগ্রসর হইল। মিট-সেফে কোথায় পাঁউরুটি থাকে, তাহা তাহার অজানা নাই।

বাবা বাবা, মেয়ের কত্তাত্তির জ্বালায় গেলাম!

মেয়ের পিছু পিছু অমিয়াও ভাণ্ডারঘরে ঢুকিল এবং ঝুম্‌মরের জন্য এক টুকরো রুটি তাহার হাতে দিল।

আল্‌গোছে দিও, ছুঁয়ো না যেন।

আত্‌তা।

শঙ্কর এতক্ষণ বাহিরের ঘরে নানাবিধ লোকপরিবৃত হইয়া নানারূপ সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত ছিল। একটু ফাঁক পাইয়া সে ভিতরে আসিল একটু চায়ের আশায়। পূজা সারিয়া

অমিয়া এই সময় একটু চা পান করে, শঙ্করও প্রায় এ সুযোগ ছাড়ে না। আসিবামাত্র খুকু তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—

মানে—কোলে কর। কোলে তুলিয়া লইতে হইল।

তোমার চা খাওয়া হয়ে গেল নাকি?

না। এস না।

হামরো এক জরা দিও মাঈজি।

মুখপোড়ার পাঁউরুটি চাই, চা-ও চাই! সুখ আর ধরছে না!

হাসিয়া শঙ্করের দিকে চাহিয়া অমিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল।

গল্‌লা বঝি গেলছে মাইজি।

হাসপাতাল থেকে ওষুধ নাওগে যাও না। তোমাদের জন্যে তো হাসপাতাল করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঝুম্‌মর বলিল যে, হাসপাতালে সে গিয়াছিল, তাহার গলায় কি একটা ঔষধ তাহারা লাগাইয়াও দিয়াছিল, কিন্তু কোনো উপকারই হয় নাই, বরং আরও বেশি বসিয়া গিয়াছে।

অমিয়া শঙ্করকে বলিল, এখানকার হাসপাতালের ডাক্তারবাবুটি তেমন সুবিধের নয়। হয় কিছু জানে না, নয়, গরিবদের ভালো করে দেখে না। আমাদের দাইটার আমাশা তো মাসখানেক থেকে কিছুতেই সারছে না, অথচ রোজ ওষুধ খাচ্ছে।

কি করি বল, শিক্ষিত লোক দেখেই তো রাখা হয়েছে। এখুনি বেরুব একবার, তখন খোঁজ করব।

ঝুম্‌মরকে বলিল, চা পিকে হামারা সাথ তুম চলো দাবাকা ইন্‌তিজাম কর দেঙ্গে।

শঙ্কর হিন্দি ভালো জানে না। হিন্দি, ভাঙা উর্দু, মোচড়ানো বাংলা প্রভৃতি মিশাইয়া একটা খিচুড়ি ভাষায় যা-হোক করিয়া কাজ চালাইয়া লয়।

'ইন্‌তিজাম' শব্দটা ঝুম্‌মর ভালো বুঝিল না, কিন্তু শঙ্করের কথার সারমর্ম বুঝিতে তাহার বিঘ্ন হইল না। সে বসিয়া রহিল।

ঝুম্‌মরকে সঙ্গে লইয়া শঙ্কর হাসপাতালে গিয়া দেখিল, সেখানে অনেক রোগী ভিড় করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু ডাক্তারবাবু নাই। তিনি উৎপলকে দেখিতে গিয়াছেন। উৎপলের নাকি পরশু হইতে শরীর খারাপ। শঙ্করও তিন-চারদিন উৎপলের খবর পায় নাই, উৎপলের বাড়িতে যায় নাই। সে ঝুম্‌মরকে হাসপাতালে বসাইয়া উৎপলের বাড়ি চলিয়া গেল।

।। ছয় ।।

নিজের বাড়ির সম্মুখে প্রশস্ত গোলাপ-বাগানে দাঁড়াইয়া উৎপল কয়েকটি সদ্যক্রীত মূল্যবান গোলাপ-চারার বিষয়ে মালীকে উপদেশ দিতেছিল। শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইল।

তোমার কথাই ভাবছিলাম। এত লোকের এত উপকার করে বেড়াচ্ছ, আমার একটু কর না।

হয়েছে কি তোর?

সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। ওই দেখ, ওধারের স্নো-কুইনটার কি দশা, এদিকে এভারেস্টও যায় যায়—ডিউক অব ওয়েলিংটন পর্যন্ত ঘায়েল হয়ে পড়েছে।

শঙ্করকে ভ্রূকুঞ্চিত করিতে দেখিয়া উৎপল বলিল, অমন ভ্রূকুটি করবার দরকার নেই, খুব সাঙ্ঘাতিক কিছু নয়—। উই। উই ভার্সাস we। তামাকের জল দিয়ে দিয়ে পরিশ্রান্ত হয়েছি, তোমার যদি কিছু জানা থাকে বল।

সহসা থামিয়া বলিল, অনেকক্ষণ সিগারেট খাওনি মনে হচ্ছে।

পকেট হইতে সোনার সিগারেট-কেস বাহির করিয়া উৎপল সেটি শঙ্করের সম্মুখে খুলিয়া ধরিল। একটি সিগারেট তুলিয়া লইয়া শঙ্কর বলিল, তোকে তখুনি বলেছিলাম, ওই প্রমথ ডাক্তারকে রেখো না, লোকটা বড় বেশি কথা বলে আর একের নম্বর ফাঁকিবাজ।

কেন, কি করেছে?

এখনই হাসপাতালে গিয়েছিলাম। বহু রোগী বসে আছে, অথচ তার পাত্তা নেই। হাসপাতালে বলে এসেছে যে, তোমার নাকি অসুখ, তুমি ডেকে পাঠিয়েছ। তোমার যে কিছু হয় নি, তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

উৎপল অপ্রতিভ হইল।

I stand rebuked, আমিই ডেকে পাঠিয়েছি—ভদ্রলোক এখানেই আছেন।

কি হয়েছে তোর?—শঙ্কর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

চলতি ভাষায় সর্দি, ডাক্তারি ভাষায় ইনফ্লুয়েঞ্জা।

এতেই এত ভয়?

ভয় অসুখকে নয়, সুরমাকে। আয়, ভেতরে আয়।

ভেতরে সুবিস্তৃত দালানে প্রমথ ডাক্তার ও বীরু খানসামা ছিল। প্রমথ ডাক্তার বীরু খানসামার অন্তরে সম্ভ্রম উদ্রেক করিবার মানসেই সম্ভবত তাহাকে সবিস্তারে বুঝাইতেছিলেন, ব্রঙ্কাইটিস-কেট্‌ল কিভাবে ব্যবহার করিতে হয়, ফুটবাথ দিতে হইলে জলের উত্তাপ ঠিক কতটা হওয়া প্রয়োজন, অ্যাস্‌পিরিন নামক, ঔষধের ডোজ কি, দোষ কি কি, অ্যাস্‌পিরিন না দিয়া তিনি ভেরামন কেন ব্যবহার করিতেছেন, উৎপলের চিকিৎসার জন্য কি কি 'প্রিকশন' তিনি লইবেন। এমন সময় উৎপল ও শঙ্কর আসিয়া প্রবেশ করিল। বীরু পাশের দরজা দিয়া সুট করিয়া সরিয়া পড়িল, প্রমথ ডাক্তার সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

এটা কি?

শঙ্কর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

ওটা হচ্ছে স্যার ব্রঙ্কাইটিস-কেট্‌ল। বেশি কাশি হলে কিংবা লাংসে কোনো অ্যান্টিসেপ্‌টিক দিতে হলে আমরা এটা ব্যবহার করি।

বুক খোলা জামা গায়ে মালকোঁচা-মারা প্রমথ ডাক্তার বেশ সপ্রতিভ ব্যক্তি।

উৎপল প্রমথ ডাক্তারের দিকে চাহিয়া বলিল, আপনি হাসপাতাল ফেলে চলে এসেছেন, শঙ্করের কাছে আমাকে বকুনি খেতে হল।

হাসপাতালে আপনি গিয়েছিলেন নাকি স্যার, কোনো দরকার ছিল?

একটা রোগী নিয়ে গিয়েছিলাম।

ও, চলুন, যাচ্ছি, কি রোগী?

ঝুম্‌মরকে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওর কাশি কিছুতেই সারছে না, গলাটা ভেঙেই আছে, ও-ই বেচারির উপজীবিকা—

ডাক্তারবাবু ক্ষণকাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। ঝুম্‌মর? কই চিনতে পারছি না।

ওই যে কাঠের পা পরে বেড়ায়, সব রকম জানোয়ারের ডাক ডাকে—

বুঝেছি, বুঝেছি। ওর গলায় তো রোজ থ্রোট-পেন্ট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে স্যার, মেন্ডেল্‌স পিগমেন্ট দিচ্ছি—

কমছে না কিন্তু।

গলার ভেতরটা একবার 'এক্সপ্লোর' করা দরকার। করিই বা কি করে? আমাদের ল্যারিংগোস্কোপ যে নেই।

উৎপল এতক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া সবিস্ময়ে ব্রঙ্কাইটিস-কেট্‌লটাকেই নিরীক্ষণ করিতেছিল।

এটা কি আমার জন্যেই এনেছেন?

হ্যাঁ, স্যার।

হাসপাতাল থেকে?

হ্যাঁ, স্যার। রাত্রে যদি কোনো ফিট অব কাফ-টাফ হয়, দরকার লাগতে পারে।

উৎপলকে নীরব দেখিয়া এবং তাহার নীরবতার কারণ অনুমান করিয়া লইয়া ডাক্তারবাবু পুনরায় বলিলেন, স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা চলবে—ব্র্যান্ড নিউ আছে।

আছে নাকি? আচ্ছা। আপনি আপনার প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন ডিরেকশন সব লিখে রেখে যান।

সারটেন্‌লি।

ডাক্তারবাবু পটাৎ করিয়া বুক-পকেট হইতে ফাউন্টেন-পেন বাহির করিয়া লিখিতে বসিয়া গেলেন।

শঙ্কর বলিল, ল্যারিংগোস্কোপ আনা যদি দরকার মনে করেন, আনিয়ে নিন না। বলেন তো আজই অর্ডার প্লেস করে দি।

প্রমথ ডাক্তার লিখিতে লিখিতে উত্তর দিলেন, দিন।

আয়, ওপরে আয়।

উৎপল সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

যাচ্ছি।

প্রমথ ডাক্তারের দিকে ফিরিয়া শঙ্কর বলিল, ঝুম্‌মরটাকে হাসপাতালে বসিয়ে রেখে এসেছি। আপনি তা হলে গিয়ে তার একটা ব্যবস্থা করে দিন।

সারটেন্‌লি। একটা গার্গারিস্‌মা দিয়ে দেখি আজ। পরে না হয় লিংটাস দেব যদি না কমে।

উৎপল ওপরে উঠিয়া গিয়াছিল, শঙ্করও অনুগমন করিল। ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপশন ও ডিরেকশন লিখিতে লাগিলেন।

সুরমা স্পিরিট-স্টোভে দুধ গরম করিতেছিল। শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইতেই উৎপল সুরমার দিকে চাহিয়া বলিল, তোমার জন্যে শঙ্করের কাছে বকুনি খেতে হল।

সুরমা কিছু না বলিয়া স্মিতমুখে শঙ্করের দিকে চাহিল ও স্পিরিট-স্টোভ হইতে দুধটা নামাইয়া নিপুণভাবে একটি সুদৃশ্য পেয়ালায় ঢালিল। এক ফোঁটা বাহিরে পড়িল না, এবং নীরবে বাহির হইয়া গেল।

মৃদু হাসিয়া উৎপল বলিল, দশটা বাজল।

তা হবে বোধ হয়।

বোধ হয় নয়, নিশ্চয়। দুধ গরম করে কাপে ঢালা হয়ে গেছে যখন—

পাশের ঘরের একটা ঘড়িতে টং টং করিয়া দশটা বাজিল।

ওই শোন। এখন সমস্যা ওইটি গলাধঃকরণ করতে হবে। কি মুশকিল!

ক্ষিদে না থাকলে জোর করে খাওয়াবে নাকি?

ওই তো মজা, জোর করে না কখনও। ঠিক সময়ে দুধটি গরম করে পাশে রেখে যাবে, হয়তো একবার বলবে—খাও। যদি না খাও, কিছু বলবে না, মুখও যে ভার করে থাকবে তা নয়; কিন্তু কেমন যেন সর্বদা মনে হতে থাকবে, নেপথ্যে ও চটেছে। সে এক ভারি অস্বস্তি, তার চেয়ে খাওয়াই ভালো।

এ সময়ে রোজ দুধ খাস নাকি?

তোমার ওই ডাক্তার এসে ব্যবস্থা করেছে। ডাক্তারের বাক্য সুরমার কাছে বেদবাক্য।

সুরমা আসিয়া প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবামাত্রই উৎপল থামিয়া গেল এবং নিতান্ত ভালোমানুষের মতো মুখ-চোখ করিয়া বলিল, শঙ্করকে বলছিলাম, সুরমা হয়তো তোমাকে কফি না খাইয়ে ছাড়বে না।

কফির কথা বলতেই গিয়েছিলাম।

শঙ্কর বলিল, আমাকে কিন্তু এখনই উঠতে হবে। বেশি দেরি করতে পারব না।

উৎপল গম্ভীর মুখে সুরমার দিকে চাহিয়া ছদ্ম আদেশের ভঙ্গিতে বলিল, না, দেরি করিয়ে দিও না, দেশের কাজে বাধা দেওয়া অন্যায়। একেই তো তুমি সকালবেলা ডাক্তারকে ডেকে গরিবদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছ।

আমরা গরিব নই বলে বিনা চিকিৎসায় মারা যাব নাকি?

এই বলিয়া সুরমা কোণ হইতে একটি চৌকো ফ্রেম বাহির করিল এবং স্মিতমুখে শঙ্করের দিকে একবার চাহিয়া অর্ধ-সমাপ্ত কার্পেটের আসনটিতে মন দিল।

কেন, আপনারা তো চরণবাবুকে ডাকতেন! তিনি ডাক্তারও ভালো, লোকও ভালো, কারও চাকরি করেন না, তিনিই তো বেশ ছিলেন, তাঁকে ছাড়লেন কেন?

তাঁকেই তো ডাকতে পাঠিয়েছিলাম, তিনি এলেন কই? তাঁকে পাওয়া শক্ত। পরশু বললেন, দুটোর সময় যাব; কাল তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করে বীরুকে পাঠালাম সাইকেল করে। তিনি বললেন, আমার এখনও কয়েকটা গরিব রোগী দেখতে বাকি আছে, তাদের দেখে তবে যাব। আমরা যেন বড়লোক হয়ে চোরের দায়ে ধরা পড়েছি।

সুরমা কার্পেটের আসন বুনিতে শুরু করিয়া দিল। উৎপল দুধের কাপটা তুলিয়া এক চুমুক পান করিয়া নীরবে আবার তাহা নামাইয়া রাখিল। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিয়া গেল। আসনের ফুলগুলির দিকে চাহিয়া শঙ্কর বলিল, বাঃ, আসন তো বেশ চমৎকার হচ্ছে আপনার!

উৎপল বলিল, তা হচ্ছে। কিন্তু ওতে তোমার বা আমার কোনো লাভ নেই।

কেন?

আমরা পাব না। প্রত্যেক মন্দিরে মন্দিরে পুরোহিতের বসবার জন্যে একটি করে দান করবেন উনি ঠিক করেছেন।

বেশ, ভালোই তো।

ও! কুন্তলাদেবীর সঙ্গে তোমারও আলাপ হয়েছে নাকি?

না। তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কি?

তিনিই এই সদিচ্ছাটি ওঁর অন্তরে, তোমরা সাহিত্যিকেরা যাকে বল উদ্বুদ্ধ, তাই করেছেন। তোমারও সহানুভূতি দেখে মনে হচ্ছে যে, হয়তো তোমার সঙ্গেও—

না, আলাপ হয়নি, কিন্তু আলাপ করতে হবে। ওঁর সম্বন্ধে যা শুনি, তাতে মনে হয় চেষ্টা করলে ওঁকে হয়তো আমাদের কাজে লাগাতে পারা যায়।

সুরমা আপনার মনে বুনিতেছিল। এই কথায় বলিল, আপনাদের এই ধরনের পল্লীসংস্কার ওর পছন্দসই নয়।

তাই নাকি? বলছিলেন কিছু?

একদিন কথা হয়েছিল, তাতেই আভাসে বুঝলাম।

'আভাস' কথাটা শুনিয়া উৎপল ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলন করিয়া সুবোধ বালকের ন্যায় দুধের কাপটি তুলিয়া আর এক চুমুক পান করিল।

আভাসে বুঝেছেন মানে?

এ নিয়ে তর্ক করলে হয়তো ওর মনের ভাবটা স্পষ্ট বোঝা যেত, কিন্তু তা আর আমি করিনি। কি হবে বাজে তর্ক করে ওর সঙ্গে?

বিশেষত হেরে যাবার সম্ভাবনাটাই যখন বেশি।

উৎপল ফোড়ন কাটিল।

ইহাতে সুরমা চটিল না, মুচকি হাসিয়া বলিল, তাও ঠিক। ভয় করে ওর সঙ্গে তর্ক করতে।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, খুব মুখরা নাকি?

না। খুব কম কথা বলে। দারুণ সংস্কৃত জানে বলে ভয় হয়।

উৎপল দুধের পেয়ালাটি নিঃশেষ করিয়া নামাইয়া রাখিল এবং বলিল, সুরমার কাছে ওঁর সঠিক চিত্রটি পাবে না।

কেন? শঙ্কর প্রশ্ন করিল।

দু'জনে বন্ধুত্ব হয়েছে।

সুরমা হাসিল, শঙ্করও হাসিল।

উৎপল বলিল, পাশের ঘর থেকে সেদিন আমি যতদূর আন্দাজ করেছিলাম, তাতে ওঁর সম্বন্ধে একটি উপমাই আমার মনে হয়েছিল, সুরমা যদি রাগ না করে বলতে পারি।

সুরমা সহাস্য দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিল। কোনো প্রকার মন্তব্য করিল না।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, কি উপমা, শুনিই না?

কামান। কামানও বেশি কথা বলে না, কিন্তু যখন বলে, তখন একেবারে কন্‌ভিন্‌সিং।

কফির সরঞ্জাম লইয়া ভৃত্য প্রবেশ করিল এবং ছোট একটি টেবিলে সেগুলি রাখিয়া টেবিলটি আগাইয়া দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

আর কিছু খাবেন?

সুরমা উঠিয়া দাঁড়াইল।

না।

সহসা শঙ্করের অনাহারক্লিষ্ট ঝুম্‌মরের কথা মনে পড়িল। সে হয়তো তাহার অপেক্ষায় এখনও হাসপাতালে বসিয়া আছে। ডাক্তারবাবু এবার তাহাকে ঠিকমত ঔষধ দিয়াছেন কি না কে জানে!

।। সাত ।।

প্রমথ ডাক্তার বেশ করিতকর্মা ব্যক্তি। বছর তিনেকের মধ্যে উৎপলদের এই প্রাইভেট ডাক্তারখানাটিকে অবলম্বন করিয়াই তিনি নিজের বেশ একটি 'ফিল্‌ড' 'ক্রিয়েট' করিয়া লইয়াছেন। যে সম্প্রদায় ডাক্তারের মধ্যে কেবল চিকিৎসকই নয়, ধূর্ত ফন্দিবাজ বন্ধু কামনা করেন (যিনি আইনজ্ঞ অথচ নিরঙ্কুশ), সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রমথ ডাক্তার বেশ পসার জমাইতে পারিয়াছেন। মিথ্যা সার্টিফিকেট লিখিয়া, দারোগাকে তোয়াজ করিয়া, জেলার গভর্নমেন্ট অফিসারদের সহিত ভাব-সাব রাখিয়া, উৎপল এবং শঙ্করের তোষামোদ করিয়া তিনি নিজের আসনটি বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইঞ্জেক্‌শন-বিশারদ বলিয়া এ অঞ্চলে তাঁহার একটা বিশেষ খ্যাতি হইয়াছে। 'জক্‌শন' দিয়া তিনি বহু দুঃসাধ্য ব্যাধি নাকি সারাইয়াছেন।

গুলাব সিং আসিয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি শহর হইতে ইঞ্জেকশনের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইয়া ফিরিয়াছেন। গোঁফ চুমরাইতে চুমরাইতে সালঙ্কারে নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতেছিলেন।

হড়বড়মে থে হুজুর, ভুখতি লগা থা, হালওয়াইকো কহা—জলদি করো ভাই। উ ভুজতে চলা, ম্যঁয় খাতে চলে। কুছ দেরমে খেয়াল পড়া ই তো গল্‌তি কাম কর রহেঁ হেঁ, ই শালা তো কাচ্চা পুরি খিলা রহা হ্যা। খেয়াল হোনেকা সাথহি খানা বন্ধ কর দিয়া—মগর তবভি ভোগনা পড়া ডাক্তারবাবু।

ক্যা হুয়া?

কাচ্চা আঁটা পেটমে লসক্ গিয়া।

লসক্ গিয়া?

লসক্ গিয়া। দো রোজ দস্ত নহি উত্‌রা, বাই তক ভি গায়েব—ঠসম্-ঠোস। এক ডাক্‌টরকো বোলায়েঁ। উ আ কর এক সুই দিহিন, এক পুরিয়া দিহিন, পাঁচ রুপিয়া ফিস লিহিন। নেহি উতরা। দুসরা এক ডাক্‌টর বোলায়েঁ, ইস্ ডাক্‌টরনে দো সুই দিহিন, এক শিশি দাবাই দিহিন, ফিস লিহিন আট রুপিয়া। কুছ নেহি হুয়া। পেট বেশি ফুলা দিহিস। ম্যয় আর দেরি নেহি কিয়া, তনাক শহর চলে গ্যয়ে। ডাক্‌টার চৌধুরিকো বোলায়েঁ। ডাক্‌টার চৌধুরি আচ্ছাহ তরেসে দেখিন্, পেটমে যন্তর বৈঠাইন, বাঁমে ফিতা লপ্টাকে প্রিসার দেখিন, পেসাব জামিন কিহিন, পাঁচ রুপিয়া ফিস দেনে পড়া পেসাব জামিন কা বাস্তে। দেখ শুন কর ডাক্‌টর

চৌধুরি কহিন, দেখো ভাই, ইসকা দো তরেকা জকশন হ্যা মেরা পাস, এক বড়া, এক ছোটা। বড়া জকশন দেনে সে চার ঘণ্টাকা অন্দর পাখানা উতর যায়ে গা, ছোটামে দো রোজ লাগে গা। বড় জকশনকা কিমৎ ষোলা রুপেয়া, ছোটাকা পাঁচ রুপেয়া, অব তুমহারা ক্যা খাঁইস কহো? ম্যঁয় কহা, বড় জকশনই দিজিয়ে হুজুর, জান যা রহা হ্যায়। ইয়া বড়া এক জকশন চুতড়মে ঘোঁৎ দিহিন, আউর মিশ্‌রিকে লায়েক এক দাবা ছ চাম্‌মচ লেকে গরম পানিমে ঘোরাকে পিলা দিহিন। জহরকা লায়েক তিতা। মগর হাঁ—

উদ্ভাসিত মুখে গুলাব সিং চুপ করিলেন।

হো গিয়া?

একদম সাফ—দোহি ঘণ্টে মে।

ইহা শুনিয়া প্রমথ ডাক্তার চক্ষুর্দ্বয় ঈষৎ বিস্ফারিত করত মাথা নাড়িয়া ভাঙা হিন্দিতে অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, অভিজ্ঞ ডাক্তার ঠিক ঔষধটি নির্বাচন করিয়া যদি জকশন দেন ফল তো হইবেই।

বেশক।

গুলাব সিং গোঁফ চুমরাইয়া অতঃপর তাঁহার আগমনের কারণটি ব্যক্তি করিলেন।

আজ হুজুর মেরে ঘর পর তশরিপ লাইয়ে।

কাহে?

মেরা জানানাকো এক জকশন দেনা পড়ে গা।

ক্যা হুয়া উনকো?

উ যব চলতি ফিরতি হ্যায়, তব তো ঠিক হ্যায়, কোই তকলিফ নহি। মগর যবহি উ বাচ্চোকো গোদমে লে কর বৈঠি, যব তক সিধা রহি তব তক ঠিক রহি, মগর যবহি দুধ পিলানো কে লিয়ে সামনেহ ঝুকি, কচ—

গুলাব সিং কোমরে হাত দিয়া দেখাইয়া দিলেন কচ করিয়া ব্যথাটা কোথা লাগে।

এক ঘণ্টা বাদ আওয়েঙ্গে।

একঠো কড়া জকশন দেনে পড়ে গা।

আচ্ছা।

বাত তব পাক্কা?

পাক্কা।

পাক্কা কথা কহিয়া গুলাব সিংহের মনে হইল, দর্শনীটা অগ্রিম দিয়া দিলে ব্যাপারটা আরও পাকা হইয়া যাইবে। ন্যায্য খরচ করিতে তিনি কোনো কালেই পশ্চাৎপদ নহেন। ট্যাঁক হইতে ডাক্তারবাবুর দক্ষিণাটি বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন এবং জোড় হস্তে কহিলেন, উঠা লিয়া যায় হুজুর।

ডাক্তারবাবু টাকা চারিটি তুলিয়া লইয়া নমস্কার করিলেন। গুলাব সিংহও প্রতি-নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

ডাক্তারবাবু একাই থাকেন, পরিবার দেশে। কিছুক্ষণ পূর্বেই কল সারিয়া ফিরিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ পরিশ্রান্ত ছিলেন। ভাবিলেন, এক চটকা ঘুমাইয়া লইয়া তাহার পর গুলাব সিংহের

স্ত্রীকে একটা ইঞ্জেকশন দিয়া আসিবেন। ইঞ্জেকশন একটা দিতেই হইবে, না দিলে গুলাব সিংহের তৃপ্তি হইবে না। ঘুমাইতে যাইবেন, এমন সময় শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইল।

ডাক্তারবাবু, বিরজু মরে গেল নাকি?

বিরজু কে? কি হয়েছে?

আপনি কিছু জানেন না? বিরজু কাঠ কাটছিল, হঠাৎ কুড়ুলটা ফসকে তার পায়ে লাগে। রক্ত কিছুতেই বন্ধ হচ্ছিল না দেখে তাকে আমি আপনার কাছে পাঠালাম যে।

কতক্ষণ আগে?

তা প্রায় ঘণ্টা দুই হবে।

আমি ছিলাম না। কলে বাইরে গিয়েছিলাম।

লোকটা বিনা চিকিৎসাতেই মল তা হলে?

না, আমাদের কম্পাউন্ডার খুব এক্সপার্ট লোক, যা করবার করেছে ঠিক চলুন দেখি, কি ব্যাপার!

হাসপাতালে গিয়া দেখা গেল, বিরজুর মৃতদেহের পাশে বসিয়া তাহার যুবতী স্ত্রী বুকফাটা হাহাকার করিতেছে। এক্সপার্ট কমপাউন্ডারবাবু তাঁহার যথাসাধ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বিরজু মারা গিয়াছে। কম্পাউন্ডারবাবুর যথাসাধ্য যে কতদূর তাহা ডাক্তারবাবুর অবিদিত ছিল না অবশ্য, কিন্তু তিনি তাহা প্রকাশ করিলেন না, বরং বলিলেন, সবই তো করা হয়েছে দেখছি, সিরাম একটা দিলে ভালো হত অবশ্য, কিন্তু তা তো আমাদের হাসপাতালে নেই।

শঙ্কর এসব কিছুই শুনিতেছিল না। ওই শোকার্ত বিধবাটার গগনবিদারী ক্রন্দনে সে যেন মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, আহা, অমন জোয়ান লোকটা অপঘাতে মারা গেল! ডাক্তারবাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া কি বলিতেছিলেন, কিছুই শঙ্করের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল না। হঠাৎ তাহার কানে গেল, আমাদের একটা বড় সিরিঞ্জ পর্যন্ত নেই স্যার, গ্লুকোজ-টুকোজ দিতে এমন অসুবিধে হয়,—টেন সি সি সিরিঞ্জ দিয়ে, মানে বার বার খুলে খুলে দিলে—

শঙ্কর বলিল, কি কি জিনিস আপনাদের দরকার, তা তো আপনারাই ঠিক করে দেন, আমরা টাকা দিয়েই খালাস। যা যা দরকার তা তো আপনাকেই আনাতে হবে।

সারটেন্‌লি। দিয়েছিলামও, কিন্তু সিবিল সার্জন ঘচাঘচ কেটে দিলে সব, এমনকি অ্যাক্রিফ্লেবিন পর্যন্ত কেটে দিয়েছে স্যার।

টাকা আমরা দিচ্ছি, সিভিল সার্জন কেটে দেওয়ার কে?

প্রমথ ডাক্তার হাত উল্টাইয়া এমন একটা সহাস্য মুখভাব করিলেন, যাহার অর্থ—ওই তো! আর বলেন কেন! ও লোকগুলোর সব জায়গাতেই ফফরদালালি করা স্বভাব।

আমি ভাবছি—

কথাটা বলিয়াই শঙ্কর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থামিয়া গেল।

কি ভাবছেন?

ভাবছি, ডাক্তারের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করতে না পারলে, হাসপাতালে কাজ ভালো হওয়া সম্ভব নয়।

সারটেন্‌লি। কিন্তু তা হলেই মাইনেও বেশি দিতে হবে, পঁচাত্তর টাকায় কুলোবে না।

কত টাকা হলে কুলোয়?

অন্তত শ' পাঁচেক।

শ' পাঁচেক!

মৃদু হাসিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, তার কমে কি করে হয়, বলুন?

অত আমাদের বাজেটে কুলোনো শক্ত।

সারটেন্‌লি। বাজেট নিয়েই তো যত গোলমাল। সিভিল সার্জন যে ঘচাঘচ কেটে দেন, তাঁরও অজুহাত ওই বাজেট। আপনারা ওষুধ-পত্তরের জন্যে যত টাকা দেন—

আচ্ছা, চললাম।

হঠাৎ শঙ্কর হনহন করিয়া চলিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর কম্পাউন্ডারের দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, এ সব কবি-টবি নিয়ে চলাই দুষ্কর বাবা।

কম্পাউন্ডার একটু হাসিল।

ডাক্তারবাবু ডাক্তারখানায় আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিলেন না, গুলাব সিংহের স্ত্রীকে ইঞ্জেকশন দিতে যাইতে হইবে। ক্যালসিয়াম বা ভিটামিন বা ওই জাতীয় কিছু একটা দিতেই হইবে। লোকটা ডবল ফি দিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। বাসায় আসিয়া দেখেন, তাঁহার অপেক্ষায় একটি লোক এক হাঁড়ি দই, কিছু ভালো চিঁড়া এবং কয়েক ছড়া চমৎকার রম্ভা লইয়া বসিয়া আছে। ডাক্তারবাবুকে দেখিয়া লোকটি উঠিয়া ঝুঁকিয়া নমস্কার করিল এবং দেহাতি হিন্দি ভাষায় যাহা নিবেদন করিল, তাহার সারমর্ম এই, গুলাব সিংহের পত্নী ডাক্তারবাবুকে নমস্কার জানাইয়া এই ভেটগুলি উপহার পাঠাইয়াছেন, তাঁহার ডবল ফি-ও পাঠাইয়াছেন এবং অনুরোধ করিয়াছেন, তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া ইঞ্জেকশন দিবার জন্য না আসেন, কারণ তিনি কিছুতেই ইঞ্জেকশন লইবেন না। স্বামী কিন্তু না-ছোড়, তাই তিনি লুকাইয়া ডাক্তারবাবুকে এই অনুরোধটি জানাইতেছেন, ডাক্তারবাবু যেন টাল-বেটাল করিয়া কোনো রকমে ব্যাপারটা গোলমাল করিয়া দেন।

ডাক্তারবাবু গম্ভীরভাবে ভেটসহ ফিসটি হস্তগত করিয়া বাম গুম্ফপ্রান্তে মৃদু মৃদু তা দিতে দিতে সমস্ত ব্যাপারটি প্রণিধান করিলেন। তাহার পর বলিলেন, মাঈজিকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিও, ইঞ্জেকশন আমি দিব না। কিন্তু গুলাব সিংকে ফাঁকি দিবার জন্য ইঞ্জেকশন দিবার একটা অভিনয় করিতে হইবে। তাঁহার গায়ে সূচ ফুটাইব না, কিন্তু মাঈজিকে এমন একটা ভাব করিতে হইবে যেন ফুটাইলাম। এইরূপ না করিলে গুলাব সিং হয়তো অন্য ডাক্তার ডাকিবে এবং সে ডাক্তার হয়তো মাঈজির এ অনুরোধ না-ও রক্ষা করিতে পারেন।

এই বার্তা লইয়া লোকটি প্রসন্ন মনে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তারবাবুও অনুগমন করিলেন।

।। আট ।।

বাড়ি ফিরিয়া শঙ্কর দেখিল, স্যুট-পরিহিত একটি তরুণকান্তি যুবক তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। পদশব্দ শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং শঙ্করকে দেখিয়া যেন অবাক হইয়া গেল,

মুখভাবে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। শঙ্করও কম অবাক হয় নাই। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো বাক্যবিনিময় হইবার পূর্বেই যুবকটি পকেট হইতে কার্ড বাহির করিয়া শঙ্করের হাতে দিল এবং বলিল, আমি এই কোম্পানিকে রিপ্রেজেন্ট করছি। আপনার হাতে অনেকগুলো ডাক্তারখানা, আমাদের যদি অর্ডার দেন, ভারি উপকৃত হব। হাসপাতালের জন্যে আমাদের স্পেশাল রেট আছে, এই দেখুন—

হেঁট হইয়া চামড়ার ব্যাগ হইতে কাগজপত্র বাহির করিতে লাগিল। শঙ্কর সবিস্ময়ে চুপ করিয়া চাহিয়া ছিল, তাহার মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না। নিজের চক্ষুকে সে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। এ চেহারা তো ভুল হইবার নয়! যুবকটি খুব সপ্রতিভভাবে নিজের কাগজপত্র দেখাইতেছিল বটে, কিন্তু একবারও সে শঙ্করের চোখের দিকে চাহে নাই। নিজের কাগজপত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই কথাবার্তা চালাইতেছিল। ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতেছিল, প্রয়োজনীয় আলাপ শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িতে পারিলে সে যেন বাঁচে। শঙ্কর একটিও কথা বলে নাই, কেবল সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল।

বক্তব্য শেষ করিয়া যুবকটি একগোছা কাগজ টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে আমি দেখা করেছি। তাঁরা বললেন, আপনার সঙ্গেও একটু দেখা করে যেতে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন আমাদের কথা। আচ্ছা, আমি এখন চলি।

কোথায় যাবেন?

স্টেশনে।

একটু ইতস্তত করিয়া শঙ্কর অবশেষে বলিল, কিছু যদি মনে না করেন, একটা প্রশ্ন আপনাকে করব।

কি, বলুন?

বেলা মল্লিক বলে কি আপনার কোনো যমজ ভগিনী ছিলেন?

ভ্রূভঙ্গিসহকারে অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া যুবক বলিল, না। আচ্ছা, আমি এখন চলি।

বারান্দার নীচেই বাইক ছিল। দ্রুতপদে নামিয়া যুবক তাহাতে চাপিয়া বসিল এবং নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বিস্মিত শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল। ছদ্মবেশ সত্ত্বেও বেলা মল্লিককে চিনিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। বেলা মল্লিক? বেলা অবশেষে তাহার নারীত্বকেই অবলুপ্ত করিয়া দিল! প্রাক্-জীবনের একঝাঁক স্মৃতি মনের মধ্যে ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। বেশিক্ষণ কিন্তু সেসব লইয়া বসিয়া থাকিতে সে পারিল না।

বাবা, তল. তা তান্‌দা হত্‌তে।

খুকি আসিয়া হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। তাহার পর আসিল স্যানিটেশন বিভাগের চৌধুরি এবং বলিল, দশ পাউন্ড কুইনিন অবিলম্বে দরকার। সেদিন তো অত কুইনিন দিল, আবার কুইনিন চাই! শঙ্করের সন্দেহ হইল, কুইনিন বোধ হয় চুরি হইতেছে। কিন্তু ভদ্রসন্তানকে সে কথা বলা যায় না। তাহা ছাড়া অমিয়ার সহিত উহার স্ত্রীর বন্ধুত্ব হইয়াছে। শঙ্কর কিছুই বলিতে পারিল না। কেবল বলিল, কাল আসবেন।

।। নয় ।।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে।

নিজের ঘরে ঝকঝকে পিতলের পিলসুজে মাটির প্রদীপ জ্বালাইয়া নিবিষ্টমনে চরকা কাটিতে কাটিতে হাসি পুত্রটিকে কবিতা মুখস্থ করাইতেছিল। হাসির পরিধানে শুভ্র খদ্দরের থান, মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোনো অলঙ্কার নাই, চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রখর জ্যোতি। সে যেন ভিতরে ভিতরে জ্বলিতেছে। জ্বালা যে কেন, তাহা সে নিজেও জানে না। যাহা উচিত, যাহা বিবেকসম্মত, সমস্তই সে করিতেছে, তবু সমস্ত অন্তর যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া গেল।

ছেলেটি ঠিক বাপের মত হইয়াছে। মৃন্ময়ই যেন শিশুরূপে আবার তাহার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে। তেমনই ধপধপে রঙ, তেমনই লাল চুল, তেমনই চোখ-মুখ—সব। হাসি তাহার নাম রাখিয়াছে, তুমি।

কই, বলছ না, বল আবার।—

'পড়ি গেল কাড়াকাড়ি
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারই লাগি তাড়াতাড়ি।'

দুই-একবার ভুল করিয়া 'তুমি' অবশেষে ঠিক করিয়া আবৃত্তি করিতে পারিল। চরকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে হাসি বলিয়া চলিল—

'সপ্তাহকালে সাত শত প্রাণ
নিঃশেষ হয়ে গেলে
বান্দার কোলে কাজী দিল তুলে
বান্দার এক ছেলে।
কহিল. ইহারে বধিতে হইবে
নিজ হাতে অবহেলে।'

এই ভাবে রোজ চলে। হাসি সকালে রাঁধে, নিজে পড়ে, ছেলেকে পড়ায়। মৃন্ময়ের একটা ছবি সম্মুখে রাখিয়া ফুল-চন্দন দিয়া পূজাও করে। দুপুরে স্কুল। বৈকালে ছেলের সঙ্গে থাকে। তাহার সহিত খেলাও করে। বাহিরে কোথাও যায় না, কাহারও সহিত মেশে না। এমন কি শঙ্করও যে তাহার নিকট বার বার আসে, ইহাও সে পছন্দ করে না। ইহাই তাহার বর্তমান জীবন। নিঃসঙ্গ এবং কর্তব্যময়।

।। দশ ।।

ব্যাঙ্কে আজ ধার লইবার দিন। অসম্ভব ভিড় হইয়াছে। কেবল সহি করিতে করিতেই শঙ্কর ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কাহার ধার পাওয়া উচিত, কাহার উচিত নয়, কাহার ধার শোধ করিবার সংস্থান আছে, কাহার নাই, এসব বিচার করিতে গেলে শুধু যে বিলম্ব হইয়া যায় তাহা নয়,

কেনারাম চক্রবর্তীকেও অসন্তুষ্ট করিতে হয়। তিনি যাহাকে যাহাকে সুপারিশ করিয়াছেন, শঙ্কর তাহারই দরখাস্ত মঞ্জুর করিতেছে। কেনারামবাবু অবশ্য প্রত্যেক দরখাস্তেই ইহা লিখিয়া দিয়াছেন যে, শঙ্কর নিজে ভালো করিয়া খোঁজ-খবর করিয়া যদি ধার দেওয়া নিরাপদ মনে করে, তবেই যেন ধার দেয়, কিন্তু তাহা শঙ্করের পক্ষে করা অসম্ভব। সে নির্বিচারে সহি করিয়া চলিয়াছে। মাথা-পিছু টাকা অবশ্য বেশি নয়, কেহ দশ, কেহ বিশ, কেহ পঁচিশ, কিন্তু মাথা অনেকগুলি, প্রায় দুই শত। ইহাদের প্রত্যেকের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর লওয়া শঙ্করের সাধ্যাতীত।

কাল ছট পরব। প্রত্যেকেরই টাকার দরকার এবং টাকার দরকার পড়িলে ধার করা ছাড়া অন্য কোনো সদুপায় ইহাদের জানা নাই। উৎপলও বলিয়াছে, পরবের সময় কাহাকেও যেন নিরাশ করা না হয়। আদেশের ভঙ্গিতে বলে নাই, অনুরোধ করিয়াছে।

সকলের দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া শঙ্কর বাড়ি ফিরিতেছিল। পথে হঠাৎ নেকিরাম মাড়োয়ারির সহিত দেখা হইল।

রাম রাম, সোংকরবাবু, রাম রাম। হাঁ, খুব কিয়া আপ দোনো, সব কোই ধন্ ধন্ বোলছে।

হিন্দি-বাংলা মিশ্রিত অদ্ভুত ভাষায় নেকিরাম দন্ত বিকশিত করিয়া সোল্লাসে উৎপলের এবং শঙ্করের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

গরিব লোক সব কাঁহাসে রুপিয়া লানবে! হামি লোক তো সব চোষ লিয়া। আপনেরা খুব করলেন। সামনে ছট পরব, কাঁহাসে রুপিয়া মিলবে বেচারাদের! খুব কিয়া, যশ হো গিয়া, সব কোই ধন্ ধন্ বোলছে, বা বা বা বা বা!

খানিকক্ষণ এই জাতীয় বক্তৃতার পর 'রাম রাম' করিয়া নেকিরাম পাশের গলিতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। শঙ্কর মনে মনে বেশ একটু পুলকিত হইল। নেকিরাম কাপড়ের দোকান ছাড়া মহাজনি কারবারও করে। এই ছট পরবের মরশুমে গরিব চাষীদের বেশ চড়া সুদে টাকা ধার দিয়া বেশ কিছু বাণিজ্য করিত, এবার বেচোরার সে গুড়ে বালি পড়িল। সত্যই ইহারা গরিবদের রক্ত শোষণ করে। নিজের মুখেই আবার বলা হইতেছে, হামি লোগ সব চোষ লিয়া! ইহারা না গেলে দেশের উন্নতি নাই। নিপু ঠিকই বলে। এই ক্যাপিটালিস্টরাই দেশের শত্রু, ইহাদের সর্বগ্রাসী লোভ দেশের সর্বস্বই গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে। অথচ ইহাদের বাদ দিয়া চলিবারও উপায় নাই। অর্থবানদের অর্থেই দেশের যত কিছু সৎকার্য হয়। ধনীদের বদান্যতাতেই গরিবদের উপকারের আশা। ক্যাপিটালিস্ট উৎপল যদি টাকা না দিত, তাহা হইলে তো এসব কিছুই হইত না। কমিউনিস্টদের মতে, এই উৎপলই কিন্তু উচ্ছেদযোগ্য। অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর যখন বাড়ি পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অমিয়া তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়া প্রণাম করিতেছিল। কমিউনিস্টদের মতে ভক্তিপরায়ণা অমিয়াও উপহাসাস্পদ।

প্রণতা অমিয়ার পাশে খুকিও হেঁট হইয়া বলিতেছে, নমো—নমো।

নিকার-বোকার পরানো থাকাতে ভালো করিয়া হেঁট হইতে পারিতেছে না, কিন্তু বেচারার চেষ্টার ত্রুটি নাই। কুঁতাইয়া কুঁতাইয়া যথাসম্ভব পিঠ বাঁকাইয়া চোখ-মুখ লাল করিয়া মাথাটা নত করিয়াছে।

শঙ্করের পদধ্বনি শুনিয়া তাহার প্রণাম করা ঘুচিয়া গেল। ঈষৎ ভ্রূভঙ্গি করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, তে? মানে, কে?

তাহার পর শঙ্করকে দেখিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া ছুটিয়া আসিল এবং তাহার হাঁটু দুইটি জাপটাইয়া ধরিয়া উদ্ভাসিত মুখে বলিল, ভম্ ভম্ ভম্ ভম্ বাদে।

শঙ্কর বলিল, কিচ্ছু হল না।

কিত্তু ওলো না?

না।

খুকি পুনরায় চেষ্টা করিল। চোখ বড় বড় করিয়া দুইবার আবৃত্তি করিল, ভম্ ভম্ ভম্ ভম্ বাদে, ভম্ ভম্ ভম্ বাদে।

শঙ্কর তাহাকে কোলে তুলিয়া চুমু খাইয়া বলিল, কিচ্ছু হচ্ছে না।

আজ সকালে নিমাই আসিয়াছিল এবং সে খুকিকে ভারতচন্দ্রের, ভুজঙ্গ-প্রয়াত ছন্দে লেখা দুই লাইন কবিতা শিখাইতে চেষ্টা করিয়াছিল।

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে।

খুকি কেবল শিখিয়াছে—'ভম্ ভম্ ভম্ বাদে' এবং তাহাই সমস্ত দিন যখন তখন আবৃত্তি করিয়া বেড়াইতেছে। কোলে উঠিয়াই খুকি শঙ্করের বুক-পকেটে হাত চালাইয়া সিগারেট-কেস ও ফাউন্টেন-পেনটি হস্তগত করিয়া ফেলিল এবং সতৃষ্ণ নয়নে হাতঘড়িটার পানে চাহিল। বাবার এই জিনিসগুলির ওপ্পর তাহার টান সবচেয়ে বেশি। চকচকে সেলুলয়েডের পুতুল অথবা দম-দেওয়া মোটরের উপর তাহার তাদৃশ্য মমতা নাই, প্রথম প্রথম যে মোহ ছিল, এখন আর তাহাও নাই। মোটরের চাবিও খারাপ হইয়া গিয়াছে, পুতুলটাও খুব সুস্থ নয়। বাঘা কুকুরটা চিবাইয়া তাহার একটা পা শেষ করিয়া দিয়াছে এবং দুইটি জিনিসই বারান্দার কোণে অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। খুকির টান বাবার এই জিনিসগুলির প্রতি। সিগারেট-হোল্ডারটা তো দখলই করিয়া লইয়াছিল, এখন অবশ্য সেটা হারাইয়া গিয়াছে, তাহার কথাও মনে নাই।

দাও, ওগুলো দাও।

খুকি মাথা নাড়িয়া আপত্তি করিল।

দাও তো, লক্ষ্মী। ও বাবা, তোমার কি সুন্দর কোট হয়েছে, দেখি দেখি!

কোটের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেই কোট সম্বন্ধে তাহার সত্য মতামত সে অকপটে ব্যক্ত করিয়া ফেলিল।

কোত কুলে দাও।

অমিয়ার জেদাজেদিতেই ওগুলো পরিতে হয়। কোট-পাজামা পরিয়া থাকিতে তাহার মোটেই ইচ্ছা করে না।

বাবা, কুলে দাও।

আবো নুনু, ইধার আবো? উঠানের অন্ধকার কোণ হইতে কে কথা কহিয়া উঠিল। খুকি সঙ্গে সঙ্গে কোল হইতে নামিয়া পড়িল। তাহার প্রিয় পরিচিত কণ্ঠস্বর।

যমুনিয়া নাকি?

অমিয়া ভাঁড়ার ঘরে ধুনা দিতেছিল, বাহির হইয়া বলিল, আবার কে, কাল ছট, টাকা দাও।

মুশাই গাড়োয়ানের বউ যমুনিয়া।

এখুনি তো মুশাই কুড়ি টাকা ধার নিয়ে গেল।

ওক্‌রসে একো পয়সা কি হামরো মিলতে। পঁদ্‌র রুপিয়া লেতেই নাকি মাড়বারিয়া আ পাঁচ রুপিয়া লেতেই ওহি মুসহরনি ছৌড়ি।

কি রকম?—ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শঙ্কর প্রশ্ন করিল।

যমুনিয়া সবিস্তারে যাহা বর্ণনা করিল, তাহাতে শঙ্কর অবাক হইয়া গেল। নেকি মাড়োয়ারি, রাজীব দত্ত এবং মুকুন্দ—এ অঞ্চলের এই তিনজন মহাজন নাকি তাহাদের সমস্ত খাতকদের ডাকাইয়া শাসাইয়াছেন যে, আজ সন্ধ্যার মধ্যে যদি সকলে তাহাদের ঋণ সুদ সমেত পরিশোধ না করে, তাহা হইলে প্রত্যেকের নামে নালিশ করিলে আদালতের বিচারে কি হইবে, তাহা যদিও ঠিক জানা নাই, কিন্তু নালিশের নামেই গরিব লোকেরা ভয় পায়। তাহারা ভালো করিয়াই জানে যে, যাহার প্রচুর অর্থ আছে, আদালতে শেষ পর্যন্ত তাহারই জয় হয়। তাহারা আজ সকলে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইয়াছে, উহাদের ঋণ পরিশোধ করিবার নিমিত্ত। সুদ সমেত ঋণ পরিশোধ করিলে ছটের জন্য আবার তাহারা নতুন ঋণ পাইবে, এ আশ্বাসও মহাজনরা অবশ্য দিয়াছে। কিন্তু যমুনিয়া অত চড়া সুদে আর টাকা ধার করিতে পারিবে না, কারণ বন্ধক দিবার মত তাহার আর কিছুই নাই। তাহার যাহা কিছু ছিল, সব উহাদের গর্ভেই গিয়াছে। যমুনিয়া মলিন বস্ত্রাঞ্চল চোখে দিয়া কাঁদিতে লাগিল। মুশাই আজকাল তাহাকে দেখে না, আজকাল রাত্রে বাড়ি পর্যন্ত যায় না, ওই মুসহরনি ছুঁড়িটার কাছে পড়িয়া থাকে, ছুঁড়ি তাহার স্বামীকে 'গুণ' করিয়াছে। ও মানুষ নয় ডাইনি। তাহার পর সহসা চক্ষু হইতে বস্ত্রাঞ্চল নামাইয়া শঙ্করের দিকে সে আগাইয়া গেল এবং একটু ঝুঁকিয়া মুখ বাড়াইয়া তিক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তোহি তো রুপিয়া দে দে করিকে ওকর এইসন হাতল করলি।

ছট করবি তুই কার জন্যে?

ওকরে বাস্তে।

ওই স্বামীর মঙ্গলার্থেই সে উপবাস করিয়া ছটপূজা করিবে।

ক'টাকা চাই?

দশঠো।

শঙ্কর বিনা বাক্যব্যয়ে দশটা টাকা বাহির করিয়া দিল।

অমিয়া কিছু বলিল না, মুচকি হাসিল। তাহার সমস্ত অন্তর যেন আনন্দে গর্বে ভরিয়া উঠিল। পূর্বে শঙ্করের যথেচ্ছ খরচ দেখিয়া তাহার কষ্ট হইত, এখন আর হয় না। এই লোকটির মনের সুরের সহিত সুর মিলাইয়া চলিতে পারিলেই আনন্দ পাওয়া যায়, ইহা সে বুঝিয়াছে।

যমুনিয়া চলিয়া গেল না। টাকাটা খুঁটে বাঁধিয়া খুকিকে কোলে লইয়া হিন্দি ছড়া বলিতে বলিতে ঘুম পাড়াইতে লাগিল, চানু মামু চানু মামু, আরে আবো বারে আবো, নদীয়া কিনারে আবো, সোনাকা কাটোরামে দুধু ভাতু নেনে আবো।

শঙ্কর বাহিরের আরাম-কেদারাটায় অন্ধকারে চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার কেবলই

মনে হইতে লাগিল, তাহাদের ব্যাঙ্কের এতগুলো টাকা ওই রক্তশোষক মহাজনদের সিন্দুকে গিয়া ঢুকিল। গরিব প্রজারা এক পয়সা পাইল না!

সব কোই ধন্ ধন্ বোলছে। খুব কিয়া আপলোগ। নেকি মাড়োয়ারির বিকশিতদন্ত মুখচ্ছবিটা তাহার চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল।

।। এগারো ।।

অন্ধকার রাত্রি, চতুর্দিক নির্জন। নিপু আপন ঘরে বসিয়া একমনে ডায়েরি লিখিতেছিল—

একটা কালো কুক্কুরী আমার অস্থি-মাংস চিবাইয়া চিবাইয়া খাইতেছে। স্নায়ুশিরা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, অসহ্য যন্ত্রণায় শরীর মন আর্তনাদ করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই নিস্তার নাই, কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছি না, কিছুতেই সে আমাকে শান্তি দিবে না। অর্থ, সামর্থ্য, ভয়-প্রদর্শন, যুক্তি—সমস্ত ব্যর্থ হইয়া গেল। কিছুতেই তাহার মন পাইতেছি না। কুক্কুরী ঘৃণিতা, কুক্কুরী কালো, কুৎসিত, কদর্য কিন্তু তবু, ওঃ—না, নিজেকে সম্বরণ করিতে হইবে, এ জ্বালাময় অপমান আর সহ্য করিতে পারি না, আর সহ্য করা উচিত নয়। কিন্তু কেন? কেন আত্মসম্বরণ করিবার প্রবৃত্তি জাগিতেছে? এ দুর্বলতার অর্থ কি? অর্থ সেই সনাতন সংস্কার, মনের সেই অন্ধ গোঁড়ামি, যাহা বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া নিষেধকে মানে, যাহা প্রত্যক্ষ যুক্তিকে বিদলিত করিয়া অযৌক্তির মানস-বিলাসে আত্মহারা হয়, যাহা কাল্পনিক পরলোকের আশ্বাসে অতি বাস্তব ইহলোককে তুচ্ছ করে। না, এ দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রয়োজন আছে। সকলকে বায়োলজির মূল তত্ত্ব শিখাইতে হইবে, যে বায়োলজি জীবধর্মের স্থূল রূপটা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয়, যাহা জীবকে জীব হিসাবেই গণ্য করে—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দার্শনিকতার কুয়াশা সৃষ্টি করিয়া যাহা জীবনের বৃহৎ সত্য আবৃত করিয়া ফেলে না। আগে জীবন, তাহার পর জীবনদর্শন। বলশেভিক রাশিয়া সহজ সুস্থ যৌন-মিলনের সমস্ত কৃত্রিম বাধা দূর করিয়া দিয়াছে। সে দেশে ভালোবাসা ছাড়া আর কোনো নিগড় নাই। ও মেয়েটা কি আমাকে ভালোবাসে না? হয়তো বাসে, কিন্তু বাসিলেও প্রকাশ্যত তাহা স্বীকার করিতে পারে না, সমাজের নিষ্ঠুর আইন আছে। সে পারিলেও আমি পারি না, আমার একটা ঝুটা আত্মসম্মানের বুর্জোয়া মুখোশ আছে, আমি কিছুতেই প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতে পারি না যে, আমি একটা নীচজাতীয়া অস্পৃশ্যার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। বলশেভিক রাশিয়ায় হয়তো এই অবৈজ্ঞানিক চক্ষুলজ্জা থাকিত না, হয়তো ওই মেয়েটাও ওই নাক-বসা সর্বাঙ্গে-ঘা লোকটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে বাধ্য হইত না, হয়তো—

চিন্তা-স্রোতে সহসা বাধা পড়িল। অদূরে হাড়ি-টোলায় একটা কলবর উঠিল। মনে হইল, যেন মারামারি বাধিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি কলম রাখিয়া ডায়েরি বন্ধ করিয়া ফেলিল। উৎকর্ণ হইয়া খানিকক্ষণ শুনিল, তাহার পর আলোটি কমাইয়া বালিশের তলা হইতে টর্চটি লইয়া সন্তর্পণে বাহির হইয়া পড়িল। অস্পৃশ্যতা নিবারণ, অস্পৃশ্যদের উন্নতি-সাধন তাহার কাজ, অস্পৃশ্যদের মধ্যেই তাই সে বাসা বাঁধিয়াছে। একেবারে ঠিক মধ্যে নয়, কাছাকাছি। হাড়ি-পাড়ার একটু দূরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে তাহার পরিচ্ছন্ন ছোট বাসাটি। উৎপলই বাসাটি করাইয়া

দিয়াছে। অস্পৃশ্য বালক-বালিকাদের পাঠশালাটি এই বাসারই প্রশস্ত বারান্দায় রোজ বসে। নিপুই তাহাদের পড়ায়—ইহাদের কাছে সে 'গুরুজি' বলিয়া পরিচিত। টর্চ ফেলিতে ফেলিতে অন্ধকারে নিপু আগাইয়া গেল। অকুস্থলে পৌঁছিয়া তাহাকে কিন্তু গতিবেগ সম্বরণ করিতে হইল। আর অগ্রসর হওয়া নিরাপদ বলিয়া মনে হইল না। এ কি কাণ্ড! সুরা-উন্মত্ত একদল হাড়ি অশ্রাব্য ভাষায় চিৎকার করিতেছে। ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া মুশকিল। ভিড়ের ভিতর হইতে একটা আর্তনাদও উঠিতেছে—ভিতরে কে যেন কাহাকে প্রহার করিতেছে। নিকটেই ধূমাঙ্কিত একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে বটে, কিন্তু তাহা না জ্বলিলেও ক্ষতি ছিল না। একটু দূরে দাঁড়াইয়া নিপু ইতস্তত করিতে লাগিল—কি করা যায়! কিছু একটা অবিলম্বেই করা উচিত, আর্তনাদটা ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। কি যে ঠিক হইতেছে, তাহা অনুমান করা কঠিন—সকলেই অসংলগ্ন ভাষায় চিৎকার করিতেছে, কিছুই বোঝা যায় না, কেহই থামিবেও না। উহাদের ভিতর গিয়া হাতাহাতি করিতে পারিলে তবে হয়তো উহাদের থামানো যায়; কিন্তু তাহা করা নিপুর পক্ষে অসম্ভব। সে দূর হইতেই দুই একবার টর্চ ফেলিয়া 'এই এই কিয়া হুয়া', জাতীয় দুই-একটা উক্তি করিল, কিন্তু কেহ তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। ভিড়ের ভিতরে আর্তনাদটা প্রবলতর হইয়া উঠিল। কেহ কাহাকেও খুন করিয়া ফেলিতেছে না তো! অসম্ভব নয়। নিপুর স্মরণ হইল, জারের যুগে রাশিয়ান শ্রমিকরা ভডকা পান করিয়া আপনজনকে হত্যা করিয়া ফেলিতেছে, এ কাহিনী সে বহুবার বহু পুস্তকে পাঠ করিয়াছে। আরও একটু আগাইয়া গিয়া সে আর একবার টর্চ ফেলিল। এবার সে দেখিতে পাইল এবং যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। মোটা কালো একটা হাড়িনী একটা রোগা ছোঁড়ার বুকের উপর বসিয়া তাহার চুলের ঝুঁটি মুঠি করিয়া ধরিয়া ক্রমাগত চড়াইতেছে এবং ক্রুদ্ধ কর্কশকণ্ঠে বলিতেছে, এইসে, এইসে, এইসে—। ছোঁড়া তারস্বরে চিৎকার করিতেছে, বাপ রে, বাপ রে, বাপ রে—

মোটা হাড়িনী শুধু মোটা নয়, মোটা এবং কালো। তাহার রুক্ষ চুল আলুলায়িত, কাপড় ছিন্নভিন্ন, মুখে অশ্রাব্য অশ্লীল ভাষা। আর একবার টর্চ ফেলিয়া নিপু ইহাকে চিনিতে পারিল। এই মাগীই তো (মাগী কথাটাই তাহার মনে হইল) চুপড়ি, কুলো, মোড়া বুনিয়া গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। দিনের আলোকে নিপু ইহাকে অনেকবার দেখিয়াছে। তখন তো ইহার বেশ শান্তশিষ্ট সলজ্জ মূর্তি, মুখের আধখানা ঘোমটা দিয়া ঢাকা থাকে, ভদ্রলোক দেখিলে একটু তেরছাভাবে দাঁড়াইয়া ফিসফিস করিয়া কথা বলে। সেই ব্যক্তির এখন এই মূর্তি এবং প্রতাপ! ছোঁড়াটা নিদারুণ চিৎকার করিতেছে। নিপু আর একবার ক্ষীণভাবে চেষ্টা করিল, আরে এই, কিয়া করতা হ্যায় তুমলোগ? ছোড়ো, ছোড়ো, উঠো।

মহিষমর্দিনী তাহার কথায় দৃকপাত পর্যন্ত করিল না। কিন্তু বার বার টর্চের আলো ফেলাতে ভিড়ের অন্য দুই-একজন যে বিচলিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ মিলিল একটা রোগা লম্বা-গোছের হাড়ি আগাইয়া আসিয়া আদেশের ভঙ্গিতে বলিল, কোওন হ্যায় রে?

নিপু আমতা আমতা করিয়া বলিল, আরে শুনো—শুনো—

ভা-গো শালা।

একটু বুড়ো আগাইয়া আসিল। তাহারও পা টলিতেছিল, কিন্তু সে একেবারে সম্বিৎ হারায়

নাই। নিপুকে সে চিনিতে পারিল। আরে শালা চুপ রে, গুরুজি আইলো ছে। সেলাম গুরুজি।

তৃতীয় আর এক ব্যক্তি ইহার প্রত্যুত্তরে খুব একটা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করিয়া বলিল, গোলি মারো গুরুজিকো।

চতুর্থ একজন জড়িত কণ্ঠে মন্তব্য করিল, গুরুজি ফুলশরিয়াকো পিছোমে পড়লো ছে—

ইহাতে পঞ্চম একজন হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মোটা কালো হাড়িনীটা ছোঁড়াটাকে সমানে মারিয়া চলিয়াছে। কাহারও সেদিকে বিশেষ ভ্রূক্ষেপ নাই, যেন অতিশয় স্বাভাবিক এবং সঙ্গত একটা ব্যাপার ঘটিতেছে, বিচলিত হইবার কিছু নাই। কেবল সেই বুড়াটা একবার মাত্র বলিল, হে গে, আব ছোড় দে, ঢের ভেলো।

নিপু নির্বাক হইয়া ভাবিতেছিল, এখন কি করা যায়! বাইক করিয়া অবিলম্বে থানায় খবর দেওয়া উচিত, না শঙ্করের কাছে যাওয়া উচিত! এমনভাবে চলিলে তো—

অপ্রত্যাশিতভাবে কিন্তু সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। নটবর ডাক্তার সহসা অশ্বপৃষ্ঠে ঘটনাস্থলে আসিয়া হাজির হইয়া গেলেন এবং ঘোড়ার লাগাম টানিয়া প্রশ্ন করিলেন, এতনা হল্লা কাহে রে?

মন্ত্রবলে সমস্ত যেন ঠিক হইয়া গেল। যে যেখানে ছিল, সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নটবর ডাক্তারকে সেলাম করিল। মোটা হাড়িনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া নিজের প্রায় উলঙ্গ কলেবরকে লুকাইবার জন্য কুঁড়ে ঘরটায় ঢুকিয়া পড়িল। ছোঁড়াটা টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ছোঁড়া অপর কেহ নয়, উহারই তৃতীয় পক্ষের স্বামী, ন্যায়সঙ্গতভাবেই মার খাইতেছিল। ডাক্তারবাবু ঘোড়া হইতে নামিয়া ঘোড়াটাকে বেড়ার খুটায় বাঁধিলেন এবং সহাস্যমুখে উহাদের মধ্যে গিয়া হাজির হইলেন।

তাড়ি, তাড়ি, খালি তাড়ি! শালা লোগ তাড়ি পিতে পিতেই জাহান্নমমে যাগা। দেখে কেইসে তাড়ি, লে আও!

ইতিমধ্যে একজন ঘরের ভিতর হইতে একটি মোড়া বাহির করিয়া আনিয়াছিল। নটবর ডাক্তার তাহার উপর গিয়া উপবেশন করিলেন। সসম্ভ্রমে একজন মাটির খুরিতে ভরিয়া তাড়ি আগাইয়া দিল, ডাক্তারবাবু একবার শুঁকিয়া দেখিলেন, তাহার পর এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া ফেলিলেন।

ছি ছি ছি ছি, যেত্তা রদ্দি মাল পিতে হো শালে লোগ। যাও, পাঁচ বোতল আচ্ছা মাল লে আও।

পকেট হইতে পাঁচটা টাকা ঝনাৎ করিয়া বাহির করিয়া দিলেন। টাকাটা কুড়াইয়া লইয়া একজন বলিল, কালালি কি আভি খুললো হোতৈ?

যা করকে বোলো—ডাক্‌টারবাবু মাংতে হেঁ।

একজন টিপ্পনী কাটিল, ওকর বাপ দেতেই।

যাহার বাড়িতে ডাক্তারবাবু রোগী দেখিতে যাইতেছিলেন, সে ব্যক্তি ঔষধের বাক্স মাথায় লইয়া পিছু পিছু আসিতেছিল, সে আসিয়া পৌঁছিল। তাহাকে নটবর ডাক্তার আদেশ করিলেন, তুম আগু বঢ়ো, হাম আতে হেঁ।

লোকটি তাড়ির আড্ডায় ডাক্তারবাবুকে সমাসীন দেখিয়া মনে মনে প্রমাদ গণিল, কিন্তু

মুখে কিছু বলিতে সাহস করিল না। এমনিতে ডাক্তারবাবু কোনো না কোনো সময়ে গিয়া ঠিক পৌঁছিবেন, কিন্তু প্রতিবাদ করিলে বাঁকিয়া বসিতে পারেন এবং একবার বাঁকিয়া বসিলে নটবর ডাক্তারকে সিধা করা শক্ত। কিছু না বলিয়া সে ব্যক্তি নীরবে চলিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু এতক্ষণ নিপুকে লক্ষ্য করেন নাই। নিপুর সহিত তাঁহার সবিশেষ পরিচয় ছিল না, মুখ চিনিতেন, কিন্তু স্বল্পালোকে তাহাও চিনিতে পারিলেন না।

কোন্ হ্যায়?

আমি।

নিপু আগাইয়া আসিল।

ও, মাস্টারমশাই! কি বিপদ! আসুন আসুন। আর একঠো মোড়া লে আও। আসুন। চলবে নাকি এক-আধ পত্তর?

আজ্ঞে না, আমি ওসব 'টাচ' করি না।

টাচ করেন না? ও! আপনিই না untouchability দূর করবার জন্য নিযুক্ত হয়েছেন? বসতে তো দোষ নেই, বসুন না।

আর একটা মোড়া আসিয়া হাজির হইল। কিন্তু নিপু বসিল না। হাড়িদের তাড়ির আড্ডায় বসিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। নটবরের উপর তাহার রাগও হইল। কোথায় ইহাদের সুরাপান হইতে নিবৃত্ত করিবে, না আরও পাঁচ বোতল আনিতে দিল! শঙ্করকে বলিয়া ইহার একটা প্রতিবিধান করিতে হইবে।

বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে!

আমার একটু কাজ আছে, চললাম—এখন আর বসব না।

বাসায় আসিয়া বাইক করিয়া সে শঙ্করের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। শঙ্কর কিন্তু তখন দ্বিতলে বসিয়া কবিতার ছন্দ মিলাইতেছিল। চাকরের মুখে নিপুদার আগমনবার্তা শুনিয়া পুলকিত হইল না।

বল গিয়ে, বাবু শুয়ে পড়েছেন, এখন দেখা হবে না।

নিপু চাকরের মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর দ্বিতলের আলোকিত বাতায়নটার দিকে একবার চাহিয়া আবার বাইকে সওয়ার হইল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এত রাত্রে ছয় মাইল রাস্তা বাইক করিয়া আসিলাম, শঙ্কর তাহার সহিত দেখা পর্যন্ত করিল না। এ কিছু নয়, টাকার গরম। ক্যাপিটালিস্ট মনোবৃত্তির লক্ষণ। উৎপল আসিলে তাহাকে শঙ্কর এমনভাবে ফিরাইয়া দিতে পারিত কি?

নির্জন মাঠের ভিতর দিয়া নিপু বাইক করিয়া চলিয়াছে। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, কি একটা অজানা ফুলের গন্ধে বাতাস আমোদিত। নিপুর মনে কিন্তু এতটুকু আনন্দ নাই। মাতাল হাড়িগুলো পর্যন্ত তাহাকে উপহাস করিল, অথচ তাহাদের মঙ্গলের জন্য সে কি না করিতেছে! নটবর ডাক্তারটারও স্পর্ধা কম নয়, তাহাকে ওই স্থানে বসিয়া তাড়ি খাইতে অনুরোধ করিতেছিল! ছোটলোকগুলোকে মদ ঘুষ দিয়া তাহাদের দলপতি সাজিয়াছে! স্কাউন্ড্রেল! আবার তাহার মনে হইল, ক্যাপিটালিজম—ক্যাপিটালিজমের এই আর এক রূপ—ইহাকে ধ্বংস করিতে না পারিলে দেশের উন্নতি নাই!

।। বারো ।।

ছট পরব লাগিয়াছে।

দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ রঙিন কাপড় পরিয়া নদীতীরে চলিয়াছে। হলুদ এবং গোলাপি রঙের প্রাধান্যই বেশি। গরিব লোকেরা সাধারণ কাপড়ই রাঙাইয়া লইয়াছে। যাহাদের অবস্থা একটু ভালো, তাহাদের কেউ কেউ রেশম পরিয়াছে। বেশিরভাগই স্ত্রীলোক, শাড়ি এবং ওড়নারই আধিক্য। যাহার যেটুকু জুটিয়াছে, তাহাতেই সে বেশ ছিমছাম পরিচ্ছন্ন হইয়া বাহির হইয়াছে। সকলেরই মুখে একটা শান্ত সৌম্য নিষ্ঠার ভাব। যাহারা 'ছট' করে, তাহারা সকলেই উপবাসী থাকে, প্রিয়জনের কল্যাণ-কামনায় ভগবানের নিকট মানত করিয়া আন্তরিক নিষ্ঠাভরেই সেই মানত শোধ করিতে যায়।

ছট পরবের নিয়ম অনেক। কালীপূজার পর হইতে ছয় দিন নিয়ম করিয়া থাকিতে হয়। কালীঠাকুরের ভাসানের পর পুরাতন হাঁড়ি ফেলিয়া দিয়া নূতন হাঁড়িতে পাক করিয়া প্রথম তিন দিন খুব শুদ্ধাচারে নিরামিষ আহারাদি করা নিয়ম, কোনোদিন কদ্দু-ভাত, কোনোদিন মটর-ডাল ভাত। চতুর্থ দিন, 'খর্ণা', অর্থাৎ সেই দিনই আসল পূজার আরম্ভ। উঠানেই পূজা হয়। কাঁচা মাটির সরায় ও হাঁড়িতে পূজার উপকবণ সজ্জিত করাই বিধি, পোড়া মাটির বাসন চলে না। কাঁচা মাটির বাসনগুলিকে সিন্দুর দিয়া অলঙ্কৃত করিয়া তাহাতে ফল, দুধ, মিষ্টান্ন, ঘি প্রভৃতি রাখা থাকে। একটি বাসনে কাঁচা দুধে পাঁচ রকম ফলের রস দিয়া পঞ্চামৃত তৈয়ারি হয়, আর একটি পাত্রে দুধে আলো-চাল সিদ্ধ করিয়া পূর্ব হইতেই 'আরোয়াইন' প্রস্তুত করা থাকে। যে ছট করিবে, পূজা করিয়া এক নিঃশ্বাসে যতটা পারে ততটা দুধ পান করিয়া লয়। দুগ্ধ পান করিবার সময় যদি কেহ 'ঢোকে' অর্থাৎ নাম ধরিয়া ডাকিয়া দেয় কিংবা যদি কোনো রকম শব্দ হইয়া বা গোলমাল হইয়া বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আর খাওয়া হয় না। ছটের প্রথম দিন হইতেই 'সুপে' অর্থাৎ কুলাতে নানারূপ ফল সাজাইতে হয়, যাহার যেমন সামর্থ্য সে সেইরূপ করে। বড়লোকেরা দেয় আঙুর আপেল কিসমিস—গরিবেরা দেয় পেয়ারা খেজুর আতা নারিকেল। ইহা ছাড়া সকলকেই দিতে হয় 'খাবুনি'—আটা এবং ঘি দিয়া প্রস্তুত পিষ্টকজাতীয় একরূপ খাবার। চতুর্থ দিন সকালে এক নিঃশ্বাসে দুগ্ধ-পান, রাত্রে 'আরোয়াইন'। পঞ্চম দিন উপবাস। ডালায় 'সুপ' সাজাইয়া সেটি মাথায় লইয়া একবার সকালে, একবার বিকালে নদীতীরে যাইতে হয়. আকাশের দিকে হাত তুলিয়া সূর্যপূজা করিতে হয়। পঞ্চম দিন অহোরাত্র নিরম্বু উপবাসের পর ষষ্ঠ দিনে নদীতীরে গিয়া সূর্যপূজা করিয়া তবে উপবাস ভঙ্গ করিতে হয়। ছট পরবে এ দেশের জনসাধারণের গভীর বিশ্বাস—সকলেই জানে, নিষ্ঠাভরে করিলে নিশ্চয়ই দেবতা মনোরথ সিদ্ধ করিবেন। উপবাস ছাড়াও কেহ কেহ আবার কঠোরতর মানত করে। নিজের বাড়ি হইতে নদীর তীর পর্যন্ত হয়তো সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে করিতে যায়, এই কৃচ্ছ্র সাধনই তাহার মানত। কেহ হয়তো ভিক্ষা করিয়া পূজার উপকরণ সংগ্রহ করে, এই দীনতা স্বীকারই তাহার মানতের অঙ্গ। একবার মানত করিয়া ফেলিলে তাহা শোধ করিতেই হয়, মানত করিয়া যদি কেহ অসুস্থতাবশত তাহা পালন করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার হইয়া অপর কাহাকেও তাহা করিয়া দিতে হয়। করিয়া দিবার লোকাভাবও হয়

না। ছট বড় জাগ্রত দেবতা, কোনো অনিয়ম সহ্য করেন না। দাইয়ের স্বামীটা যে পাগল হইয়া গিয়াছে, মুশাইয়ের মামার সর্বাঙ্গে যে ধবল হইয়াছে, সকলের বিশ্বাস ছটপূজায় অনিয়ম করাই নাকি সে সবের আসল কারণ। একজন নাকি উপবাসের সময় লুকাইয়া খাইয়াছিল, আর একজনের নাকি 'সুপে' পা ঠেকিয়া গিয়াছিল, সেই পদপিষ্ট 'সুপ' লইয়াই সে নাকি দেবতার পূজা চড়াইয়াছিল, তাই এই শাস্তি।

ডালা মাথায় লইয়া দলে দলে নরনারী চলিয়াছে। যে একটু অবস্থাপন্ন, সে সঙ্গে বাজনাও লইয়াছে। বাজনা অবশ্য বিশেষ কিছু নয়—একটা ঢোল, একটা কাঁসি এবং একটা সানাই। কিন্তু উহাতেই জমিয়া উঠিয়াছে।

শঙ্কর বারান্দায় আরাম-কেদারায় শুইয়া এই জনস্রোত দেখিতেছিল এবং ভাবিতেছিল, আমরা এতদিন ইহাদের ছোটলোক বলিয়া ঘৃণা করিয়াছি, ইহাদের পূজা-পার্বণকে কুসংস্কার বলিয়া উপহাস করিয়াছি। কিন্তু এই যে দলে দলে নরনারী উপবাস করিয়া প্রিয়জনের কল্যাণ-কামনায় দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাইতে চলিয়াছে, তাহা কি সত্যই উপহাস করিবার মতই জিনিস? নব-বৎসরে ছাপানো-হরফে ডাকযোগে 'শুভকামনা' জানান অপেক্ষা কি ইহা বেশি হাস্যকর? ইহাদের মত আন্তরিক নিষ্ঠা ও বিশ্বাস কি আমাদের কাছে? আছে বইকি। আমরা ইংরেজি অক্ষরে লেখা অথবা বিদেশি-মুখনিঃসৃত যে কোনো অসম্ভব তথ্য নির্বিচারে বিশ্বাস করি। নাসা কুঞ্চিত করি কেবল দেশি জিনিসের বেলায়। কিরোর 'বুক অব নাম্বার্স' আমরা অবিচলিত শ্রদ্ধার সহিত পড়ি, আমাদের যত অবিশ্বাস দেশি গণক-ঠাকুরকে। ফ্রি-ম্যাশনের আংটি পরিতে আমাদের আপত্তি নাই, মাদুলি পরিতেই যত আপত্তি। উপবীতগুচ্ছ গলায় ঝুলাইয়া রাখা অযৌক্তিক মনে করি, টাই ঝুলাইবার বেলায় কিন্তু যুক্তির কথা মনে পড়ে না, বারংবার মনে হয়, নটটা ঠিকমত হইয়াছে কি না, রঙটা ঠিক ম্যাচ করিয়াছে কি না! রাশিয়ার সাম্যবাদ অথবা সমাজতন্ত্র লইয়া আমরা উন্মত্ত, কিন্তু হিন্দু সভ্যতার যে সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের নীতি আছে, তাহা প্রণিধান করিবার মত ধৈর্য আমাদের নাই। উদ্দীপ্ত হইলেই শঙ্করের চা পান করিবার বাসনা হয়। চেয়ারে শুইয়াই হাঁকিল, অমিয়া!

অমিয়া একটু দিবানিদ্রা উপভোগ করিবে বলিয়া শুইয়াছিল, সবে বেচারির তন্দ্রাটি আসিয়াছিল, উঠিয়া আসিতে হইল।

কি?

একটু চা কর না।

অমিয়া চলিয়া গেল।

সহসা শঙ্করের চোখে পড়িল, ডালা মাথায় করিয়া যমুনিয়া যাইতেছে। তাহার পিছু পিছু ভালোমানুষের মত মুশাইও চলিয়াছে। যমুনিয়ার মাতৃমূর্তি। মুশাই যেন দুষ্ট অবাধ্য ছেলে, নিতান্ত দায়ে পড়িয়া ভালোমানুষ সাজিয়া কর্তব্য পালন করিতেছে। মুশাই একবার আড়চোখে শঙ্করের দিকে চাহিয়া হাসিল।

শঙ্করের সমস্ত মন মাধুর্যে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সে মুগ্ধনেত্রে বসিয়া ছট পরবের শোভাযাত্রা দেখিতে লাগিল।

অমিয়া চা করিয়া আনিল।

এইবার খাতা-কলম চাই নাকি?

চাই।

অমিয়া গনগন করিয়া বলিল, খালি ফরমাশের ওপর ফরমাশ! ভাবলুম, একটু ঘুমুব—

খুকি ঘুমিয়েছে?

তাকে যদুয়া ছটের মেলা দেখাতে নিয়ে গেছে।

অমিয়া খাতা ও ফাউন্টেন-পেন দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। শঙ্কর আবার ডাকিল।

সিগারেট দেশলাই।

বাবা, বাবা!

শঙ্কর যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, অমিয়াকে ফরমাশে অস্থির করিয়া তোলে। অনেক সভ্য স্বামী স্ত্রীর সহিত লৌকিকতা করেন, স্ত্রীর সম্বন্ধে তাঁহাদের নানারূপ 'কন্‌সিডারেশন' আছে। শঙ্করের সে সব কিছুই নাই। নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত সে যেমন লৌকিকতা করে না, স্ত্রীর সহিতও করে না। অমিয়াকে সে সত্যই অর্ধাঙ্গিনী মনে করে। অমিয়াকে ঘিরিয়া কোনো রকম রোমান্স তাহার মনে জাগে নাই, অমিয়ার সহিত কোনো রকম ভণ্ডামি করাও সে প্রয়োজন মনে করে না, এমনকি অমিয়ার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সে সর্বক্ষণ সজাগভাবে সচেতন নয়, কিন্তু অমিয়া না হইলে তাহার জীবনযাত্রা অচল। অতিশয় অপ্রত্যক্ষভাবে নিঃশ্বাসবায়ুর মত অমিয়া সঙ্গোপনে তাহার জীবনের সহিত কখন যে মিশিয়া গিয়াছে, তাহা সে জানে না।

সিগারেট দেশলাই দিয়া অমিয়া বলিল, এবার যাই?

যাও।

চা শেষ করিয়া শঙ্কর সিগারেট ধরাইল এবং প্রবন্ধ লিখিতে শুরু করিল। পল্লী উন্নয়নের আবর্তে পড়িয়াও তাহার অন্তরবাসী কবি বিপর্যস্ত হয় নাই। সে সদা জাগ্রত, সদা উৎকর্ণ, কেবল দেখিতেছে, শুনিতেছে এবং মনে সুর লাগিলেই গান গাহিয়া উঠিতেছে। কোনো অজুহাতেই তাহাকে থামানো যায় না। শঙ্কর তন্ময় হইয়া লিখিতে লাগিল, যদিও তাহার এখন স্যানিটেশন-বিভাগ পরিদর্শন করিতে যাওয়া উচিত ছিল।

।। তেরো ।।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

মেঠো পথ বাহিয়া শঙ্কর একা ফিরিতেছিল। গ্রামের বাহিরে কৃষকদের চাষের নিমিত্ত গত বৎসর যে ইঁদারাটি প্রস্তুত করানো হইয়াছিল, সেটি ধসিয়া পড়িয়াছে, তাহাই পরিদর্শন করিতে শঙ্কর গিয়াছিল। পরিদর্শন করিয়া চিত্ত আনন্দিত হয় নাই, অনিবার্যভাবে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সে বাধ্য হইয়ছিল, তাহা আনন্দজনক নহে। জীবন চক্রবর্তী পুরা টাকা লইয়া কাজে ফাঁকি দিয়াছে। সে-ই এ অঞ্চলের সমস্ত ইঁদারার কন্ট্রাক্ট লইয়াছিল। যে পরিমাণ চুন সুরকি প্রভৃতি দিলে পাকা ইঁদারা সত্যই পাকা হয়, সে পরিমাণ চুন সুরকি দেওয়া হয় নাই, ইহাই সকলে বলিল। এ অঞ্চলের সব ইঁদারাই ভাঙিয়া পড়িয়াছে। জীবন গ্রামেরই ছেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী, তাহার ন্যায্য মজুরি তাহাকে দেওয়া হইয়াছে, তবু সে অন্যায়ভাবে

চুরি করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। উৎপল বলিয়াছিল, কোনো সাহেব কোম্পানিকে কন্ট্রাক্ট দিতে, কিন্তু শঙ্করের কোনো কথার উপর সে কথা কহিবে না প্রতিশ্রুতি ছিল, তাই শঙ্কর যখন তাহাতে সায় দিল না, সে চুপ করিয়া গেল। শঙ্কর ভাবিয়াছিল, কি হইবে বিদেশি লোক ডাকিয়া। এই সামান্য কাজ কি আর দেশের লোকেরা করিতে পারিবে না? বিশেষত কেনারাম চক্রবর্তীর পুত্র জীবন যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সোৎসাহে ইঁদারাগুলির ভার লইল, তখন শঙ্করের আর কোনো সংশয় রহিল না। এখনও কোনো সংশয় নাই, কেবল তাহার মনের ভিতরটা জ্বালা করিতেছিল। নিতান্ত আপনজন যদি নিঃসংশয়ে চোর প্রতিপন্ন হয়, তখন যেমন জ্বালা করে, তেমনই জ্বালা করিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, এমন কেন হয়? কোনো সাহেবের আপিসে চাকরি করিতে পাইলে এই জীবন উপরওয়ালার চাবুকের ভয়ে অতিশয় দক্ষতার সহিত কাজ করিত, চুরি করিতে সাহস পাইত না। কিন্তু চাবুক-ভয়শূন্য জীবন কিছুতেই স্বাধীনভাবে স্বকর্তব্য সুষ্ঠুভাবে করিবে না। তাহার শিক্ষা দীক্ষা ভদ্রতা কোনো কিছুরই উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার উপায় নাই, করিলেই ঠকিতে হইবে। চাবুক না মারিলে কাজ করিবে না, দেশের কাজের প্রতি নিষ্ঠার জন্য তো করিবেই না, মজুরি পাইলেও করিবে না। অথচ বাহিরে কি অপরূপ ছদ্মবেশ! বি. এ. পাশ করিয়াছে, দেশের সম্বন্ধে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে, রাজনীতির কথায় মুখে খই ফোটে, বর্তমান যুদ্ধের প্রগতি ও পরিণাম বিষয়ে বিজ্ঞের মত বচন বিস্তার করে, লেনিন-স্টালিন-গান্ধী সকলের চরিত্র নখদর্পণে, দেশের বেকার-সমস্যা লইয়া ক্ষোভের অন্ত নাই, অথচ নিজে চোর। এই ছোকরাই সেদিন সামান্য লাউ-চুরির অপরাধে নিজেদের চাকরটাকে পুলিসে দিয়াছে। হঠাৎ শঙ্করের নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বলিয়া মনে হইল। দেশের শিক্ষিত যুবকরাই তো দেশের আশা-ভরসা, তাহাদের উপর যদি আস্থা স্থাপন করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে উপায় কি! শঙ্কর বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাপারটাকে ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। কেন এমন হয়? ইহারা শিক্ষিত, ইহাদের সমস্তা শিক্ষা এমনভাবে নিষ্ফল হইয়া গেল কেন? যে শিক্ষার চাকচিক্য ইহাদের রসনার তুণ্ডাগ্রে ক্ষণে ক্ষণে ঝলমল করিয়া উঠে, তাহার সামান্যতম দীপ্তিও ইহাদের চরিত্রে প্রতিভাত হয় না কেন? গলদটা কোথায়?

বাবু!

মৃদু নারীকণ্ঠের ডাক শুনিয়া শঙ্কর সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল।

কে?

ফুলশরিয়া।

নামটা শুনিয়া শঙ্কর মনে মনে বিব্রত হইয়া পড়িল।

এই অস্পৃশ্য মেয়েটার সহিত নিপুদার নাম যুক্ত করিয়া যে জনবর উঠিয়াছে, তাহা শঙ্করের অবিদিত ছিল না। এ বিষয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সে নিপুদাকে কিছু বলিতেও পারে নাই। উচিত হইলেও ইহা লইয়া নীতিগর্ভ বক্তৃতা দিবার অধিকার আর যাহারই থাক, তাহার যে নাই, ইহা সে সসঙ্কোচে অনুভব করিয়াছিল। প্রতিষ্ঠানের হিতার্থে এ বিষয়ে নীরব থাকা উচিত নয় তাহা সে বুঝিয়াছিল, কিন্তু কি করিয়া যে কথাটা পাড়িবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। এখন সহসা নির্জন গ্রামপ্রান্তে সেই মেয়েটির সহিতই মুখামুখি হওয়াতে সে ভয় পাইয়া গেল। নিপুদার

নামে নালিশ করিতে আসিয়াছে নাকি! তাহা হইলে তো অতিশয় অস্বস্তিকর 'পরিস্থিতি'।

কি চাই?

ফুলশরিয়া কিছু বলিল না, নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। শঙ্করের মনে হইল, কাঁদিতেছে।

কি চাই?—শঙ্কর পুনরায় প্রশ্ন করিল।

ফুলশরিয়া মৃদুকণ্ঠে যাহা বলিল, তাহাতে শঙ্কর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। নিপুদার সম্বন্ধে কিছু নয়, স্বামীর অসুখের কথা বলিতে আসিয়াছে। তাহার স্বামী নাকি বহুদিন হইতে অসুস্থ, এখানকার হাসপাতালের ডাক্তারবাবু তিন মাস ধরিয়া 'দাবাই পানি' করিয়াছেন, কিছুই হয় নাই। সেদিন নটুবাবু আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে চরণবাবুকেও একবার ডাকিয়া দেখানো উচিত, কারণ একা তিনি এ রোগ সামলাইতে পারিবেন না। নটুবাবু গরিবের 'মাই বাপ', তাঁহাকে বিনা ফিসে ডাকা যায়, কিন্তু চরণবাবুকে ডাকিতে তাহাদের সঙ্কোচ হইতেছে। এ গ্রামে আসিলে সাধারণত তিনি আট টাকা ফিস নেন, কিন্তু আট টাকা দেওয়া তাহার পক্ষে সাধ্যাতীত, বাবু যদি একটা চিঠি লিখিয়া দেন, তাহা হইলে হয়তো তিনি কমে আসিতে রাজি হইতে পারেন। রূপার চুড়ি বন্ধক দিয়া সে গোটা চারেক টাকা কোনোক্রমে জোগাড় করিয়াছে।

সহসা ফুলশরিয়া বসিয়া পড়িল এবং শঙ্করের পা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল, দয়া করো বাবু।

হয়েছে কি তোর স্বামীর?

ঘা।

ঘা?

ফুলশরিয়া যে নিপুদার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়া তাহাকে বিপন্ন করে নাই, ইহাতেই শঙ্কর মেয়েটার প্রতি মনে মনে প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার উৎসাহ যেন বাড়িয়া গেল।

চল্, দেখে আসি কি হয়েছে।

ফুলশরিয়ার সঙ্গে যাইতে যাইতে একটা কথা সহসা শঙ্করের মনে পড়িল। ফুলশরিয়ার আবার স্বামী কি? সে তো পতিতা। পতিতারও একটা লোক-দেখানো স্বামী থাকা অসম্ভব নয়—মনকে এই বলিয়া সে প্রবোধ দিল। কিছুক্ষণ হাঁটিয়া একটি মাটির ছোট কুঁড়েঘরে উপস্থিত হইয়া সে যাহা দেখিল, তাহা অপ্রত্যাশিত। ঘরের কোণে খাটিয়ায় হরিয়া শুইয়া আছে। হরিয়া জাতিতে কুর্মী, সামাজিকভাবে সে ফুলশরিয়ার স্বামী হইতে পারে না। হরিয়া এককালে তাহাদের ভৃত্য ছিল। শুধু তাহাদের নয়, অনেকের বাড়িতেই সে চাকরি করিয়াছে, কিন্তু কোথাও টিকিয়া থাকে নাই। কোথাও টিকিয়া থাকা তাহার স্বভাব নয়। কিছুদিন আসামে পলাইয়া গিয়া চা-বাগানে কুলিগিরি করিয়াছিল, একটা পাটের কলেও নাকি কিছুদিন মজুর খাটিয়াছে। এই পর্যন্ত ইতিহাস শঙ্কর জানিত, তাহার পর কিছুদিন তাহার কোনো পাত্তাই ছিল না। কবে সে ফিরিয়াছে এবং কিরূপে সে ফুলশরিয়ার স্বামী হইয়া পড়িয়াছে, তাহা শঙ্কর জানিতে পারে নাই। হঠাৎ এতদিন পরে তাহাকে ফুলশরিয়ার ঘরে রোগশয্যায় শয়ান দেখিয়া শঙ্কর অবাক হইয়া গেল। সর্বাঙ্গে বড় বড় ঘা, নাকটা বসিয়া গিয়াছে, বীভৎস চেহারা! দেখিয়া মনে হয়; কুষ্ঠ হইয়াছে।

হরিয়া উত্থানশক্তি-রহিত। শুইয়া হাত তুলিয়া প্রাক্তন মনিব শঙ্করকে সেলাম করিল।

সে-ই ফুলশরিয়াকে শঙ্করের কাছে পাঠাইয়াছিল।

তোর স্বামী?

ফুলশরিয়া নতমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শঙ্কর ইতিপূর্বে মেয়েটাকে ভালো করিয়া দেখে নাই।

কেরোসিনের স্বল্পালোকে আজ প্রথম ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিল। রূপসী নয়, রঙ কালো। বয়সও খুব কম নয়, ত্রিশের উপর হইবে। স্বাস্থ্য কিন্তু নিটোল এবং অটুট। চোখের দৃষ্টিতে, পুষ্ট অধরে, গর্বিত গ্রীবাভঙ্গিমায় আকর্ষণী শক্তি আছে।

শঙ্কর পুনরায় হরিয়াকে প্রশ্ন করিল, তুই একে বিয়ে করেছিস নাকি?

ফুলশরিয়া ঘাড় ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল।

খোনা স্বরে হিন্দি ভাষায় হরিয়া বলিল, না, বাবু, ওকে আমি 'সাধি' করি নাই। কিন্তু ও-ই আমার সব। আমার স্ত্রী আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, ভাইরা আমাকে দেখে না, আত্মীয়-স্বজন সকলেই আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। ও-ই কেবল আমাকে ছাড়ে নাই। আমি পাজি, বদমাশ, লুচ্চা—ও সব জানে, তবু আমাকে ছাড়ে না। আমি রোজ উহাকে কত বলি, তুই কেন এ মুর্দার কাছে পড়িয়া আছিস, আমাকে ছাড়িয়া দে, আমি মরিয়া পচিয়া শেষ হইয়া যাই, তুইও আমার সঙ্গে কষ্ট ভোগ করিস কেন? রাস্তায় ফেলিয়া দিতে না পারিস, হাসপাতালে দিয়া আয়। ও কিন্তু কিছুতেই আমার কথা শোনে না বাবু, নিজের জেবর শাড়ি বেচিয়া ডাক্তার ডাকিতেছে, রোজ নিজের হাতে আমার এই পচা ঘা সাফ করে—

হরিয়ার চোখের কোণ হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

ফুলশরিয়া হঠাৎ ধমকাইয়া উঠিল, চুপ চুপ, ঢের ভেলো—

শঙ্কর অবাক হইয়া শুনিতেছিল এবং দেখিতেছিল। দেখিতেছিল, বিছানার চাদর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ব্যান্ডেজের ন্যাকড়াগুলি ধপধপ করিতেছে, এই কুঁড়েঘরেও হরিয়া রাজার হালে রহিয়াছে।

শঙ্কর বলিল, আচ্ছা, আমি যতদূর পারি ব্যবস্থা করব। চরণবাবুকে খবর দেব কালই। এখন চললাম। ভালো হয়ে যাবি, ভয় কি?

হরিয়া দুর্বল কম্পিত হস্ত তুলিয়া পুনরায় সেলাম করিল।

শঙ্করের সঙ্গে সঙ্গে ফুলশরিয়াও বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়া শঙ্কর প্রশ্ন করিল, একে হাসপাতালে দিতে এত আপত্তি কেন?

ওহাঁ আচ্ছা দবাই নেই দেইছে।

শঙ্করের কৌতূহল হইল। সর্বাঙ্গে-ঘা অসমর্থ দরিদ্র হরিয়াকে এমনভাবে আঁকড়াইয়া থাকিবার নিগূঢ় মনস্তত্ত্বটা কি? প্রেম? তাহার মন পরীক্ষা করিবার জন্য শঙ্কর বলিল, ও যখন তোর স্বামী নয়, তখন শুধু শুধু ওর জন্যে খরচ করে মরছিস কেন? হাসপাতালেই দে।

ফুলশরিয়া মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল। তাহার পর নিজস্ব হিন্দিতে বলিল, ও যদি সুস্থ হইত, উহাকে অনায়াসেই ত্যাগ করিতে পারিতাম। এখন কিন্তু পারি না। আমিই উহাকে ওই রোগ দিয়াছি, রোগের জন্যই ওর এই দশা, আমি সময়মত 'জকশন' লইয়া ভালো হইয়া গিয়াছি। ও প্রথমে রোগটাকে গ্রাহ্যই করে নাই, নানারকম দেশি জড়িবুটি করিয়াছিল, এখন

একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছে। এই রোগের জন্যই ওর আত্মীয় স্বজন উহাকে ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু আমি কি করিয়া ত্যাগ করি? আমার জন্যই যে ওর রোগ।

তাহার পর আকাশের দিকে হাত তুলিয়া বলিল, উপরে মালিক আছেন, তিনি সব দেখিতেছেন, আমি বেইমানি করিতে পারিব না, আমি জান দিয়া উহাকে ভালো করিয়া তুলিব।

আচ্ছা, কাল চরণ ডাক্তারকে খবর পাঠাব তা হলে।

শঙ্কর চলিয়া গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিপু আসিয়া হাজির হইল।

হরিয়া আজ কেইসা হ্যায়?

আচ্ছা।

ফুলশরিয়ার মুখভাব কঠিন হইয়া উঠিল। তাহার মুখের দিকে আড়চোখে একবার চাহিয়া নিপু বলিল, উস্‌কো দবাইকা বাস্তে দাইকা মারফত রুপিয়া ভেজা থা, মিলা?

কোনো উত্তর না দিয়া ফুলশরিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল এবং দুইখানি দশ টাকার নোট আনিয়া নিপুর হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, যাইয়ে।

ইসকা মানে?

ঝপাৎ করিয়া ঝাঁপটা ফেলিয়া দিয়া ফুলশরিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল। নিপু বেকুবের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

নীচের পড়িবার ঘরে একটি সুদৃশ্য আলো জ্বালিয়া উৎপল তন্ময় হইয়া ইংরেজি ভাষায় লিখিত চীন দেশের রূপকথা পড়িতেছিল।

শঙ্কর হনহন করিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল।

শিক্ষা মানে কি বলতে পার? আসল শিক্ষা কাকে বল তুমি? এ কি করছি আমরা?

তার মানে?

বিস্মিত উৎপল সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল।

আনুপূর্বিক সমস্ত বর্ণনা করিয়া শঙ্কর পুনরায় প্রশ্ন করিল, এখন বল, কে শিক্ষিত? জীবন চক্রবর্তী, নিপুদা, না ফুলশরিয়া?

উৎপলের চক্ষু দুইটি কৌতুকে নাচিয়া উঠিল। কিন্তু কোনো জবাব দিল না, কেবল গম্ভীরভাবে বাম-গুম্ফপ্রান্ত পাকাইতে লাগিল। কিছুদিন হইতে সে গোঁফ রাখিতে শুরু করিয়াছে।

উত্তর দিচ্ছ না যে?

মনের মত উত্তর যদি শুনতে চাও, ওপরে চল, কুন্তলাদেবী এসেছেন।

এমন সময় তিনি হঠাৎ?

হরিহরদা এই পাড়ায় এসেছেন কোনো একটা কাজে, তাঁরই সঙ্গে এসেছেন।

আমার সঙ্গে আলাপ নেই যে!

তার জন্যে আটকাবে না, আলাপ করিয়ে দিচ্ছি চল। চীনে-পরীদের গল্প গিলে গিলে

মুখটাও মেরে গেছে আমার সঙ্গে থেকে। মুখটা একটু বদলানো যাক, চল। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই তিনি বেশ ঝাঁজালো গোছের একটা উত্তর দেবেন।

তোমার উত্তরটা কি শুনি?

আমি উত্তর দিতে পারব না। তবে যদি আপত্তি না থাকে, পরামর্শ দিতে পারি।

কি পরামর্শ?

একজন এক্সপার্ট ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে ভাঙা ইঁদারাগুলো পরীক্ষা করাও, তিনি যদি বলেন যে, জীবন সত্যিই জোচ্চুরি করেছে, তা হলে তার নামে কেস ঠুকে দাও। আর তোমার ওই নিপুদা, যদি সত্যিই অপরিহার্য রকম কাজের লোক হন, তা হলে তাঁকে অপদস্থ করা ঠিক হবে না। তাঁকে বরং কিছু টাকা আর ছুটি দিয়ে কিছুদিনের জন্যে কলকাতায় পাঠিয়ে দাও, একটু ঝরঝরে হয়ে ফিরে আসুন ভদ্রলোক। হাসছ যে? এরকম করে পারে নাকি মানুষ!

হাসছি বটে, কিন্তু আমি কেমন যেন হতাশ হয়ে পড়েছি।

হতাশ হবার কি আছে? পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,—ধাবিত হওয়াই আমাদের কাজ, থামলে চলবে না। চল, ওপরে চল।

কুন্তলাদেবীর সহিত সহজেই আলাপ হইয়া গেল।

উৎপল পরিচয় করাইয়া দিতেই শঙ্কর বলিল, অনেক দিন থেকেই আপনার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে। কিন্তু সুযোগ হয়নি এতদিন।

কুন্তলা বসিয়া পান সাজিতেছিল, এই কথায় হাসিমুখে শঙ্করের দিকে একবার চোখ তুলিয়া পানই সাজিতে লাগিল, কোনো কথা কহিল না। উৎপল পরিচয় করাইয়া দিয়া গম্ভীরভাবে কোণের ক্যাম্প-চেয়ারটায় গিয়া বসিল এবং একটি সিগারেট ধরাইল। কি ভাবে আলাপ চালানো যায়, শঙ্কর মনে মনে একটু বিব্রতই বোধ করিতেছিল, এমন সময় সুরমা পাশের ঘর হইতে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আপনি এসে গেছেন দেখছি ঠিক সময়ে, এক্ষুনি আপনার বিষয়েই কথা হচ্ছিল কুন্তলার সঙ্গে। ও আপনার 'কুসংস্কার' লেখাটি পড়ে চটেছে।

কুন্তলা আর একবার হাসিভরা দৃষ্টি তুলিয়া শঙ্করের দিকে চাহিল, তাহার পর সুরমাকে বলিল, প্রথম পরিচয়ের মুখেই একটা ঝগড়ার সূত্রপাত করিয়ে দিয়ে ভালো করলে না তুমি। উনি লেখক মানুষ, লেখার নিন্দে করলে ওঁর সমস্ত মন সজারুর মত কণ্টকিত হয়ে উঠবে।

শঙ্করবাবু সে রকম পরমুখাপেক্ষী লেখক নন। তুমি সত্যিই যখন চটেছ, তখন বলতে বাধা কি?

চটি নি। শঙ্করবাবুর মত প্রতিভাবান লেখককেও গড্ডলিকা-প্রবাহে ভাসতে দেখে দুঃখ হচ্ছিল। কুসংস্কার সম্বন্ধে ওসব কথা ক্রিশ্চান আর ব্রাহ্ম মিশনারিদের মুখে অনেকবার শুনেছি আমরা। ওঁর কাছ থেকে নতুন কথা শুনব আশা করেছিলাম।

উৎপলের চক্ষু দুইটি আরও কৌতুকদীপ্ত হইয়া উঠিল। সিগারেটে সন্তর্পণে টান দিতে দিতে সে পা দোলাইতে লাগিল।

হঠাৎ এমন কথা কুন্তলার মুখে শুনিবে, শঙ্কর আশা করে নাই। 'কুসংস্কার' প্রবন্ধটা সে অনেক দিন পূর্বে লিখিয়াছিল, যদিও সেটা সম্প্রতি 'সংস্কারক' পত্রিকায় বাহির হইয়াছে।

'কুসংস্কার' সম্বন্ধে তাহার নিজের মত বদলাইয়াছে। ছুট পরবের পর যে প্রবন্ধটি সে লিখিয়াছে, তাহাতে তাহার পরিবর্তিত মনোভাবের পরিচয় আছে। কিন্তু এই নতমুখী বধূটির মুখে এ কথা শুনিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল। সত্যই এ বিষয়ে মেয়েটি কতদূর চিন্তা করিয়াছে, তাহা জানিবার লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না; ঠিক করিল, তর্ক করিবে।

সুরমা বলিল, কিন্তু ওঁর ভাষা আর উপমাগুলো যে চমৎকার, সেটা তোমাকে মানতেই হবে।

মানছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বলছি যে, ভাষা আর উপমা চমৎকার ব'লেই ও প্রবন্ধ আরও ভয়ঙ্কর। যে পড়বে, সে-ই মুগ্ধ চিত্তে ওর প্রতি কথাটি বিশ্বাস করবে।

করলেই বা ক্ষতি কি?

গম্ভীরভাবে শঙ্কর প্রশ্ন করিল।

আপনারা তা হ'লে তর্ক করুন, আমি ট্যাপারির জেলিটা চড়িয়ে এসেছি, দেখি, যদি কুন্তলা থাকতে থাকতেই নামাতে পারি। সঙ্গেই দিয়ে দেব তা হলে। শঙ্করবাবু নেবেন নাকি একটু?

না। ট্যাপারির গন্ধ পছন্দ নয় আমার।

অমিয়া কিন্তু ভালোবাসে, তাকেই পাঠিয়ে দেব।

সুরমা চলিয়া গেল। কুন্তলা নীরবে পানগুলি লবঙ্গ দিয়া মুড়িতে লাগিল। শঙ্করই পুনরায় কথা কহিল, আমার প্রবন্ধে আপত্তি আপনার কোন্‌খানটায়?

সবটাতেই। আপনি যা বলেছেন তা সত্যি নয়, কুসংস্কার আমাদের পঙ্গু করেনি। আপনি মুখস্থ বুলি আউড়েছেন মাত্র।

আমি যেসব কুসংস্কারের উল্লেখ করেছি, আপনি সেগুলো সমর্থন করেন, এই কি আমাকে বুঝতে হবে?

এতক্ষণ কুন্তলা ধীরকণ্ঠে কথা কহিতেছিল, শঙ্করের এই কথায় যেন আহত ফণিনীর মত তর্জন করিয়া উঠিল।

দেখুন, আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত বর্বর, বিদেশি অনাত্মীয়দের মুখে ওসব কথা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। এখন তলিয়ে বোঝবার সময় এসেছে যে, কথাগুলো সত্যি কি না।

আপনার মতে তা হলে ওগুলো কুসংস্কার নয়?

কোন্‌টা কু, কোন্‌টা সু, তা জানি না। এইটুকু শুধু জানি যে, যাদের আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে ঘৃণা করতে শিখেছি, মানুষ হিসাবে তারা আজকালকার সংস্কারমুক্ত স্বার্থপর নাস্তিকগুলোর চেয়ে ঢের বড়। ওরাই দেশের মেরুদণ্ড।

শঙ্করের ফুলশরিয়ার কথা মনে পড়িল, বলিল, তা বলতে পারেন। কিন্তু আমি যদি বলি, কুসংস্কারবর্জিত হলে ওরা আরও বড় হবে।

যা নমুনা দেখা যাচ্ছে, তার থেকে তা তো মনে হয় না। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার কল্যাণে আমরা অনেকেই অনেক রকম কুসংস্কার ত্যাগ করতে শিখেছি, কিন্তু সত্যই বড় হয়েছি কি?

হইনি স্বীকার করছি। কিন্তু তার অন্য কারণও থাকতে পারে। কতকগুলো যুক্তিহীন কুসংস্কার আঁকড়ে থাকলেই কি আমাদের মহত্ত্ব বাড়বে?

হ্যাঁ, বাড়বে। সমাজ-জীবনের একটা স্তরে ওর প্রয়োজন আছে। আগে আমার একটা কথার জবাব দিন। এ যুদ্ধের বাজারে প্রশ্নটা বেখাপ্পা শোনাবে না, মিলিটারি ট্রেনিং আপনি ভালো মনে করেন, না, খারাপ মনে করেন?

নিশ্চয়ই ভালো মনে করি।

কেন? কতকগুলো লোক ক্যাপ্টেনের হুকুম পাওয়ামাত্র কোনো একটা জিনিস লক্ষ্য করে দমাদ্দম গুলি ছুঁড়ছে, 'মার্চ' কথাটা উচ্চারিত হতে না হতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে, কখনও এগুচ্ছে কখনও পেছুচ্ছে, একটা বিশেষ ধরনের পোশাক পরে বিশেষ রকম কায়দায় হাত পা ছুঁড়ে ড্রিল করছে, এগুলো কুসংস্কার নয়? যাকে নিরীহ বলে জানে, তাকে নির্বিচারে হত্যা করার মধ্যে কি যুক্তি আছে? প্রত্যেক সৈনিক যদি ওপরওলার প্রত্যেক আদেশটি নিজের যুক্তি দিয়ে বিচার করতে চায়, তা হলে কি রকম হয় সেটা?

মিলিটারি ট্রেনিং মিলিটারি ডিসিপ্লিন শেখায়, ওতে চরিত্র দৃঢ় হয়, এইটেই ওর সপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি।

ওপরওলার অফিসারকে দেখামাত্র খটাৎ করে গোড়ালিতে গোড়ালি ঠুকে স্যালুট করা তা হলে আপনি কুসংস্কার মনে করেন না? আপনার যত আপত্তি দিশি কুসংস্কারের বেলায়? আমি যদি বলি, ওগুলোর উদ্দেশ্যও চরিত্র দৃঢ় করা? একাদশীর দিন উপবাস করা, একটা বিশেষ বারে বেগুন না খাওয়া, পূজা-পার্বণে নিষ্ঠা-নিয়ম অনুসারে চলা, এসবের প্রত্যেকটির মধ্যেই এমন একটি সংযত আত্মসম্বরণের ভাব আছে, যা মেনে চলতে পারলে চরিত্র সত্যিই উন্নত হয়।

তাই যদি হয়, তা হলে সেটা স্পষ্ট করে বলা নেই কেন?

মিলিটারি স্ট্র্যাটেজিও সব সময় স্পষ্ট করে বলা হয় না। মিলিটারি আইন হচ্ছে—You are not to reason why–

কিন্তু কুসংস্কারের সঙ্গে যে কতকগুলো জিনিস স্পষ্টভাবেই জড়ানো আছে দেখা যাচ্ছে, যথা—ভগবান, পরলোক, পাপপুণ্য—

না জড়ালে লোকে মানত না, কোর্ট মার্শালের ভয় না থাকলে সাধারণ সৈনিক যেমন মিলিটারি আইন মানে না। ওগুলো আমাদের অদৃশ্য কোর্ট মার্শাল। সাধারণ মানুষকে সৎপথে রাখবার আর কোনো উপায় নেই।

আমি কুসংস্কার না মেনেও সৎপথে থাকতে পারি।

আপনি অসাধারণ মানুষ। আমি সাধারণ লোকের কথা বলছি। সাধারণ লোক যদি অসাধারণত্বের ভান করে তা হলে যা কাণ্ড হয়, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন আজকাল। অঙ্ক শাস্ত্রে যার কিছুমাত্র অধিকার নেই, সেই অর্বাচীনটা নামতা মুখস্থ করা জ্যামিতি পড়াকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিয়ে উচ্চস্তরের গণিত শাস্ত্রের বুলি কপচাচ্ছে সস্তা ছাপাখানার দৌলতে, আর আপনারা তাই দেখে বাহবা বাহবা করছেন।

আমি অন্তত করছি না। আমাদের কুসংস্কারগুলো যুক্তি-সহ কিনা, তাই ওই প্রবন্ধটায় বিচার করবার চেষ্টা করছিলাম মাত্র। ওটা আমার অনেকদিন আগের লেখা। এমন আমারও মত অনেকটা বদলেছে, কিন্তু তবু আমি নির্বিচারে অন্ধ কুসংস্কার মানবার পক্ষপাতী হইনি এখনও।

ভালো করে ভেবে দেখলে হবেন।

দেখি।

সুরমা আসিয়া প্রবেশ করিতেই উৎপল বলিয়া উঠিল, শঙ্কর হেরে গেছে তোমার বন্ধুর কাছে। প্রায় স্বীকার করে ফেলেছে যে কুসংস্কারগুলোর একটা সার্থকতা আছে।

কুন্তলা হাসিল। সুরমা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, আমি কিন্তু তোমার মতে মত দিয়ে পাঁজি দেখে চলতে পারব না। আমার যেদিন খুশি আমি অলাবু ভক্ষণ করব।

তা করো। জেলি কতদূর?

ঠাণ্ডা করতে দিয়েছি।

উৎপল বলিল, শঙ্করের পরাজয় উপলক্ষে একটু চা খেলে কেমন হয়?

এতরাত্রে আবার চা কেন? সুরমা ঈষৎ ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল।

উৎপল ক্যাম্প-চেয়ারে শুইয়া পড়িল।

কই, চল এবার, রাত হয়ে গেল।

কুন্তলার স্বামী হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারপ্রান্তে দেখা দিলেন।

মাথায় কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিয়া কুন্তলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

সভা ভঙ্গ হইল।

।। চোদ্দো ।।

পাড়ায় 'রাম-লীলা' হইতেছে। খুকিকে লইয়া অমিয়া শুনিতে গিয়াছে। শঙ্কর নিজে যদিও এই 'রাম-লীলা'র একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক, কিন্তু শরীরটা তেমন ভালো নাই বলিয়া যায় নাই, বারান্দায় আরাম-কেদারায় চুপ করিয়া শুইয়া ছিল। তাহার অভাবে 'রাম-লীলা' উৎসবের এতটুকু অঙ্গহানি যে হইবে না, তাহা সে ভালোভাবেই জানে। ক্রমশই এই কথাটা সে উপলব্ধি করিতেছে যে, যাহাদের আমরা 'মাস' অর্থাৎ জনসাধারণ বলি, তাহাদের সহিত অন্তরের যোগ রক্ষা করা কত কঠিন। আমাদের অন্তরে উহাদের স্থান নাই, উহাদের অন্তরেও আমাদের স্থান নাই। আমরা উহাদের অনুগ্রহ করি, উহারা আমাদের সেলাম করে। সম্পর্ক শুধু এইটুকু। উহাদের উৎসব আমাদের অনুপস্থিতিতে অঙ্গহীন হয় না, আমাদের উৎসব উহাদের যোগদানের অপেক্ষা রাখে না। আমরা ভিন্ন জাতের লোক, আমরা পর। আমরা যে উহাদের হিতার্থে এত করি, তাহা কর্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া, আন্তরিক আবেগবশত নহে।

সহসা কুন্তলার কথা শঙ্করের মনে পড়িল। সেদিন যদিও তাহার সহিত মতের কিছুমাত্র অমিল হয় নাই, তবু কেমন যেন খটকা লাগিয়াছিল। কেমন অদ্ভুত যেন মেয়েটি! ঠিক যেন স্বাভাবিক নয়। সকলকে তাক লাগাইয়া দিয়া উল্টা কথা বলিবার ঝোঁকটা যেন বড় বেশি রকম উগ্র। কথাবার্তা যেন তীক্ষ্ণ তীরের মত। তীরন্দাজের লক্ষ্যভেদশক্তি দেখিয়া চিত্ত কিন্তু আনন্দিত হয় না, তীরের ফলাটা অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া মর্মস্থল বিদ্ধ করে। উহার যুক্তি মানিলেও উহার কথাবার্তার ধরন, উহার দলিতা-ফণিনী মূর্তি দেখিয়া উহাকে আপন লোক বলিয়া মানিতে মন ইতস্তত করে। কুন্তলার মনের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো গোল আছে,

ইংরেজি ভাষায় যাহাকে 'কমপ্লেক্স' বলে। বেলা মল্লিকের কথাও মনে পড়িল। মেয়েটা পুরুষ-বেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিলাতে কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে কে জানে! নারীবেশে সমাজে থাকিতে পারিল না? কেন পারিল না? পাছে পুরুষের সংস্পর্শে আত্মসম্মান আহত হয়? পুরুষের বাহুপাশে কিছুতেই ধরা দিবে না, এ অসম্ভব প্রতিজ্ঞার দুর্গে অস্বাভাবিক একটা আত্মসম্মানকে বাঁচাইয়া রাখার অর্থ কি? কোনো একজন পুরুষের হাতে আত্মসমর্পণ করিলেই তো হইত! এত অহঙ্কার কিসের? মনোমত পুরুষ জুটিল না! মনোমত আহার না জুটিলে কি অনাহারে থাক, মনোমত শয্যা না জুটিলে কি অনিদ্রায় কাটাও, বিবাহের বেলাতেই বা এত বিচার কেন? শঙ্করের মনে হইল, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার ফলে সকলেই একটা অস্বাভাবিক আদর্শের পিছনে ছুটিতেছে। কুন্তলা পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার বিরোধী। কিন্তু তাহার বিরোধিতাটাই কেমন যেন প্রতিক্রিয়া-ক্লিষ্ট হিংস্র মূর্তি ধরিয়াছে। ইহার অন্তরালে ক্ষোভে একটি গ্লানি প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে যেন। একজন মাতালের কথা মনে পড়িল। সে হুইস্কি পান করিয়া যতক্ষণ নেশা থাকিত, ততক্ষণ কুৎসিত ভাষায় হুইস্কিকেই গালাগালি দিত। উদরস্থ বিলাতি সুরাকে সম্বোধন করিয়া বলিত, ওরে শালা হুইস্কি, তুই কি ভেবেছিস, তুই মস্ত বড় একটা কিছু? তুই তো ছেলেমানুষ রে ব্যাটা! সোমরসের নাম শুনেছিস? মাধ্বী, গৌড়ী, পৈঠীর কথা জানিস? এদের কাছে তুই তো একটা অপোগণ্ড নাবালক রে! কুন্তলারও বোধ হয় সেই দশা। পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সে সর্বান্ত করণে সেই শিক্ষারই বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এই জাতীয়তাবোধ আমরা কোথা হইতে পাইলাম? সহসা শঙ্করের মনে হইল, এই জাতীয়তাবোধ জিনিসটা যে ভাবে আমরা চর্চা করিতে শিখিয়াছি, তাহা সত্যই কি ভালো? এই জাতীয়তাবোধ জিনিসটাকে কেন্দ্র করিয়াই তো আধুনিক মানবের নীচতা হীনতা হিংস্রতা সহস্র বীভৎস রূপে প্রকট হইয়া উঠিতেছে। একটা বড় মাপের আড়ালে ইহা কি স্বার্থপরতারই জঘন্যতম রূপ নয়? ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য তাহার ব্রাহ্মণত্বে। সে ব্রাহ্মণত্ব এখন অবলুপ্ত, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারই আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাই কি আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়? বর্বরসুলভ এই হানাহানির আদর্শে ভারতীয় প্রতিভা কি স্বচ্ছন্দে স্ফূর্তি পাইবে? ভারতীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্য কি, শঙ্কর চিন্তা করিতে লাগিল। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ—ইহাই কি ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণের শেষ কথা? কিছুই কিছু নয়, সবই মায়া, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত এই সংসার ত্যাগ কর, এষণা-মুক্ত হও—ইহাই যদি ভারতীয় ঋষির নির্দেশ হয়, জাতীয় পতাকা আস্ফালন করিয়া তাহা হইলে এসব পণ্ডশ্রম কেন? পল্লী-সংস্কারেরই বা প্রয়োজন কি? যাহা মন্দ তাহা কালক্রমে আপনিই ভালো হইবে, সত্য-শিব-সুন্দর যথাস্থানে যথাসময়ে নিজেকে প্রস্ফুটিত করিবেন, অলীক অবিদ্যা মিথ্যা মরীচিকাবৎ আপনি বিলুপ্ত হইবে। আমি ছটফট করিয়া মরিতেছি কেন? আমি কে? কি ক্ষমতা আছে আমার? পরক্ষণেই শঙ্করের মনে হইল, সংসারটা যে মায়া-মরীচিকা ইহা আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু এই মন্ত্রে বিহ্বল হইয়া হিন্দুসভ্যতা জড়ত্বকে কখনও প্রশ্রয় দেয় নাই। সত্য সত্যই যে ব্যক্তি তপস্যা দ্বারা সংসারের নশ্বরত্বকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, সেই তপস্বী মহাপুরুষ হিন্দুসমাজের শিরোমণি, কিন্তু সকলেই শিরোমণি হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না, সকলের সে অধিকারও নাই। সমাজের অধিকাংশ লোকই সাধারণ লোক। তাহারা যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে শান্তিতে বাস করিতে পারে, তাহার

ব্যবস্থাও ব্রাহ্মণেরাই করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চতুর্বর্ণ সমন্বিত হিন্দুসমাজে গুণানুসারে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্তব্য সুনির্দিষ্ট আছে। দ্রোণাচার্য ও পরশুরামের কথাও শঙ্করের মনে পড়িল। উঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন, তপস্যাও করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রয়োজনের সময় অস্ত্রচালনা করিয়া শত্রু হনন করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। শঙ্কর যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ভারতীয় আদর্শ তাহা হইলে নিছক মায়াসর্বস্ব নির্বেদ নয়। উহাতে বলিষ্ঠ পুরুষকারেরও স্থান আছে। উহাতে স্থান নাই কেবল মূঢ় আসক্তির, যে আসক্তি মানুষের হিতাহিত-জ্ঞান অবলুপ্ত করে। সংসারকে মায়াময় জানিয়াও নিঃস্বার্থ নিরাসক্ত চিত্তে সমাজের হিতার্থে প্রত্যেককে স্বকর্তব্য করিতে হইবে, ইহাই আমাদের জাতীয়তা। বর্তমান যুগের স্বার্থপঙ্কিল পরস্বলোলুপ ন্যাশনালিজম আমাদের ন্যাশনালিজম নহে। আমাদের সঙ্কীর্ণতা নাই, কারণ আমরা জানি, সংসার মায়াময়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রত্যেকেই জানে, সংসার মায়াময়, অথচ প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে, স্বকর্তব্য সাধন না করিলে এই মায়াপাশ ছিন্ন করা যাইবে না। নিষ্কাম কর্মের দ্বারাই কর্মের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে, গত্যন্তর নাই। ইহাই আমাদের সনাতন আদর্শ, ইহাই আমাদের কর্তব্য; অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়ও বিশ্বাস করিবে, সংসার অনিত্য, তবু সে যুদ্ধ করিবে আত্মরক্ষা এবং আত্মসম্মান রক্ষার জন্য, আদর্শ ও কর্তব্যের জন্য, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য নহে।

স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতামুক্ত নিরাসক্তচিত্ত নিষ্কাম কর্তব্যপরায়ণ সমাজ এ যুগে স্থাপন করা কি সম্ভব? কেন সম্ভব নয়? শিক্ষা দ্বারা সবই সম্ভব। শিক্ষাই গোড়ার কথা। সমস্ত দেশের চিত্তকে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে। এই সব মূঢ় ম্লান মুক মুখে দিতে হবে ভাষা—রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দ মনের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল। অন্ধকারে চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া সে পড়িয়া রহিল। ভারতের সনাতন আদর্শকে নূতন করিয়া প্রাণের মধ্যে পাইয়া তাহার সমস্ত সত্তা যেন চরিতার্থ হইয়া গেল। শান্ত শুভ্র উদাত্ত বিরাট একটা অনুভূতি তাহার দেহমনকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল; এমন সময় বাইসিক্লের ঘণ্টার শব্দে সচকিত হইয়া সে উঠিয়া বসিল।

কে?

কুণ্ঠিত কণ্ঠে উত্তর আসিল, আমি নিমাই।

ও, নিমাই, এস। এত রাত্রে হঠাৎ কি মনে করে?

কোনো খবর না দিয়ে মোটরে করে স্কুল-ইনস্পেক্টর এসেছেন একটু আগে। কাল আমাদের স্কুল দেখবেন। আপনাদের অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচিটা একবার চাই।

কেন, কি হবে?

মুরগি রাঁধতে হবে তাঁর জন্যে।

একটু ইতস্তত করিয়া নিম্নকণ্ঠে নিমাই বলিল, মদও চাইছেন। এত রাত্রে মদ কি পাওয়া যাবে?

শঙ্কর নির্বাক হইয়া রহিল। শিক্ষাবিভাগের পরিদর্শক স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া প্রথমে মুরগি ও মদের ফরমাস করিয়াছেন। দেশের শিক্ষার আদর্শ-নিয়ন্ত্রণের ভার ইঁহার উপর! আদর্শ চুলায় যাক, লোকটার চক্ষুলজ্জাও কি নাই। ট্যুর করিবার জন্য উচ্চহারে ভাতা পান, অথচ গরিব শিক্ষকের বাড়িতে আসিয়া চড়াও হইয়াছেন।

কোথা উঠেছেন?

হেডমাস্টারবাবুর বাসায়।

শঙ্করের ইচ্ছা হইল, এখনই গিয়া লোকটাকে কড়া কড়া দুই-চারি কথা শুনাইয়া দেয়। কিন্তু এ আবেগ তাহাকে সম্বরণ করিতে হইল। এই লোকটাকেই তোয়াজ করা হয় নাই বলিয়া কাঁটাপোখর স্কুলটা গভর্নমেন্টের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। এবারও যদি ইহাকে তোয়াজ না করা হয়, হীরাপুর স্কুলটার হয়তো সর্বনাশ করিয়া দিবেন। তা ছাড়া নিমাই ঘটকের মুখ চাহিয়াই তাঁহাকে খুশি করা প্রয়োজন। সে আই. এ. ফেল, অথচ হেডপণ্ডিতি করিতেছে। শঙ্করই তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছে। হেডপণ্ডিতি করিবার যোগ্যতা তাহার আছে, কিন্তু ব্যাপারটা আইনসঙ্গত নয়। ইনস্পেক্টর রুষ্ট হইলে কলমের এক খোঁচায় তাহার চাকরি চলিয়া যাইতে পারে।

এ তো এক আচ্ছা মুশকিল দেখছি!

এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করবার ইচ্ছে ছিল না। আমি প্রথমে কেনারামবাবুর কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানেও আজ মাংস রান্না হচ্ছে। হৃদয়বল্লভবাবু এসেছেন কি না কলকাতা থেকে।

যদিও অন্ধকারে শঙ্কর নিমাই ঘটকের মুখ দেখিতে পাইতেছিল না, তবু তাহার কণ্ঠস্বরে মনে হইতেছিল, নিজের চাকরির জন্য সকলকে বিরক্ত করিতে হইতেছে বলিয়া বেচারা যেন সঙ্কোচে মরিয়া যাইতেছে। ইনস্পেক্টর আসিয়া রাত-দুপুরে মদ-মাংস দাবি করিয়াছে, ইহা যেন তাহারই অপরাধ। ভারতীয় আদর্শে প্রত্যেক নরনারীর মন শিক্ষাসমৃদ্ধ করিতে পারিলে দেশের যে জাগরণ হইবে, এতক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন নয়নে শঙ্কর তাহারই স্বপ্ন দেখিতেছিল। সহসা সে স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। আদর্শের তুঙ্গলোক হইতে অবতরণ করিয়া নিমাইকে আশ্বাস দিতে হইল, তার জন্যে কি হয়েছে, তুমি যাও, আমি সব ব্যবস্থা করছি।

নিমাই তবু দাঁড়াইয়া রহিল।

তুমি যাও, মুশাইকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি।

নিমাই চলিয়া গেল।

মুশাই!

মুশাই পাশেই কোথাও ছিল, ছায়ামূর্তির মত আসিয়া দাঁড়াইল।

দুটো মুরগি বেঁধে হীরাপুরে এখুনি নিয়ে আসতে হবে। আর এক বোতল মদ। জোগাড় করতে পারবি?

হ্যাঁ হুজুর।

শঙ্কর টাকা বাহির করিয়া দিল।

হীরাপুরে হেডমাস্টারবাবুর বাসায় দিয়ে আসতে হবে।

মুশাই চলিয়া গেল। শঙ্কর নিস্তব্ধ হইয়া ইজি-চেয়ারে পড়িয়া রহিল।

।। পনেরো ।।

অলক্ষ্যে আর একটা মেঘও ঘনাইতেছিল।

কেনারাম চক্রবর্তী, ভূতপূর্ব জমিদার রাজবল্লভের একমাত্র পুত্র হৃদয়বল্লভ এবং বিখ্যাত মহাজন রাজীব দত্ত কেনারাম চক্রবর্তীর বৈঠকখানায় সমবেত হইয়া নিম্নকণ্ঠে আলাপ করিতেছিলেন।

জমিদারি বিক্রয় হইয়া যাইবার পর হৃদয়বল্লভ কলিকাতা হইতে অদ্য প্রথম আসিয়া গ্রামে পদার্পণ করিয়াছেন। তাহাও গোপনে, গ্রামের অধিকাংশ লোকই তাঁহার আগমনবার্তা জানে না। রাত্রিবাস মাত্র করিয়া কাল পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন। প্রাক্তন নায়েব বন্ধুপ্রতিম কেনারাম চক্রবর্তীর বাড়িতে আসিয়া উঠিয়াছেন। এতদিন কেনারাম চক্রবর্তীর মারফত রাজীব দত্তের সহিত পত্রযোগে তাঁহার যে সব নিগূঢ় মন্ত্রণা চলিতেছিল, সাক্ষাতে সেগুলির সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা করিবার জন্যই তিনি আসিয়াছেন।

প্রায় দুই বৎসর পূর্বে রাজবল্লভ মারা গিয়াছেন। কলিকাতায় নানা ঘাটের নানা জল আস্বাদন করিয়া, শেয়ার-মার্কেটে লোকসান দিয়া এবং চিকিৎসা-ব্যাপারে ঋণগ্রস্ত হইয়া হৃদয়বল্লভ অবশেষে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে, কলিকাতায় থাকা তাঁহার পোষাইবে না। তাঁহাকে গ্রামেই পুনরায় ফিরিতে হইবে। কিন্তু যে গ্রামে এতদিন তিনি জমিদার ছিলেন, সে গ্রামে প্রজারূপে—বিশেষ করিয়া সেদিনকার ছোঁড়া উৎপল এবং শঙ্করের আধিপত্যে বাস করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। গ্রামে ফিরিতে হইলে জমিদার রূপেই ফিরিতে হইবে। কিন্তু তাহাও প্রায় অসম্ভব! কি করিয়া তাহা সম্ভব হইতে পারে, তাহারই জল্পনা-কল্পনা পত্রযোগে এতকাল চলিতেছিল, কিন্তু এমন ঢিমা চালে চলিতেছিল যে, হৃদয়বল্লভ আর ধৈর্য রক্ষা করিতে পারেন নাই; অবিলম্বে ইহার একটা 'ফয়সালা' করিয়া ফেলিবার জন্য সশরীরে আসিয়া হাজির হইয়াছেন। তাঁহার আগমন উপলক্ষেই কেনারাম, রাজীব দত্ত এবং প্রমথ ডাক্তারকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। প্রমথ ডাক্তার এখনও আসিয়া পৌঁছান নাই।

রাজীব দত্তই প্রধান ভরসা। হৃদয়বল্লভ নিজে প্রায় কপর্দকহীন। কেনারামের প্ররোচনায় রাজীব দত্ত সম্পূর্ণ জমিদারিটি মর্টগেজ রাখিয়া শতকরা পাঁচ টাকা সুদে আড়াই লক্ষ টাকা কর্জ দিতে রাজি হইয়াছেন। তিনজনেই পাকা লোক, তিনজনেরই উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। হৃদয়বল্লভ অপুত্রক এবং বিপত্নীক। পত্নী পুত্র উভয়েই কিছুকাল পূর্বে যক্ষ্মারোগে মারা গিয়াছেন। তিনি নিজেও যক্ষ্মাগ্রস্ত, আর বেশিদিন বাঁচিবার আশা নাই। যে কয়দিন বাঁচিবেন, পরের টাকায় জমিদারি ক্রয় করিয়া ভোগ করিতে চান। যদি ঋণশোধ করিতে না পারেন, জমিদারি না হয় রাজীবলোচনের হস্তগত হইবে, তাহাতে তাঁহার কি আসে যায়, উত্তরাধিকারী তো কেহ নাই। নিজের জীবনটা ভদ্রভাবে কাটিলেই যথেষ্ট।

কেনারামের উদ্দেশ্য—কমিশন। চার বৎসর পূর্বে রাজবল্লভ যখন দেনার দায়ে জমিদারিটি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখন রাজবল্লভ এবং উৎপল উভয়েরই হিতৈষী সাজিয়া তিনি উভয় পক্ষের নিকট হইতে একুনে প্রায় হাজার দশেক টাকা উপার্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এসব বিষয়ে সত্যই তিনি ক্ষমতাবান পুরুষ। হিতৈষী সাজিতে অদ্বিতীয়।

হিতাকাঙ্ক্ষায় কখনও কড়া কথা বলিয়া, কখনও স্পষ্টভাষণ করিয়া, কখনও মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া, কখনও সান্ত্বনা দিয়া তিনি এমন একটা অভিনয় করিতে পারেন যে, তাঁহার ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি মনোভাব সবসময়ে সকলে বুঝিতেও পারে না। পারিলেও রাগ করিতে পারে না, রাগ করিলেও তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করিবার উপায় থাকে না, এমন পরিচ্ছন্ন তাঁহার কার্যবিধি। কোনো কিছুতেই কখনও নিজেকে এমনভাবে জড়াইয়া ফেলেন না, যাহাতে আইনত তাঁহাকে দোষী প্রতিপন্ন করা যায়। জমিদারি পুনঃক্রয়ের বাসনাটি আভাসে-ইঙ্গিতে তিনিই একদা হৃদয়বল্লভের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। ভাষাটি ছিল এইরূপ—তোমার পক্ষে সবচেয়ে ভালো হয় জমিদারিটা তুমি যদি আবার ফিরে পাও, ফিরে পাওয়া শক্ত অবশ্য, কিন্তু চেষ্টা করলে হয়তো—এই পর্যন্ত বলিয়াই তিনি থামিয়া গিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে স্ফুলিঙ্গটি যখন হৃদয়বল্লভের অন্তরে শিখারূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, যখন হৃদয়বল্লভ জমিদারি ফিরিয়া পাইবার জন্য কেনারামকে ক্রমাগত পত্র লিখিতে লাগিলেন, তখন অনেকটা যেন বিপন্ন হইয়াই প্রাক্তন সম্বন্ধের খাতিরে তিনি এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে রাজি হইলেন। কিন্তু চেষ্টাটা এমন মন্দগতিতে করিতে লাগিলেন যে, হৃদয়বল্লভ অবশেষে স্পষ্ট করিয়া লেখা সমীচীন মনে করিলেন, তুমি চেষ্টা করিয়া জমিদারিটি যদি উৎপলের কবল হইতে নির্বিঘ্নে পুনরুদ্ধার করিতে পার, তোমার ন্যায্য পারিশ্রমিক তোমাকে আমি দিব। জমিদারির মূল্য এবং তোমার পারিশ্রমিক—এই সমস্ত টাকাটাই তুমি রাজীব দত্তর নিকট হইতে কর্জ কর—। কেনারাম উত্তরে লিখিলেন, পারিশ্রমিকের জন্য কিছু আসিয়া যায় না, পরিশ্রম করিলে অবশ্য কিছু পারিশ্রমিক লইতেই হয়, তবে তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ আলাদা। তোমার ক্ষেত্রে টাকাটাই বড় নয়। দেখি, কত দূর কি করিতে পারি।

বলা বাহুল্য, কেনারাম আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং সত্য সত্যই চেষ্টা করিয়া খানিকটা সফলকামও হইয়াছিলেন। আর কিছু না হউক, রাজীবলোচন তো রাজি হইয়াছেন।

কুসীদজীবী রাজীবলোচনের উদ্দেশ্য কুসীদ। কুসীদের লোভেই তিনি এই রাত্রে অসুস্থ শরীর লইয়াও কেনারামের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছেন এবং ইঁহাদের আগড়ম-বাগড়ম আলোচনা শুনিতেছেন। রাজীবলোচন প্রিয়দর্শন ব্যক্তি নহেন। কালো, বেঁটে, শীর্ণকায় লোক তিনি। যখন চলেন সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়া থাকেন, যখন বসেন উবু হইয়া বসেন। তাঁহার চোয়াল সর্বদাই নড়ে, মনে হয়, সুপারি জাতীয় কি যেন একটা চিবাইতেছেন। মুখে এক-আধ টুকরা সুপারি, লবঙ্গ বা হরীতকী কখনও হয়তো বা থাকে, কিন্তু তাহার জন্য অত ঘন ঘন মুখ নাড়ার প্রয়োজন হয় না। ওটা তাঁহার মুদ্রাদোষ। মাথার সামনের দিকে সামান্য টাক, সামান্য একটু কাঁচা-পাকা গোঁফ, মুখভাবে বিশেষ কিছুই অসামান্যতা নাই। মুখের মধ্যে ছোট ছোট হইলেও চক্ষু দুইটিই বেশ জীবন্ত। কিন্তু প্রায়ই তাহা অর্ধমুদ্রিত থাকে, ক্বচিৎ কখনও কাহারও দিকে যদি চোখ খুলিয়া তাকান, সে চোখের মর্মভেদী দৃষ্টি তাহার মনে ভীতি সঞ্চার করে। পারতপক্ষে কেহ সে দৃষ্টির সম্মুখবর্তী হইতে চায় না, এমন কি তাঁহার একমাত্র পুত্রও নয়। সুদের লোভেই তিনি কেনারামের প্রস্তাবে রাজি হইয়াছেন। বিশ্বাসযোগ্য ব্যাঙ্কে আজকাল সুদের হার অতিশয় কম। টাকাগুলো কেবল পচিতেছে। কেনারামটাকে কিছু উপুড়হস্ত করিলে কিছু টাকার যদি সদগতি হয়, মন্দ কি? টাকা অবশ্য ও ছোকরা শোধ করিতে পারিবে না,

জমিদারিটাই শেষ পর্যন্ত লইতে হইবে, তাহাই বা মন্দ কি? আড়াই লক্ষ টাকার পরিবর্তে বিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি লাভ করা এ বাজারে নিন্দনীয় নয়। আজকাল ওই আড়াই লক্ষ টাকার সুদ বছরে চার হাজারও হয় না। জমিদারিতে অবশ্য হাজা শুকা আছে, নানা হাঙ্গামা। কিন্তু নির্ঝঞ্ঝাটে মালক্ষ্মী কবেই বা কাহার গৃহে আসিয়াছেন? তাহা ছাড়া আর একটা কথা, উৎপল এবং শঙ্কর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছে। যদি এখনও পর্যন্ত তাহারা তাঁহার বিশেষ কোনো ক্ষতি করিতে পারে নাই, তাঁহার খাতকসংখ্যা আগে যেমন ছিল এখনও যদিও প্রায় সেইরূপ আছে, কিন্তু উহাদের উপর জনসাধারণের শ্রদ্ধা যেরূপ বাড়িতেছে, (জনসাধারণ দূরের কথা, তাঁহার নিজেরই শ্রদ্ধা বাড়িতেছে!) ভবিষ্যতে হয়তো তাঁহার ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। এই উপলক্ষে ওই দুইজনকেও যদি গ্রাম হইতে উৎখাত করা যায়, মন্দ কি? শত্রুকে অঙ্কুরে বিনাশ করাই তো ভালো। কিন্তু এই বিনাশ করার ব্যাপারে তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ খটকা আছে। অসঙ্কোচে কাহাকেও বিনাশ করিতে চিরকালই তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন, বিশেষত সে ব্যক্তি যদি নিরীহ হয়। দীর্ঘনিঃশ্বাসকে তাঁহার বড় ভয়। কুসীদজীবী হইলেও তিনি ধর্মভীরু ব্যক্তি, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, আশীর্বাদ-অভিশাপ প্রভৃতিতে আস্থাবান। বিনা দোষে শঙ্কর এবং উৎপলকে বিপন্ন করাটা কি ঠিক হইবে? বহু অনুসন্ধান করিয়াও তো তিনি উৎপল অথবা শঙ্করের চরিত্রে এমন কোনো দোষ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, যাহার অজুহাতে তাহাদের উচ্ছেদসাধন সমর্থন করা যায়। অম্বিকা রায়ের ব্যাটা শঙ্করকে তো ভালোবাসিতেই ইচ্ছা করে। নিজের অকালকুষ্মাণ্ড পুত্র গদাধরের সহিত তুলনা করিয়া এ কল্পনাও তিনি মাঝে মাঝে করিয়াছেন, শঙ্কর আমারই ছেলে হইলে মন্দ কি হইত? কেমন বিদ্বান বুদ্ধিমান শক্ত-সমর্থ জোয়ান ছেলে, কোনোরূপ নষ্টামি নাই, লোকের বিপদে-আপদে বুক দিয়া করে, কথায়-বার্তায় কেমন বিনয়ী, অথচ চালাক-চতুর, সেদিন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত কেমন গড়গড় করিয়া আলাপ করিল! অথচ গদাধরটা কি যেন! ঠিক যেন একটা কানা কুলি-বেগুন, বেঁটে কুরকুট্টে, পেঁচার মত স্বভাব, ভদ্রসমাজে মুখ দেখায় না, বদমাইসের ধাড়ি, যত আড্ডা ছোটলোকদের সঙ্গে, এই বয়সেই গাঁজা ধরিয়াছে নাকি, তুরিটোলার ছুঁড়িগুলো তো তাহার পয়সায় বড়লোক বনিয়া গেল। শাড়ি-চুড়ির কি বাহার হারামজাদীদের!

সহসা রাজীবলোচনের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল।

কেনারাম মূল সমস্যাটা লইয়া আলোচনা করিতেছিল।

আমাদের যতই না কেন গরজ থাক, উৎপল শুধু শুধু জমিদারি বিক্রি করতে রাজি হবে কেন? তার তো কোনো অভাব নেই।

রাজীব দত্তের চোয়াল নড়িয়া উঠিল।

হৃদয়বল্লভ বলিলেন, তা নেই স্বীকার করছি। কিন্তু ওদের অতিষ্ঠ করে তোল। তা হলেই পালাবে।

কেনারাম বাহিরে সভ্য-ভব্য মিতভাষী মার্জিতরুচি ব্যক্তি, চট করিয়া এমন কিছু বলেন না যাহার জন্য ভবিষ্যতে তাঁহাকে দায়ী করা যাইতে পারে। অতিষ্ঠ করিবার আয়োজন তিনি করিয়াছেন, হৃদয়বল্লভের আগ্রহাতিশয্য ছাড়া ব্যক্তিগত একটা কারণও সম্প্রতি ঘটিয়াছে। উৎপলের পরামর্শ-অনুযায়ী শঙ্কর তাঁহার পুত্র জীবনকে সত্যই উকিলের চিঠি দিয়াছে। কিন্তু

এত কথা হৃদয়বল্লভকে বলার প্রয়োজন কি? সংক্ষেপে শুধু বলিলেন, দেখি।

না না, উঠে পড়ে লাগ ভাই, 'দেখি দেখি' তুমি অনেকদিন থেকে করছ। তুমি চুপ করে থাকবার লোকও নও, নিশ্চয় কোনো আয়োজন করেছ একটা। চুপিচুপি বলই না ভেঙে, শুনি।

শীর্ণকান্তি হৃদয়বল্লভের সমস্ত প্রাণশক্তি ড্যাবডেবে চক্ষু দুইটিতে জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল। সর্বগ্রাসী দৃষ্টি সে চক্ষুর।

আয়োজন? না, তেমন কিছু করিনি এখনও। তবে মণি বাঁড়ুজ্জের লক্ষ্মীবাগের ব্যাপারটা যদি বেশি দূর গড়ায়, তা হলে হয়তো কিছু হতে পারবে। হয়তো—

হয়তো কথাটার উপর জোর দিয়া তিনি থামিয়া গেলেন।

হৃদয়বল্লভ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

সমস্ত ব্যাপারটা খুলেই বল না ভাই, মণি বাঁড়ুজ্জে কে?

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর কেনারাম অবশেষে ব্যাপারটা খুলিয়া বলাই মনস্থ করিলেন।

আমাদের হরিহর বাঁড়ুজ্জের খুড়তুতো ভাই মণি লক্ষ্মীবাগে প্রায় হাজার বিঘে জমি নিয়ে মহা ধুমধাম করে চাষ করছে। আশেপাশের কয়েকজন বেহারিদের, বিশেষ করে শিক্ষিত বেহারিদের, চোখ টাটাচ্ছে তাই দেখে। জনকয়েক বেহারি, জমিদার (গুলাব সিং তাদের মধ্যে প্রধান) জনকয়েক বেহারি উকিলও সেই নিয়ে ঘোঁট পাকাচ্ছে। শঙ্করের দক্ষিণহস্ত নিপুবাবুও ইন্ধন যোগাচ্ছেন তাতে। মণি যেসব চাষীর কাছ থেকে টাকা দিয়ে জমি কিনে নিয়েছিল, নিপুবাবু সেই সব চাষীদের ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছেন এই বলে যে, মণি ক্যাপিটালিস্ট, ঠকিয়ে তাদের কাছ থেকে জমি নিয়ে নিয়েছে, যে চাষ করে জমি তারই, সমবায়-কৃষি-সমিতি করেই রুশদেশে নাকি চাষীরা সুখে আছে, মণির ন্যায়ত কোনো অধিকার নেই একা অতখানি জমি ভোগ করবার। মোট কথা, এই নিয়ে একটা হাঙ্গামা বাধবার সম্ভাবনা।

কেনারাম চুপ করিলেন।

তার সঙ্গে উৎপল আর শঙ্করের সম্বন্ধ কি?

হাঙ্গামা যদি বাধে আর ওরা যদি যোগ দেয় তাতে, দেওয়াই সম্ভব, ওরা আদর্শবাদী লোক, মণির পক্ষ নিশ্চয়ই নেবে, তা হলে ও অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু বেহারিদের সঙ্গে আর চাষীদের সঙ্গে শত্রুতা হবে ওদের, আর তা হলেই—মানে—

মৃদু হাসিয়া কেনারাম পুনরায় চুপ করিলেন।

মানে?

মানে—একখানা টিকে একবার একটু ধরলে বাকিগুলোও ধরে উঠতে দেরি লাগবে না।

উপমাটা রাজীব দত্তের ভালোই লাগিল।

তিনি একবার চোয়াল নাড়িলেন।

কিন্তু ফুঁ দেওয়া চাই, ফুঁ-টা তোমাকে দিয়ে দিতে হবে—

হৃদয়বল্লভ বক্তব্য শেষ করিতে পারিলেন না। প্রমথ ডাক্তার আসিয়া প্রবেশ করিলেন। গুলাব সিংহের উপর প্রমথ ডাক্তারের অসীম প্রভাব আছে বলিয়া কেনারাম প্রমথ ডাক্তারকে দলে টানিয়াছেন। প্রমথ ডাক্তার আসিয়াছেন শঙ্করের উপর মনে মনে রাগ আছে বলিয়া।

বিশেষত সেদিনকার প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করিয়া দিবার কথাটা তাঁহার মোটেই ভালো লাগে নাই। লোকটা যেন হাতে মাথা কাটিয়া বেড়াইতেছে। উৎপলবাবু ভালোমানুষ, লোক, কিছু বলেন না, যা-তা করিয়া বেড়াইতেছে একেবারে! ভদ্রলোককে একটু কড়কাইয়া দেওয়া উচিত বইকি। সারটেন্‌লি।

প্রমথ ডাক্তারের অভ্যাগমে পরামর্শ-সভা আরও জাঁকিয়া উঠিল।

।। ষোলো ।।

শঙ্করের দিনগুলি কাটিতেছিল।

পল্লীজীবনের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ-খচিত দিনগুলি। পৃথিবীর ইতিহাসে এই অতি তুচ্ছ দিনগুলির হয়তো কোনো চিহ্ন থাকে না, পল্লীজীবনের দৈনন্দিন ইতিহাসে কিন্তু ইহাদের মূল্য কম নয়। ডান্‌কার্কে কে পরাজিত হইল, কোন্ পক্ষ যুদ্ধনৈপুণ্যের কি পরিচয় দিল, চীনবাসীদের প্রতি বলশেভিক রাশিয়ার আসল মনোভাব কি, জার্মানির নূতনতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অথবা বর্বরতার কোন্ কাহিনী কাগজে বিজ্ঞাপিত হইতেছে, কোন্ পক্ষের কোন্ সেনানায়কের যুদ্ধকৌশল কিরূপ, বিমানবহর কে কত বেগে বাড়াইয়া চলিয়াছে—এসব খবর শিক্ষিত শহরবাসীকে যতটা চঞ্চল করিয়া তোলে, অশিক্ষিত পল্লীবাসীকে ততটা তোলে না। পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের অত্যাশ্চর্য কাহিনী তাহারা শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মুখে অত্যাশ্চর্য কাহিনীর মতই শোনে, যেন রূপকথা শুনিতেছে। ঘর্ঘর শব্দ করিয়া আকাশ-পথে যখন বিমান-পোত উড়িয়া যায়, বিস্ফারিত নয়নে দলবদ্ধ হইয়া তাহারা সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকে—যুদ্ধের সঙ্গে ওইটুকুই তাহাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। মহাযুদ্ধের খবর তাহাদিগকে বিস্মিত করে, কিন্তু তাহাদের জীবনের সুখ-দুঃখ-আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করে না, অন্তত তখনও পর্যন্ত করে নাই। যুদ্ধের খবর তাহাদের নিকট খবরই নয়।

তাহাদের নিকট আসল খবর—নিমাই পণ্ডিতের গাই একটি চমৎকার বকনা প্রসব করিয়াছে। কুচকুচে কালো রঙ, কপালের মাঝখানে চন্দনের ফোঁটার মত সাদা একটি টিপ। চমৎকার দেখিতে। হকরু গোয়ালা গাইটি সস্তায় কিনিয়া দিয়াছিল বলিয়া একটা ব্যক্তিগত গর্ব অনুভব করিতেছে। বানারসি গাড়োয়ান, নৈমুদ্দিন দর্জি, ইস্কুলের চাকর পরমেশ্বরা—সকলেই ইহাতে উল্লসিত, সকলেই নিমাইকে নানারূপ পরামর্শ অযাচিত ভাবেই দিয়া যাইতেছে। এই সময়ে গাইকে কোন্ কোন্ জিনিস খাওয়ানো উচিত তাহা লইয়া রামু ও বিষুণের কলহই হইয়া গেল। রামু সরিষার খোলের পক্ষপাতী, বিষুণের মতে তিসির খোলই সর্বশ্রেষ্ঠ। খড় ভুষি কোথায় সস্তায় পাওয়া যাইবে সে পরামর্শ অনেকেই দিয়া গেল, খ'ড়ো চালাটা আগামী বর্ষায় চলিবে কি না তাহা লইয়াও অনেকে মাথা ঘামাইল। মুকুন্দ পোদ্দার কি একটা কাজে হীরাপুরে আসিয়াছিলেন, বকনাটি দেখিয়া তাঁহার ভারি পছন্দ হইয়া গেল। তিনি যাচিয়া নিমাইয়ের সহিত দেখা করিয়া বলিয়া গেলেন যে, নিমাই ভবিষ্যতে কখনও যদি বকনাটি বিক্রয় করে তিনিই কিনিবেন, এমনকি এখনই তিনি ইহার জন্য নগদ পাঁচ টাকা বায়না দিতে প্রস্তুত আছেন। বলা বাহুল্য, নিমাই সম্মত হইল না।

কয়লার সদ্যোজাত শিশুটা নাকি শৃগালের কবলে গিয়াছে। কয়লার বউ তাহাকে আঙিনায় শোয়াইয়া রাখিয়া ঘরের ভিতর রান্না করিতেছিল। দিন-দুপুরে এই কাণ্ড! খুকির জন্য অমিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ মাঝে একদিন শিলাবৃষ্টি হইয়া গেল। আমের মুকুল যদিও এখনও তেমন হয় নাই, তবুও যা হইয়াছিল নষ্ট হইল। ইউরোপীয় যুদ্ধের শোচনীয় পরিবেশ অপেক্ষা এই পরিবেশ সকলকে বেশি আকুল করিয়া তুলিল। অতীতে কে কত ভীষণ শিলাবৃষ্টি দেখিয়াছে, তাহা লইয়া পাল্লা দিয়া গল্পও চলিল দুই-চারিজন বৃদ্ধের মধ্যে।

আর একটা বিস্ময়কর ঘটনায় সব চাপা পড়িয়া গেল। গ্রামপ্রান্তে শিবমন্দিরের পাশে এক বৃদ্ধ ভিক্ষুক-দম্পতি বাস করিত। বেচারারা সত্যই অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। এ অঞ্চলের বৃদ্ধতম লোকও নাকি তাহাদের ওই একই রকম দেখিতেছে। যম যেন তাহাদের ভুলিয়া আছে। ঝড় ঝঞ্ঝাবাত মহামারি দুর্ভিক্ষে কত শক্তসমর্থ লোক অকালে মরিল, কিন্তু উহাদের মৃত্যু নাই। কুব্জপৃষ্ঠে ন্যুব্জদেহে লাঠি ধরিয়া উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল এবং চিরকাল হয়তো বেড়াইত, যদি রাজীব দত্ত দয়া না করিতেন। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব ঠেকিলেও কুসীদজীবী রাজীব দত্তই দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের একটা মাসোহারার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বেচারাদের আর ভিক্ষা করিতে হইত না। বেশ ছিল। অকস্মাৎ একদিন রাত্রে ইহাদের কেন্দ্র করিয়া একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরে ষণ্ডা ষণ্ডা দুইজন কালো লোক তাহাদের কুঁড়েঘরে ঢুকিয়া বুড়া অন্ধ ভিখারিটাকে কাঁধে তুলিয়া লইল এবং নিমেষমধ্যে অন্ধকারে কোথায় মিলাইয়া গেল। বুড়ির চিৎকারে আকৃষ্ট হইয়া প্রতিবেশীরা সমবেত হইল। লণ্ঠন লইয়া, মশাল জ্বালিয়া, অনুসন্ধানের ত্রুটি হইল না। কিন্তু জীবন্ত বা মৃত বুড়ার কোনো সন্ধানই মিলিল না। থানায় খবর দেওয়া হইল, কোনো ফল ফলিল না। সম্ভব অসম্ভব নানারূপ গবেষণার পর যে ধারণাটা ক্রমশ অধিকাংশ লোকের মনে বদ্ধমূল হইল তাহা এই যে, যমরাজকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। বুড়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিল কিছুতেই মরিবে না। যমরাজ তাহা শুনিবেন কেন? দূত পাঠাইয়া জীবন্তই তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া কয়েকদিন পরে বুড়িও মরিয়া গেল।

রহিমের ভেড়া মটরা সকলকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। ফসল খাইয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু কিছু বলিতে গেলেই ছুটিয়া আসিয়া ঢুঁ মারিয়া ফেলিয়া দেয়। এ অঞ্চলের ছেলেরা তো ওটাকে যমের মত ভয় করে। সর্বাঙ্গে কোঁকড়ানো কালো লোম, প্রকাণ্ড পাকানো শিঙ দুইটা বিশাল 'ৎ'-এর মত বলিষ্ঠ গর্দানের উপর যেন ওত পাতিয়া বসিয়া আছে। মটরার জ্বালায় সকলে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু মটরার প্রতি সকলের স্নেহেরও অন্ত নাই। হইবে না? সেবার রসুলগঞ্জে যখন ভেড়ার লড়াই হয়, তখন এই মটরাই সমাগত সমস্ত ভেড়াকে পরাস্ত করিয়া গ্রামের মুখরক্ষা করিয়াছিল। সেই হইতে মটরা গ্রামবাসী সকলেরই আদরের পাত্র। ইহার বাড়ি ফ্যান খাইয়া, উহার বাড়ি ভুষি খাইয়া, কাহারও বাগান ভাঙিয়া, কাহারও ফসল চরিয়া মটরা দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইতেছে। সম্প্রতি কিছু বাড়াবাড়ি শুরু করিয়াছে। ভাগিয়ার ছেলে ননকুকে এমন মারিয়াছে যে, সে হাতের হাড় ভাঙিয়া হাসপাতালে শয্যাগত হইয়া পড়িয়া আছে। ভাগিয়া শঙ্করের নিকট আসিয়া মটরার বিরুদ্ধে নালিশ জানাইল।

শঙ্কর বলিল, আমি কি করব তার? রহিমকেই বল গিয়ে।

আপ থোড়া বোল দিজিয়ে হুজুর।

আচ্ছা, ডেকে নিয়ে আয়।

রহিম আসিয়া বলিল, যে, মটরার জ্বালায় নিজেই সে নাস্তানাবুদ হইয়া পড়িয়াছে।—কত দড়ি আর কিনি হুজুর, রোজ রোজ দড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে! নারিকেলের শক্ত মোটা দড়িও এক ঝটকায় পট করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। আমি আর উহাকে লইয়া পারি না, নাচার হইয়া পড়িয়াছি। আপনারা বরং ওটাকে কাটিয়া খাইয়া ফেলুন, আপদ চুকিয়া যাক।

এই কথায় ভাগিয়াই জিব কাটিয়া বলিয়া উঠিল, আরে, ছি ছি ছি, ই কৈসন বাত!

শঙ্কর বলিল, একটা মোটা লোহার শেকল কিনে গলায় বকলস দিয়ে বেঁধে রাখ ব্যাটাকে।

ইহার উত্তরে রহিম যাহা ব্যক্ত করিল, তাহাও সঙ্গত। এই যুদ্ধের সময় বকলস এবং লোহার শিকলের যা দাম, তাহা জুটাইবার সঙ্গতি তাহার নাই। অবশেষে শঙ্করকে বলিতে হইল যে, দামটা সে-ই দেবে।

ভাগিয়া-রহিম উভয়েই খুশি হইয়া চলিয়া গেল।

নেকি মাড়োয়ারি শীঘ্রই নাকি একটি মাখন-তোলা কল বসাইবে।

নটবর এবং চরণ ডাক্তারের চিকিৎসায় হরিয়া ক্রমশ সারিয়া উঠিতেছে।

নিপু মাঝে একদিন হীরাপুর হাটে দাঁড়াইয়া ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বলশেভিজম সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দিবার চেষ্টা করিয়া নাকি হাস্যাস্পদ হইয়াছে।

কর্পূরা গোয়ালার মেয়ে শুক্‌রি মাঝে একদিন হৈ-চৈ বাধাইয়া বসিল। এ দেশের সব মেয়েরই যেমন হয়, তাহারও অতি বাল্যকালেই, দুই বৎসর বয়সেই, বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। ষোলো বৎসর বয়স পর্যন্ত সে বাপের বাড়িতেই ছিল। মাসখানেক পূর্বে তাহার 'গওনা' (দ্বিরাগমন) হইয়াছে। 'গওনা' উপলক্ষে গরিব কর্পূরা বেচারা এই দুর্দিনেও যথাসাধ্য সমারোহ করিয়া মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়াছিল। দশ ক্রোশ দূরে ঝাপটি গ্রামে তাহার শ্বশুরবাড়ি। মেয়েটা হঠাৎ সেখান হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। রাতারাতি হাঁটিয়া চলিয়া আসিয়াছে। শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও দুই-একদিন পরে দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া উপস্থিত। পলাতক বধূকে যেমন কবিয়া হোক তাহারা লইয়া যাইবেই।

শুক্‌রি আসিয়া অমিয়ার শরণাপন্ন হইল। বলিল, তাহার স্বামীর শ্বেতী (ধবল) হইয়াছে, কিছুতেই ও স্বামীর ঘর সে করিবে না। ঝপ্‌টি গ্রামের কাছেই শঙ্করদের স্থাপিত একটি ডিস্‌পেনসারি আছে। তাহার স্বামীর যাহাতে সুচিকিৎসা হয়, সে ব্যবস্থা শঙ্কর করিয়া দিবে আশ্বাস দিল। প্রমথ ডাক্তার বলিলেন, ধবল আর কুষ্ঠ এক জিনিস নয়, সংক্রামকও নয়, সুচিকিৎসায় সারিয়া যাইতে পারে। তবু শুক্‌রি যাইতে চায় না। অবশেষে শঙ্করকে গ্রামের দোহাই দিতে হইল। সে যদি না যায়, গ্রামেরই একটা বদনাম হইয়া যাইবে যে! এ গ্রামের মেয়েকে কেহ বিবাহই করিতে চাহিবে না হয়তো। তা ছাড়া এমনভাবে পলাইয়া আসিলে লোকে অন্যরকম বদনামও দিতে পারে। শুক্‌রির মত ভালো মেয়ের নামে এ রকম কুৎসা রটা কি ঠিক?

পায়ের বুড়া আঙুল দিয়া মাটি খুঁড়িতে-খুঁড়িতে নতমুখী শুক্‌রি বলিল, এখন গেলে

আমাকে উহারা মারিবে। বাহিরের বারান্দায় শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বসিয়া ছিল, তাহারা প্রতিশ্রুতি দিল যে, বধূর উপর কোনো রকম অত্যাচার করা হইবে না। তখন শুক্‌রি আর এক বাহানা তুলিল। দশ ক্রোশ হাঁটিয়া যাইতে পারিবে না। কর্পূরা গোয়ালা নিকটে বসিয়া সব শুনিতেছিল, তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। মহিষের শিঙের মত উচ্চাগ্র বাঁকা গোঁফ চুমরাইয়া সে সগর্জনে বৈবাহিককে সম্বোধন করিয়া বলিল, ঝোঁটি পকড়িকে ঘিশিয়াকে লে যা। বৈবাহিকটি বলিষ্ঠ-গঠন ব্যক্তি, শালপ্রাংশু মহাভুজ যাহাকে বলে। পুত্রবধূর চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার মত শারীরিক ক্ষমতা তাহার আছে। লোকটি কিন্তু ধীরপ্রকৃতির। কর্পূরার কথায় তাহার মুখ প্রশান্ত হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পুত্রবধূর আপত্তির যৌক্তিকতাও সে বোধ হয় উপলব্ধি করিল। বটুয়া হইতে একটা আধুলি বাহির করিয়া সেটির প্রতি এক দৃষ্টে ক্ষণকাল তাকাইয়া রহিল, তাহার পর ইতস্তত করিয়া বলিল, আট আনামে বয়েল গাড়ি কি ডোলি হোতেই?

অসম্ভব। আজকালকাব দিনে মাত্র আট আনায় কোনো গরুর গাড়ি বা ডুলি দশ ক্রোশ পথ যাইতে রাজি হইবে না। অন্তত চার টাকা লাগিবে। কর্পূরা 'গওনা'তে সম্প্রতি ঋণগ্রস্ত হইয়াছে, আবার এই চার টাকাও তাহাকে দিতে হইবে নাকি? তাহার ভয়ানক রাগ হইল। আর একবার গোঁফে চাড়া দিয়া সে বোধ হয় পুনরায় ঝুঁটি ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার প্রস্তাবটাই করিতেছিল, কিন্তু শঙ্কর বাধা দিল।

শঙ্কর বলিল, আচ্ছা, আমার গাড়িটাই পৌঁছে দিয়ে আসুক ওকে, মুশাইকে বলে দিচ্ছি।

মুশাই মনে মনে খুব চটিল, ছুঁড়িটার দেমাক তো কম নয়। কিন্তু তাহাকে যাইতে হইল। শঙ্করের বিরুদ্ধাচরণ করা তাহার সাধ্যাতীত। শুক্‌রির আর আপত্তি করিবার উপায় রহিল না, বরং তাহার মুখে হাসি ফুটিল।

শঙ্করের 'শিশা-লাগানো 'টপ্‌পর'-দেওয়া গাড়িতে চড়িবার সুযোগ পাইয়া সত্যই সে উল্লসিত হইয়া উঠিল। অমিয়া তাহাকে একটি রঙিন শাড়ি কিনিয়া দিল। সে কিন্তু আরও বেশি খুশি হইল অমিয়ার অর্ধেক-খালি তরল আলতার শিশিটা পাইয়া, হাতে যেন স্বর্গ পাইল। আর কোনো আপত্তি করিল না, শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল।

পল্লীজীবনের এই সব অতি তুচ্ছ ঘটনার ভিতর দিয়া শঙ্করের দিনগুলি কাটিতেছিল। ঠিক নিরুদ্বিগ্ন না হইলেও, শান্তিপূর্ণ।

।। সতেরো ।।

কুন্তলা গৃহকর্মে নিমগ্ন ছিল।

উঠানে বসিয়া নিজের হাতেই গরুর জাব কাটিতেছিল। বাংলাদেশ হইতে জাব কাটিবার একটা বঁটি সে আনাইয়া লইয়াছে। এ দেশের 'গড়াসা' তাহার পছন্দ নয়। বর্তমানে তাহার দৈনন্দিন জীবন সে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে যে, ভোর পাঁচটা হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত তাহার কোনো অবসর নাই। ইচ্ছা করিয়াই কোনো অবসর সে রাখে নাই। ভোর পাঁচটায় সে ওঠে। উঠিয়াই প্রথমে ঘর বারান্দা উঠান স্বহস্তে ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করে। প্রতি ঘরের

চৌকাঠে জল ছিটায়, গোবর দিয়া রান্নাঘরটা নিকাইয়া ফেলে। তাহার পর গোয়াল পরিষ্কার করিয়া, গরুকে খাইতে দিয়া, বাসনগুলি মাজে। এতদিন একটা বুড়ি ঝি ছিল, কিন্তু সে এখন নিতান্ত বুড়ি হইয়া পড়িয়াছে, চোখে দেখিতে পর্যন্ত পায় না। ইচ্ছা করিয়াই কুন্তলা নূতন কোনো ঝি রাখে নাই। সে নিজেই সব করিবে। বাসন মাজা হইয়া গেলে সে স্নান করে, স্নানান্তে পূজার ঘরে ঢোকে। পূজা সারিয়া রান্না শুরু করে। বেলা বারোটার পূর্বে হরিহরের খাইবার অবসর হয় না। স্নান, আহ্নিক, পৌরোহিত্য, সামান্য বৈষয়িক কাজকর্ম প্রভৃতি দৈনিক কর্তব্যগুলি করিতে বারোটাই বাজিয়া যায়। সুতরাং রান্না খাওয়া শেষ করিতে কুন্তলার প্রায় একটা বাজে। ইহার পর ঘণ্টাখানেক সে বিশ্রাম করে। বিশ্রামের পর খানিকক্ষণ পড়াশোনা, খানিকক্ষণ চরকা। পাঁচটার সময় গরুর জাব কাটে। গরু চরিয়া ফিরিয়া আসিলে স্বহস্তে তাহার জাব পর্যন্ত সে মাখিয়া দেয়। ন্যাংড়া নামক যে বালকটি গরু চরায়, সে অবশ্য খানিকটা সাহায্য করে, না করিলেও কিছু ক্ষতি হইত না। কুন্তলা কিছুতেই দমিত না। গরুর সেবা করিয়া আবার ঠাকুরঘর, আবার রান্নার আয়োজন। বৈকালের দিকে রান্নাটাকে সে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়াছে। সন্ধ্যা আটটার মধ্যেই সব শেষ করিয়া ফেলে। আটটার পর বাহিরের বারান্দায় পাড়ার অনেকে সমবেত হন, হরিহর ভাগবত পাঠ করেন। কুন্তলাও কিছুদিন হইতে রোজ সেখানে বসিতেছে। পিসিমা যতদিন ছিলেন, ততদিন অবশ্য এসব কিছু ছিল না। তখন হরিহর পাড়ার মুনশিজির সহিত দাবা খেলিতেন। কুন্তলা পিসিমার খুঁটিনাটি কাজ করিয়া দিত এবং পিসিমার সঙ্গেই গল্পগুজব করিত। পিসিমার গল্পের প্রধান বিষয় ছিল হরিহরের পিতা ত্রিপুরেশ্বর এবং হরিহর। হরিহরের বাল্য-জীবনের কথা, ত্রিপুরেশ্বরের জীবনের অলৌকিক নানা কাহিনী পিসিমা সবিস্তারে বলিয়া যাইতেন, বার বার বলিয়াও যেন শেষ করিতে পারিতেন না, শেষ করিয়াও যেন তৃপ্তি হইত না। কুন্তলা ময়দা মাখিতে মাখিতে বা ক্ষীরের ছাঁচ তুলিতে তুলিতে স্মিতমুখে সে সব গল্প শুনিত। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত বটে, কিন্তু প্রাণপণে চেষ্টা করিত যাহাতে অন্যমনস্ক না হয়। পিসিমা সম্প্রতি কাশীবাস করিয়াছেন। তাঁহার এক বোনপো কাশীতে বাড়ি করিয়া তাঁহাকে সেখানে লইয়া গিয়াছে। সেখানেই পিসিমা এখন কিছুকাল থাকিবেন। যে হরিহরকে বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ করিয়াছেন, তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার একটু কষ্ট হইয়াছিল বইকি। কিন্তু সমস্ত হিন্দু নারীর মনে যে ভাব শেষ পর্যন্ত প্রবল হয়, তাহা তাঁহার মনেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মায়া তো একদিন কাটাইতেই হইবে, পরকালের কাজটাও তো করা দরকার, কতদিন আর সংসারের ঝঞ্ঝাটে জড়াইয়া থাকিবেন তিনি? বাবা বিশ্বেশ্বর এরকম একটা সুযোগ যখন ঘটাইয়া দিয়াছেন, তখন তাহা ত্যাগ করা কি উচিত? তবু তাঁহার মনে কিছু খুঁতখুঁতানি ছিল, বউমা একা সংসার চালাইতে পারিবে কি? হাজার এম. এ. পাস করুক ছেলেমানুষ তো, সংসারের কতটুকু বোঝে! কুন্তলা চুপ করিয়া থাকিত। কাশী যাওয়ার সপক্ষে কিছু বলিলে পাছে পিসিমা ভাবেন, বউ তাঁহাকে কাশীতে বিদায় করিয়া দিয়া নিজেই সংসারের কর্ত্রী হইবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। কিছুকাল দোটানার মধ্যে থাকিয়া পিসিমা নিজেই অবশেষে মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন। হিন্দু বিধবার পক্ষে কাশীবাসের প্রলোভন সম্বরণ করা কঠিন। পিসিমা কাশী চলিয়া গেলে সন্ধ্যার পর কুন্তলার বড় একা একা বোধ হইত। পাড়া-বেড়ান স্বভাব তাহার

নয়। পড়িতেও ইচ্ছা করে না একা একা। তাই সে হরিহরকে বলিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যায় ভাগবতপাঠের আয়োজন করিয়াছে। এ প্রস্তাবে মুনশিজিও বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করাতে হরিহর রাজি হইয়াছেন। রাত্রি দশটা পর্যন্ত ভাগবতপাঠ হয়। তাহার পর আহারাদি করিয়া কুন্তলা শুইয়া পড়ে। এই তাহার বর্তমান দৈনন্দিন জীবন। একেবারে নিশ্ছিদ্র। ইচ্ছা করিয়াই সে কোনো ছিদ্র রাখে নাই। ছিদ্র থাকিলেই নানা ভাবনা আসিয়া জোটে। অসংখ্য আশা আকাঙ্ক্ষা কল্পনা মনে নিম্নস্তর হইতে উঠিয়া আসিয়া অদ্ভুত দিবাস্বপ্ন রচনা করে। চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। যে জীবনকে সে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছে, সে জীবনের মহিমায় যেন সন্দেহের ছায়াপাত না হয়। না, কোনোরূপ অশান্তিজনক স্পপ্নবিলাসের সুযোগ নিজেকে সে কিছুতেই দিবে না, যে জীবন সে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই হিন্দু নারীর আদর্শ জীবন। সর্বতোভাবে সে আদর্শের উপযুক্ত তাহাকে হইতে হইবে, কায়মনোবাক্যে সে আদর্শ-জীবনের মহত্ত্বকে স্বীকার করিতে হইবে, কোনোরূপ অনুশোচনার অবসর সে দিবে না, কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিবে। আচরণ দ্বারা তো নহেই, মনে মনেও সে স্বীকার করিবে না যে, ভুল করিয়াছে। ভুল সে করে নাই। ইহাই ভারতবর্ষীয় নারীর আদর্শ। এই আদর্শের উপযুক্ত হইতে হইবে, কষ্ট হয় হোক। যে কোনো মহৎ সাধনা করিতে হইলেই কষ্ট করিতে হয়।

তবু মাঝে মাঝে সুধাংশুকে মনে পড়ে। কলেজ জীবনে সুধাংশুকে সত্যই তাহার ভালো লাগিয়াছিল। যেমন তাহার সৌম্য মূর্তি, তেমনই আচরণ, তেমনই বিদ্যাবত্তা। দূর হইতেই সে তাহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিল, উপযাচিকা হইয়া অন্য মেয়েদের মত ছলে ছুতায় তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে নাই। তাহার সহিত একটা কথা পর্যন্ত বলে নাই। তাহার সহপাঠিনীদের মর্যাদাবোধের অভাব চিরকাল তাহাকে পীড়া দিয়াছে। কাপড়, গহনা, সিনেমা, পুরুষের সঙ্গ প্রভৃতি অতি তুচ্ছ ব্যাপারই যেন তাহাদের নিকট বড়। আত্মসম্মানের যেন কোনো মূল্য নাই। অতি তুচ্ছ মুল্যেই নিজেকে বিকাইয়া দিতে সকলে প্রস্তুত। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাটাই আমাদের কেমন যেন আত্মগৌরবশূন্য করিয়া তুলিয়াছে—এই কথাই কলেজে পড়িবার সময় বারবার তাহার মনে হইত। আমাদের যেন কিছু নাই। আমাদের ধর্ম পৌত্তলিকতাময়, আমাদের সমাজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আমাদের সমস্ত সামাজিক নীতি সুবিধাবাদী ব্রাহ্মণদের কারসাজি মাত্র! বিদেশি ধর্মকে, বিদেশি সমাজকে, বিদেশি নীতিকে, বিদেশি বুলিকে নকল করিতে না পারিলে আমাদের যেন আর মুক্তি নাই! নোবেল প্রাইজ না পাইলে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করিব না, বিলাত-ফেরত না হইলে কৌলিন্য-মর্যাদা দিব না, বিলাতি নজির না থাকিলে দেশি কোনো কিছু বিশ্বাস করিব না—এই হেয় মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে সে চিরকাল উদ্যত-প্রহরণ। এইজন্যই সে সুধাংশুর নামোল্লেখ পর্যন্ত কাহারও কাছে করে নাই. সুধাংশু জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহাদের পালটি ঘরও, চেষ্টা করিলে অনায়াসেই তাহার সহিত বিবাহ হইতে পারিত। কিন্তু 'চেষ্টা' করিয়া বিবাহ করার ব্যাপারটায় একটা বিদেশি গন্ধ আছে বলিয়া সে চেষ্টাই সে করে নাই। সত্য বটে, এই ভারতবর্ষে পূর্বে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিবার নিয়ম ছিল। সীতা, সাবিত্রী, উষা, দময়ন্তী—সকলে পছন্দ করিয়াই বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের আচরণে এমন শিকারি-মনোবৃত্তি ছিল না। আজকাল মেয়েরা যাহা করে, তাহা ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরার মত মর্যাদাহীন ব্যাপার। ধৃত মৎস্যটি যদি রুই কাতলা না হয়, তাহা হইলে

সেটিকে ছাড়িয়া দিয়া অভিজাত মৎস্যের উদ্দেশ্যে আবার নতুন টোপ ফেলা হয়। বর্তমান যুগের অর্থশাসিত বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় প্রেমের সে মহিমা আর নাই। কেবলমাত্র প্রেমের জন্যই আজকাল কেহ প্রেমাস্পদকে বিবাহ করিতে রাজি হয় না, যদি না তাহার সহিত একটি সুরঞ্জিত 'ফিউচার' জড়িত থাকে। সুধাংশুর সহিতও একটি সুরঞ্জিত 'ফিউচার' জড়িত ছিল। বিশেষ করিয়া এই জন্যেই কুন্তলা তাহাকে এড়াইয়া চলিত। পাছে কেহ মনে করে যে, ধনী সন্তান সুধাংশুকে সে রূপের টোপ ফেলিয়া গাঁথিবার চেষ্টা করিতেছে। সুধাংশু যদি দরিদ্র হইত, যদি সে বিলাতি ডিগ্রি অর্জন করিয়া বড় চাকুরি করিবার স্বপ্ন না দেখিত, যদি সে ব্রাহ্মণোচিত নিরাসক্তিতে দারিদ্র্যকেই বরণ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণের কর্তব্যকেই জীবনে প্রাধান্য দিত, তাহা হইলে কুন্তলা হয়তো তাহাকে স্বামিত্বে বরণ করিবার জন্য চেষ্টা করিত। ব্রাহ্মণ-কন্যা সে, পছন্দ করিয়া যদি বিবাহ করিতে হয় সত্যকার ব্রাহ্মণকেই সে পছন্দ করিবে। কিন্তু সে রকম ব্রাহ্মণ একজনও তো তাহার চোখে পড়িল না। সকলেই অর্থগৃধ্নু। কেহ কেহ ব্রাহ্মণত্বের মুখোশ পরিয়া রহিয়াছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের আদর্শে কেহই জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। প্রেমের অঞ্জলি, শ্রদ্ধার অর্ঘ্য কাহার চরণে দিবে সে? ব্রাহ্মণ-কন্যা হইয়া টাকার লোভে একটা বৈশ্যকে ভুলাইতে হইবে? ইহা করা অপেক্ষা বর্তমান যুগের সম্প্রদান-প্রথায় আত্মসমর্পণ করিয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা ঢের বেশি আত্মসম্মানজনক। সম্প্রদানপ্রথার অন্তর্নিহিত ভাব সত্যই মহত্ত্বপূর্ণ। যে কন্যা সর্বশ্রেষ্ঠ রত্নের সঙ্গে উপমিত, সেই কন্যাকে লালনপালন করিয়া স-দক্ষিণা সৎপাত্রে দান করার মধ্যে যে আভিজাত্য আছে, তাহা কি তুচ্ছ করিবার মত? বর্তমান যুগের বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্ত্য আবহাওয়ায় (যে আবহাওয়ায় অর্থই পরমার্থ) পণপ্রথা-দুষ্ট হইয়া সে উদারতা চর্চা করা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই! কিন্তু তবু তাহা যে মহত্ত্বপূর্ণ, এ কথা কে অস্বীকার করিবে! এখনও আমাদের দেশের ভদ্রসমাজ এত কষ্টে পড়িয়াও এই উদার প্রথাকে অবলম্বন করিয়া আছে, কন্যা-বিক্রয়ের হীনতা স্বীকার করে নাই। তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত সমাজেই কন্যারা আজকাল নিতান্ত দেহের তাগিদে এবং বিলাস-লালসায় মত্ত হইয়া বৈশ্যের কামবহ্নিতে নিজেদের ইন্ধন দিবার জন্য লোলুপ হইয়া উঠিয়াছে পাশ্চাত্ত্য সমাজের নকল করিয়া। কুন্তলা এ হীনতা স্বীকার করে নাই। পিতার হস্তেই বিবাহের সম্পূর্ণ ভার ছাড়িয়া দিয়াছিল।...তবু সুধাংশুর মুখখানা মাঝে মাঝে তাহার মনে পড়ে। পড়ুক, সুধাংশু তাহার কেহ নহে। হরিহরের সহিত তাহার তুলনা পর্যন্ত সে করিবে না। হরিহর তাহার স্বামী, আরাধ্য দেবতা, শুধু ইহকালের নয়, পরকালের সম্বল।

কুন্তলার সহিত হরিহরের বিবাহের ইতিহাসটিও ঈষৎ অদ্ভুত। কুন্তলার উগ্র আত্মমর্যাদাবোধের জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। হরিহরের পিতা স্বর্গীয় ত্রিপুরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এ অঞ্চলে 'ঠাকুর-বাবা' নামে প্রসিদ্ধ। জনশ্রুতি, তিনি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। হীরাপুরের জগদ্ধাত্রী-মন্দিরের পুরোহিত অপুত্রক অবস্থায় মারা যাইবার পর প্রাক্তন জমিদার রাজবল্লভ রায় স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া ত্রিপুরেশ্বরকে বর্ধমান জিলার এক গ্রাম হইতে সন্ধান করিয়া লইয়া আসেন এবং হীরাপুরের জগদ্ধাত্রী-মন্দিরের পুরোহিতরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে ঠাকুর-বাবা একমাত্র মাতৃহীন পুত্র হরিহর ও বিধবা ভগ্নীটিকে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং জমিদার-প্রদত্ত নিষ্কর জমিজমার সাহায্যে হীরাপুরে বসবাস করিয়াছিলেন।

ঠাকুর-বাবার বিষয়ে অনেক অলৌকিক গল্প এ দেশে প্রচলিত আছে। তিনি নাকি ভূতপ্রেতের সহিত কথাবার্তা কহিতেন, শীতকালে পাকা আম কাঁঠাল আনাইয়া দিতে পারিতেন। অনেক পরী নাকি তাঁহার বাধ্য ছিল। অনেকে স্বচক্ষে নাকি দেখিয়াছেন, স্বচ্ছ-বসনা জ্যোৎস্না-বরণা পরী মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে ডানা মেলিয়া উড়িয়া যাইতেছে। লোহাকে সোনা করার ক্ষমতাও নাকি তাঁহার ছিল। কিন্তু এ বিদ্যা একটিবার ছাড়া কখনও তিনি কাজে লাগান নাই। তিনি সত্যই সন্ন্যাসী ছিলেন। স্বর্ণ এবং লৌহ তাঁহার নিকট তুল্যমূল্য ছিল। একবার কেবল একটি দরিদ্র বৃদ্ধার লোহার খুন্তিটিকে তিনি সোনার করিয়া দিয়াছিলেন। বৃদ্ধা অর্থাভাবে তাহার একমাত্র পুত্রের চিকিৎসা করাইতে পারিতেছিল না এবং ঠাকুর-বাবাকে আসিয়া ধরিয়াছিল তাহাকে নিরাময় করিয়া দিবার জন্য। ঠাকুরবাবা বলিয়াছিলেন, নিয়তি কাহারও বাধ্য নয়, যাহা অদৃষ্টে আছে তাহা ঘটিবেই, তুমি কর্তব্য কর, পুত্রের চিকিৎসা করাও, তাহার পর জগজ্জননীর যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। বৃদ্ধা অর্থাভাবের কথা জানাইলে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, তোর যদি কোনো লোহার বাসন থাকে, পরিষ্কার করিয়া মায়ের পায়ের তলায় রাখিয়া যা, মায়ের যদি দয়া হয় লোহাকে সোনা করিয়া দিবেন। বুড়ির প্রকাণ্ড একটা লোহার কড়া ছিল সেইটা পরিষ্কার করিয়া দিলেই হইত, কিন্তু বোকা বুড়ি তা না করিয়া খুন্তিটা দিয়া আসিয়াছিল। বুড়ি বোধ হয় ঠাকুর-বাবার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে নাই। পরদিন কিন্তু বুড়ির বিস্ময়ের অবধি রহিল না, মায়ের পদস্পর্শে লোহা সত্যই সোনা হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর-বাবা বুড়িকে এ কথা প্রকাশ করিতে মানা করিয়াছিলেন। কিন্তু বুড়ি কি এত বড় একটা সংবাদ চাপিয়া রাখিতে পারে! বেশি লোককে সে অবশ্য বলে নাই। কেবল নিজের ভোজাইকে, পিতিয়াকে এবং তেতরিকে বলিয়াছিল। তাহার এই অবাধ্যতার ফলও অবশ্য ফলিয়াছিল, ছেলেটি বাঁচে নাই। এই সংবাদে আকৃষ্ট হইয়া অনেকে ঠাকুর-বাবার নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু ঠাকুর-বাবা কাহাকেও আর আমল দেন নাই। সকলেই চলিয়া গিয়াছিল, যায় নাই কেবল ঝক্সু। বলিষ্ঠ দুর্দান্ত ঝক্সু জাতিতে লোহার। স্বচক্ষে সে সুবর্ণময় খুন্তিটি দেখিয়াছিল। অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াও যখন ঠাকুর-বাবার নিকট হইতে সে সোনা করিবার মন্ত্রটি আদায় করিতে পারিল না, তখন কি যে তাহার মনে হইল, ঠাকুর-বাবার আশ্রয় সে আর ত্যাগ করিল না। আজীবন তাঁহার আশ্রয়েই থাকিয়া গেল। দুর্দান্ত মাতাল দুর্দান্ত কর্মীতে পরিণত হইল। ঝক্সু তাহার মোটা বুদ্ধি দিয়া এইটুকুই বোধ হয় বুঝিয়াছিল যে, ফাঁকি দিয়া অর্থোপার্জন করা পাপ। তাহা না হইলে ঠাকুর-বাবা নিজেই ঐশ্বর্যবান হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা হন নাই। তিনি নিজের কয় বিঘা জমি হইতে উৎপন্ন শস্য এবং শিষ্যদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সামান্য দক্ষিণা লইয়াই তো সন্তুষ্টচিত্তে মায়ের সেবা করিতেছেন।

এই ঠাকুর-বাবার পুত্র হরিহর স্থানীয় স্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন অবধি পড়িয়াছিলেন। কাজ-চলা-গোছের ইংরেজি বিদ্যা লাভ করিয়া পিতার নির্দেশে তাঁহাকে সংস্কৃত অধ্যয়নে মনোযোগ করিতে হইয়াছিল। খাঁটি স্বদেশি ছাঁচে ঠাকুর-বাবা পুত্রটিকে মানুষ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ পুরুষ, টানা চোখে প্রশান্ত দৃষ্টি, ক্ষৌরীকৃত মুখমণ্ডলে শুচিতা যেন মূর্ত হইয়া আছে। নগ্ন গাত্রে এক গোছা শুভ্র উপবীত, মস্তকে গোক্ষুর-পরিমাণ শিখা বিদেশাগত আধুনিকতার বিরুদ্ধে মূর্তিমান বিদ্রোহের মত বিরাজ করিতেছে। অথচ লোকটি রবীন্দ্রনাথের গোরার মত

উগ্র নয়, কথায় কথায় বক্তৃতা দিবার আবেগ তাঁহার জাগে না। অতিশয় স্বল্পভাষী মৃদু-প্রকৃতির লোক। নিজেকে লোকচক্ষু হইতে যথাসম্ভব অবলুপ্ত করিয়া রাখাই যেন তাঁহার সাধনা। অধিকাংশ সময়ই মন্দিরে থাকেন, পূজা এবং পড়াশোনা করা ছাড়া অন্য কোনো কাজ নাই। শিষ্যবাড়ির আহ্বানে অথবা কোথাও কথকতা করিবার জন্য বিশেষ অনুরুদ্ধ হইলে নিতান্ত অনিচ্ছা ও সঙ্কোচ সহকারে কাঁধে চাদরটি ফেলিয়া ক্বচিৎ কখনও তিনি বাহির হন। ফসল উঠিবার সময়ও মাঝে মাঝে তাঁহাকে বাহির হইতে হইত, কিন্তু কুন্তলা আসিবার পর হইতে বৈষয়িক সমস্ত ব্যাপারের ভার তাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। এই নিরীহ ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের সহিত এম. এ. পাস কুন্তলার বিবাহ সম্ভবপর হইয়াছিল ত্রিপুরেশ্বরের সহিত কুন্তলার পিতার আলাপ ছিল বলিয়া। শুধু আলাপ নয়, কুন্তলার পিতা ইংরেজিশিক্ষিত অধ্যাপক হইলেও ত্রিপুরেশ্বরের একজন ভক্ত ছিলেন। কুন্তলার মা-ও ত্রিপুরেশ্বরকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করিতেন। ত্রিপুরেশ্বরই নাকি একবার বালিকা কুন্তলাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, মেয়েটি খুব সুলক্ষণা, আমার হরুর সঙ্গে এর বিয়ে দাও তো বড় খুশি হই। কুন্তলার পিতা মাতা উভয়েই তখন এ প্রস্তাবে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন, কুন্তলাও কথাটা শুনিয়া মনে মনে একটা স্বপ্ন-রচনা করিয়াছিল। কিন্তু কথাটা তখন চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। কিছুদিন পরে ত্রিপুরেশ্বর পত্রযোগে আবার এ প্রস্তাব করেন। কুন্তলার পিতা পত্রের উত্তরে লেখেন, কুন্তলা হরিহর উভয়েই এখন পড়িতেছে, উহাদের পড়াশোনা শেষ হইলে শুভকর্ম সমাধা করা যাইবে। বিবাহ ঠিক করাই রহিল। কিন্তু কুন্তলা এমন ভালোভাবে পড়াশোনা এবং পাস করিতে লাগিল যে, তাহার বাবা পড়া বন্ধ করিতে পারিলেন না। কুন্তলা যখন আই. এ পড়িতেছে, তখন তাহাকে একদিন বলিলেন, হরিহরের সঙ্গে কিন্তু তোর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করা আছে, বিয়ে করবি তো? কুন্তলার মন তখনও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মোহে মুগ্ধ। সবাই যেমন বলে তেমনই বলিল, পড়াশোনা শেষ করে তারপর বিয়ের কথা। ইতিমধ্যে ত্রিপুরেশ্বর মারা গেলেন। হরিহরকে ত্রিপুরেশ্বর বিবাহের কোনো কথাই বলিয়া যান নাই, বিবাহ সম্বন্ধে হরিহরেরও বিশেষ তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না। পিসিমাই মাঝে মাঝে কেবল ব্যগ্র হইতেন। এদিকে কুন্তলা যখন এম. এ. পাশ করিয়া ফেলিল, তখন তাহাকে একটা গ্রাম্য পুরোহিতের হস্তে সমর্পণ করিতে কুন্তলার বাবা একটু যেন ইতস্তত করিতে লাগিলেন। কুন্তলার মায়েরও কেমন যেন অনিচ্ছা দেখা যাইতে লাগিল। কুন্তলার আত্মমর্যাদাবোধ তখন উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। সে বলিল, ওঁদের সঙ্গে যখন কথা হয়ে আছে, সে কথার নড়চড় করা অভদ্রতা হবে। ওঁদের একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত, ওঁরা যদি আপত্তি করেন, আমাদের তা হলে আর কোনো দায়িত্ব থাকবে না।

কুন্তলার মা বলিলেন, ছেলেটি তো মোটে ম্যাট্রিক পাস শুনছি। ওর সঙ্গে তোর মানাবে কেন?

কুন্তলা হাসিয়া জবাব দিয়াছিল, বাবা এম. এ., পি এইচ-ডি, আর তুমি তো একেবারে নিরক্ষর, তোমাদের কি মানায়নি? আমি এম. এ. পাস করেছি বলে কি তোমাকে মা বলে সম্মান করব না? পাস করাতে কি এসে যায়!

কুন্তলার বাবা বলিলেন, ইংরেজি তেমন না জানলেও ছেলেটি সংস্কৃতে বেশ পণ্ডিত। ঘরে খেতে-পরতেও আছে। একশো বিঘের ওপর ভালো জমি, দেশেও ধেনো জমি আছে।

সেদিকে কিছু খারাপ নয়, অত বড় বংশ, ছেলেটিও বেশ সুস্থ সচ্চরিত্র। আমি কেবল তোর কথা ভেবেই একটু দোনোমনো করছিলাম।

আমার কোনো আপত্তি নেই।

পত্র পাইয়া হরিহর অবাক হইয়া গেলেন। তিনি ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিতেন না। মেয়ে এম. এ. পাস শুনিয়া পিসিমা নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, ও মা, তা হলে সে তো মেয়ে নয়, মেমসাহেব! চশমা গাউন পরে রুজ পাউডার মেখে বাহার দিয়ে জুতো খটখটিয়ে বেড়াবে খালি। একবার কলকাতায় দেখেছিলাম এক এম. এ. পাশ মেয়েকে, বাবা রে বাবা, সে কি ছিরি তার! হাতে ব্যাগ, পায়ে জুতো, চোখে চশমা, ঘাগরা করে কাপড় পরা! মুখখানি কিন্তু এরই সঙ্গে শুকনো আমসির মত, তার ওপর আবার রুজ পাউডার।

ভীত হরিহর অসহায়ভাবে বলিলেন, বাবা কিন্তু এরই সঙ্গে কথা দিয়ে গেছেন যে!

কথা দিয়ে গেছেন? কি করে জানলি তুই?

বাবার চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁরা।

এ যুক্তি অকাট্য। উভয়েই চিন্তিতভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। বাক্যস্ফূর্তি হইলে পিসিমা অবশেষে বলিলেন, এক কাজ কর না হয় তুই, গুরুঠাকুরকে চিঠি লেখ। তিনি জ্যোতিষীও বটেন, তোর কুষ্ঠিবিচার করে সৎপরামর্শ দেবেন। এ তো মহা মুশকিলে পড়া গেল বাপু!

হরিহর তাহাই করিলেন। কয়েকদিন পরে কুলগুরু শিবশঙ্কর শর্মার উত্তর আসিল। তিনি লিখিয়াছেন, তোমার পিতা যদি যথার্থই বাগ্‌দান করিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে সত্যই অধর্ম হইবে জানিও। তোমার কোষ্ঠী বিচার করিয়া তোমার বধূর যে বর্ণনা উদ্ধার করিলাম, তাহা জানাইতেছি। বাগ্‌দত্তা কন্যাটির সহিত যদি মিলিয়া যায়, তুমি নির্ভয়ে বিবাহ করিতে পার। বুঝিও, ইনিই তোমার বিধি-নির্দিষ্টা সহধর্মিণী। কন্যাটি গৌরবর্ণা, নাতিদীর্ঘাঙ্গী, বিদুষী ও অচপলা হইবে। চরিত্রের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রখরতা থাকিতে পারে, কিন্তু স্থিরপ্রজ্ঞাশালিনী ও চারিত্রিক শক্তিসম্পন্ন হওয়াতে তাহা দুঃখের হেতু না হইয়া আনন্দেরই কারণ হইবে। কন্যার নামের আদ্যক্ষর 'ক' হওয়া উচিত; কন্যার পিতা সম্ভবত অধ্যাপক। তোমার একটা অপমৃত্যু-যোগ আছে দেখিতেছি, কন্যার কোষ্ঠিতে ইহার কোনো কাটান আছে কি না, জানি না। যাই হোক, বিধাতার বিধান অলঙ্ঘনীয় অদৃষ্টও দুরতিক্রম্য। আমার মতে পিতৃ-আদেশ পালন করাই তোমার কর্তব্য।

বর্ণনার সহিত অনেকটা যখন মিলিয়া গেল, তখন হরিহর এবং হরিহরের পিসিমা বুঝিলেন, গত্যন্তর নাই, ভবিতব্যকে মানিতেই হইবে।

বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহ করিয়া হরিহর যেদিন গ্রামে আসেন, সেদিন হরিহরের পিসিমা কম্পিতবক্ষে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, পালকির ভিতর হইতে শেমিজ-কামিজ-জুতা-পরা কি অদ্ভুত জীবই না জানি বাহির হইবে। হয়তো প্রমাণ না করিয়া শেকহ্যান্ড করিতে যাইবে, হয়তো বা বাড়িতে পা দিতে না দিতেই হরিহরের হাত ধরিয়া বলিবে, চল, ফাঁকা মাঠে হাওয়া খাইয়া আসি, বিকালে বেড়ানো আমার অভ্যাস। কিন্তু পালকির ভিতর হইতে যখন চেলী পরিহিতা অবগুণ্ঠনবতী নতমুখী সিঁথি-মউর-শোভিতা অলক্তক-চরণা কুন্তলা সসঙ্কোচে বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহার

পদধূলি লইল, তখন আনন্দে বিস্ময়ে তিনি কাঁদিয়াই ফেলিলেন। যতদিন সংসারে ছিলেন, তাঁহার সে বিস্ময় এবং আনন্দ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছিল। কুন্তলার প্রশংসায় তিনি শতমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বউ শুধু এম. এ. পাশই নয়, শাক চচ্চড়ি সুক্তো হইতে আরম্ভ করিয়া সব রকম রান্না করিতে জানে, বড়ি দিতে পারে, চমৎকার আলপনা দেয়, চরকা কাটে, এমন কি ইতুপূজা পর্যন্ত জানে। হরিহরের মনেও যে ভয়টা হইয়াছিল, তাহা অল্প পরিচয়েই কাটিয়া গেল। তিনি নিঃসংশয়ে বুঝিলেন যে, ব্রাহ্মণ-গৃহিণী হইবার যোগ্যতা কুন্তলার আছে। ইহা লইয়া বেশি উচ্ছ্বসিত অবশ্য তিনি হন নাই, বিবাহরূপ কর্তব্যকর্ম সমাপন করিয়া নিজের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় সহজভাবেই চলিতেছিলেন। ইহাই কুন্তলার বিবাহের ইতিহাস।

কুন্তলা জাব কাটিতেছিল।

ঝক্সুর পুত্র রামলাল একটি খাতা ও বই লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথার চুল বেশ কায়দা-দুরস্ত করিয়া ছাঁটা। গায়ে হাফশার্ট এবং হাফশার্টের হাতা হইতে আধুনিক রীতিতে ছোট একটা ত্রিভুজাকৃতি অংশ বাদ দেওয়া। পায়ে বক্‌লস-শোভিত জুতা। সে যে ঝক্সুর পুত্র, তাহা না জানিলে বোঝা শক্ত। এবারে সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবে। বহুমাইজির নিকট পড়া বলিয়া লইতে আসিয়াছে। রোজ আসে। সে বারান্দায় উঠিয়া বসিল এবং গতকল্য কুন্তলা যে যে অংশগুলি অনুবাদ করিতে দিয়াছিল, তাহা পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে বিরক্তিতে কুন্তলার ভ্রূকুঞ্চিত হইয়া উঠিল। অজস্র ভুল। রামলালকে লইয়া আর পারা গেল না। সংস্কৃত ভাষায় বিশেষণেরও যে লিঙ্গ আছে, এই সামান্য কথাটা কিছুতেই ইহার মাথায় ঢুকিবে না। জাব কাটিতে কাটিতেই কুন্তলা সংশোধন করিতে লাগিল।

।। আঠারো ।।

মাঘ মাসের শীত। সকাল হইতে একটা প্রখর পশ্চিমে হাওয়া উঠিয়াছে। আকাশ পরিষ্কার স্বচ্ছ নীল, রৌদ্রকিরণে চতুর্দিক ঝলমল করিতেছে, তবু কনকনে শীত, হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিতেছে। আঙুলের ডগাগুলি বরফ-শীতল। গায়ে গেঞ্জি, সার্জের পাঞ্জাবি, মোটা সোয়েটার, তবু শীত করিতেছে। শঙ্কর উঠিয়া ওভারকোটটা গায়ে দিল।

ছিত করচে।

খুকি মন্তব্য করিল। খুকির শীত নাই। একটা সাধারণ জুট-ফ্ল্যানেলের ফ্রকই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। ঘরের কোণে একটি টুলের ওপর বসিয়া এবং আর একটি উচ্চতর টুলের ওপর খাতা রাখিয়া একটি পেন্সিল সহযোগে সে হিজিবিজি কাটিতেছিল। লিখিবার সময় শঙ্কর যেমনভাবে বসে, ঠিক তেমনিভাবে একটু ঝুঁকিয়া টুলের উপর বাম কনুইয়ের ভর দিয়া বসিয়াছে। যদিও আজকাল কাগজ পেন্সিল দুর্মূল্য তবু তাহাকে একটা ছোট পেন্সিল এবং পুরাতন খাতা দিতে হইয়াছে। সে চিঠি লেখে। বাবা যাহা যাহা করে, সব তাহার করা চাই। এমন কি, পোড়া সিগারেটের টুকরো কুড়াইয়া সে বাবার মত 'ছিগ্‌লেট'ও খায়।

বড্ড শীত করছে।

তা কাবে।

খাব।

মাকে বলে আতি।

পাকা গৃহিণীর মত মুখ করিয়া খুকি রান্নাঘরের উদ্দেশে চলিয়া গেল।

শঙ্কর খবরের কাগজটি মুড়িয়া রাখিয়া দিল। এতক্ষণ সে খবরের কাগজ পড়িতেছিল। জাপান ও জার্মানির যুদ্ধোদ্যম আশঙ্কাজনক। ভারতবর্ষের যুদ্ধে যোগদান করা উচিত কি না, ইহা লইয়া নেতাদের মধ্যে বিতণ্ডা চলিতেছে। উচিত কি? শঙ্কর ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। খানিকক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। ক্ষণপরেই মনে হইল, আদার ব্যাপারি শুধু শুধু জাহাজের ভাবনা ভাবিয়া মরিতেছি কেন? যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানও যেমন তাহার অসম্পূর্ণ, সম্পর্কও তেমনই অসংলগ্ন। বহু সহস্র মাইল দূরে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইতেছে, এ দেশের উলুখড়দেরও আপাতত চিন্তিত হইবার কোনো হেতু নাই। যুদ্ধ এ দেশে উপস্থিত হইলে যথাকর্তব্য চিন্তা করা যাইবে। যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো প্রেরণাই তাহার মনে জাগিল না।

কট কট কট কট কট...

'তাসা' বাজিতেছে। মহরম আসিয়া পড়িল নাকি? এইবার দলে দলে মুসলমান প্রজারা আসিয়া ধারের জন্যে দ্বারে ধর্না দিবে। যে উদ্দেশ্যে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। ঠিক হইয়াছিল যে, চাষের জন্যই চাষীদের ধার দেওয়া হইবে, যাহাতে তাহারা ভালো বীজ, ভালো সার, ভালো গরু কিনিয়া ভালোভাবে চাষ করিতে পারে। ভালো ফসল উৎপন্ন করিতে পারিলে, তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইবে। কার্যকালে কিন্তু দেখা গেল যে, প্রত্যেকটি চাষা ধার চায়—হয় বিবাহের জন্য, না হয় মহাজনদের ধার শোধ করিবার জন্য, কিংবা কোনো পর্ব উপলক্ষে। ভালো ফসল উৎপন্ন করিবার দিকে তাহাদের তত উৎসাহ নাই। তাহারা জানে যে, যত ভালো ফসলই তাহারা উৎপন্ন করুক না কেন, সে ফসল তাহাদের ভোগে কখনও লাগিবে না। তাহা মহাজনে গ্রাস করিবে। যে ঋণজালে তাহারা জড়িত প্রত্যেক বছর ফসল দিয়াই সে ঋণের খানিকটা পরিশোধ করিতে হয়, অনেক সময় মহাজন মাঠ হইতেই ফসল কাটাইয়া লইয়া যায় এবং নিজের খুশিমত একটা মূল্য ধার্য করিয়া দেয়। তাহারা জানে যে, ফসল যত ভালোই হোক, ঋণ কখনও পরিশোধ হইবে না। মহাজন ফসলের দাম যাহা দিবে, তাহাই তাহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই, কারণ ওই মহাজনরাই বিপদে-আপদে টাকা ধার দেয়, মহাজনদের দ্বারেই হাত পাতিয়া জীবন-ধারণ করিতে হয়, মহাজনরাই মালিক। বহু যুগ ধরিয়া কার্যত এই মহাজনদেরই ক্রীতদাস তাহারা। মহাজনদের ঘরে দশ মনের জায়গায় বিশ মন ফসল পৌঁছাইয়া দিলে যদি সত্যই তাহারা ঋণমুক্ত হইতে পারিত, সে চেষ্টা তাহারা নিশ্চয়ই করিত। কিন্তু অধিকাংশ চাষীরই জমি সামান্য, কিন্তু ঋণ প্রচুর। সুদের চক্রবৃদ্ধিতে সে ঋণ পর্বতপ্রমাণ হইয়া রহিয়াছে। সে পর্বত ধূলিসাৎ করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। দেশের আইন তাহাদের অনুকূল নয়, চাষের উন্নতি করিয়া ঋণ-শোধ করিবার আশাও তাহারা করে না। ভালো সার, ভালো গরু, ভালো বীজ লইয়া কি করিবে তাহারা? ঋণমুক্ত হইবে? অসম্ভব। বংশপরম্পরা ধরিয়া এই সত্য তাহারা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছে যে, ঋণ আছে এবং থাকিবে। তাই বলিয়া কি বিবাহ

করিতে হইবে না? হোলি, ছট, দশমীতে, রঙিন নূতন কাপড় পরিতে হইবে না? কোনো সামাজিক অপরাধে হুক্কাপানি বন্ধ হইলে গোতিয়াদের আহারে তুষ্ট করিয়া জাতে উঠিতে হইবে না? ইহাই তো তাহাদের জীবন। চাষের উন্নতির জন্য নয়, এই জীবনকে আঁকড়াইয়া থাকিবার জন্যই তাহাদের টাকার দরকার। এই জীবনের দুঃখ-দুর্দশা হইতে কিছুক্ষণের জন্য অব্যাহতি পাইবার নিমিত্তই তাহারা তাড়ি মদ গাঁজা আফিং খায়। এসব বাদ দিয়া তাহারা বাঁচিবে কিসের আশায়! তাই তোমাদের শুচিবায়ুগ্রস্ত নৈতিক বক্তৃতা তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিলেও মর্মে প্রবেশ করে না। তোমাদের মত তাহারাও জীবনকে ভোগ করিতে চায়। শঙ্কর ইহা বোঝে, তাই আর আপত্তি করিতে পারে না। লিখিত আইন অমান্য করিয়াও ধার দিয়া ফেলে। মহরমের বাজনা শুনিয়া তাই সে মনে মনে বিব্রত হইয়া পড়িল। চাষের মিথ্যা অজুহাতে আবার একদল লোককে একগাদা টাকা দিতে হইবে। অথচ না দিয়াও উপায় নাই। এ এক মহাসমস্যা। এবার কিন্তু সে টাকা দিবে না ঠিক করিয়াছে। সেবার অত টাকা মহাজনদের সিন্দুকে ঢুকিয়াছিল। এবার সে টাকা দিবে না, জিনিস কিনিয়া দিবে। নিপুদা আর নিমাই ঘটক যদি সাহায্য করে, অনায়াসেই উহাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি কিনিয়া দেওয়া যায়। মেয়েদের জিনিস হাসি কিনিতে পারে। হাসিও এক সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে। হাসির তত্ত্বাবধানে ও কার্যকুশলতায় মেয়ে-স্কুলটার বেশ উন্নতি হইতেছিল। কিন্তু জনকয়েক শিক্ষিত বেহারি ভদ্রলোক একটা বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছেন। হাসি 'হিন্দি-নোইং' নয়। কাজ-চলা-গোছ হিন্দি সে অবশ্য শিখিয়াছে, কিন্তু হিন্দি পরীক্ষা পাস না করিলে গভর্নমেন্টের চক্ষে 'হিন্দি-নোইং' হওয়া যায় না। পরীক্ষা পাস করিতে হইবে। হাসি পরীক্ষা দিতে রাজি নয়। যাঁহারা 'হিন্দি-নোইং' শিক্ষয়িত্রীর জন্য আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহারা যে হিন্দি ভাষার প্রতি অথবা বেহারি সংস্কৃতির প্রতি সহানুভূতিবশত করিতেছেন, তাহা নয়। তাঁহাদের সর্ববিষয়ে বাঙালিদের অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া এ ধারণা হয় না যে, স্বকীয় বেহারি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁহারা খুব বেশি অবহিত। এই শিক্ষিত বেহারিগণ বাঙালিদেরই মত চাকুরিলোলুপ, বাঙালি পোশাক পরেন, ছেলেমেয়েদের বাঙালি নাম রাখেন, বাঙালি আহার পছন্দ করেন, বাঙালিদের সাহিত্য হইতে চুরি করেন, কিন্তু বাঙালিদের ভালো দেখিতে পারেন না। ইংরেজি সম্পর্কে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালিদের যে মনোভাব ছিল, বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি সম্পর্কে ইহাদের ঠিক সেই মনোভাব। হাসি যে স্কুলের উন্নতির জন্য এত পরিশ্রম করিতেছে, তাহা ইহাদের নিকট অবান্তর ব্যাপার, আসল কথা—হাসি 'বাঙালিনী', তাহাই তাহার চরম অপরাধ। কোনো একটা ছুতা করিয়া তাহাকে তাই তাড়াইতে হইবে। মেষশাবককে বধ করিবার জন্য নেকড়ে বাঘের ছুতার অভাব কোনো কালে হয় না। শিক্ষা বিভাগের আইনও তাঁহাদের সপক্ষে আছে।

যাহারা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত তাহাদেরই এই মনোভাব। অশিক্ষিত জনসাধারণ হাসিকে ভালোবাসে, ভক্তি করে। শঙ্কর বারংবার এই সত্যটাই নানারূপে উপলব্ধি করিতেছে, যত গলদ যত কলহ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই। শিক্ষাবিভাগের আইনের কবলে নিমাই বেচারাও কবলিত। এই সব কারণে তাহার স্কুলগুলি গভর্নমেন্ট-সম্পর্ক রহিত করিবার ইচ্ছা শঙ্করের কিছুদিন পূর্বে হইয়াছিল। গভর্নমেন্ট যে টাকা সাহায্য করেন তাহা যৎসামান্য, সে সাহায্য না লইয়াও শঙ্কর স্কুলগুলি চালাইতে পারে। কিন্তু অন্য মুশকিল আছে। ইনস্পেক্টর মহাশয়ের

কলমের খোঁচায় কাঁটাপোখর স্কুলটি যখন গভর্নমেন্ট সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল, তখন স্কুলটা উঠিয়াই গেল। অর্থাভাবে নয়, ছাত্র জুটিল না। যে স্কুল হইতে পাশ করিয়া গভর্নমেন্ট 'নোকরি' মিলিবে না, সে স্কুলে কেহ পড়িতে চায় না। কেহই 'শিক্ষা' চায় না, সকলেরই উদ্দেশ্য 'নোকরি'। গভর্নমেন্ট অননুমোদিত 'জাতীয়' স্কুলে ছাত্র জুটিবে না। এ মনোভাব যদিও প্রশংসনীয় নয়, তবু শঙ্কর ভাবিয়া দেখিয়াছে, 'নোকরি'র লোভে তবু খানিকটা শিক্ষা তো হয়, তাহাই মন্দের ভালো। নিমাই আইনত নিজেকে 'কোয়ালিফাই' করিতেছে। মুরগি-মদ-পরিতুষ্ট ইনস্পেক্টর দয়া করিয়া তাহাকে 'টাইম' দিয়াছেন। হাসিকেও রাজি করাইতে হইবে। হাসি দিন দিন কেমন যেন গম্ভীর হইয়া পড়িতেছে। মুখে হাসি নাই, প্রসন্নতা নাই,—চোখে কেমন যেন একটা দৃষ্টি। কোথাও যায় না, কাহারও সহিত মেশে না। নিজের ছেলেকেও কাহারও সহিত মিশিতে দেয় না। নিখুঁত নিষ্ঠার সহিত কর্তব্যটুকু করিয়া নিজের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। অমিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে গিয়াছিল, আলাপ জমে নাই। খুব কম কথা বলে। মনে হয়, সর্বদাই যেন অন্যমনস্ক। কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক সেইটুকুই উত্তর দিয়া চুপ করিয়া যায়। ক্রমাগত প্রশ্ন করিয়া আলাপ জমানো যায় না। অমিয়ার আর হাসির কাছে যাইবার উৎসাহ নাই। সুরমা কিন্তু মাঝে মাঝে যায়। কারণ সুরমার জীবনের একটা নির্দিষ্ট কর্মসূচি আছে, তদনুসারে সে নিয়মিতভাবে সামাজিক কর্তব্যগুলি করিয়া যায়। কবে কাহার বাড়িতে যাইতে হইবে, কাহার বাড়িতে কবে কোন্ খাবারটি পাঠাইতে হইবে, কোন্ মেয়েটিকে কবে কোন্ গানটি শিখাইতে হইবে, কবে কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে—এ সমস্তই সুরমা বাঁধা-নিয়ম অনুসারে করে। ঠিক নিয়মিতভাবে আসন বুনিয়া চলিয়াছে। অথচ উৎপলের সম্বন্ধেও সে উদাসীন নয়, উৎপলের জন্য অন্তত একটি খাবার তাহার নিজের হাতে করা চাই, উৎপলের অনেক চিঠির জবাব সে-ই লেখে। পড়াশোনাও করে। পাড়ার কয়েকজন বাঙালি ও বেহারি মেয়েকে ব্যাডমিন্টন খেলাতেও উৎসাহিত করিয়াছে। কুন্তলার সহিত তর্ক করিবারও অবসর পায়। তুমুল তর্ক করিয়া বন্ধুত্বও অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। অদ্ভুত রকম ছন্দোময় তাহার জীবন। অদ্ভুত রকম মাত্রাজ্ঞান আছে। অমিয়ার সহিত যখন কথা কয়, মনে হয়, শিক্ষায় দীক্ষায় সে অমিয়ারই সমান। ঠিক সমান স্বাচ্ছন্দ্যতার সহিত সে সেদিন পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্টের মেমসাহেবের সহিতও আলাপ করিল। কোথাও কখনও বেসুরো হয় না। সুরমার কর্মতৎপরতায় শঙ্কর মুগ্ধ। বহুকাল পূর্বে এই সুরমাকে ঘিরিয়া তাহার মনে যে মোহ জাগিয়াছিল সে মোহ এখন কিন্তু তার নাই। নিজের স্ত্রীরূপে অমিয়ার স্থানে সুরমাকে সে কল্পনাই করিতে পারে না। সুরমা কারুকার্যমণ্ডিত পালঙ্ক, অমিয়া হয়তো অতি সাধারণ তক্তপোশ। কিন্তু সুনিদ্রার জন্য শঙ্করের পালঙ্কের আর প্রয়োজন নাই, তক্তপোশই যথেষ্ট। বস্তুত পালঙ্কে হয়তো মোটেই নিদ্রা আসিবে না, এ আশঙ্কাও আছে। না, সুরমাকে ঘিরিয়া সে মোহ তাহার আর নাই। তবু সুরমা-চরিত্রে সে মুগ্ধ।

বাবুজি!

দ্বারপ্রান্তে রহিম দেখা দিল। তাহার সহিত পুরণও আসিয়াছে। মহরমে কি কি জিনিস লাগে, তাহারই আলোচনা করিবার জন্য শঙ্কর রহিমকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। শঙ্কর সোজা হইয়া উঠিয়া বসিতেই রহিম এবং পুরণ উভয়েই সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

পুরণের কি খবর?

পুরণ কোনো উত্তর না দিয়া সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া রহিল।

শঙ্কর তখন রহিমকে বলিল, মহরমে তোদের কি কি হয়, বল তো? এবার আর টাকা পাবি না কেউ, জিনিস কিনে দেব ভাবছি। মহরমে কি কি করবি বল?

রহিম নিজের ভাষায় মহরম-পর্ব বর্ণনা করিতে লাগিল।

আমরা যেমন পূজা-পার্বণে একজন পুরোহিত নিযুক্ত করি, উহারাও তেমনই একজন 'মোজাবর' নিযুক্ত করে। 'মোজাবর'কেই সব করিতে হয়। আমাদের দুর্গাপূজায় যেমন ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী আছে, মহরমেও তেমনই আছে। 'ছট্‌মি'র দিন দুইটি কর্তব্য। প্রথম—'কেলা কাট্‌টি'। সকালে কলার গাছ কাটিতে হয়। তাহার পর পাড়ার লোক দল বাঁধিয়া গিয়া 'ইমামবাড়া'তে সমবেত হইয়া সেই কলাগাছ পুঁতিয়া আসে। বৈকালে দ্বিতীয় কর্তব্যটি করা হয়। দ্বিতীয় কর্তব্য—নদী হইতে মাটি আনা। পরিষ্কার মাটির গামলায় সে মাটি রাখিয়া পরিষ্কার কাপড় দিয়া তাহা আবৃত করিয়া দেওয়া হয়। এই হইল 'ছট্‌মি'র কাজ। সপ্তমীর দিন 'সুনসান', অর্থাৎ শূন্য, বিশেষ কিছু করিবার থাকে না। 'অষ্টমী'র দিন কিন্তু অনেক কাজ। সেদিন 'ইমামবাড়া'তে শরবত এবং তিল-চৌরি লইয়া যাইতে হয়। 'তিল-চৌরি' চাল, চিনি এবং তিল দিয়া প্রস্তুত একপ্রকার মিষ্টান্ন। প্রত্যেকে ঘরেই তৈয়ারি করে। শরবত এবং তিল-চৌরি ইমামবাড়াতে লইয়া যাইবার পর 'মোজাবর' নমাজ পড়েন। সেই নমাজ-পূত শরবত, তিল-চৌরি ঘরে আনিয়া রাখা হয়। তাহার পর 'মলিদা' বানাইয়া কিছু বুঁদিয়া এবং লাল সূতা উহার উপর দিয়া মুরতজ আলির পাঞ্জার নিকট লইয়া গিয়া ভোগ দেওয়া হয়। ভোগ দিবার পর সেগুলি ঘরে আনিয়া সকলে মিলিয়া খায়। সেই 'অঠ্‌মী'তেই রাত দুইটার সময় 'তাসা' বাজিয়া ওঠে। মাটির কড়ার উপর চামড়া দিয়া এই বাদ্যটি প্রস্তুত, কোমরের কাছে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া কাঠি দিয়া বাজাইতে হয়। 'তাসা' বাজিলেই সকলে নিজেদের নিশান-তাজিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়ে। তাজিয়া-নিশানসমন্বিত এক একটা দলকে 'আখাড়া' বলে। আপন আপন আখাড়া লইয়া তাসা বাজাইতে বাজাইতে লাঠি খেলিতে খেলিতে সকলে মুরতজ আলির বাজারে যায়। সেখানে নিশান নামাইয়া ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে। তাহার পর বাড়ি ফিরিয়া আসে। 'নউমী'র দিনে কিছু হয় না, রাত্রে একটু ভালো আহারের ব্যবস্থা থাকে সেদিন; পোলাও হয়। রাত্রি নয়টা-দশটা নাগাদ পোলাও লইয়া মোজাবর-সহ সকলে ইমামবাড়াতে যায়। সেখানে 'ফতেহা' হয়। মোজাবর 'দোয়া' মানে, অর্থাৎ সকলের জন্য ভগবানের নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া বাড়িতে সেই পোলাও আহার করে। ইহার সঙ্গে মাংসও থাকে। রাত্রি দুইটার সময় আবার 'তাসা' বাজিয়া ওঠে। আবার সকলে 'আখাড়া' লইয়া বাহির হয়, পূর্বদিনের মত মুরতজ আলির বাজারে যায়, সেখানে নিশান-তাজিয়া নামাইয়া খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে, ভোর হইতে না হইতে আবার বাড়ি ফিরিয়া আসে। 'দশমী'র সকালবেলাটা স্নানাদি করিয়া গত রাত্রির শ্রম অপনোদন করিতেই কাটিয়া যায়। অপরাহ্ণে বেলা দুইটা নাগাদ আবার আখাড়া বাহির হয়। সেদিন চতুর্দিক হইতে 'আখাড়া' আসিয়া রাস্তার চৌমাথায় জমিতে থাকে। সেখান হইতে সকলে 'কারবালা'য় যায়। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী যাহার আখাড়া আগে যাইবার আগে যায়, যাহার পিছনে যাইবার কথা

সে পিছনে থাকে। আগে-পিছনে যাওয়া লইয়া অনেক সময় দাঙ্গাও বাধে। কারবালায় পৌঁছিয়া 'দফ্‌না' দিতে হয়। নিশানে নিশানে কাগজের যে ফুল থাকে, সেই ফুলগুলিকে ছোট ছোট পরিষ্কার কাপড়ের টুক্‌রায় বাঁধিয়া কবর দেওয়া হয়, কবরের ভিতর 'কফন' থাকে। এই কাগজের ফুল কবর দেওয়াই দফ্‌না দেওয়া। দফ্‌না দিবার পর নিশানগুলির সম্মুখে 'শির্নি' দিয়া সকলে আপন আপন বাড়ি ফিরিয়া যায়। এই উপলক্ষে কারবালার কাছে মেলা বসে, অনেকে সেখানে জিনিসপত্র কেনে। দশমীর পর চারদিন কাটিয়া গেলে 'ফুলপান' হয়। সকলে পানের সহিত এক টুকরো ফুল চিবাইয়া খায়। ইহা হাসান-হোসেনের মৃত্যুদিবস পালন। চল্লিশ দিন পরে 'চলিশ্‌মা' হয়। আবার 'আখাড়া' লইয়া মুরতজের কাছে সকলে যায়। ইহাকে 'চেহেল্‌লুম' বলে অনেকে।

বর্ণনা শেষ করিয়া রহিম বলিল যে, সে এবার মানত করিয়াছে নিশান চড়াইবে।

তোরাও হিন্দুদের মত মানত করিস নাকি?

শঙ্করের অজ্ঞতা দেখিয়া রহিম হাসিল। তাহারা মানত করে বইকি। কেহ নিশান চড়ায়, কেহ হাত বাঁধে, কেহ দুল পরে। অনেক হিন্দুরাও মহরমে মানত করে, এই পুরণই তো এবার হাত বাঁধিয়াছে।

তাই নাকি?

পূরণ সসঙ্কোচে একটু হাসিল।

ইতিপূর্বে শঙ্করের অনেকবার মনে হইয়াছে, এখন আবার মনে হইল, হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা লইয়া জিন্না-সাভারকরের যে দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক গজকচ্ছপ যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে, সে দ্বন্দ্ব ইহাদের মধ্যে নাই। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও শঙ্করের মনে পড়িয়া গেল। কিছুদিন পূর্বে মংলার বউটা একটা সদ্যোজাত শিশু রাখিয়া মারা গিয়াছে। প্রায় একই সময়ে আলিজানেরও ছেলে হইয়াছিল। আলিজানের বউ মংলার ছেলেকে স্তন্যদান করিয়া মানুষ করিতেছে। যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা খবরের কাগজের পাতায়, শিক্ষিত সমাজের বক্তৃতামঞ্চে, রাউন্ড টেবল কনফারেন্সে বিষ উদগীরণ করে সে সমস্যা ইহাদের মধ্যে নাই। যে সমস্যা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের, ইহাদের নয়। ইহাদের একটি সমস্যাই আছে, তাহা দারিদ্র্য। সেই নিদারুণ সমস্যার প্রবল চাপে ইহারা সকলেই এক জাত হইয়া গিয়াছে। সকলেই বিপন্ন। বাহিরের ধর্ম যাহাই হউক, অন্তরে সকলে এক। ইহারা মহরমই করুক আর 'ছট'ই করুক, সকলেই দেবতার কাছে মানত করে, একই ভাষায় একই প্রার্থনা জানায়—ভগবান আমাদের বাঁচাও।

রহিম পূরণ উভয়েই টাকা ধার চাহিল। চাহিলে এ লোকটি যে 'না' বলিতে পারে না, এ খবর ইহারা জানিয়াছে, তাই ইহারই কাছে বার বার ছুটিয়া আসে। কিন্তু ব্যাঙ্ক হইতে এমনভাবে কত টাকা সে দিতে পারে? জিনিস কিনিয়া দিলেই বা কি সুবিধা হইবে? জিনিস কিনিতেও টাকা লাগিবে, অথচ ইহারা সুখী হইবে না। নিজেদের উৎসবে নিজেরা জিনিস কিনিলে যে আনন্দ হয়, পরের দেওয়া জিনিসে ঠিক সে আনন্দ হয় না। সে আনন্দে ইহাদের বঞ্চিত করার কি অধিকার আছে তাহার?

টাকা নিয়ে যে মহাজনদের ধার শোধ করবে, তা হবে না।

নেই বাবু নেই, কিরিয়া খিলা লিজিয়ে।

উভয়েই সমস্বরে শপথ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

ইহাদের শপথও যে সব সময়ে বিশ্বাসযোগ্য নহে, তাহা শঙ্কর বলিতে যাইতেছিল; হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল, এই নিদারুণ শীতে উভয়েই অতি জীর্ণ সূতীর চাদর জড়াইয়া আছে, পরিধানেও অতি মলিন ছিন্ন বসন, হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পড়ে নাই। অথচ সে কোটের ওপর ওভারকোট চড়াইয়াছে! বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন আর সে তুলিতে পারিল না, বলিয়া ফেলিল, আচ্ছা, কাল আসিস, দেব।

উভয়ে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

আবার শঙ্করের মনে প্রশ্ন জাগিল ব্যাঙ্কের টাকা এমনভাবে খরচ করা কি ঠিক হইতেছে? সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, ব্যাঙ্কের যদি কিছু ক্ষতি হয়, আমিই না হয় তাহা নিজের টাকা হইতে পূরণ করিয়া দিব। নিজের টাকা! নিজের কত টাকা আছে তাহার! উৎপল তাহাকে যে বেতন দেয়, তাহার সমস্তই তো খরচ হইয়া যায়। পৈতৃক কিছু টাকা অবশ্য রাজীবলোচনের কাছে জমা আছে (অম্বিকাবাবুর রাজীবলোচনের ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল) কিন্তু সে টাকার পরিমাণ কত শঙ্করের তাহা জানা নাই। পিতা যে উইল করিয়া তাহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন, এই অভিমানে সে এ বিষয়ে কোনো অনুসন্ধানই করে নাই এতদিন। রাজীবলোচনের কাছে যত টাকাই থাক, তাহা ধর্মত অমিয়ার। উইল সে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু টাকা খরচ করিবার অধিকার তাহার নাই।

তোমার আদুরে মেয়েকে নিয়ে আর পারি না বাপু, সমস্ত দেশলাই কাঠিগুলো বাক্স থেকে বার করে মেঝেময় ছড়িয়েছে।

অমিয়া খুকিকে দুম করিয়া বসাইয়া চলিয়া গেল।

খুকি কাঁদিল না। তাহার সমস্ত মুখে যেন আহত আত্মসম্মান মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, বিস্ফারিত চক্ষুর কোণে অশ্রুর আভাস, ঠোঁট দুইটি কাঁপিতেছে।

মা দুষ্টু, এস তুমি আমার কাছে।

মুহূর্তে সমস্ত দুঃখ অন্তর্হিত হইল, হাসিতে সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, শঙ্করের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল বাবা বালো।

অমিয়া চা লইয়া প্রবেশ করিল।

চায়ের কথা ঠিক বলেছে গিয়ে তা হলে।

তক্ষুনি। উনুন জোড়া ছিল বলে দেরি হয়ে গেল।

খুকি শঙ্করের বুকের ওপর চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

যা আদুরে করছ মেয়েটিকে, বুঝবে মজা। দুধ খাবি চল্।

আমি ডুড কাব না। বাবার তন্দে তা কাব।

শঙ্কর হাসিয়া উঠিল।

দেখেছ আস্পর্ধা। চল্।

অমিয়া জোর করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

না না না—

আচ্ছা, একটু চা দিচ্ছি, দুধ খাও গিয়ে। লক্ষ্মী তো—

ডিসে একটু চা ঢালিয়া দিতে হইল। খুকি অমিয়ার কোল হইতে ঝুঁকিয়া তাহা পান করিতেছে, এমন সময় বাড়ির উঠানে কোঁকর-কোঁ শব্দে মুরগি ডাকিয়া উঠিল।

ঝম্‌মু—

হ্যাঁ, ঝম্‌রু এসেছে চল।

খুকি আর যাইতে আপত্তি করিল না।

চা-পান শেষ করিয়া শঙ্কর আবার ইজিচেয়ারে শুইয়া পড়িল। নানা চিন্তার আলো-ছায়ায় মনটা বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। কাছে দূরে সর্বত্র মহরমের বাজনা বাজিতেছে। কিন্তু এই বাজনার অন্তরালে অপরিশোধ্য ঋণের যে কাহিনী প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেই কাহিনীটাই শঙ্করের অন্তরে জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া রহিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এত করিয়াও কিছু হইতেছে না। ইহারা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রহিয়া গেল। সকলেরই অর্থাভাব। কাহারও সচ্ছলতা নাই। এমন কি তাহার নিজেরও। টাকা টাকা টাকা—সকলেরই ওই এক চিন্তা।

।। উনিশ ।।

হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম পাইয়া শঙ্করকে কলিকাতা চলিয়া যাইতে হইল। যে অ্যাডভোকেট জীবন চক্রবর্তীকে ক্ষতিপূরণের দাবি জানাইয়া চিঠি দিয়াছিলেন, তিনি কলিকাতাবাসী। তিনিই শঙ্করকে অবিলম্বে কলিকাতা যাইবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। কলিকাতার লোককে দিয়া কাজ করানোর নানারূপ অসুবিধা আছে। তথাপি দুইটি কারণে এই ভদ্রলোকের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। প্রথমত, ইনি উৎপলের বন্ধু। দ্বিতীয়ত, এ অঞ্চলের কোনো ভালো উকিল কেনারাম চক্রবর্তীর পুত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিতে রাজি নহেন। মনে মনে কেনারাম চক্রবর্তীর উপরে সকলেই চটা, কিন্তু খোলাখুলিভাবে তাহা প্রকাশ করিতে সকলেই অনিচ্ছুক। লোকটাকে সবাই ভয় করে। জীবন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে মকদ্দমা করার ইচ্ছা শঙ্করের তেমন ছিল না, কিন্তু উৎপল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যখন কথাটা তুলিয়াছে এবং সমস্ত টাকা যখন উৎপলেরই, তখন না করিবার আর সঙ্গত উপায় রহিল না। মকদ্দমা করিতে অস্বীকার করিলে উৎপল হয়তো আপত্তি করিত না, কিন্তু ওই 'হয়তো' জিনিসটা বড়ই অনিশ্চিত, বিশেষত টাকাকড়ির ব্যাপারে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করাই নিরাপদ। উৎপল যদিও তাহাকেই সর্বময় কর্তা করিয়া রাখিয়াছে, তবু সে যেন স্বাধীন নয়, একটা অদৃশ্য পরাধীনতার বন্ধন তাহাকে যেন বাঁধিয়া রাখিয়াছে, কিছুতেই সে যেন স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে না। নেপথ্যবাসী উৎপল নীরবে থাকিয়াও যেন তাহার ওপর কর্তৃত্ব করিতেছে। কেন এমন হয়? ট্রেনে বসিয়া শঙ্কর এই কথাটাই ভাবিতেছিল। মনটা ভালো ছিল না। অনেকদিন পরে অমিয়াকে, বিশেষত খুকিকে, ছাড়িয়া আসিয়া সে কেমন যেন বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিল। আসিবার সময় মেয়েটা বড় কাঁদিয়াছে। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দায়ে পড়িয়া তাহাকে যাইতে হইতেছে। কি দরকার ছিল এই কলহ করিবার! সে কেন সোজাসুজি উৎপলের প্রস্তাবে আপত্তি করিল না? কেন তাহার এই দীনতা?

ট্রেন চলিতেছে। দুই ধারে চাষের জমি। কৃষিপ্রধান দেশ। জমিই এ দেশের সব। চাষের উন্নতি হইলেই এ দেশের উন্নতি। চাষের উন্নতির জন্যই ইঁদারা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং সেই ইঁদারাকে কেন্দ্র করিয়াই মকদ্দমা বাধিয়াছে। সহসা শঙ্করের একটা কথা মনে হইল, ইঁদারা করাইয়া লাভ কি? মকদ্দমায় জিতিয়া জীবন চক্রবর্তীর নিকট হইতে পাঁচ হাজার টাকা আদায় করিয়া পুনরায় পঁচিশটি ইঁদারা করাইয়া দেওয়া যদি সম্ভবও হয়, তাহা হইলেই কি চাষীদের দুঃখমোচন হইবে? যে অঞ্চলে জলকষ্ট নাই, সে অঞ্চলের চাষীরাই কি সুখী? তাহা তো নয়, সকলেই দুঃখী, সকলেই ঋণগ্রস্ত, সকলেরই টাকার অভাব। টাকা রোজগার করিবার জন্যই প্রত্যহ দলে দলে তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া ফ্যাক্টরিতে, কলিয়ারিতে, চা-বাগানে চলিয়া যাইতেছে। সকলেরই টাকার দরকার। টাকা না থাকিলে জমিদারের খাজনা দেওয়া যায় না, মহাজনের ধার শোধ হয় না, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা যায় না, এমন কি বিবাহ পর্যন্ত করা যায় না। প্রতি পদক্ষেপে নগদ টাকার প্রয়োজন। কিন্তু টাকা তাহারা কিছুতেই পায় না। যে টাকার লোভে তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া শহরে ছুটিয়া যায়, সে টাকা তাহারা শহরেও সংগ্রহ করিতে পারে না। শহরে বাড়িভাড়া আছে, কাবুলিওয়ালা আছে, ঘুষ আছে, মদের দোকান আছে। শহরের টাকা শহরেই রাখিয়া আসিতে হয়। শহরে বাস করিয়া তাহারা কেবল শহুরে হয়। বিলাসিতার নেশায় কুসংসর্গে জর্জরিত হইয়া পশুর মতই অবশেষে মরিয়া যায়। কয়েকটা ইঁদারা করাইয়া দিলেই কি ইহাদের দুঃখ ঘুচিবে? এক সময় ছিল, যখন তাহারা তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়েই প্রয়োজনীয় অধিকাংশ জিনিস পাইত। দেশের রাজা খাজনা হিসাবে উৎপন্ন শস্যেরই অংশ লইতেন, টাকা চাহিতেন না। শস্যের বদলেই তাঁতি কাপড় দিত, নাপিত ক্ষৌরকার্য করিত, ধোপা কাপড় কাচিত, কুম্ভকার বাসন প্রস্তুত করিত, পুরোহিত পূজা করিতেন, অধ্যাপক টোল চালাইতেন। আজকাল কিন্তু সকলেই টাকা চায়। চাষীরা টাকা পাইবে কোথায়? তাহারা টাকা উৎপাদন করে না, উৎপাদন করে শস্য। যে শস্য না হইলে পৃথিবীর কাহারও চলে না, সেই শস্য যাহারা রোদে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া উৎপন্ন করে, তাহারাই আজ টাকার ফেরে পাড়িয়া নিরন্ন বিবস্ত্র। আর আমরা তাহাদের আসল দুঃখটা না বুঝিয়া কেবল কতকগুলা বাঁধা বুলি কপচাইয়া মরিতেছি। আমরা তাহাদের নিকট টাকার দাবি করি বলিয়াই তাহারা তাহাদের কষ্টার্জিত শস্য লইয়া রক্তশোষক মহাজনদের দ্বারস্থ হয় এবং যে কোনো মূল্যে তাহা বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করে। সারা বছরের খাইবার সংস্থানও অনেকের থাকে না, বীজের শস্যও অনেককে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়। এই যেখানে চাষের পরিণাম, সেখানে চাষের জন্য জল-সরবরাহ করিলে কতটুকু সুবিধা হইবে, যদি উৎপন্ন শস্যের পরিবর্তে তাহারা জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি না পায়? এ চাষ করিয়া লাভ কি তাহাদের? যত শস্যই হোক না, তাহা বিক্রয় করিয়া টাকায় রূপান্তরিত করিতে হইবে এবং তাহার দর ঠিক করিবে মহাজন, যে মহাজন পূর্বে টাকা ধার দিয়া সুদের সুদ কসিয়া বসিয়া আছে। মহাজনরাও নিরুপায়। কারণ তাহারাও মহত্তর জনের নির্দেশ অনুসারে চলিতে বাধ্য।

ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিল। চাষীদের নয়, খুকিকে নয়, অমিয়াকে নয়,—শৈলকে। সেই ফলসা গাছটার তলায় শৈল যেন দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। কোঁচড়ে মিত্তিরদের বাড়ির পেয়ারা। কোঁচড় হইতে একটা ডাঁশা পেয়ারা বাহির করিয়া

শঙ্করকে দেখাইয়া ভুরু নাচাইয়া ঘাড় নাড়িল তাহার পর তাহাতে কামড় দিল। সমস্ত মুখখানাতে দুষ্টামি মাখান। হঠাৎ সে কাঁদিয়া উঠিল। শঙ্করদা, শিগ্‌গির এস, এটা পেয়ারা নয়, ওল, মুখ কুটকুট করছে আমার, শিগ্‌গির এস তুমি, এস না—। ছুটিয়া যাইতে গিয়া শঙ্কর হোঁচট খাইল। ঘুম ভাঙিয়া গেল। হঠাৎ এতদিন পরে শৈল আসিয়া স্বপ্নে দেখা দিল কেন? শৈলর কথা তো সে বহুদিন ভাবে নাই। শঙ্কর উঠিয়া বসিল। শৈলর মুখখানাই চোখের উপর ভাসিতে লাগিল। সত্যই পরলোক বলিয়া কিছু আছে নাকি? প্রায় চার বৎসর হইল, শৈল মারা গিয়াছে। যে সন্তানের জন্য তাহার এত আকাঙ্ক্ষা ছিল, সেই সন্তান প্রসব করিতে গিয়াই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সন্তানটিও বাঁচে নাই। মিস্টার এল. কে. বোস আবার বিবাহ করিয়াছেন। অন্যমনস্ক হইয়া শঙ্কর শৈলর কথাই ভাবিতে লাগিল। ঠিক করিল, কলিকাতায় গিয়া তাহার নামে তর্পণ করিবে। হয়তো তাহার তৃষিত আত্মা এখনও কোথাও একবিন্দু জলের জন্য আশা করিয়া আছে। হয়তো—

ট্রেন একটা বড় স্টেশনে আসিয়া প্রবেশ করিল। 'চা-গ্রম' গোশ্‌ত-রোটি', 'চাই কমলালেবু', যাত্রীদের কলরব, কুলির চিৎকার, ট্রলির ঘড়ঘড়ানি, হুড়মুড় করিয়া একটা প্রচণ্ড কোলাহল মনের ওপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল। শৈল কোথায় হারাইয়া গেল!

কলিকাতায় পৌঁছিয়া শঙ্কর অবাক হইয়া গেল।

চার বৎসর পরে এই তাহার কলিকাতায় প্রথম পদার্পণ। সেই যে গিয়াছিল, আর আসে নাই। কলিকাতার রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। চারিদিকে 'বিফল' দেওয়াল, রাস্তায় রাস্তায় পার্কে পার্কে ট্রেঞ্চ। রাত্রে ব্ল্যাক আউট। মাঝে মাঝে সাইরেন বাজিতেছে। মাথার ওপর এরোপ্লেন ঘুরিতেছে। চায়ের দোকানে, বৈঠকখানায়, ট্রামে বাসে সর্বত্রই যুদ্ধের আলোচনা। জাপান ক্রমশ আগাইয়া আসিতেছে, জওহরলাল কোন্ বক্তৃতায় কি বলিয়াছেন, মহাত্মাজির স্বল্প দুই-চারিটি উক্তি হইতে কি আভাসিত হইতেছে, সে সবের সহিত বর্তমান যুদ্ধ-'পরিস্থিতি'র কি সম্পর্ক, এই সব লইয়াই কথা আলোচনা তর্ক। দীর্ঘ চার বৎসর পল্লীগ্রামে বাস করিয়া সে সত্যই যেন গেঁয়ো হইয়া গিয়াছে। বর্তমান জগতের রাজনৈতিক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখিবার প্রয়োজনই সে অনুভব করে নাই, এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো আগ্রহই নাই তাহার। একটা মহাযুদ্ধ লাগিয়াছে বটে, তাহার আঁচ গৌণভাবে আমাদের গায়েও লাগিতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা ইতিপূর্বে এমন প্রত্যক্ষভাবে তাহার অন্তরকে বিচলিত করে নাই। সত্যই একটা কিছু হইবে নাকি? সে কেমন যেন একটা অস্বস্তি ভোগ করিতে লাগিল। আর এক মুশকিল, পুরাতন পরিচিত দলের কাহারও সহিত দেখা হইল না। সকলেই হয় অনুপস্থিত, না হয় অসুস্থ। কাহারও সহিত যে প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিবে, তাহার উপায় নাই। নীরা, অনিল, পলাশকান্তি, রেণুকা, নিলয়কুমারের দল পলাশকান্তির সহিত আসাম পরিভ্রমণে গিয়াছেন। প্রফেসার গুপ্ত পক্ষাঘাতে শয্যাগত, কাহারও সহিত দেখা করেন না। ভণ্টু সে ঠিকানায় নাই। চুনচুন ঠিকানা বদলাইয়াছে। খুঁজিলে হয়তো চুনচুনকে বাহির করা যায়, কিন্তু কি দরকার? চুনচুনেরও যে ছবিটি মনে আঁকা আছে, তাহাই তো চমৎকার। তাহার রূপ পরিবর্তন করিয়া কি হইবে? নিশ্চয়ই পরিবর্তিত হইয়াছে, হয়তো সে সন্তান-সম্ভবা, কিংবা হয়তো—না, দরকার নাই। বর্তমানের চুনচুন আপন কক্ষপথে ঘুরিতে ঘুরিতে যেখানে যাইবার চলিয়া যাক। যে

চুনচুন একদা তাহার হৃদয় হরণ করিয়াছিল, তাহার ছবিটাই অমর হইয়া থাক শুধু। চুনচুন সম্বন্ধে মনের গহনে যে দুর্বলতা প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল, এতদিন পরে সহসা তাহা আবিষ্কার করিয়া শঙ্কর নিজের কাছেই যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। না, চুনচুনের সহিত দেখা করিবার চেষ্টা সে আর করিবে না।

সেকালে আর কে কে তাহার পরিচিত ছিল, ভাবিতে গিয়া অনেকগুলি মুখ একে একে মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। রিনি, মিষ্টিদিদি, সোনাদিদি, মুক্তো, মুক্তোর সগোত্রবর্গ, ভণ্টু, ভণ্টুদের পরিবার, অরিজিনাল, প্রোটোটাইপ, নিবারণবাবু, আস্‌মি, দার্জি, অপূর্বকৃষ্ণ, বেলা মল্লিক, প্রফেসার গুপ্ত, মুকুজ্জেমশাই, মৃন্ময়, মিসেস স্যানিয়াল, হিরণদার দল, 'সংস্কার' পত্রিকার পূর্বতন কর্মচারীবৃন্দ, করালীচরণ, লোকনাথ ঘোষাল, ছোট বড় আরো কত লোক মনের পর্দায় যেন মিছিল করিয়া আসিল এবং মিলাইয়া গেল। কাহারও মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, কেহ অস্পষ্ট। ছায়াছবির মিছিল। কাহারও সম্বন্ধে কিন্তু মনের সে আগ্রহ আর নাই। এমন কি তাহার নিজের শ্বশুরবাড়ির সম্বন্ধেও তাহার আগ্রহ অতিশয় কম। বিবাহের পর হইতে সে শ্বশুরবাড়ি যায় নাই বলিলেও চলে। শিরীষবাবু মাঝে মাঝে চিঠি লেখেন, মধ্যে মধ্যে লোক পাঠাইয়া অমিয়াকে লইয়া যান। পূজার সময়, জামাই ষষ্ঠীতে কখনও কিছু টাকা, কখনও কিছু কাপড়-জামা পাঠান। ইহার অধিক কোনো সম্পর্ক নাই। শ্বশুরবাড়ি দূরের কথা, নিজের মায়ের সহিতই বা তাহার নিবিড় সম্পর্ক কতটুকু? মা পাগলা-গারদে আছেন, মাসে মাসে তাঁহার জন্য সে টাকা পাঠাইয়া দেয়। মাঝে একবার রাঁচি গিয়াছিল, কর্তব্যবোধেই গিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া মায়ের পাগলামি আরও যেন বাড়িয়া গেল। ডাক্তাররা দেখা করিতে মানা করিলেন। প্রতি মাসে টাকা পাঠাইয়া তাই সে নিশ্চিন্ত আছে। প্রাণের নিবিড় সম্পর্ক থাকিলে সে কি ডাক্তারদের মানা শুনিত? সে কি মাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত? না, সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয়, মায়ের সহিতও তাহার প্রাণের গভীর সম্পর্ক নাই। যাহা আছে, তাহা কর্তব্যের সম্পর্ক মাত্র। প্রাণের নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখা বড় কঠিন। মনে যে সুর বাজে, সেই সুরের যাহারা সমঝদার তাহাদেরই সহিত কেবল অন্তরঙ্গতা হয়, বাকি সকলে পর। মনে চিরকাল এক সুর বাজে না। আপনজনও চিরকাল এক থাকে না। নূতন সুরের নূতন সমঝদার আসিয়া জোটে, সে-ই তখন অন্তরতম হয়। পুরাতন আপনজনেরা স্মৃতির ফলকে কখনও বা সামান্য চিহ্ন রাখিয়া, কখনও বা না রাখিয়া ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যায়।

ট্রামের এক কোণে বসিয়া শঙ্কর ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিল। ট্রামটা প্রায় খালি, সামনের দিকে আর একজন মাত্র যাত্রী বসিয়া আছেন। শঙ্কর একটা হোটেলে আসিয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু সেখানে সে কতক্ষণই বা থাকিতে পায়! সমস্ত দিনই ট্রামে-বাসে কাটিতেছে। মফস্বলের লোক অনেকদিন পরে কলিকাতা আসিয়াছে, বহু লোকের বহু ফরমাশ আছে। কোন্‌টা চাঁদনিতে পাওয়া যায়, কোন্‌টা বড়বাজারে, কোন্‌টা শ্যামবাজারে, কোন্‌টা মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে। চরকির মতো ঘুরিতে হইতেছে। অ্যাডভোকেট মহাশয়ের সহিতও পরামর্শটা সমাধা হয় নাই। সম্মুখে উপবিষ্ট যাত্রীটি শঙ্করের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশ তাঁহার দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটিল।

আরে কে, শঙ্কর নাকি! আঁ, ছ্যা-ছ্যা, চিনতেই পারিনি! ভাবছিলুম, কে না কে-অ্যাঁ!

শঙ্করও এতক্ষণ চিনিতে পারে নাই। ভালো করিয়া দেখিয়া চিনিতে পারিল। ভণ্টুর মেজকাকা, ওরফে বাবাজি, ওরফে মুক্তানন্দ। সেকালের গোঁফদাড়ি কিছুই নাই, সমস্তই কামাইয়া ফেলিয়াছেন। তাই সহসা চেনা আরও কঠিন।

অনেক দিন পরে দেখা হল। তারপর, ভালো তো সব?

বাবাজি নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

চলে যাচ্ছে এক রকম।

ভণ্টুর কাছে শুনেছিলাম, তুমি দেশে ফিরে গেছ। তা ভালোই করেছ এক রকম। কলকাতা ভদ্রলোকের বাস করবার অযোগ্য হয়ে পড়ছে ক্রমে। জাপান যদি অ্যাটাক করে, সকলকেই পালাতে হবে।

ভণ্টুর খবর কি?

ভণ্টুর চিঠিপত্র পাও না?

গোড়ায় গোড়ায় পেয়েছিলাম দু-একখানা তারপর আর পাইনি।

তাহার ঠিকানাটা কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইবে, এমন সময় বাবাজি সক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন, আফিং খেলেই মানুষ জন্তু হয়ে যায়, ইনজেকশন নিলে কি আর রক্ষে আছে তার!

কে ইনজেকশন নেয়?

তোমার ভণ্টু গো।

আফিঙের ইনজেকশন? মানে মর্ফিয়া?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই রকম কি একটা যেন নাম তার।

মর্ফিয়া নেয়! কেন?

কেন আবার, নেশা? পায়ের হাড় ভেঙে মেডিকেল কলেজে যখন পড়ে ছিল, তখন সেখানকার ডাক্তাররা ওই ইনজেকশন দিয়ে দিয়ে ওর সর্বনাশটা করে দিয়েছে। এখন নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ-বেলা ও-বেলা ইনজেকশন না হলে চলে না, নিজেই পট পট ছুঁচ ফুটিয়ে নেয়।

অত মর্ফিয়া পায় কোথা?

পায় কোথা! শোন কথা একবার! পায় ডাক্তারদের মারফত। আজকালকার লক্ষ্মীছাড়া ডাক্তারগুলো পয়সা পেলে না করতে পারে হেন কাজ তো নেই। ফি পেলেই প্রেস্‌ক্রিপশন লিখে দিচ্ছে।

বাবাজি হাত উল্টাইয়া মুখভঙ্গি করিলেন।

ঘেন্না ধরে গেছে বুঝলে, সমস্ত সংসারের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে।

ভণ্টুর ঠিকানাটা কি?

সে তো এখানে নেই। তার আপিস দিল্লিতে উঠে গেছে। সে এখন দিল্লিতে।

বউদিরা? বউদিরা সেখানে নাকি?

ওরা তো বহুকাল হল ভিন্ন হয়ে গেছে, এ খবর জান না বুঝি তুমি?

না।

শঙ্কর আর কিছু বলিতে পারিল না।

বাবাজি কিছুক্ষণ স্মিতমুখে চুপ করিয়া থাকিয়া পকেট হাতড়াইয়া একটা পকেট-বুক বাহির করিলেন। সেটা একবার খুলিয়া কি দেখিয়া আবার সেটা পকেটে রাখিয়া দিলেন।

ওদের খবর কতদিন জান না?

ভণ্টুর বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলাম, তারপর আর জানি না।

দাদা বেঁচে থাকতে কিছু হয়নি, তারপরই এই কাণ্ড।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বাবাজি পুনরায় বলিলেন, ভণ্টুর বউ বড়লোকের মেয়ে, কাঁহাতক সে আর আস্তাকুঁড়ে হাঁটু গেড়ে বাসন মাজতে পারে, বল?

বাবাজির চোখে যেন একটা বিদ্যুদ্দীপ্তি খেলিয়া গেল। শঙ্কর যেন বজ্রাহতবৎ বসিয়া রহিল। যে ভণ্টুকে সে চিনিত, সে যে স্ত্রীর পরিশ্রম লাঘবের জন্য বউদিদির সহিত মনোমালিন্য করিয়া পৃথক হইয়া যাইতে পারে, এ কল্পনাও সে কোনোদিন করে নাই।

বউকে বাসন-মাজা থেকে রেহাই দেওয়ার জন্যে অবশ্য ভণ্টু আলাদা হয়নি। আলাদা হল একটা তুচ্ছ কারণে, আর তোমার ওই বউদির জেদে। ভয়ঙ্কর লোক তোমার ওই বউদিদি। আমি পট করে মাঝ থেকে খামখা জড়িয়ে পড়লাম।

এমনভাবে শঙ্করের দিকে চাহিলেন, যেন শঙ্করই এজন্য অপরাধী। তাহার পর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। ট্রাম আসিয়া মেডিকেল কলেজের সম্মুখে দাঁড়াইল। শঙ্কর প্রশ্ন না করিয়া পারিল না।

আসল কারণটা তা হলে কি?

আসল কারণ হল—ভণ্টুর ছেলেটা। ছেলেটা হয়ে উঠেছিল ভয়ানক আদুরে। কারণও ছিল। ভণ্টু গ্রাহ্য করত না যদিও, কিন্তু ভণ্টুর স্ত্রীর মনে একটা ক্ষোভ হতই যে, তার ছেলের ঠিক যত্ন হচ্ছে না। দুধ পেত না, খাবার পেত না, খেলনা পেত না, ভালো পোশাক পেত না; দিতে হলে সব ছেলেকেই দিতে হয়, পয়সায় কুলোত না ভণ্টুর। এ সমস্তর অভাব ভণ্টুর স্ত্রী পূরণ করত আদর দিয়ে দিয়ে। ভণ্টুর বউদি ছেলেটাকে সমীহ করত। ভয়ানক আদুরে করে তুলেছিল ছেলেটাকে। যা হাতের কাছে পেত ভাঙত, বই পেলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত, কেউ কিছু বলত না। হাতে কাঁচি পেলে তো রক্ষে নেই, যা পাবে কেটে ফেলবে। ভণ্টুর বই-খাতা, কাগজ-পত্তর, এমন কি ভণ্টুর একটা দামী স্যুট পর্যন্ত কাঁচি চালিয়ে দিলে একদিন সাবড়ে। দুপুরে সবাই ঘুমত, ভণ্টু আপিসে, বড় ছেলে দুটো স্কুলে, কর্তা সেই অবসরে সব জিনিস নষ্ট করতেন বসে বসে। রাগলে ভণ্টুর চেহারা কি রকম হয় তা নিশ্চয় তোমার অজানা নেই। আপিস থেকে ফিরে এসে রোজ সে অনর্থ করত। অথচ আসল অপরাধীর নাম বলতে কারও সাহস হত না, ভণ্টুর স্ত্রীর তো হতই না, তোমার বউদিরও হত না, ছেলেগুলোও ভয়ে চুপ করে থাকত। কারণ নাম বললেই ভণ্টু নির্দম ঠেঙাবে।

বাবাজি চুপ করিলেন।

তারপর?

ভণ্টু কিন্তু ঠেঙানো বন্ধ করলে না। সে ভুল করে মনে করত যে, তার ভাইপোরাই বোধ হয় এসব করছে। তারা যত বলত—আমরা করিনি, তত তার রাগ চড়ে যেত, মনে হত, ওরা

মিছে কথা বলছে। তার নিজের ওইটুকু ছেলে যে কাঁচি চালাতে পারে, এ সন্দেহও তার মনে হত না। তার এ ভুল ভাঙিয়েও কেউ দিত না, এইটেই সবচেয়ে আশ্চর্য। ভাইপো তিনটে রোজ মার খেয়ে মরত, তবু সত্যি কথাটা বলত না। না, ভুল করছি, একদিন একজন বোধ হয় বলেছিল; কিন্তু সে আরও বেশি মার খেয়ে মল, ভণ্টু বিশ্বাসই করলে না তার কথা। ভণ্টুর মার যে কি মার, তা তো জানই। মারতে মারতে বেত ফেটে ছ্যাতরা ছ্যাতরা হয়ে যেত। শেষকালে তোমার বউদি একদিন এক কাণ্ড করে বসল। একটা খোলার বাড়ি দেখে সেইখানে একদিন উঠে গেল দুপুরে ভণ্টু তখন আপিসে।

বাবাজি পুনরায় নীরব হইলেন।

তারপর?

তারপর আর কি। সেই থেকেই ভিন্ন। ভণ্টু অনেক সাধ্যসাধনা করলে, কিন্তু বউদি আর কিছুতেই ফিরল না। কেন আলাদা হয়ে গেল, তাও ঘুণাক্ষরে বললে না, মানে—সত্যি কথাটা বললে না। শুধু বললে, তোমার দাদার বেশি ঝামেলা সহ্য হয় না, তাই সরে এসেছি।

ভণ্টুর দাদা ফিরে এসেছিলেন বুঝি?

হ্যাঁ, অনেক দিন। সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে বেশ মুটিয়ে ফিরেছে। চাকরি করছে আবার।

তারপর?

তারপর আর কি। কিছুদিন পরেই ভণ্টু দিল্লিতে বদলি হয়ে গেল। ওরাও কলকাতার খরচ চালাতে না পেরে নৈহাটিতে গিয়ে বাসা বাধল। সেখানেই এখন আছে। আমি মাঝ থেকে কেবল বিপদে পড়ে গেছি।

আপনার কি হল?

জড়িয়ে পড়েছি। ঠাকুরের আদেশ অমান্য তো করতে পারি না!

ঠাকুরের আদেশ মানে? মুকুজ্জে মশাইয়ের?

বাবাজি বিস্মিত হইলেন।

ঠাকুরকে তুমি চিনলে কি করে?

আমার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে ওঁর আলাপ ছিল যে, সেই সূত্রে আমার সঙ্গেও আলাপ। চমৎকার লোক! ও-রকম পরোপকারী লোক আমি আর দেখিনি।

ওই! ওই পরোপকারের ঠেলাতে আমিও অথৈ জলে পড়েছি।

কি রকম?

গুজরাটে গিয়েছিলাম প্রভাসতীর্থ করতে। মন বসল না। ফিরে এলাম। এসে শুনলাম, ওরা সব নৈহাটিতে। কর্তব্যের খাতিরেই গেলাম একদিন দেখা করতে। সেখানে গিয়ে দেখি, হৈ-হৈ ব্যাপার, রৈ-রৈ কাণ্ড! ফন্তির হয়েছে টাইফয়েড, আর ঠাকুর সেখানে রয়েছেন। আমি তো অবাক। শুনলাম, বিষ্ণুচরণের সঙ্গে ওঁর পুরীতে আলাপ হয়েছিল নাকি। দেখলামও, খুবই স্নেহ করেন বিষ্ণুচরণকে। ফন্তির চিকিৎসা উনিই চালাচ্ছেন। বড় ডাক্তার আসছে, বরফ লেবু আঙুর সমস্ত ওঁরই খরচে। এত টাকা যে উনি কোথা থেকে পান, ভগবানই জানেন। আমি প্রণাম করতেই বললেন, আরে তুমি কোথা থেকে এখানে! আমি যে বিষ্ণুচরণের কাকা, এ খবর ঠাকুর জানতেন না। শুনে খুব খুশি হলেন, বললেন, বাঃ, বেশ ভালোই হল, এখন কি

করছ তুমি? বললাম, প্রভাসতীর্থটা সেরে এলাম। বললেন, তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়ে আর কি হবে, তুমি এদের কাছেই থাক। আমি তো শুনে অবাক! এদের কাছে থাকব! কিন্তু ঠাকুরের মুখের ওপর কিছু বলতে ভরসা করলাম না। রাত জেগে ফন্‌তির সেবায় লেগে পড়তে হল। কি করি, ঠাকুর নিজে রাত জাগছেন, আমি কি করে ঘুমোই? একদিন ঠাকুরকে আড়ালে পেয়ে বললাম, ঠাকুর, নামজপ করে মন ভরছে না, আমাকে একটা মন্তর দিন আপনি। ঠাকুর হেসে ফেললেন, বললেন, পাগল নাকি! আমি কি মন্তর দেব তোমাকে! আমি জোর করে চেপে ধরতে বললেন, আচ্ছা, আমি যা বলব, তা সত্যি সত্যি করবে? আমি বললাম, নিশ্চয়। ঠাকুর কি বললেন শুনবে?

বাবাজির চক্ষু দুইটি যেন অক্ষিকোটর ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিল।

কি বললেন?

তুমি বিষ্ণুচরণদের সেবার ভার নাও। এরা বড় দুঃস্থ হয়ে পড়েছে। এদের সেবা করলে তোমার পুণ্য হবে। কর্মযোগও মুক্তিলাভের একটা শ্রেষ্ঠ পন্থা। তুমি কায়মনোবাক্যে এদের সেবা কর দিকি, আনন্দ পাবে, মুক্তিও পাবে! কোনো মন্ত্রের দরকার নেই। বিশ বাঁও জলে পড়ে গেলুম, বুঝলে? বললাম, আপনি যা বলছেন, তা করতে আপত্তি নেই। কিন্তু এখন এদের এই দুরবস্থা, বিষ্ণুচরণের আয় যৎসামান্য, এর ওপর আমার নিজের ভার ওদের কাঁধে চাপালে ওরা সেটা ঠিক সেবার স্পিরিটে নেবে কি? আমার নিজের যা বিষয়-আশয় ছিল, তা তো সব ফুটকড়াই হয়ে গেছে। ভণ্টুকে দিতে চেয়েছিলাম, সে নেয়নি, বন্ধুর গর্ভেই গেল শেষকালে সব। ঠাকুর বললেন, না, গলগ্রহ হতে বলছি না। ওদের সাহায্য করতে বলছি। তোমাকে রোজগার করতে হবে। যা রোজগার করবে, সব এনে বউমার হাতে দেবে। চাও তো এক্ষুণি তোমার একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে পারি। আমার চেনা একজন রেশমের কারবারি বিশ্বাসী লোক খুঁজছেন। আমার আর কিছু বলবার উপায় রইল না। কিছুদিন পরে সত্যিই ঠাকুর চাকরিটি জুটিয়ে দিলেন এবং তার কিছুদিন পরে ফন্‌তি যেই একটু সেরে উঠল, অমনি অন্তর্ধান করলেন, তাঁর যা চিরকাল স্বভাব।

তারপর?

তারপর আর কি! সেই চাকরি করছি। নৈহাটি থেকে রোজ ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করি কিন্তু ব্যাপারটা বোঝ একবার।

বাবাজি চোখের দৃষ্টিতে পুনরায় বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

শঙ্কর বুঝিল বাবাজি সেবাটা কায়মনোবাক্যে হয়তো করিতেছেন, কিন্তু সে বিষয়ে নির্বিকার নন।

ভণ্টু কিছু সাহায্য করে না?

আগে আগে করত কিছু কিছু। এখন আর পারে না। পারবে কি করে? একে দিল্লির ভীষণ খরচ, তার ওপর ওই ইঞ্জেকশন কিনতে হচ্ছে অগ্নিমূল্যে।

ইঞ্জেকশন রোজ নেয়?

রোজ, দুবেলা। রেশমের ক্যানভাসিং করতে মাঝে আমি একবার দিল্লি গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, তার বউ বেশ ছিমছাম করে, মানে—নিজের মনের মত করে সংসারটি গুছিয়ে

নিয়েছে। ছেলের ট্রাইসাইকেল, বাইরের ঘরে সোফা, রেডিও কিনেছে একটা।

আর ভণ্টু?

ভণ্টু ঊর্ধ্বশ্বাসে চাকরি করছে। সন্ধের পর আপিস থেকে ফিরে ইঞ্জেকশন নেয়, আর ছাতে বসে বসে হেঁড়ে গলায় গান গায়। আর মাঝে মাঝে হা-হা করে হাসে—মর্মান্তিক সে হাসি, বুঝলে?

কি গান গায়?

নিজে তৈরি করেছে গান হে। টুকে এনেছি আমি, দেখবে? বাবাজি পকেট হইতে পকেটবুকটি বাহির করিলেন এবং একটি পাতা খুলিয়া শঙ্করকে দিলেন।

শঙ্কর পড়িল—

লদ্‌কালদ্‌কি করতে করতে হিল্লি-দিল্লি হলাম পার।
নৈহাটিতে রান্নাঘরে বেগুন ভাজছে বিড়্‌ডিকার
খুজবুজ, খুজবুজ, খুজবুজ—
ফাটকা-খেলায় আটকে গিয়ে পড়লাম বিষম গাড্ডায়
চুনোপুঁটি স্মোকিং হুক্কা তিমি মাছের আড্ডায়
খুজবুজ, খুজবুজ, খুজবুজ—

দাও, এবার আমাকে নামতে হবে। এই, রোক্‌কে।

ট্রাম থামিল। পকেট-বুক লইয়া বাবাজি নামিয়া গেলেন। শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এতক্ষণ সে যেন তন্ময় হইয়া একটা উপন্যাস পাঠ করিতেছিল। ট্রামে অনেক যাত্রী উঠিয়াছে, সে লক্ষ্যই করে নাই। তাহার যেখানে নামিবার কথা, সে স্থান বহুক্ষণ পার হইয়া গিয়াছে। অ্যাডভোকেট ভদ্রলোক আবার বাহির হইয়া না যান! সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার সমস্যা এখন ভণ্টু নয়, তাহার সমস্যা এখন উকিল এবং ইঁদারা। অনেক জিনিসও কিনিতে বাকি আছে। সহসা মনে পড়িল, কুমোরটুলিতেও একবার যাইতে হইবে।

চলন্ত ট্রাম হইতে সে লাফাইয়া পড়িল।

।। কুড়ি ।।

দিবা দ্বিপ্রহর।

খোলা মাঠে হু-হু করিয়া একটা হাওয়া বহিতেছে। কাছে দূরে গরু চরিতেছে। মাঠের প্রান্তে যে কুলগাছটা আছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া কয়েকটা রাখাল বালক ক্রমাগত ঢিল ছুঁড়িয়া চলিয়াছে। আরও দূরে চাষের জমি। কোথাও সরিষা, কোথাও গম, কোথাও যব, কোথাও মটর, কোথাও ছোলা—হলুদ-সবুজ-নীলের মহোৎসব পড়িয়া গিয়াছে যেন। যমুনিয়ার কিন্তু এ সব দিকে লক্ষ্য নাই, সে আপন মনে কাঠ ও গোবর কুড়াইতেছে। প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে ইহাই তাহার কাজ। মাঠে মাঠে ঘুরিয়া সে শুকনো ডালপালা ও গোবর সংগ্রহ করে। প্রকৃতির এই ঐশ্বর্যের মাঝখানে তাহাকে কিন্তু মোটেই মানায় নাই, পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের মাঝখানে খানিকটা সচল আবর্জনা যেন। মাথায় রুক্ষ তৈলহীন চুল, পরিধানে জীর্ণ মলিন বসন, রোগে খাদ্যাভাবে

শীর্ণ শ্রীহীন বিগত যৌবন দেহ। বলিষ্ঠ মুশাইকে ভুলাইবার মত তাহার কিছুই নাই। অথচ কতই বা তাহার বয়স। ত্রিশের বেশি নয়, কিন্তু ইহারই মধ্যে বুড়ি হইয়া গিয়াছে। মুশাইকে ভুলাইবার মত কিছু না থাকিলেও মুশাইকে ভুলাইবার আগ্রহ তাহার কম নয়। বস্তুত উহাই তাহার জীবনের একমাত্র আগ্রহ। তাহার সহিত ঝগড়া করিয়া, তাহার জন্য পূজা করিয়া, তাহার পছন্দমত রান্না করিয়া, রাত্রে কোমরে তেল মালিশ করিয়া, সকালে চা প্রস্তুত করিয়া, তাহার কাপড়-জামা-পাগড়ি ক্ষার দিয়া পরিষ্কার করিয়া নানা উপায়ে সে মুশাইকে আগলাইয়া রাখিয়াছে। মুশাই যদি তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহার গতি কি হইবে! কাহাকে লইয়া থাকিবে সে! নিজের পেটের ছেলে জোয়ান বউ লইয়া শহরে চলিয়া গেল, তাহার দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইল না পর্যন্ত। কলে 'নোকরি' করিতেছে। যমুনিয়া অমন নোকরির মুখে প্রত্যহ হাজারবার ঝাড়ু মারে। নোকরি নয়, আসল কথা 'জরু'। জোয়ান জরু লইয়া মজা করিয়া আলাদা থাকিতে চায়। তাহার কথা একবার ভাবিল না পর্যন্ত, জরু লইয়া উন্মত্ত হইয়া চলিয়া গেল। কমবয়সী ছুঁড়ি দেখিলে পুরুষগুলোর হিতাহিতজ্ঞান লোপ পায় যেন। 'পুতহু'র যৌবনের কথা ভাবিতে গিয়া সহসা তাহার নিজের যৌবনের কথা মনে পড়িল। তাহাকেও কি কম নাকাল হইতে হইয়াছিল! জমিদারের গোমস্তা কুঞ্জবাবু, পিরু গাড়োয়ান, জমিরুদ্দিন সিপাহি, কত লোকই যে তাহার পিছনে লাগিয়াছিল! থানার নাককাটা চৌকিদারটা তো তাহাকে ধরিয়া একদিন জঙ্গলের মধ্যে টানিয়াই লইয়া গিয়াছিল। বিগত যৌবনের বিস্মৃতপ্রায় নানা কাহিনী মনের মধ্যে ভিড় করিয়া আসিল। কয়দিনই বা ছিল সে যৌবন! চকিতে আসিল এবং চলিয়া গেল। মুশাইয়ের সহিত কবে কোন্ বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল, ভালো করিয়া মনেও পড়ে না। মনে পড়ে, যখন সে যৌবনে প্রথম পদার্পণ করিল, সেই দিনগুলি। মুশাই তখন তাহাকে লইয়া বিভোর হইয়া থাকিত, পাগল হইয়া গিয়াছিল যেন। কাহারও দিকে তাকাইলে ক্ষেপিয়া যাইত, কোনো বেচালের খবর কানে গেলে মারিয়া ধুনিয়া দিত। গুণ্ডাটা চিরকালই একরকম, কথায় কথায় কেবল মারপিট। কিছুদিন পরে বিষুণের জন্ম হইল, দেখিতে দেখিতে তাহার যৌবন চলিয়া গেল। শুধু যৌবন কেন, কত দিনই কাটিল তাহার পর। মুশাই তাড়ি ধরিল, মদ ধরিল, কত ছুঁড়ির পিছনে ঘুরিল, এক সাহেবের কাছে কিছুদিন নোকরি করিল, তাহা ছাড়িয়া আবার কিছুদিন মজুরি খাটিল। এক দারোগাবাবুর বিষদৃষ্টিতে পড়িয়া দুই মাস জেল পর্যন্ত খাটিয়া আসিল। এখন শঙ্করবাবুর কাছে বাহাল হইয়াছে। সে নিশ্চিন্ত হইয়াছে। শঙ্করবাবুর কাছেই জব্দ থাকে। তবু মুসহরণীটাকে লইয়া সেদিন পর্যন্ত কি কাণ্ড। পাপটা বিদায় হইয়াছে, বাঁচা গিয়াছে। মুশাই তাহার আর কাহারও নয়। আর কাহাকেও কাছে ঘেঁষিতে দিবে না সে। মুশাইয়ের জন্যই যমুনিয়া জ্বালানি সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছে। শীতকাল। ঘর একটু গরম না করিলে মুশাই ঘুমাইতে পারে না। এইগুলি দিয়া ঘরে 'বোরশি', উঠানে 'ঘুর' জ্বালাইতে হইবে। ঘুরের পাশে বসিয়া মুশাই গল্প করিতে ভালোবাসে। বার বার বিড়ি খাওয়াও আছে, কত 'শালা'ই কিনিবে সে!

নির্জন মাঠে নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে জীর্ণবসনা শীর্ণকান্তি যমুনিয়া শুকনা ডালপালা কুড়াইয়া ফিরিতে লাগিল।

।। একুশ ।।

রাত্রি দ্বিপ্রহর।

সমস্ত গ্রাম ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কৃষ্ণপক্ষ। চতুর্দিকে সূচিভেদ্য অন্ধকার, অবিশ্রান্ত ঝিল্লিধ্বনি। হুঁম্‌হুঁ। প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের অন্ধকার ভেদ করিয়া শব্দ হইল, দূরের আর একটা বৃক্ষ হইতে প্রত্যুত্তর আসিল, হুঁম্‌হু, হুঁম্‌হু, হুঁম্‌হু। নির্জন নিশীথে নিশাচর পক্ষিমিথুন গম্ভীর কণ্ঠে আলাপ করিতেছে। শীতের বাতাস প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছের শাখাপ্রশাখা দুলাইয়া, বাঁশবনে শিহরন জাগাইয়া, মাঠের শুষ্ক পাতা উড়াইয়া একটানা বহিয়া চলিয়াছে। ঝিল্লি ধ্বনির সহিত হিল্লোলিত বৃক্ষপল্লবের মর্মরধ্বনি মিশিয়া একটা নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গীত মধ্যরাত্রির স্তব্ধতার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া অপরূপ ছন্দে রণিয়া রণিয়া উঠিতেছে। সহসা পাশের ঝোপে একটা শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। তীক্ষ্ণ তীব্র একটি মাত্র ডাক। তাহার পর সব চুপচাপ। অন্ধকারের নিবিড়তা ঘনতর হইয়া উঠিল। সমস্ত শব্দ যেন মুহূর্তের জন্য থামিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আর একটা তীক্ষ্ণ শব্দে অন্ধকার বিদীর্ণ হইল, কে যেন শিস দিতেছে। ঝোপটি নড়িয়া উঠিল, ঝোপের ভিতর হইতে গুঁড়ি মারিয়া বাহির হইয়া আসিল—শৃগাল নয়, মানুষ। কারু। যে দিকে শিস বাজিয়াছিল, সেই দিকে সে দ্রুতপদে আগাইয়া গেল। শ্যাওড়াগাছের অন্ধকারে কম্বল গায়ে দিয়া ফরিদ দাঁড়াইয়া আছে। দুইজনে নিঃশব্দ গতিতে অন্ধকারে মিশিয়া গেল। চুরি করিতে চলিয়াছে!

মানুষের সাড়া পাইয়া নিশাচর পক্ষীদম্পতি উড়িয়া গেল।

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রি আবার নিবিড় হইয়া উঠিল।

ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং—

মহিষের গলার ঘণ্টা বাজিতেছে। মাঠের পথ ধরিয়া গুলাব সিংহের শতাধিক মহিষ ধীর মন্থর গতিতে চলিয়াছে। চলিয়াছে লক্ষ্মীবাগের উদ্দেশে। মণি বাঁড়ুজ্জের জমিতে এবার নাকি চমৎকার ফসল হইয়াছে, আজ রাত্রের মধ্যেই সমস্ত ক্ষেত চরাইয়া দিতে হইবে, ইহাই গুলাব সিংহের হুকুম। চারিজন বলিষ্ঠ পশ্চিমা গোয়ালা প্রকাণ্ড লাঠি কাঁধে করিয়া মহিষ বাহিনীর পিছনে চলিয়াছে।

হুঁম্‌হুঁ, হুঁম্‌হু—

দূর আম্রকাননে নিশাচর পক্ষীদম্পতি পুনরায় আলাপ শুরু করিল।

গিয়াছে, অথচ নড়িবার নাম নাই! এক পয়সা রোজগার করিবে না, জোয়ান মরদ বসিয়া বসিয়া আমার অন্ন ধ্বংস করিবে রোজ রোজ! আমি কত যোগাই! ঘায়ের চিকিৎসা করিতে গিয়া তো যা কিছু সঞ্চিত ছিল সব গিয়াছে, কিছু 'জেবর' পর্যন্ত বন্ধক পড়িয়াছে! ও কি আর সে টাকা শোধ দিবে? 'মুরদ' আবার 'আশনাই' করিতে চায়, একবার 'আশনাই' করিতে গিয়া তো মরিতে বসিয়াছিল, লজ্জাও করে না 'বেহুদ্দাটা'র! আমার কাছে আর কোনো 'মরদ' আসিতে দিবে না, কাল তো রাজীববাবুর ব্যাটাকে অপমানই করিয়া বসিল। ইস্, 'সাধি' করা 'জরু' বানাইয়া তুলিতে চায় আমাকে! 'সাধি' করা 'জরু' তো ঘরে আছে একজন, সেইখানেই যা না, এখানে মরিতে পড়িয়া আছিস কেন? এক কড়ার সামর্থ্য নাই, 'আশনাই' জমাইতে চায়!—এই জাতীয় স্বগতোক্তি করিতে করিতে ফুলশরিয়া পেঁয়াজ কুটিতে লাগিল। পেঁয়াজের তরকারিটা বানাইয়া এক বোতল 'শরাব' আনিতে হইবে। আজও গদাইবাবুর আসিবার কথা আছে। রাজীবলোচনের পুত্র গদাইবাবুর মুখটা মনে পড়িতে তাহার হাসি পাইল। কি বেহায়া, আত্মসম্মানহীন এ লোকটা! কাল হরিয়ার নিকট অপমানিত হইয়াও আজ আবার আসিবে, খবর পাঠাইয়াছে। আজ আসিবার অন্য একটা কারণ আছে অবশ্য। ফরিদ কারু নিশ্চয় খবর দিয়াছে যে, গহনাগুলি ফুলশরিয়ার জিম্মায় তাহারা রাখিয়া গিয়াছে। সেইগুলি হস্তগত করিবার জন্যই গদাইবাবু আজ বিশেষ করিয়া আসিতেছেন। উৎপলবাবুর ঘরে সিঁধ দিয়া উহারা আর কি কি পাইল, কে জানে! মাইজির দামি শাড়িগুলা নিশ্চয়ই নেকি মাড়োয়ারির ঘরে গিয়াছে। জেবরগুলা রাজীববাবুর ঘরে গিয়া ঢুকিবে। চোরাই গহনা আত্মসাৎ করিবার জন্য রাজীববাবু একজন স্যাকরাকেই নিজের বৈঠকখানার বাহিরের ঘরটাতে আশ্রয় দিয়াছেন, লোককে অবশ্য বলেন—ভাড়া দিয়াছেন। চোরাই গহনা গালানোই ওই স্যাকরাটার একমাত্র কাজ। ভাড়া না আর কিছু! ফুলশরিয়ার অজানা কিছুই নাই। 'চোট্টা' সব। শুধু 'চোট্টা' নয়, ভীতুও। চোরের হাত হইতে সোজাসুজি গহনা লইবারও হিম্মত নাই হুজুরদের, পাছে ধরা পড়েন। ফুলশরিয়া গহনাগুলি কয়েকদিন লুকাইয়া রাখিবে, তাহার পর চুপিচুপি গদাইবাবু আসিয়া একদিন লইয়া যাইবেন। বিশেষ করিয়া এই জন্যই আরও হরিয়াকে তাড়াইয়া দিতে হইল। সেদিন শেষরাত্রে গহনার পুঁটুলি লইয়া কারু আসিয়া যখন ডাক দিল, তখন কি মুশকিলেই না সে পড়িয়াছিল! পুঁটুলিটা সারারাত বাড়ির পিছনে ছাইগাদায় লুকাইয়া রাখিতে হইল। হরিয়াকে এসব কথা বলা যায় না। বিশ্বাস করিবার মত লোক সে নয়। কারুকেও ফিরাইয়া দিতে পারে না। নিজের স্বার্থের জন্যই পারে না। এসব ব্যাপারে তাহার বেশ মোটা রকম পাওনা আছে। দুই দফা পাওনা—একবার কারুরা দিবে, আর একবার গদাইবাবু। নানা রকম 'দুখ ধান্দা' করিয়া তাহাকে রোজগার করিতে হইবে তো। না করিলে তাহার চলিবে কেমন করিয়া! সহসা ফরিদ এবং কারুর জন্য তাহার দুঃখ হইল। চুরির সমস্ত ঝুঁকিটা তাহাদের। ধরা পড়িলে তাহাদেরই জেল হইবে। অথচ কয়টা টাকাই বা বেচারারা পাইবে! রাজীবলোচন এবং নেকিরাম দয়া করিয়া যাহা দিবে, তাহাই। কারুর ভীতচকিত মুখখানা তাহার মনে পড়িল। সহসা সে ঠিক করিয়া ফেলিল, কারু এবং ফরিদের নিকট হইতে সে এবার আর কমিশন লইবে না।

কি না! এদিকে আসিলে রামুর ফুলশরিয়ার আঙিনায় একবার ঢোকা চাই। পুরাতন আলাপ। ফুলশরিয়ার প্রথম প্রণয় রামুর সহিতই। প্রণয়ের নেশা অবশ্য রামুর বহুদিন পূর্বে ছুটিয়া গিয়াছে। এখন তাহার ঘরে একপাল ছেলেমেয়ে এবং মারমুখী খাণ্ডার বউ। তবু রামু এখনও আসে। আসে, একটু বসে, বিড়ি খায়, দুই-একটা অশ্লীল রসিকতা করে, তাহার পর চলিয়া যায়। মাঝে মাঝে দুই-এক দানা চানাচুর উপহার দেয়, দাম দিতে গেলে লয় না। বলে, ই তোরা সুদ ছে—। বলে আর অপ্রতিভ হাসি হাসে একটা।

চানাচুরের ব্যবসা করিবার জন্য ফুলশরিয়াই তাহাকে কুড়িটা টাকা দিয়াছিল কিছুকাল পূর্বে। সে ভালো করিয়াই জানে যে, রামু ও-টাকা কখনও শোধ দিবে না। রামু কিন্তু রোজই বলে যে, পরের মাসেই সে সব শোধ করিয়া দিবে। বহু 'পরের মাস' আসিল এবং চলিয়া গেল, টাকা আজও শোধ হয় নাই। ফুলশরিয়া মনে মনে হাসে। যদিও সে জানে যে ও-টাকা আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না, তবু সে মুখ ফুটিয়া কখনও বলে না যে, টাকাটা তোমায় দান করিলাম। রামু বড় আত্মসম্মানী লোক, তাহার দান সে লইবে না। তা ছাড়া সে মুখ ফুটিয়া বলিতেই বা যাইবে কেন, লোকটাকে হাতে রাখাই তো ভালো। ফুলশরিয়া পেঁয়াজ কুটিতে কুটিতে রামুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রামু চলিয়া গেলে গদাইবাবু আসিবেন, তাহার পর জমাদার সাহেব। হঠাৎ ফুলশরিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। জমাদার সাহেবের কি ভীষণ গালপাট্টা, বাহিরে কি তর্জন-গর্জন, হঠাৎ মনে হয়, দুর্ধর্ষ সিংহ একটা যেন, অথচ—। ফুলশরিয়া আবার হাসিল।

।। তেইশ ।।

নিপুদা ডায়েরি লিখিতেছিল—

"যাহাদের গৃহের কোনো বন্ধন নাই, যাহারা ব্যক্তিগত কোনো সম্পত্তি স্বীকার করে না, সতীত্বের যূপকাষ্ঠে স্ত্রীপুরুষের স্বাভাবিক প্রজনন-প্রবৃত্তিকে যাহারা বলিদান দিবার পক্ষপাতী নয়, কর্ম ছাড়া যাহাদের অন্য কোনো ধর্ম নাই, এমন কি ভগবানকে পর্যন্ত যাহারা মানে না, আমি সেই দলের। আমি নির্ভীক। কোনো কিছুর খাতিরে আমি সত্যপথভ্রষ্ট হইব না। শঙ্কর আমাকে চাকরি করিয়া দিয়াছে, এই অজুহাতে শঙ্করকে বাঁচাইবার জন্য অথবা উৎপলকে তুষ্ট করিবার জন্য আমি আমার জীবনের নীতি বিসর্জন দিব না, দিতে পারিব না। আমি বিদ্রোহী। বিদ্রোহের আগুন জ্বালানোই আমার কাজ। প্রতি শ্রমিকের, প্রতি কৃষকের প্রাণে প্রাণে যে ভাব জাগাইতে হইবে, তাহা যদি শঙ্কর-উৎপলের স্বার্থের পরিপন্থী হয়, তাহা হইলে আমি নিরুপায়। কৃতজ্ঞতা? কিসের কৃতজ্ঞতা! আমার কাজের পরিবর্তে উহারা আমাকে বেতন দেয়। অমনই দেয় না। যাহা দেয়, তাহাও যথেষ্ট নয়। আমার মতো একজন কর্মী রুশ দেশে ইহার অপেক্ষা ঢের বেশি সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকে। আমিই বা থাকিব না কেন? অতিশয় স্থূল দৈহিক ক্ষুধা মিটাইবার সঙ্গতি পর্যন্ত আমার নাই। প্রায়ই ধার করিতে হয়। ভজহরি হয়তো আজই তাগাদা করিতে আসিবে। কেন আমি ধার করিব? শঙ্কর-উৎপল 'ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট' সিগারেট খাইবে, আমিই বা কেন বিড়ি ফুঁকিয়া মরিব? শঙ্কর-উৎপল শাল-দোশালা উড়াইবে, আমিই বা

দারুণ শীতে একটা সস্তা র‍্যাপার জড়াইয়া কাঁপিয়া মরিব কেন? আমি কি মানুষ নই? আমি কি উহাদের অপেক্ষা কম বিদ্বান? কম বুদ্ধিমান? আমার ক্ষুধা কি উহাদের ক্ষুধা অপেক্ষা কম প্রবল? সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যদি বিলাসিতার অনুকূল না হয়, সকলে মিলিয়া সমানভাবে দুঃখ ভোগ করিব, সকলে মিলিয়া ব্ল্যাক-ব্রেড আহার করিতে আপত্তি নাই; কিন্তু একজন পোলাও খাইবে, আর একজন পান্তা-ভাত—এ অবিচার সহ্য করা শক্ত। এ অসাম্য দূর করিতেই হইবে। আমারই যখন এই অবস্থা, তখন দরিদ্র শ্রমিক এবং কৃষকদের অবস্থা যে কি তাহা ভাবিতেও ভয় হয়। দারিদ্র্যের চাপে তাহাদের সমস্ত মন অসাড় হইয়া গিয়াছে, দুঃখকে দুঃখ বলিয়া অনুভব করিতেও পারে না। প্রতি শ্রমিককে, প্রতি কৃষককে বুঝাইয়া বলিতে হইবে, যাহারা তোমাদের পেশীর শক্তি অন্যায়ভাবে অপরহণ করিয়া ক্রমাগত নিজেদের শক্তি বাড়াইয়া চলিয়াছে, যাহাদের লোভের অন্ত নাই, তোমাদের বুকের রক্ত শোষণ করিয়া জোঁকের মত স্ফীতকায় হইতে যাহারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না, তাহাদের ওই গগনস্পর্শী প্রাসাদটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ধূলিসাৎ কর। ওই পুঁজিতন্ত্রী ধনীরাই তোমাদের শত্রু। তোমাদের ন্যায্য প্রাপ্য জোর করিয়া কাড়িয়া লও!...”

দ্বারপ্রান্তে শব্দ হইল। ভজহরি আসিল বোধ হয়। ঘাড় ফিরাইয়া নিপু দেখিল, ভজহরি নয়, দুলকি! একটু বিব্রত বোধ করিল। মেয়েটাকে আজই টাকা দিবার কথা। দুলকি কিছু না বলিয়া দ্বারপ্রান্তে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার এই স্তব্ধতা অস্বস্তিকর। নিপু যতটুকু দেখিয়াছে, তাহাতে অদ্যাবধি কোনো উচ্ছলতা সে দুলকির মধ্যে লক্ষ্য করে নাই। নির্ঝরের চাপল্য কিংবা অগ্নির প্রদাহ, মান অভিমান, সোহাগ আবদার—অর্থাৎ ইহার অন্তরের কোনো পরিচয় আজ পর্যন্ত নিপু পায় নাই। দুলকি শুধুই যেন দেহ, কেবল মাংস খানিকটা, আর কিছু নয়। কিন্তু অপরূপ সে দেহের গঠন। ক্ষীণকটি কুচভর নমিতাঙ্গী নিবিড়নিতম্বিনী দুলকি যেন জীবন্ত অজন্তা-চিত্র। কোনো শিল্পীর কল্পনা যেন মূর্ত হইয়াছে। কিন্তু এ মূর্তির মধ্যে প্রাণ নাই, থাকিলেও নিপু তাহার কোনো স্পর্শ পায় নাই। নিপুর কাছে দুলকি পাথরের মতই স্থির কঠিন নীরব। নিপু বিহ্বল হইয়া চাহিয়া রহিল। দুলকি লাল-ফুটকি দেওয়া হলুদ রঙের একটা শাড়ি পরিয়া আসিয়াছে। অবগুণ্ঠন নাই। চোখের দৃষ্টিতে শঙ্কা নাই, লজ্জা নাই, আগ্রহ নাই, প্রেম নাই, এমন কি দীপ্তিও নাই। স্থির অপলক দৃষ্টি যেন অনুচ্ছ্বসিত নীরব ভাষায় বলিতেছে, আমার পাওনাটা দিয়া দাও, আমি চলিয়া যাই।

দুলকি জাতে মুসহর; এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে মধু বিক্রয় করিতে আসে। মাথায় মধুর হাঁড়ি লইয়া ‘মধু-উ-উ-উ, মধু লিবে গো’ বলিয়া রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করিয়া বেড়ায়। সঙ্গে একজন পুরুষও থাকে। ঝাঁকড়া-চুলওয়ালা ভীষণদর্শন লোকটা, তাহারও শরীর যেন পাথরে কোঁদা, কোমরে সর্বদা একটা ছোরা গোঁজা, চক্ষুর দৃষ্টি সামান্য উত্তেজনাতেই হিংস্র হইয়া ওঠে। স্বামী বলিতে সভ্য-সমাজে যে সম্পর্ক বুঝায়, এ ব্যক্তির সহিত দুলকির ঠিক সে সম্পর্ক আছে কি না, তাহা জানা কঠিন; কিন্তু সে যে দুলকির মালিক, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। দুলকি তাহার পদানত। এই আত্মসমর্পণের মূলে কি আছে, ছোরা, না প্রেম, না, সামাজিক বন্ধন তাহাও কেহ জানে না। এইটুকু শুধু সকলে জানে যে, সে দুলকির মালিক। দুলকির এই সব নৈশ-অভিযান সে-ই নিয়ন্ত্রিত করে, উপার্জনের সমস্ত টাকা সেই লয়। কিছুকাল আগে মুশাই

এই দুলকির কবলে পড়িয়াছিল। অর্থাভাবেই হোক বা যমুনিয়ার ছট পরবের জোরেই হোক, মুশাই এখন দুলকিকে ছাড়িয়েছে। দুলকি এখন নিপুর। ফুলশরিয়ার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া নিপু কিছুদিন ক্রোধে ক্ষোভে দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছিল। বিস্ময়ও তাহার কম হয় নাই, যখন সে আবিষ্কার করিল যে, ওই ঘেয়ো লোকটা তাহার স্বামী নয়। সামান্য পণ্যরমণী হইয়াও ওই লোকটাকে সে আঁকড়াইয়া রহিয়াছে! কেন? যে বস্তুতান্ত্রিক মানদণ্ড দিয়া সে জীবনের সমস্ত রহস্য নিরূপণ করিতে অভ্যস্ত, তাহা দিয়া সে ফুলশরিয়ার চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে পারিল না। কাব্যের মুখস্থ বুলি আওড়াইয়া অবশেষে সে মনকে স্তোক দিল, প্রেমের বিচিত্র নিয়ম বোধ হয়। ইহা লইয়া বেশিদিন সে মাথাও ঘামাইল না, দুলকিকে পাইয়া ফুলশরিয়াকে ভুলিয়া গেল। সে বায়োলজিকালি বাঁচিতে চায়, দুলকি ফুলশরিয়া যে কেহ একটা জুটিলেই হইল। এখন কিন্তু দুলকিকে দেখিয়া সে একটু বিব্রত বোধ করিল। হাতে মাত্র পাঁচটি টাকা আছে। পাঁচ টাকাই উহাকে দিয়া দিলে হাত যে একেবারে খালি হইয়া যাইবে! কিন্তু দুলকির অপলক নীরব দৃষ্টিকে উপেক্ষা করা শক্ত। একটু ইতস্তত করিয়া নিপু অবশেষে পাঁচ টাকার নোটটা বাহির করিল এবং সেটা টেবিলে রাখিয়া একমুখ হাসিয়া বলিল, বৈঠো।

দুলকি বসিল না।

পাঁচ টাকার নোটটার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া স্থির কণ্ঠে বলিল, পাঁচ টাকায় হোবে না বাবু, পঁচাশ টাকা লাগবে।

মুসহরদের নিজেদের ভাষা একরূপ অদ্ভুত হিন্দি। কিন্তু বাঙালি বাবুদের সহিত ইহারা বাঁকা বাংলায় কথা বলে।

নিপু আকাশ হইতে পড়িল। বলে কি! পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে!

কাহে?

দুলকি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণপরেই যাহা ঘটিল, তাহা অপ্রত্যাশিত। নিপু চমকাইয়া উঠিল। হঠাৎ পিছনের অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া আসিল দুলকির মালিক এবং খাঁউখাঁউ করিয়া নিজস্ব ভাষায় যাহা বলিল, তাহার সারমর্ম এই—আপনিই তো হুজুর সেদিন হাটে বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, মজুরদের বেতন দশগুণ হওয়া উচিত। বাবু ভেইয়ারা তাহাদের ঠকাইয়া তাহাদের ন্যায্য মজুরি চুরি করিয়া নিজেরা বাবুয়ানি করে। কথাটা আমার বড় ভালো লাগিয়াছিল। আশা করিয়াছিলাম যে, আপনি অন্তত মজুরদের প্রতি সুবিচার করিবেন। আপনিও আর সকলের মত কম মজুরি দিতে চাহিতেছেন, এ তো বড় তাজ্জব কি বাত!

শাণিত দন্ত বিকশিত করিয়া লোকটা হাসিল। নিপু যে কি বলিবে, ভাবিয়া পাইল না। লোকটার চোখের দিকে চাহিয়া থাকিতেও পারিল না, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। এই মুখটাকে সে কি করিয়া বুঝাইবে যে, সকলে যদি সমাজতন্ত্রী না হয়, সে একা কি করিয়া হইবে, অর্থনৈতিক আইন অনুসারে তাহা যে কিছুতেই হওয়া যায় না। তাহার মনে হইল, অর্থনীতির মূল সূত্রগুলি সহজ ভাষায় ইহাদের মধ্যে প্রচার করা উচিত, তাহা না হইলে বক্তৃতার সহিত আচরণের সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। আমি নিজেও যে কত অসহায়, তাহা ইহাদিগকে বুঝাইতে না পারিলে—

চল্।

নিপু চকিতে চোখ ফিরাইয়া দেখিল, লোকটা দুলকির হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে, মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল, চোখ দুইটা দপদপ করিয়া জ্বলিতেছে। কয়টা টাকার জন্য মেয়েটা নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইবে নাকি?

আরে, ঠহরো, ঠহরো, যাও মত।

উভয়ে ফিরিয়া দাঁড়াইল। যদিও এতদিন ধরিয়া সে সাম্যবাদের মন্ত্র জপ করিয়াছে, কার্যকালে কিন্তু তাহার সুপ্ত বুর্জোয়া মনোবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। টাকা দিয়া এই ছোটলোকগুলোকে কিনিয়া রাখিবার লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না। তাহাকে অপমান করিয়া চলিয়া যাইবে! আস্পর্ধা তো কম নয়! ঘোড়দৌড়ের মাঠে জুয়াড়ির যে রকম অযৌক্তির রোখ চাপিয়া যায়, বৈজ্ঞানিক নিপুরও ঠিক তাহাই হইল। সে অশুদ্ধ হিন্দিতে বলিয়া বসিল যে, সে পঞ্চাশ টাকাই দিবে, আজ হাতে অত টাকা নাই, দুলকি কাল আসিয়া যেন টাকা লইয়া যায়।

বহুত খুব।

দুইজনেই অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

নিপু খোলা দ্বারটার দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া বসিয়া রহিল। আরও অবাক হইয়া যাইত, যদি দেখিতে পাইত, অন্ধকারে কেমন দুইজনে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত গলা ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। দেহের শুচিতা ইহাদের কাছে তত বড় নয়, মনের শুচিতা যতটা। প্রাণ ধারণ করিবার জন্য যেমন মধু বিক্রয় করিতে হয়, তেমনই দরকার পড়িলে দেহ বিক্রয়ও করিতে হয়। নারী-মাংসলোলুপ কুত্তার অভাব নাই পৃথিবীতে। তাহাদের লোভের খোরাক যোগাইয়া অর্থ উপার্জন করিতে হয় বইকি মাঝে মাঝে। অর্থটা যে অতিশয় প্রয়োজনীয় জিনিস, না থাকিলে চলে না এবং মধু বিক্রয় করিয়া সব সময়ে তাহা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহও করা যায় না। উপরি রোজগার করিতে দোষ কি? ইহাদের নীতি কমিউনিস্টিক নয়, একেবারে মহাভারতীয়। মন যদি একনিষ্ঠ থাকে, দেহ লইয়া ইহারা মাথা ঘামায় না। সমুদ্রাভিমুখিনী স্রোতস্বতীর বুকে সাময়িক খড়-কুটা জঞ্জালের মত এসব নিতান্তই সাময়িক ব্যাপার, আসে এবং ভাসিয়া যায়।... কেকার ধ্বনির ন্যায় একটা তীক্ষ্ণ শব্দ অন্ধকারকে আকুল করিয়া তুলিল। নিপুর মনে হইল, আকাশে বোধ হয় হাঁস উড়িয়া যাইতেছে। এ অঞ্চলের খালে-বিলে এ সময় হাঁস আসে। এ কিন্তু হাঁস নয়, দুলকি। স্বামীর কি একটা রসিকতায় কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়াছে। নিপু বুঝিতে পারিল না, কারণ নিপুর কাছে দুলকি কখনও হাসে নাই।... উন্মুক্ত দ্বারপথে চাহিয়া নিপু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার অন্তরের মধ্যে অতৃপ্ত লালসা, দারিদ্র্যজনিত ক্ষোভ, আদর্শনিষ্ঠা, আদর্শচ্যুতি, আহত আত্ম-অভিমান, ব্যর্থ আক্রোশ—সমস্ত যেন একটা তিক্ত বীভৎস রসের ফেনিল আবর্তে টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, যে সমাজবিধান তাহাকে এমন ক্ষুধিত অসমর্থ অসহায় করিয়া রাখিয়াছে, তাহার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার টুঁটি কামড়াইয়া ধরিতে, ভীম যেমন করিয়া দুঃশাসনের রক্তপান করিয়াছিল।

দেবতা, বাড়ি আছেন নাকি?

তড়িৎস্পৃষ্ট হইয়া নিপু যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল। মুকুন্দ পোদ্দারের কণ্ঠস্বর।

এবার ভজহরিকে না পাঠাইয়া স্বয়ং আসিবার মানে? ভজহরিই তো প্রতি মাসে সুদ লইয়া যায়। দ্বারপ্রান্তে মুকুন্দ পোদ্দার আবির্ভূত হইলেন।

এই যে, দেবতা আছেন দেখছি!

চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া পোদ্দার মহাশয় পা ঠুকিয়া ঠুকিয়া চটিজুতা হইতে ধূলি অপসারণ করিলেন। তাহার পরে ঘরে ঢুকিয়া তৈলপক্ক বেঁটে বাঁশের লাঠিটা কোণে সন্তর্পণে রাখিয়া চৌকিতে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং নিপুর দিকে চাহিয়া হাসিলেন। দন্তলগ্ন স্বর্ণখণ্ডগুলি বাতির আলোকে চকমক করিয়া উঠিল।

আপনি নিজেই এলেন যে আজ?

কেন, দেবদর্শনে দোষ কি আছে?

তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন, ভজহরির শরীরটা খারাপ। বাবু লোক সে, একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই কাবু হইয়া পড়ে। ঠাণ্ডার দিনে আমি কিন্তু হাঁটিলেই ভালো থাকি, তাই ভাবলুম, বেড়িয়েই আসি একটু।

ক্ষণকাল থামিয়া মুকুন্দ পুনরায় বলিলেন, আঃ, সেদিন হাটের বক্তৃতাটা আপনার চমৎকার হয়েছিল, অমন হক কথা বহুকাল শোনা যায়নি।

তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে অগ্নির আভা ফুটিয়া উঠিল, মুখে হাসি।

নিপু হাসিয়া বলিল, আপনারও ভালো লেগেছিল? আমার বক্তৃতা শুনে ওরা যদি জাগে, তা হলে তো আপনাদেরই বিপদ সবচেয়ে বেশি।

তা হলেও হক কথা হক কথাই। তা ছাড়া আমরা আর কদিন? আর সবচেয়ে বড় কথা কি জানেন দেবতা?—এই।

মুকুন্দ পোদ্দার ললাটের মধ্যস্থলে তর্জনী স্থাপন করিয়া হাসিলেন।

এটি যতক্ষণ আমার সপক্ষে আছে, ততক্ষণ দেবতা, কোনো বক্তৃতাকেই আমি কেয়ার করি না। এমন কি আপনার প্যামপ্লেট না কি বললেন সেদিন, তাও ছাপিয়ে দিতে আমি রাজি আছি।

রাজি আছেন?

আপত্তি কি?

নিপু যেন অকূলে কূল পাইল। কলিকাতায় যে কমিউনিস্ট দলের সহিত সে এখন নামেমাত্র সংশ্লিষ্ট আছে এবং যে দলের হরেন তালুকদার তাহার চাকরি-করা লইয়া খুব একটা ব্যঙ্গাত্মক পত্র লিখিয়াছে, হাজার কয়েক গরম প্যামপ্লেট ছাপাইয়া যদি সেই দলে ছড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার শুধু যে মুখরক্ষা হইবে তাহাই নয়, নীরব কর্মী হিসাবে হয়তো দলের মধ্যে একটা জয়জয়কারও পড়িয়া যাইতে পারে। ইহা নিতান্ত তুচ্ছ করিবার মত জিনিস নয়। এমন কি প্যামপ্লেটের ভাষায় সে যে আগুন ছুটাইবে, তাহা যদি পুলিস বিভাগের রোষ উৎপাদন করিয়া তাহাকে কারাবরণ করিতে বাধ্য করে, তাহা হইলে তো কথাই নাই, তাহার প্রতিপত্তির অন্ত থাকিবে না। উত্তেজনাপূর্ণ কোনো একটা কিছু করিতে না পারিলে তৃপ্তি নাই। এই অখ্যাত পল্লীগ্রামে একটা ক্যাপিটালিস্ট জমিদারের অধীনে হাড়ি-ডোমদের মধ্যে বাস করিয়া সহস্র বিরুদ্ধতার মধ্যে কি কাজ করা সম্ভব? কেহ তাহার একটা কথা বোঝে না।

ইহাদের মধ্যে কোনো উত্তেজনা নাই, কোনো উৎসাহ নাই, কেহ একটা কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত প্রকাশ করে না। উত্তেজনার সন্ধানেই সেদিন সে হাটে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিয়াছিল, উত্তেজনার সন্ধানেই লক্ষ্মীবাগে মণির বিরুদ্ধে চাষীদের ক্ষেপাইতেছে। কিন্তু ইহাতেও তৃপ্তি নাই। সমস্ত দেশকে মাতাইবে—ইহাই তাহার স্বপ্ন। এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে পড়িয়া থাকিলে তাহার স্বপ্ন সফল হইবে কি? মুকুন্দ পোদ্দারের কথায় তাহার অন্তরের সুপ্ত বহ্নি যেন দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মুখে কিন্তু বিশেষ আগ্রহ সে প্রকাশ করিল না, সে বিষয়ে সে খুব চালাক, অত্যন্ত নিরীহভাবেই বলিল, বেশ তো, দিন না। তা হলে তো একটা ভালো কাজ হয়।

ভালো কাজ করতে কোনো কালে পেছপা নই আমি। শঙ্করবাবু ইস্কুল করতে চাইলেন, দিলাম করে। এখন সে ইস্কুলে ছাত্তোর জুটছে না, তা তো আর আমার দোষ নয়।

ছাত্র জুটছে না নাকি?

জুটবে কি করে? যা এক মাস্টার পাঠিয়েছেন শঙ্করবাবু—লোকটার নাক সর্বদা কুঁচকেই আছে। এটা নেই, ওটা নেই, সেটা নেই—নিত্যি একটা না একটা বায়নাক্কা লেগেই আছে। তা ছাড়া বলে কি, শুনবেন? বলে, ছোটলোকের ছেলেদের গায়ে বড্ড গন্ধ, কাছে বসা যায় না। ফিনফিনে পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে এসেন্সওলা রুমাল নাকের কাছে ধরে পড়ান। এরকম হতচ্ছেদা করলে ছাত্তোর ওর কাছে ঘেঁষবে কেন—অ্যাঁ, কি বলেন আপনি? ছোটলোক হলেও ওরা মানুষ তো। এখন প্রতিটি ছাত্তোরকে যদি সাবান মাখাতে পারি, তা হলে হয়তো ওঁর মনঃপূত হয়, কিন্তু অত পয়সা আমার নেই মশাই, অমন করে লেখাপড়া শিখিয়েও কাজ নেই, আর লেখাপড়া শিখে হবে তো কচু, ইস্কুল করার চেয়ে এ দেশে অন্নছত্র খোলা ভালো। ছোটখাটো একটা খুলেওছি, গুটি দশেক লোককে খেতে দিই, তার বেশি আর পারি না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া মুকুন্দ পোদ্দার পুনরায় বলিলেন, ইস্কুল-ফিস্কুল চলবে না।

স্কুল সম্বন্ধে নিপুর নিকট হইতে কোনো মন্তব্য না শুনিয়া পোদ্দার মহাশয় ও-বিষয়ে আর আলোচনা করা সঙ্গত মনে করিলেন না। কি জানি, শঙ্করকে গিয়া যদি লাগায়! উৎপলের দক্ষিণ হস্ত শঙ্করকে চটাইবার সাহস তাঁহার নাই। স্কুল সম্বন্ধে এতক্ষণ তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা অবশ্য খানিকটা সত্য। কিন্তু স্কুল না চলিবার আসল কারণ শিক্ষকের ফিনফিনে পাঞ্জাবি অথবা তাঁহার সুগন্ধপ্রিয়তা নয়। আসল কারণ তিনি নিজেই। ভজহরির মারফত তিনিই পাকে-প্রকারে চেষ্টা করিয়াছেন, ছাত্র যাহাতে না জোটে। ভজহরি গ্রামের চাষীদের গোপনে 'টিপিয়া' দিয়াছে যে, স্কুলে যেন তাহারা ছেলে না পাঠায়, পাঠাইলে, পোদ্দারজি চটিয়া যাইবেন। ছাত্র না জুটিবার ইহাই যথেষ্ট কারণ এবং আসল কারণ।

সহাস্য দৃষ্টিতে মুকুন্দ নিপুর দিকে চাহিলেন।

প্যামপ্লেট লিখি তা হলে?

লিখুন। পাঁচজনের যদি উপকার হয়, দেব না হয় ছাপিয়ে। কিন্তু একটি শর্তে।

কি, বলুন?

একটি নয়, দুটি শর্ত আছে। প্রথম—আমার নাম কারুর কাছে প্রকাশ করতে পারবেন না। দ্বিতীয় শর্তটি একটু ইয়ে-গোছের—বুঝিয়ে বলি তা হলে শুনুন। আচ্ছা, ছোটলোকদের মধ্যে আন্দোলন চালাতে পারবেন আপনি? মানে স্ট্রাইক, ধর্মঘট এই সব?

তা চেষ্টা করলে পারি বোধ হয়।

বহুৎ আচ্ছা। একটি কাজ করতে হবে আপনাকে। শুনেছেন বোধ হয়, হৃদয়বল্লভ উৎপলের কাছ থেকে জমিদারিটা ফের কিনে নেওয়ার চেষ্টা করছে, রাজীব দিচ্ছে টাকা। এর মানেটা বুঝছেন?

নিপু কিছুই শোনে নাই। মনে মনে আশ্চর্য হইল। বাহিরে কিন্তু এমন ভাব করিল, যেন সে সব জানে।

বুঝছেন কিছু?

না।

এর মানে, ওই চশমখোর কঞ্জুস রাজীবই শেষ পর্যন্ত জমিদার হবে। আর তা হলে দুর্গতির অন্ত থাকবে না ভদ্দরলোকদের। উৎপল জমিদারি বিক্রি করুক, হৃদয়বল্লভ তা কিনুক—এ ওয়াজিব ব্যাপার, আমার কোনো আপত্তি নেই; কিন্তু রাজীবকে মাথা গলাতে দেব না আমি তার মধ্যে। হৃদয়বল্লভ যদি চায়, আমিই টাকা দিতে পারি।

বিহ্বল নিপু বলিল, আমাকে কি করতে হবে?

কিছু নয়, হৃদয়বল্লভকে এই কথাটি শুধু জানিয়ে দিতে হবে যে, রাজীবের টাকা নিয়ে আপনি যদি জমিদারি কেনেন, তা হলে আপনি শান্তিতে থাকতে পারবেন না। আমরা ধর্মঘট করব, প্রজারা যাতে খাজনা না দেয় তার চেষ্টা করব, গান্ধীর দলকে ডেকে আনিয়ে ছারখার করে দেব সব। জমিদারি আপনি কিনুন, কিন্তু রাজীবের টাকা নিয়ে নয়। আমি টাকা দিতে রাজি আছি, নিতে হলে আমার টাকাই নিন।

মানে, আপনি নিজেই জমিদার হতে চান?

মুকুন্দ পোদ্দার হাসিলেন। তাঁহার দাঁতের সোনা আবার চকমক করিয়া উঠিল।

আমি জমিদার হলে দেখবেন কি করি! নিজের মুখে আগে থাকতে বলতে চাই না কিছু, দেখবেন। প্রজার ভালো কি করে করতে হয়, তা দেখিয়ে দেব আমি।

নিপু সহসা অনুভব করিল, এই ধনী মহাজনটিকে খুশি রাখিতে পারিলে ভবিষ্যতে তাহার অনেক সুবিধা হইতে পারে। আজ শঙ্কর যেমন উৎপলের সহায়তায় প্রতাপান্বিত হইয়াছে, সেও একদিন জমিদার মুকুন্দ পোদ্দারের সহায়তায় বহুলোকের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবে। নিজের আদর্শ প্রচার করিবার সুবিধাই হইবে তাহাতে। তাহার এতদিনকার মহাজন-বিদ্বেষ সহসা যেন কুয়াশার মত মিলাইয়া গেল। এই পুঁজিবাদী লোকটার স্বার্থরক্ষা করিতে তাহার আর দ্বিধা হইল না। বলিল, আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখব।

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরেই কিন্তু মুকুন্দ পোদ্দারের আসল কথাটি মনে পড়িয়া গেল।

আজ কিছু দেবেন নাকি?

হাতে এ মাসে একদম কিচ্ছু নেই। আরও গোটা পঞ্চাশেক টাকার জরুরি দরকার। কি যে করব ভাবছি। দেবেন আপনি?

দিতে পারি অবশ্য, যদি—

একটু ইতস্তত করিয়া মুকুন্দ বলিলেন, আচ্ছা থাক, আপনার সঙ্গে আর ব্যবসাদারি নাই

করলাম, বন্ধকি দিতে হবে না আপনাকে, এমনই দেব। কাল সকালে গিয়ে নিয়ে আসবেন। আপনার সোনার হাতঘড়িটাও ফেরত দিয়ে দেব। আপনার সঙ্গে বন্ধকি কারবার আর নাই করলাম—অ্যাঁ, কি বলেন?

সহাস্য দৃষ্টিতে মুকুন্দ নিপুর দিকে চাহিলেন।

নিপু শুধু একটু মুচকি হাসিল।

রাত হল এবার ওঠা যাক।

ঘরের কোণ হইতে লাঠিটা লইয়া মুকুন্দ চৌকাঠের উপর সেটি অভ্যাসমত বার দুই ঠুকিলেন।

শীতকালে একটি সুখ কি জানেন, সাপ-খোপের ভয় থাকে না। ওই জিনিসটিকে বড় ডরাই দেবতা।

নিপু আবার মুচকি হাসিল।

মুকুন্দ পোদ্দার চলিয়া গেলেন। মুকুন্দ পোদ্দার চলিয়া গেলে নিপু আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। মনে হইল, সে যেন নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে। এতদিন যে বিত্ত সে সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, আজ যেন তাহা ডাকাতে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল। না না না, সে মুকুন্দ, রাজীব, শঙ্কর, উৎপল—কাহাকেও সাহায্য করিবে না, শত বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে একক সে সগর্বে বিদ্রোহ-পতাকা তুলিয়া যুদ্ধ করিবে, ক্যাপিটালিজ্‌মের সহিত কোনো শর্তেই রফা করা চলিবে না। মুকুন্দ পোদ্দারকে এখনই সে কথাটা বলিয়া দেওয়া ভালো। সে উঠিয়া বাহিরে গেল।

পোদ্দার মশাই!

কোনো উত্তর আসিল না। পোদ্দার মশাই অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিলেন। একটা পেচক কর্কশকণ্ঠে চিৎকার করিতে করিতে উড়িয়া গেল।

।। চব্বিশ ।।

গ্রামের ছোট স্টেশনটিতে শঙ্কর ট্রেন হইতে যখন নামিল, তখন তাহার মনে হইল, একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে যেন তাহার পরিচিত বিছানায় আবার জাগিয়া উঠিল। এতদিন একটা কদর্য ঘূর্ণাবর্তে সে যেন হাবুডুবু খাইতেছিল। দেঁতো হাসি, ছেঁদো কথা, অনান্তরিক আলাপ, সবজান্তা উন্নাসিকতা, স্বার্থসর্বস্ব মনোভাব, যুদ্ধের হিড়িক, তা ছাড়া দোকান—দোকান—দোকান—এই অল্প কয়েক দিনে কলিকাতার আবহাওয়া তাহার মনে যে গ্লানি জমাইয়া তুলিয়াছিল, কুৎসিত-দর্শন স্টেশনমাস্টারের আকর্ণবিস্তৃত আন্তরিক হাসির স্পর্শে তাহার অনেকখানি যেন ধুইয়া মুছিয়া গেল।

আমার জিনিস এনেছেন?—হাসিয়া মাস্টারমহাশয় আগাইয়া আসিলেন।

এনেছি।

ঝুড়ির ভিতর হইতে রবিনসন বার্লির কৌটাটি শঙ্কর বাহির করিয়া দিল।

বিস্তর জিনিস এনেছেন দেখছি। আরে, বা বা বা—চমৎকার, কুমোরটুলির নিশ্চয়?

হ্যাঁ। সমস্ত রাস্তা আগলে আগলে আসছি। পাছে কেউ ধাক্কা মেরে দেয়।

সরস্বতী প্রতিমাটিকে শঙ্কর সস্নেহে একধারে সরাইয়া রাখিল। ছোট প্রতিমাটি, কিন্তু নিখুঁত একেবারে।

আপনার আনা চারেক ফিরেছে। এই নিন।

ঘাড় ফিরাইয়া শঙ্কর দেখিল, মাস্টারমহাশয় নিজ প্রকোষ্ঠে অন্তর্ধান করিয়াছেন। ক্ষণপরেই তিনি থার্মোফ্লাস্ক হইতে কাপে চা ঢালিতে ঢালিতে বাহির হইয়া আসিলেন।

একটু ইস্টিম করে নিন, যা শীত!

কোথা পেলেন এই ভোরে?

আমার জন্যে এসেছিল বাড়ি থেকে। আমি আবার আনিয়ে নিচ্ছি।

না না, সেটা ঠিক হয় না।

খুব ঠিক হয়। আমি আনিয়ে নিচ্ছি এখুনি। আপনি যা জিনিস এনেছেন, গিন্নি দুহাত তুলে আশীর্বাদ করবে এখন আপনাকে।

বাড়িতে কারও অসুখ নাকি?

তিন-তিনটে মেয়ে পেটের অসুখে ভুগছে মশাই। গ্যাঁদালপাতার ঝোল আর খেতে পারে না বেচারিরা। নটবর বার্লি খাওয়াতে বলেছে, কিন্তু এ অঞ্চলে ও বস্তু পাবার জো নেই। ভাগ্যে আপনি কলকাতা গেলেন—ও ইয়েস, আপনার সব জিনিস নেমেছে তো, ও ইয়েস, অল রাইট, অল রাইট।

মাস্টারমহাশয়ের সমর্থন পাইয়া গার্ড সাহেব বাঁশি বাজাইয়া সবুজ পতাকা আন্দোলিত করিলেন। গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

চা খুব খারাপ, তবু শঙ্করের অন্তর যেন পরিতৃপ্ত হইয়া গেল। চা পান করিয়া শঙ্কর পেয়ালাটি নামাইয়া রাখিল। ইতিপূর্বে অনেকবার তাহার মনে হইয়াছে—এখন আবার মনে হইল, এই কেরানিরাই প্রকৃত ভদ্রলোক। ইহারা হয়তো 'এডুকেটেড' নয়, কিন্তু ইহারাই ভদ্রলোক। ছাপোষা বেচারিরা তথাকথিত কালচারের ধার ধারে না, কিন্তু স্বল্প আয় সত্ত্বেও ইহারাই সামাজিক সমস্ত দায়িত্ব বহন করে। থলি হাতে বাজারে যায়, ঋণগ্রস্ত হইয়া ছেলে পড়ায়, মেয়ের বিবাহ দেয়, অসমর্থ আত্মীয়কে প্রতিপালন করে, লোক-লৌকিকতা বজায় রাখে, চাঁদা করিয়া দুর্গাপূজা কালীপূজা করে, রাত জাগিয়া যাত্রা থিয়েটার শোনে। অথচ কোনো অহমিকা নাই, সর্বদাই যেন সঙ্কুচিত হইয়া আছে। স্বাতন্ত্র্যবাদী ড্রইংরুম-বিহারী আলোকপ্রাপ্ত সমাজে যে আন্তরিকতার অভাব, ইহাদের মধ্যে বাঙালি জাতির সেই সহৃদয় আন্তরিকতা এখনও জীবন্ত হইয়া আছে, ওষ্ঠ-চটক অন্তঃসারশূন্য আপ্যায়নমাত্রে পর্যবসিত হয় নাই।

আপনার চার আনা ফিরেছে, এই নিন।

সস্তায় পেয়েছেন তা হলে। ওরে বজ্‌রঙ্গি, পেয়ালাটা তুলে রাখ্ বাবা, পা লেগে ভেঙে গেলেই গেল। আচ্ছা, আমি এবার চলি, ঘানি কামাই দেওয়ার জো নেই তো।

হাসিয়া মাস্টারমহাশয় নিজ অফিসে প্রবেশ করিলেন।

মুশাই গরুর গাড়ি আনিয়াছিল। কুলির সাহায্যে সে জিনিসপত্র গরুর গাড়িতে তুলিতে

লাগিল। কাপড়চোপড়, বই-খাতা, এক ঝুড়ি কমলালেবু, এক ঝুড়ি নারকুলে কুল, বাসনপত্র, গোটা দুই কোদাল, বাংলা দেশের কুলো ধুচুনি, এক বাক্স গ্রামোফোন রেকর্ড, তা ছাড়া সুটকেশ, বিছানা—গাড়িতে বসিবার স্থান আর রহিল না। শঙ্কর ঠিক করিল, হাঁটিয়াই যাইবে। সরস্বতী প্রতিমাটি লইয়া যাওয়াই সমস্যা। স্কুলের ছেলেদের ফরমাশ, অনেক কষ্টে বাঁচাইয়া এতদূর আনিয়াছে। ছোট প্রতিমা, একটা কুলি মাথায় করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না? পারা তো উচিত। মুশাইকে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, চেটিয়া সেনি আইলোছে, ওহি লোক লে যাইতে—

ওরা এসেছে? কই, কোথায়?

মুশাইয়ের অঙ্গুলিনির্দেশে শঙ্কর দেখিল, স্টেশন হইতে একটু দূরে যে প্রকাণ্ড বটগাছটা আছে, তাহার নীচে একদল ছাত্র সত্যই বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে এখনও দেখিতে পায় নাই বোধ হয়। এই ভোরে এতটা পথ তাহারা হাঁটিয়া আসিয়াছে। তাহার নিজের ছাত্রজীবন মনে পড়িল। সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্রজীবনে কী উৎসাহই না হইত। সরস্বতী পূজার আগেরদিন রাত্রে চোখে ঘুমই আসিত না। দুবেজিকে মনে পড়িল। তিনি স্বহস্তে প্রতিমা নির্মাণ করিতেন। খড় দেওয়া হইতে শুরু করিয়া রঙ দেওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ দুবেজির বাড়িতে ধর্না দিয়া বসিয়া থাকিত সে। দুবেজির চেহারাটা স্পষ্ট মনের উপর ভাসিয়া উঠিল। বৃদ্ধ হইয়া একটু কুঁজো হইয়া পড়িয়াছিলেন, মুখে একটি দাঁত ছিল না, কপালের মাঝখানে একটি চন্দনের ফোঁটা পরিতেন। বড় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রাণ দিয়া ঠাকুরটি গড়িতেন, প্রাণ দিয়া পূজাও করিতেন। ছাত্রজীবনের সেই অতীত দিনগুলি শঙ্করের মনে সজীব হইয়া উঠিল। দেবদারুপাতা আর রঙিন কাগজের শিকল দিয়া স্কুল সাজানো, নিষ্ঠাভরে কুল না খাওয়া, পূজার দিন ভোরে উঠিয়া যবের শীষ সংগ্রহের জন্য মাঠে যাওয়া, অঞ্জলি না দেওয়া পর্যন্ত উপবাস করিয়া থাকা...। ছাত্রদল আসিয়া শঙ্করকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের চোখে মুখে কি প্রদীপ্ত উৎসাহ! তাহারা আশাই করিতে পারে নাই যে, শঙ্করবাবু সত্য সত্যই তাহাদের জন্য প্রতিমা লইয়া আসিবেন। যদির ওপর নির্ভর করিয়াই তাহারা এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছিল। কুলির দরকার কি? প্রতিমা তাহারাই বহিয়া লইয়া যাইবে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক একজন বালক সোৎসাহে আগাইয়া আসিল। মুশাই গরুর গাড়ি লইয়া আগাইয়া চলিয়া গেল। ছাত্রদের সহিত শঙ্কর পথ হাঁটিতে লাগিল।

প্রভাত হইতেছে। দুই পাশে চাষের জমি। সরিষা কাটা হইতেছে। গম এবং যবের শিষ ধরিয়াছে। চতুর্দিকেই স্নিগ্ধ শ্যামল শ্রী। ফুলে পাতায় শিশিরবিন্দু টলমল করিতেছে। কোথায় যেন একটা শ্যামা পাখি শিস দিতেছে। বকের সারি উড়িয়া চলিয়াছে। একটা ক্ষেতের মাঝখানে বসিয়া কয়েকটা কাক কলরব তুলিয়াছে। কোথাও যেন কোনো অভাব নাই, নীচতা নাই, কলহ নাই, সমস্তই যেন প্রাচুর্যে, দাক্ষিণ্যে, সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। শঙ্করের মনে হইল, এই তো আমার দেশমাতৃকা, অন্নপূর্ণা, সদাহাস্যময়ী জননী। মুগ্ধনেত্রে শঙ্কর সম্মুখের দিকে চাহিল। ছাত্রের দল সরস্বতী প্রতিমাকে মাথায় করিয়া লইয়া চলিয়াছে, যে সরস্বতী কুন্দেন্দুতুষার-ধবলা, পুস্তক-শ্রী, বীণাপাণি, সংশয়-অন্ধকার-বিনাশিনী, জ্যোতির্ময়ী বাণী। তাহার মনে হইল, ভারতবর্ষের বিশিষ্ট রূপটি আজ যেন এই প্রভাত আলোকে অপরূপ হইয়া ফুটিয়াছে।

দিগন্তবিস্তৃত শস্যশ্যামল মাঠের বুক চিরিয়া সরু একটি পায়ে-চলার পথ, সেই পথ দিয়া বিদ্যার্থীর দল বাণীমূর্তিকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে, যুগযুগান্তর ধরিয়া চলিয়াছে, কত রাজ্যের কত উত্থান-পতন হইল, ভারতবর্ষের এই মূর্তিটি কিন্তু এখনও শাশ্বত হইয়া আছে।

।। পঁচিশ ।।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

প্রকাণ্ড হল ঘরে প্রকাণ্ড টেবিলে একটা ম্যাপ বিস্তৃত করিয়া উৎপল তন্ময়চিত্তে কি যেন দেখিতেছিল। শঙ্কর আসিয়া প্রবেশ করিল।

ও কি?

তাহার স্বরটা যেন রুক্ষ। উৎপল চকিতে একবার তাহার দিকে চাহিয়া পুনরায় ম্যাপে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল এবং বলিল, আধুনিক কুরুক্ষেত্র।

ম্যাপ দেখে খবরের কাগজ পড়ছ! যুদ্ধ নিয়ে খুব উন্মত্ত হয়ে উঠেছ তা হলে?

খুব। মানব সভ্যতার এত বড় একটা ঊর্ধ্বোৎক্ষেপে তোমরা যে কি করে অবিচলিত আছ, আমি বুঝতে পারছি না।

আমরা তো উদ্ভিদ মাত্র। মানব সভ্যতার হর্ষ-বিষাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? যাদের তুমি মানব বলছ, তাদের সঙ্গে আমাদের খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ। তুমি হয়তো মানব, কিন্তু আমি নই।

উৎপল ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর টেবিল হইতে সিগারেট কেসটা তুলিয়া স্মিতমুখে খুলিয়া ধরিল।

অনেকক্ষণ সিগারেট খাওনি মনে হচ্ছে।

সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

সবিস্ময়ে ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া উৎপল বলিল, হঠাৎ এ তুষ্ণী ভাব?

শঙ্কর নির্বাক হইয়া রহিল।

ব্যাপার কি? বস্, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

শঙ্কর একটা চেয়ারে উপবেশন করিল। সিগারেট-প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিবার মত মনের অবস্থা তাহার নয়, যাহা বলিতে আসিয়াছিল তাহাই বলিয়া ফেলিল।

নিজে জামিন হয়ে ওদের ছাড়িয়ে নিয়ে এলুম।

কাদের?

ফরিদ, কারু পূরণ, আর হরিয়াকে।

কে তারা?

তোমার প্রজা। দারোগা সাহেব তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে মারধর করছিলেন, অথচ তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই।

ও।

উৎপল সন্তর্পণে সিগারেটে একটা টান দিল এবং ব্যাপারটা এইবার হৃদয়ঙ্গম করিল।

এতক্ষণ সে সত্যই কিছু বুঝিতে পারে নাই। সিগারেটে মৃদু গোছের আর একটা টান দিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

শঙ্কর আর কোনো কথা বলিল না, তাহার রগের শিরাগুলি দপদপ করিতেছিল। উৎপল ম্যাপটার ওপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া নীরবে ধূমপান করিতে লাগিল। তাহার পর সহসা বলিল, ওরা যে নির্দোষ, তা আশা করি তুমি ঠিক জান।

না, জানি না।

অথচ ওদের জন্যে জামিন হলে?

ওরা দোষী কি নির্দোষ তা জানি না বটে, কিন্তু আসল কথাটা জানি।

কি সেটা?

ওরা নিরুপায়।

বাই জোভ!

ওরা চুরি করে কেন, জান?

উৎপলের চক্ষু দুইটি কৌতুকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

জানি এবং এর পর তোমার কি বক্তৃতা যে আসন্ন, তাও জানি।

সব জেনেও ওদের বিরুদ্ধে থানা-পুলিস করতে ইচ্ছে হল তোমার?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিয়মের খাতিরে অনেক জিনিস করতে হয়। বিশেষ করে ওদের বিরুদ্ধেই আমি কিছু করিনি, চুরি হলে থানায় খবর দেওয়া উচিত বলেই দিয়েছিলাম।

থানায় খবর দিলেই চোর ঠিক ধরা পড়বে, এটা তুমি বিশ্বাস কর?

বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নই উঠছে না। চুরি হলেই থানায় খবর দেওয়াই প্রতিকারের একমাত্র উপায়। সভ্য সমাজে এ ছাড়া দ্বিতীয় আর কি উপায় আছে, বল?

সভ্য সমাজের কথা জানি না, নিজেদের সমাজের কথা জানি।

সেটা কি, খুলেই বল না?

ওই তো বললাম, আমরা নিরুপায়।

উৎপল স্মিতমুখে ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কি করতে বল তা হলে তুমি? চুরি হলে সহ্য করব?

তোমার নিজের ভাই চুরি করলে থানায় খবর দিতে? ধর, যদি তোমার একটি চোর ভাই থাকত।

তা হয়তো দিতাম না। কিন্তু পৃথিবীসুদ্ধ সকলকেই নিজের সহোদর বলে স্বীকার করতে হবে? কার্যকালে তা পারি না, কাব্য করবার সময় পারি অবশ্য।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

পুনরায় ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া উৎপল বলিল, হঠাৎ হল কি তোর? ছাড়িয়ে এনেছিস, বেশ করেছিস, আমার ওপর তম্বি কেন? আমি কি আপত্তি করছি?

মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা চালাতে দেব না তোমাকে আমি।

হঠাৎ তাহার গলার স্বর কাঁপিয়া গেল। সে আর বসিল না, উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া উৎপল অস্ফুটকণ্ঠে পুনরায় বলিল, বাই জোভ!

শঙ্কর অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অন্তরের যুক্তিহীন ক্ষোভকে অকস্মাৎ ভাষায় প্রকাশ করিয়া সে যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িতেছিল। এলোমেলো নানা কথা মনে হইতেছিল। কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। কি করা উচিত, কোথায় পথ, অসংখ্য অসহায় পল্লীবাসীদের কি করিলে উপকার হইবে? মনে হইতেছিল, সে কিছুই জানে না, অথচ পল্লীসংস্কার করিতে নামিয়াছে। নিজের অক্ষমতায় সে মনে মনে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। উৎপলের নিকট হইতে চলিয়া আসিবার পরমুহূর্ত হইতেই একটা নিদারুণ সংকোচে সে যেন মরিয়া যাইতেছিল। এমন কি বাড়ি ফিরিয়া যাইতেও তাহার সঙ্কোচ হইতেছিল। একটা কথা বার বার মনে হইতেছিল, ভাবপ্রবণতার আধিক্যবশত সে হয়তো অমিয়ার প্রতি অবিচার করিতেছে। এই তুচ্ছ কারণকে কেন্দ্র করিয়া হয়তো ঝড় উঠিবে এবং সে ঝড়ে অমিয়ার ক্ষুদ্র নীড়খানি হয়তো ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। নিজের প্রতি তাহার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। হঠাৎ কখন যে কি করিয়া বসিবে, অতর্কিতে কি হইয়া যাইবে, তাহা নিজেও সে জানে না। অন্তরের অন্তস্তল হইতে মাঝে মাঝে কিসের যেন একটা ঘূর্ণন জাগে, সুবিন্যস্ত চিন্তাধারাকে অবিন্যস্ত করিয়া দেয়, সাজানো বাগান ছারখার হইয়া যায়। হঠাৎ খুকির মুখটা মনে পড়িল—কচি দুষ্টু মুখটা। না না, উৎপলের সহিত ঝগড়া করা চলিবে না। কিন্তু উৎপল কেন তাহার মনের কথা বুঝিবে না? কেন সে এমন নির্বিকারভাবে দূর হইতে মজা দেখিবে কেবল? সভ্য সমাজের আইন মানিয়া চলাটাই কি জীবনের একমাত্র নীতি? কিন্তু উৎপলই বা করিবে কি? আইন মানিয়া চলা ছাড়া যে উপায় নাই। চুরি হইলে থানায় খবর দেওয়াই উচিত।...পরক্ষণেই ফরিদ-কারু-হরিয়ার মুখগুলি মনের ওপর একে একে ভাসিয়া উঠিল, তাহাদের পিঠের বেতের দাগগুলিও। নিরীহ ও নিরুপায় বেচারারা। সুরমার শাড়ি গহনা উহারা যদি লইয়াই থাকে, নিতান্ত পেটের দায়েই...সহসা মনে হইল, সুরমা হয়তো উৎপলের নিকট সব শুনিয়াছে, হয়তো তাহার কথা লইয়া দুই জনেই এতক্ষণে হাসাহাসি করিতেছে... হঠাৎ তাহার রাগ হইল, আবার পরক্ষণেই লজ্জা হইল।...

শঙ্কর নাকি?

কে?

শঙ্কর হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল।

আমি নিপু।

ও, নিপুদা। বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি?

না। আমি মুকুন্দ পোদ্দারের বাড়ি থেকে ফিরছি। তোমার সঙ্গেও একটু দরকার ছিল, একটা কথা বলতে চাই তোমাকে।

কি, বলুন? চলুন, বাড়ির দিকেই ফেরা যাক।

চল।

নিপুদার সান্নিধ্যে শঙ্কর যেন আত্মস্থ হইল। যে দ্বন্দ্ব এতক্ষণ তাহার চিত্তকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছিল, তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল। উৎপলের জমিদারির সর্বেসর্বা ম্যানেজার জনৈক কর্মচারীর প্রয়োজনীয় আলাপ শুনিবার জন্য সহসা অতিশয় স্বাভাবিকভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিছুই যেন হয় নাই।

কি বলবেন, বলুন?

মুকুন্দ পোদ্দারকে যে কথা বলবার জন্যে গিয়েছিলাম, তোমাকেও সেই কথাই বলতে চাই। আমি তোমাদের শত্রু!

শত্রু!

শঙ্কর বিস্মিত হইল। মুহূর্ত মধ্যে তাহার মন অজ্ঞাতসারেই যেন শত্রুর বিরুদ্ধে বর্মাবৃত হইয়া গেল। কমিউনিস্ট নিপুদা।

আপনি আমাদের শত্রু। বলেন কি?

হ্যাঁ, শত্রু। আমি কমিউনিস্ট, তোমরা ক্যাপিটালিস্ট, তোমাদের উচ্ছেদ করাই আমার ধর্ম। তোমাদের সঙ্গে আপস করে চলতে পারব না আমি।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শঙ্কর বলিল, আমার ধারণা ছিল, আমরা সবাই এক দলের।

ভুল ধারণা ছিল। আমি অন্য জাতের লোক।

অন্য জাত মানে? অ-ভারতীয়?

না, কমিউনিস্ট।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, একটা নামের লেবেল লাগিয়ে দিলেই যে জাত বদলে যায়, তা তো জানতুম না। যে লেবেলই লাগান নিপুদা, একটা কথা ভুলে যাবেন না, আমরা সকলেই নিরুপায় পরাধীন ভারতবাসী, এখন ওই আমাদের একমাত্র পরিচয় জগতের কাছে।

ভুলব কেন? মুহূর্তের জন্যেও ভুলি না সে কথা। ভুলি না বলেই, যে ক্যাপিটালিজম এই পরাধীনতার কারণ, যে ক্যাপিটালিজমের তোমরা পৃষ্টিপোষক, সেই ক্যাপিটালিজমকে ধ্বংস করতে চাই আমরা। আমরা চাই সাম্য।

কে না চায়? পৃথিবীতে যুগে যুগে সভ্য মানুষের ওই তো আদর্শ, ওই তো স্বপ্ন।

স্বপ্ন কিন্তু এখন আর স্বপ্নমাত্র নেই, রাশিয়ায় তা সফল হয়েছে। আমরাও যদি তাদের পন্থা অনুসরণ করি—

রাশিয়ায় কি সর্বজনীন সাম্য হয়েছে বলে আপনার বিশ্বাস? আমার তো মনে হয়, সেখানে চাকাটা ঘুরে গেছে শুধু। সেখানেও হিংস্র বর্বরতা অসহায় দুর্বলকে শোষণ করছে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত শ্রমিকরা নির্যাতন করছে ক্ষমতাচ্যুত ধনিকদের। একে আপনি সাম্য বলেন? সাদা চামড়া যেমন অস্পৃশ্য করে রেখেছে কালো চামড়াকে, সোবিয়েটও তেমনি অস্পৃশ্য করে রেখেছে 'কুলাক'দের।

কালা আদমি আর 'কুলাক' এক জাতীয় নয়। উপমাটা ঠিক হল না তোমার।

বিশেষ তফাত কি? কালো হয়ে জন্মানোটাই যদি অপরাধ বলে না ধরেন, ধনী হয়ে জন্মানোটাই বা অপরাধ বলে ধরবেন কেন?

ধনী হয়ে কেউ জন্মায় না, গরিবের রক্ত শোষণ করে তবে লোক ধনী হয়।

সত্যি সত্যি গরিবের রক্ত শোষণ যারা করেনি, ধনীর বংশে জন্মগ্রহণ করেছে—এইমাত্র যাদের অপরাধ, তাদেরও আপনারা নিস্তার দেননি।

রক্তবীজের বংশ নির্মূল করাই উচিত।

ওটা আপনাদের রাগের ভাষা। একটু তলিয়ে দেখেন যদি, কালা আদমি আর ধনীদের

উপমাটা নেহাত খেলো মনে হবে না। একটি বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ, যেমন কালো হয় তেমনই একটা বিশেষ অর্থনৈতিক পরিবেশে বুদ্ধিমানও ধনী হয়। গরিব হয় বোকারা। বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসারেই এসব হয়, এর জন্যে ন্যায়ত কাউকে অপরাধী করা যায় না। শক্তি অথবা বুদ্ধি থাকা পাপ নয়।

ডাকাতকেও তা হলে অপরাধী করা যায় না তোমার মতে। তার শক্তি, বুদ্ধি দুইই আছে।

শক্তি আর বুদ্ধির যুদ্ধে সে যদি জয়ী হয়, বিজ্ঞানের চোখে নিশ্চয়ই সে অপরাধী নয়, বৈজ্ঞানিক তাকেই বাহবা দেবে, বিজয়ী সোভিয়েটকে এখন আপনারা যেমন দিচ্ছেন।

অসহায় দুর্বলরা তাদের প্রাপ্য ফিরে পেয়েছে বলে দিচ্ছি, অন্য কোনো হেতু নেই। আমরা অত্যাচারী শোষকের বিরুদ্ধে—

অসহায় উদ্ভিদ গরু ছাগল মুরগি মাছ—এদের দিক দিয়ে ভেবে দেখলে সমস্ত মানব জাতিটাকেই তা হলে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হয়।

তোমার মত ক্যাপটালিস্টসুলভ কল্পনাশক্তি আমার নেই। আমি মানুষ, মানুষের সুখ-দুঃখের কথাই ভাবি। গরু-ছাগলের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার মত বাজে কবিত্ব আমার নেই। মানুষের মধ্যে যারা বঞ্চিত দুর্গত সর্বহারা, যাদের ঠকিয়ে ঠকিয়ে তোমরা বড়লোক হয়েছ, আমি তাদের দলে, তুমি যতই না কবিত্ব কর।

কবিত্ব নয়, বায়োলজি। বায়োলজিস্টের চোখে জীবজগতের দুটি মাত্র দল আছে—বিজিত এবং বিজেতা। উদ্ভিত গরু ছাগল মুরগি মাছ এবং আপনার ওই বঞ্চিত দুর্গত সর্বহারারা বায়োলজিস্টের বিচারে একশ্রেণীভুক্ত, জীবনযুদ্ধে সক্ষম লোকের কাছে ওরা হেরে গেছে কিংবা যাচ্ছে।

যারা মানুষকে মুরগি-মাছের সামিল করে দেখে, তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের যুদ্ধ। আমরা বঞ্চিতদের দলে। ওরাও যাতে পৃথিবীতে মানুষের মতো বাঁচতে পারে, প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করব আমি।

আমরাও তো সেই চেষ্টাই করছি। সেইজন্যই তো আপনাকে ডেকে এনেছি, আপনি আমাদের শত্রু ভাবছেন কেন?

নিপুদা চুপ করিয়া রহিল। অন্ধকারে কিছুক্ষণ পথ চলিয়া শঙ্কর আবার প্রশ্ন করিল, হঠাৎ আপনার আজ এ কথা মনে হচ্ছে কেন?

হঠাৎ হয়নি, বরাবর এই আমার মত। এতদিন সে কথা বলবার সাহস ছিল না। এখন মনে হচ্ছে, দু'নৌকায় পা দিয়ে আমি চলতে পারব না।

সত্যিই কি নৌকো দুটো? আমরা সবাই কি এক নৌকাতেই ভাসছি না?

না। কবিত্ব করে আসল সত্যটা কিছুতেই ঢাকা দিতে পারবে না। তোমাদের সঙ্গে আমার অনেক তফাত। তোমরা সুখী। অন্তত দেহের স্বাভাবিক ক্ষুধা মেটাবার সঙ্গতি তোমাদের কাছে, আমার নেই। কোনোক্রমে কদন্ন খেয়ে, ভয়ে ভয়ে কুৎসিত নারীসঙ্গ করে, দেঁতো হাসি হেসে আমাকে যে দুর্বহ জীবন যাপন করতে হয়, তার সঙ্গে তোমাদের জীবনের কিছুমাত্র মিল নেই। তোমাদের অধীনে থেকে তোমাদের অনুগ্রহ-প্রদত্ত যৎসামান্য বেতন নিয়ে হাড়ি-পাড়ার কদর্যতার মধ্যে বাস করে এ কথা কিছুতেই আমি মানতে পারব না যে, আমরা এক

নৌকোতে ভাসছি। আমাদের জাত আলাদা, আমরা বঞ্চিত, তোমরা বঞ্চক। মিথ্যা অভিনয় করতে পারব না আমি।

শঙ্করের কানের দুই পাশ সহসা গরম হইয়া উঠিল। তবু আত্মসম্বরণ করিয়া রহিল সে এবং ক্ষণকাল পরে সংযতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কি করবেন তা হলে?

আজই কলকাতায় চলে যাব। মিথ্যার মুখোশ পরে তোমাদের অধীনে কাজ করা পোষাল না আমার।

বেশ।

আচ্ছা, চলি তা হলে।

নিপুদা হঠাৎ বিপরীত দিকে ঘুরিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বিস্মিত শঙ্কর বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। উদীয়মান ক্রোধ কোথায় বিলীন হইয়া গেল, নিপুদার কাতর অন্তরটা সহসা যেন অতি স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইল সে। শুধু নিপুদার নয়, দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত যুবকদের করুণ মর্মকথা নূতন করিয়া তাহার চিত্তকে উন্মথিত করিয়া তুলিল। সত্যই বঞ্চিত বেচারারা। লেখাপড়া শিখিবার সময় আদর্শ জীবনের যে স্বপ্ন তাহারা দেখে, লেখাপড়া শেষ করিয়া কিছুতেই তাহারা বাস্তব জীবনে সে স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিতে পারে না। মরীচিকার মত কেবলই তাহা দূর হইতে প্রলুব্ধ করে, কিছুতেই নাগালের মধ্যে ধরা দেয় না। আদর্শ জীবন দূরে থাক, স্বাভাবিক জীবন যাপন করিবারই সুযোগ মেলে না, অতিশয় স্থূল আধিভৌতিক ক্ষুধা মিটাইবারও সঙ্গতি নাই। ঘরের পরের—সকলের অবজ্ঞা-উপহাস সহ্য করিয়া চাকরির চেষ্টায় আপিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া, মুক্তির চেষ্টায় অবশেষে হয় স্বদেশি, না হয় সাহিত্যিক হয়। শঙ্কর আবার পথ চলিতে শুরু করিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, ফরিদ কারু হরিয়া পূরণই কেবল নয়, নিপুদা, এমনকি, সে নিজেও একদলভুক্ত, জীবনযুদ্ধে পরাজিত লাঞ্ছিত অপমানিত। নিপুদাদের দুঃখটা আরও বেশি মর্মান্তিক। কল্পনায় তাহারা যে মহত্তর জীবনের স্বাদ পাইয়াছে, বাস্তবে কিছুতেই তাহাকে মূর্ত করিয়া তুলিতে পারিতেছে না। পিপাসা জাগিয়াছে, কিন্তু পানীয় নাই, আছে শুধু স্বপ্ন। আলো কি তাহা জানে, মিলিয়াছে কিন্তু আলেয়া। ফরিদ কারু হরিয়াদের অভাব আছে, কিন্তু স্বপ্ন নাই। তাই তাহারা অভাবের মধ্যেও সুখী। স্বপ্নই পাগল করিয়া তোলে। পরাজিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, এই কথাগুলাই বারবার মনে মনে আবৃত্তি করিতে করিতে শঙ্কর পথ চলিতে লাগিল। বার বার তাহার মনে হইতে লাগিল, সুমহৎ হিন্দু সভ্যতার ঐতিহাসিক আস্ফালনে মাতিয়া যত বাগাড়ম্বরই আমরা করি না কেন, এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে কিছুতেই উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না যে, আমরা হারিয়া গিয়াছি। বিজয়ী প্রতিপক্ষের নিষ্ঠুর প্রহারে আমরা মরণোন্মুখ, কেবলমাত্র হিন্দু সভ্যতার জয়গান করিয়া গীতা-উপনিষদ্-রামায়ণ-মহাভারত আওড়াইয়া কিছুতেই সে মৃত্যুকে রোধ করা যাইবে না। সহসা তাহার মনে হইল, সনাতন আর্য সভ্যতা সত্যই যদি এত মহৎ ছিল, তবে তাহা সগৌরবে বাঁচিয়া থাকিতে পারিল না কেন? বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব কেন সম্ভবপর হইল? মুসলমানই বা আসিল কেন? তাহা ছাড়া আর্য সভ্যতার যাহা লইয়া আমরা গর্ব করি, তাহার সহিত আমাদের অন্তরের নিবিড় যোগ কতটুকু? যাঁহারা রামায়ণ-মহাভারত-গীতা-উপনিষদ্ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এবং আমরা কি একজাতের লোক? রামায়ণ-

মহাভারতে বর্ণিত চরিত্র কি আমাদের চরিত্র? কিছুমাত্র কি মিল আছে? মিল আছে বরং ইউরোপের। যে আর্যরা এখন ইউরোপে রাজত্ব করিতেছে, সেই আর্যদেরই একটা অংশ ভারতবর্ষে একদা আসিয়াছিল, তাহাদেরই কীর্তিকলাপ, তাহাদেরই সভ্যতা বেদ-উপনিষদ্-রামায়ণ-মহাভারতে লিপিবদ্ধ আছে, ইউরোপের ইতিহাসে কাব্যে বিজ্ঞানে যেমন লিপিবদ্ধ আছে ইউরোপীয় আর্য সভ্যতার কাহিনী। আমরা কি আর্য? মোটেই নয়। ওসব বলিয়া আমরা বৃথা গর্ব করিয়া মরি। আমরা পরাজিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, শোষিত, পদদলিত—এইটুকুই ঐতিহাসিক সত্য, এই সত্যটা যদি কাঁটার মত মর্মে বিঁধিয়া থাকে, তবেই হয়তো উদ্ধারের উপায় আছে। সহসা তাহার মনে হইল, মর্মে কি বিঁধিয়া নাই? প্রতি পদে প্রতি কশাঘাতের সহিত কি মনে পড়িতেছে না, আমরা অক্ষম অশক্ত অপটু নিবীর্য স্বপ্নবিলাসীর দল? কিন্তু কই, উদ্ধারের উপায় তো দেখা যাইতেছে না? আমাদের অপটুতা লইয়া আমাদের নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করিতেছি, আমাদের দুঃখ দৈন্য লইয়া কবিত্ব করিতেছি, রাজনীতির নামে হয় খোশামোদ, না হয় দলাদলি করিতেছি, উদ্ধারের উপায় সন্ধান করিতেছি কই? আমাদের শক্তি বাড়িতেছে কই? তাহা ছাড়া আমরা মানে কাহারা? এই গ্রামের লোক। বেহারিরা? বাঙালিরা? ভারতবাসীরা, না এশিয়াবাসীরা? না, পৃথিবীর যেখানে যত দুর্গত দুর্ভাগারা আছে সকলে?... হাঁটিতে হাঁটিতে সহসা সে স্থির করিয়া ফেলিল, নিপুদাকে যাইতে দেওয়া হইবে না। নিপুদার বাসায় গিয়া যখন যে হাজির হইল, তখন নিপুদা তোরঙ্গ গোছানো শেষ করিয়া বিছানা বাঁধিতেছেন। বাহিরে একটা গরুর গাড়ি অপেক্ষা করিতেছে।

নিপুদা, আপনার যাওয়া হবে না।

নিপুদা শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইল না। যদিও সে যাইবে বলিয়াই ঠিক করিয়াছিল, তবু শঙ্করের কথায় মনে মনে যেন একটু তৃপ্তি অনুভব করিল। মুখে বাঁকা হাসিটি ফুটিয়া উঠিল।

আমি থাকতে পারব না ভাই, মাপ কর। যে কাজের ভার তুমি আমাকে দিয়েছ, আমি তার উপযুক্ত নই। তা ছাড়া তোমার সঙ্গে মতেরও মিল নেই আমার।

আমার মত যে ঠিক কি, আমিই তা জানি না। অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছি কেবল। আপনি চলে যাবেন না নিপুদা।

শঙ্করের কণ্ঠস্বরে এমন একটা মিনতি ফুটিয়া উঠিল যে, নিপুদা অবাক হইয়া গেল। অন্ধকারে অসহায় পথভ্রষ্ট পথিক যেন সাহায্য চাহিতেছে।

তোমার মতের ঠিক নেই, অথচ তুমি দেশের কাজে নেমেছ? তোমার একটা উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়?

দেশের ভালো হোক—সর্বান্তঃকরণে এই আমি চাই, এর বেশি আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

ভালো মানে কি? মাড়োয়ারিরা বেশি বড়লোক হোক?

সে সব আলোচনা পরে হবে, আপনি এখন বিছানা খুলুন।

পরস্পর উভয়ের দিকে নির্নিমেষে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। তাহার পর নিপুদা বলিল, আচ্ছা, তুমি এত করে বলছ যখন, আজকে অন্তত যাওয়াটা স্থগিত রাখলুম, পরে কি করব বলতে পারি না।

শঙ্কর বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, লক্ষ্মীবাগের মণি তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। মণি স্বাস্থ্যবান যুবক। শুধু দেহ নয়, মনও তাহার বলিষ্ঠ। কলেজে পড়াশোনা শেষ করিয়া চাষ করিতেছে, চাকরি পাইয়াও চাকরি করে নাই। খুব ভালো শিকারি, কলেজে নামকরা স্পোর্টসম্যান ছিল।

কি হে, কি খবর?

গুলাব সিং রোজ মোষ পাঠিয়ে আমার গমের ক্ষেতে চরিয়ে দিচ্ছিল, আমি দুদিন লোক পাঠিয়ে ভদ্রভাবে তাকে মানা করেছিলাম, তবু কাল আবার তার মোষ এসেছিল— এই পর্যন্ত বলিয়া মণি চুপ করিল।

তারপর?

আমি গোটা দুই মোষ গুলি করে মেরেছি কাল।

মেরেছ!

না মেরে উপায় কি, ভদ্রভাবে বললে যখন শুনবে না? আমার একশো বিঘে গম কিভাবে নষ্ট করেছে, আপনি যদি দেখেন গিয়ে—

তাহার চোখ দুইটি জ্বলিয়া উঠিল।

আমাকে কি করতে হবে?

গুলাব সিং দাঙ্গাহাঙ্গামা করবে শুনে উৎপলবাবুর কাছে এসেছিলাম, তিনি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শঙ্কর বলিল, তুমি থানায় গিয়ে একটা ডায়েরি করে দাও আপাতত।—বলিয়াই তাহার মনে পড়িয়া গেল, এই থানা লইয়াই কিছুক্ষণ আগে উৎপলের সহিত তাহার ঝগড়া হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা ছাড়া কি-ই বা করিবার আছে এখন? ওই ঘুষখোর দারোগাটার কাছেই প্রতিকারের জন্য ছুটিতে হইবে।

মণি উঠিয়া দাঁড়াইল।

আপনি বলছেন যখন, যাচ্ছি আমি থানায়, কিন্তু ওতে কিছু হবে না। আমি এসেছিলাম গোটা কয়েক লাঠিয়াল সিপাহি চাইতে। বেশি নয়, গোটা দশেক সিপাহি যদি আমাকে দেন, মেরে পস্তা উড়িয়ে দিতে পারি আমি ব্যাটাদের।

আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে। আগে আইনত চেষ্টা করে দেখা যাক।

মণি উঠিয়া গটগট করিয়া চলিয়া গেল। শঙ্করের ব্যবস্থাটা তাহার মনঃপূত হইল না।

রহিম আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

হুজুর, দশঠো রুপিয়াকা বড়া—

শঙ্করের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। এক মুহূর্ত তাহাকে শান্তি দিবে না ইহারা।

হিঁয়া কি রূপিয়াকা গাছ হ্যায়? ভাগো হিঁয়াসে।

কণ্ঠস্বর অতটা উচ্চ করিতে সে চাহে নাই, কিন্তু উচ্চ হইয়া পড়িল।

রহিম সভয়ে বারান্দা হইতে নামিয়া গেল। তাহার ভীতচকিত দৃষ্টি শঙ্করকে কষাঘাত করিল যেন।

শুনো।

রহিম ফিরিয়া দাঁড়াইল।

ক্যা করেগা রুপিয়া লেকে?

তিন দিনসে বালবাচ্চা সব ভুখা হ্যায় হুজুর। কুছ নেই খায়া। মোদিকা দোকানমে দশ রুপিয়া বাকি হ্যায়, ই রুপিয়া নেহি দেনেসে আর উধার নেহি মিলেগা।

সসঙ্কোচে সে থামিয়া গেল। আশা-আকাঙক্ষাভরা দৃষ্টি তুলিয়া চকিতে শঙ্করের মুখের দিকে একবার চাহিল। নিরুপায় শঙ্কর পকেট হইতে ব্যাগটা বাহির করিল। দেখিল, পাঁচটা টাকা আছে। ঘরে ঢুকিয়া ড্রয়ার হইতে আরও পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া আনিল। টাকা লইয়া রহিম সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। শঙ্কর বাড়ির ভিতর গেল না। বারান্দায় ক্যাম্পচেয়ারটায় বসিয়া পড়িল। মনে হইল, সে যেন আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না, পা দুইটা যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল। অমিয়াকে ডাকিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু গলা দিয়া কোনো স্বর বাহির হইল না। পাথরের মত কি একটা যেন কণ্ঠরোধ করিয়া আছে। আর একদিন ঠিক এমনই হইয়াছিল, যেদিন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ আসে।... একা অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সহসা তাহার দুই চক্ষু জ্বালা করিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

।। ছাব্বিশ ।।

শঙ্করের সহিত তর্ক করিবার পর হইতে কুন্তলা মনে মনে কেমন যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, নিজের কাছেই যেন সে ছোট হইয়া গিয়াছে। কলেজের ডিবেটিং ক্লাবে সে তর্ক করিত, সেই অভ্যাসবশেই সেদিন সে নিজেকে সংযত করিতে পারে নাই। ভুলিয়াই গিয়াছিল, কলেজের ডিবেটিং ক্লাবে যাহা শোভন, শ্বশুরবাড়িতে তাহা শোভন নহে। তাহা ছাড়া তর্ক করিয়া লাভ কি? তর্ক করিয়া কখনও কাহারও স্বভাব বা মত পরিবর্তন করা যায় না। মুখে স্বীকার করিলেও মনে মনে যে যাহা, তাহাই থাকিয়া যায়। তর্ক করিয়া সময় নষ্ট হয়, নিজের মর্যাদাও নষ্ট হয়। কুন্তলা তর্ক করা ছাড়িয়া দিয়াছে। সুরমার সঙ্গেও আর সে তর্ক করে না। সে অনুভব করিয়াছে, সুরমা তর্ক করে সত্য উদঘাটনের জন্য নয়, তাহার গোঁড়ামিকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য। সুরমা অবশ্য কোনো অভদ্রতা করে না, কোনো অপ্রিয় কথা বলে না। তাহার সভ্য শিক্ষিত আচরণে এমন কিছুই প্রকাশ পায় না, যাহা লইয়া ন্যায়সঙ্গতভাবে রাগ করা চলে। কুন্তলার গোঁড়ামিতে সুরমা বিস্ময় প্রকাশ করে, প্রতিবাদ করিলেও এমন সুষ্ঠু সহাস্য ভঙ্গিতে করে যে, তাহাতে সোজাসুজি অসন্তুষ্ট হওয়া যায় না। কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টিতে, হাসির টুকরায়, বিস্মিত ব্যাজস্তুতিতে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা যে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গই তাহা বুঝিতে কুন্তলার বিলম্ব হয় না। অনেক সময় সুরমা কুন্তলার কথায় সায়ও দেয়. কিন্তু তাহা যেন বয়স্ক ব্যক্তির শিশুর অসঙ্গত কথায় সায় দেওয়ার মত। কুন্তলা তাই আর তর্ক করে না। যাহা তাহার অন্তরের বস্তু, যাহাকে সে জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, যাহার প্রতি সামান্যতম অশ্রদ্ধাও সে সহ্য করিতে পারে না, তাহা লইয়া এই মূঢ়দের সহিত সে আর বচসায় প্রবৃত্ত হইবে না। টেনিস বল লইয়া লোফালুফি করা যায়,

অন্তরে বেদনা লওয়া যায় না। আজকাল সুরমার সঙ্গ তাই সে এড়াইয়া চলিতেছে। তাহার ভয় হয়, হয়তো কথায় কথায় এমন কিছু বলিয়া ফেলিবে, যাহা তাহার আদর্শের পক্ষে গ্লানিকর। ইহাদের চক্ষে নিজের আদর্শকে সে কিছুতেই কোনো কারণেই খাটো করিবে না। যে স্বার্থসর্বস্ব পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মুখোশ পরিয়া ইহারা নাচিয়া বেড়াইতেছে, সে সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতাকে লইয়া ব্যঙ্গ করিতে যাওয়াটাও গ্লানিকর। ক্ষুদ্রকে ব্যঙ্গ করিতে গেলে নিজেকেও ক্ষুদ্রের পর্যায়ে নামাইয়া আনিতে হয়। একবার তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার যে অগ্রগতির প্রশংসায় সকলে পঞ্চমুখ, সেই অগ্রগতির স্বরূপটা বিশ্লেষণ করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে। ও দেশের মনীষা নানারকম আশ্চর্য যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে সন্দেহ নাই, চমৎকৃত হইতে হয়। কিন্তু আরও চমৎকৃত হইতে হয় সে যন্ত্রের ব্যবহার দেখিয়া। ওই সব অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য যন্ত্র লইয়া সকলে চুরি ডাকাতি রাহাজানি করিয়া বেড়াইতেছে। তাহা না করিলে অগ্রগতি হইবে কি করিয়া! কিন্তু প্রবন্ধ রচনা করিবার বাসনাও সে ত্যাগ করিয়াছে। সে কিছুই করিবে না, কাহারও কথায় থাকিবে না, কাহারও সহিত মিশিবে না। অনাড়ম্বরে নিজের আদর্শকে অনুসরণ করিবে কেবল, আস্ফালন করিবার প্রয়োজন কি? সে স্বতন্ত্রভাবে থাকিবে। হরিহর পর্যন্ত কুন্তলার পরিবর্তিত আচরণে বিস্মিত। তাহার স্বামীভক্তি যেন বাড়িয়া গিয়াছে। প্রত্যহ স্বামীর পাদোদক পান করে। হরিহর প্রথমে একটু আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু তাহার আপত্তি টেকে নাই। সেদিন দ্বিপ্রহরে কুন্তলা নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া নিপুণভাবে ছুরি দিয়া দাঁত খুঁটিবার খড়কে প্রস্তুত করিতেছিল। দুই বেলা আহারের পর হরিহরের খড়কে না হইলে চলে না। এতদিন ন্যাংড়াই খড়কে প্রস্তুত করিত, কোনোটা বেশি সরু, কোনোটা বেশি মোটা হইত। হরিহরের খুব যে একটা অসুবিধা হইত তাহা নয়, কোনোদিন এ বিষয়ে কিছু বলেও নাই সে, তবু স্বামীর এতটুকু অসুবিধাই বা কুন্তলা হইতে দিবে কেন?

হরিহর আসিয়া প্রবেশ করিল।

তোমাকে নেওয়ার জন্যে উৎপলের বাড়ি থেকে গাড়ি পাঠিয়েছে।

আমি আর এখন যাব না।

ওগুলো তো ন্যাংড়াও করতে পারে, তুমি ঘুরে এস না।

কুন্তলা কোনো কথা বলিল না, কেবল যেমন তাহার স্বভাব, হাসিভরা চোখ তুলিয়া স্বামীর দিকে একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র।

।। সাতাশ ।।

উৎপলের আজ জন্মতিথি। সমস্ত দিন শঙ্কর বাড়ি ছিল না। তাহাকে যাইতে হইয়াছিল লক্ষ্মীবাগে, মণির ব্যাপারে তদন্তের জন্য। তাই দুপুরবেলা সে আসিতে পারে নাই। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, সুরমার চিঠি লইয়া একজন চাকর তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। চিঠিতে তেমন বিশেষত্ব কিছু ছিল না। সাধারণ কাগজে সংক্ষিপ্ত নিমন্ত্রণলিপি।—

শঙ্করবাবু,

আজ আপনার বন্ধুর জন্মদিন। দুপুরে তো আপনাকে পাওয়াই গেল না। অমিয়া একা

মেয়ে নিয়ে এসেছিল। আপনি সন্ধ্যায় এখানে নিশ্চয়ই আসবেন, রাত্রে আমাদের এখানেই খেয়ে যাবেন। আসবেন কিন্তু নিশ্চয়। আপনার জন্য অপেক্ষা করব আমরা।

ইতি—

সুরমা

সেদিনের পর হইতে শঙ্কর আর উৎপলের কাছে যায় নাই। উৎপলের আজ যে জন্মদিন, সে কথাও তাহার মনে ছিল না। চিঠিটার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া এ সঙ্কল্পও সে একবার করিল যে, যাইবে না। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হইল, না গেলে ব্যাপারটা আরও দৃষ্টিকটু হইয়া উঠিবে। তাহা ছাড়া না যাইবার কোনো সঙ্গত কারণ তো নাই। একা একা বাড়িতে বসিয়া কি করিবে এখন? অমিয়া বাড়ি নাই। দাইটা বলিল, খুকিকে লইয়া স্যানিটেশন বিভাগের চৌধুরীদের বাড়িতে বেড়াইতে গিয়াছে সে। চৌধুরীর স্ত্রীর সহিত তাহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব, প্রায়ই সেখানে যায়। সুরমা কুন্তলা অথবা হাসির সহিত তাহার তেমন ভাব নাই, যত ভাব চৌধুরীর স্ত্রীর সহিত। শঙ্কর বাড়ির ভিতরে জামা বদলাইবার জন্য একবার ঢুকিল। ঘরে তালা বন্ধ, সমস্ত বাড়িটা যেন খাঁ-খাঁ করিতেছে। সমস্ত বাড়িটাই যেন ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। ছোট্ট দুইটি প্রাণী, কিন্তু সমস্ত বাড়িটাকে যেন পূর্ণ করিয়া রাখে। মুশাই বাহিরের ঘরে স্টোভ জ্বালিয়া চা করিয়া দিল। চা পান করিয়া শঙ্কর ঠিক করিয়া ফেলিল, যাইবে, মনটা তবু একটু খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। সেদিনের ওই হাস্যজনক কাণ্ডের পর সহজভাবে উহাদের সম্মুখে সে যাইবে কি করিয়া! সেদিন তাহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে যাহা উৎসারিত হইয়াছিল, তাহা যুক্তির আলোকে আজ তাহার নিকটও হাস্যজনক বলিয়া মনে হইতেছে।

সূর্যালোকস্পর্শে কুয়াশা যেমন বিলুপ্ত হয়, সুরমার হাসির স্পর্শে শঙ্করের মনের সমস্ত গ্লানি তেমনি নিমেষে মুছিয়া গেল যেন। অতিশয় তুচ্ছ কারণে সহসা উদ্দীপ্ত উত্তেজনায় উৎপলের সহিত তাহার যে মনোমালিন্য ঘটিয়া গেল বলিয়া শঙ্করের ধারণা হইয়াছিল এবং যে ধারণাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার মন অস্বস্তিতে আশঙ্কায় বিতৃষ্ণায় ক্ষোভে সম্ভব-অসম্ভব নানা কাল্পনিক বিভীষিকা সৃষ্টি করিতেছিল, তাহা নিঃশেষে অবলুপ্ত হইয়া গেল স্মিতমুখী সুরমার সানন্দ অভ্যর্থনায়।

আসুন।

একটি কথা মাত্রই সুরমা বলিল। কিন্তু তাহার আলোকিত দৃষ্টি, হাস্যোজ্জ্বল অধর, অভ্যর্থনার প্রসন্ন ভঙ্গিমায় যাহা প্রকাশ পাইল, তাহাতে তাহার মনের গ্লানিই শুধু মুছিয়া গেল না, মনে রঙও ধরিয়া গেল। যে বীণার তার বহুকাল অনাহত ছিল, তাহা সহসা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল যেন। শঙ্কর স্পন্দিত বক্ষে বিস্মিত মুগ্ধ নয়নে সুরমার দিকে চাহিয়া রহিল। বহুকাল পূর্বে যে সুরমা তাহাকে স্বপ্নলোকের পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিল, সেই সুরমাই সহসা যেন আজ আবির্ভূত হইয়া তাহাকে ডাক দিল, আসুন।

সেই সুরমা। দীর্ঘদিনের ব্যবধান চকিতে অতিক্রম করিয়া পরিবর্তনের বাধাপুঞ্জ নিমেষে অবলুপ্ত কমিয়া দিয়া সহসা তাহার এ কি অপ্রত্যাশিত অপূর্ব আবির্ভাব! শঙ্করের বয়স সহসা যেন কমিয়া গেল। সেকালের সুরমা-স্বপ্নবিহ্বল শঙ্কর পুনর্জীবন লাভ করিয়া সেকালের মোহে সেকালের বিস্ময়ে সেকালের আকুলতায় আত্মহারা হইয়া ক্ষণকালের জন্য মন্ত্রবলে যেন

রূপকথার দেশে উত্তীর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্যই।

লোকগুলোর কাণ্ড দেখেছ!

উৎপলের কণ্ঠস্বরে অকস্মাৎ চুরমার হইয়া গেল সব। উৎপলকে সে দেখিতে পায় নাই, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই এতক্ষণ সচেতন ছিল না সে। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, প্রশস্ত হলটার কোণে একটা সোফায় ঠেস দিয়া উৎপল বসিয়া আছে। গায়ে কারুকার্যমণ্ডিত দামি একখানা শাল, হাতে লাল রঙের ছোট একখানা বই, চোখে মুখে চাপা হাসি! শিয়রের দিকে টেবিলের ওপর সুদৃশ্য একটি বাতিও জ্বলিতেছে।

আপনারা গল্প করুন, আমি আসছি।

সুরমা চলিয়া গেল।

কি কাণ্ডের কথা বলছ?

শঙ্কর আগাইয়া গিয়া একটা চেয়ার টানিয়া বসিল।

এই ম্লেচ্ছ ব্যাটাদের—

লাল বইখানা তুলিয়া দেখাইল সে। পেঙ্গুইন সিরিজের বই, 'সায়েন্স ইন ওয়ার'। শঙ্কর একটু মুচকি হাসিল।

কি কাণ্ড! কোথায় আধ্যাত্মিক চিন্তা করবে, তা না, কাঠ থেকে চিনি করছে, বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে নিয়ে নাইট্রেট তৈরি করে তা দিয়ে বোমা বানাচ্ছে! সিন্‌থেটিক রবারই বানিয়ে ফেললে। সিন্‌থেটিক সিল্ক।

উৎপল সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল এবং টেবিল হইতে সিগারেট-কেসটা তুলিয়া বলিল, যাচ্ছেতাই কাণ্ডকারখানা ব্যাটাদের। এই নাও।

সিগারেট-কেসটা আগাইয়া দিল। পরক্ষণেই সেদিনের কথা মনে পড়িয়া গেল তাহার।

ও, আই অ্যাম সরি, মনেই ছিল না।

নিজে সিগারেট বাহির করিয়া নিপুণভাবে সেটি ধরাইল, তাহার পর চোখের দৃষ্টিতে হাসি বিকিরণ করিয়া বলিল, কতদিন এ কৃচ্ছ্রসাধন চলবে তোমার?

যতদিন চালাতে পারি।

উৎপল ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া আবার নামাইয়া লইল, কোনো কথা বলিল না। শঙ্করও চুপ করিয়া রহিল। অস্বস্তিকর নীরবতা কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হইল না, সুরমা আসিয়া প্রবেশ করিল।

কুন্তলা এ বেলাও এল না।

ও।—উৎপল সন্তর্পণে সিগারেটে একটা টান দিল।

আর একটা কথা শুনেছ? শঙ্কর সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে।

ভালোই তো।

উৎপল শঙ্করের দিকে ফিরিয়া চোখে মুখে ছদ্ম-উদ্বেগ ফুটাইয়া প্রশ্ন করিল, মাছ মাংস খাচ্ছিস তো?

শঙ্করের কানের দুই পাশ সহসা গরম হইয়া উঠিল। সুরমার সম্মুখে উৎপলের এ ব্যঙ্গ তাহার ভালো লাগিতেছিল না। তবু আত্মসম্বরণ করিয়া রহিল সে। কোনো উত্তর দিল না, একটু মুচকি হাসিল শুধু।

চা খাবেন?—সুরমা প্রশ্ন করিল।

না, এই মাত্র খেয়ে আসছি।

উৎপলের চোখের দৃষ্টি পুনরায় কৌতুক-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে দৃষ্টির অর্থ—ও, চা-টা ছাড়নি তা হলে? ভালো। শঙ্করও সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল, মনে মনে আরও একটু উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু কিছু বলিল না।

সুরমার দিকে চাহিয়া উৎপল বলিল, অকূল সমুদ্রে পড়ে ও একটা ভেলা খুঁজছে, উদ্ধার কর ওকে।

শঙ্করবাবু সমর্থ লোক, সমুদ্রে যদি পড়েই থাকেন, সাঁতরে পার হয়ে যাওয়ার শক্তি আছে ওঁর। ভেলার দরকার হবে না।

আহা, তবু একটা ছুঁড়ে দিতে ক্ষতি কি! বিশেষ কিছু করতে হবে না, একটা গান কর শুধু। অনেকটা প্রকৃতিস্থ হবে। তোমার চেয়ে ওকে আমি বেশি চিনি।

স্বাভাবিক হইবার চেষ্টা করিয়া শঙ্করও হাসিয়া বলিল, গান শুনতে আপত্তি নেই। করুন না একটা গান, অনেকদিন গান শুনিনি আপনার।

উৎপল ফরমাশ করিল, কাল রবিবাবুর যে গানটা শিখলে সেইটে ধর। উতরেছে গানটা।

সুরমার চোখে মুখে স্নিগ্ধ সলজ্জ হাসির আভা ফুটিয়া উঠিল। পর্দা সরাইয়া সে পাশের ঘরে গেল এবং অর্গানের ডালাটা তুলিয়া বসিল। একটু বাজাইয়া ধরিল—

সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে
ফুল-ডোরে বাঁধা ঝুলনা
এই স্মৃতিটুকু কভু ক্ষণে ক্ষণে
যেন পড়ে মনে, ভুলো না।
ভুলো না ভুলো না ভুলো না...

অন্ধকার রাত্রে শঙ্কর হাঁটিয়া বাড়ি ফিরিতেছিল। সুরমার কণ্ঠস্বর, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত তাহার অন্তরের গভীরতম স্তরে যে ছন্দ-স্পন্দন তুলিয়াছিল, তাহারই আবেশে আত্মহারা হইয়া সে পথ চলিতেছিল। একের পর এক রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গানই আজ সুরমা গাহিয়াছে। সকলগুলিরই নিগূঢ় আবেদন এক। হে প্রিয়, হে দয়িত কোথা তুমি, কত আয়োজন করিয়া যুগযুগান্ত যে তোমার জন্য বসিয়া আছি। জানি, আঁধার ঘরে বিজন রাতে একদিন তুমি আসিবে, সকল কাঁটা ধন্য করিয়া গোলাপ হইয়া একদিন তুমি ফুটিবে, তোমার পায়ের শব্দ, তোমার গন্ধ পাইতেছি, তোমার জন্যই যে আকাশ ভরিয়া নক্ষত্রের দীপালি তাহা জানি, বনে বনে কুসুম-কিশলয়ের উৎসব তোমারই প্রতীক্ষা করিয়া আছে, শুক্লা একাদশীর মধ্যরাত্রে নিদ্রাহারা শশী তোমার পথ চাহিয়াই স্বপ্ন-পারাবারের খেয়া বাহিতেছে, কিন্তু হে প্রিয়, আভাসে-ইঙ্গিতে স্বপ্নে-কল্পনায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আর কতকাল লুকাইয়া থাকিবে তুমি? আগ্রহে অধীর হইয়া আর কতকাল অপেক্ষা করিব? মূর্ত হও, হে জীবনবল্লভ, দেখা দাও, ধরা দাও। তোমাকে পাইয়াও যে পাই না। একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি, সেইটুকু লইয়া আর কতদিন ফাল্গুনী-স্বপ্ন রচনা করিব? কোথায় তুমি, কবে আসবে? হয়তো নিশীথ-রাতের বাদলধারার সুরে আমার একলা ঘরে চুপি চুপি তুমি আস, কিন্তু তখন চোখে আমার ঘুম,

চারিদিকে অন্ধকার, তোমাকে কাছে পাইয়াও পাই না। যখন জাগিয়া উঠি তখন দেখি, তুমি নাই, দখিন হাওয়াকে পাগল করিয়া আঁধার ভরিয়া তোমার গন্ধ কেবল ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তুমি চলিয়া গিয়াছে। আকুল চিত্তে কল্পনা করি, তোমার মালার পরশ আমার বুকে লাগিয়াছিল কি...

রবীন্দ্রনাথের কথা ও সুর, সুরমার আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বর। শঙ্কর ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিল। সুরমা বিশেষ করিয়া এই গানগুলিই গাহিল কেন? তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই গাহিল কি? সুরমার অন্তরের অন্তস্তলে এমন কোনো কথা কি লুকানো আছে যাহা সহজ ভাষায় সে বলিতে পারে না, যাহা সহজ ভাষায় বলা যায় না, যাহার রূপ-রস-নিবিড়তা একমাত্র গানের সুরই প্রকাশ করিতে পারে? আশ্চর্য কি! হয়তো আছে। কিন্তু...। 'কিন্তু' ভাব কিন্তু বেশিক্ষণ রহিল না। ঈষৎ-জাগ্রত বিবেককে সম্মোহিত করিয়া তাহার মন চিরন্তন পুরুষোচিত সেই স্বপ্ন সৃজন করিতে লাগিল, সে স্বপ্নে সামাজিক নীতির ভেজাল নাই, সংস্কারকের সংযম যাহাকে কুণ্ঠিত করিতে পারে না, অবিমিশ্র আবেগে যাহা চিরকাল সুস্থ পুরুষের মর্মমূলে কবিত্ব উৎসারিত করিয়া আসিয়াছে। আদিম উদ্দাম প্রেরণায় স্বকীয়া-পরকীয়ার কৃত্রিম গণ্ডি উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহা নরনারীর আপাত-সামাজিক বন্ধনকে যুগে যুগে শিথিল করিতেছে, চিরকাল করিবে। বহুকাল পরে অকস্মাৎ শঙ্করের চিত্ত সুরমাকে ঘিরিয়া স্বপ্নমধুর হইয়া উঠিল। শুধু মধুর নয় মদিরও। সবিস্ময়ে সে আবিষ্কার করিল, তাহার অন্তরতম সত্তা দেশের দুঃখে এতটুকু ম্রিয়মান নয়। বাহিরে সে একটা অভিনয় করিয়া চলিয়াছে শুধু। ইহা তাহার সংস্কারক মনের কর্তব্যবোধ মাত্র, অন্তরতম সত্তার সহিত ইহার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। যে নিগূঢ় বেদনা আজ বহুকাল পরে সত্যই তাহার চিত্তকে বিচলিত করিতে পারিয়াছে, তাহা পল্লীবাসীর দুঃখজনিত বেদনা নয়, তাহা বিরহ-বেদনা। সুরমার গান শুনিয়া তাহার অন্তর বেতসপত্রের ন্যায় আজ যে আকুলতায় কম্পিত হইতেছে, সুরমার মনের কথাটি জানিবার জন্য অবুঝের মত যে আগ্রহে সে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে, সে আকুলতা, সে আগ্রহ কি তাহার দেশসেবায় ফুটিয়াছে কখনও? দেশকে ঘিরিয়া এমন তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতি জাগিয়াছে? সুরমার সান্নিধ্যে আজ তাহার অন্তর যেমন সম্পূর্ণভাবে উদ্বুদ্ধ হইল, এমন কি দেশের কাজে কোনোদিন হইয়াছে? সত্যটা আবিষ্কার করিয়া মনে মনে সে অপ্রতিভ হইয়া পড়িল এবং পরমুহূর্তেই তাহার রাগ হইল। সে রাগ শুধু নিজের ওপর নয়, দেশের শিক্ষা-দীক্ষার ওপর, এমন কি রবীন্দ্রনাথের উপরও।

তাহার মনে হইল, তাহার চিত্তকে এমন উন্মনা স্বপ্নবিলাসী করিয়া তুলিয়াছে কি রবীন্দ্রনাথই। কবিই দেশের চিত্ত গঠন করেন। এ কি করিয়াছেন তিনি। পেলব মধুর ভাষায়, মর্মস্পর্শী ছন্দে সুরে মানব মনের প্রেমবিহ্বলতাকে না-পাওয়ার আকুলতাকে সুদূরের পিপাসাকে রূপে রসে রঙে এমন মনোহারিণী করিয়া গিয়াছেন যে, দেশের সমস্ত যুবক-যুবতী ভাবাকুললোচনে কল্পনার কুঞ্জকুটিরে আজ কেবল স্বপ্ন দেখিতেছে। বলিষ্ঠতা কোথাও নাই, কেবল স্বপ্ন। অর্জুন একজনও নাই, ঘরে ঘরে কেবল রাধা। একটা তূর্যধ্বনি শোনা যায় না, চারিদিকে কেবল বাঁশের বাঁশি বাজিতেছে। সত্য বটে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি সঙ্গীত লিখিয়াছেন, 'নৈবেদ্য' রচনা করিয়াছেন, নানা প্রবন্ধে দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, 'মূঢ়

ম্লান মূক মুখে' ভাষা দিতে চাহিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সে সব রচনা দেশের মনে প্রেরণা দিতে পারিল কই? দেশ যত আবেগভারে 'মম যৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখি—সখি জাগো' গাহিল, ঠিক তত আবেগভরে কি 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গাহিতে পারিল? হুজুগে মাতিয়া দুই-চারিদিন হয়তো গাহিয়াছিল, কিন্তু সে গান তাহাদের মর্মে প্রবেশ করে নাই। তাহাদের মর্মে প্রবেশ করিয়াছে 'কদম্বেরি কানন ঘেরি আষাঢ় মেঘের ছায়া নামে'। কেন? শঙ্করের সন্দেহ হইল, হয়তো রবীন্দ্রনাথই ঠিক তেমন প্রাণ ঢালিয়া ওই দেশাত্মবোধক রচনাগুলি লেখেন নাই। ওগুলি সুললিত সুন্দর রচনা কিন্তু ওগুলিতে ঠিক যেন তাঁহার প্রাণের সুর বাজে নাই, তাই দেশের কর্ণে প্রবেশ করিলেও দেশের মর্মে উহারা প্রবেশ করিতে পারিল না। তিনি অচিন পথের উন্মনা পথিক ছিলেন, ছিলেন বাউল সুফি মরমিয়া। দেশকে নয়, প্রিয়কে সুন্দরকেই তিনি আহ্বান করিয়াছেন, ধ্যান করিয়াছেন। পচা পানা পুকুরের পঙ্কোদ্ধারের কথা তিনি মাঝে মাঝে চিন্তা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে 'সোনার তরী' ভাসাইতেই তিনি বেশি ব্যস্ত ছিলেন। কালিদাসের ভাববিলাস অথবা বৈষ্ণব কবিদের কান্ত-কোমলতা ভারতের যে স্বাচ্ছন্দ্যের যুগে স্বাস্থ্যকর ছিল, পরাধীন নিরন্ন ভারতের পক্ষে তাহা যে মারাত্মক, সে খেয়াল থাকিলেও তাহার প্রতিবিধান করিবার উপায় তাঁহার হাতে ছিল না; কারণ নিজের সংস্কারকে, নিজের প্রতিভার বৈশিষ্ট্যকে তিনি অতিক্রম করিতে পারেন নাই—কোনো কবিই পারেন না। কোকিলের গান যদি কোনো কারণে দেশের পক্ষে অনিষ্টকর হয়, কোকিল কি নিজের সুর বা স্বর পরিবর্তন করিতে পারে?...

সমস্ত দোষটা রবীন্দ্রনাথের স্কন্ধে চাপাইয়া নিপুণভাবে আত্মবিশ্লেষণ করিয়া শঙ্কর যেন নিজের কাছেই জবাবদিহি করিল। পতনের কারণ নির্ণয় করিয়া পতনের গ্লানি হইতে অব্যাহতি পাইবার প্রয়াস পাইল—একটুও অনুতপ্ত হইল না। সুরমার হাসি, গান, মার্জিত আলাপ, তন্বী দেহশ্রী, শাড়ির রঙ, অলকের কম্পন, অপাঙ্গের মাধুর্য ঘিরিয়া যে কল্পলোকে তাহার মুগ্ধ মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ফিরিতে লাগিল, সে কল্পলোকে কল্পনাই সম্রাজ্ঞী, যুক্তির স্থান সেখানে নাই। পুলকিত চিত্তে শঙ্কর আবিষ্কার করিল, তাহার যৌবন এখনও সজীব আছে। যে ভয়ে সে কলিকাতায় চুনচুনের সহিত দেখা করে নাই, তাহা তাহার লুব্ধ বাসনারই ভীত রূপ। তাহার কবি-মানসে যে মানসী-লিপ্সা চিরকাল চিরন্তনী প্রিয়ার স্বপ্নে বিভোর হইয়া আছে, তাহা মরে নাই—প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল, আজ সহসা সুরমাকে ঘিরিয়া তাহা আকুল হইয়া উঠিয়াছে, মুগ্ধ মদির হৃদয়ে সে পথ চলিতে লাগিল। শীতের আকাশে শীর্ণ চাঁদ উঠিয়াছে। দূরে রাস্তায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ করিয়া গরুর গাড়ি চলিয়াছে, সমস্ত পল্লী ধূম ও কুয়াশায় আচ্ছন্ন, শিউলি ফুলের এক ঝলক গন্ধ যেন কোথা হইতে ভাসিয়া আসিল। 'আজি মম অন্তর-মাঝে কোন্ পথিকের পদধ্বনি বাজে'—মনের মধ্যে গুঞ্জরণ করিয়া ফিরিতেছে সুরমার গানের সুর। একটা নিদারুণ চিৎকারে সহসা তাহার স্বপ্নভঙ্গ হইল। সে দাঁড়াইয়া পড়িল। মনের সুরটা কাটিয়া গেল। বিরক্তিতে মনটা ভরিয়া উঠিল। কে এমন বেসুরা চিৎকার করিতেছে? চাহিয়া দেখিল পাশেই মুশাইয়ের বাড়ি, চিৎকারটা সেখান হইতেই আসিতেছে। শঙ্কর আগাইয়া গিয়া ডাকিল। হাউমাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া আসিল যমুনিয়া। তাহার রুক্ষ চুল, ছিন্ন বসন অসম্বৃত। এমন সময় এখানে শঙ্করকে দেখিতে পাইবে, সে প্রত্যাশা করে নাই। শঙ্করকে

দেখিয়া তাহার দুঃখ যেন আরও উথলাইয়া উঠিল। কাপড় সামলাইবার কথা পর্যন্ত তাহার মনে রহিল না, অসম্বৃত বসনেই সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। মুশাই তাহাকে মারিতেছে। এইমাত্র কোথা হইতে সে 'পিইয়া' আসিয়াছে। ম্লান জ্যোৎস্নার স্বপ্নালোকেও শঙ্কর দেখিতে পাইল, যমুনিয়ার পাঁজর গোনা যায়, জীর্ণ বুকের হাড়গুলা উঁচু হইয়া রহিয়াছে, স্তনযুগল শুষ্ক বিশীর্ণ—যেন রুগ্ন পুরুষ মানুষের বুক। নিজের ভাষায় যমুনিয়া বকিয়া চলিয়াছিল। অত দাম দিয়া মুশাইকে সেদিন একটা 'মোটিয়া' কিনিয়া দিল, কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছে—কোনো ছুঁড়িকে দিয়া আসিয়াছে কি না, তাহারই বা ঠিক কি! ইহার জন্য সে কিন্তু কোনো অনুযোগ করে নাই, সে 'কিরিয়া খাইতে' (শপথ করিতে) প্রস্তুত আছে, বরং নিজের গায়ের চাদরখানা তাহাকে দিতে গিয়াছিল, তখন অবশ্য বলিয়াছিল, নে, এটাও নে, আমার যথাসর্বস্ব গ্রাস কর তুই। এই কথাতেই তাহাকে মারিতে শুরু করিয়া দিল, চুলের ঝুঁটি ধরিয়া মুক্কা, থাপ্পড়, লাত (কিল, চড়, লাথি)।... শঙ্কর ভিতরে প্রবেশ করিল। উঠানের মাঝখানে 'ঘুর' জ্বলিতেছে, তাহার পাশেই মুশাই দাঁড়াইয়া আছে, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, আরক্ত চক্ষু।

যমুনিয়াকে কেন মেরেছিস?

মুশাই সাধারণত নীরব প্রকৃতির। কিন্তু মদের ঝোঁকে বলিয়া বসিল, হামারা খুশি।

খুশি?

ঠাস করিয়া তাহার গালে শঙ্কর প্রচণ্ড একটা চড় বসাইয়া দিল। মুশাই পড়িয়া গেল।

ওঠ্, ওঠ্ শিগ্‌গির। খুন করে ফেলব তোকে আজ।

মুশাই ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল এবং নতমস্তকে বসিয়াই রহিল। উঠানের এক কোণে শুষ্ক মুখে যমুনিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, বলিয়া উঠিল, আব ছোড়ি দে নুনু, পিলোছে (এবার ছেড়ে দে বাবা, মদ খেয়ে ও রকম করছে)।

শঙ্কর ফিরিয়া দেখিল, যমুনিয়া ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। শুধু ভয়ে নয়, শীতেও। গায়ে কাপড় নাই, নিজের একমাত্র গায়ের কাপড়খানি মাতাল চরিত্রহীন স্বামীকে দিয়াছে। শঙ্কর নিজের গায়ের র‍্যাপারটা খুলিয়া তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল। চেঁচামেচিতে যে দুই-চারিজন পাড়ার লোক বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে ফুলশরিয়া একজন। শঙ্কর কাহারও দিকে না চাহিয়া দ্রুতপদে পথ চলিতে লাগিল। ফুলশরিয়া অবাক হইয়া গেল।

বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিল, অমিয়াও তাহার অপেক্ষায় জাগিয়া আছে। খুকিকে ঘাড়ের উপর শোয়াইয়া পায়চারি করিতেছে। আসন্নপ্রসবা সে, নিশ্চয়ই কষ্ট হইতেছে।

এখনও ঘুমোওনি?

খুকির পেটব্যথা করছে, কিছুতে ঘুমুচ্ছে না। পারুলের বাড়িতে পানিফল-টল খেয়ে কতকগুলো যা-তা—

শঙ্করের সাড়া পাইয়া খুকি মাথা তুলিল এবং ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, পেত ব্যাতা কত্‌তে।

এস আমার কাছে।

সমস্ত দিন একটিবারও আজ সে বাবাকে পায় নাই, একমুখ হাসিয়া ঝাঁপাইয়া কোলে আসিল।

সুরমার মোহ স্বপ্নের মত ভাঙিয়া গেল।

সে স্বর্গ হইতে মর্ত্যে নামিল, না মর্ত্য হইতে স্বর্গে উঠিল, বুঝিতে পারিল না।

পরদিন সকালে যখন উঠিল, তখন দেখিল, মনের আকাশ নির্মেঘ। কম্প দিয়া যে জ্বরটা সহসা আসিয়াছিল, তাহা সহসাই ছাড়িয়া গিয়াছে। মুশাই আসিয়া প্রবেশ করিল এবং অন্যদিনের মত টেবিল ঝাড়িতে লাগিল, যেন কিছুই হয় নাই।

।। আটাশ ।।

'তুমি' অঘোরে ঘুমাইতেছে। বিনিদ্র নয়নে হাসি একা জাগিয়া আছে। ভাবিতেছে। রোজই ভাবে। ভাবে, কোথায় সে ভাসিয়া চলিয়াছে, কি তাহার জীবনের পরিণাম? বিহার পল্লীর একটা তুচ্ছ স্কুলের নগণ্য শিক্ষয়িত্রী রূপেই কি তাহার জীবনের অবসান হইবে? শঙ্করবাবুর আগ্রহাতিশয্যে সে আসিয়াছে, দেখিতে দেখিতে এতদিন কাটিয়াও গেল, ফল কি হইল। কিছুই না। শিক্ষার যে আদর্শ লইয়া সে আসিয়াছিল, সে আদর্শে মনের মত করিয়া একটা মেয়েকেও সে লেখাপড়া শিখাইতে পারিল না, শিখাইবার উপায় নাই। একপাল মেয়ে সাজিয়া গুজিয়া স্কুলে আসে যেন তাহারই মাথা কিনিবার জন্য। পড়াশোনায় কাহারও মন নাই। মেয়েদের অভিভাবকরাও এ বিষয়ে খুব সচেতন নন। দুই দিন পরে তো বিবাহ হইয়া যাইবে, লেখাপড়া কত আর শিখিবে! শঙ্করবাবুর খাতিরে, অনেকটা চক্ষুলজ্জাবশত, যেন তাঁহারা মেয়েদের স্কুলে পাঠান। খানিকটা ফ্যাশানের খাতিরেও বটে। আজকাল সভ্যসমাজে টর্চ, হাতকাটা কামিজ, বাটারফ্লাই গোঁফের মত মেয়েদের 'লিখাপঢ়ি' শেখানোটাও একটা ফ্যাশান হইয়াছে। 'বাংগালি' বাবুরা তাঁহাদের 'লেড়কি'দের লেখাপড়া শিখাইতেছেন, তাহাদের লেড়কিরাও শিখুক যতটা পারে—ক্ষতি কি? ইহাই অধিকাংশ লোকের মনোভাব। আমরাই বা কম কিসে, এ মনোভাবও কয়েকজন শিক্ষিত 'ফিলিংওয়ালা' বিহারির আছে। কিন্তু ওই ফিলিং-দুষ্ট মনোভাবটুকুই আছে, যোগ্যতা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতে হইলে যে আগ্রহ ও নিষ্ঠার প্রয়োজন, তাহা নাই। স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা বাড়াইয়া ইনস্পেক্টরের কাছে বাহাদুরি লইবার জন্যই তাঁহারা ব্যগ্র। স্কুলকমিটির কে মেম্বার হইবে এবং মেম্বারদের মধ্যে কে সেক্রেটারি হইবে তাহা লইয়াই সকলে ঝগড়া করিয়া মরিতেছে, আর এস. ডি. ও.-র খোশামোদ করিতেছে। তাহারা যে স্কুল এবং স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতন, তাহা প্রমাণ করিবার একটিমাত্র উপায় তাহারা আবিষ্কার করিয়াছেন স্কুলের নানা খুঁত ধরিয়া গোপনে ইনস্পেক্টরের নিকট দরখাস্ত করা। খুঁতও সব অদ্ভুত ধরনের। সেদিন কে একজন লিখিয়াছে, বিদ্যালয়ের হাতায় ঘাস গজাইয়াছে, পরিষ্কার করানো হয় নাই, শিক্ষয়িত্রীর গাভীটিকে চরিবার সুবিধাদান করিবার জন্য কি স্কুলের হাতাটিকে জঙ্গলে পরিণত করা উচিত? মাসিক পনেরো টাকা কন্‌টিন্‌জেন্সির হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার জন্য একজন মোক্তার মেম্বার বদ্ধপরিকর। খড়ি, কাগজ, কলম, দোয়াত, নিব প্রত্যেকটি কবে কেনা হইয়াছে, কেন কেনা হইয়াছে, নির্ভরযোগ্য রসিদ আছে কিনা, থাকিলেও এত ঘন ঘন কেনা হইয়াছে কেন—এই সব লইয়া তিনি তাঁহার শাণিত আইনজ্ঞানের এমন সুতীব্র পরিচয় দিতেছেন যে, হাসি উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। লাইব্রেরিতে ভালো বই আনাইবার উপায় নাই। বেহারি লেখকের লেখা বেহারি প্রকাশকের প্রকাশিত বই সর্বাগ্রে আনাইতে হইবে। তাহা

কিনিতেই টাকা ফুরাইয়া যায়, ভালো বই কেনা হয় না। হাসি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সর্বাপেক্ষা বিরক্ত হইয়াছে, শুধু বিরক্ত নয়, অপমানিতও বোধ করিয়াছে তাহার প্রতি সকলের অনুকম্পা প্রদর্শনে। সকলের ভাবটা যেন, আহা, স্কুলটা চলুক, আর কিছু না হোক, একজন গরিব বিধবার অন্নসংস্থান হইতেছে তো, বেচারির একটা ছেলেও আছে। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য নয়, তাহাদের নিজেদের প্রয়োজনেও নয়, তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া সকলে স্কুলটাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। শিক্ষিত বেহারি মেম্বারগণ আবার আইনের কষ্টিপাথরে বারংবার যাচাই করিয়া দেখিতেছেন, মহিলাটি প্রকৃতই তাঁহাদের, অর্থাৎ বিহারিদের, দয়া পাইবার উপযুক্ত কিনা। 'পাবলিক মানি' লইয়া ছিনিমিনি খেলা তো উচিত নয়। খুঁত ধরা পড়িয়াছে, সে 'হিন্দি-নোইং' নয়। শঙ্করবাবু তাহাকে হিন্দি পরীক্ষা পাশ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন, পরীক্ষা পাস করা অসম্ভব নয়, কিন্তু সে পরীক্ষা দিবে না। এই তুচ্ছ কাজের জন্য সে আর একবিন্দু শক্তি ক্ষয় করিবে না। মৃন্ময়ের সহধর্মিণীর এই কি উপযুক্ত কাজ? তাহার সঙ্কল্প—মৃন্ময়ের সহধর্মিণী হইবে সে, মৃন্ময়ের আদর্শকেই জীবনে সফল করিয়া তুলিয়া ধরিবে। কি সে আদর্শ? ত্যাগ। ন্যায়ের সমর্থন করিয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। প্রয়োজন হইলে তাহার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে, এমন কি জীবনও। এই ত্যাগের স্বপ্ন দেখিয়াই সে এই অপরিচিত পল্লীগ্রামে শিক্ষয়িত্রী হইয়া আসিয়াছিল। শঙ্কর তাহাকে বুঝাইয়াছিল, নারীত্বের যে লাঞ্ছনার প্রতিকার করিতে গিয়া মৃন্ময় আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, সে লাঞ্ছনার সত্যকার প্রতিকার স্ত্রী-শিক্ষায়। এই স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারে হাসি যদি সাহায্য করে, ইহার জন্য সে যদি সুখ-সুবিধা-স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলেই মৃন্ময়ের আত্মা তৃপ্ত হইবে। স্বার্থ ত্যাগ করিতেই হাসি আসিয়াছিল। কিন্তু এখানে এতদিন কাটাইয়া সে অনুভব করিতেছে যে, দেশের সমস্ত জনসাধারণকে মনুষ্যত্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে বিচ্ছিন্নভাবে অবমানিত নারীত্বকে উন্নত করা যায় না। শঙ্করবাবু একা কি করিবেন? গদাই দত্ত, নেকি মাড়োয়ারি, গুলাব সিং, প্রমথ ডাক্তার, সুখদেও মোক্তার যে স্কুলের পরিচালকবর্গ, হাজার স্বার্থত্যাগ করিয়াও সে স্কুলের কিছু করা যাইবে না। পাষাণ-প্রাচীরে মাথা কুটিলে তাহা যদি ভাঙিয়া পড়িত, মাথা কুটিতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু হাসি বুঝিয়াছে, মাথা কুটিয়া মাথা রক্তাক্ত করিয়া ফেলিলেও এ অনড় প্রাচীর নড়িবে না, তাহার কাণ্ড দেখিয়া লোকে শুধু হাসিবে। শুধু স্কুল-কমিটির দোষ নয়, গভর্নমেন্ট শিক্ষা-বিভাগের আইনও প্রকৃত শিক্ষার অনুকূল নয়। ভিতরে 'পলিসি' আছে। হাসির স্বপ্ন ভাঙিয়া গিয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষার নামে কতকগুলা বর্বরের খোশামোদ করা কি ত্যাগ? ইহাতে কি মহত্ত্ব আছে? ইহা তো ভণ্ডামির নামান্তর, ত্যাগের অজুহাতে নিজেকে খর্ব করিয়াও নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার মধ্যে কোনোক্রমে বাঁচিয়া থাকা, ত্যাগ করিলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, সে আনন্দ সে একদিনের জন্যও পায় নাই। সমস্ত অন্তর ভরিয়া কেবল গ্লানি, ক্ষোভ আর হতাশাই তো হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। সে কি করিবে, কোথায় যাইবে, কোথায় গেলে শান্তি পাইবে? স্বার্থ ত্যাগ করিয়া, আত্ম ত্যাগ করিয়া, বৃহৎ একটা কিছু করিয়া স্বামীর আদর্শ অনুসরণ করিবার জন্য তাহার সমস্ত হৃদয় উন্মুখ হইয়া আছে, প্রয়োজন হইলে সে ছেলের দিকেও ফিরিয়া চাহিবে না। প্রতিদিন রাত্রে মৃত মৃন্ময়ের উদ্দেশে এই একই কথা সে রোজ লেখে, আজও লিখিয়াছে, আজও সে তাহাকে আশ্বাস দিয়াছে—তুমি অপেক্ষা কর, আমি

প্রমাণ করিয়া দিব যে, আমিও তোমার অনুপযুক্ত ছিলাম না, যে সিংহাসনে স্বর্ণলতাকে বসাইয়াছিলে, সেখানে আমারও কিছু অধিকার আমি দাবি করিতে পারিতাম। কিন্তু কি করিয়া প্রমাণ করিব? কে তাহাকে পথ দেখাইয়া দিবে, কে তাহাকে সেই মহাদেবীর মন্দিরে লইয়া যাইবে, যে মহাদেবীর পূজাবেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করিলে অশান্ত হৃদয় শান্তিলাভ করে, অধন্য ধন্য হয়, অপূর্ণ পূর্ণতা লাভ করে? ধাত্রী পান্না, জোয়ান অব আর্ক যে পথে চলিয়াছিল, কোথায় সে পথ?

বিনিদ্র নয়নে হাসি ভাবিতেছিল। রোজই ভাবে।

।। ঊনত্রিশ ।।

এই, নাও লে আও—

খেয়াঘাটের নৌকাটা ঘাট ছাড়িয়া প্রায় নদীর মাঝামাঝি চলিয়া গিয়াছে, এমন সময় অশ্বপৃষ্ঠে নটবর ডাক্তার নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্য সময় হইলে জান্‌কি মাঝি অবিলম্বে নৌকা তীরে ভিড়াইয়া নটবর ডাক্তারকে তুলিয়া লইত, আজ কিন্তু সে একটু দ্বিধায় পড়িয়া গেল। প্রথমত, নৌকায় নেকি মাড়োয়ারির একটা 'বরিয়াত' রহিয়াছে, দ্বিতীয়ত, রহিয়াছেন স্বয়ং দারোগা সাহেব। উহাদের মধ্যে কাহাকেও চটানো গরিব জান্‌কির পক্ষে শক্ত। নেকি মাড়োয়ারির কাছে আপদে বিপদে হাত পাতিতে হয়, তাহা ছাড়া সুশৃঙ্খলায় 'বরিয়াত'টা পার করিয়া দিলে হয়তো কিছু বকশিশও আজ মিলিতে পারে। আর দারোগা সাহেব তো স্বয়ং সম্রাটেরই প্রতিনিধি, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা রাজদ্রোহেরই সামিল। অথচ নটুটুবাবুকে ফেলিয়া যাওয়াও যে অসম্ভব। গরিবের 'মাই-বাপ' তিনি। জান্‌কি বেচারা একটু বিপদে পড়িয়া গেল। অনুমতির প্রত্যাশায় সে একবার নেকি মাড়োয়ারির দিকে, একবার দারোগা সাহেবের দিকে চাহিল। নেকি মাড়োয়ারি চতুর লোক, সহসা 'হাঁ', 'না' কিছুই বলিল না। দারোগাজির সহিত নটবর ডাক্তারের ঠিক কি সম্পর্ক আছে, জানা তো নাই, চট করিয়া কিছু একটা বলিয়া শেষে ফ্যাসাদে পড়িয়া যাইবার মত বোকা লোক সে নয়। তাহার স্থূলকায় পুত্র 'কানাইয়া' চোখ পাকাইয়া জান্‌কিকে নৌকা ভিড়াইতে মানা করিতে যাইতেছিল, নেকি গোপনে পুত্রের গা টিপিয়া ইঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিল। নেকি মাড়োয়ারির মনের ইচ্ছাটা অবশ্য নটবর ডাক্তারকে না লওয়া, লোকটা ঘোড়াসুদ্ধ লাফাইয়া নৌকাতে উঠিবে, বরিয়াতের জিনিসপত্র সব লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইবে। কিন্তু স্বমুখে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবার মত সাহস সে সংগ্রহ করিতে পারিল না। দারোগা সাহেব কি বলেন, তাহা শুনিবার জন্য সোৎসুক বিপন্ন দৃষ্টি তুলিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। দারোগা সাহেব ন্যায়সঙ্গত কথাই বলিলেন।

চলো তুম্! ডাক্‌টরবাবু দেরি করকে আয়েহেঁ, পিছে যায়েঙ্গে।

এই, নাও ঘুরাও।

বজ্রনির্ঘোষে নটবর আবার হাঁক দিলেন।

জান্‌কি লগি ঠেলিতে ঠেলিতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, ডাক্তারবাবুর পাহাড়ি ঘোড়াটা ঘাটে অধীরভাবে পরিক্রমণ করিতেছে। ঘোড়াটা দেখিয়া সহসা জান্‌কির মনে দুই বৎসর আগেকার

একটা ছবি ফুটিয়া উঠিল! অন্ধকার গভীর রাত্রি, আকাশে ঘনঘটা, মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে, ঝড় উঠিয়াছে, বৃষ্টি পড়িতেছে। দুর্যোগ মাথায় করিয়া দুর্গম পথে এই পাহাড়ি ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া নটবর ডাক্তার ছুটিয়া চলিয়াছেন—তাহারই বাড়ির উদ্দেশ্যে চলিয়াছেন। তাহার একমাত্র পুত্র জ্বরে অচৈতন্য। গরিব শুনিয়া হাসপাতালের ডাক্তারবাবু আসিতে রাজি হন নাই, কবিরাজজিও আসিলেন না। নটুবাবু কিন্তু শুনিবামাত্র ঘোড়ার সওয়ার হইলেন, ‘ঝড়-ঝাপটি’ কিছু মানিলেন না, আসিয়া বিনাপয়সায় ‘জকসন’ দিলেন, ঔষধ খাওয়াইলেন—ছেলে তাহার বাঁচিয়া গেল।

আরে, নাও ঘুরাতা হ্যায় কাহে ফের?

জান্‌কি আইনসঙ্গত অজুহাত একটা খাড়া করিয়া ফেলিয়াছিল। বলিল, নৌকায় জল জমিয়া গিয়াছে, জল তুলিয়া ফেলিবার পাত্রটা সে ঘাটে ফেলিয়া আসিয়াছে, সেটা না লইলে যদি জল বেশি জমিয়া যায়, মাঝ-দরিয়ায় তাহা হইলে—কথাটা সে সম্পূর্ণ করিল না। নেকি শশব্যস্ত হইয়া বলিল, নেই নেই, লে লেও ভাই, দো-পাঁচ মিনিটমে কেয়া হর্‌জা হোয়েগা।

দারোগা সাহেব কিছু বলিলেন না। স্বল্পভাষী লোক তিনি। নৌকা আসিয়া ঘাটে ভিড়িল। নটবর ডাক্তার ঘোড়া হইতে না নামিয়া ঘোড়াসুদ্ধ লাফাইয়া নৌকায় উঠিলেন এবং জান্‌কিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, ক্যা রে, কানমে আজকাল কম শুনতা হ্যায়? জান্‌কি একটু কুণ্ঠিত হাসি হাসিল। নৌকায় চড়িয়াও ঘোড়ার পিঠ হইতে নটবর নামিলেন না। জান্‌কি জল তুলিবার পাত্রটা লইয়া আসিল।

রাম রাম ডাক্‌টারবাবু।

দন্ত বিকশিত করিয়া নেকি মাড়োয়ারি অভিবাদন করিল।

রাম, রাম, শেঠজির খবর কি, ছেলের বিয়ে নাকি?

আপলোককা কির্‌পা।

দারোগা সাহেবও নটবরকে হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন।

প্রতি-নমস্কারান্তে নটবর বলিলেন, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, ভালোই হল। আপনার কাছে যাব ভাবছিলাম। হরিয়াটার নামে কি আপনি বি. এল. কেস করেছেন?

হ্যাঁ। ও ব্যাটা তো একের নম্বর লুচ্চা গুণ্ডা। শঙ্করবাবু জামিন হয়ে ছাড়িয়ে দিলেন, তা না হলে ওই থেফ্‌ট চার্জেই ফাঁসাতাম ওকে।

নটবর ডাক্তারের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল এবং অনেকক্ষণ কুঞ্চিত হইয়াই রহিল।

বি. এল. কেস প্রমাণ করতে পারবেন ওর বিরুদ্ধে?

নিশ্চয়।

দারোগাবাবুর আত্মপ্রত্যয় দেখিয়া নটবর মনে মনে হাসিলেন, চক্ষুদ্বয় ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন। চোখের দৃষ্টি যেন দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, ও বাবা! হরিয়াটা কাল গিয়া তাঁহার কাছে কাঁদিয়া পড়িয়াছিল। তিনি তাহাকে আশ্বাস দিয়াছেন। যদিও নবাগত দারোগা সাহেবের সঙ্গে তেমন আলাপ নাই, তবু ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাকে একবার বলিলেই ব্যাপারটা মিটিয়া যাইবে বোধ হয়। এখন দেখিতেছেন, লোকটির কর্তব্যজ্ঞান বেশ টনটনে। এ ধরনের জীবরা ভদ্রলোকের মর্যাদা বোঝে না। ইঁহাদের কাছে কোনো অনুরোধ করা বৃথা। আর

কিছু বলিলেন না, ঘাড় ফিরাইয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। একটু হাসিও পাইল। হরিয়া লুচ্চা এবং গুণ্ডা! ছুঁচ এবং চালুনির গল্পটা মনে পড়িল।

।। ত্রিশ ।।

উত্তেজিতভাবে নিপুদা আসিয়া প্রবেশ করিল।

আমাকে তুমি মিছিমিছি আটকে রাখলে শঙ্কর, এখানে কোনো কাজ করা অসম্ভব।

আবার কি হল?

রামলাল পড়বে না।

কেন?

বহুমাইজি মানা করেছে।

নিপুদা ঠোঁট বাঁকাইয়া হাসিল।

বহুমাইজি মানে কুন্তলা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আবার কে? এম. এ. পাস করলে কি হবে, সেকেলে বুর্জোয়া সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেননি এখনও। হাজার হোক, বামুনের মেয়ে তো, কামারের ছেলে লেখাপড়া শিখছে—বরদাস্ত করতে পারছেন না সেটা।

নিপুদা কায়স্থ-সন্তান, ব্রাহ্মণদের ওপর ভীষণ রাগ, সুযোগ পাইলে ছোবল দিতে ছাড়েন না। নিপুদার কথায় ব্রাহ্মণ-সন্তান শঙ্করের কান ঈষৎ গরম হইয়া উঠিল। কিন্তু কিছু বলিল না সে। নিপুদার চালচলন কথাবার্তা কিছুই তাহার ভালো লাগে না, তবু তাহাকে সে যাইতে দেয় নাই। তাহার সমস্ত ঋণ শোধ করিয়া দিয়া তাহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া অর্থাৎ একরূপ খোশামোদ করিয়াই আবার তাহাকে রাখিয়াছে। মনকে বুঝাইয়াছে, নিপুদা না থাকিলে অনুন্নতদের উন্নত করিবার ভার কে লইবে? পল্লী উন্নয়নের উহাই যে একটা প্রধান অঙ্গ। নিপুদার মত উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইবে না। এ পল্লীগ্রামে কেহ আসিতেই চাহিবে না। আসলে অসহায় নিপুদার প্রতি অনুকম্পাবশতই যে তাহাকে সে যাইতে দেয় নাই, এ কথা নিজের কাছেও শঙ্কর স্বীকার করিতে চায় না। নিপুদা সত্যই উপযুক্ত লোক, অভাবের চাপেই মনটা বাঁকিয়া-চুরিয়া গিয়াছে। শিক্ষিত লোক যে, তাহা তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নানা যুক্তি দিয়া নিজের মনকে বুঝাইয়াছে যে, এ দেশে স্বার্থের জন্যই নিপুদার থাকা প্রয়োজন। যদি মন দিয়া কাজ করেন, সত্যই অনুন্নত শ্রেণীর অনেক উপকার হইবে। ডোমপাড়ার নিরক্ষর ছেলেমেয়েদের জন্য একটা পাঠশালা খাড়া তো করিয়াছেন। অনুন্নতদের উন্নত করিতে না পারিলে যে দেশের উন্নতি অসম্ভব, তাহা শঙ্করের অনেক দিনের বদ্ধমূল ধারণা। তাহাদের জন্যই সে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা করিয়াছে। স্বাস্থ্য যাহাতে ভালো থাকে, তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহাদের বাসস্থানের চতুর্দিক পরিষ্কার করাইয়াছে, ভ্যাকসিন দেওয়াইবার জন্য, কুইনিন বিতরণ করিবার জন্য চৌধুরীকে নিযুক্ত করিয়াছে। নিম্নশ্রেণীর একটি বালকের উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি-স্থাপনও করিয়াছে। কামার কুমোর তেলি অথবা নিম্নতর কোনো বর্ণের বালক যদি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে

এম. এ. পর্যন্ত পড়িবার খরচ উৎপলের এস্টেট হইতে দেওয়া হইবে। বালকটির সহিত একটি শর্ত থাকিবে কেবল উপার্জনক্ষম হইলে টাকাটা তাহাকে পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে, সেই টাকায় ভবিষ্যতে যাহাতে আর একটি ছেলের পড়া হয়। নিম্নশ্রেণীর কোনো বালক এতদিন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাই দেয় নাই। এই বৎসর ঝক্‌সু কামারের পুত্র রামলাল ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবে, পাস করিতে পারিবে কি না, তাহা অনিশ্চিত, কিন্তু তবু সে নিপুদা কর্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়া 'যদি'র উপর নির্ভর করিয়া বৃত্তিটি দাবি করিয়াছে। নিপুদার উদ্দেশ্য, ক্যাপিটালিস্ট উৎপল সত্য সত্যই টাকাটা দেয় কি না, তাহা যাচাই করিয়া দেখা এবং উৎপল সত্যই যদি টাকাটা দিয়া ফেলে (সে বিষয়ে নিপুদার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল), তাহা হইলে তাহা লইয়া ছোটলোক-মহলে নিজের বেশ একটা প্রতিপত্তি বিস্তার করা। উৎপল বিনা দ্বিধায় রামলালের দাবি মঞ্জুর করিয়াছে। সমস্তই ঠিকঠাক, এমন সময়ে এক অপ্রত্যাশিত বাধা আসিয়া উপস্থিত। রামলালের পিতা ঝক্‌সু হঠাৎ বাঁকিয়া বসিয়াছে! পুত্রকে সে আর 'অংরেজি' পড়াইবে না, বহুমাইজি বারণ করিয়াছেন। বহুমাইজির কথা তাহার নিকট বেদবাক্য।

কুন্তলার এই বিরুদ্ধতায় শঙ্কর বিস্ময় বোধ করিল। শিক্ষিত মহিলার নিকট এ আচরণ সে প্রত্যাশা করে নাই।

কুন্তলা মানা করলে? কেন বুঝতে পারছি না তো!

আমিও প্রথমটা পারিনি, তাই জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম।

কি বললে?

দেখা পর্যন্ত করলে না আমার সঙ্গে হে।

নিপুদার ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল, চোখের দৃষ্টি অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল।

ভাবলে, বোধ হয়, যেহেতু আমি এম. এ. পাস নই, সেই হেতু ওর সঙ্গে কোনো বিষয়ে আলোচনা করবারও যোগ্য নই। দি ইন্‌সোলেন্ট স্মার্ট—

ইংরেজি গালাগালিটা অর্ধস্বগত উচ্চারণ করিয়া নিপুদা চুপ করিল এবং যেমন তাহার স্বভাব, মুখে ঈষৎ হাসি ফুটাইয়া অন্য দিকে চাহিয়া রহিল। কুন্তলার সম্বন্ধে নিপুদার অপমানসূচক ভাষাটা শঙ্করের নিজের আত্মসম্মানকেই যেন আঘাত করিল। কিন্তু তবু সে কিছু বলিতে পারিল না। কুন্তলার সপক্ষে কোনো যুক্তিই সে খুঁজিয়া পাইল না। নিপুদার সহিত সে কলহ করিতে চায় না, পল্লী উন্নয়নের বিঘ্ন হিসাবে কুন্তলার এই আচরণ তাহার নিকট বিরক্তিকর, তবু তাহার ভদ্র মন তাহার অজ্ঞাতসারেই কুন্তলার সপক্ষে একটা যুক্তি আহরণ করিতে ব্যস্ত হইল। নিপুদাকে মুখের মত একটা জবাব দিতে পারিলে সে যেন আরাম বোধ করিত। লোকটা ভারি অভদ্র। কিন্তু কুন্তলা—

কি ভাবছ? ওঠ, চল, যাওয়া যাক।

কোথা?

ঝকসুর কাছে। তাকে রাজি করাতে হবে। যদি নেহাত রাজি না হয়, তা হলে রামলালকে তার বাপের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করব। ও যদি পাস করতে পারে, ওকে কলেজে ভর্তি করবই আমরা, দেখি, কে আটকায়!

সেটা কি ঠিক হবে, মানে—বাপের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করাটা?

তুমি তোমার প্রিন্সিপ্‌লের খাতিরে বাপের বিরুদ্ধে যাওনি? রাশিয়াতে অ্যান্টি-রিভলিউশনারি বাপ-মাকে হরদম বর্জন করছে সেখানকার ছেলে-মেয়েরা এবং বায়োলজিক্যালি আত্মরক্ষার জন্য তা করা ছাড়া উপায় নেই।

সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের সহিত কথাগুলি বলিয়া নিপুদা হাসিল।

শঙ্কর আর থাকিতে পারিল না।

আত্মরক্ষা মানে?

আত্মরক্ষা মানে আত্মরক্ষা, আবার কি?

কার আত্মরক্ষা? আমাদের, না রামলালদের?

আমাদের সকলের।

বল্‌শেভিক রাশিয়ায় কিন্তু সকলে রক্ষা পায়নি। 'কুলাক' এবং 'নেপ্‌ম্যান'দের দুর্গতির অন্ত ছিল না সেখানে। এখানেও যদি সবাই বলশেভিক হয়ে ওঠে, আপনি আমি বাঁচব না। বলশেভিক শাস্ত্রমতে—আমরা শোষকের দলে। বায়োলজিক্যালি আত্মরক্ষা করতে হলে রামলালদের বাড়তে না দেওয়াই উচিত। সে হিসাবে কুন্তলাদেবীর যুক্তি ঠিক।

কুন্তলাদেবীর যুক্তি স্বার্থপর পশুর যুক্তি।

বায়োলজিতে পরার্থ বলে কিছু নেই, স্বার্থই সেখানে মূলমন্ত্র।

মানলাম। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ বলিদান দিতে হবে।

মানে সোজা ভাষায় আমার স্বার্থ, আপনার স্বার্থ, আমাদের বংশধরদের স্বার্থ সব বলিদান দিতে হবে। শ্রমিকদের বড় করে নিজেদের অবলুপ্ত করে ফেলতে হবে।

বাঁকা হাসি হাসিয়া নিপুদা বলিল, একদিন তা হবেই। শ্রমিকদের প্রাধান্যকে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

গত্যন্তর থাকবে না যখন, তখন নেব। আগে থাকতে যেচে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনি কেন?

যুক্তির পথে না গিয়া নিপুদা চটিয়া উঠিল।

তা হলে কি বুঝতে হবে, তুমিও কুন্তলার দলে? তোমার এই পল্লী-উন্নয়ন টুন্নয়ন একটা 'শো' মাত্র। আমাকে তা হলে মিছিমিছি কেন—

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, আহা, চটছেন কেন? ব্যাপারটা বায়োলজির দিক থেকে ভেবে দেখছি একটু, সেদিন যেমন দেখেছিলাম।

এ বায়োলজি নয়, এ তোমার কবিত্ব।

আর একটু হাসিয়া শঙ্কর বলিল, কবিত্বই তো সত্য নিপুদা। ডারবিনও কবি ছিলেন, Struggle for existence, survival of the fittest—আসলে বোধহয় কাব্যকথাই। আমরা কি নিজেদের এক্‌জিসটেন্সের জন্যে স্ট্রাগল করছি? যদি নিছক পশু-প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হতাম, তা হলে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনবার জন্যে এমন করে উঠে পড়ে লাগতাম না। এটা ঠিক জানবেন, যাদের জাগাবার আমরা চেষ্টা করছি, তারা জাগলে আমরা কেউ বাঁচব না। বৃহত্তর মানব সমাজ হয়তো রক্ষা পাবে—

তুমি ঝক্‌সুর ওখানে যাবে, না বাজে তর্ক করবে বসে বসে?

চলুন।

উভয়ে বাহির হইয়া পড়িল। পরিহাস-ছলে তর্ক করিতে গিয়া শঙ্কর যেন একটা সত্য আবিষ্কার করিল এবং মনে মনে চমৎকৃত হইয়া গেল। বায়োলজির দিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে পতিতোদ্ধারের চেষ্টা করা, মানে সত্যই তো আত্মবিলোপের আয়োজন করা। কোনো জীব কি সজ্ঞানে আত্মবিলোপের আয়োজন করে? বায়োলজিক্যালি রামলালদের হয়তো উপকার হইবে, কিন্তু আমরা উদ্বুদ্ধ হইয়াছি কিসের প্রেরণায়? আমরাই তো উহাদের চোখ ফুটাইতেছি। নিজেদের সর্বনাশ সুনিশ্চিত জানিয়াও কিসের প্রেরণায় আমরা নিজেদের মারণাস্ত্র উহাদের হাতে তুলিয়া দিতেছি? ইহা জৈবিক নয়, ইহা জীবোত্তর প্রেরণা, ইহাই মনুষ্যত্ব, ইহাই মহত্ত্ব। এই প্রেরণাবশেই দধীচি বজ্র নির্মাণের জন্য নিজের অস্থি দান করিয়াছিলেন, বশিষ্ঠ আত্মনিধনযজ্ঞে পৌরোহিত্য স্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। নিজের কল্পনায় মশগুল হইয়া শঙ্কর পথ চলিতে লাগিল।

হুঁঃ, ক্যাপিটালিস্টদের লেখা কতকগুলো বাজে প্রোপাগান্ডা পড়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার।

নিপুদা খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল এবং আড়চোখে শঙ্করের দিকে চাহিল। শঙ্কর কোনো উত্তর দিল না। তাহার মন তখন আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে।

মুখময় বসন্তের দাগ, কাঁচা-পাকা ঝাঁকড়া গোঁফ, কালো রঙ, একমাথা অবিন্যস্ত চুল, বিরাটকায় ঝক্সু বিশাল হাতুড়িটা তুলিয়া চতুর্দিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করিতে করিতে তপ্ত লোহা পিটিতেছিল। শঙ্করের শিক্ষার উপযোগিতা বিষয়ক বক্তৃতা অথবা নিপুদার কমিউনিস্টিক বচন সে শুনিতেছিল কিনা, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া অনুমান করা শক্ত। রামলালও একটু দূরে দাঁড়াইয়া রোদ পোহাইতেছিল এবং সব শুনিতেছিল। শঙ্করের এবং নিপুদার বক্তব্য যখন শেষ হইয়া গেল, তখনও ঝক্সু কিছু বলিল না, লোহাই পিটিতে লাগিল।

কি রে, কিছু বলছিস না যে? তোর এক পয়সা খরচ লাগবে না, খরচ যা লাগে, আমরাই দেব সব।

হাতুড়ি পেটা বন্ধ করিয়া বাম হাত দিয়া ঝক্সু মাথার ঘাম মুছিয়া ফেলিল। ঠাকুর-বাবার শিষ্যকে ইহারা পয়সার লোভ দেখাইতে আসিয়াছে! এ সম্বন্ধে সে অবশ্য মুখে কিছু বলিল না। গলা খাঁকারি দিয়া বাক্‌যন্ত্রটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া সংক্ষেপে কেবল বলিল, বহুমাইজিকা বাতো সে হাম্ বাহার নেই হোবে পারব, অংরেজি উ আর নেহি পঢ়তে।

ওই এক বুলি ধরেছে।

নিপুদা হতাশভাবে হাত উল্টাইল।

অংরেজি পড়তে দোষটা কি?—শঙ্কর প্রশ্ন করিল।

ঝক্সু হাতুড়ি তুলিয়া কাজ শুরু করিতে যাইতেছিল, এই কথায় হাতুড়ি নামাইয়া রামলালের দিকে নিজের বলিষ্ঠ দক্ষিণ বাহুটা প্রসারিত করিয়া সক্ষোভে বলিল, অংরেজি পঢ়ি কর্ শালারো হালত্ কি ভোলোছে দেখো, তো আপনে আঁখিসে দেখো।

পুত্রকে শালা সম্বোধন করাতে নিপুদা শঙ্করের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিল। শঙ্কর হাসিতে

সায় দিল না, রামলালের দিকে চাহিয়া সে অবাক হইয়া গেল। রামলালকে সে ইতিপূর্বে বহুবার দেখিয়াছে, কিন্তু এই পারিপার্শ্বিকে সে যেন রামলালকে নবরূপে আবিষ্কার করিল। এই ঝকসুর পুত্র রামলাল! লিক্‌লিকে চেহারা, দশ আনা-ছ আনা চুল ছাঁটা, গায়ে শৌখিন কামিজ, গলায় রেশমের গলাবন্ধ, পায়ে গ্রিসিয়ান স্লিপার, গোঁফ কামানো! তাহাদের দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছে! পুরুষ নয়, যেন মেয়েমানুষ! একটা বটের চারা অস্বাভাবিক আওতায় পড়িয়া কেমন যেন লতানে-গোছের হইয়া গিয়াছে।

হোপলেস্! চল, হরিহরবাবুর কাছে যাওয়া যাক, এর কাছে বকবক করে কোনো লাভ নেই। কি হে, গুম মেরে গেলে যে?

শঙ্কর কোনো উত্তর দিল না। ঝক্‌সু আবার লোহা পিটিতে শুরু করিয়াছিল। বিচ্ছুরিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলির দিকে চাহিয়া শঙ্কর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইতেছিল, আমরা ভুল পথে চলিতেছি না তো?

।। একত্রিশ ।।

সমস্ত রাত শঙ্করের ঘুম হয় নাই। নিপুদা, কুন্তলা, ঝক্‌সু, রামলাল, সুরমা, উৎপল সকলের সম্মিলিত প্রভাব একটা পাথরের মত তাহার বুকে চাপিয়া বসিয়াছিল। সে যেন স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও লইতে পারিতেছিল না। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া অবশেষে সে বিছানায় উঠিয়া বসিল। কমানো বাতিটার স্বল্পালোকে চোখে পড়িল, অমিয়া এবং খুকি অঘোরে ঘুমাইতেছে। খুকির গায়ে লেপ নাই, অমিয়ার খোঁপাটা এলাইয়া পড়িয়াছে। খুকির গায়ের লেপটা সন্তর্পণে ঠিক করিয়া দিয়া সে মশারি হইতে চুপি চুপি বাহির হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে কপাট খুলিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। বারান্দায় আসিয়া সে অভিভূত হইয়া পড়িল। এ কোথায় আসিল সে! এ যে রূপকথার রাজ্য! তাহারই ঘরের বারান্দায় এই অপরূপ স্বপ্ন কতক্ষণ হইতে মূর্ত হইয়া রহিয়াছে! মেঘচাপা জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতায় চতুর্দিক স্বপ্নাকুল। কিছু দূরে রাস্তায় যে অস্ফুট কলরব উঠিতেছিল, তাহা তাহার জ্যোৎস্না-অভিভূত মন প্রথমটা শুনিতেই পাইল না। একটু পরেই কিন্তু পাইল এবং উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। কিসের কলরব? রাস্তায় এত ভিড় কিসের? বারান্দা হইতে নামিয়া দেখিল, দলে দলে লোক চলিয়াছে। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, আজ মাঘীপূর্ণিমা। গঙ্গাস্নান করিতে চলিয়াছে সব। গঙ্গার তীরে প্রকাণ্ড উৎসব আজ। মেলা বসিবে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, তীব্র হাওয়া উঠিয়াছে একটা, মাঘের কনকনে শীত। কিন্তু কিছুই ইহাদের নিরস্ত করিতে পারে নাই। দলে দলে চলিয়াছে সব। দূরদূরান্ত হইতে আসিয়াছে। মাঝে মাঝে 'টপ্‌পর' দেওয়া গরুর গাড়ি, তাহাতেও লোক ঠাসা। কি উৎসাহ! মাঝে মাঝে নারীকণ্ঠের উচ্চহাস্য শোনা যাইতেছে, মাঝে মাঝে শিশুকণ্ঠের ক্রন্দনও। 'জয় গঙ্গামায়ী' কি জয়' বলিয়া এক-একটা দল মাঝে মাঝে জয়ধ্বনি দিতেছে, কেহ ভজন গাহিতেছে, দেশি ঢোল খঞ্জনি বাজাইয়া কেহ কেহ কীর্তন ধরিয়াছে। মেঘ-মেদুর জ্যোৎস্নায় শঙ্কর স্পষ্ট কিছু দেখিতে পাইতেছিল না, কিন্তু সে অনুভব করিতেছিল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই চলিয়াছে আজ। অন্ধ-খঞ্জ, সুস্থ-অসুস্থ, ধনী-দরিদ্র,

কৃপণ-দাতা, চোর-সাধু, পাপী-পুণ্যবান কেহ বাদ নাই। তাহার মনে হইল, আমাদের মত 'কাল্‌চার্ড' কুসংস্কারমুক্ত ইংরেজি-পড়া মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া বাকি সকলেই আজ গঙ্গাস্নানে চলিয়াছে। কিসের টানে চলিয়াছে? কোন্ অদৃশ্য আইন ইহাদের এই শীতের ভোরে হাঁটিতে বাধ্য করিতেছে? পুণ্যের লোভ? পরলোকের সদ্‌গতি? সে কিন্তু লোভ দেখাইয়া ইহাদের সৎপথে আনিতে পারিতেছে না তো! পাশ করিলে চাকরি পাইবে, হাকিম হইবে—এসব লোভ দেখানো সত্ত্বেও, তাহার অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র কই জুটিল! আর একটা ঘটনাও মনে পড়িয়া গেল। রাজীব দত্ত একবার মাতৃশ্রাদ্ধে গরিব-দুঃখীদের পোলাও খাওয়াইবেন বলিয়া ঢ্যাটরা দিয়াছিলেন। কয়েকজন অস্পৃশ্য ভিখারি ছাড়া তেমন বেশি লোক জোটে নাই। এই নিরন্ন বুভুক্ষু দেশে পোলাও খাইবার লোভে দলে দলে লোক ছুটিয়া গেল না তো! রাজীব দত্তের ঢ্যাটরা দিয়া পোলাও-খাওয়ানোর অশোভন অহমিকাকে এ দেশের গরিব-দুঃখীরাও প্রশ্রয় দিল না। না না, ঠিক লোভ নয়। বিশ্বাস, তৃপ্তি, নিগূঢ় সংস্কার বা ওই জাতীয় একটা কিছু ইহাদের অন্তরে এখনও আছে, যাহা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। ইহারা যাহা বিশ্বাস করে, আমাদের তাহাতে বিশ্বাস নাই। এই বিশ্বাসের জোরে ইহারা বারো মাসে তেরো পার্বণের উৎসবে মাতিয়া উঠিতে পারে, আমরা পারি না, নিরুৎসব আমরা নাক সিঁটকাইয়া দূরে বসিয়া থাকি। মনে করি, যদি এই অসভ্যগুলাকে ধরিয়া সাবান-পাউডার মাখাইয়া ফিটফাট কেতা-দুরস্ত করিয়া মুখে বিদেশি বুলি এবং মনে বিলাতি সভ্যতার রঙটা ধরাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলেই বুঝি ইহারা শান্তি পাইবে। কিন্তু তাহাতে ইহারা বোধ হয় শান্তি পায় না। আমরাই কি পাইয়াছি? শীতের ভোরে খালি পায়ে হাঁটিয়া ভজন গাহিতে গাহিতে গঙ্গাস্নান করিয়াই বোধ হয় ইহারা শান্তি পায়।... প্রত্যুষের অস্ফুট আলোকে তীর্থযাত্রী এই জনস্রোতের দিকে শঙ্কর সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। মনে হইল, সে যেন বিদেশি, ইহাদের চেনে না, ইহাদের সহিত কোনো সম্পর্ক যেন তাহার নাই।

এই বিদেশির জন্যই কিন্তু যমুনিয়া লুকাইয়া মুকুন্দ পোদ্দারের দ্বারস্থ হইয়াছিল এবং কিছু টাকা কর্জ করিয়া 'ঝান্ডা' উঠাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিল। বাজু জোড়া বাঁধা দিতে হইল। কিন্তু উপায় কি, মানত শোধ করিতে হইবে তো! মানত শোধের জন্য এত খরচ অবশ্য না করিলেও চলিত, কম পূজা দিলেও 'দেবতা' অসন্তুষ্ট হইতেন না; কিন্তু শঙ্করবাবুকে ভালো মাংস খাওয়াইবার সাধ তাহার অনেক দিন হইতে। সেদিন এক কথায় অমন একটা দামি পশমি দোশালা তাহাকে দিয়া দিলেন! সামান্য কিছু একটু প্রতিদান না দিলে কি ভালো দেখায়! সুতরাং মাঘীপূর্ণিমার দিন 'দেও' স্থানে 'ঝান্ডা' উঠাইবার অজুহাতে সে একটা পাঁঠা এবং পাঁচটা কবুতর চড়াইবার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। মেথরপাড়ার এই 'দেও'-স্থানটি বড় জাগ্রহ স্থান। ডাইনি 'আঁখ লাগিয়া' কেহ যদি অসুস্থ হয়, দুরারোগ্য ব্যাধি যদি কাহারও না সরে, কাহারও যদি বারবার ছেলে হইয়া মরিয়া যায়, বিদেশে পুত্রের সংবাদ না পাইয়া কেহ যদি ব্যাকুল হয়, এই 'দেও' স্থানে আসিয়া সে মানত করে এবং মাঘীপূর্ণিমার দিন পূজা চড়ায়। বিষুণের অনেক দিন কোনো খবর নাই, কলিকাতায় সেই যে সে গিয়াছে আর আসে নাই। চিঠিও লেখে না। চিঠি লিখিলে উত্তরও আসে না। ছেলের জন্যই যমুনিয়া মানত করিয়াছিল। মুশাই আপত্তি করে নাই, বরং খুশিই হইয়াছিল। অন্য কোনো কারণে নয়, ন্যায়সঙ্গতভাবে মদ

খাইতে পারা যাইবে বলিয়া। আজ যমুনিয়া আপত্তি করিবে না। একটা বিষয়ে সে কিন্তু যমুনিয়াকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল, ধারের কথা বাবু যেন না জানিতে পারে। ইহা লইয়া বাবু যদি তাহাকে 'বক্‌ঝক্' করে, তাহা হইলে কিন্তু সে মারিয়া ধুনিয়া দিবে। যমুনিয়াও ধারের ব্যাপারটা যথাসাধ্য গোপন রাখিবার প্রয়াস পাইতেছিল।

।। বত্রিশ ।।

পরম শ্রদ্ধাবিষ্ট কণ্ঠে হরিহর জগদ্ধাত্রী-প্রতিমার সম্মুখে মন্ত্রপাঠ করিয়া ধ্যান করিতেছিলেন—

সিংহস্কন্ধাধিসংরূঢ়াং নানালঙ্কার-ভূষিতাম্
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্।
শঙ্খ-শার্ঙ্গ-সমাযুক্ত-বামপাণিদ্বয়ন্বিতাম্
চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাংশ্চ ধারয়ন্তী চ দক্ষিণে।
রক্তবস্ত্র-পরিধানাং বালার্কসদৃশী তনুম্
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাম্ ভবসুন্দরীম্
ত্রিবলীবলয়োপেত নাভিনাল মৃণালিনীম্
রত্ন-দ্বিপময়দ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে
প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভব-গেহিনীম্।

ধ্যানান্তে ভক্তিভরে তিনি প্রণাম করিলেন। অনেকক্ষণ প্রণত হইয়াই রহিলেন এবং মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, ত্রিভুবন-পালিনী, জগজ্জননী, সকলের মঙ্গল কর মা, সকলকে শান্তি দাও। সকলের জন্যই প্রার্থনা করিলেন তিনি, কেবল নিজের জন্য প্রার্থনা করিতে তাঁহার কেমন যেন সঙ্কোচ হইল। কিন্তু নিজের জন্যও প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল তাঁহার। কিছুদিন হইতে তিনি কেমন যেন একটা অশান্তি অনুভব করিতেছিলেন। অশান্তিটা যে ঠিক কি এবং কেন, তাহাও তাঁহার অগোচর ছিল। স্পষ্ট কোনো কারণ তো চোখে পড়ে না! তবে কেমন যেন একটা অস্বস্তি, অস্পষ্ট কিসের যেন একটা ছায়া তাঁহার মনের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করিতেছিল। কিসের একটা অভাব যেন তিনি মনের মধ্যে অনুভব করিতেছিলেন। এই অভাব বোধটা কি কুন্তলাকে কেন্দ্র করিয়াই? মাঝে মাঝে এ কথা তাঁহার মনে হয়, আবার তখনই ভাবেন—না, কুন্তলার আচরণ তো নিখুঁত। তাহার পতিভক্তি, গৃহকর্ম-নিপুণতা, দেবসেবা, কর্মশৃঙ্খলা সমস্তই তো অনিন্দনীয়। কেবল সে বড় বেশি গম্ভীর এবং আন্তরিক। একবার যাহা ভালো বলিয়া মনে করিবে, প্রাণপণে তাহা করিবেই। কলেজে-পড়া মেয়ে একটু যদি বিলাসিতা করিতই, কি এমন ক্ষতি ছিল তাহাতে? তাঁহার জন্যই হয়তো সে নিজেকে বঞ্চিত করিতেছে, এ সন্দেহ মাঝে মাঝে মনে জাগে এবং জাগিলেই তাঁহাকে বড় ব্যাকুল করিয়া তোলে। তাঁহার জন্য কেহ কষ্ট পাইতেছে, এ চিন্তা অতিশয় পীড়াদায়ক। তাঁহার জন্যই কি কুন্তলা এই কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছে? জিজ্ঞাসা করিতে কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। তুমি বিলাসী হও—এ কথাও মুখ ফুটিয়া বলা যায় না। অথচ...। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে এতটা সনাতন মনোবৃত্তি কি ভালো? কে জানে!

রামলাল যদি ম্যাট্রিক পাস করিয়া জমিদারের খরচে আই. এ. পড়িত, কি এমন ক্ষতি ছিল তাহাতে? ইহা লইয়া অনর্থক একটা অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। নিপুবাবু সেদিন যা মুখে আসিল বলিয়া গেলেন। কি দরকার ছিল এসবের? কুন্তলা কিন্তু কিছুতেই নিজের মত পরিবর্তন করিবে না। ঝক্সুও কুন্তলার মতের বিরুদ্ধে কিছুতেই যাইবে না। কুন্তলা যাহা বলিতেছে এক হিসাবে তাহা ঠিকই। সংস্কৃত লজিক মুখস্থ করিয়া অবশেষে একটা অকর্মণ্য জীবে পরিণত হওয়া অপেক্ষা কুলকর্ম করাই রামলালের পক্ষে শ্রেয়...। কিন্তু কি দরকার আমাদের এসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাওয়ার? জগদ্ধাত্রীর চরণাশ্রয়ে যে শান্ত শুদ্ধ আনন্দিত জীবন তিনি যাপন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এ সবের কোনো স্থান ছিল না এতদিন। সকলের মঙ্গল কামনা করিয়া সকলকেই স্বীয় নিয়তি নির্ধারিত পথে চলিতে দেওয়াই বিবেকসম্মত মনে হইত। কিন্তু কুন্তলাও হয়তো নিজের বিবেককেই অনুসরণ করিতেছে। স্বামীত্বের জোরে তাহাকে বাধা দিতে যাওয়াটাও কি ঠিক? তাহা ছাড়া কিছুদিন হইতে তাঁহার নিজেরও একটা খটকা লাগিয়াছে। সকলেই স্বীয়-নিয়তি-নির্ধারিত পথে চলিতেছে—এই বলিয়া নির্বিকারভাবে বসিয়া থাকা কি ব্রাহ্মণোচিত? শস্যশ্যামলা দেশ আমাদের শ্মশান হইয়া উঠিল যে! সবই নিয়তি-নির্ধারিত? অসংখ্য লোকের অসংখ্য দুর্দশা এবং নিজেদের ক্লীবত্ব মনকে পীড়িত করিয়া তোলে। ভিখারির সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। আমার কি করিবার আছে, আমি কি করিতে পারি—বলিয়া বসিয়া থাকা কি উচিত? পুনরায় তিনি জগদ্ধাত্রী-চরণে প্রণত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, জগদ্ধাত্রী জননী, সকলের মঙ্গল কর মা, সকলকে শান্তি দাও।

প্রণামান্তে বাহিরে আসিয়াই দেখিতে পাইলেন, কাঠের-পা-পরা সেই ভিখারিটা দাঁড়াইয়া আছে, সঙ্গে একটি শিশু। প্রাণপণে কি একটি জানোয়ারের ডাক ডাকিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। গলা একেবারে বসিয়া গিয়াছে। বড় ছেলেটা মহিষের ডাক ডাকিবার চেষ্টা করিল। কিছুই হইল না। এখনও ভালো শিখিতে পারে নাই।

হরিহর ভিতরে ঢুকিয়া চাল-কলা-ফল যাহা কিছু সব বাহির করিয়া তাহাকে দিলেন। ঝম্রু চলিয়া গেল। হরিহর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

।। তেত্রিশ ।।

শঙ্করের পরিবর্তিত মনোভাব সম্বন্ধে সুরমা অচেতন ছিল না। নিগূঢ় উপায়ে সে ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিল। বুঝিতে পারিয়াও কিন্তু নিজের সহজ আচরণকে সে ক্ষুণ্ণ করে নাই, বিশেষ বিব্রত বা কুণ্ঠিত সে হয় নাই। অন্তরের অন্তস্তলে সে বরং একটি সূক্ষ্ম গর্বই অনুভব করিতেছিল। অজ্ঞাতসারে নয়, জ্ঞাতসারেই সে এই মুগ্ধ ভৃঙ্গটিকে মনে মনে যে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছিল, তাহা সতী-সুলভ নহে, বিজয়িনী-সুলভ। কিন্তু তাই বলিয়া বিগলিত কিংবা বিচলিত সে হয় নাই। বাক্যে বা আচরণে এমন কিছুই সে প্রকাশ করে নাই, যাহা অশোভন। সে যে বুঝিতে পারিয়াছে, তাহাও তাহাকে দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না। তাহার সুমার্জিত ব্যবহারের স্বচ্ছন্দ সাবলীলতায় এতটুকু ছন্দপতন হয় নাই, তাহা ঠিক আগের মতই সংযত অথচ অনাড়ষ্ট ছিল। কিন্তু শঙ্করের স্পন্দিত হৃদয়ের উন্মুখ প্রণয়োৎকণ্ঠায় তাহার মনের

নিভৃততম প্রদেশে যে সূক্ষ্ম আনন্দ অদৃশ্য পুষ্পসুরভির মত সঞ্চারিত হইতেছিল। তাহাতে সে ঈষৎ আবিষ্ট হইয়াছিল বইকি। কিন্তু সে মনে মনে বর্মাবৃতও হইতেছিল, ধরা দেওয়া হইবে না, লঘু ললিত-গতিতে স্থূলতাকে এড়াইতে হইবে, এমন আচরণ করিতে হইবে, যাহাতে এই অকথিত প্রণয়-আকুতি কথ্য প্রেমালাপের ইতরতায় পরিণত হইবার সুযোগ না পায়। নেপথ্য মানস-বিলাসকে নেপথ্যেই নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। কিন্তু স্থূলতা এড়াইবার এই চেষ্টাও আবার স্থূলভাবে প্রকট হইয়া না পড়ে, সে দিকেও তাহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। নিজের কৃতিত্ব মনে মনে উপভোগ করিতে করিতে নিপুণা সার্কাস-অভিনেত্রী যেমন ছাতা-হাতে সরু তারের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়, সুরমাও মনে মনে অনেকটা সেই জাতীয় ক্রীড়ায় লিপ্ত ছিল। একটু তফাৎ অবশ্য ছিল। মানসলোকের প্রত্যন্তদেশে অতিশয় সঙ্গোপনে যে খেলা চলিতেছিল, তাহাতে ক্রীড়ক এবং দর্শক—উভয়েরই ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল সে নিজেই। বাহিরের কোনো দর্শক সেখানে ছিল না।

।। চৌত্রিশ ।।

ভজহরি-প্রমুখাৎ বার্তা শুনিয়া মুকুন্দ পোদ্দার শুধু বিস্মিত নয়, কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন। অঙ্কে ভুল করিয়া ফেলিলে লোকে যেমন অপ্রস্তুত হয়, তেমনি অপ্রস্তুতও হইলেন তিনি একটু মনে মনে। সেদিন নিপুর ব্যবহারে তিনি মোটেই বিচলিত হন নাই। বস্তুত আজকালকার এই ডেঁপো ছোকরাদের সম্বন্ধে তাঁহার অনেক দিনের অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণার সপক্ষে আর একটা প্রমাণ পাইয়া মনে মনে বরং তিনি খুশি হইয়াছিলেন। ছোকরা বাড়ি বহিয়া তাঁহাকে বলিতে আসিয়াছিল, আমি আপনার শত্রু, এ জেনেও যদি আপনি আমাকে সাহায্য করতে চান করুন। ময়রাকে রসগোল্লা চিনাইতে আসিয়াছে। অ্যাঁ! ডাহা উজবুক না হইলে এতটা পথ হাঁটিয়া এ কথা বলিতে আসে কেহ? লোক চরাইতে চরাইতে মাথায় টাক পড়িয়া গেল, কে শত্রু, কে মিত্র তাঁহার এখনও চিনিতে বাকি আছে যেন! মিত্র কে? সব ব্যাটাই তো শত্রু। ঘাড় মটকাইবার সুযোগ পাইলে কোন্ দেবতা তাহা ছাড়েন? তুই যে শত্রু, তা ভালো করিয়াই জানি, কিন্তু সেদিনকার ছোঁড়া তুই, তোর নাক টিপিলে এখনও বোধহয় দুধ বাহির হইবে, আমার সঙ্গে কি শত্রুতা করবি তুই? তোর মুরোদ কত? বাহাদুরি করিয়া একথা বলিতে আসিবার মানে কি? ডাহা উজবুক না হইলে এ কাজ করে কেহ? নিপুর প্রতি পোদ্দার মহাশয়ের সে দিন সস্নেহ অনুকম্পাই হইয়াছিল একটু। নেহাত গাড়োল একটা! একমুখ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, বেশ বেশ, আপনি যে শত্রু, তা না হয় মেনেই নিলাম। কিন্তু শত্রুরও উপকার যদি করি আমি, কার কি বলবার আছে তাতে? আপনি মানুষ তো, ভারতবাসী তো, হিন্দু তো, আপনি বিপন্ন হয়েছেন এইই যথেষ্ট নয় কি, অত শত্রু মিত্র বিচার করার কি দরকার? গোটাকয়েক টাকা দিয়ে যদি আমি সাহায্যই করি আপনার, কার চণ্ডী অশুদ্ধ হবে তাতে, অ্যাঁ, কি বল ভজহরি? দাও, ওঁকে পঞ্চাশ টাকা দাও, নোট নেবেন, না খুচরো, আর হাতঘড়িটাও ফেরত দিয়ে দাও। কথার নড়চড় করবার লোক নই আমি।

নিপু বলিয়াছিল, আপনার কাজ কিন্তু আমি করব না।

আপনার ধর্ম আপনার কাছে।—বলিয়া তিনি হাসিয়াছিলেন। সোনা-বাঁধানো দাঁতগুলি

চকচক করিয়া উঠিয়াছিল। কেবল নিপুর ওপর নির্ভর করিয়াই বসিয়া থাকিবেন, এমন কাঁচা লোক তিনি নন। ইতিমধ্যে আরও দুই-তিনজন লোক মারফত তিনি হৃদয়বল্লভকে খবর পাঠাইয়াছেন। কেনারাম চক্রবর্তীকেই হাত করিবার ফিকিরে আছেন তিনি। আরও হাজার খানেক টাকা কবুল করিলেই লোকটি তাঁহার দিকে ঢলিয়া পড়িবে, বেশ বোঝা যাইতেছে। কেবলমাত্র নিপুর মত চ্যাংড়ার সাহায্যেই তিনি যে এতবড় জমিদারিটা কিনিয়া ফেলিবেন, এ হাস্যকর আশা তাঁহার কোনোদিনই ছিল না। তবে স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রও যখন কাঠবিড়ালিকে উপেক্ষা করেন নাই, তখন তাঁহার মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যক্তি তাহা করিবে কোন্ সাহসে? স্পষ্ট ভাষায় শত্রুতা ঘোষণা করিলেও তাই তিনি কাঠবিড়ালিটার হাতে পঞ্চাশটা টাকা গুঁজিয়া দিয়াছিলেন। এত লম্ফঝম্ফ তো, টাকা ও ঘড়িটা কিন্তু বেশ হাত পাতিয়াই লইল। তাহার পর অবশ্য আর কোনো খোঁজখবর পান নাই ছোকরার। রাখেনও নাই। ভাবিয়াছিলেন, টাকা কয়টা বোধ হয় জলেই গেল! এই ভাবিয়া কেবল সান্ত্বনা লাভ করিতেছিলেন যে, ছোকরা আর যাই করুক, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ অন্তত করিবে না। যে ছিদ্র দিয়া বুড়বুড়ি কাটিবার সম্ভাবনা ছিল, চাঁদির চাকতি দিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া গেল। ভজহরির নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিবার পর কিন্তু এ বিশ্বাস টিকাইয়া রাখা শক্ত হইল। ছোটলোকদের মধ্যে এ অঞ্চলে তাঁহার যত খাতক ছিল, সকলেই সুদ দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে যে, আর এক পয়সাও সুদ তাহারা দিবে না। দশ কিস্তিতে আসলটা তাহারা পাঁচ বৎসরে ক্রমশ শোধ করিয়া দিবে। তাহাতে যদি পোদ্দার মহাশয় সম্মত না থাকেন, মকদ্দমা করিতে পারেন। সকলের মুখেই এক বুলি এবং বুলিটা নিপুবাবুই নাকি সকলকে মুখস্থ করাইয়াছেন।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, অন্নছত্রে আজকাল লোক খাচ্ছে কত?

দশ জন খাওয়ার কথা, খায় কিন্তু বারো-তেরো জন, মানা করলে শোনে না, এসে বসে পড়ে।

কাল থেকে একশো জনের আয়োজন কর। একটা তরকারিও বাড়িয়ে দাও। কি তরকারি দিচ্ছ আজকাল? কদিন যেতেই পারিনি।

শাক বেগুন মুলো দিয়ে একটা ঘণ্ট হয়েছিল আজ।

লাউ সস্তা আজকাল, লাউয়ের তরকারি কর একটা কাল থেকে।

যে আজ্ঞে।

আর যারা যারা সুদ মাপ চায়, তাদের বলো—আমার সঙ্গে যেন দেখা করে তারা। বলো যে, তোদের বিপদে আপদে আমরাই চিরকাল করেছি, চিরকাল করবও। আজ হঠাৎ নিপুবাবুর কথায় নেচে মরছিস কেন তোরা? ভালো করে বুঝিয়ে বলো, বুঝলে? দুটো মিষ্টি কথা বলতে শেখো।

যে আজ্ঞে।

ভজহরি চলিয়া গেল, পোদ্দার মহাশয় স্মিতমুখে বসিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার চোখে আগুনের আভা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

।। পঁয়ত্রিশ ।।

ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দশী।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি। অতিশয় অসহায়ভাবে শঙ্কর গোরুর গাড়ির ভিতর চুপ করিয়া শুইয়াছিল। মন্থরগতিতে গ্রাম্যপথে গাড়ি চলিয়াছে, মুশাই গাড়ি হাঁকাইতেছে, শঙ্কর ভালো করিয়া ভাবিতেও পারিতেছে না, এখন কি করা উচিত। কিছুক্ষণ পূর্বে লক্ষ্মীবাগে স্বচক্ষে সে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিল, তাহার অপ্রত্যাশিত আঘাতে তাহার মননশক্তিই যেন মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। সত্য সত্যই কিন্তু দিবা-দ্বিপ্রহরে একদল উন্মত্ত জনতা আসিয়া মারপিট লুটতরাজ করিয়া মণিকে তাহার সম্পত্তি হইতে বেদখল করিয়াছে। মণির মাথা ফাটিয়া গিয়াছে, অজ্ঞান অবস্থায় সে এখন সদর হাসপাতালে। তাহার সমস্ত সম্পত্তি গুলাব সিং দখল করিয়া বসিয়াছে। মণির ঘরে মণিরই বিছানায় বসিয়া লোকটা সদলবলে আসর জমাইয়াছে। দলে আছে কেনারামের পুত্র জীবন, রাজীবের পুত্র গদাই, প্রমথ ডাক্তার ও স্থানীয় বেহারি উকিল দুইজন। ফুলশরিয়া মদ পরিবেশন করিতেছে। প্রাঙ্গণে জনতার মধ্যে ছিল ফরিদ, কারু, হরিয়া, রহিম, কর্পূরা, পূরণ—চেনা-শোনা আরও কত লোক, সকলেই তাহাদের প্রজা। সে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া চোরের মত লুকাইয়া পড়িল সব। লুকাইল না কেবল গুলাব সিং এবং ফুলশরিয়া। গুলাব সিং গোঁফে চাড়া দিয়া একপাত্র মদ আগাইয়া দিয়া বরং সম্বর্ধনাই করিল তাহাকে। স্বয়ং দারোগা সাহেবকে সে হাত করিয়াছে। শঙ্করবাবুকে তাহার কি ভয়? ফুলশরিয়া এক পাশে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। ফুলশরিয়া! এই ফুলশরিয়া নিপুদাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, নিজের গহনা বেচিয়া অসুস্থ হরিয়ার চিকিৎসা করিয়াছিল, এখন ডাকাতের দলে মদ পরিবেশন করিতেছে। পরিধানে চমৎকার একটি ছাপা বোম্বাই শাড়ি। একদিন তাহার মহত্ত্ব দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছিল, আজ সাহস দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তাহাকে দেখিয়া যে যেখানে পারিল আত্মগোপন করিল, সেই কেবল কোথাও গেল না। এক ধারে একটু সরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ফরিদ কারু রহিম কর্পূরা—প্রত্যেকের মুখ একে একে আবার তাহার মনে পড়িল। বিশেষ করিয়া ইহাদের কথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। প্রত্যেককে আপদে বিপদে সাহায্য করিয়াছে সে।... সেদিন নিজে জামিন হইয়া ছাড়াইয়া আনিল, দুই দিন যাইতে না যাইতেই ডাকাতি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে! দিনে-দুপুরে! কেবল অভাবের তাড়নাতেই তাহারা এসব করিতেছে—এ অজুহাতে আর মনকে প্রবোধ দেওয়া যায় না। অভাব নয়, ইহাই উহাদের স্বভাব! স্বভাব! স্বভাবই যদি হয়, তাহার জন্যও কি উহাদের দায়ী করা যায়? বহু যুগের নানা অভাবই কি উহাদের স্বভাব গঠন করে নাই? শুধু অন্নাভাব বস্ত্রাভাব নয়, শিক্ষার অভাব। তখনই আবার মনে হইল, জীবন চক্রবর্তী, গদাই দত্ত, প্রমথ ডাক্তার, দুইজন বেহারি উকিল, গুলাব সিং—ইহাদের কিসের অভাব আছে? ইহারাই তো আসল ডাকাত, কারু-ফরিদরা তো উহাদের চালিত যন্ত্রমাত্র। শিক্ষা? জীবন চক্রবর্তী, প্রমথ ডাক্তার, দুইজন উকিল—ইহাদের কি শিক্ষার অভাব ছিল? ইহারা যে শিক্ষা পাইয়াছেন, সে শিক্ষা পাইলে ফরিদ-কারুদের বিশেষ কিছু উন্নতি হইত কি? রামলাল কি উন্নত হইয়াছে? প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকটা মনে পড়িয়া

গেল। কাকের ঠোঁট সোনা দিয়া, পা মানিক দিয়া এবং ডানা মুক্তা দিয়া অলঙ্কৃত করিলেও কাক কাকই থাকে, রাজহংস হয় না। কাককে রাজহংস করিবার তাহার এ আগ্রহ কেন? নিমগাছের তলায় দুধ ঢালিলেই তাহাতে আম ফলিবে, এ দুরাশা সে কেন করিতেছে?—কেন করিতেছে—চিন্তা করিতে গিয়া অনিবার্যভাবে তাহার মনে হইল, করিতেছে নিজের বাহাদুরি দেখাইবার জন্য, করিতেছে তাহার আর কিছু করিবার নাই বলিয়া। যে শিক্ষার অন্তঃসারশূন্যতা সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ, সেই শিক্ষাই অপরকে জোর করিয়া গিলাইবার এই সাড়ম্বর আয়োজনের অন্য অর্থ আর কি হইতে পারে? তাহা ছাড়া তাহার নিজের কি এমন যোগ্যতা আছে, কি এমন চরিত্রবল আছে, যাহার জোরে সে সমাজ-সংস্কার করিবার স্পর্ধা করে? বাহাদুরি করিয়া সেদিন উৎপলের দেওয়া সিগারেটটা প্রত্যাখ্যান করিল বটে, কিন্তু মনে মনে তাহার স্ত্রীকে কামনা করিতে তো তাহার বাধিল না? সে নিজেও কি কম পরস্ব-লোলুপ? যে শিক্ষা তাহার নিজের চিত্তকে শুদ্ধ করিতে পারে নাই, সেই শিক্ষা দিয়া সে সমাজসংস্কার করিবে? সে নিজেই তো ভণ্ড!

মুশাই!

কি বাবু?

এখানে কাছাকাছি কোনোও দোকানে সিগারেট পাওয়া যাবে?

কোশিস্ করনে সে মিলবে জরুর।

দেখ্ তো।

মুশাই গাড়ি থামাইয়া নামিয়া গেল। শঙ্কর শুইয়া ছিল, উঠিয়া বসিল। সূচিভেদ্য অন্ধকার চতুর্দিকে। একা একা তাহার কেমন যেন গা-ছমছম করিতে লাগিল। চারিদিকে নির্জন, কোথাও আলোর লেশমাত্র নাই। গরুর গাড়ির আলোটাও নিবিয়া গিয়াছে। মুশাইটা গেল কোথায়? এখানে সিগারেট কোথা পাইবে? না পাঠাইলেই হইত। শঙ্কর মুখ বাড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। দেখিতে পাইল, দূরে একটা আলো আসিতেছে। আলো, না আলেয়া? না আলোই বোধ হয়। কাছাকাছি তো কোনো জলাভূমি নাই! শঙ্কর একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। একটু কাছাকাছি হইলে প্রশ্ন করিল, কে?

কোনো উত্তর নাই। আর একটু কাছে আসিলে শঙ্কর দেখিতে পাইল, একজন স্ত্রীলোক, সঙ্গে কেহ নাই। এত রাত্রে একা এই নির্জন মাঠের মধ্যে কে এ!

কোন্ হ্যায়, কাঁহা যায়েগা?

স্ত্রীলোকটি দাঁড়াইয়া পড়িল। আলোটা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, কে শঙ্করবাবু নাকি?

শঙ্কর চিনিতে পারিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। কুন্তলা!

এত রাত্রে একা কোথা চলেছেন?

শিবমন্দিরে পূজো দিতে যাচ্ছি।

এত রাত্রে শিবমন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছেন!

হ্যাঁ। আজ শিবরাত্রি যে।

একা কেন?

মণি-ঠাকুরপোর খবর পেয়ে উনি হাসপাতালে চলে গেলেন, চাকরটারও অসুখ করেছে, তাই একাই যাচ্ছি। কি আর হবে।

আর কোনো সঙ্গী পেলেন না?

কই আর পেলুম!

কুন্তলা একটু হাসিল! ম্লান বিষণ্ণ হাসি। শঙ্করের মনে হইল, সে হাসি যেন নীরব ভাষায় বলিতেছে, থিয়েটার সিনেমা হইলে অনেক সঙ্গী মিলিত, কিন্তু এই শীতে দুই মাইল পথ হাঁটিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে শিবপূজা করিতে যাইবে কে?

বলেন তো আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি।

না থাক।

কুন্তলা চলিয়া গেল। শঙ্কর একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ওই মেয়েটার তুলনায় নিজেকে কেমন যেন খেলো মনে হইতে লাগিল। পরমুহূর্তেই সে নিজের সহিত তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইল। নূতন যুগের নূতন পারিপার্শ্বিকে যাহার পুরাতন প্রথাকে অবুঝের মত আঁকড়াইয়া আছে, তাহারা কি সত্যই শ্রদ্ধেয়? কুন্তলা রামলালের শিক্ষার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া নিষ্ঠাভরে শিবরাত্রি করিতেছে! মনে মনে কথাটি বলিয়াই সে অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। নিজেই তো সে এতক্ষণ এই শিক্ষার তুচ্ছতার কথা ভাবিতেছিল। চিন্তার সূত্রটা কেমন যেন হারাইয়া গেল। নিজেরই অন্তরের পরস্পর-বিরোধী চিন্তাধারা মনের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর আবর্ত ফেনাইয়া তুলিল। একবার মনে হইল, শিবরাত্রি করায় কি এমন মহত্ত্ব আছে? আছে শুধু দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা, অক্ষমের অন্তঃসারশূন্য দম্ভ এবং তাহা বজায় রাখিবার জেদ! পরমুহূর্তেই নিজেকে প্রশ্ন করিয়া সে বিব্রত হইয়া পড়িল। অন্তঃসারশূন্য? সত্যিই কি ইহা অন্তঃসারশূন্য? নূতন যুগের নূতন ঢেউয়ের মুখে যে হালকা শোলাটা নাচিয়া বেড়াইতেছে তাহারই অন্তর পরিপূর্ণ, আর যে পর্বত সমস্ত ঢেউ সত্ত্বেও অটল হইয়া আছে সে-ই অন্তঃসারশূন্য! সহসা ইহার কোনো সদুত্তর মাথায় আসিল না, তবু কিন্তু নূতন যুগের নূতন দাবি যে একটা আছে, তাহা সে অস্বীকার করিতে পারিল না। নূতন যুগের সে অভিনব দাবিটা কি? কমিউনিজম? তাহাও কি পুরাতন মনোবৃত্তিরই পুনরাবর্তন নয়? শক্তিমান শ্রমিক জরাগ্রস্ত ধনিকের উপর প্রভুত্ব করিতেছে, ইহাতে অভিনবত্ব কোথায়? শক্তিমান চিরকালই অশক্তের ওপর প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছে! তবে? নূতন যুগের নূতন দাবিটা যে কি, তাহাই সে চিন্তা করিতে লাগিল। একটু পরেই মুশাই আসিয়া হাজির হইল। দেখা গেল, তাহার অসাধ্য কিছু নাই, ঠিক এক প্যাকেট সিগারেট কোথা হইতে জোগাড় করিয়া আনিয়াছে! কুন্তলার নিষ্ঠাকে ব্যঙ্গভাবে অবজ্ঞা করিবার জন্যই শঙ্কর যেন সাড়ম্বরে একটা সিগারেট ধরাইল এবং অপ্রস্তুত মুখে ফসফস করিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।

।। ছত্রিশ ।।

ভিতরে উত্তেজনা হইলে উৎপল বাহিরে খুব শান্ত হইয়া পড়ে। ভ্রূ উত্তোলন করা, পা দোলান, গোঁফে তা দেওয়া প্রভৃতি মুদ্রাদোষগুলি সমস্তই বন্ধ হইয়া যায়। এমন কি তাহার চোখের চঞ্চল দৃষ্টিও অচঞ্চল হইয়া পড়ে। শঙ্কর যখন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন এইরূপ তুরীয় অবস্থায় সে নিজের ঘরে বসিয়া রেডিও শুনিতেছে। শঙ্কর ঢুকিতেই সে রেডিওটা বন্ধ করিয়া দিল। প্রবেশ করিয়া শঙ্কর প্রশ্ন করিল, খবর জান?

খুব জানি। জাপানিরা সিটাং নদী পেরিয়ে আঠারো মাইল এগিয়েছে। রেঙ্গুন যায়-যায়।

সে খবরের কথা বলছি না। মণির কথা বলছি। মণির খবর জান?

মণির খবর তোমার জানবার কথা, আমার নয়।

জমিদারি কিন্তু তোমার এবং মণি তোমারই প্রজা।

সেটা কাগজে কলমে, আসল মালিক তুমি।—বলিয়া সে হাসিল। শঙ্করের ইচ্ছা করিতে লাগিল, উৎপলের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া দিতে, ছেলেবেলায় চটিয়া গেলে যেমন মাঝে মাঝে দিত। কিন্তু সে ছেলেবেলা আর নাই, উৎপলের সে ঝুঁটি নাই, সে উৎপলও আর নাই বোধ হয়। তাই সে সব কিছু না করিয়া বলিল, ননসেন্স।

একটা চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিল।

শঙ্করের আগমনে এবং কথাবার্তায় উৎপলের উত্তেজনা কমিয়া গিয়াছিল। তাহার চোখের স্বাভাবিক কৌতুকদীপ্তিও ফিরিয়া আসিয়াছিল। শালটা সর্বাঙ্গে ভালো করিয়া জড়াইয়া লইয়া বলিল, তা হলে ভণ, শ্রবণ করি।

তুই কিছুই শুনিসনি?

বৈশম্পায়ন না বললে তো জনমেজয়ের শোনবার কথা নয়। মহাভারতের ট্রাডিশন ওল্টাই কি করে বল?

শঙ্কর আরম্ভ করিতে যাইতেছিল, উৎপল বলিল, দাঁড়াও।

সিগারেট কেস হইতে সিগারেট বাহির করিতে করিতে উৎপল চকিত দৃষ্টিতে একবার শঙ্করের দিকে চাহিল।

আমাকেও দে একটা।

উৎপল ভ্রূ উত্তোলন করিল এবং একটু হাসিল। শঙ্করও হাসিতে যোগ দিল বটে কিন্তু মনে মনে সে যেন মরিয়া গেল।

মণির ব্যাপার সমস্ত শুনিয়া উৎপল বলিল, আমাকে কি করতে বল?

ব্যবস্থা কর।

আমার ব্যবস্থা কি তোমার পছন্দ হবে?

দেখ, ফের যদি ওরকম করে কথা বলিস, এক ঘুষি মারব তোকে।

উৎপল হাসিল।

শঙ্কর বলিল, ও-রকম করে গা বাঁচিয়ে থাকলে চলবে না। অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

তোমার যদি আপত্তি না থাকে, হঠাৎ ভাবগ্রস্ত হয়ে তুমি যদি বাধা না দাও, খুব ভালো ব্যবস্থা হতে পারে।

আমার আপত্তি হবে কেন?

উৎপল নীরবে বামগুম্ফ পাকাইতে লাগিল।

কি ব্যবস্থা করতে চাও?

বিকট রকম, অর্থাৎ স্ত্রিংস্ক্রিগ।

মানে?

উৎপল কিছুক্ষণ নীরবে গোঁফে তা দিল, তাহার পর বলিল, শোন তা হলে। প্রথমেই দারোগাটাকে টাকা দিয়ে হাত করতে হবে। গুলাব সিং যা দিয়েছে, তার চেয়ে বেশি দিয়ে আমাদের স্বপক্ষে আনতে হবে ওকে। দ্বিতীয়, জীবন চক্রবর্তীর নামে কেসটা তুমি 'উইথড্র' করবে ভাবছিলে, তা না করে 'ফুল ফোর্সে চালাতে হবে সেটা। তৃতীয়, রাজীব দত্তের ধানের গোলা আর পাটের গুদামে আগুন লাগিয়ে দিতে হবে এক্ষুনি—পরের সম্পত্তি নষ্ট করার মজাটা বুঝুন একবার ভদ্রলোক, তার আগে অবশ্য একটা ওয়ার্নিং দিতে পার, খেসারাৎ স্বরূপ যদি হাজার টাকা দেন, মাপ করতে পার এবারের মত। চতুর্থ, তোমার ওই নিপুদা এবং প্রমথ ডাক্তারকে আজই জবাব দিয়ে দাও। আজই যেন তাঁরা আমার এলাকা ত্যাগ করেন, জবাব দেওয়ার আগে থামে বেঁধে চাবকে দিলেও মন্দ হয় না। পঞ্চম, এই গুলাব সিংকে তিন দিক থেকে আক্রমণ করতে হবে। মণির হয়ে কেউ ওর নামে থানায় গিয়ে নালিশ করে আসুক, আমাদের এলাকায় ওর যত মহিষ আছে সব আড়গড়া দিয়ে দাও, আর মুখে মুখে প্রচার করে দাও (অর্থাৎ কথাটা যেন ওর কানে গিয়ে পৌঁছয়) যে, ওর মাথাটা কেউ যদি কেটে এনে দিতে পারে, তাকে হাজার টাকা বকশিশ দেব আমরা। ষষ্ঠ, তোমার ওই 'লেম ডাক্স'দের—ফরিদ কারু আর কি কি নাম বলছিলে সেদিন, ওদের প্রত্যেককে ডেকে এনে বেশ করে চাবকাও, তারপর বলে দাও যে, ওরা যদি সব মণির স্বপক্ষে সাক্ষী না দেয়, সর্বনাশ করে দেব ওদের। সপ্তম, এ অঞ্চলের বেহারি বাঙালি যত উকিল মোক্তার আছে, সবাইকে মণির তরফে নিযুক্ত করে ফেল; যে দুজন ডাকাতি করতে গিয়েছিলেন, তাঁরা যদি আমাদের পক্ষে আসতে রাজি না থাকেন, তাঁদেরও আসামী করে ফেল—আসামী করাই ভালো বোধ হয়। অষ্টম, এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহায়তায় পুলিস ফোর্স নিয়ে মণির সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা কর।

শঙ্কর অবাক হইয়া শুনিতেছিল।

এত না করলে হবে না?

হবে না—হবে না—হবে না—খোল তলোয়ার, এসব দৈত্য নহে তেমন। অবশ্য তোমার যদি মনে হয়, বাঘের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করলে ফল হবে, করে দেখতে পার, আমি কিন্তু সে সবের মধ্যে থাকব না।

সিগারেটটা শেষ হইয়া আসিয়াছিল, সেটা ফেলিয়া দিয়া উৎপল আর একটা ধরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তুমি আর একটি ধরিয়ে ব্যাপারটা প্রণিধান কর। আমি বাথরুম থেকে ঘুরে আসছি একটু।

উৎপল চলিয়া গেল। শঙ্কর আর সিগারেট ধরাইল না। নীরবে বসিয়া রহিল। সে বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। উৎপল কি ঠাট্টা করিতেছে? না, তাহা তো মনে হইল না। প্রয়োজন হইলে সত্যই সে যে এমন বীভৎস রকম নিষ্ঠুর হইয়া উঠিতে পারে, তাহার সম্বন্ধে এ ধারণা শঙ্করের ছিল না কখনও। তাহার ধারণা ছিল, উৎপল খামখেয়ালি এপিকিউরিয়ান মাত্র। তাহার আপাতসৌম্য পেলব মূর্তির অন্তরালে যে এমন একটা রাক্ষস প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে, তাহা কে ভাবিয়াছিল! মণি এবং গুলাব সিংয়ের কথা ভুলিয়া শঙ্কর উৎপলের কথা ভাবিতে লাগিল। আবাল্য পরিচিত উৎপলের মধ্যে এই অপরিচিত ব্যক্তিত্বের অপ্রত্যাশিত প্রকাশ

দেখিয়া মানবচরিত্রের বিবিধ সম্ভাবনা বিষয়েই আর একবার সে সচেতন হইল যেন। কিছুক্ষণ আগে ফুলশরিয়াকে দেখিয়া যেমন হইয়াছিল। এতগুলি ভয়ানক অনুষ্ঠানের তালিকা বেশ নির্বিকারভাবে দিয়া গেল তো! শক্তি আছে বলিতে হইবে। তখনই মনে হইল, শক্তি যে আছে, তাহা তো তাহার আগেই বোঝা উচিত ছিল। শক্তি না থাকিলে কেহ কি নিজের স্ত্রীর জবানিতে প্রেমপত্র লিখিয়া বন্ধুর নাড়ী পরীক্ষা করিতে পারে? শক্তি না থাকিলে কেহ কি এত টাকা এমন অবহেলাভরে খরচ করিতে পারে? এত বড় সম্পত্তির সমস্ত ভার তাহার ওপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? আজ পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন করে নাই, কোনো জবাবদিহি চাহে নাই। শক্তি আছে বইকি। এ শক্তির সম্মুখে কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সে বসিয়া রহিল। প্রতিকারস্বরূপ উৎপল যাহা করিতে চাহিতেছে, তাহাতে সায় দেওয়ার শক্তি তাহার যে নাই। প্রতিশোধের কথা সেও যে ভাবিয়া দেখে নাই তাহা নয়, কিন্তু সাদীর কবিতাটা মনে পড়িতেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। কুকুর কামড়াইয়াছে বলিয়া কুকুরকে কামড়াইতে হইবে? তোমার যদি মনে হয়, বাঘের সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবত পড়িলে ফল হবে, করে দেখতে পার...উৎপলের কথাগুলি মনে পড়িল। সত্যিই কি উহারা বাঘ? সত্যিই কি এ উপমা খাটে? পরমুহূর্তেই মনে হইল, এখনই তো সে নিজেই উহাদের কুকুরের সঙ্গে তুলনা করিতেছিল। উহারা সত্যই যে পশু ছাড়া আর কিছু নয়, অন্তরের অন্তস্তলে নিজেই কি সে এ কথা বিশ্বাস করে না? উহাদের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিলে যে কোনো ফল হইবে না, ইহা কি সে নিজেই অনুভব করিতেছে না? তবে এই পশুসমাজে তাহার কি করিবার আছে? নখদন্ত বিস্তার করিয়া উহাদের সহিত কলহ করিবে, না দূরে দাঁড়াইয়া উহাদের পশুত্ব লইয়া নৈতিক হাহাকার করিবে? এই দুইয়ের মধ্যে একটাকে বাছিয়া লওয়া ছাড়া অন্য আর কি করিবার আছে? পশুকে মানুষ করা? তাহার তো সম্ভাবনাই নাই। যাহা করিলে পশু সত্য সত্য মানুষ হয়, তাহা করিবার সুযোগ এই পরাধীন দেশে কোথায়? এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়, রাজনৈতিক আইনের নিক্তি-তে ওজন করিয়া। হিন্দু-মুসলমান বাঙালি-বেহারি প্রত্যেকের মন রাখিয়া ধর্ম-রাজনীতির ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া যে শিক্ষা আমাদের দেওয়া হয়, তাহার ফলে মনুষ্যত্ব উদ্বুদ্ধ হয় না, পশু ছদ্মবেশী হয় মাত্র। তবে? কি কর্তব্য এখন? সে কেমন যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল। মনে হইল, একটা বিপুল অরণ্যে যেন পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

কি ঠিক হল?

উৎপল আসিয়া প্রবেশ করিল।

শঙ্কর কোনো উত্তর দিল না।

আর একটা সিগারেট ধরাও না।

সিগারেট কেসটা আগাইয়া দিল। শঙ্করের মনে হইল, তাহার চক্ষু দুইটি যেন কৌতুকে নাচিতেছে। মনে হইবামাত্র তাহার মাথা খারাপ হইয়া গেল। অযৌক্তিকভাবে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া বসিল, তোমার জমিদারিতে তুমি যা ইচ্ছে করতে পার, যেখানে খুশি আগুন দিতে পার, যাকে ইচ্ছে চাবকাতে পার, কিন্তু তার সঙ্গে আমি নিজেকে জড়াব কি না ঠিক করতে পারিনি এখনও।

উৎপল কিছু বলিল না। নীরবে একটি সিগারেট তুলিয়া লইল।

শঙ্কর বলিয়া চলিল, কতকগুলো অসহায় লোককে ধরে চাবকানো, অশিক্ষিত লোকের বাড়িতে আগুন দেওয়া, গরিব কর্মচারীদের ওপর অত্যাচার করার মধ্যে সত্যিকারের পৌরুষের কোনো লক্ষণ খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি হয়তো পাচ্ছ।

আমিও পাচ্ছি না।

তবে?

আমি মণির কথা ভাবছি। কতকগুলো হিংস্র জন্তু তাকে আক্রমণ করেছে—এই কথাই মনে হচ্ছিল খালি। ঠিক কি করলে জগতের সম্মুখে নিজের পৌরুষ-প্রদর্শন নিখুঁত হবে, সে চিন্তা আমার মাথায় আসেনি।

বেশ, তা হলে যা ভালো বোঝ, কর।

আমার কথা শেষ করতে দে আগে। একটা কথা জানিস?

কি?

বাথরুম নামক স্থানটি অতি উত্তর স্থান। ওখানে গেলে হু-হু করে অনেক ভালো ভালো চিন্তা আমার মাথায় আসে, বোঁ বোঁ করে বড় বড় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, অর্থাৎ আমি খুব ভালো একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি হঠাৎ।

কি সেটা?

আমি এ বিষয়ে কিছুই করব না, যা করবার তুমিই কর।

রাগে শঙ্করের আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। বিড়াল যেমন ইঁদুরকে লইয়া খেলা করে, তাহার সন্দেহ হইল, উৎপলও তাহার সহিত তেমনই খেলা করিতেছে।

তুমি কিছুই করবে না কেন?

ভাবছি, শুধু শুধু তোমার মনে কষ্ট দিয়ে কি হবে?

আমার ব্যক্তিগত কষ্টের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি?

সম্পর্ক আছে বইকি। তুমিই তো সব, ব্যক্তিই তো আসল ভাই।

উৎপলের কণ্ঠস্বরে এমন একটা আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিল যে বিড়াল-ইঁদুরের উপমাটা নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। সহসা তাহার ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়িল। স্কুলের ফুটবল ম্যাচে সে একবার খেলিতে চাহে নাই। উৎপল সেবার ক্যাপ্টেন ছিল। আসিয়া ধরিয়া পড়িল, খেলিতেই হইবে। তুই-ই তো সব, তুই না খেললে আমরা দাঁড়াতেই পারব না। বহু বৎসরের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া উৎপলের কথাগুলি সহসা যেন ভাসিয়া আসিল। সেই উৎপল কি এখনও আছে?

ভুরু কুঁচকে দেখছিস কি?

তোমার কাণ্ডটা। বিপদে পড়ে তোমার পরামর্শ চাইতে এলুম, তুমি তা না দিয়ে কতকগুলো আজগুবি কসরত দেখাচ্ছ কেবল।

পরামর্শ তো দিয়েছি, এখন তদনুসারে চলা না-চলা তোমার ইচ্ছে। অর্থাৎ তুমি যা করবে তাই হবে।

প্রতিশোধ না নিলে এর প্রতিকার হবে না?

আর কি উপায় আছে, বল?

শঙ্কর বলিতে পারিল না। বস্তুত সেও আর কোনো উপায় ভাবিয়া পাইতেছিল না। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

অত দুশ্চিন্তা করবার দরকার নেই। তুমি ধীরে-সুস্থে ভেবে-চিন্তে যা হয় করো। আপাতত আর একটা কাজ করা যেতে পারে বরং।

কি?

এই অসময়ে সুরমার কাছ থেকে এক কাপ করে 'কফি' আদায় করবার চেষ্টা করলে মন্দ হয় না। আমি বলাতে ফ্ল্যাটলি 'না' বলে দিলে। তুমি যদি চাও—

আমার এখন খেতে ইচ্ছে করছে না ভাই।

বাই জোভ!

উৎপল অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া শিস দিতে লাগিল।

আমি ছুটি চাইছি ভাই! আমি এখান থেকে কয়েকদিনের জন্য পালাতে চাই। ও সমস্যার সমাধান তুমিই যা ভালো বোঝ কর।

দ্যাট'স নট শঙ্কর লাইক। পালাবি!

শঙ্করকে কে যেন কশাঘাত করিল। যদিও সে অবিলম্বে ঠিক করিয়া ফেলিল যে, পালাইবে না। তবু বলিল, কিছুদিন ছুটি নিতে ইচ্ছে করছে।

কেন?

এ সব নোংরামির মধ্যে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

পল্লীসংস্কার মানেই তো আবর্জনা সাফ করা।

দেশের লোক খুন করা নয়।

দেশের লোক যদি আবর্জনা হয়ে ওঠে, তা হলে তাও করতে হবে বইকি।

কিন্তু যে দেশের লোক এককালে মনুষ্যত্বের জন্যে বিখ্যাত ছিল, সে দেশের লোক যে কারণে আবর্জনায় পরিণত হচ্ছে, সেই কারণটা দূর করবার চেষ্টাই কি সংস্কার নয়?

কে অস্বীকার করছে তা? রিসার্চ করে রোগের কারণটা বার করবার চেষ্টা কর। কিন্তু রোগাক্রান্ত যে ব্যক্তিটি সত্যি মারা গেছেন, দেশের লোক হলেও তাঁকে পুড়িয়ে ফেলাই তো আমি উচিত মনে করি।

রিসার্চ করবার দরকার নেই। রোগের কারণ অনেক দিন আগেই ধরা পড়েছে, আর মারা আমরা সবাই গেছি, পোড়াতে হলে দেশসুদ্ধ সবাইকে পোড়াতে হয়—তোমাকে আমাকে সবাইকে।

যদি দরকার হয়, তাই করতে হবে।

আমার মতে কিন্তু তার দরকার নেই। দস্যু রত্নাকরকে পুড়িয়ে ফেললে বাল্মীকিকে পাওয়া যেত না। হাজার খারাপ হলেও মানুষ আবর্জনা নয়। আজকের বিলাসী মিস্টার গান্ধী কাল মহাত্মা গান্ধীতে বিবর্তিত হয়ে যেতে পারেন; আজ যে দুর্বল জীর্ণ-শীর্ণ, কাল সে স্যান্ডো। মানুষের ইতিহাসে এ সব উদাহরণ মোটেই বিরল নয়।

নারদ সেজে তা হলে গুলাব সিংয়ের কাছে যাওয়া যাক্ চল। কিছুই বলা যায় না, লোকটা সত্যিই হয়তো মহাকাব্য লিখে ফেলতে পারে। অন্তত সম্ভাবনা যে আছে, তর্কের খাতিরে সে কথা মানতেই হবে।

উৎপলের চক্ষু দুইটি হাসিতে লাগিল। শঙ্কর কিন্তু তাহা লক্ষ্য করিল না। নিজেরই আলোচনার সূত্র ধরিয়া সে এক ভিন্ন লোকে উপনীত হইয়াছিল, সেখানে দীন দরিদ্র বালক প্রতিভাবান ফ্যারাডেতে পরিণত হয়, রাজপুত্র সিদ্ধার্থ তপস্বী বুদ্ধে রূপান্তরিত হয়, সামান্য সৈনিক দেখিতে দেখিতে নেপোলিয়ানের শৌর্যে বীর্যে প্রজ্বলিত হইয়া ওঠেন—

বাই জোভ! সহসা এত দয়া!

শঙ্কর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, সুরমা প্রবেশ করিয়াছে। তাহার পিছনে বেয়ারা কফির সরঞ্জাম বহন করিয়া আনিতেছে।

কল্পনার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। সুরমার আবির্ভাবে নতুন ধরনের একটা উত্তেজনা তাহার সমস্ত চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। একটা আলো নিবিয়া গিয়া আর একটি রঙিন আলো যেন জ্বলিয়া উঠিল। শুধু তাই নয়, নিমেষমধ্যে সে নিজের সহিত সেই পুরাতন দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইল। বারংবার মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিল, অন্যায় করিতেছে, ভুল করিতেছে, পাপ করিতেছে, চুরি করিতেছে। বন্ধুপত্নীকে দেখিয়া মনে মনে মুগ্ধ হইবার অধিকার তোমার নাই; নির্বিকার থাক। প্রাণপণে সে নির্বিকার থাকিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

আপনি এসেছেন ভালোই হয়েছে, আপনার কাছে একবার যাব ভাবছিলাম।

শঙ্কর চাহিয়া দেখিল, সুরমার শুভ্র কপোলে কয়েকটি চূর্ণ অলক কাঁপিতেছে। শুভ্র নির্মল কপোল, আরক্তিম নয়।

কেন?

গুলাব সিং লোকটাকে শিক্ষা দিয়ে দিন, সব শুনেছেন তো? আমি আজ দুপুরে কুন্তলার কাছে গিয়েছিলাম, তাকে কথা দিয়ে এসেছি, এর প্রতিকার আমরা করবই।

কি বললেন তিনি?

বিশেষ কিছু বললে না। আজকাল বেশি কথা বলে না সে আর। শুধু বললে অরাজক দেশে বাস করছি, মুখ বুজে সবই সহ্য করতে হবে। আমি কিন্তু সহ্য করব না, এর একটা প্রতিবিধান করুন!

এতক্ষণ তুমি আমাকে কিছু বলনি তো?

বিস্মিত উৎপল প্রশ্ন করিল।

জানি তোমাকে বলা বৃথা।

উৎপল ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া আবার নামাইয়া লইল।

শেষ পর্যন্ত শঙ্করবাবুকেই সব করতে হবে। রেডিও আর যুদ্ধ নিয়ে যা মেতেছ তুমি আজকাল!

না মেতে উপায় কি? শত্রু-বাহিনী দ্বারে হানা দিয়েছে।

এ কথায় কোনো মন্তব্য না করিয়া সুরমা শঙ্করের দিকে চাহিয়া বলিল, এই মেড়ো জমিদারটাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে, আমরা, মানে বাঙালিরা, সত্যিই ভেতো নই। পারবেন তো?

নিশ্চয়ই।

অতর্কিত কথাটা শঙ্করের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর সামলাইয়া লইয়া

বলিল, উৎপলের সঙ্গে এতক্ষণ সেই কথাই হচ্ছিল। উৎপল তো একেবারে সপ্তমে চড়তে চায়।

চড়াই উচিত। এই বলিয়া সুরমা কফির কাপটা উৎপলের দিকে আগাইয়া দিল। শঙ্করও এক কাপ লইল, প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। কফিতে এক চুমুক দিয়া উৎপল বলিল, শঙ্করের কিন্তু ইচ্ছে—

না, আমি ভেবে দেখলাম তুমি যা বলছ তাই ঠিক। ও ছাড়া উপায় নেই।

শঙ্করবাবুর কি ইচ্ছে? সুরমা প্রশ্ন করিল।

ও বলছিল—

উৎপলের কথায় বাধা দিয়া শঙ্কর বলিল, দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ—এই বর্বর নীতিকে মানতে ইচ্ছে করছিল না আমার। ভদ্রতর কোনো উপায়ে এ সমস্যার সমাধান হয় কি না আলোচনা করছিলাম।

আলোচনা করতে পারেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আপনাকে বর্বর নীতি মানতে হবে, তার কারণ আসলে আমরা এখনও বর্বরই আছি। যিশুখ্রিস্ট বা বুদ্ধের বাণী আজও আমাদের মুখের বুলি মাত্র। তদনুসারে কোনো দিন আমরা চলি না। এখন চলতে চেষ্টা করলে, সেটা ভীরুতা বা ভণ্ডামীর নামান্তর হবে। নয় কি?

অনুত্তেজিত কণ্ঠে হাসিমুখে সুরমা কথাগুলি বলিল। শঙ্কর নির্নিমেষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিরাট একটা বীরত্ব করিয়া সুরমার চোখে নিজেকে মহনীয় প্রতিপন্ন করিবার প্রবল বাসনা সহসা তাহার মনে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। উৎপলের মুখে যে কথা শুনিয়া সে এতক্ষণ তাহাকে হৃদয়হীন ভাবিতেছিল, সুরমার মুখে ঠিক সেই একই কথা শুনিয়া সুরমাকে অতিশয় হৃদয়বতী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সহসা সে নিজেই নিজেকে মনে মনে ব্যঙ্গ করিয়া উঠিল, নারীস্তাবক পশুটা বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে! কোনো যুক্তি আর টিকিবে না। ব্যঙ্গ করিল, কিন্তু বিহ্বলতা কমিল না। কফি পান করিয়া সোৎসাহে সে উৎপলের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কি উপায়ে গুলাব সিং এবং তাহার দলকে বিদলিত করা যায়?

শঙ্কর বাড়ি ফিরিতেছিল।

ভাবিতেছিল, ক্ষতি কি? বিশেষ একটা যুক্তিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া অসুখী হইবার কি হেতু থাকিতে পারে? সুখে বাঁচিয়া থাকাটাই আসল জিনিস। আনন্দই কাম্য, যুক্তি নয়। যত বড় যুক্তিই হোক না, তাহা যদি পারিপার্শ্বিককে শেষ পর্যন্ত নিরানন্দময় করিয়া তোলে, তাহা হইলে সে যুক্তি মানিবার সার্থকতা কি? আনন্দের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়ানোই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, কি হইবে একটা বিশেষ মতবাদ লইয়া? সুরমাকে একটু খুশি করিতে গিয়া সে যদি আগেকার মতো পরিবর্তন করিয়া থাকে, কি এমন ক্ষতি তাহাতে? সুরমাকে খুশি করিয়া সে আনন্দ পাইতেছে, ইহাই তো মত পরিবর্তনের সপক্ষে সর্বপ্রধান যুক্তি। উৎপলের বিপক্ষেও সে যুক্তি খাড়া করিয়াছিল স্বীয় চিত্তকে আনন্দিত করিবার জন্যই। আনন্দহীন যুক্তির মূল্য কি? বিবেক? বিবেকও একটা সংস্কার, তাহাকেও বারংবার ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়া যায়। মরিয়া হইয়া শঙ্কর নিজেকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, মত পরিবর্তন করিয়া

সে অন্যায় কিছু করে নাই। পরস্ত্রীকে দেখিয়া এত মুগ্ধ হইবার কি অধিকার আছে তাহার—এই পুরাতন প্রশ্নটারও একটা উত্তর সে খাড়া করিয়াছিল। বারংবার নিজেকে বলিতেছিল, মুগ্ধ করে, তাই মুগ্ধ হই। সন্ধ্যা ঊষা জ্যোৎস্না দেখিয়া যেমন মুগ্ধ হই, সুরমাকে দেখিয়াও তেমনি মুগ্ধ হইয়াছি, তাহার মতে মত দিয়া আনন্দ পাইতেছি। মুগ্ধ হইতে ক্ষতি কি? আর তো কিছুই করিতেছি না।... অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে সে পথ হাঁটিতে লাগিল। বাড়িতে পৌঁছিয়া দেখিল, বাড়ির সামনে একটি পালকি রহিয়াছে। পালকি করিয়া কে আবার আসিল? বেয়ারারা বারান্দার একধারে বসিয়া ছিল, তাহারা উঠিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, বাবু গুলাব সিংয়ের জেনানা রুক্মিণীদেবী আসিয়াছেন, এবং তাঁহার অপেক্ষায় অন্দরে গিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। হঠাৎ? ভিতরে গিয়া দেখিল, রুক্মিণীদেবী অমিয়ার সহিত গল্প করিতেছেন। শঙ্করকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং নমস্কারান্তে অবগুণ্ঠনটি একটু টানিয়া দিয়া নতনেত্রে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রুক্মিণীদেবীর রূপ দেখিয়া শঙ্কর অবাক হইয়া গেল। স্বর্ণাভ গৌরবর্ণ, নিটোল নিখুঁত মুখশ্রী, আয়ত ভ্রমরকৃষ্ণ চোখ দুইটি, লম্বা ছিপছিপে গড়ন, পরিধানে কালোপাড় বাসন্তী রঙের শাড়ি। শঙ্করের মনে হইল, স্বয়ং বৈদেহী যেন তাহার ঘর আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

ম্যায় মাফি মাংনে আয়ি হুঁ।

মৃদুকণ্ঠে এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া তিনি অমিয়ার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আপহি সব কহিয়ে।

অমিয়া বলিল, ইনি গুলাব সিংয়ের স্ত্রী, লক্ষ্মীবাগের দাঙ্গার সম্পর্কে এসেছেন। স্বামীর হয়ে মাপ চাইতে এসেছেন উনি। বলছেন, এ ঘটনার জন্য উনি মর্মান্তিক দুঃখিত। মণিবাবুর চিকিৎসার যা খরচ লাগে তা উনি দেবেন, স্বামীকে লক্ষ্মীবাগ ছেড়ে আসতে বাধ্য করবেন। স্বামী যদি ওঁর কথা না শোনেন, তা হলে স্বামীর বিরুদ্ধে উনি নিজে গিয়ে কোর্টে এজাহার দেবেন বলছেন, তোমরা যদি মকদ্দমা কর। কিন্তু তার বোধ হয় দরকার হবে না, কারণ ওঁর বিশ্বাস—স্বামী ওঁর কথা রাখবেন। উনি অনুরোধ করতে এসেছেন, তোমরা আগে থাকতে ওঁর নামে কোনো কেস করো না। কারণ মকদ্দমা করা ওঁর স্বামীর একটা নেশা, একবার যদি শুরু হয়ে যায়, ওঁকে থামানো শক্ত হবে। কিন্তু ওঁর বিশ্বাস, স্বামী ওঁর কথা রাখবেন, মকদ্দমা করতে হবে না।

অমিয়া যেন কথাগুলি মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিল। এই পর্যন্ত বলিয়া রুক্মিণীদেবীর দিকে চাহিল। রুক্মিণীদেবী ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন যে, তাঁহার বক্তব্য যথাযথ উক্ত হইয়াছে। তাহার পর তিনি আঁচল হইতে একখানি হাজার টাকার নোট খুলিয়া অমিয়ার হাতে দিতে গেলেন।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, কি ও?

উনি মণিবাবুর ক্ষতিপূরণস্বরূপ হাজার টাকা দিতে চাইছেন।

শঙ্কর বলিল, আমরা তা নিই কি করে? মণিবাবুর সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, তিনি ভালো হয়ে আসুন, তাঁকেই পাঠিয়ে দেবেন। তিনি যদি নিতে চান নেবেন।

রুক্মিণীদেবী নোটটা ক্ষণকাল ধরিয়া থাকিয়া আনতমস্তকে শঙ্করের কথাগুলি প্রণিধান করিলেন এবং তাহার পর ধীরে ধীরে সেটি আবার আঁচলে বাঁধিয়া ফেলিলেন।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, আপনি যে এখানে এসেছেন, তা কি গুলাব সিং জানেন?

রুক্মিণী ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন যে, জানেন না। তাহার পর অমিয়ার কানে কানে কি বলিলেন। অমিয়া শঙ্করকে জানাইল, ওঁর স্বামী অন্য আর একটি মকদ্দমার তদ্বির করতে সদরে গেছেন, এখানে নেই তিনি।

ও।

রুক্মিণীদেবী আবার অমিয়ার কানে কানে কি বলিলেন।

অমিয়া বলিল, উনি জিজ্ঞেস করছেন, তা হলে উনি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারেন তো? তোমরা কিছু করবে না তো?

শঙ্করকে বলিতেই হইল যে, ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় মিটিয়া গেলে তাহারা আর কিছুই করিবে না।

বলিয়াই কিন্তু দুঃখিত হইল, সুরমার মুখটা মনে পড়িল।

রুক্মিণীদেবী নমস্কারান্তে চলিয়া গেলেন।

অমিয়া বলিল, দই ক্ষীর কলা সন্দেশ কত কি এনেছে দেখবে এস।

খুকি কোথা?

যমুনিয়া পারুলদের বাড়ি নিয়ে গেছে তাকে।

এত রাত্রে সেখানে কেন?

সমস্ত দিন ঘুমিয়েছে। চোখে ঘুম নেই। কেবল আমাকে বিরক্ত করছিল, তাই পাঠিয়ে দিয়েছি। বলে কি জান? মানাতে রঙ মাখিয়ে লজেনচুষ করে দাও। এত দুষ্টু হয়েছে।

অমিয়া হাসিল, শঙ্করও একটু হাসিল।

তোমার শরীরটা কি ভালো নেই? অমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

শঙ্কর শুষ্ক মুখ ও প্রাণহীন হাসি অমিয়ার দৃষ্টি এড়ায় নাই।

অমিয়ার প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর আর একটু হাসিল।

কি যে টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছ এ কদিন মণিবাবুর ব্যাপার নিয়ে! নাওয়া-খাওয়ার পর্যন্ত ঠিক নেই। এতক্ষণ কোথা ছিলে?

উৎপলের বাড়িতে। খিদে পেয়েছে, খাবার ঠিক কর।

খিদে পাবে না? সেই কোন্‌কালে দু'টি খেয়ে বেরিয়েছ। বেগুনগুলো ভেজে ফেলি, কুটে রেখে এসেছি।

অমিয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। শঙ্কর ইহাই চাহিতেছিল। সত্যই তাহার ক্ষুধা পায় নাই। তাহার মনে হইতেছিল, অমিয়ার মনোযোগ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলে সে যেন বাঁচে। নির্জনে বসিয়া সে নিজের সহিত বোঝাপড়া করিতে চায়। সিগারেট ধরাইয়া বাহিরের ঘরটাতে গিয়া সে বসিল। বসিয়াই মনে হইল, সে অন্যায় করিতেছে—ঘোরতর অন্যায় করিতেছে। সুরমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইবার স্বপক্ষে যে সব যুক্তি সে এতক্ষণ খাড়া করিয়াছিল, মনে হইল, তাহা অর্থহীন দুর্বল মনের মূঢ় লোলুপতা মাত্র। সুরমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হওয়া মানে বৃহত্তর সর্বনাশের দিকে অগ্রসর হওয়া। তাহা করা কি উচিত? তা ছাড়া মনের এই কাঙালপনা আত্মসম্মান হানিকর নয় কি? সুরমা না হয় খুবই সুন্দর, কিন্তু যেখানে যাহা

কিছু সুন্দর দেখিবে, অমনই তাহা লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিতে হইবে? সে দিন তো সে নিজেই এক বিলাত প্রত্যাগত শিক্ষিত ব্যক্তির বিলাত-ভ্রমণ কাহিনী পাঠ করিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। মনে হইতেছিল, লোকটা বিলাতে গিয়া একেবারে বিগলিত হইয়া গিয়াছে যেন! সেখানকার চাকরানী হইতে শুরু করিয়া রাজরানী পর্যন্ত সমস্তই তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। প্রতি পদে এদেশের সহিত ওদেশের তুলনা করিয়া গদগদ পঞ্চমুখে ওদেশের স্তুতি এবং এদেশের নিন্দা করিতে করিতে ভদ্রলোক বেসামাল হইয়া পড়িয়াছে যেন! একটা গ্রাম্য বর্বর যেন সর্বপ্রথম কলিকাতায় আসিয়া কৃতার্থ নয়নে হাইকোর্ট দর্শন করিতেছে! ভারতীয় বলিয়া তাহার মনে যেন কিছুমাত্র গর্ব নাই, বিলাতি ঐশ্বর্য দেখিয়া আত্মসম্মানশূন্য লোকটা লোভে ক্ষোভে যেন দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছে! তাহার নিজের আচরণও কি ঠিক অনুরূপ নয়? সুরমা সুন্দর, কিন্তু অমিয়াও কি কম সুন্দর? সিদ্ধান্তে উপনীত হইবামাত্র তাহার মনের গ্লানি যেন কাটিয়া গেল। সে বারংবার মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিল, অমিয়াও সুন্দর, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, সুন্দর বইকি।

কোথা তুমি?

এই যে, বাহিরের ঘরে।

অমিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল।

তুমি নিশ্চয় খুব রাগ করবে, আজ তোমার একখানা চিঠি এসেছিল, দিতে ভুলে গেছি।

কার চিঠি?

খামের চিঠি, খুলিনি। মেয়েলি হাতের লেখা।

মুচকি হাসিয়া অমিয়া ড্রয়ার হইতে চিঠিখানা বাহির করিয়া দিল।

বেগুনভাজা হয়ে গেছে, রুটি সেঁকছি, এস তুমি।

অমিয়া চলিয়া গেল। শঙ্কর চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিল।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনি আমাকে চেনেন না। আমরা পলাশপুরে থাকি, আমার স্বামীর নাম লোকনাথ ঘোষাল। অত্যন্ত বিপদে পড়ে আপনাকে এই চিঠি লিখছি। ইতিপূর্বে ওঁর মুখে আপনার যে পরিচয় পেয়েছিলাম, তাতে বিশ্বাস আছে যে, আপনি নিশ্চয় এ বিপদে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। পলাশপুর আপনার ওখান থেকে বেশি দূর নয়, দয়া করে যদি একবার আসেন স্বচক্ষে সবই দেখতে পাবেন। চিঠিতে আমার বিপদের কথা লেখা যাবে না। আসুন একবার। বেশি বিপদে না পড়লে আপনাকে এ অনুরোধ আমি করতাম না। ওঁকে না জানিয়ে গোপনে আপনাকে চিঠি লিখলাম। দেখবেন, উনি যেন না জানতে পারেন। আশা করি, যত শীঘ্র সম্ভব আপনি আসবেন।

ইতি—

বিনীতা শ্রীমতী হররমাদেবী

পত্রটি পড়িয়া শঙ্কর বিস্মিত হইল কিন্তু বাহিরে যাইবার একটা সঙ্গত কারণ পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল। পরদিন প্রভাতে উৎপলকে সমস্ত কথা একটি পত্রযোগে জানাইয়া সে পলাশপুরের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। উৎপলের সহিতও দেখা করিল না। কারণ তাহার

সহিত দেখা করিতে গেলেই সুরমার সহিতও দেখা হওয়ার সম্ভাবনা। এ লোভনীয় সম্ভাবনার সুযোগ লইতে তাহার সাহস হইল না।

।। সাঁইত্রিশ ।।

শঙ্করের পত্রখানি দ্বিতীয়বার পাঠ করিয়া উৎপলের মুখে মৃদু হাসি এবং ভ্রূযুগলে কুঞ্চন জাগিল। একটি সিগারেট ধরাইয়া পত্রখানি তৃতীয়বার সে পাঠ করিল—

ভাই উৎপল,

লোকনাথবাবুর স্ত্রী খুব বিপন্ন হয়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কাল ভোরেই তাই আমাকে পলাশপুর যেতে হচ্ছে। ফিরতে কত দেরি হবে তা বলতে পারি না, কারণ বিপদটা যে ঠিক কি জাতীয়, তা তিনি লেখেননি। তুমি ইতিমধ্যে লক্ষ্মীবাগের ব্যাপারটার একটা ব্যবস্থা করে ফেল। যা ভালো বোঝ, তাই কর। যদিও প্রথমে আমার মনে একটু খুঁতখুঁতানি ছিল (এবং সত্য কথা বলতে কি, এখনও আছে) কিন্তু ভেবে দেখলাম, তোমার এবং সুরমার মতটাই ঠিক। এ অপমান হজম করা উচিত নয়। গুলাব সিংহের নামে এখন কিছু করো না, কারণ কাল তোমার কাছ থেকে ফিরে এসে দেখি, তাঁর স্ত্রী রুক্মিণীদেবী আমার বাড়িতে বসে আছেন। তিনি তাঁর স্বামীর হয়ে মাপ চাইলেন এবং বলে গেলেন যে, মণির সমস্ত ক্ষতিপূরণ করবেন তাঁরা, আমরা যেন এই নিয়ে কোর্টে না যাই। আমি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। প্রমথ ডাক্তার, নিপুদা, গদাই, কেনারাম এবং আর সকলের সম্বন্ধে তোমার যা খুশি করো, আমি আপত্তি করব না।

ইতি—

শঙ্কর

কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া উৎপল কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। যদিও সে ইংরেজিনবিশ লোক, তবু দুইটি প্রচলিত সংস্কৃত প্রবচন পর পর তাহার মনে পড়িয়া গেল। প্রথমটি—'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম ভয়াবহ', দ্বিতীয়টি 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্'। সে কেনারাম চক্রবর্তীকে ডাকিতে পাঠাইল। লক্ষ্মীবাগের দাঙ্গার পর কেনারাম একটা আহ্বান প্রত্যাশাই করিতেছিলেন। খুব একটা ক্ষুব্ধ মুখভাব লইয়া তিনি উৎপলের নিকট গেলেন। নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্তা হইল।

বিনা ভূমিকায় উৎপল বলিল, শঙ্কর এখানে নেই। আপনাকে কয়েকটা কাজ করতে হবে।

কি কাজ?

লক্ষ্মীবাগের মণির সম্পত্তি লুঠ করা ব্যাপারে যারা লিপ্ত ছিল, তাদের একটু শিক্ষা দিতে চাই। কে কে ছিল, খবর পেয়েছি আমি।

কেনারামের মুখের উপর নির্নিমেষে ক্ষণকাল চাহিয়া সে দৃষ্টি সরাইয়া লইল। গুম্ফ প্রান্ত পাকাইতে পাকাইতে গম্ভীরভাবে বলিল, সকলের সম্বন্ধে ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে না। আপনি ফরিদ হারু হরিয়া রহিম কর্পূরা—এই কজনের নাম থানায় পাঠিয়ে দিন, লিখে দিন যে ওরা ডাকাতের দলে ছিল, তার প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। আপনার দ্বিতীয় কাজ, নিপুদা

এবং প্রমথ ডাক্তারকে নোটিশ দেওয়া। এক মাসের মাইনে অগ্রিম দিয়ে তাঁদের বলে দিন যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি তাঁরা আমার এলাকা ত্যাগ না করেন, অপমানিত হবেন। তৃতীয় কাজ, রাজীব দত্ত। তাঁর ছেলে গদাইকেও শঙ্কর ওদের মধ্যে দেখে এসেছে। আপনি রাজীব দত্তকে গিয়ে বলুন যে, অবিলম্বে তিনি খেসারৎস্বরূপ যদি এক হাজার টাকা দিতে রাজি না হন, আমরা তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করব।

কেনারাম মনে মনে উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছিলেন। কিন্তু মনোভাব প্রকাশ করা তাঁহার স্বভাব নয়। রাজীব-প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক কথা কয়টি বলিলেন, রাজীব এখানে নেই, কলকাতা গেছে।

গদাইকে গিয়ে বলুন তা হলে।

বেশ। কিন্তু গদাই যদি বলে যে, সে ওদের সঙ্গে ছিল না?

অবিচলিতকণ্ঠে উৎপল মিথ্যাভাষণ করিল, অস্বীকার করিবার উপায় নেই। শঙ্করের কাছে ছোট্ট একটা পকেট-ক্যামেরা ছিল, সমস্ত দলটার ফোটো সে তুলে এনেছে।

এই সংবাদে কেনারাম চক্রবর্তী মনে মনে একটু অশান্ত হইয়া উঠিলেন। জীবনও সেখানে ছিল যে!

উৎপল চকিতে একবার কেনারামের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর বলিল, জীবনও সেখানে ছিল। কিন্তু জীবনের কথা আমরা প্রকাশ করব না, আপনি নিজেই তাকে ধমক দিন।

নিশ্চয়—নিশ্চয় ধমক দেব। এ কথা তো আমার কানেই যায়নি।

উৎপল এ বিষয়ে আর বিশেষ কোনো উচ্চবাচ্য করিল না। কেবল বলিল, হ্যাঁ ও ছিল। ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, এটা মগের মুলুক নয়। আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে চিঠি লিখছি আজ।

নতুন ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন, তিনি বড় বদমেজাজী লোক শুনেছি। কারও সঙ্গে দেখা-টেখা করতে চান না বড়। সেদিন—

আমার সঙ্গে হয়তো দুর্ব্যবহার না-ও করতে পারে, একসঙ্গে বিলেতে পড়েছিলাম।

ও!

কেনারাম মতি স্থির করিয়া ফেলিলেন। এখন আপাতত উৎপলের বিরুদ্ধাচরণ করা চলিবে না। তাঁহার মুখভাব সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। অভিভাবকী ভঙ্গিতে বলিলেন, নিশ্চয়ই, এর একটা বিহিত করা দরকার বইকি। যা যা বললে, এখুনি আমি করছি সব। তুমি নিজে এসব ব্যাপারে মন দিয়েছ দেখে ভারী সুখী হলাম। এই তো চাই। শঙ্কর অবশ্য খুবই করে। তবু—ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, তবু তোমার নিজের সব দেখা চাই। কারণ জমিদারি তোমার।—এই কথা বলিবার পরই প্রসঙ্গত আর একটা কথাও যেন তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। বলিলেন, পাঁচ বছর পরে একটা যে হিসেবনিকেশের কথা ছিল, তারও সময় হয়ে এল প্রায়। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের হিসেবটা আমি আপ-টু-ডেট করে রেখেছি। অন্য অন্য ব্যাপারগুলোও শঙ্করকে ঠিক করে রাখতে বলব, রেখেছে আশা করি, বেশ কেপেবল ছোকরা ও, তবু তুমি নিজে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিও সব। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, নিজের সম্পত্তি নিজে না দেখলে থাকে না, মা-লক্ষ্মীর আইনই ওই

রকম। রাজবল্লভবাবু নিজে কিছু দেখতেন না বলেই তো সব গেল। কেনারাম আবার একটু হাসিলেন। উৎপল গম্ভীরভাবে আনত নয়নে ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া গোঁফ পাকাইতে লাগিল, কোনো উত্তর দিল না। তাহার মনোভাব যে কি, তাহা টের না পাইলেও কেনারাম প্রসঙ্গত আর একটি কথা বলিতেও ছাড়িলেন না।

সেদিন হৃদয়বল্লভও এসেছিল। সে জমিদারিটা আবার ফিরে কিনে নিতে চায়। ভালো দামও দিতে চাইছিল। আমি অবশ্য তাকে বলে দিয়েছি যে, জমিদারি বেচবার কোনো কথাই ওঠেনি এখনও।

উৎপল ইহারও কোনো উত্তর দিল না।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কেনারাম অবশেষে বলিলেন, এখন উঠি তাহলে। প্রমথ ডাক্তার আর নিপুকে কি আজই নোটিশ দেবে?

আজই।

বেশ। তা হলে ড্রাফট করে টাইপ করে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সই করে দিও।

দিন।

কেনারামবাবু চলিয়া গেলেন।

তিনি চলিয়া যাইবামাত্র উৎপলের মুখভাব পরিবর্তিত হইল। প্রচ্ছন্ন হাস্যে মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, চক্ষু দুইটি কৌতুকে নাচিতে লাগিল।

।। আটত্রিশ ।।

শঙ্করের সম্বন্ধে ফুলশরিয়ার অনেক দিন হইতেই একটা খটকা ছিল। হরিয়ার মুখে খবর শুনিয়া তাহা আরও বাড়িয়া গেল। কি রকম ধরনের লোকটা যেন। মণিবাবুর 'কামতে' যাহারা ডাকাতি করিতে গিয়াছিল, তাহাদের সকলের নামে নাকি থানায় নালিশ হইয়া গিয়াছে। শঙ্করবাবুই নিশ্চয় ইহার মূলে আছেন, কারণ সব জিনিসের মূলে তিনিই থাকেন। এতদিন ধারণা ছিল, লোকটা সত্যই বোধ হয় দেবতা। কেন যে এমন অসম্ভব একটা ধারণা তাহার হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া নিজেরই ওপর রাগ হইতে লাগিল। তাহার পতিতা জীবনে অনেক লোকের সংস্রবে তাহাকে আসিতে হইয়াছে, কিন্তু 'দেওতা' তো একজনও চোখে পড়ে নাই, শঙ্করবাবুকেই বা শুধু শুধু দেবতা ভাবিতে গেল কেন সে? লোকটাকে দেখিয়া 'তাজ্জব' লাগে কিন্তু। হাবভাব ইঙ্গিতে কোনো প্রকার দুর্বলতা প্রকাশ করে না, মাথা উঁচু করিয়া কেবল পরোপকার করিয়া বেড়ায়। এ যে আশ্চর্য ব্যাপার। নট্টুবাবু ডাক্টারও কম পরোপকারী নন, কিন্তু 'সরাব' পান করিয়া রাত-দুপুরে তাহার দরজা ঠেলাঠেলি করিতে তিনি কোনোদিন ইতস্তত করেন না। এ লোকটা কিন্তু সে সবের ধার দিয়াও যায় না। পাথরের নয়, রক্তমাংসের শরীর নিশ্চয়, কিন্তু কোনোরূপ বেচাল নাই। এমন নিখুঁত রকম 'বরহম্‌চারী' তো দেখা যায় না বড়। কিন্তু না, ফুলশরিয়া ওসব বিশ্বাস করে না। শঙ্করবাবু একদিন তাহার উপকার করিয়াছেন সন্দেহ নাই, তাহাতে হইয়াছে কি? বাবু ভেইয়াদের পায়ে পড়িলে অনেকেই অমন উপকার করিয়া থাকে। গরিব-দুঃখীদের কাকুতি-মিনতিতে গলিয়া পড়া অনেকের ঢঙ,

অনেকের শখ; 'চুহা মুহা' নিপুবাবুও সকলের উপকার করিবার জন্য লালায়িত, উপকার করিয়াছেন বলিয়াই শঙ্করবাবুকে 'মহাৎমাজি' মনে করিবার কোনো কারণ নাই। তাহা করিলে মানুষের সম্বন্ধে তাহার এতদিনকার ধারণাই যে বদলাইয়া ফেলিতে হয়। না, সে বিশ্বাস করে না। নিশ্চয় আর সকলের মত এ লোকটারও গলদ আছে। কিন্তু কোথায় সে গলদ? সেদিন লক্ষ্মীবাগে গুলাব সিংজির দরবারে হঠাৎ গিয়া হাজির। তাহার দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইলেন না পর্যন্ত! অথচ গুলাব সিংহের মত লোক তাহার পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছে। আর একদিন কোথাও কিছু নাই, রাত-দুপুরে যমুনিয়ার বাড়ি গিয়া উপস্থিত। চিৎকার চেঁচামেচি শুনিয়া সে ভাবিল, এইবার হুজুর বোধ হয় ধরা পড়িলেন। কিন্তু কোথায় কি! পরে শোনা গেল, মুশাইকে শাসন করিবার জন্য আসিয়াছেন, ওই 'ডোকহর'-মার্কা যমুনিয়াকে গায়ের দামি শালটি বকশিশ করিয়া গেলেন। দরদ দেখাইবার আর লোক পাইলেন না! গরিবদের প্রতি দরদ যে কত, তাহার নমুনা তো এইবার বাহির হইয়া পড়িয়াছে; নিজেদের লেজে যেই পা পড়িয়াছে, অমনিই ফোঁস করিয়া উঠিয়াছেন। মণিবাবুর 'কামৎ' যেই লুঠ হইয়াছে, অমনই যত গরিব-দুখীয়াদের নামে থানায় নালিশ হইয়া গেল। আসল ডাকাত গুলাব সিংহের নামে নাকি নালিশ হয় নাই। যত দোষ ইহাদের। অথচ ইহাদের জন্য শঙ্করবাবুর দয়া একদিন উথলাইয়া উঠিয়াছিল। সকলের 'মাইবাপ' সাজিয়া বসিয়াছিলেন। নিজে জামিন হইয়া থানা হইতে ছাড়াইয়া পর্যন্ত আনিয়াছিলেন। কেন যে আনিয়াছিলেন, কে জানে। কিছু নয়, ও-সমস্ত লোক-দেখানো ঢঙ।...

ঘুঁটের উনুনে হাওয়া করিতে করিতে ফুলশরিয়া মনে মনে গজরাইতেছিল। সেদিন লক্ষ্মীবাগে শঙ্কর যে তাহার দিকে একবার মাত্র চাহিয়া দেখিয়া দ্বিতীয় বার আর দেখে নাই, ইহাতে সে বড়ই মর্মাহত হইয়াছিল। শঙ্কর যদি তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া বকিয়া দিত, যদি বলিত—ফুলশরিয়া, তুই এখানে? তোকে এখানে দেখব আশা করিনি তো, তাহা হইলে কৃতার্থ হইয়া যাইত সে। বুঝাইয়া বলিতে পারিত যে, তাহারা অসহায় জনমজুর মাত্র, ধনীদের ডাকে সাড়া না দিলে তাহাদের দিন চলা ভার। ভালো কাজ মন্দ কাজের বিচার করিয়া চলিবার উপায় আছে কি তাহাদের? যাহাতে বেশি মজুরি, তাহাই তাহাদের কাছে ভালো কাজ; যাহাতে কম মজুরি, তাহা মন্দ। তাহারা অন্নহীন বস্ত্রহীন সহায়সম্পদহীন দীন দরিদ্র যে। গুলাব সিংহের অত মজুরির লোভ তাহারা কি সামলাইতে পারে? এত কথা ঠিক এমনভাবে মনে জাগে নাই, কিন্তু এমনই ধরনের কিছু একটা সে শঙ্করকে বুঝাইয়া বলিতে পারিত। কিন্তু শঙ্করবাবু তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না পর্যন্ত। সে যেন মানুষ নয়, ডাকিয়া কথা বলিবার উপযুক্ত নয়, পোকামাকড় যেন। মাঝে মাঝে দয়া করিয়া কৌতূহলভরে নিরীক্ষণ করেন, কখনও আবার পায়ে দলিয়া চলিয়া যান। ইস্ ভারি বড়লোক আমার! অমন বড়লোক সে ঢের দেখিয়াছে। সজোরে আবার সে উনুনে হাওয়া করিতে লাগিল। হরিয়াটা আবার আসিয়া জুটিয়াছে। এত রাত্রে তাহার জন্য আবার রাঁধিতে হইবে। ঘরে চাল নাই, কিন্তু হরিয়া সে কথা শুনিবে না, ভাত সে খাইবেই। পয়সা লইয়া দোকানে চাল কিনিতে গিয়াছে। বলিল, উপর্যুপরি কয়েকদিন ভাত খাইতে পায় নাই, চিড়া মুড়ি কিংবা ছাতু খাইয়া কাটাইয়াছে। কে তাহাকে রাঁধিয়া দিবে। বউ তাহাকে ঘরে ঢুকিতে দেয় না, সে নাকি একটা 'চুমানা' করিয়াছে। থানার দারোগা ব্যাগার

ধরিয়া তাহাকে দিয়া কয়েক দিন 'বরতন' মলাইয়াছিলেন, বেতন চাওয়াতে দূর করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার নামে বি এল কেস করিবেন বলিয়া শাসাইয়াছেন। হরিয়ার মুখেই ফুলশরিয়া শুনিল যে, লক্ষ্মীবাগ লুঠ উপলক্ষে সকলের নামে নালিশ হইয়া গিয়াছে। তাহাকে এইবার কিছুদিন গা-ঢাকা দিতে হইবে। নালিশটা যে উৎপল করিয়াছে, শঙ্করের ইহাতে যে কোনো হাত নাই, তাহা হরিয়া জানিত না।

হরিয়া চাল লইয়া প্রবেশ করিল এবং খবর দিল, শঙ্করবাবু পলাশপুরে চলিয়া গিয়াছেন। নটবরবাবু তাহার জন্য শঙ্করবাবুর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল, দেখা হইল না। তিনি ফিরিয়া গেলেন। 'বদ্‌নসিব' বলিয়া হতাশ হইয়া কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

বদ্‌নসিব তো হাম্ কি করবো? য়ঁহা কি ছে?

হরিয়া কিছু বলিল না, ফুলশরিয়া প্রজ্বলিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

দে, চাউল দে।

চাল লইয়া সে ধুইতে বসিল। সহসা নটবর ডাক্তারের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় তাহার সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

।। ঊনচল্লিশ ।।

পলাশপুর অভিমুখে যাইতে যাইতে শঙ্কর নিজের মনের আধুনিকতম সমস্যার কথাটাই ভাবিতেছিল। তাহা পল্লীসংস্কার নয়, গুলাব সিং নয়, সুরমা। সুরমাকে সে কিছুতেই মন হইতে দূর করিতে পারিতেছিল না। এজন্য সে লজ্জিত হইতেছিল, নিজেকে ধিক্কার দিতেছিল; কিন্তু কিছুতেই মনকে সুরমামুক্ত করিতে পারিতেছিল না। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, এই অশুদ্ধ অশান্ত চিত্ত লইয়া দেশের কাজ করিবার সত্যই কি কোনো অধিকার আছে তাহার? কোনোও কালে কি ছিল? বাষ্পে স্ফীত রবারের বেলুনের মত এক-একটা ভাবে মাতিয়া কিছুকাল সে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছে মাত্র। এত দুর্বল কেন সে? নারীর সান্নিধ্যে কিছুতেই নিজেকে ঠিক রাখিতে পারে না, সমস্ত আদর্শ সমস্ত শিক্ষা নিমেষে ভূমিসাৎ হইয়া যায়। কেন এমন হয়? সে তো প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া রাখে, তবু কেন তাহার অন্তরবীণার সমস্ত তার আচম্বিতে অকস্মাৎ এমনভাবে ঝঙ্কৃত হইয়া ওঠে? জীবনে এমন বহুবার হইয়াছে। কেন এমন হয়? অমিয়াকে ঘিরিয়া তাহার এ আকুলতা জাগে না তো! চুনচুন, সুরমা, বেলা, নীরা তাহার মনে যে ঢেউ তোলে, অমিয়া তাহা পারে না কেন? মনকে সহস্র প্রশ্ন করিয়াও কোনো উত্তর মেলে না, মন কেবল স্বপ্ন দেখিতে থাকে। সে ভাবিয়াছিল, তাহার মনের এই স্বপ্নবোধ বুঝি মিটিয়া গিয়াছে। পল্লীসংস্কারের প্রেরণায় আদর্শবাদের কঠোরতায় তাহার চঞ্চল যৌবনচিত্ত বুঝি শান্ত কর্তব্যনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু না, আজ সে সবিস্ময়ে দেখিতেছে, মনের এই প্রিয়-প্রবণতা প্রচ্ছন্ন ছিল মাত্র, বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ তাহা এতদিন পরে এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করিল কেন? এই সুরমাকে তো সে এতদিন ধরিয়া দেখিতেছে, এতদিন তো কিছু হয় নাই! এতদিন পরে সুরমাকে ঘিরিয়াই আবার স্বপ্ন জাগে কেন? সহসা সে অনুভব করিল, তাহার মন যেন ত্রিধা-বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এক অংশ

অপরাধী, এক অংশ বিচারক এবং আর অংশ দ্রষ্টা। এই দ্রষ্টা অংশ উভয় পক্ষেরই কথা শুনিতেছে, উভয় পক্ষের প্রতিই সে সহানুভূতিসম্পন্ন। মনের এই অংশই যেন নিগূঢ়ভাবে শঙ্করের প্রশ্নের উত্তর দিল। বলিল, তোমার কবি-চিত্ত যে প্রিয়া কামনা করে, অমিয়ার মধ্যে সে প্রিয়া নাই। অমিয়া তোমার প্রিয়া নয়, প্রয়োজন। প্রিয়াকেই তুমি মনে মনে খুঁজিয়া বেড়াইতেছ এবং যে নারীর মধ্যে তাহার আভাস পাইতেছ তাহাকে ঘিরিয়াই তোমার মন স্বপ্ন-রচনা করিতেছে। স্বপ্ন-রচনা করাই তোমার স্বভাব। এতদিন পল্লীসংস্কারের স্বপ্নে মগ্ন ছিলে, বাস্তবের রূঢ় আঘাতে সে স্বপ্ন ক্রমশ ভাঙিতেছে, প্রাক্তন স্বপ্ন তাই ফিরিয়া আসিতেছে আবার। তাই কি?

লোকনাথ ঘোষালের জীর্ণ বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া শঙ্কর অবাক হইয়া গেল। যে লোকটি তাহাকে লোকনাথের বাড়ি দেখাইয়া দিয়াছিল, সে বেশিক্ষণ দাঁড়াইতে চাহিল না। আকারে ইঙ্গিতে সে এমন ভাব প্রকাশ করিল যেন, একটা বাঘের গুহা অথবা সাপের বিবর দূর হইতে অঙ্গুলিনির্দেশে দেখাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িতে পারিলে সে বাঁচে। শঙ্করের প্রতিও লোকটা এমনভাবে দুই-একবার চাহিল, যাহার ভাবটা—আচ্ছা অসমসাহসিক ভদ্রলোক তো, ওখানে কি দরকার? তাহারই মুখে শঙ্কর শুনিল যে, লোকনাথবাবু স্কুলে আর চাকরি করেন না, স্কুল হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। লোকটা দাঁড়াইল না। চলিয়া গেল। শঙ্কর একা দাঁড়াইয়া রহিল।

সূর্য অস্ত গিয়াছে। সন্ধ্যা আসন্ন। লোকনাথ ঘোষালের জীর্ণ বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া শঙ্কর ইতস্তত করিতে লাগিল। লোকনাথবাবুর সহিত বহুদিন তাহার কোনো যোগ নাই। কলিকাতা ত্যাগের পর হইতে দেখা তো হয়ই নাই, বছর দুই হইতে পত্রালাপও বন্ধ আছে। 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকাতেও সে আর লেখে না। লোকনাথবাবুর উপর্যুপরি কয়েকবার তাহার লেখা প্রত্যাখ্যান করায় আর লেখাও পাঠায় নাই। বস্তুত লোকনাথবাবুর সহিত কার্যত কোনা যোগ তাহার আর নাই। তবু সে হঠাৎ—মাত্র একখানি পত্র পাইয়াই—আসিয়া পড়িয়াছে। নিজের এই আচরণে নিজেই সে বিস্মিত বোধ করিতে লাগিল। আসিয়াছে বলিয়া বিস্ময় নয়। এতদিনের অদর্শন এবং এত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও লোকনাথবাবুর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা এখনও অটুট আছে, ইহা আবিষ্কার করিয়াই সে বিস্মিত হইল। লোকনাথবাবুর প্রতি এ অহেতুক শ্রদ্ধা কেন? কি আছে লোকটার মধ্যে?

বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে।

ভাঙা পুরুষকণ্ঠে কে যেন ধমকাইয়া উঠিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দড়াম করিয়া একটা গুরুভার পতনের শব্দ এবং নারীকণ্ঠের আর্ত করুণ একটা চিৎকার। শঙ্কর আর আত্মবিশ্লেষণ করিবার অবসর পাইল না, ভদ্রতার রীতি লঙ্ঘন করিয়া সামনের দরজা ঠেলিয়া সোজা ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। ঢুকিয়াই যাহা তাহার চোখে পড়িল, তাহা অপ্রত্যাশিত। জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার একটি রমণী মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছেন। শঙ্করকে দেখিয়াই তিনি উঠিয়া বসিলেন। শঙ্কর দেখিল, তাঁহার নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে। লোকনাথবাবু একটা তক্তপোশের উপর বসিয়া রহিয়াছেন, চতুর্দিকে বই খাতা ছড়ানো। তাঁহার রক্তচক্ষু কপালে উঠিয়াছে, দৃষ্টি দিয়া আগুনের হলকা বাহির হইতেছে, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, ঠোঁট কাঁপিতেছে,

বাহু ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত, সমস্ত দেহটাই যেন আক্ষিপ্ত। সর্ব-অবয়বে যেন ক্রোধ এবং ঘৃণা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ, গলার চারিদিকে ঘা। পূর্বে গণ্ডমালা ছিল, এখন সেগুলি ঘায়ে পরিণত হইয়াছে। তৈলাভাবে মাথায় চুল রুক্ষ অবিন্যস্ত। কপালে ঠোঁটের আশেপাশে কালো দাগ। শঙ্করের সহসা মনে হইল, লোকটা দগ্ধ হইতেছে।

কে—কে আপনি?

লোকনাথবাবু শঙ্করকে চিনিতেই পারিলেন না।

আমি শঙ্কর।

শঙ্করবাবু! ও। আসুন আসুন, আপনি এখানে এখন হঠাৎ?

বাঁচান আমাকে, বাঁচান।—ভব্যতা লজ্জা সমস্ত ভুলিয়া হররমা শঙ্করের পা জড়াইয়া ধরিলেন।

ভেতরে যাও, ভেতরে যাও শিগ্‌গির, ভেতরে যাও বলছি।

লোকনাথবাবু এমন চিৎকার করিয়া উঠিলেন যে, শঙ্করের ভয় হইল, হয়তো আবার কি করিয়া বসিবেন! তাড়াতাড়ি নিজের পা ছাড়াইয়া লইয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল।

ভেতরে যা—ও।

হররমা আর বসিয়া থাকিতে সাহস করিলেন না। মাথার ঘোমটা একটু টানিয়া দিয়া নাকের রক্ত মুছিতে মুছিতে উঠিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। চলিয়া যাইবামাত্র লোকনাথবাবুর মুখভাব পরিবর্তিত হইল। এতক্ষণ যেন কিছুই হয় নাই, প্রফুল্লমুখে বলিলেন, তারপর হঠাৎ কি মনে করে?

বহুদিন পরে প্রিয়দর্শন করিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটি যেন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

আসল সত্য গোপন করিয়া শঙ্কর বলিল, এদিকে এসেছিলাম, ভাবলাম, আপনার সঙ্গে একটু দেখা করে যাই।

বেশ করেছেন। আসুন, বসুন। ভালোই হল এসেছেন, আপনাকে শোনানো যাক তা হলে। সময় আছে তো আপনার?

আছে।

বসুন তা হলে। একটা প্রবন্ধ লিখেছি, শুনবেন?

বেশ তো।

নিকটেই একটা হাতল-ভাঙা চেয়ার ছিল, শঙ্কর তাহাতে উপবেশন করিল। লোকনাথবাবু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রবন্ধ পাঠ শুরু করিয়া দিলেন। পড়িতে পড়িতে আবেগভরে তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল। প্রবন্ধের নাম—'বাঙালিত্ব'। শঙ্কর চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সহসা আবিষ্কার করিল যে, সে প্রবন্ধ শুনিতেছে না, এই অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটিকে অদৃশ্য একটা নিক্তিতে চড়াইয়া মনে মনে ওজন করিতেছে এবং তাহা লইয়া নিজের সহিত নানা বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। একটা জিনিস যাহা ইতিপূর্বে ইঁহার সম্বন্ধে কখনও মনে হয় নাই, তাহাই সহসা যেন অতি স্পষ্ট এবং কষ্টদায়ক রূপে মনে প্রতিভাত হইল এবং চিত্তকে পীড়িত করিতে লাগিল। অজানিত হররমা-সম্পর্কিত ব্যাপার বাদ দিয়াও, শুধু তাঁহার সাহিত্যিক প্রকৃতি হইতে বিচার করিলেই অনিবার্যভাবে মনে হয়, অতিশয়

সঙ্কীর্ণমনা লোকটি, এতটুকু উদারতা নাই। জগতের সহিত দূরের কথা, সমগ্র ভারতের সহিতই তাঁহার অন্তরের আত্মীয়তা নাই। নিরতিশয় স্বল্পপরিসর গণ্ডির মধ্যে নিজের 'বাঙালিত্ব' লইয়া তিনি আস্ফালন করিতেছেন। সমস্ত বঙ্গদেশ লইয়াও তাঁহার গর্ব নয়। তাঁহার ধারণা, পদ্মার ওপারে যাহারা থাকে, তাহারা সকলেই অসভ্য বর্বর, তাঁহার মতে বাঁকুড়া-মানভূমও প্রকৃষ্টরূপে মার্জিত নয়, তাঁহার যত গর্ব ভাগীরথী-তীরের-সন্নিহিত রাঢ় প্রদেশ লইয়া। শুধু তাহাই নয়, সাহিত্যের একটা বিশেষ নীতি, সীমাবদ্ধ মতবাদ, বিশিষ্ট ভঙ্গি ছাড়া আর কিছুই তাঁহার চিত্তকে উদ্বেলিত করে না। সেই সীমার মধ্যে তাঁহার স্বকীয় সাহিত্য-চর্চা অবশ্য শক্তির পরিচায়ক, কিন্তু তাহা চর্চা মাত্র, সৃষ্টি নয়,—সঙ্কীর্ণ মন লইয়া বৃহৎ কিছু সৃষ্টি করা যায় না। বিদ্যাবত্তা এবং মনীষার সমন্বয়ে তাঁহার রচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ সন্দেহ নাই, বিদগ্ধ চিত্তকে তাহা পরিতৃপ্ত করে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই পরিমিত বদ্ধ গণ্ডির মধ্যে প্রাণ যেন হাঁপাইয়া ওঠে। মনে হয়, দমবন্ধ হইয়া আসিতেছে, মুক্তি পাইলে বাঁচি। তাঁহার শুচিবায়ুগ্রস্ত সাবধানী মন নিজ বক্তব্যকে নিখুঁতরকমে সুস্পষ্ট করিবার প্রয়াসে শব্দবিন্যাসের এত নিপুণতা, এত পাণ্ডিত্য এবং সঙ্গে সঙ্গে এত দম্ভ, এত বক্রোক্তি প্রকাশ করিয়াছে যে, সমস্ত ব্যাপারটা কাব্য না হইয়া একটা জটিল গ্রন্থিসঙ্কুল সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। তাহাতে স্বচ্ছতা নাই, স্নিগ্ধতা নাই, মনে হয়, বকবকানি ছাড়া যেন আর কিছুই নাই। সমস্ত চিত্ত বিরূপ হইয়া ওঠে। কেহ তাই তাঁহার লেখা পড়ে না। শ্রোতা পাইলে তাই তিনি দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন। এই যে এতকাল পরে আসিলাম, আমাকে একটা কুশল প্রশ্ন পর্যন্ত করিলেন না, আহারাদি হইয়াছে কি না খোঁজ লইলেন না, নিজের কৃতিত্ব জাহির করিবার জন্য একেবারে হুড়মুড় করিয়া প্রবন্ধ পড়িতে শুরু করিয়া দিলেন। লোকটার সঙ্কীর্ণতা, আত্মম্ভরিতা এবং কাঙালপনা শঙ্করকে পীড়িত করিতে লাগিল। আবার তখনি মনে হইল, একটা বিশেষ পন্থায় বিশেষ দেবতার সাধনা মানেই সঙ্কীর্ণতা নয়। একসঙ্গে তেত্রিশ কোটির পূজা করা কি সম্ভব? একনিষ্ঠ পূজা মানেই কি নিজের বিশেষ দেবতাটি ছাড়া বাকি সকলের প্রতি ঔদাসীন্য নয়? এবং সেই ঔদাসীন্যের সহিত গৌণভাবেও কি ঈষৎ বিতৃষ্ণা মিশ্রিত থাকে না? থাকাটাই তো স্বাভাবিক। বিশেষ একটি দেবতা বাছিয়া বরণ করার অর্থই তো অন্য দেবতার খুঁত সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। যাঁহারা সমদৃষ্টি অথবা উদারদৃষ্টির বড়াই করেন, হয় তাঁহারা কোনো দেবতারই উপাসক নন, না হয় তাঁহারা ভণ্ড। দেবতা সম্বন্ধে যাহা সত্য, সাহিত্যবুদ্ধি সম্বন্ধে বা রাজনীতি সম্বন্ধেই বা তাহা সত্য নহে কেন?

লোকনাথবাবু পড়িয়া চলিয়াছেন, 'জীবনে কাহারও কৃপা, করুণা অথবা ক্রোধের তোয়াক্কা না রাখিয়া এ দেশের বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর আশীর্বাদ অভিশাপ উপেক্ষা করিয়া আমি যে ধরনের সাহিত্যচর্চা করিয়াছি, তাহাও এক হিসাবে আমার বাঙালিত্বেরই পরিচয় বহন করিতেছে। বাঙালিজাতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। পরানুকৃতি তাহার একটা মজ্জাগত স্বভাব বটে, কিন্তু সকলে যখন অনুকরণের সুরায় বুঁদ হইয়া রহিয়াছে, তখন নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেও উল্টা কথা বলিবার শক্তি এই বাঙালিরই আছে। নেশা করিয়াও সে নেশার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাইতে পারে; তাই আজ যখন সকলের চিত্ত বিশ্বমুখী, কেহ যখন চীনের দুঃখে কাতর, কেহ যখন কমিউনিস্ট, কেহ যখন ইউরোপীয় ডেমোক্রেসির অধঃপতনে বিগতনিদ্র, তখন আমিই কেবল

তারস্বরে বলিতেছি—আগে ঘর সামলাও; বিশ্বকে জানিবার পূর্বে নিজেকে জান। নিজের বৈশিষ্ট্য বৈভবকে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের পবিত্র যজ্ঞাগ্নির মত রক্ষা করিতে শেখো, নিজের বৈশিষ্ট্য যদি পৃথিবীতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পার, তবেই তোমার মনুষ্য-জন্ম সার্থক। পরের কথায় সায় দিয়া পরের সুরে সুর মিলাইয়া পরের হুজুগে মাতিয়া নাচিলে ইতঃভ্রষ্ট তাতো নষ্ট হইবে মাত্র। ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মানি—সকলেই আগে নিজের ঘর সামলাইয়াছে, বস্তুত উহাই তাহাদের মুখ্য লক্ষ্য। নিজের ঘর সামলাইয়া তাহারা পর তাহার বিশ্বের দিকে নজর দিয়াছে। তাহাদের এই বিশ্বনজরের প্রকৃত তাৎপর্যও আজ সুধী সমাজে অবিদিত নাই। সুতরাং—'

লোকনাথবাবু আবেগভরে পড়িয়া চলিয়াছেন, শঙ্কর হঠাৎ বাধা দিল। বস্তুত তাহার মনে হইল, এই আহত রমণীটির সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ না করিলে তাহার আচরণ শুধু যে ভণ্ডামির নামান্তর হইতেছে তাহাই নয়, অস্বাভাবিকও হইতেছে। ভূপতিত রক্তাক্ত একটি নারীকে স্বচক্ষে এমন অবস্থায় দেখিবার পর সে সম্বন্ধে নীরব থাকা খুবই অশোভন। উনিই যে হররমা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই; কিন্তু উনিই যদি হররমা হন, তাহা হইলে লোকনাথবাবুর এ কি রকম আচরণ!

মরিয়া হইয়া সে বলিয়া ফেলিল, একটা কথা—

কি বলুন?

আমি এসে যাঁকে দেখলাম, উনি—

শঙ্কর ইতস্তত করিতে লাগিল।

উনি আমার স্ত্রী।

লোকনাথবাবু শঙ্করের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, উনি আমার সাহিত্যিক জীবনের বাধা, অভিশাপ।

শঙ্কর সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার পর হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, বুঝতে পারছি না ঠিক।

পারতেন, যদি আপনিও একনিষ্ঠ সাহিত্যিক হতেন।

কেন, উনি করেছেন কি?

আমাকে সাহিত্য-পথভ্রষ্ট করবার জন্যে না করেছেন হেন কাজ নেই। আমার লণ্ঠনের পলতে ফেলে দিয়েছেন, দোয়াতের কালিতে জল মিশিয়েছেন, আমার খাতা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলেছেন। ওঁর ইচ্ছে, ভারতীর নয়, ওঁরই আরতি আমি সারাজীবন ধরে করি।

লোকনাথবাবুর মুখভাব কঠোর হইয়া উঠিল। আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ওই বাঁজা মাগীটা জীবন দুর্বহ করে তুলেছে আমার!

তিনি আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ দ্বার ঠেলিয়া হররমা পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

আমি তোমার জীবন দুর্বহ করে তুলেছি? শুনুন তা হলে আপনি—

যাও, ভেতরে যাও।

আমার বিছে ফেরত দাও, এখুনি চলে যাচ্ছি।

দেব না। চলে যাও বলছি।

লোকনাথবাবুর চোখ দুইটা ধক ধক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। দৃঢ়মুষ্টিতে তিনি একখানা বই চাপিয়া ধরিলেন। শঙ্করের ভয় হইল, হয়তো ছুঁড়িয়া মারিবেন। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল এবং হররমাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল।

আমার যা কিছু গয়না কাপড় ছিল, সব বেচে ওই 'ক্ষত্রিয়' ছাপা হচ্ছে। খাট বিছানা আলমারি দেরাজ সব ওইতে গেছে। ওই বিছেটুকু লুকিয়ে রেখেছিলাম, তাও জোর করে কেড়ে নিয়েছে আজ। ওটুকু উদ্ধার করে দিন আমাকে, আপনার পায়ে পড়ছি আমি।

বেরিয়ে যাও এখানে থেকে, বেরিয়ে যাও বলছি—

চুপ করুন আপনি।

ধৈর্যচ্যুত শঙ্কর হঠাৎ গর্জন করিয়া উঠিল। গর্জন শুনিয়া লোকনাথবাবুও চমকাইয়া উঠিলেন। শঙ্করের এই রুদ্র রূপ তিনি কখনও দেখেন নাই। তাঁহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না, সহসা তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন।

।। চল্লিশ ।।

শঙ্কর পলাশপুর হইতে ফিরিতেছিল।

হররমার বিছা উদ্ধার করিয়া সে প্রত্যর্পণ করিয়াছে বটে, কিন্তু একটা বড় দায়িত্ব তাহাকে লইতে হইয়াছে। লোকনাথবাবুকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছে, যে, 'ক্ষত্রিয়' ছাপাইবার সমস্ত ব্যয়ভার সে বহন করিবে। 'ক্ষত্রিয়ে'র প্রবন্ধাদি প্রস্তুত হইয়া গেলে লোকনাথবাবু তাহা শঙ্করের নিকট পাঠাইয়া দিবেন এবং শঙ্কর নিজে কলিকাতায় গিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে তাহা ছাপাইয়া যথাস্থানে সেগুলি বিতরণ করিবে। আজকাল মূল্য দিয়া কেহ 'ক্ষত্রিয়' কেনে না। লোকনাথবাবুর বিচারে যাঁহারা সাহিত্যবুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহারা বিনামূল্যে 'ক্ষত্রিয়' উপহার পাইয়া থাকেন। ইহা করিতে গিয়াই লোকনাথবাবু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই নিরস্ত হন নাই। কিছুতেই তিনি নিরস্ত হইবেন না, শঙ্কর তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াছে। যতক্ষণ আমার দেহে একবিন্দু শক্তি এবং আমার ঘরে একখণ্ড কপর্দক অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ আমি থামব না। আমার স্ত্রী আমারই অর্থে তাঁর বোনপো-বউকে শাড়ি পাঠাবেন, আর অর্থাভাবে আমার কাগজ উঠে যাবে—এ কখনও হতে পারে না। এ চিন্তাও আমার পক্ষে অসহ্য।...লোকনাথবাবুর কথাগুলি শঙ্করের মনে পড়িল। লাঞ্ছিতা হররমার কাতর অশ্রুসিক্ত মুখখানিও মনে পড়িল। কাহারও দাবি সে অগ্রাহ্য করিতে পারে না।

আজকাল 'ক্ষত্রিয়' ছাপাইতে কত খরচ পড়িতে পারে, মনে মনে তাহাই সে হিসাব করিতেছিল। শুধু তাহাই নয়, যে 'ক্ষত্রিয়'কে একদিন সে প্রাণ দিয়া ভালোবাসিয়াছিল, যাহা একদিন তাহার দিবসের চিন্তা এবং রাত্রির স্বপ্ন ছিল, সেই 'ক্ষত্রিয়' অদ্ভুতভাবে আবার তাহার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছে—এই চিন্তায় সে বিভোর হইয়াছিল। সমস্ত সম্পর্ক চুকাইয়া যাহাকে সে একদা স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া আসিয়াছিল, সে আবার ফিরিয়া আসিল! 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকাটাকে একটা জীবন্ত প্রাণবান কিছু বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল, মায়া কাটাইতে না পারিয়া পথ

চিনিয়া আবার যেন ফিরিয়াছে। বহুদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়িল। ছেলেবেলায় সে একটা কুকুর পুষিয়াছিল। যদিও অতি সাধারণ দেশি কুকুর, কিন্তু তাহাই তাহার ধ্যানজ্ঞান হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে খাওয়ানো, নাওয়ানো, শোয়ানো, কসরৎ শেখানো ছাড়া আর কোনো কাজ বা চিন্তা ছিল না। কিন্তু সে কুকুরকে ছাড়িতে হইল। মায়ের শুচিবায়ু প্রবল ছিল। কুকুরটাকে দেখিলেই তিনি সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িতেন। শঙ্কর ওটাকে লইয়া মাখামাখি করিতেছে—এ চিন্তা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত। বাধ্য হইয়া কুকুরটাকে ছাড়িতে হইল। না ছাড়িলে মা হয়তো পাগলই হইয়া যাইতেন। সহপাঠী অবিনাশের কুকুরটার প্রতি লোভ ছিল, তাহাকেই সে কুকুরটা দান করিয়া দিল। অবিনাশ কুকুর লইয়া বাড়ি চলিয়া গেল। তাহার বাড়ি দশ ক্রোশ দূরে। মাস দুই পরে একদিন মনে হইল, কে যেন কপাট আঁচড়াইতেছে, কুঁই-কুঁই শব্দও শোনা গেল। দ্বার খুলিয়া শঙ্কর দেখে, টম ফিরিয়া আসিয়াছে। দশ ক্রোশ হাঁটিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার উৎসুক দৃষ্টি, আন্দোলিত পুচ্ছ, চোখের উপর ছবিটা আবার যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিল।...'ক্ষত্রিয়'র মলাটটা এবার নূতন ধরনের করিতে হইবে, কতই বা খরচ পড়িবে?

স্টেশনে গাড়ি ছিল না, শঙ্কর হাঁটিয়াই ফিরিতেছিল। হঠাৎ একটা কোলাহল কানে আসিল। চাহিয়া দেখিল, একদল লোক হল্লা করিতে করিতে আসিতেছে। কিসের হল্লা? কে ইহারা? ছ্যারা-রা-রা-রা—। ও হোলির দল! সকলের মাথায় ফাগ, জামা-কাপড়ে রঙ, যুদ্ধের বাজারে ভালো লাল রঙ জোটে নাই, সবুজ হলুদ বেগুনি যে যাহা পাইয়াছে মাখিয়াছে, অনেকের মুখে তেল কালি মাখানো, খচমচ করিয়া একটা বাজনা বাজিতেছে, সঙ্গে গোটা কয়েক ঢোলও আছে, দুই হাত তুলিয়া নাচিতে নাচিতে হোলিতে মাতিয়াছে সব। ছ্যারা-রা-রা-রা...। শঙ্কর এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। আবার তাহার মনে হইল, কে ইহারা? ইহারাই কি তাহার স্বদেশবাসী? ইহাদের সহিত তাহার কিছুমাত্র মিল আছে কি? এই ইহাদের উৎসব? এভাবে উৎসব করিবার কল্পনাও সে কি করিতে পারে? সভ্যতা ভব্যতা, শ্লীলতা, শোভনতা, মানসিক যে সব উৎকর্ষকে আয়ত্ত করিবার জন্য সে এতদিন সাধনা করিয়াছে, এই জনতা কি তাহার মূর্ত প্রতিবাদ নয়? কিছুকাল পূর্বে 'ভারতীয় সংস্কৃতি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাহার মনে যে গর্ব হইয়াছিল, তাহা সহসা যেন ধূলিস্যাৎ হইয়া গেল। ইহাই কি ভারতীয় সংস্কৃতির রূপ? বসন্তোৎসবের সহিত যে মদনিকা-মালবিকা, আবীর-কুঙ্কুম, ঝারি-পিচকারি, যে রঙ ও রসের মধুর ছবি তাহার কল্পলোকে রঙিন হইয়া আছে, এই উন্মত্ত অসভ্য দেহসর্বস্ব জনতার মধ্যে তাহার কিছুমাত্র আভাস তো নাই। ইহারা কি সত্যই ভারতীয়? সত্যই তাহার আপন লোক? ইহাদের উদ্ধার করিবার জন্যই কি সে জীবনপণ করিয়াছে? ইহাদের, এই মূঢ় বর্বরদের উদ্ধার করিবার সত্যই কি উপায় আছে কোনো? নির্বাক বিস্ময়ে নূতন দৃষ্টিতে সে এই জনতার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দূরে একটা নারীমূর্তি দেখা গেল। একটু কাছে আসিতেই দলের মধ্যে একজন আগাইয়া গিয়া অশ্লীল অঙ্গভঙ্গীসহকারে মেয়েটার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণ করিয়া অশ্লীল একটা ছড়া মুখে মুখে বানাইয়া সুর করিয়া গাহিতে লাগিল। জনতা গর্জন করিয়া উঠিল, হো-হো-হো-হো, ছ্যারা-রা-রা-রা—। খচমচ খচমচ বাজনা উদ্দাম হইয়া উঠিল। মেয়েটি লজ্জায় মরিয়া গেল না, সরিয়াও গেল না। ছদ্ম রোষভরে সে বরং আগাইয়া আসিল এবং রাস্তা হইতে এক

আঁজলা ধূলা তুলিয়া লোকটার মুখের ওপর ছুঁড়িয়া মারিল। শঙ্কর হঠাৎ চিনিতে পারিল। মেয়েটি আর কেহ নয়, ফুলশরিয়া। তাহাকে দেখিয়া যে লোকটা গান ধরিয়াছিল, সে চানাচুরওয়ালা রামু। রামুর চোখে বোধ হয় ধূলা পড়িয়াছিল। তবু সে চোখ মুখ কুঁচকাইয়া হাসিতে হাসিতে আগাইয়া গেল এবং ফুলশরিয়াকে ধরিয়া জোর করিয়া তাহার সমস্ত মুখখানাতে 'বাঁদুরে রঙ' মাখাইয়া দিল। আর একজন ঢালিয়া দিল পাতলা খানিকটা গোলাপি রঙ। বিস্রস্তকেশা ফুলশরিয়া আবার একমুঠো ধূলা ছুঁড়িয়া মারিল। সর্বাঙ্গ তাহার রঙে ভিজাইয়া দিল 'ছৌড়াঁপুতারা'। খচমচ খচমচ করিয়া বাজনা বাজিতে লাগিল। হো-হো-হো-হো—ছ্যারা-রা-রা-রা—উন্মত্ত জনতা উদ্বাহু হইয়া নৃত্য জুড়িয়া দিল। সহসা তাহারা শঙ্করকে দেখিতে পাইল এবং থামিয়া গেল। হঠাৎ ভিড়ের ভিতর হইতে ঈষৎ টলিতে টলিতে নটবর ডাক্তার বাহির হইয়া আসিলেন।

নমস্কার শঙ্করবাবু, আসুন, আজকের দিনে একটু ফাগ নিন। অমন টিপ-টপ হয়ে থাকা মানায় না আজকের দিনে।

দিন।

মনে মনে একটু বিব্রত হইলেও কপালটা না বাড়াইয়া দিয়া সে পারিল না। নটবর তাহার কপালে ফাগ লাগাইয়া দিলেন।

সেদিন আপনার বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছি আমি।

কেন, কিছু দরকার ছিল?

ছিল বইকি। হরিয়াটার নামে দারোগা সাহেব বি. এল. কেস চালাতে চান। এ গ্রাম থেকে একটি সাক্ষী যাতে না জোটে, তার ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে।

হরিয়া এবং অন্যান্য অনেকের নামে পুনরায় থানায় নালিশ হইয়াছে—এ কথা তিনি হরিয়ার মুখে শুনিয়াছিলেন; কিন্তু নিজে সম্পূর্ণ অনুসন্ধান না করিয়া শঙ্করকে এ বিষয়ে কিছু বলাটা তাঁহার অনুচিত বোধ হইল। কেবল বলিলেন, কথা যখন দিয়েছি, তখন ও ব্যাটাকে বাঁচাতেই হবে। আপনাকে সাহায্য করতে হবে একটু। ওরে হরিয়া!

ভিড়ের ভিতর হইতে রঙ-মাখা হরিয়া কুণ্ঠিতমুখে বাহির হইয়া আসিল।

কাল যাবি বাবুর বাড়িতে, গিয়ে একবার মনে করিয়ে দিবি! উনি পাঁচ কাজের মানুষ।

জি হুজুর।

আচ্ছা, চলি তবে এখন আমরা। হৈ হৈ করা যাক আজকের দিনটা—বছরের একটি দিন বই তো নয়।

দল আগাইয়া গেল। শঙ্কর দেখিল, দলের ভিতর শুধু হরিয়া নয়, কারু, ফকিরা, কর্পূরা, মধু, বেচু—সকলেই রহিয়াছে। রঙে নাহিয়া ফুলশরিয়া একটু দূরে আগে আগে চলিতেছিল। শঙ্কর তাহার পিছু পিছু চলিতে লাগিল।

হঠাৎ আর একটা দল আবির্ভূত হইল। ইহাদের ধরনটা অন্যরূপ। একজনকে মড়া সাজাইয়া খাটের উপর শোয়াইয়াছে এবং শোভাযাত্রা করিয়া তাহাকে বহিয়া লইয়া চলিয়াছে। শোভাযাত্রার আগে একজন এবং পিছনে একজন গাধার পিঠে চড়িয়া আসিতেছে। সকলে, এমন কি মড়া এবং গাধা দুইটা পর্যন্ত নানা বর্ণে রঞ্জিত। যে মড়া সাজিয়াছে, সে মাঝে মাঝে

মাথা তুলিয়া খিলখিল করিয়া হাসিতেছে এবং বাকি সকলে জোর করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিতেছে। হোলির দিনে মৃত্যুকেও তাহারা রঙে রাঙাইয়া দিয়াছে। হাসির হর্‌রা তুলিয়া মাঝে মাঝে গর্জন করিয়া উঠিতেছে, রাম নাম সৎ হ্যায়!

ফুলশরিয়া এবং শঙ্কর উভয়েই রাস্তা ছাড়িয়া মাঠে নামিয়া পড়িল। তাহাদের কেহ কিন্তু লক্ষ্যই করিল না, নিজেদের আনন্দেই সকলে মশগুল হইয়া রহিয়াছে।

ইহাদের পিছনে আর একটা তৃতীয় দলও দেখা দিল। ইহারা একটু প্রবীণ গোছের, পক্বকেশ বৃদ্ধও আছে। সকলেই ফাগ-মাখা, সকলেরই গায়ে রঙ। ঢোল এবং খঞ্জনি বাজাইয়া সমস্বরে গান গাহিতেছে ও নাচিতেছে—

সীতারাম সীতারাম, জয় জয় সীতারামকি—
রাধেশ্যাম রাধেশ্যাম, জয় জয় রাধেশ্যামকি—

গাহিতেছে ও নাচিতেছে। দুই হাত তুলিয়া উদ্দাম নৃত্য। ইহারাও চলিয়া গেল। ফুলশরিয়া এবং শঙ্কর তখন পথে উঠিল। ফুলশরিয়া আগাইয়া চলিতে লাগিল। শঙ্কর গতিবেগ একটু মন্থর করিয়া দিল। ভাবিল, মেয়েটা আগাইয়া যাক। যে চিন্তাটা কিছুক্ষণ আগে তাহার মনকে আলোড়িত করিতেছিল, তাহাই মনের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া জাগিতে লাগিল। আমরা সত্যই কি একজাতের। ফুলশরিয়া হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া একমুখ হাসিয়া বলিল, তু হাম সেনিসে ঘিন করইছ, নেই বাবু?

প্রশ্নটা শুনিয়া শঙ্কর বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহার মনের কথা মেয়েটা টের পাইল কি করিয়া। উহাদের সম্বন্ধে ঘৃণা, বড় জোর অনুকম্পা ছাড়া অন্য কোনো ভাব যে সে পোষণ করে না, তাহা নিজেই সে এতদিন স্পষ্ট করিয়া জানিত না। ইহাদের সহিত সত্যই তো তাহার কোনো আন্তরিক যোগ নাই। শিক্ষায় দীক্ষায় আচারে ব্যবহারে চিন্তায় কর্মে সত্যই সে সম্পূর্ণ আলাদা জাতের লোক। গায়ের রঙ এবং মুখের ভাষা ছাড়া বিলাতি মিশনারিদের সহিত তাহার যে বিশেষ কোনো তফাত নাই, সহসা এই সত্যটার সম্মুখীন হইয়া সে একটু যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। ইহাদের সকলকে বর্বর মনে করিয়াই তো সে ইহাদের উদ্ধার করিতে চায়। কিন্তু ইহারা সত্যই কি বর্বর নয়? হঠাৎ নজরে পড়িল, ফুলশরিয়া তাহার দিকে হাসিমুখে চাহিয়া আছে। মুখময় কালচে সবুজ রঙ, মাঝে মাঝে আবির লাগিয়াছে, বিস্রস্ত অলকগুচ্ছ কপালের দুই পাশে দুলিতেছে, হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু দুইটি অস্বাভাবিক রকম সাদা রঙে ভিজিয়া শাড়িটা সর্বাঙ্গে সাঁটিয়া বসিয়া গিয়াছে। একটা ডাকিনী যেন! এই কি ভারতীয় রমণীর প্রতীক? এই কি শতকরা পঁচানব্বই জনের একজন? চকিতের মধ্যে কয়েকটা মুখ মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। অমিয়া, সুরমা, কুন্তলা, চুনচুন, বেলা, বউদিদি, মিষ্টিদিদি, রিনি, মুক্তো—ইহাদের মধ্যে কে ভারতীয়? সরোজিনী নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, কস্তুরবাঈ গান্ধী—ইহাদের মধ্যেই কি ভারতীয় রমণীর বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে? এইমাত্র যে হররমার গহনা-সমস্যা সে সমাধান করিয়া আসিল, সেই কি ভারতীয়? না, এই ফুলশরিয়ারা? যমুনিয়ার শীর্ণ শুষ্ক মুখটাও মনে পড়িয়া গেল। ইহারাই তো সংখ্যায় বেশি। ইহাদেরও একটা জীবনযাপন নীতি আছে, কিন্তু আমাদের মানদণ্ড অনুসারে তাহা অসভ্য। সভ্যতা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, ইহাদের সে সব বালাই নাই। ইহারাও চাষ করে, চাকরি করে, ব্যবসা করে, ভিক্ষা করে, চুরি করে, ডাকাতি

করে, উপবাস করে, উৎসব করে। কিন্তু বিশেষ একটা কোনো সভ্যতার আদর্শে সবাই চলে না। অথচ খুঁজিলে ইহাদের মধ্যে সবই মিলিবে। অনার্য-আর্য-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সব রকম সভ্যতার উচ্ছিষ্ট আসিয়া ইহাদের মধ্যে জমা হইয়াছে। যেন একটা ডাস্টবিন।

ডাস্টবিনটা সহসা আবার কথা কহিয়া উঠিল, কহ না বাবু, তু হাম সেনি সে নফ্‌রত্ করইছ?

শঙ্কর ক্ষণিকের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, ফুলশরিয়ার কথায় আবার আত্মস্থ হইল। অপ্রস্তুত মুখে ভুল হিন্দিতে আমতা আমতা করিয়া বলিতে হইল, না না, সে কি কথা, তোমাদের ঘৃণা করি না তো। আর কিন্তু সে ফুলশরিয়ার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না, দ্রুতপদে আগাইয়া গেল। ফুলশরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পিছন ফিরিয়া তাকাইলে শঙ্কর দেখিতে পাইত, ফুলশরিয়া তাহার দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছে। তাহার চোখ দুইটা জ্বলিতেছে, যেন বাঘিনীর চোখ।

শঙ্কর কিন্তু ফিরিয়া তাকাইল না। তাহার মনের মধ্যে একটা ঘৃণা জাগিয়াছিল এবং তাহাতে পল্লী-সংস্কার, লোকনাথ ঘোষাল, 'ক্ষত্রিয়', হররমা, অমিয়া, সুরমা, নিজের জীবনের আদর্শ, ভারতের ইতিহাস, ভবিষ্যৎ কর্তব্য—সমস্তই যেন অসংলগ্নভাবে আবর্তিত হইতেছিল। নতমস্তকে দ্রুতবেগে সে হাঁটিতে লাগিল, যেন একটা বিরাট ঝড়ের ভিতর দিয়া চোখ বুজিয়া সে ছুটিয়া চলিয়াছে।

।। একচল্লিশ ।।

উৎপল নিবিষ্টচিত্তে রেডিও শুনিতেছিল। কি সর্বনাশ, রেঙ্গুন যে যায় যায়! কেনারাম চক্রবর্তী প্রবেশ করিলেন।

নিপুবাবু আর প্রমথবাবু চলে গেলেন। কিন্তু—

কেনারাম ইতস্তত করিতে লাগিলেন। এ সংবাদ শুনিয়া উৎপল যে আবার কি মূর্তি ধরিবে, তাহা তিনি আন্দাজ করিতে পারিতেছিলেন না।

আবার 'কিন্তু' কি?

উৎপল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল।

গদাই দত্ত জরিমানা দিতে চাইছে না।

কি বলছে?

বলছে—দেব না, আপনারা যা করতে পারেন করুন।

উৎপল রেডিওর ডায়ালটির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আচ্ছা, ভেবে দেখি। আপনি এখন যান।

কেনারাম কতকগুলি কাগজপত্র সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। সেগুলি টেবিলে রাখিয়া বলিলেন; ব্যাঙ্কের হিসেব এটা। আমি আপ-টু-ডেট করে রেখেছি। হাজার দশেক টাকা লোকসান হয়েছে।

ওসব শঙ্করকে দেবেন। আমি তার সঙ্গেই কথাবার্তা কইব।

কেনারাম চলিয়া গেলেন।

উৎপল ক্ষণকাল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিল। হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়াতে তাহার অধরে হাসি ফুটিল। রেডিওটা বন্ধ করিয়া দিয়া সে ভিতরে যাইবার জন্য উঠিল। সুরমার সহিতই পরামর্শটা করা যাক। ছোটখাটো একটা প্রলয় করাই যখন উদ্দেশ্য, তখন প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির সাহায্য লইলে নেহাত অশোভন হইবে না।

।। বিয়াল্লিশ ।।

গ্রামে ঢুকিয়াই শঙ্কর দেখিল, গ্রামে একটা হৈ হৈ পড়িয়া গিয়াছে। রাজীব দত্তের গোলাবাড়িতে আগুন লাগিয়াছে। পাটের গুদাম এবং ধানের গোলা দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছে। রাজীব দত্তের বাড়ির চতুর্দিকে ভিড় এবং কোলাহল। দূর হইতে অকাশবিসর্পী লেলিহান শিখার দিকে চাহিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উৎপল কথাকে কাজে পরিণত করিতে পারিয়াছে তাহা হইলে। রাগে ক্ষোভে দুঃখে তাহার সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু রাগ যে কাহার উপর, ক্ষোভ ও দুঃখ যে কিসের জন্য, তাহা সে নির্ণয় করিতে পারিল না বলিয়াই সমস্ত অন্তঃকরণ যেন বেদনায় আরও টনটন করিতে লাগিল। দুষ্ট শাস্তি পাইয়াছে এবং সে শাস্তির আয়োজন তাহার অভিমত অনুসারেই হইয়াছে, ইহাতে দুঃখিত হইবার কিছু নাই; সুরমাও ইহাতে খুশি হইবে—এ সব যুক্তি তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল হারিয়া গেলাম, নামিয়া গেলাম, সব নষ্ট হইয়া গেল। যাহা করিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা হইল না। সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া চুপে চুপে সে বাড়ি ফিরিল। ফিরিবার পথে বারংবার তাহার মনে হইতে লাগিল, ছাত্রজীবনে কোথাও আগুন লাগিয়াছে। শুনিলে সে-ই সর্বাগ্রে ছুটিত আগুন নিবাইতে, এখন চোরের মত পলাইতেছে। কোন্ মুখ লইয়া সে এখন উহাদের কাছে যাইবে? ছি ছি, কি শোচনীয় অধঃপতন। কিন্তু কেন? কেন সে নিজের আদর্শকে ছোট করিতেছে? সনাতন মনুষ্যত্বের আদর্শ ছাড়িয়া কোথায় কিসের লোভে চলিয়াছে সে? নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি দুর্বলতা সমস্ত ভুলিয়া তাহার মন সহসা এক নিষ্কলুষ স্বপ্নরাজ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। ওই স্বপ্নরাজ্যই তো তাহার লক্ষ্য! অপথে বিপথে কোথায় সে ঘুরিয়া মরিতেছে?

বাড়ি ফিরিতেই খুকি তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। বাড়ির সামনেই ফাঁকা মাঠটায় সে দুইটি সমবয়সীর সঙ্গে ধূলা মাখিয়া খেলা করিতেছিল। তাহার ফ্রকে কে খানিকটা রঙ দিয়াছে। শঙ্কর তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

বাবা, তুমি কোদা দেতলে?

পলাশপুরে।

আমি পলাচপুর যাব।

এরা কে?

ছামিয়া বুদিয়া। কাও।

আধখানা-কামড়ানো একটা কুল সে শঙ্করের মুখে গুঁজিয়া দিল।

মুছাই এতো দুত্তু হয়েতে বাবা, কুল পেলে দিতে বললে দেয় না। তাকে বকে দিও তো।

আচ্ছা।

বারান্দায় উঠিয়া সে খুকিকে কোল হইতে নামাইয়া দিল। খুকি ছুটিল মাকে খবর দিতে। বাহিরের ঘরে ঢুকিয়াই শঙ্করের চোখে পড়িল, টেবিলের উপর কয়েক দিনের ডাক জমিয়া রহিয়াছে। উপরের পোস্টকার্ডখানা শ্বশুরের। তুলিয়া পড়িতে লাগিল—আসন্নপ্রসবা অমিয়াকে তিনি লইয়া যাইতে চান। অমিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার কাপড় নানা রঙে বিচিত্র এবং সিক্ত।

এমন অসময়ে রঙ দিল কে?

রঙ সকালে দিয়েছে। আমি এখন আমাদের খোড়ো চালে জল ঢালছিলাম। রাজীববাবুর গোলায় আগুন ধরেছে, দেখলে না?

হ্যাঁ, দেখলাম আসতে আসতে।

আহা, বেচারীর সব পুড়ে গেল! কি করে যে লাগল আগুন!

শঙ্কর পোস্টকার্ডেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোনো জবাব দিল না।

একদিনের নাম করে গেলে, এই বুঝি তোমার একদিন?

এ কথারও জবাব না দিয়া শঙ্কর বলিল, তোমার বাবা চিঠি লিখেছেন, দেখেছ?

দেখেছি।

যাচ্ছ কবে?

আমার আবার যাওয়া। আরও তিনজন পোষ্য জুটেছে—দাইয়ের ছেলেমেয়েরা তো আছেই।

আবার কে জুটল?

ঝমরু তার ছেলেদের নিয়ে হাজির হয়েছে এসে। তার গলা দিয়ে আর স্বর বেরোয় না, কেঁপে কেঁপে জ্বর আসছে রোজ। কাল দেখি, খিড়কি দরজার পাশে কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। ছেলে দুটো পাশে বসে আছে চুপ করে। দু'দিন খেতে পায়নি বললে। ডেকে এনে খেতে দিলাম। আর নড়তে চাইছে না।

অমিয়া হাসিল। শঙ্করও হাসিল।

দীনদুঃখীদের প্রতি অমিয়ার একটা স্বাভাবিক করুণা অবশ্য আছে; কিন্তু কেবল এই জন্যই সে যে বাপের বাড়ি যাইতে চাহিতেছে না, তাহা সত্য নহে। আরও একটা নিগূঢ় কারণ আছে। শঙ্করের পরিবর্তিত মনোভাব সেও টের পাইয়াছিল। মুখে সে কিছু বলে নাই, কোনোদিন বলিবেও না, কিন্তু শঙ্করকে ছাড়িয়া এ সময় সে কোথাও যাইবে না।

দুই হাতে দুই মুঠা মটরশুঁটি লইয়া খুকি ঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়া পাশ কাটাইয়া বাহিরে পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল।

দেখেছ মেয়ের কাণ্ড? রেখে আয় মটরশুঁটি—বলিয়া অমিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। খুকি চোখ দুইটি বড় বড় করিয়া নীরবে শঙ্করের পানে চাহিল। ভাবটা, মায়ের ব্যবহারটা দেখ একবার।

শঙ্কর বলিল, দাও দাও, ছেড়ে দাও।

ছাড়িয়া দিতেই ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

এমন দস্যি হয়েছে! ওরা এসে থেকে পর্যন্ত দিনরাত ওদের সঙ্গে আছে। কাল সন্ধেবেলা ওদের কাছে গিয়ে শুয়েছিল পর্যন্ত।

ওরা শুচ্ছে কোথা?

ভাঁড়ার-ঘরের পাশের গলিটায়।

উভয়ে ভিতরে চলিয়া গেল।

ভিতরে গিয়া শঙ্কর কিন্তু বেশিক্ষণ বিশ্রাম করিতে পাইল না। বাহিরের ঘরে লোকের পর লোক আসিতে লাগিল। স্যানিটেশন বিভাগের চৌধুরী আসিয়া দুই পাউন্ড কুইনিন লইয়া গেলেন। বিরিপুরের একজন শিক্ষক আসিয়া নিবেদন করিলেন যে, লছমন গোয়ালার পুত্রকে ক্লাসে প্রমোশন দেওয়া হয় নাই বলিয়া লছমন তাহাকে শাসাইতেছে, মারিবে বলিতেছে। লছমন বলিষ্ঠ ব্যক্তি, বিরিপুরে তাহার প্রতিপত্তিও আছে। শিক্ষক মহাশয় ভীত হইয়া পড়িয়াছেন এবং ইহার ব্যবস্থা না করিলে কার্যে ইস্তফা দিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। কারু, ফরিদ, রহিম, কর্পূরা, ফকিরার দল এবং তাহাদের পরিবারবর্গ আসিয়া পায়ে উপুড় হইয়া পড়িল, দারোগার কবল হইতে বাঁচাইতে হইবে। কেনারামবাবু তাহাদের নামে থানায় নালিশ করিয়া আসিয়াছেন। জমিরগঞ্জে উল্টা মহরমের দিন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। জমিরগঞ্জ মুসলমান প্রধান স্থান। একজন মৌলবি আসিয়া সমস্ত মুসলমানদের মন হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিষাইয়া তুলিয়াছে। সেখানকার হিন্দু-প্রজাদের মুখপাত্র গুলজার সিং আসিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিল। প্রতিকারের উপায়ও বলিয়া দিল। শঙ্করবাবু এবং গুলাব সিং আসিয়া যদি 'মদৎ' করেন, তাহা হইলে সে—গুলজার সিং—একাই উহাদের 'বীজ' পর্যন্ত জ্বালাইয়া দিতে পারে। বদমায়েসগুলা একটা কচি বাছুরের গলায় মালা পরাইয়া সেটাকে হিন্দুদের বাড়ির সামনে দিয়া শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া গিয়া প্রকাশ্য স্থানে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে। গুলজার সিং আর একটা উপায়ও বলিল। রাজীব দত্ত এই মুসলমানগুলোর মহাজন। তিনিও ইচ্ছা করিলে প্রতিশোধ লইতে পারেন এবং শঙ্করবাবু অনুরোধ করিলে তিনি যে অস্বীকার করিবেন তাহা মনে হয় না। গুলাব সিং ও শঙ্করবাবুর অনুরোধ সে ঠেলিতে পারিবে না। চক্রবর্তী মহাশয় আসিয়া নিপুদা এবং প্রমথ ডাক্তারের বিতাড়নবার্তা জানাইয়া গেলেন। প্রসঙ্গত আর একটি কথাও বলিলেন, পাঁচ বছর পুরে গেছে, উৎপল হিসেব চাইছিল। আমি ব্যাঙ্কের হিসেব ঠিক করে রেখেছি। দশটি হাজার টাকা লোকসান হয়েছে। তুমি বাকি সব ডিপার্টমেন্টগুলার হিসেব ঠিক রেখো। উৎপল বাইরে দেখতে ও রকম হলে কি হবে, ভেতরে ভেতরে বেশ স্ট্রিকট আছে। খু—ব। চক্রবর্তী মহাশয় চলিয়া যাইবার পর ঝক্সু আসিল এবং বলিল যে, নিপুবাবুর সহিত তাহার পুত্র রামলালও অন্তর্ধান করিয়াছে। ডিস্ট্রিক্ট হেলথ অফিসার একজন চৌকিদারকে দিয়া খবর পাঠাইলেন, আশপাশের গ্রামে এই অসময়ে (খুব সম্ভবত হোলির জন্য) কলেরা লাগিয়াছে। পাশের গ্রামেই দশজন মারা গিয়াছ। কিছুক্ষণ পূর্বে স্যানিটেশন বিভাগের চৌধুরী আসিয়া ছিলেন, তিনি তো কিছুই বলিলেন না, সম্ভবত কোনো খবরই রাখেন না। অথচ প্রতি মাসে এই জন্য বেতন পান।

শঙ্কর নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে সে উঠিয়া ছাদে চলিয়া গেল এবং যাইবার সময় অমিয়াকে বলিয়া গেল, কেহ যদি খুঁজিতে আসে, তাহাকে যেন বলিয়া দেয়া হয় যে, সে বাড়ি নাই। রাত্রি দশটার সময় অমিয়া যখন তাহাকে খাইবার জন্য ডাকিতে গেল তখনও সে নিস্তব্ধ হইয়াই বসিয়া ছিল।

চল, খাবে চল।

চল।

অমন চুপ করে মন-মরা হয়ে বসে আছ যে! কি হয়েছে?

কিছু না।

নিশ্চয় কিছু হয়েছে। বলবে না?

অমিয়াও পাশে বসিয়া পড়িল।

একটু ইতস্তত করিয়া শঙ্কর বলিল, ব্যাঙ্কে দশ হাজার টাকা লোকসান হয়েছে। টাকাটা পুষিয়ে দিতে না পারলে উৎপলের কাছে মান থাকবে না।

অত টাকা লোকসান হল কি করে?

সবাই ধার নিয়েছে আর শোধ দেয়নি, মানে—দিতে পারেনি! আমি ভাবছি—

বলিতে গিয়া শঙ্কর হঠাৎ থামিয়া গেল।

কি ভাবছ?

একটা কথা তুমি জান—বাবা উইল করে তাঁর সমস্ত টাকা আর সম্পত্তি তোমাকে দিয়ে গেছেন।

জানি তো।

কি করে জানলে?

তাঁর উইল তো এই কাঠের আলমারির দেরাজে রয়েছে, দাদা সেবার এসে বার করলে যে। কেন, তাতে কি হয়েছে?

অমিয়া জানিত। জানিয়াও তাহাকে এতদিন কিছু বলে নাই। অমিয়া-চরিত্রের একটা অনাবিষ্কৃত অংশ সহসা যেন তাহার চোখে পড়িয়া গেল।

কি ভাবছ, বললে না?

ভাবছি—না থাক, তোমার টাকাগুলো নষ্ট করে ফেলা ঠিক হবে না।

আমার টাকা তোমার টাকা বলে আলাদা আলাদা কিছু আছে নাকি? কালই তুমি টাকাটা তুলে ব্যাঙ্কে জমা করে দাও। তোমার মানের চেয়ে তো আর টাকা বড় নয়।

বাবা যে কত টাকা রেখে গেছেন, তাও তো ঠিক জানি না। ও-টাকাতে যদি না কুলোয়—

যদি না কুলোয় তা হলে আমার গয়না বিক্রি করে দাও। ওর জন্যে আর ভাবনা কি? চল, খাবে চল। রাত হয়েছে।

শ্রদ্ধায় শঙ্করের অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শিক্ষিত বলিতে যাহা বুঝায়, অমিয়া তো তাহা নয়, তবু সে এত মহৎ! এত সহজে এত অনাড়ম্বরে এতগুলো টাকার অধিকার এমন অবলীলাক্রমে ছাড়িয়া দিল! অনিবার্যভাবে একটা কথা তাহার মনে পড়িল। অনুরূপ অবস্থায় পড়িলে সুরমা কি ঠিক এই রকম পারিত?

।। তেতাল্লিশ ।।

হাসি অত্যন্ত বিরক্ত চিত্তে বসিয়া জবাবদিহি লিখিতেছিল।

গত পরীক্ষায় এত কমসংখ্যক ছাত্রী পাস করিয়াছে কেন, স্কুল-কমিটি জানিতে চাহিয়াছেন। হাসি সত্য কথাই লিখিতেছিল। লিখিতেছিল, এই অল্প কয়েকজন ছাত্রীই যে পাস করিতে পারিয়াছে, এজন্য স্কুল-কর্তৃপক্ষের ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। পিতামাতারা যদি নিজেদের কন্যাদের লেখাপড়া বিষয়ে অবহিত না হন, বাড়িতে যদি তাহারা পড়াশোনা না করে, তাহা হইলে কেবলমাত্র সাজিয়া-গুজিয়া স্কুলে আসিলেই তাহারা কোনোকালে পাস করিতে পারিবে না। স্কুলেও তাহারা নিয়মিত আসে না। যখন আসে, তখনও পড়ায় মন দেয় না। অমনোযোগী হইবার জন্য সামান্য শাস্তি দিলেও কান্নাকাটি করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া বসে যে, কিছু বলিতে ভয় হয়। অনেক অভিভাবক এবং স্কুলের কর্তৃপক্ষ শাস্তি দেওয়া পছন্দ করেন না। এ অবস্থায় বেশি মেয়ে পাস করিলেই আমি বিস্মিত হইতাম। লেখাপড়ায় মেয়েদের এবং তাহার অভিভাবকদের যদি আন্তরিক নিষ্ঠা না থাকে—

এ পর্যন্ত লিখিয়া সে থামিয়া গেল। বারান্দায় কাহার যেন পদশব্দ পাওয়া যাইতেছে। বিছানায় বসিয়া হেঁট হইয়া লিখিতেছিল সে, কলম ছাড়িয়া উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিল।

দ্বারে মৃদু করাঘাত হইল।

কে?

কোনো উত্তর নাই।

কে?

খোলই না।

গলার স্বরটা যেন চেনা মনে হইল; কিন্তু কাহার, তাহা ঠিক করিতে পারিল না। সাহসে ভর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কাপড়-চোপড় ঠিক করিয়া লইল এবং আগাইয়া গিয়া খিলটা খুলিয়া দিল। প্রবেশ করিল একজন লাল-পাগড়ি কন্‌স্টেবল।

চিনতে পারছ?

লোকটার সামনের দাঁত একটাও নাই। এক-মুখ গোঁফদাড়ি। তবু চোখের দিকে চাহিয়া হাসি চিন্ময়কে চিনিতে পারিল এবং বিস্মিত হইয়া গেল।

ঠাকুরপো!

ওষ্ঠে তর্জনী স্থাপন করিয়া চিন্ময় বলিল, চুপ, আস্তে। জেল থেকে পালিয়ে এসেছি।

পুলিসের পোশাক কেন?

ছদ্মবেশ।

হাসি আরও খানিকক্ষণ চিন্ময়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আমি যে এখানে আছি, সে খবর কে দিলে তোমাকে?

বেলা মল্লিক।

সে আবার কে?

তুমি তাকে চেন না, আলাপ হবে, ভয় নেই।

চিন্ময় হাসিল। হাসিতেই তাহার মুখের বীভৎসতা আরও প্রকট হইয়া পড়িল। সামনের দাঁত একটাও নাই, ঠোঁটগুলা কেমন যেন এবড়ো-খেবড়ো—সমভাবে কুঞ্চিত প্রসারিত হয় না।

তোমার দাঁত কি হল?

মেরে ভেঙে দিয়েছে। লোহার নাল-বসানো বুটের লাথি—। বলিয়া সে আবার হাসিল।

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে হাসি চাহিয়া রহিল।

চিন্ময় বলিল, গোঁফ-দাড়ি দিয়েও এ-হাসি ঢাকা যাবে না। ধরা পড়তে হবেই। তার আগে একটা দল গড়ে দিয়ে যেতে চাই।

কিসের দল?

সব বলছি।

।। চুয়াল্লিশ ।।

অর্ধনিমীলিত লোচনে শঙ্করের কথাগুলি শুনিতে শুনিতে রাজীবলোচনের অন্তরে একটা অদ্ভুত ইচ্ছা জাগিতে লাগিল। ছোঁড়ার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিলে কেমন হয়! পুণ্য যে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। বলে কি! পিতার সঞ্চিত অর্থ হইতে নির্বিকারভাবে দশ হাজার টাকা তুলিয়া ব্যাঙ্কের ক্ষতিপূরণ করিবে! দেবতা, না পাগল—কি এ!

বক্তব্য শেষ করিয়া শঙ্কর কুণ্ঠিতমুখে বলিল, আপনার কাছে অবশ্য বাবার কত টাকা জমা আছে, তা আমি জানি না ঠিক। কিন্তু দশ হাজার টাকা আমার চাই।

রাজীব অর্ধনিমীলিত লোচনেই খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। চোয়ালটা বার দুই নড়িল।

আমার কাছে কত টাকা আছে, তা ·তোমার না-জানবার কথা নয়। টাকা নিয়ে তোমার বাবাকে আমি রসিদ দিয়েছি।

সে কোথায় আছে আমি খুঁজে দেখিনি।

রাজীবলোচনের ভাবলেশহীন মুখে প্রচ্ছন্ন হাসির একটা আভাস যেন ফুটিয়া উঠিল।

আমার কাছে টাকা আছে, তা হলে জানলে কি করে।

ছেলেবেলা থেকেই জানি। বাবা আর তো কোথাও টাকা রাখতেন না।

এই বুদ্ধি লইয়া ছোকরা উৎপলের জমিদারি চালাইতেছে নাকি? মনে মনে মুখ ভ্যাঙাইয়া বলিলেন, ছেলেবেলা থেকেই জানি! আরে বাপু, তার প্রমাণ কি? আমি যদি এখন অস্বীকার করি, একটি আধলা যদি না দিই? গাড়োল কোথাকার! তাঁহার চোয়াল আরও বার দুই নড়িল, ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, এ বছরের সুদটা এখনও হিসেব করিনি। গত বছর পর্যন্ত কুড়ি হাজার টাকা ছিল। এ বছরের সুদ নিয়ে বেশি হবে আরও কিছু।

তা হলে দশ হাজার টাকা দিন আমাকে।

হঠাৎ রাজীবলোচন ভালো করিয়া চোখ খুলিয়া তাকাইলেন এবং তাঁহার মর্মভেদী দৃষ্টি শঙ্করের মুখের ওপর স্থাপন করিয়া বলিলেন, একটি কপর্দক দেব না।

দেবেন না! কেন?

তোমার বাবা আমার বন্ধুলোক ছিলেন। তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ এমনভাবে বরবাদ করতে দেব না আমি। বিশ্বাস করে তিনি আমার হাতে টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন।

শঙ্কর ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

একটু সসঙ্কোচে বলিল, কিন্তু আমার দরকার যে।

ও দরকার কোনো দরকারই নয়। ও টাকা কেনারাম দিক—ওই তো ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিল, ওই খেয়েছে টাকাটা, ওকে চেপে ধর।

আমার হুকুমেই টাকাটা খরচ হয়েছে, আইনত আমিই দায়ী।

আমার কাছ থেকে কিচ্ছু পাবে না।

একটু হাসিয়া শঙ্কর বলিল, এ কি রকম কথা বলছেন আপনি! আমার টাকা আমি পাব না!

টাকা তোমার নয়, তোমার স্ত্রীর। উইলের কপি আমার কাছেও দিয়ে গেছে অম্বিকা।

বেশ, তার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে আসছি আমি।

চিঠি নিয়ে এলেও হবে না, সাক্‌সেশন সার্টিফিকেট চাই, করালীচরণ বক্‌শিরও ফ্যাচাং আছে একটা।

শঙ্কর নির্বাক হইয়া রাজীবলোচনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজীব মৃদু হাসিয়া বলিলেন, এ সব সত্ত্বেও দিতাম, যদি বুঝতাম, টাকাটা ন্যায্য খরচ হবে। তা যখন বুঝছি না তখন বাগড়া দেব। বিশেষত তোমার কাছে যখন কোনো প্রমাণ নেই যে, টাকাটা আমার কাছে আছে তখন তো কিছুই করতে পার না তুমি। আগে রসিদ বার কর।

রাজীবলোচনের চক্ষু দুইটি পুনরায় অর্ধনিমীলিত হইল। শঙ্কর কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। তাহার কানের পাশ গরম হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পিতৃবন্ধুকে কোনো অসম্মানজনক কথা সে বলিতে পারিল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হঠাৎ রাজীবলোচন পুনরায় চোখ খুলিয়া তাহার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

অতিশয় নির্বোধ তোমরা। অগ্রপশ্চাৎ কিছুই চিন্তা কর না, হুটহাট করে একটা কিছু করে বসাটাই স্বভাব তোমাদের। গদাইটা যে অতি নচ্ছার তা আমি জানি, ওকে শাসন করাই যদি তোমাদের উদ্দেশ্য ছিল, ওকে ধরে চড়টা চাপড়টা দিলে পারতে, আমার গোলায় আগুন দিতে গেলে কেন বাপু? আমার কি ক্ষতি হল তাতে, লাভই হল বরং, ইন্‌সিওর করা ছিল সব। মরতে মল কতকগুলো গরিব। ঠিক পাশের একটা ঘরে গরিব চাষীদের পাটের বাণ্ডিলগুলো ছিল, কোথাও রাখতে জায়গা পায় না, রেখে গিয়েছিল ওখানে, সেগুলো পুড়ে গিয়ে তাদেরও লোকসান হল। আমার আর কি হল?

আমি ওসবের মধ্যে ছিলাম না।

শঙ্কর কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, আর বসিয়া থাকিতে পারিল না।

আচ্ছা, আমি চললাম এখন তা হলে।

টাকার জন্য চিন্তা করো না, দরকারের সময় ঠিক পাবে, কিন্তু বরবাদ করতে দেব না আমি।

শঙ্কর কোনো উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল।

রাজীব দত্ত একটু মুচকি হাসিলেন।

অন্ধকারে শঙ্কর গ্রামের পথে পথে একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অবিলম্বে দশ হাজার টাকা কোথায় কি উপায়ে পাওয়া যায়? রাজীব দত্ত সত্যই টাকাটা দিবে না নাকি...নিপুদা গেলেন কোথায়... কলেরা ক্রমশ বাড়িতেছে...হরিয়া, কারু, ফরিদকে আবার উদ্ধার করা সম্ভব কি...সুরমা আর তো তাহার কোনো খোঁজ করিল না...ডাকিতে না পাঠাইলে আর সে যাইবে না...নানা অসংলগ্ন চিন্তা তাহার মাথার মধ্যে ভিড় করিতেছিল।

অনেক রাত্রে যখন বাড়ি ফিরিল, তখন অমিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার পদশব্দ শুনিবামাত্র ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

ছি ছি, কত রাত করলে তুমি!

বেশি রাত তো হয়নি, সাড়ে দশটা।

ও।

অমিয়ার চোখে ঘুম ছিল, তাই সে শঙ্করের চিন্তাচ্ছন্ন মুখটা ভালো করিয়া লক্ষ্য করিল না। তাড়াতাড়ি আহারাদি চুকাইয়া শুইয়া পড়িল। শঙ্করও শুইল, কিন্তু কিছুতেই তাহার চোখে ঘুম আসিল না। অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিয়াও যখন কিছুই হইল না, তখন সে উঠিয়া বসিল। অমিয়া খুকি উভয়েই গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত। সন্তর্পণে মশারি তুলিয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর নিঃশব্দচরণে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। পাশের ঘরেই আলমারিটা আছে। বাবার বিরাট আলমারিটার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল সে। বহুকাল এটাকে খোলা হয় নাই। ইহার চাবি যে কোন্‌টা, তাহার মনে নাই। চাবির গোছাটা আনিয়া একটার পর একটা লাগাইয়া দেখিতে লাগিল। রসিদটা খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে।

চিঠির বাণ্ডিল খাতা ডায়েরি বই ফাইলের স্তূপের ভিতর বসিয়া শঙ্কর রসিদ খুঁজিতেছিল। নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া সহসা শব্দ হইল।

রাম নাম সৎ হ্যায়—

সে চমকাইয়া উঠিল। কে মারা গেল? ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে পাইল, ভোর হইয়া গিয়াছে। জানালা দিয়া ভোরের আলো ঘরে ঢুকিতেছে। সমস্ত রাত খুঁজিয়াও কোনো রসিদ বা পাস-বই পাওয়া গেল না। হতাশ হইয়া অবশেষে উঠিয়া পড়িল সে। কপাট খুলিয়া বাহিরে আসিতেই চোখে পড়িল, লেটার-বক্সে একখানা চিঠি রহিয়াছে। বাহির করিয়া দেখিল, খামের উপর তাহারই নাম লেখা। কাহার চিঠি? খুলিয়া পড়িল—

শ্রীচরণেষু,

আমি আর থাকতে পারলাম না, চললাম। কেন বা কোথায়, তা বলব না। বৃহত্তর যে আহ্বানের অপেক্ষা করেছিলাম, তা এসেছে। আমাকে খুঁজে বৃথা সময় নষ্ট করবেন না। 'তুমি' আপনার কাছে রইল। ওর ভার আপনাকে দিয়ে গেলাম। কোন্ অধিকারে যে এত বড় ভার স্বচ্ছন্দে আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি, তা জানি না। মনে হচ্ছে কিন্তু, অধিকার আছে। কোনো সংকোচ হচ্ছে না। আর একটা কথা। যে দশ হাজার টাকার জন্য আপনার বন্ধুর জেল হয়েছিল, তা আমার কাছেই ছিল এতদিন। টাকাটা আমাকেই এনে দিয়েছিলেন তিনি, আমার

ভবিষ্যৎ ভেবে। সে টাকা আমার ট্রাঙ্কের তলায় আছে। টাকাটা আপনিই নিন, আমি আর কি করব ও নিয়ে! এতবড় গোপনীয় চিঠিটা আপনার খোলা লেটার-বক্সে রেখে যেতে দ্বিধা হচ্ছে। কিন্তু তা ছাড়া আর উপায় কি? একটা ভরসার কথা, খোলা জায়গাতেই গোপনীয় জিনিস সবচেয়ে নিরাপদে থাকে। সন্দেহ জাগে না কারও। আশা করি, আমার জন্যে বিপদে পড়বেন না। চিঠিটা পড়েই ছিঁড়ে ফেলে দেবেন। আপনাকে একটা প্রণাম করে যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না, দূর থেকেই তাই প্রণাম জানাচ্ছি। আমার সম্বন্ধে যাহোক একটা গল্প বানিয়ে প্রচার করে দেবেন। যদি কোনোদিন ফিরি, আবার দেখা হবে। আর যদি না ফিরি, তা হলে এই শেষ।

ইতি—

প্রণতা হাসি

শঙ্কর নিজের চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। হাসি কোথায় গেল? কেন গেল? তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িল সে। হাসির কোয়ার্টার্সে গিয়া দেখিল, হাসি নাই। চাকরটা কিছুই বলিতে পারিল না। 'তুমি' উঠিয়াছে এবং গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ছোট্ট মৃন্ময় যেন।

মা কোথায়?

জানি না।

আমাদের বাড়ি যাবে? চল।

'তুমি' গম্ভীরভাবে একবার শঙ্করের দিকে তাকাইল।

তাহার পর বলিল, চলুন!

কোনো আপত্তি করিল না, জামাটা গায়ে দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মায়ের সম্বন্ধেও কোনো কৌতূহল প্রকাশ করিল না। শঙ্কর স্কুলের চাকরটাকে ডাকিয়া যখন তাহার মাথায় ট্রাঙ্কটা তুলিয়া দিল, তখনও সে কোনো প্রশ্ন করিল না।

চল।

শঙ্করের পিছু পিছু সে চলিতে লাগিল।

শঙ্কর বলিল, তোমার মা একটা কাজে গেছেন। কিছুদিন পরে আবার আসবেন। ততদিন আমার কাছে থাক।

আচ্ছা।

হাসির ব্যবহারে শঙ্কর অবাক হইয়া গিয়াছিল। আরও অবাক হইয়া গেল 'তুমি'র ব্যবহারে। তাহার মনে হইতে লাগিল, 'তুমি' যেন সব জানে, কেবল আত্মসম্মানে বাধিতেছে বলিয়া কিছু বলিতেছে না।

শঙ্কর অমিয়াকে সত্য কথাটা বলিল না। বলিল, হাসি স্কুলের কাজে কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় গিয়াছে। যতদিন না ফেরে, ততদিন 'তুমি' তাহার নিকট থাকিবে।

অমিয়া বলিল, বেশ তো।

সবচেয়ে খুশি হইয়া উঠিল খুকি। সে তাড়াতাড়ি 'তুমি'র হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে নিজের ঐশ্বর্য-সম্ভার দেখাইতে বসিল।

এইতে হাতি, এইতে খুকু, এইতে মোতল—

শঙ্কর পুনরায় আসিয়া আলমারির সম্মুখে বসিয়া ছিল। খাতাপত্রগুলি যথাস্থানে তুলিয়া রাখিতে হইবে। তুলিয়া রাখিতে রাখিতে হাসির কথাই ভাবিতে লাগিল। বৃহত্তর আহ্বান কি হইতে পারে? হাসিকে সে কোনোদিনই বুঝিতে পারে নাই। তখনই আবার মনে হইল, কাহাকেই বা আমরা বুঝি? যাহাকে বুঝি বলিয়া মনে করি, তাহাকে হয়তো ভুল বুঝি। চকিতে সুরমার কথাটা মনে পড়িল। সুরমার কথাই ভাবিতে লাগিল সে। কিছুক্ষণ পরে আর একটা জিনিস আবিষ্কার করিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল রসিদ খুঁজিবার আগ্রহ তাহার তো আর নাই। হাসির অপ্রত্যাশিত চিঠিটা পাইয়া সে যেন নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে। যদিও এখন ট্রাঙ্ক খুলিয়া—সহসা মনে হইল, ট্রাঙ্কের চাবি তো আমার কাছে নাই। বাসায় নিশ্চয়ই আছে কোথাও। পরে গিয়া লইয়া আসিলেই হইবে। টাকাটা আছে নিশ্চয়। হাসি শুধু শুধু মিথ্যা কথা লিখিবে কেন? তখনই আবার মনে হইল, ও টাকা এমন ভাবে খরচ করাটা কি ঠিক হইবে? দেখা যাক।

চিন্তাস্রোত ব্যাহত হইল।

রাম নাম সৎ হ্যায়, রাম নাম সৎ হ্যায়, রাম নাম সৎ হ্যায়—

আবার? শঙ্কর উঠিয়া বাহিরে গেল।

বাহিরে গিয়া দেখিল, মুশাই আসিয়াছে। তাহার মুখে শুনিল, গ্রামে খুব কলেরা শুরু হইয়া গিয়াছে।

।। পঁয়তাল্লিশ ।।

সাইকেলে চড়িয়া শঙ্কর গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেছিল। এমন অসময়ে যে এত কলেরা হইতে পারে, তাহা তাহার স্যানিটেশন বিভাগ কল্পনা করে নাই। চৌধুরী বলিলেন যে, প্রথমটা যদিও তিনি খবর পান নাই, এখন কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না। কূপে কূপে পটাশিয়াম পার্মাঙ্গানেট দেওয়া হইয়াছে, গরিবদের মধ্যে পটাশিয়াম পার্মাঙ্গানেট বিতরিত হইয়াছে, নূতন রোগী হইলেই স্থানীয় ডাক্তারবাবুকে খবর দেওয়া হইতেছে, কিছু কিছু ভ্যাকসিনও দেওয়া হইয়াছে; তথাপি কেন যে ফলোদয় হইতেছে না, সে জবাবদিহি করিতে তিনি অপারগ। তিনি যথাকর্তব্য যথাসাধ্যই তো করিয়া চলিয়াছেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া শঙ্কর হতাশ হইয়া পড়িল। বহু লোক মরিতেছে। একটা ডাকবাংলোয় গভর্নমেন্ট-নিয়োজিত একজন হেল্‌থ অফিসারের সঙ্গে শঙ্করের সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। ভদ্রলোক খাকী হাফ-প্যান্ট হাফ-শার্ট পরিয়া মাথায় শোলার হ্যাট চড়াইয়া শঙ্করের মতই সাইকেল-যোগে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কলেরা কেন থামিতেছে না, জিজ্ঞাসা করায় তিনি ফস করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া সক্ষোভে উত্তর দিলেন, কি করে বলব বলুন? কলেরা থামানো তো আমার কাজ নয়, আমার কাজ ওপরওলার হুকুম তামিল করা। তাই করে যাচ্ছি প্রাণপণে। কলেরা থামল কি থামল না, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর নেই আমার।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, ইচ্ছেও নেই বাকি? দিন একটা আমাকে—আমার সিগারেট ফুরিয়ে গেছে।

এই যে আসুন। ইচ্ছে থাকবে না কেন মশাই, ইচ্ছে খুব আছে, উপায়ও জানা আছে, কিন্তু কিছু করা যাবে না।

করা যাবে না কেন?

বলি তা হলে শুনুন। কলেরার বিষ শুধু যে জল দিয়েই সংক্রামিত হয় তা নয়, যে কোনো খাদ্যদ্রব্য দিয়েই তা হয়। কিন্তু আমাদের যত আক্রোশ কেবল জলের ওপর, অন্য সব বিষয়ে আমরা উদাসীন। এই যে গয়লানীগুলো দুধ বেচছে, এই যে সবাই পেয়ারা চিবুচ্ছে, এদের ওপর আমাদের কোনো কনট্রোল নেই। আমরা শুধু মৌখিক উপদেশ দিয়েই খালাস—সব ফুটাকে খাও। আমাদের কথায় কেউ কর্ণপাতও করে না।

না করবার কারণটা কি?

আমাদের কথা কেউ বিশ্বাস করে, ভেবেছেন? নট এ সিংগল সোল। খাকী হ্যাট-কোট দেখলেই ভাবে পুলিসজাতীয় কেউ হবে বোধ হয় একজন—আমাদের হ্যারাস করতে এসেছে। আমরা পুলিসের হেলপ নিয়ে কাজও করি যে। সেইজন্যে লোকে আমাদের ভয় করে, বিশ্বাস করে না। ওদের যত বিশ্বাস বৈদ্য কবরেজ গোঁসাই এই সবের ওপর। কুয়োয় পার্মাঙ্গানেট পর্যন্ত দিতে দেয় না মশাই। একটা কুয়োয় পার্মাঙ্গানেট দিয়ে মার খেতে খেতে বেঁচে গেছি। ভাগ্যে বাইক ছিল, চোঁ-চোঁ দৌড়ে তবে প্রাণটা বাঁচে। আর একটু হলেই পশ্চিমে গোয়ালার লাঠিতে মাথাটি ফাটত আমার সেদিন। ডাক্তারবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং সবিস্তারে গল্পটি বলিলেন।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, এ অবিশ্বাসের হেতু কি?

তা জানি না মশাই, তবে এইটে বুঝেছি যে, ফরসা জামা-কাপড়ওলা সো-কল্‌ড ভদ্রলোক মাত্রকেই ওরা সন্দেহের চোখে দেখে। ফরসা কাপড়-জামার ওপর ওদের ঘোর সন্দেহ। ওদের নিজেদের মধ্যেও কেউ যদি বেশ ফরসা কাপড়-জামা পরে একটু ফিটফাট হয়, ওরা সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেয় যে, তার চরিত্র খারাপ হয়েছে। মেয়েরা তো এই ভয়ে ফরসা-কাপড় পরতেই চায় না। আর সত্যিই দেখা যায় যে, যারা বেশি ফিটফাট, তাদের চরিত্র খারাপ। আমাদের সম্বন্ধেও ওদের ধারণা যে, আমরা ভালো করবার ছুতোয় এসে ঠিক পকেট মেরে নিয়ে যাব।

একটু হাসিয়া ডাক্তারবাবু পুনরায় বলিলেন, আর পকেট মারিও আমরা। নেহাৎ মিথ্যে কথাও নয়।

পকেট মারেন?

মারি না? আজই তো এক পাউন্ড পার্মাঙ্গানেট, এক পাউন্ড কুইনিন বেচলুম। কিন্তু খরচ দেখিয়ে দিলুম। শুধু যে বেচি তা নয়, দানও করি। বন্ধু-বান্ধবদের স্পিরিট, টিঞ্চার আইয়োডিন, কুইনিন তো হরদম দিচ্ছি। কি করি, চাইলে 'না' বলতে পারি না।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

না বেচে কি করি বলুন, আমাদের ওপর তো জাস্টিস হয় না। দশ বচ্ছরের ওপর চাকরি করছি, এখনও পর্যন্ত একটা ডিসপেন্সারি পেলাম না। অথচ আমার চেয়ে কত জুনিয়র ঢুকল আর পটাপট ডিসপেন্সারি পেলে। আমার অপরাধ আমি বাঙালি আর হিন্দু। এই কংগ্রেস মিনিস্ট্রি

আরও ডোবালে আমাদের মশাই। এতগুলো চোর যে কি করে একসঙ্গে জুটল এত অল্প সময়ের মধ্যে! এর চেয়ে সাহেব মনিব ঢের ভালো ছিল মশাই, সাহেব জাত গুণের কদর বোঝে।

শঙ্কর চুপ করিয়াই রহিল।

ডাক্তারবাবুও ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় সক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন, লাক্ লাক্, সবই লাক্ মশাই। যখন আই. এস-সি পাস করলুম, বাবা বললেন—যা, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়গে যা। তখন কেমন একটা ভুল ধারণা ছিল, ডাক্তারিটা নোবল প্রফেশন, ডাক্তারই হতে হবে। মেডিকেল কলেজ, কারমাইকেল কলেজ, কোথাও ঢুকতে না পেয়ে শেষে দুর্গা বলে কটক মেডিকেল স্কুলেই ঢুকলাম, তা-ও অনেক ঘুষ-ঘাষ দিয়ে। বার তিনেক ফেলও করলাম। শেষে অনেক কষ্টে টেনে হিঁচড়ে বেরিয়ে প্র্যাকটিশ করতে বসলাম দিনকতক। কিছু হল না। আমাকে ডাকবে কে। ঢুকলাম শেষে চাকরিতে। বৃহৎ পরিবার ঘাড়ে, কি করি বলুন? কিন্তু চাকরির তো এই দশা—

বৃহৎ পরিবার বুঝি আপনার?

রাবণের গুষ্টি। আর সব এই শর্মার ঘাড়ে। গজাতে দিলে না মশাই, অনেক কষ্টে যেই দুটি একটি পাতা ছাড়ছি, অমনি কেউ না কেউ এসে মুড়িয়ে খেয়ে যাচ্ছে। আজ ভাগনে, কাল ভাইপো, পরশু বেয়াই, তরশু বউ—একটা না একটা লেগেই আছে। শুধু মাইনেটি সম্বল করে কি চলে মশাই? চলে না।

আপনাদের উপরি কিছু নেই বুঝি?

ওই যা অ্যালাউন্স পাই, তাও যৎসামান্য। আর এই চুরি-চামারি করে যা দু-চার টাকা হয়। কলেরা থামবে কি করে? আমরা কেউ কি উইলিং ওয়ার্কার? কেউ না। উইলিং হব কি করে, বলুন? আমাদের হাতে ক্ষমতাও দেয় না, পয়সাও দেয় না, আমাদের ওপর সুবিচারও হয় না। আমাদের কেবল I have the honour to be sir, your most obedient servant পর্যন্ত দৌড়। তাই করে যাচ্ছি। কেউ প্রাণ দিয়ে কাজ করে না। সব চোর। আমাদের কাজ হচ্ছে গ্রামের গুরুদের কাছে কুইনিন, পটাসিয়াম পার্মাঙ্গানেট দেওয়া। উদ্দেশ্য—তারা গ্রামের গরিবদের বিনা পয়সায় বিতরণ করবে। কেউ তা করে ভেবেছেন? সব বিক্রি করে। আর এই যে আপনারা সব ছ টাকা আট টাকা মাইনে দিয়ে গুরু নিযুক্ত করেছেন, এরা কেউ কি পড়ায় ভেবেছেন ভালো করে? পাজির পা-ঝাড়া ব্যাটারা। কারও বারান্দায়, কারও আটচালায়, থিয়োরেটিক্যালি এক-একটা পাঠশালা খুলে রেখেছে খালি, কতকগুলো ছোঁড়া সেখানে বসে গুলতানি করে মাঝে মাঝে। পড়াশোনা কিচ্ছু হয় না। অনেক গুরু আবার অন্য জায়গায় চাকরিও করেন। অথচ কাগজে কলমে দেখুন এত টাকা spent for education! এডুকেশন তো হচ্ছে কচু!

বলেন কি।

শুধু কচু নয়, কচু-পোড়া! এ দেশের উদ্ধার নেই মশাই। এই আপনারাই যে পল্লীসংস্কারের জন্যে এত টাকা ঢাললেন, তা কি হচ্ছে জানেন? আমার মতে দেশের পিণ্ডি চটকানো হচ্ছে কেবল। অধিকাংশ টাকাই পাঁচজনে লুটে-পুটে খেয়ে ফেলছে, দেশ কিছুই পাচ্ছে না। কাজ করছে মিশনারিরা, দেখে আসুন গিয়ে।

কিন্তু আমাদের উপায় কি?

উপায়? উপায় ভগবান।

বলিয়া তিনি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেম।

ওই যে আপনাদের চৌধুরী, যাকে আপনারা স্যানিটেশন বিভাগের কর্তা করে রেখেছেন, একের নম্বর চোর ব্যাটা। চরণ ডাক্তারের কম্পাউন্ডার মাঝে মাঝে কুইনিন নেয় আমার কাছে, হাফ প্রাইসে দিই তাকে আমি, এবারেও তার জন্যে রেখেছিলুম কিছু, কিন্তু এবার সে নিলে না, বললে, চৌধুরীর কাছে পাঁচ পাউন্ড পেয়েছে ওয়ান ফোর্থ দামে। চৌধুরী পাঁচ পাউন্ড কুইনিন পায় কোথা থেকে মশাই?

শঙ্কর নির্বাক হইয়া রহিল। কয়েকদিন আগেই চৌধুরী তাহার নিকট হইতে দুই পাউন্ড কুইনিন লইয়া গিয়াছে।

ডাক-বাংলোর চৌকিদারটা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। তাহারই আত্মীয় একটি শিশুর কলেরা হইয়াছে। বলিল, চেষ্টার কোনো ত্রুটি হয় নাই। স্থানীয় কূপে 'দাবাই' দেওয়া হইয়াছে, ছেলেটিকে 'জকসন'ও দেওয়া হইয়াছিল, একজন ডাক্তারবাবু আসিয়া 'পানি'ও চড়াইয়া গিয়াছেন, তবু ছেলেটির অবস্থা শোচনীয়। সায়েব যদি মেহেরবানি করিয়া একবার—

তোর বাড়ি কতদূর?

নগিচে হুজুর।

যাবেন নাকি, চলুন না দেখে আসা যাক, কাছেই বলছে।

চলুন।

যাইতে যাইতে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, অ্যান্টি-কলেরা ভ্যাক্‌সিনের কি অভিজ্ঞতা আপনার?

সময়মত হিসেবমত দিলে খাসা কাজ করে। কাজেও বেশ উপকার হয়। কিন্তু আসল কথা কি জানেন, ঠিক সময়ে ঠিকমত সব হয়ে ওঠে না। এরা সব সময়ে ইন্‌জেকশন নিতেই চায় না। কাঁহাতক সাধ্যসাধনা করে বেড়াই ব্যাটাদের।

রোগীর বাড়িতে গিয়া দেখা গেল, রোগী মুমূর্ষু। তিন-চারি বৎসরের একটি শিশু। শঙ্করদের ডিস্‌পেন্সারির ডাক্তারবাবু 'স্যালাইন সাব-কিউটেনিয়াস' দিয়া গিয়াছেন। বগলের নীচেটা ফুলিয়া আছে। ফাজ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা খাওয়ানো হইতেছে। গোপনে গোপনে বৈদ্যদেব 'দাবাই'ও চলিতেছে। গলায় একটা মাদুলিও পরানো হইয়াছে। তবু অবস্থা শোচনীয়। চোখের কোণ বসা, মাথার চুল রুক্ষ, নিষ্প্রভ দৃষ্টি, শুষ্ক অধর। অন্ধকার ঘরের ভিতর পচা ভ্যাপসা একটা গন্ধ। বমি ও বিষ্ঠার উপর মাছি ভনভন করিতেছে। কাল ইহার বড়টি মারা গিয়াছে, আজ এটিও প্রায় যায় যায়। নির্জীবের মত বিছানায় পড়িয়া আছে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় মৃত—ক্ষীণ নিশ্বাস-প্রশ্বাসটুকু এখনও থামিয়া যায় নাই কেবল। ডাক্তারবাবু ঝুঁকিয়া নাড়ীটা দেখিলেন, তাহার পর মুখ বিকৃত করিয়া শঙ্করের পানে চাহিলেন।

ছেলেটা হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিল, মাই গে!

মা পাশেই বসিয়াছিল। ঝুঁকিয়া বলিল, কি বেটা?

ছেলেটা দুই শীর্ণ হাত দিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল। ভয় পাইয়াছে।

ডর নেই বেটা, ডাক্‌টরবাবু আইলোছে, ঘুর দেখে দ।

ছেলে কিন্তু মাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল।

মা তখন তাহাকে চুম খাইয়া খাইয়া ভুলাইতে লাগিল, লালু মেরা, শুগা মেরা, ঘুর ঘুর দেখে দ।

ডাক্তারবাবু অধীর হইয়া উঠিলেন।

আর দেখবার দরকার নেই। যা দেখবার দেখে নিয়েছি। চলুন, এখানে দাঁড়িয়ে আর কি হবে? আরে, ওইসে করকে চুম মৎ খাও। ফিন তুমরাভি হোগা।

মা কিন্তু চুম খাইতে লাগিল, বারণ শুনিল না।

ডিসগাস্টিং! আসুন।

ডাক্তারবাবুর পিছু পিছু শঙ্করও বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তারবাবু চৌকিদারটাকে বলিলেন যে, চিকিৎসা ঠিক মতই চলিতেছে, আর নূতন কিছু করিবার নাই। ফাজটা ঘন ঘন যেন খাওয়ানো হয়। চৌকিদার 'জি হুজুর' বলিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিল।

চলুন, যাওয়া যাক।

নির্বাক শঙ্কর ডাক্তারবাবুর পিছু পিছু যেন যন্ত্রচালিতবৎ চলিতে লাগিল।

ওকে বললুম বটে, চিকিৎসা ঠিকমত চলছে, কিন্তু ঠিকমত চলছে না। অধিকাংশ ডাক্তারই মনে করে, কলেরা হলেই স্যালাইন দিতে হবে। কোনো রকমে পানি চড়াতে পারলেই যেন চিকিৎসার চরম হয়ে গেল।...ও কি! আপনি অমন গুম মেরে গেলেন কেন?

শঙ্কর তবু কিছু বলিল না, গম্ভীর হইয়া রহিল।

আপনার কি মনে হচ্ছে, তা বুঝতে পারছি। I respect your feeling– আপনার মনে হচ্ছে, এত করে কিছু হচ্ছে না। হবে কি করে? স্বচক্ষেই তো দেখলেন, মা-টা ওর মুখে মুখ লাগিয়ে চুমু খাচ্ছে, চতুর্দিকে মাছি ভনভন করছে, পাশেই সরাতে পান্তা ভাত বাসি ডাল রয়েছে, তাতে মাছি বসছে, একটু পরেই মাগী গিলবে ওগুলোকে গপ গপ করে। আমরা জলে পার্মাঙ্গানেট দিয়ে আর কি করব বলুন?

ম্লান হাসিয়া শঙ্কর বলিল, সব বুঝেও কিন্তু শান্তি পাচ্ছি না। আমি আর ডাক-বাংলোয় ফিরব না, আপনি যান।

আপনি কোথা যাবেন?

আমি আমাদের ডিসপেন্সারির দিকেই যাই একবার।

আচ্ছা, তা হলে নমস্কার।

নমস্কার।

এক ছেলে মারা গিয়াছে, আশপাশ সকলে মারা যাইতেছে, রোগটা কত ভীষণ তাহা অজানা নাই, কি করিলে রোগের হাত হইতে বাঁচা যায় বৈজ্ঞানিক ডাক্তার বারংবার তাহা বলিয়া দিতেছেন. সমস্ত জানিয়া শুনিয়া তবু মা সন্তানকে চুমু খাইতেছে। শঙ্করের নিজের মায়ের কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহারই অমঙ্গল-আশঙ্কায় তিনি পাগল হইয়া গিয়াছেন। তাহারই মঙ্গলের জন্য তাহার সান্নিধ্য তিনি এড়াইতে চান।...অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর ডিসপেন্সারির দিকে না গিয়া অন্য দিকে চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। মাঠে ফসল উঠিতেছে। কলাই মুগ কুরথি কাটা হইয়াছে, এখন

গরু দিয়া তাহা মাড়ানো হইতেছে—এদেশে 'দৌনি' বলে। পাশাপাশি আট-দশটা গরু মাঝখানে পোঁতা একটা বাঁশের খুঁটাকে কেন্দ্র করিয়া বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে। প্রত্যেক গরুর মুখে একটা করিয়া দড়ির জাল না দিলে ফসল খাইয়া ফেলিবে। গরুগুলা অনাহারক্লিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ। যে লোকটা গরু হাঁকাইতেছে, সেও অনাহারক্লিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ। মাথায় একটা মলিন পাগড়ি, গায়ে জামা নাই, ছেঁড়া ময়লা কাপড় হাঁটুর ওপর উঠিয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাহার আনন্দের সীমা নাই। আশেপাশে যে এত লোক কলেরায় মরিতেছে, তাহা যেন সে জানেই না। আনন্দে গান ধরিয়া দিয়াছে। নিকটেই 'ওসৌনি' হইতেছে। একদল মেয়ে সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে, প্রত্যেকেই এক-একটি করিয়া কুলা হাত দিয়া মাথার কাছে তুলিয়া ধীরে ধীরে নাড়িতেছে। কুলায় আছে মাড়ানো ফসল। ফসল পায়ের কাছে পড়িতেছে, খোসাগুলি উড়িয়া যাইতেছে। মেয়েগুলিও সমস্বরে গান ধরিয়াছে। একটি যুবক ফসলগুলি মেয়েদের পায়ের নিকট হইতে সরাইয়া এক জায়গায় জমা করিতেছিল, সে একটি যুবতীর পায়ের নিকট আসিয়া কি একটা রসিকতাই করিল বোধ হয়, মেয়েটি সকোপকটাক্ষে ভ্রূভঙ্গি করিয়া তাহাকে ছোট্ট একটি লাথি মারিল। সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। গরুগুলি দ্রুততর বেগে ছুটিয়া যেন এ আনন্দে যোগ দিল। শঙ্করের মনের মেঘও সহসা যেন কাটিয়া গেল। এত দুঃখেও ইহাদের প্রাণের উৎসব থামিয়া যায় নাই তো! খাইতে পায় না, পরিতে পায় না, ম্যালেরিয়ায় ভোগে, কলেরায় মরে, তবু এত আনন্দ! দুঃখে হাহাকার করে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া সুখের দিনে উৎসব করিতে ইহাদের বাধে না। কোনো 'পরব' বাদ দেয় না, একটা কিছু হইলেই হইল। উপার্জন করিয়া, ধার করিয়া, চুরি করিয়া, যেমন করিয়া হোক দলে দলে রঙিন কাপড় পরিয়া রাস্তায় বাহির হইবে—মিঠাই কিনিবে, পুতুল কিনিবে, নাচিবে, গাহিবে। সে মিঠাই, সে পুতুল, সে নাচ, সে গান হয়তো উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু তাহাতেই উহারা আনন্দে বিহ্বল। আমরা উহাদের ঠিক চিনি না, উহারাও আমাদের ঠিক চেনে না, মাঝখানে কি একটা যেন বাধা সৃষ্টি করিয়াছে! কি সেটা?... হঠাৎ অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনিয়া শঙ্কর পিছু ফিরিয়া চাহিল। একরাশ ধুলা উড়াইয়া নটবর ডাক্তার বিদ্যুৎবেগে চলিয়া গেলেন। মনে হইল, গ্রামের ভিতরই গেলেন। ওই মেয়েটাকেই দেখিতে গেলেন নাকি? শঙ্করও ফিরিল, সেই চৌকিদারের বাড়ির দিকেই আবার অগ্রসর হইতে লাগিল। গিয়া দেখিল, তাহার অনুমানই ঠিক। চৌকিদারের বাড়ির সামনের বেঁটে খেজুরগাছটায় নটবর ডাক্তারের ঘোড়া বাঁধা রহিয়াছে। আর একটু কাছে গিয়া শঙ্কর শুনিতে পাইল, নটবর তারস্বরে গালাগালি শুরু করিয়াছেন।

এত্‌না দের তক্ কেয়া করতা থা রে শালা সব? পুটুর পুটুর তাতে হ্যায়! আগিন্ বানাও জলদি—ফুকো জোরসে উল্লু কাঁহাকা। হট।

শঙ্কর দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। উঁকি দিয়া দেখিল, নটবর নিজেই উবু হইয়া বসিয়া একটা উনুনে ফুঁ দিতেছেন। তাঁহার বড় বড় লাল চোখ ধোঁয়ায় আরও লাল হইয়া উঠিয়াছে। খানিকক্ষণ ফুঁ দিয়া তিনি বলিলেন, ফুঁক আচ্ছা করকে এবং উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইতেই শঙ্করের সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল।

আরে, আপনাকেও ডেকে এনেছে নাকি ব্যাটা?

না, আমি এমনিই এসেছি।

চলুন, বাইরে চলুন, এখানে বড্ড ধোঁয়া। শালারা উনুনটা পর্যন্ত ভালো করে ধরিয়ে রাখে নি। অথচ ঘণ্টা দুই আগে আমাকে যখন ডাকতে গিয়েছিল, তখন পইপই করে বলে দিলাম, চরণ ডাক্তারকে খবর দিয়ে বিকেল নাগাদ আমি ঠিক পৌঁছব। তোরা উনুনে এক হাঁড়ি জল চড়িয়ে রাখ্‌গে যা, গরম জল চাই। কিচ্ছু করে নি শালা, কেবল ডাক্তার চেখে চেখে বেড়াচ্ছে, হেল্‌থ অফিসারটাকে পর্যন্ত ডেকে এনে দেখিয়েছে বলছে। আর যার যা খুশি ওষুধ ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে গেছে। এখন তুই শালা সামলা। আসুন, আপনার সঙ্গে একটা কথাও আছে। এ ব্যাটাদের শতরঞ্চি মাদুর কিচ্ছু নেই যে বিছিয়ে বসি, সব শুয়ে মুতে একশা হয়ে গেছে। আঃ! আসুন, এইখানেই বসা যাক।

বাড়ির সামনে গোটা কয়েক ইঁট পড়িয়া ছিল। একটা ইঁট শঙ্করের দিকে আগাইয়া দিয়া আর একটাতে নটবর উপবেশন করিলেন এবং হুকুম করিলেন, বেগ লে আও।

ত্রস্ত চৌকিদার তাড়াতাড়ি ঔষধের ব্যাগটি আনিয়া সম্মুখে রাখিল। নটবর ব্যাগ খুলিয়া কয়েকটা ইন্‌জেক্‌শনের ঔষধ বাহির করিয়া দেখিলেন, তাহার পর মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, এই মরেছে, কিছুই শালার মনে থাকে না, আঃ!

কি হল?

পি ডি-র পিটুইট্রিনটা আনতে ভুলেছি, অথচ ওটা দরকার এখুনি। যাই, টপ করে গিয়ে নিয়ে আসি। জলটা ততক্ষণ গরম হোক। আপনি বসবেন? আমি যাব আর আসব। ঘোড়ার পিঠে দুক্রোশ যেতে আর কতক্ষণ লাগবে! আপনার সঙ্গে দরকার ছিল একটু, হরিয়ার সেই ব্যাপারটা—আচ্ছা সে পরে হবে না হয়, ওষুধটা আগে দরকার, যাই।

এখানে আমাদের ডিস্‌পেন্সারিতে ওষুধটা কি পাওয়া যাবে না?

পাওয়া তো উচিত।—বলিয়াই মুচকি হাসিয়া নটবর বলিলেন, কিন্তু আমার নাম শুনলে আপনাদের ডাক্তার দেবে কি না সন্দেহ। সেদিন মদের ঝোঁকে লোকটাকে জুতো নিয়ে তাড়া করেছিলুম।

এক মুখ হাসিয়া নটবর শঙ্করের দিকে চাহিলেন।

কেন, কি হয়েছিল?

সেদিন এই পাশের গ্রামেই ভোজু গোয়ালার বাড়িতে রুগী দেখতে গেছি। গিয়ে শুনলাম, ভোজু ওঁকেও খবর দিয়েছে। বসে রইলাম ওঁর অপেক্ষায়। খানিকক্ষণ পরে উনি সুট চড়িয়ে গটমট করে এলেন, রুগী দেখলেন, আমার সঙ্গে একটা কথা পর্যন্ত কইলেন না। আমি নিজেই তখন উপযাচক হয়ে বললাম, পিঠের ডান দিকে নীচে 'ক্রিপিটেশান' আছে বলে মনে হচ্ছে, দেখেছেন সেটা কি? ব্যাটা বললে কি শুনবেন?

নটবরের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল।

কি?

বল্‌লে, কোয়াকের সঙ্গে আমি কন্‌সাল্ট করি না। শুনুন কথা একবার। বললাম, তবে রে শালা, তোর পাশের নিকুচি করেছে, বেরোও এখান থেকে। এ ভজুর বাড়ি নয়, আমার বাড়ি। আমিই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, এই ফী নাও, বেরোও এখান থেকে এখ্‌খুনি। তোমাদের নোট মুখস্থ করে চুরি করে ঘুষ দিয়ে পাশ করার যে মুরোদ কত, তা আমার জানা

আছে। তেল দিতে পারলে আমিও একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করতে পারতাম। নিকালো শালা—। টং টং করে দুটো টাকা ফেলে দিয়ে দূর করে দিলাম। শালা হেঁট হয়ে টাকা দুটো কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। চিকিৎসার 'চ' জানে না, এটিকেট মারাতে এসেছেন। খুব সম্ভব, চুরি করে পাশ করেছে ছোকরা।

নটবরের হস্তে নিজেদের ডাক্তারের এই লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া শঙ্কর আহত হইল।

বলিল, তা হতে পারে। কিন্তু তাঁকে এমনভাবে অপমান করাটা ঠিক হয় নি আপনার।

নিশ্চয় হয় নি। কিন্তু একটি বোতল 'খাঁটি' তখন আমার মগজে চড়ে আছে, বাজে 'ফরম্যালিটি' করতে দেবে কেন সে? সাদা চোখে একদিন অ্যাপলজি চেয়ে আসব ভেবেছি, কিন্তু ফুরসৎই পাচ্ছি না।

আকর্ণবিস্তৃত হাসি হাসিয়া নটবর শঙ্করের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শঙ্করও হাসিয়া ফেলিল ও উঠিয়া দাঁড়াইল।

কি ওষুধ বললেন? পিটুইট্রিন?

হ্যাঁ, পি. ডি.-র।

দেখি, যদি আনতে পারি!

আপনি গেলে তো 'বাপ বাপ' করে দেবে।

শঙ্কর চলিয়া গেল।

ডিস্‌পেন্সারি কাছেই, পাঁচ মিনিটের পথ। গিয়া দেখিল, ডাক্তার কম্পাউন্ডার কেহ নাই। কলেরার মরশুম, দুইজনই 'কলে' বাহির হইয়া গিয়াছেন। ড্রেসার ছিল। সৌভাগ্যক্রমে তাহার কাছে চাবিও ছিল। অনেকক্ষণ খুঁজিয়া সে ঔষধটি বাহির করিয়া দিল। শঙ্কর ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, উনুন ধরিয়া উঠিয়াছে, জলও গরম হইয়াছে, নটবর ডাক্তার নিজেই ছেলেটির হাতে পায়ে শেঁক দিতেছেন। ছেলেটি অনেকটা যেন চাঙ্গা হইয়াছে। নটবর ইন্‌জেক্‌শনটা দিলেন, ব্র্যান্ডি দিয়া এক দাগ ঔষধ স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইলেন। তাহার পর বলিলেন, এইবার স্যালাইনটার ব্যবস্থা করা যাক।

শঙ্কর বলিল, একবার দেওয়া হয়েছে শুনলাম।

আর একটু দেওয়া দরকার। আমি পেট ফুঁড়ে দেব! এঁদের ভয় হয়। কেউ বলেন, ইন্‌টেস্টাইন ছ্যাঁদা হয়ে যাবে; কেউ বলেন, পেরিটোনাইটিস হবে। আমি কিন্তু বহুৎ দিয়ে দেখেছি, কিছু হয় না, খুব ভালো ফল হয়। আর কত সহজে টপ টপ দেওয়া যায়। ব্যবস্থা করে ফেলা যাক। চরণ ডাক্তারের আশায় কতক্ষণ আর থাকি! তিনি তাঁর প্রত্যেক রুগীর প্রত্যেক কথার উত্তর দিয়ে প্রত্যেকের পথ্যের খুঁটিনাটি ব্যবস্থা করে সকলের সব রকম আবদার মিটিয়ে তবে আসবেন। আশ্চর্য লোক! অথচ ওঁকে ছাড়া আর কারুকে বিশ্বাস নেই আমার।

চরণ ডাক্তারকে এরাই ডেকেছে নাকি?

এরা ডাকবে কেন, আমিই ডেকেছি। দায় কি এদের? দায় এই শালার। চরণবাবু বোধ হয় ফি নিতে চাইবেন না, কিন্তু দিতে হবে কিছু। বলে রাখি। এই, শুনতা হ্যায়, চরণবাবুকো বোলায়েঁ হেঁ। আঠ রুপিয়া ফিস লাগে গা।

হুজুর মাই বাপ, জো বোলিয়ে।

নটবর মুখ ভ্যাঙাইয়া বলিলেন, জো বোলিয়ে! জো বোলিয়ে কি রে! রুপিয়া হ্যায়?

ছেলের মা অশ্রু মুছিয়া সজলকণ্ঠে বলিল, থালি লোটা বন্ধক দে করি-কে রুপিয়া আনব বাবু, বেটাকে মেরা বচাই দে—

এই গাইতে শুরু করেছে!—তাহার পর শঙ্করের দিকে চাহিয়া বলিলেন, যা দেখছি, শেষকালে I shall have to pay from my own pocket—এই ব্যাটারাই ফতুর করবে আমাকে। মেথরপাড়ায় এক মিশনারি সায়েব সেবা করে বেড়াচ্ছে দেখলাম, তাকেও কতকগুলো কাজ করে দিয়ে আসতে হল। চাইলে, 'না' বলতে পারলাম না। আর সত্যিই কাজ করছে লোকটা।

মেথরপাড়াতেও কলেরা হয়েছে নাকি?

চারটে মরেছে, দশটা শুষছে।

তাহলে আমার তো একবার যাওয়া দরকার সেখানে।

নিশ্চয়। যান। যদি পারেন, কিছু সাহায্যও করুন। হ্যাঁ, আপনাকে সেই কথাটা বলে নিই। হরিয়ার নামে শুনলাম উৎপলবাবু নালিশ করেছেন। দারোগাও তার নামে বি. এল. কেস আগেই দায়ের করেছে। আমি কিন্তু বলে রাখছি, হরিয়ার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবেন না আপনারা। তার বিরুদ্ধে একটি সাক্ষীও পাবেন না। মিছিমিছি অপ্রস্তুত হবেন শুধু। হরিয়া, বিষুণ, কারু, ফরিদ—সক্কলের হয়ে লড়ব আমি। এ জেলার সেরা উকিলরা বিনা পয়সায় আমার হয়ে খেটে দিয়ে যাবে। উৎপলবাবুকে বলে দেবেন কথাটা। তিনি সেদিন আমার সঙ্গে দেখা করলেন না, কিন্তু একদিন তাঁকে এই শর্মার কাছে আসতে হবে, তা বলে দিচ্ছি। তাঁকে বলে দেবেন, শুধু যে সাক্ষী পাবেন না তা নয়, ধোপা পাবেন না, নাপিত পাবেন না, গোয়ালা পাবেন না, কিচ্ছু পাবেন না। এই গরিবরাই আপনাদের হাত পা, এদের পীড়ন করে কোনো সুখ পাবেন না আপনারা। এ কলকাতা নয়, মফস্বল। এখানে পয়সা ফেললেই সব জিনিস পাওয়া যায় না। এদের কাছে হুকুম হাকিম নয়, ভালোবাসাই হাকিম। এই অসহায় দরিদ্রদের পীড়ন করতে ইচ্ছেও হয় আপনাদের? আশ্চর্য!

শঙ্কর একটু যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল।

আমি তো কিছুই করিনি। উৎপল করেছে। পলাশপুর থেকে আসার পর তার সঙ্গে দেখাও হয়নি আমার। কলেরা নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছি চারদিকে। তাকে বলব আপনার কথা।

বলবেন।

নটবর স্যালাইন দিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। শঙ্কর বাহির হইয়া চলিতে শুরু করিল। পলাশপুর হইতে আসিয়া সত্যই সে উৎপলের সহিত দেখা করে নাই। কলেরার অজুহাত পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গিয়াছিল। সুরমার সান্নিধ্য সে এড়াইয়া চলিতেছিল। ও ফাঁদে সে আর পা দিবে না। ফাঁদটা যে তাহার মনেই, এ খেয়াল তাহার ছিল ন। নিপুদাকে, প্রমথ ডাক্তারকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, এতগুলো গরিব লোকের নামে নালিশ করা হইয়াছে, রাজীব দত্তের গোলাবাড়িতে আগুন দেওয়া হইয়াছে, দুষ্ট দমনের এত আয়োজন উৎপল সাড়ম্বরে করিয়াছে, তাহার সহিত দেখা হইলেই নিশ্চয় সোৎসাহে সে এই সব কথা আলোচনা করিবে। শঙ্করকে চুপ করিয়া সব শুনিতে হইবে। প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই। উৎপল তাহার উপরই সব ভার দিতে চাহিয়াছিল, সে লয় নাই, লইতে পারে নাই, সমস্যার সমাধান করিবার কোনো সদুপায় তাহার মাথায় আসে নাই; সুরমার প্ররোচনায় প্রতিবাদ

করিবার শক্তি পর্যন্ত হারাইয়া উৎপলের কথাতেই অবশেষে সায় দিয়া সামান্য একটা ছুতোয় ভীরুর মত সে পলাশপুরে পলাইয়া গিয়াছিল।

মেথরপাড়ায় গিয়া সে দেখিল, মিশনারি সাহেব মলমূত্রসিক্ত কতকগুলি কাপড় জামা বাঁখারি করিয়া তুলিয়া প্রকাণ্ড একটি গামলায় ফেলিতেছেন। গামলায় ফিনাইল-মেশানো সাদা জল রহিয়াছে। সারি সারি অনেকগুলি গামলা। সাহেবের সঙ্গে শঙ্করের আলাপ ছিল।

গুড আফটারনুন মিস্টার রয়।—তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, ডিসইনফেকটিং সয়েলড ক্লোদজ।

শঙ্কর প্রত্যভিবাদন করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব বাংলাও জানেন। বলিলেন, আপনিও সেবাকার্য করছেন।

শঙ্কর ঘাড় নাড়িল।

উত্তম, খুব উত্তম। আমি আপনার সাহায্য পাইতে পারি কি?

নিশ্চয়, কি করতে হবে বলুন?

আসুন।

সাহেবের পিছু পিছু শঙ্কর ছোট একটা কুঁড়ে ঘরে প্রবেশ করিল। ভিতরে এত অন্ধকার যে, সে প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইল না, কিছু শুনিতেও পাইল না। মৃত্যুর স্তব্ধতায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন যেন। একটা নিদারুণ দুর্গন্ধ কেবল তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। সহসা সাহেব টর্চ জ্বালিলেন। তীব্র আলোকে প্রথমেই চোখে পড়িল, ঘরের এক কোণে গোটা দুই প্রকাণ্ড শূকর বাঁধা রহিয়াছে। তাহার পর দেখিতে পাইল, আর একধারে সারি সারি তিনজন শুইয়া আছে। দুইজনের মুখ ঢাকা, একজনের মুখ খোলা। যাহার মুখ খোলা, মনে হইল, সে যেন দুই চোখে কালো কালো ঠুলি পরিয়া আছে। সাহেব পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখের ওপর নাড়িতেই ভনভন করিয়া অসংখ্য মাছি উড়িয়া গেল। চক্ষুকোটর বাহির হইযা পড়িল। চক্ষু দেখা যায় না, খালি কোটর। ঠুলি নয়, মাছির স্তূপ। হাত নাড়িয়া তাড়াইবার সামর্থ্য নাই।

সাহেব ঝুঁকিয়া নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, নাড়ী নাই, তবু এ বোধ হয় বাঁচিয়া আছে। এ লোকটাকে আমি হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছি। আপনি যদি এ দুজনের ক্রিমেশনের ব্যবস্থা করেন, বড় ভালো হয়।

শঙ্করের মুখে কথা সরিতেছিল না।

বাক্যস্ফূর্তি হইলে দুইটি মাত্র কথা সে বলিল, এ কি?

সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন, এই আপনার দেশ। Your country lives in huts, not in palaces,— lives like this and dies like this—

শঙ্করের আত্মসম্মানে কেমন যেন আঘাত লাগিল। বলিয়া ফেলিল, I have read about Black Plague of your country too.

No offence please—চলুন, কাজ করা যাক। Let us be up and doing.

সাহেব বাহিরে আসিয়া ডিসইন্‌ফেকটিং-এ মন দিলেন।

শঙ্কর অকূল পাথারে পড়িল। একটি লোক নাই, কি করিয়া মড়া পোড়াইবার ব্যবস্থা করিবে সে? এ পাড়ার সকলে পলাইয়াছে। অন্য কোনোও জাত মেথরের মড়া স্পর্শ করিবে না। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া সে একটি মাত্র লোকের নাগাল পাইল। ফুলশরিয়ারই শরণাপন্ন হইল। সে যদি কোনো লোক

জোগাড় করিয়া দিতে পারে। ফুলশরিয়ার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। শঙ্করবাবু তাহাকে ডাকিয়া কাজের ভার দিতেছেন। জরুর সে 'কোসিস' করিবে। মেথরদের উদ্দেশ্যে অকথ্য গালি বর্ষণ করিতে করিতে সে বাহির হইয়া গেল। শঙ্কর আবার মেথরপাড়ায় ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া দেখিল, সাহেব তাঁহার 'ডিসইনফেক্‌টিং' শেষ করিয়াছেন।

লোক পেলেন?

ডাকতে পাঠিয়েছি।

সাহেবের চক্ষু দুইটি হাস্য-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। মিটিমিটি করিয়া শঙ্করের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, পাওয়া শক্ত। কেউ আসবে না। এ দেশের লোককে আমি চিনি।

সত্য কথাটা শুনিয়া শঙ্করের লজ্জা হইল। হঠাৎ রাগও হইল। আশ্চর্য স্পর্ধা এই বিদেশিটার! আমাদেরই অর্থে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া, আমাদের দেশের মাটিতেই দাঁড়াইয়া, আমাদেরই নিন্দা করিতেছে! আমাদের উপকার করিবার জন্য কে উহাকে পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছিল? উত্তরে একটা রূঢ় কথা বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, তাহার অবস্থাও কি অনুরূপ নয়? তাহাকে কে পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছিল এখানে আসিতে? সাহেব কিছু না বলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেলেন এবং অবলীলাক্রমে মুমূর্ষু কলেরা রোগীটাকে কাঁধে তুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

আমি হস্‌পিটালে চলি। আপনি অপেক্ষা করুন। শীঘ্র কেহ আসিবে না। জানোয়ার সব—

বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সাহেব চলিয়া গেলেন।

যতক্ষণ দেখা গেল, শঙ্কর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল। ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। স্কুলের স্পোর্টসে একবার সে ফার্স্ট হইতে পারে নাই। তাহার অপেক্ষা বলিষ্ঠতর আর একজনের নিকট সে হারিয়া গিয়াছিল। পুরস্কার-বিতরণ-সভায় সেই ছেলেটা যখন 'কাপ' লইয়া চলিয়া গেল, তখন তাহার যাহা মনে হইয়াছিল, এই সাহেবকে দেখিয়া ঠিক তাহাই মনে হইল। সাহেবের মহত্ত্বে সে যতটা প্রীত হইয়াছিল, তাহার ওই 'জানোয়ার' কথাটায় ঠিক ততটা বিরক্ত হইল সে। তাহার সর্বাঙ্গ জ্বালা করিতে লাগিল যেন। মনে হইতে লাগিল, এই যে ইহারা আমাদের সকলকে অশিক্ষিত বর্বর মনে করিয়া অনুকম্পাভরে অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার মূলে কি আছে? নিছক মানবপ্রেম? স্বার্থ নয়? ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা পর্যন্ত স্বদেশবাসীকে হীনচক্ষে দেখিতে শিখিয়াছি। আমাদের কবিও গাহিয়া গিয়াছেন—'এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা।' কাহার ভাষা? সত্যই কি আমরা মূঢ়, সত্যই কি আমরা মূক, সত্যই কি আমরা ম্লান? সত্যই কি আমাদের নিজের কোনো বুদ্ধি নাই, সৌন্দর্য নাই, ভাষা নাই? যে বিদেশি মানদণ্ডের মাপে এসব কথা বলিতে শিখিয়াছি, সেই মানদণ্ডটাই কি নিখুঁত? উহাদের চোখ দিয়া দেখিলে আমাদের হয়তো ম্লান দেখায়, উহাদের কান দিয়া শুনিলে আমাদের প্রাণের ভাষা হয়তো শোনা যায় না, কিন্তু উহাদের বিচারটাই কি শেষ বিচার? কলেরায় দলে দলে লোক মরিতেছে, দলে দলে লোক পলাইতেছে, ইহা লইয়া ঠাট্টা করিবার কি আছে? উহাদের দেশে পলায় না? নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখে কে স্থির হইয়া থাকিতে পারে? পলাইয়াছে তো হইয়াছে কি? উহারা যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায় না? প্রাণের ভয় কাহার নাই? ও দেশের গরিবদের কথা কে না জানে? ও দেশের 'স্লাম'বাসীদের তুলনায় আমাদের দেশের গরিব লোকেরা তো দেবতা। উহাদের সাহিত্যে স্লামের যে পাশবিক ছবি আমরা পাই তাহা বীভৎস, এ দেশে ও-ছবি কল্পনাও করা যায় না। আমাদের অনেক দোষ আছে—আমরা রুগ্ন, আমরা অশিক্ষিত, আমরা অসহায়;

কিন্তু এ সবের মূল কারণ কি পরাধীনতা নয়? নিরীহ হরিণ বিরাট একটা পাইথনের কবলে পড়িয়া নানারূপ অশোভন ভঙ্গিতে ছটফট করিতেছে। এই অশোভনতা যদি দোষ হয়, তাহা হইলে আমরা দুষ্ট। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তাহার মনের গ্লানি অনেকটা যেন কমিয়া গেল। কিন্তু তাহা বেশিক্ষণ স্থায়ী হইবার অবসর পাইল না। ফুলশরিয়া আসিয়া হাজির হইল। বলিল যে, ভদু ও যোগীয়ার সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল, কয়েকদিন আগে তাহাদের দুইজনেরই ছেলে-বউ মরিয়াছে। এখন তাহারা কালালিতে বসিয়া মদ খাইতেছে। মড়া ফেলিবার কথা বলায় হা-হা করিয়া হাসিয়া অশ্লীল ভাষায় তাহাকে গালাগালি দিল। বাবু নিজে যদি গিয়া ছোঁড়া-পুতাদের কান ধরিয়া টানিয়া আনেন, তবে ঠিক হয়।

শঙ্কর বলিল, দুটো ছোট খাটিয়া জোগাড় করতে পারিস?

হাঁ। উ আর কি ভারী বাত ছে।

তাই আন তা হলে। তোর আপত্তি আছে ছুঁতে? যদি না থাকে, তা হলে তুই আর আমি একে একে এদের নিয়ে যাই, চল।

ফুলশরিয়া শিহরিয়া উঠিল।

উ বাবু হম নেই সেকবো।

শঙ্কর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সেদিন গভীর রাত্রে শঙ্কর যখন বাড়ি ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি দুইটা। সমস্ত দেহ মন অবসন্ন। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। সে কাহাকেও উঠাইল না। উঠাইবার প্রবৃত্তিও হইল না। বাহিরের ঘরে তাহার এক প্রস্থ বিছানা পাতাই থাকিত। বাহিরের ঘরের চাবিও তাহার কাছে ছিল, বাহিরের ঘরেই সে শুইয়া পড়িল। সাহেবের কথাগুলি তখনও তাহার কানে বাজিতেছিল—Your country lives in huts, not in palaces--lives like this and dies like this. তাহার ঘুম আসিল না। খানিকক্ষণ পরে সে উঠিয়া বসিল, আলো জ্বালিয়া লিখিতে শুরু করিয়া দিল।

'যেমন করিয়া হোক ইহাদের আমি উদ্ধার করিব, তাহা করিতে গিয়া যদি আমার ধনপ্রাণ সর্বস্ব যায়, তবু আমি নিরস্ত হইব না।...'

হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে একটা শব্দ হইল। চাহিয়া দেখিল, বারান্দায় একটা ছায়ামূর্তির মত কে যেন দাঁড়াইয়া আছে।

কে?

ছায়ামূর্তি আগাইয়া আসিল। কি চাই এত রাত্রে?

কম্পিতকণ্ঠে ফুলশরিয়া বলিল, কুছু নেই।

শঙ্কর উঠিয়া দ্বারের কাছে আসিতেই ফুলশরিয়া হঠাৎ আগাইয়া আসিল এবং তাহার পায়ের কাছে উপুড় হইয়া প্রণাম করিল।

এ কি!

ফুলশরিয়া কিছুতেই পা ছাড়ে না। কি হইল? কাঁদিতেছে কেন? জোর করিয়া পা সরাইয়া লইতেই ফুলশরিয়া উঠিয়া বসিল এবং আঁচলে চোখ মুছিয়া বারান্দা হইতে নামিয়া গেল। একটি কথাও বলিল না। নিজের অদ্ভুত আচরণে নিজেই সে লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু না আসিয়া সে কিছুতেই পারে নাই। কিছুতেই তাহার চোখে ঘুম আসিতেছিল না। অনেকক্ষণ হইতেই সে শঙ্করের বাড়ির

আনাচে-কানাচে ঘুরিতেছিল। মেথরের মড়া বাবু নিজে কাঁধে করিয়া বহিয়া লইয়া গেলেন! এ কি মানুষে পারে? এ লোককে প্রণাম না করিয়া থাকা যায়?

শঙ্কর অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পরদিন সকালে খোঁজ করিয়া শুনিল, ফুলশরিয়া বাড়িতে নাই। হাতে কোনো কাজ ছিল না, মনে হইল, উৎপলের কাছে একবার যাওয়া যাক। তাহার সহিত দেখা না করাটা অশোভন হইতেছে। সুরমা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলে তবে যাইবে, এ কি তাহার পাগলামি! সেখানেও গিয়া দেখিল, কেহ নাই। দারোয়ান বলিল, বাবু এবং মাইজি একটা জরুরি তার পাইয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। কবে ফিরিবেন বলিয়া যান নাই।

।। ছেচল্লিশ ।।

পরদিন একজন পাচক সমভিব্যাহারে শিরীষবাবু আসিয়া পড়িলেন এবং শুধু অমিয়াকে নয়, শঙ্করকেও লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অমিয়া বলিল, আমি যাই কি করে, বল? হাসিদি তাঁর ছেলেকে আমার কাছে রেখে গেছেন। কার কাছে রেখে যাই একে?

চিবুকের তলাটা চুলকাইতে চুলকাইতে শিরীষবাবু বলিলেন, রেখে যাবি কেন? ও চলুক আমাদের সঙ্গে।

বাঃ, হাসিদি ফিরে এসে যদি ছেলে খোঁজেন?

শঙ্কর বলিল, তার ফিরতে এখন দেরি আছে। তুমি নিয়ে যেতে পার ওকে।

অমিয়া বলিল, তা ছাড়া বাড়িতে এতগুলি পোষ্য, তাদের দেখে কে?

ইহার জন্য শিরীষবাবু প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন। সেই জন্যই তো রাঁধুনী বামুনটাকে সঙ্গে এনেছি, ও স্বচ্ছন্দে সব চালিয়ে দিতে পারবে। শঙ্করও আমাদের সঙ্গে চলুক। চারিদিকে কলেরা হচ্ছে, এখন এখানে থাকা ঠিক নয়।

শঙ্কর বলিল, কলেরা হচ্ছে বলেই আরও আমাকে থাকতে হবে।

শিরীষবাবু জামাতার দিকে আড়চোখে একবার চাহিয়া আবার চিবুক চুলকাইতে শুরু করিলেন।

অমিয়া বলিল, যাই, বাবার চা-টা নিয়ে আসি। তুমিও খাবে নাকি আর এক কাপ?

আন।

শিরীষবাবু সোৎসাহে বলিলেন, খাবে বই কি। আন্।

অমিয়া চলিয়া গেল।

শ্বশুর ও জামাতার মধ্যে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনাইয়া উঠিতেছিল। মুশাই আসিয়া ডাকের চিঠি দিয়া গেল।

ডাক এল নাকি?

হ্যাঁ।

শঙ্কর খামখানা খুলিয়া দেখিল, উৎপলের চিঠি।

উৎপল লিখিয়াছে—

ভাই শঙ্কর,

চিঠি পড়িবার আগেই একটা কথা বিশ্বাস করতে অনুরোধ করি। যা করেছি, তার প্রেরণা মানবসুলভ কৌতূহল, অন্য কিছু নয়। লোভটা সামলাতে পারা গেল না। শুধু তাই নয়, সামলানো উচিত বলেও মনে হল না। আগে তোমাদের কাউকে কিছু বলিনি, কারণ বললেই তোমরা বাগড়া দিতে। সুরমা এখনও দেবার চেষ্টা করছে, যদিও এখন আর ফেরবার পথ নেই, সই করে দিয়েছি। অর্থাৎ, ইন ব্রিফ, কিংগ্‌স কমিশন পেয়ে যুদ্ধে যাচ্ছি। আগে থাকতেই গোপনে গোপনে চেষ্টা করছিলাম, লেগে গেছে। মানব-মনীষার এই নবতম বহ্যুৎসবটা স্বচক্ষে দেখবার কি যে আগ্রহ হচ্ছে আমার, তা তোমাদের বোঝাতে চেষ্টা করব না;কারণ তোমরা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির লোক, তোমাদের ধরনধারণ সবই স্বতন্ত্র। যাক সে কথা। এখন যে-কোনো মুহূর্তেই উড়ব এবং চীন না কায়রো কোথায় গিয়ে যে হাজির হব, তা জানি না। যতদিন না ফিরি, সুরমা তার বাবার কাছে বম্বেতে থাকবে। তোমার সঙ্গে দেখা হল না, তাই চিঠিতেই গোটাকতক কাজের কথা বলে যাচ্ছি, অবধান কর। আগে যেমন ছিলে, এখনও তেমনই তুমি জমিদারির সর্বময় কর্তা রইলে। তোমাকে সম্পূর্ণ ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে গেলাম অর্থাৎ আমার অবর্তমানে তুমি যা করবে, তাতে আমার অগ্রিম সম্মতি রইল এবং আইনত সেটা পাকা করবার জন্যে আমার উকিলকেও অনুরূপ নির্দেশ দিয়ে গেলাম। আর আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। শুধু একটা কথা। দেশোদ্ধারের যে এক্সপেরিমেন্টটা আমরা শুরু করেছিলাম, তাতে যে খুব সুবিধে হয়নি, এতদিনে তুমি সেটা বুঝেছ নিশ্চয়। অন্য একটা লাইন ধরলে কেমন হয়? অবশ্য কি লাইন ধরলে যে ভালো হবে, সেটা তুমিই ভেবে-চিন্তে ঠিক করো।

মণির ব্যাপারে আমি যে বিকট কাণ্ড করে এসেছি, তার ফল কি হল? আমরা পদ্ধতি উল্টে দিয়ে নতুন কোনো উপায়ে তুমি যদি সমস্যাটার সমাধান করতে পার, করো, আমার কিছু আপত্তি নেই। বিবেকদংশনে ক্ষত-বিক্ষত হবার দরকার কি! যাদের ক্ষতি হয়েছে, যদি ভালো মনে কর, তাদের ক্ষতিপূরণও করে দিতে পার।

তোমার নিপুদার সঙ্গে এখানে দেখা হয়েছিল। রিক্রুটিং আপিসে দেখি, তিনি ওয়ারে নাম লেখাবার জন্যে এসেছেন। নেহাত পেটের দায়েই এসেছিলেন বলে মনে হল, যদিও অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট নানারকম বুক্‌নি ঝাড়লেন। এ কথা মনে হবার কারণ, যেই তাঁকে বললাম—আপনি যদি চান সিভিল লাইনেই ভালো একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারি আপনার, অমনই তিনি রাজি হয়ে গেলেন। ভালো একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়েছি তাঁর। তিনি একটি অনুরোধ করেছেন, জমিদারি আমরা যদি বিক্রি করি, মুকুন্দ পোদ্দার বা রাজীব দত্তকে যেন না দিই। এ অনুরোধের অর্থ কিছু বুঝলাম না। জমিদারি আমর' বিক্রি করব, এ গুজব উঠল কি করে? কেনারামও একদিন বলছিল এ কথা। হ্যাঁ, আর একটা কথা। ওই কেনারামটিকে সাবধান। বড় গভীর জলের মাছ উনি। আমাকে জানিয়ে গেছেন, ব্যাঙ্কে দশ হাজার টাকা লোকসান হয়েছে, অর্থাৎ, তাঁর ইচ্ছেটা এই নিয়ে তোমার সঙ্গে একটা মনোমালিন্য করি। আমি যে গভীরতর জলের জীব, এ খবর উনি জানেন না বলেই এ চেষ্টা করেছিলেন। পারতপক্ষে ওঁর সংস্পর্শ পরিহার করো। আমার মতে লোকসান-টোকসান যা হয়েছে, তা 'রাইট অফ' করে দিয়ে ব্যাঙ্কটা তুলে দাও। ধার হিসেবে না দিয়ে বছরে বছরে গরিব প্রজাদের যা পার, দানই করো বরং কিছু কিছু। সব দিক থেকে নিরাপদ সেটা, দেখতে শুনতেও ভালো।

আর বিশেষ কিছু লেখবার নাই। চুম্বন গ্রহণ কর।

সুরমা খুব হাসিমুখে থাকবার চেষ্টা করছে, কিন্তু ওর ভেতরটা যে টনটন করছে, তা ঠিক ঢাকতে পারছে না, বোঝা যাচ্ছে একটু একটু। তবে সেটা আমার জন্যে, না তোমার বিরহে, তা বুঝতে পারছি না ঠিক।

ইতি—
উৎপল

অমিয়া চা লইয়া প্রবেশ করিল।

কার চিঠি?

উৎপলের।

ডাকে আসবার মানে?

ওরা এখানে নেই। উৎপল যুদ্ধে যাচ্ছে।

আর সুরমা?

সে বম্বে যাবে।

বাহির হইতে কে ডাকিল, শঙ্করদা!

শঙ্কর বাহিরে গিয়া দেখিল, নিমাই ঘটক দাঁড়াইয়া আছে।

কি খবর?

আমাদের গ্রামেও কলেরা লেগেছে।

চৌধুরী মশাইকে খবর দাও তা হলে। আমাকে আজ কলকাতা যেতে হচ্ছে।

ও। কলকাতায় কোথায় উঠবেন?

সপরিবারে যাচ্ছি যখন, ক্যালকাটা হোটেলেই উঠব। তেমন দরকার যদি বোঝ, খবর দিও।

আচ্ছা।

নিমাই ঘটক চলিয়া গেল।

সুরমা এখানে নাই এবং কিছুদিন এখন থাকিবে না—এই বার্তা শুনিয়া অমিয়া আর বাপের বাড়ি যাইতে আপত্তি করিল না।

শঙ্করও বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, চল, আমিও তোমাদের সঙ্গে কলকাতা পর্যন্ত যাই। উৎপলের সঙ্গে দেখা করা দরকার একটু।

শিরীষবাবু সোৎসাহে বলিলেন, বেশ তো, বেশ তো।

।। সাতচল্লিশ ।।

অমিয়াকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া শঙ্কর গড়ের মাঠে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। কাহারও সঙ্গ তাহার ভালো লাগিতেছিল না। নির্জনে নিজের সঙ্গে সে বোঝা-পড়া করিতে চায়। উৎপল সুরমা কাহারও সহিত তাহার দেখা হয় নাই। বিমর্ষচিত্তে সে বারংবার আবৃত্তি করিতেছিল, ভালোই হইয়াছে, ভালোই হইয়াছে। আত্মগ্লানিতে সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। গ্রামে সকলে যখন কলেরায় মরিতেছে, তখন সে তাহাদের ফেলিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিল কেন? এই না সেদিন উচ্ছ্বাসভরে লিখিতেছিল, 'আমি যেমন করিয়া হউক উহাদের উদ্ধার করিব।' এই কি উদ্ধার করিবার নমুনা! কেন

আসিল সে? অমিয়ার জন্য সে আসে নাই, শ্বশুরের অনুরোধেও নয়, এমন কি উৎপলের সহিত দেখা করিবারও একটা বিশেষ আগ্রহ জাগে নাই তাহার, সে আসিয়াছিল সুরমার জন্য। নির্জনে এই রূঢ় সত্যটার সম্মুখীন হইয়া সে যেন মরমে মরিয়া গেল। ছি ছি, কেন এই হীন লোলুপতা! আত্মসম্বরণ করিবার জন্য সামান্য এ শক্তিটুকু যাহার নাই, সে করিবে পতিতোদ্ধার! চরিত্রের কোন্ সম্পদ আছে তাহার! বেশ স্বচ্ছন্দেই তো সে হাসির টাকাটা দিয়া নিজের ঋণপরিশোধের কল্পনা করিয়াছিল! অতি সহজেই তো রাজীব দত্তকে স্পষ্ট মিথ্যা কথাটা বলিয়া আসিল, আমি ওসবের মধ্যে ছিলাম না। পরোপকার করিবার ছুতায় সে এতদিন আত্মবিনোদন ছাড়া আর কি করিয়াছে? কেবল কর্তৃত্ব করিয়াছে সকলের ওপর। যে তাহার অহংকে তুষ্ট করিতে পারিয়াছে, তাহাকে অনুগ্রহ করিয়াছে; যে পারে নাই, তাহাকে নির্যাতন না করিলেও অনুকম্পা করিয়াছে। পরের অর্থে নিজের অহঙ্কারকে পরিতুষ্ট করিতে করিতেই তো জীবন কাটিল। গৌরব করিবার মত তাহার নিজের কি আছে? কিছুই নাই।... নিঃস্ব ভিখারির মত অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল সে। সহসা মনে পড়িল, শাস্ত্রে বলিয়াছে—আত্মানং বিদ্ধি। নিজেকে জান। নিজেকে? অন্তরের দিকে চাহিয়া দেখিল, অন্ধকার গুহায় লুব্ধ পশুটা বসিয়া আছে—কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যের মূর্ত প্রতিচ্ছবিটা। শিহরিয়া উঠিল। ওই কদাকার পশুটাই আমি? আর কিছু নাই? মিথ্যা কথা। আমার অন্তরে এত স্বপ্ন, পশু কি কখনও স্বপ্ন দেখে? পশুর অন্তরে কি উচ্চাশা জাগে? আমার অহঙ্কার অসংযম অপৌরুষ অসন্তোষ অক্ষমতা সত্ত্বেও আমার যে কল্পনা আদর্শলোকে উত্তীর্ণ হইতে চাহিতেছে তাহা কি পশুর কল্পনা? এতদিনের এত শ্রম এত সাধনা সব পণ্ড হইয়া যাইবে, পশুটারই জয় হইবে শেষে? সহসা তাহার হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল, শিরায় শিরায় রক্তস্রোত দ্রুততর বেগে বহিতে লাগিল, চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, অন্তরের ভাষা মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, কিছুতেই না, পশুটাকে আমি জয় করিবই। পরক্ষণেই মনে হইল, কিরূপে? অন্ধকার অন্তরলোকে তাহার ব্যাকুল মন কেবলই প্রশ্ন করিয়া ফিরিতে লাগিল, কিরূপে? কিরূপে? অন্ধকারের ভিতর হইতেই উত্তর আসিল, বিলাস বর্জন করিয়া কাজ কর। ভোগের শিখরে বসিয়া এতদিন কাজ করিবার অভিনয় করিয়াছ মাত্র, তোমার অন্ন অপরে উৎপাদন করিয়াছে, তোমার বস্ত্র অপরে বয়ন করিয়াছে, তুমি কেবল সাড়ম্বরে আস্ফালন করিয়াছ, আর কিছুই কর নাই। সমস্ত অভিমান বিসর্জন দিয়া এইবার কাজে লাগ। কাজ করিলেই চিত্ত শুদ্ধ হইবে। অপরকে ভালো করিবার দায়িত্ব তোমার নহে, কায়মনোবাক্যে নিজে তুমি ভালো হও। নিজে যদি ভালো হইতে পার, তোমার সংস্পর্শে যাহারা আসিবে, তাহারাও ভালো হইবে। মুখের উপদেশ দিয়া নয়, নিজের পবিত্র জীবন দিয়া সকলকে উদ্বুদ্ধ কর। অন্য কোনো পথ নাই। নিজের বিবেকের চক্ষে নিজেকে যদি নিষ্কলুষ করিয়া তুলিতে পার, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। তাহাই তোমার সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ

এই কর্তব্যই পালন করিবে সে। এবার ফিরিয়া গিয়া জমিদারির সর্বময় কর্তা আর সে হইবে না। উৎপলের জমিদারির ভার লইবে উৎপলের প্রজারাই। তাহারাই নিজেদের মধ্যে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া শাসন-পরিষদ গড়িবে, নিজেদের হিতাহিতচিন্তা নিজেরাই করিবে। তাহাকে যদি নির্বাচন করে, ভৃত্যের মত সেবা করিবে সে। তাহার বেশি আর কিছু নয়। নিজে সে কৃষকজীবন যাপন করিবে। ফরিদ, কারু, বিষুণদের দলে মিশিয়া ঠিক উহাদেরই মত বাস করিবে। উহাদেরই মত নিজের হাতে চাষ করিয়া স্বোপার্জিত অন্ন স্বহস্তে পাক করিয়া খাইবে। বাবু আর সে থাকিবে না। মুশাইয়ের বাড়ির

পাশে ছোট একখানি কুঁড়েঘর বাঁধিবে...কল্পনার ডানায় উড়িয়া উড়িয়া মন তাহার স্বপ্ন-রচনা করিতে লাগিল। আচ্ছন্নের মত সে বসিয়া রহিল। কখন যে তাহার চোখ বুজিয়া আসিয়াছিল, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। কতক্ষণ চোখ বুজিয়া ছিল, তাহাও সে জানে না।

অনেকক্ষণ পরে যখন চোখ খুলিল, তখন মনের সমস্ত গ্লানি কাটিয়া গিয়াছে। অদ্ভুত একটা প্রেরণায় সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ।

হোটেলে ফিরিয়া দেখিল, নিমাই ঘটক তাহার অপেক্ষায় হোটেলের সামনে ফুটপাথে দাঁড়াইয়া আছে।

নিমাই যে, কি খবর?

বড় দুঃসংবাদ। হরিদা কলেরায় মারা গেছেন, আর কুন্তলাদি সহমৃতা হয়েছেন তাঁর সঙ্গে।

সে কি!

হ্যাঁ। প্রমথ ডাক্তার চলে যাওয়ার পর থেকে গ্রামে তো আর ডাক্তার নেই। আপনি যেদিন আসেন, সেইদিনই সন্ধেবেলা হরিদার কলেরা হয়, পাড়ার কে যেন হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়েছিল, কিছু হয়নি। কেউ কিছু জানে না। ভোরে ঝক্‌সু দেখতে পেলে, বাড়ির ভিতর থেকে ধোঁয়া আর গন্ধ বেরুচ্ছে। ডাকাডাকি করা হল, কোনো সাড়া নেই। কপাট ভেঙে ঢুকে দেখা গেল, উঠোনে চিতা জ্বলছে। তেল আর ঘিয়ের খালি টিন পড়ে রয়েছে। বাড়ির যত কাঠ কাপড়-চোপড় ছিল, তাই দিয়ে চৌকির ওপর চিতা সাজিয়েছেন কুন্তলাদি, আর তাইতেই পুড়েছেন স্বামীর সঙ্গে, 'টুঁ' শব্দটি পর্যন্ত করেননি, কেউ জানতে পারেনি।

শঙ্কর নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পুলিস এ নিয়ে গোলমাল করছে, আপনার একবার যাওয়া দরকার।

নিশ্চয়। চল।—বলিয়াই সে চলিতে শুরু করিল।

এখন তো ট্রেন নেই।

এ কথা শঙ্কর শুনিতে পাইল কি না বোঝা গেল না।

সে দ্রুতবেগে চলিতেই লাগিল।

রূপকথা এবং তারপর

"আকাশচুম্বী পর্বতশৃঙ্গের দিকে চেয়ে নির্নিমেষে দাঁড়িয়েছিল কালো মেয়েটি। তার পরনের বসন ছিন্নভিন্ন, কেশ আলুলায়িত, মুখ ক্ষতবিক্ষত। মেয়েটি কালো বটে কিন্তু অপরূপ সুন্দরী।

মেয়েটি সবিস্ময়ে ভাবছিল—পৃথিবীর খানিকটা এমনভাবে আকাশের দিকে পালিয়ে গেছে কেন? ওকেও কি কেউ ধর্ষণ করতে গিয়েছিল? আমিও কি ওখানে যেতে পারি না? সহসা একটি রূপবান যুবক এবং রূপসী যুবতী আবির্ভূত হল তার সামনে। যুবকটির স্কন্ধে একটি সুদৃশ্য তূণীর, হস্তে ফুলধনু। মুখে স্মিত হাস্য। যুবকটি অভিবাদন করে বলল, "অয়ি পলাতকা, জীবন-ধর্ম থেকে তুমি পালাতে পারবে না। যে যুবকটি তোমাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে নিষ্পেষিত করতে চেয়েছিল সে তোমার প্রেমিক। তুমি তাকে যদি ভালোবাসতে পার তাহলেই আনন্দ পাবে। মিলনেই আনন্দ, তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? পালিয়ে কি নিস্তার পাবে?"

"নিস্তার আমাকে পেতেই হবে। পিশাচকে আমি ভালোবাসতে পারব না।"

"ভালোবাসলেই বুঝতে পারবে ও পিশাচ নয়, ও সুন্দর।"

"ভালোবাসব বললেই কি ভালোবাসা যায়—"

রূপসী যুবতীটি এতক্ষণ কোনো কথা বলেননি।

এইবার মুচকি হেসে বললেন—"না, তা যায় না। আমাদের সাহায্য না পেলে কোনো লোকেরই মনে ভালোবাসার ফুল ফোটে না। মহাদেবের মত শ্মশানচারী সংসারবিরাগী নির্বিকার সন্ন্যাসীর বুকেও আমরা প্রেমের ফুল ফোটাতে পেরেছিলাম—"

"কে আপনারা—?"

"ওঁর এই পুষ্পধনু দেখেও বুঝতে পারছেন না কে আমরা—"

মদন ও রতিকে দেখে ভয় পেয়ে গেল মেয়েটি। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগল সে। পাহাড়ের পথ দুর্গম। তবু মেয়েটি হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। তার হাত-পা রক্তাক্ত হল, ছিন্ন বসন আরও ছিন্ন, আরও বিস্রস্ত হল। কিন্তু সে থামল না। হামাগুড়ি দিয়ে সে উঠতে লাগল।

রতি মদনকে বলল—আর দেরি করছ কেন, শরসন্ধান কর। সঙ্গে সঙ্গে মদন ফুলশর নিক্ষেপ করলেন একটি। সে শর আলোকরেখার মত বিদ্যুৎগতিতে গিয়ে প্রবেশ করল কালো মেয়েটির বুকে। রতি বলল—"এইবার চল আমরা অদৃশ্যভাবে ওকে অনুসরণ করি। ওকে ফিরিয়ে আনতেই হবে।"

অদৃশ্য হয়ে গেল দুজনেই।

মেয়েটি পিছু ফিরে দেখল একবার। কাউকে দেখতে পেল না। আবার উপরে উঠতে লাগল সে। মনে হল পাহাড়ের চূড়ায় উঠে তারপর লাফিয়ে পড়বে নীচে। আত্মহত্যা করবে। শেষ করে দেবে তার ঘৃণিত জীবন। কিছুদূর উঠে সে দেখতে পেল পাহাড়ের চূড়ায় ছোট

একটি মন্দিরের মত দেখা যাচ্ছে। আরও কিছুদূর উঠে সে বুঝতে পারল মন্দিরই। দুগ্ধধবল সুন্দর মন্দির একটি। চড়াই কিন্তু দুস্তর। একটা পাথরের উপর বসে হাঁপাতে লাগল সে। সহসা তার নিরাশ হৃদয়ে যেন আশার সঞ্চার হল। এমন কি সেই পিশাচের মুখটাও ভেসে উঠল তার মনে। লোকটির পেশীসমৃদ্ধ বাহু দুটির কথাও মনে পড়ল। উঃ, কি জোরেই চেপে ধরেছিল। 'না, না, ওর কথা আর ভাবব না, ও মানুষ নয়, পিশাচ, ভয়ঙ্কর পশু একটা'— মনে মনে এই কথা বলে উঠে দাঁড়াল সে। আবার উঠতে লাগল সেই মন্দিরের দিকে। প্রখর দ্বিপ্রহর। রোদের উত্তাপ ভয়ানক। অগ্নিবৃষ্টি করছেন সূর্য। তবু মেয়েটি উঠতে লাগল। তার কেমন যেন আশা হল ওই মন্দিরে পৌঁছলেই তার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু কি বিপদ, ওই পিশাচের মুখটা তার মনে ফুটে উঠছে কেন বার বার। তার চোখের দৃষ্টিতে একটা কৌতুকহাস্যও চিকমিক করছে। ঘৃণায় পাথরের উপর মাথা কুটতে লাগল মেয়েটি। কপালটা রক্তাক্ত হয়ে গেল। আবার উঠতে লাগল সে। পা পুড়ে যাচ্ছে, সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে, মনে হচ্ছে, যেন একটা অগ্নিকুণ্ডের ভিতর দিয়ে সে চলেছে। তবুও কিন্তু সে থামল না, চলতেই লাগল। ওই মন্দিরে তাকে পৌঁছতেই হবে। মন্দিরে যখন সে পৌঁছল তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। অস্তমান সূর্যের রক্তকিরণে মন্দিরের দুগ্ধধবল কান্তি রূপান্তরিত হয়েছে। অগ্নির বর্ণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার সর্বাঙ্গ থেকে। মন্দিরের দ্বার খোলা, বস্তুত মন্দিরের কোনো দ্বার নেই। মেয়েটি সেই দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আবার উঠে দাঁড়াল। তারপর দেখতে পেল বেদীর উপর সমাসীন মহাদেব মূর্তিটিকে। জীবন্ত মূর্তি। করজোড়ে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল মেয়েটি।

"কে তুমি—"

কোনো উত্তর দিতে পারলে না মেয়েটি।

তার আর্ত দৃষ্টি, কম্পিত কলেবর, যুক্তপাণিই যেন উত্তর রূপে মূর্ত হল মহাদেবের মনে।

"তোমাকে ওরা তাড়া করছে কেন জান?"

মেয়েটি এবারও কোনো উত্তর দিতে পারল না।

"করছে, কারণ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তুমি ওদের আকর্ষণ করছ। তুমি চুম্বক, ওরা লোহা। মদন আর রতি তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের সত্যিই কি তুমি দমন করতে চাও?"

"আমি পারব কি?"

"তোমার পায়ের তলায় ওদের অবনত করে দিতে আমি পারি। কিন্তু ওদের দমন করতে হবে তোমাকেই। আমি তোমাকে একটি খড়্গ দিচ্ছি সেই খড়্গাঘাতে ওদের ছিন্নভিন্ন করতে হবে! এই নাও—"

মহাদেব একটি খড়্গ দিলেন তার হাতে। সন্ধ্যার রক্তরাগে সে খড়্গ যেন অট্টহাস্য করে উঠল নীরবে।

"এই খড়্গ নিয়ে ওদের তুমি টুকরো টুকরো করতে পার কিন্তু তাতে ওরা মরবে না। মনসিজের নিবাস মনে, রতিও ওর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে। ওকে মন থেকে তাড়াতে হবে। আমি মদনকে ভস্ম করেছিলাম কিন্তু সে মরেনি। রতির চক্রান্তে সে আবার পুনর্জীবন লাভ

করেছে। আমি তাকে মন থেকে দূর করেছি বলেই সে আমাকে আর বিরক্ত করতে পারে না। তুমি ওদের এই খড়্গ দিয়ে বধ কর, কিন্তু মন থেকেও ওদের বিদূরিত করতে হবে, তা না হলে শান্তি পাবে না—"

"ওরা কোথায়—"

মহাদেব সামনের দিকে চেয়ে আদেশ করলেন—"তোমরা এর পায়ের তলায় অবিলম্বে এসে শুয়ে পড়। তা না হলে—" মহাদেবের তৃতীয় নয়ন রোষদীপ্ত হয়ে উঠল।

অবিলম্বে রতি ও মদন এসে শুয়ে পড়ল মেয়েটির পায়ের তলায়, তাদের ভয় হল আবার না ভস্ম করে দেন।

"তুমি ওদের উপর উঠে দাঁড়াও—"

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল, তাদের দেহের উপর পা দিয়ে।

মহাদেব বলতে লাগলেন, "ওদের বধ করবার আগে ভেবে দেখ ওদের তুমি মন থেকে দূর করতে পারবে কি না। ভেবে দেখ যে পিশাচ তোমাকে ধর্ষণ করতে চেয়েছিল তার সম্বন্ধে তোমার কোনো দুর্বলতা আছে কি না।"

এর পর মেয়েটি যা করল তা অপ্রত্যাশিত।

হঠাৎ সে বলে উঠল। "না আমি পারিনি। ওই পিশাচ ক্রমশ আমার চোখে সুন্দর হয়ে উঠছে। ভয়ঙ্কর কিন্তু সুন্দর। আমার এ কি হল—না আমি সহস্তে এর প্রতিকার করব।" সহসা খড়্গ দিয়ে নিজের মুণ্ডটাই কেটে ফেলল সে। মুণ্ডটা কিন্তু মাটিতে পড়ল না, মেয়েটিও পড়ল না। মেয়েটি হাতে মুণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আর সেই দণ্ডায়মান কবন্ধ থেকে রক্তের ধারা উৎসাকারে পড়তে লাগল সেই ছিন্নমুণ্ডের মুখে। মনে হল মুণ্ডটি সাগ্রহে যেন সেই রক্ত পান করছে।

"মহাদেব নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর প্রণাম করলেন।"

এই পর্যন্ত বলে কিঙ্কিণীর হাতটি ছেড়ে দিলেন ভদ্রলোক। উল্লিখিত গল্পটি তিনি কিঙ্কিণীর হাত দেখেই বলছিলেন। যতক্ষণ বলছিলেন ততক্ষণ কিঙ্কিণীর প্রসারিত করতলের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তাঁর।

কিঙ্কিণী মেয়েটিও কালো। কিন্তু অপরূপ রূপসী সে। মহাভারতে ব্যাসদেব কৃষ্ণার যে রূপ কল্পনা করেছিলেন সেই রূপ যেন ঝলমল করছে মেয়েটির আলুলায়িত কুন্তলে, আয়ত নয়নে, স্ফুরিত অধরে, পীবর বক্ষে। গল্পটা শুনে একটা অপূর্ব হাসি বিচ্ছুরিত হয়ে উঠল তার চোখে মুখে। তার গায়ের ডুরে শাড়িটাও যেন লুটোপুটি খেতে লাগল তার সর্বাঙ্গে। হু হু করে ছুটে চলেছিল গাড়িটা অন্ধকার ভেদ করে, হু হু করে হাওয়া ঢুকছিল খোলা জানালা দিয়ে। ফার্স্ট ক্লাস গাড়ির একটি কামরায় বসে ছিল তারা। তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। ভদ্রলোক মেয়েটির হাত ছেড়ে দিয়ে কৌতুকভরে দেখছিলেন তার বাতাসে-ব্যতিব্যস্ত ডুরে শাড়িটার দিকে। শাড়ির ডুরেগুলো চওড়া এবং সবুজ রঙের। তাঁর মনে হচ্ছিল কতকগুলো লাউডগা সাপ যেন কিলবিল করছে মেয়েটিকে ঘিরে।

কিঙ্কিণী বলল—"আপনি আমার হাত দেখে যা বললেন তা যেন একটা পৌরাণিক গল্প। ওসব কি আমার হাতে লেখা ছিল? আপনি যখন আমার হাত দেখতে চাইলেন আমি ভাবলাম

বুঝি আমার সম্বন্ধে কিছু বলবেন। কিন্তু আপনি এ কি বললেন—"

ভদ্রলোক কোনো উত্তর দিলেন না। ভ্রূ কুঞ্চিত করে তার শাড়িটার দিকে চেয়ে রইলেন।

"আমার সম্বন্ধে কিছু বলবেন না?"

"না। প্রত্যেকেরই জীবন এক। জন্ম হয়, কিছুদিন ছটফট করে, তারপর মারা যায়। সকলেই সুখ দুঃখ ভোগ করে। কর্মফল অনুসারে সুখ দুঃখের চেহারাটা হয়তো আলাদা আলাদা। জুতোর দোকানে নানারকমের জুতো থাকে, কিন্তু আসলে সবাই চামড়ার তৈরি। কেউ শু, কেউ পাম্ শু, কেউ বুট, কেউ চটি, কেউ স্যান্ডাল—রংও নানারকম কিন্তু সবাই জুতো, সবাই চামড়া। তোমার জীবনের বিশেষ ছাঁচটা কি তা আমি দেখতে পাইনি। তোমার হাত দেখে যে গল্পটা আমার মনে জাগল তাই বললাম তোমাকে। এক একটা হাত দেখে ওই রকম গল্প জাগে আমার মনে। সবার হাত দেখে জাগে না। তোমার হাত আমার মনে ওই ছবিটা জাগিয়ে দিলে। কেন জানি না।"

"জাগিয়ে দিলে মানে? ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"যে গল্পটা তোমায় বললাম তার ছবিটা আপনাআপনি ফুটে উঠল আমার মানসপটে। যা দেখলাম তাই বর্ণনা করে গেলাম। এর সঙ্গে তোমার জীবনের কোনো সম্পর্ক আছে কি না তা আমি জানি না। তোমার কোনো পরিচয়ই তো জানি না। তুমি কে হঠাৎ আমার রিজার্ভড কম্পার্টমেন্টে ঢুকে পড়লে কেন রাত দুপুরে তাও তো বুঝতে পারছি না।"

"কোথাও জায়গা পাচ্ছিলাম না। এই গাড়ির কপাটটা ঠেলতেই খুলে গেল। দেখলাম খালি, তাই ঢুকে পড়লাম। এটা যে রিজার্ভড তা বুঝতে পারিনি। সবটাই আপনি রিজার্ভ করেছেন?"

"হ্যাঁ। আমি ট্রেনে যখন কোথাও যাই, পুরো একটা কম্পার্টমেন্ট রিজার্ভ করি।"

"আপনার একার জন্যে সমস্ত কম্পার্টমেন্ট দরকার?"

"আমার সঙ্গে আরও অনেকে থাকে—"

"কই, আর কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না—"

ভদ্রলোক মৃদু হাসলেন, কোনো উত্তর দিলেন না। তার শাড়ির গায়ে লাউডগা সাপের খেলা দেখতে লাগলেন সকৌতুকে।

"তোমার পরিচয় তো দিলে না। কে তুমি, নাম কি—"

"আমার ডাক নাম কিনি—পুরো নাম কিঙ্কিণী। এর বেশি পরিচয় আর কিছু বলব না, আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি। আমি পরের স্টেশনে নেবে যাব। কিন্তু তার আগে আর দুটো প্রশ্ন করব আপনাকে। আপনি হঠাৎ আমার হাত দেখতে চাইলেন কেন।—"

"আমি গল্প ভালোবাসি। কারো কারো হাত দেখলে মনে গল্প জেগে ওঠে। বিশেষত—মেয়েদের হাত দেখলে। তোমার হাত একটা অদ্ভুত গল্প শুনিয়েছে আমাকে। গল্পটা তুমিও তো শুনলে। অদ্ভুত নয়?"

"খুবই অদ্ভুত। কিন্তু ওর মানে কি বুঝতে পারলাম না। ছিন্নমস্তার নাম শুনেছি। উনি দশমহাবিদ্যার একজন, কিন্তু আমার হাতের সঙ্গে ওঁর কি সম্পর্ক—ছিন্নমস্তার মানেই বা কি—"

"তোমার হাত দেখে ছিন্নমস্তার কথা কেন মনে পড়ল তা বলতে পারি না। তন্ত্রে

ছিন্নমস্তার যে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে, আছে নিশ্চয়ই কোথাও, তা-ও আমি পড়িনি। কিন্তু তবু আমি ওর একটা ব্যাখ্যা জানি—"

আবার চুপ করে গেলেন ভদ্রলোক এবং রহস্যময়ভাবে চেয়ে রইলেন বাইরের অন্ধকারের দিকে।

"কি রকম ব্যাখ্যা—"

তবু ভদ্রলোক উত্তর দিলেন না কোনো। অন্ধকারের দিকেই চেয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ কিঙ্কিণীর দিকে ফিরে বললেন—"তুমি লেখাপড়া কতদূর করেছ?"

"করেছি কিছু—সামান্য।"

"সামান্য মানে? স্কুল কলেজে পড়নি?"

"পড়েছি। আমি ডবল এম. এ.—জার্মানি, ফরাসী আর ইতালি ভাষা জানি। ছবি আঁকতে পারি, গান গাইতে পারি—"

"তাহলে আমার ছিন্নমস্তার ব্যাখ্যাটা হয়তো বুঝতে পারবে। সংক্ষেপে এইটুকু শুধু বলতে পারি বর্তমান বস্তু-তান্ত্রিক সভ্যতাই ছিন্নমস্তা। বিজ্ঞানের নানা রকম আবিষ্কার দিয়ে সে যে খড়্গ তৈরি করেছে সে খড়্গ দিয়ে নিজেরই মাথা সে নিজে কেটেছে। তার কবন্ধ থেকে উৎসারিত রক্ত তারই মুখে পড়ছে—সে কাম আর রতির উপর দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তাদের দমন করতে পারেনি—এই সভ্যতাই ছিন্নমস্তা। জানি না কেন, তোমার হাতে দেখতে পেলাম।"

আবার তার শাড়ির দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর মনে হতে লাগল ওই সবুজ ডোরাগুলো সত্যিই যদি লাউডগা সাপ হত তাহলে ওগুলোকে ধরে ফেলতুম।

"আপনি যে বললেন—আপনি এত বড় কম্‌পার্টমেন্ট রিজার্ভ করেছেন কারণ আপনার সঙ্গে অনেক লোক থাকে। কিন্তু কই, আর কাউকে তো দেখছি না—"

"কেন, তুমি তো আছ। আরও আসবে।"

ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা ধূর্ত শিকারীর ভাব ফুটে উঠল।

"আমি তো পরের স্টেশনে নেমে যাব।"

"যদি যাও, আপত্তি করব না। কিন্তু আমার মনে হয় তুমি যাবে না। আশা করছি আরও দু'একজন আসবে।"

আবার সেই ধূর্ত দীপ্তিটা ফুটে উঠল তাঁর চোখে।

"আমি পরের স্টেশনেই নেমে যাব।"

"যেও।"

তারপর একটু থেমে বললেন, "তুমি তো বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ বললে না? তাহলে তো আমার সঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি দেখছি তোমার। আমি যখন আসি তখন জনকয়েক পলাতক পলাতকা জুটে যায় আমার সঙ্গে। তোমাদের মত ঘর-পালানো অনেক লোক আমার রাজত্বে গিয়ে বাস করছে। সুখেই আছে তারা—"

"আপনার রাজত্বে? আপনি রাজা নাকি—"

"আমাকে কোনো সরকার রাজা উপাধি দেয়নি। শাস্ত্রে রাজার যে সব সদগুণ থাকা উচিত

তা-ও আমার আছে কি না জানি না। কিন্তু যে বিস্তৃত অঞ্চলে আমি থাকি সেটা আমারই রাজত্ব। আমিই সেখানকার একচ্ছত্র অধিপতি।"

"কোথায় সেটা—"

"তা বলব না। সেখানে যেতে চাও তো নিয়ে যেতে পারি। সেখানে গেলে আর আসতে চাইবে না। যারা সংসার ছেড়ে পালায় তারা হয় বিদ্রোহী না হয় দুঃখী। যারা দুঃখী তারাও একরকম বিদ্রোহী। কিন্তু তাদের বিদ্রোহ করবার শক্তি ইচ্ছে বা সাহস নেই। তারা দুঃখটাকেই মেনে নেয়, অনেকে আবার সেটাকে উপভোগও করে, কেউ কেউ তার থেকে অব্যাহতি পেতে চায়। আমার রাজ্যে বক এই রকম একটি লোক। যদি যাও আলাপ করে সুখী হবে।"

ঘচ্ করে গাড়িটা থেমে গেল।

"স্টেশন নাকি—"

জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল কিঙ্কিণী।

"না এ তো স্টেশন নয়। একটা মাঠের মধ্যে গাড়ি থেমেছে—"

খুব জোরে হুইস্‌ল দিতে লাগল ইঞ্জিন।

তারপর জানালায় দেখা গেল একটা মুখ। উৎকট চোখের দৃষ্টি। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। মনে হল জানালা ধরে ঝুলছে লোকটা।

"এখানে জায়গা আছে?"

ভদ্রলোক বললেন, "আছে—"

"কপাটটা খুলে দিন তাহলে"

"কপাট খোলা আছে। ঠেলুন"

কপাট ঠেলে যিনি প্রবেশ করলেন তিনি বিরাটকায় ব্যক্তি। মাথার চুল লম্বা লম্বা, গোঁফ-দাড়িও আছে, চোখের ভ্রূ-দুটিও বেশ চওড়া এবং রোমশ। কিন্তু সবই কেমন যেন অবিন্যস্ত। পুরু ঠোঁট, চোখ দুটি বড়, কিন্তু চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক নয়, কেমন যেন উৎকণ্ঠিত, ভীত-চকিত। গায়ে একটা ছেঁড়া ফতুয়া, পরনে ময়লা লুঙ্গি, খালি পা। কিন্তু পাটা ভদ্রলোকের পা নয়।

ভদ্রলোকের অনেকগুলি প্যাকিং কেস, কয়েকটি তোরঙ্গ এবং কয়েকটি ঝাঁপি উপর্যুপুরি সাজানো ছিল যে দিকটায়, লোকটি সেদিক ঘেঁষে বসলেন। একটা প্যাকিং কেসে ঠেস দিয়েই বসলেন।

"অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছেন তো?"

আগন্তুকের চোখের দৃষ্টিতে একটা বিস্ময় ফুটে উঠল।

"কি করে বুঝলেন আপনি?"

মৃদু হাসলেন ভদ্রলোক, কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না।

"খাবেন কিছু? ক্ষিধে পেয়েছে নিশ্চয়!"

আগন্তুকের চোখের দৃষ্টি আরও বিস্মিত হল। বিস্ময়ের সঙ্গে একটা ভয়ের ভাবও ফুটে উঠল সে দৃষ্টিতে। তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। ভদ্রলোক হেঁট হয়ে বেঞ্চির তলা থেকে নিজের টিফিন কেরিয়ারটি বার করে এগিয়ে দিলেন তার দিকে।

"ধরুন। সব কৌটোগুলোতে মাংস আছে। হরিণের মাংস। আপনি তো ভালোবাসেন—নিন ধরুন!"

আগন্তুক টিফিন কেরিয়ারটি নিলেন। কিন্তু তাঁর চোখে মুখে ভয় আর বিস্ময় আরও যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠল। শেষকালে বললে, "আপনি কে বলুন তো—"

ভদ্রলোকের চোখে সেই ধূর্ত দৃষ্টি আবার চকিতের মধ্যে ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি উত্তর দিলেন—"আমিও আপনার মতো শিকারী।"

"ও, তাই নাকি— "

ভদ্রলোক টিফিন কেরিয়ার খুলে খেতে আরম্ভ করে দিলেন। গাঁউ গাঁউ করে খাচ্ছিলেন। কড়মড় করে চিবুচ্ছিলেন হাড়গুলো। অবাক হয়ে চেয়ে ছিল কিঙ্কিণী। সে অবাক হয়ে ভাবছিল—এই ভদ্রলোক যাদুকর, না জ্যোতিষী, না আরও কিছু। এই জংলী শিকারীটা যে আসবে তা কি উনি জানতেন? ও যে ক্ষুধিত, ও যে হরিণের মাংস ভালোবাসে এ-ও কি জানতেন? ওর জন্যে টিফিন কেরিয়ারে হরিণের মাংস নিয়ে এসেছিলেন—আশ্চর্য তো!

ভদ্রলোক তার দিকে না চেয়ে নিজের মনেই যেন বললেন, "কিছুই আশ্চর্য নয়!"

আরও অবাক হয়ে গেল কিঙ্কিণী।

জংলী শিকারীটা স্তূপীকৃত প্যাকিং কেসে ঠেস দিয়ে বসে খাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি লাফিয়ে সরে এলেন।

"এগুলোর ভিতর কি আছে বলুন তো! খসখস আওয়াজ হচ্ছে—"

"ওগুলোতে ঠেস দিয়ে বসবেন না। সরে বসুন।"

আগন্তুক সরে বসলেন।

"কি আছে ওগুলোর ভিতর?'

কোনো উত্তর দিলেন না ভদ্রলোক! কিঙ্কিণীর মনে হল একটা চাপা হাসি যেন ফুটে উঠেছে তাঁর সারা মুখে। তিনি হঠাৎ পকেট থেকে ছোট একটা ব্যাগ বার করলেন। তার থেকে বার করলেন একটা 'নেল কাটার'। নিবিষ্ট মনে নখ কাটতে লাগলেন তিনি। অনেকক্ষণ কোনো কথাই বললেন না। আগন্তুক লোকটি খেয়ে যেতে লাগলেন নিবিষ্ট মনে। হাড়-চিবোনর কড়মড় শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। হঠাৎ ট্রেনটা আবার চলতে শুরু করল।

এবার গাড়িটা একটা স্টেশনে এসে ঢুকল।

ভদ্রলোক উঠে গিয়ে একটা জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালেন।

খাওয়া শেষ করে আগন্তুক ভদ্রলোকটি বললেন—"খাওয়ার জল আছে এখানে কোথাও!"

কিঙ্কিণীর দিকে চেয়েই প্রশ্ন করলেন তিনি।

ভদ্রলোক জানালার বাইরে মুখটা বাড়িয়ে ছিলেন। মুখটা টেনে নিলেন তিনি ভিতরে।

"আপনার পেট ভরেছে কি? পংখী আরও খাবার আনছে। এখানে বেশ ভালো খাবার পাওয়া যায়। নোনতা মিষ্টি দুইই। এই যে পংখী এসে গেছে—"

পংখীকে দেখে সবাই চমৎকৃত হয়ে গেলেন। অপরূপ আবির্ভাব একটি। একটি কাকাতুয়া যেন মনুষ্য-মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। নাকটি ঠিক কাকাতুয়ার ঠোঁটের মত। মুখটিও প্রায় সেই রকম। মাথায় যে রেশমের টুপিটা পরে আছে সেটির উপর কাকাতুয়ার একটি ঝুঁটি। হাত দুটি

ছোট ছোট, কবজি পর্যন্ত সাদা ভেলভেট দিয়ে ঢাকা। জামাও সাদা ভেলভেটের। পিঠের খানিকটা কেবল ঈষৎ লাল আর সে অংশটা পিছনের দিকে এমনভাবে নেমে গেছে যে মনে হচ্ছে কাকাতুয়া ডানা মুড়ে আছে। ডানার ডগার দিকে লাল রংটা আরও ঘোরালো। পরনে হলুদ রংয়ের 'চুস্ত' পায়জামা আর পায়ে জরিদার নাগরা জুতো। পায়ে ঘুঙুর পরা। ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম করে পংখী ঢুকল এসে। তার পিছনে এল খাবারওলা, তার হাতে প্রকাণ্ড একঝুড়ি খাবার। পংখীর গলার স্বরও ঠিক পাখির মতো। সে যখন কথা বলল মনে হল একটা কাকাতুয়াই বুঝি কথা বলছে।

"লুচি, কচুরি, শিঙাড়া, আলুর দম, সেওভাজা, রসগোল্লা, সন্দেশ, বালুশাই—সব এনেছি। আরও কিছু চাই কি—"

"না। আমার খাবার পেয়েছ?"

"আমি এখানে দুধ পেলাম না। বেলও পাওয়া গেল না। তবে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে দেখলাম দুধ আর বেল নিয়ে কাকে যেন খুঁজছে।"

"বাস তাহলে আর তোমায় ভাবতে হবে না। তারা আমাকেই খুঁজছে—"

হঠাৎ কিঙ্কিণীর দিকে ফিরে বললেন—"তুমি কি এইখানে নেবে যেতে চাও?"

এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না কিঙ্কিণী।

বলল—"আপনারা কোথায় যাবেন?"

"আমরা হিমালয়ে উঠব। এ গাড়িটা কালকা পর্যন্ত যাবে। সেখানে আমাদের মোটর আসবে। সেই মোটরই যাবে হিমালয়ে আমার রাজত্বে। তুমি যাবে কি আমাদের সঙ্গে?"

কিঙ্কিণী সহসা কোনো জবাব দিতে পারল না। একবার মনে হল, এই অজ্ঞাতকুলশীল অদ্ভুত লোকটার সঙ্গে যাওয়া কি সমীচীন হবে? আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, তাহলে যাবই বা কোথায়? অতীত জীবনের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েই তো চলে এসেছি বাড়ি থেকে! এ ভদ্রলোক যদিও অদ্ভুত, যদিও এঁর আচরণে কেমন যেন একটা অলৌকিক ভুতুড়ে ভাব আছে, কিন্তু ইনি যে শক্তিমান লোক তাতে সন্দেহ নেই। এঁর অদ্ভুত আচরণে কেমন যেন একটা দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করছি। মনে হচ্ছে যে কোনও সময়ে আমাকে তাক লাগিয়ে দিয়ে এমন একটা কিছু উনি করে ফেলবেন যা আমার কল্পনার অতীত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাতে আমার ভালো হবে।

কিঙ্কিণীর চিন্তাধারাকে বাধা দিয়ে ভদ্রলোক বললেন—"যদি এখনই না নাবতে চাও নেবো না। পরে ভেবে চিন্তে কি করবে তা ঠিক কোরো। তাড়াতাড়ি কিছু নেই। কিছু খাও এইবার—'

পংখী হেঁট হয়ে একটি বেঞ্চির তলা থেকে কাঠের বাক্স বার করল একটি। তার ভেতর থেকে বার করল কয়েকটি চীনে প্লেট।

কিঙ্কিণী দেখে বুঝতে পারল প্লেটগুলি সাধারণ প্লেট নয়। তাদের বাড়িতেও ওরকম দামি প্লেট ছিল। সম্মানিত অতিথিরা এলে খেতে দেওয়া হত। অন্য সময় বন্ধ থাকত আলমারিতে।

কিঙ্কিণীর ক্ষিধে পেয়েছিল বেশ। তাই পংখী যখন দুটি প্লেটে ভরে নানারকম খাবার সাজিয়ে তার সামনে ধরে দিলে তখন সে আপত্তি করল না। আগন্তুক ভদ্রলোকটিও আরও

কিছু খাবার খেলেন। তারপর বড় একটি মীনা-করা রুপোর ভৃঙ্গার থেকে রুপোর গ্লাসে গ্লাসে সুবাসিত জল পরিবেশন করতে লাগল পংখী।

খাওয়া শেষ হলে পংখী নীরবে নেমে গেল।

তখন হঠাৎ সেই আগন্তুক লোকটি ভদ্রলোকটির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কে, কি নাম আপনার—"

ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ স্মিতমুখে। তারপর বললেন, "আমি কে, তা আমি নিজেও জানি না। আমার নামও নেই কোনো। যে কোনো নামে ডাকলেই আমি সাড়া দেব।"

"কি রকম?"

"ওই রকমই। আপনার নামটা কি তাই বলুন।"

"যদি না বলি—"

"কিছু ক্ষতি নেই। দমন দেওকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি।"

আগন্তুকের মুখটা একটু ফাঁক হয়ে গেল।

ভদ্রলোক বলে যেতে লাগলেন—"তুমি ডাকাতি করতে যাবার আগে মহোলি পাহাড়ের কালী মন্দিরে যখন পুজো দিতে যেতে তখন আমিও সে মন্দিরের ভিতর থাকতাম। তোমার পুজোর আয়োজন আমিই করে দিতাম, আমিই পুরোহিত ছিলাম সে মন্দিরের। আমি—"

"আপনিই কি মহাদেব মিশ্র?"

"হ্যাঁ, ওই নামেই তখন ডাকত আমাকে সবাই। আমার চেহারাও তখন অন্য রকম ছিল—"

"দমন দেও সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "তাহলে আপনি বদলে গেলেন কি করে!"

"কালী কৃপা করলে সবই সম্ভব। কালীর কাছে আমি নিজের জন্যও কিছু চাই নি। তাই তিনি আমাকে সব দিয়েছেন। তুমি কালীকে আরাধনা করতে স্বার্থের জন্য। তাই শেষ পর্যন্ত তোমাকে জেলে যেতে হল। পরশু রাত্রে তুমি তখন জেলের প্রহরীকে খুন করে পালালে তখনই আমি টের পেয়েছিলাম, তখনই আমি বুঝেছিলাম আমার কাছে না এলে মহাবিপদে পড়বে তুমি। তাই তোমার জন্য ফাঁদ পেতে রেখেছিলাম। আমি জানতাম তুমি সে ফাঁদে ধরা পড়বে। অবশ্য ধরা পড়েছ বলে তোমাকে যে ধরেই রাখব আমার এমন কোনো জবরদস্তি নেই। ইচ্ছে করলে তুমি চলে যেতেও পার—"

ঠিক এই সময়ে বকুল ফুলের গন্ধে সুবাসিত হয়ে উঠল কামরাটা। দ্বার ঠেলে প্রবেশ করলেন একটি যুবক এবং একটি যুবতী। দুজনেরই চোখ-ধাঁধানো রূপ। একজনের হাতে একটি বড় বেল আর একজনের হাতে একটি বড় রুপোর ঘটিতে দুধ।

যুবকটি বললেন, "এই কম্পার্টমেন্টে ধূর্জটি সেন বলে কেউ আছেন কি?"

ভদ্রলোক হাসিমুখে চাইলেন তাঁর দিকে।

"তাঁকে কি দরকার তোমাদের"

"আমরা দুজনেই রোজ স্বপ্ন দেখছি যে এই গাড়িতে ধূর্জটি সেন বলে একটি লোক যাবেন, তাঁকে যদি একটি পাকা বেল আর এক ঘটি খাঁটি দুধ খাওয়াতে পারি তাহলে আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আমরা মহা বিপদে পড়েছি। তাই আমরা ধূর্জটি সেনকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—আপনাদের মধ্যে কেউ কি ধূর্জটি সেন?

"হ্যাঁ আমিই। দাও আমাকে বেল আর দুধ। বস তোমরা—"

দুধের ঘটিটা তুলে ঢক্‌ঢক্ করে সব দুধটা খেয়ে ফেললেন তিনি।

"বাঃ, চমৎকার দুধ। বেলটা কাল সকালে খাব—"

বেঞ্চির নীচে রেখে দিলেন বেলটাকে।

যুবকটি একটু বেকায়দায় পড়ে গেলেন মনে হল। অর্থাৎ এই লোকটিই ধূর্জটি সেন কি না তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হবার আগেই দুধ আর বেল তো বেহাত হয়ে গেল। যদি ইনি—

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, "সন্দেহ হচ্ছে? আমি কিন্তু তোমাদের নাম জানি—তুমি তো রত্ন আর ইনি তো ঝিলিক? তাই না?"

মেয়েটি সবিস্ময়ে তার অপূর্ব ভুরু দুটি তুলে বলে উঠলেন, "কি আশ্চর্য। কালই তো রত্ন আমাকে ঝিলিক নামটা দিয়েছে—আপনি জানলেন কি করে। আর তো কেউ জানে না।"

"আমার আর একটা নাম তো প্রীতি—"

"আরও নাম আছে তোমার। রাগলতা, মায়াবতী, শুভঙ্গী এগুলোও তোমার নাম। আরও অনেক নাম আছে—কিন্তু সেগুলো এত লোকের সামনে বললে তুমি লজ্জা পাবে তাই বলছি না।"

"আপনি কি করে জানলেন এসব?"

"সব কথা কি বলা যায়? বস তোমরা—"

উভয়েই বসে পড়লেন একটা খালি বেঞ্চিতে।

জেল-পলাতক ভদ্রলোকটি উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। উত্তেজনায় তাঁর নাকের ডগাটা কাঁপছিল। হাতের মুঠো দুটো তিনি খুলছিলেন আর বন্ধ করছিলেন।

"ফাঁদ? ফাঁদ পেতে আমায় ধরেছেন? কিসের ফাঁদ? জেল থেকে যে পালাতে পেরেছে তাকে কি রকম ফাঁদে ধরেছেন আপনি? কই, কোনো ফাঁদ তো আমার চোখে পড়ল না।"

"আমি যে ফাঁদ পাতি তা দৃশ্য নয়, অদৃশ্য। তা আমার খেয়ালখুশি ইচ্ছার ফাঁদ। আমি যখন আমার রাজত্ব ছেড়ে আসি তখন এই ফাঁদ পেতে দিই চারিদিকে। অনেকেই ধরা পড়ে। যারা আমার সঙ্গে যেতে চায় তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাই। যারা যেতে চায় না তাদের ছেড়ে দিই। আমি কারো কাছে কিছু চাইও না! শুধু বলি তোমরা যদি আমার সঙ্গে আমার রাজত্বে গিয়ে থাক আমি আনন্দ পাব। আনন্দটাই উদ্দেশ্য। কিনির হাত দেখে একটা গল্প জেগে উঠল মনে, ভারি আনন্দ পেলাম। ওই আনন্দটুকুই আমার লাভ।—"

কিঙ্কিণী উৎকর্ণ হয়ে উঠল একথা শুনে। বলে উঠল—"আপনি স্পষ্ট করে কিছু বলছেন না কেন? আমাদের সবাইকে এ রকম একটা অদ্ভুত ধাঁধার মধ্যে ফেলেই বা রেখেছেন কেন?"

"এর চেয়ে স্পষ্ট আর যে করতে পারি না। 'স্পষ্ট' কথার মানেটা কি বলতে পার? যা স্পষ্ট তার পিছনেও অস্পষ্টতার একটা কুয়াশা থাকে। আর সে কুয়াশার মধ্যে যা দেখা যায় তা দৃশ্য বটে কিন্তু স্পষ্ট নয়। তোমরা যারা আজ আমার ফাঁদে ধরা পড়েছ তাদের নিয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোনো নাটক জমে উঠবে ওই অস্পষ্ট কুয়াশায় তার আভাস পাচ্ছি কিন্তু সবটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। একটা কথা শুধু জানতে চাই—স্পষ্ট করেই বল সেটা—তোমরা কি আমার সঙ্গে যাবে?"

"কোথায় নিয়ে যাবেন আমাদের"—কিঙ্কিণীই প্রশ্ন করল আবার।

"জায়গাটার নাম বলব না। কারণ আমিও ঠিক জানি না। কিন্তু মনোরম জায়গা। হিমালয়ের উপর। গেলে আর আসতে চাইবে না বলেই মনে হয়—"

"সেখানে গিয়ে আমাদের লাভ?"

"লাভ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, যা এখানে তোমরা কেউ কখনও পাওনি। ওখানে গেলে সে স্বাধীনতা তোমরা পাবে। এখানে স্বেচ্ছাচারী হবার স্বাধীনতাও নেই। যে ডাকাত হতে চায় তাকে জেলে পুরে জোর করে আটকে রাখবার ব্যবস্থা আছে এখানে, কিন্তু তাতে কারও কোনো লাভ হয়নি। ডাকাতরাও খুশি হয়নি, সমাজও নিরাপদ হয়নি। দমন দেওকে জেলে পুরে কি লাভ হয়েছে? ও একজন লোককে খুন করে জেল থেকে পালিয়ে এসেছে। পুলিশ আবার যদি ওকে ধরতে পারে আবার হয়তো জেলে পুরে রাখবে, কিম্বা ফাঁসি দেবে। কিন্তু তাতে কি ওর সংশোধন হবে? ওকে নিজের পথে চলতে দিতে হবে, ও ডাকাতি করে করে নিজেই দেখুক এর শেষ কোথায়, এতে সুখ আছে কি না। উপদেশ দিয়ে বা জেলে পুরে রেখে ওকে সংশোধন করা যাবে না। আমার রাজত্বে কেউ ওকে ডাকাতি করতে বাধা দেবে না, লুট করবার মত অনেক সম্পত্তি সেখানে আছে। মানুষ ওকে বাধা দেবে না বটে, কিন্তু প্রকৃতি দেবে, ঝড় বৃষ্টি ভূমিকম্প সাপ বাঘ সিংহকে ঠেকানো যাবে না। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে দমন দেও যদি ডাকাতি করতে পারে করুক—কেউ আপত্তি করবে না। কি দমন দেও, যাবে?"

দমন দেও রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল কথাগুলো।

বলল, "যাব! মহাদেব মিশ্র যদি আমাকে নরকেও নিয়ে যায় যাব। কিন্তু সেখানে খাব কোথায়? রোজগারের কোনো উপায় আছে কি?"

"সব আছে। তুমি যেমন ভাবে থাকতে চাইবে তেমনিভাবে থাকতে পাবে। এমন কি যদি বিয়েও করতে চাও বউ জুটে যাবে একটা।"

"যদি ভালো না লাগে—"

"তাহলেই মুশকিল। সেখান থেকে চলে আসা শক্ত। তোমার চলে আসবার আগ্রহ যদি খুব প্রবল হয় তাহলেই হয়তো হেলিকপ্টার এসে তুলে নিয়ে যাবে তোমাকে। আমরা পাহাড়ে কিছুদূর মোটরে উঠব তারপর হেলিকপ্টারে করেই যাব সেখানে। বিদেশ থেকে একটা হেলিকপ্টার ভাড়া করে আনা হয়েছে আমাদের জন্য। সে হেলিকপ্টার আমাদের নাবিয়ে দিয়েই চলে যাবে। আবার তাকে ফিরিয়ে আনতে হলে তপস্যা করতে হবে।"

কিঙ্কিণী প্রশ্ন করল এবার।

"সেখানে ফোন নেই? টেলিগ্রাফ নেই? পোস্টাফিস নেই?"

"না। আধুনিক সভ্যতার কিচ্ছু নেই সেখানে। সে দেশে রাত্রে আলো জ্বলে না। সূর্য চন্দ্রই সে দেশের আলো। বাইরের সভ্য জগতের সঙ্গে সে দেশের কোনো যোগাযোগ নেই।"

"তার মানে ছিন্নমস্তা-সভ্যতার সংস্রব আপনারা ত্যাগ করেছেন?"

"ছিন্নমস্তা যে সতীরই আর একটা রূপ, শক্তিরই আর একটা বিগ্রহ, তাঁকে কি ত্যাগ করা যায় সহজে? তবে আমার রাজত্বে ছিন্নমস্তার মন্দিরটি খালি আছে এখনও। নজন এসেছেন, এমনকি ধূমাবতী পর্যন্ত, কিন্তু ছিন্নমস্তা আসেননি এখনও। কে জানে হয়তো একদিন আসবেন।

কিন্তু ছিন্নমস্তা আর ছিন্নমস্তা-সভ্যতা এক নয়। প্রথমটা পৌরাণিক সাধকদের উপলব্ধি আর দ্বিতীয়টা আমার তৈরি রূপক—হয়তো বাজে রূপক।"

মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন তিনি।

"আধুনিক সভ্যতা থেকে নির্বাসিত হয়ে কেউ কি থাকতে পারে আজকাল?"

কোনো উত্তর দিলেন না ভদ্রলোক, মৃদু মৃদু হাসতেই লাগলেন। রত্ন আর ঝিলিক বলল—"আমরা এখানেই নেবে যাচ্ছি। যে বিপদে পড়েছিলাম হঠাৎ সেটা কেটে গেল। মিলিয়ে গেল কুয়াশার মত। আশ্চর্য!"

ঝিলিক হঠাৎ রত্নের হাত দুটি ধরে বললে—"আমাকে ক্ষমা কর তুমি, আমি তোমাকেই সন্দেহ করেছিলাম। এখন হঠাৎ বুঝতে পারলাম সব। কি করে যে পারলাম তা-ও কিন্তু বুঝতে পারছি না। সব কিন্তু স্বচ্ছ হয়ে গেল।"

হঠাৎ দুজনেই প্রণত হল ভদ্রলোকের পায়ের কাছে। মৃদু মৃদু হাসতেই লাগলেন ভদ্রলোক।

বললেন, 'স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে অনেক স্ত্রী পুরুষ আসবে যাবে, তাদের কেউ কেউ হয়তো সমস্যারও সৃষ্টি করবে। কিন্তু তোমরা নিজেরা যদি ঠিক থাক তাহলে ভাবনা নেই। তোমাদের নিমন্ত্রণ করছি—যদি আমার রাজত্বে আস খুব খুশি হব।"

"পরে আসব। আজ অন্যত্র একটু কাজ আছে—"

"বেশ, তাই এস। তোমাদের তো সর্বত্র অবাধ গতি। যানবাহনের প্রয়োজনও নেই।"

দুজনেরই মুখে স্মিত হাস্য ফুটে উঠল। আর কিছু না বলে নেবে গেল তারা। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনও ছেড়ে দিলে!

কিঙ্কিণীর দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "কই, তুমি তো নাবলে না? তুমি যে বলেছিলে নেবে যাব?"

কিঙ্কিণী চুপ করে রইল। তার চোখ দুটো বাঘিনীর চোখের মতো জ্বলতে লাগল। নির্নিমেষে চেয়ে রইল সে ভদ্রলোকের দিকে। তারপর হঠাৎ বলল— "আপনি ভাবছেন আমি নেবে যেতে পারি না?"

ভদ্রলোকের চোখে ধূর্ত শিকারীর ভাবটা আবার ফুটে উঠল। বললেন— "তুমি শক্তির প্রতীক, তুমি কি না পার? আসল কথা হচ্ছে তুমি কি চাইছ তা তুমি নিজেই জান না এই মুহূর্তে, সেটা মহাতমসায় লীন হয়ে আছে, সেই মহাতমসার তামসী তো তুমিই। কোথায় কখন তোমার ইচ্ছার আলো জ্বলে উঠবে তা তুমি এখন বুঝতে পারছ না, কিন্তু আমি জানি তা একদিন জ্বলবেই। ইচ্ছাময়ী নিজের ইচ্ছা বেশি দিন চেপে রাখতে পারবেন না।"

কিঙ্কিণীর চোখ দুটো ধক্‌ধক্ করে জ্বলে উঠল।—"আমার আপনাকে দেখে কি মনে হচ্ছে জানেন? আপনি পুরাকালের সেই যাদুকর দলের একজন যারা ম্যাজিক দেখিয়ে লোকেদের ভোলাতো, যারা শেষে ভাঁওতার জোরে পুরোহিত হত, রাজা হত। আপনি আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন সেই দেশে যেখানে সভ্যতার আলো নেই, কেন চাইছেন কি আপনার মতলব তা আমি বুঝতে পারছি না, ভেবেছিলাম আপনি খুলে বলবেন, কিন্তু আপনি ক্রমাগতই হেঁয়ালি করে যাচ্ছেন। আমি পরের স্টেশনেই নেবে যাব।"

"বেশ যেও, আমি বাধা দেব না।"

"আমি দেব"—বিরাটকায় দমন দেও বলে উঠল হঠাৎ।

কিঙ্কিণী দেখল বিস্ফারিত-চক্ষে সে চেয়ে আছে তার দিকে। বিদ্যুৎস্ফুরিত হল ব্যাঘ্রিনীর জ্বলন্ত দৃষ্টিতে।

"আমি চলন্ত ট্রেন থেকেই নেমে যাচ্ছি—"

গাড়ির কপাট খুলে কিঙ্কিণী যে-ই পা বাড়িয়েছে অমনি বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল দমন দেও। তাকে হাত ধরে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে এল গাড়ির ভিতর। তারপর কোণের দিকে তাকে বসিয়ে দিলে জোর করে।

"চুপ করে বসে থাক এইখানে। উঠতে চেষ্টা করলে খুন করে ফেলব। মনে রেখো আমি ডাকাত।"

"আমি কিছুতেই বসব না এখানে—"

লাফিয়ে উঠতে গেল কিঙ্কিণী। দমন দেও আবার তার ঘাড় ধরে বসিয়ে দিল। কিঙ্কিণী আবার লাফিয়ে উঠল। এই ধাক্কাধাক্কিতে উপর থেকে একটা ঝাঁপি পড়ে গেল, আর সেটা থেকে বেরিয়ে এল এক গোখরো সাপ। ফণা তুলে দাঁড়িয়ে উঠল সেটা দমন দেও আর কিঙ্কিণীর মাঝখানে। দুজনেই চিৎকার করে উঠল।

ভদ্রলোক এতক্ষণ নির্বিকার দ্রষ্টা ছিলেন। এইবার উঠে দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়িয়ে সাপটাকে নির্ভয়ে ধরে আবার ঝাঁপির মধ্যে পুরে ঝাঁপিটা উপরে তুলে দিলেন। তারপর দমন দেওকে সম্বোধন করে বললেন, "এখানে তোমাকে ভদ্র ব্যবহার করতে হবে। ওই মেয়েটির মতের বিরুদ্ধে কিছু করতে পাবে না তুমি।"

কিঙ্কিণীর দিকে ফিরে বললেন—"তুমি এদিকে এসো। তুমি যদি এখনই নাবতে চাও আমি চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে দেব।"—বলতে না বলতেই ট্রেনটা থেমে গেল।

ভদ্রলোক জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন—"এটা একটা মাঠ। স্টেশন নয়। নামবে এখানে?"

কিঙ্কিণী কোনো উত্তর না দিয়ে বসে রইল গুম হয়ে।

ট্রেন আবার ছেড়ে দিল।

কিঙ্কিণী তারপর হঠাৎ তাঁর দিকে চেয়ে বলল—"আপনি সঙ্গে সাপ নিয়ে যাচ্ছেন কেন?"

"তোমরা যেমন আমার ফাঁদে ধরা পড়েছ, তেমনি ওরাও পড়েছে। ওরা আমার সঙ্গে যেতে চেয়েছে তাই ওদের নিয়ে যাচ্ছি।"

"ওদের? আরও সাপ আছে না কি—"

"যত প্যাকিং কেস দেখছ সবগুলোতেই সাপ আছে। নানারকম সাপ। ওরা এখানে নিরাপদ নয়, ওদের দেখলেই তোমরা মেরে ফেল। তাই ওরা আমার সঙ্গে চলে যাচ্ছে। পালাচ্ছেও বলতে পার—"

"সবগুলো প্যাকিং কেসে সাপ আছে? ওই ট্রাংকগুলোতেও?"

"হ্যাঁ, সবই সাপে ভরতি। ভয় পেও না। ওরা কিছু বলবে না তোমাকে। এখনই তো দেখলে ওই গোখরো সাপটাই বাঁচাল তোমাকে দমন দেওয়ের হাত থেকে—"

"এত সাপ! আপনি সাপের ব্যবসা করেন না কি—"

"না। ওরা যখনই যেতে চায় ওদের আমি নিয়ে যাই। ওরাই আমার রাজত্বের পুলিস। আমার রাজত্ব রক্ষা করে ওরা। আমার রাজত্বের তিনদিকে পাহাড় আর একদিকে জঙ্গল। বিরাট অরণ্য। সেই অরণ্য পার হয়ে আমার রাজত্ব থেকে পালানো সম্ভব। কিন্তু সাপগুলো কাউকে পালাতে দেয় না। ওরাই আমার সীমান্ত প্রহরী।"

"কেউ আপনার রাজত্বে থাক বা না থাক তা নিয়ে আপনার এত মাথাব্যথা কেন।"

"কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই। আমার রাজত্বে আমি তো নির্বাক পাথর। তবে আমি চাই যাদের আমি নিয়ে যাচ্ছি তারা যেন বিপদে না পড়ে। যে অরণ্যের কথা বললাম সেই অরণ্যে একটা মায়াবিনী রাক্ষসী নদী আছে। সে নদী পাতালে প্রবেশ করেছে। তাকে অনুসরণ করে আমার রাজত্বের অনেক লোকের জীবন্ত সমাধি হয়ে গেছে। তাই যাতে সেই অরণ্যে কেউ প্রবেশ না করতে পারে তার ব্যবস্থা করেছি আমি। প্রহরী রেখেছি। এই সাপরাই সেই প্রহরী। তুমি যদি যাও সবই বুঝতে পারবে—"

"যা বুঝতে পারছি আপনার ওখানে গেলে তো বন্দী হয়ে থাকতে হবে। সভ্য জগতে আর ফিরতে পারব না—"

"সভ্য জগতে তো শান্তি পাওনি। পেলে এমনভাবে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসতে না।"

"আবার ফিরে যেতেও পারি। কিন্তু আপনার রাজত্বে গেলে সে পথ তো বন্ধ।"

"না বন্ধ নয়। ওই তো বললাম—তোমার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যদি তীব্র হয় তোমার তপস্যায় যদি নিষ্ঠা থাকে—আকাশ থেকে নেমে আসবে হেলিকপ্‌টার। তোমাকে নিয়ে যাবে যেখানে তুমি যেতে চাও।"

"আবার আপনি হেঁয়ালি সৃষ্টি করছেন?"

"যা তোমার অভিজ্ঞতার বাইরে তাকেই তোমার হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে। যখন অভিজ্ঞতা হবে সব স্বচ্ছ হয়ে যাবে।"

"তাহলে কি করব আপনিই বলে দিন।"

"আমি তোমাকে যেতে অনুরোধও করব না, যেতে মানাও করব না। তুমি তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় যদি যেতে চাও তাহলে আমি খুশি হব!"

"আমি সেখানে কিভাবে থাকব"

যেভাবে খুশি থাকতে পার। পংখী আমাদের সঙ্গে যাবে। সে সব ব্যবস্থা করে দেবে তোমার। তুমি যা চাও তাই পাবে!"

"আপনি থাকবেন না?"

"ওই যে বললাম আমি নির্বাক পাথর হয়ে থাকব সেখানে। আমি কাউকে আদেশও করব না, কাউকে মানাও করব না।"

"এই যে বললেন আমরা গেলে আপনি আনন্দ পাবেন। সেটা পাবেন তাহলে কি করে? পাথরের মূর্তি কি সুখ দুঃখ অনুভব করে?"

"করে হয়তো! সব পাথর তো মরা নয়। জীবন্ত পাথরও আছে। জীবন্ত কিন্তু নির্বাক, নিশ্চল"—মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

দমন দেও হঠাৎ বলে উঠল, "তোমাকে যেতে হবে। তুমি যদি যেতে না চাও, আমিও

নেবে যাব তোমার সঙ্গে সঙ্গে। মহাদেব মিশ্রের সঙ্গে না গেলে তোমার বিপদ বাড়বে, কমবে না। দমন দেও ডাকাতের পাল্লা সহজ পাল্লা নয়—"

"কি করবে তুমি আমার—"

"তা আমি জানি না এখন। তবে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব।"

কিঙ্কিণী ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বলল—"আপনি ওকে মানা করবেন না? ও আমার পিছু নিয়ে আমাকে জ্বালাতন করবে আপনি কিছু বলবেন না?"

"আমার চোখের সামনে ওকে অভব্যতা করতে দেব না। কিন্তু তোমরা যদি আমার চোখের আড়ালে চলে যাও তাহলে আমি কি করব বল—"

"সত্যি পারেন না কিছু করতে! যা দেখলাম তাতে তো মনে হয় আপনার অনেক শক্তি—"

"তোমরাই শক্তি। তোমরা তোমাদের শক্তি যদি আমাকে দাও তাহলেই আমি শক্তিমান হতে পারি—তা না হলে আমি কিছু নই।"

"তার মানে—"

"তার মানে, আমাকে যদি বিশ্বাস কর তাহলেই আমি শক্তিমান। তোমাদের বিশ্বাসই আমার শক্তি! তুমি তো আমাকে বিশ্বাস করছ না, মনে করছ হয় আমি যাদুকর, না হয় ভণ্ড তান্ত্রিক, তোমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমার কোনো স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য। এ অবস্থায় তোমাকে রক্ষা করবার দায়িত্ব আমি নেব কি করে? আমার সামনে অবশ্য দমন দেওকে কিছু করতে দেব না— কিন্তু ও যদি আমার নাগাল থেকে চলে যায়—ও যদি আমাকে অবিশ্বাস করতে শুরু করে তাহলে আমি নাচার।"

"আমি কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস করতে পারছি না যে—"

ভদ্রলোক মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন এ কথা শুনে।

"আপনি এত শক্তিমান, ইচ্ছার ফাঁদ পেতে না কি আমাদের ধরে এনেছেন, এতগুলো সাপও না কি আপনার ইচ্ছার ফাঁদে ধরা পড়ে আপনার সঙ্গে চলে যাচ্ছে—আপনিই বা আমার মনে বিশ্বাস সঞ্চার করতে পারছেন না কেন। আমি আপনার কাণ্ড-কারখানা দেখে অবাক হয়ে গেছি, কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। কিছুতেই মনে করতে পারছি না আপনার হাতে আমার ভবিষ্যৎ চোখ বুজে তুলে দিতে পারি। আপনি আমার এ অবিশ্বাস দূর করতে পারছেন না কেন।"

"বিশ্বাস, ভক্তি প্রেম ভালোবাসা ওসব ফুলের মত আপনিই ফোটে। জোর করে ফোটানো যায় না। তাছাড়া আমি সব পারি এমন কোনো অহঙ্কারও নেই। আমি সামান্য যেটুকু পারি তাই দেখেই তো তোমার অবিশ্বাস আরও বেড়ে গেছে। শক্তি দেখিয়ে লোককে ভীত করা যায়, সম্মোহিত করা যায়, কিন্তু তার মনে ভালোবাসা জাগানো যায় না। ভালোবাসাই বিশ্বাস। সে ভালোবাসা তোমার মনে যখন জাগছে না তখন আমি নিরুপায়। পরের স্টেশনে তুমি নেমে যাও।"

"আমিও নামব—" বলে উঠল দমন দেও।

ভদ্রলোক দমন দেওয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "তোমাকে অনুরোধ করছি দমন দেও তুমি সভ্য হও। আমার আশ্রয় যদি চাও তাহলে তোমাকে সভ্য হতে হবে। আর একটা কথা ভুলো

না, তুমি খুন করে জেল থেকে পালিয়েছ। পুলিস তোমাকে খুঁজছে। হয়তো পরের স্টেশনেই পুলিস এসে হাজির হবে। পুলিস যদি আসে তাহলে ওপরে বাংকে যে লম্বা ট্রাংকটা আছে, ওর মধ্যেই ঢুকে পোড়ো তুমি। ওটা খালি আছে, ওটা তোমার জন্যেই এনেছি আমি!"

তারপর কিঙ্কিণীর দিকে চেয়ে বললেন, "তুমিও পরের স্টেশনে নেবেই যেও। তুমিও পুলিসের কথাটা মনে রেখো। পুলিস তোমাকেও খুঁজছে। তুমি বড়লোকের মেয়ে, বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ, কাগজে কাগজে তোমার ছবি ছাপা হয়ে গেছে, থানায় থানায় খবর পাঠানো হয়েছে, হাসপাতালে হাসপাতালে খোঁজ করা হচ্ছে তোমার। তুমিও হয়তো পরের স্টেশনে ধরা পড়তে পার। যাদের তুমি ঘৃণা কর তারাই হয়তো আবার ধ'রে নিয়ে যাবে তোমাকে। তোমার ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার বাবা এবার হয়তো অনেক পাহারাদার রেখে দেবে, আর পালাতে পারবে না তুমি—"

"আমার বাবাকে চেনেন না কি!"

"আমি সবাইকে চিনি কিন্তু আমাকে কেউ চেনে না। নিজেকে চেনাবার আগ্রহও আমার নেই।"

"তবে আমাদের ফাঁদে ফেলে নিয়ে যাচ্ছেন কেন!"

"এ প্রশ্নের উত্তর তোমরা জান অথচ জান না। তোমরা বিপদে পড়ে নিজেদের অজ্ঞাতসারে যে প্রার্থনা অহরহ করেছ আমি এবং আমার ফাঁদ সেই প্রার্থনারই উত্তর। বিপদে পড়ে সবাই মনে মনে প্রার্থনা করে। কিন্তু সকলের ডাকে উত্তর আসে না। তার কারণ সকলের ডাকে আন্তরিকতা থাকে না, তাই সকলের ডাক পৌঁছয় না, তাই সকলের ডাকে সাড়া আসে না। তোমাদের ডাকে আন্তরিকতা ছিল, তাই আমি এসেছি। রঘুপতির ডাকেও আমি এসেছিলাম, তাকেও আমি নিয়ে গেছি—"

"কোন রঘুপতি? ডক্টর রঘুপতি মুখার্জি? তিনি তো আমেরিকা গেছেন—"

"সেখান থেকে গেছেন আমার রাজত্বে। বস্তুতন্ত্রের রগড়া-রগড়ি তাঁর ভালো লাগছিল না। মহা অসুখী লোক ছিলেন তিনি। আমার রাজত্বে গিয়েও তিনি রিসার্চ করছেন, আর ভারি আনন্দে আছেন। তাঁর আনন্দের আলো আমাকেও আলোকিত করেছে—"

"রঘুপতির কাছেই কি আমার কথা শুনেছেন আপনি?"

"না। তোমার কথা নিজেই তুমি বার বার বলেছ আমাকে। কিন্তু নিজেই সেটা তুমি জান না। চোখের জলে রাত্রে যখন তোমার বালিশ ভিজে যেত, তখন আমি তোমার মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকতাম!"

সভয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইল কিঙ্কিণী। তারপর তার মনে হল কম্প দিয়ে জ্বর আসছে। খুব শীত করতে লাগল।

"তুমি ওইখানে শুয়ে পড়। এইটে গায়ে ঢাকা দাও—"

ওপর থেকে যা পেড়ে দিলেন তা একটা বাঘ ছাল। কিন্তু খুব নরম আর খুব বড়। আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ল কিঙ্কিণী।

"তুমি ঘুমোও। পরের স্টেশনে ট্রেন থামলে তোমাকে উঠিয়ে দেব আমি—"

কিঙ্কিণীর বলতে ইচ্ছা করল—"আমি আপনার সঙ্গে যাব, রঘুপতি যেখানে আছে

সেইখানেই আমার স্থান—" কিন্তু বলতে পারল না কথাটা। এর পরই খুব কম্প দিয়ে জ্বর এল তার। অচৈতন্য হয়ে পড়ল।

সকালবেলা যখন ঘুম ভাঙল তখন উঠে বসল সে! জ্বর নেই। লোকও কেউ নেই। এমন কি সাপের ঝাঁপিগুলোও নেই। খালি কামরায় একা বসে আছে সে। গাড়ির কপাটটা খোলা। একটু পরে পংখী ঢুকল।

"ও আপনি উঠেছেন দেখছি। আপনি কি আমাদের সঙ্গে যাবেন? যদি ফিরে যেতে চান তাহলে এখান থেকে আপনার টিকিট কেটে দেব আমি।"

"সেই ভদ্রলোক কোথা—"

"তিনি চলে গেছেন। সবাই চলে গেছে। আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। আপনি যেমন বলবেন তেমনি ব্যবস্থা করব। আমাদের দেশে যদি যেতে চান— তাহলে মোটর আছে, চলুন, আর না যদি যেতে চান—"

"হেলিকপ্টার কোথায় আছে—"

"আরও উপরে। একটা উপত্যকার মাঝখানে। খুব সরু রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে সেখানে পৌঁছতে হয়। মোটর সেখানে চলে না। যদি যেতে চান আমি আপনাকে হাত ধরে পার করে দেব সেটুকু।"

"হাত ধরে কেন? আমি নিজে পার হতে পারব না?"

"না। মোটরে ওঠবার আগে আপনার চোখে ওষুধ লাগিয়ে দেব, খানিকক্ষণ কিছু দেখতে পাবেন না আপনি।"

"ওষুধ? কেন!"

"কিছুদূর উঠলেই বরফে প্রতিফলিত তীব্র আলো এসে চোখে পড়বে আপনার। তাই এই সাবধানতা। কিছুক্ষণ পরেই আবার দেখতে পাবেন সব। ভয়ের কোনো কারণ নেই। বলুন, এখন কি করবেন—"

"সেই ভদ্রলোক কোথা। তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলে দেখতাম—"

"আর সে সুযোগ পাবেন না। তিনি চলে গেছেন—"

কিঙ্কিণী চুপ করে রইল। পংখীও দাঁড়িয়ে রইল অনড় মূর্তির মত নীরবে। কিন্তু তার নীরবতাই যেন বার বার করে বলতে লাগল তাকে—'এখন কি করবেন বলুন—'

এর পর প্রবেশ করল যে লোকটি তার মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল কিঙ্কিণী।

"এ কি রঘুপতি, তুমি এখানে!"

"পংখী বললে তুমি এসেছ। তাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।"

"তুমি এখানেই আছ?"

"হ্যাঁ। ঠিক এখানে নয়, আরও উপরে। আমি এখানে অহল্যাপাথর সংগ্রহ করতে এসেছি। হঠাৎ পংখীর সঙ্গে দেখা হল সে বলল কিঙ্কিণী এসেছে—"

"পংখী তো আমার নাম জানে না।"

"জানে তো দেখলাম।"

"তুমি উপর থেকে নামলে কি করে। শুনেছি ওপর থেকে নামা যায় না—"

"যায়, কিন্তু সহজে যায় না। সে কথা সহজে বলাও যায় না। সে সব আর না-ই শুনলে এখন। তুমি কি উপরে যেতে চাও!"

"তুমি ওখানে বরাবর আছ?"

"হ্যাঁ, আমি রিসার্চ করছি?"

"কেমন লাগছে।"

"খুব ভালো—এমন স্বাধীনতা আর কোথাও পাইনি।"

"রিসার্চ করবার জিনিসপত্র সব ওখানে পাও?"

"সব। পংখীকে বললেই সে এনে দেয়।"

"কি নিয়ে রিসার্চ করছ—"

"পাথর নিয়ে। পাথরকে জীবন্ত করা যায় কি না। তাকে চৈতন্যময় করা সম্ভব কি না—এই আমার রিসার্চ!"

"অহল্যা-পাথর কি?"

"পংখী খবর দিয়েছে এখানে না কি একটা পাথর আছে যাকে সবাই অহল্যা-পাথর বলে। অহল্যার পৌরাণিক কাহিনী মনে পড়ল, তাই ঠিক করেছি এই পাথরটাকে নিয়ে একস্‌পেরিমেন্ট করব—কে জানে হয়তো পাথর একদিন রূপান্তরিত হবে অহল্যায়। তুমি যাবে?"

"যাব কি? তুমিই বল না!"

"সেটা তোমাকেই ঠিক করতে হবে।"

"না, তুমি বল। তুমি যা বলবে তাই করব।"

"আমি কিছুই বলব না। তোমাকেই ঠিক করতে হবে।"

ক্ষণকাল মৌন থেকে কিঙ্কিণী বলল— "যাব। তুমি আছ বলেই যাব। আমার কিন্তু ভয় করছে রঘুপতি।"

রঘুপতি হেসে উত্তর দিল—"আমি তোমাকে চিনি কিঙ্কিণী। ভয় পাওয়ার মেয়ে তুমি নও।"

"তুমি ওখানে কোথায় থাকো? তুমি যেখানে থাকবে আমি তার কাছাকাছি থাকতে চাই।"

"ওখানে প্রত্যেককেই পাহাড়-ঘেরা উপত্যকার মধ্যে একা থাকতে হয়। একা না থাকলে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করা যায় না। দ্বিতীয় লোকের সান্নিধ্য স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে—"

"তাহলে ওখানে গেলে তোমার সঙ্গে দেখা হবে না?"

"হবে, যদি আমার অনিচ্ছা না থাকে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ আমার এলাকায় প্রবেশ করতে পারবে না। প্রত্যেক এলাকাতেই চারদিকে পাহাড়, একটি মাত্র প্রবেশ পথ আছে, সে পথও প্রকাণ্ড পাথরের দেওয়াল দিয়ে অবরুদ্ধ। সেই এলাকায় যিনি বাস করেন তাঁর যদি ইচ্ছা হয় তাহলেই সেই পাথরের দেওয়াল সরে গিয়ে প্রবেশ পথ করে দেয়। তুমিও সেখানে তেমনি একটি এলাকা পাবে!"

"সেখানে আমাকে একলা থাকতে হবে? সেখানে কোনো সমাজ থাকবে না?"

"সমাজে এতদিন বাস করে তো দেখলে। সেখানে স্বস্তি পাওনি বলেই তো বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছ, আবার সমাজ চাইছ কেন!"

"আমি সমাজে থেকেই সমাজকে বদলাতে চাই।"

"সমাজকে তোমার মনের মতন করে বদলানো যাবে না। সমাজ বহুলোকের স্বার্থের ঘূর্ণাবর্তে আলোড়িত হয়, সে কখনও একার খেয়াল খুশির হুকুম মানে না। এট্টিলা, চেংগিস, তৈমুর নিছক গায়ের জোরে যা করেছিল তা-ও বেশিদিন থাকেনি, নেপোলিয়ন হিট্‌লারের জবরদস্তিও টেকেনি। সমাজ বদলায়, কিন্তু তোমার আমার খুশিতে বদলায় না। বদলায় অধিকাংশ লোকের প্রয়োজন অনুসারে এবং যুগের পরিবেশ অনুযায়ী। যুগের পরিবেশ তোমার বাবাকে কালোবাজারী করেছে, আমার মাস্টারমশাইকে সামান্য চাকরের পর্যায়ে টেনে নিয়ে গেছে, অধ্যাপনার দিকে তাঁর মন নেই তাঁর মন চাকরি বাঁচানোর দিকে। এর বিরুদ্ধে আমরা কিছু করতে পারব না। তাই আমরা পালাতে চেয়েছিলাম। আমি পালিয়ে এসেছি, ইচ্ছে করলে তুমিও আসতে পার।"

"পাহাড়ের কারাগারে বন্দী হয়ে কি করব আমি—"

"যা খুশি করতে পার—"

"আমি বক্তৃতা দিতে চাই। শ্রোতা কোথায় পাব।"

"অনেক শ্রোতা পাবে। তোমার অন্তত মনে হবে হাজার হাজার শ্রোতা তোমার বক্তৃতা শুনছে। হাততালিও শুনতে পাবে।"

"কোথা থেকে আসবে শ্রোতা—"

"সে পংখী জানে। সেই সব ব্যবস্থা করে এখানে। তোমার রুচি অনুসারে খাওয়া-পরা খাট-বিছানা আয়না-দেরাজ সব যোগাড় করে দেবে সে। তোমার লাইব্রেরী গুছিয়ে দেবে তোমার মনের মতন বই দিয়ে।"

"এই পাহাড়ের ওপর এত শ্রোতা আসবে কোথা থেকে—"

"পংখী মায়াবী। সে অলীক ছায়া-শ্রোতা সৃষ্টি করবে হয়তো। তোমার মনে হবে হাজার হাজাব শ্রোতা বসে আছে তোমার সামনে—"

"ছায়া-শ্রোতাকে বক্তৃতা শুনিয়ে লাভ কি"

"পংখী বলবে ওতেই তোমার কাজ হবে। ওই ছায়ারা গিয়ে প্রবেশ করবে অসংখ্য মানুষের মনে, যে মানুষদের সামনে দাঁড়িয়ে জীবনে তুমি কখনও বক্তৃতা করবার সুযোগ পেতে না। তোমার বক্তব্য যথাস্থানে ঠিক ঠিক পৌঁছে যাবে—"

"ওসব গাঁজাখুরি কাহিনী তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলছ?"

"একজন গাঁজা-খোর পণ্ডিত আমাকে বলেছিলেন যত রকম ট্র্যাংকুইলাইজার (tranquiliser) আছে, গাঁজাই তার মধ্যে নাকি শ্রেষ্ঠ। অশান্ত বিক্ষিপ্ত মনকে শান্ত করতে সাহায্য করে। এখানে তোমাকে গাঁজা খেতে হবে না, তবু তোমার অশান্ত বিক্ষিপ্ত মন শান্ত হবে এটুকু আমি বলতে পারি। আমার হয়েছে—"

"ওই উপত্যাকায় বন্দী হয়ে শান্তি পেয়েছ তুমি?"

"বন্দী বলছ কেন? তুমি ইচ্ছা করলেই তোমার কপাট খুলে যাবে। স্বচ্ছন্দে তুমি চারিদিকে

ঘুরে বেড়াতে পার। এখানে চারিদিকে এত সৌন্দর্য আছে যে তুমি দেখে শেষ করতে পারবে না— দেখবার মত অনেক জিনিস আছে এখানে—"

পংখী এতক্ষণ নীরবেই দাঁড়িয়েছিল।

এইবার বলল— "কি ঠিক করলেন তাহলে—যাচ্ছেন তো আমাদের সঙ্গে—"

কিঙ্কিণী তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে রঘুপতিকেই আবার প্রশ্ন করল—"তুমি কি তোমার উপত্যকায় আমাকে ঢুকতে দেবে না?"

"আমার যতক্ষণ একা থাকার ইচ্ছে হবে ততক্ষণ আমার দরজা বন্ধ থাকবে। সে ইচ্ছা কতক্ষণ থাকবে তা আমি নিজেও জানি না। তবে আমার দরজা মাঝে মাঝে আমি খুলে দিই, তখন আসেও কেউ কেউ। বক আসে। তার সঙ্গে গল্প করতে ভারী ভালো লাগে আমার। নীলপর্ণ আসে—সে-ও অদ্ভুত লোক—"

"সে আবার কে—"

"সে কুবেরের প্রহরী। জটায়ু না কি তার পূর্বপুরুষ ছিলেন—"

"পাখি?"

"বাইরেটা পাখির মত। কিন্তু ভিতরে সে মহৎ মানুষ। তার পালকে নীলরঙের বাহার দেখে তুমি অবাক হয়ে যাবে। নানারকম নীল। বাইরেটা পাখির মত হলেও সে মানুষের মত কথা কয়। তার গায়ে জোরও খুব। তার ডানার ঝাপটার জোরে আর ঠোঁট-নখের দাপটে সে কুবেরের অতুল ঐশ্বর্য রক্ষা করে। তার সঙ্গে আলাপ হলে খুশি হবে—"

"তোমার কাছে যেতে পাব কি না বল—"

"যখনই কপাট খোলা দেখবে চলে এস। তবে তুমি যে রঘুপতিকে জানতে সে রঘুপতি আর নেই। আমি যে কিঙ্কিণীকে জানতাম সে-ও হয়তো বদলে গেছে। নতুন করে পরিচয় করতে হবে আবার। আসবে, নিশ্চয় আসবে—"

পংখী আবার ইতস্তত করে বলল— "তাহলে—"

"আমি যাব—"

কিঙ্কিণী যেন মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

উপত্যকাটি খুব পছন্দ হয়েছিল কিঙ্কিণীর। এত বড় একটা বিস্তৃত জায়গায় সে যে একা থাকতে পারবে তা তার কল্পনাতীত ছিল। দূরে দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। কোনো পাহাড় বরফে আবৃত, কোনো পাহাড় পুষ্পিত বনে ঢাকা, কোনো পাহাড় থেকে ঝরনাধারা দেখা যাচ্ছে, কোনো কোনো পাহাড়ের একটা বিশেষ ভঙ্গি আছে, মনে হয় যেন পাহাড় নয় মানুষ ওরা। একটা পাহাড় যেন অভিমানভরে মুখ ফিরিয়ে আছে, আর একটা পাহাড় যেন উঁকি দিয়ে উপত্যকার ভিতরটা দেখাবার চেষ্টা করছে। কিঙ্কিণী যে ঘরটি পেয়েছে সেটিও চমৎকার। বসবার ঘর, শোবার ঘর, লাইব্রেরি, একেবারে অতিআধুনিক ধরনের। বাড়ির চারিদিকেই বারান্দা। চারটি বারান্দার সামনে উন্মুক্ত প্রান্তর। প্রত্যেক বারান্দার নীচেই ফুলবাগান। বাগানে নানারকম ফুল। একটু দূরে একটি ছোট্ট পুকুর আছে, তাতে ফুটে আছে রাশি রাশি নীলকমল। উপত্যকার ভিতর দিয়ে ছোট একটি নদী বয়ে গেছে। তার জল ফিকে

সবুজ (সবুজ রঙই কিঙ্কিণীর প্রিয় রং), তার বেগ অতি প্রবল, তার সর্বাঙ্গ ঊর্মিশিহরিত। যে সব পাহাড় উপত্যকাটিকে ঘিরে আছে তারই একটা থেকে বেরিয়েছে নদীটি। উপত্যকার প্রত্যন্ত প্রদেশ দিয়ে বয়ে গিয়ে সেটি প্রবেশ করেছে আর একটি পাহাড়ের পাদদেশে বিরাট একটি ফাটলের মধ্যে, সেখান থেকে বেরিয়ে সে প্রপাতের আকারে পড়ছে পাশের উপত্যকাটিতে যেখানে রঘুপতি আছে। কিঙ্কিণীর ভাবতে ভালো লাগে যে তার উপত্যকার নদী প্রপাত হয়ে পড়ছে রঘুপতির উপত্যকায়। কিন্তু কিঙ্কিণীর মনের খটকা এখনও যায়নি। সে বারবার ভাবছে এসব হল কি করে? যে দেশ থাকা সম্ভব নয়, সত্যি সত্যি সে দেশে এসে বাস করছে সে কি করে? মহাদেবের কৃপায়? যে ভদ্রলোকটির রিজার্ভ করা কামরায় সে উঠেছিল, যাঁর দেখা সে আর পায়নি, তিনি কি ছদ্মবেশী মহাদেব? যে যুক্তিবাদের বনিয়াদের উপর তার ভাবনা চিন্তা কর্মপন্থা প্রতিষ্ঠিত তা দিয়ে তো এর ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে? মহাদেবের মন্দিরটি সে দেখে এসেছে একদিন। সে মন্দিরে কোনো মূর্তি নেই, আছে প্রকাণ্ড একটি মর্মরধবল পাথর। সে মন্দিরে ছাতও নেই। সেটা মন্দিরই নয়, পাথর দিয়ে ঘেরা জায়গা খানিকটা। সেই মর্মরধবল পাথরের উপর রোজ বরফ জমে এসে, সেই স্তূপীকৃত বরফ দূর থেকে দেখলে মানুষেরই স্ট্যাচুর মত দেখায়। কাছে গেলে দেখা যায় বরফ ছাড়া আর কিছু নয়। স্ট্যাচুর যেখানে মুখটা সেখানে বরফেরই খাঁজ পড়ে। কোনো কোনো দিন মনে হয় যেন একটা মৃদু হাসি ফুটেছে সেখানে। কোনো কোনো দিন আবার ভ্রূকুটিকুটিল হয়ে ওঠা মুখটা। কোনোদিন কোনো ভাবেই ফোটে না, উদাসীন বরফের একটা চাঙড়, ভাবলেশহীন হয়ে থাকে। এখানকার ব্যাপার কিঙ্কিণী বুঝতে পারে না ঠিক। অথচ সত্যিই সে খুব সুখে আছে। দুটি মেয়ে এসে তার সব কাজ করে দিয়ে যায়। তারা নীরবে আসে, নীরবে কাজ করে, তারপর নীরবে চলে যায়। নদীর ধারে তাদের থাকবার জায়গা আছে কিঙ্কিণী শুনেছে, কিন্তু সে জায়গা কিঙ্কিণীর বাড়ি থেকে দেখা যায় না। কিন্তু ডাকবামাত্র তারা চলে আসে। একজনের নাম উমা আর একজনের নাম পার্বতী। কিঙ্কিণী জিগ্যেস করেছিল বলেই নাম বলেছিল তারা। এমনিতে তারা কোনো কথা বলে না। নীরবে সমস্ত কাজ নিখুঁতভাবে করে চলে যায়। দেখে মনে হয় তারা যমজ। দুজনের চেহারা একরকম। জিগ্যেস করেছে কিঙ্কিণী, কিন্তু তারা কোনো উত্তর দেয়নি। মৃদু হেসে চুপ করে ছিল। এতো ভালো রান্না কিঙ্কিণী আগে খায়নি। রান্না করবার জায়গাটা একটু দূরে, সেখানে ওরা দুজনে মিলেই রান্না করে। কি রান্না করতে হবে তা কিঙ্কিণীকে একদিনও জিগ্যেস করেনি, কিন্তু আশ্চর্য কিঙ্কিণী যা যা ভালোবাসে তাই রান্না করে ওরা। এই পাহাড়ের উপর ইলিশ মাছ, কই মাছ, ভেটকি মাছ কোথায় পায় ওরা জিগ্যেস করেছিল একদিন। কোনো উত্তর দেয়নি। মুচকি হেসেছিল শুধু। পংখী আসে মাঝে মাঝে। তার না কি সর্বত্র অবাধ গতি। ও শুধু কাকাতুয়ার মত দেখতে নয়, কাকাতুয়ার মত উড়তেও পারে। উড়ে পাহাড় পার হয়ে চলে যায়। সব উপত্যকার খবর নেয়। কিঙ্কিণী একদিন পংখীকে জিগ্যেস করেছিল—সুখে আছি কিন্তু ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছি না। কি করে সম্ভব হচ্ছে এসব? পংখী চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল খানিকক্ষণ ঘাড়টা একদিকে কাত করে। তারপর বলেছিল, আপনি একটা পরম মুহূর্তে হঠাৎ প্রবেশ করেছেন, সে মুহূর্তের সঙ্গে অনন্তের যোগ আছে, যে অনন্তে অসম্ভব কিছু নেই। আপনি পূর্বজন্মের মানদণ্ড দিয়ে মাপছেন তাই সম্ভব

অসম্ভবের কথা আপনার মনে হচ্ছে। আপনার পূর্বজীবনটা যখন অলীক ছায়ার মত মিলিয়ে যাবে তখন কিছুই অসম্ভব বলে মনে হবে না। আপনার পূর্ব জীবন এখনও প্রবাহিত হচ্ছে কিন্তু। তার ছবি যদি দেখতে চান দেখাতে পারি। একটা পরদা টাঙিয়ে দিয়ে যাব আপনার বারান্দায়। সে পরদাকে হুকুম করলেই সে ছবি দেখাবে আপনাকে। সন্ধের পর অন্ধকারের সময়টা তাতে ভালোই কাটবে আপনার। আপনার যে জীবন আগে ছিল, যে জীবন থেকে হঠাৎ আপনি বেরিয়ে এসেছেন একটি পরমমুহূর্তে, সে জীবন এখনও চলছে, তার ছবি যদি দেখতে চান দেখুন না। টাঙিয়ে দেব পরদা—"

"সিনেমা দেখার মতো?"

"হ্যাঁ ঠিক তাই।"

ট্রেনে সেই ভদ্রলোক কিন্তু বলেছিলেন এখানে আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার কিছু নেই, তাহলে সিনেমা দেখাবেন কি করে?

"না, যাকে আপনারা যন্ত্র বলেন তা এখানে নেই। যন্ত্র বিষয়ে আপনারা এখনও অনেক পিছিয়ে আছেন, আপনাদের যন্ত্র ভারি অপটু, ছোট ছেলের খেলনার মত—"

"তাহলে সিনেমা দেখাবেন কি করে?"

"যন্ত্র নেই, কিন্তু মন্ত্র আছে। আর আছেন দেবাদিদেব যিনি সমস্ত আবিষ্কারের উৎস—"

"দেবাদিদেব কোথায়? তাঁকে দেখতে তো পাই না!"

"তিনি সর্বদাই আপনার নিকটে আছেন। তাঁকে যে দেখতে পাচ্ছেন না সেটা আপনারই অক্ষমতা। এর জন্যে আপনাকে দোষ দিই না। তাঁকে প্রত্যক্ষ করবার ক্ষমতা অর্জন করতে বেশ কিছু সময় লাগে, আচ্ছা, আমি চললাম। পরদা দক্ষিণ দিকের বারান্দায় লাগিয়ে দেব।"

"ও বারান্দায় খুব হাওয়া—উড়ে যাবে না?"

"কাপড়ের পরদা টাঙাব না, মর্মর পাথরের পরদা টাঙাব। তাতে ছবি আরও স্পষ্ট হবে।"

পংখী চলে গেল।

কিঙ্কিণী চুপ করে বসে রইল। দুরে পাহাড়ের উপর গাছের সারি, সবাই যেন উন্মুখ হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। কি গাছ চেনে না, নাম জানে না, তবু যেন ওদের সঙ্গে একটা আত্মীয়তা অনুভব করল সে। সে-ও তো উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে। তার আকাশ আর ওই নীল আকাশ কি এক? নীল আকাশের অসীম ব্যাপ্তি আছে, ওই আকাশে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, নীহারিকা, মেঘ, রামধনুর সমারোহ, তার দৃষ্টির বাইরেও ওই নীল আকাশ বহুদূর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত, কতদূর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত, কতদূর যে তার সীমা, সীমা আছে কি নেই এ সব খবরও জানে না সে। ওই আকাশের দিকে চেয়ে আছে পাহাড়ের ওই গাছগুলো। সে কি ওই আকাশের দিকে উন্মুখ হয়ে চেয়েছিল কোনো দিন? হ্যাঁ চেয়েছিল। দিনে নয় রাত্রে। নক্ষত্র চেনার বাতিক হয়েছিল কিছুদিন। খালি চোখে যে সব নক্ষত্রদের দেখা যায় তাদের পরিচয় লাভ করবার জন্যে উৎসুক হয়েছিল সে রঘুপতির সঙ্গে। নক্ষত্রের বই আর বাইনাকুলার নিয়ে অনেক রাত্রি কাটিয়েছে রঘুপতির সঙ্গে। প্রায় সব নক্ষত্রই চেনা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উৎসাহ বেশিদিন রইল না, রঘুপতিও চলে গেল, সংসারখরচ চালাবার জন্যে তাকে 'কোচিং ক্লাস' খুলতে হয়েছিল কিছুদিন। সে ক্লাসে স্বাতী ছিল তাদের পাড়ার সেই ফ্লার্ট (Flirt) মেয়েটা। ক্লাস খোলবার পর

রঘুপতি তার কাছে আসবার আর সময় পায়নি। স্বাতীর মুখেই তার খবর পেত আর সে খবরে স্বাতী এমন রং লাগাত যে মনে হত রঘুপতি বুঝি স্বাতীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। তারপর রঘুপতি যখন রিসার্চ করবার স্কলারশিপ পেল, তখন তাকে কোচিং ক্লাস উঠিয়ে দিতে হল। তখনও কিন্তু সে কিঙ্কিণীর কাছে আসত না। তারপর একদিন স্বাতী আত্মহত্যা করল। কেন করল জানা যায়নি। একটুকরো কাগজে কেবল লিখে গিয়েছিল—আমি স্বেচ্ছায় সায়ানাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করলাম—আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

যারা গুজব-বাজ তারা কিন্তু এজন্য দায়ী করেছিল রঘুপতিকে! রঘুপতি তখন আমেরিকায়। হঠাৎ কিঙ্কিণীর মনে পড়ল তার মাকে—তার যে মা অনেকদিন আগে মারা গেছেন, যাঁর সশঙ্কিত সদা-ভীত, রূপটাই সর্বদা জেগে আছে তার মনে। তার মা রূপবতী ছিলেন না, রং কালো ছিল, মুখশ্রীও ভালো ছিল না। চোখ দুটো ছোট ছোট, বড় বড় দাঁতগুলো, নাকটা থ্যাবড়া। সামনের কয়েকটা দাঁত বেরিয়েই থাকত। কিন্তু তিনি ছিলেন বিরাট ধনী সুরেন রায় মহাশয়ের একমাত্র কন্যা। তাঁকে বিয়ে করবার জন্য বহু সৎপাত্র নাকি লালায়িত হয়েছিল, অনেক উঁচু বংশের বিদ্বান ছেলেও ছিলেন নাকি সেই দলে। কিন্তু সুরেন রায় নির্বাচন করেছিলেন স্বল্পবিত্ত, স্বল্পবিদ্যা সাতকড়ি বিশ্বাসকে তার বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য এবং অনিন্দনীয় রূপের জন্য। তাঁর কুৎসিত মেয়ের জন্য তিনি স্বাস্থ্যবান এবং রূপবান পাত্রই সংগ্রহ করেছিলেন, বিত্ত বা বিদ্যার দিকে নজর দেননি, কারণ তিনি জানতেন তাঁর যে বিত্ত আছে তা তাঁর একমাত্র সন্তান কমলাই পাবে আর জামাইয়ের বিদ্যার অভাব চাপা পড়ে যাবে সে ঐশ্বর্যের দ্যুতিময় প্রাচুর্যে। তিনি নিজে লেখাপড়া বেশি শেখেননি, কিন্তু প্রচুর পয়সা উপার্জন করেছিলেন বলে কোথাও এমন কি সভ্য ও বিদ্বৎসমাজেও তাঁর সমাদর কিছু কম হয়নি। তিনি অনুভব করেছিলেন যে সমাজে আমরা আজকাল বাস করি সে সমাজে টাকাই সব। টাকা দিয়ে সবই কেনা যায়, আলু পটল মাছ-মাংসের মত মানসম্ভ্রম প্রভাব প্রতিপত্তিও ক্রীত-বিক্রীত হয়। তাই অন্য দিকে ঝোঁক না দিয়ে তিনি মেয়ের জন্য রূপবান পাত্র খোঁজার দিকেই বেশি ঝোঁক দিয়েছিলেন। সাতকড়ির বিদ্যা, বিত্ত কিছুই ছিল না, কিন্তু রূপ ছিল সত্যই অনন্য। স্কুলে এবং বন্ধুবান্ধব মহলে লালু ছেলে বলত তাকে সবাই। অনেকে ভেবেছিল সিনেমায় ঢুকলে হয়তো ওর ভাগ্য ফিরে যাবে। কিন্তু ভাগ্য ফিরে গেল অন্য পথে, সুরেন রায়ের একমাত্র সন্তান কমলাকে বিয়ে করে। এতে সে নিজেও ঘাবড়ে গেল, কমলাও ঘাবড়ে গেল। কমলা কল্পনাও করেনি এমন দেবকান্তি সুপুরুষ তার স্বামী হবে। প্রথমেই কেমন যেন ভয় ভয় করেছিল তার, মনে হয়েছিল এত সুখ তার সইবে না, এ যেন সত্যি নয় স্বপ্ন। স্বপ্নের মত মিলিয়ে যাবে। সাতকড়িও ঘাবড়েছিল কমলার রূপ দেখে। এই তাড়কা যে মালা হাতে করে তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল এ কথা সেও ভাবেনি। বিয়ের আগে সে মেয়ে দেখেনি দেখতে পায়নি। রায় মশাই বলেই দিয়েছিলেন—"আমার মেয়ে দেখতে ভালো নয়, কিন্তু সে আমার বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী! বিয়ের বাজারে সামান্য পণ্যের মতো তাকে আমি ফিরি করব না। আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি দেখতে সে ভালো নয় এইটুকু খবরের উপর নির্ভর করেই তাকে বিয়ে করতে হবে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না, টাকা ছড়ালে পাত্রেরও অভাব হবে না। অনেক পাত্র পেয়েছি, তবে আপনার ছেলেটিকেই আমার পছন্দ। আপনি ভেবে দেখুন।

বিয়ে যদি হয় তাহলে আপনি আমার বৈবাহিক হবেন। তখন আপনাকে আর আমার অপিসের কেরানী হয়ে থাকতে হবে না। আমার একটা মিলের সর্বেসর্বা করে দেব আপনাকে। আমার মেয়ের বিয়েতে যৌতুকস্বরূপ ওই মিলটাই আপনাকে দিয়ে দেব। আমার সাতটা মিল আছে এর মধ্যে যেটা আপনার পছন্দ সেইটেই পাবেন আপনি। আর আমার মৃত্যুর পর সবই তো আপনাদের হবে! ভেবে দেখুন কথাটা। "পরশু দিন আপনার উত্তর চাই—" কথাগুলো তিনি বলেছিলেন সাতকড়ির বাবা গণেশবাবুকে। এই কল্পনাতীত প্রস্তাব শুনে গণেশবাবু হকচকিয়ে গেলেন প্রথমে। তারপর বললেন—আমার ছেলেকে আর স্ত্রীকে জিগ্যেস করে তারপর আপনাকে বলব। সুরেন রায় বললেন—পরশু পর্যন্ত আপনাকে সময় দিচ্ছি। কারণ তার পরদিন আর একটি ছেলের বাবা আসবেন আমার কাছে। কমলার বয়স তেরো পেরিয়ে গেছে, আমি এই মাসের মধ্যেই তার বিয়ে দিতে চাই।

এ সব গল্প কিঙ্কিণী শুনেছিল তার দূরসম্পর্কের এক বিধবা পিসির কাছে। তিনি সুরেন রায়ের বাড়িতেই থাকতেন। সুরেন রায়ের মৃত্যুর পরও অনেকদিন বেঁচে ছিলেন। তিনি বলতেন—কিনি তুই পেয়েছিস মায়ের রং বাপের মুখশ্রী। হাত দেখতেও জানতেন তিনি। শুধু হাত নয়, নখ দাঁত চুলের ডগা কপাল চোখ মুখ দেখেও নানারকম ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতেন। তিনি বলেছিলেন—তোর কপালে সুখ নেই কিনি, কারণ তোর মতের বিরুদ্ধে তুই কিছু মেনে নিবিনা, তুই যুঝবি, তুই লড়বি, আমরা যা পারিনি তুই হয়তো তাই পারবি, কিন্তু সুখ পাবি না। তুই শিবপুজো কর!' কিঙ্কিণী বলেছিল, 'আমার যে ওসবে বিশ্বাস হয় না পিসি। তোমার পুজোর ঘরে যে শিবের ছবিটি আছে তা সুন্দর, কিন্তু ওকে পুজো করে কোনো লাভ হবে বলে মনে করি না।' পিসি হেসে বলেছিলেন, 'কলেজে পড়ে এই বুদ্ধি হয়েছে বুঝি তোর। কিন্তু জেনে রাখ শিবই মঙ্গলময়, হয়তো একদিন একথা তুই বুঝবি।'

নানারকম এলোমেলো কথা মনে হতে লাগল কিঙ্কিণীর। পিসির মৃত্যুসময়েও সে ছিল তাঁর মৃত্যুশয্যায়। তার মা-ও ছিলেন। মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ পিসি তার হাত ধরে বলেছিলেন— "শিব তোকে দয়া করবেন। তুই পারবি। তোর মাকে তুই রক্ষা করিস। তুই ছাড়া তোর বাবার হাত থেকে কেউ ওকে বাঁচাতে পারবে না।" নীরবে কাঁদছিলেন। একটা আশঙ্কা মূর্ত হয়েছিল তাঁর চোখে মুখে। তিনি যেন একটা অতলস্পর্শী গহ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে এক নিদারুণ ভবিষ্যতের দিকে চেয়েছিলেন। তার ডান হাতের উপর কালসিটে দাগটাও দেখতে পেয়েছিল কিঙ্কিণী। তার বাবা যে রাত্রে মাতাল হয়ে এসে তার মা-কে মারে। এ ঘটনা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক। সে ছেলেবেলা থেকেই দেখছে। প্রথম প্রথম তারও ভয় করত, সে নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে কাঁদত। কিন্তু কোনো প্রতিকার করতে পারত না। আর একটু যখন সে বড় হল তখন তার লজ্জা হত। তার মাকে যে রোজ মারে এ কথাটা সে যেন চাপা দিতে চেষ্টা করত, এমন কি নিজের কাছেও। তারপর সে হস্টেলে চলে গেল। তার পিসিমাই রক্ষা করতেন তার মাকে বাবার হাত থেকে। বাবা যখন মাতাল হয়ে ফিরতেন তখন তাকে লুকিয়ে রেখে দিতেন পিসিমা তালা বন্ধ করে। এর জন্যে পিসিমার গায়েও দু এক ঘা বেত পড়ত মাঝে মাঝে। কিন্তু পিসিমা সবলা ছিলেন, বাবার হাতের বেত কেড়ে নিতেন তিনি, বাবাকে ধাক্কা মেরে একটা ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে কপাট বন্ধ করে দিতেন জোর করে।

কিন্তু সব দিন তিনি পারতেন না। মাঝে মাঝে কম্প দিয়ে জ্বর আসত তাঁর, দু তিনদিন শয্যাগত হয়ে থাকতে হত তাঁকে। সেই সময় বাবা অত্যাচার করবার সুযোগ পেতেন। মা কিছু বলতেন না, চেঁচাতেন না পর্যন্ত, শুধু উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতেন। আর তাঁর উপর চাবুক পড়ত। শেষকালে কিঙ্কিণীই একদিন প্রতিবাদ করল। তখন সে কলেজে পড়ছে। হস্টেল থেকে বাড়ি এসেছিল সেদিন। পিসিমা কিছুদিন আগে মারা গেছেন। ছবিটা হঠাৎ মনে পড়ল তার। তেতলার ঘরে পড়ছিল সে রাত্রে। হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার স্তব্ধতাকে ভেদ করে চলে গেল। মা কোনোদিন চিৎকার করত না, সেইদিনই করেছিল কেবল। কিঙ্কিণী তরতর করে নেবে গেল সিঁড়ি দিয়ে। নেবে দেখল মা সিঁড়ির কাছেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। তার কাছেই ছুটে যাচ্ছিলেন বোধ হয়, কিন্তু পারেননি। বাবা চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে আছেন, মদে চুর, টলছেন। বজ্র-নির্ঘোষ সহসা ধ্বনিত হয়েছিল কিঙ্কিণীর কণ্ঠে—“এ কি করছ তুমি রোজ রোজ। আর কোনো দিন তুমি মায়ের গায়ে হাত দেবে না—।” চাবুকটা কেড়ে নিয়েছিল সে। তারপর একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছিল, তার বাবাও হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন। কিঙ্কিণীর চিন্তাধারা বিঘ্নিত হল হঠাৎ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ঝরনাটা উদ্দাম হয়ে উঠেছে। তার ঝর্ঝর, কলকল ছলছল শব্দকে ছাপিয়ে উঠছে একটা উদ্বেলিত হাসি। তিনটি তুষার পর্বত প্রখর রৌদ্রালোকে স্বর্ণ-কান্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাকে ঘিরে, আর তার উপর চক্রাকারে উড়ছে, বড় বড় একদল নীল পাখি। ও পাখি কখনও সে দেখেনি। কিঙ্কিণীর মনে হল—ওটা ঝরনা নয়, ওটা তারই হৃদয়, যার ঝর্ঝর, কলকল, ছলছল শব্দ, যার উদ্বেলিত হাসি সে প্রত্যহ অনুভব করেছে কিন্তু কোনোদিন প্রত্যক্ষ করেনি। অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে ঝরনাটার দিকে। নিজেকেই দেখছে যেন। হঠাৎ তার মনে হল ওর উদ্বেলিত হাসি কি সে অনুভব করেছিল কোনোদিন? ওই উদ্বেলিত উচ্ছল হাসির একটি অর্থই তো আছে—কোনো বাধা আমি মানব না, কোনো বিপদকেই আমি ভয় করব না, সমস্ত তুচ্ছ করে আমার প্রাণের প্রবাহ দুর্দমগতিতে এগিয়ে যাবে লক্ষ্যের দিকে। হাসির এই অর্থ কি সুস্পষ্ট হয়েছিল তার অনুভূতিতে? হ্যাঁ, হয়েছিল বই কি মাঝে মাঝে। কিন্তু ওটা যে হাসি, ওটা যে অন্তরতম উপলব্ধির নিঃসংশয় হর্ষোচ্ছ্বাস তা সে স্পষ্ট করে বুঝতে পারেনি। সে ওটাকে ভেবেছিল প্রেরণা, নিঃসন্দিগ্ধ প্রত্যয়ের আনন্দিত রূপকে সে আগে দেখতে পায়নি। আজ পেল। এই প্রেরণার বলেই কিন্তু অসাধ্যসাধন করেছিল সে। যখনই সে বুঝতে পারল যে তার বাবা তার মাকে নির্যাতন করে টাকার জন্য তখনই সে এর প্রতিকার করেছিল। তার দাদামশায় উইল করে গিয়েছিলেন যে তার মা তাঁর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, সম্পত্তির সমস্ত আয় মায়ের নামেই যাতে ব্যাংকে জমা হয় এর জন্য সরকারকেই তিনি মায়ের রক্ষক করে গিয়েছিলেন। বাবাকে তিনি একটা মিল দিয়েছিলেন আর দিয়েছিলেন মাসিক হাজার টাকা করে মাসোহারা। কিঙ্কিণীর জন্যেও আলাদা মাসোহারা ছিল। সুরেনবাবু তার মাকে সর্বময়ী কর্ত্রী করে গিয়েছিলেন তার বিষয়ের। অর্থাৎ ইচ্ছে করলে তার মা বিষয় দান বা বিক্রি করতে পারবে এ ক্ষমতাও তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে। তাঁর বাবা তার মাকে পীড়ন করতেন বিষয়টা হস্তগত করার জন্য। ব্যাংকের অনেক টাকা তিনি কেড়ে নিয়েছিলেন মায়ের কাছ থেকে জোর করে। মতলব ছিল বিষয়টাও যাতে তিনি লিখে দেন তাঁর নামে। একটা দান-পত্র তিনি লিখিয়ে এনেছিলেন এবং

মা যাতে সই করে দেন তাতে তার জন্যেই পীড়াপীড়ি করছিলেন অনেকদিন থেকে। মা রাজি হননি। মার খেয়েও হননি। সেদিন তার অজ্ঞান মাকে তুলে নিয়ে এসে ঘরে খিল দিয়েছিল কিঙ্কিণী। তার পর থেকেই মায়ের ভার নিয়েছে সে। আলাদা বাড়ি ভাড়া করে মাকে সেখানে রেখেছে—বাবার নাগালের বাইরে। সশস্ত্র গুর্খা দারোয়ান রেখেছে পাহারা দেবার জন্য। কিঙ্কিণীর বিনা অনুমতিতে সেখানে বাইরের কোনো লোকের ঢোকবার উপায় নেই। আর একটা কাজও করেছে সে। গৌরাঙ্গবাবু উকিলের সাহায্যে মায়ের সমস্ত বিষয় সে নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছে। মা দলিল করে তাঁর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি দান করে দিয়েছেন কিঙ্কিণীকে। সে দলিল রেজিস্ট্রীও হয়ে গেছে। স্ত্রীকে নির্যাতন করে সাতকড়ি বিশ্বাস যাতে আর বিষয়টি হস্তগত করতে না পারেন সে ব্যবস্থা করেও কিঙ্কিণী কিন্তু শান্তি পায়নি। সাতকড়ি বিশ্বাস গুন্ডা লাগিয়েছেন তার পিছনে। কিঙ্কিণী তার বাবাকে কোনোদিন ভালোবাসতে পারেনি। শ্রদ্ধা করতেও পারেনি। বাবার সঙ্গও পায়নি সে ছেলেবেলা থেকে। তার জ্ঞান হয়ে থেকে সে দেখছে বাবা খুব ভোরে বেরিয়ে যান, সমস্ত দিন আসেন না, বাইরেই খান, বাইরেই থাকেন একটা আলাদা বাড়িতে। রাত্রে মাতাল হয়ে তার মায়ের কাছে আসেন এবং মাকে পীড়ন করেন। কিঙ্কিণীকে একটা বোর্ডিংয়ে ভরতি করে দিয়েছিলেন তার বয়স যখন এগারো বারো। বোর্ডিংয়ে হস্টেলেই সে মানুষ হয়েছে। টাকার অভাব হয়নি কোনোদিন। তার দাদামশায় তার নামে যে মাসোহারা দিয়ে গিয়েছিলেন তাতে সে ভালোভাবেই পড়াশোনা করতে পেরেছে। ইংরেজি ছাড়া জার্মানি, ফরাসী আর ইতালী ভাষা শিখেছে সে। ভালো ভালো শিক্ষক অধ্যাপক সাহিত্যিকের সংস্পর্শে এসেছে। কিন্তু তার বাবাই ক্লেদাক্ত করে দিয়েছে তার জীবন। সে সাতকড়ি বিশ্বাসের মেয়ে এই পরিচয় ম্লান করে দিয়েছে তার কৃতিত্বকে। ভদ্রসমাজ মনে মনে তাকে অস্পৃশ্য করে রেখেছে। সামনে তাকে অনেকে খাতির করে অবশ্য, সম্ভবত তার টাকার জন্যে, কিন্তু মনে মনে তাকে ঘৃণা করে সবাই এটা সে বুঝতে পারে। রঘুপতি এই জন্যেই সম্ভবত তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যায়নি, যদিও সে নিজে যেচে তার মায়ের সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিল। রঘুপতির বিধবা মা নাকি অদ্ভুত রকম ভালো। সেকেলে হিন্দু বিধবা, সেকেলে নিয়ম মেনেই চলেন। কিন্তু একালের উচ্ছৃঙ্খলতায় বিচলিত হন না, তা নিয়ে কোনো আলোচনাও করেন না কারো সঙ্গে, নিজের মনে নিজেকে নিয়ে থাকেন নিজের জগতে, নিজের মতে নিজের পথে চলেন। তাঁর কাছে গেলে ভারী ভালো লাগে না কি, অনেকেই বলেছিল কিঙ্কিণীকে, পবিত্রতার প্রতিমূর্তি তিনি। কিন্তু রঘুপতি তাকে নিয়ে যায়নি। রঘুপতিও আমোল দেয়নি তাকে। আলতো-আলতো ভাবে আলাপ করত, ভদ্র আলাপই করত। কিন্তু কিঙ্কিণী যা চেয়েছিল তা পায়নি। কি চেয়েছিল সে? অনেক প্রণয়ী মধুকরের মত ঝাঁকে ঝাঁকে এসেছিল তার চারপাশে। কিন্তু সে তাদের ভাগিয়ে দিয়েছিল। রঘুপতি এই মধুকরের ঝাঁকের মধ্যে ছিল না। কলেজেই আলাপ হয়েছিল তার সঙ্গে। অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক রঘুপতি। সর্বদাই যেন অন্যজগতে থাকত। কিঙ্কিণীর মনে হয়েছিল সে যতবার তার সঙ্গে কথা বলেছিল একবারও তার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখেনি, তার কথার সুরে যে আন্তরিকতা ছিল না তা নয়। কিন্তু একটা অন্যমনস্কতার কুয়াশায় যেন ঢাকা ছিল সব। মনে হত সে অন্য জগৎ থেকে কথা বলছে। রঘুপতিকে দেখে, তার

কথা শুনে, যে শ্রদ্ধা কিঙ্কিণীর মনে জেগেছিল তা ভাষায় নিবেদন করবার সুযোগ পায়নি কিঙ্কিণী। তার লজ্জা করেছিল, সঙ্কোচও জেগেছিল মনে। সে যে অস্পৃশ্যা এই বোধটা যেন কণ্ঠরোধ করে রেখেছিল তার। সে কিছু বলতে পারেনি, একটা মাত্র যে লোককে দেখে তার অন্তর পুষ্পিত হয়ে উঠেছিল তার সামনে নতনেত্রে নির্বাক হয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে পারেনি সে। মনে পড়ল নক্ষত্র চেনবার ওজুহাতে সে ঘনিষ্ঠতা করেছিল রঘুপতির সঙ্গে। বলেছিল, "তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র, কিন্তু বিজ্ঞানের তো আমি কিছু জানি না যে তোমার সঙ্গে আলাপ করব। তবে গাছপালা, পশুপাখি, গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে প্রচুর কৌতূহল আছে আমার কিন্তু কে আমার কৌতূহল মেটাবে বল।" রঘুপতি বলেছিল— "আমিও বিশেষ কিছু জানি না। তবে যে নক্ষত্রদের খালি চোখে দেখা যায় তাদের আমি চিনি। সেগুলো তোমাকে চিনিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তার জন্যে রাত জাগতে হবে—"। একটা বাইনাকুলার নিয়ে রঘুপতির সঙ্গে অনেক রাত জেগেছে সে, তাদের বাড়ির ছাদে। রঘুপতির ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে সে অনেক নক্ষত্র দেখেছে। গায়ে গা ঠেকে গেছে অনেক সময়, কিন্তু রঘুপতির নাগাল পায়নি সে। ওই নক্ষত্রগুলোর মতই রঘুপতি দূরে অনেক দূরে থেকে গেছে। অনেক যুগ্ম-নক্ষত্র দেখিয়েছিল রঘুপতি। সপ্তর্ষি-মণ্ডলে বৃষরাশিতে, বৃশ্চিকরাশিতে, আরও অনেক নক্ষত্রমণ্ডলীতে—দূর থেকে ঠিক মনে হয় তারা যেন পাশাপাশি আছে, কিন্তু রঘুপতি বলেছিল ওদের মধ্যেও নাকি লক্ষ লক্ষ মাইল ব্যবধান। রঘুপতির সঙ্গে তার যখন ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তখন স্বাতী বলেছিল, ওরা মানিকজোড়ের মত ঘুরে বেড়ায়, রঘুপতির মতলব বোধহয় কিনিকে বিয়ে করে বিষয়টা হস্তগত করা। স্বাতী বুঝতে পারেনি যে রঘুপতি যদিও তার পাশে পাশে ঘুরেছিল কিছুদিন, কিন্তু সে ছিল লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে। স্বাতীর আসল নাম কি তা সে জানে না। তার বাবা সাতকড়ির রক্ষিতা বলে তাকে সবাই স্বাতী বলে ডাকে। তার বাবা তাকে আলাদা বাড়ি করে দিয়েছেন একটা। স্বাতী একদিন কলেজে এসে দেখা করেছিল তার সঙ্গে। ও রকম সুন্দরী মেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না। প্রকাণ্ড একটা বুইক গাড়ি করে এসেছিল। কিঙ্কিণীর ক্লাস ছিল তখন। কমন রুমে বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল সে। হঠাৎ স্বাতী এসে ঢুকল আর তার পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল। পাশের চেয়ারটা খালি ছিল, কমন রুমে কেউ ছিল না তখন।

"তোমার নাম কিনি, নয়?"

"হ্যাঁ। আপনাকে তো দেখিনি কখনও—"

"আমার নাম শুনেছ নিশ্চয়। সকলে আমাকে স্বাতী বলে ডাকে। আমি সম্পর্কে তোমার মা হই—"

অবাক হয়ে তার দিকে চেয়েছিল কিঙ্কিণী। খানিকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারেনি। স্বাতীই আবার বলেছিল—"আমি তোমার বন্ধু হতে চাই। সাথী হতে চাই তোমার। ভাব করবে আমার সঙ্গে?"

তবু কোনো উত্তর দেয়নি সে।

নির্নিমেষে চেয়েছিল সে স্বাতীর মুখের দিকে। হঠাৎ সে দেখল স্বাতীর মুখে যদিও হাসি কিন্তু চোখের কোণে জল টলমল করছে। তবু কয়েক মুহূর্ত কিছু বলতে পারেনি সে। শেষে

বলেছিল—"কোনো মানুষ কোনো মানুষের বন্ধু হতে পারে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সব সময়েই স্বার্থের সম্পর্ক। সেই স্বার্থের কথাটাই আগে বলুন—"

"তোমার একজন বন্ধু তো আছে—"

"কে?"

"রঘুপতি।"

"রঘুপতির সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার যোগ্যতা আমার নেই।"

"কিন্তু তোমরা তো একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতে। এমন কি রাত্রেও সে তোমার বাড়িতে যেত এ খবর পেয়েছি!"

"আমরা দুজনে আকাশ চর্চা করতাম। আকাশের নক্ষত্র চেনবার আগ্রহ হয়েছিল আমার, তাই তাকে অনুরোধ করেছিলাম আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দেবার জন্য। সে দয়া করে রাজি হয়েছিল। তার সঙ্গে সম্পর্ক এর চেয়ে বেশি নয়।"

"তাকে তোমার ভালো লাগেনি?"

"খুব। তারও যদি আমাকে ভালো লাগত আমি কৃতার্থ হয়ে যেতাম। কিন্তু তা তো হবার নয়। রঘুপতি অন্য জাতের লোক। আপনারা আমাদের নামে যে কুৎসা রটনা করার চেষ্টা করেছিলেন তা আমি শুনেছি, কিন্তু জেনে রাখুন তা মিথ্যা। টাকা দিয়ে রঘুপতির মতো ছেলেকে কেনা যায় না। সে যা চায় তা আমাদের আয়ত্তে নেই।"

"কি সেটা?"

"তা-ও জানি না। ও আলোর মত যতক্ষণ তোমার বারান্দায় আছে, যখন থাকবে না তখন কোনো লোভ দেখিয়েই তাকে রাখা যাবে না। ও রোদের মত, জ্যোৎস্নার মত—"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে স্বাতী বলেছিল—"আহা, আমি যদি ওর মত হতে পারতাম—"

কয়েক ফোঁটা জল এর পর গড়িয়ে পড়েছিল স্বাতীর গাল বেয়ে।

"আপনি কাঁদছেন কেন?"

"আমার দুঃখ তুমি বুঝবে বলেই তোমার কাছে এসেছি।"

"আমি তো জানি আপনি সুখেই আছেন। অভিজাত পাড়ায় প্রকাণ্ড বাড়ি আপনার, দুটো গাড়ি, দাই, চাকর, দরোয়ান, শফার, মাসে হাতখরচের জন্য কত পান তা জানি না কিন্তু অনেক পান নিশ্চয়ই—এ সব সত্ত্বেও যদি আপনার দুঃখ থাকে তাহলে তা আপনাকেই মোচন করতে হবে, আর কেউ তো তা পারবে না—"

"তুমি পারবে—"

"আমি? কি করে?"

"আমাকে ঘৃণা না করে। আমাকে সবাই ঘৃণা করে—এমন কি যে বাপ-মায়ের দারিদ্র্যমোচনের জন্যে আমি এই ঘৃণিত পথে পা বাড়িয়েছি তারাও ঘৃণা করে আমাকে। আর তোমার বাবাকে তো চেনই, তিনি আমাকে ব্যবহার করেন, ভালোবাসেন না। আমি ঘৃণার শরশয্যায় শুয়ে আছি। তুমি আমাকে বাঁচাও কিনি অন্তত একজন যে আমাকে ঘৃণা করে না এই সান্ত্বনাটুকুই আমি পেতে চাই। আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট হবে।"

"কিন্তু আমি যে আপনাকে ঘৃণা করি—"

"তুমি এত লেখাপড়া শিখেছ, তোমার মায়ের দুঃখ ঘুচিয়েছ আমার দুঃখটা তুমি বুঝবে এই আশা করে এসেছিলাম। ক্রীতদাসীকে ঘৃণা কর তুমি? বলির পশুকে ঘৃণা কর? যে উড়ন্ত পাখিকে তীর মেরে ব্যাধ মাটিতে নামিয়ে আনে—তাকে ঘৃণা কর তুমি?"

"আপনি তো স্বেচ্ছায় এ জীবন বরণ করেছেন ওদের সঙ্গে আপনার তুলনা চলে না। আপনি টাকার লোভে স্বেচ্ছায় যে পথে নেমেছেন সে পথে ভদ্রসমাজ চলা-ফেরা করে না। তাদের শ্রদ্ধা সম্ভ্রম ভালোবাসা আপনি কখনও পাবেন না।"

"তুমি বিশ্বাস কর স্বেচ্ছায় আমি এ পথে আসিনি। আমার বাবা পক্ষাঘাতে পঙ্গু, আমার মা অন্ধ, আমার ভাইটা লেখাপড়া শেখেনি সে একটা গুণ্ডা। যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল সে তোমার বাবার মিলে চাকরি করে, সেই আমাকে জোর করে দিয়ে এসেছে তোমার বাবার কাছে। স্বেচ্ছা? স্বেচ্ছা বলে আজকাল আছে নাকি কিছু আমাদের? ধনীরা স্বেচ্ছাচারী, গুণ্ডারা স্বেচ্ছাচারী, যারা ভদ্র তারা অসহায়। আমি আত্মহত্যা করতে পারতুম, কিন্তু তা পারিনি। মরতে আমার ভয় করে।"

"কিন্তু ভীতুকে কে শ্রদ্ধা করবে বলুন!"

"আমি শ্রদ্ধা চাই না, তোমাদের একটু অনুকম্পা চাই। আর একটা কথা শোন—আমি হয়তো একদিন আত্মহত্যাই করে ফেলতাম, জীবন আমার দুর্বহ, কিন্তু আমি বেঁচে থেকে তোমার বাবার মনোরঞ্জন করছি বলে আমার পঙ্গু বাবা আর অন্ধ মা সুখে আছেন, আমার গুণ্ডা ভাইটার একটা চাকরি হয়েছে, আইনত যিনি আমার স্বামী তিনি আর একটা বিয়ে করেছেন—সব হয়েছে তোমার বাবার টাকায়। আমি বেঁচে আছি বলেই তোমার বাবা টাকা দেন। মরে গেলে আর দেবেন না। তাই ওদের মুখ চেয়েই আমি বেঁচে আছি। তোমরা ভদ্রলোক, আমার দুঃখের কথা, আমার ত্যাগের কথা তোমরা হয়তো বুঝবে না। আমি কিন্তু আশা করেছিলাম তুমি একটু অন্যরকম হবে। তাই তোমার কাছে এসেছিলাম।"

"আমি কি করব বলুন?"

"আমি কি বলব বল। আমার নিজের দুঃখের কথা তোমাকে খুলে বললাম এখন তোমার যা খুশি কর।"

কিঙ্কিণী চুপ করে ছিল খানিকক্ষণ। তারপর বলেছিল, "আপনার কথা শুনে দুঃখ হচ্ছে খুব। আপনি যেমন আছেন তেমনিই থাকুন। ওই নাগপাশ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবার সামর্থ্য আপনার যখন নেই তখন—"

"সামর্থ্য আছে, কিন্তু আমি যদি চলে আসি আমার পঙ্গু বাবা আর অন্ধ মার কি হবে। তাঁদের সেবার জন্যে আমি এখন মাসে পাঁচ শ টাকা খরচ করতে পারি, চলে এলে তা তো পারব না—"

কিঙ্কিণী ভ্রূ কুঞ্চিত করে ভেবেছিল খানিকক্ষণ। তারপর বলেছিল "আমি যদি আপনার বাবা মায়ের খবর দিই, আপনি চলে আসতে পারবেন?"

"পারব—"

"আমার বাবা কি তাতে বাধা দেবেন না?"

"বাধা দেবেন কি না জানি না। শুধু এইটুকু জানি,—আমার সম্বন্ধে তাঁর আর মোহ নেই।

তিনি এখন একটি ইহুদী তরুণীকে নিয়ে ব্যস্ত। তার জন্যে চৌরঙ্গী অঞ্চলের একটা বড় হোটেলে তিনি খানকয়েক ঘর ভাড়া নিয়েছেন, নিজেও সেখানে থাকেন—তার জন্যে ফ্ল্যাট কিনবেন শুনছি—"

কিঙ্কিণী মাথা হেঁট করে বসে রইল। নিজের মৃত্যু কামনা করছিল সে বসে বসে। যে পিতার সম্বন্ধে আমাদের দেশে বলা হয়েছে পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাহি পরমং তপঃ—তার অদৃষ্টক্রমে সেই পিতাই এমন পিশাচ হল কেন? হঠাৎ তার মনে পড়েছিল বাবার সেই কান্নাটা। হাউ হাউ করে কেঁদেছিলেন তিনি তার সামনে। সেটা কি নিছক মাতালের কান্না? সেটা কি তাঁর অসহায় কামনা-পীড়িত আর্ত ব্যক্তিত্বের হাহাকার নয়?

"আপনি যদি আমার বাবার আশ্রয় ছেড়ে চলে আসেন তাহলে মাসে মাসে আমি পাঁচ শ টাকা দেব। আপনার ঠিকানাটা দিন আপনাকে চেক পাঠিয়ে দেব সেখানে।"

"কিন্তু আমি আরও কিছু চাই—"

"কি বলুন!"

"আমি তোমাকে চাই। তুমি আমার বাড়িতে এস একদিন। দেখে যাও আমার অসহায় বাবা-মাকে। আর দেখে এসো আমার সিফিলিসগ্রস্ত বিকলাঙ্গ মেয়েটাকে। সে তোমারই বাবার সন্তান—"

হঠাৎ একটা উচ্ছলিত অট্টহাস্যে পূর্ণ হয়ে উঠল চতুর্দিক। কিঙ্কিণীর চিন্তাধারা এলোমেলো হয়ে গেল। সে অতীতে ফিরে গিয়েছিল, ওই অট্টহাসির রূঢ় আঘাতে সহসা ফিরে এল বর্তমানে। চোখে পড়ল সেই লীলালাস্যময়ী কলহাস্যমুখরা ঝর্ণাধারা, আর সেই তিনটি নিঃসঙ্গ তুষারাবৃত পর্বত। পাহাড় তিনটির স্বর্ণকান্তি আর নেই, রোদ সরে গেছে, বহুবর্ণরঞ্জিত মেঘের পাগড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে তারা। কিঙ্কিণীর মনে হল তার দিকে চেয়ে তারাও যেন হাসছে নীরবে। তার দুঃখ, তার লজ্জা, তার বেদনা, তার অপমান, তার অতীত জীবনের সমস্ত গ্লানি মুহূর্তে যেন তুচ্ছ হয়ে গেল তার কাছে। আনন্দ-তরঙ্গের স্রোতে সামান্য খড়কুটোর মত সব ভেসে গেল যেন। অভিভূত হয়ে বসে রইল সে। উমা আর পার্বতীকে দেখা গেল দূরে। খাবার নিয়ে আসছে তারা। তবু বসে রইল কিঙ্কিণী। ভয় হচ্ছিল যে আনন্দ অভিভূত করেছে তাকে, উঠলেই তা আর থাকবে না। কিন্তু উঠতে হল আর একটা কারণে। হঠাৎ সে দেখল দমন দেও একমুখ হেসে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। তার ঘাড়ে একটা বস্তা।

"আপনার কপাটটা খোলা দেখলাম, তাই ঢুকে পড়েছি। আমাকে ভোলেননি আশা করি। এক ট্রেনেই আমরা এসেছি এখানে—"

কিঙ্কিণীর কপাট সর্বদাই খোলা থাকে। সে মনে মনে আশা করে রঘুপতি আসবে কোনোদিন। কখন তার আসবার ইচ্ছে হবে তা তো সে জানে না। আন্দাজও করতে পারে না। তাই তার কপাট সব সময়ই খোলা থাকে। একদিন এক পাল পাহাড়ী ছাগল ঢুকেছিল, কিন্তু তাকে দেখেই পালিয়ে গিয়েছিল তারা। তারপর আর কেউ আসেনি। তার উপত্যকার পুকুরটিতে মাঝে মাঝে একজোড়া রাজহংস নামে এসে। ধপধপে সাদা রাজহংস। কোনো শব্দ করে না। নীরবে ভেসে ভেসে বেড়ায় নীলকমলের বনে। খুব ভোরে আসে। খানিকক্ষণ থাকে তারপর উড়ে যায়। উড়ে যায় ওই বরফ-ঢাকা পাহাড়গুলোর ওপারে। দমন দেও আসবে এ

প্রত্যাশা করেনি কিঙ্কিণী। সবিস্ময়ে চেয়ে রইল সে দমন দেওয়ের দিকে। চোখাচোখি হতেই দমন দেও একবার হাসল, তারপর কাঁধের বস্তাটা নামিয়ে রীতিমত অভিবাদনের ভঙ্গীতে নমস্কার করল কিঙ্কিণীকে।

"আমি তোমার কাছেই একটা উপত্যকায় থাকি। তোমার কপাট রোজই খোলা দেখি। মনে করি আসব, আবার ভাবি তুমি হয়তো রাগ করবে। আজ—"

পার্বতী এসে পড়াতে দমন দেও থেমে গেল।

পার্বতী বলল— "আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে। আসুন—"

"তুমি খেয়ে এস।"—দমন দেও তাড়াতাড়ি বলে উঠল— "আমি অপেক্ষা করছি—"

খাওয়া শেষ করে কিঙ্কিণীর একবার মনে হল ওই অসভ্য লোকটার সঙ্গে আর সে দেখা করবে না। ট্রেনে লোকটা তার সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করেছিল তা মনে পড়ল। হাত ধরে টেনে জোর করে বসিয়ে দিয়েছিল নিজের কাছে। সেই ভদ্রলোক না থাকলে, আর সেই সাপটা ফণা তুলে না দাঁড়ালে...হঠাৎ সব গুলিয়ে গেল আবার। যে ট্রেনে সেদিন সে চড়েছিল সে ট্রেন কি সত্যিই ট্রেন? গুণ্ডার ভয়ে সে মাঠামাঠি ছুটেছিল অন্ধকারে, মোটরে করে পালিয়েছিল কলকাতা থেকে, কিছু দূরে গুণ্ডার মোটরটাও ছুটেছিল তার পিছু পিছু। সে হঠাৎ ড্রাইভারটাকে বলেছিল—তুমি মোটরটা নিয়ে চলে যাও, আমি এখানে নেবে যাই—ওদের মোটরটা তোমার পিছু পিছু যাক—যতদূর পার ভুলিয়ে নিয়ে যাও ওকে—আমি এখান থেকে নেবে চলে যাব। অন্ধকার মাঠের ধারে নেবে পড়েছিল সে—তারপর হঠাৎ দেখতে পেয়েছিল ট্রেনটাকে। খানাখন্দ পেরিয়ে অনেকবার হোঁচট্ খেয়ে অনেকবার পড়ে গিয়ে অনেক দূর আসার পর যখন কোথাও কোনো আশার আলো তার চোখে পড়ছিল না, তখন সেই নিঃস্ব নিঃসঙ্গ, নিরুপায় মুহূর্তে তার মনে মনে কি ভগবানের কথা জাগেনি? জেগেছিল। তার পিসিমার সেই শিবঠাকুরকেই মনে মনে প্রার্থনা করছিল সে, আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও—হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারেই করেছিল, হয়তো তার আপাত-স্পষ্ট জ্ঞানের মুখোশটা খুলে পড়েছিল তখন, হয়তো ক্ষণিকের জন্য সে এমন একটা আশ্রয় পেয়েছিল যা নির্ভরযোগ্য, দারুণ দুর্যোগের অতল সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে সে হঠাৎ হয়তো দাঁড়িয়ে পড়তে পেরেছিল সেই অটল প্রস্তরভূমির উপর যার নাম একান্ত বিশ্বাস, সেইখানে দাঁড়িয়ে সে হয়তো যে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছিল, তার ফলেই এই সব অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। পংখী যাকে পরম মুহূর্ত বলছিল সেই পরম মুহূর্তেই সে প্রবেশ করেছে হয়তো, তাই সম্ভব-অসম্ভবের পুরোনো ফরমুলা হয়তো খাটছে না আর। হঠাৎ তার মনে হল বাস্তবজীবনেও সে ফরমুলা কি ঠিক আছে? ফোন, রেডিও, প্লেন, মহাকাশ ভ্রমণ, বিজ্ঞানের আরও অসংখ্য আবিষ্কার কি প্রমাণ করছে না যে আজ যা অসম্ভব কাল তা সম্ভব হচ্ছে, কিম্বা হবে। চাঁদের কাছাকাছি আমরা যেতে পারব তা কেউ কি ভেবেছিল কোনোদিন? তাহলে এখন যা দেখছি তা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে কেন? ওই ডাকাতটাকে তার ভয়ই বা করছে কেন। ওর চেহারায় সে রকম উদ্ধত ভাব তো নেই। হয়তো অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। হয়তো ও ভদ্র হয়ে গেছে। দেখাই যাক না কি বলে। বেরিয়ে এসে চমকে গেল কিঙ্কিণী। দেখল দমন দেওয়ের কাছে একটি বিরাট সিংহ বসে আছে। নিবিষ্ট মনে নিজের থাবা চাটছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

দমন দেও হেসে বলল, "ভয় পেও না, ও আমার পোষা সিংহ, তোমাকে কিছু বলবে না।"

"পোষা সিংহ? এখানে সিংহ কোথা পেলেন!"

"সিংহ আমার মধ্যেই ছিল। মহাদেবের কৃপায় ওটাকে আমার ভিতর থেকে বার করে ফেলতে পেরেছি। ও এখন পোষা কুকুরের মত আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে।"

"আপনার ভিতরে ছিল ওই সিংহটা?"

হাস্যোদ্ভাসিত হয়ে উঠল দমন দেওয়ের মুখ।

"আমার মধ্যে যে হিংস্র প্রবৃত্তি ছিল তার চেহারা যে সিংহের মত তা আমিও জানতাম না। যখন বেরিয়ে এল তখন দেখে অবাক হয়ে গেলাম—।"

"কি করে বেরিয়ে এল।"

"মহাদেবের কৃপায়। তিনি বললেন তুমি আন্তরিকভাবে একাগ্র হয়ে যা ইচ্ছা করবে তাই হবে। সত্যিই একদিন ইচ্ছা করলাম আমি ভদ্র হব, আমার মধ্যে যে পশু আছে সে বেরিয়ে যাক। আমি চোখ বুজে একাগ্র হয়ে এই ইচ্ছা করছিলাম, হঠাৎ চোখ খুলে দেখলাম সিংহটা আমার সামনে বসে ল্যাজ আছড়াচ্ছে। তার দিকে চাইতেই সে মানুষের ভাষায় বললে—আমি তোমার ইচ্ছায় তোমার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছি। তুমি না চাইলে তোমার ভিতরে আর ঢুকব না। কিন্তু তোমার সঙ্গে থাকব বরাবর।"

"আশ্চর্য তো। মহাদেবের সঙ্গে আপনার দেখা হয়?"

দমন দেও মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। এ কথার উত্তর দিল না। তারপর হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হল সে।

"এইবার আমি যার জন্য এসেছি তা বলি—"

এই বলে সে নিজের বস্তাটি খুলে যা বার করে রাখল, তা দেখে অবাক হয়ে গেল কিঙ্কিণী! অনেক মোহর, অনেক জড়োয়া গহনা, অনেক হীরা, মুক্তা, পান্না, চুনী, স্তূপীকৃত করে ফেলল সে বারান্দার উপর। অবশেষে পকেট থেকে ডিমের মত প্রকাণ্ড একটা গোলাপি পাথর বার করে বলল—"এটা পদ্মরাগ মণি। দুর্লভ রত্ন—।"

"কোথায় পেলেন এসব—"

"ডাকাতি করে সঞ্চয় করেছিলাম। একটা জঙ্গলে পোঁতা ছিল। পংখীকে একদিন বললাম এনে দাও ওগুলো আমাকে। আমার সারাজীবনের সঞ্চয় ওভাবে নষ্ট হোক এটা আমি চাই না। পংখী এনে দিয়েছে কাল। এখন তোমার কাছে এসেছি একটা অনুরোধ নিয়ে—"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিঙ্কিণী।

"এগুলো তুমি নাও। সত্যি আমি তাহলে কৃতার্থ হব।"

"আমি? আমি কি করব এসব নিয়ে!"

"কি করব তা তুমি ঠিক কোরো। কিন্তু তুমি যদি না নাও তাহলে আমার কর্মশক্তি পঙ্গু হয়ে যাবে। কারণ ডাকাতি করা ছাড়া আর কিছুতেই আমার কৃতিত্ব নেই। প্রবৃত্তিও নেই। কিন্তু ডাকাতি করে যা পাব তা কাউকে দিতে না পারলে উৎসাহই থাকবে না আমার—"

"কেন আপনার আপনজন নেই কোথাও?"

"বাপ মা বাল্যকালে মারা গেছেন। তাদের কথা আমার ভালো মনে নেই। তাঁরাও চুরি ডাকাতি করতেন। আমাকে মানুষ করেছিলেন ডাকু শের সর্দার। তাঁর ফাঁসি হয়ে গেছে। তাঁর মেয়ে কাজরীকে আমি ভালোবাসতাম। তাকে জোর করে হরণ করে নিয়ে যে গুণ্ডা পালিয়েছিল তাকে আমি হত্যা করি। হত্যা করে ধরা পড়েছিলাম, জেলে ছিলাম, হয়তো আমারও ফাঁসি হয়ে যেত, কিন্তু জেল থেকে আমি পালাতে পেরেছি—"

"কাজরী কোথা?"

"সে আত্মহত্যা করেছে। সে থাকলে—"

চুপ করে গেল দমন দেও কিছুক্ষণের জন্য।

তারপর হঠাৎ বলল—"আমি তোমার মধ্যেই আবার কাজরীকে সৃষ্টি করব। তুমি কাজরী এই ভেবেই আমি তোমাকে আমার যথাসর্বস্ব দেব। লুঠ করে আনব কুবেরের ভাণ্ডার। এনে তোমার পায়েই ঢেলে দেব সব। তুমি শুধু গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ কর—"

এর জন্য প্রস্তুত ছিল না কিঙ্কিণী। এ উক্তি শুনে তার যা মনে হওয়া স্বাভাবিক তাই হল। কলেজ জীবনে অনেক প্রণয়ী তার কাছে নানা সুরে প্রণয় নিবেদন করেছে, সকলকেই প্রত্যাখ্যান করেছে সে। কাউকে রূঢ়ভাবে, কাউকে ভদ্রভাবে। তার মনে হল দমন দেও যা বলছে তার ভাষাটা যদিও হেঁয়ালির মত, কিন্তু ভাবটা স্পষ্ট। অর্থাৎ সেও প্রণয় নিবেদন করছে। সে কাজরীকে তার মধ্যেই আবার সৃষ্টি করতে চায়—তার মানেই...একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। রাগ হল না। বরং তার মনে হল পরম মুহূর্তের অসম্ভব কাণ্ডকারখানার মধ্যে এও একটা নতুন ধরনের সুর বাজছে। কিন্তু কোনো কথা বলল না সে। স্মিতমুখে চেয়ে রইল শুধু।

"তুমি কোনো উত্তর দিচ্ছ না যে—"

"যেখানে এসেছি সেখানে সব অসম্ভবই সম্ভব হয় দেখছি। আমার মতামতের কি মূল্য আছে এখানে? আপনি আমার মধ্যেই আপনার কাজরীকে সৃষ্টি করবেন বলছেন—হয়তো এই অসম্ভবের দেশে তা সম্ভব হবে—কিন্তু আমি কাজরী হতে চাই না, জানি না আমার স্বাধীন ইচ্ছার কোনো মূল্য আছে কি না এখানে—"

"স্বাধীন ইচ্ছারই চরম মূল্য এখানে। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই হবে না, হতে পারে না, হবার উপায় নেই। আমি শুধু তোমার কাছে আমার ইচ্ছাটা জানালাম। আমি তোমাকে স্পর্শও করব না, শুধু তোমার কাছে আমার অর্ঘ্য নিবেদন করে যাব—এতে তুমি বাধা দিও না। আমি যা পাব তোমার বারান্দার উপর রেখে যাব, তুমি যদি সে সব স্পর্শও না কর তাহলেও যাব। আমার কাজরী আমার মনেই আছে, তাকে শুধু আমি আরোপ করব তোমার উপর—পাষাণ প্রতিমার উপর যেমন আরোপ করি মনের দেবতাকে—এতেও তুমি আপত্তি করবে?"

"আপত্তি করলেও তো আপনি তা শুনবেন না মনে হচ্ছে!"

"শুনব। সিংহকে আমি বার করে দিয়েছি আমার ভিতর থেকে। জোরজবরদস্তি করছি না তাই। মিনতি করছি। মিনতি করছি তোমার অনিচ্ছা দিয়ে আমার ইচ্ছাকে প্রতিরোধ কোরো না।"

"একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে। আপনি আমাকেই কাজরী করতে চাইছেন কেন। এখানে কি অন্য মেয়ে নাই—"

"আছে। কিন্তু তারা সবাই উমারই নানা রূপ। আমরা যেখানে আছি সেখানে মহেশ্বরই একমাত্র পুরুষ, উমাই একমাত্র নারী! এখানে উমা মহেশ্বরই নানা রূপে আছেন। বাইরে থেকে মহেশ্বরই আমাদের নিয়ে এসেছেন হয়তো আমাদের মুক্তির জন্য। আমাদেরই কেন এনেছেন তা জানি না। কিভাবে আমরা এখানে এলাম তা তোমার অজানা নেই। ট্রেনে যখন তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম তখনই আমি চমকে উঠেছিলাম। মনে হয়েছিল, যে কাজরীকে আমি হারিয়েছি তাকেই বুঝি ফিরে পেলাম। কাজরী তোমারই মত কালো ছিল, তার চোখের দৃষ্টিতেও সেই আগুনের আভা ছিল যা তোমার চোখের দৃষ্টিতে আছে। সে-ও জেদী ছিল তোমার মতো। সে অসাধ্যসাধন করতে পারত। দুরারোহ পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে পারত, দুরন্ত ঘোড়াকে বশ করতে পারত। তরোয়াল নিয়ে নির্ভয়ে এগিয়ে যেত শত্রুর বিরুদ্ধে। সে ছিল বীরাঙ্গনা! তোমার মধ্যেই সেই বীরাঙ্গনাকে প্রত্যক্ষ করছি আমি। আমার মনে হচ্ছে—"

ঠিক এই সময়ে দেখা গেল পংখী আসছে। আকাশপথে পাখির মত উড়ে আসছে। সবিস্ময়ে চেয়ে রইল কিঙ্কিণী সেদিকে।

"পংখী উড়তে পারে না কি!"

"হ্যাঁ। ও সব পারে। আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় পংখীর বেশে মহাদেবেরই কোনো শক্তি ছদ্মবেশে আমাদের দেখাশোনা করছেন। পংখী সাধারণ লোক নয়।"

"আচ্ছা, সেই ভদ্রলোক কোথা? যাঁর রিজার্ভ কম্‌পারটমেন্টে আমরা চড়েছিলাম? তাঁর সঙ্গে কি দেখা হয়েছে আপনার?"

একবার হয়েছিল। তিনি বললেন, 'আমি যে কালীমন্দিরের মহাদেব মিশ্র ছিলাম সেই কালীমন্দিরেই আবার ফিরে যাচ্ছি। সেখানে কালীর সেবা ঠিক মত হচ্ছে না। যিনি সেখানে পৌরোহিত্য করছিলেন তাঁর পুজো করার দিকে তত মন ছিল না, ডাকাতি করার দিকেই মন ছিল বেশি। মা কালীকে তিনি ডাকাতদের নেত্রী করে তুলেছিলেন। কালী ডেকেছেন আমাকে, তাই আমাকে সেই পাহাড়ে ফিরে যেতে হচ্ছে, কারণ সেই পুরোহিত সর্পাঘাতে মারা গেছে সম্প্রতি। পুজোর একটা সুব্যবস্থা করে ফিরে আসব আমি আবার।' এই বলে তিনি চলে গেলেন।"

পংখী এসে পড়ল।

"যে কথাটা বলতে এলাম—সেটা এই বারান্দায় মর্মর পাথরের পরদা টাঙানো হয়ে গেছে। আপনার বর্তমান জীবনের ছবি আপনি দেখতে পাবেন সেখানে—"

"শুধু আমার জীবনেরই ছবি দেখতে পাব? আর কারোর নয়?"

"আপনার বর্তমান জীবনের সঙ্গে যাঁরা যাঁরা সংশ্লিষ্ট আছেন তাঁদের সবাইকেই দেখতে পাবেন। তাঁদের কথাও শুনতে পাবেন—"

কিঙ্কিণী দমন দেওকে দেখিয়ে বলল—"এঁর জীবন যদি দেখতে চাই—"

"তাও পাবেন, ইনি যদি আপত্তি না করেন। ইনি আপত্তি করলে ওঁর ছবি ফুটবে না। এখানে মহাদেবের রাজত্বে স্বাধীন ইচ্ছারই সর্বোচ্চ দাবী। তিনি নিজেও খামখেয়ালী, স্বাধীন।

অতুল ঐশ্বর্যের মালিক তিনি, স্বয়ং কুবের তাঁর ধনরক্ষক, তবু স্বেচ্ছায় তিনি ভিখারির মত বাস করেন শ্মশানে মশানে। তিনি ধ্বংসের দেবতা, কিন্তু আর্ত আতুরকে রক্ষা করাই তাঁর বিলাস। আপনারা কে কখন তাঁকে ডেকেছেন তা আপনারাও জানেন না, কিন্তু তিনি জানেন। যে পরম মুহূর্তটিতে তাঁর সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ ঘটেছিল সেই পরম মুহূর্তেই এখন বাস করছেন আপনারা। সেই পরম মুহূর্তের পরম বাণী স্বাধীনতা। এখানে কারও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হয় না। দমন দেও যদি আপত্তি না করেন, অবশ্যই আপনি তাঁর জীবনকাহিনী দেখতে পাবেন ওই পাথরের পরদায়। আর একটা কথা জিগ্যেস করতে এসেছি। দুজন অতিথি এসেছেন এখানে। তাঁরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। এঁদের আপনি দেখেছেন। এঁরা ট্রেনে ধূর্জটির জন্য বেল আর দুধ এনেছিলেন। ভদ্রলোকের নাম রত্ন আর মেয়েটির নাম ঝিলিক।"

"কে ওঁরা—"

"তা ওঁদের সঙ্গে আলাপ করলেই বুঝতে পারবেন। ওঁদের আসতে বলি?"

"বলুন।"

পংখী অন্তর্ধান করল।

দমন দেও বলল— "আমার প্রার্থনা তাহলে মঞ্জুর হল তো?"

"আমি কি বলব ভেবে পাচ্ছি না। আমার এই বারান্দার উপর ধনরত্ন স্তূপীকৃত করে আপনি যদি আনন্দ পান তাহলে সে আনন্দের অন্তরায় অবশ্য আমি হব না। কিন্তু আমি জানি আপনার কাজরী হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। এ সব ধনরত্ন নিয়েই বা আমি কি করব, তা-ও আমি জানি না। আপনার ওই পদ্মরাগ মণি আর ওই সামান্য পাথরের নুড়িটা তো এখানে সমমূল্য—ও নিয়ে গর্ববোধ করার উৎসাহ নেই আমার!"

"সম-মূল্য স্বীকার করছি, কিন্তু সম-রূপ কি? ওই পদ্মরাগ দ্যুতি কি টাকা দিয়ে কেনা যায়? যে লোকটার কাছ থেকে ওটা কেড়ে এনেছি সে না কি পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে ওটা কিনেছিল। সোনার হারে গেঁথে দুলিয়ে দিয়েছিল তার প্রেয়সীর গলায়। কিন্তু মানায়নি সেখানে। কারণ তার প্রেয়সীর আসল রূপ ছিল না, আসল রূপ থাকে মনে, আসল রূপ থাকে চরিত্রে, আসল রূপ থাকে সংযমে, আসল রূপ শক্তির রূপ—সেই রূপ যার মুখে প্রতিফলিত হয় তিনিই রূপসী। পতিতার মুখে সে রূপ থাকে না, তাই তার গলায় ওই পদ্মরাগ মণি মানায়নি। কাজরীর গলায় মানাত, তোমার গলাতেও মানাবে। পদ্মরাগ মণিতে যে দীপ্তি আছে তা-ও শক্তির দীপ্তি। তুমি ওটা পোরো। আমি কৃতার্থ হব। আমি এখন যাচ্ছি। ঝিলিক আর রত্ন আসছেন—"

"ওরা কে, চেনেন আপনি?"

"না। তবে মনে হয় ওঁরা ছদ্মবেশী দেবতা। মহাদেব ওদের খুব খাতির করেন। আচ্ছা, আমি চলি।"

দমন দেও চলে গেল। তার সিংহও গেল তার পিছু পিছু।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করলেন রত্ন আর ঝিলিক। বকুল ফুলের গন্ধে ছেয়ে গেল চারিদিক।

"আসুন। আপনাদের কি দিয়ে অভ্যর্থনা করব জানি না।"

"এই যে অভ্যর্থনার অর্ঘ্য আমরা এনেছি।"

কিঙ্কিণী ঘাড় ফিরিয়ে দেখল উমা আর পার্বতী দু ডালি ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাত থেকে ডালি দুটি নিয়ে কিঙ্কিণী ফুলগুলি ঢেলে দিল তাদের পায়ের উপর। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল মুরজ মুরলী মন্দিরা, ভেসে এল বীণা বেণুর সুর। রোমাঞ্চিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিঙ্কিণী। হঠাৎ তার মনে পড়ল ট্রেনের সেই ভদ্রলোকের কথা। তিনি তার হাত দেখে যা বলেছিলেন, যে গল্প শুনিয়েছিলেন, তাই কি মূর্ত হতে যাচ্ছে তার জীবনে? রত্নের হাতে পুষ্পধনু দেখে তার সন্দেহ রইল না যে ইনি মদন আর এঁর সঙ্গিনী রতি। সেই ভদ্রলোক যে গল্প শুনিয়েছিলেন তাতেও মদন রতির আবির্ভাব ঘটেছিল। এঁরা কি চান আমার কাছে? কেন এসেছেন দেখা করতে? একটা অজানা আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে উঠল।

হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—"আপনারা শুনেছি দেবতা। দেবতা কখনও প্রত্যক্ষ করিনি। আপনারা বিনা আহ্বানে আমার কাছে এসেছেন এ জন্য আমি অভিভূত। কিন্তু আমার ভয় করছে।"

"কিসের ভয়!"

"ভয় আপনার এই ফুলধনুটিকে—"

রত্ন তাঁর কাঁধ থেকে শরপূর্ণ তূণীরটি নামিয়ে বললেন—"আমার এই ধনু আর শর আপনাকে দিতেই এসেছি আমরা। আপনি এগুলি নিয়ে যা ইচ্ছে করতে পারেন।"

ফুল-ধনু আর তূণীর কিঙ্কিণীর পায়ের কাছে রেখে রত্ন হাসি মুখে চাইলেন তার মুখের দিকে। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিঙ্কিণী। হঠাৎ সে যেন হারিয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। যখন সম্বিৎ ফিরে পেল, তখন দেখল রত্ন তেমনিভাবেই চেয়ে আছেন। ঝিলিকও চেয়ে আছেন সোৎসুকে।

কিঙ্কিণী হাসবার চেষ্টা করল একটু। তারপর একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল—"আমি বুঝতে পারছি না, এসব নিয়ে কি করব আমি। দেবতার অস্ত্র দেবতার কাছেই থাক। আমাকে দিচ্ছেন কেন?"

"আপনাকে সম্পূর্ণ নির্ভয় এবং স্বাধীন করবার জন্য। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তির দিকে আপনার মনকে আকৃষ্ট করতে আমরা চাই না। যে অস্ত্র দিয়ে তা করতে পারতাম তা আপনার হাতেই দিয়ে গেলাম। আপনি যদি কাউকে আকর্ষণ করতে চান তাহলে আপনিই ব্যবহার করবেন আমাদের ধনুর্বাণ। আমরা কিছু করব না।"

"কেন এরকম করছেন, কিছু বুঝতে পারছি না।"

"করছি ধূর্জটির ইচ্ছায়। তাঁর মনে হয়েছে আপনি সর্বদা ভয়ে ভয়ে আছেন। আপনাকে তিনি নির্ভয় করতে চান। তাই দমন দেও আপনার কাছে নতি জানিয়ে অর্ঘ্য নিবেদন করে গেল। দমন দেও আপনাকে ধনরত্ন দিয়ে গেছে, ধনরত্নই তার সর্বস্ব। আমিও আপনাকে আমার ধনুর্বাণ দিয়ে গেলাম কারণ ও ছাড়া আমারও আর কিছু নেই!"

"ধূর্জটির ইচ্ছায়! ধূর্জটির সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?"

"হয়েছে। আপনারও হবে।"

"কিন্তু হচ্ছে না তো।"

"যখন আপনি সুস্থির শান্ত হয়ে বসবেন তখনই হবে। ধূর্জটি চান আপনি সুস্থির শান্ত স্বস্থ হোন। তা না হলে তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারছেন না। আপনার ভয়, আপনার অশান্তি,

আপনার অস্বস্তি আড়াল করে রেখেছে ওঁকে। আপনার কাছেই উনি। সর্বদা আছেন, কিন্তু আপনার চেতনায় মূর্ত করতে পারছেন না নিজেকে—"

"তিনি শুনেছি সর্বশক্তিমান, তাঁর এ অক্ষমতা কেন?"

"ওখানেই তাঁর রহস্য। তিনি স্থাণু। তিনি অপেক্ষা করতে পারেন, অপেক্ষা করতে চান। আলোর মত দাঁড়িয়ে থাকেন বদ্ধদ্বারের সামনে। দ্বার খুললেই দেখতে পাবেন তাঁকে।"

অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিঙ্কিণী। এ বদ্ধদ্বার সে খুলবে কেমন করে? তাছাড়া খোলবার দরকার আছে কি? আমার মত সামান্য প্রাণীকে নিয়ে এঁরা মাথা ঘামাচ্ছেনই বা কেন—!

হঠাৎ চমকে উঠল সে। ঝিলিক হাসিমুখে তাকে জড়িয়ে ধরেছে।

"আজ চললুম ভাই। আবার আসব আপনার কাছে। আসব আপনার রান্না খেয়ে মুখ বদলাতে—"

"এখানে তো রান্না আমি করি না। করে পার্বতী আর উমা।"

"আপনি যদি করতে চান, ওরা বাধা দেবে না। এবার যখন আসব তখন সরষে বাটা আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ইলিশ মাছের ঝাল খেয়ে যাব। বাংলাদেশের মেয়েরা ও রান্নাটায় না কি পারদর্শিনী। পংখীকে বললেই ও সব এনে দেবে! তাছাড়া আর এক রকম মুখ বদলাবার জন্যেও আসব—"

"আর এক রকম মানে?"

"ঘোঁট করতে আসব। ভালো কথা শুনে শুনে কান পচে গেছে। পরনিন্দা, পরচর্চা, একটু আধটু কেচ্ছা বেশ লাগে—" খিলখিল করে হেসে উঠল ঝিলিক।

"আপনাদের স্বর্গে ওসব নেই?"

"স্বর্গে তো আর কেউ মরে না। অমরদের নিয়ে সব কেচ্ছাই পুরানো হয়ে গেছে। ইন্দ্র মাঝে মাঝে বদল হন। আগে যিনি ইন্দ্র ছিলেন, তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ রসিক লোক—অনেকটা গ্রীক দেবতা জিউসের মতো। মর্ত্যে গিয়েও প্রেম করতেন। কেচ্ছার খোরাক পাওয়া যেত অনেক। আজকাল যিনি ইন্দ্র হয়েছেন তিনি জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ। শচীর দিকেও তাকান না ভালো করে। দেবগুরু বৃহস্পতির ভক্ত। শাস্ত্রচর্চা নিয়ে থাকেন সর্দাসর্বদা। সুতরাং স্বর্গীয় আব-হাওয়াটা ঝাল-টক-নুন বর্জিত চরুর মত হয়ে এসেছে অনেকটা। আসব আপনার কাছে মাঝে মাঝে। আমাদের ধনুর্বাণটি যত্ন করে রাখবেন কিন্তু"

"ওটা আমার কাছে রেখে যাচ্ছেন কেন? নিয়ে যান। ওটা আপনাদের হাতে না থাকলে সৃষ্টিকার্য বন্ধ হয়ে যাবে—"

মৃদু হেসে ঝিলিক চাইলেন রত্নর দিকে।

বললেন, "তুমিই এর জবাব দাও।"

রত্ন সদাহাস্যমুখে চুপ করে রইলেন একটু।

তারপর বললেন—"ছাগল, কুক্কুর প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ সাধারণ জীব যে আবেগের বশে সৃষ্টি-রক্ষা করে সে আবেগের সঞ্চার স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই করেন, প্রত্যেক জীবের মধ্যে। সৃষ্টিরক্ষা ব্যাপারে আমাদের কিছু করবার নেই। আমাদের ডাক পড়ে মহাসৃষ্টির সময়। কার্তিকের

উদ্ভবের জন্য যখন মহাদেবের তপোভঙ্গের প্রয়োজন হয়েছিল তখন আমার ডাক পড়েছিল। জীবন তুচ্ছ করেও এগিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর কি হয়েছিল তা তো আপনি জানেন! আপাতত মহাসৃষ্টির কোনো কাজ নেই। তাই আপনার কাছেই রেখে যাচ্ছি আমার ধনুর্বাণ। ধূর্জটির বিশ্বাস এতে আপনি নির্ভয় হবেন—"

"ধূর্জটি আমাকে নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন তা বুঝতে পারছি না।"

"আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন তিনি।"

"কিন্তু আমি তো তাঁকে কোনো প্রার্থনা করিনি।"

"জ্ঞাতসারে করেননি, কিন্তু অজ্ঞাতসারে করেছেন! যে অন্ধকারে আপনি তাঁকে খুঁজছেন সে অন্ধকারের খবর আপনিও জানেন না। সেই গভীর নিবিড় অন্ধকারে যে প্রার্থনা নির্বাক অথচ স্বতঃস্ফূর্ত তাই তিনি শুনতে পেয়েছেন। আচ্ছা, আজ আমরা যাচ্ছি। ধনুর্বাণটা রইল।"

"এ ধনুর্বাণ কি আমি ব্যবহার করতে পারব?"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু এখানে—এই নির্জন পাহাড়-ঘেরা উপত্যকায় লক্ষ্য করবার মত লোক পাবেন কি?"

কিঙ্কিণী দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

অন্তর্ধান করলেন রত্ন আর ঝিলিক।

সেই ঝরনার হাসি আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল তার চেতনায়। পাহাড় তিনটির রূপ বদলেছে আবার। আগে মাথায় তাদের মেঘের পাগড়ি ছিল, এবার সর্বাঙ্গে মেঘের উত্তরীয়, মাথায় সোনার মুকুট। তার উপর ঘননীলের অদ্ভুত চন্দ্রাতপ, অসীমের অনন্ত পটভূমিকা। একদল বড় বড় রাজহংসের সারি উড়ে যাচ্ছে মালার মতো। মনে হচ্ছে তুষার পর্বতের বরফই যেন উড়ে উড়ে যাচ্ছে রাজহংস হয়ে। নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সে। বিস্মিত হবার ক্ষমতাও যেন লোপ পেয়ে গেছে। সমস্ত পাহাড়গুলোই যদি পাখি হয়ে উড়তে থাকে তাহলেও অবাক হবে না সে। এখানে সবই হতে পারে এ বিশ্বাসটা মনে পাকা হয়ে গেছে তার। যে উপত্যকায় রঘুপতি থাকে সে উপত্যকাটার দিকে চেয়ে দেখল সে ঘাড় ফিরিয়ে। চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। একটা পাহাড়ের উপর পাহাড়ী কি একটা লতা অজস্র ফুল ফুটিয়েছে। আর একটা দূরের পাহাড় থেকে ঝরনা নাবছে, মনে হচ্ছে একটা রুপোলি স্বপ্ন কাঁপছে যেন। হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসল কিঙ্কিণী। ফুলধনুটি তুলে নিল সে। তুলেই চমকে উঠল। ফুলধনু কথা কইছে।

"দেবি, কি উদ্দেশ্যে আমাকে ব্যবহার করছেন তা আমাকে বলুন, তাহলে আপনার উদ্দেশ্য সহজে সিদ্ধ হবে। কি বাণ ব্যবহার করবেন তা-ও আমি বলে দেব।"

"ওই যে উপত্যকাটি রয়েছে ওই দিকেই একটা বাণ নিক্ষেপ করতে চাই।"

"কোনো বিশেষ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নয়?"

রঘুপতির নামটা বলতে পারল না সে। লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে রইল!

"বলুন—"

আর একটু চুপ করে থেকে কিঙ্কিণী বলল—"ওই উপত্যকায় যিনি থাকেন তাঁকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি, তিনি আপনভোলা সন্ন্যাসী মানুষ। ওখানে রিসার্চ করছেন শুনেছি, হঠাৎ আমার

মনে হল তিনি কি আমার দিকে একটু মনোযোগ দেবেন না? কিন্তু এখন ভেবে দেখছি সেটা ঠিক হবে না—"

"তাঁর তপোভঙ্গ করতে চান না? আমি মহাদেবের তপোভঙ্গ করেই কিন্তু বিখ্যাত হয়েছিলাম একদিন। ভস্মীভূত হয়েও আনন্দিত হয়েছিলাম উমার তপস্যা সার্থক করতে পেরেছিলাম বলে। আপনার জন্যে আবার ভস্মীভূত হতে রাজি আছি আমি—"

"না, আমি উমা নই। উমার মত তপস্যা করিনি আমি। আমার মনের সামান্য দূর্বলতা এটা, এর জন্য আমি লজ্জিত। না, আমি তীর ছুঁড়ব না—"

পুষ্পধনু বলল, "একটা কথা কিন্তু মনে রাখবেন। দুর্বলতাই শক্তি অনেক সময়। বজ্র যখন হার মানে দু'ফোঁটা চোখের জলই তখন জিতে যেতে পারে। যাই হোক, আমরা অপেক্ষা করে রইলাম, যখনই স্মরণ করবেন, সাড়া দেব। ওই আবার কে আসছে যেন।"

ছায়ার মত, স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল পুষ্পধনু আর তূণীর। এদের এই আসা আর চলে যাওয়াটা কেমন যেন আকস্মিক কেমন যেন অদ্ভুত। টপ করে আসে টপ করে চলে যায়। যেন টর্চের আলো। তারপর সে দেখতে পেল একটু কুঁজো হয়ে লাঠির উপর ভর দিয়ে দিয়ে একটি রোগা লোক আসছে তার দিকে। খুব কাছে এসে লাঠির উপর ভর দিয়ে ঘাড়টা উঁচু করে সে তাকাল কিঙ্কিণীর দিকে। লোকটির ভুরু পাকা, মাথায় টাক, ছোট গোল মুখ, চোখে চশমা, সাধারণ চশমা, চশমার দুটো ডাঁটও নেই, একদিকে সুতো বাঁধা। গায়ের লম্বা জামাটা গরম জামা বলেই মনে হয়, কিন্তু নানা রঙের তালি দেওয়া সেটা। পায়ে জুতো আছে, কিন্তু তাও তালিমারা। লোকটি খানিকক্ষণ ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে রইল। তারপর বলল— "তুমিই কিঙ্কিণী না কি!"

"হ্যাঁ—"

"কি আপদ! আমি ভেবেছিলাম হোমরা চোমরা গোছের কাউকে দেখব। তুমি দেখছি আমার নাতনির মেয়ে চাঁপার চেয়েও ছোট। তোমার সঙ্গে গল্প করতে এলাম, কিন্তু তোমাকে দেখে যে দমে গেলুম গো। তুমি তো খালি মজার গল্প শুনতে চাইবে, কিন্তু মজার গল্প তো সব ভুলে গেছি—"

কিঙ্কিণী এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল তাঁকে।

"আরে, আরে ফট্ করে পেন্নাম করে বসলে। তুমি কি জাত গো। আমি যে কায়স্থ। তুমি কি—"

"আজ্ঞে আমি অস্পৃশ্য। আধুনিক ভাষায় হরিজন বলতে পারেন।"

"কি রকম? হাড়ি, ডোম, মুচি, মেথর এদেরই তো হরিজন বলে শুনেছি।"

"আমি ওদের চেয়েও নীচু। আমার বাবা কালোবাজারি মাতাল, চরিত্রহীন গুণ্ডা।"

"কি আপদ। অনেক রকম ভণিতা জানো দেখছি, গড়গড় করে মুখস্থ করা বুলি আউড়ে দিলে! তোমার বাবার উপাধি কি?"

"বিশ্বাস। আসলে কিন্তু তিনি বিশ্বাসঘাতক—"

"ও বাবা!"

উবু হয়ে বসে পড়লেন ভদ্রলোক মাটির উপর।

"ওখানে বসলেন কেন, আসুন, ভিতরে আসুন।"

"বিশ্বাসঘাতকের বেটিকে বিশ্বাস করব কি না ভাবছি। তাছাড়া আমি দামি চেয়ার ফেয়ারে বসতে পারি না। মাটিতে কম্বলের আসন বিছিয়েই বসেছি বরাবর, বড় জোর কাঠের পিঁড়ে—"

কিঙ্কিণী একটু বিব্রত বোধ করছিল, কম্বল কি পিঁড়ে তার কাছে তো নেই। হঠাৎ সে দেখল—পার্বতী তার ঘরের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বলছে, "এই ঘরে কম্বল পেতে দিয়েছি! পিঁড়েও এনেছি একটা। আপনি আসুন—" বলেই সে মুখটা ঢুকিয়ে নিল ভিতরে। বোধহয় চলেই গেল।

"ওই এক মুশকিল এখানে বুঝলে? ইচ্ছাটি হওয়ামাত্রই তা পূর্ণ হয়ে যাবে। আমার এই পুরোনো জামাটার জন্য মন কেমন করছিল, সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হল সেটা, জুতোটাও!"

"আসুন, ভিতরে আসুন—"

"চল—"

"আপনার পরিচয় তো দিলেন না।"

"দেবার মত পরিচয় নেই কোনো। সবাই আমাকে বক বলে ডাকে।"

বকের নাম শুনেছিল কিঙ্কিণী।

"আসুন—"

"আমার নাম শুনে ভয় করছে না তোমার?"

"না, ভয় করবে কেন।"

"মহাভারত পড়নি বুঝি। বকরূপী এক রাক্ষসকে অমর করে রেখে গেছেন বেদব্যাস। বক চারজন পাণ্ডবকে ঘায়েল করে ফেলেছিল। পারেনি কেবল যুধিষ্ঠিরকে—"

কিঙ্কিণী বললে, "পড়েছি সে গল্প। আপনার এ নাম কে রেখেছিল, বাবা, মা, না, ঠাকুমা।"

"হল না, আন্দাজ করতে পারলে না। রেখেছিলেন আমার ঠাকুরদা, তিনি কবি ছিলেন। বাড়ির সব ছেলেমেয়েদের নাম ফুল দিয়ে রেখেছিলেন। আমার নাম ছিল কুরুবক। কিন্তু আমাদের দেশে সব জিনিসকেই তো বেঁকিয়ে চুরিয়ে দুমড়ে দেয়—এইটে করতেই আমরা ওস্তাদ। আমার নামটাকে করে দিলে ক্রুরবক। কেউ কেউ আবার বলত কুর্বক। ঘোঁতা ছুতোর বলেছিল স্ক্রু-বক্। শেষকালে বকটাই স্থায়ী হয়ে গেল। কুরু মারা পড়ল—"

ভিতরে ঢুকে দেখা গেল একটি পুরু কালো কম্বল বিছানো রয়েছে। একটি তাকিয়াও রয়েছে তার উপর। আর একধারে পিঁড়েও রয়েছে একটি।

বক লাঠিটি একপাশে রেখে কম্বলের উপর বসলেন। তারপর কিঙ্কিণীর দিকে চেয়ে বললেন— "তুমি চেয়ারেই বস—"

"না, আমি আপনার পাশেই বসব।"

বসে পড়ল সে।

"বলুন, আপনার গল্প—"

"মজার গল্প একটাও মনে পড়ছে না। কিন্তু। হ্যাঁ হ্যাঁ একটা মনে পড়েছে। খুব ছেলেবেলায় একটা প্রজাপতি ধরেছিলাম। ভেবেছিলাম সেটাকে পুষব। ভাবছিলাম কোথায় রাখব, বাবার আলমারিতে না, মায়ের তোরঙ্গে। ঠাকুরদাকে যদি বলি—আমাকে ছোট্ট কাচের বাক্স করিয়ে দাও, দেবে কি? এই সব ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম, প্রজাপতিটা

উড়ে গেল, হাতে থেকে গেল ডানার একটা টুকরো। বেশ মজা? না? একটু পরে সেটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলে আমার বোন ফল্‌তি। তার পর সেই ডানার টুকরোটা নিজের কপালে আটা দিয়ে সেঁটে সে দৌড়াতে লাগল আর বলতে লাগল আমি প্রজাপতি হয়েছি, আমিও উড়ছি। তারপর কি হল, শুনবে?"

"বলুন—"

"একটু পরেই মোটর চাপা পড়ে মারা গেল মেয়েটা। মানে প্রজাপতিটির মত সেও উড়ে গেল চিরকালের মত। মজা লাগছে?"

ম্লান হেসে কিঙ্কিণী বলল—"মরে গেল, এতে আর কি মজা—"

"ওইটেই তো আসল মজা।"

"ফল্‌তি আমাকে খামচে দিত আর আমি তার চুল ধরে টানতাম। এখন কি হয়েছে জানো? ওগুলো ফুল হয়ে ফুটে আছে মনে। ছেলে মেয়ে ভাই বোন নাতি নাতনি অনেক মরেছে, অনেক ফুলের অনেক মালা পরে বসে আছি আমি—"

"দুঃখ হয়নি আপনার?"

"দুঃখ হয়েছিল বই কি। আমি তো সাধারণ মানুষ। অনেক কেঁদেছিলুম, ঠাকুরের পায়ে অনেক মাথা খুঁড়েছিলাম, ঠাকুর কোনো সাড়া দেননি। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখলুম, মন ফুলের মালা পরে বসে আছে। হয়তো ওটা ঠাকুরেরই দয়া, ঠাকুর হয়তো অমনি করেই সাড়া দেন—"

"আপনি এখানে কতদিন এসেছেন?"

"অনেকদিন, তারিখ টারিখ বলতে পারব না, কারণ তারিখের হিসেব রাখবার দরকার হয় না তো। তবে এসেছি অনেকদিন—"

"ট্রেনে করে এসেছিলেন কি, প্রথম ট্রেনে তারপর হেলিকপ্‌টারে?"

"আরে না না! কি আপদ, আমি গরিব মানুষ অত ভাড়া পাব কোথায়? আমি কাশীতে ছিলাম তখন। একটা ছোট্ট ঘর ভাড়া করে বাবা বিশ্বনাথের কাছে থাকতাম। দেশে বিঘে পঞ্চাশেক ধেনো জমি ছিল, তেনা দেখাশোনা করত। তেনা আমার আপন লোক নয়, পাড়ার লোক। তেনার পুরো নাম ত্রিনয়ন, কিন্তু আসলে সে ছিল কানা। একটি চোখ বসন্তরোগে নষ্ট হয়ে যায় ছেলেবেলায়। সে আমার বড় নাতির সহপাঠী। আমার তো কেউ ছিল না, তাই তেনাই বিষয়ের দেখাশোনা করত। তাকে এ জন্যে মাসে মাসে মাইনে দিতাম। আমার ইচ্ছে ছিল আমার মৃত্যুর পর বিষয়টা আমাদের গ্রামের স্কুলকে দিয়ে যাব। একটা উইলও করেছিলাম এই মর্মে। হঠাৎ তেনা হাজির হল একদিন এসে। বললে, আমিই তোমার জমি কিনতে চাই, ওটা আমায় বিক্রি কর। নগদ দু'হাজার টাকা দিচ্ছি তোমাকে, আমাকে দিয়ে দাও জমিটা। ব্যাঙ্কে জমা করে দিলে মাসে দশ টাকা করে সুদ পাবে। আর তুমি যতদিন বাঁচবে আমিও ততদিন তোমাকে মাসে মাসে দশ টাকা করে দেব! ওতেই তোমার চলে যাবে কাশীতে। আমি দলিলপত্র সব তৈরি করে এনেছি। দলিলপত্র বার করে তেনা না-ছোড় হয়ে বসল। আমি বললাম—আমি জমি বেচব না। জমি স্কুলকে দান করব। কানা তেনা মুচকি হাসলে একটু। বললে, তোমাকে সদ্বুদ্ধি দিচ্ছি জমিটা আমাকে বিক্রি করে টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা

দিয়ে দাও। আর তাতে যদি রাজি না হও তাহলে চললুম। তোমার একটা সই জাল করা শক্ত হবে না আমার পক্ষে। জমি আমিই ভোগ করব, তোমাকে যে দুহাজার টাকা দেব ভেবেছিলাম সেটা আমার বেঁচে গেল। ভালোই হল। চললুম! চলে গেল সে। সেই সময় আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়েছিল। বাবা বিশ্বনাথকে ডেকে বলেছিলাম—ঠাকুর আমাকে এই নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও এবার। আমাকে শান্তি দাও। তার পরদিন সকালে দেখি আমি এখানে চলে এসেছি। ঘুমন্ত অবস্থায় কে কখন কিভাবে এখানে আমাকে নিয়ে এসেছে জানি না। ঘুম যখন ভাঙল তখন দেখলাম পংখী দাঁড়িয়ে আছে। মুচকি হেসে জিগ্যেস করলে— 'কি কি চাই আপনার? রাত্রে ভালো ঘুম হয়েছিল তো?' আমি তো অবাক। জিগ্যেস করলাম, কোথায় আছি আমি? পংখী বললে—পরম মুহূর্তে। পরম মুহূর্তে? সে আবার কি? কি করে এলাম! পংখী বললে—বাবা বিশ্বেশ্বরের কৃপায়। এখানে শান্তিতে থাকবেন, কোনো ভয়ের কারণ নেই। আপনার কি কি চাই বলুন, সব ব্যবস্থা করে দেব। এই মেয়ে দুটি রইল, এদের বললেই হবে। বলেই সে চলে গেল। দেখলুম দুটি মেয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করছে। হাঁ করে বসে দেখছি, এমন সময় আর একটা অদ্ভুত কাণ্ড হল। প্রকাণ্ড একটি গোখরো সাপ এসে ফণা তুলে দাঁড়াল আমার বারান্দার নীচে। মানুষের ভাষায় বলল— তেনাকে শেষ করে এসেছি। সে আর আপনার জমি নিতে পারবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার হাঁ-টা আরও বড় হয়ে গেল। কিছু বলবার আগেই সাপটা চলে গেল। কি কাণ্ড কিছুই বুঝতে পারলাম না। হকচকিয়ে বসে রইলাম। কতক্ষণ বসে ছিলাম জানি না। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে সব বুঝলাম—"

"কি বুঝলেন—"

হাসি ফুটে উঠল বকের মুখে।

বললেন—"কি বুঝেছি তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। শুধু বুঝেছি লোহার থালাটা সোনার থালা হয়ে গেছে বিশ্বেশ্বরের কৃপায়। ওতে আর মরচে ধরবে না। কক্‌খনো ধরবে না।"

"আমি কিন্তু এখনও বুঝতে পারিনি কিছু। সবই মনে হচ্ছে ধাঁধা—"

"পারবে পারবে। পট্‌ করে হবে না। সময় লাগবে, কিন্তু হবে—"

বকের চোখ মুখ হাসিতে ভরে উঠল।

"কিছু খাবেন?"

"না। আমি একবেলা স্বপাক খাই। আমি খেয়ে এসেছি।"

কিঙ্কিণী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

"স্বপাক খাই গো। ওই অভ্যাস হয়ে গেছে। আমাকে রেঁধে দেবে কে আমার তিনকুলে কেউ আছে কি? পোয়াটাক দুধ ফুটিয়ে এক মুঠো চাল ফেলে দি তাতে। তারপর খানিকটা জল ঢালি। তারপব দিই একটু গুড়। সেইটে নাবিয়ে ঠাণ্ডা করে শিব ঠাকুরকে নিবেদন করে দিই। তারপর প্রসাদ পাই। ওইটুকু করতেই আমার একবেলা চলে যায়—মানে, আগে যেত। গোয়ালা বাড়ি গিয়ে সামনে দুধ দুইয়ে আনতাম। চালগুলি একটি একটি করে বাছতাম। তারপর বার তিনেক গঙ্গাজলে ধুতাম। শিবের ভোগ হবে তো? তোলা উনুনটি বারবার

নিকোতাম। অনেকটা সময় কাটত। কিন্তু এখানে সবই ওই পার্বতী করে দেয়। আমাকে কিছু করতে দেয় না। চাল বেছে দেয়, একটি কালো গাই নিয়ে এসে পরিষ্কার বাসনে আমার সামনে দুধ দোয়, উনুন ধরিয়ে দেয়। আমি শুধু রাঁধি। নিজে না রাঁধলে আমার তৃপ্তি হয় না। সেইটি রেঁধে শিবের মন্দিরে নিয়ে যাই। শিবের মূর্তির সামনে রেখে বসে থাকি কিছুক্ষণ। তারপর নিয়ে এসে খেয়ে ফেলি সেটা—"

"শিবের মূর্তি আছে না কি এখানে?"

"মূর্তি ঠিক নয়। একটা বড় সাদা পাথর। তাকেই শিব বলে সবাই—"

"আমি সেটা দেখেছি একদিন। আচ্ছা, অতবড় শক্তিমান দেবতা শিব, আমার পিসিমার কাছে শিবের অনেক গল্প শুনেছি, সেই শিব কি শুধু একখানা পাথর হতে পারেন?"

"তিনি হতে পারেন সবই। তুমি কি রূপে তাকে দেখবে তা নির্ভর করছে তোমার বিশ্বাসের উপর। তিনি সর্বত্র আছেন, সবই হতে পারেন। পাথরে তোমার আপত্তিটা কি? শিব মানে তো মঙ্গল। পাথর কি আমাদের মঙ্গল করে না? রোজ মসলা বাট কিসের উপর? বড় বড় রাস্তা তৈরি হয় কি দিয়ে? পাথরের বড় বড় দুর্গের কথা শোননি? বড় বড় পাহাড় যে পাথর দিয়েই তৈরি গো। পাথর আমাদের হাজারো উপকারে লাগে, তাই পাথর মঙ্গলময়, পাথরকে শিব বললে চণ্ডী অশুদ্ধ হবে কেন! শিব চটে গেলে সংহারও করেন। পাথর ছুঁড়ে কত লোক কত লোককে মেরেছে তার ঠিক আছে? পাথরের ভিতর শিব নেই? কে বললে তোমাকে? কি আপদ।"

বলেই হেসে ফেললেন বক! তারপর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মত বললেন—"মুখে খই ফোটাতে পারিস, কিন্তু দেখছি কিছু বুদ্ধি নেই তোর। রঘুপতি ছেলেটা কিন্তু বুদ্ধিমান। সে পাথরকে জীবন্ত করবার চেষ্টা করছে। বাহাদুর ছেলে। ঠিক পারবে—"

"রঘুপতিকে চেনেন আপনি?"

"খুব চিনি। তার কাছে গিয়ে মাঝে মাঝে গল্প করি। তার মুখেই তো তোর খবর পেলাম—সে বললে খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে, আলাপ করে আসুন। এখন দেখছি বুদ্ধিমতী না কচু। বোকার হদ্দ একটি—"

কিঙ্কিণী মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

"আ মরণ, মুচকি হাসা হচ্ছে আবার। এইবার মনে পড়েছে। আমার বোনের এক কালো-কালো নাতনি ছিল ঠিক তোর মতন। ঠিক ওইরকম খঞ্জনের মধ্যে ত্যারচা চোখ আর দুষ্টু দুষ্টু হাসি। তোকে দেখে হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাকে—"

"কি নাম ছিল তার।"

"বিনি।"

"আমার নাম কিনি। নামের সঙ্গেও মিল আছে।"

"ওই দেখ। আমি ঠিক ধরেছিলুম। মুখচোখের আদলেও মিল আছে। একের নম্বর দস্যি ছিল মেয়েটা। তুমিও লক্ষ্মী নও মনে হচ্ছে।"

"না, আমিও দস্যি। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি—"

"ওই দেখ!"

"আপনার বিনি এখন কোথায় আছে—"

"কি জানি। আছে কি মরেছে তাও জানি না। বোনের নাতনি তো। কাউকে ধরে রাখা যায় না কি পৃথিবীতে। ভেসে যায়, তলিয়ে যায়, উড়ে যায়। নাগালের মধ্যে কেউ থাকে না বেশি দিন। আমি নিজেই নিজের নাগালের মধ্যে নেই। ছিলুম কাশীতে একটা ঘুপ্‌চি ঘরে, এসে পড়েছি প্রকাণ্ড হিমালয়ের উপত্যকায়, এরপর আবার কি জানি কোথায় যাব, বাবা বিশ্বেশ্বর আমাকে কোথায় যে ভাসিয়ে নিয়ে যাবেন তা তিনিই জানেন। নিশ্চিন্ত হয়েছি।"

"আপনার ভালো লাগে?"

"খুব। এখন কোনো দায়-দায়িত্ব নেই তো। যা চাইছি তাই হচ্ছে। যখন মনে করতাম আমি সব করছি তখন কিন্তু হত না। অনেক দুঃখ পেয়েছি। এখন আর দুঃখ নেই, কারণ দুঃখ ভোগ করত যে 'আমিটা' সে আর নেই। হালে যিনি বসে আছেন তিনি দুঃখত্রাতা।"

"এসব কাণ্ডকারখানা আপনার ভোজবাজি বলে মনে হয় না?"

"আগে হত এখন হয় না। এখন বুঝেছি ভোজবাজি বলে কিছু নেই। সবই সম্ভব। আগে ভোজবাজিকে ভোজবাজি বলে মনে হত কারণ তখন বুদ্ধি কম ছিল, মাপকাঠি ছোট ছিল। এখন মনে হয় সবই সম্ভব। তা-ও ঠিক নয়, এখন মনে হয় এছাড়া আর কিছু হতে পারত না। সেই রাজপুত্রের মত অবস্থা হয়েছে আমার—"

"কোন রাজপুত্রের মতো—"

"সেই যে রাজপুত্র নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে একটা টুকটুকে রাঙা ফল দেখে সেটি কুড়িয়ে খেয়েছিল—জানিস না গল্পটা?"

"না—"

"তবে শোন্। এক রাজপুত্র একবার রথে করে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। প্রকাণ্ড সোনার রথ ছটা বড় বড় ঘোড়ায় টানছে। টগবগ টগবগ করে চলেছিলেন মহাসমারোহে। সামনে পিছনে অনেক সেপাই সান্ত্রী বরকন্দাজ। কিছুদূরে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড নদী দেখা গেল। নদীর চেহারা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল রাজপুত্রের। বললেন—রথ থামাও আমি নামব। নদীর ধারে ধারে বেড়াব। কি সুন্দর নদী। নেবে পড়লেন রাজপুত্র। বেড়াতে লাগলেন নদীর ধারে ধারে। কিছু দুর গিয়ে দেখলেন মাটিতে আঙুলের মত একটি ফল পড়ে রয়েছে। কিন্তু টুকটুকে লাল। লোভ হল খুব—ফলটি তুলে খেয়ে ফেললেন। যেই খাওয়া অমনি সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত ব্যাপার হল একটা। রাজপুত্র মাছ হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়লেন নদীতে। জলের ভিতর তাঁর হাত-পা রইল না, শরীরে গজাল কয়েকটা পাখনা, অদ্ভুত ধরনের ল্যাজ হল একটা, রাজপোশাক রইল না, গাময় গজাল আঁশ। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য কি হল জান? রাজকুমারের একটুও খারাপ লাগল না, তাঁর মনে হল এই তো সুন্দর, এই তো স্বাভাবিক, অগাধ জলে সাঁতার কাটার চেয়ে বেশি সুখ আর কি হতে পারে। তিনি যে একদিন স্থলচর ছিলেন, রাজপুত্র ছিলেন এ কথা তিনি ভুলে যাননি, কিন্তু বারবার তাঁর মনে হত, বন্দী ছিলুম, মুক্তি পেয়েছি বেঁচেছি।"

কিঙ্কিণী হেসে উঠল।

"বাঃ বেশ সুন্দর রূপকথাটি তো—।"

"সবই তো রূপকথা। জীবনটাই তো রূপকথায় ভরা। এখানেও চারদিকে রূপকথা। বেরিয়ে দেখেছিস কোনো দিন?"

"না। এখান থেকেই তো পাহাড় ঝরনা বরফ কুয়াশা সব দেখতে পাই। আর কি দেখবার আছে।"

"শিবকে দেখেছিস?"

"না, একদিনও তো বেরুইনি।"

শিবকে দেখে এসো একদিন। যদিও একটা সাদা পাথর, কিন্তু চোখ থাকলে ওরই মধ্যে অনেক কিছু দেখতে পাবে। তারপর দেখো দশমহাবিদ্যার মন্দিরগুলি। ছিন্নমস্তার মূর্তি নেই, কিন্তু মন্দিরটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে কেমন যেন ভয় ভয় করে। মনে হয় একটা উলঙ্গিনী ছায়া-মূর্তি নেচে নেচে বেড়াচ্ছে।"

কিঙ্কিণীর মনে পড়ে গেল ট্রেনের সেই ভদ্রলোকের কথা। তিনিও তার হাত দেখে ছিন্নমস্তার গল্পটা বলেছিলেন। তারপর হঠাৎ সে প্রশ্ন করল বককে।

"আচ্ছা যে গল্পটা আপনি এখুনি বললেন সেটা কি নিছক গল্প? না কোনো রূপক? ওই টুকটুকে লাল ফলের মানে কি—"

বক মুখ উঁচু করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ।

তারপর চোখ মিটমিট করে বললেন, "দেখ্, আমি মুখ্যু মানুষ বেশি বিদ্যে নেই, তাই ব্যাখ্যা ট্যাখ্যা করতে পারব না। তবে কাশীতে এক জ্যোতিষী আমাকে বলেছিল মঙ্গলের রং লাল আর মঙ্গল হচ্ছেন অহং-এর প্রতীক। যদি বলি ওই লাল ফলটি অহঙ্কার, ওই অহঙ্কারটিকে গিলে ফেলতে পারলেই মুক্তি।"

"মানুষ থেকে মাছ হওয়া মানেই মুক্তি না কি!"

"তা জানি না। বললুম তো আমি মুখ্য মানুষ, ব্যাখ্যা-ট্যাখ্যা করতে পারব না। যা মনে হল বললুম। একটা রূপকথা বললুম, উনি তাকে রূপক বলে ব্যাখ্যা দাবি করছেন। অতিরিক্ত তার্কিক হয়েই মরেছিস তোরা। বেশি ফাজিল হওয়া ভালো নয়।"

এমন সময় একটা অদ্ভুত হাসিতে ভরে গেল আকাশ বাতাস। কিঙ্কিণীর মনে হল কেউ যেন অট্টহাস্য করছে কোথায়।

"আমি চললুম। নীলু বেরিয়েছে। আমাকে খুঁজছে বোধহয়।"

"নীলু কে আবার—"

"নীলপর্ণ। কুবেরের ধনরক্ষক। গরুড়ের বংশধর। তোর কাছেও হয়তো আসবে একদিন। আড্ডা দিতে ভালোবাসে। চললাম আমি—"

বক খুট খুট করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

যে বারান্দায় পংখী পাথরের পরদা টানিয়ে দিয়েছিল সেইখানেই বসেছিল কিঙ্কিণী। দূরে আর এক সারি পাহাড় দেখা যাচ্ছিল, প্রত্যেকটি যেন জ্বলন্ত আগুনের স্তূপ। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। রক্তকিরণে সমস্ত প্রকৃতি যেন রক্তস্নান করেছে। কর্কশ একটা পাখির ডাক ভেসে আসছে, মনে হচ্ছে এই রক্ত-প্লাবিত পরিবেশই যেন সদম্ভে চিৎকার করে বলছে—এই দেখ আমি জয়ী হয়েছি, ওই তুষারশুভ্র পাহাড়দের পরিণত করেছি জ্বলন্ত অগ্নিস্তূপে। অভিভূত হয়ে বসেছিল

কিঙ্কিণী। ভাবছিল যা দেখছি, তা সত্য না স্বপ্ন না মতিভ্রম? যে দেশে আছি সে দেশের কি কোনো ভৌগোলিক অস্তিত্ব আছে? পংখী বলেছিল আমি পরম মুহূর্তে বাস করছি, আমার আলাদা জীবনযাত্রা আমার দৈনন্দিন কার্যক্রম না কি অব্যাহত আছে অন্যত্র। দুই বিভিন্ন স্থানে আমার যুগপৎ অস্তিত্ব কি সম্ভব? আমি কি তাহলে কোথাও মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছি? মূর্ছার ঘোরে এই সব স্বপ্ন দেখছি? এ প্রশ্নের উত্তর দেবে কে। নিজের সত্তার গভীরে নেমে গেল ডুবুরির মতো। কিন্তু মুক্তো পেল না সে। সদুত্তর মিলল না। কিন্তু এই উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। ...হঠাৎ সে লক্ষ্য করল সূর্য অস্ত গেছে, কোথাও লালের চিহ্নটুকু পর্যন্ত আর নেই। চাঁদ উঠছে, দূরের পাহাড়গুলো আর জ্বলন্ত আগুনের স্তূপ নয়, রজতসন্নিভ মহিমা হয়ে উঠেছে। সবিস্ময়ে চেয়ে রইল সে তাদের দিকে। মনে হল ওরা যেন নীরবে তার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। যেন বলছে, আমাদের যে দিকটায় চাঁদের আলো পড়েছে সেই দিকটা দেখেই তুমি মুগ্ধ হয়েছ। কিন্তু আমাদের সবটা আলোকিত হয়নি। আমাদের ও পাশে গাঢ় অন্ধকার। আমরা একই সময়ে আলোকিত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমাদের মধ্যে এমন জায়গা আছে যেখানে কখনও আলো প্রবেশ করবে না। কিঙ্কিণীর মনে হল, তাহলে কি—খুক্ করে কাসলে কে যেন পিছন দিকে। কিঙ্কিণী দেখল পংখী দাঁড়িয়ে আছে!

"আমাকে ডাকছিলেন কি—" পংখী ইতস্তত করে প্রশ্ন করল।

"না, ডাকিনি তো। আমি ভাবছিলাম।"

"আপনার ভাবনার ডাকেই আমি এসেছি। আপনার মনে যে প্রশ্ন জেগেছে তার উত্তরও আমি জানি। আপনি একটা জিনিস গুলিয়ে ফেলেছেন বলে মনে হয়। আপনি নিজের দেহটাকে কেন্দ্র করেই সব ভাবছেন। আপনি ভাবছেন আপনার অস্তিত্ব আপনার দেহতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। অনাদি অতীত থেকে অনাদি ভবিষ্যৎ পর্যন্ত আপনার অস্তিত্ব প্রসারিত। সে অস্তিত্ব সব সময়ে দৈহিক নয়, তার বহু রূপ বহু রং, একটার সঙ্গে আর একটার মিল থাকে না অনেক সময়, কিন্তু কোনোটাই মিথ্যা নয়। আপনি যখন কলকাতার ফ্ল্যাটে বিছানায় শুয়ে থাকেন, তখন সেটা যেমন সত্যি, শুয়ে শুয়ে আপনি যখন স্বপ্ন দেখেন যে সুন্দরবনে বাঘে আপনাকে তাড়া করেছে তখন সেটাও তেমনি সত্যি। স্বপ্নেও আপনার দৈহিক একটা অস্তিত্ব থাকে সেটা কি আপনার অলীক বলে মনে হয়?"

"নিশ্চয়ই। স্বপ্ন তো অলীকই। যে দেহটা বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখছে সেই বেশি সত্য, বেশি বাস্তব। তাকে ধরা ছোঁয়া যায়—"

"ধরা ছোঁয়া মানে আপনি কি হাত দিয়ে ধরা ছোঁয়ার কথা ভাবছেন? তাহলে তো জীবনের অধিকাংশ জিনিসকেই অলীক বলতে হয়। প্রেম, ঘৃণা, উচ্চাশা, আধ্যাত্মিক পিপাসা, কবির কল্পনা এমন কি লোভ, মোহ—কোনোটাকেই ধরা ছোঁয়া যায় না, কোনোটাকেই কোনো যন্ত্র দিয়ে মাপা যায় না, তা বলে কি ওসব অলীক বলবেন?"

"মোটেই না। ওসবের উৎস তো আমার দেহই। দেহের মধ্যে যে মস্তিষ্ক আছে সেই মস্তিষ্কেই ওদের জন্ম। মস্তিষ্ক না থাকলে প্রেম, ঘৃণা, কবি-কল্পনা এসব থাকত কি?"

মস্তিষ্ক তো একটা বস্তু-পিণ্ড মাত্র। ওই জড়পিণ্ডের মধ্যে প্রেম, ঘৃণা, কল্পনা, কামনা, যে শক্তির ক্রিয়া সেইটিতেই তো আসল। তার হদিস বিজ্ঞানীর যন্ত্রে এখনও ঠিক মত ধরা পড়েনি

কিন্তু বিশ্বাসীর মনে ধরা পড়েছে। আপনি কিছুক্ষণের জন্য আপনার অজ্ঞাতসারেই বিশ্বাসী হয়েছেন তাই পরম মুহূর্তে প্রবেশ করেছেন, সেই অকল্পনীয় দেশে এসে পড়েছেন যেখানে সবই সম্ভব। প্রশ্ন করে কোনো সদুত্তর পাবেন না, কিন্তু বিশ্বাস করে সুখ পাবেন। আপনার দুটো অস্তিত্বই সত্য। ওই পাথরের পরদায় আপনার যে ছবি দেখতে পাবেন সেটা সত্য, কিন্তু ওই ছবিতে একটা জিনিস দেখতে পাবেন না!"

"সেটা কি—"

"সেটা আপনার বিশ্বাসের ছবি। বিশ্বাসের ছবি তোলা যায় না, সেটা অনুভব করতে হয়।"

"কিন্তু আমি তো কিছু অনুভব করতে পারছি না।"

"সব জিনিস কি অনুভব করা যায়? আপনার দেহের মধ্যেই এমন অনেক জিনিস আছে যার অস্তিত্ব আপনি অনুভব করেন না। একটা উদাহরণ দিই। দেহের রক্ত-কণিকাগুলো অহরহ আপনার শিরায় উপশিরায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাওয়া থেকে, খাদ্য থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখছে আপনার দেহের মধ্যেই তাদের জন্ম হচ্ছে, মৃত্যু হচ্ছে, এসব কি আপনি অনুভব করেন? সব জিনিস অনুভব করা যায় না। চেতনার পরও আছে অবচেতনা, তারই গভীরে আছে আপনার বিশ্বাস। তাকে অনুভব করতে পারছেন না বলেই যে তা নেই একথা সত্য নয়। আপনি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। এখন আপনার দ্বিতীয় অস্তিত্ব যে পরিবেশের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে সেইটেকেই উপভোগ করবার চেষ্টা করুন। আপনার প্রথম সত্তা অন্যত্র কি করছে তা দেখে এবং তার সঙ্গে তুলনা করে হয়তো আপনার দৃষ্টি খুলে যাবে। হয়তো নূতন কোনো বিস্ময়, নূতন কোনো জিজ্ঞাসা জাগবে মনে। আপনি ওটা দেখুন, আমি চলি এখন। হ্যাঁ আর একটা কথা—নীলপর্ণ আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান। আমাকে অনুরোধ করেছেন আপনার অনুমতি প্রার্থনা করবার জন্যে। আপনার আপত্তি হবে না আশা করি।"

"না না আপত্তি হবে কেন?"

"আচ্ছা, বলে দেব তাকে। আমি যাই তাহলে।"

পংখী নিঃশব্দে অন্তর্ধান করল।

ইচ্ছা করবার সঙ্গে সঙ্গে পরদার উপর ছবি ফুটে উঠল। আশ্চর্য সুন্দর সবাক চিত্র। ছবি দেখে অবাক হয়ে গেল সে। এ কি কাণ্ড।

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে সে? কিঙ্কিণী? মাথায়, হাতে, পায়ে ব্যান্ডেজ! মাথায় শিয়রে বসে আছে স্বাতী। কাঁদছে। তাহলে সে কি মোটর থেকে নেমে পালাতে পারেনি? মোটর থেকে নেমে মাঠামাঠি দৌড়ে সে পালিয়েছিল তার এই ধারণাটা কি মিথ্যে? স্বাতী কাঁদছে। অঝোরঝোরে কেঁদে চলেছে। একটি নার্স এসে ঢুকল। হাতে ফিডিং কাপ। গলায় একটা তোয়ালে দিয়ে খাইয়ে দিলে আস্তে আস্তে। তারপর স্বাতীর দিকে চেয়ে দেখল একবার। তারপর বলল "আপনি কাঁদছেন কেন। ডাক্তারবাবু তো বলেছেন কোনো ভয় নেই। আপনি পরশু থেকে এখানে সমানে বসে আছেন, নাওয়া-খাওয়া হয়নি, আপনি বরং বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসুন। আমরা তো আছি, চিন্তার কোনো কারণ নেই, আপনি যান,—"

"ওর যে এখনও জ্ঞান হয়নি—" স্বাতী বললে চোখ মুছে।

"হবে। ঘুমের ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে ওঁকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। আপনি বসে থেকে কি করবেন।"

"ওর বাবা যদি আসে—"

স্বাতীর চোখে ঘনিয়ে এল একটা ভাষাহীন আশঙ্কা।

নার্স বলল—"এলেই বা। আমরা তো আছি। তিনি কি এসেছিলেন একদিনও? মনে পড়ছে না তো।"

স্বাতী কোনো উত্তর দিল না। সভয়ে চেয়ে রইল শুধু।

তারপর বলল— "আমি থাকব। যাব না কোথাও।"

কিঙ্কিণীর হঠাৎ মনে হল স্বাতী কি আমাকে পাহারা দিচ্ছে? রক্ষা করছে বাবার কবল থেকে? পরমুহূর্তেই সে এর উত্তর পেয়ে গেল। টলতে টলতে প্রবেশ করলেন সাতকড়ি।

"কিঙ্কিণী এখানে আছে না কি?"

তড়িৎপৃষ্টবৎ দাঁড়িয়ে উঠল স্বাতী। তার দিকে চেয়ে একটু মৃদু হেসে বললেন— "ও তুমিও ওর সঙ্গে জুটেছ দেখছি।"

কোনো উত্তর দিলে না স্বাতী।

সাতকড়ি বললেন—"আমার মেয়েকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে হাসপাতালে রাখা হয়েছে, অথচ আমাকে একটা খবর দেওয়া হয়নি। বড়ই আশ্চর্য মনে হয়।"

এ কথারও কোনো জবাব দিলে না স্বাতী। তার চোখ দুটো শুধু জ্বলতে লাগল।

"ওকে আমি বাড়ি নিয়ে যাব বলে এসেছি—"

"না। ও এই হাসপাতালেই থাকবে। কোথাও যাবে না।"

"কেন! আমার মাতৃহীন মেয়েকে আমি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাব, বড় বড় ডাক্তার ডাকব।"

"না, ও কোথাও যাবে না। যদি নিয়ে যেতে চেষ্টা কর আমি সব কথা প্রকাশ করে দেব। চিৎকার করব, পুলিস ডাকব—"

অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন সাতকড়ি।

"ব্যাপার কি। পাগল হয়ে গেলে না কি— আমার মেয়েকে আমি চিকিৎসার জন্যে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইছি—"

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল স্বাতী—"নিয়ে যাচ্ছ মেরে ফেলবার জন্য। গুণ্ডারা যে কাজটা সমাপ্ত করতে পারেনি তুমি সেইটে সমাপ্ত করবার জন্যে নিয়ে যেতে চাইছ!"

"Shut up, you bitch" (শাট আপ্ ইউ বিচ্)

"তুমি যদি বেশি চেঁচামেচি কর, আমি পুলিস ডাকব। যে পাঞ্জাবি ড্রাইভার ওকে বাঁচিয়েছিল সে এখনও বেঁচে আছে— পুলিসের হেফাজতে আছে—"

"পুলিস? হা হা হা হা। তুমি এখনও পুলিসের ভয় দেখাও আমাকে। তোমার অন্তত জানা উচিত পুলিসের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি।"

এমন সময় নার্সটি এসে প্রবেশ করল। তাকে দেখে যে কাণ্ড করলেন সাতকড়ি তা রীতিমত নাটকীয়। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন তিনি।

"আমার মা-হারা মেয়েকে গুণ্ডারা মেরে রাস্তায় ফেলে রেখে গিয়েছিল। তাকে আমি আমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখতে চাই। তার ব্যবস্থা করে দিন আপনারা—"

নার্সটি বললে— "পুলিস এঁকে এখানে নিয়ে এসেছে। তাদের বিনা অনুমতিতে এঁকে কোথাও সরানো যাবে না। তাছাড়া এখানকার ডাক্তারের অনুমতি নিতে হবে। তিনি রোগীকে নাড়ানাড়ি করতে চান না। তাঁর মতের বিরুদ্ধে এঁকে নিয়ে যেতে "রিস্‌ক্ বন্ড্'-এ সই করতে হবে। আপনি আপিসে যান তাইলেই সব জানতে পারবেন।"

নার্স চলে গেল।

সাতকড়ি স্বাতীর দিকে চেয়ে বললেন—"তুমি এখানে এসে জুটলে কি করে! আমার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে তুমি কি কিঙ্কিণীর কাছে আশ্রয় নিয়েছ?"

"আমি তোমার কোনো কথার জবাব দেব না।"

"আমার ছেলেটাকে তুমি কোন অধিকারে নিয়ে এসেছ?"

"মায়ের স্বাভাবিক অধিকারে। আইনত ও ছেলের উপর তোমার অধিকার নেই, কারণ আইনত তুমি ওর বাবা নও, আমাদের আইনত বিয়ে হয়নি।"

"তোমার আইনজ্ঞান খুব টনটনে দেখছি। কিন্তু একটা পুরাতন আইনের কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিই। নানা নামে সে আইনই আজ পর্যন্ত বলবৎ আছে। সংক্ষেপে সে আইনটির নাম জোর যার মুলুক তার। আমি এখন চললাম, দেখা যাক কি করতে পারি।"

ঈষৎ টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন সাতকড়ি।

ছবি দেখতে দেখতে সমস্ত মনটা বিষিয়ে উঠল কিঙ্কিণীর। হঠাৎ মনে হল একটা দুর্গন্ধ পঙ্ককুণ্ডে পড়ে সে যেন হাবুডুবু খাচ্ছে। ছবি দেখার ইচ্ছা তার মনে থেকে চলে গেল। ছবিও অন্তর্হিত হল সাদা পরদা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল জ্যোৎস্নায় চারদিক ভেসে যাচ্ছে। দূরের তুষার পাহাড়গুলি যেন তুষারের স্তূপ নয়, স্বপ্নের স্তূপ।

মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল সে।

তার বর্তমান বাস্তবজীবনের যে গ্লানি তার মনে জমেছিল তা কে যেন স্নেহস্পর্শ দিয়ে মুছে দিল, কে যেন তার এই ধারণাটা স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলল, ছবিতে যা দেখেছ ওটাই সম্পূর্ণ সত্য নয়; ওটা সাময়িক, ওটা ক্ষণিক, ওটা তোমার যাত্রাপথের দৃশ্যাবলী, ওগুলো তোমার জীবনে স্থায়ী হবে না, ওগুলো তুমি পার হয়ে যাবে, ক্রমশ পার হয়ে যাচ্ছ। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল কিঙ্কিণীর। যদিও সে বিজ্ঞানের ছাত্রী নয়, তবু রঘুপতি তাকে একদিন বিবর্তনবাদের কাহিনী বলেছিল। বাঁদরই না কি মানুষ হয়েছে, মানুষই না কি একদিন অতিমানব হবে। মানুষের মন, বুদ্ধি, চেতনা, স্বপ্ন, কল্পনা সবই তো তাহলে বিবর্তিত হতে পারে? সে এখন যে চেতনা দিয়ে ওই পাহাড়গুলো দেখছে তা কি তাহলে তার বিবর্তিত চেতনা? বিবর্তন কি এত দ্রুত হয়? নেবে পড়ল সে বারান্দা থেকে। সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত উপত্যকায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

তার মনে হল সত্যিই সে যেন স্বপ্নলোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই স্বপ্নলোক এত বাস্তব যে মনে হয় জ্যোৎস্না বুঝি এখনি কথা কইবে তার সঙ্গে। কথা কইতেও লাগল, কিন্তু সে কথা কোনো ভাষার হরফেই লেখা যায় না, সে কথা শব্দে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় না। তবু তা মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে। কিঙ্কিণী যাওয়ার সময় দেখল রঘুপতির উপত্যকার দুয়ার বন্ধ। বিরাট পাষাণ দুয়ার। বাইরে থেকে

করাঘাত করলেও ভিতরে শব্দ পৌঁছবে না। ক্ষণকাল সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিঙ্কিণী। তারপর আবার হাঁটতে লাগল। হঠাৎ মনে হল চারদিক বেশ ঠাণ্ডা। গরম জামাকাপড় গায়ে না দিয়ে এভাবে হাঁটা ঠিক নয় বাইরে। তুলোর আঁশের মত বরফ পড়ছে। পথঘাটও বরফে ঢেকে যাচ্ছে। কিন্তু ভালো গরম জামা তার কি আছে? বরফের উপর হাঁটার মত জুতো? সবই তো ওই পার্বতীরা জানে। যখন যা দরকার হয় তারাই এনে দেয়। এখনও হয়তো দেবে এই আশায় কিঙ্কিণী আবার ঢুকল তার উপত্যকায়। গিয়েই দেখল পার্বতী দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায় উপর। কে পার্বতী কে উমা তা চিনতে পারে না কিঙ্কিণী। দুজনেই একরকম দেখতে। আর একটু এগিয়ে গিয়ে কিঙ্কিণী বলল— "বাইরে বড্ড ঠাণ্ডা। গরম জামা কাপড় আছে কি?"

"হ্যাঁ, সব আছে। বরফের উপর চলবার পাহাড়ি জুতোও আনিয়ে রেখেছি।"

কিঙ্কিণী আশ্চর্য হল না। সে যেন মনে মনে এটা প্রত্যাশাই করছিল। এটা না ঘটলে সে বরং আশ্চর্য হত। সে ভিতরে গিয়ে দেখল বহুমূল্য চামড়ার 'ফার' দেওয়া ওভার-কোট, নীচে পরবার জন্য দামি পশমি জামা, মাথার জন্য দামি গরম টুপি, পায়ে দেবার জন্য ভালো চামড়ার বুট সব আছে। পার্বতী নিজে হাতে সব পরিয়ে দিল কিঙ্কিণীকে। কিঙ্কিণীর মনে হল কোনো ভালো দর্জী যেন মাপ নিয়ে এগুলো করেছে। সে আশ্চর্য হল না। সে ধরে নিয়েছিল এখানে সবই সম্ভব।

জামা জুতো পরে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল, পার্বতী বলল— "আপনি তো আগে কখনও বেরোননি। আমি কি আপনার সঙ্গে যাব? এখানকার পথঘাট তো আপানার চেনা নয়।"

"বেশ চল। যে পাহাড় তিনটে দেখা যাচ্ছে ওগুলো কত দূর!"

"অনেক দূর। হেঁটে গেলে ওদের কাছাকাছি পৌঁছতে অন্তত পনেরো দিন লাগবে।"

"তাহলে চল প্রথমেই শিব ঠাকুরকে দেখে আসি। এসেই অবশ্য দেখেছিলাম একবার। চল আর একবার দেখা যাক।"

"চলুন।"

মহাদেব নামে খ্যাত সাদা পাথরটি কিছুদূরে একটা উঁচু টিলার উপর দেখেছিল কিঙ্কিণী। তার আশপাশেও ছোট বড় আরও অনেক পাথর ছিল। মহাদেব পাথরটি অবশ্য সবচেয়ে বড়। টিলার উপর উঠে কিঙ্কিণী কিন্তু পাথরটিকে চিনতে পারল না। সবগুলি পাথরই বরফে ঢাকা পড়েছে।

"দিনের আলোয় পংখী যে বড় পাথরটাকে মহাদেব বলে চিনিয়ে দিয়েছিল সেটা তো কই দেখতে পাচ্ছি না।"

পার্বতী পিছনেই দাঁড়িয়েছিল। একথা শুনে তার মুখে হাসিও ফুটল না, অবজ্ঞার ভাবও দেখা গেল না। শুধু বলল— "ওই তো আছেন। এখানে সব পাথরই মহাদেব। প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে তাদের বাইরের চেহারাটা বদলায়, কিন্তু ভিতরের মহাদেব ঠিক থাকেন। তিনি বুঝতেই পারেন না যে তাঁর বাইরের রূপ বদলাচ্ছে। ভালো করে দেখুন তিনি ঠিকই আছেন।"

কিঙ্কিণী কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। কিন্তু সে কথা সে মুখ ফুটে বলতেও পারল না। হঠাৎ তার মনে পড়ল নির্মল শাস্ত্রীকে। তিনি তাঁকে সংস্কৃত ও দর্শন পড়াতেন। তিনি বলেছিলেন— সাংখ্য বলেছেন—ভগবান আছেন একথা মানতে পারি না, কারণ প্রমাণ নেই। আরও বহুলোক একথা বলেছেন। কিন্তু তবু যেন ভগবান আছেন। তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করবার মত বুদ্ধিই আমাদের নেই। ওই সাংখ্যই যে মায়ার কথা বলেছেন সেই মায়াই আমাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে হয়তো।

সেই আচ্ছন্নভাবটা কেটে গেলেই আমাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ হবে? তখনই আমরা সত্যকে দেখতে পাব। সত্যই ভগবান। কিঙ্কিণীর মনে হল তার দৃষ্টি কি মায়ামুক্ত হয়েছে? কিন্তু কিছুতেই তো দেখতে পাচ্ছি না, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। যে বুদ্ধি আছে তা দিয়ে বর্তমান জীবনের ব্যাখ্যা করতে পারছি না, একটু আগে যে পরদায় ছবি দেখলাম সেইটেকেই আমার সত্য জীবন বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই মেনে নিতে ইচ্ছে করছে না সেটাকে।

হঠাৎ সে চমকে উঠল। হুড়মুড় করে শব্দ হল একটা, মনে হল বিরাট একটা অট্টালিকা বুঝি ভেঙে পড়ছে।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল পার্বতী প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে আছে।

"ওটা কিসের শব্দ হচ্ছে?"

"দূরে পাহাড় ভেঙে পড়ছে। একটু দূরে একটা নদীর খাত আছে, সেই দিক দিয়ে গলা বরফের স্রোত বয়ে যাবে এখনই। যাবেন দেখতে?"

"বেশ চল।"

একটু পরেই সেই খাতের ধারে এসে দাঁড়াল তারা।

খাতের কাছে এসেই কিন্তু কিছু দেখা গেল না। খাতের মাঝখানে একটি সরু লম্বা গাছ ছিল। সেই গাছের ঋজু বলিষ্ঠতা দেখে যেন আশ্বস্ত হল কিঙ্কিণী। গাছটা যেন আকাশকে স্পর্শ করতে চায়। মনে হচ্ছে চাঁদকে যেন ছুঁয়ে আছে। বলিষ্ঠতা এবং ঋজুতা তারও জীবনের আদর্শ। গাছটির দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল সে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা মনে হল তার। গাছের ঋজুতা বা বলিষ্ঠতা তাকে মুগ্ধ করতে পারে, কিন্তু তাকে যদি কেউ এখনই গাছ ক'রে দেয় তাহলে সে কি খুশী হবে? হবে না। ঋজুতা ও বলিষ্ঠতা নিয়ে অনড় হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে না, সে চলবে, সে এগোবে, খুঁজবে নিত্য নূতন দিগন্ত, জানবে অজানাকে, আবিষ্কার করবে নূতন পথ। যে আদর্শকে এখন আঁকড়ে ধরে আছে প্রয়োজন হলে সে আদর্শকে ত্যাগ করবে যদি মহত্তর আদর্শের সন্ধান পায়? কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল তার চিন্তাধারা। মনে হল এখন যে অজানার মধ্যে সে আছে তাকে সে স্বীকার করতে পারছে না কেন। বাস্তব নয় বলে? বাস্তব অবাস্তবের ভেদ রেখা কোথায়? অনেক আগে যখন জড়বস্তু পিণ্ডকে,—যাকে ধরা যেত, ছোঁয়া যেত, মাপা যেত, ওজন করা যেত—আমরা বাস্তব মনে করতুম, তখন অণু-পরমাণুর খবর জানা ছিল না। যখন জানা গেল, তখন তাকেও স্বীকার করলুম, অণু-পরমাণুতেও বিজ্ঞান থেমে থাকেনি, ইলেকট্রন প্রোটন বার করেছে, তাকে আমরা মেনে নিয়েছি, খালি চোখে শুধু হাত পা দিয়ে তাদের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না, যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে বিজ্ঞানীরা ওদের নাগাল পেয়েছেন, ওদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেছেন, আমরা সাধারণ মানুষরা— যারা বিজ্ঞানী নই, তারাও বিশ্বাস করছি ওঁদের আবিষ্কারে। পংখীর কথায় তাহলে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না কেন। যে যন্ত্র দিয়ে বিজ্ঞানীরা অলৌকিক আশ্চর্য অচিন্ত্যপূর্ব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন হয়তো কেউ সেই রকম কোনো যন্ত্রের সামনে আমাকে বসিয়ে দিয়েছে, সে যন্ত্রটা এত সূক্ষ্ম, কিম্বা এত বৃহৎ যে আমার বুদ্ধি তার কূলকিনারা পাচ্ছে না... পরমুহূর্তেই চমকে উঠল সে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল তুমুল বেগে শুভ্র শিলাপ্রবাহ আসছে—দেখতে দেখতে খাতটা ভরে গেল— ঋজু বলিষ্ঠ গাছটা দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, নুয়ে পড়ল, থরথর করে কাঁপতে লাগল। নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল কিঙ্কিণী। দেখল গাছটা সামান্য খড়ের মত ভেসে চলে গেল। একটু আগে যাকে বলিষ্ঠ মনে হয়েছিল, দেখা গেল

বলিষ্ঠতর শক্তির কাছে সে মুহূর্তে নতি স্বীকার করেছে। এই দুরন্ত শক্তিশালী শিলা-প্রবাহকে গতিহীন করে দিতে পারে এমন শক্তিও তাহলে নিশ্চয়ই থাকা সম্ভব। কোথায় সে শক্তি? কার সে শক্তি? অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল কিঙ্কিণী। তারপর সে হঠাৎ দেখতে পেল দূরে কে একজন বসে আছে। মনে হচ্ছে মাছ ধরছে। দু'হাত দিয়ে কি যেন একটা ধরে বসে আছে।

"ওখানে বসে আছে কে?"

"রঘুপতি—" উত্তর দিল পার্বতী।

"রঘুপতি?"

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল সে রঘুপতির দিকে। কাছে গিয়ে দেখল রঘুপতি দুহাত দিয়ে দড়ির মতো কি একটা টেনে রেখেছে।

"রঘুপতি তুমি এখানে? কি করছ তুমি?"

মুচকি হেসে রঘুপতি চাইলে তার দিকে, কিন্তু কথার কোনো জবাব দিলে না।

"ওটা কি ধরে আছ তুমি—"

"বজ্র-লোহা। থাম টেনে তুলি এটাকে! আমার কাজ হয়ে গেছে। তুমিও হাত লাগাও, খুব ভারী জিনিস—"

কিঙ্কিণী বসে পড়ল রঘুপতির পাশে, যে জিনিসটা সে ধরেছিল সেও চেপে ধরল সেটা। ঠাণ্ডা কন্‌কনে শক্ত জিনিস একটা, মনে হল যেন লোহার তৈরি মোটা দড়ি একটা।

"টান, খুব জোরে টান— টেনে তুলতে হবে ওটাকে—"

"কি ওটা?"

"আমার সেই অহল্যা পাথরটা"

টানতে টানতে শুয়ে পড়ল দুজনে তবু কিন্তু কিছু হল না।

রঘুপতি বলল—"এ তো মহা মুশকিলে পড়লাম। পংখী থাকলে হয়তো সাহায্য করতে পারত।"

"এই যে আমি এসেছি। কি ব্যাপার, কি হল—"

"আমি যে অহল্যা পাথরটাকে এনেছিলাম, সেটাকে একটা লোহার জালে পুরে আমি এই শিলাপ্রবাহে ফেলে রেখেছিলাম কিছুক্ষণের জন্য, বজ্র-লোহার জালটা তো আপনিই এনে দিয়েছিলেন। এখন ওটাকে তুলতে পারছি না—বড্ড ভারী হয়ে গেছে—"

"আমার গায়ে তো বেশি জোর নেই। দমন দেও ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ডেকে আনি, আপনারা ধরে থাকুন।"

পংখী অন্তর্হিত হল। একটু পরেই হাজির হল দমন দেও, আর তার পিছু পিছু সেই সিংহটি।

"কি তুলতে হবে?"

"একটা লোহার জাল, তার ভিতর একটা পাথর আছে।"

কিঙ্কিণীর পাশে তৎক্ষণাৎ বসে পড়ল দমন দেও। সিংহটাকেও আদেশ দিল— "তুইও কামড়ে ধর।" সিংহটাও সঙ্গে সঙ্গে কামড়ে ধরল লোহার কাঠিটাকে। আর একটা অদ্ভুত কাণ্ডও হল সঙ্গে সঙ্গে। শিলাপ্রবাহের প্রবল বেগ শান্ত হয়ে গেল সহসা। লোহার জালটাকে টানাটানি করে তুলে ফেলল সবাই। কিঙ্কিণীর মনে হল অতি সহজেই তোলা গেল। তুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে স্রোত আবার দুর্বার বেগে বইতে লাগল। কিঙ্কিণীর আবার মনে হল জালটা সহজে তোলবার জন্যই যেন

স্রোতটা থেমেছিল। কে থামিয়েছিল? কি করে থামিয়েছিল? বিদ্যুৎচমকের মত প্রশ্ন দুটো জাগল তার মনে, কিন্তু আর সে বিস্মিত হল না। বিস্ময়ের সাগরে সে যেন ডুবে আছে। যুক্তির একটা মানদণ্ড মনের কোণে পড়ে আছে, সেটা দিয়ে কিছু কিছু মাপতে আর ইচ্ছে করে না। মাপা যায়ও না। বারবার সেই There are more things in Heaven and Earth... শেক্সপিয়ারের এই উক্তিটাই মনে পড়ে, কিন্তু বেশিক্ষণ এসব কথা ভাববারই সময় পেল না সে। যে লোহার জালটা তারা টেনে তুলেছিল সেইটেই দেখতে লাগল সবাই। অনেক বরফের টুকরো আটকে ছিল জালটাতে। রঘুপতি সেগুলো আস্তে আস্তে খুলছিল। দমন দেও বললে— "একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দিই? সবগুলো খুলে যাবে। ওরকম করে কতক্ষণে খুলবেন।"

রঘুপতি বলল— "না, ঝাঁকানি দিতে হবে না। যেমন আছে তেমনি থাক। আমি এটাকে নিয়ে যাচ্ছি কাঁধে করে আমার উপত্যকায়। সেখানেই বরফ আস্তে আস্তে গলে যাবে।"

রঘুপতি অবলীলাক্রমে তুলে নিল কাঁধের উপর সেই বরফের পিণ্ডটাকে। রঘুপতি যে এতটা শক্তিধর তা কিঙ্কিণী কল্পনা করেনি।

"আমাকে সঙ্গে যেতে হবে কি?"— দমন দেও প্রশ্ন করল।

"না। যা করেছেন তার জন্যে অনেক ধন্যবাদ। আমি এখন সোজা আমার উপত্যকায় যাব।"

কোনোদিকে না চেয়ে রঘুপতি সামনের দিকে চলতে লাগল।

কিঙ্কিণী ঘাড় ফিরিয়ে দেখল পার্বতী নীরবে তার অনুসরণ করছে। দমন দেও হাসিমুখে এগিয়ে এল কিঙ্কিণীর দিকে।

তোমাকে যে এখানে দেখতে পাব তা প্রত্যাশা করি নি। দেখে কিন্তু কি ভালো যে লাগছে। তোমার কাছ ঘেঁষে বসতে পেয়ে আমি কৃতার্থ হয়ে গেছি।"

"আপনি এখানে এসেছিলেন কেন?"

"পংখী আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। আমি কুবের পুরীর রাস্তা খুঁজছিলাম, পংখী বললে তুমি আগে ওখানে যাও। কুবের পুরীর রাস্তা আমি দেখিয়ে দেব পরে। আমি যাই পংখীকে খুঁজে বার করি, সে হয়তো অপেক্ষা করছে আমার জন্য। পরে দেখা হবে।"

দমন দেও হন হন করে চলে গেল। তার সিংহটাও ছুটতে লাগল তার পিছু পিছু। কিঙ্কিণী দেখল রঘুপতি অনেকটা এগিয়ে গেছে। কিঙ্কিণী দাঁড়িয়ে পড়ল। কই, রঘুপতি তো তার সম্বন্ধে একটুও আগ্রহ প্রকাশ করল না। এতদিন পরে দেখা হল, অথচ—। তারপরই সে জোরে জোরে চলতে লাগল আবার। রঘুপতিকে জিগ্যেস করতে হবে এই পাথরটা নিয়ে সে শিল'-স্রোতে ডুবিয়েছিল কেন? একথাটা জানবার বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছিল না। রঘুপতি তার পাথর নিয়ে কি এক্সপেরিমেন্ট (experiment) করছে তা জেনে সে কি করবে, রঘুপতি যদি তার প্রশ্নের উত্তরও দেয় তাহলে সে উত্তর তার বোধগম্য হবে কি না—এসব কথা তার মনে হল না। যে কোনো অজুহাতে রঘুপতির সঙ্গে কথা বলতে হবে এইটেই তার কামনা। কিছুদূর হেঁটে তার মনে হল দমন দেও আর সিংহও রঘুপতির পিছু পিছু চলেছে। তারপর আশ্চর্য হল যখন সে দেখল দমন দেও আর তার সিংহ রঘুপতির মধ্যে যেন ঢুকে গেল। ঠিক যেন ছায়ার মত ঢুকে গেল। সবিস্ময়ে ভাবল আমার দৃষ্টি বিভ্রম হল না কি। দাঁড়িয়ে পড়ল কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর সে ছুটতে লাগল। রঘুপতি যখন তার উপত্যকার দরজার কাছে এসে পড়েছে তখন সে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হল।

"রঘুপতি—"

"কে ও কিঙ্কিণী, কি হল, হাঁপাচ্ছ কেন?"

"আমি একটা জিনিস জানতে চাইছি। যাব তোমার উপত্যকায়?"

"এস। কোনো দরকার আছে না কি।"

"বলছি চল ভিতরে—"

রঘুপতি ভিতরে ঢুকল, ঢুকে একটা প্রশস্ত বারান্দা পার হয়ে প্রবেশ করল নিজের ঘরে। তারপর তুষার পিণ্ড টাকে সন্তর্পণে নামিয়ে রাখল একটা টেবিলের উপর। কিঙ্কিণীর মনে হল সে যেন একটা শিশুকে নামিয়ে রাখছে। কিঙ্কিণী যেন একটা নূতন জগতে প্রবেশ করল। চারদিকে নানারকম পাথর। নানারকম যন্ত্রপাতি। নানারকম আলো।

"আচ্ছা রঘুপতি, তুমি পাথরটাকে বরফের স্রোতে ডুবিয়েছিলে কেন, বলবে আমাকে?"

"কেন? যুক্তির দিক দিয়ে কোনো উত্তর দিতে পারব না। এক কবি বলেছিলেন— যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অমূল্য রতন পাওয়া যায় না, কিন্তু যদি পাওয়া যায় এই আশাটাও ত্যাগ করা শক্ত। আমার উদ্দেশ্য অচলকে সচল করা, জড় পাথরকে জীবন্ত করা। আমার মনে হল যে পাহাড় কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত অচল অনড় কঠিন ছিল হঠাৎ সে কোন শক্তি বলে কোন প্রেরণায় সচল হল, বেগবান হল, কি করে স্থাণু পর্বত জঙ্গম হল। আমি ভাবলাম ওই শিলাস্রোতে সেই শক্তির অণুপরমাণু হয়তো বিকীর্ণ হচ্ছে মন্ত্রের মত, মনে হল আমার অহল্যা পাথরও যদি পারে সেই মন্ত্র শুনুক না, তাকে ডুবিয়ে রাখি কিছুক্ষণের জন্য ওই হিম-প্রবাহে, ক্ষতি কি। যে বজ্রলোহার জালে পুরে তাকে উত্তপ্ত করেছিলাম কিছুদিন, সেই জালে পুরেই তাকে ডুবিয়ে দিলাম হিমানীপ্রবাহে। জানি না কোনো ফল হয়েছে কি না—"

"কি রকম ফল তুমি প্রত্যাশা কর?"

"শক্ত পাথর নরম হবে। জীবনের লক্ষণ কোমলতা সাবলীলতা।"

কিঙ্কিণী কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর হেসে বলল, "তোমাকে আর একটা প্রশ্ন করব। নিজে তুমি পাথর, না জীবন্ত—?"

"তার মানে?"

"তোমার কোমলতা, তোমার সাবলীলতা কিভাবে প্রকাশ করেছ তুমি?"

"সব প্রকাশ কি সবই দেখতে পায়?"

রঘুপতির চোখে হাসি চিকমিক করে উঠল। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গাঢ়কণ্ঠে সে বলল— সংযমের কঠিন বর্মে আমি আবৃত করেছি নিজেকে। তা না করলে আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হব।"

"কি তোমার লক্ষ্য?"

"সত্য দর্শন"

"সত্য কি? আমরা এখানে চারদিকে যা দেখছি তা কি সত্য? বিজ্ঞানের সঙ্গে এর কি কোনো সম্পর্ক আছে?"

"বিজ্ঞান প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করে না। যা সে দেখে, যা অনুভব করে তার কারণ নির্ণয় করবার চেষ্টা করে সে। বিজ্ঞানের জগৎ অনুসন্ধানের জগৎ। সে সব জিনিসকে যুক্তি দিয়ে যাচাই করে, যখন তার যুক্তিতে কুলোয় না তখন সে বলে আমি বুঝতে পারছি না কিন্তু প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করে না

সে। মিরাকল (miracle) হয়, হতে পারে এ কথা সে মানে, কারণ সে এও জানে তার যুক্তির মানদণ্ডে খুঁত থাকতে পারে। তুমি কেমন আছ এখানে?"

"আমি অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি! যা দেখছি তা সুন্দর, যা পাচ্ছি তার তুলনা নেই, কিন্তু তবু মানতে পাচ্ছি না যে এগুলো সত্য। মনে হচ্ছে কোথাও ফাঁকি আছে। কি করি বল তো?"

"তোমার সমস্যা তুমি সমাধান কর, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব না। আমার সমস্যা নিয়ে আমি ব্যস্ত।"

"কি তোমার সমস্যা—"

"পাথরকে জীবন্ত করা। অহল্যা পাথরকে জীবন্ত অহল্যা করব এই আমার তপস্যা—"

"জীবন্ত মানুষের দিকে তুমি ফিরে তাকাও না, পাথরকে জীবন্ত করে কি করবে তুমি?"

"কিছুই করব না। কৌতূহল চরিতার্থ হলেই আবার অন্য কিছু নিয়ে মাতব।"

"সত্যিই যদি তুমি পাথরকে জীবন্ত করতে পার তাহলে জীবজগতে ভারসাম্য কি নষ্ট হয়ে যাবে না? যারা জীবন্ত তারাই জীবনযুদ্ধে হিমশিম খাচ্ছে, সমস্ত পাথররা যদি জীবন্ত হযে ওঠে তাহলে তো"—

"বিজ্ঞানী আবিষ্কারের আনন্দ নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকে। গীতার উপদেশই সে মানে—কাজ করে যাও, ফলাফল নিয়ে মাথা ঘামিও না। পরমাণু-বোমা আবিষ্কার করে সে মানব সমাজকে সন্ত্রস্ত করেছে, ডাক্তারি ওষুধ বার করে সে স্বাভাবিক মৃত্যুর পথ রোধ করবার চেষ্টা করে চলছে, সমাজের ওপর এসবের নানারকম প্রতিক্রিয়া তো হচ্ছেই। কিন্তু সে দিকে দৃকপাত করবার সময় নেই বিজ্ঞানীর। সে আবিষ্কারের আনন্দে মশগুল। বরফ গলছে, তুমি এবার যাও কিঙ্কিণী, আমি দেখি এটাকে ভালো করে।"

"আমি একটা আশ্চর্য জিনিস দেখলাম এখনি।"

"কি—?"

"দেখলাম দমন দেও যেন ছায়া-রূপে তোমার ভিতর প্রবেশ করল। তার সিংহটাও যেন ঢুকে গেল তোমার মধ্যে—তুমি বুঝতে পেরেছিলে?"

প্রদীপ্ত হয়ে উঠল রঘুপতির চোখের দৃষ্টি।

"তুমি দেখলে? কিন্তু আমি বুঝতে পাবিনি কিছু। অবশ্য আমি মনে মনে কামনা করছিলাম দমন দেওয়ের মত শক্তি আমি যেন পাই। তুমি দেখলে দমন দেও ঢুকে পড়ল আমার মধ্যে?"

"হ্যাঁ দেখলাম তো। কিন্তু কি করে সম্ভব হয় এসব!"

"সে বিচার করবার প্রবৃত্তি নেই এখন। দমন দেও যদি আমার মধ্যে ঢুকে থাকে তাহলে আমি অসাধ্যসাধন করতে পারব। আমি যে পথে চলেছি তা দুর্গম, সে পথে চলতে হলে শারীরিক শক্তিরও প্রয়োজন, দমন দেও আমাকে যদি সে শক্তি দেয়—"

হঠাৎ থেমে গেল রঘুপতি। চেয়ে রইল কিঙ্কিণীর দিকে। অবাক হয়ে গেল কিঙ্কিণী, শিউরে উঠল। রঘুপতির চোখে ও কার দৃষ্টি? রঘুপতির? না দমন দেওয়ের?

"আমি এখন যাই, তুমি কাজ কর—"

"যাবে? কিন্তু তোমাকে, কি বলব ভেবে পাচ্ছি না, আমি যাব তোমার কাছে আবার—তুমি—"

একটু থেমে তারপর হঠাৎ অস্বাভাবিক কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল রঘুপতি— "যাও, যাও, যাও তুমি কিঙ্কিণী, আমাকে কাজ করতে দাও—"

কিঙ্কিণীর মনে হল রঘুপতির মধ্যে দুটো সত্তা যেন দ্বন্দ্ব করছে। একজন তাকে চাইছে, আর

একজন তাকে দূর করে দিচ্ছে। রঘুপতি হঠাৎ আর একটা ঘরে অন্তর্ধান করল। কিঙ্কিণীও বেরিয়ে গেল আস্তে আস্তে। গিয়ে দেখল উপত্যকার বাইরে পার্বতী অপেক্ষা করছে তার জন্যে। আর চারিদিকে থই থই করছে জ্যোৎস্না। নিঃশব্দ অথচ মুখর, স্পষ্ট অথচ রহস্যময়। নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিঙ্কিণী। সহসা সে দেখতে পেল একটু দূরে একটি মন্দির রয়েছে। স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল মন্দিরটি। মনে হল অনুচ্চারিত ভাষায় মন্দিরটি তাকে যেন ডাকছে।

"ও মন্দিরটা কিসের?"

"ওটা খালি মন্দির। শুনেছি ওই মন্দিরে একদিন ছিন্নমস্তা অধিষ্ঠাতা হবেন, এখনও হননি।"

"কতদূরে ওটা?"

"বেশি দূরে নয়। তবে ছোট একটা পাহাড়ে উঠতে হবে।"

"চল দেখে আসি—"

মন্দিরের দিকে অগ্রসর হল তারা।

একটু দূর গিয়েই কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল কিঙ্কিণী। মনে হতে লাগল একটা দুর্নিবার আকর্ষণ যেন তাকে টেনে নিয়ে চলেছে ওই মন্দিরের দিকে। একটা খালি মন্দির দেখে কি হবে এ কথা মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল তার, কিন্তু সে থামতে পারছিল না। ট্রেনে সেই ভদ্রলোক তার হাত দেখে যে গল্পটা শুনিয়েছিলেন সেই গল্পটা আবার মনে পড়তে লাগল তার। আবছাভাবে এ-ও মনে হতে লাগল তার নিয়তিও বোধ হয় জড়িত হয়ে আছে ওই মন্দিরের সঙ্গে। আরও রহস্যময় হয়ে উঠল জ্যোৎস্না, পেঁজা তুলোর মত বরফ পড়তে লাগল। তার মনে হল পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। তারপর হঠাৎ আবার মনে হল এই সব অসম্ভব অলৌকিক ব্যাপারে সত্যিই সে বিশ্বাস করছে না কি! তার বাস্তব বুদ্ধি কি লোপ পেয়ে গেল? তবু কিন্তু সে থামতে পারল না। চলতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে টিলার উপর উঠে মন্দিরের সামনে যখন সে দাঁড়াল তখনও সে স্বপ্নাচ্ছন্ন। মন্দিরে দ্বার নেই। দেখল মন্দির শূন্য নয়। ভিতরে একটা ছায়ার মত কি যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক মুহূর্ত থামছে না। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিঙ্কিণী। সহসা কে যেন তার কানে কানে বলল— তোমার এখনও সময় হয়নি। হবে, শীঘ্রই হবে। চারিদিকে কেউ নেই। একটা হাওয়া উঠেছে। সেই হাওয়ায় নৃত্য করে বেড়াচ্ছে অসংখ্য বরফের ফুলকি...। হঠাৎ কলকণ্ঠে হেসে উঠল কে যেন। ঘাড় ফিরিয়ে অবাক হয়ে গেল কিঙ্কিণী।

"ওমা, আপনি এখানে?"

রত্ন এগিয়ে এল হাসতে হাসতে। কিঙ্কিণী দেখতে পেল তার পিছনে পিছনে ঝিলিকও আসছেন।

"আপনারা—"

"আপনার ডাকেই তো এসেছি আমরা।"

"আমার ডাকে?"

"হ্যাঁ, আপনি অনেকক্ষণ থেকে ডাকছেন। আমরা পাতালপুরীতে ভোগবতীর তীরে ছিলাম, তাই আসতে একটু দেরি হল। এসে দেখলাম আপনি রঘুপতির উপত্যকা থেকে বেরুচ্ছেন। সেই থেকে আমরা আপনার অনুসরণ করছি। আপনি যখন ওই শূন্য মন্দিরের সামনে বিহ্বল হয়ে গেলেন তখন হাসি চাপতে পারলাম না, হেসে ফেললাম—"

ঝিলিক বললেন, "হেসে তুমি অন্যায় করেছ। এটা হাসির ব্যাপার নয়। উনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে

পড়েছেন। তাই ডাকছিলেন আমাদের। আমরা এসেছি। এখন কি করতে হবে বলুন—"

রত্ন মুচকি মুচকি হেসে বলল— "রঘুপতির চেয়ে অনেক বড় বড় মহারথীকে আমরা ঘায়েল করতে পেরেছি—আপনার ভাবনা নেই।"

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিঙ্কিণী। তার মনের গোপন কামনা কি করে টের পেল এরা। এখনই সে তো রঘুপতির কথাই ভাবছিল।

"আমার এ অবস্থা কেন হয়েছে বলতে পারেন?"

"আমাদেরই কীর্তি। আপনি যখন রাত্রে ছাদে উঠে রঘুপতির সঙ্গে নক্ষত্র দেখতেন তখনই আপনাকে লক্ষ্য করে শরসন্ধান করেছিলেন আমার কর্তা। কথাটা আগে আপনাকে বলিনি।"

আবার কলকণ্ঠে হেসে উঠল রত্ন। তারপর মিলিয়ে গেল দুজনে। অন্তর্ধান করল সহসা।

কিঙ্কিণী ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, পার্বতী নীরবে দাঁড়িয়ে আছে।

"ওরা কি করে এল এখানে?"—প্রশ্ন করল তাকে।

"কই, কেউ তো আসেনি"

"আসেনি?"

তাহলে হয়তো তার মনোলোকেই ঘটে গেল এসব। কিন্তু এত স্পষ্ট, এত বাস্তব!

"আর কোথাও যাবেন কি"—জিজ্ঞাসা করল পার্বতী।

"না, চল ফিরে যাই।"

ঘরের ভিতর চুপ করে বসেছিল কিঙ্কিণী।

রত্ন আর ঝিলিক আবার এসেছে। সত্যি এসেছে, না কল্পনা করছে সে? রত্ন আর ঝিলিকের সঙ্গে সে কথা কইছে, তাদের দেখতে পাচ্ছে, তবু কেন তার মনে হচ্ছে ওরা আসেনি, যা ঘটছে তা তার মনের ভিতরেই ঘটছে, বাইরে তার কোনো অস্তিত্ব নেই? জানালা দিয়ে চেয়ে দেখল বরফের পাহাড় তিনটে ঠিক আগেকার মতই দেখা যাচ্ছে, জ্যোৎস্নার স্পর্শে রূপোর পাহাড় হয়ে উঠেছে তারা।

রত্ন আর ঝিলিক কিন্তু কথা কইছে। সেও যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গে। অথচ তার আর একটা সত্তা একটু দূরে দাঁড়িয়ে যেন তাদের এই আলাপ শুনছে।...

ঝিলিক। এ কথা এখন স্বীকার করতে আপত্তি নেই, আমরা ট্রেনে যখন উঠছিলাম তখনই দমন দেওকে অভিভূত করেছিলেন। সে তখনই আপনার প্রেমে পড়েছিল।

কিঙ্কিণী। সত্যি? কেন এ কাজ করলেন?

রত্ন। যে রূপকথালোকে আপনি এসেছেন সেখানে ছিন্নমস্তার মন্দিরটি তো দেখলেন। তার মধ্যে যে কালো ছায়া নেচে বেড়াচ্ছে সে মূর্তিমতী হবে একদিন। তাই এই ষড়যন্ত্র।

কিঙ্কিণী। ষড়যন্ত্র? কে ষড়যন্ত্র করছে?

ঝিলিক। (হেসে) আপনি নিজে, কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে। আপনার এই রূপকথালোকে আপনিই ওই মন্দিরে ছিন্নমস্তা স্থাপন করবেন। আমরা আপনাক সাহায্য করতে এসেছি—

কিঙ্কিণী। এটা আমার রূপকথালোক?

ঝিলিক। আপনারই।

কিঙ্কিণী। শিবের নয়?

রত্ন। শিবেরও। শিব সাহায্য না করলে আপনি একা পারতেন না। শিবের ইঙ্গিতেই আমরা এসেছি, দমন দেও এসেছে, রঘুপতি এসেছে।

কিঙ্কিণী। তাই না কি! কিন্তু শিবকে আমি একদিনও দেখিনি কেন।

ঝিলিক। পংখী কি আপনাকে বলেনি কেন দেখতে পাচ্ছেন না তাঁকে। তিনি আপনার আশেপাশেই ঘুরছেন, কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন না তাঁকে। অবিশ্বাসের পরদা আপনার দৃষ্টির সামনে ঝুলছে।

কিঙ্কিণী। তিনি শুনেছি সর্বশক্তিমান, তিনি এ পরদাটা সরিয়ে দিচ্ছেন না কেন জোর করে?

রত্ন। সরিয়ে দিতে পারলে নিশ্চয় দিতেন। কিন্তু অবিশ্বাসের পরদা জোর করে সরিয়ে দিলে নাটক জমে না। সর্বশক্তিমান ভগবান তা করতে চান না। বাস্তবের রূঢ় আঘাতে ওটা নিজেই ছিঁড়ে যাবে একদিন। ততদিন তিনি অপেক্ষা করতে চান।

কিঙ্কিণী। আপনাদের দেখতে পাচ্ছি, এই অদ্ভুত পরিবেশ দেখতে পাচ্ছি এও তো অবিশ্বাস্য, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তো!

ঝিলিক। পাচ্ছেন, কারণ এটা যে আপনারই সৃষ্টি। শিব কিন্তু আপনার সৃষ্টি নন। তাঁকে দেখবার দৃষ্টি যখন পাবেন তখনই দেখা যাবে তাঁকে, তার আগে নয়—

অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল কিঙ্কিণী। মনের দিকে চেয়ে দেখল সত্যিই তো সেখানে অবিশ্বাস রয়েছে। এই সব তার সৃষ্টি? দমন দেও, রঘুপতি, পংখী, এই উপত্যকা, ওই পাহাড়গুলো, ওই পার্বতী-উমা, ওই খালি ছিন্নমস্তার মন্দির, ওই বক—এ সব তার সৃষ্টি? কি এমন শক্তি আছে তার? তার মনের অতলে এই শক্তির উৎস লুকিয়ে ছিল? কই, এতদিন তো টের পায় নি সে। কোন মন্ত্রবলে সে আবিষ্কার করল এই শক্তির উৎসকে? মনে পড়ল সে যখন মোটর থেকে নেমে মাঠামাঠি ছুটছিল, যখন প্রতিমুহূর্তেই তার আশঙ্কা হচ্ছিল পিছন থেকে কোনো গুণ্ডা এসে তাকে ধরে ফেলবে। তখন তার মনে ফুটে উঠেছিল পিসিমার ঠাকুরঘরের সেই শিবের ছবিটি। প্রশান্ত মুখে স্মিত হাস্য। নয়নের দৃষ্টিতে করুণা আর আশ্বাসের বাণী নীরব মুখরতায় মূর্ত। তা ভাষায় কিছু বলছে না অথচ সব বলছে। তার কাছে কি আকুল প্রার্থনা জানায়নি কিঙ্কিণী? ক্ষণকালের জন্য তার মনে কি অগাধ বিশ্বাস জাগেনি? তারই ফল কি এই সব? তার গভীরতম সত্তায় সৃষ্টির যে স্বপ্ন সুপ্ত হয়েছিল তাই কি জেগে উঠল পরম মুহূর্তের অলৌকিক সুষমায়? সেই স্বপ্নের মধ্যে কি লুকিয়ে ছিল মহাশক্তিমান বর্বর দমন দেও, আদর্শবাদী বিজ্ঞানী রঘুপতি, যাদুকর পংখী, পুরাণের মদন-রতি, অতি-বিশ্বাসী বৃদ্ধ বক, বিষধর সাপের দল—এরা সবাই সুপ্ত ছিল তার অবচেতন স্বপ্নলোকে? বিশ্বাসের ছোঁয়া লেগে সবাই জেগে উঠল, বর্ষণের পর ঊষর ক্ষেত্রে যেমন জেগে ওঠে শ্যাম সমারোহ, কিন্তু যে বিশ্বাসের প্রভাবে এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে সে বিশ্বাস কি তার এখনও আছে? যদি থাকে তাহলে শিবকেও সে দেখতে পাবে না কেন। ঝিলিককে প্রশ্ন করবার জন্যে সে ঘাড় ফেরাল। কিন্তু দেখল তারা কেউ নেই। অবাক হয়ে গেল।

"পার্বতী—"

পাশের ঘর থেকে পার্বতী নীরবে এসে দাঁড়াল।

"এঁরা কোথা গেলেন?"

"কেউ তো আসেননি"

"আসেননি? তাহলে কি আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এখনই তো রত্ন আর ঝিলিক বসেছিলেন আমার সামনে।"

পার্বতী নীরবে দাঁড়িয়ে রইল ক্ষণকাল। তারপর বলল— "আপনার কল্পনাই হয়তো মূর্তিমতী হয়েছিল। অনেক সময় হয়। এখন খাবেন কি? খাবার তৈরি হয়ে গেছে—"

"বেশ দাও।"

অনেক রকম সুখাদ্য টেবিলের উপর সাজানো ছিল। কিঙ্কিণী সামান্য একটু খেল। তারপর বাইরের বারান্দায় গিয়ে বসল সে। জ্যোৎস্না, অপরূপ জ্যোৎস্না চারিদিকে। বারান্দার একধারে সেই পাথরের পরদাটা টাঙানো ছিল। কিঙ্কিণীর মনে হল দেখি না আমার জীবন কোন ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে এখন।

ঘরের সামনে দুজন বন্দুকধারী প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে।

দুজন ভদ্রলোক বাইরে থেকে এসে দাঁড়ালেন।

"কিঙ্কিণী দেবীর সঙ্গে দেখা করব।"

"আপনারা বসুন এইখানে। আর এই শ্লেটে আপনাদের নাম ঠিকানা আর কেন এসেছেন লিখে দিন।"

"উনি ফোনে আমাদের ডেকেছিলেন।"

"তবু লিখে দিন—"

শ্লেটের লেখা নিয়ে একজন ভিতরে প্রবেশ করল এবং কপাটটি ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল আবার। বোঝা গেল কিঙ্কিণীর সঙ্গে দেখা করা শক্ত। সব সময়ই সে রুদ্ধদ্বারের ওপারে থাকে। দ্বারের সামনে থাকে কড়া পাহারা। প্রহরী যখন ঢুকল তখন কিঙ্কিণী টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে চিঠি লিখছিল। প্রহরী একটু গলা খাঁকারি দিতেই কিঙ্কিণী ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল তার দিকে।

"দুজন ভদ্রলোক এসেছেন দেখা করতে!"

শ্লেটের দিকে তাকিয়ে কিঙ্কিণী বলল— "হ্যাঁ, আমিই ডেকেছি ওঁদের। থাম, তবু একবার চেহারাটা দেখেনি।"

কিঙ্কিণী উঠে গেল। কপাটের ছেঁদা দিয়ে দেখল কে এসেছে। তারপর বলল— "ঠিক আছে। আসতে দাও ওঁদের।"

ভদ্রলোক দুজন এলেন ঘরের মধ্যে। একজন প্রবীণ, আর একজন যুবক। কিঙ্কিণী উঠে প্রবীণ ভদ্রলোককে প্রণাম করে বলল— "আসুন মামাবাবু"— যুবকটির দিকে ফিরে মৃদু হাসল একটু— "অসিত তুমি ভালো আছ? তুমি ব্যারিস্টার হয়ে ফিরেছ কাগজে দেখলাম পরশু। খাবে কিছু?"

অসিত এককালে কিঙ্কিণীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ছিল। কিন্তু আমোল দেয়নি তাকে কিঙ্কিণী। অপ্রত্যাশিতভাবে কিঙ্কিণী তাকে ফোন করাতে সে বিস্মিত হয়েছিল একটু।

"না। হঠাৎ ডেকেছ কেন।"

"এঁকে চেন?"

"না"

"ইনি আমার মামাবাবু।"

অসিত নমস্কার করল ভদ্রলোককে। তারপর হেসে বলল— "আমার ধারণা ছিল তোমার মায়ের কোনো ভাই নেই।"

"ইনি মায়ের দূর সম্পর্কের ভাই। রাঁচিতে থাকেন। ওঁকে 'ট্রাংক কল' করে ডেকে এনেছি আজ।"

প্রবীণ ভদ্রলোক বললেন—"কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলাম না। তোমার বাবার সঙ্গে তোমার

ঝগড়া চলছে সেটা শুনেছি। সেই সম্পর্কেই ডেকেছ না কি। আমার মত হচ্ছে মিটিয়ে নাও। ঝগড়া করে লাভ নেই। অনেকদিন জজিয়তি করে এইটে বুঝেছি যে—"

থামিয়ে দিলে তাঁকে কিঙ্কিণী।

"এ ঝগড়া মিটবে না। মিটতে পারে না। বাবা সমস্ত সম্পত্তিটি গ্রাস করে তা মদে মেয়েমানুষে রেসে নষ্ট করতে চান। আমি তা কিছুতে হতে দেব না। জানেন? বাবা গুণ্ডা লাগিয়ে আমাকে খুন করতে চেয়েছিলেন? অনেক কষ্টে বেঁচেছি। ভয়ে ভয়ে বেঁচে আছি। চারিদিকে পাহারা রেখেছি। এ সত্ত্বেও হয়তো তিনি খুন করে ফেলবেন আমাকে। তাই আমি একটা উইলে সাক্ষী হবার জন্যে ডেকেছি আপনাদের।"

"বিষয়ের মালিক তুমিই?"

"হ্যাঁ। বিষয় মায়ের ছিল। মা সেটা আমাকে দিয়ে গেছেন।"

"তোমার বাবার কোনো অধিকার নেই সে বিষয়ে?"

"না। ঠাকুরদা বাবাকে একটা মিল এবং মাসিক পাঁচ শো টাকা মাসোহারা দিয়ে গিয়েছিলেন। বাকি সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছিলেন মাকে। মা যখন বেঁচেছিলেন তখনই তিনি আমাকে সে সম্পত্তি দানপত্র করে দিয়ে গেছেন।"

"উইলটা লিখেছ?"

"লিখেছি।"

ড্রয়ার টেনে উইল বার করল কিঙ্কিণী।

"পড়।"

"এই আমার শেষ উইল। এই উইল দ্বারা আমি আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আমার বন্ধু অধ্যাপক রঘুপতি মুখোপাধ্যায়কে দিয়া যাইতেছি। তিনি ফিজিক্সের অধ্যাপক। বর্তমানে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কর্মে নিযুক্ত আছেন। আমার সমস্ত বিষয়ের বর্তমান আয় বৎসরে দশ লক্ষ টাকা। আমার ইচ্ছা এই টাকা আমাদের সমাজের নির্যাতিতা নারীদের উদ্ধার এবং রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয়িত হোক। ইহা ছাড়াও অধ্যাপক রঘুপতি মুখোপাধ্যায় যদি এ টাকা অন্য কোনো সৎকার্যে ব্যয় করেন তাহাতেও আমার আপত্তি নাই। আমি আমার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করিলাম, কিন্তু আমার ইচ্ছার দ্বারাই তিনি চালিত হইবেন এমন বাধ্যবাধকতা নাই। আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি এবং বিশ্বাস করি তিনি এ টাকার সদ্ব্যবহারই করিবেন। তবে আর একটা আশঙ্কাও আছে। তিনি আমার এ দান প্রত্যাখ্যানও করিতে পারেন। যদি করেন তাহা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনই যেন আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সালারের নিকট হইতে অধ্যাপক রঘুপতি মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে যে পত্রটি পাইয়াছি তাহা এই উইলের সঙ্গে দিলাম। ইহাতে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের বিস্তৃততর পরিচয় এবং তাঁহার আমেরিকার বর্তমান ঠিকানা দেওয়া আছে।"

উইল পড়া হয়ে গেল দুজনেই চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। প্রবীণ ভদ্রলোক বললেন—"এইবার আমাদের সামনে সই কর।"

সই করা হয়ে গেলে দুজনেই যথাবিধি উইলের সাক্ষী হলেন।

কিঙ্কিণী বললে, "এ উইলের আর একটি কপি করেছি। দ্বিতীয় কপিটিতেও আমি সই করছি, আপনারাও সই করে দিন। একটি কপি নিয়ে রেজেষ্ট্রী অপিসে দিতে হবে।"

প্রবীণ ভদ্রলোক বললেন, "আমি তো আজই চলে যাচ্ছি। এখানেই রেজেস্ট্রি করিয়ে নিও। রেজেস্ট্রি না করালেও চলে।'

"রেজেস্ট্রি করাতেই হবে। অসিত তুমি ভার নাও তাহলে—"

"বেশ—"

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল কিঙ্কিণী। একটা কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার মনোলোক পরদার ছবিটা মিলিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বিহ্বল হয়ে সে শুধু ভাবতে লাগল, কোনটা সত্য? আমি কোথায় আছি, রঘুপতি কোথায়...। এর পর কতক্ষণ কেটে গেছে তা তার মনে নেই। হয়তো সময়ের স্রোত থেমে গিয়েছিল, হয়তো সময় মাপবার চেতনা হারিয়ে গিয়েছিল, হয়তো কিঙ্কিণী এমন একটা লোকে চলে গিয়েছিল যেখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিছু নেই, কিন্তু তবু—হ্যাঁ অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় এটা—সেখানে আনন্দ ছিল বস্তুত আনন্দ ছাড়া সেখানে আর কিছু ছিল না এবং আশ্চর্যের কথা সে আনন্দ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়, কোনও বিশেষ ইন্দ্রিয় দিয়ে তা উপভোগ করে নি কিঙ্কিণী উপভোগ কথাটা দিয়েও তা বর্ণনীয় নয়, আসলে খানিকক্ষণের জন্য সে যা পেয়েছিল তা অনির্বচনীয়। কিন্তু সেখান থেকে চলে আসতে হল অবশেষে। কি করে সে সেখানে গিয়েছিল, কি করেই বা সেখান থেকে ফিরে এল, কিছুই বুঝতে পারল না সে। চোখ খুলে দেখল পংখী দাঁড়িয়ে আছে।

"পংখী আমি কোথায় ছিলাম এতক্ষণ।"

পংখী চুপ করে রইল। তার চোখে মুখে ফুটে উঠল একটা অসহায় ভাব। পংখীর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে কিঙ্কিণী বুঝল ব্যাপারটা। যা বলা যায় না তা ও বলবে কি করে?

কিঙ্কিণী কি বলতে পারবে?

পংখী তবুও বলল—"আপনি আভাস পেয়েছেন।"

"কিসের আভাস?'

"যার জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তপস্যা করছেন।"

"কিঙ্কিণী চুপ করে রইল।

তারপর পংখী বলল—"আমি আপনার কাছে একটি নিমন্ত্রণ নিয়ে এসেছি। ছিন্নমস্তার যে শূন্য মন্দির আজ আপনি দূর থেকে দেখে এসেছেন সেই মন্দির আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে আগামী অমাবস্যায়!"

"মন্দির আমন্ত্রণ জানিয়েছে? মন্দির কথা বলতে পারে?"

"পারে। তার কথা আমি বুঝতে পারি। বলেছে যদি আপনি যান সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে যাবেন। শাণিত খড়্গ। পথে বিপদের সম্ভাবনা।"

কিঙ্কিণীর মনে হল এইবার ঘনিয়ে আসছে। যা অনিবার্য তা এবার ঘটবে। কিন্তু তারপর?

পংখী বললে— "কাল আমি ভালো খড়্গ রেখে যাব একটা।"

কিঙ্কিণী নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর পংখী বললে— "কাল সকালে নীলপর্ণও আসতে চায়। আপনার অনুমতি চেয়েছে। আসতে বলব তো?"

"বোলো—"

খুব ভোরে উঠেই স্নান সেরে নিয়েছিল কিঙ্কিণী। ভেবেছিল স্বপ্নের ঘোরটা স্নান করলেই কেটে যাবে। কিন্তু কাটেনি। তার পিসিমার কথাগুলো সমানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল তার কানের পাশে। "আমি শিবকে বলেছি তোর কথা। কোনো ভয় নেই তোর। তিনি বলেছেন সব ঠিক করে দেবেন। বিশ্বাস হারাসনি। বিশ্বাস কর, তিনি যা করবেন তাতে তোর মঙ্গল হবে।"

পিসিমা কতদিন আগে মারা গেছেন। কোথায় আছেন তিনি এখন? সেখানে কি শিবের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁর? আমার কথা বলেছেন শিবকে?

পার্বতী এসে বলল— "আপনার খাবার দিয়েছি।"

খাবার টেবিলে রোজই অনেক রকম খাবার থাকে। সেদিন একটা নূতন খাবার ছিল। শ্বেতপাথরের বাটিতে ঘিয়ের মতো কি খানিকটা।

"কি এটা—"

"মধু।" পংখী বলল— "আপনি খুব ক্লান্ত হয়ে আছেন তাই আপনাকে মধু দিতে।"

কিঙ্কিণী অন্যমনস্ক হয়ে রুটিতে মধু মাখিয়ে খেতে লাগল। ক্রমশ তার দেহের শিরা-উপশিরায় সঞ্চারিত হতে লাগল একটা স্নিগ্ধ উত্তাপ। সত্যিই সে খুব অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। সেইজন্যেই ভালো ঘুমও হয়নি তার। খুব বেশি ক্লান্তি হলে ঘুম আসে না। আচ্ছন্ন হয়ে শুয়েছিল সে বিছানায়, ঘুম আসেনি। এসেছিলেন পিসিমা। এখন ঘুম পেতে লাগল তার। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো বুজে গেল। বিশ্রামের অতলে তলিয়ে গেল সে। মনে হতে লাগল বিরাট সমুদ্রের তলায় যেন নেবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। তারপর মনে হল কার কোলে যেন সে শুয়ে রয়েছে। কার কোলে শুয়ে আছি? ঘুমের মধ্যেই প্রশ্ন জাগল মনে। তারপর চোখ খুলে দেখবার চেষ্টা করল সে। দেখেই চমকে উঠল। একি—এ যে ট্রেনের সেই ভদ্রলোক। ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসল সে। দেখল পার্বতী দাঁড়িয়ে আছে।

"নীলপর্ণ অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলে। আপনি ঘুমুচ্ছিলেন বলে আপনাকে ওঠাইনি।"

কিঙ্কিণী বেরিয়ে দেখল বিরাট একটা নীলরঙের পাখি পায়চারি করে বেড়াচ্ছে সামনের মাঠে। অনেকদিন আগে চিড়িয়াখানায় উটপাখি দেখেছিল, নীলপর্ণ তার চেয়েও অনেক বড়। প্রায় একতলা সমান উঁচু। সর্বাঙ্গে নীলবর্ণের সমারোহ। মাথায় মুকুটের মত ঝুঁটি একটি। চোখ দুটি বড় বড়। রক্তাভ। পাখির চোখের মত গোল-চোখ নয়, মানুষের চোখের মত। পা দুটি সবুজ, মরকতমণি দিয়ে তৈরি যেন। বাঁশের মত মোটা। পায়ের নখ .থকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে স্বর্ণ-দ্যুতি।

কিঙ্কিণী বারান্দা থেকে নেমে প্রণাম করল তাঁকে।

"আসুন—"

কিঙ্কিণীকে দেখে নীলপর্ণের গায়ের পালকগুলো ফুলে উঠল। নানা আমেজের নীল রঙের একটা প্রকাণ্ড বেলুন দ্রুতপদে এগিয়ে এল কিঙ্কিণীর দিকে। মানুষের ভাষায় কথা কইল।

"অনেকদিন থেকে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে। বক মশাই খুব সুখ্যাতি করেছিলেন আপনার।"

"আমাকে আপনি বলবেন না—"

"আপনি তুমি তুই এসব অবান্তর। সুর মিলে গেছে সেইটেই আসল কথা। সুর না মিললে আসতুম না।"

হেসে উঠল নীলপর্ণ। মনে হল গলার ভিতর থেকে কে যেন হাততালি দিচ্ছে।

কিঙ্কিণী বলল—"আপনি মানুষের মত কথা বলছেন, কিন্তু আপনার পাখির মত চেহারা কেন!"

"আমরা গরুড়ের বংশধর। যে কোনো রূপ আমরা ধারণ করতে পারি। পাখির রূপ ধারণ করে আছি, কারণ তাতে সুবিধে হয়। ত্রিভুবনের সর্বত্র যেতে হয় আমাদের। পাখিই জলে স্থলে আকাশে যেতে পারে। পংখীও ওই কারণে পাখি হয়ে আছে। আসলে ও শুকদেব। মহাদেবই ওকে সৃষ্টি করে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে দিয়েছিলেন। এখন ও মহাদেবের কাছেই থাকে। মহাদেবের আদেশে চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। পাখি হলে ঘোরাফেরায় সুবিধা হয় খুব।"

"মহাদেবকে দেখেছেন আপনারা?"

"তাঁর মধ্যেই তো নিমজ্জিত হয়ে আছি। তুমি হাওয়াকে দেখেছ কখনও? অথচ হাওয়ার মধ্যেই তো ডুবে আছ। যেতে দাও ওসব কথা, বুঝবে যখন বুঝবে, কেউ কাউকে বুঝিয়ে দিতে পারে না। একদিন নিজেই বুঝবে। যারা চোখ বুজে সব মেনে নিতে পারে, তুমি সে জাতের লোক নও। তুমি দ্বিধাগ্রস্ত জিজ্ঞাসু। তোমার দ্বিধাও ঘুচবে। সবাই ডুবে যাবে একদিন। এইবার যে জন্যে তোমার কাছে এসেছি সেইটে বলি। দমন দেও বলে মহাদেবের এক ভক্ত এখানে এসেছে। লোকটা না কি ডাকাত ছিল। লোকটা আমাকে ভারি বিরক্ত করছে।"

"আপনাকে?"

"হ্যাঁ। মহাদেবের অতুল ঐশ্বর্য কুবেরের ভাণ্ডারে আছে। সেই ভাণ্ডারের আমি প্রহরী। সে ভাণ্ডারের দ্বারে পৌঁছানো সহজ নয়। দুর্গম পাহাড়, দুস্তর প্রপাত, ভয়ঙ্কর অরণ্য, জ্বলন্ত অগ্নিশিখার বেষ্টনী পার হয়ে যেতে হয় সেখানে। দুর্ধর্ষ ডাকাত দমন দেও এসব অতিক্রম করে কুবেরের ভাণ্ডারে ঢুকেছিল। ঢুকে স্যমন্তক মণিটি চুরি করে পালাচ্ছিল, কিন্তু ফিরবার পথে ধরা পড়ল নাগ প্রহরীদের কাছে। তারা ওকে বন্দী করে নিয়ে এল আমার কাছে। দমন দেও বলছে সে স্যমন্তক মণিটি তোমাকে দেবে বলে চুরি করতে গিয়েছিল, সে তোমাকে ভালোবাসে। সাধারণ চোর হলে সাপেরা তাকে মেরে ফেলত। কিন্তু সে শিবভক্ত বলে সাপেরা তাকে মারেনি। দমন দেও বলছে তুমি যদি স্যমন্তক মণিটি গ্রহণ কর তাহলে মরতেও তার আপত্তি নেই। আমিই বিচারক, কিন্তু আমি একটু গোলমালে পড়েছি। তোমরা দুজনেই মহাদেবের প্রিয়, তা নাহলে এখানে আসতে না। তোমাদের মধ্যে প্রেম হয়েছে। হঠাৎ একজনের প্রাণদণ্ড দিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক হবে? তাই তোমাকে জিগ্যেস করতে এসেছি এখন কি করি বল। এ জট তুমিই ছাড়াও—"

আবার নীলপর্ণের গলার ভিতর হাততালি বেজে উঠল।

"দমন দেও কোথা?"

"সে প্রহরী পরিবৃত হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ডাকব তাকে?"

"ডাকুন—"

"শঙ্খচূড়, দমন দেওকে নিয়ে এস—"

এরপর যে দৃশ্য দেখা গেল তাতে যে কোনো লোক শিউরে উঠত, অভিভূত হয়ে পড়ত বিস্ময়ে আর ভয়ে। কিন্তু কিঙ্কিণী প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতাই আর ছিল না তার। পাঁচটি উদ্যত-ফণা বিরাট সাপ দমন দেওকে ঘিরে ছিল। দমন দেও এগিয়ে আসছিল ধীরে ধীরে, সাপগুলোও আসছিল। দমন দেওয়ের হাতে একটা সূর্য জ্বলছিল যেন। ওই কি স্যমন্তক মণি?

কিঙ্কিণী বিস্মিত হল না, বরং তার মনে হল এই তো স্বাভাবিক। দমন দেও যখন তাকে ভালোবাসে তখন সে তো তার জন্যে অসাধ্যসাধন করবেই। কিছুদিন আগেও তো অনেক মণিমাণিক্য এনে দিয়েছিল তাকে সেগুলো ওই বারান্দার একধারে এখনও পড়ে আছে। তোলা হয়নি। আবার স্যমন্তক মণি চুরি করে এনেছে আমাকে দেবে বলে। প্রাণ তুচ্ছ করে এনেছে। এইটেই তো স্বাভাবিক। একটা সূক্ষ্ম গর্ব সঞ্চারিত হল মনে।

দমন দেও বললে— "তোমার জন্য এটা এনেছি কিঙ্কিণী। এটা নিয়ে আমাকে কৃতার্থ কর। এরা আমাকে মেরে ফেলবে, কিন্তু মরবার আগে যদি জেনে যাই তুমি এটা নিয়েছ তাহলে মরেও আমি আনন্দ পাব। নেবে?"

এ কথার উত্তর না দিয়ে কিঙ্কিণী প্রশ্ন করল— "তোমার সিংহ কোথায়?"

"তাকে আবার ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়েছি। তারই জোরে গিয়েছিলাম কুবেরের ভাণ্ডারে, সেখান থেকে তোমার জন্যে এনেছি সেই স্যমন্তক মণি, যা সূর্য তার বন্ধু সত্রাজিৎকে দিয়েছিলেন, এ মণির অনেক ইতিহাস, অনেক গুণ, তুমি এটি নাও কিঙ্কিণী।"

হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল কিঙ্কিণীর মুখ।

"তোমাকে আমি ভালোবাসি না দমন দেও। তোমার কাছ থেকে উপহার কি করে নেব? আমি তো তোমাকে দিতে পারব না কিছু।"

"আমি কিছু চাই না। আমাকে ভালোবাস না বলছ? কিন্তু তুমি আমারই ভদ্ররূপটাকে ভালোবাস। রঘুপতি আমারই ভদ্ররূপ। রঘুপতির ভদ্ররূপের আড়ালে যে দুর্ধর্ষ ডাকাতটা আছে আমি সেই ডাকাত। আমি রঘুপতিরই মনের আর একটা রূপ। কিন্তু আমি তো আর থাকব না। এরা আমাকে এখনই মেরে ফেলবে। মরবার আগে আমি এই সান্ত্বনাটুকু নিয়ে মরতে চাই—"

"রঘুপতি আর তুমি এক?"

"সেদিন যখন রঘুপতির কাছে গিয়েছিলে তখন কি বুঝতে পারনি সেটা? আমি ওর মধ্যে ছিলাম, যদি মরে যাই তাহলে আর থাকতে পারব কি না জানি না—"

নীলপর্ণ নিজের ডানা দুটো ঈষৎ খুলে মৃদু মৃদু আস্ফালন করছিলেন। আস্ফালন থামিয়ে প্রশ্ন করলেন— "তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেল কি করবে। বেশি দেরি হয়ে গেলে দুর্বাসার কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে। তিনি আজকাল আমাদের সর্বাধ্যক্ষ। বড় কড়া লোক।"

"আমাকে কি করতে হবে—" কিঙ্কিণী আবার প্রশ্ন করল।

"জট ছাড়াও। তুমি কি স্যমন্তক মণিটা নেবে?"

"কুবেরের মণি নিয়ে আমি কি করব?"

"মহাদেবের আদেশে তুমি এখানে যতক্ষণ আছ তোমার সব ইচ্ছা পূর্ণ করতে হবে। স্যমন্তক মণি তুমি যদি চাও পাবে, কিন্তু একটা কথা বলা দরকার। বিশুদ্ধ চরিত্রের লোক ছাড়া স্যমন্তক কারো কাছে থাকেনি। অধার্মিকের পক্ষে ও মণি অনিষ্টকর। প্রসেনজিৎ এ মণি রাখতে পারেননি, জাম্ববান পারেননি। তুমি যদি পুণ্যবতী হও, তাহলে এ মণি তোমার অনেক উপকার করবে, আর তা যদি না হও—"

"আমি পুণ্যবতী কিনা জানি না। পুণ্যের সংজ্ঞা কি তাও আমার জানা নেই। এইটুকু শুধু বলতে পারি নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কিছু কখনও করিনি। এখন যে অদ্ভুত আশ্চর্য দেশে আছি তা না কি মহাদেবের অলৌকিক ক্ষমতা বলে সম্ভব হয়েছে, কিন্তু আমার বিবেকের আয়নায় সে মহাদেবকে

জ্ঞাতসারে আমি দেখতে পাচ্ছি না এখনও, যদিও পংখী বলেছে আমার অবচেতন লোকে আমার সত্তা না কি বিশ্বাসের দৃঢ়ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে বলেই আমি এই পরমমুহূর্তে প্রবেশ করেছি, এখন যা দেখছি তা না কি সেই পরমমুহূর্তের প্রকাশ! কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কিছু, আমার দ্বিধা ঘোচেনি এখনও—"

নীলপর্ণ পাখা দুটি ধীরে ধীরে আস্ফালন করতে করতে শুনছিলেন সব। হঠাৎ বলে উঠলেন—"বাঃ বাঃ বাঃ। খুব খাঁটি লোক তুমি। খাঁটি লোকদের দ্বিধা সহজে ঘোচে না। দ্বিধা ঘুচতে সময় লাগে, অনেক সময় যুগ-যুগান্তর জন্ম-জন্মান্তর কেটে যায়। নিতে পারে তুমি স্যমন্তক মণি। এ মণি শুধু রত্ন নয়, এ মণি সূর্যের আত্মা। তুষ্ট হলে বর দিতে পারেন, রুষ্ট হলে অভিশাপ দিতে পারেন, অতুল ঐশ্বর্য অকল্পিত ক্ষমতা এমন কি আত্মজ্ঞানও লাভ করতে পার এ মণি যদি প্রসন্ন হন—"

"এ মণি এতদিন কুবেরের কাছে ছিলেন? কুবের খুব ভালো লোক বুঝি—"

"এ মণি মহাদেবের। কুবেবের কাছে ছিল, কারণ কুবের মহাদেবের ঐশ্বর্যরক্ষক। কোনো ঐশ্বর্য সম্বন্ধে শিবের মোহ বা মমতা নেই। তিনি নিজের আনন্দেই সর্বদা মশগুল। নানা মণিমাণিক্যের আকর রত্নগিরি দিয়ে দিয়েছেন একজন যক্ষকে সে নাকি ওঁর খুব ভক্ত। বললেন— ওর হীরে-টিরে নিয়ে খেলবার ইচ্ছে হয়েছে দিয়ে দাও ওকে রত্নগিরিটা। খেলুক কিছুদিন। তুমি স্যমন্তক নিলে উনি খুশি হবেন—"

"আমি তো স্যমন্তকের কথা জানতাম না। ওঁকে যদি আমি পাই তাহলে কৃতার্থ হয়ে যাব। ভাগ্যবতী মনে করব নিজেকে। কিন্তু আমার একটা কথা ভেবে দুঃখ হচ্ছে, যে দমন দেও আমাকে স্যমন্তক এনে দিলে তার প্রাণদণ্ড দেবেন আপনারা?"

"তুমি যা বলবে তাই হবে। ওই দুর্ধর্ষ ডাকাতকে তুমি যদি বাঁচিয়ে রাখতে চাও ওকে আমরা মারব না।"

আবার নিজের পক্ষ দুটি ধীরে ধীরে আস্ফালন করতে লাগলেন নীলপর্ণ। কিঙ্কিণী লক্ষ্য করল তাঁর চোখ থেকে একটা চাপা হাসিও যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

"স্যমন্তক তাহলে তুমি নিচ্ছ?"

"যিনি সূর্যের প্রতিরূপ তাঁকে নেব এ কথা বলার স্পর্ধা আমার নেই। তিনি নিজে যদি আসেন তাহলে ধন্য হব আমি। আমি—"

এরপর অতি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল একটা। যে স্যমন্তক মণি দমন দেওয়ের হাতে এক মুঠো আলোর মত জ্বলছিল তা দিব্যকান্তি মনুষ্যমূর্তিতে রূপান্তরিত হল সহসা। মৃদু হেসে এগিয়ে গেল কিঙ্কিণীর দিকে। বলল, "দমন দেও আমাকে আনতে পারত না। আমি স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছি ওর হাতে। কারণ আমি জানতাম ও তোমাকে দেবে বলেই নিয়ে আসছে আমাকে। তুমি আলোর উপাসক, তোমার ডাক শুনেছি আমি, তাই এসেছি—"

ঘরের ভিতর চলে গেল সেই আলোক-মূর্তি। নীলপর্ণ হঠাৎ নৃত্য শুরু করে দিলে মহানন্দে। আর বলতে লাগল— "এরকমটা যে হবে তা ভাবিনি। বাঃ বাঃ বাঃ। দমন দেওকে ছেড়ে দিচ্ছি তাহলে। শঙ্খচূড় ওকে মুক্তি দাও—"

সাপেরা চলে গেল। বিরাট পক্ষবিস্তার করে উড়ে গেল নীলপর্ণ। সমস্ত আকাশ জুড়ে বাজতে লাগল হাততালি।

দমন দেও এগিয়ে এল।

"কিঙ্কিণী তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। প্রতিদান তোমাকে কি দেব বল?"

"কিছু দিতে হবে না।"

"দেবই। তোমার ভুল ভেঙ্গে দেব আমি। তোমাকে বুঝতে হবে যে তোমার রঘুপতি আর আমি অভিন্ন।"

কিঙ্কিণী এর কোনো উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না। ভিতরে ঢুকে গেল।

গিয়ে দেখল মনুষ্যরূপী স্যমন্তক সেখানে নাই।

কিন্তু সমস্ত ঘরটা অপরূপ আলোয় ঝলমল করছে। একটা জীবন্ত অথচ নীরব ভাস্বরতা যেন উজ্জ্বল হয়ে আছে চতুর্দিকে। কিঙ্কিণীর মনে হল তার অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত অবারিত হয়ে গেছে, তার সমস্ত গোপন কথা প্রকাশিত হয়ে গেছে এই আশ্চর্য রঞ্জনরশ্মির কাছে।

বিছানায় বসে পড়ল। তারপর চুপ করে চেয়ে রইল সভয়ে।

আলো কথা কইল সহসা।

"তোমার ভয় করছে?"

"হ্যাঁ। মনে হচ্ছে আমার সব ঢাকা খুলে গেছে।"

"তুমি কি ঢাকা খুলতে চাও না? একটা জিনিস জানি তুমি সত্যকে অপরোক্ষ করতে চাও। সত্যকে আলোতেও দেখা যায় অন্ধকারেও দেখা যায়। আলো যদি তোমার ভালো না লাগে আলোকে অন্ধকারে রূপান্তরিত করতে পারি। তাই কি চাও তুমি—"

চুপ করে রইল কিঙ্কিণী। যেন অপেক্ষা করতে লাগল স্যমন্তকই তার মনের কথা ব্যক্ত করবেন। কিন্তু কিছুই হল না! আলো কমে আসতে লাগল ক্রমশ। দেখতে দেখতে সুচীভেদ্য অন্ধকারে আবৃত হয়ে গেল চারদিক।

"কোথায় আপনি—"

"আমি তোমার কাছেই আছি। সংহরণ করেছি আমার আলো। অন্ধকারেই হয়তো তোমার দ্বিধা ঘুচবে।"

"ঘুচবে কি? যা দেখছি তা কি সত্য?"

কোনো উত্তর এল না।

প্রতীক্ষা করে বসে রইল কিঙ্কিণী। কতক্ষণ বসেছিল কিছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে প্রতীক্ষা করে বসেছিল। স্যমন্তক যদিও কথায় কিছু বলেনি কিন্তু মনের ভিতর একটা উত্তর পেয়েছিল সে! ছিন্নমস্তার মন্দির তাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে অমাবস্যায়। সেই অমাবস্যার অন্ধকারে হয়তো সে উত্তর পাবে।

অন্ধকার চারিদিকে। ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এল সে।

পংখী যে পাথরের পরদাটা টাঙিয়ে দিয়েছিল সেটা বারান্দার ওদিকে আছে। সেইদিকেই এগিয়ে গেল ধীরে ধীরে। তার অপর সত্তাটা কি করছে এখন? সেখানে কি স্যমন্তক মণির ছোঁয়া লাগেনি কিছু? কৌতূহল হল। সঙ্গে সঙ্গে ছবি ফুটে উঠল পরদায়। দেখে শিউরে উঠল সে।

তার ঘরের সামনে খুনোখুনি হচ্ছে। দারোয়ান দুটো রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে। সামনে রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে আছেন তার বাবা।

কিঙ্কিণী কপাট খুলতেই ঘরে ঢুকে পড়লেন তিনি।

"উইল করেছ শুনছি। সব খবর পেয়েছি আমি। উইল বদলাও, তা নাহলে—"

"কি করবে তা নাহলে—"

"ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখব তোমাকে। অকথ্য যন্ত্রণা দেব—"

কিঙ্কিণী নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। তার চোখ বাঘিনীর চোখের মত জ্বলতে লাগল। হঠাৎ সে ড্রয়ার খুলে বার করল তার রিভলভারটা। রিভলভার উঁচিয়ে ধরে বললে—"এখখুনি বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে!"

গর্জন করে উঠলেন কিঙ্কিণীর বাবা।

"রাঘো সিং—রমজু মিঞা। আও তুমলোক— ঘিঁচকে লে যাও এ খচড়িকো।"

দুজন গুণ্ডা প্রবেশ করল দ্রুতবেগে।

সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠল কিঙ্কিণীর রিভলভার। পড়ে গেলেন কিঙ্কিণীর বাবা। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হল তাঁর। গুণ্ডাদের লক্ষ্য করেও গুলি ছুঁড়তে লাগল কিঙ্কিণী। কিন্তু তারা পালিয়ে গেল।

আর দেখতে ইচ্ছে করল না কিঙ্কিণীর। ছবি মিলিয়ে গেল। বারান্দার উপর অবসন্ন হয়ে বসে পড়ল। এই কি সত্যি? এই বাস্তব জীবন যাপন করছে সে? কিঙ্কিণীর মুখ দিয়ে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল। তারপর মূর্ছিত হয়ে পড়ল সে। মূর্ছার ভিতরই পংখী এসে যেন দাঁড়াল। বলল— "মনের ভার লাঘব করে ফেলুন। চিৎকার করে বলুন যা বলতে চান। সভা ডাকব? আপনি তো একবার সভায় বক্তৃতা করতে চেয়েছিলেন। সভা ডাকছি। বক্তৃতা করুন সেখানে। খানিকটা বায়ু বেরিয়ে গেলে হালকা বোধ করবেন।"

"বায়ু?"—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল কিঙ্কিণী।

"মনের ভিতর যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সেটাকে আমরা বক্তব্য বলে মনে করি, কিন্তু বেরিয়ে গেলেই তা বায়ু হয়ে যায়। মিশে যায় বায়ু-সমুদ্রে। কিছুক্ষণ শব্দের ঢেউ ওঠে তারপর তাও থেমে যায়। মনে যা জমেছে বার করে দিন। আরাম পাবেন—"

বিরাট সভা।

লক্ষ লক্ষ লোক বসে আছে উন্মুখ হয়ে।

মাইকও এসেছে একটা। কিঙ্কিণী মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে নির্বাক হয়ে। কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। কানের কাছে পংখীর মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা গেল— "যা মনে আসছে, আরম্ভ করে দিন—"

মরিয়া হয়ে শুরু করে দিল কিঙ্কিণী। বলতে লাগল সেই সব কথা বহুবার যা বহুলোকে বলেছে— "আমরা কি সভ্য হয়েছি? সভ্যতার লক্ষ্য যদি সুখশান্তি লাভ হয়, তাহলে বলতে হবে আমরা সভ্য হইনি। কারণ আমাদের কষ্টের অবধি নেই। আমরা খালি ছটফট করছি, আমরা খালি বদলাচ্ছি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের পশুর বাইরের চেহারাটা বদলেছে, কিন্তু সে মরেনি। নিত্য নতুন প্রসাধনে সে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে! আগে রাজতন্ত্র ছিল, দাসত্ব-প্রথা ছিল, বিজ্ঞানের উন্নতি হয়নি। এখন গণতন্ত্র হয়েছে দাসত্ব-প্রথা নেই, বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু কষ্টের অবসান হয়েছে কি? হয়নি। গণতন্ত্রের নামে নানারকম দল গড়ে আমরা যা করছি তাতে ধনী-দরিদ্র কেউ সুখী হয়নি— লোভীরা, ধূর্তরা, ধনীরা শাসকের আসন দখল করেছে, নতুন ধরনের শৃঙ্খল তৈরি হয়েছে, দেখা

দিয়েছে নূতন ধরনের দাসত্ব-প্রথা। আমরা যন্ত্রের দাস হয়েছি, টাকার দাস হয়েছি, ষড়-রিপুর চাবুকের তাড়নায় আমরা যে মরীচিকার দিকে ছুটে চলেছি তা কি সুখ? তা কি সভ্যতা? প্রত্যেকেরই পশু-রূপ বেরিয়ে পড়ছে মুহুর্মুহু, আমরা যে পথের উপর দিয়ে চলেছি তা রক্তাক্ত— আপনারা সবাই জানেন আমাদের স্বরূপ কি— তার বিশদ বর্ণনা দিয়ে সময় নষ্ট করব না। একটি মাত্র প্রশ্নই আজ মানবজাতির সম্মুখে উদ্যত হয়ে আছে—এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? বুদ্ধির হাত থেকে যুক্তির হাত থেকে মুক্তি পেলেই কি আমরা সুখী হব? আমি যেখানে আছি সেখানে সুখ আছে, স্বাধীনতা আছে, কিন্তু যাকে আমি এতদিন বুদ্ধি বলে যুক্তি বলে মনে করে এসেছি, তার স্থান এখানে নেই। আমি যেন রূপকথার মধ্যে বাস করছি—মনে হচ্ছে যেন অদ্ভুত সুন্দর স্বপ্ন দেখছি একটা। যুক্তি কিন্তু মরেনি, পুরাতন বুদ্ধির মাপকাটি দিয়ে মাপতে যাচ্ছি কিন্তু কিছুই মিলছে না, তাই শান্তি পাচ্ছি না। কিন্তু যুক্তি আর বুদ্ধিকেও ত্যাগ করতে পারছি না। তারা যেন জোর করে আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছে এ সত্য নয়, এ স্বপ্ন, এ ক্ষণিকের মতিভ্রম। আমি যে অস্বস্তি ভোগ করছি তা আপনারাও করছেন, ইতিহাসের জোয়ান অব আর্ক কিন্তু তা করেনি, যে বিশ্বাসের জোরে সে ফ্রান্সের অপদার্থ রাজাকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে মৃত্যুবরণ করেছিল সেই বিশ্বাসের অভাবই আপনাদের প্রধান অভাব। সেটা অনুভব করছি, কিন্তু যা নেই তা কোথায় পাব, কেমন করে পাব— কেমন করে পাব—"

আবার মূর্ছিত হয়ে গেল সে। থেমে গেল বক্তৃতা। মূর্ছার মধ্যে এল স্যমন্তক।

বলল— "মদন আর রতি এসেছিল। তারা তাঁদের পুষ্পধনু রেখে গিয়েছিল তোমার কাছে না কি? দেখলাম বড় নিস্তেজ, বড় মন-মরা হয়ে গেছে দুজনেই। তোমাকে না বলেই আমি ফিরিয়ে দিয়েছি তাদের পুষ্পধনু, ওদের খেলার ওইটেই খেলনা, সেটা তোমার কাছে থাকবে কেন!"

তারপর কতদিন কেটে গেছে।

কিঙ্কিণী জানে না। মনে হল অনেক দিন সে যেন ঘুমিয়েছে। উঠে বসেই দেখল পার্বতী দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

বলল— "পংখী এসেছিলেন। আপনার জন্য একটা খড়্গ রেখে গেছেন। আজ অমাবস্যা। ছিন্নমস্তার মন্দিরে যাওয়ার দিন আজ। বললেন, আপনাকে একা যেতে হবে।"

কিঙ্কিণীর মনে হল শেষ অঙ্কের দৃশ্য অভিনয় হবে আজ।

"স্যমন্তক কোথা—"

"অমাবস্যার ধ্যান করেছেন। অমাবস্যার মধ্যেই দেখা দেবে আপনার সঙ্গে। ওঘরে আপনার খাবার দিয়েছি—"

চলে গেল পার্বতী। আবার ফিরে এল তখনই।

"রঘুপতি এসেছেন দেখা করতে। দেখা করবেন?"

কিঙ্কিণী উঠে দাঁড়াল সহসা। ঘাড় ফিরিয়ে জানলা দিয়ে দেখতে পেল বারান্দায় রঘুপতি দাঁড়িয়ে আছে। রঘুপতির চোখের দৃষ্টি ওই রকম লোলুপ? রঘুপতি, না দমন দেও?

"এখন দেখা হবে না, বলে দাও।"

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কিঙ্কিণী। বেরিয়ে গিয়েই কিন্তু তার সমস্ত অন্তরটা হাহাকার করে উঠল। মনে হল ভুল করলাম বোধহয়, চিরকালের মত হারালুম ওকে। ও নিজে এসেছিল, ওকে ফিরিয়ে

দিলুম? কিন্তু ওর চোখে ওরকম দৃষ্টি কেন। ওরকম দৃষ্টি তো ওর চোখে ছিল না কখনও! ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে গেল রঘুপতি চলে গেছে কি না। রঘুপতিকে দেখতে পেল না। দেখল দূরে তিনটি তুষার পর্বত সবিস্ময়ে চেয়ে আছে তার দিকে। তাদের চেহারাও যেন অন্যরকম।

আগের মতনই সব, কিন্তু কিছু কিছু তফাৎ আছে। আগের মতন মানে, ট্রেনে ভদ্রলোক তার হাত দেখে যা যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার মতন। ভদ্রলোক দারুণ দ্বিপ্রহরের কথা বলেছিলেন, এখন কিন্তু গভীর অমাবস্যা রাত্রি। সামনে যে পাহাড়টা উঠে গেছে তা আকাশচুম্বী তা বোঝা যেত না যদি পাহাড়ের উপরের ওই মন্দিরটি দেখা না যেত। মন্দিরের ভিতর আলো জ্বলছে। আকাশের গায়ে উজ্জ্বল একটি আলোকবিন্দু। প্রতিমুহূর্তে ডাকছে তাকে। ওখানে আলো জ্বাললে কে? মহাদেব?

এর পরই জাপটে ধরল তাকে দুটো বলিষ্ঠ বাহু। চুম্বন করল সজোরে।

"কে—কে—কে—তুমি—"

চিৎকার করে উঠল কিঙ্কিণী। তারপর আঘাত করল খড়্গ দিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল লোকটা।

"আমাকে মেরে ফেললে কিঙ্কিণী? আমি রঘুপতি—"

"রঘুপতি? রঘুপতি এমন অসভ্য হতে পারে না—"

পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল কিঙ্কিণী। বুকে ভর দিয়ে সরীসৃপের মত উঠতে লাগল। তার ভয় হল, ছদ্মবেশী দমন দেও সহজে তাকে নিস্তার দেবে না। কিছুদূর ওঠবার পরই সমতল জায়গা পেল একটা। তার উপরই বসে হাঁপাতে লাগল সে। ওই পর্বতচূড়ালগ্ন ছিন্নমস্তার মন্দির তাকে নিমন্ত্রণ করেছে। সে নিমন্ত্রণ বহন করে এনেছে রহস্যময় পংখী। পংখী খড়্গ দিয়ে গেছে, বলে গেছে এই বিপদসংকুল পথে একলা যেতে হবে অমাবস্যার মধ্যরাত্রে। সে চলেছে, চুম্বক-আকৃষ্ট হয়ে লোহা যেমন যায়। কিসের এই আকর্ষণ? কেন যাচ্ছে সে? যে নিমন্ত্রণ সে স্বকর্ণে শোনেনি, সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছে কেন সে? অথচ সে অনুভব করছে তাকে যেতেই হবে। কি এ রহস্য? সহসা বকুল ফুলের গন্ধে ভরে গেল চারিদিক। গন্ধের সঙ্গে ভেসে এল রত্ন আর ঝিলিকের কলহাস্য। তারপর শোনা গেল তাদের কথা।

ঝিলিক। ভয় পেও না। এইবার তো সত্যকে দেখতে চলেছ।

কিঙ্কিণী। কিসের সত্য? কোন সত্য?

রত্ন। সত্য তো একরকমই হয় এবং তা অবর্ণনীয়। তুমি এতদিন নিজের কাছ থেকেই পালাচ্ছিলে। এখনও পালাচ্ছ, তোমার যে অংশ তোমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, সেই পলাতকার সঙ্গে দেখা হবে তোমার আজ—

কিঙ্কিণী। তুমি কি করে জানলে?

রত্ন। আমি যে কাম। আমার রাজ্যেই তুমি আছ এখনও। একটু পরেই আর থাকবে কি না সেটা নির্ভর করছে তোমার বিবেকের ওপর।

ঝিলিক। আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে। চললুম এখন আমরা।

বকুল ফুলের গন্ধ মিলিয়ে গেল।

নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল কিঙ্কিণী।

সহসা দেখতে পেল বিরাট দৈত্যাকৃতি কি একটা যেন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। কি ওটা? রঘুপতি কি খড়্গাঘাতে মরেনি তাহলে? আনন্দে বুকটা দুলে উঠল তার। আবার বকুল ফুলের গন্ধ ভেসে এল। আবার শোনা গেল রত্ন আর ঝিলিকের চাপা হাসি। দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে দৈত্যটা। কে ও? রঘুপতি? না দমন দেও? যত জোরে সে তাকে জাপটে ধরেছিল, যাতে মনে হচ্ছিল তার বুকের হাড়গুলো গুঁড়িয়ে যাবে, তত জোর কি রঘুপতির থাকতে পারে? রঘুপতি তো ছিপছিপে রোগা রোগা, তার গায়ে অত জোর! একটা আনন্দ-শিহরণ বয়ে গেল তার সর্বাঙ্গ দিয়ে। তার পরই ভয় হল। এ কি! তার অনেকদিন-আগে-পরা সবুজ ডুরে শাড়িটা এক ঝাঁক লাউডগা সাপ হয়ে কিলকিল করছে তার চারিদিকে। খিল খিল করে হাসছে। সে হাসির সঙ্গে মিশছে বকুল ফুলের ঘন গন্ধ, আর সে গন্ধের ভিতরে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে রত্ন আর ঝিলিকের চাপা উন্মাদনা। আত্মহারা হয়ে বসে রইল কিঙ্কিণী। দৈত্যটা কিন্তু এগিয়ে আসছে। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে। রত্ন আর ঝিলিকের প্রছন্ন উন্মাদনাই যেন উৎসাহ দিচ্ছে তাদের। সম্মোহিত হয়ে বসে রইল কিঙ্কিণী।

"হাঁদার মত বসে আছিস কেন? কি বোকা মেয়ে তুই? পালা পালা, ওপরে উঠে যা। তোর শাড়ির ডুরেগুলো সাপ হয়ে পথ দেখাচ্ছে তোকে, মন্দির ডাকছে, বসে আছিস কেন। মন্দিরে পৌঁছলেই হিল্লে হয়ে যাবে একটা। ওঠ—ওঠ—উঠে পড় শিগগির—"

কিঙ্কিণীর চোখের সামনে অন্ধকারের মধ্যে আলোর বৃত্ত ফুটে উঠেছিল একটা। কিঙ্কিণী দেখলে সেই বৃত্তের মধ্যে বক দাঁড়িয়ে আছে লাঠি ধরে ঝুঁকে, চেয়ে আছে তার দিকে মুখ তুলে। তারপর আর একটা দীর্ঘ আলোর রেখায় দেখা গেল— দীর্ঘ উঁচুনীচু অমসৃণ পথ, সেই পথ বেয়ে চলেছে অসংখ্য লাউডগা সাপ বুকে হেঁটে চলেছে ওই মন্দিরের দিকে।

বক আবার বলল— "এসে পড়ল যে, পালা পালা—"

আরও কাছে এগিয়ে এসেছে দৈত্যটা লোলুপ বাহু দুটো বাড়িয়ে। কিঙ্কিণী সহসা উঠে অনুসরণ করতে লাগল লাউডগা সাপেদের, পাথরের উপর দিয়ে, বুকে হেঁটে, আলোর মন্দির লক্ষ্য করে। মনে হল ওটা মন্দির নয়, লুব্ধক নক্ষত্র জ্বলছে যেন। রঘুপতি তাকে লুব্ধক নক্ষত্র চিনিয়ে দিয়েছিল।

মন্দিরে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ঢুকল কিঙ্কিণী। ঢুকেই অবাক হয়ে গেল। তার পিসিমার ঘরে যে মহাদেবের ছবি ছিল সেই ছবিই এখানে জীবন্ত হয়ে বসে আছেন। লাউডগা সাপগুলো তাঁর ঘাড়ে পিঠে উঠছে সে দিকে লক্ষ্য নেই তাঁর। হাসিমুখে চাইলেন কিঙ্কিণীর দিকে।

"আমাকে ওরা তাড়া করছে—"

"কারা—"

"রঘুপতি। দমন দেও। রত্ন আর ঝিলিক।"

"তুমি কি সত্যি ওদের হাত থেকে মুক্তি চাও? মদন আর রতিকে ডাকছি তারা এসে তোমার পায়ের কাছে শুয়ে পড়বে। তোমার হাতে খড়্গ আছে, তুমি ওদের বধ করতে পার। কিন্তু ওরা মরবে না, যদি তুমি তোমার মন থেকে ওদের সম্পূর্ণরূপে দূর করতে না পার। তোমার কামনা থেকে ওরা আবার জন্মাবে। তুমি চুম্বক তাই লোহারা তোমার দিকে ছুটে যাচ্ছে। দমন দেও শক্ত লোহা, সে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে, হয়তো সে রঘুপতির মূর্তি ধারণ করেছে। তুমি ওকেও কি বধ করতে চাও? ওকেও এনে দিতে পারি তোমার খড়্গের সামনে। কিন্তু আসল কথা কি জান? তুমি যতক্ষণ

চুম্বক থাকবে ততক্ষণ লোহারা তোমার পিছু নেবে। তোমাকে নিষ্কাম নিশ্চুম্বক হতে হবে। ভেবে দেখ কি করবে—আমি ওদের ডাকছি।"

শিবের আদেশে রত্ন আর ঝিলিক এসে শুয়ে পড়ল তার পায়ের কাছে। তারপরই এসে প্রবেশ করল সেই দৈত্যটা। কিঙ্কিণী সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল এ দমন দেও, যদিও বাইরের চেহারা রঘুপতির!

"তুমি চলে যাও এখান থেকে—" তর্জন করে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান করল দমন দেও।

মহাদেব হাসিমুখে চেয়েছিলেন তার দিকে।

কিঙ্কিণী জিগ্যেস করল— "স্যমন্তক কোথায়?"

"ঘোর অমাবস্যায় তারই আলোকে প্রকাশিত হয়ে আছি আমি এই মন্দিরে।"

"আপনারা বলুন আমি এখন কি করব—"

"আমরা কিছু বলব না, যা করবার তোমাকেই করতে হবে। তুমিই বিচারক, আশা করব, তুমি ঠিক বিচার করবে। মদন রতিকে যদি দোষী মনে কর তাদের বধ করতে পার। দমন দেও, রঘুপতিকেও দোষী মনে করলে তাদেরও নিঃশেষ করে দিতে পার। কিন্তু তোমার নিজেকে যদি দোষী মনে হয় তাহলে কি তুমি—"

এর পরমুহূর্তেই কিঙ্কিণী ছিন্নমস্তা হয়ে গেল।

উৎসাকারে কবন্ধ থেকে রক্তের ফোয়ারা উঠে পড়তে লাগল তার ছিন্নমুণ্ডের ব্যায়ত আননে।

মহাদেব প্রণাম করলেন তাকে।

কিন্তু আর একটা কাণ্ড হল যা সবচেয়ে আশ্চর্য।

কিঙ্কিণী—আর একজন কিঙ্কিণী—দূর থেকে সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সব। এ কিঙ্কিণী ছিন্নমস্তা নয়। এ যেন কিঙ্কিণীর দ্বিতীয় সত্তা। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখল সে, তারপর বলে উঠল "না, না, এসব বিশ্বাস করতে পারছি না আমি। পংখী, পংখী আমাকে একটা হেলিকপ্‌টার আনিয়ে দাও, আমি চলে যেতে চাই এখান থেকে। আমার যুক্তিকে আমি বিসর্জন দিতে পারব না—"

অন্ধকার ভেদ করে পংখীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"তপস্যা করুন। তপস্যা না করলে হেলিকপ্‌টার আসবে না।"

সঙ্গে সঙ্গে কিঙ্কিণী তপস্যায় বসে গেল।

হিমশীতল পাথরের উপর বসে অন্ধকার নিশীথে একাকিনী তপস্যা করতে লাগল কিঙ্কিণী। তুমুল ঝড় উঠল একটু পরে। বরফের কুচি লাগতে লাগল চোখে মুখে ছররার মতো। তারপর...তারপর আর কিছু মনে নেই তার...কতক্ষণ সে বসে ছিল তাও মনে নেই।

হঠাৎ হেলিকপ্‌টার এসে হাজির হল।

"আসুন—"

হেলিকপ্‌টারে চড়ে বসল। তারপর হু হু করে নামতে লাগল অন্ধকার ভেদ করে।

কিঙ্কিণী জেলে রয়েছে।

পিতৃহত্যার দায়ে ফাঁসি হবে কাল। সে কোর্টে স্বীকার করেছে হঠাৎ উত্তেজনাবশে নয়, সে ইচ্ছে করে তার বাবাকে হত্যা করেছে। তার বাবা মানুষ ছিল না, পিশাচ ছিল।

কাল তার ফাঁসি হবে।

রঘুপতি এসেছিল দেখা করতে।

"এ তুমি কি করলে কিঙ্কিণী—"

"যা অনিবার্য তাই ঘটেছে। যুক্তির পথে চললে, বিজ্ঞানের পথে চললে এই তো পরিণতি। আচ্ছা, রঘুপতি, আলৌকিকে বিশ্বাস আছে তোমার?"

"তার মানে—?"

"আমি রূপকথালোকে ছিলাম কিছুক্ষণের জন্য। পংখী বলেছিল পরমমুহূর্তে প্রবেশ করেছি।—

"পংখী কে?"

"তা তো তোমায় বোঝাতে পারব না। তুমি বড় বিজ্ঞানী, যুক্তির আলো দিয়ে অনেক অদ্ভুত জিনিস দেখেছ। কিন্তু পংখীকে দেখতে পাবে না তুমি। তাকে বুঝতেও পারবে না। আমি তোমাকে বোঝাতেও পারব না। সে কিন্তু ভারি সুন্দর রঘুপতি। যে দেশে সে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল, কি চমৎকার যে সে দেশ, সে দেশে তুমিও ছিলে, তুমিও রিসার্চ করছিলে অহল্যা পাথর নিয়ে। কি যে অদ্ভুত সে দেশ রঘুপতি, সেখানে গিয়েছিলাম আমি, কিন্তু থাকতে পারলাম না, যুক্তির তাড়ায় চলে আসতে হল, অবিশ্বাসের আগুনে সব পুড়ে গেল।"

"তুমি কি করে গিয়েছিলে সেখানে?"

"জানি না। মোটর থেকে নেমে মাঠের মাঝখানে ছুটছিলাম।

পংখী বলে সেই সময় আমি না কি মহাদেবকে মনে মনে ডেকেছিলাম—আমার কিন্তু মনে নেই সে কথা—পংখী বলে নিজের অজ্ঞাতসারে ডাকছিলাম। মহাদেব আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই দেশে। অদ্ভুত সে দেশ রঘুপতি। কিন্তু থাকতে পারলাম না সেখানে। যুক্তি আমাকে টেনে নিয়ে এল এই জেলখানায়। অমন করে চেয়ে আছ কেন রঘুপতি, কি ভাবছ তুমি—"

রঘুপতি কিন্তু যা ভাবছিল তা বলতে পারল না।

উইল করে যে বিশাল সম্পত্তি কিঙ্কিণী তাকে দিয়ে গিয়েছিল তার কিভাবে ব্যবস্থা করা উচিত তারই আলোচনা করতে এসেছিল সে। কিন্তু পাগলের সঙ্গে কি আলোচনা করবে? রঘুপতি নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছিল কিঙ্কিণী পাগল হয়ে গেছে।

তার চোখের দিকে চেয়ে কিঙ্কিণী হঠাৎ যেন বুঝতে পারল রঘুপতি তাকে পাগল ভাবছে।

হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে।

আকুল কণ্ঠে বলে উঠল— "বিশ্বাস কর আমি পাগল নই। আমি যা বলছি তা সত্যি, আমি পরমমুহূর্তে প্রবেশ করেছিলাম, কিন্তু সেখানে থাকতে পারিনি, যুক্তিকে আঁকড়ে ছিলাম বলেই পারিনি। কিন্তু সেখানে যা দেখেছি তা সত্যি, তা অপরূপ, তা অনবদ্য। আমি—"

আর কিছু বলতে পারল না সে।

চোখের কোণ বেয়ে জল পড়তে লাগল শুধু।

প্রথম গরল

মানুষের স্মৃতি বেশি দিন থাকে না। এক জন্মেই তাহা ক্রমশ ঝাপসা হইয়া যায়। জন্মান্তরে তাহার চিহ্নমাত্রও থাকে না। আমি কিন্তু ভুলি নাই। ইকা-জোলমা-শিলাঙ্গী-নিনানিকে লইয়া যে ব্যক্তি মাতিয়া উঠিয়াছিল সেই ব্যক্তিই যে আবার নবজন্মে নূতন মোহে নূতন নারীর জন্য তপস্যা করিতেছে এবং তাহারই অন্তরলোকে বসিয়া আমি যে সাংখ্যের দ্রষ্টা পুরুষের মত নির্বিকারভাবে সমস্ত নিরীক্ষণ করিতেছি ইহা আশ্চর্যজনক হইলেও সত্য। আমি জন্ম-জন্মান্তরে নানাভাবে আবর্তিত হইয়াছি কিন্তু বিস্মৃতির কবলে পড়ি নাই। যাহা দেখিয়াছি সমস্ত আমার মনে আছে, তাহার কিছুটা আজ তোমাদের শুনাইব। যাহার পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন করিয়া আমি দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, অনুভব করিয়াছি সে ব্যক্তি আমি নহি, সে শরীরী। মৃত্যুর করাল কবলে বারংবার সে শরীর অবলুপ্ত হইয়াছে। পুরাতন গৃহের মত তাহা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সেই সব গৃহের মধ্যে আমি বায়ুর মত বাস করিয়াছি। গৃহ লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু আমি লুপ্ত হই নাই। বহু গৃহের বহু লীলা আমার স্মৃতির স্তরে স্তরে অক্ষয় হইয়া আছে। আমার নিজের জবানীতে তাহার কিছুটা আজ তোমাদের শুনাইব।

নদীর ক্রোড়েই মানব সভ্যতা লালিত হইয়াছে। কখনও সে নদীর নাম নীল, কখনও ইউফ্রেটিস, কখনও তাইগ্রিস, কখনও আমাজন, কখনও ভল্‌গা, কখনও গঙ্গা। বহু নামহীন নদীও মানব-সভ্যতাকে লালন পালন করিয়াছে। এক জন্মে—যখন আমার নাম জংলা ছিল—আমরা কন্যানদীর তীরে তৃণ বপণ করিয়া জীবন-ধারণ করিতাম। ধবল আমাদের দলপতি ছিল। ধবলের পত্নী নিনানি ছিল আমার প্রণয়িনী। তাহারই কৃপায় ও কৌশলে প্রবল পরাক্রান্ত উলন্তনের প্রবল অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি। এখন নিনানিও নাই, উলন্তনও নাই। এখন আমার নূতন নাম টালা। এখন আমাদের সে দুর্দশাও আর নাই। আমরা চাষবাসের প্রভূত উন্নতি করিয়াছি, গৃহস্থ হইয়াছি। মানুষের বাঁচিবার তাগিদই মানুষকে নিত্যনব উদ্ভাবনে নিযুক্ত করিয়াছে। লৌহ তাম্র প্রভৃতি ধাতু আবিষ্কার করিয়া মানব সমাজ এখন প্রকৃতির নির্যাতন হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ। আমরা চাষের সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়াছি, আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছি, নৌকাযোগে বিদেশের হাটেবাজারে যাতায়াত করিতেছি। এসব করিতে বহু যুগ লাগিয়াছে, নিরন্তর চেষ্টাই মানুষকে আগাইয়া লইয়া চলিয়াছে। এখন আমাদের শস্যক্ষেত্র দিগন্তবিস্তৃত। ছোট ছোট গ্রামে আমাদের পরিবারবর্গ সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে। সকলেই—বিশেষ করিয়া মেয়েরা, এমনকি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত—চাষবাসের কর্মে নিযুক্ত। আমাদের অনেক গরু, অনেক মহিষ, অনেক ছাগল, অনেক ভেড়া। কুকুর আমাদের পরিজনের মত হইয়া গিয়াছে। জন্তু জানোয়ার এবং পক্ষী শিকারে আমরা দক্ষ হইয়াছি। বল্লম বর্শা তীর-ধনুক ছোরা কুঠার এবং খড়্গ এখন আমাদের নিত্যসঙ্গী। আমাদের গরু-মহিষ-ছাগল-ভেড়া বিরানি নামক বিরাট জঙ্গলে থাকে। দোহা এবং তাহার সাঙ্গোপাঙ্গরা তাহাদের দেখাশোনা করে। অনেক দুধ হয়। কত হয় ঠিক জানি না। শুধু জানি, ছয়মাস পর্যন্ত কোনো গাভীর দুধ আমরা খাই না। ছয়মাস পর্যন্ত বাছুরেরাই মায়ের দুধ খাইবার সুযোগ পায়। শুধু বাছুরদের নয়, বাছুরের মায়েদেরও দোহা দুধ খাওয়ায়। এ

সত্ত্বেও অনেক দুধ উদ্বৃত্ত হয়। কিছু দুধ দোহা আমাদের খাওয়ার জন্য পাঠাইয়া দেয়। বড় বড় মাটির কলসিতে করিয়া সে দুধ দোহার ভৃত্যগণ আমাদের কাছে প্রত্যহ বহন করিয়া আনে। আমাদের খাইবার পরও যাহা বাঁচে তাহা লইয়া দোহা ব্যবসায় করে। দুধের বদলে চাষের জন্য লাঙল, লোহার ফাল, তামার বাসন, মাটির জালা, বল্লম, তীর প্রভৃতি সংগ্রহ করে সে। দুধ লইয়া বৎসরে একটা করিয়া উৎসবও হয় একদিন। তাহাকে শুদ্ধ ভাষায় দুধ-ভূমি বলা যাইতে পারে। চলিত ভাষায় আমরা তাহাকে দুধভুঁইয়া বলি। সেদিন আমাদের জমিতে আমাদের বৃক্ষগুলির নীচে কলসি কলসি দুধ ঢালা হয়। সেদিন আমরা বা বাছুরেরা—কেহই—দুধ খাই না। সমস্ত দুধ জমিতেই ঢালা হয়। দোহা সেদিন মহানন্দে নৃত্য করে। আমরাও সকলে নৃত্য করি। বাহুর উৎক্ষেপে, সর্বাঙ্গের দোলনে, আনন্দ-উদ্ভাসিত মুখ-মুণ্ডলে, উচ্ছ্বসিত অঙ্গভঙ্গীতে সে নৃত্যের যে প্রকাশ তাহা উচ্চাঙ্গের কলাসম্মত নৃত্যবিধির মানদণ্ডে মাপা যাইবে কি না জানি না কিন্তু তাহা যে আমাদের অন্তরের স্বতোৎসারিত আনন্দের প্রকাশ তাহাতে সন্দেহ নাই। আনন্দকে মাপিবার অথবা মাপিয়া আনন্দ করিবার কোনো উপায় তখনও আমাদের জানা ছিল না। দোহার প্রাণ-প্রাচুর্যের হিল্লোলে আমরা সকলে ভাসিয়া যাইতাম, আমরা সকলে হাবুডুবু খাইতাম, আমরা সকলে আত্মহারা হইয়া পড়িতাম। দোহা আমাদের মধ্যে একটি অদ্ভুত লোক। সে মাছ-মাংস খাইত না। দুধ, শাকসবজি আর ফল তাহার আহার ছিল। বিশাল চেহারা ছিল তাহার। দৈত্যের মত সে বিরানির বিরাট অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইত। অদ্ভুত শক্তিধরও ছিল সে। বাঘ, সিংহ, ভালুক, নেকড়ে বাঘকে সে আছড়াইয়া মারিয়া ফেলিত। শৃগাল প্রভৃতি ছোট জানোয়ারকে সে সামান্য ঢিলের মত শূন্যে ছুঁড়িয়া দিত। বেজি, খরগোশদের সে গ্রাহ্যই করিত না। তাহারা পারতপক্ষে তাহার সম্মুখে আসিত না। একবার সে একটা বন্য বরাহের পিঠে চড়িয়া তাহার সূচ্যগ্র মুখটা ধরিয়া তাহার ঘাড় মটকাইয়া দিয়াছিল। বিরাট বিরানি অরণ্যের যোগ্য অধিপতি ছিল দোহা।

আমরা তখন যেন একটা রূপকথালোকে বাস করিতাম। আমাদের চারিদিকের প্রকৃতি, আকাশ, বাতাস, জন্তু-জানোয়ার, পাখি, মেঘ ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ, আমাদের মাঠের ফসল, আমাদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সবই যেন একটা অদৃশ্য সূত্রে বাঁধা আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতাম। বিশ্বাস করিতাম আমরা যেন কোনো অদৃশ্য শক্তির দ্বারা চালিত। সেই শক্তিই আমাদের নিয়ামক, তাহার বিধান অব্যর্থ, তাহার আইন ন্যায়সঙ্গত। তাহার আইন ন্যায়সঙ্গত এই বিশ্বাস থাকাতে আমরা সর্বদাই সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতাম, পাছে সে আইন লঙ্ঘন করিয়া ফেলি। মাঝে মাঝে ফেলিতামও, কারণ সব সময় সম্পূর্ণভাবে ন্যায়পথে চলা কি সম্ভব মানুষের পক্ষে? এমন কি যাহা জীবনধারণের পক্ষে অনিবার্য তাহা তো করিতেই হইত। সম্পূর্ণ ন্যায়পথে চলা যে অসম্ভব। বন্যপশুকে যখন শিকার করি তখন কি অন্যায় করা হয় না? ফসল কাটিয়া যখন আহার করি তখন কি সেটা ন্যায়সঙ্গত হয়? অন্তরের অন্তস্তলে আমরা অনুভব করিতাম অন্যায় করিতেছি, কিন্তু না করিয়াও বা বাঁচিব কি প্রকারে। তাই মনের মধ্যে একটা অপরাধ-বোধ জাগ্রত হইয়া থাকিত। মনে মনে একটা ভয়ও হইত। ভাবিতাম যাহাকে আমরা হনন করিতেছি তাহার আত্মা কোনো না কোনো ভাবে ইহার প্রতিশোধ লইবে। আমরা বিশ্বাস করিতাম মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব লোপ পায় না, আত্মা বাঁচিয়া থাকে, সে আত্মা দুর্বল নয়, শক্তিশালী, ভয় হইত হয়তো সে প্রতিশোধ লইবে। তাহার ক্রোধ প্রশমনের জন্য আমরা তাই তাহাকে নানাভাবে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতাম।

একটা ঘটনার বর্ণনা দিতেছি। ইহা হইতেই আমাদের মনোবৃত্তির কিছু পরিচয় হয়তো পাইবে। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত।

সেদিন সকালে দোহা প্রকাণ্ড একটা ভালুক স্কন্ধে লইয়া হাজির হইল। প্রকাণ্ড কালো ভালুক। প্রায় একটা মহিষের মত আকৃতি। দোহা সেটাকে আছড়াইয়া মারিয়াছিল। দোহা নিরামিষাশী, কিন্তু সে জানে ভালুকের মাংস আমাদের খুব ভালো লাগে। আমরা সকলেই মাংসাশী, তাই কিছু শিকার করিলেই আমাদের জন্য সে জানোয়ারটি বহিয়া আনে। দোহা আসিয়া প্রথমেই একটি বিকট চিৎকার করিল। সে চিৎকার অনেকটা রোদনের মতো। সে চিৎকার যেন অনেকটা ভালুকেরই আর্তনাদের অনুরূপ। দোহা নিকটে আসিলে আমরা দেখিলাম দোহা কাঁদিতেছে। তাহার বিরাট শ্মশ্রু-গুম্ফ অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া যাইতেছে। দোহা আমাদের কাছাকাছি আসিয়া ধপাস করিয়া ভালুকটাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। তাহার পর আমাদের জমির মাঝখানে দুইটা মোটা খুঁটি পুঁতিয়া ভালুকটাকে তাহার পিছনের পায়ে দাঁড় করাইয়া দিল। ভালুকের ঘাড়টাকেও একটা কাঠ দিয়া সোজা করিয়া দিল সে। ঘাড়টা একদিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। ঘাড়টা সোজা করার পর দেখা গেল জিভটা বাহির হইয়া ঝুলিতেছে। নাকের ছিদ্র দিয়া ও চোখের কোণ হইতে রক্ত পড়িতেছে। মৃত চোখ দুইটা যেন বিস্মিত-বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে আমাদের দিকে। দোহাও খানিকক্ষণ নির্নিমেষে সেদিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল তাহাকে। অনেকক্ষণ প্রণাম করিয়া উঠিয়া বসিল, জোড়হস্তে অনেকক্ষণ বসিয়াই রহিল তাহার পর। আমরাও সকলে জোড় হস্তে নীরবে বসিয়া রহিলাম। একটু পরে সে যাহা বলিল তাহার অনুবাদ তোমাদের ভাষায় দিলাম। কিন্তু এ অনুবাদে দোহার স্বতঃস্ফূর্ত বাচনভঙ্গীর, তাহার শ্রদ্ধাপ্লুত মুখমণ্ডলের, তাহার ভক্তি-স্নিগ্ধ দৃষ্টির পরিচয় নাই।

দোহা বলিল—হে বীরবর তোমাকে আমি সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করিয়া বধ করিয়াছি এ অহঙ্কার আমি করি না। আমি জানি স্বেচ্ছায় তুমি আমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছ। আমাদের ক্ষুধাকে তৃপ্ত করিবার জন্য বার বার তুমি আত্মদান করিয়াছ। আমাদের অহঙ্কারকে স্ফীততর করিবার জন্য মহাবলী হইয়াও তুমি বার বার আমাদের মত দুর্বলের হস্তে পরাজয় বরণ করিয়াছ। তোমার দেহকে আমরা পাতিত করিয়াছি, কিন্তু তোমার অমর আত্মা বিরানির অরণ্যে এখনও স্বমহিমায় বিরাজ করিতেছে। তোমার সেই আত্মাকে আমরা প্রণাম করি। তাহার নিকট আমরা আশীর্বাদ ও অভয় ভিক্ষা করি। তোমার শৌর্য, বীর্য, মহিমা আমাদের যেন নানা বিপদ হইতে রক্ষা করে। আমাদের ক্ষুধাকে শান্ত করিবার জন্য, আমাদের লোভকে তৃপ্ত করিবার জন্য, আমাদের জীবনধারাকে অব্যাহত রাখিবার জন্য, হে বীরেন্দ্র, বার বার তুমি আমাদের নিকট আসিও, এই প্রার্থনা। আমরা বার বার তোমাকে পূজা করিয়া ধন্য হইব।...

এই ধরনের প্রার্থনা দোহা অনেকক্ষণ ধরিয়া করিল। তাহার পর আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিল—তোমাদের মধ্যে যাহারা পবিত্র আছ, যাহারা সম্প্রতি মৈথুন হইতে বিরত থাকিতে পারিয়াছ, তাহারা আসিয়া ইহার সৎকার কর। যাহারা অপবিত্র, অংসযমী, তাহারা এখন উহাকে স্পর্শ করিও না। করিলে আমাদের ঘোর অমঙ্গল হইবে।

দোহার কথা শুনিয়া দুইজন পুরুষ, রম্ভা ও জিকট্ আগাইয়া গেল। মেয়েদের মধ্যে গেল কিংকা ও রুলকি। আমি যাইতে পারিলাম না, কারণ যদিও আমি কৃষি-বিভাগের অধিকর্তা, এ ব্যাপারে আমারই অগ্রণী হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি সংযমী ছিলাম না। কিছুক্ষণ পূর্বেই আমি কণ্টকার

আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। কণ্টকা শয়তানী, কিন্তু সে এত লোভনীয়া, তাহার সান্নিধ্য এমন উন্মাদনাকর যে সে যখন তাহার ছলা-কলা লইয়া, সর্বাঙ্গে হিল্লোল তুলিয়া, আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়ায় তখন আমার পক্ষে আত্মসংযম করা কঠিন হইয়া ওঠে। দোহা যখন সকলকে আহ্বান করিতেছিল তখন অনাবৃত-স্তনী পীবরবক্ষা কণ্টকা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া আমার দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছিল। কণ্টকা সত্যই মোহিনী, কিন্তু সে দুষ্টা, সে প্রগলভা।

রম্ভা জিকট্ কিংকা ও রুলকি ছাড়া যখন কেহ গেল না, তখন দোহা বলিল, গাছের তলায় ইহার জন্য একটি ঘর নির্মাণ কর।

আমাদের বসতির মধ্যস্থলে সেই বিরাট গাছটি ছিল। সে গাছের আমরা নাম জানি না। চেনা-শোনা কোনো গাছের সহিত তাহার সাদৃশ্য নাই। শুধু জানি তাহা অতি বৃহৎ, তাহা আকাশচুম্বী। তাহার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা, বিপুল পত্রসম্ভার। পাতাগুলি বেশ বড় বড়, অতিশয় চিক্কণ এবং ঘনসবুজ। পাতাগুলি যখন কিশলয়রূপে থাকে তখনও তাহা ঘন-সবুজ। তখন মনে হয় অসংখ্য ঘন-সবুজ গুটিকা যেন গাছের সর্বাঙ্গে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। ক্রমশ তাহারা নিজেদের বিস্তার করিয়া ঘন-সবুজ পাতায় পরিণত হয়। যখন পাতায় পরিণত হয় তখনও পাতাগুলি যেন উন্মুখ হইয়া থাকে। সমস্ত গাছটারই কেমন যেন একটা উন্মুখ ওৎ-পাতা ভাব। আমরা সকলেই গাছটাকে ভয় করি, বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালে যখন সে গাছে ফুল ফুটিয়া ওঠে। মনে হয় সমস্ত গাছটায় যেন আগুন জ্বলিতেছে। অগ্নিশিখার মত এ রকম ফুল আমরা আর কোনো গাছে দেখি নাই। প্রায় এক পক্ষকাল ওই ফুলগুলি সমানে ফুটিয়া থাকে। সে সময় আমরা সকলে আতঙ্কিত হইয়া থাকি। ভয় হয় কখন কি অনিষ্ট ঘটিবে। কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো অনিষ্ট হয় নাই। বরং দেখা যায় ওই গাছে যখন ফুল ফোটে তখন আমাদের বংশবৃদ্ধি হয়।

দোহার জন্ম ওই ফুল ফুটিবার সময় হইয়াছিল। ওই গাছের তলাতেই দোহার মা দোহাকে প্রসব করিয়াছিলেন। প্রসব করিবার সময় চিৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন এই গাছই মানুষরূপে আমার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমার ছেলে মেয়ে যাহাই হউক এই গাছের আত্মাই তাহার মধ্যে আছে। আমি যেদিন বুঝিতে পারিলাম আমার স্বামী নপুংসক সেদিন আমি এই মহাবৃক্ষকেই স্বামী রূপে মনে মনে বরণ করিয়াছিলাম।

এসব অনেকদিন আগেকার গল্প। তখন আমার জন্মও হয় নাই। আমার বাবা তখন দলপতি ছিলেন। তাঁহার মুখেই এ গল্প শুনিয়াছি। দোহা বিরাটকায় শিশু হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে সে আরও বৃহৎ হইয়া উঠিল। শুধু আকারে নয়, চরিত্রেও। তাহার ধৈর্য, তাহার বীর্য, তাহার মহাশক্তি দেখিয়া সত্যই আমাদের বিশ্বাস হইয়াছিল সে ওই মহাবৃক্ষের সন্তান। কিন্তু পলিত-কেশা ঝাঝার ধারণা অন্যরূপ ছিল। সে বলিত দোহার মা বিষ-কুণ্ডা যখন যুবতী তখন এক অশ্বারোহী ডাকাত নাকি তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। অনেকদিন পরে বিষ-কুণ্ডা হাঁটিতে হাঁটিতে ফিরিয়া আসে। আসিয়া বলিয়াছিল, আমি ঘোড়ার মাংস খাইয়াছি, ভেড়ার লোম ও তুলার আঁশ দিয়া তৈরি ঘরে বাস করিয়াছি। যাহারা আমাকে হরণ করিয়াছিল তাহারা ডাকাত, চারিদিকে লুণ্ঠন করিয়া বেড়ানোই তাহাদের পেশা। আমাকে যে লোকটা লইয়া গিয়াছিল আমি তাহার দাসী হইয়া ছিলাম। হয়তো চিরকাল দাসী হইয়াই থাকিতে হইত, কিন্তু সহসা তাহাদের মধ্যে গৃহবিবাদ শুরু হইল। আমাকে যে লোকটা লইয়া গিয়াছিল তাহার বক্ষে তাহার দাদা একটা বল্লম বিদ্ধ করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হইল তাহার।

জ্ঞাতিদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। আমি সেই সুযোগে এখানে পলাইয়া আসিয়াছি। আমাকে তোমরা কেহ ছুঁইও না, আমি একধারে এক পাশে থাকিয়া বাকি জীবনটা কাটাইয়া দিব। এই গাছের তলায় থাকিব, ইহাই আমার আশ্রয়। এই গাছই এখন আমার স্বামী, আমার প্রভু। এই গাছের তলায় তিন বৎসর বাস করিবার পর দোহার জন্ম হয়। ঝাঝা বলিত ছেলেটা তিন বৎসর পেটের মধ্যে ছিল বলিয়া অত বড় হইয়াছে। ঝাঝা আমার প্রপিতামহী ছিলেন। তিনি আরও অনেক গল্প বলিতেন।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা বহু পূর্বে নাকি জিগাসা নদীর তীরে বসবাস করিতেন। সে নদীতে যখন বান আসিত তখন নাকি কূল-কিনারা দেখা যাইত না। আমাদের ফসল, ঘর-বাড়ি ডুবিয়া যাইত, গরু-বাছুর ভাসিয়া যাইত, অনেক লোকের প্রাণ-হানিও হইত। তখন সকলে মিলিয়া বানের পূর্বে নদীর তীরে বিরাট বাঁধ দিবে বলিয়া সঙ্কল্প করেন। বাঁধের মাটি কাটিবার সময় আমাদের পূর্বপুরুষ ডঙ্কার সহিত উহাদের বিবাদ বাধে। বিবাদের কারণ একটি গাছ। একটি বিরাট গাছকে উৎখাত করিয়া সকলে যখন নদীতে বাঁধ দিবেন বলিয়া ঠিক করিলেন তখন ডঙ্কা ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—ওই গাছ সামান্য গাছ নহে। উহা বৃক্ষ-রূপী দেবতা, আমি ওই দেবতার মহিমা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করি, উহার নিকট প্রার্থনা করিলে মনের বেদনা দূর হয়। ওই গাছকে উৎখাত করিলে আমাদের অনিষ্ট হইবে। ডঙ্কার কথা কিন্তু কেহ গ্রাহ্য করিল না, গাছটি কাটিয়া নদীর মধ্যে ফেলিয়া তাহার উপর মাটি দিয়া বাঁধ বাঁধিল তাহারা।

ডঙ্কা বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়াছিলেন। আকাশের দিকে দুই বাহু উৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিয়াছিলেন—আমি আর এখানে থাকিব না। দেবতার মহারোষে এদেশ ছারখার হইয়া যাইবে।

ডঙ্কা নিজের পরিবারবর্গ ও কয়েকটি গরু-ভেড়া লইয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া আসিলেন। কিছুদূর আসিয়া কিন্তু একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটিল। তিনি বন্যপথেই হাঁটিতেছিলেন। কিছুদূর হাঁটিবার পর তিনি দেখিতে পাইলেন বনের খানিকটা অংশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং তাহার মাঝখানে একটি শিশু-বৃক্ষ রহিয়াছে। ডঙ্কার মনে হইল শিশু-বৃক্ষটি যেন তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। কাছে গিয়া ডঙ্কা আশ্চর্য হইয়া গেল। যে বৃক্ষটি উহারা উৎখাত করিয়াছিল এই শিশু-বৃক্ষটি তাহারই চারা। শুধু তাহা নহে, পাশেই একটি কোদাল এবং ঝুড়িও রহিয়াছে। কি করিয়া ওই বনের মধ্যে ওই শিশু-বৃক্ষটির পাশে কোদাল ও ঝুড়ি আসিল তাহা লইয়া ডঙ্কা মাথা ঘামাইলেন না। তিনি দেবতার নিগূঢ় ইঙ্গিতটা বুঝিতে পারিলেন। অনেকখানি মাটির সহিত সেই গাছের চারাটি তুলিয়া তিনি ঝুড়িতে রাখিলেন এবং ঝুড়িটি মাথায় করিয়া বহিয়া আনিলেন। অনেকদিন হাঁটিয়া অবশেষে তিনি বিরানি জঙ্গলে আসিয়া উপস্থিত হন। বিরানির পাশ দিয়া যে নদী বহিতেছিল সেটির নাম জমানি। ডঙ্কা যখন প্রথম আসেন তখন বিরানি জঙ্গলের বা নদীটির কোনো নাম ছিল না। দুইটি নামকরণই ডঙ্কা করিয়াছিলেন। এ প্রদেশে তখন মানব-বসতি ছিল না। জন্তু-জানোয়ারগণই রাজত্ব করিত এ অঞ্চলে। বহুবৎসর পূর্বে ডঙ্কা মহাসমারোহে এই গাছটি স্বহস্তে এই স্থানে পুঁতিয়া গিয়াছেন। তখন হইতেই ক্রমশ বর্ধিত হইয়া সেই গাছ এখন মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। শুনিয়াছি বহুকাল পূর্বে এই গাছের তলায় পশুবলি হইত। বহু বন্যপশুর শোণিতে এই বৃক্ষের মূলদেশ সিঞ্চিত হইয়াছে। এই গাছ সত্যই এখন বিশাল। একশত জন হাত-ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইলেও ইহার কাণ্ডের পরিধি সম্পূর্ণরূপে বেষ্টিত করিতে পারে না। ইহার চূড়া গগনচুম্বী। নানারকম পাখি ইহার ডালে বাসা বাঁধে। নীলকণ্ঠ, ফিঙে প্রভৃতি সাধারণ পাখিরা গাছের নিম্নাংশে নীড় নির্মাণ করে। একটু উঁচু দিকে থাকে হলদে পাখিরা। মাঝে মাঝে হরিয়ালের

ঝাঁক আসিয়া বসে। আর আসে একজোড়া ধনেশ পাখি। প্রতিবছর আসিয়া তাহারা এই গাছের মগডালে বসে। দুই একদিন থাকে, তাহার পর উড়িয়া যায়। তাহাদের আমরা অতিথির মত অভ্যর্থনা করি। তাহাদের উদ্দেশে ফল ফুল শস্যের অর্ঘ্য নিবেদন করি, নৃত্যগীত দিয়া তাহাদের সংবর্ধনা করি। তাহাদের কৃষ্ণাভ ছাইয়ের মত রং, বিশেষ করিয়া তাহাদের বিরাট অদ্ভুত ঠোঁট আমাদের অভিভূত করিয়া ফেলে! মনে হয় তাহারা কোনো সুদূর দেশের দূত, সেখানকার বার্তা বহন করিয়া যেন গাছের কানে কানে বলিয়া যায়। সে বার্তা শুনিয়া গাছের পাতাগুলি আরও ঘনসবুজ আরও রহস্যময় হইয়া ওঠে। আর একটা আশ্চর্যের বিষয়, কাক, চিল বা শকুনি ওই গাছে কখনও বসে না। ও গাছে তাহারা বাসাও বাঁধে না। কিন্তু এক-জোড়া পেচক-দম্পতী এই গাছের কোনো কোটরে বাস করে। বেশ বড় পেঁচা। গায়ের রং কালো ও বাদামি মেশানো। মাথায় দুইটি পালকের শিং আছে। তাহারা গভীর রাত্রে বাহির হইয়া ডাক দেয়—বু-বুওও। মনে হয় কোনো প্রহরী যেন পাহারা দিতেছে। যেদিন তাহাদের ডাক শুনিতে পাই না, সেদিন আমাদের মনে ভয় হয়। মনে হয় বুঝি কোনো বিপদ ঘটিবে। আরও দুই প্রকার পাখি জমানির তীরে ঘুরিয়া বেড়ায়। একটির নাম মুগুক। সারস জাতীয় পাখি, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বড় মুরগির মত। দেখিতে অতি সুন্দর। সর্বাঙ্গ সাদা, ডানার কাছে বাদামি, মাথা ও মুখটি কালো। ঠোঁটটি বেশ লম্বা। কেন জানি না এই পাখিটি দেখিলেই মনে একটা পবিত্র ভাবের উদয় হয়। সকলেই আমরা শ্রদ্ধা করি মুগুককে। মুগুক প্রতি বছর আমাদের গাছের পূর্বদিকের অংশটাতে বাসা বাঁধে। শাবকগুলি বড় হইলে কিন্তু বেশি দিন মা-বাবার কাছে থাকে না, উড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। জানি না কোন দেশে যায় তাহারা। জানি না সে দেশেও এমন মহাবৃক্ষ আছে কি না। দ্বিতীয় পাখিটি আরও বড়। এটিও দেখিতে চমৎকার। তীক্ষ্ণকণ্ঠে উক্ উক্ উক্ উক্ করিয়া ডাকে বলিয়া ইহার নাম উকনা বা হুক্না। আকারে শকুনি অপেক্ষা বড়। পা দুইটি বেশ বলিষ্ঠ এবং পীতবর্ণের। বুকটা সাদা, পিঠে কালো বাদামি রং। ডানার কাছে কালো রঙের ফুল কাটা। জমানি নদীর যেখানটা নির্জন এবং বালুকাময় সেইখানেই ইহারা থাকে। মাঝে মাঝে আমাদের গাছে আসিয়া বসে। যেদিন বসে সেদিন আমাদের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া যায়। উকনা কিন্তু গাছে বাসা বাঁধে না। নদীর চরে ঝোপের মধ্যে ডিম পাড়ে। তাহার ডিম আমরা খাইয়া দেখিয়াছি, খুব সুস্বাদু।

এসব কথা এত বিস্তারিত বলিলাম, কারণ ইহাদের লইয়াই তখন আমাদের জীবন ছন্দিত হইত। ওই বিরাট গাছটাই ছিল আমাদের সমস্ত জীবনের কেন্দ্র এবং প্রেরণা। তাহাকে আমরা ভয় করিতাম, ভক্তিও করিতাম। আমাদের পূর্বপুরুষ ডঙ্কার তিনটি স্মৃতি আমাদের মধ্যে এখনও বর্তমান। একটি স্মৃতি বিরানি জঙ্গল যেখানে দোহা থাকে, যেখানে আমাদের গরু-বাছুর ছাগল-ভেড়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। এই বিরানি অরণ্যের নামকরণ ডঙ্কা নিজের মায়ের নামে করিয়া গিয়াছে। ডঙ্কা যখন জিগাসা নদীর তীর ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতেছিল তখন পথে তাহার মা বিরানি এবং জ্যেষ্ঠা পত্নী জমানি মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি এবং করকাপাতের ভিতর পড়িয়া অনেক গরু-বাছুর এবং আত্মীয়-স্বজন মারা যায়। এই সময় বিরানি ও জমানিরও মৃত্যু হয়। কিন্তু ডঙ্কা তাহাদের অমর করিয়া গিয়াছে। বিরানি অরণ্য এবং জমানি নদীর মধ্যে তাহারা বাঁচিয়া আছে। আমরা চাষ-বাসের উপর নির্ভর করি। আমাদের নিকট নদী অরণ্য এবং ভূমি এই তিনটিই অপরিহার্য জীবন-ভিত্তি। আর আমাদের ভূমির উপর দাঁড়াইয়া আছে ওই বিরাট বনস্পতি। ডঙ্কা ইহাকে মাথায় বহিয়া আনিয়া রোপণ করিয়াছিল বটে কিন্তু কোনো নামকরণ করিয়া যায় নাই। হয়তো ইহার কোনো নামকরণ

করিতে পারে নাই। তাহার হয়তো মনে হইয়াছিল এই অনন্ত-সম্ভাবনাময় বহুরূপী বৃক্ষকে একটা কোনো নামের সীমাবদ্ধতায় বাঁধা যাইবে না। আমরা উহার নাম দিয়াছি 'টুকচুম্বা'। আমাদের ভাষায় ইহার অর্থ দেবতা।

এইখানে আমাদের আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। কারণ, তোমাদের যে গল্পটি বলিব বলিয়া ঠিক করিয়াছি সে গল্পটির মূল তাহার মধ্যে নিহিত আছে। জমানি নদীর পূর্ব ও পশ্চিম তীরে আমাদের বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র। ক্ষেতের মাঝে মাঝে ছোট ছোট পল্লী। সে সব পল্লীর কোনোটা আমাদের কামারশালা, কোনোটাতে আমাদের কুম্ভকারেরা থাকে। শুধু কুম্ভ নয়, নানাবিধ সুদৃশ্য তৈজসপত্রাদি নির্মাণ করে তাহারা। সে সব আমরা নৌকায় করিয়া বিদেশের হাটে পাঠাই এবং সে সবের বদলে অনেক বিদেশি জিনিস লইয়া আসি। কিন্তু আমাদের নদীর পশ্চিমে তীর খুব নিরাপদ নয়। যেখানে আমাদের শস্যক্ষেত্র শেষ হইয়াছে সেখানে শুরু হইয়াছে আমাদের সমাধিক্ষেত্র। জায়গাটা পাহাড়ে গোছের। চারিদিকে বড় বড় পাথরের স্তূপ। সে স্তূপ হইতে আরও পশ্চিমে পাহাড়ের গায়ে পর্বতশ্রেণী দেখা যায়। বর্ষাকালে সে পর্বতশ্রেণীর বর্ণ নীল, গ্রীষ্মকালে ধূসর। এই পর্বতশ্রেণীর ওপারে আছে মরুভূমি। ঝাঝার মুখে শুনিয়াছি ডঙ্কার প্রপিতামহের প্রপিতামহরা ওই পর্বতশ্রেণীর ওপারে মরুভূমিতে বাস করিতেন। তাঁহারাই নাকি বহুপূর্বে পাহাড় ডিঙাইয়া একদা সপরিবারে জিগাসা নদীর তৃণশ্যামল সৈকতে চলিয়া যান। জিগাসা নদী ওই পর্বতমালা হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণ-বাহিনী হইয়াছে। পর্বতমালা হইতে আর একটি নদী বাহির হইয়াছে, তাহার নাম কলকলা। জমানি নদী কলকলা নদীর শাখা। কিন্তু জমানি জিগাসা নদী হইতে অনেক দূরে। তাহা পশ্চিমদিক হইতে আসিয়া পূর্ববাহিনী হইয়াছে এবং উপর্যুপরি কয়েকটা অরণ্য পার হইয়া বিরাট একটা জলাশয় সৃষ্টি করিয়াছে। সে জলাশয় বহুদূরে। তাহা আমরা দেখি নাই। মরুভূমি হইতে জিগাসা নদীর তীরে আমাদের যে পূর্বপুরুষ দুইজন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের একজনের নাম ছিল থানথিরা, আর একজনের নাম ছিল বানমুখ। ঝাঝা বলে—দুইজনের চরিত্র নাকি দুইরকম ছিল। থানথিরা ধীর স্থির প্রকৃতির লোক ছিলেন। মরুভূমির অনিশ্চয়তা এবং রুক্ষতার মধ্যে বাস করিয়া থানথিরা সুখ পান নাই। তাঁহার মনে সুখশান্তির যে স্বপ্ন জাগিত তাহাই পাইয়াছিলেন জিগাসা নদীর তীরে। তিনি একদা মরুবাসী বেদুঈন ছিলেন, কিন্তু সেই ভয়াবহ অনিশ্চিত দস্যুর জীবন তাঁহার ভালো লাগিত না। জিগাসা নদীর তীরেই তিনি নূতন ধরনের গৃহস্থালী স্থাপন করিলেন। মরুভূমিতে আর ফিরিয়া গেলেন না। ওই অঞ্চলে যে সব নিতান্ত বর্বর অরণ্যবাসীরা আসিত তাহাদের মধ্য হইতে তিনি গো-বংশীয়া মন্‌মনকে ছাগ-বংশীয়া বুলাকে এবং অশ্ববংশীয়া অংঘ্রোকে বিবাহ করিলেন। ইহাদের মধ্যে অংঘ্রোই নাকি সর্বাপেক্ষা সুন্দরী ছিল। সে যখন হাসিত তখন অংঘ্রো, অংঘ্রো শব্দ হইত। মনে হইত তাহার গলার ভিতর কোনো বাজনা বাজিতেছে। তাহার পা দুইটিও অদ্ভুত ধরনের ছিল, অনেকটা অশ্বক্ষুরের মত। সে ঘোড়ার মত ছুটিতেও পারিত। ঘোড়ার পিঠের উপর তাহার দক্ষতাও অসাধারণ ছিল। ঘোড়ার পিঠের উপর দাঁড়াইয়াও সে ঘোড়া হাঁকাইতে পারিত। ঘোড়ারাও অতি সহজে বশীভূত হইত তাহার। বস্তুত থানথিরা এবং বানমুখ যতগুলি ঘোড়া সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন অংঘ্রোই তাহাদের তত্ত্বাবধান করিত। অংঘ্রো ডাক দিলেই তাহারা দলবদ্ধ হইয়া চলিয়া আসিত তাহার কাছে।

বানমুখ অস্থির প্রকৃতির লোক ছিলেন। সর্বদাই বনে বনে শিকার করিয়া বেড়াইতেন। গৃহস্থালীর শান্ত পরিবেশ তাঁহার ভালো লাগিত না। দুর্গম গিরিসঙ্কটের আহ্বান, মরুভূমির নিষ্করুণ স্পর্ধা তাঁহাকে

বেশি আকর্ষণ করিত। দুর্দমনীয়কে দমন করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে সর্বদা কোনো না কোনো বিপজ্জনক অভিযানে টানিয়া লইয়া যাইত। একবার বিরাট একটা হস্তীযুথের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার প্রাণসংশয় হইয়াছিল। আর একবার মরুভূমির একটা ক্ষুধার্ত সিংহের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়া তিনি প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার মুখের খানিকটা ওই সিংহ খাবলাইয়া লইয়াছিল। বাম দিকের গালে মাংস ছিল না। শূন্য গহ্বর দিয়া মুখের দাঁতগুলি এবং জিভের খানিকটা দেখা যাইত। সে অতি বীভৎস চেহারা। কোনো ছেলে বা মেয়ে পারতপক্ষে তাঁহার নিকট যাইত না।

থানথিরা বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছিলেন। বানমুখকেও তিনি বন্য-স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে শান্তিময় জীবন যাপন করিতে উপদেশ দিতেন। কিন্তু বানমুখ তাঁহার সে উপদেশে কর্ণপাত করিতেন না। শুধু তাহাই নয়, যে শান্তি তিনি পাইতেছিলেন না, যে শান্তি পাইবার যোগ্যতাই তাঁহার ছিল না, সে শান্তি থানথিরা পাইয়াছিলেন বলিয়া থানথিরার প্রতি তাঁহার কেমন যেন একটা আক্রোশ ছিল। হঠাৎ একদিন তিনি বিনা কারণেই থানথিরার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। থানথিরা যদিও ধীর-স্থির প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার গায়ে শক্তি কম ছিল না। পিশাচ-প্রকৃতির বলশালী বানমুখকে তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহাকে চিৎ করিয়া তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসিয়া দুইহাতে তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া বলিয়াছিলেন—তোমাকে এখনই আমি মারিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু ভ্রাতৃহত্যায় আমার প্রবৃত্তি নাই। এখানে যখন তোমার ভালো লাগিতেছে না, যে সামাজিক জীবন আমরা এখানে যাপন করিতেছি তাহা যখন তোমার পছন্দ নয়, তখন তোমার এখানে থাকিবার প্রয়োজন কি? তুমি যেখানে সুখে থাকিবে মনে কর সেইখানে চলিয়া যাও। কাল প্রভাতে তোমার মুখ যেন আর না দেখি।

পরদিন প্রভাতে দেখা গেল সমস্ত ঘোড়াগুলি লইয়া বানমুখ অন্তর্ধান করিয়াছে। অংঘ্রোও নাই। সে-ও সম্ভবত তাহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে।

সেইদিন হইতে থানথিরা আর ঘোড়া পোষেন নাই। তাঁহার কেমন যেন ধারণা হইয়া গিয়াছিল ঘোড়া জানোয়ারটার সহিত যুদ্ধবিগ্রহ যে' যুক্ত হইয়া আছে। তাঁহার বেদুঈন-জীবনে যখন তিনি মরু-দস্যু ছিলেন তখন ঘোড়ার পিঠে চড়িয়াই তিনি লুটপাট করিয়া বেড়াইতেন। ওসবে তাঁহার আর প্রবৃত্তি ছিল না। তাঁহার মনে হইয়াছিল যে ঝঞ্ঝা আমাদের শস্যকে ছিন্নভিন্ন করে, আমাদের ঘরের চাল উড়াইয়া লইয়া যায়, শান্ত নদীকে উন্মাদ করিয়া তোলে, সেই ঝঞ্ঝা যে বায়ুর রুদ্ররূপ সেই বায়ুটিরই আর এক রূপ ঘোড়া। বানমুখ এবং অংঘ্রোও অশ্ব-প্রেত অশ্ব-প্রেতিনী। মানুষের রূপ ধরিয়া তাহারা আমাদের অনিষ্ট করিতে আসিয়াছিল। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি অশ্ব বর্জন করিয়াছিলেন। অশ্ব যদিও খুব উপকারী জন্তু, অশ্বের মাংস যদিও খুব সুস্বাদু, তবু আতঙ্ক-বশত থানথিরা অশ্বের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। থানথিরা ডঙ্কার পূর্বপুরুষ। তাই ডঙ্কাও অশ্ব পোষেন নাই। তাই থানথিরার বংশধরেরা কেহ অশ্বপালন করে না। অশ্বের সম্বন্ধে তাহাদের একটা ঘৃণা-মিশ্রিত ভয় ছিল। দোহার মা বিষ-কুণ্ডাকে একজন অশ্বারোহী ডাকাত ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, ইহাতে অশ্ব সম্বন্ধে আমাদের আতঙ্ক আরও বাড়িয়াছিল। বিষ-কুণ্ডা যখন ফিরিয়া আসিয়া বলিল সে ঘোড়ার মাংস খাইয়াছে, যাহারা অশ্বপালন করে তাহাদের চলন্ত তাঁবুতে তাহাদের সহিত বাস করিয়াছে, তখন সে নিজেই নিজেকে অস্পৃশ্যা বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছিল, তাই সে আমাদের সঙ্গে মেশে নাই। ওই বৃক্ষতলেই সে নিরামিষ খাইয়া বাকি জীবনটা কাটাইয়া গিয়াছে। হয়তো সেই জন্যই দোহা মাছ-মাংস খায় না।

দোহার বয়স যখন দশ বৎসর তখন বিষ-কুণ্ডা মারা যায়। তখনই দোহার চেহারা বলিষ্ঠ যুবকের মত। একাই সে মায়ের মৃতদেহ স্কন্ধে তুলিয়া কবর দিয়া আসিয়াছিল। আর কাহাকেও যাইতে দেয় নাই। বলিয়াছিল—আমার মা চিরকাল তোমাদের সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া একা একা বাস কবিয়াছেন। তিনি আমাকে বলিয়া গিয়াছেন তাঁহার মৃত্যুর পর আমি একাই যেন তাঁহার শবদেব বহন করিয়া তুঙ্গালি পর্বতে তাঁহাকে কোনো গুহার ভিতর সমাহিত করি। সে গুহা আমি নির্বাচন করিয়া রাখিয়াছি। মায়ের নির্দেশ মত আমি সেখানে একাই গিয়া তাঁহার সমাধি রচনা করিব। তোমরা কেহ আমার সঙ্গে আসিও না। আসিলে মায়ের আত্মা হয়তো শান্তি পাইবে না।

তখন আমাদের দলপতি ছিলেন আমার বাবা। তাঁহার নাম ছিল মহোরি। আমাদের ভাষায় মহোরি মানে সিংহ। তিনি দোহাকে খুব ভালোবাসিতেন। তাই দোহার অনুরোধ তিনি অগ্রাহ্য করেন নাই। দোহা একাই গিয়া তাহার মাকে তুঙ্গালি পর্বতের কোনো গুহায় কবরস্থ করিয়া আসিয়াছিল। দোহাকে বাবা খুব ভালোবাসিতেন। দোহার মা বিষ-কুণ্ডা ছিল বাবার ভগ্নী। একমাত্র ভগ্নী। দোহার সামর্থ্য ও চরিত্র দেখিয়া বাবা এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, ঠিক করিয়াছিলেন দোহাকে আমাদের দলপতি করিয়া যাইবেন। কিন্তু দোহার জন্মের সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তা ছিল বলিয়া বৃদ্ধা ঝাঝা তাঁহাকে এ কাজ করিতে দেয় নাই। বলিয়াছিল, তোমার পুত্রদের মধ্যেই কাহাকেও দলপতি নির্বাচন কর। মহোরির বহু পুত্র-কন্যা। আমার চল্লিশ জন ভাই ছিল। মহোরির যখন বার্ধক্য উপস্থিত হইল, একদিন যখন তিনি উঠিতে গিয়া পড়িয়া গেলেন, সেইদিনই স্থির করিলেন নূতন দলপতি এইবার নির্বাচন করিতে হইবে, আমি অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি। পরদিনই তিনি সমবয়স্ক কুড়িজন পুত্রদের মধ্যে মল্লযুদ্ধের আয়োজন করিলেন। ঘোষণা করিলেন যে সকলকে পরাজিত করিয়া জয়ী হইবে তাহাকেই তিনি দলপতি নির্বাচিত করিবেন। দোহা অবশ্য এ প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল না। মহোরি তাহাকে বিরানি বনের একাধিপত্য দিয়া বলিলেন, তুমি বিরানি বনকে রক্ষা কর। তুমি ছাড়া এ কাজ আর কেহ পারিবে না। তুমি ওই বনে সর্বেসর্বা হইয়া থাক। আমাদের জমি, ফসল ও সমাজের শাসনভার রহিল দলপতির উপর। প্রতিযোগিতার দ্বারাই সে দলপতি নির্বাচিত হইবে।

আমিই মল্লযুদ্ধে সকলকে পরাজিত করিয়া দলপতি নির্বাচিত হইয়াছিলাম। কিন্তু দলপতি হইয়াও আমি সর্বদা সশঙ্ক হইয়া থাকিতাম। সর্বদাই মনে হইত আমার জীবন নিরাপদ নয়। বিশেষ করিয়া ভয় করিতাম আমার সৎভাই ভিংড়াকে। ভিংড়ার মা ছিলেন ক্রীতদাসী। কোনো এক দূরের হাট হইতে বাবা তাঁহাকে অনেক শস্যের বিনিময়ে কিনিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত একটা বন্য সৌন্দর্য ছিল। স্বভাবও ছিল বন্য। সাপের মাংস প্রিয় খাদ্য ছিল তাঁহার। সাপের মুণ্ডটা কাটিয়া ফেলিয়া তাহার চামড়া ছাড়াইয়া ফেলিতেন। তাহার পর সেটাকে পোড়াইয়া খাইতেন। তাহার ভাষাও আমরা বুঝিতাম না। বাবা কিন্তু তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মেয়েটি অনেক রকম তুকতাক তন্ত্রমন্ত্র জানিতেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র ভিংড়াকেও তিনি এসব শিখাইয়াছিলেন। ভিংড়া আমাদের সহিত মিশিতও না। তাহাকে মল্লযুদ্ধে হারাইয়া দিয়া আমি দলপতি হইয়াছিলাম ইহাতে সে খুশি হয় নাই। আমার কেমন যেন ভয় করিত। যদিও আমাকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক সশস্ত্র দাস আমার চারিদিকে পাহারা দিত তবু আমার ভয় ঘুচিত না। পায়ে সামান্য একটা কাঁটা ফুটিলেও মনে হইত ভিংড়া হয়তো আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া পথের কাঁটাকে আমার পায়ের পাতায় দংশন করিতে প্ররোচিত করিয়াছে। সেই কাঁটার কানে কানে হয়তো কোনও সাংঘাতিক মন্ত্রও বলিয়া দিয়াছে। ভিংড়া আমার সহিত

গায়ের জোরে পারিবে না, কিন্তু মায়ের পথ অনুসরণ করিয়া যে শক্তিতে সে শক্তিমান হইতে চাহিয়াছিল তাহা ভয়ঙ্কর। সে শক্তির নিকট আমার শক্তি তুচ্ছ। সকলে বলিত সে দৈবীশক্তিতে বলীয়ান। সে-ও প্রকাশ্যে বলিয়া বেড়াইত ঝঞ্ঝা, বজ্র, সূর্য, চন্দ্র তাহার আজ্ঞা পালন করে, বর্ষার মেঘমালা তাহার নির্দেশেই সঞ্চরণ করে। আমাদের ফসলের প্রাণ-শক্তিও নাকি তাহার নিয়ন্ত্রণে বাড়ে কমে। সমস্ত প্রকৃতিই নাকি তাহার আদেশ মান্য করিয়া চলে।

ভিংড়া যে জীবন যাপন করে তাহাও আমাদের মত স্বাভাবিক গৃহস্থ জীবন নয়। আমরা আদিম অসভ্য যুগ পার হইয়া আসিয়াছি, আমরা কৃষিসভ্যতার পত্তন করিয়াছি, শুধু প্রস্তরের অস্ত্র-শস্ত্র নহে, ধাতুর অস্ত্র-শস্ত্রও আমরা ব্যবহার করিতে শিখিয়াছি, পদব্রজে এবং নৌকা করিয়া আমরা আমাদের এলাকার বাহিরে যাতায়াত করি, শস্যসম্ভার লইয়া আমাদের কর্মীরা বিদেশের হাটে যায়, শস্যের বদলে লোহা, তামা, কাঠ ও আরও নানারকম পণ্য কিনিয়া আনে। আমরা এখন গুহায় থাকি না। মাটির ঘরে বাস করি, নলখাগড়া এবং লম্বা লম্বা ঘাস দিয়া আমাদের ঘরের চাল যে ভাবে প্রস্তুত হয় তাহাতে শিল্প-নৈপুণ্য আছে। আমরা তাঁত বসাইয়াছি। আমাদের মেয়েরা চরকায় সূতা কাটে। আমাদের চম্বা নামে মেয়েটি চিরকুমারী, কোনো পুরুষের সংশ্রবে আসে না। সে চমৎকার ছিট বানাইতে পারে। সে শিল্পী। নানা রঙের সূতা দিয়া কাপড়ের উপর ফুল-লতা-পাতার সুন্দর নক্শা আঁকে। তাহার জন্য বিদেশি হাট হইতে বিশেষ ধরনের ছুঁচ দোহা আনাইয়া দেয়। শুধু ফুল-লতা-পাতা নয়, পাখির ডানার বর্ণ-বৈচিত্র্য, এমন কি সাপের গায়ের বর্ণ-লীলাও আকর্ষণ করে তাহাকে। দোহা তাহার জন্য চিমটা দিয়া সাপ ধরিয়া আনে মাঝে মাঝে, এবং সাপটাকে দুইটা কাঠির কৌশলে এমনভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখে যে সাপটা আর নড়িতে পারে না। চম্বা সাপের গায়ে বার বার হাত বুলাইয়া সেই হাত নিজের চোখের উপর বুলায়। এই আশ্চর্য উপায়ে সে সাপের গায়ের রঙ নিজের মনের মধ্যে আঁকিয়া লয়। তাহার পর কাপড়ের উপর সেটা তুলিবার চেষ্টা করে। সাপটাকে সে মারে না। কয়েকবার তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেয়।

আমাদের এই পরিবেশে ভিংড়া বড় বেমানান। সে আমাদের পল্লীতে মাটির ঘরে থাকে না। থাকে পাহাড়ের পাথর ঘেরা একটা গুহায়। তাহার বেশবাসও অদ্ভুত। মাথার চুল, মুখের দাড়িতে সে নানারকম জন্তুর হাড়, নখ, নানাজাতের পাখির পালক, ঠোঁট ঝুলাইয়া রাখে। একটা শকুনির ঠোঁট তাহার মাথার জটার মাঝখানে উদ্যত উদগ্র হইয়া আছে। সকলের মনে একটা রহস্যময় বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া সে নিজেকে অসাধারণ করিয়া তুলিতে চায়। পর্বত-গুহায় বসিয়া সে যাহা করে তাহাও ভীতিকর। প্রকাণ্ড একটা অগ্নিকুণ্ড করিয়া সে সেখানে নানারকম জিনিস পোড়ায়। নানা রঙের নানা আকারের পাথর, বুনো-লতা-পাতা, নানারকম জন্তু-জানোয়ার, দুই একটা লোহা বা তামার টুকরা, আরও কতরকম জিনিস সে ওই অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দেয়। অগ্নিকুণ্ডের আগুন সে কখনও নিবিতে দেয় না। নিজেও যে সব জন্তু জানোয়ার বা গাছপালা খায় ওই আগুনেই ঝলসাইয়া লয়। তাহার খাওয়া-দাওয়াও আমাদের মত নহে। আমরা সাধারণত রুটি, যবচূর্ণ বার্লির মণ্ড, নানারকম ফল খাই। ভেড়া গরু ছাগও আমাদের খাদ্য বন্যবরাহ বা ভালুকের মাংস পাইলে, কিংবা বন্যহরিণ শিকার করিতে পারিলে আমাদের মধ্যে একটা উৎসব পড়িয়া যায়। মাংস আমাদের প্রতিদিন জোটে না। মাছও খাই আমরা। মাছও রোজ পাওয়া শক্ত। ছিপ বা জালের তখনও চলন হয় নাই। মেয়েরা কাপড় দিয়া মাছ ধরে মাঝে মাঝে। কেহ কেহ বড় বড় মাছ সাঁতার দিয়াও ধরে। মাছ পোড়া

আমাদের প্রিয় খাদ্য। কিন্তু ভিংড়া এসব খায় না। সে খায় বাদুড় চামচিকা কাছিম ঝিনুক ইঁদুর—এই সব। শুনিয়াছি মাঝে মাঝে শকুনি বা বাজের মাংসও খায়। তাহার আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে জন্তু-জানোয়ার ঝলসাইবার সময় যে চর্বি নির্গত হয় সেগুলি সে ফেলে না, একটি পাত্রে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। কাঠ, খড় এবং সূতা দিয়া অনেকগুলি ছোট ছোট মশালও সে তৈয়ারি করিয়াছে। মশালের সহিত যে বিশেষ বিশেষ লতা এবং পাতাও বাঁধিয়া দেয়। কোনো কোনো মশালে পাখির পালক এবং নাড়িভুঁড়িও বাঁধা থাকে। এই মশালগুলি জ্বালাইয়া সে মাঝে মাঝে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠে এবং আকাশের দিকে চাহিয়া চিৎকার করিয়া কি সব বলে। কি বলে তাহা বোঝা যায় না। কিন্তু চিৎকারটা আদেশের মতো শোনায়, মনে হয় অন্তরীক্ষবাসী কাহাকেও সে যেন ধমক দিয়া হুকুম জারি করিতেছে।

সকলে ভয় করে ভিংড়াকে। সকলে মনে করে ভিংড়া রুষ্ট হইলে যে কোনো লোকের অনিষ্ট করিতে পারে। আকাশের দেবতা-অপদেবতার সঙ্গে তাহার নাকি যোগাযোগ আছে। একদিন গোন্দা নাম্নী মেয়েটি মাঠে ফসল কাটিতে কাটিতে হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিল। তাহার কাপড় খুলিয়া গেল। সে দুইটা প্রস্তরখণ্ড লইয়া নিজের স্তন দুইটিকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। তাহার পর মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। মুখ দিয়া ফেনা উঠিতে লাগিল। ফেনার সহিত রক্তও পড়িল অনেক, পড়িয়া গিয়া ঠোঁট কাটিয়া গিয়াছিল। একটু পরে মারা গেল সে। সকলেই মনে করিল ভিংড়ার ক্রোধই এই মৃত্যুর কারণ। এই নবোদ্ভিন্নযৌবনা গোন্দাকে ভিংড়া তাহার পর্বত-গুহায় যাইতে বলিয়াছিল। কিন্তু সে যায় নাই। না যাইবার কারণ ভয়। ভিংড়া নাকি নারীদের নির্যাতন করিয়া আনন্দ পায়। উলঙ্গ করিয়া তাহাদের চাবুক মারে, তাহার পর তাহাদিগকে অগ্নিকুণ্ডের চারিপাশে নৃত্য করিতে বাধ্য করে। যখন তাহারা নাচে তখনও সে নির্মমভাবে চাবুক চালায়। সে বলে উলঙ্গিনী যুবতি নারীদের আর্ত হাহাকারে তাহার দেবতা নাকি তুষ্ট হয়। তাহাদের আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে ভিংড়াও আকাশের দিকে চাহিয়া চিৎকার করিতে থাকে। ভিংড়ার এই অমানুষিক আচরণের জন্য সকলে তাহাকে ভয় করে। আমিও করি।

আমার মনে হয় আমাকে এবং দোহাকে সে তাহার দৈবীশক্তির সাহায্যে মারিয়া ফেলিতে চায়। তাহার পর আমাদের সমস্ত দলটার উপর আধিপত্য করিতে চায় সে। এই জন্যই দৈববলে সে নিজেকে বলীয়ান করিতেছে। তাহার শক্তি যে মিথ্যা প্রতারণা একথা বিশ্বাস করিবার সাহস আমাদের নাই। এ বিষয়ে একটা অন্ধ ভয় আমাদের সর্বদা ভীত করিয়া রাখিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি আমরা তখন একটা রূপকথালোকে বাস করিতাম। রূপকথায় যেমন যে-কোনো অপ্রত্যাশিত আশ্চর্যজনক ঘটনা যে-কোনও সময় ঘটিতে পারে আমরাও তেমনি যে-কোনো অত্যাশ্চর্য ঘটনার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হইয়া থাকি। কোনো কিছুকেই আমরা অসম্ভব মনে করি না। আমাদের স্বপ্নের সহিত ভয়, আশার সহিত আশঙ্কা, জীবনের উপর মৃত্যুর ছায়া, সম্পদের মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা সর্বদা প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করে। তাই আমরা কোনো কিছুকেই উপেক্ষা করিতে পারি না। পাথরের মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করি, কর্কশ কণ্ঠে ডাকিতে ডাকিতে কর্করা পক্ষীর দল যখন অর্ধবৃত্তাকারে আকাশে উড়িয়া যায় তখন তাহার নিগূঢ় অর্থ বুঝিবার জন্য আমরা ব্যাকুল হই, আমাদের খাদ্যের প্রয়োজনে অথবা আত্মরক্ষার জন্য যখন পশুকে হত্যা করিতে বাধ্য হই তখন সেই মৃত পশুর কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করি।

সেদিন দোহা যে ভালুকটি মারিয়া আনিয়াছিল তাহার কথা বলিতে বলিতে প্রসঙ্গান্তরে আসিয়া পড়িয়াছি। সেটা আগে শেষ করি। সেদিন আমরা মহাসমারোহে ভালুকটিকে নব-নির্মিত কুটিরটিতে

লইয়া গেলাম। সংযমী রম্ভা, জিকট্, কিংকা ও রুলকি ভালুকটিকে বহন করিয়া লইয়া গেল। আমরা তাহাদের পিছু পিছু নৃত্যগীত করিতে করিতে চলিতে লাগিলাম। গানের মর্ম—ওগো ভালুক, তুমি আর আমাদের পর নও তুমি আমাদের আত্মীয়, তুমি আর বনের নও তুমি ঘরের। ঘরের ভিতরে গিয়া ভালুকের ছাল ছাড়াইয়া তাহার মাংস রম্ভা ও জিকট্ কাটিয়া কাটিয়া বাহির করিল। তাহার হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসটি কিংকা ও রুলকি গাছের তলায় পুঁতিয়া দিল। তাহার মুণ্ডটা কিন্তু অক্ষত রহিল। তাহার পর খড়ের একটা ভালুক বানাইয়া তাহার উপর মুণ্ডটি স্থাপন করিয়া কিংকা ও রুলকির সাহায্যে দোহা সেটিকে মাঠের মধ্যে আনিয়া কয়েকটা বাঁশের উপর টানাইয়া দিল। মুণ্ডের উপর সিঁদুর দেওয়া হইল, তাহার গলায় ফুলের মালা দিয়া তাহাকে ঘিরিয়া আবার আমাদের নৃত্যগীত শুরু হইল। গানের সেই একই মর্ম—ওগো ভালুক, ওগো ভালুক, তুমি আর আমাদের পর নও। তাহার পর কিংকা, রুলকি, রম্ভা, জিকট্ অগ্নিকুণ্ড বানাইয়া ভালুকের টুকরা-করা মাংসগুলি সেঁকিতে লাগিল। মাংস সেঁকা হইয়া গেলে সেগুলি কলাপাতার উপর সাজাইয়া ভালুকের সম্মুখে রাখিয়া আমরা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—ভালুক তুমি আমাদের অনুমতি দাও আমরা তোমার মাংস ভক্ষণ করি। মৃত ভালুক অনুমতি দিতে পারে না, অনুমতি কিন্তু আসে। হয়তো গাছে কাকেরা একসঙ্গে কা কা করিয়া উঠিল, হয়তো অপ্রত্যাশিতভাবে মেঘের গর্জন শোনা গেল, কিংবা হয়তো অকস্মাৎ শোঁ শোঁ করিয়া হাওয়া উঠিল—আমরা বুঝিলাম ভালুকের আত্মা আমাদের অনুমতি দিয়াছে। সেদিন কিন্তু কিছুই হইল না। চারিদিক নীরব নিথর। গান গাহিয়া গাহিয়া আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, ক্ষুধার উদ্রেক হইল, মাংসের লোভনীয় গন্ধ আমাদের আকুল করিয়া তুলিতে লাগিল, কিন্তু তবু কোথাও এমন কোনো নির্দেশ মিলিল না যাহাকে আমরা অনুমতি বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

একটু পরে দেখা গেল ভিংড়া আসিতেছে। ভিংড়া সাধারণত আমাদের মধ্যে আসে না, দূরে দূরে থাকে। তাহার এই অপ্রত্যাশিত আগমনকে আমরা অনুমতি হিসাবে গণ্য করিব কি? সকলে আমরা দোহার মুখের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম দোহা চোখ বুজিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। দোহা হাত না তুলিলে আমরা মাংস স্পর্শ করিতে পারিব না। কণ্টকা লোলুপ দৃষ্টিতে মাংসখণ্ডগুলির দিকে চাহিয়াছিল। সে হঠাৎ চোখ তুলিয়া ভিংড়াকে দেখিতে পাইল এবং দোহাকে বলিল—আমাদের জাদুকরই হয়তো আজ অনুমতি-রূপে আমাদের কাছে আসিয়াছে। ভিংড়া নিকটে আসিয়া দোহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—তুমি একটি বড় ভালুক মারিয়াছ শুনিলাম। ভালুকটি আমার বন্ধু ছিল। আমি প্রায়ই তাহাকে খাম-আলু, শাঁক-আলু খাওয়াইতাম। কন্দ উহার প্রিয় খাদ্য ছিল। উহার জন্য কিছু কন্দ আনিয়াছি। সেগুলি উহার সম্মুখে রাখিয়া মনে মনে বল—তোমার জন্য কন্দ আনিয়াছি, খাও। তাহার পিছনে পিছনে এক সহচরী কন্দের বোঝাটা বহিয়া আনিতেছিল। বোঝা খুলিয়া দোহা ভালুকের সম্মুখে সেগুলি সাজাইয়া দিল। আমরা সকলে মনে মনে ভালুককে অনুরোধ করিতে লাগিলাম, তোমার কন্দ আসিয়াছে, তুমি খাও। প্রত্যাশা করিতে লাগিলাম কন্দ দেখিয়া ভালুকের আত্মা প্রসন্ন হইবে, আমাদের অনুমতিও শীঘ্র আসিয়া পড়িবে। কিন্তু কোনো নির্দেশ আসিল না।

কণ্টকা ভিংড়ার দিকে চাহিয়া বলিল—কই অনুমতি তো আসিতেছে না। তোমার বন্ধুকে অনুমতি দিতে অনুরোধ কর। আমরা আর কতক্ষণ অপেক্ষা করিব?

ভিংড়া কণ্টকার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ। কণ্টকার চোখে-মুখে একটা আতঙ্ক ফুটিয়া উঠিল। সে সরিয়া আমার কাছে আসিয়া বসিল এবং মাটিতে দুই হাত রাখিয়া মনে মনে

ধরিত্রী মাতার আশ্রয়-ভিক্ষা করিতে লাগিল। বিপদে পড়িলে আমাদের সমাজে সকলেই ইহা করে।

ভিংড়া বলিল, অনুমতি এখনই আসিবে। কিন্তু সে অনুমতি দিবে ভালুকের কোনো শত্রু। মেঘ, জল, আকাশ, অরণ্য ভালুকের বন্ধু। ইহারা অনুমতি দিবে না। দেখিতেছ না চারিদিকে কেমন থমথম করিতেছে। আমিও কাহাকেও অনুমতি দিতে অনুরোধ করিব না।

এই সময়ে হঠাৎ একটা বড় বাদামি রঙের পাখি আসিয়া আমাদের সেই মহাবৃক্ষের ডালে বসিল। দেখিলাম তাহার নখরে একটা সবুজ সাপ কিলবিল করিতেছে। টুকচুম্বার ডালে বসিয়া সে সেই সাপটাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া খাইতে লাগিল। খাওয়া শেষ হইবামাত্র তীক্ষ্ণস্বরে সে চিৎকার করিয়া উঠিল—কেক্, কেক্, কেক্ কীঈঈ।

দোহা সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলিল। ভিংড়াও সঙ্গে সঙ্গে পাখিটাকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িল একটা। তাহার সঙ্গে ধনুর্বাণ ছিল। কিন্তু তাহার বাণ পাখির গায়ে লাগিল না। পাখিটা লাফাইয়া উপরে উঠিয়া গেল এবং ব্যঙ্গ করিয়া হাসিয়া উঠিল যেন—কেক্ কেক্ কেক্ কেক্ কীঈঈ। ভিংড়া জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল তাহার দিকে। তাহার পর বলিল, লক্ষণ শুভ নয়। আমাদের বিপদ আসন্ন। ও পাখি এদেশের নয়, আমাদের রাজারা যেখানে থাকে সেই দেশের। বাজপাখি। সাপ ধরিয়া খায়। এ অঞ্চলে ক্বচিৎ আসে, যখন আসে তখন অমঙ্গল হয়। উহাকে মারিয়া উহার দেহটাকে যদি আমার অগ্নিকুণ্ডে ঝলসাইয়া লইতে পারিতাম, উহার চর্বি দিয়া যদি আকাশের দিকে মশাল জ্বালিয়া দিতে পারিতাম, উহার ঠোঁট ও নখর যদি আমার অঙ্গে ধারণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে অমঙ্গলটা আমাদের এলাকায় আসিতে পারিত না। কিন্তু আমার বাণ লক্ষ্যভেদ করিতে পারিল না। তাই মনে হইতেছে অমঙ্গলটা আসিবেই। এই কথাগুলি বলিয়া ভিংড়া আর একবার কণ্টকার দিকে চাহিল। কণ্টকা মাটিতে দুই হাত রাখিয়া এবং মাটির দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আমার পাশেই বসিয়াছিল। ভিংড়া আর কিছু বলিল না। চলিয়া গেল।

আমাদের সে সমাজে যদিও সতীত্ব বলিয়া কিছু ছিল না, কিন্তু বলাৎকার মহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। পুংশ্চলী কামুকী রমণীদেরও আমরা প্রশ্রয় দিতাম না। এরূপ ঘটনা ঘটিলে আমাদের সমাজের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সমবেত হইয়া দোষীদের বিচার করিতেন। ধর্ষণকারীদের তাঁহারা দূর করিয়া দিতেন সমাজ হইতে। আমাদের প্রহরীরা তাহাদের কলকলা নদী পার করিয়া আমাদের এলাকা হইতে বাহির করিয়া দিত। সে লুকাইয়া ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিলে তাহাকে মৃত্যু-দণ্ড দেওয়া হইত। তাহাকে আমাদের কবরস্থানে লইয়া গিয়া জীবন্ত কবর দেওয়া হইত। তবে এরূপ ঘটনা বেশি ঘটিত না। আমি একবার মাত্র দেখিয়াছি। যে রমণী তিনবারের বেশি ধর্ষিতা হইয়াছে তাহাকেও সমাজ হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইত। তাই তিনবারের বেশি ধর্ষিতা হইলে কোনো রমণী সে কথা সমাজপতিদের কানে তুলিতেন না। স্বেচ্ছায় কেহ যদি একাধিক পুরুষের সংস্রবে আসিত তাহা তেমন দোষণীয় বলিয়া গণ্য হইত না। কেবল সে এবং তাহার সন্তানসন্ততি স্বামীর ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইত—এই নিয়ম ছিল। সেকালে সমাজের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ঘর এবং তাহার চারিপাশের চাষের জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত। সে জমিতে সে নিজেই চাষ করিত, সে ঘরটি সে নিজেই মেরামত করিত, নিজের রুচি অনুসারে সাজাইত, গুছাইত। আমরা প্রত্যেকেই অনেকখানি জমির মালিক ছিলাম। সে জমিতে অনেক কুটির প্রস্তুত করিতাম কারণ অনেকেরই একাধিক স্ত্রী ছিল। স্ত্রীরা ভালোও হইত, মন্দও হইত। তোমাদের সমাজে এখন যেমন সতী অসতী দুইই আছে, আমাদের সমাজে তেমনি ছিল।

সেদিন ভিংড়ার কথা শুনিয়া আমি একটু ভয় পাইয়া গেলাম। তাহার ভবিষ্যদ্বাণী মাঝে মাঝে সত্যই ফলিয়া যায়। একবার মনে আছে নীল নির্মল আকাশের দিকে চাহিয়া সে বলিয়াছিল, তোমরা যে সব ফসল রোদে শুকাইতে দিয়াছ তাহা তাড়াতাড়ি তুলিয়া ফেল, একটু পরেই প্রচণ্ড বৃষ্টি নামিবে। আকাশে বৃষ্টির কোনো লক্ষণ ছিল না। কিন্তু সত্যই কিছুক্ষণ পরে আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ দেখা দিল, চতুর্দিক ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এত বৃষ্টি হইল যে আমাদের অনেকের ঘর ভাঙিয়া পড়িল। জমানি নদীতে জল বাড়িয়া গেল। ভিংড়ার এই ভবিষ্যদ্বাণীতে আমরা অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। বিরানি জঙ্গলের উপর কয়েকটি শকুনিকে চক্রাকারে উপর্যুপরি কয়েকদিন উড়িতে দেখিয়া ভিংড়া একবার বলিয়াছিল এবার গো-মড়ক হইবে। সত্যই সেবার অনেক গরু মারা গিয়াছিল। আমাদের অবশ্য ক্ষতি তেমন হয় নাই। আমাদের দাস-দাসীরা গরুর চামড়া ছাড়াইয়া নৌকা করিয়া সেগুলি বিদেশের হাটে বেচিয়া আসিয়াছিল। গরুর হাড় দিয়াও অনেক রকম অস্ত্র-শস্ত্র বানাইয়াছিলাম আমরা। কিছু হাড় বিদেশে পাঠাইয়া তাহার পরিবর্তে গরুও কিনিয়াছিলাম। ভিংড়ার ভবিষ্যদ্বাণীকে তাই আমরা উপেক্ষা করিতে পারিতাম না। একবার আমাদের দেশে অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। সমস্ত ফসল যখন বৃষ্টির অভাবে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। তখন আমি একদিন ভিংড়াকে গিয়া বলিলাম, তুমি তো শক্তিধর পুরুষ মেঘ, বজ্র, সূর্য, আকাশ সবাই তোমার আদেশ মান্য করিয়া চলে একথা তুমি অনেকবার বলিয়াছ। অনাবৃষ্টিতে আমাদের ফসল শুকাইয়া যাইতেছে। নদীতে বান আসে নাই। তুমি ইহার একটা ব্যবস্থা করিতে পার? ভিংড়া বলিল, পারি। কিন্তু ইহার জন্য অন্তত চৌদ্দজন কুমারী মেয়ে দরকার। তাহার প্রত্যেকেই সুকেশিনী হইবে। তাহাদের মধ্যে চারজন সাজিবে জল-মুরগি, তিনজন বুড়ি-পাখি, তিনজন বাবাজী এবং চারজন জল-পিপি। ইহাদের সকলকে চুল এলো করিয়া জমানি নদীতে ডুবিয়া স্নান করিতে হইবে। তাহার পর নদীতীরে বসিয়া ওই জলচর পাখিদের ডাকের নকল করিয়া ডাকিতে হইবে। ডাকটা যেন প্রার্থনার মতো হয়। জলমুরগি, বুড়িপাখি, বাবাজী, জলপিপি সকলেই জলচর পাখি। জলের অভাবে তাহারা যেন বিধাতার কাছে আর্তকণ্ঠে অভিযোগ করিতেছে, জল দাও জল দাও, আমরা মারা গেলাম। পাখিদের প্রার্থনা দেবতা পূর্ণ করেন। উহাদের আলুলায়িত কুন্তল হইবে মেঘের প্রতীক। ভিজা চুলগুলি রোদে শুকাইয়া গেলে তাহারা আর্তকণ্ঠে চিৎকার করিতে করিতে নদীর জলে লাফাইয়া পড়িয়া আবার চুলগুলি ভিজাইয়া লইবে এবং মুখে জল পুরিয়া ফোয়ারার আকারে তাহা আকাশের দিকে ফুৎকার দিয়া ছুঁড়িয়া দিবে। কিছু জোঁক শামুক কচ্ছপ এবং মাছ প্রতিদিন চাই। তাহাদের জীবন্ত অবস্থায় আগুনে সেঁকিতে হইবে। ওই সব জলচর প্রাণীদের নির্বাক যন্ত্রণা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর সহিত আকাশে উঠিয়া মেঘদের মনে করুণা-সঞ্চার করিবে।

আমরা সব ব্যবস্থাই করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের সমাজের কুমারী মেয়েরা জলচর পাখির অভিনয় করিতে রাজি হইল না। ক্রীতদাসীরা সে অভিনয় করিয়াছিল। তাহারা কিন্তু সকলে কুমারী ছিল না। জোঁক শামুক এবং কচ্ছপ অনেক পোড়ানো হইয়াছিল, মাছ বেশি পাওয়া যায় নাই। ভিংড়া বলিল ব্যবস্থায় খুঁত আছে, বৃষ্টি হইবে না। হইলও না। আকাশে কালো মেঘ না আসিয়া একটা রক্তবর্ণ মেঘ সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইল। কিন্তু একফোঁটা বৃষ্টি হইল না। ভিংড়া বলিল, আমাদের সমাজের মেয়েরা ইহাতে যোগ দেয় নাই বলিয়াই এরূপ হইল। ক্রীতদাসীরা নানা দেশ হইতে আসিয়াছে, বৃষ্টি হইয়া থাকিলে তাহাদের দেশেই হইয়াছে। ভিংড়া পর্বতশৃঙ্গে চড়িয়া রক্তবর্ণ মেঘের উদ্দেশে চিৎকার করিয়া নানারূপ দুর্বোধ্য অভিশাপ উচ্চারণ করিল, সারি সারি মশাল জ্বালিয়া তাহাকে

চলিয়া যাইতে বলিল। মেঘটা সরিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার বদলে কালো মেঘ আসিল না। একফোঁটা বৃষ্টি হইল না।

দোহা সেই সময়ে একটা নূতন ধরনের কাজ করিয়াছিল। সে বলিল আমাদের জমানি নদী, একটি শাখানদী। যে বৃহত্তর কলকলা নদী উত্তরবাহিনী হইয়া অবশেষে সাগরে গিয়া মিশিয়াছে, জমানি নদী তাহারই শাখা। কলকলা নদীও নাকি আর একটি প্রকাণ্ড বড় নদীর শাখা। সে নদীর নাম গাং-গাং। তাহার পার দেখা যায় না। তাহার দুই কূল বার বার ভাঙিয়া যায় বলিয়া তাহার তীরে কেহ বাস করিতে পারে না। এই গাং-গাং নাকি মরুভূমি বেষ্টন করিয়া অবশেষে সাগরে গিয়া মিশিয়াছে। গাং-গাং নদীর কথা আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু সে নদী কখনও দেখি নাই। দোহা বলিল, আমরা সকলে মিলিয়া যদি চেষ্টা করি, একটা খাল কাটিয়া আমরা কলকলা নদীর কিছু জলকে আমাদের অঞ্চলে আনিতে পারি। আনিতে পারিলে আমাদের জলকষ্ট দূর হইবে। দোহা নিজেই সর্বপ্রথমে একটা কোদাল লইয়া অগ্রসর হইল। দেখা গেল চম্বাও তাহার অনুবর্তিনী হইয়াছে। তাহার কাঁধেও একটা কোদাল। চম্বা দোহাকে ভালোবাসিত। মনে মনে তাহাকে পূজা করিত। দোহাও হয়তো ভালোবাসিত তাহাকে। কিন্তু এ ভালোবাসার কোনো বহিঃ-প্রকাশ ছিল না। আরও অনেকে গেল তাহাদের সঙ্গে। ক্ষেতখামারে যে সব ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীরা ছিল, তাহারা গেল। আর গেল দোহার বিরানি জঙ্গলে যাহারা কাজ করিত তাহারা। তাহারাও অনেকেই ক্রীতদাস। দোহা বিরানি জঙ্গলে স্ত্রীলোক ঢুকিতে দিত না। ক্রীতদাস-দাসীদের কথা আগেও দুই-একবার উল্লেখ করিয়াছি। তখন শস্যের বিনিময়ে অনেক দাস-দাসী আমরা কিনিতাম। তখন বিভিন্ন অঞ্চলের হাটে বা মেলায় গরু-বাছুরের মত ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীও ক্রীত বিক্রীত হইত। এইভাবে বহু বিভিন্ন দেশের স্ত্রী-পুরুষ আমাদের সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিল। অনেক সময় তাহাদের ভাষা আমরা বুঝিতাম না। ইঙ্গিতের ভাষা দিয়া তাহাদের সহিত প্রথম প্রথম আলাপ চলিত। ক্রমশ আমাদের ভাষা তাহারা শিখিয়া ফেলিত। তাহাদের চেহারাও নানারকম ছিল। কেহ পীতবর্ণ, কেহ রক্তবর্ণ, কেহ বা গৌরবর্ণ। কৃষ্ণবর্ণও ছিল অনেকে। আমরা নিজেরাই ছিলাম কৃষ্ণকায়। ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের মধ্যে রূপসী এবং রূপবানও থাকিত অনেকে। তাহাদের কিনিয়া আনিতাম বটে কিন্তু কিছুকাল পরে সকলের সহিতই অন্তরের যোগ স্থাপিত হইত। কিছু কিছু অবশ্য পলাইয়া যাইত। কিন্তু অধিকাংশই পলাইত না। কালক্রমে আমাদের সুখ-দুঃখের সহিতই তাহারা নিজেদের জড়াইয়া ফেলিত। সুন্দরী ক্রীতদাসীদের আমরা মাঝে মাঝে বিবাহও করিয়াছি। আমার কনিষ্ঠা পত্নী সুলমা কোন দেশের মেয়ে তাহা ঠিক জানি না। সে তন্বী, তাহার চোখের তারা মিশকালো, গোছা-গোছা বাদামি রঙের কোঁকড়ানো চুলে তাহার মাথা ভর্তি। মুখখানি লম্বা গোছের। দাঁতগুলি দুগ্ধধবল এবং ছোট ছোট। গাল দুটি লাল, ঠোঁটও লাল। কিন্তু যাহা সর্বাপেক্ষা আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহা তাহার বুদ্ধি-দীপ্ত চোখের দৃষ্টি। সুলমা স্বল্পভাষিণী। আমাদের কথা হয়তো ভালো বোঝেও না। কিন্তু মনে হয় চোখের দৃষ্টি দিয়া সে সব বুঝিয়া লইতেছে। আমাদের ভাষা তাহাকে কিছু কিছু শিখাইয়াছি। তাহাকে একথাও বলিয়াছি সে যদি নিজের দেশে ফিরিয়া যাইতে চায় আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিব। সে যদি স্বেচ্ছায় আমার কাছে না থাকে তাহাকে বন্দিনী করিয়া রাখিতে চাই না। সে কিন্তু যাইতে রাজি নয়। তাহার বাবা তাহাকে নাকি হাটে বিক্রয় করিয়া দিয়াছিল। বাবার কাছে সে আর ফিরিয়া যাইতে চাহে না। মাঝে মাঝে সে আমার ছোরা লইয়া তাহার তীক্ষ্ণতা

পরীক্ষা করে এবং আমার দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসে। তাহার এই রহস্যময় আচরণে আমি মনে মনে একটু ভয় পাইয়া যাই। কণ্টকা সে ভয়টা আরও বাড়াইয়া দেয়। সে বলে সুলমা একদিন আমাকে হত্যা করিয়া সরিয়া পড়িবে। সুলমাকে খোলাখুলি আমি একদিন এ-কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল (কিছুটা আমাদের ভাষায় এবং কিছুটা আকার-ইঙ্গিতের সহায়তায়) সে এদেশের কাহাকেও কখনো হত্যা করিবে না। যদি সে নিজের দেশে সসম্মানে ফিরিবার কোনো সুযোগ পায়, সে হত্যা করিবে তাহার বাবাকে এবং তাহার বাগ্‌দত্ত স্বামীকে যাহারা শস্যের হাটে নিলামে তাহাকে বিক্রয় করিয়াছিল। বলিতে বলিতে তাহার চোখের দৃষ্টিও ছুরিকার মত চক চক করিয়া উঠিয়াছিল। এ বিষয়ে আমি আর তাহার সহিত আলাপ করি নাই। কণ্টকা আমাকে প্রায়ই সাবধান করিত, আমি যেন উহার সহিত বেশি না মিশি। কিন্তু তাহার এ সাবধান-বাণী সত্ত্বেও আমি মিশিতাম, আত্মসংবরণ করিতে পারিতাম না। তাহার রূপই যে শুধু আমাকে আকর্ষণ করিত তাহা নয়, যৌন-আকর্ষণই যে সুলমার একমাত্র আকর্ষণ ছিল এ কথা বলিলে ভুল হইবে। তাহার মধ্যে যে রহস্যময়ী ছিল তাহাকে আমি উপেক্ষা করিতে পারিতাম না। মনে হইত সে যেন আমাকে ভালোও বাসে এবং সে ভালোবাসা ঠিক যৌন-ভালোবাসা নয়। সে যুগে যৌন-লালসা তৃপ্ত করিবার উপকরণ আমাদের সমাজে প্রচুর ছিল। তাহার জন্য কাঙালের মত কাহারও পিছনে পিছনে ঘুরিবার প্রয়োজন হইত না। যদি কাহারও মধ্যে এমন কোনো গুণ দেখিতাম যাহা পশুত্ব ছাড়া আরও কিছু, তাহাই আমাকে আকৃষ্ট করিত। যাহা ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, বিশ্লেষণ করা যায় না, যাহা আকুল করে কিন্তু কেন আকুল করে বোঝা যায় না—তাহাই সুলমার মধ্যে ছিল। তাহার জন্যই তাহাকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। আমার শতাধিক পত্নী। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কণ্টকা এবং সুলমাই আমার হৃদয়-হরণ করিয়াছে। বাকি সকলের আমি খবরও রাখি না। তাহারা আমার অনুগত দাসীমাত্র কাহারও পুত্র-কন্যা হইয়াছে কাহারও হয় নাই। সকলেই আমার জমিতে কাজ করে। কণ্টকাকেও আমি উপেক্ষা করিতে পারি না। সে উগ্র, কিন্তু তাহার উগ্রতাতেও একপ্রকার মাদকতা আছে। সে যেন সর্পিনী কিংবা ব্যাঘ্রিনী, কিন্তু ভয়ঙ্করী নহে, মোহিনী। তাহার প্রেমের তীব্রতা এবং প্রচণ্ডতা আমাকে যেমন অভিভূত করে তেমনি করে সুলমার সংযত, শান্ত, বুদ্ধিদীপ্ত রহস্যময় আমন্ত্রণ। কণ্টকা একদিন ব্যাঘ্রিনীর মতো সুলমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। কণ্টকা শক্তিশালিনী গাঢ়-যৌবনা, বন্যপ্রাখর্যে প্রখরা সে। আশঙ্কা হইয়াছিল সে হয়তো সুলমাকে মারিয়া ফেলিবে। কিন্তু আশ্চর্য হইয়া গেলাম, তন্বী সুলমার শক্তিও কম নয়। দেখিলাম একটু পরেই সুলমা কণ্টকাকে চিৎ করিয়া তাহার বুকের উপর বসিয়া দৃঢ়মুষ্ঠিতে তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিয়াছে। আমিই উঠিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া লইয়া আসি। সেইদিনই উভয়ে ওই মহাবৃক্ষকে সাক্ষী করিয়া আমার নিকট শপথ করে যে ভবিষ্যতে কেহ কাহারও অঙ্গস্পর্শ করিবে না।

কথায় কথায় অন্য প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছি। দোহা কলকলা নদী হইতে যে খাল কাটিয়া আনিয়াছিল তাহা দুঃসাধ্য কার্য তো বটেই, তাহাতে দোহার বাস্তববুদ্ধির পরিচয়ও আমরা পাইয়াছিলাম। সে যুগে এরূপ একটা দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার কথা কেহই ভাবিতে পারিত না। কাজটি কিন্তু নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় নাই। ভিংড়া ইহাতে মত দেয় নাই। বলিয়াছিল, কলকলা নদীকে জোর করিয়া একটা খালের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করিবার চেষ্টা করিলে ফল ভালো হইবে না। নদীর অভিশাপই আমাদের উপর পড়িবে। ভিংড়া পর্বতের শিখরে চড়িয়া কর্কশকণ্ঠে অবিরাম চিৎকার করিত। কি যে বলিত

তাহাও অনেক সময় বোঝা যাইত না। হঠাৎ একদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। নদীর খাল যখন খানিকটা কাটা হইয়াছে, দোহা যখন নদীর মধ্যে নামিয়া খালটাকে গভীরতর করিতেছিল এমন সময় একটা বিরাট কুমীর তাহাকে আক্রমণ করিল। তাহার পায়ে কামড়াইয়া কুমীরটা তাহাকে জলের তলায় টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। অন্য কেহ হইলে সেই বিরাট কুমীরের কবলমুক্ত হইতে পারিত না। কিন্তু দোহাও বিরাট শক্তিশালী পুরুষ। সে সেই কুমীরকেই ডাঙায় টানিয়া তুলিল, তাহার পর কোদাল দিয়া কোপাইয়া তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। দোহার পায়ে কয়েকটা ক্ষত হইয়াছিল, রক্তও পড়িতেছিল খুব। দোহা নিজের চিকিৎসা নিজেই করিয়াছিল। সে নানারকম গাছ-গাছড়া পাতা-শিকড় বাটিয়া একটা মলম প্রস্তুত করিল, মলমের সহিত ওই কুমীরটার পিত্তি এবং চর্বি মিশাইল এবং চম্বার স্বহস্তে প্রস্তুত একটি ছিটের উপর তাহা মাখাইয়া ক্ষতগুলির উপর বাঁধিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে কাজও করিতে লাগিল। প্রায় সহস্র নর-নারী কাজে লাগিয়াছিল। কাজ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। কলকলার জল কল কল বেগে সেই খালের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া আসিল। মধ্যে একটা ঢালু উপত্যকার মত ছিল, সেখানে খাল কাটিতে হইল না। কলকলা সে উপত্যকা প্লাবিত করিয়া বিরাট একটা জলাশয়ের সৃষ্টি করিয়া ফেলিল। উপত্যকাটির আকার অনেকটা প্রকাণ্ড গামলার মত। যে দিক দিয়া কলকলা প্রবেশ করিয়াছিল সে দিকটাই কেবল নীচু ছিল। অন্য তিন দিক উঁচু সেই উঁচু অংশটা অতিক্রম না করিলে আমাদের অঞ্চলে জমানি নদীতে কলকলাকে আনা যাইবে না, এই ভাবিয়া দোহা পাহাড়ের মতো একটা উঁচু টিলাকে কাটিয়া খুব বড় একটা খাল বানাইবার আয়োজন করিতে লাগল। টিলাটার উপর অনেক বড় বড় গাছ ছিল। প্রত্যেক গাছের গায়ে সিঁদুর লেপিয়া দোহা প্রথমে প্রত্যেক গাছকে পূজা করিল। মেয়েরা প্রত্যেক গাছকে ঘিরিয়া নৃত্যসহকারে যে গীত গাহিল তাহার মর্ম এই : ওগো গাছ তোমরা আমাদের সঙ্গে আমাদের দেশে চল। তোমাদের সাহায্য আমরা চাই। আমাদের বিরানি জঙ্গলে তোমাদের নবজন্ম লাভ হোক, তোমরা আমাদের সহায় হও, আমাদের উপর বিরূপ হইও না। একটা বিরাট গাছ যখন ভাঙিয়া পড়িল তখন দেখা গেল গাছটা একক নয়, জোড়া গাছ। দুইটি ভিন্ন জাতীয় গাছ পরস্পর জড়াইয়া মহামহীরুহে পরিণত হইয়াছে। একটি গাছে অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছিল। ছোট ছোট ফুল, কিন্তু অপরূপ। চম্বা বলিল, আমি ওই গাছে চড়িব, ওই ফুলগুলিকে ভালো করিয়া দেখিব তাহাদের উপর হাত বুলাইয়া সেই হাত আমার চোখের উপর বার বার বুলাইব। খানিকক্ষণ এইরূপ করিলে ওই ফুলগুলির ছবি আমার মনে আঁকা হইয়া যাইবে। নূতন ধরনের একটা ছিট প্রস্তুত করিব আমি। চম্বা তর-তর করিয়া গাছটার উপর উঠিয়া গেল এবং ফুলগুলির উপর চোখ রাখিয়া বার বার তাহাদের যেন চুম্বন করিতে লাগিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নূতন কোনো প্রকাশ দেখিলে চম্বা যেন আত্মহারা হইয়া যাইত। এজন্য অনেকে তাহাকে পাগলি বলিত, অনেকে সন্দেহ করিত সে ডাইনি। কিন্তু কেহ তাহাকে ঘাঁটাইতে সাহস করিত না, সকলেই ভয় করিত তাহাকে। ভিংড়া একদা তাহাকে নিজের সহচরী করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। চম্বা উত্তর দিয়াছিল, তুমি যে দেবতার উপাসনা কর সে দেবতা ভীষণ। আমার দেবতা সুন্দর। তোমার সহচরী হইতে পারিব না। ভিংড়া এ কথা শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া ছিল, তাহার পর উত্তর দিল— ভীষণের মধ্যেও সুন্দর আছে একথা জান না? চম্বা কোনো উত্তর দেয় নাই। ভিংড়ার চোখের একটা তির্যক দৃষ্টি চম্বার মুখের উপর অনেকক্ষণ নিবদ্ধ হইয়াছিল। চম্বা কিন্তু তাহাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে নাই।.
তাহার পর অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে। ভিংড়া চম্বাকে আর কিছু বলে নাই।

সেদিন চম্বা যখন গাছের উপর উঠিয়া ফুলের রাশির মধ্যে তন্ময় হইয়াছিল তখন কিন্তু একটা অঘটন ঘটিয়া গেল। চম্বা হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিল। যে গাছে ফুল ফুটিয়াছিল তাহার সহিত অন্য যে গাছটি জড়িত ছিল তাহার পাতাগুলি ছোট ছোট এবং ঘন সবুজ রঙের। প্রায় কৃষ্ণবর্ণ। তাহার ডালপালাগুলির বিন্যাসও জটিল। তাহার ডালপালার মধ্যে যে একটা প্রকাণ্ড ময়াল সাপ আত্মগোপন করিয়া ছিল তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই। চম্বাও পারে নাই। সাপটা হঠাৎ যখন তাহাকে জড়াইয়া ধরিল তখন সে চেঁচাইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সকলে ছুটিয়া গেল সেদিকে। দোহা উঠিয়া গেল গাছটার উপর। আরও অনেকে গেল। দোহার হাতে একটা বড় ছোরা ছিল। সেই ছোরা দিয়া সে ময়াল সাপটাকে কাটিতে লাগিল। কিন্তু তবু যে পাকে সাপটা চম্বাকে জড়াইয়াছিল সেই পাকটা শিথিল হইল না। পাছে চম্বার গায়ে আঘাত লাগে এই ভয়ে সে পাকটার উপর ছুরি চালাইতে সাহস করে নাই। কিন্তু চম্বার আর্তস্বরে বিচলিত হইয়া দোহা শেষে সেই পাকটার উপরই ছোরা চালাইতে লাগিল এবং সাপটাকে টুকরা টুকরা করিয়া নীচে ফেলিয়া দিল। দেখা গেল চম্বার নিশ্বাস-প্রশ্বাস লইতে কষ্ট হইতেছে। তাহার গায়ে স্তনের নীচে ছোরার আঁচড়ও লাগিয়াছে। রক্ত পড়িতেছে। দোহা চম্বাকে ছোট শিশুর মতো বুকে তুলিয়া লইল এবং ঘাস-পাতার একটা মোটা বিছানা করিয়া তাহার উপর তাহাকে শোওয়াইয়া দিল। তাহার পর গাছ-গাছড়া পিষিয়া মলম প্রস্তুত করিল ওই ময়াল সাপের চর্বি দিয়া। সে মলম সে স্বহস্তে তাহার ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিল। তাহার পর চম্বারই প্রস্তুত (একটি গোক্ষুর সর্পের অনুকরণে প্রস্তুত) ছিট দিয়া সেটি বাঁধিয়া দিল। তাহার পর দোহা বলিল—ওই সাপটারই চামড়া খানিকটা ছাড়াইয়া আনিয়া এটির উপর বাঁধিয়া দিতেছি। আমার বিশ্বাস তাহা হইলে তুমি তাড়াতাড়ি সারিয়া উঠিবে। সাপের টুকরাগুলি কুড়াইয়া দোহা সেগুলিকে সমাধিস্থ করিল এবং সমাধির পাশে অনেকক্ষণ চক্ষু বুজিয়া প্রার্থনা করিল।

প্রায় মাসখানেক শয্যাগত ছিল চম্বা। দোহাই তাহার সেবা করিত। অনেকের ধারণা হইল ভিংড়ার চক্রান্তেই এই সব দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। দোহা এ সম্বন্ধে কিছু বলিত না। সে রোজ খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিত।

কলকলা নদীর জল যখন আমাদের জমানিতে প্রবেশ করিয়া আমাদের শস্যক্ষেত্রগুলির উপর প্রবাহিত হইল তখন আমাদের কিছু ফসল বাঁচিল বটে, কিন্তু অনেক ফসল ডুবিয়াও গেল। আমাদের অনেকের ঘর-বাড়িও জলমগ্ন হইল। বস্তুত কলকলা নদীর প্রবল বন্যায় আমরা হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম। তখন আমাদের মনে হইতে লাগিল ভিংড়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল কলকলার অভিশাপে আমাদের অনিষ্ট হইবে। হঠাৎ এই সময় প্রচুর বৃষ্টিপাতও হইয়া গেল। ভিংড়া বৃষ্টিপাতের জন্য কিছুদিন আগে যে সব প্রক্রিয়া করিয়াছিল, আমাদের মনে হইল, তাহাই হয়তো এতদিন পরে সফল হইল। এ কথাও মনে হইল যে কলকলাকে এ অঞ্চলে এমন জবরদস্তি করিয়া না আনিলেই বোধহয় ভালো হইত। মেঘ তো আসিলই, আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করা উচিত ছিল। বৃষ্টিতেই আমাদের ফসল রক্ষা পাইত। দোহা কিন্তু অক্লান্তকর্মী লোক। সে দমিল না। উপত্যকার যে মুখটা কাটিয়া সে কলকলাকে আমাদের জমির উপর বহাইয়াছিল সে মুখটা সে আবার মাটি দিয়া বন্ধ করিয়া দিল। ইহার জন্য আরও কিছু মাটি কাটিতে হইল। কাছের একটা পাহাড় হইতে কিছু পাথরও আনাইল সে। খালের মুখটা বন্ধ হইয়া গেল। উপত্যকাটা প্রকাণ্ড একটা জলাশয়ে পরিণত হইল। দেখা গেল জলাশয়ে মাছও আছে। আমাদের মেয়েরা গিয়া সেখানে মাছ ধরিত। ইহার পর হইতেই

কিন্তু ভিংড়ার প্রভাব আমাদের মধ্যে খুব প্রবল হইল। ভিংড়া যে একজন অসাধারণ শক্তিধর একথা আমাদের মধ্যে অনেকেই বলাবলি করিতে লাগিল। আমার মনেও ক্রমশ এই ধারণাটা বদ্ধমূল হইল যে ভিংড়া অসাধারণ লোক, যে কোনো উপায়েই হোক সে এমন একটা শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে যে শক্তি প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করিতে পারে, যে শক্তির ইঙ্গিতে হিংস্র কুম্ভীর কলকলার জলে দোহাকে আক্রমণ করে, যে শক্তির প্ররোচনায় ময়াল সাপ আসিয়া চম্বাকে নিষ্পেষিত করিতে চায়, যে শক্তির আদেশে আকাশে মেঘ আসিয়া আমাদের প্লাবিত করে। এ শক্তিকে উপেক্ষা করা শক্ত। এ শক্তিকে দমন করিব এমন শক্তি আমার নাই। লোকে বিপদে পড়িলে আমার কাছে আসিত না, ভিংড়ার কাছে যাইত। একদিন নাম্‌নাকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলাম। নাম্‌না বন্ধ্যা ছিল। বহু পুরুষের সংস্রবে আসিয়াও তাহার সন্তান হয় নাই। আমাদের সমাজেও বন্ধ্যা নারীকে সকলেই কৃপার চক্ষে দেখিত। অনেকে তাহাদের ডাইনি মনে করিত। অনেক বন্ধ্যা নারী আত্মহত্যা করিতেও পশ্চাৎপদ হইত না। কেহ বিষ খাইত, কেহ পাহাড়ের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িত, কেহ জমানির জলে ডুবিয়া মরিত। সকলে ভাবিয়াছিল নাম্‌নার এইরূপই কিছু একটা পরিণতি ঘটিবে। হঠাৎ দেখিলাম নাম্‌নার গায়ে মুখে পিঠে সর্বাঙ্গে কালো কালো দাগ। কে যেন তাহাকে চাবুক মারিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—এ কি, তোমাকে এমন করিয়া মারিয়াছে কে? নাম্‌না উত্তর দিল—ভিংড়া। আমি সন্তান-কামনায় অনেকের নিকট গিয়াছি, কিন্তু কেহই আমাকে সন্তান দিতে পারে নাই। ভিংড়া বলিল তোমার শরীরে একটা পিশাচী বাস করে। সে-ই তোমার সন্তানকে খাইয়া ফেলে। তাহাকে চাবকাইয়া না তাড়াইলে সে যাইবে না। তুমি যদি মার খাইতে প্রস্তুত থাকো, আমার নিকট আসিও। আমি কাল ভিংড়ার নিকট গিয়াছিলাম। আমি অবাক হইয়া গেলাম। দেখিলাম ভিংড়া তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছে। ইহার কিছুদিন পরে আরও অবাক হইতে হইল। সকলে দেখিল নাম্‌নার গর্ভলক্ষণ দেখা দিয়াছে। দশমাস পরে নাম্‌না সত্যই একটি সুস্থ পুত্র প্রসব করিল। ভিংড়ার শক্তি সম্বন্ধে আর কাহারো সন্দেহ রহিল না। এই দৈবীশক্তির নিকট নতি স্বীকার না করিয়া উপায় নাই এই কথাই সকলের মনে হইতে লাগিল। আমি একদিন দোহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহাকে বলিলাম, আমার আর দলপতি থাকিবার ইচ্ছা নাই। যদিও একদা আমি পিতার আদেশে ভিংড়াকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলাম, যদিও পিতাই আমাকে দলপতি নির্বাচন করিয়া গিয়াছেন, তবু এখন আমার মনে হইতেছে ভিংড়াই আমার অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী। দৈবীশক্তি তাহার সহায়। এ অবস্থায় আমাদের সমাজের দলপতিত্ব ভিংড়াকে দেওয়াই উচিত। দোহাকে বলিলাম, তোমার যদি আপত্তি না থাকে, চল আমরা দুইজনে একদিন তাহার কাছে যাই এবং তাহাকেই দলপতি পদে বরণ করি।

দোহা তখন দুগ্ধ-দোহন করিতেছিল। চারিদিকে গাভীর পাল, একপাশে কয়েকটি জালা। দোহা একটি কলসীতে দুধ দুহিতেছিল। যাহারা দুগ্ধ বহন করে তাহারা দূরে দাঁড়াইয়াছিল। দোহা আমার কথার কোনো উত্তর দিল না। দুধের কলসীটা যখন ভরিয়া গেল তখন সেটা একটা বড় জালায় ঢালিয়া দিয়া সে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, আজ 'ফান্‌ডি'তে যাইব। সেখানকার জন্তুগুলিকে দুধ খাওয়াইব। 'ফান্‌ডি'তে কয়েকটি হায়না ধরা পড়িয়াছে। চল, সেখানেই সব কথাবার্তা হইবে।

ফান্‌ডি দোহার একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। এখানে সে অবসর বিনোদন করে। ফাঁদে যে সব জন্তু-জানোয়ার ধরা পড়ে, জীবন্ত থাকিলে দোহা তাহাদের এই 'ফান্‌ডি'তে রাখিয়া দেয়। একটা বিস্তীর্ণ জায়গাকে বড় বড় গাছ ও লম্বা লম্বা খুঁটি দিয়া সে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তাহার ভিতরও খুঁটি-দিয়া-

ঘেরা ছোট বড় অনেক কক্ষ আছে। কক্ষগুলির মধ্যেও ছোট ছোট গাছপালা এবং প্রচুর ঘাস। এই সব কক্ষের মধ্যে দোহা নানারকম জন্তুদের কিছুদিন বন্দী করিয়া রাখে। তাহার পর নানাভাবে তাহাদের পর্যবেক্ষণ করে। এ বিষয়ে তাহার কৌতূহল অসীম। সে তাহাদের জন্য নানা রকম খাবার সংগ্রহ করে, তাহাদের সহিত কথা বলে। তাহার পর যখন তাহার কৌতূহল মিটিয়া যায় তখন তাহাদের ছাড়িয়া দেয়। অনেকগুলি কুকুর পুষিয়াছে। খরগোশও অনেকগুলি। সম্প্রতি সে আবিষ্কার করিয়াছে যে, সমস্ত জানোয়ারই দুধ খায়। যাহারা স্তন্যপায়ী জীব নয়, যেমন সাপ, পাখি, তাহাদেরও দুধে অরুচি নাই। অবশ্য সব পাখিদের কথা সে জানে না।

দোহা একটি জালা মাথায় তুলিয়া লইল। তাহার দুই বিশ্বস্ত সহচর নাগা ও বাঘার মাথাতেও একটি করিয়া জালা চড়িল। তাহাদের পিছনে ছোট বড় জালা বহিয়া অনেক অনুচর চলিতে লাগিল। বিরানি অরণ্যে দোহা কোনো স্ত্রীলোক দাসী নিযুক্ত করে না। তাহার অনুচরেরা সবাই পুরুষ। দোহা নীরবেই পথ চলিতে লাগিল। আমিও তাহার পাশে পাশে যাইতে লাগিলাম। হঠাৎ দোহা বলিল, তোমার বাবা তোমাকে দলপতি করিয়া গিয়াছেন। সে পদ ত্যাগ করিবার তোমার অধিকার নাই। ভিংড়ার দৈবীশক্তি যে কি ধরনের শক্তি তাহা আমার ধারণাতীত। সে যখন মেঘকে আহ্বান করে মেঘ তখন আসে না, আসে ছয় মাস পরে। আহ্বান না করিলেও হয়তো সে মেঘ আসিত। একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া নানারকম জন্তু-জানোয়ার পোড়াইয়া এবং কয়েকটা মেয়েকে নির্যাতন করিয়া সে যে কি শক্তি কেমন করিয়া অর্জন করে তাহা আমি বুঝিতে পারি না। মার খাইয়া বন্ধ্যা নারী সন্তানবতী কেমন করিয়া হয় তাহা জানি না। শুধু জানি অনেক মেয়ের কিছুদিন ছেলে হয় না, তাহার পরে আপনিই হয়। ভিংড়া চমকপ্রদ একটা কিছু করিয়া তোমাদের ঘাবড়াইয়া দিতে চায়, তোমরা অতি সহজে তাহার ভাঁওতায় ভোল। একটা কথা নিশ্চয় জানিও সর্বশক্তিময়ী প্রকৃতি কিন্তু তাহার ভাঁওতায় ভোলেন না, তাহার চিৎকারে সাড়া দেন না, তাহার উৎকট চেহারা দেখিয়া ভয় পান না। প্রকৃতি সর্বশক্তিময়ী। তিনি কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না। তাঁহার কাছে আমরা প্রার্থনা করিতে পারি, নতজানু হইতে পারি, তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে পারি, নানা উপচার সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পূজা করিতে পারি, ইহাতে আমাদের তৃপ্তি হয়, কিন্তু প্রকৃতি প্রসন্ন হইবেন কি না তাহা জানি না। আমরা কেবল আশা করিতে পারি তিনি দয়া করিবেন। এ আশা করিয়া সুখ আছে, মাঝে মাঝে সান্ত্বনাও পাওয়া যায়। কিন্তু ভিংড়া যাহা করে তাহা বীভৎস, তাহা নিষ্ঠুর, তাহাতে শক্তি বা সৌন্দর্যের পরিচয় নাই। ভিংড়া গায়ে নানা রকম রং মাখে, আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া মাথা নাড়ে, বহুরূপী গিরগিটিও রং বদলায়, সে-ও আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া মাথা নাড়ে। তাহা দেখিয়া কেহ মুগ্ধ হয়, কেহ ভয় পায়। শুনিয়াছি পাহাড়ের ওপারে একটা সম্প্রদায় আছে তাহারা নাকি গিরগিটিকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। আর একটা সম্প্রদায় আছে তাহারা আবার বহুরূপী গিরগিটিকে শয়তান বলিয়া মনে করে। দেখিতে পাইলেই মারিয়া ফেলে। ভিংড়াও অনেকটা বহুরূপী গিরগিটির মত। তাহার ভড়ং দেখিয়া তুমি ভয় পাইও না। উহাকে লইয়া মাথা ঘামাইও না। তোমার বাবা তোমাকে যে ভার দিয়া গিয়াছেন সুপুত্রের মত তাহা বহন কর। ভিংড়া যদি সমাজের কোনো অনিষ্ট করে তখন তাহাকে লইয়া মাথা ঘামাইও, এখন কিছু করিবার দরকার নাই।

এই দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া দোহা নীরবে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল এবং বাকি পথটাও নীরবেই অতিক্রম করিল। আমিও ভাবিয়া দেখিলাম দোহা যাহা বলিতেছে তাহাই সমীচীন।

'ফানডি'র কাছাকাছি আসিবামাত্র ব্যাঘ্রের চিৎকার ও হায়েনাদের হা-হা-রব শুনিতে পাইলাম। দোহার একজন অনুচর বলিল—বাঘটা দুধ খায় নাই। ক্রমাগত চিৎকার করিতেছে, আর বার বার লাফাইয়া বেড়াটা পার হইবার চেষ্টা করিতেছে। হায়নাগুলা পরস্পর মারামারি করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে। সব ক'টাই পুরুষ হায়না। উহাদের বোধহয় রাখা যাইবে না। উহারাও দুধ খায় নাই।

দ্বিতীয় অনুচর বলিল—বাদামি রঙের যে বড় বাজপাখিটা ধরা পড়িয়াছে সে-ও দুধ খাইতেছে না। ঠোঁট এবং নখ দিয়া দুধের বাটি বার বার উল্টাইয়া দিতেছে। উহার জন্য কি কয়েকটা ইঁদুর ধরিয়া দিব? দোহা জালাটা নামাইয়া বলিল—মহিষটাকে আন এবং শঙ্কর মাছের চাবুকটা আমাকে দাও।

মহিষ মানে মহিষের চামড়া। মৃত মহিষের চামড়া ছাড়াইয়া সেটাকে শুকাইয়া বোরখার আকারে এক অদ্ভুত পোশাক প্রস্তুত করিয়াছে দোহা। শিং সুদ্ধ মহিষের মুণ্ডটাও পোশাকে সংলগ্ন হইয়া আছে। মুণ্ডের ভিতর আছে খড়। সেটা যখন দোহা পরিধান করে মনে হয় একটা মহিষ যেন পিছনের দুই পায়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দোহা হাত দুইটিও মহিষের চামড়ায় ঢাকিয়া রাখে। দক্ষিণ হস্তে থাকে শঙ্কর মাছে শুষ্ক ল্যাজটি।

এই পোশাক পরিয়া দোহা যখন দুর্দান্ত বাঘটির কক্ষে প্রবেশ করিল তখন বাঘটি প্রথমে ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া গেল। দোহা আগাইয়া গিয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। প্রথমে বাঘটা কিছু বলিল না। কিন্তু যে মুহূর্তে সে বুঝিতে পারিল যে ওই ভীষণদর্শন জিনিসটা সত্যিই তত ভীষণ নয় তখন সে স-গর্জনে ঝাঁপাইয়া পড়িল তাহার উপর। প্রচণ্ড পদাঘাত করিয়া তাহাকে দূরে সরাইয়া দিল দোহা। তাহার পর ছুটিয়া গিয়া দুইহাতে তাহাকে শূন্যে তুলিয়া মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিল। তাহার পর তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া দুই হাতে তাহার মুখ ফাড়িয়া তাহার মুখের মধ্যে খানিকটা দুধ ঢালিয়া দিল। দোহা একটা দৈত্য। তাহার পর সে হায়েনার ঘরে ঢুকিল। হায়েনারা তাহার চেহারা দেখিয়া ভয় পাইল না। দলবদ্ধ হইয়া একসঙ্গে আক্রমণ করিল। কিন্তু মহিষের শুষ্ক চর্মে তাহাদের নখ-দন্ত বসিল না। দোহা নির্মমভাবে চাবুক চালাইয়া তাহাদের বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। বলিল, তিনদিন উহাদের খাইতে দিও না। তাহার পর কেবল দুধ দিও। তখনও যদি না খায় আরও তিন চার দিন কিছু খাইতে দিও না। তাহার পর আবার দুধ দিও। সাতদিন পরেও যদি না খায় উহাদের ছাড়িয়া দিও।

দোহা বাহিরে আসিয়া মহিষটা দূরে ফেলিয়া দিল। তাহার পর যাহা করিল তাহা অপ্রত্যাশিত। একটা গাছের নীচে বসিয়া হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিরানির ক্রীতদাসরা ইহাতে বিস্মিত হইল না। তাহারা প্রতি কক্ষে কক্ষে দুধ দিয়া আসিতে লাগিল। দোহার এসব ভাবান্তরে তাহারা অভ্যস্ত। দোহা কখনও কাঁদে, কখনও অট্টহাস্য করে, কখনও বড় বড় বাছুরকে কাঁধে তুলিয়া নৃত্য করে। এসব আমিও জানিতাম। কিন্তু তাহার বিগলিত অশ্রুধারা দেখিয়া আমি আবার বিচলিত হইলাম। বলিলাম, তুমি কাঁদিতেছ কেন? যদি কাঁদিবেই তবে এ সব কাণ্ড কর কেন? দোহার যুক্তি কিন্তু অদ্ভুত। সে বলিল, কাঁদি, কারণ না কাঁদিয়া পারি না। আর এসব করি, কারণ এসব কর্তব্য। বিরানি অরণ্যে আধিপত্য করিতে হইলে হিংস্র পশুদের শাসন করিতে হইবে। তাহাদের আমি মারিয়া ফেলিতে চাহি না, কারণ তাহারা এ অরণ্যের শোভা। তাহাদের আমি ভালোবাসা দিয়া খাবার দিয়া দুধ খাওয়াইয়া বশ করিতে চাই। যখন বশ মানিতে চায় না তখনই শাসন করি। এটা আমার কর্তব্য, কিন্তু বড় দুঃখজনক কর্তব্য, তাই মাঝে মাঝে কাঁদিয়া ফেলি।

আমরা তখন সভ্যতার যে স্তরে ছিলাম সে স্তরে আমাদের সমাজ বেশ সমৃদ্ধ ছিল। অনেক উন্নতি হইয়াছিল। আমাদের খাদ্যের অভাব ছিল না, আমরা খাদ্য সঞ্চয় করিতে শিখিয়াছিলাম, আমরা বাহির হইতে খাদ্য আমদানীও করিতে পারিতাম। মোটামুটি আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও ছিল আমাদের। যদিও আমরা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলাম না, তবু বাহিরের শত্রু হানা দিলে আমরা বর্শা, বল্লম, কুঠার, খড়্গ, তরবারি, ঢাল দিয়া তাহাদের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা অর্জন করিয়াছিলাম। শুনিয়াছিলাম বহুদূরে একজন প্রবল প্রতাপশালী রাজা নাকি আমাদের অধিপতি। তাঁহাকে আমরা কখনও দেখি নাই। ইহাও শুনিয়াছিলাম তিনি নাকি পোড়ামাটির ইঁট দিয়া বিরাট একটি শহর নির্মাণ করিয়াছেন। শহরের মধ্যস্থলে তাঁহাদের দেবতার প্রকাণ্ড মন্দির আছে। সে মন্দিরে ধূমধাম করিয়া সে দেবতার পূজা হয়। আমরা সে দেবতা বা মন্দির কখনও দেখি নাই। মর্দন নামে আমাদের ভৃত্যটি প্রতি বছর কিছু শস্য খাজনা স্বরূপ তাহার তহশিলদারকে দিয়া আসে। তহশিলদারের সহিতও আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। ধর্ম সম্বন্ধেও আমাদর পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল, রাজার ধর্ম আমাদের পালন করিতে হইত না। তখন প্রত্যেক জনপদের আলাদা আলাদা দেবতা ছিল। একটা নয়, অনেক। গাছে গাছে, নদীতে তড়াগে, পর্বতে ঝরনায়, এমন কি জন্তুতেও অনেকে দেবতার প্রকাশ অনুভব করিত এবং পূজা করিত। আমাদের দেবতা ছিল টুকচুম্বা, যদিও অনেকে জীবজন্তুকেও পূজা করিত। এই পরিবেশে দোহা ছিল একটি অনন্য পুরুষ। ভিংড়ার অনন্যতাও অনেকে স্বীকার করিত। কিন্তু দুইজনের মধ্যে তফাত ছিল অনেক। ভিংড়া মনে করিত শাসন করিয়া সে প্রকৃতিকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারিবে। তাহার এই শক্তিকে সকলের সম্মুখে আস্ফালন করিবার জন্য সে মাঝে মাঝে ভণ্ডামিরও আশ্রয় লইত। এমন একটা ভাব করিত যে যদিও তাহার ভবিষ্যদ্বাণী সব সময়ে সফল হইতেছে না, কিন্তু এই না হওয়ার মধ্যেও এমন একটা নিগূঢ় কিছু আছে যাহা আমাদের মত সাধারণ লোকের বোধগম্য নহে। আমরা যেন অন্ধভাবে তাহার কথায় বিশ্বাস করি। অনেকে করিত। দোহা কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির। তাহার দেহের শক্তি প্রচণ্ড, মনের শক্তিও প্রচণ্ড। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই প্রচণ্ডতা তাহাকে নিষ্ঠুর করে নাই, উগ্র করে নাই, দোহা শক্তিধর, কিন্তু কোমল। প্রকৃতিকে স্ববলে আনিয়া তাহার উপর প্রভুত্ব করিবার স্পর্ধা তাহার নাই। সে জানে প্রকৃতির শক্তি অমিত, তাহার নানা রূপ, নানা প্রকাশ। তাহা অগ্নিতে জ্বলন্ত, প্রস্তরে কঠিন, আলোকে জ্যোতির্ময়, বন্যায় ভূমিকম্পে মেঘগর্জনে অশনিপাতে ভয়ঙ্কর। তাহার বহু, রূপ, অসংখ্য প্রকাশ। এ সবের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবার সাধ্য মানুষের নাই। সে সাধ্য যদি কখনও হয়ও, তবু প্রকৃতির শক্তি অদম্য থাকিবে, সে নিগূঢ় শক্তি বিস্তার করিয়া নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিবেই। মানুষ এ শক্তির নিকট নতজানু হইয়া কেবল প্রার্থনা করিতে পারে এবং এই প্রার্থনা তাহাকে এমন একটা অবর্ণনীয় শক্তি দেয় যাহা লাভ করিলে মানুষের আর ভয় থাকে না। দোহা প্রার্থনা করিত। সকলকে প্রার্থনা করিতে বলিত। এই বিরাট শক্তির নিকট প্রার্থনা করা ছাড়া গত্যন্তর নাই ইহাই তাহার মত ছিল। প্রতি মাসে শুক্লা দ্বিতীয়ার দিন টুকচুম্বার তলায় প্রার্থনা-সভা বসিত। সে সভায় কোনো বক্তৃতা হইত না। সকলেই চোখ বুজিয়া নীরবে বসিয়া থাকিত। দোহা উঠিয়া পড়িলেই সভা ভাঙিয়া যাইত। তাহার পর শুরু হইত নৃত্য-গীত। নাচ-গান শেষ হইয়া গেলে আমরা প্রত্যেকে এক কলসী করিয়া জল টুকচুম্বার তলায় ঢালিয়া দিতাম।

সেদিন দোহা সেই বাজপাখিটার ঘরে যখন গেল তখন আমরা দুজনেই চমকাইয়া উঠিলাম।

দোহা বলিল, এ পাখি তো এ প্রদেশের নয়। যেদিন ভালুকটাকে মারিয়াছিলাম সেইদিন এই পাখিটাই আসিয়া আমাদের গাছে বসিয়াছিল না? আমিও বলিলাম—হ্যাঁ এইটাই তো টুকচুম্বার ডালে বসিয়া আমাদের মাংস খাইবার অনুমতি দিয়াছিল। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই তীর ছুঁড়িয়াছিল ভিংড়া। এ পাখি কি করিয়া ধরা পড়িল? দোহার একটা অনুচর বলিল, পাখিটা একটা প্রকাণ্ড সাপ ধরিয়াছিল। সেই সাপটার সহিত ঝটাপট করিতে করিতে পাখিটা একটা মস্ত কাঁটাঝোপে পড়িয়া যায়। সেই ঝোপে উহার ডানা আটকাইয়া গিয়াছিল। সেখান হইতেই আমরা উহাকে ধরিয়াছি। সাপটাকে ধরিতে পারে নাই, সেটা পলাইয়া গিয়াছিল। পাখিটাও দুধ খায় না। ঠোঁট দিয়া রোজ দুধের বাটি উল্টাইয়া দেয়। উহার ঘরে একটা ইঁদুর ঢুকিয়াছিল। সেটাকে ধরিয়া খাইয়াছে। আমাদের ফাঁদে অনেক ইঁদুর ধরা পড়িয়াছে। উহাকে ইঁদুর দিব কি? দোহা একটু ভাবিল। তাহার পর বলিল, না, উহাকে ছাড়িয়া দাও। কিন্তু ছাড়িয়া দিবার আগে উহার গায়ে গাঢ় সবুজ রং মাখাইয়া, দাও। এবার বিদেশের বাজার হইতে যে রং আসিয়াছে সেটা খুব পাকা রং। ও পাখি যদি আবার দেখা দেয় তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব একই পাখি বার বার ফিরিয়া আসিতেছে কি না। পাখিটাকে ধরিয়া রঙের চৌবাচ্চার কাছে লইয়া গেল অনুচরটি। গরু-বাছুর ছাগল-ভেড়াকে চিহ্নিত করিবার জন্য বিরানিতে নানা রঙের চৌবাচ্চা থাকিত। সবুজ রঙের চৌবাচ্চায় পাখিটাকে ডুবাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। পাখিটার গায়ের রং বাদামি। মাঝে মাঝে সাদা রং ছিল কিছু কিছু। পেটের কাছে গোল গোল কয়েকটি সাদা বৃত্তের মত ছিল। ল্যাজেরও খানিকটা সাদা। সাদা অংশগুলি সবুজ হইয়া গেল। বাদামির উপরও সবুজের ছোপ লাগিয়া একটা অদ্ভুত রং হইল। মোট কথা, পাখিটা যেন রূপান্তরিত হইয়া গেল। ছাড়িয়া দেওয়া মাত্র সে সোঁ করিয়া অনেক উপরে উঠিয়া গিয়া একটা ঘুরপাক খাইল। তাহার পর তীক্ষ্ণকণ্ঠে সেই চিৎকারটা করিল—কেক্ কেক্ কেক্ কেক্—কীঈঈ। মনে হইল যেন ব্যঙ্গ করিয়া গেল। তাহার পরই অন্তর্হিত হইয়া গেল মহাশূন্যে। তাহাকে আর দেখা গেল না। তাহার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া দোহা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল পাখিটাকে বশ করিতে না পারিয়া সে যেন ক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাহার মুখে-চোখে কেমন যেন একটা উৎকণ্ঠার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অস্ফুট স্বরে সে বলিল—কে জানে ইহা কোনো অমঙ্গলের সঙ্কেত কি না। মনে পড়িল ভিংড়াও এ কথা বলিয়াছিল। বলিলাম—চল কাল টুকচুম্বার পূজা করি। দোহা বলিল, বেশ। পরদিনই সেই মহাবৃক্ষের তলায় পূজার আয়োজন হইল। সমস্ত জনপদ নৃত্য-গীতে মাতিয়া উঠিল। হঠাৎ একজন বলিল—টুকচুম্বার কুঁড়ি হইয়াছে। দেখিলাম অগ্নি-গোলকের ন্যায় একটি কুঁড়ি একটি শাখার প্রান্তে দেখা দিয়াছে।

ইহার কয়েকদিন পরেই অগ্নিশিখার মত অজস্র ফুল ফুটিল। মনে হইল সমস্ত গাছটাই যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। গাছটায় ফুল ফুটিলেই আমার কেমন যেন আতঙ্ক হইত। এবারও হইল। এবারও আমাদের সমাজে অনেক জননী সন্তান প্রসব করিল। প্রতিবারেই ফুল ফুটিলে আমাদের বংশবৃদ্ধি হয়, এবারও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না।

এবারে কিন্তু বিস্ময়জনক ব্যাপার ঘটিল একটি। শুধু তাই নয়, বিস্ময় ক্রমশ আতঙ্কে রূপান্তরিত হইল।

প্রথমে একটা গুজব শোনা গেল, আমাদের অঞ্চলে কেহ কেহ নাকি ঘোড়া দেখিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি ঘোড়া জানোয়ারটার সহিত আমাদের পূর্বপুরুষ বাণমুখ ও অংঘোর অপ্রীতিকর স্মৃতি বিজড়িত

ছিল। তাহাদের বিদ্বেষপূর্ণ আচরণের জন্য থানথিরার বংশধরেরা ঘোড়ার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিল। আমাদের অঞ্চলে বহুকাল ঘোড়া দেখা যায় নাই। ঘোড়ার আবির্ভাবে আমরা সকলেই বেশ বিচলিত হইয়া পড়িলাম। আমি নিজেই একদিন স্বচক্ষে দেখিলাম আমাদের ক্ষেতের মাঝখানে বেশ একটা বড় একটা ঘোড়া চরিয়া বেড়াইতেছে। যাহারা আমাদের ক্ষেত পাহারা দেয় তাহারা ঘোড়াটাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া পলাইয়া আসিয়াছে। তাহারা বলিল ঘোড়াটাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য তাহার কাছাকাছি যাইতেই ঘোড়াটা কান দুইটি পিছন দিকে বাঁকাইয়া তাহাদের কামড়াইতে গিয়াছিল। আমরা অনেকে বাহির হইয়া ক্ষেতের চারিদিকে সমবেত হইলাম। দেখা গেল অনেক দূরে আরও দুইটি ঘোড়া চরিতেছে। এ অবস্থায় কি করা উচিত আমরা চিন্তা করিতেছিলাম এমন সময় আমার কনিষ্ঠা পত্নী সুলমা আমার পাশে দাঁড়াইল এবং মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। তাহার চোখের দৃষ্টিতে একটা সোৎসুক দীপ্তি দেখিয়া প্রশ্ন করিলাম, কি ব্যাপার। হাসিতেছ কেন? সে বলিল একটা লম্বা দড়ি দিয়া উহাকে যদি ধরিয়া দাও আমি উহার পিঠে চড়িতে পারি। আমার বাবার ঘোড়া ছিল। সুলমার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, একটু বিব্রতও হইলাম। যাহার বাবার ঘোড়া আছে এবং যে ঘোড়ায় চড়িতে পারে তাহাকে আমি—থানথিরার বংশধর—বিবাহ করিয়াছি এ কথাটা রাষ্ট্র হইয়া গেলে লোকে কি ভাবিবে! এ আশঙ্কাও মনে জাগিল সুলমা অংঘ্রোর বংশের কেহ নয় তো? কাহাকেও কিছু বলিলাম না। শেষে ঠিক করিলাম দোহার নিকট গিয়া সব বলিব। সে হয়তো এখনও ঘোড়ার খবর শোনে নাই, শুনিলে আসিত।

সব শুনিয়া দোহা বলিল—ঘোড়া তিনটিকে ধরিতে হইবে। সুলমার জন্য চিন্তিত হইও না। সে অংঘ্রোর আত্মীয় কি না এ চিন্তা অনর্থক। সে ঘোড়ায় চড়িতে পারে এটা তাহার বিশেষ গুণ, দোষ নহে। তবে কথাটা কাহাকেও বলিও না। কারণ অনেকেই অল্পবুদ্ধি, কথাটা শুনিলে অমূলক জল্পনা-কল্পনা করিবে। এখন কথাটা গোপন রাখ। ঘোড়া তিনটিকে আগে ধরা যাক।

দোহা পশু-পক্ষী বিষয়ে খুব উৎসাহী, সে আমাদের ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদের সমবেত করিয়াছিল। তাহার পর নির্দেশ দিল বৃত্তাকারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ঘোড়া তিনটিকে ঘিরিয়া ফেলিতে। বৃত্তটি প্রথমে বৃহদাকার হইবে, পরে সেটি ক্রমশ ক্ষুদ্রতর হইয়া আসিবে। প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র দেওয়া হইল। কাহারও হাতে বর্শা, কাহারও হাতে লগুড় কাহারও হাতে তরবারি, কাহারও হাতে ছোরা। অনেকের হাতেই দড়িও রহিল। সুলমা একটা লম্বা দড়ি সংগ্রহ করিয়াছিল। সকলকে বলিয়া দেওয়া হইল ঘোড়া যদি আক্রমণ করিতে আসে তাহারা তাহাকে যেন আঘাত করিতে ইতস্তত না করে। সুলমাও ওই বৃত্তের মধ্যে রহিল। দোহাও নিজের শংকর মাছের চাবুকটা লইয়া সকলের সহিত যোগ দিল।

তিনটি ঘোড়াকে লইয়া তিনটি বৃত্ত হইয়াছিল। আমিও একটা বৃত্তের মধ্যে ছিলাম। বৃত্তগুলি ক্রমশ ছোট হইয়া ঘোড়াগুলির নিকটবর্তী হইতে লাগিল। ঘোড়াগুলি বুঝিতে পারিল যে তাহাদের ঘিরিয়া ফেলা হইতেছে। তাহারা সচকিত হইয়া এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিল। সুলমা যে বৃত্তের মধ্যে ছিল সেই বৃত্তের ঘোড়াটা সবেগে সুলমার দিকে ছুটিয়া আসিয়া বৃত্ত ভেদ করিতে চেষ্টা করিল। সুলমা কিন্তু বিচলিত হইল না। সে দড়িতে একটা ফাঁস বানাইয়া প্রস্তুত হইয়াই ছিল। ঘোড়াটা কাছে আসিবামাত্র সে দড়িটা ছুঁড়িয়া দিয়া তাহার গলায় ফাঁসটা পরাইয়া দিল। ঘোড়াটা কিন্তু থামিল না। সুলমাকে টানিয়া অনেক দূরে লইয়া গেল। কতদূর লইয়া যাইত কে জানে, কিন্তু দোহা ছুটিয়া গিয়া ঘোড়াটার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার মুখের উপর শপাশপ চাবুক মারিতে লাগিল।

তাহার পর আরও আগাইয়া গিয়া তাহার সামনের ঝুঁটিটা ধরিয়া এক ঝটকায় মাটিতে ফেলিয়া দিল। ঘোড়াটা মাটিতে পড়িতেই সে যাহা করিল তাহা সাধারণ মানুষে পারে না। সে ঘোড়ার চার পা ধরিয়া তাহাকে কাঁধে তুলিয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে আরও লোকজন ছুটিয়া আসিয়া ঘোড়াটাকে দড়িদড়া দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। ঘোড়াটা সত্যই যখন বন্দী হইল তখন সুলমা বলিল, আমি ঘোড়াটার পিঠে চড়িব। আমি ঘোড়ায় চড়িতে জানি। সুলমা একটা শক্ত দড়ি পাকাইয়া লাগামের মত ক ি ল এবং তাহার এক অংশ ঘোড়ার মুখের মধ্যে ঢুকাইয়া বাঁধিয়া দিল। ঘোড়াটা কামড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম সুলমা জানে কি করিয়া ঘোড়াকে জব্দ করা যায়। লাগামটা যখন ঠিক মত বাঁধা হইয়া গেল তখন সুলমা একলাফে ঘোড়াটার পিঠে চড়িয়া বসিল। বলিল, ঘোড়ার মুখের লাগাম সাধারণত চামড়ার হয়। মুখের ভেতরের অংশটায় লোহার শিকল থাকে। এ লাগাম বেশিক্ষণ টিকিবে না। তখন আমি উহার ঘাড়ের চুল মুঠো করিয়া ধরিব, উহার গলা জড়াইয়া ধরিব। ঘোড়াটা লাফাইয়া আমাকে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিবে। তোমরা একটা শক্ত দড়ি দিয়া ঘোড়াটার পেটের সঙ্গে আমার কোমর ও উরু শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দাও। দোহা আপত্তি করিল না, যদিও আমি মনে মনে বিব্রত বোধ করিতেছিলাম। দোহা নিজের চাবুকটাও সুলমাকে দিল। সুলমা বলিল, এবার ঘোড়াটাকে খুলিয়া দাও। খুলিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সুলমা ও ঘোড়াটা দিগন্তরেখায় অন্তর্ধান করিল। আমি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। কণ্টকা আমার পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলল, পাপ বিদায় হইল, ও আর ফিরিবে না।

বাকি ঘোড়া দুইটাও কিছুক্ষণ পরে ধরা পড়িল। দোহা সে দুটিকে তাহার 'ফানডি'তে লইয়া গেল।

পরদিন দোহা আমাকে বলিল, দুইজন বিশ্বস্ত লোককে বিদেশের বাজারে পাঠাও। ঘোড়ার সাজ-সরঞ্জাম কিনিয়া আনুক। আমাদেরও ঘোড়ায় চড়া শিখিতে হইবে। আমরাও সুলমার অনুসরণ করিয়া দেখিব ঘোড়ারা কোথা হইতে আসিয়াছে। তাহাদের খুশিমতো চলিতে দিলে তাহাদের নিজেদের দেশেই ফিরিয়া যাইবে। দোহার মতলব শুনিয়া আমার ভয় হইল।

বলিলাম, আমাদের পূর্বপুরুষ থানথিরা ঘোড়া বর্জন করিয়াছিলেন। তুমি ঘোড়ার সহিত কোন সাহসে ঘনিষ্ঠতা করিতে চাহিতেছ? দোহা বলিল, আমরা ঘোড়াকে ডাকিয়া আনি নাই। ঘোড়া নিজে আসিয়াছে। আজকাল অন্যান্য দেশে শুনিয়াছি ঘোড়াকে মানুষ নানা কাজে লাগাইতেছে। বাহন হিসাবে ঘোড়া যে বেশি দ্রুতগামী তাহাতেও কোনো সন্দেহ নাই। দেখিলে না সুলমা কেমন সবেগে চলিয়া গেল? হয়তো থানথিরার আত্মাই আমাদের উপকারের জন্য ঘোড়া তিনটিকে আমাদের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন। হয়তো ইঙ্গিতে আমাদের বলিয়া দিলেন—এইবার তোমরা ঘোড়া ব্যবহার করিতে পার। ঘোড়া ব্যবহার না করিলে বাহিরের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারিবে না। আত্মরক্ষাও হয়তো অসম্ভব হইয়া উঠিবে। শত্রু যদি ঘোড়ায় চড়িয়া আসে তখন ঘোড়ায় চড়িয়াই তাহাদের প্রতিরোধ করিতে হইবে। তিনটি ঘোড়াকে আমাদের রাজ্যে পাঠাইয়া থানথিরা হয়তো এই ইঙ্গিতই করিতেছেন। আর একটা কথা, সকলেই যখন ঘোড়া ব্যবহার করিতেছে তখন আমরা পিছাইয়া থাকিব কেন? ঘোড়ার সমস্ত খবর আমাদের জানিতে হইবে। দেখিলাম ঘোড়ার ব্যাপারে দোহা এত উৎসাহিত হইয়াছে যে তাহাকে বাধা দেওয়া শক্ত। জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের তাহা হইলে কি করিতে বল তুমি?

দোহা বলিল, যাহারা ঘোড়ার জিন লাগাম কিনিতে বিদেশের হাটে যাইবে তাহাদের বলিয়া দিব দুইজন ভালো অশ্বারোহীও তাহারা যেন সন্ধান করিয়া আনে। তাহাদের আমরা বেতন দিয়া এখানে রাখিব। আমাদের সকলকেই ঘোড়া-চড়া শিখিতে হইবে। ঘোড়া-চড়া শিখিয়া আর একটা কাজ করিতে হইবে আমাদের। আমার ইচ্ছা যে ঘোড়া দুইটা আমরা ধরিয়াছি, তাহাদের পিঠে চড়িয়া তুমি এবং আর একজন বাহির হইয়া পড়। ঘোড়াকে নিজের মতে চলিতে দিলে তাহারা যে দেশ হইতে আসিয়াছে সেই দেশে ফিরিয়া যাইবে। সে দেশের হাল চাল কিরূপ, আমাদের সহিত তাহাদের বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব কি না, এ-সব খবর জানা দরকার। তুমি আমাদের দলপতি, তুমিই তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলিতে পারিবে, তাই তোমাকেই যাইতে বলিতেছি।

প্রশ্ন করিলাম, আমার সহিত আর কাহাকে যাইতে বলিতেছ?

সেটা তুমিই ঠিক কর।

তুমিই চল না।

না, আমি যাইব না। প্রথমত, এই ঘোড়া আমার ভার বহন করিতে পারিবে না। দ্বিতীয়ত, আমরা দুইজনেই চলিয়া গেলে ভিংড়া যে কি করিবে তাহা অনিশ্চিত। সে হয়তো রটাইয়া দিবে ঘোড়া দুইটি আমাদের হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমরা আর ফিরিব না। সে-ই তখন দলপতি হইয়া আরও পশু-পক্ষী পুড়াইতে থাকিবে। আমাদের এই জনপদ নষ্ট হইয়া যাইবে। তৃতীয়ত, আমি চলিয়া গেলে বিরানিতে বিশৃঙ্খলা হইবার সম্ভাবনা। তাই আমি যাইব না। আমাকে এখানে থাকিতে হইবে। সেই দিনই আমাদের দুইজন লোক নম্‌রি নামক বিখ্যাত মেলায় ঘোড়ার সাজসরঞ্জাম কিনিতে চলিয়া গেল। অনেক জিনিসপত্র, শস্যসম্ভার, ফল, চামড়া লইয়া সাতটি নৌকাও তাহাদের সঙ্গে গেল। সেকালে আমাদের মুদ্রা ছিল না, দ্রব্যের বিনিময়েই আমরা জিনিসপত্র কেনা-বেচা করিতাম।

ঘোড়ায় চড়া শিখাইবার জন্য যে দুইজন শিক্ষক আসিয়াছিলেন তাহাদের একজনের নাম আবিদ, আর একজনের নাম শরীফ। দুইজনেই বেশ বলিষ্ঠ সুপুরুষ। তাঁহারা আরব অঞ্চলের লোক। বেদুইনদের রক্ত নাকি তাহাদের ধমনীতে প্রবাহিত। আরব দেশের জনৈক অশ্ব-ব্যবসায়ীর ক্রীতদাস তাহারা। খুব প্রভুভক্ত এবং বিশ্বাসী। তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার চালচলন বেশ আভিজাত্যপূর্ণ। কটিবন্ধে সর্বদা ছোরা ও অসি। তাহাদের ঘোড়া দুইটিও চমৎকার। আমাদের ঘোড়ায় চড়া শিখাইবার জন্য তাহাদের প্রচুর গম, অনেক চামড়া, কিছু হরিণের শিং এবং দুইটি বাঘের চামড়া অগ্রিম দিতে হইয়াছিল। তাহাদের মালিক গিয়াসুদ্দিনকে তাহা তাহারা দিয়া আসিয়াছিল। আমাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে আরও কিছু তাহাদের দিব। এ প্রতিশ্রুতিও আমরা দিয়াছিলাম।

দেখা গেল আবিদ এবং শরীফ দুইজনেই ভালো শিক্ষক। তাহারা দুইটি বেশ বড় বড় ঘোড়া আনিয়াছিল। আমাদের দুইটা ঘোড়া আগে হইতেই ছিল। দেখা গেল আমাদের ঘোড়াগুলি বুনো ঘোড়া নয়। বোঝা গেল তাহারা ইতিপূর্বে মানুষের সংস্পর্শে ছিল। আবিদ ও শরীফ তাহাদের মুখে লাগাম এবং পিঠে জিন দিয়া চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পর আমাদের শিক্ষা শুরু হইল। আমরা অনেকেই তাহাদের নিকট ঘোড়ায় চড়া শিখিলাম। দোহাও তাহাদের বড় উঁচু ঘোড়াটায় চড়িল একদিন। কয়েক দিনের মধ্যেই ভালো ঘোড়-সোয়ার হইয়া উঠিল সে। আবিদ এবং শরীফ দুইজনেই তাহার নৈপুণ্যের প্রশংসা করিল। কিন্তু এ-কথাও বলিল, দোহা ছোট ঘোড়ায় চড়িতে পারিবে না। তাহার জন্য বড় বলিষ্ঠ ঘোড়া চাই। বলিল, তাহারা বড় ঘোড়া আনিয়া দিবে কিন্তু তাহার

পরিবর্তে দুইটি বাঘের চামড়া এবং ভালুকের চামড়া দিতে হইবে। দোহার ভাণ্ডারে চামড়ার অভাব ছিল না। কিন্তু দোহা এখনই বড় ঘোড়া কিনিতে রাজি হইল না। বলিল, এখন আমি ঘোড়ায় চড়িয়া কোথাও যাইব না। যখন প্রয়োজন হইবে, তখন গিয়াসুদ্দিনের নিকট লোক পাঠাইব।

আমরা অনেকেই ঘোড়ায় চড়া শিখিলাম। শুধু পুরুষেরা নয়, মেয়েরাও। আমাদের একঘেয়ে জীবনযাত্রায় ঘোড়া যেন একটা নূতন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিল। দলে দলে ছেলেমেয়েরা আবিদ ও শরীফের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়িল। কণ্টকা অল্প দিনেই ভালো অশ্বারোহিণী হইল একজন। সে ধনুর্বাণেও খুব দক্ষ ছিল। উড়ন্ত পাখিকে সে তীরবিদ্ধ করিয়া মাটিতে নামাইয়া আনিতে পারিত।

মাস তিনেকের মধ্যে আমাদের শিক্ষাপর্ব সমাপ্ত হইল। দম নামক যুবকটিও ঘোড়ায় চড়া ভালো করিয়া শিখিয়াছিল। দোহা আর একদিন যখন আমাকে তাগাদা দিল, এইবার তুমি ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়া পড়, দেখ ঘোড়া তোমায় কোথায় লইয়া যায়, তখন ঠিক করিলাম দমকে সঙ্গে লইয়াই বাহিরে যাইবে। কণ্টকা কিন্তু কিছুতেই ছাড়িল না। বলিল, আমার সঙ্গে সে-ই যাইবে। আর কাহারও যাইবার প্রয়োজন নাই। দোহা আমাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল, যুবতী স্ত্রীলোক লইয়া পথ চলা নিরাপদ নহে। কণ্টকা কিন্তু কিছুতেই নিরস্ত হইল না। বলিল, তুমি চলিয়া গেলেই ভিংড়া আমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। তখন আমাকে রক্ষা করিবে কে? দোহা যদি আমাকে তাহার বিরানি জঙ্গলে লুকাইয়া রাখে তাহা হইলে আমি নির্ভয়ে থাকিতে পারি। এই বলিয়া দোহার পানে চাহিয়া সে মুচকি হাসিতে লাগিল। দোহা এ প্রস্তাবে রাজি হইল না। সুতরাং তাহাকে সঙ্গেই লইতে হইল। দম আমাদের পিছু পিছু হাঁটিয়া চলিল। প্রায় শতখানেক ক্রীতদাসও দমের সহিত রহিল। আমি আর কণ্টকা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হইয়া বসিলাম। কণ্টকার পিঠে তীর-ধনুক বাঁধা, কোমরে ছোরা, মাথায় বাজপাখির পালক দিয়া প্রস্তুত একটা শিরস্ত্রাণ। সে পুরুষের বেশই ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু পীবর স্তন দুইটিকে লুকাইতে পারে নাই।

আমরা ঘোড়ার লাগাম ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। ঘোড়া দুইটি নিজের খুশিমত চলিতেছিল। দেখিলাম তাহারা পশ্চিম দিকেই চলিতেছে। দূরে আকাশের গায়ে পর্বতশ্রেণী দেখা গেল। শুনিয়াছি পর্বতের ওপারে মরুভূমি আছে। একটু পরে ঘোড়া দুটি পাহাড়ের দিকেই মুখ ফিরাইল। দেখিলাম তাহারা পাহাড়ের ক্রমোচ্চ ঢালু পথ বাহিয়া উপরে উঠিতেছে। খুব সাবধানে পদক্ষেপ করিয়া তাহারা ক্রমশ উপরে উঠিতে লাগিল। আমরা তাহাদের বাধা দিলাম না। খানিকক্ষণ পরে আমরা একটা উপত্যকার মত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। চারিদিকে ছোট-বড় পাহাড়, মাঝখানটা সমতল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, ঠিক করিলাম রাত্রে আর পাহাড়ে উঠিব না। ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলাম। কাছেই ঘাস ছিল, ঘোড়া দুটি চরিতে লাগিল। কণ্টকা আমার পাশে বসিয়াছিল। হঠাৎ সে তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল। তাহার পর আমার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়া একটি নাতি-উচ্চ পর্বতশৃঙ্গের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। দেখিলাম শৃঙ্গের ঠিক নীচেই একটি পুষ্টকায় রোমশ ছাগল দাঁড়াইয়া আছে। কণ্টকা আমার অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া মাটিতে শুইয়া সরীসৃপের মত ছাগলটির দিকে অগ্রসর

হইতে লাগিল। বুঝিলাম তাহার শিকারের স্পৃহা জাগিয়াছে। খুশিই হইলাম। যদি ছাগলটাকে মারিতে পারে কিছু ভালো টাটকা মাংস পাওয়া যাইবে। দমের সহিত ক্রীতদাসরা আমাদের জন্য যে খাদ্য আনিতেছে তাহাতে মাংস নাই। কণ্টকা একটু পরে একটি উঁচু টিলার অন্তরালে ঢাকা পড়িয়া গেল। আমি একা বসিয়া রহিলাম। একটু পরে দলবল লইয়া দম আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে বলিলাম, কণ্টকা ছাগল শিকার করিতে গিয়াছে। তুমি এইখানেই আমাদের তাঁবুটা ফেল আর আগুন জ্বালাও। রাতটা এখানেই কাটানো যাক। দম বলিল, আমাদের তাঁবুর গাড়িটা পিছাইয়া পড়িয়াছে। আসিয়া পৌঁছিতে কিছু বিলম্ব হইবে। আমি ততক্ষণ কাঠ যোগাড় করিয়া, আগুন জ্বালাই। নিকটেই একটি শুষ্ক গাছ ছিল, সে তাহারই ডালপালা কাটিতে লাগিল। আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম ছাগলটা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেখানে নাই। কণ্টকাকেও দেখা যাইতেছে না। ঘনায়মান অন্ধকারে উপত্যকার চতুর্দিক হইতে নানারকম অদ্ভুত শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। সম্ভবত পাহাড়ি কীটপতঙ্গ ও নিশাচর পাখিদের শব্দ। মনে হইল যেন একটা ভিন্ন জগতে আসিয়াছি। কয়েকটা পাখির তীব্র চিৎকার শুনিলাম। এ ডাক আগে কখনও শুনি নাই। মনে হইল পাখিগুলি বোধহয় এ অঞ্চলেরই বিশেষ অধিবাসী। একটা তীব্র গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। গন্ধটা সম্ভবত ফুলেরই গন্ধ, কিন্তু অচেনা। কিন্তু কণ্টকা কোথা গেল? টিলার ওপারে সহসা একটা আর্ত চিৎকার শুনিতে পাইলাম। আমাদের তাঁবুর গাড়ি তখনও আসে নাই। সে গাড়িতে কিছু মশাল ছিল, অস্ত্রশস্ত্রও ছিল। আমি কিন্তু গাড়ির অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। যেদিক হইতে চিৎকারটা আসিয়াছিল, সেই দিকে ছুটিয়া গেলাম। দমকে বলিলাম একটা জ্বলন্ত কাঠ লইয়া আমার অনুসরণ করিতে। টিলার ওপারে গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে চক্ষুস্থির হইয়া গেল। দেখিলাম বাণবিদ্ধ মৃত ছাগলটা পড়িয়া আছে এবং তাহার পাশে দুই জন দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতেছে। জ্বলন্ত মশালের আলোতে দেখিলাম কণ্টকা একটি দাড়ি-গোঁফওলা লোকের বুকে চড়িয়া বসিয়া আছে। তাহার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত।

একি কাণ্ড কণ্টকা?

আমি ইহার বুকে ছুরি বসাইয়া দিয়াছি।

সে কি? লোকটা কে?

আমি জানি না। আমি যখন ছাগলটাকে মারিয়াছি তখন লোকটা হঠাৎ ওই পাহাড়ের উপর হইতে নামিয়া বলিল, এ আমাদের ছাগল, তুমি মারিয়াছ কেন? তোমাকে এবং এই ছাগলটিকে লইয়া আমি আমাদের দলপতির কাছে যাইব। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের দলপতি কোথায় থাকেন? সে বলিল, পাহাড়ের ওপারে যে মরুভূমি আছে সেই মরুভূমির তিনি মালিক। সেইখানে তোমাকে যাইতে হইবে। এই বলিয়া, সে আমার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। বুঝিলাম তাহার মতলব ভালো নয়। এক ধাক্কায় তাহাকে সরাইয়া দিলাম। তাহার পরই যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ঠিক যুদ্ধ নয়, আমি ছুটিয়া পলাইতেছিলাম সে আমাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল। হঠাৎ একবার সে আমাকে ধরিয়া ফেলিল। আমি তাহার হাতে কামড়াইয়া দিতেই সে আবার আমার হাত ছাড়িয়া দিল। তখন আমি ছুটিয়া গিয়া একটা বড় পাথর তুলিয়া তাহার মাথা লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া দিলাম। পাথরটা মাথায় লাগিতেই লোকটা পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমি তাহার বুকে চড়িয়া বসিয়া ছোরা বসাইয়া দিয়াছি। ভালো করি নাই? এ ছাড়া উপায়ই বা কি ছিল? আমি বলিলাম, এখন উঠিয়া এস। দম ছাগলটাকে টানিয়া লইয়া চলুক এবং ওটাকে আগুনে ঝলসাইয়া ফেলুক। লোকটা ওখানেই পড়িয়া থাক।

তাঁবুর গাড়িটা আসিয়া পড়িয়াছিল। তাঁবুটা আমরা বিদেশের হাট হইতে আমদানী করিয়াছিলাম। পশুর লোম ও মোটা সূতা দিয়া প্রস্তুত। অন্ধকার হইলে তাঁবুটা খাটাইয়া রাত্রিবাস করিব বলিয়াই তাঁবুটা আনিয়াছিলাম। কিন্তু কণ্টকা যে কাণ্ডটা করিয়া বসিয়াছে তাহার পর এখানে তাঁবু খাটাইয়া থাকা নিরাপদ মনে হইল না। গাড়িতে মশাল ছিল তাহাই বাহির করিয়া জ্বালানো হইল। দম একটু দূরে একটা অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া গোটা ছাগলটাকেই ঝলসাইতে লাগিল। লোম-পোড়ার বিশ্রী গন্ধ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল এই গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া কেহ না আসিয়া পড়ে। কিছুক্ষণ পরে ঘন অন্ধকারে একটা শব্দ ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

দম বলিল, দূরে বোধহয় একটা ঝরনা আছে। তাহারই শব্দ।

কণ্টকা সোৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বলিল, রক্তে আমার সর্বাঙ্গ মাখা। আমি ঝরনায় স্নান করিয়া আসি। দম তুমি আমার সঙ্গে চল। কণ্টকাকে মানা করা বৃথা। সে মানা শুনিবে না। সে খামখেয়ালী। তাহার সাহসেরও অভাব নাই। তাহার চরিত্রে সামান্য দূরদর্শিতা থাকিলে সে এই অজানা জায়গায় অন্ধকার রাত্রে ঝরনায় গিয়া স্নান করিতে চাহিত না। বিশেষত, যখন একটু আগে একটা খুন হইয়া গিয়াছে এবং যে ছাগলটার পোড়া-গন্ধে চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে সেটা আমাদের সম্পত্তি নহে, তখন আমাদের একটু সতর্ক থাকা উচিত। কিন্তু অসমসাহসিকা কণ্টকা বিপদের মধ্যেই ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়। সম্ভবত মনে করে তাহার যৌবন তাহাকে সর্ব বিপদ হইতে রক্ষা করিবে। যৌবন যে বিপদকে ডাকিয়াও আনিতে পারে এ জ্ঞান যে তাহার নাই তাহা নহে, কিন্তু সে বোধহয় মনে করে যৌবনের ছলা-কলার সাহায্যে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার ক্ষমতাও তাহার আছে।

কণ্টকা চলিয়া যাইবার পর আমি খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। আমাদের ক্রীতদাসরাও আগুনের চারপাশে বসিয়া রহিল। আমাদের ঘোড়া দুইটি নিকটেই চরিতেছিল। আমার হঠাৎ মনে হইল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া লাভ কি? বরং একটু ঘুরিয়া-ফিরিয়া জায়গাটা কি রকম দেখা যাক। আমরা পর্বতের একটা উপত্যকার মধ্যে ছিলাম। কাছে দূরে পর্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছিল। শুনিয়াছিলাম পর্বতের ওপারে মরুভূমি আছে। আমি একটা ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। দুইজন ক্রীতদাসকে বলিলাম আমার অনুসরণ করিতে। উপত্যকার প্রান্তে আসিয়া দেখিলাম সেই মৃত লোকটি নাই। ঘোড়াটা একটা পাহাড়ের পথ ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিল।... কিছু দূর উপরে উঠিয়া মনে হইল দূর হইতে একটা সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে। পুরুষ-কণ্ঠের সঙ্গীত। সঙ্গীতের ভাষা বুঝিতে পারিলাম না। দূর হইতে সঙ্গীতের সব কথাও শোনা যাইতেছিল না। কিন্তু সে সঙ্গীতের আবেগ এমনই প্রবল এবং সে আবেগের আবেদন এত মর্মস্পর্শী যে, তাহা আমাকে সেই দিকে লইয়া চলিল, মনে হইল সঙ্গীত তাহাকেও যেন আকর্ষণ করিতেছে।

পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া দেখিলাম চাঁদ উঠিতেছে। আর পাহাড়ের চূড়ার ঠিক নীচেই রহিয়াছে একটি তাঁবু। তাঁবুর চারিদিক খোলা, তাঁবুর ছাদ গম্বুজাকৃতি হইয়া আকাশকে যেন খোঁচা মারিতেছে। চারদিকে চারটি মোটা কাঠের থাম, তাঁবুর মাঝখানেও একটি মোটা কাঠের থাম। পাঁচটি থামের উপরই মনে হইল তাঁবুটি বিস্তৃত রহিয়াছে। দেখিলাম তাঁবুর মধ্যে যে থামটি রহিয়াছে তাহাতে ঠেস

দিয়া বসিয়া একটি বলিষ্ঠ ব্যক্তি গান গাহিতেছে। তাহার হাতে একটি একতারা। একতারার নিম্নভাগটা একটু অদ্ভুত ধরনের। সহসা মনে হয় মানুষের খুলি দিয়া প্রস্তুত। আমরা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার গান থামিয়া গেল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল—সম্ভবত জানিতে চাহিল—আমরা কে। কিন্তু তাহার ভাষা আমরা বুঝিলাম না। কোনো উত্তর দিতে পারিলাম না। কিন্তু আমাদের রীতি অনুসারে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহাকে অভিবাদন করিলাম। সে-ও ঝুঁকিয়া অভিবাদন করিল আমাকে। তাহার পর মুখে তর্জনী ঠেকাইয়া এবং তর্জনীটি দূরে লইয়া গিয়া সে ইঙ্গিতে যাহা জানাইল তাহা হইতে অনুমান করিলাম সে আমাকে কথা বলিতে অনুরোধ করিতেছে। কথা বলিলাম এবং পরমুহূর্তেই আশ্চর্য হইয়া গেলাম। সে আমাদের ভাষাতেই উত্তর দিল। দেখিলাম সে আমাদের ভাষা জানে এবং আরও কয়েক রকম ভাষা তাহার আয়ত্ত। তাহাকে বলিলাম,আপনার গান শুনিয়াই আমরা এখানে আসিয়াছি। গানের ভাষা বুঝি নাই, গানের সুরই আমাদের টানিয়া আনিয়াছে। আপনার বন্ধুত্ব কামনা করি। আপনার পরিচয় জানিতে পারিলে আনন্দিত হইব।

তখন সে বলিল—আমার নাম তিরখন। সর্দার মালেকের আমি ভৃত্য।

সর্দার মালেক কে?

তিনি এই মরুভূমির অধিপতি।

কোন মরুভূমি?

যতদূর দৃষ্টি চলে চাহিয়া দেখুন। এ সমস্তই সর্দার মালেকের। দৃষ্টির ওপারেও খানিকটা জমি তিনি সম্প্রতি দখল করিয়াছেন। সেখানে এখনও লড়াই চলিতেছে। তেমুজিন খাঁ বন্দি হইয়াছে কিন্তু তাঁহার স্ত্রী শিকারা এখনও লড়িতেছে। তাহার সাহায্যে নাকি খেখুন সম্প্রদায়ের লোকেরা আসিয়াছে।

আপনি এখানে কি করিতেছেন?

আমি সীমান্তরক্ষী। সীমান্তে শত্রু হানা দিলে আমি তূর্যধ্বনি করি।

মরুভূমির মধ্যে বালিয়াড়ির আড়ালে কিছু সৈন্য আত্মগোপন করিয়া থাকে।

তূর্যধ্বনি শুনিলেই তাহারা ছুটিয়া আসে। এই দেখুন আমার তূর্য।

পাশেই প্রকাণ্ড বাঁশির মত একটা জিনিস রাখা ছিল। সেইটা তুলিয়া দেখাইল।

আপনি এতক্ষণ যে গান গাহিতেছিলেন তাহার সুর অতি চমৎকার। কিন্তু সে গানের ভাষা আমি বুঝিতে পারি নাই। বিষয়টা কি, যুদ্ধ নাকি? কিন্তু অনুমান করিতেছি যুদ্ধের উদ্দীপনা উহাতে নাই। আছে কোমল মধুর ভাব একটা।

তিরখন কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর মৃদু হাসিয়া যাহা বলিল তাহাতে বুঝিলাম সে সাধারণ মানুষ নহে, সে কবি।

বলিল, আমার গানের বিষয় আমার অন্তরের হাহাকার। একদিন যাহা ছিল এখন যাহা নাই, তাহার জন্য হাহাকার। অতি বাল্যকালে মঙ্গোলিয়ায় দিগন্তবিস্তৃত পীতাভ উঁচু-নীচু বালিয়াড়ি আর লম্বা লম্বা ঘাসের জঙ্গলে, মরুভূমির ঘূর্ণিঝড়ের তপ্ত আবহাওয়ায় মরীচিকাময় স্বাধীনতার মধ্যে আমি দিন কাটাইয়াছি। ওই আবহাওয়াতেই আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম এক হুন পরিবারের ক্রোড়ে। হুনরা যুদ্ধপ্রিয়। পরস্পরের মধ্যে মারামারি করাই তাহাদের স্বভাব। অপরের ধনসম্পত্তি লুটপাট করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করে তাহারা। একদল হুন আর একদলকে আক্রমণ করিতেছে ইহা তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এই রকম একটা মারামারির সময় আমি শত্রুপক্ষের হাতে ধরা পড়ি। তাহারা

আমাকে মারিয়া ফেলে নাই। অনেক ক্ষুধার্ত হুন মানুষের মাংসও খায়। তাহারা ইচ্ছা করিলে আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারিত। কিন্তু মারে নাই। আমার বয়স তখন ষোল বৎসর। আমাকে যাহারা হরণ করিয়া আনিয়াছিল তাহারা আর একটি যুদ্ধে আর একটি পরিবার হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছিল রিরিকে। দশ বছরের মেয়ে রিরি। চোখ দুটি ছিল হরিণীর চোখের মত। ছিপছিপে পাতলা গড়ন। গায়ের রং অদ্ভুত রকম উজ্জ্বল বাদামি। সে রকম উজ্জ্বল বাদামি রং দেখা যায় না। আমি তো আর দেখি নাই। ফরসা নয়, কালো নয়, সে ছিল উজ্জ্বল বাদামি। মাথায় কালো ভ্রমরকৃষ্ণ চুল। মাথার চুল মুখের খানিকটা ঢাকিয়া গুচ্ছে গুচ্ছে নামিয়া আসিয়া কাঁধের উপর পড়িয়াছে। অদ্ভুত সুন্দরী ছিল রিরি। কিন্তু ওই সুন্দর সুকোমল রিরির উপর যে অকথ্য অত্যাচার হইত তাহা যেমন অশ্লীল, তেমনি নিষ্ঠুর। রিরি একদিন গভীর রাত্রে আমাকে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, চল পালাই। সেদিন খুব শীত ছিল। একটা তীব্র হাওয়াও বহিতেছিল। অন্ধকারে মরুভূমির উপর দিয়া আমরা ছুটিতে লাগিলাম। না ছুটিলে সেই শীতে জমিয়া আমাদের মৃত্যু হইত। অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইতেছিলাম না, তবু ছুটিতেছিলাম। অবশেষে একটা জঙ্গলের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম। জঙ্গলের ভিতর কিছুদুর গিয়া দেখিলাম রিরি নাই। আস্তে তাহারা নাম ধরিয়া ডাকিলাম, কোনো সাড়া পাইলাম না। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, সে আসিল না। একটু পরেই কিন্তু ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পাইলাম। বুঝিলাম হুনের দল ছুটিয়া আসিতেছে আমাদের ধরিবে বলিয়া। একটু পরেই রিরির আর্তনাদ শুনিতে পাইলাম। তাহার পর আর্তনাদটা হঠাৎ থামিয়া গেল। তাহারা উহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল, কি মারিয়া ফেলিল, বুঝিতে পারিলাম না। আমাকে ধরিবার জন্যও তাহারা বনটা তোলপাড় করিয়া বেড়াইল খানিকক্ষণ। কিন্তু আমাকে ধরিতে পারিল না। সেই ঘাসের জঙ্গলে আমি এমনভাবে আত্মগোপন করিয়াছিলাম যে তাহারা আমাকে ধরিতে পারে নাই। আমার নাগাল পাইলে ধরিত, কিন্তু নাগালই পায় নাই। আমি বালির মধ্যে নিজের দেহটাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিলাম। তাহার উপর ঘাসের জঙ্গল ঘন হইয়াছিল। তাহারা আমাকে দেখিতে পায় নাই। তাহারা যখন চলিয়া গেল তখনও আমি অনেকক্ষণ সেই বালু-স্তূপের নীচে পড়িয়া রহিলাম। মনে হইতেছিল শীতে বুঝি জমিয়া যাইব। কিন্তু যাই নাই, বালুর আবরণ আমাকে রক্ষা করিয়াছিল। চতুর্দিক যখন নিস্তব্ধ হইয়া গেল তখন আমি সন্তর্পণে বালুর স্তর হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিলাম। তখনও বেশ অন্ধকার। মাথার উপর দিয়া একঝাঁক পাখি ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল। বুঝিলাম প্রভাতের আর বিলম্ব নাই। ভাবিলাম অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই এই হুনদের এলাকা পার হইয়া অন্য এলাকায় যাইতে হইবে। কালবিলম্ব না করিয়া আবার ছুটিতে শুরু করিলাম। কিছুদিন পরে আবার একদলের হাতে ধরা পড়িলাম। হুনেরা নানা দল মরুভূমিকে নানাভাবে ভাগ করিয়া বাস করে। এক এলাকা পার হইলে অন্য এলাকার লোকেদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হয়। সেখানে ক্রীতদাসের মত থাকিতে হয়। থাকিতে পারিলে আহার আশ্রয় দুই পাওয়া যায়। কিন্তু এক জায়গায় বেশি দিন থাকা যায় না। এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় বার বার পলাইতে হইয়াছে। কারণ কোথাও স্নেহের সাগ্রহ বাহু আমাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহে নাই। একমাত্র রিরিই আমাকে ভালোবাসিয়াছিল। কিন্তু তাহা শেষ হইয়া গেল। সারা জীবনটাই কষ্টে কাটিয়াছে। জীবনে অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট, অনেক হাহাকার জমিয়া আছে। সেই সবই মাঝে মাঝে বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া গান রূপে মূর্ত হয়। আজ রিরির কথা মনে পড়িতেছিল। আর মনে পড়িতেছিল আমার-বাল্যজীবনের কথা। মনে পড়িতেছিল সেই গোবি মরুভূমিকে যাহার ক্রোড়ে একদা জন্মলাভ

করিয়াছিলাম। বড় বড় হ্রদের পাশে নলখাগড়ার বন, সেখানে নানা রকম পাখিদের আনা-গোনা, মনে পড়িতেছিল সেই বৈকাল হ্রদের তীরে কি বড় বড় পাখিই না দেখিয়াছিলাম, মনে পড়িতেছিল সেই দিগন্তবিস্তৃত বিস্তারকে, বালিয়াড়ির উঁচু-নীচু অদ্ভুত সৌন্দর্যকে, মেঘহীন আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীকে। আমার গানের সুরে ইহাদের কথাই ধ্বনিত হইতেছিল। তাহা ভীষণ অথচ সুন্দর, মৃদু অথচ কঠিন। ভাষায় তাহা অবর্ণনীয়, সুরেই তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়। আর মনে পড়িতেছিল আমার মাকে। তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। আমার মুখ তিনি কখনও দেখেন নাই। সর্বদাই আমার মুখে হাত বুলাইয়া দেখিতেন, সর্বদাই আমাকে বুকে আঁকড়াইয়া থাকিতেন। তাঁহার বুক হইতেই একবার এক দস্যু আমাকে ছিনাইয়া লইয়া আসিয়াছিল। আমার বাবাকে আমি দেখি নাই। আমার জন্মের পূর্বেই এক খণ্ডযুদ্ধে তিনি মারা যান।

তিরখন চুপ করিল।

আমি তখন বলিলাম, আমি আপনার নিকট একটি পরামর্শ চাই।

তিরখন উত্তর দিল—তৎপূর্বে আপনার পরিচয় দিতে হইবে।

'আমার নাম টালা। এই পাহাড়ের নীচে পূর্বদিকে নদীতীরে যে সমস্ত জমি আছে সেখানে আমাদের দল বহুদিন হইতে বাস করিতেছে। আমি তাহাদের দলপতি। আমরা জমিতে ফসল ফলাই। আমাদের নৌকা সে ফসল দূরদেশে লইয়া যায়। কয়েকদিন আগে কয়েকটি ঘোড়া আমাদের অঞ্চলে আসিয়াছিল। আমরা তাহাদের ধরিয়াছি, তাহাদের পিঠে চড়িয়াই এখানে আসিয়াছি। তাহাদের লাগাম ছাড়িয়া দিয়াছিলাম তাহারাই আমাদের এখানে লইয়া আসিয়াছে। কিছুক্ষণ আগে আমরা এই পাহাড়ে উপত্যকায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আমার স্ত্রী কণ্টকা শিকার-প্রিয়। এই উপত্যকায় সে একটি ছাগল দেখিয়া সেটিকে তীরবিদ্ধ করে। তাহার পরই পাহাড়ের অন্তরাল হইতে একজন আসিয়া বলে, আমার ছাগল তুমি মারিলে কেন? এই লইয়া উভয়ের কলহ হয়। লোকটি নাকি কণ্টকাকে আক্রমণ করিয়াছিল। বলিয়াছিল তাহাকে বন্দি করিয়া দলপতির কাছে লইয়া যাইবে। কণ্টকা আত্মসমর্পণ করিবার পাত্রী নয়। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কণ্টকা ছুরিকাঘাতে লোকটিকে মারিয়া ফেলিয়াছে। আমি তখন সেখানে ছিলাম না। সব শুনিয়া সেখানে গেলাম, দেখিলাম মৃতদেহটি নাই। হয় সে মরে নাই, কিংবা তাহার মৃতদেহ কেহ তুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

তিরখন প্রশ্ন করিল, মৃত ছাগলটা কোথা?

সেটাকে আমরা ঝলসাইতেছি। আপনি যদি অনুমতি করেন কিছু মাংস আপনাকেও আনিয়া দিব। ছাগলটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট। আপনি এখন পরামর্শ দিন এ অবস্থায় আমাদের এখন কি করা উচিত।

তিরখন নিজের দাড়ির মধ্যে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ কোনো উত্তর দিল না। আমি সৌৎসুকে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। অবশেষে সে যাহা বলিল তাহা দুশ্চিন্তা বাড়াইয়া দিল, কমাইল না।

বলিল, আপনারা যাহা করিয়াছেন তাহা যদি সর্দারের কর্ণগোচর হইয়া থাকে তাহা হইলে ভয়ানক কাণ্ড হইবে। আপনাদের ধ্বংস না করা পর্যন্ত তাঁহার রাগ কমিবে না। তিনি অত্যন্ত রাগী লোক। আমি আপনাকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছি একথা তিনি যদি শোনেন তাহা হইলে আমারও সমূহ বিপদ। হয়তো আমার মুণ্ডচ্ছেদেরই আদেশ দিবেন।

প্রশ্ন করিলাম, এ ছাগলটা কি সর্দারের?

'সম্ভবত তাঁহারই। তাঁহার একটি সদ্য-বিবাহিতা বেগমের মনোরঞ্জনের জন্য এখানে আজ একটি উৎসব হইতেছে। সে জন্য কিছু ছাগল বাহির হইতে আনানো হইয়াছে। সর্দার এখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে। কিন্তু কথা আছে রাত্রে যুদ্ধ শেষ করিয়া সর্দার আসিয়া সদলবলে উৎসবে যোগ দিবেন। বিরাট ভোজের আয়োজন হইয়াছে। অনেক মাংস চাই। দুইটি উটও মারা হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, দল হইতে একটা ছাগল ছিটকাইয়া বোধহয় পলাইয়া আসিয়াছিল। আপনার পত্নী সেইটাই মারিয়াছেন। ছাগলের রক্ষকটি মরে নাই, গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। একটু আগে এই পথেই তাহাকে তাঁবুতে লইয়া গিয়াছে। সম্ভবত তাহার মুখেই সর্দার সব খবর পাইবেন।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি লোক আসিয়া হাজির হইল। বলিল, ছাগলের রক্ষকটি মারা গিয়াছে।

তিরখন তাহাকে প্রশ্ন করিল, সর্দার কখন আসিবেন?

খবর আসিয়াছে তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া রওনা হইয়াছেন। শীঘ্রই আসিয়া পড়িবেন।

আচ্ছা তুমি যাও, সর্দার আসিলে আমাকে খবর দিও। লোকটি সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইল। তাহার পর চলিয়া গেল।

তিরখন তখন আমাকে বলিল, আপনাকে দেখিয়া আমার ভালো লাগিয়াছে। আপনার কথাবার্তাও ভালো। সুতরাং আপনার প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিব। আমাদের সর্দার অত্যন্ত নিষ্ঠুর লোক। বন্দিদের প্রতি তিনি কিছুমাত্র দয়া করেন না। সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করিয়া ফেলেন। আমার আশঙ্কা, আপনারও সেই দশা হইবে। কারণ, আপনি যখন আমার নাগালের মধ্যে আসিয়াছেন তখন আপনি আর পলাইতে পারিবেন না। পলাইতে চেষ্টা করিলে আমি তূর্যধ্বনি করিব। সঙ্গে সঙ্গে সেনারা আসিয়া আপনাকে বন্দি করিয়া ফেলিবে। আপনাকে আমি ছাড়িয়াও দিতে পারি না, কারণ মালিকের কাজে ফাঁকি দেওয়া আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ। কিন্তু আপনি যদি কয়েকটি মিথ্যা কথা বলিতে প্রস্তুত থাকেন এবং আপনার পত্নীও যদি তাহা সমর্থন করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে বাঁচাইবার একটা উপায় বাহির করিব। সম্ভবত, বাহির করিতে পারিব। যে ছাগলটা মারিয়াছেন সেটা কোথায়?

সেটা ঝলসানো হইতেছে।

'সেটাকে গোটাই লইয়া আসুন। আপনার পত্নীকেও আনুন। তাহার পর ওই ঝলসানো ছাগলটা লইয়া আমরা সর্দারের দরবারে যাইব। আমি বলিব, আপনার এই উৎসবে ইনি একটি ঝলসানো ছাগল উপহার আনিয়াছেন। ইনি পাহাড়ের ওপাশের জনপদের মালিক। ইনি আপনার বন্ধুত্ব কামনা করেন। পাহাড়ের ওপাশে বিস্তৃত সমতল আছে সেখানে ইঁহারা চাষ করেন। ইনি দলপতি। আমাদের দলের একটি লোক ইঁহার পত্নীর সহিত অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিয়াছে। সে নাকি ইঁহাকে ধর্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু ইঁহার হাতে শাণিত অস্ত্র ছিল। আত্মরক্ষার জন্য তিনি লোকটির বুকে ছোরা বসাইয়া দিয়াছেন। লোকটি মারা গিয়াছে। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। কিন্তু তবু ইঁহারা আশা করিতেছেন যে সমস্ত শুনিয়া আপনি ইহাদের ক্ষমা করিবেন। আমি এই সব কথা যখন বলিব তখন আপনি ও আপনার পত্নী মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া হাতজোড় করিয়া বসিয়া থাকিবেন।

এ সব কথা আমার ভালো লাগিতেছিল না। আমার আত্মসম্মান যেন ক্ষুণ্ণ হইতেছিল। কিন্তু দেখিলাম এ অবস্থায় এই দুর্ধর্ষ সর্দারের বিরুদ্ধাচরণ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। বিরুদ্ধাচরণ করাটাও সুবুদ্ধির কাজ হইবে না। আমাদের লোকবল কম। তাছাড়া আমরা যুদ্ধেও পারদর্শী নই। এই সামান্য ব্যাপারের জন্য আমাদের সমগ্র জনপদকে বিপন্ন করা উচিত নয়।

তিরখন বলিল, আপনি ফিরিয়া যান। ছাগলটাকে আর আপনার পত্নীকে লইয়া আসুন। বেশি বিলম্ব করিবেন না। আমি আপনার ওপর বিশ্বাস করিয়াই আপনাকে যাইতে দিতেছি। কিছুক্ষণের মধ্যে যদি আপনি ফিরিয়া না আসেন সৈন্য ডাকিয়া আপনাকে ধরিয়া আনিব।

আমি আবার অশ্বারোহণে ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিয়া দেখি কণ্টকা দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া সর্বাঙ্গ দোলাইয়া নৃত্য করিতেছে। ঝরনায় স্নান করিয়া খুব আনন্দ হইয়াছে তাহার।

কি সুন্দর ঝরনাটা। সর্বাঙ্গ জুড়াইয়া গিয়াছে। এস এবার খাওয়া-দাওয়া করা যাক।

খাইব কি, মাথায় বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ছাগলটা স্পর্শ করিও না। মহা বিপদে পড়িয়াছি। সর্দারের ছাগল মারিয়াছ। এখন খাওয়া-দাওয়া থাক, চল সকলে সর্দারের কাছে যাই। তিনি যদি ক্ষমা করেন তবেই আমরা রক্ষা পাইব। চল দেরি করিও না—

তিরখন যাহা বলিয়াছিল কণ্টকাকে সব বলিলাম। কণ্টকা বলিল, আমি যাইব না।

না গেলে বিপদ আছে। সমূহ বিপদ। সর্দার যদি সসৈন্যে আমাদের তাড়া করেন আমরা ধরা পড়িয়া যাইব। ধরা পড়িলে শাস্তি মৃত্যু। সর্দার নাকি মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অন্য দণ্ড দেন না। চল না, দেখিয়াই আসি ব্যাপারটা কি।

চল, কিন্তু আমি যাহা করিব তাহাতে বাধা দিও না।

কি করিবে?

অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিব।

বিরাট মরুভূমির মধ্যে সর্দারের সভা বসিয়াছিল একটা প্রকাণ্ড সামিয়ানার নীচে। সর্দার প্রশস্ত একটা সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। তাঁহার পাশে বসিয়াছিলেন তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী ভুলেরা। অগ্নিশিখার মত চেহারা। ধবধবে ফরসা রং, গায়ে লাল রঙের ওড়না। সর্বাঙ্গে লাল পাথরের গহনা চকমক করিতেছে। দেখিলাম সর্দারের সম্মুখে কিছু দূরে নরমুণ্ড স্তূপীকৃত রহিয়াছে। যুদ্ধে কিছু পূর্বে যাহাদের বন্দি করা হইয়াছিল তাহাদের হত্যা করা হইয়াছে। মুণ্ড-নিঃসৃত রক্তের ধারায় খানিকটা জায়গা ভিজিয়া গিয়াছে। সর্দার গম্ভীর মুখে বসিয়া ছিলেন। মুখে সামান্য একটু ভ্রূকুটি। চোখের দৃষ্টি জ্বলন্ত। কোমরে প্রকাণ্ড একটা বাঁকা তলোয়ার। অঙ্গে বহুমূল্য পোশাক। তাঁহার ঘনকৃষ্ণ চাপ-দাড়ি এবং গুম্ফ সত্যই ভীতিপ্রদ। মনে হইতেছিল একটা মনুষ্য-রূপী সিংহ যেন বসিয়া আছে। সর্দারের দুই পাশে এবং পিছনে বহু সশস্ত্র সৈনিক।

তিরখন কুর্নিশ করিতে করিতে তাঁহার নিকট গেল এবং আমাদের কথা তাঁহার কাছে নিবেদন করিল। আমার কয়েকজন ক্রীতদাস ঝলসানো ছাগলটা লইয়া কিছু দূরে দাঁড়াইয়াছিল। ছাগলটি রাখিবার জন্য তিরখন প্রকাণ্ড একটি কারুকার্যমণ্ডিত থালা দিয়াছিল। তিরখন ইঙ্গিত করিতেই তাহারা সেটি আনিয়া সর্দারের পদপ্রান্তে স্থাপন করিয়া আমাদের প্রথামতো প্রণাম করিল। দেখিলাম সর্দারের মুখভাব কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হইয়াছে। তিনি ঝলসানো ছাগলটি দেখিলেন এবং হাত নাড়িয়া সেটি অন্যত্র লইয়া যাইবার ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহারই কয়েকজন ভৃত্য ছাগলটি স্থানান্তরে লইয়া গেল। তখন তিরখন আমাদের দুইজনকে ডাকিল। আমরা কুর্নিশ করিতে করিতে অগ্রসর হইলাম। তাহার পর সর্দারের সম্মুখে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাতজোড় করিয়া রহিলাম। সর্দারের দৃষ্টি দেখিলাম কণ্টকার উপর নিবদ্ধ হইয়াছে। তিরখন যে ভাষায় সর্দারকে আমাদের কথা বলিতেছিল সে ভাষা

আমাদের পক্ষে দুর্বোধ্য। সর্দার মাঝে মাঝে কেবল বলিতেছিলেন—'খো।' পরে জানিয়াছি 'খো' মানে 'ঠিক'। সব শুনিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া সর্দার যাহা বলিলেন তিরখন তাহার অর্থ আমাদের বুঝাইয়া দিল।

তিরখন বলিল, সর্দার বলিতেছেন যে এই আগন্তুকদের সদ্ব্যবহারে আমি প্রীত হইয়াছি। যে পাষণ্ড লোকটা এই বিদেশিনীর উপর বলাৎকার করিতে গিয়াছিল তাহাকে বধ করিয়া তিনি শুধু যে সাহসের পরিচয় দিয়াছেন তাহা নয়, সুরুচিরও পরিচয় দিয়াছেন। যে রমণী পশুর নিকট আত্মসমর্পণ করে সে-ও পশু। আপনাদের উপহার পাইয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। আপনাদের সম্প্রদায়ের বন্ধুত্বলাভ করিলেও আমি খুশি হইব। কিন্তু একটি কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে চাই। সমানে সমানে বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব। আপনারা ভূমি চাষ করিয়া যে সম্পত্তি আহরণ করেন আমাদের কাজ তাহা লুণ্ঠন করা। সুতরাং আমাদের উভয়ের ধর্ম বিপরীত। যে তেমুজিনের সঙ্গে আমার যুদ্ধ হইতেছে তাহারাও কৃষক-সম্প্রদায়, জমি চাষ করিয়া প্রভূত সম্পত্তি উৎপাদন করে। আত্মরক্ষার জন্য তাহারা প্রচুর সৈন্য এবং প্রচুর যুদ্ধোপকরণও রাখিয়াছে। তাহাদের অশ্ববাহিনী বিপুল, তাহাদের রণকৌশলও প্রশংসাযোগ্য। তেমুজিনের পত্নী শিকারা নিজেই একজন যোদ্ধা। তিনি নিজেই এখন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য- পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহাদের দেশ হইতেই আমি আমার কনিষ্ঠা-পত্নী ভুলেরাকে সংগ্রহ করিয়াছি। আশা করিতেছি এইবার আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হইবে। আমি আত্মীয়দের সহিত যুদ্ধ করি না। ভুলেরা শিকারার নিকট একটা শান্তি-প্রস্তাব পাঠাইয়াছে, দেখা যাক কি হয়। আমি জানিতে চাই আপনারা যদি আমাদের বন্ধুত্ব কামনা করেন, কি শর্তে সেটা হইবে?

আমি বললাম, বন্ধুত্ব নিশ্চয়ই কামনা করি। আমি আমাদের সম্প্রদায়ের দলপতি। তবু শর্তের কথা আমার দলের অন্যান্য লোকদের সহিত পরামর্শ না করিয়া বলিতে পারি না।

সর্দার বলিলেন, শর্ত দুই প্রকার হইতে পারে। এক, সম্পত্তি বিনিময় করিয়া, না হয় বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া—কণ্টকার দিকে চক্ষু ফিরাইয়া তিনি বলিলেন, আপনাদের সম্প্রদায়ের কয়েকজন রূপসীকে আমার পরিবার-ভুক্ত করিতে পারিলে আমি খুশি হইব। আমাদের সম্প্রদায়ের কিছু রমণীকে আপনারাও বিবাহ করুন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। সহসা কণ্টকার দিকে ফিরিয়া তিনি তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, এ বিষয়ে আপনার কি মত?

কণ্টকা ইহা শুনিয়া যাহা করিল তাহা বিস্ময়জনক। সে কিছু বলিল না। সে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং সর্দারের দিকে দুই হাত প্রসারিত করিয়া আগাইয়া গেল। সর্দার হাতের ইঙ্গিতে তাহাকে আরও নিকটে ডাকিলেন। তখন সে বলিল, আমি যাহা করিতে চাই তাহাতে কেহ বাধা দিবে না তো?

তিরখন তাহার বক্তব্য অনুবাদ করিয়া সর্দারকে শুনাইল। সর্দার মাথা নাড়িয়া জানাইলেন, না, কেহ বাধা দিবে না। তখন কণ্টকা সর্দারের কনিষ্ঠা পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিল, আপনিও অনুমতি দিন। তিনি কোনো উত্তর দিলেন না, মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন। সহসা দেখা গেল, তাঁহার দুই চোখে জল টলমল করিতেছে। সর্দার বলিলেন, আমার হুকুমের বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার অধিকার নাই। আমার সহস্র পত্নী। প্রত্যেকের মতামত শুনিয়া যদি আমাকে চলিতে হয়, আমি এক পা-ও চলিতে পারিব না। আপনি যাহা করিতে চান তাহা নির্ভয়ে করুন। কেহ আপনাকে বাধা দিবে না। ইহার পর কণ্টকা যাহা করিল তাহা আরও

বিস্ময়কর। সে সোজা গিয়া সর্দারের কোলের উপর বসিয়া পড়িল এবং দুই হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

সর্দার বলিলেন—খো।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম। সর্দার সোচ্ছ্বাসে কি যেন বলিতে লাগিলেন। তিরখন তাহার অনুবাদ করিল। বলিল, সর্দার বলিতেছেন আপনার পত্নী আচরণ দ্বারা যাহা ব্যক্ত করিলেন তাহার অর্থ অতিশয় স্পষ্ট। আমি ইহাতে খুব আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু ইনি আপনার পত্নী। আপনার এ বিষয়ে অভিমত কি? আপনি যদি বলেন আমি এখনই ইহাকে আমার কোল হইতে নামাইয়া দিব। আমি বলিলাম, আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তাহারা নিশ্চয়ই নিজেদের পতি নিজেরাই নির্বাচন করিতে পারে। কণ্টকা যদি আপনাকেই পতিত্বে বরণ করে আমার কোনো আপত্তি নাই।

কণ্টকার চোখে হাসি চিকমিক করিতে লাগিল। ইহার পরই সহসা চতুর্দিকে একটা গোলমাল শুরু হইয়া গেল। সকলেই আমরা সামিয়ানার তলা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

সেদিন পূর্ণিমা ছিল। দেখিলাম চাঁদের খানিকটা কালো হইয়া গিয়াছে। গ্রহণ লাগিয়াছে। চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হইলে আমরা সকলে টুকচুম্বার তলায় সমবেত হইয়া প্রার্থনা করিতাম। তাহার পর আগুনের প্রজ্বলিত মালশা আকাশের দিকে তুলিয়া ধরিতাম। উদ্দেশ্য, আমাদের দেওয়া আগুন হইতে সূর্য বা চন্দ্র তাহার জ্যোতি সংগ্রহ করুক। কিন্তু ইহাদের আচরণ দেখিলাম অন্যরূপ। ইহারা দেখিলাম তীরে কাপড় জড়াইয়া এবং সেগুলি চর্বিতে ভিজাইয়া ছোট ছোট মশাল জ্বালিতেছে এবং সেই মশালগুলি ধনুকে লাগাইয়া আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া দিতেছে। দেখিতে দেখিতে চারিদিকে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। আকাশে অসংখ্য জ্বলন্ত মশাল উড়িতে লাগিল। তিরখনকে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, ইহাদের পূর্বপুরুষেরা নাকি ইহাই করিতেন। ইহাদের বিশ্বাস জ্বলন্ত মশালগুলি হইতে চন্দ্র পুনরায় তাহার জ্যোতি সংগ্রহ করিতে পারিবে। ভাবিয়া দেখিলাম আমরা যাহা করি তাহা ইহারই রকমফের। উদ্দেশ্য একই।

যাই হোক, সেই জনারণ্যে কণ্টকা হারাইয়া গেল। সর্দার এবং তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী ভুলেরাকেও আর কোথাও দেখিলাম না।

তিরখনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এখন আমরা কি করিব? তিরখন বলিল—কিছুক্ষণ এইখানে থাকা যাক। আপনার পত্নীকে না লইয়া কোথায় যাইবেন?

বলিলাম, আমার পত্নীর যে ব্যবহার দেখিলাম তাহাতে মনে হয় না যে সে আমার সহিত ফিরিয়া যাইবে। তিরখন হাসিয়া উঠিল।

বলিল, নারীদের চরিত্র অতি জটিল। আপনি অত সহজে উহাদের বিচার করিবেন না। আপনার পত্নীর কি উদ্দেশ্য তাহা এখনই বোঝা যাইবে না। কিছুদিন সবুর করিতে হইবে।

আমরা দুইজনেই সেই জনারণ্যে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। চারিদিকেই চিৎকার আর কোলাহল; চন্দ্রগ্রহণ সকলকে যেন উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম ছোট অসংখ্য মশাল ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। কিছু দূর আসিয়া দেখিলাম। একদল লোক উবু হইয়া বসিয়া কি একটা কাজে যেন ব্যস্ত রহিয়াছে। আকাশের দিকে তাহাদের দৃষ্টি নাই। তিরখনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এরা কে? এরা আকাশের দিকে মশালের

তীর ছুড়িতেছে না কেন? তিরখন বলিল—উহারা ক্রীতদাস। অত্যন্ত বীভৎস এবং হিংস্র। লক্ষ্য করিয়া দেখুন উহাদের প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ। প্রত্যেকের পায়ে শিকল বাঁধা আছে। হিংস্র প্রকৃতির জন্য সর্দার ইহাদের কিনিয়া আনিয়াছেন। উদ্দেশ্য, ইহাদের হিংস্র সৈন্যবাহিনীতে পরিণত করা। ইহারা নরমাংস খায়। আজ যে সব যুদ্ধবন্দির মাথা কাটা গিয়াছে—যে সব মাথা আপনি সর্দারের দরবারে স্তূপীকৃত দেখিলেন—সেই সব মাথার কবন্ধগুলি এই নরমাংসভক্তদের দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক যুদ্ধের শেষেই দেওয়া হয়। উহারা কবন্ধগুলি টুকরা টুকরা করিতেছে। পরে আগুনে ঝলসাইয়া খাইবে। অনেকে কাঁচাও খায়।

আমি নির্বাক বিস্ময়ে রহিলাম। ইহাদের কাহারও আকাশের দিকে দৃষ্টি নাই, চন্দ্রে কি হইতেছে না হইতেছে সে বিষয়ে ইহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। ইহাদের সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ কতকগুলি ছিন্নভিন্ন কবন্ধের উপর। শুনিতে পাইলাম ইহারা একটা হিস্ হিস্ শব্দও করিতেছে। সেখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না।

চলুন অন্য কোথাও যাই।

কিছু দূরে একটা টিলা আছে। চলুন সেইখানেই যাওয়া যাক। আপনাকে গান শুনাইব।

চলুন।

টিলাটি সত্যই নির্জন স্থানে অবস্থিত। চারিদিকে মরুভূমি যেন সাগরের মত দিগন্ত বিস্তৃত। মাঝখানে নাতি-উচ্চ টিলাটি।

সেই টিলার উপর বসিয়া তিরখন গান ধরিল।

সে গানের ভাষা আমার নিকট দুর্বোধ্য, তবু তাহার সুর আমার মনে একটা বেদনা জাগাইয়া তুলিল। আমি মুগ্ধ হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম। গান শেষ হইলে তিরখনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ গানের অর্থ কি?

তিরখন বলিতে লাগিল, মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার করে। অত্যাচারের তরবারি মানুষকে মারিয়া ফেলে। কিন্তু মানুষের দেহটাই মরে, আর কিছু মরে না। সে অন্য দেহে অন্য রূপে জন্মগ্রহণ করে। বৈকাল হ্রদের তীরে বড় বড় নলখাগড়ার অন্তরালে ক্ষুদ্র বৃহৎ কত বর্ণের পাখিরা নামে। বৈকাল হ্রদের জলে বড় বড় শ্বেতহংস ভাসিয়া বেড়ায়। মনে হয় তাহারা রূপান্তরিত মানুষ। অত্যাচারিত নিহত মানুষরাই বোধহয় পক্ষীর রূপ ধরিয়াছে। বৈকাল হ্রদের তীরে একবার বাদামি রঙের একটি চমৎকার পাখি দেখিয়াছিলাম। তার মুখটা সাদা, পুচ্ছটি নীল। সেই পাখিটার ছবি মনে জাগিল। সে পাখি কি এখনও বৈকাল হ্রদে আসে? আমার রিরি কি সেই পাখির রূপ ধরিয়া বৈকাল হ্রদের উদার পরিবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? সে কি গান গায়? তাহার গানে আমার কথা থাকে? আমার স্মৃতি কি তাহার মন এখনও আচ্ছন্ন করিয়া আছে? আমার গানে এই সব কথাই সুর করিয়া বলিতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি কি হুন?

হ্যাঁ, এক হুন পরিবারেই আমার জন্ম। চিরকাল আমি হুনদের সঙ্গেই আছি। সর্দার মালেক একটি হুন সম্প্রদায়েরই দলপতি।

হুনদের বিশেষত্ব কি?

তিরখন কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল।

তাহার পর বলিল, আমাদের প্রধান বিশেষত্ব, আমরা যাযাবর। আমরা কোথাও ঘর বাঁধি না। পথই আমাদের ঘর। সে পথ চিরপরিবর্তনশীল। আমাদের খাদ্যদ্রব্য, আমাদের তাঁবু, আমাদের অস্ত্রশস্ত্র, আমাদের পরিবারবর্গ, আমাদের সৈন্যদল, আমাদের ক্রীতদাসেরা, আমাদের ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল হরিণের দল—সবই চলন্ত। সকলকে লইয়া আমরা পথে পথেই ঘুরিয়া বেড়াই। অপরের সম্পত্তি লুণ্ঠন করাই আমাদের জীবনধারণের উপায়। সে জন্য যুদ্ধ করিতে হয়। প্রকৃতির সহিতও আমরা যুদ্ধ করি। রোদে পুড়ি, জলে ভিজি, বরফে কাঁপি, কখনও জমিয়া যাই, কখনও মরিয়া যাই। তবু আমরা দমি না, থামি না। বন্যজন্তু শিকার করি আর লুণ্ঠন করি সেই সব মূর্খদের যাহারা ঘর-বাড়ি বানাইয়া ভূসম্পত্তির মালিক হইয়া একস্থানে শিকড় গাড়িয়া বসিয়া আছে।

বলিলাম, আমরা তো সেই দলের—

তোমরাও একদিন হুনেদের পাল্লায় পড়িবে। কিন্তু আমাদের সহিত তোমরা যদি বন্ধুত্ব কর, সর্দার তোমাদের রক্ষা করিবেন। হুনদের বন্ধুপ্রীতি অসাধারণ। আমার ঠাকুমার মুখে গল্প শুনিয়াছি। তিনি এ গল্প শুনিয়াছিলেন তাঁহার ঠাকুমার মুখে। চীন সাম্রাজ্যের সহিত হুনদের চিরশত্রুতা। অহি-নকুল সম্পর্ক। চীন সম্রাটরা অধিকাংশই অত্যন্ত বিলাসী। বিলাস মানুষের মনুষ্যত্বে ঘুণ ধরাইয়া দেয়। ক্রমশ তাহারা অপদার্থ কামুক ননীর পুতুল হইয়া পড়ে। তাহাদের এই অপদার্থতার সুযোগ লইয়া হুনরা তাহাদের আক্রমণ করে। চীন সম্রাটরা নিজেদের মধ্যেও মারামারি করে। এক বংশ আর এক বংশকে উচ্ছেদ করিয়া সিংহাসন জবর দখল করিয়া নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করে কিছুদিন। আবার তাহাদের মধ্যেও পচ্ ধরে। একবার এক রাজ্যচ্যুত চীনা রাজকুমার চীন-উই হুনদের আশ্রয় লইয়াছিল। তাহাদের নিকট গিয়া বলিয়াছিল—আমি কোমল জীবন যাপন করিতে চাই না, তোমাদের মতো কঠোর জীবন যাপন করিতে চাই। তোমরা আমাকে আশ্রয় দাও। হুনরা যদিও চীনদের শত্রু তবু ওই রাজকুমারকে তাহারা মারিয়া ফেলে নাই। সাদরে আহ্বান করিয়া নিজেদের দলভুক্ত করিয়া লইয়াছিল—

ঠিক এই সময় গোলমালটা তুমুল হইয়া উঠিল। দেখিলাম আমাদের সম্মুখ দিয়া কয়েকটি ঘোড়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছে। অশ্বারোহী নাই। তাহার পরে দেখিলাম কয়েকটি অশ্বারোহীও ছুটিয়া চলিয়াছে। তিরখন বলিল—এ তো আমাদেরই সৈন্য। তাহার পর সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপার কি, তোমরা পলাইতেছ কেন?

শিকারার কাছে আমরা হারিয়া গিয়াছি। অগণিত খেখুন সৈন্য আমাদের পিছনে ছুটিয়া আসিতেছে। না পলাইলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। তুমিও পালাও আর দেরি করিও না।

তিরখন ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

দুটি অশ্বারোহীহীন ঘোড়া আমাদের সম্মুখ দিয়া ছুটিয়া যাইতেছিল, তিরখন দুইটাকেই ধরিয়া ফেলিল। সে যে এত ক্ষিপ্র তাহা অনুমান করিতে পারি নাই।

তিরখন বলিল, চল পালাই। একটাতে আমি চড়িতেছি আর একটাতে তুমি চড়।

পলাইয়া কোথা যাইব?

আপাতত চল তোমাদের দেশে যাই।

আমাদের এলাকায় যখন পৌঁছিলাম তখন ভোর হইতেছে। দূর হইতে টুকচুম্বার শিখর দেখিতে পাইলাম। রক্তবর্ণ পুষ্পের সমারোহে সে শিখর যেন বিরাট একটা অগ্নিশিখার মত জ্বলিতেছে। একটু ভয় হইল। একজন অপরিচিত হুনকে সঙ্গে আনিয়া অন্যায় করিলাম না তো? কিন্তু তখনই মনে হইল এই সর্বত্রচারী হুনের গতিরোধ করিবার শক্তি আমার নাই। ইহার সহিত বন্ধুত্ব করিলেই বরং লাভ আছে। আমার ক্রীতদাসরাও একটু পরে তাঁবু লইয়া ফিরিয়া আসিল। আমাকে দেখিয়া আনন্দিত হইল তাহারা। তাহারা ভাবিয়াছিল আমি যখন মরুপতি সর্দারের কবলে পড়িয়াছি তখন আমার রক্ষা নাই। আমার নিধন বার্তাই তাহারা বহন করিয়া আনিতেছিল। আমাকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত এবং পুলকিত হইল তাহারা। কণ্টকার সম্বন্ধে কেহ কোনো প্রশ্ন করিল না। আমি যদিও জানিতাম কণ্টকা হুন-সর্দারের অঙ্ক-শায়িনী হইয়াছে তবু তাহার জন্য আমার মনে মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু আমি বাহিরে সে কষ্ট প্রকাশ করিলাম না।

আমাদের প্রথা অনুসারে আমার দামামায় ঘা দিলাম। সকলে সমবেত হইলে বলিলাম—আমার সঙ্গে একজন অতিথি আসিয়াছেন ইঁহার সংবর্ধনা কর। সকলে তিরখনকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তারপর গান গাহিতে গাহিতে তাহাকে নদীতীরে লইয়া গেল। সেখানে তাহাকে স্নান করাইল। স্নানের পর গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিল। তাহার পর নানাবিধ খাদ্যসম্ভার আনিয়া সাজাইয়া দিল তাহার সম্মুখে।

আমি দোহার নিকট লোক পাঠাইয়াছিলাম। একটু পরেই দোহা প্রচুর দুগ্ধ, নানারকম ফল এবং একটি মৃত হরিণ লইয়া উপস্থিত হইল। হরিণটি সে কাঁধে করিয়া বহিয়া আনিয়াছিল। সেটি আমাদের সম্মুখে ফেলিয়া সে আদেশ করিল ইহার সৎকার কর।

মৃত ভালুকের সৎকারের কথা আগেই বলিয়াছি। সেই ভাবেই এই হরিণটিকেও বন্দনা করিয়া আমরা তাহার মাংস টুকরা টুকরা করিয়া আগুনে ঝলসাইতে লাগিলাম। তিরখন নীরবে সব দেখিতেছিল। মৃদু হাসিয়া বলিল, হরিণকে মারিয়া তাহার পর হাতজোড় করিয়া তাহার গুণগান করা আমার নিকট হাস্যকর বোধ হইতেছে। ইহার মধ্যে তোমাদের যে দুর্বলতা প্রকাশ পাইতেছে তাহা অসঙ্গত। হয়তো ইহার মধ্যেই তোমাদের বিনাশের বীজ নিহিত হইয়া আছে। যাহা আমরা নিজেদের শক্তিবলে জয় করি, তাহার জন্য কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হওয়ার প্রয়োজন কি। বাঘ বা ভালুক বা হরিণ যখনই সুযোগ পায় তখনই আমাদের মারিবার চেষ্টা করে। এজন্য তাহারা কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হয় না। আমরাই বা হইব কেন?

দোহা বলিল—কারণ আমরা বাঘ, ভালুক বা হরিণ নই, আমরা মানুষ। তাই বাধ্য হইয়া যখন আমরা অন্যায় করি তখন আমাদের দুঃখ হয়।

তিরখন বলিল—যে ভগবান আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই আমাদের মধ্যে শক্তি ও সাহস দিয়াছেন যাহাতে আমরা লুণ্ঠন করিতে পারি। অপরকে না মারিয়া আত্মরক্ষার কোনো উপায় নাই। অপরকে লুণ্ঠন করিবার প্রবৃত্তি ভগবানই আমাদের মধ্যে দিয়াছেন। সেই প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি। ইহার জন্য কুণ্ঠার কোনো প্রয়োজন নাই। যে সবল শক্তিমান সে-ই বাঁচিয়া থাকিবে, অশক্ত দুর্বলের বাঁচিবার অধিকার নাই, বলিয়া তিরখন একটি সুমিষ্ট হাসি হাসিল। তাহার পর বলিল—আমার জীবনে বহুবার আমি বহুভাবে বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু কখনও কাহারও বিরুদ্ধে

আমি নালিশ করি নাই। কারণ অপরাধটা যে আমার। আমি দুর্বল। এখন যে সর্দারের ক্রীতদাস আমি, তাঁহার অনুগ্রহের উপরই জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে। তাঁহাকে বিধ্বস্ত করিবার শক্তি আমার নাই, তাই তাঁহার অবিচার অত্যাচার সব মানিয়া লইয়াছি। কাহারও বিরুদ্ধে কোনো নালিশ আমার নাই। কারণ অপরাধ আমার, আমি দুর্বল। এই যুদ্ধের পরিণাম কি হইবে তাহা জানি না। মরুভূমির ওপারে বিরাট পিরালা রাজ্য আছে। তেমুজিন সে রাজ্যের রাজা ছিলেন। ইঁহারাও আপনাদের মত কৃষিকর্ম করেন, বাণিজ্য-ব্যবসায় করেন। আত্মরক্ষার জন্য ইঁহারা বিশাল সৈন্যবাহিনীও গঠন করিয়াছেন। হিংস্র এবং দুর্ধর্ষ খেখুন সম্প্রদায়ের সহিত ইঁহাদের মিত্রতা আছে। আমাদের সর্দার মালেক ইঁহাদের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। অপরের রাজ্য আক্রমণ এবং লুণ্ঠন করিয়াই হুনদের জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়। পিরালা রাজ্যের রাজা তেমুজিন যুদ্ধে মারা গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী শিকারা দোর্দণ্ড প্রতাপশালিনী। তিনি খেখুনদের সাহায্য লইয়া আমাদের আক্রমণ করিয়াছেন। আমাদের সৈন্যরা পলাইয়া যাইতেছে দেখিলাম। জানি না যুদ্ধের ফলাফল কি হইবে। আমার অদৃষ্টে কি আছে তাহাও অনিশ্চিত।

দোহা বলিল, আপনি আমাদের অতিথি হইয়া আসিয়াছেন, আমাদের দলপতি আপনাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন, আপনি যতদিন খুশি আমাদের এখানে থাকুন। আপনি সবল ও দুর্বলের যে সংজ্ঞা ও পরিণতির কথা বলিলেন আমরা তাহার সহিত একমত নই। আমরা মনে করি আজ যে দুর্বল, জন্মান্তরে সে-ই হয়তো সবল হইবে। দুর্বলের প্রতি অযথা অত্যাচার করা তাই আমরা নিরাপদ মনে করি না। যখন বাধ্য হইয়া জীবনধারণের জন্য তাহা করিতে হয়, তখন আমরা তাই অত্যাচারিতের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করি। করিয়া তৃপ্তি পাই। আপনি নির্ভয়ে আমাদের সঙ্গে থাকুন। আপনার কোনও অসুবিধা আমরা হইতে দিব না। একজন ক্রীতদাস এবং একজন ক্রীতদাসী সর্বদাই আপনার সঙ্গে থাকিবে। আপনার ইচ্ছামত যে-কোনো কাজ আপনি করিতে পারেন। আমাদের এখানে নানা রকম কাজ হয়।

তিরখন অভিবাদন করার ভঙ্গীতে দোহাকে নমস্কার করিয়া কহিল—আপনাদের ভদ্রতায় আমি খুব মুগ্ধ। কিন্তু আপনাদের এই ভদ্রতা আমাকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। আমার ধারণা, ভদ্রতা একপ্রকার দুর্বলতা। ভদ্রলোকেরা জীবনযুদ্ধে টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। নির্মম দস্যুদের হস্তে তাহারা বিনষ্ট হইবে। আপনারা সৈন্যবাহিনী গঠন করুন। শক্তিশালী রাজাদের সহিত বন্ধুত্ব করুন। বিষয়-সম্পত্তি করিলেই দস্যু আসিবে, দস্যুদের ঠেকাইতে হইলে সৈন্য চাই। আমরা হুনরা তাই কখনও বিষয়-সম্পত্তি করি না, আমরা যাযাবর, আমাদের সম্পত্তিও যাযাবর। কিন্তু আপনারা যখন যাযাবর হইতে পারিবেন না, তখন আপনাদের সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমি আপনাদের হিতৈষী হিসাবেই এ পরামর্শ দিতেছি।

দোহা বলিল, আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক। কোনো শক্তিশালী রাজার সহিত বন্ধুত্ব করিতে আপত্তি নাই। আত্মরক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনীও প্রস্তুত রাখা যে উচিত তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। কিন্তু কি ভাবে তাহা সম্ভবপর হইবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। সামরিক শিক্ষা দিবার মত লোক কোথায় পাওয়া যাইবে? আমরা তো এ বিষয়ে অজ্ঞ।

হুনদের ভিতর হইতেই লোক পাওয়া যাইবে। আপনারা যদি যথেষ্ট পারিশ্রমিক দেন তাহা হইলে আমি লোক যোগাড় করিয়া দিতে পারি। তবে এ কথাও আপনাদের বলিয়া দিতেছি—হুনরা খুব

লোভী, খুব অসভ্য, বর্বরতাই তাহাদের স্বভাব। তবে প্রচুর পারিশ্রমিক দিলে তাহারা আপনাদের সহিত ভদ্র ব্যবহার করিবে। কিন্তু তাহাদের বর্বর আচরণ আপনাদের সহ্য করিতে হইবে। তাহারা অত্যন্ত কামুক। হয়তো আপনাদের সমাজের স্ত্রীলোকদের লইয়া টানাটানি করিবে। এ সব সহ্য করিতে পারিবেন কি? যদি পারেন তাহা হইলে আমি ঘুরঘুট্ খাঁকে খবর দিই। সে সর্দার মালেকের বিরাগভাজন হইয়া সদলবলে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু আমার সহিত সে যোগাযোগ রাখিয়াছে। আমি খবর দিলে সে আপনাদের এখানে আসিবে এবং আপনাদের সেনাবাহিনী গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিবে।

ঘুরঘুট খাঁ এখন কোথায় আছেন?

তিনি এক পার্বত্য প্রদেশের জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া আছেন। এখান হইতে দুইদিনের পথ। আপনাদের সম্মতি থাকিলে আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতে পারি।

দোহা জিজ্ঞাসা করিল—সর্দার মালেকের সহিত তাঁহার বিবাদ হইল কেন?

'আসল কারণ ভুলেরা। ভুলেরা আসলে ঘুরঘুটেরই পত্নী। সে তাহাকে যখন বিবাহ করিয়া আনিতেছিল তখন সর্দার মালেক তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। বলিলেন—ইহাকে আমিই বিবাহ করিব। তুমি অন্য মেয়ে দেখ। জোর করিয়া ভুলেরাকে বিবাহ করিয়া তিনি ভুলেরাকে বলিলেন—তুমি যদিও আমার কনিষ্ঠা পত্নী হইলে কিন্তু তোমাকে আমি শ্রেষ্ঠার অধিকার দিলাম। তোমার সম্মানার্থে একটি বিরাট ভোজের আয়োজন করিব। যদিও যুদ্ধ চলিতেছিল তবু সর্দার ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই ভোজেই আপনাদের দলপতি টালা উপস্থিত ছিলেন। ইহার কয়েকদিন পূর্বেই ঘুরঘুট দলত্যাগ করিয়াছিল। যাইবার পূর্বে আমাকে বলিয়া গিয়াছিল কোথায় সে থাকিবে। আপনারা যদি বলেন আমি তাহার নিকট চলিয়া যাই, তাহাকে লইয়া আসি—'

সহসা ভিংড়া আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিলাম সে সর্বাঙ্গে লাল ও কালো রং মাখিয়াছে। তাহার হাতে একটি জীবন্ত বাজপাখি। মাথার সামনে শকুনের মুণ্ডটা বীভৎস দেখাইতেছে।

ভিংড়া বলিল—শুনিতেছি তোমরা বিদেশিদের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছ। এই বাজপাখি আসিয়া আমাকে খবরটি দিল। বাজপাখি বজ্রের দূত। বজ্রের সহিত আমি বন্ধুত্ব করিয়াছি। বাজপাখির মুখে বজ্রই আমাকে খবরটি পাঠাইয়াছে। আরও বলিয়াছে, তোমরা যদি বিদেশির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সত্যিই বিশ্বাসঘাতকতা কর, বজ্র তোমাদের দলপতিকে নিধন করিবে। বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইবে তাহার।

এই বলিয়া সে বাজপাখির কানের কাছে বিড় বিড় করিয়া কি বলিতে লাগিল আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তাহার পর বাজপাখীটিকে সে ছাড়িয়া দিল। সোঁ করিয়া উড়িয়া গেল পাখিটা।

তিরখন ভিংড়ার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়াছিল। ভিংড়ার শেষ কথাগুলি শুনিয়া সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বলিল, বজ্রের সহিত যদি সত্যই আপনার বন্ধুত্ব হইয়া থাকে তবে তো আপনি পৃথিবীর সম্রাট হইতে পারেন। তাহা না হইয়া আপনি এ রকম অদ্ভুত বেশে প্রায়-উলঙ্গ হইয়া সর্বাঙ্গে পাখির নখ পালক ও ঠোঁট ঝুলাইয়া উন্মাদের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন কেন বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি কে?—

দোহা বলিল—উনি আমাদের আত্মীয়। সম্পর্কে আমাদের দলপতির বৈমাত্র ভাই। কিন্তু উনি আমাদের জীবনধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজের স্বতন্ত্র একটি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সে জগতের সহিত আমাদের জগতের কোনও মিল নাই। উনি মনে করেন নিজের শক্তিবলে উনি প্রকৃতির

শক্তিকে বশীভূত করিতে পারিবেন। সূর্য, চন্দ্র, মেঘ, ঝঞ্ঝা, বর্ষা, বন্যা সকলেই উহার আজ্ঞা অনুসারে চলিবে। আমরা তাহা সম্ভব মনে করি না। তাই উনি আমাদের সঙ্গে থাকেন না। দূরে একটা পাহাড়ে একাই থাকেন। পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করেন।

তিরখন বলিল, শুনিয়াছি আমাদের পূর্বপুরুষরা যে দেশে বাস করিতেন সে দেশকে সকলে দানব-দৈত্য ভূত-প্রেতের দেশ বলিত। সে দেশের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত ছিল। সে দেশের বিরাট তৃণ-প্রান্তর, সে দেশের প্রকাণ্ড মরুভূমি, সে দেশের প্রচণ্ড শীত-গ্রীষ্ম, সে দেশের প্রবল ঝঞ্ঝা, বস্তুত সে দেশের তীক্ষ্নতা, রুক্ষতা এমনই ভয়ঙ্কর ছিল যে, সে দেশে কোনো মানুষ বাস করিতে পারে, ইহা কেহ কল্পনাই করিতে পারিত না। সভ্যদেশ হইতে কোনো মানুষ সে দেশে গেলে আর ফিরিয়া আসিত না। সকলে মনে করিত দৈত্য-দানবেরা তাহাদের খাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সে দেশে কাহারা ছিল জানেন? হুনরা। আমাদের পূর্বপুরুষেরা। দৈত্য-দানব ভূত-প্রেত নয়। এই হুনদের কোনো অলৌকিক শক্তি ছিল না। তাহাদের সম্বল ছিল তাহাদের ঘোড়া, তাহাদের শাণিত অসি, তাহাদের দুর্জয় সাহস, তাহাদের কষ্ট সহ্য করিবার অসীম ক্ষমতা। প্রতিকূল প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়াই তাহারা বাঁচিয়া থাকিত, কিন্তু সে যুদ্ধ তাহারা করিত তাহাদের অদম্য চরিত্রবলে, কোনো মন্ত্রের সাহায্যে নয়।

ভিংড়ার মুখে একটা ভ্রূকুটি-কুটিল হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, অদম্য চরিত্রবলেই প্রকৃতিকে বশ করা যায়। কিন্তু সে অদম্য চরিত্র কেবল ঘোড়া বা তলোয়ার থাকিলেই হয় না। তাহা লাভ করিবার আরও নানা উপায় আছে। আমি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছি তাহা সাধারণ লোকের নাগালের বাহিরে। আমি চলিলাম। কিন্তু আমি যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া গেলাম তাহা যেন ভুলিও না।

ভিংড়া চলিয়া গেল। আমি একটু ভয় পাইয়া গেলাম। ভিংড়ার ভবিষ্যদ্বাণী অনেক সময় ফলিয়াছে। আমি কি সত্যই বিদেশিদের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছি? আমাদের যাহাতে মঙ্গল হয়, আমরা যাহাতে নিরাপদে থাকিতে পারি, তাহার ব্যবস্থাই তো করিতেছি আমি। ইহার জন্য বজ্র আমাকে মারিয়া ফেলিবে?

সহসা চমকিত হইয়া উঠিলাম। দেখিলাম আকাশে ধূলা উড়াইয়া অনেক অশ্ব আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। অশ্বারোহীদের চিৎকারে চতুর্দিক পূর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে তাহারা আসিয়া পড়িল। দেখিলাম সকলেরই হাতে তীক্ষ্ণ বর্শা, প্রত্যেকেরই কটি-বন্ধ হইতে তরবারি ঝুলিতেছে। প্রত্যেকেই দুর্ধর্ষ সৈন্য। সৈন্যদের পুরোভাগে যে দুইজন ছিল তাহারা ঘোড়া হইতে নামিয়া আমাদের দিকে আগাইয়া আসিল। কাছে আসিতেই কণ্টকাকে চিনিতে পারিলাম। চিনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। সৈন্যের বেশ পরিয়া এ কাহাদের সঙ্গে কণ্টকা আসিয়াছে? কণ্টকা বলিল, তোমার জন্য একটি উপহার আনিয়াছি। ঘোড়ার জিনের পিছন দিকে একটি পুঁটুলি বাঁধা ছিল। কণ্টকা সেটি আনিয়া আমার হাতে দিল। বলিল, খুলিয়া দেখ।

খুলিয়া চমকাইয়া উঠিলাম। এ কি, এ যে সর্দার মালেকের মুণ্ড।

কণ্টকা হাসিয়া বলিল, আমি স্বহস্তে উহার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছি। পাষণ্ডটা যখন আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়াছিল তখন কৌশলে আমি উহারই কোমর হইতে ছোরা খুলিয়া উহার গলায় বসাইয়া দিয়াছিলাম। তাহার পর বাহির হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলাম—সর্দার মালেকের মৃত্যু হইয়াছে। এই সংবাদে সকলে ভীত হইয়া পড়িল। মালেকের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্তত ছুটিতে লাগিল। তখন

শিকারা সুযোগ পাইলেন। সৈন্য লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলেন সর্দারের সৈন্যদের উপর। শিকারার সহিত আলাপ কর, তিনি আমাদের সহিত আলাপ করিতেই আসিয়াছেন।

কণ্টকার সহিত অপর যে সৈনিকটি ঘোড়ার পিঠ হইতে নামিয়াছিল তিনি অভিবাদন করিয়া আমার দিকে আগাইয়া আসিলেন। শিকারাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। মুখটা ঠিক যেন ব্যাঘ্রিনীর মুখ। দেহটাও বেশ লম্বা-চওড়া। স্ত্রীলোক বলিয়া মনেই হয় না। শিকারা আমাকে বলিল সে আমাদের সহিত বন্ধুত্ব করিবার জন্য আসিয়াছে। কণ্টকার সহিত সে 'সেহলা' পাতাইয়াছে। 'সেহলা'র স্বামী তাহার বন্ধু। কণ্টকা সর্দার মালেককে বধ করিয়াছিল বলিয়াই তাহার পক্ষে নাকি যুদ্ধ জয় সম্ভব হইয়াছে। এ জন্য কণ্টকার কাছে সে কৃতজ্ঞ। দোহা নিকটেই নির্বাক হইয়া বসিয়াছিল। শিকারা দোহার বিশাল দেহের দিকে নির্নিমেষে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার পর প্রশ্ন করিল, উনি কে?—

উনি আমাদেরই লোক। উনি আমাদের বিরানি অরণ্যের অধিপতি।

শিকারা দোহাকেও অভিবাদন করিল।

সহসা আবিষ্কার করিলাম তিরখন অন্তর্ধান করিয়াছে। তখন কিভাবে সে অন্তর্ধান করিল তাহা বুঝিতে পারি নাই। সম্ভবত তাহার ভয় হইয়াছিল শিকারা যদি বুঝতে পারে সে সর্দার মালেকের ভৃত্য, তাহা হইলে তাহাকে বন্দি করিবে। আমাদের সন্দেহ হইল তিরখন হয়তো ঘুরঘুটের সন্ধানে সেই পার্বত্য প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে।

শিকারাকে প্রশ্ন করিলাম, সর্দার মালেকের কনিষ্ঠা পত্নী ভুলেরাকে আপনারা কি বন্দি করিয়াছেন?

তাহাকে আপনি চিনিলেন কিরূপে?

তাঁহার সহিত আমার পরিচয় নাই। দূর হইতে সর্দার মালেকের সভায় তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। কণ্টকা সর্দার মালেকের একটি ছাগল মারিয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া আমাদের সে সভায় যাইতে হইয়াছিল। সেই সভাতেই কণ্টকার প্রতি সর্দারের লুব্ধ দৃষ্টি পড়ে। তাহার পরিণাম যে কি হইয়াছে তাহা আপনার অবিদিত নাই। সেই সভাতেই দেখিয়াছিলাম ভুলেরাকে। পরে শুনিয়াছি তাহাকে সর্দার নাকি তাহার স্বামী ঘুরঘুট খাঁ-র নিকট হইতে কাড়িয়া আনিয়াছিলেন। ঘুরঘুট খাঁ সর্দারের অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন। ইহাও শুনিয়াছি এই অপমানের পর ঘুরঘুট খাঁ সদলবলে সর্দারকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাকি ইচ্ছা ছিল, যুদ্ধ ক্ষেত্রে এ অপমানের প্রতিশোধ দিবেন। তাই কৌতূহল হইতেছে ভুলেরার কি হইল? তাহাকে কি আপনারা বন্দি করিয়াছেন?

শিকারা বলিল, আপনি যে সব খবর দিলেন তাহা সবই সত্য। আমার গুপ্তচরেরা-ও এই খবর আনিয়াছে। সর্দার মালেকের অনেক পত্নী ছিল, তাহাদের প্রত্যেককে আমি বধ করিয়াছি, কিন্তু ভুলেরাকে করি নাই। আমি ঘুরঘুট খাঁ-র কাছে খবর পাঠাইয়াছি সে যদি আসিয়া আমার দলে যোগ দেয় এবং আমার বাধ্য হইয়া থাকে তাহা হইলে ভুলেরাকে সে ফিরিয়া পাইবে। ভুলেরা এখন বাঁদী হইয়া আমার কাছে আছে।

বলিলাম—'ভুলেরা বাঁচিয়া আছে জানিয়া সুখী হইলাম। শিকারার ব্যাঘ্রবদনে একটা কৌতুকের হাসি ঝলমল করিয়া উঠিল। বলিল, ভুলেরা অপূর্ব সুন্দরী। মনে হইতেছে তাহাকে আপনার পছন্দ হইয়াছে। আমার 'সেহলা' যদি আপত্তি না করে তাহা হইলে ওই রূপসীকে আপনার হাতে সমর্পণ করিতে আমার আপত্তি নাই। আপনাদের বন্ধুত্ব আমি কামনা করি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলিলাম—কণ্টকা আপত্তি না করিলেও আমার আপত্তি আছে। কোনো স্ত্রীলোককে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি ভোগ করিতে চাই না। তাহাতে কোনো আনন্দ হয় না।

কণ্টকা কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

দোহা হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া শিকারার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—আপনারা অতিথি। আপনাদের জন্য কোনো আয়োজন করা হয় নাই এখনও। আমি চলিলাম। আপনাদের সঙ্গে কত লোক আছে?

দুই শত। বেশি ব্যস্ত হইবার দরকার নাই। আমাদের সঙ্গে খাবারও আছে।

তবু আমাদের খুদ-কুঁড়া যাহা আছে তাহা সসম্ভ্রমে আপনাদের নিকট আনিয়া উপস্থিত না করিলে আমাদের কর্তব্যচ্যুতি হইবে। টালা তুমি নাচ-গানের ব্যবস্থা কর। আমি বিরানি হইতে এখনই কিছু দুধ, আটা এবং চাল পাঠাইতেছি।

দোহা চলিয়া গেল। তাহার প্রস্থানপথের দিকে শিকারা চাহিয়া রহিল। যে যখন দৃষ্টির বাইরে চলিয়া গেল তখন বলিল, ইনি প্রচণ্ড স্বাস্থ্যবান। এমন সুন্দর স্বাস্থ্য বড় একটা দেখা যায় না। উনি বিবাহ করিয়াছেন?

না। দোহা নারীসঙ্গ বর্জন করিয়া চলে। বিবাহ করে নাই।

আশ্চর্য!

আমি একজন ক্রীতদাসকে আদেশ করিলাম নাচ-গানের ব্যবস্থা করিতে।

শিকারা আদেশ করিল তাহার সেনাদের অধ্যক্ষকে।

আপনারা ঘোড়া হইতে নামিয়া এখানেই বিশ্রাম করুন। গায়ের পোশাক খুলিবার দরকার নাই। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা সর্দার মালেকের আস্তানা জুনজিরায় যাইব।

আমাদের গায়ক-গায়িকাদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর একটু পরেই দূরে শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরেই নানা সাজে সাজিয়া নানা বয়সের ছেলে-মেয়েরা নৃত্য-গীতে মাতিয়া উঠিল। শিকারাও তাহাদের সহিত যোগ দিল। কণ্টকাও চুপ করিয়া রহিল না। সে নানারকম নাচ জানিত, তাহাই একে একে দেখাইতে লাগিল। শিকারার সৈন্যদল টুকচুম্বার তলায় সমবেত হইয়া করতালি দিয়া উৎসাহিত করিতে লাগিল কণ্টকাকে। মনে হইতেছিল তাহারা সকলেই কণ্টকার প্রেমে পড়িয়া গিয়াছে।... একটু পরেই দোহার অনুচরবৃন্দ প্রচুর খাবার লইয়া উপস্থিত হইল। একটু দূরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উনুন কাটাইয়া দোহা বড় বড় ভাতের হাঁড়ি চড়াইয়া দিল। রম্ভা, জিকটু, কিংকা, রুলকি এবং তাহাদের সঙ্গিনীরা লাগিয়া গেল রুটি প্রস্তুত করিতে। হাত দিয়ে চাপড়াইয়া মোটা মোটা রুটি করিতে লাগিল তাহারা।

শিকারা বলিল—আমাদের সঙ্গে শুকনো মাংস আছে। শুকনো ফলও আছে। সুতরাং আর কিছু করিবার দরকার নাই।

দোহা কিন্তু ইহাতে সম্মত হইল না।

বলিল, আপনাদের প্রত্যেককে একবাটি করিয়া দুধ খাইতে হইবে। তাছাড়া বিরানি জঙ্গলে একপ্রকার কন্দ আমরা আবিষ্কার করিয়াছি। সেই কন্দ সিদ্ধ করিয়া তাহাতে কাঁচালঙ্কা মাখিয়া দিলে উত্তম ব্যঞ্জন হয়। তাহাও আপনাদের খাইতে হইবে।

শিকারা মুগ্ধদৃষ্টিতে দোহার দিকে চাহিয়া ছিল। সে বলিল—আপনার অনুরোধ উপেক্ষা করিবার সাধ্য আমাদের নাই। যাহা বলিলেন তাহাই করিব—

আহারাদির পর শিকারা বলিল—আমরা এখনই জুনজিরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

জুনজিরা কোথা? সেখানে কেন যাইতেছেন—একটু বিশ্রাম করুন না।

আমার কথায় শিকারা হাসিয়া উঠিল।

বিশ্রাম? বিশ্রাম করিবার সময় কই। এখন বিশ্রাম করিতে গেলে জুনজিরা হাতছাড়া হইয়া যাইবে। ঘুরঘুট খাঁ জুনজিরার খবর জানে। জানি না সে এতক্ষণ সেখানে গিয়া হাজির হইয়াছে কি না!

জুনজিরা কোথায়?

এখান হইতে সোজা উত্তরে মরুভূমির ওপারে যে পর্বতশ্রেণী আছে তাহারই নাম জুনজিরা। গুপ্তচর খবর আনিয়াছে ওই জুনজিরা পর্বতের গুহায় গুহায় সর্দার মালেকের লুণ্ঠিত প্রচুর ধনরত্ন নাকি স্তূপীকৃত হইয়া আছে। গুপ্তচর আমাদের সেখানে লইয়া যাইবে। সর্দার মালেককে যখন পরাজিত করিয়াছি তখন তাহার ধনরত্ন আমি অধিকার করিব। সে ধনরত্ন যদি পাই তাহা হইলে এই অঞ্চলের সমস্ত, যতদূর দৃষ্টি চলে সমস্ত, আমি বিরাট এক রাজ্যে পরিণত করিব। তোমরা সে রাজ্যের অংশীদার হইবে, বন্ধু হইবে। এখন আমাদের যাইতে দাও। শিকারা সদলবলে চলিয়া গেল। অশ্বক্ষুরের শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দোহা আর আমি সবিস্ময়ে তাহাদের প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

দোহা বলিল—আমাদের জীবনে একটা পরিবর্তন আসন্ন। আরও ঘোড়া সংগ্রহ কর। আমাদেরও একটা সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে। তিরখন সাহায্য করিবে বলিয়াছিল। সে কোথায় গেল?

সে অন্তর্ধান করিয়াছে। সম্ভবত শিকারার ভয়েই করিয়াছে। তবু মনে হয় সে কোনো সময়ে ফিরিয়া আসিবে। লোকটি ভালো। শিকারা মেয়েটিকে তোমার কেমন মনে হয়?

প্রথম দৃষ্টিতে ভালো মনে হয় নাই। পরে কি রকম লাগিবে জানি না। প্রথম পরিচয়ে সবটা বোঝা যায় না।

কয়েকদিন বেশ অস্বস্তির মধ্যে কাটিয়া গেল। সশস্ত্র অশ্বারোহী সেনাদল লইয়া শিকারার আগমন অনেকের মনেই একটা ত্রাসের সঞ্চার করিল। দুঃসাহসী কণ্টকাও একদিন আমাকে বলিল—শিকারার সহিত বন্ধুত্ব করিলে হয়তো আমরা নিরাপদে থাকিব, কারণ তাহার অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যবল প্রচুর। কিন্তু আমার সন্দেহ শিকারার সহিত তোমরা বন্ধুত্ব রাখিতে পারিবে কি না—

তোমার এ সন্দেহ কেন?

কণ্টকা মুচকি হাসিয়া বলিল—তাহার রোজ একটি করিয়া নূতন পুরুষ চাই। তাহার স্বামী তেমুজিন পাহাড়ের মত জোয়ান ছিল একজন। তবু শিকারার গোপন অনেক প্রণয়ী ছিল শুনিলাম। তোমরা কি তাহার চাহিদা মিটাইতে পারিবে?

কোনো পুরুষ যদি স্বেচ্ছায় তাহার নিকট যায় আমরা আপত্তিই বা করিব কেন?

শিকারা যদি এখানে তাহার আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে তাহা হইলে সে যাহা চাহিবে তাহাই করিতে হইবে। স্বেচ্ছার বা অনিচ্ছার কোনো প্রশ্নই থাকিবে না তখন। কামোম্মাদিনী শিকারা ব্যাঘ্রিনীর মত ভয়ঙ্করী। তাহার সে মূর্তি আমি দেখিয়াছি তাই সাবধান করিয়া দিতেছি—

তুমি এত কথা জানিলে কিরূপে?

আমি যে কয়েকদিন উহার সঙ্গে ছিলাম। আমাকে সে নিষ্কৃতি দেয় নাই। হঠাৎ একদিন রাত্রে একটা জোয়ানকে আমার তাঁবুতে ঢুকাইয়া দিয়া বলিল, এ লোকটা তোমাকে দেখিয়া ক্ষেপিয়াছে, ইহার মনোরঞ্জন কর। লোকটা আমাদের সেনাপতি—

তুমি কি করিলে—

সব কথা খুঁটাইয়া নাই বা শুনিলে!

কণ্টকা মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

তাহার পর বলিল— বোরিলার সহিত তোমার দেখা হইয়াছে?

না।

বোরিলা জাল পাতিয়া অনেক হাঁস ধরিয়াছিল। নানারকমের হাঁস। সে হাঁসগুলিকে লইয়া আসিতেছিল, পথে ভিংড়ার সহিত তাহার দেখা হয়। ভিংড়া তাহার নিকট হইতে হাঁসগুলি কাড়িয়া লইয়াছে। বোরিলার জালটাও কাড়িয়া লইয়াছে সে। অনেকদিন ধরিয়া বেচারি জালটি বুনিয়াছিল।

শুনিয়া বড় রাগ হইল। বোরিলার নৈপুণ্যের জন্যই আমরা মাঝে মাঝে বুনো হাঁসের মাংস খাইতে পারিতাম।

বোরিলা কোন দেশের মেয়ে তাহা জানি না। কিন্তু জাল পাতিয়া হাঁস ধরিবার বিশেষ ক্ষমতা আছে তাহার। সে জালে আঠা লাগাইয়া মাঠে বিছাইয়া দেয়। আঠা-লাগানো জালের উপর ঘাস-পাতা-খড়-কুটা দিয়া তৈরি একটা মেকি হাঁস স্থাপন করে এবং পাশের ঝোপ হইতে হাঁসের ডাক ডাকে। আকাশচারী হাঁসেরা মনে করে তাহাদের কোনো সঙ্গী বুঝি মাঠে নামিয়াছে। তাহারাও দলে দলে নামিয়া পড়ে এবং জালের আঠায় আটকাইয়া পড়ে। তখন বোরিলা তাড়াতাড়ি জালটা গুটাইয়া জালের ভিতরই তাহাদের বন্দি করিয়া ফেলে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—বোরিলা কোথায়?

সে ভিংড়ার ভয়ে লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়াইতেছিল, হঠাৎ কাল আমার সহিত দেখা হয়। সে আমাকে দেখিয়াও একটা ঝোপের আড়ালে বসিয়া পড়িয়াছিল। আমি তাহাকে ডাকিতেই কিন্তু সে বাহির হইয়া আসিল। এবং ভয়ে ঠক-ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে বলিল ভিংড়া তাহাকেও জোর করিয়া লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সে হাত ছিনাইয়া পলাইয়া আসিয়াছে। তাহার ভয় ভিংড়া তাহাকে একদিন ধরিবেই এবং ধরিয়া নির্ম্মমভাবে চাবকাইবে। তোমরা উহাকে যদি রক্ষা না কর, ও একদিন হয়তো এ দেশ ছাড়িয়াই চলিয়া যাইবে। এখানে ও ছাড়া আর তো কেহ হাঁস ধরিতে পারে না। ও চলিয়া গেলে হাঁসের সুন্দর মাংস আর আমাদের ভাগ্যে জুটিবে না। বড় ভালো লাগে হাঁসের মাংস।

উহার নিকট হইতে হাঁস ধরিবার কৌশলটা শিখিয়া লও।

মন্মন্ জাল প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু যে আঠাটা বোরিলা জালে লাগায় সে আঠা যে যে জিনিস দিয়া প্রস্তুত করে, তাহা কাহাকেও শিখায় না বোরিলা। বলে ও আঠা মন্ত্রঃপূত। যবদ্বীপের এক ডাইনির নিকট সে উহা শিখিয়াছিল। সেই ডাইনির অনুমতি না পাইলে সে উহা কাহাকেও শিখাইতে পারিবে না। শিখাইলে ডাইনির অভিশাপে উহাকে বোবা হইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু আমি মন্মন্‌কে বলিয়াছি সে গোপনে গোপনে লক্ষ্য রাখুক কি ভাবে আঠাটা প্রস্তুত করে বোরিলা। সে লক্ষ্য রাখিতেছে। কিন্তু তবু দলপতি হিসাবে তোমার বোরিলাকে রক্ষা করা কর্তব্য। ভিংড়া তাহার নিকট হইতে হাঁস

কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে, ইহার একটা প্রতিবাদ না করিলে অন্যায় হইবে। তুমি দোহার সহিত পরামর্শ করিয়া কিছু একটা কর।

কণ্টকার কথাটা সঙ্গত মনে হইল। কিন্তু এ কথাটাও মনে মনে অস্বীকার করিতে পারিলাম না যে আমিও ভিংড়াকে মনে মনে ভয় করি। তাহার দৈবীশক্তিকে অযৌক্তিক ও অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিব এতটা মনের জোর তখন আমাদের ছিল না। নানাবিধ অলৌকিক এবং অযৌক্তিক ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়াই তখন আমাদের মন আবর্তিত হইত। অনেক অযৌক্তিক অলীক ব্যাপারকেই তখন আমরা ধর্ম বলিয়া মনে করিতাম। সুতরাং ভিংড়াকে বেশি ঘাঁটানোটাও সুযুক্তি মনে হইল না।

কণ্টকা দেখিলাম আমার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

বলিলাম, তোমাকে যদি ভিংড়ার নিকট দূত করিয়া পাঠাই, তুমি যাইতে রাজি আছ?

দলপতি হিসাবে যদি আদেশ কর নিশ্চয়ই যাইব। কিন্তু স্বামী হিসাবে যদি বল, তাহা হইলে বলিব ওই পিশাচের কাছে আমার যাইবার ইচ্ছা নাই। ওই সাপটার কাছে গেলেই সে আমাকে জাপটাইয়া ধরিবে। ছোবল দিবে। তুমি যদি আমার সঙ্গে রক্ষক রূপে যাও, আমি নিশ্চয়ই যাইব। কিন্তু আমার পরামর্শ, অবিলম্বে দোহার সহিত দেখা কর। সে যাহা বলিবে তাহা করাই সমীচীন।

দোহার নিকটেই অবশেষে গেলাম।

গিয়া দেখিলাম বিরানির সংলগ্ন যে বিরাট প্রান্তরটি ছিল দোহা সেখানে বহু লোকজন লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। অনেক বড় বড় গাছের ডাল কাটিয়া একস্থানে স্তূপীকৃত করা রহিয়াছে। বড় বড় গাছের গুঁড়িও কয়েকটা রহিয়াছে দেখিলাম।

দোহা আমাকে দেখিয়া আগাইয়া আসিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—এ-সব কি করিতেছ?

এই মাঠটাকে উঁচু বেড়া দিয়া ঘিরিয়া ফেলিব। এখানে আমাদের ঘোড়ারা থাকিবে। বিদেশের বাজারে লোক পাঠাও। তাহারা ঘোড়া কিনিয়া আনুক। ঘোড়া আমাদের পুষিতেই হইবে। কাল রাত্রে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি।

কি রকম?

দেখিলাম যেন আমার মা বিষ-কুণ্ডা একটা বিরাট কালো ঘোড়ার উপর চড়িয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক অশ্বারোহী। মা যেন তাহাদের এই স্থানটা দেখাইয়া বলিতেছেন তোমরা সবাই এখানে থাকিবে। আমার ছেলে দোহা তোমাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। এ কথা শুনিয়া ঘোড়ারা সমস্বরে হ্রেষাধ্বনি করিয়া উঠিল। আমার যখন ঘুম ভাঙিল তখনও মনে হইল যেন বহু অশ্বের হ্রেষাধ্বনি অন্ধকারে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আমি অনেকক্ষণ চক্ষু বুজিয়া বসিয়া রহিলাম। মনে হইল আমার মা বিষ-কুণ্ডা যেন আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টি হইতে একটা নীরব অনুরোধ যেন আমার অন্তরে আসিয়া পৌঁছিল। সে অনুরোধ— তুমি ঘোড়াকে অবহেলা করিও না। অশ্বপালন করিলে তোমার মঙ্গল হইবে। কিছুক্ষণ পরেই মায়ের মূর্তি মিলাইয়া গেল। সকালে উঠিয়াই তাই এ স্থানটা ঘিরিয়া ফেলিব ঠিক করিলাম। তুমি আবিদ ও শরীফকেও খবর দাও। তাহারা ঘোড়ার বিষয়ে অনেক কিছু জানে। তাহাদের উপদেশ অনুসারে আমরা চলিব।

বেশ, তাহাই হইবে। আমি কিন্তু ভিংড়ার ব্যাপারে তোমার পরামর্শ লইতে আসিয়াছি। ভিংড়ার আচরণ ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে।

সব কথা তাহাকে খুলিয়া বলিলাম।

সব শুনিয়া দোহা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, ভিংড়ার আচরণ যদি মাত্রা ছাড়াইয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে শাসন করিতে হইবে। তুমি কয়েকজন বলিষ্ঠ লোক পাঠাইয়া তাহার নিকট হইতে হাঁসগুলি কাড়িয়া আন। বোরিলা যে হাঁস ধরিয়াছে তাহা কাড়িয়া লইবার কোনো অধিকার ভিংড়ার নাই। বোরিলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে যদি তাহার উপর বলাৎকার করে তাহা হইলে আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়া তাহার প্রতিবাদ করিব এ কথা তাহাকে বলিয়া পাঠাও।

বলিলাম, সে যদি তাহার দৈবীশক্তি দিয়া আমাদের শক্তিকে প্রতিহত করে কিংবা যদি আমাদের উপর প্রতিশোধ লয় তখন আমরা কি করিব সেটাও ভাবিয়া দেখ—

ভিংড়া যে দৈবীশক্তি লইয়া আস্ফালন করে, যে অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা করিয়া সে সকলকে ভয় দেখায়, তাহার মর্ম আমরা বুঝি না, তাহার সম্বন্ধে জ্ঞানও আমাদের নাই। আমরা দেবতাকে বিশ্বাস করি। সেই সর্বশক্তিমান যে সর্বত্র আছেন একথাও আমরা মানি, কিন্তু তিনি যে আমার, তোমার, বা ভিংড়ার আদেশে চলিবেন—একথা বিশ্বাস করি না। ভিংড়া করে। করুক, তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই, কিন্তু আমাদের সে যদি অনিষ্ট করিতে চায়, আমাদের সামাজিক নিয়ম যদি সে লঙ্ঘন করে, আমরা তাহা সহ্য করিব না। আমরা যে শক্তিতে বিশ্বাস করি সেই শক্তি দিয়াই আমরা তাহাকে বাধা দিব, প্রয়োজন হইলে তাহাকে উৎখাত করিব। একথা তাহাকে জানাইয়া দাও। জনকয়েক বলিষ্ঠ লোক লইয়া তুমি নিজে গেলেই ভালো হয়। সে যদি তোমার কথা না শুনিতে চায়, কিংবা মারমুখী হইয়া তোমাকে তাড়া করিয়া আসে, তুমি সদলবলে তাহাকে আক্রমণ করিয়া আমাদের এলাকা হইতে তাড়াইয়া দাও। আমাদের এলাকার বাহিরে গিয়া সে যাহা ইচ্ছা করুক, আমাদের এলাকায় তাহাকে থাকিতে দিব না।

দোহার চোখ-মুখে একটা ভীষণ ভাব ফুটিয়া উঠিল। বলিলাম, তুমিও ভাই আমার সঙ্গে চল না—

তুমি আমাদের দলপতি, ভিংড়া তোমার ভাই, তোমারই প্রথমে যাওয়া উচিত। তুমি যদি কিছু না করিতে পার তখন আমি তো আছিই। তুমি সশস্ত্রে স-সৈন্যে ভিংড়ার বিরুদ্ধে যাও, তাহার পর দেখা যাক কি হয়।

আমার কিন্তু ভয় করিতেছিল। কিন্তু সে কথা দোহাকে বলিতে পারিলাম না। দৈহিক বলপ্রয়োগ করিয়া অবশ্যই আমি ভিংড়াকে কাবু করিতে পারিব। কিন্তু তাহার দৈবীশক্তি? কখন যে সাপ হইয়া কামড়াইবে, বজ্র হইয়া মাথায় পড়িবে, বিষ হইয়া কণ্টকের মুখে মৃত্যুকে লেলাইয়া দিবে, তাহার তো স্থিরতা নাই।

...তবু গেলাম।

আমার সশস্ত্র সহচরদের লইয়া ভিংড়া যে পাহাড়ের গুহায় থাকিত সেই পাহাড়ে চড়িতে লাগিলাম। পাহাড়ে ওঠার একাধিক রাস্তা ছিল। যে গুহায় ভিংড়া থাকিত একটা রাস্তা সেই গুহার পিছনে গিয়া শেষ হইয়াছে। আমি সেই রাস্তা দিয়া উঠিতে লাগিলাম। আমার হাতে বড় একটা ছোরা ছিল। সহচরদের বলিলাম,তোমরা ভিন্নপথে পাহাড়ে ওঠ। সকলেই গুহার নিকটে গিয়া সমবেত হও। আমি ভিংড়ার সহিত প্রথমে আলাপ করিব, সে যদি রূঢ় আচরণ করে, তাহা হইলে তোমাদের ডাকিব।

আমি গিয়া যাহা দেখিলাম তাহা ভয়ঙ্কর।

ভিংড়া গুহার সামনে হাঁসগুলির পায়ে ও ডানায় দড়ি জড়াইয়া তাহাদের বাঁধিয়া রাখিয়াছে। দেখিলাম সে একটা হাঁসের গলা কাটিয়া তাহার রক্ত আর একটা হাঁসকে জোর করিয়া পান করাইতেছে। পায়ে চাপিয়া ধরিয়া বাঁ-হাতের তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের সহায়তায় সে জোর করিয়া একটা জীবন্ত হাঁসের ঠোঁট দুইটা ফাঁক করিয়া ছিন্নমুণ্ড হাঁসের রক্তাক্ত কবন্ধটা তাহার মুখের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া চিৎকার করিতেছে—পি পি পি পি। তাহার গলার শির ফুলিয়া উঠিয়াছে, চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ।

আমি ধমক দিয়া উঠিলাম—তুমি এ কি করিতেছ! ভিংড়া তড়াক করিয়া আমার দিকে ফিরিয়া বসিল। রক্তাক্ত হাঁসটা ছটফট করিতে লাগিল, কিন্তু উড়িয়া পালাইতে পারিল না, কারণ তাহার পা ও ডানা দুই-ই বাঁধা ছিল।

ভিংড়া আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক নয়নে চাহিয়া রহিল। তাহার পর অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

আমি কি করিতেছি—তাহা বুঝিবার বুদ্ধি তোমার নাই। তুমি লাঙল চষিয়া গম ফলাইতে পার, তাহাই কর গিয়া। এখানে আসিয়াছ কেন?

তোমার পাগলামির প্রতিবাদ করিতে আসিয়াছি। তুমি বোরিলার হাঁস কাড়িয়া আনিয়াছ কেন? তাহার জালটা কাড়িয়া আনিয়াছ। সেটা কোথায়—

ভিংড়া তর্জনী তুলিয়া দেখাইয়া দিল—ওই দেখ। দেখিলাম নিকটস্থ পর্বতশৃঙ্গ দুইটিতে যে বড় বড় গাছ ছিল তাহাতে জালটা টান করিয়া টাঙানো আছে। জালের ভিতর দিয়া আকাশ দেখা যাইতেছে। আমি বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া চাহিয়া আছি দেখিয়া ভিংড়া আবার অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

বলিল, তোমার মাথায় ঢুকিবে না কেন ওই জাল টাঙাইয়াছি—

বলিয়াই দেখ না, বুঝিতে পারি কি না।

ভিংড়া হাসিয়া বলিল—বেশ, তবে শোন। তোমাদের বোরিলা মন্ত্রঃপূত আঠা জালে মাখাইয়া হাঁস ধরিয়াছে ইহা তো প্রত্যক্ষ দেখিতেছ। আমি ওই জালে আরও কিছু মন্ত্র পড়িয়া আকাশে টাঙাইয়া দিয়াছি, আর একরকম হাঁস ধরিব বলিয়া।

কি রকম হাঁস?

তাহাদের তোমরা দেবতা বলিয়া পূজা কর। কিন্তু আমি জানি উহারা দেবতা নয়, হাঁস। হাঁসের মত উহারাও আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। খানিকটা হাঁস বটে, কিন্তু খুব শক্তিমান হাঁস। ধরিতে পারিলে তাহাদের শক্তি কাড়িয়া লইয়া তাহাদের ছাড়িয়া দিব। তাহার পর আবার তাহারা শক্তি সংগ্রহ করিয়া যখন আসিবে, তখন আবার তাহাদের ধরিব। ধরা পড়িলেই মুক্তির মূল্য স্বরূপ তাহাদের খানিকটা শক্তি তাহারা আমাকে দিবে। না দিলে ছাড়িবই না।

আবার ভিংড়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কি রকম হাঁস তাহা তো বলিলে না—

তোমরা যাহাকে চন্দ্র সূর্য বল আসলে তাহারা হাঁস। নক্ষত্ররাও হাঁস, কিন্তু তাহারা অনেক দূরে ওড়ে। এ জালে হয়তো ধরা পড়িবে না। চন্দ্র সূর্য কিন্তু ধরা পড়িবে। কাল সূর্যকে ধরিয়াছিলাম, খানিকটা শক্তি সে আমাকে দিয়াছে। চাঁদ এখন ছোট, নিজেই দুর্বল। যে দিন সূর্যের মত বড় হইবে, সেদিন তাহাকেও ধরিব—

ভিংড়া উঠিয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল। মনে হইল সে যেন স্পর্ধা করিয়া আমাকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করিতেছে।

বলিলাম, বোরিলার হাঁস এবং জাল তাহাকে ফেরত দিতে হইবে। তুমি যদি জাল ফেলিয়া আকাশের সূর্য চন্দ্র ধরিতে চাও তাহা হইলে সে জাল নিজেই প্রস্তুত কর। আর এই হাঁসগুলিকে লইয়া কি করিতেছ?—

একটা হাঁসের রক্ত আর একটা হাঁসকে খাওয়াইতেছি। তাহার পর সে হাঁসের রক্ত আর একটা হাঁসকে খাওয়াইব। এইভাবে রক্ত খাওয়াইতে খাওয়াইতে যে শেষ হাঁসটি থাকিবে, সে হাঁসটি আমি খাইব। সমস্ত হাঁসের শক্তির তখন আমার মধ্যে আসিবে। তখন আমিও আকাশে উড়িতে পারিব।

ভিংড়া দুই হাত আকাশে তুলিয়া এমন একটা ভঙ্গী করিল যে সে এখনই আকাশে উড়িয়া যাইবে। বলিলাম—নিজে হাঁস ধরিয়া তুমি সে শক্তি সংগ্রহ কর। বোরিলার হাঁস বোরিলাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে!

দিব না। আমার বেশি জোর আছে আমি তাহার হাঁস কাড়িয়া আনিয়াছি। দিব কেন?

বলিলাম, কিন্তু ইহা পূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে তোমার চেয়ে আমার গায়ে জোর বেশি। আমি তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইব!

কাড়িয়া লইবে?

দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া ভিংড়া উন্মত্তের মত আমার উপর লাফাইয়া পড়িল। আমার হাতের ছোরাটা দূরে ছিটকাইয়া পড়িয়া গেল। আমরা দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। ভিংড়ার মুখে যত প্রকোপ গায়ে তত শক্তি নাই। তাহাকে সহজেই চিৎ করিয়া তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসিলাম আমি। তাহার পর আমার অনুচরদের ডাকিলাম। ভিংড়াকে তাহারা বন্দি করিয়া ফেলিল। হাঁসগুলিকে লইয়া দুইটি লোক বোরিলার নিকট চলিয়া গেল। বোরিলার জালটাও গাছ হইতে খুলিয়া লইয়া গেল তাহারা।

বন্দি ভিংড়াকে টানিতে টানিতে আমরা দোহার নিকট উপস্থিত হইলাম। ভিংড়ার হাত-পা বাঁধিয়া সমস্ত রাস্তাটা তাহাকে ছ্যাঁচড়াইয়া ছ্যাঁচড়াইয়া আনিতে হইয়াছিল। তাই তাহার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল দোহার 'ফান্-ডি'তে পাথরের বড় বড় চাঙর দিয়া প্রস্তুত একটি বড় ঘর ছিল। দোহা সেই ঘরে ভিংড়াকে বন্দি করিয়া রাখিল।

তাহার পরদিনই তিরখন ঘুরঘুট খাঁকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। তাহারা যে ঘোড়া দুইটির পিঠে চড়িয়া আসিয়াছিল তাহাদের দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ঘুরঘুট খাঁ-র চেহারাটাও দেখিবার মতো। কপালের উপর প্রকাণ্ড একটা ক্ষতচিহ্ন। ঘনকৃষ্ণ গুচ্ছ গুচ্ছ শ্মশ্রু-গুম্ফে সমস্ত মুখ সমাচ্ছন্ন। চক্ষু দুইটি আকর্ণবিস্তৃত, দৃষ্টি নির্ভীক। বলিষ্ঠ স্কন্ধ, বলিষ্ঠ বাহু, বিস্তৃত বক্ষ, চওড়া পিঠ। বৃকোদর, ক্ষীণকটি। পা দুইটি লৌহস্তম্ভের মত। কথায় কথায় অট্টহাস্য করে। তাহার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়াও বিস্মিত হইয়া গেলাম আমরা। চামড়ার পোশাক। কিন্তু সে পোশাকে মখমল এবং উজ্জ্বল ধাতুর সমাবেশে এমন একটা শোভার সৃষ্টি হইয়াছে যাহা আমরা ইতিপূর্বে দেখি নাই। ঘুরঘুট খাঁকে দেখিয়া সত্যই আমরা বিস্মিত হইয়া গেলাম। ঘুরঘুট খাঁ যেদিন আসিল সেদিন আমরা ভিংড়ার সম্বন্ধে কি করা হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য টুকচুস্বার নীচে সমবেত হইয়াছিলাম। দোহা বলিয়াছিল সকলে একসঙ্গে বসিয়া এ বিষয়ে মীমাংসা করা উচিত এবং সকলের অভিমত শুনিয়া আমরা স্থির

করিব ভিংড়ার এই অত্যাচার আমরা সহ্য করিব, না, তাহাকে আমাদের এলাকা হইতে দূর করিয়া দিব। কণ্টকা বলিয়াছিল উহাকে মারিয়া ফেলা হোক, আপদের শেষ হইয়া যাক। দোহা কিন্তু তাহাকে হত্যা করিতে চায় না। অনেকের মত, তাহাকে নির্বাসিত করিলে দূর হইতেও সে আমাদের অনিষ্ট করিবে। উহার জাদু, উহার মন্ত্রতন্ত্র বড় ভয়ঙ্কর। উহাকে বিনাশ করিয়া ফেলাই উচিত। দোহা কিন্তু বলিতেছে উহাকে মারিয়া ফেলিলে ও আরও ভয়ঙ্কর হইয়া পড়িবে।

কারণ আমার মতে মৃত্যুই মানুষের শেষ নয়। মৃত্যুর পরও মানুষ শুধু যে বাঁচিয়া থাকে তাহা নয়, বেশি শক্তিশালী হয়। এই জন্যই আমরা পূর্বপুরুষদের আত্মাকে প্রীত রাখিবার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা করি। যে সব জানোয়ারকে আমরা হত্যা করিতে বাধ্য হই তাহাদেরও আত্মাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করি আমরা। পৃথিবীতে কেহই মরে না। সুতরাং ভিংড়াকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা হাস্যকর হইবে। এই সব আলোচনা হইতেছিল এমন সময় তিরখন ও ঘুরঘুট খাঁ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

এ কিসের জমায়েত?

আমাদের ভাষাতেই প্রশ্ন করিলেন ঘুরঘুট খাঁ। প্রশ্ন করিয়া তিনি ও তিরখন অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। আমাদের দুইজন ক্রীতদাস অশ্ব দুইটির লাগাম ধরিতে যাইতেছিল। ঘুরঘুট খাঁ বলিলেন—কিছু করিতে হইবে না। ধরিবার দরকার নাই। উহারা এমনই স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবে, কোথাও পলাইয়া যাইবে না।

ঘোড়া দুইটি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তিরখন পরিচয় করাইয়া দিল—ইনিই ঘুরঘুট খাঁ। আপনাদের নিমন্ত্রণে এখানে আসিয়াছেন। আপনারা যদি ইঁহার শিক্ষায় সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করিতে চান, ইনি আপনাদের সাহায্য করিবেন। কি শর্তে করিবেন তাহা আপনারা আলোচনা করুন। আমাকে এখানে কোথাও যদি একটু স্থান দেন, আমি বাঁশি বাজাইব, গান গাহিব, প্রয়োজন হইলে তূর্যধ্বনিও করিব। একটা ফাঁকা জায়গা, আর কিছু খাবার পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিব আমি। কোনো পাহাড়ের উপর আমার যদি স্থান করিয়া দেন, আরও খুশি হইব। প্রকৃতির বিরাট বিস্তার চোখের সম্মুখে না থাকিলে আমি স্বস্তি পাই না। আপনারা যদি আমাকে না রাখিতে চান, আমি অন্যত্র চলিয়া যাইব। এখানে এত জনতা কেন?

দোহা এবং আমি অগ্রসর হইয়া ঘুরঘুট খাঁকে অভিবাদন করিলাম।

দোহা বলিল—আমাদের সম্প্রদায়ের একটি লোক উন্মাদ হইয়া যথেচ্ছাচার করিতেছে। তাহাকে বন্দি করা হইয়াছে। এখন তাহাকে লইয়া কি করিব সেই আলোচনা সকলে মিলিয়া করিতেছি- —

ঘুরঘুট খাঁ হাসিয়া বলিলেন—সকলে মিলিয়া? সকলে মিলিয়া কলহ হয়, নানা লোক নানা মত প্রকাশ করে, কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। আপনাদের যিনি দলপতি তিনিই স্থির করুন কি করিবেন। তাঁহার হুকুমই সকলকে মানিয়া লইতে হইবে। আমার সমর-কৌশলের ইহাই মেরুদণ্ড, নির্বিচারে সেনাপতির আদেশ পালন করিতে হয়। আপনাদের এই লোকটি কি ধরনের উন্মাদ?

দোহা ভিংড়ার অদ্ভুত চরিত্রের কথা বিশদ করিয়া বর্ণনা করিল। শেষে বলিল—মুশকিল হইয়াছে ভিংড়া আমাদের জনপদবাসী অনেকের উপর অত্যাচার করিতেছে। মেয়েদের উপর অকথ্য অত্যাচার করে। বোরিলা নামে একটি মেয়ে হাঁস ধরিত, সেদিন সে তাহার সব হাঁসগুলি কাড়িয়া লইয়াছে। হাঁস ধরিবার জালটাও লইয়া গিয়াছে। বলিতেছে ওই জাল দিয়া আকাশের সূর্য চন্দ্র ধরিবে।

ঘুরঘুট খাঁ বলিলেন—উহার কি সত্যই কোনো অলৌকিক ক্ষমতা আছে? যদি থাকে উহাকে সেই ক্ষমতার অনুপাতে সম্মান করা উচিত।

দোহা বলিল—ভিংড়া বলে সে বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়, অগ্নি, বন্যা, পশু, পক্ষী সকলকে বশ করিতে পারে। আমি কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করি না। এসব বলিয়া ও শুধু লোকের মনে ভয় সঞ্চার করে।

ঘুরঘুট খাঁ কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিলেন। বলিলেন—খুব ছেলেবেলায় আমার বাবার মায়ের মুখে একটা গল্প শুনিয়াছিলাম। তিনি আবার সেটা শুনিয়াছিলেন তাঁহার দিদিমার মুখে। আমরা হুন। আমাদের কোথাও ঘর-বাড়ি নাই। ঘোড়ার পিঠেই আমাদের বাড়ি। চলন্ত জানোয়াররাই আমাদের সম্পত্তি। আমাদের সমস্ত পরিবারও থাকে চলন্ত তাঁবুর ভিতরে। সে তাঁবুর নাম আমাদের ভাষায় 'ইয়ুর্ত'। বিরাট চুনকাম করা ছবি আঁকা তাঁবু, বিরাট বাঁশের গাড়ির উপর অবস্থিত। দশ-বারোটি গরু সেই 'ইয়ুর্ত' একসঙ্গে চলে, চাকার ধুরির সঙ্গে বাঁশ বাঁধিয়া 'ইয়ুর্ত'গুলি সংযুক্ত। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই ইয়ুর্তেই জন্মলাভ করিয়াছেন, ইয়ুর্তেই মানুষ হইয়াছেন। পুরুষদের কাজ ছিল ঘোড়ায় চড়িয়া লুণ্ঠন করা। মঙ্গোলিয়ার ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে তাঁহারা দানবের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সুবিধা পাইলেই তাঁহারা চীন সাম্রাজ্যের জনপদ লুণ্ঠন করিতেন। বস্তুত সেই প্রাচীন যুগে চীনাদের সহিত আমাদের প্রায়ই সংঘর্ষ হইত। তাহা নিদারুণ সংঘর্ষ। শান্তিপ্রিয় চীন সম্রাটরা প্রায়ই আমাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেন। আমরা তাঁহাদের সাম্রাজ্য যথেচ্ছ লুটপাট করিয়া সরিয়া পড়িতাম। সম্রাটের সৈন্যেরা আমাদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। কারণ তাহারা ছিল বিলাসী। একবার কিন্তু আমাদের বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। এই গল্পটাই আমার বাবার মায়ের মুখে শুনিয়াছিলাম। তখন চীন দেশের রাজা ছিলেন হোয়া-টি। আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন দুর্ধর্ষ বীর। আকৃতিও ছিল ভয়ানক। মুখ ছিল পাথরের মতো, আমাদের মত গোঁফ-দাড়ি ছিল না তাঁহাদের। তাঁহারা গোঁফ-দাড়ি গজাইতে দিতেন না। বাল্যকাল হইতে অস্ত্র দিয়া তাঁহারা মুখের চামড়া ছুলিয়া ফেলিতেন। কোনো চুল গজাইত না। ক্ষিপ্র অশ্বারোহী ছিলেন তাঁহারা। সর্বদা ঘোড়ার পিঠেই থাকতেন। ঘোড়ার জিনের তলায় তাঁহাদের উরুর নিম্নে থাকিত কাঁচা মাংস। তাহাই আহার ছিল তাঁহাদের। আর যখন সুবিধা পাইতেন—'কুমিস' খাইতেন। চামড়ার থলিতে তাঁহারা দুধ রাখিতেন, সেই দুধ পচিয়া গাঁজিয়া কুমিসে পরিণত হইত। তাহাই তাঁহাদের প্রিয় খাদ্য ছিল। তাঁহারা একবার হোয়াং-টিশ রাজ্য আক্রমণ করিলেন। হোয়াং-টির মাহিনা-করা মোটা মোটা সৈন্যরা দলে দলে আসিল, কিন্তু আমাদের মারের চোটে ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। বিরাট হুনবাহিনী চীন রাজ্যের অনেকটা দখল করিয়া যখন রাজধানীর কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে তখন হোয়াং-টি বুঝিতে পারিলেন যে সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র বা সেনাসামন্ত দিয়া দুর্ধর্ষ হুনদের গতিরোধ করা যাইবে না। তাঁহার একটি ছোট লাল রঙের ঘোড়ার গাড়ি ছিল। সেই গাড়ি চড়িয়া তিনি বনের দিকে চলিয়া গেলেন। তাঁহার রাজত্বে প্রকাণ্ড একটি অরণ্য ছিল সেকালে। ছোট লাল রঙের গাড়ি চড়িয়া তিনি সেই অরণ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। কয়েকদিন পরে তিনি যখন তাঁহার ছোট লাল গাড়ি চড়িয়া অরণ্য হইতে বাহির হইলেন তখন দেখা গেল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সিংহ, বাঘ, চিতা, হাতি, নেকড়ে, হায়না, শৃগাল চিৎকার করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিতেছে। শুধু তাহাই নয়, বড় বড় বিষাক্ত সাপও ফণা তুলিয়া আসিতেছে তাঁহার সঙ্গে। আকাশ জুড়িয়া অনেক বাজ, চিল, শকুনি, এমন কি ঈগল পাখিও উড়িয়া আসিতেছে দলে দলে। এই অদ্ভুত বন্য বাহিনীর সম্মুখে হুনরা দাঁড়াইতে পারিল না। অনেকে মারা গেল, পলাইয়া গেল অনেকে। হোয়াং-টি অলৌকিক ক্ষমতা-

সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তিনি শুধু যে বন্য জন্তুদের অনায়াসে বশ করিতে পারিতেন তাহাই নয়, তাহাদের দ্বারা অনেক দুঃসাধ্য কাজও করাইয়া লইতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার এ ক্ষমতা ছিল, হিংস্র বন্যপশুরাই খেলার সঙ্গী ছিল তাঁহার। তিনি যতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন হুনরা তাঁহার রাজত্ব আক্রমণ করিতে পারে নাই। আপনাদের ভিংড়ার সত্যই যদি কোনো ক্ষমতা থাকে, সে ক্ষমতার সুযোগ আপনাদের গ্রহণ করা উচিত।

দোহা বলিল—ভিংড়া কিন্তু আমাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে চাহে না। সে শত্রুভাবাপন্ন—

ঘুরঘুট খাঁ সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—তাহা হইলে উহাকে মারিয়া ফেলুন।

দোহা আপত্তি করিল।

বলিল, মারিয়া ফেলিলেই শত্রুর বিনাশ হয় না। আমার বিশ্বাস, দেহহীন শত্রু আরও বেশি শক্তিশালী আরও বেশি প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়। আমার মতে ভিংড়া যে অঞ্চলটায় থাকে সে অঞ্চলটা তাহাকে দান করিয়া দেওয়া উচিত। যাহারা উহার সহিত গিয়া ওই অঞ্চলে বাস করিতে চাহিবে তাহাদের আমরা বাধা দিব না। কিন্তু ভিংড়ার সহিত একটি শর্ত থাকিবে, সে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের এলাকায় প্রবেশ করিবে না, আমাদের কাহারও উপর সে অত্যাচারও করিবে না। এই শর্তে সে যদি রাজি থাকে—

ঘুরঘুট খাঁ বলিলেন— যাহারা অত্যন্ত ধূর্ত, অত্যন্ত শঠ, তাহারা মুখে শর্ত করে, কাজে তাহা মানে না। যাহারা অত্যন্ত শক্তিশালী তাহারাও ইহা করে। সৈনিক জীবনের ইহাই আমার অভিজ্ঞতা। সুতরাং শত্রুকে যদি বিনাশ করিতে চান, তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দিন। মৃত্যুর পর তাহার প্রেতাত্মা কি করিবে তাহা লইয়া যদি মাথা ঘামান তাহা হইলে ইহলোকের সমস্যা মিটিবে না। বৈষয়িক ব্যাপারে অনিশ্চি তের উপর নির্ভর করা নিরাপদ নয়। ভিংড়ার প্রেতাত্মা যদি আপনাদের পীড়ন করে তখন তাহাকে ঠেকাইবার জন্য ভালো ওঝা ডাকিবেন। যাই হোক, আমাকে যে জন্য ডাকিয়েছেন সে কথাটার আলোচনা এইবার শুরু করুন। আপনাদের সামরিক প্রথায় শিক্ষা দিয়া আপনাদের সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করিয়া দিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু কয়েকটি শর্ত আছে—

কি শর্ত বলুন—

যে সামরিক বাহিনী আমি প্রস্তুত করিব সেই বাহিনীর আমি সর্বেসর্বা হইব। আমার আদেশ ছাড়া অন্য কাহারও আদেশ সেখানে চলিবে না।

দোহা বলিল—কিন্তু সে আদেশ দিবার আগে আপনি আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করিবেন তো?

আপনাদের, মানে কাহাদের? এই বিরাট জনতার?

না। আমাদের দলপতি টালার। তাহার সম্মতি ব্যতীত আমরা কিছুই করি না।

কিন্তু আপনাদের দলপতি কি যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু বোঝেন?

যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু বোঝেন না, কিন্তু কিসে আমাদের হিত বা অহিত হইবে তাহা বোঝেন। তাছাড়া, আপনি যখন এখানে থাকিবেন তখন যুদ্ধ সম্বন্ধেও সে আপনার নিকট জ্ঞানলাভ করিয়া ফেলিবে। আমাদের দলপতি বুদ্ধিমান ও বলবান লোক।

ঘুরঘুট খাঁ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ।

তাহার পর বলিলেন—আপনাদের দলপতির সহিত যদি আমার মতের মিল না হয় তখন কি হইবে?

দোহাও কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল।

তাহার পর উত্তর দিল— আমাদের দলপতির আদেশই সর্বদা আমাদের নিকট গ্রাহ্য হইবে। তবে আপনার বিরুদ্ধাচরণ করিবার পূর্বে আমাদের দলপতি নিশ্চয়ই তাহার পরিণাম চিন্তা করিয়া দেখিবেন এ বিশ্বাস আমাদের কাছে। আপনি আমাদের সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করুন, আপনি যাহাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে এবং সসম্মানে থাকিতে পারেন সে ব্যবস্থা আমরা করিব।

ঘুরঘুট খাঁ হা হা শব্দে অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

বলিলেন—আমি যদি ভিন্ন স্থান হইতে শিক্ষিত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আপনাদের জনপদ অধিকার করিয়া বসি, আপনারা কি বাধা দিতে পারিবেন? তখন তো আমিই সর্বেসর্বা হইব। আপনাদের অধীনে আপনাদের দলপতির মুখাপেক্ষী হইয়া আমি থাকিব কেন?

তখন আমি কথা বলিলাম। এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলাম। বলিলাম—থাকা না থাকা আপনার ইচ্ছা। আমরা শুধু এইটুকুই বলিতে পারি, আপনাকে শিক্ষকরূপে পাইলে আমরা আনন্দিত হইব। আরও বলিতে পারি মানীকে কি করিয়া সম্মান করিতে হয় তাহাও আমরা জানি। আপনি এখনই বলিলেন অন্যত্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আপনি আমাদের সর্বেসর্বা হইবার শক্তি রাখেন। খুব সম্ভব রাখেন, কিন্তু একটি কথা আপনাকে বলিতে চাই। বিজয়িনী তেমুজিনের পত্নী শিকারা আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি আমাদের বন্ধুত্ব কামনা করিয়াছেন, আমার স্ত্রী কামুক সর্দার মালেককে হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া অত সহজে তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিয়াছেন এই কথা তিনি বার বার বলিলেন। আমার স্ত্রীর সহিত তিনি 'সেহলা' পাতাইয়াছেন। সুতরাং কোনো বহিঃশত্রু যদি আমাদের এখন আক্রমণ করে, শিকারা এবং খেখুন সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের সাহায্য করিবে এ বিশ্বাস আমার কাছে। শিকারা বন্ধুত্বের জন্য কোনো শর্ত আরোপ করে নাই, তাহার নিকটই আমরা যদি বলি আমরা একটি সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিতে চাই আপনি সাহায্য করুন—আমার বিশ্বাস তিনি করিবেন। আপনার সম্বন্ধেও তাঁহার সহিত কিছু আলোচনা হইয়াছিল। আপনার যে পত্নীকে সর্দার মালেক ছিনাইয়া লইয়াছিলেন বলিয়া আপনি তাঁহার সংস্রব ত্যাগ করেন, আপনার সেই পত্নী শিকারার নিকট বন্দিনী হইয়া আছে। শিকারা সর্দার মালেকের সমস্ত পত্নীদের হত্যা করিয়াছেন, করেন নাই কেবল ভুলেরাকে। তাঁহার বাসনা, আপনি যদি তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাঁহার সৈন্যবিভাগে সেনাপতিরূপে যোগদান করেন, তাহা হইলে ভুলেরাকে তিনি আপনার নিকট ফিরাইয়া দিবেন। আপনি যদি ইহাতে সম্মত হন, আমার বিশ্বাস, তাঁহার পিরালা রাজ্যে আপনি সেনাবিভাগে একটা সম্মানের আসন পাইবেন। আমার মনে হয় শিকারার অনুরোধ রক্ষা করিলে সব দিকই রক্ষা হয়। আপনাকেও আমরা হয়তো শেষ পর্যন্ত পাইতে পারি। সবই অবশ্য আপনার সম্মতির উপর নির্ভর করিতেছে।

মনে হইল ভুলেরার খবর পাইয়া ঘুরঘুট খাঁ যেন একটু উৎসুক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে আগ্রহ ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু মুখে তিনি যাহা বলিলেন তাহাতে আশ্চর্য হইয়া গেলাম। বলিলেন, শিকারা আমার প্রভুর শত্রু। আমার প্রভু আমার সহিত দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলাম। ইহাতে বিশ্বাসঘাতকতার নাম-গন্ধও নাই। কিন্তু আমি যদি এখন সেই শত্রুর অধীনে গিয়া চাকরি করি তাহা হইলে সেটা বিশ্বাসঘাতকতার পর্যায়ে গিয়া পড়িবে। সর্দার মালেক কামুক ছিলেন বলিয়া আমার স্ত্রী ভুলেরাকে কাড়িয়া লইয়াছিলেন, শিকারাও কামুকী, সে হয়তো আমাকেই দখল করিতে চাহিবে। সর্দার মালেক কামুক ছিলেন, কিন্তু অনেক গুণ ছিল তাঁহার। তিনি

আমাকে মানুষ করিয়াছিলেন, তাঁহার সৈন্য-দলে আমাকে উচ্চপদ দিয়াছিলেন, আমার অধীনে যে সৈন্যদল থাকিত সেখানে আমার আদেশই সর্বদা বলবৎ থাকিত। সেইজন্যই আমি স-সৈন্যে অবিলম্বে তাঁহার দল ছাড়িয়া আসিতে পারিয়াছি। আমি যদিও তাঁহার অধীনে ছিলাম, কিন্তু তিনি কখনও আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। শিকারা আমাকে সে সুযোগ দিবে কি না সন্দেহ। ভুলেরাকে পাইলে অবশ্য আমি খুব খুশি হইব, কিন্তু আমার স্বাধীনতার বিনিময়ে নয়।

আমি বলিলাম—ভুলেরাকে আপনি পাইবেন—

কি উপায়ে—

শিকারা বলিয়াছিল—ভুলেরাকে আমি যদি চাই ভুলেরা আমার হইবে। তখন আমি তাহাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব। মনে হয় শিকারা তাহার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করিবে না।

ঘুরঘুট খাঁ-র ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল।

আপনি যদি ভুলেরাকে আমার কাছে ফিরাইয়া দিতে চাহেন কোনো শর্ত কি আরোপ করিবেন?

না, বিনা শর্তেই ভুলেরাকে আপনি পাইবেন। আপনার এ উপকার যদি করিতে পারি আমি নিজেকে ধন্য মনে করিব। আপনি আমাদের সেনাবিভাগ গঠন করুন আর না-ই করুন আপনার বন্ধুত্ব আমাদের সর্বদাই কাম্য।

ঘুরঘুট খাঁর চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি আগাইয়া আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন, বিনা শর্তেই আপনাদের সৈন্যগঠন আমি করিব। কিন্তু শিকারার সহিত যদি আপনারা বন্ধুত্ব করেন, দেখিবেন আমাকে যেন তাহার কবলে ফেলিয়া দিবেন না। আমার পরামর্শ, যতদিন আমরা নিজেদের সৈন্যদল গঠন না করিতে পারি, ততদিন আপনারা শিকারার সহিত একটা মৌখিক বন্ধুত্ব করুন। তারপর আমরা শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করিলে শিকারার অনুগ্রহের আমরা তোয়াক্কা রাখিব না।

বলিলাম—মৌখিক বন্ধুত্ব তো ভণ্ডামি। তাহার কবল হইতে আপনাকে আমরা মুক্ত রাখিবার চেষ্টা অবশ্যই করিব। আমাকে আমাদের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলই আমরা দিব। সেখানে আপনি আমাদের সৈন্যবাহিনীকে শিক্ষা দিতে পারিবেন। কিন্তু শিকারার সহিত ভণ্ডামি করিতে পারিব না, যদি বন্ধুত্ব করি আন্তরিক বন্ধুত্বই করিব।

ঘুরঘুট খাঁ কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—সে বন্ধুত্ব কিন্তু বেশি দিন টিকিবে না। শিকারা মানবী হইলে হয়তো টিকিত, কিন্তু সে মানবী নয়, দানবী। তেমুজিনকে সে ভেড়া করিয়া ফেলিয়াছিল। তেমুজিন তাহার হাতের পুতুল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মনুষ্যত্ব, তাহার বীরত্ব, তাহার পৌরুষ, কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। সে নিজের স্ত্রীর ভোগের জন্য সমর্থ পুরুষ সংগ্রহ করিয়া দিত। সে রাজা ছিল নামে, আসলে সে ছিল শিকারার ক্রীতদাস। খেখুন সম্প্রদায়ের রাজাকেও সে বশীভূত করিয়াছে নিজের যৌবন দিয়া। শিকারা অমিত শক্তিশালিনী, কিন্তু সে মানবী নয়, দানবী। সেই জন্য আপনাদের সাবধান করিয়া দিতেছি। শিকারা এখন কোথায় গিয়াছে জানেন?

তিনি জুনজিরা পাহাড়ে গিয়াছেন, সেখানে নাকি সর্দার মালেকের গুপ্তধন লুক্কায়িত আছে। সেই গুপ্তধনের সন্ধানে গিয়াছেন তিনি।

ঘুরঘুট খাঁ-র চোখে-মুখে একটা রহস্যময় হাসি ফুটিয়া উঠিল।

তিনি বলিলেন—আমিও ইহাই প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। কিন্তু শিকারাকে হতাশ হইতে হইবে। সর্দার মালেকের বিপুল ধনসম্ভার জুনজুনিরায় আর নাই।

কি হইল?

ডাকাতে লুণ্ঠন করিয়াছে।

ঘুরঘুট খাঁ-র মুখের হাসি আরও ব্যঞ্জনাময় হইল। ঠিক এই সময়ে দূরে বহু অশ্বক্ষুর-ধ্বনি শোনা গেল। আমরা চক্রবালরেখার দিকে চাহিয়া দেখিলাম চক্রাকারে বিরাট এক সৈন্যবাহিনী আমাদের দিকে দ্রুতবেগে আগাইয়া আসিতেছে।

তিরখন এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। এইবার সে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

বলিল, সম্ভবত শিকারা আসিতেছে। আমাদের আর এখানে থাকা ঠিক নয়।

আমরা এখন চলিলাম। পরে আবার কোনোদিন আসিব।

ঘুরঘুট বলিলেন—ঠিক কথা। আমাদের এখন এখানে থাকা উচিত নয়।

তাঁহারা দুইজনেই অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহারা গেলেন শিকারা যে দিক হইতে আসিতেছিল সেই দিকেই। আমাদের জনপদে তাঁহারা যদি আত্মগোপন করিতে চাহিতেন তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের বিরানি জঙ্গলে লুকাইয়া রাখিতে পারিতাম। কিন্তু তাঁহারা পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। শিকারা যে বিরাট প্রান্তর অতিক্রম করিয়া আসিতেছিল, স্থলপথে সেই প্রান্তরই আমাদের জনপদ হইতে নির্গমনের পথ। সুতরাং সেই দিকেই তাহারা ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। আমরা সকলে রুদ্ধ শ্বাসে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

দোহা বলিল, শিকারাকে অভ্যর্থনা করিবার আয়োজন কর। উহাদের আহারের ব্যবস্থা এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভিংড়ার সম্বন্ধে কি করিব তাহা তো এখনও ঠিক হইল না। তোমাদের সকলের মত কি তাহা তোমরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া ঠিক কর। তোমরা সব নদীর ধারে চলিয়া যাও। এখানে এখনই সদলবলে শিকারা আসিয়া পড়িবে। তাহার সম্মুখে আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার আলোচনা না করাই ভালো।

সকলে নদীর তীরে চলিয়া গেলে দোহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—তোমার কি ইচ্ছা, ভিংড়াকে আমরা মারিয়া ফেলি—?

বলিলাম, না, আমার ভাই সে। তাহাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা থাকিলে অনেক আগেই তাহা করিতাম। কিন্তু সে ইচ্ছা আমার আগেও ছিল না, এখনও নাই। কিন্তু তাহাকে আমি ভয় করি। তাহার অলৌকিক শক্তিকে একেবারে উড়াইয়া দিবার মত মনোবল আমার নাই। কিন্তু এটাও মনে হয়, উহার উপস্থিতি আমাদের জনপদের পক্ষে নিরাপদ নয়। কি করা উচিত তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। তোমরা সকলে মিলিয়া যাহা আমাকে বলিবে তাহাই আমি করিব—

আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। দম ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, ভিংড়া বন্দিশালা হইতে পলায়ন করিয়াছে। দম বলিল, আমার মৃত পিতা মহোরির প্রেতাত্মা আসিয়া নাকি বন্দিশালার অর্গল খুলিয়া দিয়াছেন। বৃদ্ধা বাবলা সেখানে ছিল। সে আমার বাবার প্রেতাত্মাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। বাবলা বাবার আমলের লোক। অনেকে বলে সে নাকি বাবার প্রণয়িনী ছিল। বাবলা যদিও এখন জরগ্রস্তা তবু সে বাঁচিয়া আছে এখনও। লাঠি ধরিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, আপনমনে বিড় বিড় করিয়া সর্বদা কি বকে। দম আরও বলিল, ভিংড়ার সহিত নামনা

মেয়েটিও পলাইয়াছে। নামনার কথা হয়তো তোমাদের মনে আছে। নামনা মেয়েটি নিঃসন্তান ছিল। ভিংড়ার নিকট নির্যাতিত হইয়া সে একটি পুত্রসন্তান লাভ করিয়া ছিল। সে-ও নাকি তাহার সহিত পলাইয়াছে। কোথায় পলাইল? জিজ্ঞাসা করিলাম তাহাকে। কোথায় তাহা কেহ জানে না। আমাদের অশ্বশালা হইতে দুইটি অশ্বও লইয়া গিয়াছে তাহারা। আমরা যখন এখানে সকলে জমায়েত হইয়া ঘুরঘুট খাঁকে লইয়া ব্যস্ত ছিলাম সেই সময়ই তাহারা পলাইয়াছে। আমি এখন হঠাৎ আবিষ্কার করিলাম তাহার বন্দিশালার কপাটটা খোলা। তাই ছুটিয়া আপনাকে খবর দিতে আসিয়াছি। আমরা কি তাহার সন্ধানে বাহির হইব?

দোহা কিছুক্ষণ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া রহিল।

তাহার পর বলিল—যে সমস্যার আমরা সমাধান করিতে পারিতেছিলাম না, অদ্ভুত উপায়ে তাহার সমাধান হইয়া গেল। এখন আর কিছু করিবার দরকার নাই। শিকারা আসিতেছে, তাহারই অভ্যর্থনার আয়োজন করা যাক।

শিকারা আসিয়া আমাদের মধ্যে রহিয়া গেল কিছুদিন। আমাদের এলাকার অনেক বিস্তীর্ণ জমি খালি পড়িয়াছিল। শিকারা সেখানে নিজের অনেক তাঁবু খাটাইয়া সসৈন্যে বসবাস করিতে লাগিল। আমরা প্রথম প্রথম কয়েকদিন তাহাদের খাদ্যসরবরাহ করিয়াছিলাম, সেবা-শুশ্রূষারও আয়োজন করিয়াছিলাম, কিন্তু শিকারা বলিল তাহারা এখানে যখন কিছুদিন বসবাস করিবে স্থির করিয়াছে তখন সে আমাদের ভার স্বরূপ থাকিতে চায় না, আমাদের প্রতিবেশীরূপে থাকিতে চায়। তাহারা নিজেরাই নিজেদের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। আমরাই মাঝে মাঝে সেখানে নিমন্ত্রিত হইতে লাগিলাম। নূতন দেশের ক্রীতদাস-দাসীদের নূতন রকম নৃত্য-গীত নূতন রকম শূল্যপক্ক মাংস, নূতন রকম পিষ্টক আমাদের মুগ্ধ করিতে লাগিল। আমরা উহাদের ভদ্রতায় মুগ্ধ হইলাম। কিন্তু উহাদের সৈন্যসামন্ত দেখিয়া আমাদের ভয় হইল। দোহাকে একদিন বিরলে ডাকিয়া বলিলাম—আমাদের জনপদের এতখানি জায়গা দখল করিয়া শিকারার ওই অবস্থান আমার ভালো লাগিতেছে না। উহারা যদি স্বেচ্ছায় চলিয়া না যায় তাহা হইলে আমাদের কি কর্তব্য তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? উহাদের সৈন্যসামন্ত আছে, আমাদের কিছুই নাই, এ অবস্থায় উহাদের সহিত কলহ করাও বুদ্ধি মানের কাজ হইবে না। কিন্তু কি করিব আমরা? ঘুরঘুট খাঁ আমাদের সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করিয়া দিবে এই আশ্বাস দিয়াছিল, কিন্তু সেই যে সে চলিয়া গিয়াছে আর তাহার কোনো খবর পাইতেছি না। তিরখনও আর আসে না। আমার মনে হয় শিকারা এখানে আছে বলিয়াই সম্ভবত তাহারা গা-ঢাকা দিয়া আছে। কিন্তু উহারা কতদিন এখানে থাকিবে তাহার তো স্থিরতা নাই। এখন কি করা যায় বল তো?

দোহা নীরবে সব শুনিল। লক্ষ্য করিলাম তাহার মনে কি একটা বক্তব্য ফুটিয়াছে যাহা সে বলিতে পারিতেছে না। তাহার মুখে কেমন যেন একটা দ্বিধা ও লজ্জার ভাব।

প্রশ্ন করিলাম—ব্যাপার কি? কিছু বলিতেছ না কেন?

দোহা বলিল—ব্যাপার গুরুতর।

বলিয়াই আবার চুপ করিয়া গেল। তাহার পর মাথা চুলকাইয়া বলিল—তোমাকে এখন কথাটা বলিব না ভাবিয়াছিলাম। তবে শেষ পর্যন্ত বলিতেই হইত, কারণ তুমি আমাদের দলপতি। এখনই শোন। শিকারা যেদিন এখানে আসে সেইদিন রাত্রেই সে বিরানি জঙ্গলে গিয়াছিল। কিন্তু প্রহরীরা তাহাকে ঢুকিতে দেয় নাই। বলিয়াছিল এ জঙ্গলে কোনো স্ত্রীলোক প্রবেশ করিবে না ইহাই নিয়ম।

পরদিন রাত্রে শিকারা মুখে গোঁফ-দাড়ি পরিয়া পুরুষের বেশে গিয়া হাজির হইল। প্রহরীকে বলিল—আমি এই বনের অধিপতি দোহার সঙ্গে দেখা করিতে চাই। জরুরি দরকার। শীঘ্র খবর দাও। কিংবা আমাকে তাহার কাছে লইয়া চল। প্রহরী তাহার গোঁফ-দাড়ি দেখিয়া বুঝিয়াছিল যে লোকটি ছদ্মবেশে আসিয়াছে। বলিল, আপনি অপেক্ষা করুন, আমি আমাদের মালিককে খবর দিতেছি। আমি তখন ঘুমাইতেছিলাম। কিন্তু প্রহরীর ডাকাডাকিতে আমাকে উঠিতে হইল। খবর শুনিয়া শিকারার নিকট আসিলাম। আমাকে দেখিয়াই শিকারা গোঁফ-দাড়ি খুলিয়া ফেলিল এবং একমুখ হাসিয়া বলিল—কাল স্ত্রীলোকের বেশে আসিয়াছিলাম বলিয়া আপনার প্রহরীরা আমাকে আপনার কাছে যাইতে দেয় নাই। আজ তাই পুরুষ-বেশে আসিয়াছিলাম, আজও যাইতে দিল না। আমি অবশ্য জোর করিয়া প্রবেশ করিতে পারিতাম, কিন্তু আমি আপনাদের বন্ধু এবং অতিথি, তাই আপনাদের মনে দুঃখ হয় এমন কিছু করিতে চাই না। আপনাদের—বিশেষ করিয়া আপনার—প্রেমই আমি কামনা করি। চলুন, আপনার আস্তানাটা একবার দেখিয়া আসি।

আমি রাজি হইলাম না। বলিলাম—রাত্রে অন্ধকারে ওই জঙ্গলের ভিতর আপনি যাইতে পারিবেন না। আমার এই জঙ্গল যদি দেখিতে চান, দিনের বেলা আসিবেন, আমি আপনাকে সব দেখাইয়া দিব। এক দিনে অবশ্য সব দেখা সম্ভব নয়, অন্তত দশ দিন লাগিবে। আপনার যদি কৌতূহল থাকে, কাল সকালেই আসুন। আপনি এত রাত্রে আসিয়াছেন কেন? শিকারা বলিল, জরুরি দরকার আছে। বলিলাম, কি দরকার বলুন? শিকারা কিন্তু কিছু বলিল না, মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। তাহার পর অপাঙ্গ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, গভীর রাত্রে কোনো একাকিনী নারী কোন্ জরুরি প্রয়োজনে একজন পুরুষের কাছে যায় তাহা কি আপনি জানেন না? বলিলাম, আমি একটু হাঁদা গোছের লোক, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি সরল করিয়া বলুন। তখন সে বলিল, আমার মনের বেদনা যদি বুঝিতে চান আমার পূর্ব-ইতিহাস শুনিতে হইবে। আপনার কি সময় আছে? যদি থাকে তাহা হইলে চলুন ওই গাছটার নীচে আমরা বসি। সেখানে বসিয়া আপনাকে আমার জীবন-কাহিনী শুনাইব। আমার জীবন-কাহিনী শুনিলে আপনার হয়তো আমার উপর অনুকম্পা হইবে। আমি একটু বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু শিকারার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না। কাছেই প্রকাণ্ড একটি বট-বৃক্ষ ছিল, তাহারই তলায় গিয়া দুইজনে উপবেশন করিলাম। বেশ অন্ধকার জায়গাটা। শিকারা আমার খুব কাছে ঘেঁষিয়া বসিবার চেষ্টা করিল। আমি কিন্তু সরিয়া বসিলাম। শিকারা তাহার জীবন-কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল।

বলিল—আমি পিরালার রাণী, পিরালার রাজা তেমুজিন আমাকে বিবাহ করিয়াছিল। আমরা এখন যদিও আপনাদের মত চাষ-বাস করি, কিন্তু পূর্বে আমরাও দস্যুবৃত্তি করিতাম। আমি হুন-কন্যা, আমার পিতা গোমন্দ খাঁ গোবি মরুভূমিতে প্রবল-প্রতাপ হুন-সর্দার ছিলেন। হুনরা নিজেদের মধ্যেই মারামারি করিত। একদল আর একদলকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিবার চেষ্টা করিত। শুনিয়াছি আমার মা নাজনীকে আমার বাবা এক হুন শিবির হইতে লুঠ করিয়া আনিয়াছিলেন। গোমন্দ খাঁ-র হারেমে অনেক বেগম ছিল, কিন্তু আমার মা ছিলেন গোমন্দ খাঁ-র প্রিয়তমা। হুনেদের জীবনে আর পশুর জীবনে বিশেষ কোনো তফাৎ নাই। ঘোড়া, গরু, ভেড়া আর খচ্চরই আমাদের সঙ্গী। তাহারাই আমাদের সম্পত্তি। আমরা তাহাদের মাংস খাই, তাহাদের দুধ দুহিয়া তাহাদেরই চর্ম হইতে প্রস্তুত থলিতে জমাইয়া রাখি, সে দুধ পচিয়া যখন কুমিস হয় তখন তাহা পান করি। তাহাদের

চামড়া দিয়া আমাদের গাত্রাবরণও প্রস্তুত হয়। যুদ্ধে র ঢাল, তরবারির খাপ সবই পশুচর্মের। আমিও বাল্যকাল হইতে শিকার করিতে ভালোবাসিতাম। তাই আমার বাবা আমার নামকরণ করিয়াছিলেন শিকারা। আমার আদরের ছোট্ট নাম ছিল—খুশ। এ নাম কিন্তু আমার বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হারাইয়া গিয়াছে। বোহন খাঁ আর একটি হুন সম্প্রদায়ের সর্দার ছিল। তাহার দলে ছিল তিন হাজার ঘোড়সোয়ার। সে আমার বাবাকে খবর দিল যে আমার বাবা যদি তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাহার দলে যোগ না দেন তাহা হইলে সে আমাদের আক্রমণ করিবে। বাবা রাজি হইলেন না। একদিন গভীর রাত্রে বোহন অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করিল। অনেকে মরিল, অনেকে পলাইয়া গেল। আমার বাবা-মা পলাইতে পারেন নাই। বোহন তাঁহাদের বন্দি করিয়া হত্যা করিয়াছিল। আমাকে ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া আমাদেরই একজন সৈনিক মরুভূমির মধ্যে অন্ধকারে পলাইয়া গিয়াছিল। সে যে কে তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। অন্ধকারে তাঁবুর মধ্যে ঢুকিয়া সে টপ করিয়া আমাকে তুলিয়া লইয়া বলিয়াছিল—আমরা হারিয়া গিয়াছি চল পালাই। ঘোড়ার পিঠে তাহার কোমর জড়াইয়া আমি বসিয়াছিলাম। অন্ধকারের ভিতর অনেকক্ষণ আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াছিলাম। হঠাৎ আমার রক্ষক ঘোড়া হইতে নীচে পড়িয়া গেল। ঘোড়াটাও দাঁড়াইয়া পড়িল। আমিও ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি উঠিতেছেন না কেন? আপনার কি খুব বেশি ব্যথা লাগিয়াছে? কোনো উত্তর পাইলাম না। তিনি নিশ্চ ল হইয়া পড়িয়া রহিলেন। যখন প্রভাত হইল তখনই বুঝিতে পারিলাম তিনি মারা গিয়াছেন। তাঁহার উরুদেশ রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে। দেখিলাম খড়্গাঘাতে তাঁহার চর্মের বর্ম ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। পোশাক দেখিয়া বুঝিলাম লোকটি আমাদের দলের সৈনিক। এত বড় আঘাত সত্ত্বেও সে যে আমাকে ঘোড়ার পিঠে তুলিয়া এতদূর আসিতে পারিয়াছে ইহাতে আমি অবাক হইয়া গেলাম। মৃতদেহের পাশেই বসিয়া রহিলাম অনেকক্ষণ। তাহার পর রোদ উঠিল, চারিদিকের হাওয়া তপ্ত হইয়া উঠিল, ক্ষুধারও উদ্রেক হইল। দেখিলাম ঘোড়াটা অনেক দূরে চরিতেছে। বুঝিলাম ওখানে তাহা হইলে ঘাস আছে। ঘাস থাকিলে জলও আছে। দূরে একটি পাহাড়ও দেখিলাম। পাহাড় হইতে অনেক সময় ঝর্ণার ধারা নামিয়া আসিয়া মরুভূমির মধ্যেও মরূদ্যান সৃষ্টি করে। অনেক সময় সেখানে লোকজনও থাকে। আমি মৃত সৈনিকটির দেহ হইতে অস্ত্রগুলি খুলিয়া লইলাম। একটা তরবারি, বেশ বড় একটা ইস্‌পাহানি ছোরা, কোমরে বাঁধিয়া লওয়াই সঙ্গত মনে হইল। ভাবিলাম সঙ্গে অস্ত্র থাকিলে আত্মরক্ষা করিতে পারিব। ঘোড়াটা যেখানে চরিতেছিল সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। কাছে গিয়া দেখিলাম তাহারও বাম উরুতে একটি প্রকাণ্ড ক্ষত, রক্ত পড়িতেছে না, রক্ত শুকাইয়া ক্ষতের মুখটি বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তবু তাহাতে আরোহণ করিলাম এবং নদীর ধার দিয়া চলিতে চলিতে অবশেষে একটি পাহাড়তলিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম নদীটি সেখানে বেশ চওড়া হইয়াছে, তাহার স্রোতও প্রবল। তাহার তীরে কয়েকটি পাথরের তৈরি বাড়িও দেখিতে পাইলাম। দূরে একটি মন্দিরের চূড়াও দেখা গেল। আমি যাইবামাত্র কয়েকজন বাহির হইয়া আসিল। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই চেহারা একরকম। সকলেরই মাথা কামানো এবং পরিধানে গলা হইতে পা পর্যন্ত হলুদ রঙের আলখাল্লা। তাহাদের ভাষা শুনিয়া মনে হইল তাহারা চীনা। চেহারাও অনেকটা সেই রকম। আমার বাবা মাঝে মাঝে চীন দেশের সীমান্তে লুটপাট করিতে যাইতেন। তখন দুই একটা চীনাকে দেখিয়াছিলাম। অশ্বপৃষ্ঠে আমার সশস্ত্র আবির্ভাব দেখিয়া তাহারা ভয় পাইয়াছে মনে হইল। আমি অনুভব করিলাম এখানে আতিথ্যগ্রহণ করিতে হইলে ইহাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে হইবে। আমি

ঘোড়া হইতে নামিয়া আমার তরবারি এবং ছোরা খুলিয়া তাহাদের পায়ের কাছে রাখিয়া সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিলাম। তাহার পর মুখে এবং পেটে হাত দিয়া ইঙ্গিতে জানাইলাম যে আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর। তখন তাহার মধ্যে একজন—পরে শুনিয়াছি তাহার নাম নামা লিং—আমাকে ধরিয়া তুলিলেন এবং হাত ধরিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেলেন। যদিও ঘরের অবস্থা দেখিয়া মনে হইল তিনি অত্যন্ত গরিব তবু একটি মূল্যবান চীনার বাসনে তিনি আমাকে খাইতে দিলেন। যাহা খাইতে দিলেন তাহা অবশ্য নগণ্য—কিছু বাসী ভাত এবং কি একটা কন্দ-সিদ্ধ। তাহার সঙ্গে একটি লঙ্কার টুকরা। বাসনটি কিন্তু মহামূল্য। আমার খাওয়া শেষ হইলে তিনি সযত্নে বাসনটি ধুইয়া মুছিয়া ন্যাকড়া জড়াইয়া একটি কাচের বাক্সে সযত্নে রাখিয়া দিলেন। দরিদ্রের গৃহে এরূপ মহামূল্য বাসন কি করিয়া আসিল তাহা ভাবিয়া অবাক হইয়া গেলাম। একবার সন্দেহ হইল ইহারা চোর না তো! দেখিলাম আমার তরবারি ও ছোরাটিকেও ইহারা সযত্নে তুলিয়া রাখিল। আমার খাওয়া শেষ হইলে লামা লিং ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল এবং দুইটি লোক লইয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার পর আমাকে ইঙ্গিতে জানাইল যে উহাদের সঙ্গে আমাকে যাইতে হইবে। আমার ঘোড়াটি দাঁড়াইয়া ছিল। আমি তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম। আমার সঙ্গী দুইজনের মধ্যে একজন আমার পিছনে চড়িল এবং আর একজন ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া ঘোড়াটিকে পর্বতশ্রেণীর দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। পর্বতশ্রেণী যত কাছে মনে হইতেছিল দেখা গেল তাহা তত কাছে নয়। মরুভূমিতে ধূলার ঝড় বহিতেছিল, কিছুদূর গিয়া আমরা আর যাইতে পারিলাম না। দুই হাতে মুখ ঢাকা দিয়া সেই তপ্ত বালুর উপরই শুইয়া পড়িলাম। আমি হুন-কন্যা, মরুভূমির তপ্ত হাওয়ার সহিত আমার বাল্যকাল হইতেই পরিচয়, তবু মনে হইতে লাগিল আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। আমার ঘোড়াটি আগে হইতেই অসুস্থ হইয়াছিল, সে-ও এবার শুইয়া পড়িল এবং খানিকক্ষণ পরে মারা গেল। সমস্ত দিন বালুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া আমরা শুইয়া রহিলাম। আমাদের উপর বালুর একটা আস্তরণ পড়িয়া গেল। সন্ধ্যার পর ঝড়টা কমিলে আমরা পদব্রজে আবার যাত্রা করিলাম। যখন সেখানে পৌঁছিলাম তখন অনেক রাত্রি। ক্ষুধায় পিপাসায় ক্লান্তিতে আমি প্রায় মর-মর। পর্বতের তলদেশে দেখিলাম অনেক লোকের বাস। পর্বতের পাশ দিয়া একটি নদীও বহিতেছে। আমার সঙ্গীরা ভিতরে ঢুকিয়া গেল। একটু পরেই আমার জন্য খাবার এবং চমৎকার একটি পানপাত্রে কিছু ঠাণ্ডা জল লইয়া একটি অপরিচিত লোক প্রবেশ করিল। সে আমাদের ভাষায় কথা বলিল—এখন যাইয়া বিশ্রাম কর। কাল সকালে তোমার সব বিবরণ শুনিব। বুঝিলাম এ লোকটি আমাদের ভাষা জানে বলিয়াই ইহার কাছে আমাকে আনা হইয়াছে। পরদিন সকালে অকপটে সব তাঁহাকে বলিলাম। তিনি খানিকটা চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—এ পাহাড়ের গুহায় গুহায় বুদ্ধমূর্তি এবং বুদ্ধের ছবি আছে। সহস্র বুদ্ধের মন্দির নামে ইহা খ্যাত। এখানে তোমাকে থাকিতে দেওয়া নিরাপদ নয়। তোমার সন্ধানে হুনরা হয়তো এখানে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। এখান হইতে কিছু দূরে একটি পথ আছে। সেই পথ দিয়া চীনদেশ হইতে বহু পণ্যদ্রব্য পশ্চিম দেশে যায় উটের পিঠে। সেখানেই লইয়া গিয়া কোনও উটের পিঠে তোমাকে চড়াইয়া দিব আমরা। তাহারা তোমাকে লইয়া গিয়া কোনো বাজারে বিক্রয় করিয়া দিবে। যে তোমাকে কিনিবে সে-ই তোমার আশ্রয়দাতা হইবে। ইহা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই। কাল সকালে আমাদের একজন লোক তোমাকে সেই পথের ধারে উটের আড্ডায় লইয়া যাইবে। উটের আড্ডাটিও বেশ দূরে। উটের পিঠে চড়িয়া যাইতে হইবে। এই পথ দিয়া মাঝে মাঝে দুই একটা উট যায় উটের আড্ডার দিকে। সেই উটেই

আমরা যাইব। আমি বিদেশি হাটের পণ্য একথা শুনিলে উট-ওলা আর আপত্তি করিবে না। পরদিনই একজন উট-ওলা আসিল, আমাকে এবং আমার সঙ্গীকে উটের পিঠে তুলিয়া লইল। দেখিলাম উট-ওলার সহিত আমার সঙ্গীর পূর্ব-পরিচয় আছে। মনে হইল কিছু ব্যবসার সম্পর্কও আছে। কারণ একটু পরেই সে থলি হইতে একটি মূল্যবান চীনের বাসন বাহির করিয়া বলিল—মরুভূমির মধ্যে এইটি কুড়াইয়া পাইয়াছি। চীনদেশ হইতে একদল বণিক অনেক জিনিসপত্র লইয়া বিদেশের বাজারে যাইতেছিল। একদল হুন আসিয়া তাহাদের আক্রমণ করে। কিছু জিনিস হুনেরা লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে, কিছু জিনিস লইয়া বণিকেরা পলাইতে পারিয়াছে। পলাইবার সময় কিছু জিনিস তাহারা এদিকে ওদিকে ফেলিয়া গিয়াছে। আমি যখন আসিলাম তখন দেখিলাম কিছু খালি পেটিকা ওদিকে ছড়ানো রহিয়াছে। তাহারই একটির মধ্যে এইটি পাইয়াছি। তুমি যদি লইতে চাও লও। যে মূল্য দিবে তাহাই লইব। আমার সঙ্গীটি তাহার হাত হইতে আংটিটি খুলিয়া দিল। বলিল—আমার পূর্ব-পুরুষরা এককালে চীনে ছিলেন। সে দেশকেই আমি স্বদেশ মনে করি। সে দেশের শিল্পীরা যে জিনিস প্রস্তুত করে তাহা আমার নিকট বহুমূল্য। আমার আংটিটি লইয়া ওটি আমাকে দিন। উট-চালক আপত্তি করিল না।

উটের আড্ডায় গিয়া দেখিলাম সেখানে অনেক উট। তাহারা সকলেই দূরদেশের যাত্রী। কেহ বোখারা যাইবে, কেহ তেহারানে, কেহ রোমে, কেহ সিডনে। আমাকে দেখিবামাত্র ক্রেতারা প্রলুব্ধ হইয়া উঠিল। অবশেষে পাঁচশত রৌপ্যমুদ্রা দিয়া একজন রোমীয় বণিক আমাকে খরিদ করিল। লোকটি বৃদ্ধ। তাহার আচরণে পিতৃসুলভ স্নেহের পরিচয় পাইলাম। দেখিলাম তিনিও আমার ভাষা জানেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আমাকে কোন হাটে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিবেন? তিনি বলিলেন, তুমি যদি ভালোভাবে থাকো তোমাকে বিক্রয় করিব না। ব্যবসা করিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি তাহা লইয়া আমি ভারতবর্ষে চলিয়া যাইব। রোমের রাজারা বড় অত্যাচারী, রোম সাম্রাজ্যে আর থাকিব না। আমার আত্মীয়স্বজন সব মারা গিয়াছে। তোমাকে লইয়া ভারতবর্ষে নূতন ঘর বাঁধিব। তুমি আমার মা হইবে, আমি হইব তোমার ছেলে। রাজি আছ তো? আমি বলিলাম, আপনি যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহাই হইবে। সমস্ত রাত উটের পিঠে চড়িয়া অজানা ভবিষ্যতের নানা স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে পথ চলিতেছিলাম। এমন সময় একদল ডাকাত আসিয়া আমাদের আক্রমণ করিল। বৃদ্ধ মারা গেলেন। আমাকে বন্দি করিয়া ডাকাতের দল ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া মরুভূমির মধ্যে ছুটিতে লাগিল। অবশেষে ডাকাতরা আমাকে তাহাদের সর্দারের কাছে লইয়া গেল। সর্দার আমাকে টিপিয়া টুপিয়া দেখিলেন এবং শেষে কহিলেন মালটি ভালো, কিন্তু আমাদের এখানে স্থানাভাব। মেয়ের সংখ্যা আর বাড়ানো উচিত নয়। এটাকে কাল হাটে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া দাও। বেশ মোটাসোটা আছে, ভালো দাম পাওয়া যাইবে। আমি এখন যে রাজ্যের রাণী সেই পিরালা রাজ্যের নিকটই একটি বড় হাট বসে। সেই হাট হইতে তেমুজিন আমাকে কিনিয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করিল। আমিই তেমুজিনের প্রথমা পত্নী। বিবাহের পর আবিষ্কার করিলাম যে তেমুজিন যদিও পুরুষ কিন্তু তাহার পৌরুষ নাই। তেমুজিন কিন্তু লোক বড় ভালো। যদিও তাহার পূর্বপুরুষেরা এককালে যাযাবর হুন ছিল, কিন্তু তাহারা বহুদিন হইতে দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের মতো চাষবাস করিয়া পিরালা অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। সকলেই তাহাকে ভালোবাসে। হুন দস্যুরা মাঝে মাঝে তাহার রাজত্বে হানা দিয়া লুটপাট করিত। পিরালা রাজ্যের লোকেরা যতটা পারিত আত্মরক্ষা করিত। কিন্তু তাহাদের বহু ক্ষতি ও

বহুলোকের প্রাণহানি দেখিয়া আমি তেমুজিনকে বলিলাম—বিষয়-আশয় থাকিলে তাহা রক্ষা করিবার জন্য সশস্ত্র বাহিনী রাখিতে হইবে। আমি হুনের মেয়ে, আমি তোমাকে সে বিষয়ে সাহায্য করিব। পিরালা রাজ্যের পাশেই খেখুনরা থাকে। আমি তাহাদের দলপতিকে একদিন নিমন্ত্রণ করিলাম। তাঁহার একটা সেনাবাহিনী ছিল। তিনি বলিলেন আরব দেশ হইতে রোম হইতে তিনি শিক্ষক আনাইয়া এই সেনাবাহিনী করিয়াছেন। আমাদেরও তাহাই করিতে উপদেশ দিলেন। আমরা তাহাই করিলাম। প্রায় পাঁচ বৎসর পরিশ্রম করিয়া আমরা একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইলাম। তোমাদের যেমন বিরানি জঙ্গল আছে আমাদের পিরালাতেও তেমনি আছে পোলং। পোলং জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া আমাদের শিক্ষকরা আমাদের যুদ্ধ শিখাইতেন। প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ শিখাইলে বিপদ আছে। শত্রুরা জানিতে পারিলে আক্রমণ করিবে এ ভয় ছিল। আমিও পোলং জঙ্গলে সৈন্যদের সহিত থাকিয়া যুদ্ধ -বিদ্যা শিখিয়াছি। তেমুজিনও শিখিয়াছিল, কিন্তু বড় দুর্বল ছিল সে। রাজা হিসাবে সে-ই প্রধান সেনাপতি হইয়াছিল। সেনাপতি হইবার পূর্ণ যোগ্যতা সে কিন্তু অর্জন করে নাই। আমি তাহার পাশে না থাকিলে বহুদিন পূর্বেই শত্রুরা আমাদের বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিত। খেখুনদের রাজা জিজিগম ভীষণ প্রকৃতির লোক, প্রত্যহ একটি করিয়া ভেড়া আহার করে। কাহারও সহিত হাসিয়া কথা কয় না। কিন্তু আমি তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছিলাম। এই বন্ধুত্ব আমাদের পিরালাকে রক্ষা করিয়াছে। ওই হুন সর্দার মালেক—আমাদের যে ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল, জিজিগম সসৈন্যে সাহায্য না করিলে আমরা মুশকিলে পড়িতাম। যাই হোক এখন পিরালা ও খেখুন রাজত্বকে একটি বিরাট রাজত্ব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কারণ আমরা অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। তেমুজিন মারা যাইবার পর জিজিগম আমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু আমি রাজি হই নাই। কারণ তাহার অনেক পত্নী। দুই একজনকে ডাইনী বলিয়াও সন্দেহ হয়। তোমাদের ভিংড়ার মত তাহারা এমন অনেক কিছু কাজ করে যাহা ভয়ানক। দিনের বেলা তাহারা অপরূপ রূপসী, কিন্তু রাত্রে তাহারা ভয়ঙ্করী। অনেকে বলে রাত্রে তাহারা ব্যাঘ্রিনীর রূপ ধারণ করিয়া শত্রু নিপাত করে। আমি তাই জিজিগমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। সর্দার মালেকের গুপ্তধন জুনজিরা পর্বতে লুক্কায়িত ছিল। তাহা অধিকার করিতে পারিলে তাহার কিছু অংশ জিজিগমকে দিব। কিন্তু জুনজিরায় গিয়া কিছুই পাইলাম না। মনে হয় ঘুরঘুট তাহা সরাইয়া ফেলিয়াছে। তাই ভাবিতেছি ঘুরঘুটের পত্নী ভুলেরাকেই উপহার-স্বরূপ জিজিগমের নিকট পাঠাইয়া দিব। যুবতী নারী পাইলে জিজিগম খুব খুশি হয়। আপনি হন না?

এই বলিয়া শিকারা আমার মুখের দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। আমি তাহার মতলবটা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি তো জান আমি তোমাদের মত নই। আমি মাছ-মাংস খাই না, নারীসঙ্গও কখনও করি নাই। করিবার প্রবৃত্তি যে হয় না, তাহা নয়। আমি কিন্তু সে প্রবৃত্তি দমন করি। দমন করিয়া একটা বিশেষ ধরনের সুখ পাই। শিকারাকে কি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না। চুপ করিয়া রহিলাম। শিকারা আবার বলিল— আমার জীবন-কাহিনী আপনাকে বলিলাম, তাহার কারণ আমি আপনাকে জীবনের সঙ্গী রূপে পাইতে চাই। আমি একাধিক পুরুষসঙ্গ করিয়াছি, কিন্তু প্রকৃত পুরুষের দেখা পাই নাই। আপনাকে দেখিয়াই আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল—হ্যাঁ এই তো একটা পুরুষের মত পুরুষ। আপনার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি, আপনাকে আমি চাই। যদি পাই তাহা হইলে আমার সৈন্যরা আপনার এলাকা রক্ষা করিবে, আমরা সেনাপতিরা আপনাদের জন্য নূতন বাহিনী সৃষ্টি করিবে, আমার সমস্ত সামর্থ্য, সমস্ত প্রতাপ, সমস্ত সম্পত্তি আপনি ইচ্ছামত

ব্যবহার করিতে পারিবেন। আমার বেদনা আপনাকে দূর করিতে হইবে, আমার পিপাসা আপনাকে মিটাইতে হইবে।

আমি তবু চুপ করিয়াই রইলাম।

শিকারা তখন প্রশ্ন করিল—চুপ করিয়া আছেন কেন, কিছু একটা বলুন।

তখন বলিলাম—আমি খুব স্বাভাবিক মানুষ নই। স্বাভাবিক মানুষ হইলে আপনার এ প্রস্তাব আমি সানন্দে গ্রহণ করিতাম। পুরুষ-পশু স্ত্রী-পশু দেখিলে যে সব আচরণ করে, তাহা আমি করিতে পারি না। মাঝে মাঝে আমার যে উত্তেজনা হয় না তাহা নহে, কিন্তু সে উত্তেজনা দমন করিয়া আমি আনন্দ পাই। সেজন্য মনে হইতেছে আপনার জীবন-সঙ্গী হইবার যোগ্যতাই বোধহয় আমার নাই, আকাঙ্ক্ষাও নাই। কিন্তু আপনার মত শক্তিময়ী নারীর বন্ধুত্ব আমি কামনা করি। আমি বুঝিয়াছি আমাদের ভূসম্পত্তি রক্ষা করিতে হইলে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করা প্রয়োজন। তাহার আয়োজনও আমরা করিয়াছি কিন্তু ঠিক মত নির্দেশ দিয়া আমাদের পরিচালনা করিবে এরূপ লোক আমরা পাই নাই। আপনি কি এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করিতে পারেন? আপনি আমাদের বন্ধু হইলে এ বিষয়ে আমাদের আর কোনো দুর্ভাবনা থাকিবে না।

আমার কথা শুনিয়া শিকারা হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমার মনে হইল যেন একটা হায়না ডাকিতেছে। হাসি থামাইয়া সে শেষে বলিল—স্বার্থের বন্ধন ছাড়া পৃথিবীতে কোনো বন্ধনই টেকে না। আমি কোন স্বার্থে আপনার হিতৈষী হইব? আপনাকে জীবনসঙ্গী রূপে পাইলে আপনার সম্পত্তিকে আমার সম্পত্তি রূপে গণ্য করিতে পারি। কিন্তু আপনি যখন তাহাতে রাজি নন তখন আমি তাহা পারি না। আমার সেনাপতিরাই তাহাতে রাজি হইবে না। আপনি যদি আমাকে বিবাহ করিতেন তাহা হইলে আমার স্বামীরূপে তাহারা আপনাকে সম্মান করিতে বাধ্য হইত। আপনার আদেশ অনুসারে চলিতে আপত্তি করিত না। আপনাকে দেখিয়া সত্যই আমার খুব ভালো লাগিয়াছে, আপনার পরিচয় পাইলে তাহাদেরও ভালো লাগিত। আপনিই তখন আমার রাজত্বের অধিপতিও হইতেন। আপনি এবং আমি এক বিশাল রাজত্বের রাজা ও রাণী হইতে পারিতাম। আপনাকে সঙ্গীরূপে পাওয়াই আমার উদ্দেশ্য। আমার জীবনের পিপাসা আপনিই মিটাইতে পারিবেন। আপনি ব্যাপারটা ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখুন।

আমি বলিলাম—ভাবিবার জন্য তাহা হইলে কয়েকদিন সময় চাই। তাছাড়া ইহার আর একটা দিকও আছে। আমাদের দলের দলপতিকে সব কথা খুলিয়া বলিতে হইবে। তাহার সম্মতি না থাকিলে এককভাবে আমি কিছু করিতে পারি না। করা উচিতও হইবে না। সময় মত আমি টালাকে সব খুলিয়া বলিব। শিকারা এমন আকুল ভাবে আমার দিকে চাহিয়া রহিল যেন আমাকে গিলিয়া খাইবে। আমি আর কালবিলম্ব করিলাম না, সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িলাম। বলিলাম—যত শীঘ্র সম্ভব আপনাকে খবর দিব। আপনি এখন আপনার তাঁবুতে ফিরিয়া যান। এই বলিয়া আমি বিরানির জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িলাম। ঘটনাটা কয়েক দিন পূর্বেই ঘটিয়াছে, আমি তোমাকে এখন বলিব না ভাবিয়াছিলাম। নিজেই ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছিলাম কি করা উচিত। কিন্তু ভাবিয়া কোনো কূল-কিনারা করিতে পারিলাম না। ভাবিতেছিলাম কিছুদিনের জন্য আত্মগোপন করিয়া এখান হইতে চলিয়া গেলে শিকারা হয়তো বুঝিবে তাহার প্রস্তাবে আমি রাজি নই। তখন তোমার সহিত আলাপ করিয়া সে যাহা হয় ঠিক করিবে। কিন্তু এটাও আমার খুব মনঃপূত হইতেছিল না, কি করিব ঠিক করিতে পারিতেছিলাম

না। এমন সময় তুমি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলে সব তোমাকে খুলিয়া বলিলাম। এখন কি করা উচিত ভাবিয়া দেখ।

আমি বলিলাম, শিকারাকে বিবাহ করিয়া তুমি যদি আমাদের অধিপতি হও, আমার তাহাতে আপত্তি নাই। তুমি আমাদের মাথার উপরে থাকিলে আমরা নিশ্চিন্ত থাকিব। আমি যদিও আমাদের দলের দলপতি, আমার বাবাই আমাকে দলপতি করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমি মনে মনে বরাবরই জানি তুমিই আমাদের প্রকৃত দলপতি। তুমি যাহা ঠিক করিবে তাহাই হইবে। শিকারাকে বিবাহ করিয়া তাহার সৈন্যসামন্ত যদি আমরা পাই, আমাদের সেনাবাহিনী নির্মাণে সে যদি আমাদের সাহায্য করে, তাহা হইলে ভালোই তো হয়। শিকারাকে বিবাহ করিতে তোমার সত্যই কি খুব আপত্তি আছে? সারাজীবন অবিবাহিত থাকিয়া তুমি এ রকম অস্বাভাবিক জীবন যাপন করিবে কেন তাহাও তো বুঝিতে পারিতেছি না।

ইহার উত্তরে দোহা যাহা বলিয়াছিল তাহা বিস্ময়কর। সেই আদিম যুগেও মানুষ যে এত মহৎ হইতে পারে ইহা শুনিয়া তোমরাও হয়তো বিস্মিত হইবে। কিন্তু একটা কথা তোমরা বিশ্বাস কর। মনুষ্যত্বের আস্বাদ সে যুগেও কোনো কোনো মানুষ পাইয়াছিল। কোনো কোনো মানুষ মাঝে মাঝে মহত্বের মহিমা উপলব্ধি করিত। স্বার্থপর হওয়া অপেক্ষা নিঃস্বার্থপর হওয়া যে বেশি তৃপ্তিকর ইহা সে যুগের দুই একটা মানুষ বুঝিয়াছিল। তাহাদের সেই ধারাই মানব পশুর মধ্যে এখনও মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করিয়া তোমাদের সমাজকে অলঙ্কৃত করে।

দোহা বলিল—আমি অবিবাহিত থাকিতে চাই তাহার আর একটা কারণ আমার বাবা কে ছিলেন তাহা আমি জানি না। কিন্তু তুমি যে ডঙ্কার বংশধর তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ডঙ্কার বংশধরই এখানে বরাবর দলপতি থাকুক ইহাই আমার ইচ্ছা। আমি যদি বিবাহ করি আমারও একটা বংশ হইবে এবং তাহার সহিত তোমার বংশধরদের মিল যে হইবেই এমন কোনো কথা নাই। খুব সম্ভবত হইবে না। আমি সেটা চাহি না তাই আমি বিবাহ করিব না। তোমার বাবা তোমাকে দলপতি নির্বাচন করিয়াছিলেন, তুমিও কালক্রমে তোমার বংশধরদের ভিতর হইতে দলপতি নির্বাচন করিবে ইহাই আমার ইচ্ছা। আমার বংশধররা থাকিলে তাহাতে বিঘ্ন হইবে, সুতরাং আমি বিবাহ করিব না ঠিক করিয়াছি।

আমি বলিলাম—আমার বংশে হয়তো দলপতি হইবার উপযুক্ত ছেলে না-ও জন্মিতে পারে, কিন্তু তোমার বংশে হয়তো জন্মিতে পারিত—

আমরা যেখানে বসিয়া আলাপ করিতেছিলাম তাহার পাশেই একটা ঝোপ ছিল। সেই ঝোপের ভিতর হইতে কণ্টকা বাহির হইয়া আসিল।

আমি দোহাকে প্রশ্ন করিলাম—কণ্টকাকে ব্যাপারটা খুলিয়া বলিব?

দোহা আপত্তি করিল না।

সবিস্ময়ে দেখিলাম কণ্টকা ফুলের সাজে সাজিয়া আসিয়াছে। কণ্টকা একটু সাজসজ্জা-প্রিয়। আজ যেন সাজটা একটু বিশেষ ধরনের মনে হইল। আমাদের দেখিয়া বলিল—তোমরা দুজনে এখানে বসিয়া কি করিতেছ?

বলিলাম—পরামর্শ করিতেছি। শিকারা দোহাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে। কি করা উচিত তাহাই ভাবিতেছি।

কণ্টকা কোনো মন্তব্য না করিয়া হাসিমুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল—শিকারা শিকার-প্রিয়, নিত্য নূতন শিকার করিতে চায়। আমি জানি সে তাহার প্রধান সেনাপতির শিবিরে রোজ রাত্রে যায়। প্রধান সেনাপতি জোখরু তাগড়া বলিষ্ঠ জোয়ান। তাহার সহিত শিকারা তাহা হইলে কি সম্বন্ধ ত্যাগ করিল? যদি করে তাহা হইলে জোখরু দোহার শত্রু হইবে, এ কথা কিন্তু আমি বলিয়া দিতেছি। আর জোখরু যদি শিকারাকে ত্যাগ করে তাহা হইলে শিকারার সৈন্যদের মধ্যেও বিদ্রোহ দেখা দিবে। সুতরাং শিকারাকে বিবাহ করা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না এখন। তাছাড়া, দোহার আশায় আমাদের চম্বা চিরকুমারী হইয়া আছে, আমার ধারণা, দোহারও কিছু দুর্বলতা আছে তাহার সম্বন্ধে—এ ব্যাপারটার কোনো মূল্যই দিবে না তোমরা? শিকারা আসিয়া ছোঁ মারিয়া আমাদের দোহাকে লইয়া যাইবে?

দোহা বলিল, আমাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া যাওয়া সহজ নয়। আমি বিবাহই করিব না ঠিক করিয়াছি। এখন প্রশ্ন হইতেছে শিকারার কবল হইতে কি করিয়া আমরা উদ্ধার পাই? সে সৈন্য-সামন্ত লইয়া আমাদের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে, বলিতেছে আপনি আমার জীবনসঙ্গী হউন—আমরা উভয়ে এক বিরাট রাজ্যের রাজারাণী হই, এ অবস্থায় কি করিব ভাবিয়া পাইতেছি না। উহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমি যদি শিকারাকে সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করি তাহা হইলে আমরা সকলেই বিপন্ন হইব, তাই ভাবিতেছি কোনো ছুতায় কাল-হরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাহাই করিতেছি। তুমি ফুলের সাজ পরিয়া কোথায় যাইতেছ?

কণ্টকা হাসিয়া বলিল—ডিম্বা হইতে একটা নিমন্ত্রণ আসিয়াছে, সেখানে যাইতেছি। কাল সেখানকার একজন লোক আসিয়া গোপনে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছে। বলিয়াছে আমি যেন গোপনেই সেখানে যাই। কিন্তু আমি দলপতির কাছে অনুমতি লইতে আসিয়াছি তাহাকে না জানাইয়া অতদূরে যাওয়াটা সঙ্গত হইবে না। আমি আমাদের একটা ঘোড়াও লইয়া যাইব। হাঁটিয়া গেলে ডিম্বায় পৌঁছিতে প্রায় কুড়ি দিন লাগিবে। ঘোড়ায় গেলে হয়তো শীঘ্র পৌঁছিব। আমি একটা ঘোড়া পাইতে পারি কি?

আমি বলিলাম—ডিম্বা তো এখান হইতে অনেক দূর। সেখানে আমরা কেহ কখনও যাই নাই। শুনিয়াছি সেখানে ব্যাঘ্র সম্প্রদায়ের লোকেরা রাজত্ব করে। যদিও আমাদের মত চাষবাসই করে, কিন্তু তাহারা হিংস্র প্রকৃতির লোক। বাহিরে কাহাকেও ঢুকিতে দেয় না। তুমি সেখানে বন্ধু যোগাড় করিলে কিরূপে? তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে? বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার। সব খুলিয়া বল দেখি—

কণ্টকা হাসিমুখে দাঁড়াইয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। কোনো জবাব দিল না। তাহার পর বলিল—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি কোনো কথা প্রকাশ করিব না। শুধু একটা কথা বলিতে পারি সেখানে গেলে আমাদের মঙ্গল হইবে, অমঙ্গল হইবে না। যিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তিনি আমাকে এই আশ্বাস দিয়াছেন। তিনি আমাকে গোপনে একা যাইতে বলিয়াছেন। কিন্তু তোমার অনুমতি লওয়াটা আমি সঙ্গত মনে করিলাম। তাই তোমাকে বলিলাম। আমাকে আর এ বিষয়ে বেশী প্রশ্ন করিও না, উত্তর দিব না।

দোহা হাসিয়া প্রশ্ন করিল—ফুলের সাজ পরিয়াছ কেন?

কণ্টকা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, ইচ্ছা হইল, পরিলাম। আমি বলিলাম, তোমার খুশি অনুসারেই তুমি চল। আমরা বাধা দিব না। একটা ভালো ঘোড়া লইয়া যাও। আর আমার পরামর্শ যদি শোন, আর একটা ঘোড়ায় দমকে লইয়া যাও। সে দূরে দূরে তোমার পিছু পিছু যাক।

কণ্টকা বলিল—না, আমি তাহাদের কথা দিয়াছি একাই যাইব। তবে সঙ্গে কিছু অস্ত্র লইব।

তাহার পর দোহার দিকে ফিরিয়া বলিল—শিকারাকে প্রশ্রয় দিও না। তাহার সঙ্গে দেখা না করাই ভালো। বিরাট বিরানি জঙ্গল তোমাকে রক্ষা করিবে। আমি যতদিন পর্যন্ত না ফিরি ততদিন সেখানে আত্মগোপন করিয়া থাকাই ভালো। আমি চলিলাম—

কণ্টকা মাথা নাড়িয়া মুচকি হাসিয়া ঝোপের মধ্যে অন্তর্ধান করিল।

দোহা বলিল—কণ্টকার উপদেশই পালন করিব। সম্প্রতি বিরানির মধ্যে বিরাট একটা গুহা করিয়াছি। তাহার চারিদিকে নানারকম গাছ পুঁতিয়াছি। গুহার প্রবেশ-পথে দুইটি গাছ আছে, গাছকে ঢাকিয়া আছে দুইটি প্রকাণ্ড লতা। বাহির হইতে গুহার মুখ দেখা যায় না। গুহাটি মাটির নীচে অনেক দূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। সেখানেই আমি থাকিব। শিকারা যদি আমার খোঁজ করে, বলিও আমি অন্যত্র গিয়াছি। পনেরো দিনের আগে ফিরিব না। তুমিও আমার সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিও না। দেখা করিতে গেলেই ব্যাপারটা জানাজানি হইয়া যাইবে। আমি কেবল বিরানির একজন কর্মীকে বলিব আমি কোথায় আছি। সে যদি বোঝে কোনো কারণে আমাকে অবিলম্বে খবর দেওয়া উচিত, তাহা হইলেই আমাকে খবর দিবে। শিকারা যদি আসিয়া খোঁজ করে, বলিও আমি এখানে নাই।

পরদিনই শিকারা আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিলাম দোহার জন্য সে বড়ই উতলা হইয়া উঠিয়াছে। দেখা হইবামাত্র বলিল—আমি বিরানি জঙ্গল হইতে আসিতেছি। সেখানে দোহাকে তো দেখিলাম না। দোহার খোঁজেই গিয়াছিলাম। সেখানকার একজন লোক বলিল দোহা কোথায় গিয়াছে তাহা তাহারা জানে না। সে নাকি এখানে নাই। আপনি তাহার কোনো খবর জানেন কি—?

বলিলাম, আমাকেও সে বলিয়াছিল সে বিদেশে যাইবে। ঠিক কোথায় যাইবে তাহা বলে নাই—।

আমরা মিথ্যাভাষণে অভ্যস্ত ছিলাম না, তাই এই মিথ্যা কথাটা বলিয়া মনে মনে অস্বস্তি ভোগ করিতে লাগিলাম। আমার মনোভাব হয়তো আমার মুখে আভাসিত হইয়াছিল।

শিকারা বলিল—আমার নিকট সত্য গোপন করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা সত্য তাহা আমি জানি। দোহাকে আমি বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু মনে হয় দোহা আমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক নয়। তাই সে আমাকে এড়াইয়া চলিতেছে, তাই সে কোথাও আত্মগোপন করিয়াছে। কিন্তু কতদিন আত্মগোপন করিয়া থাকিবে? তাহাকে একদিন না একদিন ফিরিতেই হইবে। তাহার জন্য আমি অপেক্ষা করিব। আপনি দলপতি, আপনাকেও কথাটা বুঝাইয়া বলি। আমি সত্যই আপনাদের হিতৈষী, আমি আপনাদের আপন লোক হইয়া থাকিতে চাই, আমি আপনাদের অবলম্বন করিয়া এ অঞ্চলে প্রকাণ্ড রাজত্ব স্থাপন করিতে চাই। কিন্তু সর্বাগ্রে চাই দোহাকে। আমি অনেক পুরুষের সংস্রবে আসিয়াছি, কিন্তু দোহার মত বিরাট পুরুষ আগে কখনও দেখি নাই। আমাকে দেখিয়া অনেক পুরুষ মুগ্ধ হইয়াছে। কিন্তু দোহা আমার সম্বন্ধে এমন উদাসীন কেন বুঝিতে পারিতেছি না।

বলিলাম—দোহা আপনার সম্বন্ধে উদাসীন নয়। তাহার কথাবার্তায় বুঝিয়াছি সে আপনাকে মনে মনে খুব শ্রদ্ধা করে। আমাদের সহিত আপনি যে ব্যবহার করিতেছেন এ জন্য সে কৃতজ্ঞ। কিন্তু সে একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক। কোনো নারীর সঙ্গই সে কামনা করে না। মাছ-মাংস খায় না। তাহার স্বভাব সত্যই একটু অদ্ভুত। আমার মনে হয় সে কোনো গোপন কারণে এই খাপছাড়া জীবন যাপন করিতেছে। আমার মনে হয় না এ পথ হইতে কেহ তাহাকে বিচলিত করিতে পারিবে। দোহা বড় একরোখা লোক। সম্ভবত কোনো ব্রত-পালন করিতেছে সে। সে যদি আপনাকে বিবাহ করিত, আমি

খুব খুশি হইতাম। নিশ্চিন্তও হইতাম। আপনার সেনাপতি জোখরু যদি আমাদেরও একটা সেনাবাহিনী গঠন করিয়া দিত, বাহিরের শত্রু-ভয় আমাদের আর থাকিত না। কিন্তু দোহা যদি আপনাকে বিবাহ না-ই করে, তাহা হইলে এ বন্ধুত্ব কি থাকিবে না?

শিকারা হাসিয়া উত্তর দিল—হয়তো মৌখিক বন্ধুত্ব থাকিবে। কিন্তু তাহা কি নির্ভরযোগ্য? আত্মীয়তার বন্ধনই বন্ধুত্বকে দৃঢ় করে দোহা একথা কেন বুঝিতেছে না? যাই হোক, আমি কালই এখান হইতে চলিয়া যাইব। আমার পিরালায় একবার যাওয়া প্রয়োজন। ঘুরঘুট খাঁকে বিশ্বাস নাই। সে আবার হয়তো আমার রাজ্য আক্রমণ করিবে। আমার নিকট হইতে ভুলেরাকে সে হয়তো লইবার চেষ্টা করিবে। তাই ভাবিতেছি ভুলেরাকে আপনার কাছেই কাড়িয়া রাখিয়া যাইব। ঘুরঘুট সত্যই একজন বীরপুরুষ, সে যাহাতে আমার দলে যোগ দেয় এই প্রস্তাব করিয়া তাহার নিকট একজন লোক পাঠাইব মনে করিয়াছি। ভুলেরাকে সাবধানে রাখিবেন সে যেন পলাইয়া না যায়। ভুলেরা-মূল্যেই আমি ঘুরঘুটকে কিনিব।

আমি বলিলাম—মাপ করিবেন, ভুলেরার দায়িত্ব আমি লইতে পারিব না। আমরা শান্তিপ্রিয় লোক। ভুলেরাকে আমরা আটকাইয়া রাখিয়াছি এ খবর পাইলে ঘুরঘুট খাঁ হয়তো আমাদেরই শত্রু হইয়া উঠিবে। সেটা আমি চাই না।

শিকারা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বলিল—শত্রুকে ভয় পান? পৃথিবীতে সবাই শত্রু। শত্রুর সহিত হয় যুদ্ধ করুন, না হয় কায়দা করিয়া বন্ধুত্বের ভান করুন। আপনারা শান্তিপ্রিয়, কিন্তু শান্তি চাহিলেই কি পাওয়া যায়? অশান্তি কোন দিক দিয়া কখন আসিবে কে বলিতে পারে? যেদিক দিয়াই আসুক, অশান্তি আসিবেই। যাই হোক, এখন চলিলাম। কিছুদিন পরে আবার আসিব।

পরদিন শিকারা তাহার সৈন্যসামন্ত লইয়া চলিয়া গেল। ভুলেরাকেও লইয়া গেল সে। শিকারা চলিয়া যাইবার পরদিনই দোহা বিরানি জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আসিল।

বলিল, শিকারা আবার ফিরিয়া আসিবে। সে আমাদের এই অঞ্চলটা অধিকার করিতে চায়। আমাকে বিবাহ করিবার যে প্রস্তাবটা সে করিয়াছে তাহা একটা অজুহাত মাত্র। আমাদের অঞ্চলটা সে দখল করিয়া ভোগ করিতে চায়। তেমুজিনকে বিবাহ করিয়া সে তাহাকে পুতুলে পরিণত করিয়াছিল। আমাকেও তাহাই করিতে চায়। আমাদের বিরানি জঙ্গলে নানারকম ফলের গাছ আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা রোপণ করিয়া গিয়াছিলেন। সে সব দেখিয়া শিকারার চোখ-মুখে লোভের যে লালায়িত রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমি দেখিয়াছি। তাহার পিরালা রাজ্য মরুভূমির ওপারে। সেখানে খেজুর ছাড়া অন্য গাছ জন্মায় না, কাছে-পিঠে কোনো নদী নাই। জমি সব শুষ্ক। ফসলও ভালো হয় না। মাংসই উহাদের প্রধান খাদ্য। কিছুদিন আগেই উহারা মরুচারী দস্যু ছিল। এখন গৃহস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছে। তাই আমাদের এই জনপদটা দেখিয়া শিকারার পছন্দ হইয়াছে। মনে হয় সৈন্যসামন্ত লইয়া সে আবার আসিবে এবং জোর করিয়া আমাদের সব অধিকার করিবে। আমার তো এখন সৈন্যসামন্ত কিছু নাই। তাই আমার মনে হয় তুমি আমাদের রাজার কাছে গিয়া সাহায্য প্রার্থনা কর। তাঁহাকে আমরা প্রতি বছর শস্য পাঠাই, চামড়া পাঠাই, ফল পাঠাই। মনে হয় তিনি আমাদের সাহায্য করিবেন।

আমি বলিলাম—আমাদের রাজা আছে শুনিয়াছি। তাঁহাকে দেখি নাই। তিনি বহুদূরে থাকেন।

অনেক নদী পার হইয়া তাঁহার কাছে পৌঁছিতে হয়। আমরা তো কেহ কখনও সেখানে যাই নাই। আমাদের হাটের ব্যাপারী মর্দন আমাদের জিনিসগুলি লইয়া রাজার কর্মচারীর কাছে সেগুলি পৌঁছাইয়া দেয়। সে কর্মচারীর সহিতও আমাদের পরিচয় নাই। তবে মর্দনকে খবর দিয়া দেখি, সে কি বলে।

দোহা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—তাহাকেও বরং সেই রাজকর্মচারীর কাছে পাঠাও। মোট কথা, আত্মরক্ষার জন্য অবিলম্বে আমাদের কিছু একটা করা দরকার। কণ্টকা কি উদ্দেশ্যে যে কোথায় চলিয়া গেল তাহাও তো বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি আর একটা কাজ কর, বিদেশের হাটে লোক পাঠাও। কিছু অস্ত্র কিনিয়া আনুক। আমাদের লোকবল আছে, তাহারা হয়তো যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত নয়, কিন্তু তাহাদের হাতে অস্ত্র দিলে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। আর কাল টুকচুম্বার তলায় আমরা একটা সভা করিয়া সকলকে ব্যাপারটা জানাইয়া দিব। তাহার পর প্রার্থনা করিব। টুকচুম্বাই আমাদের দেবতা, তাহার নিকট আমাদের বিপদের কথা বলিব।

আমি বলিলাম—আমার এক সৎমা মন্মন গরু পূজা করে, আর একজন সৎমা টুলা ছাগল পূজা করে, জিকটুর বিশ্বাস কাকেরা সন্তুষ্ট থাকিলে সমাজের মঙ্গল হয়। সে কাককে প্রায়ই খাবার দেয়। রম্ভা বিড়াল পূজা করে। ঝাঝা রোজ সূর্যপ্রণাম করে। আমি ইহাদের ডাকিয়াও আমাদের বিপদের কথা বলি। তাহারাও নিজের নিজের দেবতাকে ডাকুক।

দোহা বলিল, তা ডাকুক, কিন্তু কাল টুকচুম্বার তলায় সকলে যেন আসে। টুকচুম্বা আমাদের আদি দেবতা। আমাদের পূর্বপুরুষ ডঙ্কা স্বহস্তে ইঁহাকে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমার জন্ম ওই টুকচুম্বার তলায়। আমার মা-ও আমরণ ওই গাছের তলায় ছিলেন। টুকচুম্বাকেও আমরা কাল পূজা করিব। এখন আমি চলি। বিরানিতে অনেক ডুমুর পাকিয়াছে, হাটে পাঠাইব। ওগুলির বদলে কিছু অস্ত্রশস্ত্র পাইলে তাহাই আনিতে বলিব। তুমিও গমের গোলা হইতে কিছু গম বাহির করিয়া বিদেশের হাটে পাঠাও। সেখান হইতেও কিছু ছোরা তলোয়ার বল্লম আসুক।

দোহা চলিয়া গেল। আমি মর্দনের নিকট একজন লোক পাঠাইলাম।

মর্দন খুব বেঁটে, কিন্তু খুব শক্তিশালী সে। তাহার সমস্ত দেহটাই যেন একটা পেশীর প্রদর্শনী। হাত, পা, বুক, গর্দান—সবই পেশি সমৃদ্ধ। কুচকুচে কালো রং। মাথার চুল কোঁকড়ানো, ঠোঁট দুটি বেশ পুরু। আমাদের যাবতীয় বৈষয়িক কাজকর্ম সে-ই করে। নৌকা বোঝাই করিয়া সে-ই আমাদের মাল বিদেশের হাটে লইয়া যায়। পরিবর্তে বিদেশ হইতে নানারূপ জিনিস আনিয়া দেয়। অনেকদিন আগে আমার বাবার আমলে সে আসিয়া বাবার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। বলিয়াছিল, তাহার আত্মীয়-স্বজনরা তাহাকে নাকি দেবতা বানাইয়া পূজা করিবে এবং পূজা হইয়া গেলে মাটিতে জীবন্ত পুঁতিয়া দিবে। সেই ভয়ে সে পলাইয়া আসিয়াছে। তখন তাহার বয়স অল্প ছিল। গোঁফ-দাড়ি হয় নাই। এখন তাহার প্রচুর গোঁফ-দাড়ি, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুল। বাবা আগে নিজেই নৌকা লইয়া হাটে মেলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সঙ্গে থাকিত মর্দন। মর্দনের এ ব্যাপারে প্রচুর অভিজ্ঞতা। তাই বাবার মৃত্যুর পর মর্দনের উপর সব ভার দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়াছি। মর্দন খুব বিশ্বাসী লোক। অবিশ্বাসী হইবার কোনো কারণও নাই। কারণ আমরা তাহাকে তার নিজের বা নিজের পরিবারবর্গের জন্য বিদেশ হইতে যে-কোনো জিনিস সংগ্রহ করিবার অধিকার দিয়াছি। তাহার চারটি পরিবার এবং অনেক প্রণয়িনী। তাহাদের প্রত্যেকের জন্য সে বিদেশের হাট হইতে প্রচুর শৌখীন জিনিস কিনিয়া

আনে। নানা রঙের পুঁতির মালা, নানা ধরনের গহনা কাপড় তাহাদের জন্য সরবরাহ করে মর্দন। সে নিজের জন্য একটা চকচকে পাথর বসানো তামার আংটিও কিনিয়াছে। আমরা তাহার এইসব শৌখীনতায় কোনো দিন বাধা দিই নাই। নানা দেশে ঘুরিয়াছে সে। বিদেশ সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতাও প্রচুর। আমাদের খাজনা সে-ই রাজ-কর্মচারীর কাছে প্রতিবৎসর লইয়া যায়।

সে যখন আমার কাছে আসিল তখন তাহাকে সব ব্যাপার খুলিয়া বলিলাম। ইহাও জিজ্ঞাসা করিলাম, যে রাজাকে আমরা খাজনা দিই তিনি এ বিপদে আমাদের সাহায্য করিবেন কি না? কিভাবে তাঁহার নিকট আমরা আবেদন জানাইব? মর্দন মুখবিকৃত করিয়া মাথা চুলকাইল, তাহার পর বলিল— আমিও রাজাকে দেখি নাই। প্রতিবছর সুদ্‌মাকে আমরা খাজনা দিয়া আসি। গাংগাং নদী পার হইয়া দুইদিন পায়ে হাঁটিয়া তবে তাহার বাড়িতে পৌঁছানো যায়। আমার নিকট হইতে খবর পাইলে তিনি লোকজন পাঠাইয়া নৌকা হইতে জিনিসপত্র লইয়া যান। সুদ্‌মাকে দেখিলে বেশ বড়লোক মনে হয়। প্রকাণ্ড বাড়ি। লোকজনও অনেক। কিন্তু—

মর্দন আবার মাথা চুলকাইতে লাগিল।

বলিলাম, থামিয়া গেলে কেন, কি বলিতে চাও বল। মর্দন বলিল—সুদ্‌মাও রাজাকে দেখে নাই। রাজার নামে হুমকি দিয়া সে আমাদের মত ছোট ছোট জনপদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করে। সে সব খাজনা সে নিজেই ভোগ করে, অন্য কোথাও পাঠায় না।

আমি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। সবিস্ময়ে বলিলাম, রাজার খাজনা নিজেই ভোগ করে? রাজা কিছু বলে না?

মর্দন বলিল—রাজা বোধ হয় জানেই না যে সুদ্‌মা বলিয়া কোনো লোক তাহার নাম করিয়া এইভাবে খাজনা আদায় করিতেছে। আমাদের খবরও বোধহয় রাজা জানে না। নাবিকদের মুখে শুনিয়াছি রাজা একটা নয়। অনেক রাজা। কেহ নীলনদের ধারে রাজত্ব করে। তাহাদের বড় বড় মন্দির, মন্দিরে নানারকম দেবতা। তাহারা বড় বড় পাথরের স্তন স্থাপন করিয়াছে। তাহাদের চূড়া আকাশচুম্বি। তাহাদের ভিতর নাকি রাজাদের মৃতদেহ আছে। আরব দেশের মাথার উপরে ব্যাবলদের রাজত্ব। তাহারাও বড় বড় বাড়ি করিয়াছে। বাড়ির উপর বাড়ি। চারতলা পাঁচতলা। বাড়িকে ঘিরিয়া অদ্ভুত ঢালু রাস্তা। সে রাস্তা দিয়া উপর তলায় চড়া যায়। পাথরের ওপর কিংবা মাটির ফলকের উপর ছবি আঁকিয়া ইহারা লেখে। ইহাদের লোকজন সৈন্যসামন্ত বিস্তর। উহারা মূর্তি প্রস্তুত করে। উহাদের নৌকাও খুব বড় বড়। আমার মনে হয় সুদ্‌মা ইহাদের চেনে না। ইহাদের নিজেদের মধ্যেও খুব ঝগড়া মারামারি। প্রত্যেকেই অপর লোকের জমি দখল করিতে চায়। সকলেই লোভী। আমার মনে হয় ইহাদের খবর দিলে আমরা নিজেরাই বিপদে পড়িব। ইহারা আসিয়া আমাদের রাজ্য দখল করিবে এবং আমাদের সকলকে ক্রীতদাস করিয়া ফেলিবে। পরের রাজ্য দখল করিবার জন্য ওই সব রাজারা সর্বদাই উৎসুক। আমার বিবেচনায় উহাদের খবর না দেওয়াই উচিত। সুদ্‌মাকে বার্ষিক কিছু খাজনা দিলে সুদ্‌মা শান্ত থাকিবে। সে-ও আর আমাদের বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিবে না। আমার আর একটা কথাও মনে হয়। ভিংড়াকে তাড়াইয়া দিয়া আমরা ঠিক কাজ করি নাই। এসব ব্যাপারে দৈবীশক্তির সহায়তা প্রয়োজন ভিংড়া থাকিলে আমাদের এ সময় উপকার হইত। সে একজন বড় গুণিন ছিল। সে হয়তো কোথাও গিয়া আমাদের অনিষ্ট সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

আমি বলিলাম, ভিংড়া হয়তো গুণিন। কিন্তু সে যতদিন এখানে ছিল আমাদের কোনো ইষ্ট করে

নাই। অনেকের উপর অত্যাচার করিত। তাই দলপতি হিসাবে তাহাকে তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছি তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া আমার দুঃখ হইয়াছে, ভয়ও হইয়াছে, কিন্তু তবু তাহাকে তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছি। সে কোথায় গিয়াছে জান?

মর্দন যাহা বলিল তাহা খুব আশ্চর্যজনক। বলিল, আমি স্বচক্ষে দেখি নাই। কিন্তু মেনকি দেখিয়াছে। সে তখন নদীতে স্নান করিতেছিল। সে দেখিল ভিংড়া একটা আঘাটায় আসিয়া লাফ দিয়া নদী পার হইয়া গেল। তাহার পর কিন্তু আর মানুষ রহিল না সে। প্রকাণ্ড একটা শকুনে রূপান্তরিত হইয়া আকাশে উড়িয়া গেল। মেনকি ভয়ে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া আমাকে ইহা বলিল। মেনকি মর্দনের কনিষ্ঠা পত্নী। মেয়েটি যে খুব মিথ্যাবাদিনী এবং কল্পনা-কুশলা তাহা আমার জানা ছিল। কিছুদিন আগে সে আমাকেই বলিয়াছিল একদিন মাঠে সে যখন ঘাস কাটিতেছিল তখন সারা আকাশের গায়ে ছোট ছোট সাদা সাদা মেঘ। একটা মেঘ নীচে মাঠের উপর নামিয়া আসিল। মেঘের ভিতর হইতে বাহির হইল মেঘকন্যা। মেঘকন্যা তাহাকে বলিল, তোমাদের দলপতির গলায় একটি লালপাথরের মালা আছে, সেটি আমার চাই। সেটি আমাকে আনিয়া দাও, আমি পরিব। আমি কথাটা শুনিয়া অবিশ্বাস করিয়াছিলাম, কিন্তু মেনকিকে সে কথা বলি নাই। ভাবিয়াছিলাম সে মর্দনের স্ত্রী, তাহাকে চটাইয়া লাভ নাই। আমার মালাটা তাহাকে দিয়াছিলাম। কয়েকদিন পরে দেখিলাম মেনকিই সেটি পরিয়া বেড়াইতেছে। আমাকে বলিল, মেঘকন্যা বলিল, তুই আমার বোন, তুই মালাটা পর, তাহা হইলেই আমার পরা হইবে। তাই আমি পরিয়া বেড়াইতেছি। সুতরাং মেনকি মর্দনকে ভিংড়ার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে তাহা যে সর্বৈব বানানো তাহা বুঝিলাম, কিন্তু মর্দনকে বলিলাম না। মর্দনের মনে দুঃখ দিয়া লাভ কি। শুধু বলিলাম, ভিংড়া যখন উড়িয়া গিয়াছে তখন তাহাকে তো আর নাগালের মধ্যে পাওয়া যাইবে না। এখন এ অবস্থায় কি করা যায় তাহাই বল? মর্দন বলিল, রাজাদের কাছে যাইব না। তবে বলেন তো হাতি-বাবার কাছে যাইতে পারি। তাঁহার হাতি যদি দয়া করিয়া তাঁহার কাছে যাইতে দেয় আর হাতি-বাবা যদি দয়া করেন, তাহা হইলে আমাদের অনেক লাভ হইবার সম্ভাবনা। তিনি একজন মস্ত গুণিন। আমি হাতি-বাবার নাম শুনি নাই। হাতিও দেখি নাই। কারণ আমাদের এ অঞ্চলে হাতি নাই। তবে হাতি নামে যে বিরাটকায় একটা জন্তু আছে তাহা শুনিয়াছিলাম। মর্দনের কথা শুনিয়া আমার ঔৎসুক্য হইল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—হাতি-বাবা কোথায় থাকেন? মর্দন বলিল—গাংগাং নদীর ওপারে গম্ভীরা জঙ্গলে। সেখানে পৌঁছিতে প্রায় কুড়ি দিন লাগিবে। জমানী নদীতে নৌকা ভাসাইয়া টুম্বার ঘাটে পৌঁছিতে হইবে। সেখান হইতে হাঁটাপথে দিন সাতেক গেলে গম্ভীরা জঙ্গলে পৌঁছানো যাইবে। গম্ভীরা বিশাল জঙ্গল। আর সে জঙ্গলের অধিপতি হাতি-বাবা—সে জঙ্গলে অনেক হাতি আছে।

হাতি-বাবা হাতি, না মানুষ?

মানুষ। একটি প্রকাণ্ড হাতি তাঁহার সঙ্গী। তিনি হাতির সেবা করেন, হাতিও তাঁহার সেবা করে। হাতি-বাবার একটি কুড়াল এবং কাটারি আছে। তাহা দিয়া তিনি সমস্ত দিন হাতির জন্য খাবার সংগ্রহ করেন। গাছের উপর উঠিয়া হাতির জন্য কচি কচি ডাল-পাতা কাটিয়া নীচে ফেলেন, হাতি গাছের তলায় দাঁড়াইয়া সেগুলি কুড়াইয়া কুড়াইয়া খায়। হাতির পিঠে চড়িয়া তিনি ঘুরিয়া বেড়ান। তাঁহার ঘর-বাড়ি নাই। যখন বৃষ্টি হয় তখন হাতির পেটের তলায় তিনি দাঁড়ান। যখন মাটিতে শুইয়া ঘুমান তখন হাতিটি তাঁহার কাছে বসিয়া থাকে। পারতপক্ষে তাঁহার কাছে কাহাকেও যাইতে দেয় না।

হাতিটির বিশাল দাঁত, বিশাল কান, বিশাল শুঁড়। দেখিলেই ভয় করে। সেই জন্য কেহ হাতি-বাবার নিকটে যাইতে পারে না।—তবে লোক বলে হাতিটি খাদ্যরসিক। ভালো ভালো খাবার খাবার দিলে সে প্রসন্ন হয়। গম, জই, কলা তাহার প্রিয় খাদ্য। খাবার দিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিয়া অনেকে হাতি-বাবার নিকটে যাইতে পারিয়াছে। অনেককে অনেক বিপদ হইতে হাতি-বাবা রক্ষা করিয়াছেন। ক্ষমতাবান লোক উনি। বলেন তো তাঁহার নিকট গিয়া চেষ্টা করি। তবে সঙ্গে কিছু ভালো খাবার লইতে হইবে হাতিটির জন্য।

বলিলাম, বেশ, নৌকা বোঝাই করিয়া খাবার লইয়া যাও। কিছু লোকজনও লও। আমারই তোমার সহিত যাইতে ইচ্ছা করিতেছে। কিন্তু শিকারা কখন আসিয়া উপস্থিত হইবে তাহার তো ঠিক নাই। দোহাকে জিজ্ঞাসা করি, দেখি সে কি বলে। শিকারার ভয়টা যদি না থাকিত আমি যাইতাম। চল দোহার কাছে যাই।

হাতির কথা শুনিয়া দোহা খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিল। মর্দনকে বলিল, চল আমি তোমার সঙ্গে যাইব। টালা এখানে থাকুক। শিকারা যদি আসে, সে-ই তাহাকে সামলাইবে।

তাহার পর দিনই বহুরকম খাবার কয়েকটি নৌকায় বোঝাই করিয়া মর্দনের সহিত দোহা চলিয়া গেল। হাতিই তাহাকে প্রলুব্ধ করিল। সে-ও কখনও হাতি দেখে নাই। আর একটা কারণেও বোধহয় সে স্থানত্যাগ করিল। সে-কারণটা—শিকারা। শিকারা হঠাৎ আসিয়া পড়িলে সে যে কি করিবে তাহা স্থির করিতে পারে নাই।

আমি একা পড়িয়া গেলাম। ঘোড়ায় চড়িয়া আমাদের জনপদের চৌহদ্দিটা আমি পরিদর্শন করিয়া সময় কাটাইতে লাগিলাম। আমাদের জনপদ সুবিস্তৃত। আমাদের ভাণ্ডারে যে সব অস্ত্র ছিল—বর্শা, তরবারি, খড়্গ, কুঠার, বড় ছোরা—সেগুলি সমর্থ লোকদের নিকট বিতরণ করিয়া তাহাদের বলিলাম, তোমরা আমাদের জনপদের সীমান্ত রক্ষা কর। আমার আশঙ্কা, বাহির হইতে কোনো শত্রু আসিয়া হয়তো হানা দিবে। তাহারা আমাদের যেন অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ করিতে না পারে। আমরা আরও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য বিদেশে লোক পাঠাইয়াছি। সেগুলি আসিলে তাহাও তোমাদের দিব। তোমরা সতর্ক থাক। বাহিরের কোনো লোককে আমার বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিতে দিও না। দেখিলাম আমাদের জনপদের লোকেরা খুবই উৎসাহী। তাহারা নিজেদের মধ্যেই দল করিয়া আমাদের সীমান্ত রক্ষা করিতে লাগিয়া পড়িল। শুধু ছেলেরাই নয়, মেয়েরাও। অনেক যুবতী এমন কি কিশোরীও অস্ত্র আস্ফালন করিয়া বলিল, তাহারা প্রাণ থাকিতে শত্রুকে প্রবেশ করিতে দিবে না।

কণ্টকা ছিল না, তাই আমি আমার অন্য পত্নীদের খবর লইতে লাগিলাম। কেহ খুশি হইল, কেহ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কেহ বা অভিমানে মুখ ফিরাইয়া রহিল। লক্ষ্য করিলাম আমার একটি পত্নী, বাহুলা নামক একটি যুবকের সহিত একটু বেশি ঘনিষ্ঠতা করিয়াছে। বাহুলাকে সে রাঁধিয়া খাওয়ায়, মাঝে মাঝে তাহার সহিত রাত্রিবাসও করে নাকি। এ ঘটনা আমি উপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলাম। দেখিয়াও যেন দেখিলাম না—এই ভাব।

এমনি ভাবে ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া দিন কাটিতেছিল এমন সময় একদিন একটা কাণ্ড ঘটিল। আমাদের পশ্চিম সীমান্তের প্রহরীরা একটি লোককে আমার নিকট ধরিয়া আনিল। বেশ বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় লোক। তাহার মাথায় প্রকাণ্ড জালা। সে নাকি বলিয়াছে আমি জালাটি তোমাদের দলপতিকে দিয়া যাইব। যদি আমাকে না যাইতে দাও আমি ফিরিয়া যাইতেছি। কিন্তু জানিও ইহাতে তোমাদেরই

ক্ষতি হইবে। লোকগুলি তাই জালাসুদ্ধ লোকটাকে আমার নিকট লইয়া আসিয়াছে। লোকটি বলিল, আপনার অনুচরদের বলুন জালাটা আস্তে আস্তে আমার মাথা হইতে নামাইয়া দিক। সকলে মিলিয়া জালাটা নামাইয়া দিল। দেখিলাম জালাটা প্রকাণ্ড। তাহার মুখে কিছু খড় এবং সবুজ পাতা গোঁজা রহিয়াছে। লোকটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম জালার মধ্যে কি আছে? সে বলিল, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার অধিকার আমার নাই। এইটুকু শুধু বলিতে পারি আপনার কাছে লোকজন থাকিলে জালার রহস্য আপনি জানিতে পারিবেন না। আপনি যখন একা থাকিবেন তখন জালার রহস্য আপনার নিকট প্রকাশিত হইবে। আমি চলিলাম। লোকটি এই বলিয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল। আমিও আমার অনুচরদের চলিয়া যাইতে বলিলাম। তাহারা চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই জালার ভিতর হইতে শব্দ হইল—আমি তিরখন, গোপনে তোমার নিকট আসিয়াছি। তোমার অনুচররা কি দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে? কাহারও সামনে আমি আত্মপ্রকাশ করিতে চাই না। আমি তখন কণ্টকার শূন্যগৃহে ছিলাম। বলিলাম, না এখানে কেহ নাই। তিরখন তখন আশ্চর্য কৌশলে জালার ভিতর হইতে বাহির হইল। দেখিলাম সে রোগা হইয়া গিয়াছে। বলিলাম, এ কি ব্যাপার! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? সে বলিল, আমি আসিতেছি ঘুরঘুট খাঁ-র নিকট হইতে।

ঘুরঘুট খাঁ এখন কোথায়?

সে মারো পাহাড়ে আছে। ভুলেরা কোথায় জান?

ভুলেরা শিকারার কাছে আছে। শিকারা কিছুদিন এখানেই ছিল। তখন ভুলেরা তাহার সঙ্গেই ছিল। যাইবার সময় সে তাহাকে লইয়া গিয়াছে। হয়তো আবার কোনোদিন আসিয়া হাজির হইবে, তাই আমরা ভয়ে ভয়ে আছি।

তাহার পর তিরখনকে সব কথা খুলিয়া বলিলাম। সে উঠিয়া গিয়া জালার ভিতর হইতে তাহার একতারাটি বাহির করিল এবং একতারা বাজাইয়া গান শুরু করিয়া দিল। সুরটি বড় অদ্ভুত। মাঝে মাঝে যেন দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া থামিয়া যায়, আবার দ্বিগুণ উৎসাহে নাচিতে থাকে। কখনও মিনতি করে কখনও ধিক্কার দেয়। গানটির ভাষা অবশ্য গুন্দের ভাষা। তিরখন আমাদের ভাষায় সেটিকে অনুবাদ করিয়া যাহা বলিল তাহার মর্ম এই—

ওগো হাওয়া, ওগো হাওয়া
বিচিত্র তোমার আসা যাওয়া
কখনও তুমি ঝিরঝিরে
দোল দাও ছোট ফুলের পাপড়িকে।
কখনও মৃদু মৃদু
উড়িয়ে দাও প্রিয়ার ওড়নাখানি।
কখনও তুমি ঝড়
গাছপালা ভাঙো মড় মড়
সমুদ্রের ছোট্ট ঢেউকে
করে দাও মস্ত—আকাশচুম্বী।
এক দেশের ধুলোকে
নিয়ে যাও অন্য দেশে

ডুবিয়ে দাও নৌকো
ভেঙে ফেল ঘর-বাড়ি।
আবার যখন রামধনু ওঠে।
হয়ে যাও ভারী মিষ্টি।
ওগো হাওয়া
আমার একটি মিনতি
আমার ছোট্ট নৌকোর
ছোট্ট পালে
বন্ধুর মত এসো একবার
পার করে দাও সেই নদীটি
যে নদীর ওপারে সে আছে।

গানের ব্যাখ্যা শেষ করিয়া তিরখন বলিল, তোমাদের ছোট নৌকার ছোট পালে ওই হাওয়াটি বন্ধুর মত আসিবে। ঘুরঘুট খাঁ-ই সেই হাওয়া। মারো পাহাড়ে সে প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে। সে বলিয়া পাঠাইয়াছে তোমরা তাহার সহিত যদি যোগ দাও তাহা হইলে সে শিকারাকে আক্রমণ করিবে। ভুলেরা যদি বাঁচিয়া থাকে সে ভুলেরাকে কাড়িয়া আনিবে। ভুলেরাকে উহারা যদি হত্যা করিয়া থাকে সে হত্যার ভীষণ প্রতিশোধও লইবে ঘুরঘুট খাঁ। শিকারাকে বন্দী করিয়া সর্বসমক্ষে তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিবে। জুনজিরা পাহাড় হইতে সে সর্দার মালেকের বিপুল ধনসম্ভার লইয়া আসিয়াছে। সেই ধনসম্ভার লইয়া বিদেশ হইতে অনেক সৈন্য কিনিয়া আনিয়াছে সে। তাহার ইচ্ছা, তোমরাও তাহার সহিত যোগ দাও।

যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু আমি তিরখনকে সে কথা বলিতে পারিলাম না। একটু ঘুরাইয়া বলিলাম, আমার নৌকা ছোট, নৌকার পালও ছোট, কিন্তু ঘুরঘুট যে ঝড়। সে ঝড়ের দাপট কি আমার নৌকা সহিতে পারিবে?

তিরখন বলিল, তোমাকে এখনই যে গানটি শুনাইলাম তাহার মর্ম তুমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পার নাই দেখিতেছি। ঘুরঘুট ঝড়, কিন্তু ইচ্ছা করিলে সে মৃদু সমীরণও হইতে পারে। তোমার ছোট নৌকাকে সে ডুবাইবে না, পারে ভিড়াইয়া দিবে। দেখিতেছি তোমার অপেক্ষা তোমার পত্নী কণ্টকা বেশি বুদ্ধি মতী। তুমি যখন সর্দার মালেকের পাল্লায় পড়িয়াছিলে তখন তাহার কৌশলই তোমাকে সর্দারের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। সর্দার মালেক যখন মারা গেল তখন কণ্টকাই শিকারার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাহাকে তোমাদের দেশে লইয়া আসে। এখন কণ্টকা বুঝিয়াছে যে শিকারা তোমাদের জনপদকে গ্রাস করিতে চায়, দোহাকে বিবাহ করিয়া এ অঞ্চলের সর্বেশ্বরী হইতে চায় সে। তাই সে গোপনে ঘুরঘুট খাঁ-র সন্ধান করিতেছিল। তোমাদের জনপদে যে সব মাঝি বিদেশ হইতে আসে, কণ্টকা তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া সচেষ্ট থাকিত যদি কেহ ঘুরঘুট খাঁ-র সন্ধান দিতে পারে। একজন মাঝির নিকট সে ঘুরঘুট খাঁ-র সন্ধান পায়। কোন পথে গেলে মারো পাহাড়ে যাওয়া যায় তাহারও নিখুঁত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া এখন মারো পাহাড়ে গিয়া সে হাজির হইয়াছে। তাহার মোহিনী শক্তি দিয়া ঘুরঘুটকে বশও করিয়াছে। তুমি নিশ্চয়ই জানো সে এখানে নাই। কোথায় গিয়াছে তাহা জানিতে কি?

স্বীকার করিতে হইল, জানিতাম না।

তিরখন বলিল—সে এখন ঘুরঘুটের কাছে আছে। ঘুরঘুট তোমাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত। এ বিষয়ে তোমার সম্মতির জন্য কণ্টকাই আমাকে এখানে পাঠাইয়াছে। এখন বল, কি করিবে?

আমি একটু বিব্রত বোধ করিতে লাগিলাম। সম্মতি দিলে ঘুরঘুট খাঁ সসৈন্যে এখানে আসিয়া পড়িবে। আমাদের লোকজনকে লইয়া এখান হইতে হয়তো সে শিকারাকে আক্রমণ করিবে। আমাদের জনপদের লোকেরা যুদ্ধের কৌশল জানে না। তাহারা দলে দলে মারা পড়িবে। অথচ, কণ্টকা ঘুরঘুটের নিকট গিয়া বসিয়া আছে। তাহাকেই বা উদ্ধার করি কি উপায়ে? দোহাও এখানে নাই, হাতি-বাবার সন্ধানে চলিয়া গিয়াছে। সত্যই একটু মুশকিলে পড়িয়া গেলাম। অবশেষে তিরখনকে আমার মনোভাব খুলিয়া বলিলাম।

দেখ ভাই তিরখন, যুদ্ধবিগ্রহ মারামারি কাটাকাটি আমি পছন্দ করি না। কেবল আত্মরক্ষার জন্য আমরা একটি সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিতে চাই। সেই জন্যই ঘুরঘুট খাঁ-র সাহায্য চাহিয়াছিলাম। শিকারার কাছেও চাহিয়াছিলাম। কিন্তু শিকারা দোহাকে বিবাহ করিতে চাহিল। দোহা তাহাতে রাজি নয়। শিকারা এখন অবশ্য চলিয়া গিয়াছে, জানি না আবার আসিয়া হানা দিবে কিনা। এখন আমার মনে হইতেছে কি কুক্ষণে সেদিন কণ্টকা তোমাদের ছাগলটাকে মারিয়াছিল। সেই সূত্র ধরিয়া একটা সর্বনাশ যেন আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধবিগ্রহ আমি মোটেই পছন্দ করি না, এ বিপদ হইতে তুমিই আমাকে উদ্ধার কর।

তিরখন মাথায় একবার হাত বুলাইল। তাহার পরও দাড়িতে কয়েকবার। সহসা তাহার চক্ষু দুইটি হাস্য-দীপ্ত হইয়া উঠিল।

তাহার পর বলিল, দেখ টালা, যুদ্ধবিগ্রহ কেহই পছন্দ করে না। কিন্তু জীবনে যুদ্ধ বিগ্রহ অনিবার্য। মরুভূমির তপ্ত বালুকে বা তপ্ত ঝড়কে কে ভালোবাসে? কেহই না। কিন্তু তবু তাহাদের এড়াইবার উপায় নাই। তাহাদের সহিত লড়াই করিতে হয়। সে লড়াইয়ে কখনও আমরা জিতি, কখনও হারি। কষ্ট হয়, খুবই কষ্ট হয়। কিন্তু এ কষ্টকে এড়াইবে কি করিয়া? দোহা যদি শিকারার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া এ অঞ্চলের মালিক হয় তাহা হইলেও সে নিস্তার পাইবে না, কারণ ঘুরঘুট খাঁ শিকারাকে স্বস্তি দিবে না। সে তাহাকে আক্রমণ করিবেই। ভুলেরাকে সে ভুলে নাই। ভুলেরা যদি বাঁচিয়া থাকে ভুলেরাকে সে উদ্ধার করিবেই। ভুলেরা যদি মরিয়া থাকে, সে মৃত্যুর প্রতিশোধ সে লইবেই। আর তোমরা যদি কোনো পক্ষকেই আমল না দাও তাহা হইলে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে না। তোমাদের সম্পত্তিই লুণ্ঠনকারীদের আহ্বান করিয়া আনিবে। সুতরাং তোমাদের একজন সবল মিত্র থাকা প্রয়োজন। আমার মনে হয় কামুকী শিকারার অপেক্ষা বীর ঘুরঘুট খাঁ বেশি নির্ভরযোগ্য। ঘুরঘুট অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে। সে শিকারাকে বিধ্বস্ত করিবে বলিয়া আমার আশ্বাস। তোমরা যদি শিকারার সহিত যোগ দাও, তোমরাও বিধ্বস্ত হইবে। তোমার পত্নী কণ্টকা বুদ্ধিমতী, তাই সে ঘুরঘুট খাঁ-র শরণাপন্ন হইয়াছে। আমার মনে হয়, যদি আপত্তি কর সে বলপ্রকাশ করিয়া তোমার সম্মতি আদায় করিবে। অর্থাৎ সে ঘুরঘুটকে লইয়া এদেশে আসিয়া হাজির হইবে এবং এদেশ অধিকার করিবে। শিকারার আধিপত্য সে কিছুতেই সহ্য করিবে না। তুমি সম্মত হও। সম্মত না হইলে তুমি রাজ্যও হারাইবে, পত্নীও হারাইবে।

আমি বলিলাম, দেখ তিরখন, আমার অনেক পত্নী। একজন যদি চলিয়া যায়, খুব বেশি অসুবিধায়

পড়িব না। কিন্তু কণ্টকাকে আমি ভালোবাসি। আমার বিশ্বাস, কণ্টকাও আমাকে ভালোবাসে। আমার মনে কষ্ট দিয়া আমাদের সমস্ত জনপদকে বিপন্ন করিবে এ কথাও বিশ্বাস হইতেছে না। আমার মনে আর একটা কথাও জাগিতেছে। ভয় হইতেছে, খুলিয়া বলিলে তুমি হয়তো রাগ করিবে। তোমাকে শ্রদ্ধা করি, তোমার মনে কষ্ট দিতে ইচ্ছা হইতেছে না—

তিরখন বলিল, দেখ টালা, জীবনে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছি। কষ্ট সহ্য করিবার অসীম ক্ষমতা আছে আমার। অনাহারে, অনিদ্রায়, মরুর তপ্ত বালুতে, শীতে তুষারঝড়ে দিন কাটাইয়াছি আমি। অনেক প্রভুর কশাঘাতে জর্জরিত হইয়াছি। তুমি এমন কি বলিতে পার যাহা এ সবের চেয়েও কষ্টকর? যাহা বলিতে চাও, নির্ভয়ে বল, আমার কষ্ট যদি হয়ই সে কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা আমার আছে।

তখন বলিলাম, কণ্টকার নামে তুমি যাহা বলিলে তাহা যে কণ্টকারই উক্তি তাহার কিছু প্রমাণ আছে?

তিরখন উঠিয়া পুনরায় জালার নিকট গেল এবং তাহার ভিতর হইতে ছোট একটি পুঁটুলি বাহির করিল। পুঁটুলির ভিতর হইতে কয়েকটি শুষ্ক ফুলের মালা এবং একটি পুঁতির হার বাহির করিল। এই হারটি আমি কণ্টকাকে উপহার দিয়াছিলাম, দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম। তিরখন বলিল—কণ্টকা এইগুলি তাহার কথার প্রমাণ স্বরূপ পাঠাইয়াছে। চলিয়া যাইবার আগে সে নাকি এই ফুলের মালা ও পুঁতির হার পরিয়া তোমার সহিত দেখা করিয়া গিয়াছে। সে আর একটি অদ্ভুত কথাও তোমাকে বলিতে বলিয়াছে—এ কথার অর্থ আমি বুঝি না। সে বলিল, তুমি বুঝিবে।

কথাটি ছোট—চিক্-চিক্। মনে হয় কোনো পাখির ডাক। কণ্টকা বলিল এই কথাটি বলিলেই তুমি নাকি বুঝিবে আমি তাহার দূত।

চিক্-চিক্ শব্দটি শুনিয়াই বুঝিলাম কণ্টকাই একথা বলিয়াছে তিরখনকে। কারণ ওই 'চিক্-চিক্' শব্দটি আমাদের দুইজনের মধ্যে একটি সাঙ্কেতিক শব্দ। উহার অর্থ—চল একটু নির্জনে যাই। আমাদের দুইজনের কথা ওটি, তৃতীয় লোক উহার অর্থ জানে না। ইহাও মনে পড়িল যেদিন কণ্টকা চলিয়া যায় সেদিন সে বিশেষ করিয়া ফুলের সাজে সাজাইয়াছিল নিজেকে। গলায় পুঁতির হারটিও ছিল। সুতরাং বিশ্বাস করিতেই হইল তিরখনের সহিত কণ্টকার দেখা হইয়াছিল। সহসা আর একটা সন্দেহও জাগিল মনে। কণ্টকাকে হত্যা করিয়া তাহার গলার হার আনাও তো অসম্ভব নয়। কিন্তু 'চিক্-চিক্' কথাটা? সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও মনে হইল। তিরখন সত্যই তাহার বন্ধুলোক। প্রথম দিনের পরিচয় হইতেই সে তাহার হিতৈষী। বরাবর তাহার মঙ্গলের চেষ্টাই করিয়াছে। তাছাড়া আর একটা কথা আমার মনে হইল। ইহারা যদি আমার বন্ধুত্ব কামনা করে তাহার হইলে কণ্টকাকে হত্যা করিলে কি তাহা সুলভ হইবে? আর একটা কথাও ভাবিলাম। ঘুরঘুট খাঁ আমার সম্মতি না লইয়া যদি সদলবলে এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাকে বাধা দিবার শক্তি কি আমার আছে? শিকারা তো আসিয়াছিল, তাহাকে বাধা দিতে পারি নাই। ঘুরঘুটকেও বাধা দিতে পারিব না। তবু সে যে দূত পাঠাইয়া আমার সম্মতি চাহিতেছে ইহা তাহার ভদ্রতারই প্রমাণ। খুব সম্ভবত কণ্টকার মোহে মুগ্ধ হইয়াছে লোকটা। এই মোহের সুযোগ লইয়া কণ্টকা তাহার সহিত আমাদিগকে বন্ধুত্বের বন্ধনে বাঁধিতে চায়। শিকারাকে প্রতিরোধ করাই তাহার উদ্দেশ্য।

তিরখন আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়াছিল। আমাকে নীরব দেখিয়া সে বলিল,

তোমাদের মঙ্গলের জন্যই বলিতেছি এখন ঘুরঘুটের সঙ্গে ভাব কর। ঘুরঘুট একটু গোঁয়ার গোছের, কিন্তু লোক খারাপ নয়। তোমরা তো অসহায়, ঘুরঘুটের মতো শক্তিশালী লোকের বন্ধুত্বই এখন তোমাদের দরকার।

প্রশ্ন করিলাম, সত্যিই কি ঘুরঘুট আমাদের বন্ধু হইবে, না স্বার্থের খাতিরে আমাদের দলে টানিবার চেষ্টা করিতেছে?

তিরখন হাসিয়া কহিল, আমার ধারণা স্বার্থের বন্ধন না থাকিলে কোনো বন্ধুত্বই টেঁকে না। আমরা যেটাকে প্রেম বলি সেটাও নিঃস্বার্থ নয়। তাহার মধ্যে মিলন-আকাঙ্ক্ষা নিহিত থাকে। ঘুরঘুটের স্বার্থকে তুমি যদি তোমার নিজের স্বার্থ করিতে পার তাহা হইলে ঘুরঘুটও তোমার স্বার্থকে নিজের স্বার্থ ভাবিবে। এই নিয়ম। এ নিয়ম তুমি মানিতে পারিবে কি না জানি না, কিন্তু আপাতত কিছুদিনের জন্যও ঘুরঘুটের সহিত বন্ধুত্ব কর। তাহাতে তোমার লাভই হইবে।

আমি বলিলাম, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু একটা কথা আছে। কণ্টকা আমার প্রিয়তমা পত্নী বলিয়া আমাদের জনপদে অনেকে তাহার উপর বিরূপ। মেয়েরা স্বাভাবিক ঈর্ষাবশেই বিরূপ আর পুরুষরা বিরূপ কারণ কণ্টকা অনেকের প্রণয় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কণ্টকার চাল-চলন কথাবার্তাতেও একটা অহঙ্কারের টনৎকার আছে। তাই তাহার শত্রু অনেক। এখন একথা যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে যে আমি কণ্টকারই পরামর্শে ঘুরঘুটকে এ অঞ্চলে বন্ধুরূপে আমন্ত্রণ করিয়াছি তাহা হইলে অনেকেই চটিয়া যাইবে। কথাটা শেষ পর্যন্ত প্রকাশ হইয়া পড়িবেই। তখন আমাকে একটু অসুবিধায় পড়িতে হইবে। দোহা যদি এখানে থাকিত আর দোহাই যদি বলিত আমরা নিজেদের স্বার্থের জন্য ঘুরঘুটকে বন্ধুত্বে বরণ করিতেছি, তাহা হইলে আমার কোনো দায়িত্ব থাকিত না। আমি তাহার কথা সমর্থন করিয়া খালাস পাইতাম। কিন্তু দোহা এখানে নাই, কবে ফিরিবে, তাহাও ঠিক নাই। তাই স্থির করিয়াছি টুকচুম্বার তলায় সকলকে সমবেত করিয়া সকলের নিকট কথাটা বলি। তাহারা যদি মত দেয় তাহা হইলে ঘুরঘুটের প্রস্তাবে রাজি হইব।

তিরখন বলিল—আর যদি মত না দেয়?

যদি মত না দেয় তাহা হইলে তাহাদের বলিতে হইবে তোমরা এবার ঘুরঘুটের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক। শিকারাও সৈন্যে আক্রমণ করিতে পারে এ সম্ভাবনার কথাও ভুলিও না। তাহার পর আমাদের এই সুন্দর জনপদ হুনদের যুদ্ধক্ষেত্র হইয়া উঠিবে আর আমরা তাহাদের ক্রীতদাস হইয়া থাকিব যদি তাহারা আমাদের একেবারে নিঃশেষে মারিয়া না ফেলে। আমার বিশ্বাস এসব কথা শুনিলে জনপদের অধিকাংশ লোকেরাই ঘুরঘুটের প্রস্তাবে সম্মত হইবে। আমার মনে হয় আট-ঘাট বাঁধিয়া কাজ করাই ভালো।

বেশ তাই কর। আমি কিন্তু সভায় যাইব না। আমি এইখানেই আত্মগোপন করিয়া থাকি।

এই বলিয়া তিরখন পুনরায় জালার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। আমি উঠিয়া গিয়া দামামায় ঘা দিলাম।

দলে দলে নর-নারী আসিয়া টুকচুম্বার তলায় সমবেত হইতে লাগিল। সেই বিরাট সমাবেশে আমি যখন সমস্ত ব্যাপারটা খুলিয়া বলিলাম তখন সকলেই মন দিয়া তাহা শুনিল। তাহার পর যখন জিজ্ঞাসা করিলাম—আমি কি তাহা হইলে ঘুরঘুট খাঁ-র প্রস্তাব গ্রহণ করিব? তোমাদের কাহারও যদি আপত্তি থাকে বল।

অনেকক্ষণ কেহ কিছু বলিল না।

তাহার পর আমাদের কৃষি-বিভাগের প্রধান কর্মী ঘান্‌ডা দাঁড়াইয়া উঠিল। সে বলিল—দলপতির আদেশ আমাদের সর্বদাই শিরোধার্য। কিন্তু আমরা জানিতে চাই—কণ্টকা কোথায়? এ ব্যাপারে তাহার সহিত ঘুরঘুট খাঁ-র কোনো সম্পর্ক আছে কি?

কি উত্তর দিব প্রথমটা ভাবিয়া পাইলাম না। শেষে মনে হইল সত্য কথাই বলা সমীচীন।

বলিলাম, কয়েকদিন পূর্বে কণ্টকা অন্তর্ধান করিয়াছে। সে কোথায় গিয়াছে আমাকে বলিয়া যায় নাই। ঘুরঘুটের নিকট হইতে যে লোকটি এখানে আসিয়াছে তাহার মুখে শুনিলাম কণ্টকা শিকারার ভয়ে ভীত হইয়া ঘুরঘুটের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। কণ্টকার ভয়, শিকারা কিছুদিনের মধ্যেই এখানে স-সৈন্যে চলিয়া আসিবে এবং আমাদের জনপদ অধিকার করিয়া বসিবে।

আমার এক বৈমাত্রেয় ভাই ভালা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল— শিকারা এতদিন আমাদের হিতৈষিণী ছিল। হঠাৎ সে শত্রু হইয়া গেল? সে স্পর্ধাভরে আমার দিকে চাহিয়া গোঁফ-দাড়ি চুমরাইতে লাগিল।

তখনও সত্য কথা বলিলাম।

বলিলাম, শিকারা দোহাকে বিবাহ করিতে চায়। দোহা কিন্তু তাহাতে সম্মত নয়। শিকারার ইচ্ছা দোহাকে বিবাহ করিয়া অবশেষে আমাদের উপর আধিপত্য করিবে। দোহা এ ফাঁদে পা দিতে রাজি হয় নাই, তাই শিকারা এখন আমাদের শত্রু। সে আক্রমণ করিবেই। তাই ঘুরঘুট খাঁ-র মত একজন শক্তিশালী বন্ধু আমাদের প্রয়োজন।

আমার বৈমাত্রেয় ভাই ভালা আবার দাড়ি-গোঁফ চুমরাইয়া বলিল—'তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে কণ্টকা-মূল্যে আমরা ঘুরঘুট খাঁ-র বন্ধুত্ব কিনিতেছি?

বলিলাম, তুমি যাহা বলিলে তাহার জন্য এখনি তোমাকে আমাদের জনপদ হইতে দূর করিয়া দিতে পারি। দলপতি হিসাবে সে অধিকার আমার কাছে। কিন্তু আমি তাহা করিব না। তোমার অকপট উক্তিতে আমি খুশি হইয়াছি। উত্তরে বলিতেছি—আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য যদি কণ্টকা মূল্যেই ঘুরঘুটের বন্ধুত্ব ক্রয় করি, তাহাতে ক্ষতি কি? কণ্টকা আমার সম্পত্তি, তোমার তো নয়। তুমি অকারণে ক্ষুব্ধ হইতেছ কেন—

ভালা গোঁফ-দাড়ি চুমরাইতে লাগিল। কোনো জবাব দিল না।

আমি বলিলাম—আমরা এখন বিপন্ন। আমাদের সৈন্য নাই। যুদ্ধে র কায়দা-কানুন আমরা জানি না। ঘুরঘুট খাঁ-র সহায়তায় আমরা শক্তিশালী হইব এই ভরসায় তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে চাহিতেছি। তোমরা মনস্থির করিয়া আমাকে জানাও তোমাদের সম্মতি আছে কি না।

সমবেত জনতা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

হাত তুলিয়া কেহই আমার প্রস্তাব সমর্থন করিল না।

আমি কি করিব ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না, এমন সময়ে একটি আশ্চর্য কাণ্ড ঘটিল। ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে একজন অশ্বারোহী চিৎকার করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সমবেত জনতার সম্মুখে আসিয়া হাত তুলিয়া বলিল—সাবধান হও, সাত দিনের মধ্যেই শিকারা সসৈন্যে আসিয়া তোমাদের আক্রমণ করিবে। ঘুরঘুট খাঁ তোমাদের সাহায্য করিবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে। তাহার কাছে শীঘ্র লোক পাঠাও।

অশ্বারোহীর মাথায় শিরস্ত্রাণ, অঙ্গে বহুমূল্য পোশাক, কোমরবন্ধে শাণিত ছুরিকা। মুখে চাপ চাপ দাড়ি। সে যেমন দ্রুতবেগে আসিয়াছিল তেমনি দ্রুতবেগেই চলিয়া গেল।

আমরা সকলে হতভম্ব হইয়া গেলাম।

আমি আবার বলিলাম—এই অশ্বারোহী কে তাহা আমি জানি না। কিন্তু যে-ই হোক, লোকটি আমাদের হিতৈষী। এখন তোমাদের মনোভাব কি জানাও। আমি আর একটি শুভ লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। ওই দেখ টুকচুম্বার শাখায় একটি ফুল ফুটিয়াছে। কাল আরও অনেক ফুল ফুটিবে, গাঁটে গাঁটে অনেক কুঁড়ি দেখিতে পাইতেছি।

সহসা সহস্র বাহু একযোগে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইল। বুঝিলাম জনপদের সমর্থন মিলিয়াছে। আমার মনে কিন্তু স্বস্তি ছিল না। আমার বার বার মনে হইতেছিল এইবার আমাদের সুখশান্তি অন্তর্হিত হইল।

বাড়ি ফিরিয়া দেখি আমার বাসায় তন্বী চম্বা নতনেত্রে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হাতে সুন্দর একটি ছিট। পূর্বেই বলিয়াছি আমাদের জনপদে চম্বাই ছিল শিল্পী। আমাকে দেখিয়া চম্বা বলিল—দলপতি, তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি। কিছুদিনের মধ্যেই এ স্থান যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হইবে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমার স্থান নাই। আমি শান্তি ভালোবাসি, শান্তির পরিবেশেই আমি আমার কাজ করিতে পারি। মারামারি হানাহানিতে আমার কল্পনা মরিয়া যাইবে। দোহাও এখানে নাই। তাই ঠিক করিয়াছি আমিও এখানে থাকিব না। তোমার কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছি। এই ছিটটি আমি প্রস্তুত করিয়াছি। আমার স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ তুমি এটিকে রাখিয়া দাও।

চম্বা ছিটটি আমার পায়ের নিকট রাখিয়া দিল। প্রশ্ন করিলাম—তুমি কোথায় যাইবে?

তা জানি না। আপাতত দু চক্ষু যেখানে যায় সেইখানেই যাইব। তাহার পর যেখানে শান্তি পাইব সেখানেই থাকিব।

দলপতি হিসাবে আমি তাহাকে বাধা দিতে পারিতাম। কিন্তু দিলাম না। চম্বা—শিল্পী চম্বা—চলিয়া গেল।

তিরখন এতক্ষণ জালার ভিতর বসিয়া ছিল। আমার সাড়া পাইয়া জালা হইতে বাহির হইয়া আসিল। সব শুনিয়া বলিল—অশ্বারোহীটিকে চিনিতে পারিলে?

না—

ও তোমার পত্নী কণ্টকা। কথা ছিল, আমি এখানে পৌঁছিয়াছি এ সংবাদ পাওয়ার পর ও এখানে ছদ্মবেশে আসিবে। কণ্ঠস্বরও বোধহয় বিকৃত করিয়াছিল তাই চিনিতে পার নাই।

আমি স্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

তিরখনও কোনো কথা বলিল না।

অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলাম—তিরখন, এইবার কি হইবে বল তো—

তিরখন হাসিল। তাহার পর জালার ভিতর হইতে তাহার একতারাটি বাহির করিয়া গান ধরিল—

এখন তো আকাশ পরিষ্কার
শিশিরও পড়ছে
গাছেও ধরেছে অজস্র কুঁড়ি
ফুল হয়তো ফুটবে।
কিন্তু আগামী কাল যে ঝড় হয়ে
সব তছনছ করে দেবে না
এর জিম্মাদারী

কে হবে—কে হবে—কে হবে!
তাকে তুমিও চেন না
আমিও না—

কয়েকদিন পরেই ঘুরঘুট আসিয়া পড়িল। মহাসমারোহে আসিল। বহু অশ্বারোহী, বহু পদাতিক, বহু রকম অস্ত্রশস্ত্র, বহু কাড়া-নাকাড়া-দামামা লইয়া এমন একটা জাঁকজমক করিয়া সে হাজির হইল যে আমরা একটু ভয় পাইয়া গেলাম। শুধু সৈন্য-সামন্ত ও ঘোড়া নয়। তাঁবুও আসিল প্রচুর। বিরানি জঙ্গলের পাশ দিয়া যে জমানি নদীটি বহিয়া গিয়াছে তাহারই তীরে তাহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিলাম। আমাদের জনপদের ভিতর অতবড় বাহিনীর স্থান-সংকুলান হইত না। তাহাদের সঙ্গে মেয়েও আসিয়াছিল। নানা চেহারার অনেক মেয়ে। তাহারা আসিয়াছিল 'ইউর্ত' নামক এক প্রকার শকটে চড়িয়া। এক একটি শকট আয়তনে বেশ বড়। তাহার ভিতর একটি পুরা গৃহস্থালীর সমস্ত আয়োজন বিদ্যমান—এমন কি উনুন পর্যন্ত। প্রত্যেক 'ইউর্ত' গম্বুজাকৃতি তাঁবু দিয়া ঢাকা। গম্বুজের উপরে ধূম-নির্গমনের পথ। দশ-বারোটি প্রকাণ্ড বলদ এক একটি 'ইউর্ত' টানিয়া লইয়া যায়। এইরূপ বহু ইউর্ততে চড়িয়া বহু নারী-সমাগম হইল। এতগুলি নরনারীর এতগুলি ঘোড়া-গরুর খাওয়ার ব্যবস্থা কি করিয়া করিব ভাবিয়া আমি একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুরঘুট খাঁ আমাকে নিশ্চিন্ত করিল। সে প্রথমেই ঘোড়া হইতে নামিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিল। তাহার পর বলিল—আমি আপনার তাঁবেদার। যাহা হুকুম করিবেন তাহাই করিব। আমাদের জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা করিবেন না। আমরা হুন, আমরা স্বাবলম্বী, আমাদের খাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা আমাদের সঙ্গেই থাকে। আমাদের সমস্ত রসদ বাহির হইতে প্রত্যহ আসিবে, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি। খচ্চর বাহিত হইয়া, নৌকায় করিয়া, শকটে বোঝাই হইয়া আমাদের খাবার বাহির হইতে প্রত্যহ আসিবে। আপনাদের নিকট হইতে আমরা কোনো খাদ্যদ্রব্য লইব না। আপনারা কেবল প্রশস্ত স্থান দিন একটা যেখানে আমরা আড্ডা গাড়িতে পারি।

জমানি নদীর তীরে সুবিস্তৃত ফাঁকা মাঠ দেখিয়া ঘুরঘুট খুশি হইল। তাহার পর বলিল—আপনাদের জনপদের যে সব যুবকদের লইয়া আপনারা সৈন্যদল গঠন করিবেন তাহাদেরও এইবার আমার কাছে পাঠাইয়া দিন। আমি অবিলম্বে তাহাদের শিক্ষা দিতে শুরু করিব। হুন যোদ্ধার তিনটে গুণ প্রয়োজন। তাহাকে ক্ষিপ্র অশ্বারোহী, দুর্দান্ত সাহসী ও বিশ্রামহীন পরিশ্রমী হইতে হইবে। সিংহের বিক্রমের সহিত শ্যেনপক্ষীর ক্ষিপ্রতা ও খচ্চরের সতর্ক সহিষ্ণুতা আয়ত্ত না করিলে হুন-যোদ্ধা হওয়া যায় না। এজন্য অন্তত একবৎসর সময় লাগিবে, তাই আর কালবিলম্ব করিতে চাই না। আর একটা কথা, আমি এখান হইতেই শিকারার রাজ্য আক্রমণ করিতে পারি। আমার স্ত্রী ভুলেরাকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নাই। আপনার স্ত্রী কণ্টকা শিকারার সহেলি। তাহাকে শিকারার নিকট পাঠাইয়াছি। যদি সে ভুলেরাকে ফিরাইয়া আনিতে পারে। না, ভয় পাইবেন না। একশত অশ্বারোহী পরিবৃত হইয়া আমার দূতরূপে সে শিকারার নিকট গিয়াছে। শিকারা তাহার কোনও অনিষ্ট করিতে সাহস করিবে না। শিকারা যদি বুদ্ধিমতী হয়, ভুলেরাকে কণ্টকার সহিত ফিরাইয়া দিবে। যদি না দেয় তাহা হইলে শিকারাকে আমি ধ্বংস করিব। মারো পর্বতের নিকটবর্তী সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছি। আমি সেখানেও একটা বিরাট সৈন্য-সমাবেশ করিয়াছি। আমার বন্ধু জারিলা তাহাদের সেনাপতি। বিপুল শক্তিশালী লোক সে। কোনো যুদ্ধে কখনও হারে নাই। ভুলেরাকে লইয়া কণ্টকা যদি না ফেরে তাহা হইলে শিকারার সহিত তুমুল যুদ্ধ অনিবার্য। সে যুদ্ধে আপনাদেরও যোগ দিতে হইবে। হাতে কলমে না

শিখিলে কোনো কাজই শেখা যায় না, আপনার জনপদের যুবকেরা কালই আমার সহিত দেখা করুক। ঘুরঘুট খাঁ এক নিশ্বাসে একটানা এতগুলি কথা বলিয়া গেল। মনে হইল যেন মুখস্থ করিয়া আসিয়াছে। আমাকে কিছু বলিবারই অবসর দিল না সে। অবশেষে সে থামিল এবং আমার হাত দুইটি ধরিয়া সোচ্ছ্বাসে করমর্দন করিল।

বলিলাম, আপনারা বন্ধুরূপে আসিয়াছেন বন্ধুরূপেই আমাদের মধ্যে থাকুন। আপনাদের সংবর্ধনায় অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিবে, ক্ষমা করিয়া লইবেন। কণ্টকার জন্য সত্যই উদ্বিগ্ন হইয়া আছি। সে কবে ফিরিবে? কতদিন তাহার জন্য আমি অপেক্ষা করিব?

ঘুরঘুট বলিল—আগামী পূর্ণিমার পূর্বেই তাহার ফিরিবার কথা। পূর্ণিমা পর্যন্ত তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিব। যদি কোনো খবর না আসে, শিকারার পিরালা রাজ্য নিশ্চিহ্ন করিয়া দিব। কণ্টকার সহিত একশত সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্য গিয়াছে। তাহারা সকলেই আমার বিশ্বস্ত অনুচর। প্রাণ থাকিতে তাহারা কণ্টকার অনিষ্ট হইতে দিবে না। আপনার চিন্তার কোনো কারণ নাই। আপনি ধৈর্য ধরুন।

পূর্ণিমা আসিল এবং চলিয়া গেল কিন্তু কণ্টকা ফিরিল না। মারো পর্বত হইতে ঘুরঘুটের সেনাপতি জারিলা বহু সেনাসমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের জনপদের অনেক যুবক পিরালায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহাদের মনের খবর জানি না, বাহিরে দেখিলাম তাহারা খুব উৎসাহ প্রকাশ করিতেছে। ঘুরঘুটের বড় বড় ঘোড়ায় চড়িয়া তরোয়াল উৎক্ষিপ্ত করিয়া তাহাদের ছুটাছুটির ধুম পড়িয়া গেল। যুদ্ধ যে কি ভয়ঙ্কর জিনিস তাহা তখনও তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। প্রকৃত যুদ্ধে যে কি বিভীষিকা তাহা আমারও অজানা ছিল। মুখে ঘুরঘুটের বীরত্ব আস্ফালনে সায় দিতেছিলাম বটে কিন্তু মনে মনে আমিও শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলাম। কণ্টকার জন্যও খুব চিন্তা হইতেছিল। মাঝে মাঝে সন্দেহ হইতেছিল—সে বাঁচিয়া আছে তো! ঘুরঘুট চতুর্দিকে গুপ্তচর পাঠাইয়াছিল। তাহারাও কেহ ফিরিয়া আসে নাই। আমার দুশ্চিন্তা উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল। এমন সময় একজন গুপ্তচর ফিরিল। সে আসিয়া খবর দিল জিগাসা নদীর তীরে ধনুর্বাণধারী কিছু লোক আড্ডা গাড়িয়াছে। তাহাদের দলপতির নাম ভিংড়া। আর তাহার সহকারীরূপে যে লোকটি সেখানে রহিয়াছে তাহার নাম ভালা। টেংরু, দাম্‌ভা, জেইজেই নামে আরও তিনজন আছে। গুপ্তচরের সন্দেহ, তাহারা এই জনপদেরই লোক। বুঝিলাম আমার বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা আমার বিরুদ্ধে একটা দল পাকাইতেছে। বিতাড়িত ভিংড়াকে তাহারা দলপতি করিয়াছে। ঘুরঘুট জিজ্ঞাসা করিল উহাদের কি ও অঞ্চল হইতে তাড়াইয়া দিব? উহারা যদি শত্রু হয় তাহা হইলে উহাদের অবিলম্বে বিনাশ করাই কর্তব্য। আমি মানা করিলাম। বলিলাম—এখন উহাদের কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। উহারা আমার আত্মীয়। হয়তো শেষে উহারা আমাদের দলেই যোগ দিবে। দিন তিনেক পরে দ্বিতীয় গুপ্তচরটি ফিরিল। সে শিকারার পিরালা রাজ্যের দিকে গিয়াছিল। সে বলিল পিরালা রাজ্যে ভীষণ উত্তেজনা। কণ্টকা ভুলেরাকে হরণ করিয়া পলাইয়াছে। কোথায় গিয়াছে কেহ জানে না। যে একশত অশ্বারোহী সৈন্য কণ্টকার সহিত গিয়াছিল শিকারা তাহাদের সকলকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে। শিকারার সৈন্যবাহিনীতে একটা সাজ-সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। শিকারার সেনাপতি জোখরু খেখুন সম্প্রদায়ের বহু লোককে সৈন্যদলে ভর্তি করিতেছেন। পোলং জঙ্গল হইতে মশাল প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক গাছ কাটা হইতেছে। গুজব, শিকারা শীঘ্রই আমাদের আক্রমণ করিবে। এইসব শুনিয়া আমার মনের অবস্থা যাহা হইল তাহা অবর্ণনীয়। দোহা থাকিলে তাহার বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করিতাম। কিন্তু সে

যে কবে ফিরিবে তাহা তো অনিশ্চিত। পরদিন সকালে উঠিয়া দেখিলাম টুকচুম্বায় অজস্র ফুল ফুটিয়াছে। টুকচুম্বা যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে।

ঘুরঘুট খাঁকে বলিলাম—টুকচুম্বায় ফুল ফুটিলে আমরা তাহাকে পূজা করি। তাহার তলায় দুধ ঢালি। অনেক সময় পশুও বলি দিই। তাহার পর তাহাকে ঘিরিয়া নাচ-গান করি।

ঘুরঘুট বলিল—আমার আপত্তি নাই। আপনাদের বৃক্ষদেবতাকে পূজা আপনারা করুন। কিন্তু বেশি উন্মত্ত হইয়া উঠিবেন না। যে-কোনো মুহূর্তে শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইবে, এ সময় বেশি উন্মাদনা মারাত্মক। যুদ্ধের সময় যে-কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা পরাজয়ের কারণ হইতে পারে।

ঘুরঘুট খাঁ-র কথা যুক্তিযুক্ত, তবু তাহার কথায় মনে আঘাত লাগিল। মনে হইল তাহার কণ্ঠস্বরে যেন একটা প্রভু-সুলভ সুর শুনিতে পাইলাম। কষ্ট হইল, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

দামামায় ঘা দিলাম। দলপতি-রূপে আদেশ দিলাম টুকচুম্বার পূজা হইবে।

পরদিন যথারীতি সবই হইল। প্রচুর দুধ ঢালা হইল, একটি মেষ বলি দিয়া তাহার রক্তে টুকচুম্বার কাণ্ড রঞ্জিত করিলাম। নাচ-গান-বাজনাও হইল প্রচুর। ঘুরঘুটের দলের অনেকে আসিয়া যোগ দিল। কিন্তু আমার মনে হইল পূজার সুরটি যেন ঠিক বাজিতেছে না। কোথায় কিসের যেন একটা অভাব রহিয়া যাইতেছে। হয়তো অভাবটা আমার মনের মধ্যেই ছিল। অবশ্যম্ভাবী বিপদের করাল ছায়া আমার মনের দীপ্তিকে ঢাকিয়া দিয়াছিল।

পরদিনই শিকারা আসিয়া প্রচণ্ড আক্রমণ করিল আমাদের। কৃপাণ ও বর্শা হস্তে বীরবিক্রমে বহু অশ্বারোহী আমাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। আমিও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া একটা ঘোড়ার উপর চড়িয়াছিলাম। ঘুরঘুট আমার বুকে পিঠে উরুদেশে বাহুতে লৌহবর্ম পরাইয়া দিয়াছিল। আমার হাতেও একটা বর্শা ছিল। সহসা দেখিলাম একটা অশ্বারোহী উন্মুক্ত কৃপাণ লইয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার বর্শাটা তাহার স্কন্ধ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলাম। বর্শার ফলক স্কন্ধকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করিয়া দিল। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া গেল। তখন আমি আমার কোষ হইতে অসি নিষ্কাষিত করিয়া সবেগে সৈন্যব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার অসির আঘাতে একজনের হস্ত ছিন্ন হইল, একজনের গলদেশ দ্বিখণ্ডিত হইল। আমার চারিদিকে রক্তের ফোয়ারা ছুটিতে লাগিল। দেখিলাম আমার প্রিয় ভৃত্য দম আমার ঠিক পাশে ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধ করিতেছে। অপর পার্শ্বে রহিয়াছে ক্রীতদাসী বোরিলা। তাহারও অঙ্গে যোদ্ধৃবেশ, হস্তে উন্মুক্ত কৃপাণ। দম এবং বোরিলা আমাকে রক্ষা করিবার জন্য আমার পার্শ্বরক্ষীরূপে আসিয়াছিল। দেখিলাম তাহারা প্রচণ্ড বিক্রমে শত্রুনিধন করিতেছে। ঘুরঘুট খাঁ আমাকে রক্ষা করিবার জন্য আমার সম্মুখে ও পশ্চাদভাগে একদল করিয়া বর্শাধারী অশ্বারোহী সৈন্য মোতায়েন করিয়া ছিল। মাঝে মাঝে তাহাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া বিপদপক্ষের সৈন্য আমাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু বিশেষ সফল হইতেছিল না। চারিদিকে তুমুল চিৎকার, আর্তনাদ, চারিপাশে অশ্ব, অশ্বারোহী, রক্ত, আর ছিন্নভিন্ন শব-স্তূপ। আমি মাথা ঠিক রাখিতে পারিতেছিলাম না! মনে হইতেছিল আমরা মানুষ নই, আমরা পশুরও অধম, আমরা নরঘাতী রাক্ষস। নিজের প্রতি একটা তীব্র ঘৃণা মনের মধ্যে আবর্তিত হইতেছিল। হঠাৎ একটা গগনভেদী আর্তনাদ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিলাম আমাদের কৃষিবিভাগের বিরাটকায় বলিষ্ঠ ঘানডার দক্ষিণ বাহুটি ছিন্ন হইয়া মাটির উপর পড়িয়া গেল। দক্ষিণ স্কন্ধমূল হইতে ফোয়ারা দিয়া রক্ত বাহির

হইতে লাগিল। ঘানডা মাটিতে পড়িয়া আর্তনাদ করিতে করিতে আমার চোখের সম্মুখেই মরিয়া গেল। তাহার মৃতদেহের উপর দিয়া একের পর এক অশ্ব ছুটিয়া গেল। ঘানডা আমাদের জনপদের প্রাণস্বরূপ ছিল, সে প্রাণ সহসা নিবিয়া গেল, ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। ঘুরঘুটের অনেক সৈন্যের হাতে কুঠার ছিল। দেখিলাম সেই কুঠার দিয়া তাহারা শিকারার সৈন্যদের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিতেছে। সহসা আমার সামনের সৈন্য-প্রাকার ভেদ করিয়া একটা প্রকাণ্ড জোয়ান খড়্গ আস্ফালন করিতে করিতে আমার খুব নিকটে আসিয়া পড়িল। হয়তো সে খড়্গ আমার উপরই পড়িত কিন্তু কোথা হইতে একটা তীক্ষ্ণ তীর আসিয়া তাহার গলদেশে বিঁধিল—সে ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শিকারার আর একদল খড়্গধারী সৈন্য আমার দিকে তাড়া করিয়া আসিতে লাগিল, আমার পিছন হইতে আমার রক্ষী সৈন্যরা তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। আমিও আমার অসি তুলিয়াছিলাম কিন্তু সহসা পিছন দিক হইতে কে যেন চিৎকার করিয়া উঠিল, পালাও—পালাও—পিছু হটিয়া এস। ঘোড়ার মুখ ঘুরাইয়া দেখিলাম ঘুরঘুট খাঁ রেকাবের উপর দাঁড়াইয়া আদেশ দিতেছে। ঘুরঘুটের সব সৈন্য পশ্চাদপসরণ করিতেছে। ঘুরঘুটের কাছে যাইতেই সে বলিল— আমাদের অনেক সৈন্য এবং অনেক অশ্ব মারা গিয়াছে। শিকারার নূতন সৈন্যদল আসিতেছে। আমিও মারো পাহাড়ে আরও সৈন্য আনিতে পাঠাইয়াছি, তাহারা যতক্ষণ না আসে আমরা বিরানি জঙ্গলের ভিতর আত্মগোপন করিয়া থাকিব। আপনি ভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছেন। আপনার ভাই ভিংড়া ও ভালা ধনুর্বাণধারী একদল সৈন্য লইয়া আমাদের সৈন্যদেরই মারিতেছে। আপনাকে লক্ষ্য করিয়াও তাহারা একটা তীর ছুঁড়িয়াছিল কিন্তু তীরটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া আপনার আততায়ীর কণ্ঠে গিয়া বিঁধে। আমার সৈন্যদল যতক্ষণ না আসিয়া পৌঁছায় ততক্ষণ যুদ্ধ স্থগিত থাক। আসুন আমরা বিরানি জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়ি।

আমি বললাম—তাহা হইলে তো শিকারা এখনই আমাদের জনপদ দখল করিয়া লইবে। ঘরে ঘরে আগুন লাগাইয়া দিবে। অবশেষে বিরানিতেও প্রবেশ করিবে। আসুন, না পলাইয়া আমরা উহাদের বাধা দিই। আমাদের জনপদের লোকসংখ্যা কম নয়। তাহাদের কাছে কিছু কিছু অস্ত্রও আমি দিয়াছিলাম। আমরা পলাইব না, যতক্ষণ প্রাণ থাকে প্রতিরোধ করিব। আপনি ও আপনার সৈন্যরা যদি পিছু হটিতে চান, আমি বাধা দিব না। কিন্তু আমরা পলাইব না, আমরা যুদ্ধ করিব। আমাদের দেবতা মহাবৃক্ষ ওই টুকচুম্বা সহস্র সহস্র ফুল ফুটাইয়া আমাদের জানাইয়া দিয়াছেন আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করিব। আপনি যদি পশ্চাদপসরণ করিতে চান করুন। আমি ঘোড়ার মুখ ফিরাইলাম।

আমি ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া আবার সম্মুখ দিকে আগাইয়া গেলাম। ঘুরঘুটের সৈন্যরা ঘুরঘুটের আদেশে সকলেই পলাইতেছে। শিকারার সৈন্য তাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। ঘুরঘুটের সেনাদল সকলেই বিরানির দিকে দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেল।

দেখিলাম সম্মুখে কয়েকটা অশ্বারোহীহীন অশ্ব পড়িয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। তাহাদের আশেপাশে কাটা হাত, ছিন্ন মুণ্ড আর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শব। সহসা একটা বল্লম আসিয়া আমার বুকে লাগিয়া প্রতিহত হইল। ঘুরঘুট আমাকে বর্মাবৃত করিয়াছিল, বল্লম আমার গায়ে বিঁধিল না। আমি অসি নিষ্কাষিত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখে সজোরে আঘাত করিলাম। তাহার নীচের চোয়ালটা খসিয়া গেল। অদ্ভুত ভয়ঙ্কর মূর্তি লোকটা তবু কিছুদূর আগাইয়া আসিল, তাহার পর পড়িয়া গেল। হঠাৎ পিছনে একটা রে রে রে শব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার বিস্ময়ের সীমা ছাড়াইয়া গেল। জনপদের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই একযোগে বিরাট সমুদ্র-তরঙ্গের মত

কাহারও হাতে কোদাল, কাহারও হাতে কুঠার। দেখিলাম বৃদ্ধা ঝাঝা, মম্মন, টুলা, ভর্ণা, বাবলা ও প্রত্যেকেই বড় বড় কাটারি লইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। অনেক মেয়েদের হাতে বঁটি। আমাদের জনপদের আহত আত্মসম্মান জাগিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া আমার প্রাণে যে কি আনন্দ হইল তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারিব না। আশা হইল আমাদের মধ্যে অনেকে মরিবে কিন্তু পরাজয়-স্বীকার করিবে না। শিকারার সৈন্যরা সবাই অশ্বারোহী, তাহাদের হাতে খড়্গ, অসি, বল্লম, কুঠার। এ যুদ্ধ অসম যুদ্ধ। তবু যুদ্ধ চলিতে লাগিল। আমি ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া অসি চালাইতে লাগিলাম। আমাদের নিজেদের কিছু অশ্বারোহী সৈন্য ছিল, তাহারাও মরীয়া হইয়া লড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর বুঝিলাম আমাদের অনেক লোক মরিতেছে বটে, কিন্তু তাহারা বাধা দিয়াছে। শিকারার বাহিনীও অবাধে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। আমার জনপদবাসীরা তাহাদের গতিরোধ করিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, কোদাল, লাঙল, বঁটি, কাটারি প্রভৃতির বিষম প্রহারে ঘোড়াগুলির মুখ চোখ নাক মুখ জখম হইতেছিল, তাহারা পিছু হটিয়া পলাইবার উপক্রম করিতেছিল। আমার মনে হইল, আহা, এ সময়ে আমাদের যদি আরও কিছু অশ্বারোহী সেনা থাকিত তাহা হইলে আমরা সম্পূর্ণরূপে শিকারার গতিরোধ করিতে পারিতাম। সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্যের বিরুদ্ধে পদাতিকরা কতক্ষণ যুঝিতে পারে। এ সময় আকুল চিত্তে কিছু অশ্বারোহী সৈন্যের অভাব বোধ করিতে লাগিলাম। ঘুরঘুট খাঁকে খবর পাঠাইলাম সে আবার আসিয়া আক্রমণ করুক। কিন্তু সে আসিল না। বলিয়া পাঠাইল মারো হইতে তাহার নূতন অশ্বারোহী সৈন্যরা না আসা পর্যন্ত বিরানি জঙ্গলেই তাহারা বিশ্রাম করিবে। শিকারার সৈন্যরা আমাদের অসহায় প্রায়-নিরস্ত্র জনপদবাসীদের নির্মমভাবে বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। প্রকাণ্ড বল্লমের আঘাতে অনেকে ভূশায়ী হইল। ঘোড়ার পায়ের তলাতেও নিষ্পিষ্ট হইল অনেকে। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। এমন সময় সহসা একটা তূর্যধ্বনি শুনিতে পাইলাম। তাহার পর ঘন ঘন তূর্যধ্বনি হইতে লাগিল। দেখিলাম আমাদের মাঠের দিক হইতে অসংখ্য অশ্বারোহী সৈন্য আসিতেছে। কাহার সৈন্য? ঘুরঘুটের নূতন সেনাদল কি আসিয়া পড়িল? কিন্তু ইহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ তো অন্যপ্রকার, চেহারাও অন্য রূপ। ঘুরঘুটের সৈন্যদলের পোশাক কৃষ্ণবর্ণ, ঘুরঘুটের সৈন্যদলের অধিকাংশ লোকও কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু ইহাদের পোশাক সবুজ, ইহাদের বর্ণ গৌর। ইহাদের চোখ টানা টানা, চোখের মণি কুচকুচে কালো। সৈন্যদলের পুরোভাগে প্রকাণ্ড ঘোড়ার উপর চড়িয়া যে আমার দিকে দ্রুতবেগে আগাইয়া আসিল দেখিলাম সে অশ্বারোহী নয়, অশ্বারোহিনী। চিৎকার করিয়া সে বলিল—আমাকে চিনিতে পার টালা? আমি সুলমা। সেই যে অনেক দিন পূর্বে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া পলাইয়া ছিলাম। কিন্তু এসব কি?

বলিলাম—আমরা আক্রান্ত হইয়াছি। পিরালা রাজ্যের শিকারা আমাদের আক্রমণ করিয়াছে। আমাদের নিজেদের সৈন্যবাহিনী নাই, কি হইবে জানি না।

সুলমা বলিল—ভয় কি। আমি তোমাদের জন্যই সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি। আমাদের সেনাপতি আখেব খুব বড় যোদ্ধা। তোমার কপাল হইতে রক্ত পড়িতেছে। তুমি চল—আখেবের কাছে চল—সে যুদ্ধের সব ভার লইবে। তুমি চলিয়া এস।

যুদ্ধের কোলাহল হইতে সুলমা আমাকে বাহির করিয়া লইয়া গেল। তাহার সেনাপতি আখেব বিরাটকায় লোক। ধপধপে ফরসা রং, মুখে বাদামি রঙের চাপ দাড়ি ও গোঁফ। মাথার শিরস্ত্রাণ হইতে স্বর্ণজ্যোতি ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। সুলমা যে ভাষায় তাঁহার সহিত কথা কহিল সে ভাষা আমি

বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহা বুঝিলাম সুলমাই এ বাহিনীর প্রকৃত নেত্রী, আখেব তাহার ভৃত্য মাত্র।

সুলমার কথা শুনিয়া আখেব চিৎকার করিয়া উঠিল—জাম্বারিন্ কা হাফ্তা কা হাফ্তা। সঙ্গে সঙ্গে সুলমার সৈন্যবাহিনী সবেগে শিকারার সৈন্যবাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কা হাফ্তা কথার মানে বোধহয় অবিলম্বে আক্রমণ কর। যুদ্ধ আবার তুমুল হইয়া উঠিল।

সুলমা বলিল—চল আমরা একটু দূরে নির্জনে যাই, তোমাকে অনেক কথা বলিবার আছে।

কাছে-পিঠে কোনো নির্জন জায়গা ছিল না। ভিংড়া যে পাহাড়টায় থাকিত সেই দিকেই আমরা অশ্ব-চালনা করিলাম।

আপনারা বিশ্বাস করিবেন কি না জানি না কিন্তু সেই পাহাড়ের সানুদেশে অবতরণ করিয়া আমি হঠাৎ একটা জিনিস আবিষ্কার করিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। দেখিলাম সুলমা কাঁদিতেছে। তাহার দুই গাল বাহিয়া অশ্রুর প্রস্রবণ নামিতেছে।

এ কি সুলমা, তুমি কাঁদিতেছ কেন?

দুঃখে নয়, আনন্দে কাঁদিতেছি। আনন্দ তোমাকে ফিরিয়া পাইয়াছি বলিয়া। আনন্দ তোমার বিপদের সময় অশ্বারোহী সেনা দিয়া তোমাকে সাহায্য করিতে পারিয়াছি বলিয়া। এখান হইতে চলিয়া যাইবার পর আমার জীবনের একটি মাত্রই লক্ষ্য ছিল তোমাদের জন্য একটি অশ্বারোহী বাহিনী প্রস্তুত করিব। ইহার জন্য যাহা যাহা করিয়াছি তাহার বিবরণ আর একদিন বলিব। দীর্ঘ সে কাহিনী। আমার একটি প্রশ্ন—আমাকে এখনও তুমি ভালোবাস তো?

বলিলাম—বাসি। তুমি যেদিন ঘোড়ায় চড়িয়া গেলে সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত মনে মনে প্রত্যাশা করিয়া আছি তুমি ফিরিয়া আসিবে। আজ সে প্রত্যাশা সফল হইয়াছে। আজ সত্যই বড় আনন্দের দিন। সুলমা তুমি কাঁদিও না।

সুলমা কয়েক মুহূর্ত নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল—কিন্তু একটা কথা না বলিলে আমার হৃদয়ের ভার লাঘব হইবে না। সুদীর্ঘকাল তোমার সহিত আমার ছাড়াছাড়ি। এই সময়ে আমি একাধিক পুরুষের সংস্রবে আসিয়াছি। আমার একটি ছেলে হইয়াছে। তাহাকে দেশে রাখিয়া আসিয়াছি। কে তাহার বাবা সঠিক আমি জানি না। তুমি এ-সব কথা শুনিয়াও কি আমাকে আর ভালোবাসিতে পারিবে? আমার পুত্রকে তোমার নিজের পুত্রের মত গ্রহণ করিবে?

আমি ইহা শুনিয়া খুব বিস্মিত হইলাম না। সে যুগে যৌন ব্যাপারে স্বাধীনতা এমন সীমাবদ্ধ ছিল না। বিস্মিত হইলাম না, কিন্তু মনে মনে ব্যথিত হইলাম। একটু ঈর্ষাও হইল।

বলিলাম, তোমার ছেলেটি কত বড়?

আগামী শুক্লপক্ষে সে সাত মাসে পড়িবে। তাহাকে ধাত্রীর কাছে রাখিয়া আসিয়াছি। তুমি যদি তাহাকে গ্রহণ কর, এইখানেই তাহাকে লইয়া আসিব।

আমি মাথা হেঁট করিয়া কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিলাম। ভাবিলাম আমিও জীবনে একাধিক স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসিয়াছি। এই কারণে সুলমাকে ত্যাগ করিবার অধিকার আমার নাই।

বলিলাম, যুদ্ধটা শেষ হোক। তখনও আমরা যদি বাঁচিয়া থাকি তোমার ছেলেকে এখানে আনাইবার ব্যবস্থা করিব। তাহাকে আমার পুত্রের মর্যাদাই দিব। তুমি কিন্তু আমাকে আর ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। তোমাকে আর কাছ ছাড়া করিব না।

সুলমা আমাকে আবেগ-ভরে জড়াইয়া ধরিল। বলিল—বিশ্বাস কর একাধিক পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাদের ভালোবাসি নাই। ভালোবাসি শুধু তোমাকে। না বাসিলে ফিরিতাম না। বিশ্বাস কর, তোমার সৈন্যবাহিনী গঠনের জন্যই অনেক পুরুষকে প্রশ্রয় দিতে হইয়াছে। তোমার জন্য সেনাবাহিনী গঠন করাই আমার জীবনের ব্রত ছিল। সে ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া আমার মনে আজ যে কি আনন্দ, কি গর্ব, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না—

সহসা একটা তীক্ষ্ণ শব্দে সচকিত হইয়া আকাশের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম একটা বাদামি রঙের বাজ চক্রাকারে উড়িয়া উড়িয়া শব্দ করিতেছে— কেক্ কেক্ কেক্-কীঈঈ। এ পাখি আগে দুইবার আমাদের জনপদে আসিয়াছিল। প্রথমবার—যেদিন দোহা ভালুক মারিয়া আনে। ভালুকের মাংস খাইবার অনুমতি এই পাখিটিই দিয়াছিল। ভিংড়া ইহার দিকে তীর ছুঁড়িয়া ছিল কিন্তু মারিতে পারে নাই। দ্বিতীয়বার দোহা ইহাকে ধরিয়া তাহার 'ফান্‌ডি'তে রাখিয়াছিল। সবুজ রং মাখাইয়াছিল।

কেক্—কেক্—কেক্—কীঈঈ—

চক্রাকারে উড়িয়া উড়িয়া পাখিটা কয়েকবার ডাকিল, তাহার পর টুকচুম্বার দিকে উড়িয়া চলিয়া গেল।

কি কথা বলিয়া গেল পাখিটা? মনটা কেমন তোলপাড় করিয়া উঠিল। ও কি সংবাদ আনিয়াছে? সুলমা প্রশ্ন করিল—কি দেখিতেছ?

ওই পাখিটা। উচ্চকণ্ঠে ও কি বলিয়া গেল? কর্করা পাখিরা যখন ডাকিতে ডাকিতে আকাশ জুড়িয়া আসিত তখন আমরা ভীত হইতাম। তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের গমের ক্ষেতে নামিয়া ফসল নষ্ট করিত। এ পাখি কি সঙ্কেত বহন করিয়া আনিল?

সুলমা বলিল—আমাদের দেশে ও পাখির নাম রাজাবাজ। ও সাপ ধরিয়া খায়। আমরা উহাকে খুব সম্ভ্রম করি, কারণ ও পাপীকে শাস্তি দেয়। তুমি ভয় পাইও না, রাজাবাজ মঙ্গলের বার্তাবহ।

এমন সময় একজন অশ্বারোহী আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে দেখিতে পাইলাম। যুদ্ধের কোলাহল দূর হইতে অস্পষ্ট শোনা যাইতেছিল, তাহা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল।

অশ্বারোহী আসিয়া বলিল—ঘুরঘুট খাঁ-র নূতন সৈন্যদল আসিয়া পড়িয়াছে। তাহারাও যুদ্ধে নামিয়াছে। ওদিকে শিকারার সৈন্যদলেও খেখুন সম্প্রদায়ের সৈন্যরা আসিয়া যোগ দিয়াছে। আখেবের সৈন্যদলও প্রচণ্ড যুদ্ধ করিতেছে।

ঘুরঘুট খাঁ খবর দিলেন আপনি এখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাইবেন না। সেখানে হত্যার তাণ্ডব চলিয়াছে। তিনি বলিলেন আপনি যুদ্ধ হইতে দূরে থাকুন। তিনি আমাকে আপনার শরীর-রক্ষী হিসাবে পাঠাইয়াছেন।

ভিংড়ার পরিত্যক্ত ঘরটাতেই আমরা থাকা স্থির করিলাম।

অশ্বারোহীকে বলিলাম, আমাদের দুইজনের খাইবার এবং থাকিবার ব্যবস্থা পাহাড়ের ওই পাথর-ঘেরা গুহাটায় আপাতত কর। ঘুরঘুট খাঁকে আমার অভিবাদন জানাইয়া বল যে অন্তত দশজন সশস্ত্র প্রহরী যেন এই পাহাড়তলীকে পাহারা দেয়। আমার ভৃত্যদ্বয়কে যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দাও।

অশ্বারোহী বলিল—দম মারা গিয়াছে। শিকারার এক সেনা কুঠার দিয়া তাহার মস্তক দিখণ্ডিত করিয়াছে।

তুমি কি দমকে চিনিতে?

দমের চারিটি পত্নী শোকে হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছে। তাহাদের সান্ত্বনা দিতে গিয়াই শুনিলাম যে দম আপনার প্রিয় সহচর ছিল, সে মারা গিয়াছে।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

অশ্বারোহীটি বলিল, শীঘ্রই আপনার জন্য একটি ভৃত্যের ব্যবস্থা করিতেছি।

অশ্বারোহীটি দ্রুতবেগে পুনরায় চলিয়া গেল।

সুলমা বলিল—আমি তো আছি। অন্য ভৃত্যের প্রয়োজন কি।

তাহাকে চুম্বন করিলাম।

উভয় পক্ষেই প্রচুর সৈন্য, প্রচুর অশ্ব, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, প্রচুর উত্তেজনা। দশ দিন কাটিয়া গেল তবু যুদ্ধ থামিবার লক্ষণ নাই। আকাশে বহু শকুনি গৃধিনী কাক উড়িতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়া তাহারা পচা মড়া ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে। তাড়াইয়া দিলে খানিকটা সরিয়া যায়, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার আসিয়া বসে। শকুনি-গৃধিনীরা একটা সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। বিকট দুর্গন্ধে চতুর্দিক পরিপূর্ণ। হাহাকার, আস্ফালনে, অশ্বের হ্রেষায় চিৎকারে দশদিক কম্পিত। তা সত্ত্বেও যুদ্ধ চলিতেছে এবং মনে হইতেছে আরও বেশ কিছুদিন চলিবে। যতক্ষণ না উভয় পক্ষের সব নিঃশেষ হইতেছে ততদিন চলিবে।

আমি ভিংড়ার গুহায় একাই ছিলাম, আমার খাওয়া-দাওয়ার কোনো কষ্ট ছিল না, কিন্তু আমার মনে তুষানল জ্বলিতেছিল, আমি যেন কণ্টকশয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম।

কণ্টকা বা ভুলেরার কোনো খবর আসে না। সুলমা রোজ সকালে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে চলিয়া যাইত এবং সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া যুদ্ধের সব খবর আমাকে শুনাইত।

সে একদিন আসিয়া বলিল—শিকারাকে ঘুরঘুট বন্দি করিয়াছে। তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া একটি ঘরের ভিতর রাখা হইয়াছে। ঘরটি ঘিরিয়া বহু সশস্ত্র সৈন্য দিবারাত্রি পাহারা দিতেছে। কিন্তু তবু যুদ্ধ এখনও থামিবার কোনো লক্ষণ নাই। কারণ শিকারার সেনাপতি জোখরু এবং খেখুনদের রাজা জিজিগম আরও অনেক অশ্বারোহী সৈন্য আমদানী করিয়াছে। আমি আমার সৈন্যদের এখন বিরানি জঙ্গলে পাঠাইয়া দিয়াছি, তাহারা সেখানে কিছুদিন বিশ্রাম করুক। সকলে একসঙ্গে জটাপটি করিয়া লাভ নাই। এখন ঘুরঘুট খাঁ-র সৈন্যরা লড়িতেছে। প্রয়োজন হইলে আমার সৈন্যরা তাহাদের সহিত যোগ দিবে। মড়াগুলি পুঁতিয়া ফেলিবার জন্য একদল লোক লাগাইয়াছি। তাহারা আমাদের মাঠে কবর খুঁড়িতেছে...।

সুলমা একটুও বিচলিত হয় নাই। অনায়াস নিপুণতা সহকারে যে সমস্ত ব্যাপারটার হাল ধরিয়া বসিয়া আছে। আমাকে যুদ্ধ ক্ষেত্রের ত্রিসীমানায় যাইতে দেয় না।

একদিন হঠাৎ বলিল—আমি কণ্টকার খোঁজে দশজন অশ্বারোহী পাঠাইয়াছি।

কণ্টকার খোঁজে? কেন?

আমি বুঝিতে পারিতেছি, তুমি মনে মনে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছ।

আমি একথা অস্বীকার করিতে পারিলাম না। বলিলাম, তোমার চরিত্রের এ দিকটা তো আগে দেখি নাই।

সুলমা মুখ টিপিয়া হাসিল কেবল। তাহার হাসিটি সত্যই অপূর্ব।

যুদ্ধ শেষ হইবার কোনো লক্ষণ নাই। দুই পক্ষেই নূতন অশ্বারোহী দল আসিয়া যোগ দিতেছে।

শেষ হইবার কোনো আশা দেখিতেছি না। দুই পক্ষই নানা স্থান হইতে রসদও সরবরাহ করিতেছে। আমাদের জনপদ শ্মশান হইয়া গেল। একদিন শুনিলাম তিরখনও মারা গিয়াছে। তাহার একটা কথা মনে পড়িল। সে একদিন বলিয়াছিল—আমরা হুনেরা কখনও সঞ্চয় করি না। আমাদের যাহা প্রয়োজন লুটপাট করিয়া সংগ্রহ করি। আমাদের মধ্যে বিষয়-সম্পত্তি করিবার বাসনা যখন জাগিবে তখনই আমাদের ধ্বংসের বীজ আমরা বপন করিব। তোমরা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বিষয় সম্পত্তি করিয়া সেই বীজ বপন করিয়াছ। বিষয় করিলেই সে বিষয় হরণ করিবার জন্য চোর-ডাকাত আসিবে, বিষয়ের জন্য ভাইয়ে ভাইয়ে কলহ হইবে। বিষয় তোমার শান্তি অপহরণ করিবে, তোমার বিষয় যত বিস্তীর্ণ হইবে তোমার অন্তর্দাহও তত বাড়িবে। বিষয় বিষ, বিষয় গরল। তিরখনের কথাগুলি মনে পড়িতে লাগিল। আমরা মানব সভ্যতার যে স্তরে উপনীত হইয়াছিলাম সেই স্তরে আমরাই প্রথমে জমি দখল করিয়া জনপদের পত্তন করি। আমরাই প্রথম গরল পান করিয়াছি। দেখিতেছি সেই গরলের ক্রিয়াও শুরু হইয়া গিয়াছে। আমার চোখের সম্মুখেই আমাদের জনপদ শ্মশান হইয়া যাইতেছে। হয়তো মানব-সমাজে এই কাহিনীই নানারূপে বারংবার মূর্তি পরিগ্রহ করিবে, বহু সভ্যতার উত্থান ও পতন হইবে, বহু জনপদ শ্মশান হইবে, বহু নারী স্বামী-হারা সন্তান-হারা হইবে, বহু পুরুষ স্ত্রী-হারা সন্তান-হারা হইয়া হাহাকারে আর্তনাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিবে, তবু মানুষ এই হলাহল পান করিতে ছাড়িবে না। হয়তো চিরকাল এই নিদারুণ মহানাটকের অভিনয় চলিতেই থাকিবে।

যুদ্ধ চলিতেছিল।

কিন্তু এমন একটা অভিনব অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল যে যুদ্ধ হঠাৎ থামিয়া গেল। যে যেদিকে পারিল দুদ্দাড় করিয়া ছুটিয়া পলাইল। বিশাল এক হস্তী-বাহিনী লইয়া দোহা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইল। তাহার সঙ্গে হাতি-বাবা। দোহা ও হাতি-বাবা যে হাতিটির উপর চড়িয়া ছিল সেটি পর্বতাকার, বিশাল তাহার দাঁত, প্রকাণ্ড মাথা, প্রকাণ্ড কান। শুঁড় দোলাইতে দোলাইতে সেই মহামাতঙ্গ সদলবলে যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল তখন সমস্ত ঘোড়ারা ভড়কাইয়া যে যেদিকে পারিল উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। হাতির দল রণক্ষেত্র ছাইয়া ফেলিল। ঘুরঘুট দোহাকে চিনিত, সে ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িল। ঘোড়াটা সবেগে পলায়ন করিল। দেখিতে দেখিতে রণক্ষেত্র অশ্বারোহী-শূন্য হইয়া গেল। চাহিদিকে কেবল বিরাটকায় হাতির দল। সহসা লক্ষ্য করিলাম একটি হাতির পিঠে চম্বা বসিয়া আছে।

হাতি দেখিয়া আমিও ভয় পাইয়াছিলাম। কাছে যাইতে সাহস হইতেছিল না। দোহা হাতি হইতে নামে নাই। আমাকে দেখিতে পাইয়া সে ডাকিল।

কাছে এস, ভয় নাই।

তাহার পর হাতি-বাবার কানে কানে কি বলিল। বোধহয় আমার পরিচয় দিল। আমি সভয়ে হাতীর কাছে গেলাম। হাতি-বাবা হাতির ভাষায় কি বলিলেন বুঝিতে পারিলাম না। দেখিলাম হাতিটা হাঁটু গাড়িয়া শুঁড় তুলিয়া আমাকে অভিবাদন করিল। প্রত্যেক হাতির পিঠেই একজন মাহুত ছিল। তাহারাও জয়ধ্বনি করিয়া আমাকে সংবর্ধনা করিল।

যুদ্ধ থামিয়া গেল।

ঘুরঘুট আসিয়া আমাকে বলিল—বন্দিনী শিকারার কি ব্যবস্থা করিবেন? আমার ইচ্ছা রাক্ষসীটাকে হত্যা করিয়া ফেলি।

আমি বলিলাম—আমরা তো অনেক হত্যা করিলাম, আবার কেন? শিকারাকে জিজ্ঞাসা করুন সে কি আমাদের বন্ধু হইবে?

ঘুরঘুট একটু বাদে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—শিকারা বলিতেছে দোহাকে আমি ভালোবাসি। দোহাই আমার বিচার করুক। সে যে দণ্ড দিবে তাহাই আমি মাথা পাতিয়া লইব।

দোহা বলিল, আমি বিচার করিতে অক্ষম। হাতি-বাবাই করুন।

হাতি-বাবা বলিলেন—আমার হাতিই বিচারক হোক। সে আমার চেয়ে বেশি বিজ্ঞ। উহার বুদ্ধি আমার অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম।

বন্দিনী শিকারাকে হাতির সম্মুখে দাঁড় করানো হইল। হাতি-বাবা হাতির ভাষায় তাহাকে কি বলিলেন, বুঝিলাম না। সম্ভবত বিচার করিতেই বলিলেন।

হাতি হঠাৎ আগাইয়া গিয়া শিকারাকে শুড়ে জাপটাইয়া উপরে তুলিল, তাহার পর সজোরে মাটিতে আছাড় মারিল এবং রোষভরে পা দিয়া তাহাকে নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শিকারা রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডে পরিণত হইয়া গেল।

পরদিন হাতি-বাবা হাতির দল লইয়া চলিয়া গেলেন। যে হাতিটিতে চম্বা চড়িয়া আসিয়াছিল সে হাতিটি তিনি দোহাকে উপহার দিয়া গেলেন।

টুকচুম্বা লাল ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছিল। মনে হইতেছিল আমাদের জনপদের রক্তাক্ত বেদনা যেন টুকচুম্বার সর্বাঙ্গে মূর্ত হইয়াছে। আমার যাহারা বাঁচিয়া ছিলাম তাহারা সকলে একদিন টুকচুম্বার তলায় সমবেত হইয়া প্রার্থনা করিলাম। দোহা হাউহাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঘুরঘুটও সে প্রার্থনা সভায় ছিল। সে-ও দেখিলাম খুব বিচলিত হইয়াছে। তাহার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। সে আশা করিতেছিল তাহারা হয়তো মারো পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছে। সে-ও যাইবে-যাইবে করিতেছিল। এমন সময় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। স্বর্ণ-রৌপ্য-খচিত কিংখাবে-মোড়া একটি সুদৃশ্য পালকি একদিন আমাদের নদীর পূর্বতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। পালকির সহিত পালকির বেহারা ছাড়া দুইজন অশ্বারোহী ছিল। একজন অশ্বারোহী আমাদের ভাষায় বলিল—কণ্টকা ও ভুলেরা উর নামক রাজ্যে আছে। এদেশে যুদ্ধ হইতেছে বলিয়া তাহারা উর রাজ্যে আত্মগোপন করিয়াছে। এই পালকি তাহারা ঘুরঘুট খাঁ-র জন্য পাঠাইয়াছে। ঘুরঘুট খাঁ এই পালকি চড়িয়া যেন চলিয়া আসেন। উর রাজ্যে বিদেশি অশ্বরোহীদের প্রবেশ নিষেধ। তাই পালকি পাঠানো হইল। ভুলেরা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কণ্টকাও ভালো আছে। যুদ্ধ থামিয়াছে খবর পাইলেই সে ফিরিয়া আসিবে। ঘুরঘুট পরদিনই পালকি করিয়া চলিয়া গেল।

নাটকটা বেশ মিলনান্তক হইয়া আসিয়াছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়োগের সুর বাজিল। একদিন সহসা কয়েকটা তীর আসিয়া আমার গলায়, পিঠে ও মুখে বিঁধিল। দেখিলাম দূরে ভিংড়া ও ভালা ছুটিয়া পলাইতেছে। তীরগুলি বিষাক্ত ছিল, আমার মৃত্যু হইল।

রঙ্গতরঙ্গ

কল্পনা দেবীরই আরাধনা করছিলাম। তাঁর অনুগ্রহ চাই। তা নাহলে কোনো গল্পই লেখা যায় না। আরাধনা করলেই যে তাঁর দেখা পাওয়া যাবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। তিনি আকাশচারিণী, অনন্ত-বিলাসিনী। তিনি প্রসন্ন হলেই তাঁর দেখা পাওয়া সম্ভব। যে ভাষা তিনি শুনতে পান তা আকুলতার ভাষা। আকুল হয়েই ডাকছিলাম তাঁকে। মাঠে বসেছিলাম। জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছিল। চাঁদের দিকে চেয়ে ভাবছিলাম মানুষ চাঁদের বুকে পা দিয়ে এল, কিন্তু চাঁদের হাসি তো একটুও কমেনি। তার স্পর্শে এখনও কুমুদরা ফুটছে আমাদের সরসীতে, হাস্নুহানা রজনীগন্ধারা আকুল হচ্ছে আমাদের বাগানে। কিছুই তো বদলায়নি। ভূগোলে তেপান্তরের মাঠ নেই কিন্তু তবু তেপান্তরের মাঠে পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে সেই চিরকালের রাজপুত্র। তেপান্তরের মাঠে এখন হয়তো শহর বসেছে। কিন্তু সে শহরের নাম আমাদের আনন্দলোকে নেই, রূপকথায় স্থান হয়নি তার। চাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিলাম, যত মানুষই নাবুক ওখানে, চাঁদ—আমাদের চাঁদ—যেমন ছিল তেমনি থাকবে। থাকবে, কারণ ও যে দূরের, অনেক দূরের, কল্পনা দিয়ে সৃষ্টি করেছি ওকে আমরা। ওর মাটিতে স্বপ্ন নেই। স্বপ্ন আছে আমাদের মনে। সে স্বপ্নের উপর কোনো যন্ত্র নামাতে পারবে না কেউ কোনোদিন।

একটি হ্রেষা-ধ্বনি শুনে চমকে উঠলাম।

দেখি সামনে প্রকাণ্ড একটি ঘোড়া দাঁড়িয়ে।

আরও আশ্চর্য হয়ে গেলাম ঘোড়া যখন মানুষের ভাষায় কথা কইল।

"আমাকে কল্পনা দেবী পাঠিয়েছেন। আপনি পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা ভাবছিলেন তাই আমাকে বললেন তুমি ঘোড়ার বেশেই যাও। ওর গল্পকে পিঠে করে নিয়ে যাও ভবিষ্যৎলোকে। ও ভবিষ্যৎলোকের কথাই ভাবছে। অতি-দূর ভবিষ্যতে নিয়ে যাও ওর কাহিনীকে।"

আমার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। নির্বাক হয়ে রইলাম কয়েক মুহূর্ত।

"অতি দূর ভবিষ্যতে নিয়ে যাবে?"

"বলেন তো, পৌরাণিক যুগেও নিয়ে যেতে পারি। কল্পনা দেবী আমাকে যা-খুশি করবার অধিকার দিয়ে পাঠিয়েছেন। আপনি কাল ভোরেই শুরু করুন আপনার গল্প। ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠতে পারবেন?"

"পারব।"

"তাহলে ব্রাহ্ম মুহূর্তেই শুরু করুন।"

ইতি ভূমিকা।

আমার গল্পে আছেন অধ্যাপক চঞ্চল মৌলিক, তাঁর বন্ধু সরোবর সান্যাল, আছে ফুটকি, আছে সোহাগা, আছে নহুষ। এদের নিয়েই গল্প শুরু। পরে আরও অনেকের দেখা পাওয়া যাবে যেমন যেমন আবির্ভূত হবেন তাঁরা।

অতিদূর ভবিষ্যতের যে যুগে গিয়ে অধ্যাপক মৌলিক হাজির হলেন সে যুগের নাম এ যুগের

ভাষায় বলা যাবে না। কড়ি যেমন এ যুগে অচল শতাব্দীর হিসাবও তেমনি অচল হয়ে গেছে সে যুগে। সে যুগের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন সূর্যের আলো নাকি পৃথিবীতে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ক্ষয়ে যায়। কতটা ক্ষয়ে যায় তা নাকি তাঁরা সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে মাপতেও পেরেছেন। সেই মাপ অনুসারেই নাকি সময়কেও মাপা হচ্ছে। সে মাপের সাংকেতিক চিহ্ন 'ক্ষ' মানে এক পদ্ম-শতাব্দী অর্থাৎ এক হাজার লক্ষ শতাব্দী। এই মাপ অনুসারে আমাদের শতাব্দী পরমাণুর মত ছোট্ট হয়ে গেছে সে যুগে। অচলও হয়ে গেছে।

চঞ্চল মৌলিক যে যুগে গিয়ে হাজির হলেন তা ক্ষ-৪৯; কবে থেকে 'ক্ষ' এই মাপের সিংহাসন দখল করে আছেন তা জানা নেই, কতদিন থাকবেন তা-ও অবশ্য অজানা। ভবিষ্যতের সবই অজানা। শুধু চঞ্চল মৌলিক নয় তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু সরুও (যাঁর পুরো নাম সরোবর সান্যাল) ছিটকে গিয়ে পড়লেন এ যুগ থেকে আগামী যুগে। এঁরা বাল্যকালে যখন পাঠশালায় পড়তেন তখন এঁদের দুজনের চেহারা নাকি একরকম ছিল। এখন কিন্তু দুরকম হয়ে গেছেন দুজন। সরু খুব সরু হয়ে গেছেন আকারে। মাথায় টাক পড়েছে, নাকটাও হয়ে গেছে খাঁড়ার মত। সামনের দিকে ঝুঁকে চলেন, অথচ লাঠি নেন না। সরোবর নামটাও সার্থক করেছেন তিনি। খোঁজ করলে তাঁর মধ্যে সরোবরের অনেক কিছু নাকি পাওয়া যায়। শ্যাওলা গুগলি থেকে আরম্ভ করে খল্‌সে, বাটা, পোনা, পাঁক, মশার বাচ্চা এমন কি কুমুদ কহ্লার, পদ্মও নাকি মিলবে তাঁর মধ্যে। চঞ্চল মৌলিক কিন্তু নিজের নাম সার্থক করতে পারেননি। ছেলেবেলায় নাকি খুব চঞ্চল ছিলেন, এখন কিন্তু মুটিয়ে গেছেন খুব, থপ থপ করে চলেন। মৌলিকতাও কিছু নেই তাঁর। ছাত্রজীবনে বই মুখস্থ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলোতে ভালো নম্বর পেয়েছিলেন। তারই জোরে ভালো কলেজে প্রফেসারি পান একটা। সপ্তাহে পাঁচ ঘণ্টা করে বক্তৃতা দিতেন। মামুলি ভাবে ফুটকি বলে একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। পারেননি। অর্থাৎ কোনো রকম মৌলিকতা ছিল না তাঁর। এখন রিটায়ার করেছেন। ইজিচেয়ারে কিংবা বিছানায় বালিশ ঠেস দিয়ে নভেল নাটক পড়েন। বাছ-বিচার নেই। যা পান তাই পড়েন। মাঝে মাঝে পুরনো বইয়ের দোকানে গিয়ে সস্তায় যা পান কিনে আনেন। ফুটপাথ থেকে বই কিনতেও তাঁকে অনেকে দেখেছে। সুযোগ পেলে পরচর্চাও করেন। এ বিষয়েও বাছ-বিচার নেই। ক্ষেন্তি ঝিয়ের সঙ্গেও করেন, আবার বিদ্বান প্রফেসার, বা ভুঁই-ফোঁড় নেতাদের সঙ্গেও করেন। যখন যেমন জুটে যায়।

কি করে ছিটকে গিয়ে পড়লেন এঁরা অতিদূর ভবিষ্যৎ যুগে ক্ষ-উনপঞ্চাশের খপ্পরে?
যুক্তি-সম্মত উত্তর দেওয়া যাবে না।
যা ঘটেছিল তাই বলছি শুধু।

সেদিন চঞ্চলবাবু যথারীতি কফি খেয়ে একটি নাটক আরম্ভ করতে যাচ্ছিলেন ইজি চেয়ারে ঠেস দিয়ে। বইটা তিনি ফুটপাথে কিনেছিলেন। কিনেছিলেন 'সোহাগা' নামটা দেখে। সোহাগা তাঁর একমাত্র নাতনির নাম। শুধু তাই নয় সে তাঁর অভিন্ন-হৃদয় বন্ধুর সরুর ভাবী নাতবউ। এই নাটকের নায়িকার নামও সোহাগা। নাতনি সোহাগা আমেরিকায় পড়তে গেছে। হঠাৎ তার নামটা এই মলাট-ছেঁড়া নাটকের পাতায় দেখে কিনে ফেললেন তিনি বইটা নগদ চার আনা পয়সা খরচ করে। সেই বইটাই

পড়তে শুরু করব করব করছিলেন এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করলেন সরু।

বললেন, "মোটা, সোহাগা ভেগেছে।"

সরু চঞ্চলকে মোটা বলে ডাকে।

"ভেগেছে? মানে?"

সোজা হয়ে উঠে বসলেন চঞ্চল।

"নহুষকে চিঠি লিখেছে, আমি ফিরব না। আমাকে খোঁজবার চেষ্টা কোরো না। আমি অতিদূর আগামী যুগে বে-ঠিকানা হয়ে হারিয়ে গেলাম।"

"আগামী যুগে?"

"তাই তো লিখেছে—"

"আগামী যুগে, মানে?"

"তুমি প্রফেসার মানুষ মানে-টানে তো তোমারই জানবার কথা।"

ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন চঞ্চল।

"নহুষ কি বলছে?"

"নহুষ চিঠিটা আমাকে দিয়ে চলে গেল। কিছু বললে না। একটু পরে তার ঘরে উঁকি মেরে দেখলাম ইজি চেয়ারের উপর পা তুলে দিয়ে সিগারেটে রিং করে যাচ্ছে। একটু গলা-খাঁকারি দিলুম, ভাবান্তর হল না। মনে হল নহুষ— No-হুঁশ হয়ে গেছে।"

নহুষ সরু সান্যালের একমাত্র নাতি। সোহাগার ভাবী পতি।

চঞ্চল মৌলিক ফোনটা তুলে পুলিস কমিশনারকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সরু হোঁস হোঁস করে নস্যি নিলেন বার দুই।

"তোমাকে তখুনি বারণ করেছিলাম মেয়েটাকে আমেরিকায় পাঠিও না।"

চঞ্চল বাঁ হাত তুলে কথা কইতে বারণ করলেন। ফোনে তিনি একটি বামাকণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন। তন্ময় হয়ে শুনে যাচ্ছিলেন। তারপর যা ঘটল তাকে অদ্ভুতই বলতে হয়। তাঁর কুঞ্চিত ভ্রূ মসৃণ হয়ে গেল, ঢুলু-ঢুলু হয়ে এল চোখ দুটি। তারপর তিনি টলতে লাগলেন।

বিস্মিত সরু জিজ্ঞেস করলেন— "কি হল তোমার?"

"নেশা"

"নেশা?"

"যে মেয়েটি কথা বলছে তার কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটা মাদকতা আছে—অদ্ভুত কি যেন একটা—আমার ঘোর-ঘোর লাগছে—"

"কোন মেয়ে"

"কি জানি। আমি পুলিস কমিশনারকে রিং করেছিলাম—" মোটার দিকে ভ্রূ-কুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন সরু। লোকটার ভীমরতি ধরল নাকি!

"ফোনে মেয়ের গলা শুনেই বেসামাল হয়ে পড়লে। কি কাণ্ড!"

"ফুটকির গলা শুনলাম। যে ফুটকিকে যৌবনে ভালোবেসেছিলাম কিন্তু পাইনি, যে ফুটকির জন্যে দেওয়াল টপকাতে গিয়ে পা মচকে গিয়েছিল, যে ফুটকিকে—তুমি তো সবই জান সরু, তোমার কাছে কখনও তো কিছু গোপন করিনি। তুমি তো সব জান—"

"যে ফুটকি টাকার লোভে চুটকি-ওলা ভুসি সিংকে বিয়ে করেছিল আর ঠেকুয়া হজম করতে না পেরে আমাশায় ভুগে ভুগে মারা গিয়েছিল—তার গলা শুনতে পাচ্ছ? রাবিশ! এনসেন্ট হিস্ট্রীর (encient history) হর্ষবর্ধনও ফিরবে না, তোমার ফুটকিও ফিরবে না। যে চল্লিশ বছর আগে মারা গেছে তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে তুমি!"

"পেলাম ভাই। আমার কি ইচ্ছে হয়েছিল জান? সেকালে 'সীতা' নাটকে শিশির ভাদুড়ী যেমন—'কে রে কার কণ্ঠস্বর' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন আমার ইচ্ছে হয়েছিল তেমনি করে চেঁচিয়ে উঠি। কিন্তু সময় পেলাম না, কট্ করে কেটে দিলে। আমি এখন কি করি সরু—"

"শুয়ে পড়। তোমার স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকে তুমি বড্ড বেশি খাওয়ার অত্যাচার করছ। সেদিন তোমার এখান থেকে খেয়ে যাওয়ার পর আমার কি অবস্থা হয়েছিল জান? পরদিন বরফ জল দিয়ে শৌচ করতে হয়েছিল। তবু জ্বলুনি কমেনি। তোমার ব্লাড প্রেসার আজকাল কত?"

"ও সব আর মাপাই না আজকাল—"

মোটা অসহায়ের মত চাইতে লাগলেন ফ্যাল ফ্যাল করে। করুণ কণ্ঠে বললেন— "স্বপ্ন ভিড় করে আসছে মনে। নানা রঙের স্বপ্ন। রাগ করিসনি, এখন কি করি তাই বল,—স্বপ্নে মাথা 'জাম' হয়ে আসছে—"

"নস্যি নাও। নেবে?"

"নিইনি কখনও, নেব?"

"নাও। আমি তো নস্যি নিয়েই মাথা সাফ করি।"

নস্যি নিয়ে চঞ্চল ক্রমাগত হাঁচতে লাগলেন।

"কয়েকবার হাঁচলেই স্বপ্ন-টপ্ন সব বেরিয়ে যাবে। আরও হাঁচ—"

ছিপ ফেলে মৎস্য শিকারী যেমন ফাত্নার দিকে চেয়ে থাকে তেমনি ভাবে মোটার দিকে চেয়ে রইলেন সরু। আরও কয়েকটা প্রচণ্ড হাঁচি হল মোটার।

"কি রকম লাগছে এখন?"

"ফাঁড়াটা কেটে গেল বোধহয়। মাথার 'জাম' ভাবটা আর নেই। অনেকটা হালকা মনে হচ্ছে—"

রুমাল দিয়ে চোখ নাক মুখ মুছতে লাগলেন মোটা।

"হচ্ছে?"

"হ্যাঁ। স্বপ্নগুলো প্রথম নেবড়ে গেল, তারপর ধেবড়ে গেল, তারপর মিলিয়ে গেল। এখন খুব ক্ষীণ একটা পিঁ পিঁ শুনতে পাচ্ছি কেবল। মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে পিকলু বাজাচ্ছে কে যেন।"

"আর এক টিপ নস্যি নেবে?"

"না—"

"নাও না বাবা। ব্যাপারটার মূলোচ্ছেদ করে ফেলাই তো ভালো।"

"আর হাঁচ্‌তে পারব না। পেটে ব্যথা হয়ে গেছে। অত হেঁচেছি বলেই বোধহয় কানে ঝিঁ ঝিঁ বাজছে।"

"বাজুক। সোহাগার সম্বন্ধে কি করা যায় সেইটে ভাব আগে। সে আগামী যুগে চলে গেছে এর মানেটা কি। আগামী যুগে যাবে কি করে। যাওয়া যায় না কি। সে-ও পাগল-টাগল হয়ে গেল না তো! আমার সেই ভয়ই হচ্ছে—"

চমকে উঠলেন মোটা।

হকচকিয়ে গেলেন আবার।

"ভাই পিকলু বলছে, আয় আয় আয়। উত্তরে কে যেন বলছে আসছি আসছি আসছি। দ্বৈত

"কি আপদ! নে আর এক টিপ নে—"

নস্যির ডিবেটা খুলে এগিয়ে ধরলেন সেটা। চঞ্চল হয়তো এ অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারতেন না, কিন্তু পরমুহূর্তেই যা ঘটল তা আশ্চর্যজনক তো বটেই রোমাঞ্চকরও। কেন জানি না দুজনেরই মনে হল এটা একটা আবির্ভাব। দ্বারপ্রান্তে গুলতি-হাতে যে কিশোর বালকটি এসে দাঁড়াল সে যে রাস্তার সাধারণ ছোঁড়া নয় তা দুজনেই অনুভব করলেন। অপরূপ কান্তি তার। সর্বাঙ্গ থেকে জ্যোতি বেরুচ্ছে যেন। মাথা ভরতি কালো কোঁকড়া চুল। নয়ন দুটি ইন্দীবরতুল্য, চোখের দৃষ্টি বুদ্ধিদীপ্ত, মুখের হাসি অনুপম।

সে মুচকি হেসে বললে—"নস্যিতে হবে না ফুটকি বললে—"

"ফুটকি!"

মোটার নীচের ঠোঁটটা থর থর করে কাঁপতে লাগল আবার। সরু জিজ্ঞেস করলেন— "ফুটকির খবর জান তুমি?"

"জানি—"

মোটা দাঁড়িয়ে উঠলেন।

"কোথায় সে—"

"ফুটকি অতীত লোকে আছে। সে টেলিফোন গার্লের কণ্ঠে ভর করে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করেছিল একটু আগে। কিন্তু আপনি এমন অভিভূত হয়ে পড়লেন যে তার কথা শুনতে পেলেন না। আমি তখন সেখানে ছিলাম, তাই আমাকেই সে বলে দিলে খবরটা আপনাকে দিতে—"

"তুমি কে—"

"আমি কল্পনা—"

"কল্পনা?"—সরু বললেন—"আমার ধারণা কল্পনা স্ত্রীলিঙ্গ—"

মুচকি হাসল ছেলেটি।

কিছুক্ষণ হাসি মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর বলল—"ভুল ধারণা ওটা। আমি ব্যাকরণের এলাকার বাইরে বাস করি।"

মোটা সামলে নিয়েছিলেন নিজেকে।

"কি খবর পাঠিয়েছে ফুটকি?"

"খবর তো শুনলেন। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি। সে আমাকে অনুরোধ করেছে আপনারা যদি আগামী যুগে যেতে চান তার ব্যবস্থা যেন আমি করে দি।"

"ব্যবস্থা করতে পারবে তুমি?"

"নিশ্চয় পারব। এই যে গুলতি এনেছি। গুলতির উপর এই যে ছোট চামড়াটি দেখছেন তার উপর আপনারা উঠে বসুন, আপনাদের এক নিমেষে আমি ছুঁড়ে দেব আগামী যুগে—"

সরু হেসে উঠলেন।

"তুমি উন্মাদ না কি! গুলতির ওইটুকু চামড়ায় আমরা দুজন বসব কি করে?

"চামড়া বড় হয়ে যাবে, গুলতিও বড় হয়ে যাবে—"

"তুমি ছুঁড়বে কি করে?"

"আমিও বড় হয়ে যাব। দেখবেন? দেখুন।" দেখতে দেখতে কিশোর-বালক রূপান্তরিত হল এক বিরাট দৈত্যে। ছোট গুলতি হল বিরাট গুলতি। গুলতির চামড়াটা হয়ে গেল দোলনার মত। দোলনার চারদিকে ফুলের সমারোহ। মনে হল—রবীন্দ্রনাথ এইটে দেখেই বোধহয় লিখেছিলেন, 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে, ফুল-ডোরে বাঁধা ঝুলনা'—"

বিস্ময়ে সরু মোটা দুজনেরই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে গেল। অস্ফুট কণ্ঠে সরু বললেন—"কি কাণ্ড!"

মোটার মনে একটা নূতন বাসনা জাগল। বললেন, "যদি ফুটকির কাছে যেতে চাই আমাদের অতীত যুগেও ছুঁড়ে দিতে পার?"

"পারি। কিন্তু সেখানে গিয়ে আপনার সুবিধা হবে না। কারণ আপনার স্ত্রী জগদম্বাও সেখানে আছেন। ফুটকির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে তাঁর। ভিতরের কথা তিনি সব জেনেছেন। সেখানে আপনি গিয়ে পৌঁছলে একটা ধুন্দুমার বেঁধে যাবার সম্ভাবনা। অতীত যুগে এখনও প্রচুর ঝাঁটা আছে। তবে একটা কথা শুনলে আপনি হয়তো সান্ত্বনা পাবেন। ফুটকির এখনও দুর্বলতা আছে আপনার সম্বন্ধে। তাই সে টেলিফোন গার্লের কণ্ঠস্বরে ভর করে আপনার বিপদের সময় সাহায্য করতে চাইছিল, কিন্তু আপনি বেসামাল হয়ে পড়লেন। ফুটকিই আমাকে এখানে পাঠিয়েছে—"

সরু একটু চটেছিলেন।

"মোটা একটা কথা শুনবি?"

"কি—"

"ফরগেট্ ফুটকি।"

বলেই নস্যির কৌটো বার করে জোরে জোরে নস্যি নিতে লাগলেন।

"নস্যিটাও ফুরিয়ে গেল—"

দৈত্য বললেন—"যদি আগামী যুগে যেতে চান আর দেরি করবেন না। আমাকে আর এক জায়গায় যেতে হবে।"

"আবার কোথায় যাবে?"

"তা আপনাকে বলা যাবে না। আসুন—"

"আপনি তো ছুঁড়ে দেবেন বলছেন, তারপর কোথাও পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙবে না তো।"

"না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। খুব আস্তে নাবিয়ে দেব আপনাদের।"

সরু মোটা দুজনেই চড়ে বসলেন গুলতির উপর। বসে ভারি আরাম পেলেন।

চড়েই কিন্তু নেবে পড়লেন মোটা।

"চেক বুকটা নিয়ে যাই। আমাদের চেক আগামী যুগে চলবে তো"।

"আপনার ব্যাঙ্কে যদি টাকা থাকে তাহলে আপনাদের চেক ওরা নেবে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকাও তুলে নেবে ঠিক। ওরা বিজ্ঞানে অদ্ভুত উন্নতি করেছে। কোথা থেকে যে কি করে ফেলে তাজ্জব বনে যেতে হয়। নিয়ে নিন চেক বুকটা। ওদের কারেন্সি কিন্তু খোলামকুচিতে। খোলামকুচির উপর স্ট্যাম্প মেরে দেয়—"

মোটা তাড়াতাড়ি চেক বুকটা বার করে নিয়ে নিলেন।

"আসুন, আর দেরি করবেন না।"

আগামী যুগে ক্ষ-৪৯এ গিয়ে হাজির হলেন সরু মোটা। ফুলের মতন পড়লেন যেন আকাশ থেকে। একটুও কষ্ট হল না। পড়লেন যে রাস্তার উপর তা সোনা দিয়ে বাঁধানো। সব রাস্তাই সোনা দিয়ে বাঁধানো। বাড়িগুলো রঙিন প্লাসটিকের। স্বপ্নপুরী যেন। ঘুমন্ত স্বপ্নপুরী। রাস্তায় লোকজন কেউ নেই। হাওয়ায় গানের সুর ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কে গাইছে বোঝা যাচ্ছে না।

অবাক হয়ে গেলেন তাঁরা।

সরু বললেন, "লোকজন দোকানপাট কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না। নস্যি কিনতে হবে যে, একদম ফুরিয়ে গেছে—"

সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার পাশের ছোট একটা ঢাকনি খুলে গেল আর তার থেকে বেরিয়ে এল একটা মোটা নল। নলের গায়ে মানুষের ছবি।

"এ কি রে বাবা! নলের গায়ে মানুষের ছবি দেখছি! সব যে গুলিয়ে যাচ্ছে, মোটা,—"

নলের ভিতর থেকে শব্দ হল— "ধেৎ ধেৎ!"

তারপর সাইরেন বেজে উঠল। নলটা ঢুকে গেল মাটির তলায়। ঢাকনি বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটা নল ছুটে এল চারদিক থেকে। একটা নল বলল, "কে আপনারা, কোথা থেকে এসেছেন?"

মোটা অধ্যাপক লোক তিনি গুছিয়ে উত্তর দিলেন।

"আমাদের পরিচয় আমরা ভারতবাসী। এখনই সেখান থেকে এসেছি। এখন সেখানে ইংরেজি ১৯৬৮ খৃস্টাব্দ, বাংলা ১৩৭৫ সাল, স্বাধীন ভারতের ১৮৯০ শকাব্দ—"

"ও, আপনারা প্রাচীন ইতিহাসের লোক দেখছি। আসুন, স্বাগত। আমাদের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে। অতীতের রোমান্স এখনও আমাদের মন থেকে লোপ পায়নি—"

পাশের নলটি ধমক দিল— "ধেৎ, ধেৎ—"

প্রথমে যিনি কথা বলছিলেন তিনি যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে থেমে গেলেন।

তারপর বললেন, "সেকেলে কুসংস্কার মরেও মরতে চায় না। মাঝে মাঝে তাই উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ি। আমাদের সঙ্গে সর্বদাই তাই লোক থাকে একজন। 'ধেৎ-ধেৎ' বলে সাবধান করে দেয়। আপনাদের ভাষায় 'ধেৎ-ধেৎ'-এর তর্জমা করলে হবে 'কি বাজে বকছেন'। আমাদের অত কথা বলবারও সময় নেই। আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গে তাই একটা নল ঘোরে আমাদের সংযত করে দেবার জন্য। নলের ভিতর একটা যন্ত্র আছে সেটা টিপলেই 'ধেৎ ধেৎ' আওয়াজ বেরোয়। আসুন।"

"আমাদের আপনি প্রাচীন ইতিহাসের লোক বলছেন?"

"হ্যাঁ, অতি প্রাচীন। এখন ভারত-টারত বলে কিছু আর নেই। সব সীমান্ত লোপ পেয়েছে এখন। যতদূর মনে পড়ছে প্রাচীন জগতের একজন মনীষী—ওয়েন্ডেল উইলকি—ওয়ান্ ওয়ার্লড (One world) বলে একটা বই লিখেছিলেন—"

"পড়েছি, পড়েছি"—মোটা বললেন।

"নস্যি কোথায় পাওয়া যাবে বলুন তো। আমার নস্যি একদম ফুরিয়ে গেছে—"

সরু বলে উঠলেন হঠাৎ।

"নস্যি, দোক্তা, সিগারেট, বিড়ি হুঁকো গড়গড়া এ সব মিউজিয়মে আছে। বাজারে পাবেন না।"

"তাই না কি! তাহলে উপায়! আমার তো নস্যি না হলে চলবে না—নেশা তো—"

"নেশার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আসুন আমার সঙ্গে। ঢুকুন এর ভিতরে, না না, ভয়ের কিছু নেই। আমরা সবাই নলের ভিতর ঢুকেই বাইরে ঘোরা-ফেরা করি। স্বরূপে রাস্তায় বেরোবার নিয়ম নেই। মানবজাতির সাম্য স্বপ্ন সফল করবার চেষ্টা করছি আমরা। আগে সুন্দর-কুৎসিত, রোগা-মোটা, লম্বা-বেঁটে, ফরসা-কালো এসব নিয়ে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে মানব-সমাজে। ধরুন, ক্লিওপেট্রা বা মার্ক অ্যান্টনির সাক্ষাৎ যদি নলের মাধ্যমে হত তাহলে ইতিহাসের চেহারা অন্যরকম হয়ে যেত। প্রণয়কে কেন্দ্র করে যেসব কাণ্ড আগে হয়েছে তার অবশ্য একটা অন্যদিকও আছে—"

"ধেৎ, ধেৎ"

সাবধান-বাণী উচ্চারণ করল পাশের নলটি।

থেমে গেলেন ভদ্রলোক। সাইরেনের শব্দ হল আবার। দুটি নল এগিয়ে এল। নলের পরিধি বেশ বড়। অনেকটা স্টীমারের চোঙের মত। নীচে রবারের ছোট ছোট চাকা আছে। নল দুটির কপাট খুলে গেল। দেখা গেল চমৎকার একটি চেয়ারের উপর শোভনীয় একটি কুশন পাতা রয়েছে।

"ঢুকে পড়ুন ওতে। না না, ভয়ের কোনো কারণ নেই। ও নল স্বয়ং-ক্রিয় যন্ত্র। সেকালের পুষ্পকরথের আধুনিক সংস্করণ। কোনো সারথি নেই। কিন্তু যেখানে নিয়ে যেতে বলবেন সেইখানে নিয়ে যাবে আপনাকে। আপনি রোগা, আপনি মোটা, কিন্তু আপনারা ঢুকলেই ও নল সঙ্কুচিত বা বিস্ফারিত হয়ে আপনাদের স্থান করে দেবে। ঢুকুন কোনো ভয় নেই।"

"আমার নস্যির ব্যবস্থাটা কখন করবেন?"

"এখুনি, চলুন, বিজ্ঞান পাড়ায় যাওয়া যাক। নলে চড়ে বলুন, আমাকে বিজ্ঞানপাড়ায় নিয়ে চল, ঠিক নিয়ে যাবে। নস্যি ঠিক পাবেন কিনা বলতে পারি না, কিন্তু ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে।"

"আমার মশাই ক্ষিধে পেয়েছে—"

বলেই মোটা বোকার মত সলজ্জ হাসি হাসলেন একটা।

"সে ব্যবস্থাও হবে।"

তারপর হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি।

"বাই, আইনস্টাইন, সেকালের চমৎকার দুটি জীবন্ত নমুনা হাজির হয়েছেন আপনারা। চমৎকার, চমৎকার, চলুন—"

মোটার আত্মসম্মানে বোধহয় একটু আঘাত লাগল।

বললেন, "আইনস্টাইনও তো সেকালের লোক মশাই—"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। সেকালই তো একালের জন্য সিঁড়ি তৈরি করেছে। সেকালকে খেলো করবার স্পর্ধা আমার নেই। আপনাদের পেয়ে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। চলুন, চলুন।"

নলে ঢুকে পড়লেন তাঁরা।

বিজ্ঞানপাড়ায় গিয়ে তাম্রকুট বিভাগে হাজির হলেন সবাই। সে বিভাগের অধ্যক্ষও একটি নলের ভিতর বসেছিলেন। যিনি সরু মোটাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি বললেন,—"তা'-মশাই প্রাচীন ইতিহাস থেকে দুটি ভদ্রলোক এসেছেন। নমুনা হিসাবে দুজনেই অপরূপ। একজন নস্যি খুঁজছেন, তাই আপনার

কাছে নিয়ে এলাম। ওঁর নস্যির নেশাটা মিটিয়ে দিন। কষ্ট পাচ্ছেন ভদ্রলোক—"

"অবশ্যই দেব"

সরু মোটা দুজনেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। দু'জনের ঠিক এক কণ্ঠস্বর।

সরু কথা কইলেন— "মোটা—"

"কি"—উত্তর দিলেন মোটা।

ঠিক একই কণ্ঠস্বর। দু'জনের আওয়াজ দু'রকম নয়, একরকম। বাঁশীর মত। নিশ্চয়ই যন্ত্রের কৌশল। আশ্চর্য হয়ে গেলেন দুজনে। একটু ভয়-ভয়ও করতে লাগল।

"আর একটু কাছে সরে আসুন—"

"কি রকম নস্যি দেবেন? আমি র-মাদ্রাজি নিই।"

"আমি নস্যি দেব না। যে যে শিরা-উপশিরা নস্যি নিলে উত্তেজিত হয় আমি তাদেরই উত্তেজিত করব আর আপনি নস্যি নেওয়ার সুখ উপভোগ করবেন।"

"বলেন কি মশাই, নস্যি দেবেন না?"

"চুপ করে বসে থাকুন—"

"নাবব?"

"না। আমি এখান থেকেই সব করছি। নাববার দরকার নেই।"

সরু যে নলে বসেছিলেন তার পিছন দিকের জানলা খুলে গেল। খুট করে শব্দ হল একটা। সঙ্গে সঙ্গে মুখোশের মত একটা জিনিস গপ্ করে বসে গেল সরুর মাথায়।

"বাপ রে—"

অস্ফুট কণ্ঠ শোনা গেল সরুর।

অনেকটা আর্তনাদের মত শোনাল।

মোটা এমনিতেই বেশ ভয় পেয়েছিলেন। সরুর আর্তনাদ শুনে আরও ঘাবড়ে গেলেন।

"সরু, সরু, কি হল ভাই।"

সরু নীরব।

"কোনো ভয় নাই। আপনি চেঁচামেচি করবেন না।"

ধমকে উঠলেন তা-মশাই।

তবু চেঁচামেচি করতে লাগলেন মোটা। ফট্ করে মোটার নলের পিছন দিকের জানলাও খুলে গেল এবং একটা গ্যাগ্ এসে চেপে ধরল মোটার মুখ। নিঃশব্দ হয়ে গেল মোটাও। তার চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম হল।

একালের হিসাবে মিনিট দশেক কাটল।

"বাস্ হয়ে গেছে। আর নস্যি নেওয়ার ইচ্ছে থাকবে না।" সম্ভবত তা-মশাই বললেন এটা।

সরুর মুখ থেকে মুখোশ সরে গেল, মোটার মুখ থেকে গ্যাগ্।

"এবার ইতিহাসের পাড়ায় চলুন।"

"আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে।"

"সে ব্যবস্থাও হবে। ই-মশাই খা-মশাইকে খবর দিলেই কিছু খাবার এসে যাবে। চলুন। আপনাদের নলকে বলুন ইতিহাসের পাড়ায় চল।"

ইতিহাসের পাড়ার দিকে অগ্রসর হলেন সরু, মোটা, অ-মশাই (অভ্যর্থনা বিভাগের অধিকর্তা) এবং তাঁর সহিস, যিনি মাঝে মাঝে 'ধেৎ ধেৎ' বলে রাশ টেনে ধরেন তাঁর।

ইতিহাস-পাড়ায় ই-মশাইও একটা বিরাট ঘরের মধ্যে ছিলেন একটা নলের ভিতর।

অ-মশাইয়ের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"ই-মশাই, জীবন্ত ইতিহাস নিয়ে এসেছি আমি। ১৯৬৮ খৃস্টাব্দের জলজ্যান্ত দু'জন লোককে। একজন নস্যি নিতে চাইছেন, আর একজন খাবার খেতে চাইছেন। নস্যির ব্যবস্থা তা-মশাই করেছেন আপনি আর এক জনের খাওয়ার ব্যবস্থা করুন।"

সরু বললেন— "আমারও ক্ষিধে পেয়েছে খুব।"

"বেশ আপনার খাওয়ার ব্যবস্থাও হবে।"

"তুই কেমন আছিস সরু।"

মোটা প্রশ্ন করলেন উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে।

"বুঁদ হয়ে গেছি। খাসা লাগল। আসল নস্যি নিয়েও এত ভালো কখনও লাগেনি।"

ই-মশাই নলের ভিতর বসেই যোগাযোগ করেছিলেন খা-মশায়ের সঙ্গে।

বলছিলেন—"১৯৬৮ খৃস্টাব্দের দুজন লোককে নিয়ে এসেছেন অ-মশাই। তাঁদের ক্ষিধে পেয়েছে। হ্যাঁ, তাঁদের পেট আছে বই কি। ১৯৬৮ খৃস্টাব্দের মানুষ ওঁরা। আচ্ছা জিজ্ঞেস করি ওঁদের। আচ্ছা, আপনারা কি খেতে চান বলুন তো।"

মোটা বললেন, "মাছের ঝোল ভাত পেলেই চলবে আপাতত। খাওয়ার শেষে একটু ক্ষীর বা পায়েস পেলে খুশি হব।"

সরু বললে— "আমি ফুচকা খাব। লাইট খাবার খেতে চাই। ফুচকা খুব হাল্কা জিনিস।"

ই-মশাই খ-মশাইকে একথা বলতেই তিনি বললেন, "তা তো অসম্ভব। আপনি তো জানেন আমাদের দেশের কোনো লোকেরই পেট নেই। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সার্জনরা আমাদের পেট বাদ দিয়েছেন। এখন সব খাবার ইন্‌জেক্‌সন্‌ দিয়ে দেওয়া হয়—হ্যাঁ ভালো কথা আপনার ইন্‌জেক্‌শন্‌ নেওয়ার সময় হয়ে গেছে। আসবেন একদিন। আপনি তো জানেনই আমরা সব খাদ্যকে জলীয় করে অ্যামপুলে পুরে ফেলেছি। সেই অ্যামপুলই পাঠিয়ে দিচ্ছি গোটাকতক—"

"আরে এসব তো আমি জানি। কিন্তু ওঁরা অতিথি সেকথা ভুলে যাচ্ছেন কেন। শুধু অতিথি নয়, মহামান্য অতিথি, সেকালে যাঁদের ভি. আই. পি. বলা হত অনেকটা সেই রকম। এঁদের সাধ অপূর্ণ রাখাটা কি ঠিক হবে? এঁদের একজন নস্যি চেয়েছিলেন, অ-মশাই তা-মশাইয়ের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে। তিনি অ্যাটমিক যন্ত্রের সাহায্যে তাঁর মনে নস্যি নেওয়ার অনুভূতি সঞ্চার করেছেন। কিন্তু আমার মতে তাঁর জন্যে নস্যির ব্যবস্থা করাই উচিত ছিল। এক কাজ করুন। "যা-খুশি" বড়ি আর আছে আপনার কাছে?"

খা-মশাই বললেন, "মাত্র দুটি আছে। ও বড়ি তৈরি করতে বেশি খরচ হয় তাই বেশি করিনি। মোটে দশটি করেছিলাম। কিন্তু আমাদের প্রেসিডেন্টই তো আটটি নিয়ে নিয়েছেন।"

"আচ্ছা ও দুটো পাঠিয়ে দিন। আমার নামেই খরচ লিখুন, আমি এর জবাবদিহি করব। আমাদের সংবিধানে লেখা আছে যে বাইরের অতিথিদের আমরা সম্যক পরিচর্যা করব, খরচ যতই হোক।

অতীতে ভারতবর্ষে অতিথিবৎসলতা গৃহস্থের মহৎ গুণ বলে বিবেচিত হত। পুরাণে পড়েছি মহামতি কর্ণ—"

"ধেৎ ধেৎ—"

পাশের একটি নল থেকে সহিস রাশ টেনে ধরলেন। থেমে গেলেন ই-মশাই।

একটু পরেই এসে গেল দুটি 'যা-খুশি' বড়ি। বড়ি দুটি ই-মশায়ের নলের মধ্যে এসেছিল। তিনি যন্ত্রযোগে সে দুটি চালান করে দিলেন সরু আর মোটার নলে।

বললেন—"আপনাদের জন্য "যা-খুশি" বড়ি আনিয়েছি। পাঠাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলুন। এ অদ্ভুত বড়ি। বড়ি খাওয়ার পর যা খুশি করতে পারবেন। আপনাদের কোনো আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকবে না।"

বড়ি দুটি টপটপ গিলে ফেললেন সরু মোটা।

"খেয়েছি। এইবার কি করব?"

"এইবার ইচ্ছা করুন কি খেতে চান। আপনাদের নলের মধ্যেই খাবার এসে যাবে।"

সত্যিই মোটার নলের মধ্যে মাছের ঝোল ভাত আর ক্ষীর এসে গেল চমৎকার বাসনে বাহিত হয়ে। সরুর নলে এল ফুচকা আর এল চমৎকার মশলা দেওয়া ফুচকার সঙ্গে মিলিয়ে খাওয়ার তেঁতুল জল। অদৃশ্য হস্ত যেন সাজিয়ে দিয়ে গেল তাদের সামনে। ফুরিয়ে গেলে আবার পরিবেশন করল। সপাসপ আর মুচমুচ আওয়াজ বেরুতে লাগল মোটা আর সরুর নল থেকে। স্ফটিকপাত্রে কেওড়া দেওয়া ঠাণ্ডা জল আর সোনার ডিবেয় চমৎকার মিঠে পানও এল। সরু মোটা দু'জনেই ভারি তৃপ্তি পেলেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ভারি তৃপ্তি পেলাম। প্রথম প্রথম আমাদের একটু ভয় ভয় করছিল। কিন্তু আপনাদের আতিথেয়তা, ভদ্রতা আর নিপুণতা—"

সহিস সাবধান করলেন, "ধেৎ, ধেৎ—"

মোটার উচ্ছ্বাস নিবে গেল।

সরু মনে মনে বললেন, "ভদ্রতা না কচু! কথার মাঝখানে ধেৎ ধেৎ করাটা কি ভদ্রতা না কি!"

অ-মশাই বললেন, "ই-মশাই আমি যাই তাহলে। আমার কাজ আছে। এঁরা আপনার কাছেই থাকুন।"

"বেশ।"

স-সহিস অ-মশাই চলে গেলেন।

ই-মশাইয়ের সহিস গেলেন না।

ই-মশাই তখন সরু-মোটার সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন।

"এইবার আপনাদের দু'চারটে কথা জিজ্ঞেস করব। উত্তর দেবেন আশা করি। একটা বিষয়ে সাবধান করে দিই। অসত্য কিছু বলবেন না। এখানে মিথ্যা বললেই সেটা ধরা পড়ে যায় সত্য-যন্ত্রে। আর সঙ্গে সঙ্গে সাইরেন বেজে ওঠে। সে এক মহা ঝামেলা। সুতরাং অনুরোধ করছি—"

"না না, মিথ্যে বলব কেন। আমরা শিক্ষিত ভদ্রলোক। কি জানতে চান বলুন।"

"আর একটা কথা মনে রাখবেন। আপনারা যা বলবেন তা যন্ত্রে রেকর্ডেড্ হয়ে যাবে।"

"একটা কথা জানতে কৌতূহল হচ্ছে। মিথ্যে কথা কেউ যদি বলে তাহলে সেটা সত্য-যন্ত্রে ধরা পড়ে কি করে?"

"মিথ্যা বলবার সময় প্রত্যেক লোকেরই মস্তিষ্কে একটা বোধ জাগে যে সে মিথ্যা ভাষণ করছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মস্তিষ্ক থেকে একটা অদৃশ্য ঢেউ উঠে আন্দোলিত করে ইথারকে। সেই আন্দোলন ধরা পড়ে সত্য-যন্ত্রে।"

"উপন্যাস বা গল্প লেখা হয় না এখানে? সেগুলোও তো মিথ্যে।"

"লেখক গোড়াতেই যদি স্বীকার করে নেন যে তিনি কাল্পনিক কিছু সৃষ্টি করছেন তাহলে সেটা আর মিথ্যা বলে ধরা হয় না। সেগুলো রেকর্ডেড হয়। এখানে ছাপা হয় না কিছু। লেখার রেওয়াজও উঠে গেছে অনেকদিন।"

সরু বললেন, "অদ্ভুত আজব দেশে এসেছি তো! নিন এখন কি জিজ্ঞেস করবেন বলুন। মোটা তুমিই উত্তর দাও—"

ই-মশায় প্রশ্ন করলেন, "আপনারা কেন এসেছেন এখানে।"

"আমার নাতনি এখানে পালিয়ে এসেছে। তাকে খুঁজতেই এসেছি আমরা"

"নাতনি? দাঁড়ান-দাঁড়ান, আপনাদের নাতি-নাতনি হয়, না?"

"হয় বই কি। আপনাদের হয় না?"

'একদম না। আমাদের কারও সঙ্গে কারোর রক্তের সম্পর্ক নেই। আমরা যে নীতি গ্রহণ করেছি সে নীতির মর্ম হচ্ছে যে কৃত্রিমতাই মানব-সভ্যতার মানদণ্ড। যে যত কৃত্রিম সে তত সভ্য। যে যত অকৃত্রিম, যে যত স্বাভাবিক সে তত অসভ্য। আমার মা বাবা কেউ নেই, অন্তত আমি তাদের খবর জানি না, খবর জানবার উপায়ও নেই। ফ্যাক্টরিতে আমার জন্ম। শুধু আমার কেন, আমাদের সকলেরই। আত্মীয়-স্বজন বলতে আপনারা যা বোঝেন তা আমাদের নেই।"

"কি রকম? আশ্চর্য তো! বাপ-মার খবর জানেন না? আত্মীয়-স্বজন নেই?"

"না। বিজ্ঞানের অপরিসীম উন্নতি হয়েছে। আমরা সব টেস্টটিউবে (test tube) জন্মগ্রহণ করেছি। খাবার খেয়েছি কৃত্রিম যন্ত্রে, স্তন্যপান করিনি কখনও।"

"বলেন কি মশাই!"

"সত্যি কথাই বলছি। আমরা প্রকৃতির সন্তান নই, আমরা বিজ্ঞান-চর্চার ফল, বুদ্ধির ফসল। আপনারা যে ধরনের সুখ দুঃখে কম্পিত হন তা আমাদের নেই। নাতনির খোঁজে আমরা কোনোদিন বেরুব না। আপনারা যাকে আপনজন বলেন, তা আমাদের নেই, আমরা প্রগতির প্রতীক মাত্র। আমাদের স্নেহ ভালোবাসা প্রেম ঘৃণা—"

"ধেৎ ধেৎ—"

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে হল ই-মশাইকে।

"আপনার নাতনি পালিয়ে এসেছেন এখানে? কোথা থেকে এলেন, কেমন করে এলেন, বলতে পারেন?"

মোটাই উত্তর দিলেন। সরু অ্যাটমিক নস্যি নিয়ে বুঁদ হয়ে গিয়েছিলেন। ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে বসে ছিলেন তিনি।

"মেয়েটা আমেরিকায় ফিজিক্স পড়তে গিয়েছিল। সেখান থেকেই সে এখানে এসেছে। অন্তত

এই কথাই জানিয়েছে আমাদের। লিখেছে আমি অতি দূরে আগামী যুগে বেঠিকানা হয়ে হারিয়ে গেলাম—"

"কি করে এসেছেন তিনি এখানে তার কোনো আন্দাজ দিতে পারবেন?"

"না। হয়তো আমরা যেমন করে এসেছি সেও তেমনি ভাবে এসেছে।"

"আপনারা কি করে এলেন?"

"কল্পনার গুলতির সাহায্যে—"

"ও, বাই ফ্যারাডে—কল্পনা— হ্যাঁ আমাদেরও কল্পনার সাহায্য নিতে হয়। সে যুগের সঙ্গে এ যুগের যোগাযোগ তিনিই করেছেন। আরও ভবিষ্যৎ যুগের আভাসও দিয়েছেন। চন্দ্রলোক থেকে বরফের চাঙড় এনে তা গলিয়ে জল করে সেই জল থেকে হাইড্রোজেন অক্সিজেন পাবার সম্ভাবনা আছে এর আভাস উনিই দিয়েছেন। উনিই বি-মশাইকে জানিয়েছেন চাঁদের উপরে যে ধুলো আছে তা হয়তো সিমেন্টের চেয়ে ভালো—ভালো কিনা অন্তত পরীক্ষা করে দেখা উচিত—বি-মশায়ের মগজে কল্পনা প্রায়ই প্রভাব বিস্তার করেন—"

"বি-মশাই কে?"

"বিজ্ঞান-বিভাগের অধিকর্তা। আমাদের নাম সব আমাদের বিভাগের আদ্যক্ষর দিয়ে হয়। থাক সে কথা, আপনার নাতনিকে চিনব কি করে আমরা।"

"তার নাম সোহাগা। চিবুকে একটি তিল আছে। রূপসী। ইন্দ্রাণী হবার যোগ্যতা রাখে সে।"

"তাই নাকি। তাহলে একটা খবর দিই আপনাকে। কয়েকদিন আগে স্বয়ং ইন্দ্র এখানে এসেছিলেন। তিনি রাজ্যচ্যুত হয়েছেন ব্রহ্মহত্যা করেছিলেন বলে। এখন গা-ঢাকা দিয়ে 'টুর' করে বেড়াচ্ছেন—"

"ইন্দ্র? তিনি কি করে এলেন পৌরাণিক যুগ থেকে?"

"আপনারা যেমন করে এসেছেন। কল্পনাই তো সবাইকে 'পাস' দেন। তিনি সাহায্য করলে যে কোনো লোক অতীত ভবিষ্যৎ সব লোকেই যেতে পারেন। তিনিই একমাত্র এরোপ্লেন যা অনায়াসে ত্রিলোক বিহার করতে পারেন। তিনিই—"

"ধেৎ ধেৎ"

"ও একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম। সোহাগা নাম মেয়েটির? নাম নিয়ে সুবিধে হবে না। এখানে কারো নাম নেই, কারো নাম সম্বন্ধে কারো কোনও ঔৎসুক্যও নেই। তবে ওঁর চিবুকের তিলটা হয়তো কেউ কেউ লক্ষ্য করে থাকবে। চোখ দুটো কেমন?"

"পদ্মপলাশলোচন।"

"নাক?"

"কবিভাষায় বললে, বলতে হবে—তিলফুল জিনি। অর্থাৎ অবর্ণনীয়।"

"ও বাবা এ তো সাংঘাতিক মাল দেখছি। হ্যাঁ, আর একটা কথা, আপনার বন্ধুটি আপনার সঙ্গে এসেছেন কেন? ওঁরও কেউ পালিয়ে এসেছে নাকি?"

সরু একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল।

সে গান গেয়ে উঠল, হেঁড়েগলায়— "কাত হয়ে পড়েছি দাদা হারিয়ে গেছে নাতবউ—"

"গান গাইছেন কেন।"

আবার গান গেয়েই উত্তর দিলেন তিনি।

"বুঁদ হয়ে গেছি দাদা, তরর হয়ে গেছি।"

তারপর অবশ্য তিনি হেসে স্বাভাবিক ভাবেই বললেন, "কামাল করেছেন আপনাদের বি-মশাই। এমন নস্যি কখনও নিইনি।"

"তাই গান গেয়ে ফেললেন।"

"আমি আগে যাত্রার দলে জুড়ি ছিলাম মশাই। তাই গান গেয়ে ফেলি মাঝে মাঝে। ওসব কথা ছাড়ান দিন। আমার নাতবৌকে খুঁজে বার করে—"

"আপনার নাতবৌয়ের নাম কি। কেমন দেখতে?"

"ওই সোহাগা মুখপুড়ির সঙ্গেই আমার নাতি নহুষের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। যদিও এখনও বিয়ে হয়নি তবু ওকে আমি নাতবৌ বলেই ডাকি। আর ওকে আমি নাতবৌ করবই। ধরে দিন আপনারা, হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাব। নহুষের মনে দাগা দিয়ে চলে এসেছে ঢঙী মেয়েটা। ভয় হচ্ছে নহুষ সন্ন্যাসী না হয়ে যায়—"

"খুব কষ্ট হয়েছে দেখছি আপনার।"

"প্লাস রাগ।"

ই-মশাই চুপ করে রইলেন।

"ধরে দিতে পারবেন তো?"

"চেষ্টা তো করবই। ভাবছি আগে স-মশাইকে খবর দেব, না একেবারেই চু-মশাইকে বলব।"

"ওঁরা কে—"

"স-মশাই হচ্ছেন সন্ধান-বিভাগের অধিকর্তা আর চু-মশাই চুম্বক বিভাগের। চু-মশাই যদিও পদার্থ বিজ্ঞানের চুম্বক নিয়েই নানা গবেষণা করেন, কিন্তু তিনি সম্প্রতি আর একটি অসাধারণ কাজ করেছেন। আবিষ্কার করেছেন মনশ্চুম্বক। ওই চুম্বক চালু করে দিলে ফেরারি আসামী জাতীয় লোকেরাও ধরা পড়ে যায়। আমি ভাবছি আপনার নাতনি কি ফেরারি আসামীর পর্যায় পড়বে?"

মোটা বললেন, "না, না তা পড়বে কেন—"

"আলবৎ পড়বে"—সজোরে প্রতিবাদ করলেন সরু—

"ও চোর, মন-চোর। নহুষটাকে একেবারে ফতুর করে দিয়েছে। সে ছোকরা ক্রমাগত সিগারেটে রিং করে যাচ্ছে। শালী কম পাজি না কি। চু-মশাইকে খবর দিন আপনি।"

ই-মশাই চুপ করে রইলেন ক্ষণকাল।

তারপর বললেন, "আচ্ছা স-মশাইকে জিজ্ঞেস করি কি করা উচিত। তবে তাঁর কাছ থেকে উত্তর পেতে দেরি হবে একটু। কারণ, প্রথমত উনি কানে কম শোনেন, দ্বিতীয়ত বিচক্ষণ ব্যক্তি বলে কোনো কথার চট্ করে উত্তর দিতে চান না। ততক্ষণ আপনারা এক কাজ করুন না। পাশের ঘরে চলে যান। সেখানে সিনেমা দেখবার ব্যবস্থা আছে। নানারকম ডকুমেন্টরি ছবি করেছি আমরা। আপনাদের যুগে যা হত তা ছবি করে রেখে দিয়েছি। দেখে ভালো লাগবে। খুব ছোট ছোট ছবি। ছ-মশাই বুঝিয়ে দেবেন আপনাদের। একটা কথা মনে রাখবেন—এ যুগে ওসব ঘটনা আর ঘটে না। আমরা অনেক এগিয়ে এসেছি। আপনাদের যুগ এখন আমাদের কাছে ইতিহাসের ছবি মাত্র। আপনারা আপনাদের যুগে যেমন ইতিহাসের বইয়ে প্রাগৈতিহাসিক জন্তু জানোয়ারের ছবি, রেড্ ইণ্ডিয়ানদের ছবি, জুলু

দেশে মেয়েদের ছবি, নাদির, তৈমুর, ঘেংগিসের ছবি দেখেছেন—এও অনেকটা তেমনি। ওতে আপনারা নিজের স্বরূপ দেখে আনন্দ পাবেন। নিজের ছেলেবেলার উলঙ্গ ছবি দেখলে যেমন মজা লাগে ওই সব ছবি দেখে সেই রকম মজা পাই আমরা। আপনারাও পাবেন। পাশের ঘরে চলে যান, আমি ছ-মশাইকে বলে দিচ্ছি। আপনারা নলকে বলুন ছবির ঘরে নিয়ে চল তাহলেই নিয়ে যাবে। আমি ততক্ষণ স-মশাইয়ের সঙ্গে একটু পরামর্শ করি।"

সরু ও মোটা নল-বাহিত হয়ে উপনীত হলেন পাশের ঘরে।

ছ-মশাই বলে যাচ্ছিলেন।

"ওই দেখুন গুণ্ডার দল একটি অসহায় কুমারী মেয়ের উপর বলাৎকার করছে। এ ঘটনা প্রায়ই হত আপনাদের যুগে। এর চেয়ে আরও মর্মান্তিক ব্যাপার হত যখন সে মেয়েকে সমাজ গ্রহণ করত না। ওই দেখুন, পরের ছবিতে ধর্ষিতা মেয়েটি নিজের বাপের বাড়িতে ফিরে গেছে, কিন্তু কেউ তাকে গ্রহণ করছে না। ওরা সবাই কাঁদছে কিন্তু ওকে গ্রহণ করতে সাহস পাচ্ছে না। সমাজের ভয়ে সবাই তটস্থ। এর অবশ্যম্ভাবী ফল যা ঘটত তা পরের ছবিটিতে দেখুন। মেয়েটি বেশ্যা হয়েছে। দেখুন, ওর হাসির ভিতরও চোখের জল লুকিয়ে আছে। তার পরের ছবি দেখুন—সে আত্মহত্যা করেছে। গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে আড়কাঠা থেকে।

স্ত্রীলোকদের এ রকম আত্মহত্যা সে যুগে প্রায়ই হত, খবরের কাগজের পাতায় এ সবের বিবরণও ছাপা হত। সে যুগের লোকেরা সে সব খবর পড়ত, কিন্তু প্রতিকারের কোনো চেষ্টা অনেকদিন হয়নি।

প্রতিকারের চেষ্টা হল অনেক দিন পরে। সবাই ভাবলেন মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের উপার্জনক্ষম করে দিতে পারলেই বুঝি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু হল না। ঘন ঘন তাদের নানা সমস্যায় বিচলিত করে তুলতে লাগল। বিপথেও গেল অনেকে। ওই দেখুন একটি কলেজ-গামী মেয়ে একটি ছোকরার সঙ্গে প্রেম করছে। আত্মহত্যাও করত অনেকে। অনেকে বাবা মায়ের অবাধ্য হয়ে ভিন্ন জাতে বিবাহ করত। সে যুগে স্ত্রীলোকরা প্রায়ই আত্মহত্যা করতেন। এর প্রধান কারণগুলি হল—প্রেম, গুণ্ডা, আর্থিক, অনটন, স্বপ্নভঙ্গ, আশাভঙ্গ। অনেকে পাগলও হয়ে যেত। আমরা এ যুগে সে সবের মূলোচ্ছেদ করেছি।"

"কি করে?"

"আমরা বুঝেছি অধিকাংশ ঝামেলার মূলে আছে ক্ষুধা। সেই ক্ষুধা থেকেই লোভ, লোভ থেকেই পাপ, পাপ থেকেই অশান্তি। আমরা দুটো বড় ক্ষুধার—খাদ্য ক্ষুধার এবং যৌন ক্ষুধার মূলোচ্ছেদ করেছি। এ যুগে কারো পেট বা অন্ত্র নেই, কারো যোনি নেই। সার্জারির বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে। আমাদের সার্জনরা সকলের পেট, অন্ত্র যোনি কেটে বাদ দিয়েছেন। আমরা ফ্যাক্টরিতে জন্মগ্রহণ করি টেস্টটিউবের মধ্যে। ফ্যাক্টরিতেই আমাদের শৈশব কৈশোর অতিবাহিত হয়। প্রাপ্তবয়স্ক হলেই যেতে হয় সার্জনদের কাছে। তাঁরা পুরুষের শুক্রকীট এবং মেয়েদের ডিম্বকোষ সংগ্রহ করেন ল্যাবরেটরিতে। তার থেকে ভবিষ্যৎ বংশ সৃষ্টি করেন জীব-বিজ্ঞানীরা টেস্টটিউবে। আপনাদের যুগে গর্ভবতীর ছেলে হবে কি মেয়ে হবে তা আপনারা আগে থাকতে ঠিক করতে পারতেন না। কিন্তু এ যুগের বিজ্ঞানীরা তা পেরেছেন। এ যুগে সমসংখ্যক ছেলেমেয়ে ল্যাবরেটারিতে তৈরি হয়—"

"আপনাদের যুগ তাহলে খাসি-খাসিনীর যুগ! বলেন কি মশাই।"

বিস্ময় প্রকাশ করলেন মোটা।

সরু বললেন—"মানুষকে ছাগল বলাটা ঠিক হবে না। খোজা-খোজানী বলতে পার।"

সরুর মনে আর একটা কৌতূহল জাগল। ফিনান্স বিভাগে চাকরি করতেন তিনি।

"আচ্ছা, আপনাদের শুক্রকীট আর ডিম্বকোষের বার্ষিক বরাদ্দে ঘাটতি বাড়তি হয় না।"

হু-মশাই উত্তর দিলেন—"হয়। মাঝে মাঝে নষ্ট হয়ে যায় কিছু। কিন্তু সে ঘাটতি পূরণের উপায়ও আবিষ্কার করেছেন একজন বিজ্ঞানী। শুক্রগ্রহে তিনি একটি শুক্রমহাসাগরের সন্ধান পেয়েছেন। সে মহাসাগরে কোটি কোটি শুক্রকীট কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। শুক্রকীটে ঘাটতি পড়লে সেইখান থেকে আনা হয়। আর একজন বিজ্ঞানী ডিম্বকোষের খনি আবিষ্কার করেছেন চন্দ্রলোকে। বহু কোটি যুগ পূর্বে বহু নারীদেহ সেখানে নাকি বরফে চাপা পড়েছিল। তাদের দেহ এখনও অবিকৃত আছে। ডিম্বকোষ খারাপ হয়নি। চন্দ্রলোক থেকে ডিম্বকোষ আনবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।"

"চন্দ্রলোকে এত নারীদেহ গেল কি করে!"

সবিস্ময়ে বলে উঠলেন মোটা।

সরু বললেন—"নারী আবার দরকার কি! চন্দ্র নিজেই তো একটা অফুরন্ত নারী। যোগেন জ্যোতিষী বলতেন চন্দ্রের সঙ্গে নারীর কি একটা যোগও আছে, চন্দ্র মনের কারক, আর নারী রহস্যময়ী—কিন্তু আমি বোধহয় গুলিয়ে ফেলছি—কিন্তু যোগাযোগ আছে একটা। ইংরেজ কবিদের কাছে চাঁদ শী (she) হি (he) নয়। যাক ও কথা। একটা কথা কিন্তু আপনাদের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। খাদ্য-ক্ষুধা, যৌন-ক্ষুধা আপনারা হয়তো জয় করেছেন কিন্তু সব রকম ক্ষুধাকে জয় করতে পেরেছেন কি? ক্ষুধা তো নানারকম—"

"না পারিনি। কিন্তু সে ক্ষুধাকে জয় করতে পারিনি তা যে কি রকম ক্ষুধা তা-ও বলতে পারব না। সেটাকে আপনারা আত্মার ক্ষুধা বলতে পারেন, কিন্তু আমরা আত্মাকে এখনও যন্ত্রে যাচাই করতে পারিনি, তাই ও বিষয়ে জ্ঞান আমাদের অস্পষ্ট, কিন্তু তবু মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় আকাশ-পথে হু হু করে উড়ে যাই, স্বপ্ন দেখি জ্যোৎস্নালোকে—"

"ধেৎ, ধেৎ—"

থামিয়ে দিলেন তাঁকে সহিস।

সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হলেন তিনি।

"এইবার আর একটা ছবি দেখুন। আপনাদের যুগের ইলেক্‌শনের ছবি। শুধু ভারতবর্ষে নয় পৃথিবীর সর্বদেশে এই কাণ্ড হত আগে। ভোটারদের ভোলাবার জন্য কি না করত গদি-প্রার্থীরা। ওই দেখুন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জনসভায় তুমুল বক্তৃতা। প্রতিশ্রুতির বান বইয়ে দিচ্ছেন নেতারা। শুধু তাই নয়—এই ছবিতে দেখুন ওই মোটা লোকটিকে হাত করবার জন্যে মস্ত বড় একজন ধনীলোক মোটরে করে এসেছেন, হাতজোড় করছেন ওর কাছে, গোপনে গোপনে হয়তো আরও কিছুর ব্যবস্থা করেছেন—ওই মোটা লোকটির হাতে প্রচুর ভোট। এই দেখুন এক জায়গায় পোলিং বুথে আগুন জ্বলছে। এই ছবিটাতে দেখুন ইলেক্‌শনকে কেন্দ্র করে ভয়ানক রায়ট লেগেছে, মারামারি, কাটাকাটি, লাঠালাঠি চলছে, বন্দুক, বোমাও ব্যবহার করছে কেউ কেউ। লুটপাট, রাহাজানি, ধর্ষণ সবই চলছে। অর্থাৎ এ-ও একটা লড়াই। মনে পড়িয়ে দেয় হুনদের, তাতারদের, এট্টিলা-ঘেংগিস-খাঁদের,

আলেকজান্ডার-অ্যানটনি-জুলিয়াস-সিজারদের, নেপোলিয়ন হিটলারদের। আপনাদের ইলেকশনটা তাঁদেরই কর্মপদ্ধতির রকমফের মাত্র। যুদ্ধ করে ভিক্ষে করে, ঘুষ দিয়ে কৌশল করে যেমন করে হোক জিততে হবে। প্রাচীন বর্বর পদ্ধতির এটা পুনরাবৃত্তি, ভোলটা কিছু বদলেছে মাত্র—"

মোটা আগে এ নিয়ে চিন্তা করতেন অনেক। কিন্তু ডায়াবিটিস হওয়ার পর তাঁর চিন্তা কম-জোর হয়ে গেছে। ওসব নিয়ে আর মাথা ঘামান না আজকাল। হঠাৎ এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতে তাঁর কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

"আপনাদের এখানে ইলেকশন নেই বুঝি—"

"আছে। কিন্তু এখানে কেউ গদি-প্রার্থী নেই। এ অঞ্চলের সমস্ত লোকের যথার্থ পরিচয় রেকর্ডেড হয়ে আছে আমাদের লাইব্রেরিতে। সেখানে সব সময়ই সকলের পরিচয় বিঘোষিত হচ্ছে। সকলেই সকলের সম্যক পরিচয় জানে। ইলেক্‌শনের সময় কাউকে পোলিং বুথে যেতে হয় না। নিজের নলের ভিতর বসে তিনি নীরবে ইচ্ছা করেন অমুক ব্যক্তি এবার প্রেসিডেন্ট হোন। তাঁর সে ইচ্ছা আলোকের বিন্দুরূপে রেকর্ডেড হয় বিরাট একটা ফোটোগ্রাফিক প্লেটে। একজনের ইচ্ছা একবারের বেশি রেকর্ডেড হবার উপায় নেই। আমাদের পারমাণবিক যন্ত্র মানুষের চেয়েও বেশি বিচক্ষণ, আর সে নির্বিকার বলে পক্ষপাতহীন। তার রেকর্ডের উপর আমাদের অগাধ বিশ্বাস। যিনি সবচেয়ে বেশি ভোট পান তাঁকে আমরা সকলে মিলে অনুরোধ করি রাষ্ট্রপতি হবার জন্য। আমাদের সমস্ত বিভাগের অধিকর্তারা, সমস্ত কর্মচারিরাও এইভাবে নির্বাচিত হন। কেউ প্রার্থী হন না—"

"যদি দুটি লোক সমসংখ্যক ভোট পান?"

"তাহলে টস করা হয়—"

"আপনাদের প্রেসিডেন্ট, মানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কি"

"এখানে কোনো বিশেষ পদাধিকারীর বিশেষ ক্ষমতা নেই। রাষ্ট্রপতি সর্বাধিক লোকের হৃদয় জয় করেছেন বলে তাঁকে আমরা সর্বাধিক সম্মান দিই। তাঁর মূর্তি—তাঁর নলের ছবি—আমাদের খোলাম কুচিতে ছাপা হয়। তিনি একাধিক "যা খুশি" গুলি পেতে পারেন। কিন্তু রাজ্যের শাসন ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। রাজ্য শাসন করে বিভিন্ন বিভাগগুলি। আর প্রত্যেকটি বিভাগ যন্ত্রচালিত। যন্ত্রশাসিতও বলতে পারেন। অর্থাৎ আমরা সভ্য, আমরা কৃত্রিম—"

"রাষ্ট্রপতির যদি কোনো ক্ষমতাই না থাকে তাহালে তাঁকে রাষ্ট্রপতি করবার দরকার কি?"

"আমরা কৃত্রিম হলেও আমরা যে মানুষ, আমাদের যে শ্রদ্ধা করবার বাসনা এবং শক্তি আছে—এই বোধটাকে জাগ্রত রাখবার জন্যেই রাষ্ট্রপতি থাকা দরকার। সব দেশের রাষ্ট্রপতিরা মাঝে মাঝে মিলিত হন, চিন্তা করেন কি করে মানব জাতির আরও উন্নতি হবে—"

"কোথায় মিলিত হন?"

"তা তাঁরা নিজেরাই ঠিক করেন। কখনও স্বর্গে, কখনও মর্ত্যে, কখনও অতীত লোকে, কখনও আরও দূর ভবিষ্যতে। প্রত্যেকেই "যা খুশি" গুলি খেয়েছেন তো, যা খুশি করতে পারেন—"

" "যা খুশি" গুলি তো আমরাও খেয়েছি—"

"তাহলে আপনারাও পারবেন। এইবার দেখুন আপনাদের র‍্যাশনের দোকানের ছবি। এটা দোকানের অভ্যন্তরের দিক। ওই দেখুন দোকানদার কিছু চাল সরিয়ে রেখে বাকি চালটায় কাঁকর মেশাচ্ছে। ওই সরিয়ে রাখা চালটা কালো বাজারে বেচবে। এইবার বাইরের দিকটা দেখুন। কি প্রকাণ্ড 'কিউ'। ওই

দেখুন 'কিউ'য়ের ভিড়ে একটা পকেটমার আর একজনের পকেট মারছে। আর একটা ছোঁড়া দেখুন ওই মেয়েটার দিকে চেয়ে বাঁ চোখ কোঁচকাচ্ছে। ওই মোটা ভদ্রলোকটিকে কতকগুলো পাজি ছেলে 'হাতি বাবা হাতি বাবা' বলে খেপাচ্ছে। ওই বুড়ি বেচারির কি কষ্ট দেখুন, কিছুতে এগোতে পাচ্ছে না বেচারি। আরও কত রকম কি হচ্ছে দেখুন না। অথচ কিউ না দিয়েও উপায় নেই। পেটের দায়ে সবাই এই দুর্গতি বাধ্য হয়ে সহ্য করছে। আমরা এ সমস্যার সমাধান করেছি—"

"হ্যাঁ, আমরা শুনেছি সে সব—"

"পেটের দায়ে আপনাদের যুগে আরও নানান কাণ্ড হয়েছে। এই দেখুন মা তার সন্তানদের হত্যা করছে, ওই দেখুন মিলের কর্মীরা ধর্মঘট করেছে, এই দেখুন ব্যাঙ্ক লুট হচ্ছে, এই দেখুন ধানের গোলা লুট হচ্ছে,—আরও দেখবেন।"

"না, ওসব তো অহরহ দেখছি। খবরের কাগজে তো এই সব খবরই ফলাও করে ছাপা হয়"

"পতিতাদের ছবি দেখবেন?"

"না থাক, দরকার নেই—"

"আপনাদের আগেকার যুগে পতিতারা ঘৃণ্য ছিল। দেখুন এই ছবিটা। সারি সারি সব রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। ওই কোণের মেয়েটি বুকের আঁচলের তলায় টর্চ লুকিয়ে রেখেছে, মাঝে মাঝে সেটি জ্বেলে নিজের উন্নত বক্ষের দিকে পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। আপনাদের যুগে আপনারা তাদের সম্মানের আসনে বসিয়েছেন, তাদের শিল্প প্রতিভার আদর করেছেন, তাদের ছবি সাময়িক পত্রিকায় ছেপেছেন। এটা আপনাদের আর্ট-প্রীতির লক্ষণ—কিন্তু—"

হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলেন ই-মশাই।

মানে, ই-মশায়ের নল।

"ও মশাই, আপনাদের সোহাগা এখান থেকেও ভেগেছে—"

"ভেগেছে? তার মানে?"

"ওর তো দুটো মানে হয় না। ভেগেছে ইন্দ্রের সঙ্গে। চু-মশাই যা বললেন তার রেকর্ড শুনুন। রেকর্ড করে এনেছি। বাজাচ্ছি সেটা—"

কুট করে একটি শব্দ হল।

রেকর্ড বাজতে লাগল।

"চিবুকে তিল-ওলা একটি মেয়েকে আমাদের চরেরা পাকড়াও করেছিল। তার নাম যে সোহাগা তা-ও তিনি কবুল করেছিলেন। তিনি পদার্থবিদ্যায় মেধাবিনী ছাত্র এ-ও জেরা করে আমরা বুঝেছি। সেকালে পৃথিবীর যে অংশ আমেরিকা বলে চিহ্নিত হয়েছিল সেই অংশেই তিনি হার্ভারড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছেন এ খবরও মিথ্যে নয়। এই যুগের নাগরিক হয়ে এই যুগেই তিনি বাস করবেন এ ইচ্ছাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর সে ইচ্ছা রাষ্ট্রপতির দফতরেও পেশ করা হয়েছিল। এমন সময় আর এক কাণ্ড ঘটল। রাজ্যচ্যুত পলাতক দেবরাজ এসে আমাদের রাষ্ট্রপতির আতিথ্য গ্রহণ করলেন। আমাদের রাষ্ট্রপতি সর্বদেশের পৌরাণিক যুগের বিশেষজ্ঞ। স্বয়ং ইন্দ্রকে অতিথিরূপে পেয়ে তিনি উল্লসিত হয়ে উঠলেন। বললেন, বলুন কি ভাবে আপনার পরিচর্যা করতে পারি। ইন্দ্র কোনো ভণিতা না করে সংক্ষেপে বললেন, মদ আর মেয়েমানুষ চাই। অমৃতে অরুচি ধরে গেছে।

শচী উর্বশী মেনকা রম্ভা ঘৃতাচী তে-বাসী তরকারির মতো হয়ে গেছে। মাদকতা তো নেইই, পচা গন্ধ ছাড়ছে। আপনি নতুন কোনো মাল আমদানী করুন।"

রাষ্ট্রপতি বিস্মিত হয়ে বললেন, "বলো কি! শচী, উর্বশী, মেনকা, রম্ভার আর মাদকতা নেই? ওঁরা তো চিরযৌবনা—"

"তাই তো আরও বিপদ। বদলায় না। ওরা আসলে ফুরিয়ে গেছে; প্রমাণও পেয়েছি। বিশ্বকর্মার তিন-মাথা-ওলা ছেলে বিশ্বরূপটা যখন ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য তপস্যা করছিল তখন ওই অপ্সরাদের পাঠিয়েছিলাম তাকে ভোলাবার জন্যে। পারলে না মশাই। আমাকেই বজ্র দিয়ে মারতে হল তাকে। তক্ষার সাহায্যে তার মুণ্ডপাত করলাম। সেই হল আমার কাল। বিশ্বকর্মা আবার সৃষ্টি করলেন বৃত্রাসুরকে। তার সঙ্গে মানসসরোবরের তীরে শতাধিক বছর ধরে যুদ্ধ করেছি। ছলে বলে কৌশলে শেষটায় যখন তাকে মারলাম তখন জড়িয়ে পড়লাম ব্রহ্মহত্যার পাকে। এখন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। নহুষ ইন্দ্র হয়ে বসেছে স্বর্গে—"

"আমি সব জানি। কিন্তু আপনি যে আমার কাছে আসবেন তা প্রত্যাশা করিনি। খুব খুশি হয়েছি, অত্যন্ত খুশি হয়েছি, আপনি আসাতে। আপনাকে আমি যতটা পারি আনন্দ দেবার ব্যবস্থা নিশ্চয় করব। এখন এই গুলিটা দিচ্ছি, আপনি খেয়ে ফেলুন। এর নাম "যা খুশি" গুলি, আপনার ইচ্ছামত সব কিছু পাবেন। এটা আমাদের একটা অদ্ভুত আবিষ্কার। একটা খবরও আপনাকে দিচ্ছি। সোহাগা নামে একটি বিজ্ঞানী মেয়ে এখানে এসেছে। সে এখানেই বসবাস করতে চায়। মেয়েটি অসাধারণ রূপসী। বিদুষীও—"

"বিদুষী। তাহলেই সেরেছে—"

"কেন, আলাপ করে দেখুন না।"

"আমি একটা ঘোড়া লুট করে এনেছিলাম একবার কুবেরের অশ্বশালা থেকে। চমৎকার দেখতে। দেখলেই চড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু চড়তে পারলাম না। কাছে গেলেই কামড়াতে আসে, চার পা তুলে চাঁট ছোঁড়ে। তাড়িয়ে দিতে হল শেষকালে। বিদুষীরা অনেকটা সজারুর মত, কাছে গেলেই গাময় শত শত কাঁটা খাড়া হয়ে ওঠে। তাছাড়া বিদুষী মেয়ের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও নেই আমার তেমন। ওদের দেখলে ভয় করে। একবার একটি বিদুষী ব্রাহ্মণকন্যাকে দেখে শিস্ দিয়েছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে সম্মার্জনী নিয়ে তেড়ে এসেছিল সে। পালাতে পথ পাই না—"

"কিন্তু পুরাণে তো আপনি প্রেমিক বলে বিখ্যাত—"

"আমি জীবনে যে সব মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছি তারা সবাই মূর্খ। অপ্সরাগুলি সব ক-অক্ষর গোমাংস, শচী একটি আকাট। সে পুলোমনা ঋষির মেয়ে বটে, তবু আকাট। বিয়ে হবার আগেই আমি ওর সতীত্ব নষ্ট করেছিলাম, ভয় হল ওর বাবা হয়তো আমাকে অভিশাপ দেবেন, তাই ওর বাবাকে হত্যাও করেছিলাম। মানে, আত্মরক্ষার জন্যে করতে বাধ্য হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এত কাণ্ডের পর মেয়েটা বোধ হয় আমার দিকে ফিরে চাইবে না। কিন্তু মশাই, অবাক হয়ে গেলুম যখন দেখলাম ও পিতৃঘাতীকেও বিয়ে করবার জন্যে লালায়িত। অনেক মেয়েই আমাকে বিয়ে করবার জন্য লালায়িত হয়েছিল। কারণটা কি জানেন? আমার রূপ, আমার অমরত্ব এবং সর্বোপরি ইন্দ্রাণী হবার লোভ। অধিকাংশ মূর্খ মেয়েই ইন্দ্রাণী হতে চায়। কিন্তু ওই বিদুষী মেয়েদের মানদণ্ড আলাদা। হয়তো ওঁদেরও ভিতরে ভিতরে ইন্দ্রাণী হবার লোভ আছে, কিন্তু প্রথমেই সেটা প্রকাশ করবেন না।

প্রথমেই আপনাকে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দেবেন। তাছাড়া আর কাউকে তো ইন্দ্রাণী করাও যাবে না। শচী দেবী বহাল তবিয়তে আছেন, থাকবেনও চিরকাল, কারণ উনি অমরা—"

"জানি, জানি, আমি সব জানি"—রাষ্ট্রপতি বললেন—

"আপনার নীতির কোনো সমালোচনাও আমি করছি না। আপনি দেবরাজ, আপনি আমার অতিথি, আপনি যাতে সুখী হন তাই আমার কাম্য। তাই একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি পৌরাণিক যুগে বিদুষী রমণীরা নীতির নিগড়ে সব সময়ে নিজেদের শৃঙ্খলিতা করে রাখেননি। স্বয়ং সরস্বতীই এর উদাহরণ। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে সরস্বতী কৃষ্ণ-কণ্ঠ-সমুদ্ভূতা। তিনি কিন্তু জনক কৃষ্ণকেই কামনা করেছিলেন। কৃষ্ণ তখন তাঁকে বলেন নারায়ণকে ভজনা করতে। নারায়ণের তখন দুই স্ত্রী বর্তমান—লক্ষ্মী এবং গঙ্গা। দুটি স্ত্রী নিয়েই অত্যন্ত বিব্রত হয়ে ছিলেন তিনি। তৃতীয় স্ত্রী সরস্বতী গিয়ে জুটতেই ত্র্যহস্পর্শ হয়ে গেল। তিতিবিরক্ত হয়ে উঠলেন নারায়ণ। শেষে তিনি বললেন— 'আমি একা তোমাদের তিনজনকে পেরে উঠব না। লক্ষ্মী আমার কাছে থাকো, গঙ্গা মহাদেবের কাছে যাও, আর সরস্বতী যাও ব্রহ্মার কাছে। আবার কোনো পুরাণের মতে ব্রহ্মাই সরস্বতীকে সৃষ্টি করেছিলেন। ব্রহ্মার তিনি মানস-কন্যা। কিন্তু কন্যাকে বিয়ে করবার জন্যেই আকুল হয়েছিলেন তিনি। কন্যাও রাজি হয়ে গেলেন। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নীতিতে বাধল না কিছু। ইয়োরোপীয় পুরাণের গল্পে সাইপ্রাসের রাজা পিগম্যালিওন অনেকটা এই কাণ্ড করেছিলেন। নিজের তৈরি হাতির দাঁতের এক কুমারী মূর্তির প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় আফ্রোদিতের কাছে প্রার্থনা করে জীবন্ত করেছিলেন তাকে এবং তার গর্ভে পাফাস (Paphus) নামক সন্তানেরও জন্মদান করেছিলেন। পুরাণে সব রকম হয়েছে। সুতরাং আপনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন। সোহাগা হয়তো আপনার নাগালের মধ্যে আসতেও পারে—"

"সোহাগা কিন্তু পৌরাণিক যুগের মেয়ে নয়, আধুনিকা সে। সে হয়তো ইতিমধ্যেই কারও প্রেমে পড়েছে—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ পড়েছে। চু-মশাই মনশ্চুম্বক দিয়ে এ খবরটি জোগাড় করেছে। তার মানসলোকে যে মানুষটির নাম অহরহ উজ্জ্বল হয়ে আছে তার নাম নহুষ।"

"নহুষ? নহুষ তো আমার স্বর্গ দখল করে বসে আছে। সেই না কি—"

"সোহাগার মনে যে নহুষ আছে তার ফোটোও তুলেছেন চু-মশাই। আমার কাছে আছে সেটি। দেখবেন?"

"দেখি দেখি—"

ইন্দ্র নহুষের ফোটোটি মনোযোগ দিয়ে দেখলেন।

"না, এ অন্য নহুষ। ক্যাবলা ক্যাবলা চেহারা। আপনার কাছে আর একটি "যা খুশি" গুলি প্রার্থনা করছি। দেবেন?"

"আর একটা চাইছেন কেন?"

"সোহাগার কাছে যাব এখুনি। আর তাকেও একটা খাওয়াব।"

"এখুনি যাবেন?"

"তার আগে একটু সুরা পান করতে চাই। মর্ত্যলোকে বিহার প্রদেশে তাড়ি নামে এক অপূর্ব সুরা পাওয়া যায় শুনেছি। কখনও খাইনি—"

"বেশ তো খান না। "যা খুশি" গুলি তো খেয়েছেন। ইচ্ছে করলেই তাড়ি এসে যাবে। তবে আমি

শুনেছি ব্র্যান্ডি, শেরি, হুইস্কি, বিয়ার, আর পোর্ট একসঙ্গে মিলিয়ে খেলে না কি খুব ভালো লাগে—"

"বেশ, আগে তাড়িটা খাই। তারপর আপনার পঞ্চরং চেখে দেখব"

প্রচুর মদ খেলেন ইন্দ্র এবং ইন্দ্র রূপেই নেশাটা উপভোগ করলেন রাষ্ট্রপতির বৈঠকখানায় বসে। তারপর বললেন—"দিন আর একটা "যা খুশি" গুলি। সোহাগার অভিসারে বেরিয়ে পড়ি—"

গুলিটি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের চেহারাটি বদলে ফেললেন। ছিলেন ইন্দ্র, হয়ে গেলেন নহুষ। সরুর নাতি নহুষ।

সোহাগার কাছে গিয়েও হাজির হলেন অবিলম্বে।

"এ কি, তুমিও এখানে এসে গেছ না কি, তোমাকে নিয়ে আর পারি না—"

ছদ্মকোপে বলে উঠল সোহাগা।

"তোমাকে ছেড়ে আমি একদণ্ড থাকতে পারছি না—"

হঠাৎ ভুরু কুঁচকে গেল সোহাগার। দু'পা পেছিয়ে গেল সে।

"কে তুমি! তুমি তো নহুষ নও—"

"তার মানে?"

"আমাকে দেখে তোমার মুখে যে রকম বোকা-বোকা হাসি ফুটে ওঠে সে রকম হাসি তো তোমার মুখে ফুটল না।"

নহুষের মুখে সঙ্গে সঙ্গে বোকা-বোকা হাসি ফুটে উঠল। ইন্দ্র নিপুণ অভিনেতা।

"চল, ফিরে চল—"

"না, আমি ও সমাজে ফিরে যাব না। ওখানে গেলেই তোমাকে বিয়ে করতে হবে আর আমাকে মাথায় কাপড় দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গৃহলক্ষ্মী সাজতে হবে। তা আমি পারব না।"

"এইটে খাও—"

"কি ওটা? লজেন্স?"

"খেয়েই দেখ না। খেলে যা খুশি করতে পারবে। অদ্ভুত ম্যাজিক গুলি। এখানকার রাষ্ট্রপতির কাছে উপহার পেয়েছি। খেয়ে ফেল—"

"তুমি খাও না।"

"আমি খেয়েছি একটা। দুটো পেয়েছিলাম। তোমার জন্যে এনেছি এটা—"

"খাব?"

"খাও"

গুলিটা খেয়ে ফেললে সোহাগা।

"যা খুশি করতে পারব? তুমি পার?"

"নিশ্চয়"

"আচ্ছা, ভেড়া হও তো—"

ইন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে ভেড়া হয়ে গেলেন। ধপধপে শাদা লোমওলা ভেড়া। সোহাগা তার পিঠে চেপে বসল।

"বাঃ চমৎকার। কি নরম তোমার লোম। বরাবর ভেড়া হয়ে থাকবে? আমি তোমার পিঠে চড়ে বেড়াব।"

"একবার নাব তো"

সোহাগা নাবতেই ভেড়া মুহূর্তে আবার নহুষ হয়ে গেল।

মুচকি মুচকি হাসতে লাগল সোহাগার দিকে চেয়ে।

"আমিও যা খুশি গুলি খেয়েছি। আমি যদি বলি নহুষ ভেড়া হয়ে থাকুক—"

"নহুষও সঙ্গে সঙ্গে বলবে নহুষ ভেড়া হবে না। দুই বিপরীত শক্তিতে তখন কাটাকাটি হয়ে যাবে। কিচ্ছু হবে না।"

"তাহলে গুলি খেয়ে আর লাভ কি হল? তুমি তো সর্বদাই আমার ইচ্ছাকে বাধা দেবে—"

"দুজনে মিলে স্বর্গলোক রচনা করি চল। সে স্বর্গলোকে আমি হব দাস, তুমি হবে সম্রাজ্ঞী। পুরোনো সমাজে আমরা আর ফিরব না। আমাদের স্বর্গলোক নিজের মত করে সৃষ্টি কর তুমি। চল—"

"আমি কিন্তু এখানেই থাকতে চাই—"

"তাহলে আমিও থাকব—"

এই সময় একটি নল এসে দাঁড়াল তাদের কাছে।

"আমি রাষ্ট্রপতির দফতর থেকে আসছি। শ্রীমতী সোহাগা দেবী এ যুগে বসবাস করবার জন্যে যে আবেদন করেছেন তার উত্তরে জানানো হয়েছে যে তিনি এখানে থাকতে পারেন যদি এখানকার আইন-কানুন মানতে তিনি সম্মত হন। প্রথমেই তাঁকে সার্জনদের কাছে যেতে হবে। অস্ত্রহীন এবং যোনি-হীন ব্যক্তিরাই এ দেশের অধিবাসী হবার যোগ্য। বাইরের লোক অতিথি হিসাবে এখানে দুদিনের বেশি থাকতে পারেন না। তৃতীয় দিনে হয় তাঁদের চলে যেতে হবে নয়তো সার্জনদের কাছে যেতে হবে। সার্জনদের সার্টিফিকেট নিয়ে আবেদন করলেই সোহাগা দেবীকে এ যুগের অধিবাসী রূপে গণ্য করা হবে।"

এ কথা বলেই নলটি চলে গেল।

একটু পরেই দেখা গেল দুটি চখা-চখী আকাশ-পথে উড়ে যাচ্ছে।

চখা বলছে—"আমরা যে স্বর্গলোক সৃজন করব সে স্বর্গে আমি হব ইন্দ্র তুমি হবে শচী—"

"না আমি শচী হতে চাই না, তোমাকেও ইন্দ্র হতে হবে না। যদি কিছু হতেই হয় তাহলে আমি হব প্রোটন আর তুমি ইলেকট্রন হয়ে আমার চারদিকে বনবন করে ঘুরবে। পারমাণবিক জগতই হবে আমাদের নব-স্বর্গ"

এর পর সোহাগা দেবীর আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

ই-মশাই বললেন—"চু-মশাইয়ের রেকর্ড আপনারা শুনলেন। এবার আপনারা কি করবেন স্থির করুন। আমার কাজ আছে, আমি চললুম।"

ই-মশাইয়ের নল অন্তর্ধান করল।

"আরে কচু খেলে যা—"

বলে উঠলেন সরু।

"টেমপার লুজ কোরো না। এখন কি করা যায় তাই ভাব—"

"অবিলম্বে এখান থেকে সটকে পড়া উচিত। আর কিছুক্ষণ থাকলে তো ওরা আমাদের কেটেকুটে সাফ করে দেবে—"

"কিন্তু সটকাই কি করে। কল্পনার গুলতিতে চড়ে এখানে ছিটকে পড়েছি। এখান থেকে পালাব কি করে!"

ছ-মশাই বললেন, আপনাদের একটা পরামর্শ দিতে পারি। দুজনেই আপনারা "যা-খুশি" গুলি খেয়েছেন। ইচ্ছে করলেই আপনারা স্বস্থানে ফিরে যেতে পারেন—"

"কিন্তু এখন স্বস্থানে তো আমরা ফিরতে চাই না। আমরা সোহাগাকে পাকড়াও করতে চাই"

"আপনারাও চখা-চখী হয়ে ওদের অনুসরণ করুন তাহলে"

"ও বাবা, সে সাহস নেই আমাদের। হঠাৎ কোনো শিকারী যদি গুলি ছুঁড়ে আমাদের ঘায়েল করে ফেলে আর তারপর রোস্ট বানিয়ে খেতে উদ্যত হয়—কি করব আমরা। আমাদের সঙ্গে তো ইন্দ্র থাকবে না।"

মোটা বললেন—"তাছাড়া ওই মহাশূন্যে তারা কোনদিকে গেছে তাই বা ঠিক করব কি করে?"

সরু ভুরু কুঁচকে চুপ করে রইলেন।

মোটা তার দিকে চেয়ে বললেন—"জাঁতি-কলে পড়ে গেছি ভাই।"

সরু হাসলেন। তারপর বললেন— "আমার গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করতে ইচ্ছে করছে না। আধুনিক সম্পাদকদের ভাষায় আমার বলতে ইচ্ছা করছে—নিদারুণ পরিস্থিতি। কোন মোর্চায় কার সঙ্গে সামিল হয়ে কি রকম সমঝোতা করলে যে কার্য উদ্ধার হবে জানি না তা কে বলে দেবে। আমার কথা বুঝতে পারছেন ছ-মশাই? ভালো কথা আপনাদের এ যুগে ভাষা সমস্যা নেই?"

"না, আমরা যে যার মাতৃভাষায় কথা কই। অন্য ভাষাভাষী লোকদের যখন আমরা আমাদের মনোভাব বোঝাতে চাই তখন আমরা নানারকম ইঙ্গিত আর চিহ্নের সাহায্য নিই। সেটা কারো ভাষা নয়। সেটা অনেকটা সেকালের ইজিপ্টের হিয়ারোগ্লিফিক্স্‌-এর (hieroglyphics) মত। এই সঙ্কেত ভাষার বিশেষজ্ঞরা আমাদের সব বিভাগে কাজ করেন। আপনারা যে অঞ্চলে এসে পড়েছেন সেটা বাঙালি প্রধান জায়গা। তাই আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে না।"

"কি রকম সাঙ্কেতিক ভাষা আপনাদের?"

সরুর কৌতূহল জাগ্রত হল।

"ছবিতে দেখিয়ে দিচ্ছি"

কুট করে একটি শব্দ হল।

"এই দেখুন। একটি মানুষ, তার পাশে একটি এরোপ্লেন। এটির মানে মানুষটি এরোপ্লেনে করে যাবেন। আবার এই ছবিতে দেখুন, এরোপ্লেনের মুখটি উল্টো দিকে ফিরে আছে। এর মানে মানুষটি এরোপ্লেনে ফিরচেন। আর একটি ছবি দেখুন—"

"ওসব থাক মশাই"—মোটা অধীর হয়ে থামিয়ে দিলেন তাকে—"আমরা যে সঙ্কটে পড়েছি তার থেকে কি করে ত্রাণ পাব তার উপায় বলে দিন আগে। সরু, তোমার এই সব বাজে ব্যাপার ভালো লাগছে এখন? আশ্চর্য।"

অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন সরু।

"যান্ত্রিক নস্যি নেওয়ার পর থেকে মনটা একটু বেশি চনমনে হয়ে পড়েছে ভাই। ঠিক বলেছ,

আসল সমস্যা থেকে সরে গেছি। ছ-মশাই দয়া করে আমাদের সমস্যাটার উপর একটু আলোকপাত করুন। সত্যিই আমরা ফাঁদে পড়ে গেছি।"

তারপর হঠাৎ হেঁড়ে গলায় গান গেয়ে উঠলেন— "হাত ধরে তুমি টেনে তোল সখা—"

"আরে কি করছিস সরু, ভাঁড়ামির একটা সময়-অসময় আছে তো।"

আবার গান গাইলেন সরু।

"লাগছে না ভালো আমারও—ইমন সারং পিলু ভৈরবী ধামারও। ছ-মশাই, আপনি কৃপা না করলে গেলাম আমরা নির্ঘাত, দয়া করুন, দয়া করুন প্রাণনাথ।"

ছ-মশাই খুক খুক করে হাসছিলেন।

বললেন—"কল্পনা আপনাদের এখানে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরই শরণ নিন আবার—"

"কিন্তু তার নাগাল পাব কি করে। মোটার প্রণয়িনী ফুটকি তাকে পাঠিয়েছিল আমাদের কাছে। টেলিফোন গার্লের কণ্ঠে ভর করে খুব খেল খেলেছিল মেয়েটি। অবাক কাণ্ড করেছিল। কিন্তু এখন তাকে আমরা পাব কি করে। তাছাড়া আপনারা আমাদের ঢুকিয়ে দিয়েছেন নলের ভিতর। এ নলের দময়ন্তী আছে কি না জানি না—থাকলেও তিনি আমাদের দয়া করবেন কি?"

আবার খুক খুক করে হাসলেন ছ-মশাই।

"না এ নলের দময়ন্তী নেই। এ নল পৌরাণিক নল নয়, পারমাণবিক নল। পাশের ঘরে চলে যান আপনারা। পাশের ঘরটা জিরো রুম (zero room), সেখানে আমাদের নল আপনাদের কোনো কাজে বাধা দেবে না। সেখানে সব নীরব নিবাত নিষ্কম্প। সেখানে গিয়ে আপনারা দুজনে কল্পনাকে স্মরণ করুন। একাগ্র হয়ে দাবি করুন তাঁর আবির্ভাব। আপনারা দুজনে "যা-খুশি" গুলি খেয়েছেন, মনে হয় আপনাদের দাবি ফলপ্রসূ হবে। কল্পনা আসবেন এবং আপনাদের সমস্যার সমাধানও করবেন।

জিরো রুমে পাশাপাশি দুটি নলের মধ্যে বসে সরু আর মোটা কল্পনার ধ্যানে মগ্ন হয়ে ছিলেন। অনেকক্ষণ কেটে গেল, কিন্তু কোনো ফল হল না। সরু বললেন, "মোটা একাগ্রভাবে ভাবছ তো?" মোটা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন— "না ভাই একাগ্রভাবে ভাবতে পাচ্ছি না। ফুটকির মুখটা বারবার মনে ভেসে উঠছে—"

"তাহলেই সেরেছে! ও মেয়ে ডোবাবে তোমাকে"

"তুমি একাগ্র হতে পেরেছ!"

"না, পারছি কই। কেবলি মনে হচ্ছে সেই নস্যির মুখোশটা আর একবার পরলে হত। নেশাটা ফিকে হয়ে এসেছে—"

"এই মাটি করেছে—"

"শুধু মাটি নয়, গোবর-মেশানো মাটি। এখন কি করা যায় বলতো—"

মোটা বলল— "নল থেকে বেরিয়ে সনাতন পদ্ধতিতে মাটিতে সুখাসনে বসে ধ্যান করি এস। ধ্যান মানে নাম জপ। কলিকালে আমাদের মত সাধারণ মানুষ ধ্যান করতে পারে না। মন বারবার বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এসো আমরা জপ শুরু করি—"

"ঠিক বলেছ—"

দুজনে নল থেকে বেরিয়ে মেঝেতে বসলেন।

সরু বললেন—"কি মন্ত্র জপ করি বলতো—"

"মনে মনে বারবার বল, কল্পনা এসো, কল্পনা এসো, কল্পনা এসো—"

"ওর সঙ্গে একটা 'দোহাই' জুড়ে দিলে কেমন হয়"

"বড্ড বড় হয়ে যাবে। জপের মন্ত্র যত ছোট হয়, ততই ভালো"

"বেশ"

নিমীলিত নয়নে জপ করে যেতে লাগলেন দুজনে। তাদের মনে হতে লাগল যুগ যুগান্তর পার হয়ে যাচ্ছে।

"আমি এসেছি—"

দুজনেই চোখ খুলে দেখলেন সেই অনিন্দ্যকান্তি কিশোরটি এসে দাঁড়িয়েছে—। মুখে মৃদু হাসি। সরু মোটাকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই সে বললে— "দুটো খবরও এনেছি। সোহাগা ইন্দ্রের শচী হয়েছে। আর এ খবর পেয়ে আপনাদের নহুষ চলে গেছে পৌরাণিক যুগে। সেখানে গিয়ে সে হয়েছে চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুষ। তপস্যা করছে ইন্দ্রত্ব লাভ করবে বলে। ইন্দ্রত্ব লাভ করলেই সে শচীকে দখল করবে এই তার ধারণা হয়েছে—

"পৌরাণিক যুগে সে গেল কি করে?"

"আমিই তাকে দিয়ে এসেছি। এখন আপনারা কি করবেন বলুন। ইন্দ্রের নাগাল সহজে পাবেন না। তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন। সোহাগাও তাঁর সঙ্গে আছেন সম্ভবত। আপনারা বাড়ি ফিরে যাবেন, না পৌরাণিক যুগে যাবেন?"

"রামঃ, বাড়ি ফিরে কি করব। সেখানে গিয়ে সেই তো চর্বিত-চর্বণ করতে হবে। সেই খবরের কাগজ, সেই র‍্যাশন, সেই গদি নিয়ে নেতাদের রেষারেষি, সেই বান, সেই মড়ক, সেই দুর্ভিক্ষ, সেই বিক্ষোভ, সেই মীটিং। না, বাড়ি ফিরব না। পৌরাণিক যুগেই যাব। কিন্তু যাব কি করে, হাতে গুলতি দেখছি না তো।"

"পৌরাণিক যুগে গুলতি চড়ে যাওয়া যায় না। গর্তের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। সমস্ত প্রাচীন অনুসন্ধান গর্ত খুঁড়ে হয়। সেখানে যদি যেতে চান গর্তের ভিতর দিয়ে যেতে হবে—"

"ও বাবা, তাই না কি? গর্ত কোথায় পাব? এখানে তো সব সোনা দিয়ে বাঁধানো। এরা গর্ত খুঁড়তে দেবে কি! ধেৎ ধেৎ করে তেড়ে আসবে—"

"আপনারা যদি চান, আমিই গর্ত হয়ে যাব। আমার ভেতরই ঢুকে পড়বেন আপনারা।"

"পারবেন। কিন্তু আপনাকে একটা বিষয় সাবধান করে দিচ্ছি। পৌরাণিক যুগে হিড়িম্বারা আছে। তারা মোটা মানুষ পছন্দ করে। ভীমসেন মোটাসোটা ছিল বলেই একজন হিড়িম্বা তাঁকে পছন্দ করেছিল—"

"কি যে বলেন—"

লজ্জিত হয়ে পড়লেন মোটা।

সরু বললেন—"ফুটকি এসে জুটবে না তো সেখানে।"

"পরলোক থেকে পৌরাণিক লোকে সহজে যাওয়া যায়। তবে তিনি বোধহয় আসবেন না। বাতে খুব ভুগছেন—"

"তাই নাকি"—আকুল হয়ে উঠলেন মোটা—"তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারেন একবার। আহা বাতে ভুগছে। আমিই যাব তার কাছে—"

"আমিই যাব তার কাছে"—মুখ ভেংচে বলে উঠলেন সরু— "তুমি যাবে কেন? গেলেই কি সে তোমায় চিনতে পারবে? খেয়ে খেয়ে তো হাতির মতো হয়েছ—"

কল্পনা বলল—"ফুটকিকেও আপনি চিনতে পারবেন না। মাথার সামনে টাক পড়েছে। দাঁত নেই, গাল তুবড়ে গেছে, মুখময় মেচেতা, দুটো হাঁটুই ফোলা, জগদম্বার কাঁধে হাত রেখে অতি কষ্টে চলা-ফেরা করেন—"

"তাহলে—"

ইতস্তত করতে লাগলেন মোটা।

সরু বললেন—"তাহলে শুনবে? অথরিটি কোট করছি। কবিগুরুর কথা—ফুরায় যা দে রে ফুরাতে ভ্রষ্ট মালার ছিন্ন কুসুম ফিরে যাসনে কো কুড়াতে। ফরগেট ফুটকি। ভুলতে না পার স্মৃতিলোকের ফুট্‌কিকেই বারবার নিরীক্ষণ কর না বাবা। বখেড়া বাধাচ্ছ কেন। বেরিয়েছি আমরা সোহাগার খোঁজে মাঝ রাস্তায় তুমি ফুটকি ফুটকি করে হেদিয়ে পড়ছ, এর কোনো মানে হয়?"

কল্পনা বললে—"আমার কিন্তু বেশি সময় নেই। আপনারা প্রস্তুত হোন। এখনই আমি রূপান্তরিত হয়ে আপনাদের পৌরাণিক লোকে পৌঁছে দেব।"

"সেখানে গিয়েই নহুষের দেখা পাব তো?"

"খুঁজতে হবে। পৌরাণিক যুগ প্রকাণ্ড যুগ। অনেক জটিলতা সেখানে। এক একজনের একাধিক নাম। একাধিক লোকের এক নাম। চেহারাও নানারকম। খুঁজতে হবে। খুঁজলে পেয়ে যাবেন।"

"আপনি যদি আমাদের সঙ্গে থাকতেন বড় ভালো হত"

"আমার সময় নেই। আমাকে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ, স্বর্গ-মর্ত্য পাতাল সব জায়গায় ঘুরতে হবে। মর্ত্যে এখন কবিরা, ইলেকশন নেতারা, বিজ্ঞানীরা প্রণয়ী প্রণয়িনীরা ক্রমাগত ডাকাডাকি করছেন আমাকে। সেইজন্যে আপনাদের পৌরাণিক যুগে পৌঁছে দিয়েই আমি অন্তর্ধান করব। আপনাদের সঙ্গে থাকতে পারব না। এবার আপনারা প্রস্তুত হোন, আমি গর্ত হয়ে যাচ্ছি। গর্ত হলেই তার ভিতর ঢুকে পড়ুন আপনারা। আসুন—"

নিমেষের মধ্যে কল্পনা বিরাট একটা পাথরে রূপান্তরিত হয়ে গেল। রূপান্তরিত হয়েই ফেটে গেল সশব্দে। গহ্বর বেরিয়ে পড়ল একটা।

"কি কাণ্ড! আমার কি মনে হচ্ছে বলব?"

সরু বললেন।

"বল"

"আমরা দুজনেই বোধ হয় পাগল হয়ে গেছি।"

"তোমার কথা বলতে পারব না। আমি কিন্তু পাগল হইনি। তুমিও হওনি। আমাদের দুজনেরই ক্ষিধে পেয়েছিল। পাগলদের কখনও ক্ষিদে পায় না। নস্যি নেবার ইচ্ছে হয় না—"

"দেখ, যা দেখছি তাতে মনে হচ্ছে সব হয়। সব হওয়া সম্ভব। যাক গে ওসব কথা। ওই গর্তে ঢুকবে?"

"ঢুকব বই কি। তুমি একটু উঁকি মেরে দেখ না।"

সরু উঁকি মেরে দেখলেন।

"ভিতরে সিঁড়ি আছে দেখছি। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হবে। তাহলে এস আর দেরি কোরো না। দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা। দেখো, মাথা বাঁচিয়ে।"

ঢুকে পড়লো তাঁরা গর্তের মধ্যে।

হামাগুড়ি দিয়েই অগ্রসর হতে লাগলেন সিঁড়িগুলোর দিকে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হতে লাগল একটা। সিঁড়িগুলো সরে সরে যেতে লাগল তাঁদের কাছ থেকে। সরু বললেন, "ও মোটা, ও যে দেখছি মরীচিকা সিঁড়ি! কাছে গেলেই সরে যাচ্ছে। এদের নাগাল পাওয়া যাবে না—"

মোটা হাঁস-ফাঁস করছিলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "সোহাগাই মারবে আমাদের। আমরা দুজনেই বুড়ো হয়েছি। কিন্তু এখনও মায়ার লল্‌কানিতে লটপটিয়ে যাচ্ছি। শঙ্করাচার্য পড়েছি, কিন্তু উপলব্ধি করিনি। সবই যে মায়া, মায়াই যে যত অনর্থের মূল এ কথা জেনেছি কিন্তু বুঝিনি। জয় শঙ্কর, জয় শঙ্কর বাঁচাও আমাদের—"

শঙ্করের নাম উচ্চারণ করবামাত্র সিঁড়িগুলো এগিয়ে এল কাছে। দুজনেই অবাক হয়ে গেলেন।

সরু বললেন—"নাম-মাহাত্ম্যের এ রকম প্রমাণ আগে পাইনি ভাই! চল আর দেরি নয়। জয় শঙ্কর, জয় শঙ্কর—"

তর তর করে নেমে গেলেন দুজনে।

পৌরাণিক যুগে পৌঁছে দেখলেন, চারদিক কুয়াশায় ঢাকা। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছু দেখা যাচ্ছে না।

শরতের মেঘ যেন নেমেছে আদিগন্ত, সাদা প্রাচীরের মত ঘিরে আছ সব। দৃষ্টি আটকে যাচ্ছে। ধোনা তুলো যেন স্তূপীকৃত হয়ে আছে চারদিকে।

"এ যে নতুন রকম প্যাঁচে পড়া গেল হে।"

"কুয়াশা ঠেলেই আস্তে আস্তে এগোনো যাবে—"

"সামনে যদি গর্ত-টর্ত থাকে—"

"তাহলে?"

"আরে একটু দম নিতে দাও না। হড়বড় করছ কেন"

হঠাৎ এক জায়গায় কুয়াশা নানাবর্ণে রঞ্জিত হয়ে উঠল।

"চল, ওই দিকেই যাওয়া যাক।"

গিয়ে দেখলেন সপ্তবর্ণ পরিবেষ্টিত হয়ে এক দিব্যকান্তি যুবক দাঁড়িয়ে আছেন।

মোটা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন তার দিকে।

সরু কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে ইঙ্গিত করলেন—প্রণাম কর।

নিজেও প্রণত হলেন তিনি। মোটা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। পৌরাণিক কায়দায় তিনি সম্বোধন করলেন তাঁকে।

"মহাভাগ, আপনার দর্শন পেয়ে কৃতার্থ হলাম আমরা। আমাদের দুর্ভাগ্য আপনার সম্যক পরিচয় আমরা জানি না। এ দেশে আমরা আগন্তুক। আত্মপরিচয় দিয়ে অনুগৃহীত করুন আমাদের।"

"আমি ইন্দ্রধনু"

"যে ইন্দ্রধনু আমরা আকাশে দেখতে পাই?"

সরু কণ্ঠস্বরকে সশ্রদ্ধ করবার চেষ্টা করলেন।

"যেটা দেখতে পান সেটা আমার নকল। মেঘ আর আলোর চাতুরি। আমি সেই ইন্দ্রধনু যা মহর্ষি অগস্ত্য রামকে উপহার দিয়েছিলেন তাঁর বনবাসকালে। যে ইন্দ্রধনু দিয়ে রাম রাবণকে নিধন করেন—আমি সেই ইন্দ্রধনু। সুরপতি ইন্দ্র তাঁর সমস্ত শক্তি আমার ভিতর সঞ্চারিত করে মাতলির হাত দিয়ে যাকে পাঠিয়েছিলেন রামচন্দ্রের কাছে, আমি সেই ইন্দ্রধনু। কিন্তু আমি অপূর্ণ—"

তাঁর অঙ্গের সপ্তবর্ণ আকুলতায় যেন কাঁপতে লাগল। লকলক করতে লাগল শিখার মতো।

ভয় পেয়ে গেলেন দুজনেই।

ইন্দ্রধনু বলতে লাগলেন—"আমার মধ্যে কোটি কোটি বর্ণের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমি প্রকট করতে পেরেছি মাত্র সাতটিকে। বাকিগুলি সূক্ষ্ম কল্পনা-রূপে ঘুরে বেড়াচ্ছে মহাশূন্যে। আমি সেই চোখের অপেক্ষায় আছি যে সবগুলিকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে। সেই মহাচক্ষুষ্মান মহাপুরুষকে আমি খুঁজছি—"

"নহুষ কোথায় আছে এখানে বলতে পারেন?"

"না। আমার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত জিজ্ঞাসা, সমস্ত জ্ঞান একমুখী হয়ে অন্বেষণ করছে সেই দিব্যদৃষ্টিপূর্ণ মহাত্মাকে যিনি আমার পূর্ণরূপ দেখতে পাবেন, যিনি আমার স্বরূপ প্রচার করবেন উদাত্ত কণ্ঠে। আমি আর কিছু জানি না আর কিছু জানতেও চাই না—"

সপ্তবর্ণ বিকিরণ করতে করতে চলে গেলেন ইন্দ্রধনু।

সরু বললেন, "ওর পিছু পিছু যাবে?"

"গিয়ে লাভ হবে কি—"

অন্তর্হিত হলেন ইন্দ্রধনু। তাঁর আর চিহ্নমাত্র রইল না কোথাও।

"ওই দেখ, ওই দেখ, ওটা কি—!"

স্বর্ণদ্যুতি চকমক করে উঠল কুয়াশার পটভূমিকায়, মনে হল স্বর্ণবিদ্যুৎ জাল যেন ঘন ঘন কম্পিত হচ্ছে।

একটু পরে সেটা স্থির হল। তখন বোঝা গেল ওটা সোনার হরিণ। সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন সরু মোটা দুজনেই। নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন। হরিণ নিজেই কথা কইল।

"আপনাদের চোখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে আপনারা আমাকে চিনি-চিনি করেও চিনতে পারছেন না। আপনাদের আন্দাজ ভুল হয়নি। আমি রামায়ণের সেই মারীচ, সোনার হরিণ সেজে সীতাকে ভোলাতে গিয়েছিলাম। কিন্তু রাম-ভক্ত বাল্মীকি একটা ভুল খবর লিখেছেন তাঁর রামায়ণে। রামের বাণে আমি মরিনি, আমার মুক্তিও হয়নি। রাম আমার মা তাড়কাকে বধ করেছিল, সে হত্যার প্রতিশোধ নেব বলে আমি বেঁচে আছি। রামকেই আমি খুঁজছি, রামই আমার ধ্যানজ্ঞান—"

"ভারতবর্ষে আজকাল রাম-রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হয়েছে শুনেছি, সেখানে যদি যান রামের দেখা পেতে পারেন—"

"এ যুগের ভারতবর্ষেও আমি গেছি। সেখানে কালোবাজারি আর স্যাকরারা আমাকে ধরবার জন্যে নানারকম ফাঁদও পেতেছিল। কিন্তু যে রামকে আমি খুঁজছি সে রাম সেখানে নেই। আসল রামকে, সীতাপতি রামকে, রাবণারি রামকে, আমার মাকে যিনি বধ করেছিলেন সেই রামকে আমি

খুঁজে বার করবই—খুঁজে বার করবই—"

এক লম্ফে সোনার হরিণ কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"শুনুন, শুনুন, নহুষ কোথায় আছে বলতে পারেন?"

কুয়াশার ভিতর থেকে হরিণ উত্তর দিল।

"না। আমি রাম ছাড়া আর কাউকে চিনি না। চিনতে চাইও না—"

কুয়াশার বুকে আর একবার স্বর্ণবিদ্যুৎ ঝকমক করে উঠল। মায়ামৃগ অন্তর্ধান করল বিদ্যুদ্বেগে।

"মোটা, এ তো ভারি বিপদে পড়া গেল দেখছি! এই কুয়াশার মধ্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব আমরা। আস্তে আস্তে এগোনো যাক চল—দাঁড়াও দাঁড়াও—"

সরু কপালের উপর হাত দিয়ে চারদিক পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

"ওই দূরে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে—"

"খুব ক্ষিদে পেয়েছে ভাই। ওই গর্তের ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে—"

"চল ওই ধোঁয়া লক্ষ করেই যাওয়া যাক। হয়তো কোনো হালুইকরের দোকান আছে—"

মোটা ভ্রূকুঞ্চিত করে দেখলেন দূরে একটা কুজ্ঝটিকা-স্তূপের উপর থেকে ধোঁয়া উড়ছে।

"বেশ দূর মনে হচ্ছে।"

"যত দূরই হোক, ওই দিকেই যেতে হবে। ক্ষিধে আমারও পেয়েছে। তাছাড়া নস্যি নিতেও ইচ্ছে করছে। স্বাভাবিক ভদ্র দু একজনের নাগাল পেলেই হবে—চল।"

"একটা কথা বলব?"

"কি আবার"

"হাত ধরাধরি করে যাই দুজনে। যদি পড়ে-টড়ে যাই—"

"তুমি পড়লে কি আমি তোমাকে সামলাতে পারব?"

"তবু ধর—"

হাত ধরাধরি করেই দুজন অগ্রসর হতে লাগলেন কুয়াশার ভিতর দিয়ে। পথ সুগম নয়। প্রস্তরাকীর্ণ। মাঝে মাঝে বড় বড় পাথরও আছে।

অবশেষে তাঁরা কুয়াশা পেরিয়ে যেখানে গিয়ে হাজির হলেন সেখানে দেখলেন একটি ছোট বাড়ির বারান্দায় বসে একটি বৃদ্ধ মুনিগোছের লোক পরোটা সেঁকছেন। মুনি খর্বকায়। মাথার চুলে এবং দাড়িতে খাবছা খাবছা টাক পড়েছে। মুনি নিবিষ্টচিত্তে পরোটা সেঁকছিলেন, ওঁদের দেখতেই পেলেন না প্রথমে। মোটা গলা-খাঁকারি দিতে চোখ তুলে চাইলেন। তখন তাঁরা দুজনেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন তাঁকে।

"কে আপনারা—"

"আমরা আগন্তুক—"

"কি চান—"

"বড়ই ক্ষুধার্ত হয়েছি দুজনে। এখানে কোথায় খাবার পাওয়া যায় যদি বলে দেন দয়া করে—"

"উপবেশন করুন আপনারা—"

তাঁরা বসতেই দুটি ভূর্জপত্র এগিয়ে দিলেন তিনি তাঁদের দিকে এবং যে কটি পরোটা সেঁকেছিলেন

সবগুলি দিয়ে দিলেন তাঁদের। তারপর ঘরের দিকে বললেন, "লোপা, এদের চরু আর শূল্যপক্ক বরাহমাংস দিয়ে দাও।

ভিতর থেকে প্রশ্ন এল—"কাদের—"

"বেরিয়ে দেখ, অতিথি এসেছেন"

অপরূপ রূপসী লোপামুদ্রা বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে অভিভূত হয়ে পড়লেন দুজনেই। এ রকম একটি রূপসী যে ওই কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে আসবেন তা প্রত্যাশা করেননি তাঁরা। বল্কল পরিধান করেছিলেন বলে তাঁর শরীরও প্রায় অনাবৃত। হাঁ করে চেয়ে রইলেন মোটা।

রূপসীর চোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা গেল।

বললেন—"সব পরোটাগুলি দিয়ে দিয়েছ দেখছি—"

"চরু আর মাংস যা আছে তাও দিয়ে দাও।"

"তাহলে আমরা কি খাব"

"আপাতত বায়ু ভক্ষণ করে থাকতে হবে। এঁরা ক্ষুধার্ত অতিথি, এঁদের সৎকার আগে করতে হবে।"

মোটা বললেন, "মহর্ষি আমরা ক্ষুধার্ত বটে কিন্তু অভদ্র নই—"

সরু বললেন, "না, আপনাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে আমরা ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারব না। আপনি মহৎ এবং কৃপালু, আপনার মহত্ত্বের সুবিধা নিয়ে আপনাদের অসুবিধায় ফেলব না আমরা। আপনার পরিচয় দিয়ে কৃতার্থ করুন আমাদের। আমরা আমাদের নাতি নহুষকে খুঁজতে এখানে এসেছি। সে পালিয়ে এসেছে পৌরাণিক লোকে—

মুনিবরের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

বললেন—"আমার কর্তব্য কি তা আমি জানি। আপনাদের মৌখিক ভদ্রতা আমাকে কর্তব্য থেকে বিচলিত করতে পারবে না। আপনারা আগে ক্ষুন্নিবৃত্তি করুন। লোপা, এঁদের পরিচর্যা কর—"

মোটা আবার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সরু চোখের ইশারায় বারণ করলেন তাঁকে। তাঁর ভয় হল, মুনি-ঋষি লোক, হঠাৎ যদি ক্রোধান্বিত হয়ে অভিশাপ দিয়ে বসেন তাহলে আর এক বিপদ হবে।

লোপামুদ্রা উৎকৃষ্ট চরু এবং শূল্যপক্ক মাংস দিয়ে গেলেন। জলও দিলেন দুটি মৃন্ময় পাত্রে। খেয়ে খুব তৃপ্তি হল দুজনেরই।

মোটা গদগদকণ্ঠে বললেন, "মা, আপনার কথা চিরদিন মনে থাকবে আমাদের।"

কিন্তু লোপামুদ্রা বিন্দুমাত্র বিগলিত হলেন না এ কথায়।

এঁটো পাতা আর মাটির পাত্র দুটি বাইরে ফেলে দিয়ে ভিতরে গিয়ে হাত ধুয়ে এলেন।

মহর্ষি তখন স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললেন—"তুমি কাম্যক বনে চলে যাও। সেখান থেকে কিছু কন্দ সংগ্রহ করে নিয়ে এস। তোমার সুপুত্র ইধ্ম যতদিন না টাকাকড়ি পাঠাচ্ছে ততদিন কন্দ খেয়েই থাকব আমরা। কন্দও উৎকৃষ্ট খাদ্য—"

এ কথায় লোপা চোখে হাত দিয়ে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন। বল্কলবসনা না হলে হয়তো চোখে আঁচল দিতেন।

মুনি বললেন, "অতিথিদের সামনে আত্মহারা হওয়াটা অশোভন। তুমি নিজেকে সংযত কর।"

লোপামুদ্রা চোখ থেকে হাত সরিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং বললেন—"মামার ছেলের নিন্দা আমি সইতে পারি না—"

মুনি একটু চটে গেলেন এবং সরু-মোটার উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে যে সব কথা বললেন তা মুনি ঋষি ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না।

"তোমার ছেলে আমারও ছেলে। তার সম্বন্ধে যা বললাম তা নিন্দা নয়, তা তার সম্বন্ধে সত্যভাষণ। স্বার্থবুদ্ধি সকলকে বিভ্রান্ত করে ইধ্মকেও করেছে। এই স্বার্থবুদ্ধিটি সে পেয়েছে তোমার কাছ থেকে। তুমি কি করেছিলে তা মনে করে দেখ। সঙ্গম-প্রার্থী হয়ে যখন তোমার কাছে গেলাম তখন তুমি কি পরিমাণ বসন-ভূষণ আমার কাছ থেকে দাবি করেছিলে তা স্মরণ কর। তোমার এই স্বার্থবুদ্ধি তোমার পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে, এখন তা নিয়ে পরিতাপ করা বৃথা। তুমি যাও, কন্দ সংগ্রহ করে আন—"

মুনি-পত্নী ভিতরে চলে গেলেন এবং একটু পরে একটি ছোট কোদাল হাতে করে বেরিয়ে গেলেন।

সরু-মোটা দুজনেই হাত জোড় করে উবু হয়ে বসেছিলেন।

মুনি বললেন— "এখানে সাধারণত কেউ আগন্তুকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে চান না। কারণ আগন্তুকরা সাধারণত লঘুচিত্ত হন। অবিশ্বাসী মন নিয়ে এখানে আসেন। কেউ আসেন আমাদের নিয়ে গবেষণা করার ছলে নিজের বিদ্যা আস্ফালন করতে। হস্তী যদি শুণ্ড আস্ফালন করে দেখতে খারাপ লাগে না। কিন্তু ছুঁচো যদি নাসার অগ্রভাগ কুঞ্চিত প্রসারিত করে হস্তী-মাহাত্ম্য লাভ করতে চায় তাহলে বড়ই হাস্যকর হয় সেটা। বিরক্তিকরও হয় অনেক সময়। কেউ কেউ আবার আসেন প্রমাণ করতে যে আমরা সত্য নই, আমরা কবিদের উদ্ভট সৃষ্টি। তৃতীয় আর একদল আমাদের কুসংস্কারের প্রতিচ্ছবি বলে প্রমাণ করতে চান। অর্থাৎ আপনাদের ভাষায় যাদের ফাজিল ফক্কোড় ডেঁপো বলে তারাই আসে এখানে। এইসব কারণে আমরা তাদের প্রায় আমল দিই না। একমাত্র বিশ্বাসের মুকুরেই আমাদের সত্যরূপ দেখা যায়। সে বিশ্বাস কি আছে আপনাদের?"

সরু বললেন, "আছে—"

"কি করে বুঝব তা"

"আমরা দুজনেই মূর্খ এবং স্বল্পবুদ্ধি। বিশ্বাসই আমাদের একমাত্র সম্বল। তাছাড়া এখন বিপদে পড়েছি, বিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরে আছি তাই, কারণ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার সামর্থ্য আমাদের নেই। ভগবান দয়া করলেই নহুষকে আমরা খুঁজে পাব। ভগবানই বোধহয় আপনার মত মহাপুরুষের সান্নিধ্যে আমাদের এনে দিয়েছেন।"

"আপনাদের চোখ মুখ দেখে আমারও মনে হয়েছিল আপনারা লঘুচিত্ত নন। তাই আপনাদের প্রশ্রয় দিয়েছিলাম।"

"আপনার পরিচয় দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করুন।"

"সত্যি জানতে চান?"

"নিশ্চয়। দয়া করে বলুন—"

"আমি মিত্র-বরুণের পুত্র ঘটোদ্ভব অগস্ত্য। এককালে অনেক কিছু করেছি। সমুদ্রশোষণ করেছি, বিন্ধ্য পর্বতকে নুইয়েছি, বাতাপিকে হজম করেছি, সদ্‌গতি-লোলুপ পূর্বপুরুষদের মুক্তির জন্য বিবাহ

করেছি। কোনো কুমারীকে পছন্দ না হওয়াতে লোপামুদ্রাকে সৃজনও করেছি পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর সৌন্দর্য আহরণ করে। তার গর্ভে উৎপন্ন করেছি ইধ্‌মকে। কোনো কোনো গবেষক এর নাম দিয়েছেন দৃঢ়স্যু। কিন্তু ওটা ভুল, আমি ওর ইধ্মবাহ নামই রেখেছিলাম। সংক্ষেপে ইধু বলে ডাকি। নক্ষত্রলোকে বাস করেছি অনেকদিন। দক্ষিণ আকাশে আমার নামে চিহ্নিত একটি নক্ষত্রও আছে এখনও। আমি কিন্তু এখন এই ছোট অগস্ত্য আশ্রম বানিয়ে এখানে আছি। এই আশ্রমে স্বয়ং রামচন্দ্র এসেছিলেন। তাঁকে আমি বৈষ্ণবধনু, অক্ষয় তূণীর এবং আরও নানারকম অস্ত্র দিয়েছিলাম—"

এই পর্যন্ত বলে মুনি একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। নীরব হয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর নিশ্বাস ফেলে বললেন—"জীবনে করেছি অনেক কিছু। তপস্যালব্ধ শক্তি সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর তপস্যা করতে ইচ্ছে করে না। পেরে উঠি না, শরীরে কুলোয় না। এখন ইধুর ভরসাতেই থাকি। কিন্তু সে সব সময় টাকা-কড়ি পাঠাতে পারে না। শুনছি একটা অপ্সরার পাল্লায় পড়েছে। সবই মেনে নিয়েছি। যখন টাকাকড়ি পাঠায় তখন পরোটা মাংস চরু খাই। যখন পাঠায় না, তখন কন্দ খেয়ে থাকি।"

মুনিবর নীরব হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন—"আপনাদের নাতির নাম কি বললেন?"

"নহুষ"

"নহুষ? আমি চন্দ্রবংশের এক নহুষকে চিনতাম। তার পালকি বয়েছিলাম দিনকতক। আপনাদের নহুষ কি পালকি চড়ে?"

"তাতো জানি না। এখানে এসে সে যে কি করছে তা আমাদের অজ্ঞাত—এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?"

"চড়লে আমি তার পালকি-বাহক হতে পারি। বড় টানাটানির মধ্যে আছি।"

"কিন্তু তাকে পাব কোথায়?"

"দাঁড়ান একটু ধ্যানে বসি। ধ্যানযোগে খবর পেয়ে যাব তার"

চোখ বুজে ধ্যানস্থ হলেন অগস্ত্য।

তাঁর সামনে চোখ বুজে হাতজোড় করে গদগদ হয়ে বসে রইলেন সরু আর মোটা। কিন্তু বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারলেন না। একটু পরে দুজনেই চোখ পিটপিট করতে লাগল। সরু মোটার কাছে আর একটু ঘেঁষে এসে ফিস ফিস করে বললে—"মহর্ষির কাছে জেনে নিতে হবে এখানের মাদ্রাজি নস্যি কোথায় পাওয়া যায়—"

মোটা বললে—"চুপ—"

আবার দুজনের চোখ বুজে গেল।

অনেকক্ষণ পরে ধ্যান ভঙ্গ হল অগস্ত্যর।

বললেন, "দেখুন, আপনাদের নহুষ নকল-নহুষ হয়ে তপস্যা করছে ম্লেচ্ছ অঞ্চলে। সে কি ম্লেচ্ছ বিদ্যায় পারদর্শী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। সে ফিজিক্সে ডি. এস. সি.। সোহাগার সঙ্গে তার বিয়ে হবার ঠিকঠাক। এমন সময় সোহাগার কি মতিচ্ছন্ন হল সে চলে গেল আগামী যুগে। সেখানে আমরা গিয়েছিলাম। সেখানে শুনলাম ইন্দ্র তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গেছে—"

"ইন্দ্রের স্বভাব ওইরকমই হয়েছে আজকাল। বৈদিক যুগে তিনি মহান দেবতা ছিলেন, পৌরাণিক যুগে তিনি হয়েছেন ইন্দ্রিয়াসক্ত। তবে ভাববেন না, টিট্ হয়ে যাবেন শেষ পর্যন্ত। বিরাট শক্তি আর অগাধ ঐশ্বর্য মানুষকে ঠিক থাকতে দেয় না। যিনি আসল নহুষ ছিলেন—যাঁর নকল আপনাদের নাতি হয়েছেন এখন—তিনি অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও প্রথম প্রথম খুব আত্মসংযম করে ভোগবিলাস থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। এই জন্যেই তিনি ইন্দ্রত্ব লাভ করেছিলেন কিছু দিনের জন্য। কিন্তু ইন্দ্রত্ব লাভ করেই তাঁর চারিত্রিক অধঃপতন হল। তিনি শচীকে কামনা করতে লাগলেন। শচী খুব চালাক মেয়ে। সে একটি কৌশল করল। বলল আপনি যদি ঋষি-বাহিত যানে আমার কাছে আসেন তবেই আমি আপনার আলিঙ্গনে ধরা দেব। নহুষ যে তপোবলে কতটা শক্তি অর্জন করেছিল তার ধারণা ছিল না শচীর। সে ভেবেছিল কোনো ঋষি তার পালকি বইতে রাজি হবে না। কিন্তু ঋষিরা পুণ্যবানের বশ। ঋষিদের ডাক পড়ল। অতবড় পুণ্যবান বীর্যবান রাজার আহ্বানকে উপেক্ষা করা অনুচিত মনে করলেন ঋষিরা। আমারও ডাক পড়েছিল। কিন্তু আমার যাবার খুব ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু আদেশ অমান্য করতে পারলাম না, কারণ নহুষ পুণ্যবান, যতক্ষণ তার কোনো খুঁত না ধরা পড়ে ততক্ষণ তার আহ্বান উপেক্ষা করা শক্ত। গেলাম। নহুষ বললেন, আমি শচীর কাছে যাব। আমার শিবিকা তোমাদের বহন করতে হবে। খুব রাগ হল মনে মনে। কিন্তু উপায় নেই। শেষে তুলতেই হল পালকি। নহুষ অন্যান্য ঋষিদের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করতে লাগলেন। শাস্ত্রজ্ঞ লোক ছিলেন তিনি, যদিও চরিত্রটি শেষ পর্যন্ত ঠিক রাখতে পারেননি। শাস্ত্র আলোচনা করতে করতে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন খুব। উত্তেজনার কারণ অঙ্গিরা বললেন—এ সময় শাস্ত্র আলোচনায় তিনি যোগ দিতে অনিচ্ছুক। কারণ পরস্ত্রীর কাছে অভিসার করার সময় শাস্ত্র আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক এবং অশোভন বলে মনে করেন তিনি। রেগে হাত পা ছুঁড়তে লাগলেন নহুষ। আমার মাথায় এসে লাগল একটা লাথি। আমি ছুতো পেয়ে গেলাম। অভিশাপ দিলাম সঙ্গে সঙ্গে। নহুষ অজগর সাপ হয়ে গেল। আর ইন্দ্র শুনেছি ব্রহ্মহত্যা করে গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে এখন—"

চুপ করলেন অগস্ত্য।

"আমাদের নহুষ তাহলে—"

"আপনাদের নহুষ নকল-নহুষ। তবু আসল নহুষের মত কিছু কিছু দুর্ভোগ ভুগতে হবে ওকে। স্ত্রীলোকের পাল্লায় যে-ই পড়ুক তার নিস্তার নেই। আমি পুত্রার্থে বিয়ে করেছিলাম, আমার হাড়ির হাল হয়েছে। তবে একটা বাঁচোয়া, আপনাদের নহুষ পরস্ত্রীকে কামনা করছে না। করছে নিজেরই ভাবী বধূকে। তবু ভুগতে হবে। আপনারা ম্লেচ্ছ অঞ্চলে চলে যান। সেখানে তার দেখা পেয়ে যাবেন। একটা কথা মনে রাখবেন তার পালকির যদি দরকার হয় তাহলে আমি বেয়ারা হতে রাজি আছি। তবে আমার আর লোপার খাই-খরচটা দিতে হবে। পালকিও আমি জোগাড় করতে পারব—"

"তার পালকির দরকার কেন হবে—"

"মনে হচ্ছে যেন হবে।"

মোটা বললেন, "ম্লেচ্ছ-অঞ্চল কোন দিকে তা আমরা চিনব কি করে? আমরা পথঘাট তো কিছুই চিনি না।"

"এখানকার পথঘাট দুর্গম। নদী অরণ্য পর্বত চারিদিকে ছড়ান"

সরু অনুনয় করে বললেন, "আপনি একটা ব্যবস্থা করে দিন মহর্ষি। আপনি কৃপা করলে—"

"খরচ করতে পারবেন?"

"পারব। কিন্তু আমার কাছে পৌরাণিক মুদ্রা নেই। আধুনিক যুগের একটা চেকবুক সঙ্গে এনেছি। চেক দিতে পারি। তাতে কি চলবে।"

"হনুমানকে ডাকি তাহলে। আপনাদের আধুনিক যুগের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। সব যুগের সঙ্গেই আছে। খুব চৌকশ লোক। বুদ্ধিও আছে, শক্তিও আছে অসীম। ও যদি আপনাদের বহন করে নিয়ে যেতে রাজি হয় তাহলে আর কোনো ভাবনাই থাকবে না। ও আপনাদের কাঁধে করে নিয়ে যাবে। তবে বিনা পয়সায় ও কিছু করতে চায় না আজকাল।"

"আমরা পারিশ্রমিক দেব ওঁকে। আপনি ওঁকে খবর দিন। উনি কোথায় থাকেন।"

অগস্ত্য এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে হাত তুলে তুড়ি দিলেন দু বার।

সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হলেন মহাবীর হনুমান।

অগস্ত্যকে প্রণাম করে বললেন, "আপনার কি প্রয়োজন মহর্ষি, আমাকে স্মরণ করেছেন কেন"

"আমার প্রয়োজনের জন্যে স্মরণ করিনি। স্মরণ করেছি এই দুটি ভদ্রলোকের জন্য। এঁরা আধুনিক মর্ত্যলোক থেকে এসেছেন। নাতিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সে ছোকরা আছে ম্লেচ্ছ অঞ্চলে। কিন্তু এঁরা এখানকার পথঘাট চেনেন না। এঁদের কাঁধে করে তুমি পৌঁছে দিতে পারবে? এঁরা তোমার পারিশ্রমিক দেবেন। একটা চেক দেবেন বলছেন—"

"চেক? কোন ব্যাঙ্কে—"

"স্টেট ব্যাঙ্কে—"

"হ্যাঁ ভালো ব্যাঙ্ক। নিতে পারি চেক—"

মোটা চেক বুক বার করলেন পকেট থেকে। ফাউন্টেন পেনটাও।

"কত টাকার চেক দেব।"

"হাজার টাকার। আজকাল টাকার দাম কিই বা বলুন।"

"ঠিক বলেছেন। আগেকার এক টাকা এখন দশ টাকার সমান। হাজার টাকাই দিচ্ছি—"

এক হাজার টাকার চেক লিখে দিলেন মোটা।

হনুমান বললে—"আমি চললুম—"

"কোথা—"

"চেকটা ভাঙিয়ে আমার মা অঞ্জনাকে টাকাটা দিয়ে আসি"

"তিনি কোথায় থাকেন"

"সুমেরু পর্বতে। আমার বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। একলাফে যাব, একলাফে আসব। চেকটা কার নামে দিয়েছেন—"

"শ্রীমহাবীর—"

"না না, আপনি সেল্‌ফ (self) বলে দিন। বেয়ারার চেক দেবেন আর চেকের পেছন দিকে একটা সইও করে দেবেন।"

অগস্ত্য হেসে বললেন—"মহাবীর চৌকশ লোক—"

মোটা আবার একটা চেক লিখলেন। হনুমান সেটা নিয়ে অন্তর্ধান করলেন সঙ্গে সঙ্গে।

অগস্ত্য মুগ্ধ হয়েছিলেন ফাউন্টেন পেনটি দেখে।

"বাঃ, চমৎকার কলমটি তো! ওর ভিতর বুঝি কালি থাকে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"চমৎকার, আমরা খাগের কলমে লিখেছি দোয়াতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে। সে এক দুর্গতি ছিল আমাদের সময়।"

"আপনি কলমটা নেবেন?"

"না। আজকাল আর লেখাপড়া করবার সময় পাই না। কি করব কলম নিয়ে। ঘরের কাজ কর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকি। নিজেকেই পরোটা সেঁকতে হয়—"

সরু বললেন, "মুনি-পত্নী বুঝি অন্য কাজ নিয়ে থাকেন?"

"হ্যাঁ। ওকে আটা পিষতে হয়। কন্দও খুঁড়ে আনতে হয়। শ্রমসাধ্য কাজ ওই করে সব।"

"কিন্তু আপনাদের মত ত্রিভুবন বিখ্যাত দম্পতি এত কষ্ট করে আছেন দেখে বড় আশ্চর্য লাগছে। একটি ইঙ্গিত করলেই তো অনেকে আপনাদের সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসবেন—"

"তা হয়তো আসবেন। কিন্তু আমি স্বাবলম্বী হওয়াটাকেই শ্রেয়ঃ মনে করি। জীবনে কখনও কাউকে খোশামোদ করিনি, কখনও কোনও অন্যায়কে ক্ষমা করিনা। উদ্ধত মদগর্বী লোককে শাস্তি দিয়েছি বরাবর। বৃদ্ধ বয়সে কারো সাহায্য ভিক্ষা করা অসম্ভব আমার পক্ষে। বৃদ্ধ বয়সে আমার স্বাভাবিক রক্ষাকর্তা আমার পুত্র। সে যদি নিজ কর্তব্য অবহেলা করে তার ফল সেই ভোগ করবে। আমি খাসা আছি, আমার কোনো কষ্ট নেই। কাম্যক বনে প্রচুর কন্দ পাওয়া যায়, খেতেও খুব ভালো। যদি একটু অপেক্ষা করেন আপনাদের খাওয়াব। লোপা এখুনি এসে পড়বে—কিন্তু এ কি! হনুমান যে ফিরে এল! খুব শিগগির এসেছে তো! বাহাদুর বটে—"

একলম্ফে মহাবীর এসে হাজির হলেন।

"চলুন এবার। আমার কাঁধে চড়ে যাবেন তো।"

"যা বলবেন তাই করব---" সরু বললেন— "কিন্তু আপনার কাঁধে আমরা দুজনে চড়ব কি করে"

"শরীর বাড়াব—এই দেখুন।"

দেখতে দেখতে হনুমান দৈত্যাকৃতি হয়ে গেলেন।

"এইবার আসুন। দু কাঁধে দুজন বসুন আমার মাথা ধরে। আসুন—"

দুজনকে দুহাতে তুলে হনুমান তাঁদের কাঁধের উপর বসিয়ে দিলেন।

"মাথাটা ভালো করে ধরে থাকবেন। কারণ আমি লাফাব।"

অগস্ত্য বললেন, "রাস্তায় নানারকম দৃশ্য দেখতে পাবেন। মহাবীর, ওদের বুঝিয়ে দিও সব।"

"যে আজ্ঞে।"

তারপরই লম্ফ দিলেন মহাবীর।

আকাশ-পথে চলেছিলেন তাঁরা।

সত্যিই নানারকম দৃশ্য দেখা যেতে লাগল নীচে।

চিত্রকূট পর্বত, বধূসরা নদী, কাম্যক বন, অযোধ্যা, মিথিলা, হস্তিনাপুর, গঙ্গা যমুনা, মথুরা বৃন্দাবন কুরুক্ষেত্র, ভূগোলের নানাস্থানে অবস্থিত পৌরাণিক স্থানগুলো পাশাপাশি কে যেন সাজিয়ে রেখেছে

ছবির মতন। গ্রীস, রোম, ইজিপ্ট, এমন কি সিউমেরিয়নদের রাজত্বভূমি, টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস নদী—সব যেন আঁকা রয়েছে একটা স্বপ্নের পটভূমিকায়।

হনুমান বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন।

তন্ময় হয়ে শুনছিলেন তাঁরা।

হঠাৎ এক জায়গায় প্রচুর কোলাহল শোনা গেল। শিখা আর ধূম আবৃত করে ফেলল গগনমণ্ডলকে। অনেক নর-নারীর দেহ উৎক্ষিপ্ত হতে লাগল আকাশে। হনুমান একটু সরে ভিন্ন পথ ধরলেন।

"কি হচ্ছে ওখানে?"

"দক্ষযজ্ঞ। বীরভদ্র এখনও আসেননি। দক্ষ বারবার জন্মাচ্ছে আর বীরভদ্র তাকে বারবার ধ্বংস করছেন। ক্রমাগত চলেছে এই কাণ্ড। আপনাদের আধুনিক যুগেও ভিন্ন নামে হচ্ছে এসব। ওদিকে গিয়ে কাজ নেই। সরে যাওয়াই ভালো—"

বেশ কিছু দূর সরে গেলেন তিনি।

একটা বিরাট অরণ্য পেরিয়ে একটা নূতন দেশে হাজির হলেন তাঁরা। সামনে প্রকাণ্ড একটা পাহাড়। তারপরই সমুদ্র। তাঁরা দেখে অবাক হলেন পাহাড়ের গায়ে একটি দিব্যকান্তি তরুণ শৃঙ্খলিত অবস্থায় টাঙানো রয়েছেন। সম্পূর্ণ নগ্ন তিনি। হাত-পা পাহাড়ের সঙ্গে শৃঙ্খলিত। পাহাড়ের নীচে একটি চমৎকার বকনা গাই উর্ধ্বমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে যেন কথা বলছে যুবকটির সঙ্গে।

"এরা কে মহাবীরজি।"

সরু প্রশ্ন করলেন।

"পাহাড়ের উপর যিনি টাঙানো রয়েছেন তাঁর নাম প্রমেথিউস (Prometheus)—ইনি স্বর্গ থেকে অগ্নি এনে মানুষদের দিয়েছিলেন। এই অপরাধে গ্রীক স্বর্গের ইন্দ্র জিউস (Zeus) ওঁকে এই পাহাড়ে শৃঙ্খলিত করে রেখেছেন। রোজ সকালে একটি ঈগল পাখি এসে ওর যকৃত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় ছোকরাকে। রাত্রে যকৃতটি আবার ঠিক হয়ে যায়। সকালে আবার আসে ঈগল পাখি। কিন্তু এ যন্ত্রণা ওঁকে বেশিদিন ভোগ করতে হবে না। হারকিউলিস্ এলে উদ্ধার করবেন ওঁকে—"

মোটা বললেন, "হ্যাঁ কলেজে পড়বার সময় গল্পটা পড়েছিলাম। মনে পড়ছে। শেলী খুব চমৎকার কবিতা লিখেছিলেন প্রমেথিউসকে নিয়ে। কিন্তু ওই গরুটি কি করছে ওখানে—"

"ও গরু নয়। ও একজন রাজকুমারী। নাম আইও (Io) —জিউস ওর প্রেমে পড়েছিলেন। জিউসের স্ত্রী হেরা তাই ক্রোধান্ধ হয়ে মেয়েটির এই দুর্দশা করেছে। ওই দেখুন ছুটল আবার—"

"কি রকম—"

"যে রকম চিরকাল হয়। জিউস হেরার কাছ থেকে মেয়েটিকে লুকোতে গিয়ে নিজেই তাকে বকনায় রূপান্তরিত করেছিলেন। হেরা বকনাটিকে জিউসের কাছ থেকে চেয়ে নেয় এবং ওর পিছনে একটি সাংঘাতিক ডাঁশ মাছি লাগিয়ে দেয়। সেই ডাঁশ মাছির কামড়ের জ্বালায় বেচারি ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। ওরও মুক্তি হবে একদিন—"

মোটা বললেন—"এ গল্পটাও পড়েছি মনে হচ্ছে—"

ধমকে উঠলেন মহাবীরজী।

"গল্প গল্প করছেন কেন। কোনোটাই গল্প নয়, সবই সত্যি। আমার কথাও তো গল্পে পড়েছিলেন, কিন্তু আমি কি গল্প?"

"আজ্ঞে না। আপনি তো প্রত্যক্ষ সত্য"— সরু বলে উঠলেন তাড়াতাড়ি। মোটার দিকে চোখের ইশারায় ইঙ্গিত করলেন সে যেন আবার বেফাঁস কিছু বলে না বসে। সরুও মনে মনে ঠিক করলেন পারতপক্ষে কথা কইবেন না। হনুমানের কাঁধে চড়ে শূন্য দিয়ে যাচ্ছেন সাবধান থাকাই ভালো। একটু পরে কিন্তু তিনিই বলে উঠলেন—"ওটা কি? ওটা কি?—"

আকাশপথে একটি রূপবান যুবক হু হু করে উড়ে যাচ্ছিলেন। তার এক হাতে অদ্ভুত রকম চকচকে একটা ঢাল, অন্য হাতে শাণিত তলোয়ার। পায়ের স্যান্ডালে ডানা, কাঁধ থেকে ঝুলছে রুপোর একটা বাক্স—।

মোটাও অবাক হয়ে গেলেন দেখে।

হনুমান বললেন—"উনি পারসিউস (Parseus) মেডুসাকে বধ করতে যাচ্ছেন—"

সরুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল— "গল্পটা কি", কিন্তু তিনি সামলে নিয়ে বললেন—"ঘটনাটা কি—"

"লম্বা ঘটনা। পরে জেনে নেবেন। প্রত্যেকটি ঘটনার বর্ণনা যদি দিতে হয় তাহলে তো দম ফুরিয়ে যাবে আমার। ম্লেচ্ছ অঞ্চলে পৌঁছতেও দেরি হয়ে যাবে অনেক—"

"তাহলে থাক—"

একটি লম্ফ দিয়ে হনুমান গ্রীক অঞ্চলটা পার হয়ে গেলেন।

আবার সমুদ্র। ভূমধ্যসাগর।

বিরাট একটা নৌকো দেখা গেল। অসাধারণ নৌকো। মনে হল মুক্তো দিয়ে তৈরি বিরাট একটা ময়ূর যেন। নৌকোর মাঝিমাল্লারা পুরুষ নয়, অপরূপ বেশে সজ্জিতা যুবতী নারী সব। প্রত্যেকের হাতে রুপোর দাঁড়। নানা বেশে ভূষিতা ক্রীতদাসীরাও দাঁড়িয়ে রয়েছে নানা ভাবে। মানবী নয়, অপ্সরার দল যেন। নৌকোর সামনের দিকে সোনার একটি চাঁদোয়া দুলছে। তার নীচে মণিমাণিক্য-খচিত চমৎকার পালঙ্ক একটি। পালঙ্কের উপর নীল মখমলের তাকিয়া ঠেস দিয়ে আধা-শোয়া অবস্থায় বসে আছেন একজন মোহিনী নারী। অনিন্দ্য সুন্দরী তিনি। তাঁর পরিধানে জাফরান রঙের পোশাক। পায়ের নীচে আর আশেপাশে নানা রঙের ছোট বড় বালিশ। সমুদ্রের দিকে স্বপ্নাবিষ্ট দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছেন তিনি। অস্ট্রিচের পালক দিয়ে তৈরি পাখা দিয়ে হাওয়া করছে ক্রীতদাসীরা। ময়ূরপঙ্খী তীরবেগে এগিয়ে চলেছে, উড়ছে বেগ্‌নি রঙের রেশমী পাল।

"কে উনি—"

মোটা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

"ক্লিওপেট্রা। টারশিষের (Tarshish) দিকে চলেছেন অভিসারে। মার্ক এন্‌টনি এসেছেন সেখানে—"

সরু বললেন, 'নামটা শোনা শোনা মনে হচ্ছে। ইতিহাসটা ঠিক মনে পড়ছে না।"

"বাড়ি গিয়ে পড়ে নেবেন"

হনুমান দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

আর একটা দৃশ্য চোখে পড়ল তাঁদের।

সারি সারি শিবির সন্নিবেশিত হয়েছে সমুদ্র-সৈকতে। একটা শিবিরের সামনে সৈন্যদের ভিড়। শিবিরের ভেতর থেকে আনত নয়না একটি সুন্দরী বেরিয়ে এল। তার পিছু পিছু বেরিয়ে এল একজন উন্নত মস্তক বলিষ্ঠ যুবক। চিৎকার করে সে সৈন্যদের বলল—"তোমরা রাজার আদেশে ওকে নিতে এসেছ নিয়ে যাও। বাধা দেব না আমি। কিন্তু এর প্রতিশোধ নেব। আগামেম্‌নন্‌কে (Agamemnon) বলে দিও এ অপমান আমি সহ্য করব না। আমি যুদ্ধ থেকে নিরস্ত হলাম।"

মোটা কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

"পোশাক দেখে মনে হচ্ছে গ্রীক—"

"ঠিকই বলেছেন ওরা ম্লেচ্ছ গ্রীক। ট্রয়ের যুদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে মারামারি লাগিয়ে দিয়েছে মেয়েমানুষ নিয়ে। অ্যাকিলিসের (Achilies) কাছ থেকে ব্রাইসিস্‌কে (Briseis) কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে অ্যাগামেম্‌নন্‌। হোঁৎকা গোছের লোকটা। এর ফলও ভুগতে হয়েছিল বাছাধনকে। ফেরত দিতে হয়েছিল ব্রাইসিসকে সুদসুদ্ধ—"

"তাই নাকি—"

সরু বলে উঠলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল আরও কিছু প্রশ্ন করেন এ বিষয়ে। কিন্তু মোটা চোখের ইঙ্গিতে বারণ করলেন। হনুমান রেগে গিয়ে যদি কাঁধ-ঝাড়া দেন তাহলে সমুদ্রে পড়ে যাবেন তাঁরা। হনুমান তখন সমুদ্র পার হচ্ছিল।

সাগর পার হয়ে অনেক অরণ্য, নদী পর্বত দেখা গেল। সরু মোটা হনুমানের মাথাটি শক্ত করে ধরে বসে রইলেন টুঁ শব্দটি না করে। কিন্তু একটু পরেই যা দেখা গেল তাতে সরুর পক্ষে আত্মসম্বরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। দেখলেন একটি ল্যাংটো মেয়ে এলোচুলে মাঠামাঠি ছুটছে। আর তার পিছু পিছু ছুটছে একদল লোক। মেয়েটিকে একটু পরেই ধরে ফেলল তারা। টানতে টানতে নিয়ে গেল একটা হাটের মাঝখানে। সেখানে একটা উঁচু আড়গড়ার মত ছিল, তার ভিতর পুরে ফেললে তাকে।

"ওটা কি কাণ্ড মহাবীরজি, যদি রাগ না করেন বলুন না ব্যাপারটা খুলে—"

হনুমান ঘোঁৎ করে শব্দ করলেন একটা। কিন্তু সরুর অনুরোধ রক্ষা করলেন।

বললেন—"ব্যাবিলনের হাটে মেয়ে নিলাম হচ্ছে। ওই মেয়েটা পালাচ্ছিল তাই ধরে নিয়ে এল। কসাইরা যখন খাসি পাঁঠার দল কিনে নিয়ে যায় তখন তার থেকে একটা ছিটকে পালালে সেটাকে যেমন ধরে নিয়ে আসে অনেকটা তেমনি আর কি—"

সরু মোটা দুজনেই মাংসাশী। নিরামিষাশী হনুমানের এই শ্লেষবাক্যে একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন দুজনেই। সরু মনে মনে বললেন—'চাষা যেমন মদের স্বাদ জানে না তুই ব্যাটা বাঁদর তেমনি জানিস না মাংসের স্বাদ। মাটন রোস্ট তো কখনও খাসনি, কলা মুলো খেয়ে দিন কাটাস, বড় জোর দু একটা উকুন—"

মোটা কিন্তু হনুমানকে তৈলাক্ত করাই সমীচীন মনে করলেন।

"কত কি দেখালেন আমাদের, কত কি শিখলাম—"

"আমি মূর্খ মানুষ আমি আর আপনাদের কি শেখাতে পারি। আমি শুধু এইটুকুই জানি দেখারও শেষ নেই, শেখারও শেষ নেই। উ—প্‌—"

বিরাট একটা লম্ফ দিয়ে হনুমান সোঁ সোঁ করে উপরে উঠতে লাগলেন। টাল খেয়ে পড়ে যাবার মত অবস্থা হল সরু মোটা দুজনেরই।

"কি কাণ্ড করছেন সার।"

ইংরেজি বেরিয়ে পড়ল সরুর মুখ দিয়ে।

"মানসলোকে যাচ্ছি। আপনাদের যখন এত দেখার ইচ্ছে তখন নতুন একটা জিনিস দেখাব—আপনাদের। এর কথা পুরাণে লেখা নেই। বিশ্বকর্মা গোপনে সৃষ্টি করেছেন এটা। রোদনের যাদুঘর, আপনাদের ভাষায় মিউজিয়াম (museum) —"

একটু পরেই তাঁরা চেরাপুঞ্জীর মত একটা জায়গায় এসে উপস্থিত হলেন। ঝর ঝর শব্দে অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে সেখানে। নানা আকারের মেঘ জমে আছে চতুর্দিকে। আর নানা কণ্ঠের রোদনধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বুক-ফাটা হাহাকার সব।

হনুমান বলতে লাগলেন—"অদ্ভুত জায়গা ওটি। ওই শুনুন সত্যবানের জন্য সাবিত্রী কাঁদছে, রামের জন্য সীতা, ইন্দুমতীর জন্য অজ, শৈব্যার জন্য হরিশ্চন্দ্র, ইন্দ্রজিতের জন্য প্রমীলা, রাবণের জন্য নিকষা, হেক্‌টরের জন্য অ্যান্ড্রোম্যাচি (Andromache), সতীর জন্য শিব, কর্ণের জন্য কুন্তী, শ্রীকৃষ্ণের জন্য রাধা, লক্ষ্মণের জন্য উর্মিলা, দুষ্মন্তের জন্য শকুন্তলা, কচের জন্য দেবযানী, মৃত পঞ্চপুত্রের জন্য দ্রৌপদী, নুরজাহানের জন্য শের আফগান, দারার জন্য সাজাহান, সিরাজ-উদ্দৌলার জন্য লুৎফুন্নিসা, বুদ্ধের জন্য যশোধরা,—পৌরাণিক ঐতিহাসিক বহু কান্না এখানে একত্রিত করে রেখেছেন বিশ্বকর্মা। আমি সব ঠিক করে বলতে পারলাম না, যে কটা মনে পড়ল বললাম। এ একটা অদ্ভুত জায়গা।"

"সত্যিই অদ্ভুত—"

"এইবার তাহলে ম্লেচ্ছ অঞ্চলে যাওয়া যাক। সেখানে আপনাদের নামিয়ে দিয়ে আমি কিন্তু মক্ষিকার রূপ ধারণ করে থাকব—"

"সে কি—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ম্লেচ্ছরা হনুমান দেখলেই ধরে ফেলে আর তার শরীরের ওপর নানারকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালায়। সুতরাং আমি সাবধানে থাকতে চাই। এ অঞ্চলে পারতপক্ষে আসি না। কিন্তু মহর্ষি অগস্ত্যের আদেশ উপেক্ষা করতে পারলাম না—"

"আপনাকে তাহলে আমরা পাব কি করে"

"তিনটি তুড়ি মারবেন, সঙ্গে সঙ্গে আমি এসে হাজির হব। ভালো করে মাথাটা ধরে থাকুন। প্রচণ্ড একটা লাফ দেব এবার—"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড লাফটি দিলেন তিনি এবং অনতিবিলম্বে ম্লেচ্ছ অঞ্চলে উপনীত হলেন।

ম্লেচ্ছ অঞ্চলে পদার্পণ করে মোটা বুঝলেন তাঁরা বিলেতে এসেছেন। তিনি প্রথম যৌবনে বিলেতে গিয়েছিলেন। পথঘাট পার্ক প্রভৃতি দেখে তাঁর এ কথাটা মনে হল। কিন্তু কাছে-পিঠে কোনো লোক দেখতে পেলেন না যে জিজ্ঞেস করবেন জায়গাটার নাম কি। রাস্তার পাশে একটা সবুজ লন (lawn) ছিল, তার ওপারে হলদে রঙের বাড়ি দেখতে পেলেন একটা। সেই বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নেবেন কিনা ভাবছিলেন এমন সময় সেই বাড়িরই দরজা খুলে একটি লোক বেরিয়ে এসে হা হা করে হেসে

উঠল। সাহেবি পোশাকপরা, মাথার চুল উস্‌কো খুসকো, চোখের দৃষ্টি উদভ্রান্ত। ইংরেজিতে তিনি বললেন—"আসুন, আসুন, আসুন। আপনারা যে আসবেন তা জানতাম আমি। আমি যে বিশপ (Bishop) হয়েছি সেই খবর এনেছেন তো? রোজই প্রতীক্ষা করি কেউ না কেউ খবরটা নিয়ে আসবে। এসথার (Esther) কি কোনো খবর পাঠিয়েছে?"

সরু বললেন—"পাগল মনে হচ্ছে—"

সাহেব উচ্ছ্বসিত হয়ে দু হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন।

"আসুন, আসুন, প্লীজ স্টেপ-ইন (please, step in) —" মোটা ইতস্তত করতে লাগলেন।

সরু বললেন, "চল এগিয়ে যাই। পাগল বড় ভয়ানক জীব"

"প্লীজ কাম—"

মোটা বললেন—"দুর্গা বলে এগিয়ে তো পড়া যাক। তারপর যা হয় হবে—"

মোটা অগ্রসর হলেন। সরুকেও অগত্যা তাঁর পিছু পিছু যেতে হল।

সাহেবের সঙ্গে ইংরেজিতে কথাবার্তা হল।

আমি বাংলা তর্জমা করে দিচ্ছি।

"সাহেব জড়িয়ে ধরলেন মোটাকে। শেক হ্যান্ড করলেন সরুর সঙ্গে। তারপর বললেন, "আপনারা আসবেন তা আমি জানতাম। আমাকে বিশপ করে দিয়েছে শেষ পর্যন্ত, না? জানতাম দিতেই হবে। এস্‌থার কোনো খবর পাঠায়নি? তার ঠিকানাটা আমি হারিয়ে ফেলেছি। সে বলেছিল খবর পাঠাবে। কিন্তু এখনও পাঠায়নি। হয় তো আর কারও প্রেমে পড়ে গেছে—হা-হা-হা-হা—মেয়েমানুষদের ব্যাপার বোঝেনই তো—"

মোটা সবিনয়ে প্রশ্ন করল—"আপনার পরিচয় জানতে পারি কি?"

"আমি সামান্য লোক। নাম জোনাথন সুইফ্‌ট (Jonathan Swift)—পাদরিগিরি করতাম, বইটইও লিখেছি দু'একটা।"

মোটা বললেন—"সরু প্রণাম কর—"

উভয়েই প্রণাম করলেন সসম্ভ্রমে।

হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলেন সাহেব।

"কি ব্যাপার, এ কি কাণ্ড!"

মোটা বললেন—"আমরা ভারতবাসী। মহৎ লোককে আমরা এইভাবেই শ্রদ্ধা জানাই।"

"আপনারা ভারতবাসী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আমি বিশপ হয়েছি কি না সে খবর তাহলে তো আপনাদের জানবার কথা নয়।"

"একটা খবর কিন্তু জানি আপনি বিশপের চেয়ে অনেক বড় হয়েছেন, রাজার চেয়েও বড়—"

"কি রকম?"

"আপনি, গালিভার্স ট্র্যাভেল্‌স্‌-এর লেখক। বিশ্ব সাহিত্যে আপনার কীর্তি অক্ষয়, রসিক সমাজে আপনার সম্মান অতুলনীয়—"

হা হা করে হেসে উঠলেন সাহেব।

তারপর ভ্রূকুঞ্চিত করে ঢুকে গেলেন ঘরের ভিতরে। এক টিন বিস্কুট নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

টিনের ঢাকনা খুলে বললেন—“এগুলো কি বলুন তো।”

“বিস্কুট”

আবার হা হা করে হেসে উঠলেন তিনি।

“না, না আসল বিস্কুট নয় খ্যাতির বিস্কুট। খেলে পেট ভরে না, মুখে দিলেই হাওয়া হয়ে যায়। এই রকম খ্যাতির বিস্কুট, খ্যাতির কেক, খ্যাতির রুটি মাখন, খ্যাতির জ্যাম জেলি, খ্যাতির বীফ-স্টিক, খ্যাতির মাটন চপ্ আমার বাড়িতে রোজ এসে জমা হচ্ছে। কিন্তু আমার ক্ষিদে মিটছে না। এ সমস্ত ফাঁকি, সমস্ত ফাঁকা, সমস্ত হাওয়া। হয় তো আমি অনাহারে মরেই যেতাম, কেবল একটি জিনিস আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে—নেকটার অব মেমরি (nectar of memory) —স্মৃতির সুধা পান করে বেঁচে আছি আমি। এসথারকে (Esther) ভালোবাসতাম, সেও আমাকে ভালোবাসত, এরই স্মৃতি সঞ্জীবনী সুধার মত। এই সুধা পান করে আমি বেঁচে আছি। খ্যাতি-ট্যাতি সব বাজে। প্রেমই সব চেয়ে সেরা জিনিস। যারা প্রেমে পড়তে পারে তারাই সেরা মানুষ। সেদিন একটি যুবক এসেছিল আমার কাছে, সে প্রেমে পড়েছে, তার প্রণয়িনীকে নিয়ে এক হোমরা চোমরা দেবতা না কি ইলোপ (elope) করেছে। সে এখানে এসেছিল তপস্যা করে সেই দেবতাকে জব্দ করবে বলে—”

“তার নাম কি বলুন তো”

“ন্যাউস”

“নহুষ নয় তো”—বলে উঠলেন সরু।

“হতে পারে। ওই ধরনেরই কি একটা নাম বলেছিল সে। আপনারা তাকে চেনেন না কি”

“তারই খোঁজে আমরা এখানে এসেছি। সে আমার নাতি।”

“আই সি (I see)—তাকে আমি গালিভার বানিয়ে দিয়েছি। সে এখন লিলিপুটদের দেশে আছে”

“কি সর্বনাশ! সে দেশ আবার কতদূর—”

মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন সুইফ্‌ট্।

“বলুন না কত দূর। কি করে যাব সেখানে।”

ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সরু।

“বেশি দূর নয়। জানলা খুললেই তাকে দেখতে পাবেন।

“আসুন—”

সাহেব পাশের জানলাটা খুলে দিলেন।

জানলার নীচেই প্রকাণ্ড মাঠ। তার উপর নহুষ শুয়েছিল চোখ বুজে। তার হাতে পায়ে বুকে পেটে মাথায় সর্বাঙ্গে সরু সরু দড়ির বাঁধন। তার আশেপাশে অনেক ছোট ছোট মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। মোটা সবিস্ময়ে দেখল দুই একজন মই লাগিয়ে তার পেটে ওঠবার চেষ্টা করছে। পেটে উঠলেও কোনো বিপদের সম্ভাবনা আছে বলে মনে হল না। কারণ মানুষগুলি সত্যিই খুব ছোট ছোট। এক ইঞ্চির বেশি লম্বা বলে কাউকে মনে হল না।

“কি ব্যাপার হচ্ছে ওখানে—”

সুইফ্‌ট্ জানলাটা বন্ধ করে দিলেন।

তারপর বললেন—“আপনার নাতি তপস্যা করছে। ওই দড়িগুলো হচ্ছে সংযমের বাঁধন।”

“কি রকম?”

"তত্ত্বটা শুনুন তাহলে। চেয়ারে বসুন ভালো করে"

সরু মোটা দুজনেই দুটো চেয়ারে বসলেন।

"বলুন।"

"তত্ত্বটা হচ্ছে, তপস্যার উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান লাভ করা। আমার মতে তার প্রথম ধাপ হচ্ছে নিজেকে সর্বশক্তিমান মনে করা। আপনাদের দেশেই ছান্দোগ্য উপনিষদ রচিত হয়েছিল। সেই উপনিষদে উদ্দালক তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুকে বলেছিলেন শ্বেতকেতু, তুমিই সেই ব্রহ্ম, তৎ ত্বম অসি। এ ধারণাটা মনে বদ্ধমূল করতে হলে তাকে এমন একটা পরিবেশে থাকতে হবে যেখানে সবাই তার চেয়ে অনেক ছোট, যেখানে তার মনে হবে আমি সর্বশক্তিমান, আমি বৃহৎ। এই ধারণাটা তার মনে যখন পাকা হয়ে যাবে তখন তাকে নিয়ে যাব ব্রবডিংন্যাগদের (Brobdingnag) দেশে যেখানে বৃহদাকার দৈত্যরা বাস করে। তাদের কাছে গিয়ে ন্যাউস বুঝতে পারবে আসলে সে কত ছোট। তার দর্প চূর্ণ হবে, মনে বিনয় জাগবে। বুঝতে পারবে এদের তুলনায় সে কত নগণ্য। আর একটা জ্ঞানও তার হবে পৃথিবীতে ছোট বা বড় কিছু নেই। একজনের তুলনায় আর একজন ছোট বা বড় বা সমান। এই জ্ঞানই আত্মজ্ঞান। ন্যাউস এখন যে লিলিপুটদের কাছে আছে তারা আমার গালিভার্স ট্রাভলসের (Gullivers Travels) লিলিপুট নয়। ওরা হচ্ছে আমাদের সমাজের সাধারণ বর্বর মানুষ। তাদের তুলনায় ও যে অনেক বড় এ জ্ঞান ওকে আগে লাভ করতে হবে। ওকে যে ব্রবডিংন্যাগদের (Brobdingnug) কাছে পাঠাব আবার তারাও গল্পের ব্রবডিংন্যাগ নয় তারা সত্যিকার মহামানব। তাদের মধ্যে গ্যালিলিও আছেন, নিউটন আছেন, ডারবিন আছেন, ফ্যারাডে আছেন, পৃথিবীর সমস্ত ইনটেলেকচুয়াল জায়েন্টরা (Intelectual Giant) আছেন। সেখানে গিয়ে ন্যাউস জানতে পারবে কি করে ওই লম্পট দেবতার কবল থেকে সে তার প্রণয়িনীকে উদ্ধার করতে পারবে! মহামানবদের মধ্যেই কেউ ওকে সাহায্য করবেন। বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া এ কাজ সম্ভব হবে না। কারণ আমি যা শুনছি— Your Indra is a subtle tricky fellow—

সরু বাংলাতে বললেন— লোকটা বদ্ধ পাগল দেখছি। সুইফট্ হেসে জিজ্ঞেস করলেন— "What do you say?"

মোটা হেসে বললেন, "He says you are mad."

"No doubt I am, but you are no less."

"ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন"— সরু সহর্ষে বললেন—

"আমরা শুধু পাগল নই থার্ডক্লাস পাগল। তা না হলে ওই দুটো বখা ছোঁড়া ছুঁড়ির পিছনে ছোটাছুটি করছি। কতক্ষণ যে নস্যি নিইনি। নস্যির জন্যে প্রাণটা খাঁ খাঁ করছে। আমাকে একটু দয়া করবেন সাহেব, আপনি তো দেখছি যাদুকর। আমাকে একটু র মাদ্রাজি নস্যি আনিয়ে দেবেন—"

"নিশ্চয়, সে আর শক্ত কি"

সাহেব রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন আর ধুলো নিয়ে এলেন এক মুঠো।

"নিন—"

"এ যে ধুলো সাহেব"

"চোখ বুজে এইটেই টানুন আর ভাবুন নস্যি নিচ্ছেন। মনই সব। মনে করুন এইটেই নস্যি, তাহলেই নস্যি হয়ে যাবে ওটা। নিয়েই দেখুন না।"

"নেব?"

"নিন"

হোঁস হোঁস করে এক টিপ ধুলোই নাকে গুঁজে দিলেন সরু। তারপর আর এক টিপ। চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর।

"বাঃ, এতো চমৎকার জিনিস দেখছি। অবিকল নেপোর দোকানের ঘিয়ে ভাজা র মাদ্রাজি—বাঃ বাঃ বাঃ"

"আমরা এখন তাহলে কি করি বলুন তো"

"আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে। দিন দুই পরে লিলিপুটদের দেশ থেকে ব্রবডিংন্যাগদের দেশে যাবে। সেখানে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পরিচয় করতে কিছুদিন সময় লাগবে। আমার বিশ্বাস কারো না কারো নেকনজরে পড়ে যাবে ও। তিনিই পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন ওঁকে। তারপর ইন্দ্রের ব্যূহভেদ করে প্রণয়িনীর সঙ্গে মিলিত হতে হবে। তবে তো আসবে। চট করে হবে না। দেরি হবে—"

আবার নস্যি নিলেন সরু।

একটু উত্তেজিত হয়ে আরক্ত নয়নে বললেন— "আমরা ততক্ষণ কি করব?"

"আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে।"

"অতদিন অপেক্ষা করা কি সম্ভব?"

"আমি আপনাদের স্ট্যাচু (Statue) করে দিচ্ছি।"

"স্ট্যাচু?"

"হ্যাঁ। পাথর কখনও অধীর হয়ে ছটফট করে না।"

"তারপর?"

"তারপর আপনার নাতি যখন ফিরে আসবে তখন আপনাদের আবার মানুষ করে দেব।"

"পারবেন তো।"

"নিশ্চয়ই পারব। আপনারা চোখ বুজে বসুন।"

"কি বল সরু, রাজি আছ?"

"ছটফট করার চেয়ে পাথর হয়ে থাকাই তো ভালো। ক্ষিদে তেষ্টাও থাকবে না।"

"তাহলে চোখ বুজে বসুন আপনারা"

পাশাপাশি বসলেন দুজনে চোখ বুজে।

সুইফ্‌ট্ স্ট্যাচু করে দিলেন তাদের।

দিনের পর দিন কাটতে লাগল।

কতদিন যে কেটে গেল তার ঠিক নেই। তারপর হঠাৎ একদিন নহুষ আর সোহাগা এসে হাজির হল সুইফ্‌টের বাড়িতে।

"হ্যালো, তোমরা এসে গেলে।"

"হ্যাঁ। আপনার পরামর্শ না পেলে—"

"ওসব কথা থাক। কি হল বল সেখানে!"

"সে অনেক কাণ্ড। প্রথমে কেউ পাত্তাই দিলেন না কিছুদিন। তারপর একদিন দেখা হল কিরোর

(Cheiro) সঙ্গে। তাঁর ফোটো দেখেছিলাম, চিনতে পারলাম। তাঁর কাছে গিয়ে বললাম—'সার, আমার হাতটা দেখবেন দয়া করে। আমি বড় বিপদে পড়েছি। আমার উড্-বি ওয়াইফকে (would-be-wife) নিয়ে ইন্দ্র পালিয়ে গেছে। কোথায় গেছে কিনারা করতে পাচ্ছি না।' কিরো মনোযোগ সহকারে আমার হাতটি দেখলেন। তারপর বললেন— 'তারা যেখানে আছে সেখানে যাওয়া শক্ত।' জিজ্ঞাসা করলাম— 'কোথায় আছে তারা?' কিরো বলল— 'তারা নাইট্রোজেন আটমে ঢুকেছে। মেয়েটি হয়েছে প্রোটোন (Proton) আর ইন্দ্র ইলেকট্রন হয়ে তার চারিদিকে বন বন করে ঘুরছে। আপনি এক কাজ করুন। আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করুন। তিনি ছাড়া এ ব্যাপারে আর কেউ আপনাকে সুপরামর্শ দিতে পারবে না। অনেকক্ষণ খুঁজে আইনস্টাইনের দেখা পেলাম। দেখলাম তিনি তন্ময় হয়ে বেহালা বাজাচ্ছেন। অপেক্ষা করে রইলাম। বেহালা থামতেই গেলাম তাঁর কাছে। সব কথা বললাম। তিনি বললেন রাদারফোর্ড (Rutherford) অ্যাপারেটস (apparatus) দিয়ে নাইট্রোজেন অ্যাটমকে বম্ করতে হবে। তাহলেই প্রোটোনটা ছিটকে বেরিয়ে আসবে। থাম আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। নিজেই তিনি সব ব্যবস্থা করে দিলেন। ছিট্‌কে বেরিয়ে এল সোহাগা—"

"I congratulate you. তোমার সোহাগাকে দেখে আমার এস্‌থারকে (Esther) মনে পড়ছে। এ দুটি স্ট্যাচুকে চিনতে পারছ?"

"না। কে ওঁরা—"

"তোমার ঠাকুর্দারা। তোমাদের খোঁজে এখানে এসেছিলেন। আমি ওঁদের স্ট্যাচু করে রেখে দিয়েছি। বড় ছটফট করছিলেন। দাঁড়াও এঁদের জীবন্ত করে দিই—"

পরমুহূর্তেই সরু মোটা দুজনেই জীবন্ত হয়ে গেলেন।

নহুষকে দেখে সরু বললেন— "রাসকেল কোথাকার! কি ভোগানটা ভুগিয়েছ আমাদের জান?"

মোটার মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হয়ে উঠল সোহাগাকে দেখে।

"সত্যি বড় ভাবনায় পড়েছিলুম আমরা।"

"দাদু আমি পি. এইচ. ডি. হয়েছি—'

"এবার বাড়ি চল, আর দেরি নয়"।

"যাব কি করে? আপনারা ফিরবেন কিসে—"

"আমরা হনুমানের পিঠে চড়ে এসেছি, তার পিঠে চড়েই ফিরব, তোরা যাবি কিসে?"

নূতন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন তাঁরা। সুইফ্‌টের দিকে চেয়ে বললেন,"সাহেব তুমি তো যাদুকর, তুমি কোনো ব্যবস্থা করতে পারবে?"

"নো, আমার এস্‌থারকে (Esther) বার বার মনে পড়ছে, মনে হচ্ছে, সে হয়তো আসবে। হয়তো অসম্ভব সম্ভব হবে—দেখি রাস্তায় বেরিয়ে একটু, হয়তো সে আমার বাড়ির পথ খুঁজে পাচ্ছে না—"

সাহেব বারান্দা থেকে নেমে হন হন করে বেরিয়ে গেলেন।

মোটা বললেন— "উনি আর কিছু করবেন না। নিজেদেরই ব্যবস্থা করতে হবে। আবার এস কল্পনার ধ্যান করি—"

সরু বললেন— "হয়েছে। এস এক কাজ করা যাক। আমরা চল অগস্ত্যকে বলে যাই, তিনি পালকির ব্যবস্থা করুন। তিনি মহর্ষি লোক তিনি সুব্যবস্থা করে দেবেন। চল আমরা হনুমানকে ডেকে বেরিয়ে পড়ি।"

সঙ্কেত করবা মাত্র হাজির হলেন মহাবীর। দুজনকে পিঠে তুলে নিয়ে অন্তর্ধান করলেন এক লাফে।

একটু পরেই অগস্ত্য হাজির হল একটি সোনার পালকি নিয়ে। সঙ্গে সপ্তর্ষি—মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ।

অগস্ত্য বললেন— "তোমরা দুজনেই উঠে বস। বেশ বড় পালকি। কুবেরের কাছ থেকে চেয়ে আনলুম—"

নহুষ বললেন—"আমাদের দুজনকে বইতে পারবেন?"

"আটজন আছি। খুব পারব। উঠে পড়, বেশি দেরি কোরো না। পালকিটা কালই ফেরত দিতে হবে। কুবেরের বউ বাপের বাড়ি যাবেন কাল। ওঠ ওঠ দেরি কোরো না—"

নহুষ ও সোহাগা পালকিতে উঠে বসতেই আটজন ঋষি তুলে নিলেন পালকিটিকে—এদিকে চারজন, ওদিকে চারজন।

"হুমব্রো হুমব্রো হুমব্রো—"

ঋষি-কণ্ঠে মুখরিত হয়ে উঠল আকাশ।

কিছুদূর গিয়ে দেখা হল সুইফট্ সাহেবের সঙ্গে। তিনি উৎসুক নেত্রে দিগন্তের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন একটা মাঠে।

"গুড্ বাই, মিস্টার সুইফট—"

নহুষ সোহাগা দুজনেই মুখ বাড়িয়ে অভিবাদন করলেন তাঁকে।

"গুড্ বাই, গুড্ বাই—"

স্মিতমুখে প্রত্যভিবাদন করলেন সুইফট্। তারপর আবার দিগন্তের দিকে চেয়ে রইলেন সোৎসুক দৃষ্টি মেলে।

আশাবরী

নাম সত্যেন। সত্যেন ভদ্র।

ছোঁড়াটা হতভাগা। বয়স বছর পঁচিশ। মামার বাড়িতে থেকে ইতিহাসে এম-এ পাস করেছে। চাকরি জুটছে না। অনেক দরখাস্ত করেছে চারদিকে। কোথাও কিছু হয়নি। মামা যদিও তাড়িয়ে দেননি, মামীমা যদিও বলেননি আমি আর তোমার জন্যে দুবেলা খাবার তৈরি করতে পারব না, তবু চলে এসেছে সে সেখান থেকে।

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। দেখে অনেক ফেরিওয়ালা ফেরি করছে, অনেক রিকশাওয়ালা রিকশা টানছে, অনেক কুলি মাল বইছে, অনেক মজুর রাস্তা তৈরি করছে, অনেক মূর্খ লোক গতর খাটিয়ে পয়সা রোজগার করছে। সে কিন্তু কিছুই করছে না পয়সা রোজগার করবার জন্যে। ওসব করবার সামর্থ্য নেই তার। চাকরি জুটলে করতে পারত, চাকরি জোটেনি। ফ্যানের তলায় চেয়ারে বসে কেরানীগিরি করবার সুযোগ যদি পেত অনায়াসে করতে পারত। কিন্তু সে সুযোগ পায়নি। পাওয়ার আশাও নেই। তাই এখন ভিক্ষা করে। এ-ও একরকম উপার্জন। পেটটা চলে যায়। রাস্তাতেই শোয়। কখনও কোনোও বড় লোকের বাড়ির বারান্দায়। কখনও বা স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে। কখনও বা ফুটপাথের ওপরই। সে কিন্তু নিতান্ত নিঃসম্বল নয়। একটা ছেঁড়া কাঁথা যোগাড় করেছে। সেইটে পেতেই শোয় রাত্তিরে। সেইটে জড়িয়ে পুলিন্দার মত করে বগলে নিয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। গায়ে ছেঁড়া একটা আলখাল্লা কোট। কোটের পকেটে একটা খাতা। আর একটা পেন্সিল। কবিতা লেখে। আধুনিক ধাঁচের কবিতা লেখবার চেষ্টা করে। সব সময়ে কিন্তু হেঁয়ালি বানাতে পারে না। মানে বোঝা যায়, মামুলী মানে। তবু চেষ্টা করে সে। কবিতা না লিখে পারে না। ওটাই একমাত্র অবলম্বন। আর একটা অবলম্বন আছে— প্রিয়া। যে প্রিয়া নেই সেই প্রিয়া। যে প্রিয়া বাস্তবে দেখা দেবে না, যার রূপ নিত্য নূতন, সেই প্রিয়া। তার সঙ্গে সে রোজ কথা কয়।

শহরে অনেক পার্ক আছে, স্কোয়ার আছে। তারই একটাতে বসে কবিতা লেখে সে দুপুরে। দুপুরে লোকজনের ভিড় থাকে না। কবিতা লিখে প্রিয়াকে শোনায়।

সেদিনও তাই করছিল। কল্পনা করছিল চাঁ চাঁ দুপুরের রোদে তার পাশে বসে আছে টুকটুকে ফরসা একটি মেয়ে। মাথায় ঘোমটা নেই। পিঠে লম্বা-চওড়া কালো বেণী দুলছে পিঠ-কাটা ব্লাউসের উপর। মুচকি মুচকি হাসছে আর নখ খাচ্ছে।

আকাশ, ছুঁচো আর ফটকিরি
ভালোবাসে পালক-মেঘের চচ্চড়ি।
আমি বাসি না।
আমি ভালোবাসি
গরম গরম ফুলকো লুচি,
যে লুচি ভাজা হচ্ছে
কৃষ্টি-উনুনের ধিকি ধিকি আঁচে
পরদার আড়ালে।
আমার ইচ্ছে দেখে
হাসছে গয়টে
শেক্সপীয়রকে জড়িয়ে,

ন্যাংচাচ্ছে গেঁটে বাত,
হাঁচছে শীলার,
কাশছে টলস্টয়।
ওরা ভাবছে।
আমি সঙ্গত করব ওদের সঙ্গে তবলা নিয়ে।
কিন্তু করব না
কভি নেই।
আমি একক, আমি স্বতন্ত্র, আমি অনন্য
আমি ভিখারি হয়েও সম্রাট।
মনের বাসনার খিড়কির ফাঁক দিয়ে
বেরিয়ে এল কামনা-টিকটিকি ল্যাজ ঘুরিয়ে,
বললে আমিও।
উপরে চেয়ে দেখলাম।
আকাশ নীরব
সে কিছু বলছে না।
তুমিও বলবে না?

সে জানে তার পাশে প্রিয়া নেই। তবু চেয়ে দেখল একবার। রোজই দেখে। দেখতে পেল দুরে আর একটা লোক ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছে তার দিকে।

এগিয়ে এল লোকটা।

'কি লিখছিলে—'

কেমন যেন লজ্জা হল তার। খাতা পেন্সিল পকেটে পুরে সলজ্জ হাসি হেসে বলল, 'কিছু না'। পরক্ষণেই আত্মপ্রকাশ করল ভিক্ষুকটা।

বলল— 'সমস্ত দিন খাইনি। কিছু দেবেন?'

লোকটা ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়েই রইল একটু। তারপর একটা দশ নয়া ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল।

পয়সাটা কুড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে পার্ক থেকে। দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ ফুটপাথের উপর।

জনস্রোত চলছে। আর চলেছে মোটর গাড়ির সারি। চলেছে ট্রাম বাস লরি। চলেছে টেম্পো, ঠেলাগাড়ি।

তারপরই হঠাৎ একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠল একটু দূরে। লোক জমে গেল! কাকে যেন মারছে অনেকে মিলে। একটা পকেটমার ধরা পড়েছে। সে-ও এগিয়ে গেল। দশ-বারো বছরের ছোঁড়া একটা, নির্দয়ভাবে মারছে তাকে। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে।

'আর কখনও করব না—আমাকে ছেড়ে দাও, আর মেরো না, তোমাদের পায়ে পড়ি।'

তারস্বরে চিৎকার করছে ছেলেটা।

ওরা কিন্তু ছাড়বে না। মেরেই চলেছে। তারপর পুলিস এল।

ও সরে গেল সেখান থেকে।

গেল একটা খবরের কাগজের স্টলে। সেখানে কাগজগুলো উল্টে 'নিরুদ্দেশ প্রাপ্তি' অংশটা দেখল। রোজই দেখে। না, তার মামা তার খোঁজে কোনো বিজ্ঞাপন দেয়নি।

চলে গেল হাঁটতে হাঁটতে। হাঁটতেই লাগল অনেকক্ষণ। তারপর একটা চানাচুরওলার দেখা পেল। চানাচুর কিনল খানিকটা। তাই চিবুতে চিবুতে আরও খানিকক্ষণ হাঁটল। পা ব্যথা করতে লাগল। বসে পড়ল শেষে ফুটপাথের ওপরই একটা বাড়ির দেওয়ালে ঠেস দিয়ে।

॥ ২ ॥

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ দিয়ে হাঁটছিল। পাশে সামনে পিছনে লোক চলছে। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া। নানা রঙের পোশাক পরা। অধিকাংশই সাহেবি পোশাক। কেউ কাউকে চেনে না। সবাই চলেছে নিজের ধান্দায়। রাস্তার উপর ট্র্যাফিক জ্যাম। হর্ন বাজাচ্ছে মোটরগুলো। একটা সাইকেল ট্রিং ট্রিং ট্রিং করতে করতে এগিয়ে এল। তার ওপর বসে আছে এক অদ্ভুত মূর্তি। মাথায় গান্ধী টুপি, গায়ে লাল কামিজ, পরনে কালো চোং প্যান্ট। তার পিছনে তাকে জড়িয়ে বসে আছে একটা মেয়ে। তার মাথায় চুল বব্ করা, চোখে কাজল, বড় বড় দাঁত ওপরের ঠোঁট দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করছে। হতভাগা ছোঁড়াটা দাঁড়িয়ে পড়ল সেখানে। জ্যাম হওয়ার জন্যে সাইকেলটা আর চলছিল না। এক পা মাটিতে রেখে সাইকেলটাকে কেৎরে দাঁড়িয়ে ছিল গান্ধী টুপি। মেয়েটাও নেবেছিল।

'সমস্ত দিন খাইনি মা।'

হাত পেতে দাঁড়াল সে মেয়েটার কাছে। মেয়েটা ঘাড় অন্য দিকে ফেরাল। তখন দেখা গেল তার ঘাড়ে একটা কালো জড়ুল আছে। জড়ুলের উপর পাউডার লেগেছে একটু। ছোঁড়াটার অকারণে মনে হল চুল বব্ না করলে জড়ুলটা ঢাকা পড়ত। মোটর হর্ন দিচ্ছে চারদিকে। নানা জাতের হর্ন। শুধু মানুষের নয়, শব্দেরও ভিড় হয়ে গেল চারদিকে। হঠাৎ খুব জোরে জোরে হুইসলও বাজতে লাগল। পুলিসের হুইসল। একগাদা লোক রাস্তা থেকে উঠে পড়ল ফুটপাথের উপর। একটা লেবুওলা ফুটপাথে লেবুর পশরা বিছিয়ে বসেছিল। সে হাঁ-হাঁ করে উঠল জোরে। তার লেবুর উপর দিয়ে লোক চলেছে। হুমড়ি খেয়ে সে শুয়ে পড়ল লেবুগুলোর উপর। তারপর তার কি হল সে আর দেখতে পেলে না। জনতার ধাক্কায় সে ছিটকে গেল। হঠাৎ লক্ষ্য করল সেই জড়ুলওয়ালা মেয়েটা আর নেই। সে দাঁড়িয়ে আছে একটা মেওয়ার দোকানের সামনে। সামনেই একটা প্রকাণ্ড জ্যাম্।

কাজুবাদাম। তার খুব প্রিয় জিনিস। চেয়ে রইল খানিকক্ষণ জারটার দিকে। তার চোখে বোধহয় লোলুপতা ফুটে উঠেছিল। দাড়িতে মেহেদী লাগানো দোকানদার হঠাৎ ভারি গলায় প্রশ্ন করল—'ক্যা দেখতো হো?'

'কাজু।'

'বারো রুপিয়ে কে-জি।'

ছেলেটা দাঁত বের করে বললে, 'মায় ভুখা হুঁ। মগর পয়সা নেহি হ্যয়।'

দাড়িতে মেহেদী লাগানো লোকটা তখন পকেট থেকে ছোট্ট একটা আয়না আর চিরুনি বার করে চুল আঁচড়াতে লাগল। রাস্তায় হৈ হৈ উঠল একটা। আবার জনতার একটা ধাক্কা। খুন হয়ে গেছে, খুন হয়ে গেছে—চিৎকার করতে করতে একটা লুংগিপরা লোক বোঁ করে ঢুকে পড়ল পাশের গলিটাতে।

সে-ও ঢুকে পড়ল। খুব সরু গলি। গলির মুখেই একটা কল থেকে অনবরত জল পড়ছে। জলের কলটা ভাঙ্গা। অনেক দিন থেকেই জল পড়ছে বোধ হয়। নীচের শানটা ক্ষয়ে গেছে। আর একটু গিয়ে দেখতে পেল, দুটো ছোঁড়া ব্যাটবল খেলছে। একজনের হাতে একটা কেরোসিন কাঠের ব্যাট, অন্যজনের হাতে একটা ন্যাকড়ার বল। পাশের রাস্তাতেই যে তুমুল কাণ্ড হচ্ছে সে খেয়ালই নেই ওদের। খেলে চলেছে। তাদের পেরিয়ে আর একটা ছোট্ট দোকান পাওয়া গেল। দোকানের মালিক যুবতী নারী একজন। যুবতী দেখলেই মন ছোঁক ছোঁক করে ছোঁড়ার। দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা ভিতরের দিকে একটা ঘুপচি ঘরে অন্তর্ধান করল হঠাৎ। বেরিয়ে এল হোঁতকা গোছের ঘাড়েগর্দানে একটা লোক। তার গলায় কালো সুতো দিয়ে লটকানো একটা মাদুলী। দোকানে ছোট্ট একটা গ্লাস কেস। কাচের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে লাল কাঁকড়ার ঝাল। কিছু শুকনো আলুর দম। কিছু বেগুনি ফুলুরিও। হোঁতকা লোকটা তার পানে ভ্রূকুটি করে চাইল একবার। তারপর দোকানের ঝাঁপটা তুলে দিল। আবার চলতে লাগল সে। কিছু দূরে গিয়ে দেখল একটা আবগারির দোকান। দোকানে বসে আছেন যিনি, তিনি গীতাপাঠে মগ্ন। বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছিল বইয়ের মলাটের উপর স্বর্ণাক্ষরে লেখা—শ্রীমদ্ভাগবত গীতা।

'সমস্ত দিন খেতে পাইনি বাবা।'

গীতা নিরুত্তর।

'সমস্ত দিন খেতে পাইনি বাবা।'

আবার গীতা নিরুত্তর।

'সমস্ত দিন খেতে পাইনি বাবা।'

গীতা জানলা বন্ধ করে দিলেন।

আবার হাঁটতে লাগল সে। সত্যিই বড্ড ক্ষিধে পেয়েছিল তার। একটা বন্ধ দুয়ারের কড়া নাড়তে লাগল অবশেষে।

কপাট খুলল।

'কি চাই—'

'বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে বাবা—'

পাশের ঘর থেকে কে যেন গাঁক করে উঠল, 'মাফ কর বাবা। ওরে কপাট্টা বন্ধ করে দে—'

'থাম্ থাম্। আজ যে খোকার জন্মবার। ভিকিরিকে ফিরিয়ে দিস না। রাত্তিরের যে রুটিগুলো আছে দিয়ে দে। তরকারিও আছে খানিকটা।

খান দুই রুটি আর একটু ফুলকপির তরকারি জুটে গেল। সামনের বারান্দায় বসে খেল সেটা। কাপড়েই হাত মুখ মুছে ফেলল। একটু জল পেলে হত—সামনের বাড়ির দরজা কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে। উঠে হাঁটতে লাগল। অনেক দূর হেঁটে কল পেল একটা, খুলে অনেকখানি জল খেয়ে ফেলল। আবার কিছুদূর হেঁটে পাওয়া গেল ছোট্ট একটা পার্কের মতন। লোহার বেঞ্চিও রয়েছে একটা। সেইখানে গিয়ে বসে রইল। আকাশের দিকে চাইল। আশপাশের বাড়িগুলোর দিকে চাইল। সব পরদা-লাগানো জানলা। যে জানলায় পরদা নেই, সে জানলাটা ফাঁকা। কেউ নেই সেখানে। খাতা পেন্সিল বার করে কবিতা লিখতে শুরু করল সে।

'রান্না-করা কাঁকড়ার লাল লাল ঝালে
কাজুবাদামের নোনতা মিষ্টি স্বাদে
ঘিয়ে ভাজা পেঁয়াজের গন্ধে
হিং-দেওয়া কচুরির ফিং-দেওয়া মাধুর্যে
হাতে টানা রিকশার টুন টুন আওয়াজে
দাঁতভাঙ্গা চিরুনির ফাঁকে ফাঁকে
চুলের জটাপটিতে
দেখতে পাই তোমাকে।
আর আমি—
আমি তখন ব্যাংকের হিসাব মেলাই
যদিও আমার কোনো ব্যাংকে হিসেব নেই।
যদিও মোটর নেই
তবু দেখি মোটরে তেল আছে কি না।
স্তূপ মেঘেদের পিছন দিকে
আকাশের যে নীল গলিটা—
অন্যমনস্কতার মেঘে ভেসে ভেসে
সেখানে আস তুমি মাঝে মাঝে।
আমাকে দেখেও দেখ না।
নির্মলদের বাড়ির লোম-ওঠা কুকুরটা
পিঁচুটি-ভরা চোখ দিয়ে
কটাক্ষ হানে আমার দিকে।
ক্ষীণমার্জারীরা আড়-চোখে চায়,
রুজ-পাউডার-মাখা ঘুজঘুজে মেয়েরা
ভঙ্গী করে নানা রকম।
আমার ব্যাংকের হিসাবে গোলমাল হয়
মোটরের ট্যাংকে পেট্রল কমে যায়।
তবু আমি দমি না।
না-পাওয়া কাঁকড়ার লাল দাঁড়াটা
চিবোই বসে আনমনে।
আর ভাবি টপসি কার নাম?
কুকুরের, না, মানুষের?
হঠাৎ দেখতে পাই
অন্যমনস্কতার মেঘে চেপে
ভেসে যাচ্ছ তুমি নিরুদ্দেশ যাত্রায়
আমি কি করে যাব?

আমি ভারী, ভাসতে পারি না;
মোটর চড়ি
কিন্তু মোটরে যে তেল নেই।
শুনছ?
কেমন হয়েছে কবিতাটা?'

পাশে কেউ নেই। কল্পনা করছিল সাঁওতাল কিশোরীর মত লাবণ্যময়ী তার প্রিয়া বসে আছে তার পাশে। নেই। কেউ নেই।

উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াও উঠল একটা। সেই হাওয়াতে উড়তে উড়তে এল একটা কাগজ। উড়তে উড়তে তার দিকেই এল। তুলে নিয়ে দেখল বিখ্যাত দৈনিক কাগজের ছেঁড়া-পাতা একটা। উল্টো পিঠে একজন বিখ্যাত লোকের ছবি। ছবির উপর ময়লা লাগানো। বড় দুঃখ হল। ইচ্ছে হল ওই বিখ্যাত লোকটির ঠিকানা খুঁজে তার পায়ে ধরে গিয়ে ক্ষমা চাইতে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। নাকের পাতা দুটো কাঁপতে লাগল। হঠাৎ সামনের বাড়ি থেকে একটা ষণ্ডা লোক বেরুল, তার হাতে চেন-বাঁধা মস্ত একটা কুকুর। অ্যালসেশিয়ান নয়, বুলটেরিয়র। সাদা গায়ের ভিতর থেকে গোলাপি-আভা বেরুচ্ছে। কেমন যেন একটা রোখা-রোখা ভাব। ও বুলটেরিয়ার কখনও দেখেনি। অবাক হয়ে চেয়ে রইল। ভয়-ভয়ও করতে লাগল একটু। লোকটা পার্কেই ঢুকছে। অন্য গেট দিয়ে সরে পড়ল সে। হঠাৎ মনে হল সারা জীবনটাই সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে। বাল্যকাল থেকেই গা বাঁচিয়ে চলছে। মুখে বলেছে—সম্মুখ-সমর। কিন্তু সম্মুখ-সমর দেখেনি কখনও, কোথাও গোলমাল দেখলেই সরে পড়েছে। পার্ক থেকে বেরিয়ে চোখে পড়ল পুব দিকের বাড়ির বাইরের বারান্দাটি দিব্যি চকচকে ঝকঝকে। বোধহয় মোজেইক করা। এগিয়ে গিয়ে দেখল তাই। কারো চকচকে ঝকঝকে জিনিস দেখলেই নেবার লোভ হয়েছে বরাবর। এখনও হল। চারদিকে কেউ নেই। সটান উঠে শুয়ে পড়ল বারান্দাটাতে। মাথায় কাঁথার পুলিন্দাটি দিয়ে বেশ বাগিয়ে শুলো, পাশ ফিরে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। অগাধে ঘুমুতে লাগল। বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল নাচগানের শব্দে। দেখলে, পার্কে একটা ছোঁড়া নানা ভঙ্গী করে নাচছে আর গাইছে—

ওগো আমার মানিনী
নাকছাবিটি আনিনি
কাল আনব, কাল আনব, কাল আনব
মাইরি বলছি কাল নয়তো পরশু
বড় জোর তোরশু
পান্না থাকবে ওতে লো
ওগো আমার ডেসডেমোনা
আমি তোমার ওথেলো।

গান গেয়ে গেয়ে ক্রমাগত নাচতে লাগল ছোঁড়াটা। আর পয়সা পড়তে লাগল চারদিক থেকে। প্রতিটি বাড়ির জানলায় ভিড়। সবাই পয়সা দিচ্ছে।

কবি দেখতে লাগল দাঁড়িয়ে। আধ ঘণ্টা নেচে একগাদা পয়সা কুড়িয়ে ছেলেটা ঘুরে ঘুরে অভিবাদন করতে করতে চলে গেল। কবি পিছু নিল তার।

'শুনছেন ভাই।'

'আমাকে ডাকছেন?'

'হ্যাঁ আপনাকে। চমৎকার লাগল আপনার নাচ আর গান। মনে হয় আপনি লেখাপড়াও জানেন—'

'না, আমি মুখ্যু।'

'তাহলে ডেসডেমোনা আর ওথেলোর কথা জানলেন কি করে?'

'আমি যাত্রাপার্টিতে ছিলাম যে। ওথেলো নাটকটার বাংলা করে আমাদের অধিকারী মশাই নাবাবেন ভেবেছিলেন। ভালো ডেসডেমোনা পাওয়া গেল না। পেঁচামুখী পটলিকে মানাল না। তখনই জেনেছিলাম ওথেলো আর ডেসডেমোনার লভ হয়েছিল।'

'কোন্ যাত্রাপার্টি?'

'সে দল ভেঙ্গে গেছে। ওই পটলিকে ঘিরেই আগুন জ্বলল। আমি সেখানেই নাচগান শিখেছিলাম তেনা মাস্টারের কাছে। তিনিই তো গানটা লিখে দিয়েছেন।'

'তেনা মাস্টার? কে তিনি—'

'ভালো নাম ত্রিনয়ন। তেনা তেনা বলে ডাকে সবাই। চমৎকার নাচ শেখায়, ভালো গান বাঁধতে পারে।'

'কোথায় থাকেন তিনি?'

'চিৎপুরে। একসঙ্গেই থাকি আমরা। ছোট্ট একটা ঘর নিয়েছি তবলার দোকানের উপরে।'

'তাঁর পরিবার নেই বুঝি?'

'কেউ নেই। আমিই তার পরিবার। সন্ধ্যাবেলা গিয়ে রেঁধে-বেড়ে খাওয়াই।'

'বিয়ে-টিয়ে করেননি বুঝি?'

'না। একটি মেয়েমানুষের সঙ্গে ছিলেন। সে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিয়েছে। ঐ রগচটা মেজাজি লোককে সহ্য করবে কে। আমাকে তো প্রায়ই ঠ্যাঙায়। গুণী কিন্তু। শুধু গান-বাজনায় নয়, গুনতেও পারে। ওর সঙ্গে কথা আছে আমি সমস্ত দিন নেচে যে পয়সা পাব তার অর্ধেক দিতে হবে ওকে। ও ঠিক গুনে বুঝতে পারে আমি কত পয়সা পেয়েছি। একদিন তঞ্চকতা করেছিলাম, মেরে আমার পস্তা উড়িয়ে দিলে।'

কত রোজ পান আপনি।

'তা পাঁচ-ছ'টাকা হয়ে যায়।'

'তেনা মাস্টার আমাকে নাচগান শেখাবেন?'

'অনেক মার খেতে হবে কিন্তু। নাচে ভুল করলেই পায়ে সপাং করে বেত মারবে।'

'উনিই ওই গানটা বেঁধেছেন?'

'হ্যাঁ—'

'ইনি ওর চেয়ে ভালো একটু সভ্যগোছের গান বাঁধতে পারেন না?'

'পারেন। কিন্তু বলেন ওসব গান চলবে না। এদেশে চুট্‌কি ফক্কোড় গান বেশি চলে। বলেন—রেডিওতে বড় ওস্তাদের গান কেউ শোনে না। শোনে বিবিধ ভারতী।'

হি হি করে হাসতে লাগল ছোঁড়াটা।

'আমাকে নিয়ে যাবেন আপনার তেনা মাস্টারের কাছে? আমিও নাচ শিখব—'

'আপনি ধেড়ে কার্তিক হয়ে গেছেন। নাচ আর আপনার দ্বারা হবে না। তেনা মাস্টার দেখেই আপনাকে দূর করে দেবে, তাছাড়া আমি আপনাকে নিয়েও যেতে চাই না।'

'কেন?'

'নিজের সতীন আবার কেউ জোটায় নাকি?'

হি হি করে হাসতে লাগল। দাঁতগুলোতে পানের ছোপ ধরেছে। চোখ দুটোতে আলো নাচছে। আচ্ছা চলি।

কোমরে হাত দিয়ে মাথা নেড়ে আর একটা গান ধরলে ছোকরা।

তন্ মন্ ধন সব দিয়া
তব্ ভি কুছু নেহি পায়া
দিন্ গিয়া রাত গিয়া
তব্ ভি প্যারি নেহি আয়া।

তারপর হঠাৎ একছুটে চলে গেল।

দাঁড়িয়ে রইল ছেলেটা।

'কি হে, তুমি এখানে কি করছ? কে তুমি—'

পাশের বাড়ির দরজা খুলে একটা গোঁফ আর জুলপি-ওলা লোক বেরিয়ে এল।

'আমি এমনি দাঁড়িয়ে আছি।'

'এমনি দাঁড়িয়ে থাকে নাকি কেউ! নিশ্চয় কিছু মতলব আছে তোমার।'

'আমি ভিক্ষা করি—'

'কিছু হবে না এখানে। সরে পড়। জনার্দন যদি এসে পড়ে ঠেঙিয়ে হাড় গুঁড়িয়ে দেবে। এখান থেকে প্রায়ই জিনিসপত্র চুরি যাচ্ছে—'

'আমি এখুনি চলে যাচ্ছি। আমাকে দয়া করে দিন কিছু। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে—'

'কিছু পাবে না যাও—'

'আপনারা তো এখুনি নাচ দেখে ওই ছেলেটাকে কত পয়সা দিলেন—'

'তুমি নাচ দেখাও, তোমাকেও দেব। সোজা নাক দেখানোতে কোনও বাহাদুরি নেই। ঘুরিয়ে নাক দেখালে তবু কিছু আছে। ও ছোকরা ঘুরিয়ে নাক দেখাল, তুমি সোজা নাক দেখাচ্ছ। সরে পড় এখান থেকে—'

দড়াম করে কপাটটা বন্ধ করে দিলে সে। ছোঁড়া আবার হাঁটতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে দেখল একটা সরু গলির মোড়ে প্রকাণ্ড একটা লাল বাড়ি। রাস্তার দিকে বেশ বড় একটা বারান্দা। বাড়িতে সে ঢুকতে পারে না, কিন্তু বারান্দায় বসতে পারে। বারান্দার ওধারে একটা রাস্তার কুকুরও কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। এধারে গিয়ে বসল সে। খুব ক্ষিধে পেয়েছিল। হঠাৎ পিছনের জানলাটা খুলে গেল। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল, একটি প্রৌঢ়া মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। তার মনে হল একটি মাতৃমূর্তি যেন দাঁড়িয়ে আছে।

করুণ দৃষ্টি তুলে তাঁর দিকে চাইতেই তিনি বললেন— 'কে তুমি বাবা?'

'আমি ভিকিরি মা। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, অনেকক্ষণ কিছু খাইনি—'

'তোমার গায়ের কাপড় জামাও তো খুব ময়লা। তুমি ভিকিরি হলে কি করে? তোমার বাবা মা নেই—'

'না। মামার বাড়িতে থাকতুম। সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি।'

'কেন?'

ছোঁড়াটা চুপ করে রইল মাথা হেঁট করে। কারণ এ 'কেন'র উত্তর দেওয়া সহজ নয়।

'তুমি দাঁড়াও একটু।'

মহিলা অন্তর্ধান করলেন। তার একটু পরেই একটি চাকর এসে সদর দরজা খুলল।

'এই নাও।'

একটি মাটির সরায় কিছু খিচুড়ি। একটা সন্দেশ। তাছাড়া ভাজা কয়েক রকম।

'এত খাবার আমাকে দিলেন?'

'হ্যাঁ। কাল সরস্বতী পুজো ছিল। তারই ভোগ।'

চাকরটির কাঁধে একটি খদ্দরের কোট আর ফরসা কাপড়ও ছিল একখানা।

'এগুলোও তোমাকে দিয়েছেন মা।'

একটু হক্‌চকিয়ে গেল ছেলেটা। তারপর খাবারের সরাটা নিয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে লাগল। দেখল খিচুড়ি, তরকারি, সন্দেশ—সব বরফের মত ঠাণ্ডা। বোধহয় 'ফ্রিজে' ছিল। তার মানে এরা বড়লোক। প্রচণ্ড বড়লোক। এত বড় বাড়ি, বাড়িতে পুজো হয়। বাড়িতে 'ফ্রিজ' আছে। তার সঙ্গে এক বন্ধু পড়ত—তার নাম দিব্যেন্দু দাস। সে বলত—দেখ, এটা জানবি বড়লোক মাত্রেই আমাদের শত্রু। ওদের ধ্বংস করলে আমাদের মুক্তি। দিব্যেন্দু তিনবার ফেল করে ম্যাট্রিক পাস করেছিল। বলত—একজামিনাররা বড়লোকের ছেলেদের পাস করিয়ে দেয়—আর গরিব ছেলেদের ফেল করায়। ইচ্ছে করে করায়। দিব্যেন্দু কোনো ক্লাসেই নাকি একবারে প্রমোশন পায়নি। তার সঙ্গে আই-এ পড়ত। ফেল করেছিল। সে যে অপদার্থ এ কথা কিন্তু একবারও স্বীকার করত না সে। বলত—তলে তলে—হুঁ হুঁ—অনেক ব্যাপার আছে ভাই। আমি যে গরিব। দিব্যেন্দুর কথা শুনে শুনে তারও মনে এই ধারণাটা গেঁথে গিয়েছিল যে বড়লোক মাত্রেই পাজি, গরিবরা সব ভালো। এখন কিন্তু এই ক্ষিধের মুখে খাবার পেয়ে তার ধারণাটার রং বদলে গেল হঠাৎ। মনে হল, না, সব বড়লোকেরা খারাপ তো নয়। আমাকে উনি খাবার জামা কাপড় না দিলেও তো পারতেন। যারা আমাকে তাড়িয়ে দিলে তাদের মধ্যে গরিবও তো অনেক ছিল।

খেয়ে রাস্তার কলে জল খেয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল সে। মনের ভিতর কিন্তু জুলফিওলা সেই লোকটার কথাগুলো জাগতে লাগল। ঘুরিয়ে নাক দেখালে বাহবা দেয় সবাই।...বড় রাস্তায় সে পড়েছিল। দেখল সারি সারি গাড়ি চলছে, প্রত্যেক গাড়িতে তুলোর বস্তা। গাড়িগুলো পার হল তো এল লরির সারি। এতেও সারি সারি বোরা। তেরপল দিয়ে ঢাকা। লরিগুলো চলে যাবার পর সে রাস্তা পার হয়ে ওপারে ফুটপাথে গিয়ে পড়ল। সেখানে একটি ইলেকট্রিসিটির থাম ছিল। তার নীচে একটা মুচি বসে জুতো সেলাই করছিল। থামের ও-পাশটা খালি ছিল। সেইখানেই গিয়ে বসে পড়ল সে। পকেট থেকে বার করল খাতা আর পেন্সিল। কবিতা লিখতে হবে। সেই ঘুরিয়ে নাক দেখাবার কথাটাই মনে জাগছিল। শুরু করে দিলে—

সোজা নাক দেখালে
বাহবা দেয় না কেউ
ঘুরিয়ে নাক দেখালে বলে—চমৎকার।
মন কেমন করছে বললে
সবাই বলে সেকেলে
বলতে হয় পাংশু মনের কুট্‌কুটুনি জ্বালাচ্ছে।
শুধু সবুজ বললে কান দেয় না কেউ।
উৎকর্ণ হয়ে ওঠে শ্যাওলা-সবুজ বললে,
পান্না-সবুজ বাতিল হয়ে গেছে আজকাল।
ঠিক করেছি তাই
ভাইকে বলব বাবার ছেলে
স্ত্রীকে শালার দিদি।
আর শ্বশুরকে শালীর দাদার বাবা।
বাবাকে পিসেমশায়ের বড় শালা।
এই সব হিসেব করছি
ক্রমাগত হিসেব করছি
হিসেবই করে যাচ্ছি
এমন সময় লাথি খেলাম,
মনে হল ঘোড়ার লাথি
পড়ে গেলাম মুখ থুবড়ে।
উঠে দেখি ঘোড়া নেই
কেউ নেই
আমার দিকে কটমটিয়ে চেয়ে আছে
আমার মাত্রাবোধ।
আর তার পাশে তুমি।
লজ্জিত হলাম।

সে হয়তো আরও লিখত। কারণ লেখার একটা ঝোঁক এসে গিয়েছিল তার। কিন্তু হঠাৎ বাধা পড়ল। নীল রঙের প্রকাণ্ড একটা ধামা এসে ধাক্কা মারল তাকে। তারপর সে আবিষ্কার করল ধামা নয় পাছা। তার ঠিক পাশেই পেন্টালুন পরা একটা মেয়ে হেঁট হয়ে কি যেন কুড়াচ্ছে রাস্তা থেকে। তার রঙিন লজেন্সগুলো পড়ে গেছে ফুটপাতের উপর।

মণি থাম না একটু ভাই লজেন্সগুলো পড়ে গেছে। 'শো' সাড়ে পাঁচটায় শুরু হবে। এখনও অনেক দেরি।

হিপি-মার্কা মণি একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। সে আকর্ণ বিশ্রান্ত হাসি হেসে বলল—তার আগে চীনে রেস্তোরাঁয় যাব। চীনে মাল খাওয়াব তোকে আজ। সেখানে শ্লারা আমরা শিরি ফরহাদ বনে যাব একেবারে—বুঝলি—

সব 'স' গুলোই সংস্কৃত দন্ত্য 'স' উচ্চারণ করলে।

'এই ট্যাকসি—'

ট্যাকসি দাঁড়াতেই উঠে পড়ল তারা। বোঁ করে চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল তার প্রিয়া। তার মানসী। সে যেন একটু আগে এসে বসেছিল তার পাশে। তার নানারকম চেহারা কল্পনা করে সে। কিন্তু বিভিন্ন চেহারার ভিতর তার প্রিয়া প্রিয়াই থাকে, অপ্রিয়া হয় না কখনও। তার প্রিয়া পেলব শোভন মধুর অবর্ণনীয়া। এই মেয়েটাকে দেখে সে লজ্জায় মরে গেল। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তার পাশ থেকে।

হঠাৎ আবার একটা হৈ হৈ উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে একটা মোষের গাড়ির একটা মোষ খুলে গিয়ে দৌড়চ্ছে, একটা ছুটন্ত ট্যাকসির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল সেটা। ট্যাকসিটাও থেমে গেল, লোকে লোকারণ্য। আবার দাঁড়িয়ে গেল মোটরের সারি। দেখতে পেল একটা ফুল দিয়ে সাজানো মোটর থেকে চেলিপরা একটি সুন্দর বৌ রক্তাক্ত মোষটার দিকে চেয়ে আছে।

আরও ভিড় জমতে লাগল। ভিড় বেশিক্ষণ ভালো লাগে না। আবার হাঁটতে লাগল সে। হাঁটতে লাগল। ক্রমাগত হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে একটা আশ্চর্য প্রশ্ন মনে জাগল—কেন আমি হাঁটছি? কেন আমি মামার বাড়ি থেকে পালিয়ে এলাম? কি চাই আমি? কি খুঁজছি? চাকরি? চাকরি পেলেই কি আমি সুখী হব? মজুমদার মশাই বড় চাকরি করেন, কিন্তু তিনি কি সুখী? প্রায়ই তার মামার কাছে এসে হাউ হাউ করে কাঁদতেন। সুখী হলে কেউ অমন করে কাঁদে। এই সব আশ্চর্য প্রশ্নের একটা আশ্চর্য উত্তরও যেন আবছাভাবে মনে এল তার। তার মনে হল সে যেন নিজেকেই খুঁজছে, নিজেকেই সে যেন হারিয়ে ফেলেছে ভিড়ের ভিতর, নিজেকে খুঁজে পেলেই যেন আপাতত বর্তে যাবে সে।

জ্ঞানীরা 'আত্মানং বিদ্ধি' বলে চড়া সুরে উপদেশ দেন, সেই সুরে উদ্বুদ্ধ হয়ে ও নিজেকে খুঁজছিল না, ওর মনে হচ্ছিল ওর নিতান্ত 'আপনজন' যেন কোথায় হারিয়ে গেছে, তাকে পেলেই বুঝি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সে আপন জনের স্বরূপ কি? তা-ও জানা ছিল না তার। জানা ছিল না, তবু খুঁজছিল। এই ভিড়ে তাকে খুঁজে পাওয়া কি সম্ভব? তারপর হঠাৎ মনে হল তার প্রিয়ার কথা যে প্রিয়াকে কখনও দেখেনি কখনও দেখবে না, তার কথা। মনে হল তাকে পাই বা না পাই, সে বড় ভালো বড় সুন্দর, এই মরুভূমিতে সেই মরূদ্যান, সেখানে সবুজ আছে ফুল আছে ঠাণ্ডা জল আছে।

হঠাৎ তার মনে হল তাকে পাব কি? সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, না পাব না। তার তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে এই রূঢ় উত্তরটা দিলে। কিন্তু তার অন্তরের অন্তস্তলে যে ফল্গুধারা বইছিল তার তীরে বসেছিল কে একজন। সে বললে—পাবে পাবে নিশ্চয় পাবে।

কিছু দূর হেঁটে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। দেখলে একটা রোগা চিনেম্যানকে একটা কুচকুচে কালো মেয়ে জল খাওয়াচ্ছে। জল ঢেলে দিচ্ছে একটা সুদৃশ্য মগ থেকে। চিনেম্যানটা অঞ্জলি পেতে অঞ্জলিতে মুখ লাগিয়েই জল খাচ্ছে। কলকাতা শহরের রাস্তায় কিছুই বিসদৃশ নয়, কিন্তু এ দৃশ্যটা ভারি অদ্ভুত মনে হল তার। কে ওই কালো মেয়েটা? ওর নাম নিশ্চয় শ্রাবণী। মূর্তিমতী শ্রাবণ যেন। চিনেম্যানটার সঙ্গে ওর সম্পর্ক কি? হঠাৎ এক পাল ছাগল আর ভেড়া এসে পড়ল। ফুটপাথেও উঠে পড়ল তারা। রাস্তায় তখন মোটরের ভিড় ছিল না। ভিক্‌টোরিয়া গাড়ি একটা দাঁড়িয়ে ছিল মোড়ের দিকে আর টুং টুং করে চলেছিল একটা রিক্‌শা। সবাই কিন্তু অভিভূত হয়ে পড়ল এই ছাগলদের ভিড়ে। ভিক্‌টোরিয়া গাড়ির ঘোড়াটা কান খাড়া করে হ্রেষাধ্বনি করে উঠল একবার। কিন্তু তা গ্রাহ্য না করে কশাইখানার যাত্রী সব দ্রুতবেগে ছুটে চলতে লাগল মৃত্যুর দিকে।

হাঁটতে লাগল আবার। এটা কোন্ পাড়া? কোন্ রাস্তা? এ সব নিয়ে মাথা ঘামাল না সে আর। দু একটা রাস্তা ছাড়া সব রাস্তাই এক রঙা। অন্যমনস্ক হয়ে যেতে হোঁচট খেল এক জায়গায়। স্তূপাকার বাঁধাকপি ফুটপাতের উপর। পাশেই একটা বাঙালি মিষ্টির দোকান—Haru's Sweets। বাঙালিরা পারতপক্ষে বাংলায় দোকানের নাম লেখে না। হঠাৎ মনে হল কথাটা। পরমুহূর্তেই কিন্তু ভুলে গেল আর একটা লোকের ধাক্কা খেয়ে। তারপরই খানিকটা ফাঁকা ফুটপাথ। তারপরই একটা ছোট্ট পার্ক।

পার্কে গিয়ে ঢুকল সে। ঢুকে বসে পড়ল একটা বেঞ্চির উপর। আহ্। বড্ড পা ব্যথা করছিল। অনেকক্ষণ বসে রইল চুপ করে। তারপর খদ্দরের জামা আর কাপড়টা দেখলে। দুটাই বেশ ভাল। কিন্তু কাপড়জামা বদলাবে কোথায়! রাতে কোথাও বদলাতে হবে। আর একটা কথাও মনে হল। এই কাপড়জামা পরে ভিক্ষা করা চলবে কি? ফরসা কাপড়জামা দেখে লোকের দয়ার উদ্রেক হবে কি? দয়ার বা বিরক্তির? বিরক্ত হয়েই লোকে দু-এক পয়সা ভিক্ষে দেয় সাধারণত। সামনের একটা ইলেক্‌ট্রিক তারের উপর কাক বসে ছিল একটা। তার পাশে আর একটা কাক উড়ে এসে বসল। বসেই হাঁ করল, আর প্রথম কাকটা তার মুখে ঠোঁট ঢুকিয়ে খাবার খাইয়ে দিলে। ওর মা নিশ্চয়। একটা ছেলে গুলতি দিয়ে টিপ করছিল ওদের। ওরা সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেল।

পার্কে অনেকক্ষণ কেউ এল না। তারপর এল একটা কুৎসিত কালো লম্বা মেয়ে। তার কাঁধে একটা লম্বা থলি। সে আনমনে কাগজ কুড়িয়ে সেই থলিতে ভরতে লাগল। তারপর চলে গেল। তার দিকে একবার ফিরেও চাইল না। আকাশের দিকে চেয়ে দেখল একটা চিল চক্কোর দিচ্ছে। চিল না শকুনি? ঠাহর করতে পারল না ঠিক। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল সেই রোগা চিনেম্যানটাকে। বার করল কবিতার খাতা—

অনেকদিন পরে টুংলিং এল।
বুঝতে পারলাম না।
সে মানুষ না দিগন্ত পারের হাতছানি।
এসে বললে, তেষ্টা পেয়েছে
বড্ড পিপাসিত আমি
ওগো বাঙালি বাবু
আমার পিপাসা মেটাও।
ভদ্‌কা শ্যামপেন বারগাণ্ডি রম কোঁইয়াক্
অনেক খেয়েছি ঃ পিপাসা মেটেনি।
নিয়ে গেলাম তাকে শ্রাবণীর কাছে
যার নিতল চোখের অতলতায়
ডুবে গেছে বড় বড় মানোয়ারি-জাহাজ।
সে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ
চোখের পাতা দুটো কাঁপল একটু।
তারপর বাঁশি বেজে উঠল
তার উদ্ভাসিত চোখে মুখে।

সে বাঁশি বলল, তুমি
শত্রুর মুখোস পরে আছ
কিন্তু তুমি শত্রু নও।
তোমার পিপাসা মেটাব আমি।
আমি ভারতবর্ষ।
আগেও তোমার পিপাসা মিটিয়েছিলাম।

হঠাৎ তার মনে পড়ল চীন-আক্রমণের কথা। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল আমাদের দেশেই আমাদেরই আপন লোকেরা কি প্রতিদিন আক্রমণ করছে না আমাদের? পাড়ায় পাড়ায় কেন ঘরে ঘরেই কোন্দল জুয়াচুরি ধাপ্পাবাজি খুন জখম দলাদলি তো খবরের কাগজের প্রধান খবর এদেশে। এরই ঘূর্ণাবর্তে তো আবর্তিত হচ্ছি আমরা, চোরেরা চুরি করছে আর ভদ্রলোকেরা মারা যাচ্ছে। হঠাৎ তার মনে হল—কিন্তু না, আমি এ চাই না। আমি জানি এ থাকবে না। চাবুকে জর্জরিত হয়েছে, কিন্তু চাবুক থেমে যাবে! আমি চাই—হঠাৎ সে গুলিয়ে ফেলল সব। কি চায় সে? নিজেই জানে না। তার মনে হল অবাস্তব চাওয়াটা বাস্তব হবে না কখনও। তা উচ্চারণ করলে হো হো করে হেসে উঠবে সবাই, কিন্তু তবু আশা ছাড়তে পারে না সে। আর একটা কবিতা লিখে ফেললে সে—

কেমন যেন গুটিয়ে যায় সব
আসে, খুব কাছে আসে—
কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাল-গোল পাকিয়ে যায় যেন।
নিয়তি, ভগবান, কর্মফল, অদৃষ্ট।
এদের মানলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম।
কিন্তু মানি না, মানতে পারি না।
বুদ্ধি রাশ টেনে ধরে।
তাই সাজগোজ করি শুধু
তারপর দিক্‌বিদিক্‌-জ্ঞান-শূন্য হয়ে
ঝাঁপিয়ে পড়ি চিন্তার সমুদ্রে।
নাকানি চোবানি খাই
তবু মনে হয়
এই সমুদ্র থেকে হয়তো উর্বশী উঠবে
এই দুধ থেকেই মাখন।
এ আশা ছাড়িনি এখনও
তাই আকাশ নীল

তুমি অপরূপ।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে তার 'তুমি' নেই। কিন্তু আর একজন বসে আছে বেঞ্চের ও-প্রান্তে। চ্যোং-প্যান্ট পরা দাড়িওলা একটা ছেলে। গায়ে একটা আধুনিক বুশ-শার্ট। চোখে চশমা। গলায় একটা বাইনাকুলার। কবিতা-লেখায় মগ্ন ছিল বলে বুঝতে পারেনি এই অদ্ভুত লোকটি কখন এসে বসেছে।

হাঁ করে চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর চোখাচোখি হতেই নমস্কার করলে। সে ছেলেটিও নমস্কার করে হাসলে একটু।

'আপনার গলায় ওটা কি?'

'বাইনাকুলার।'

'কি করেন ওটা দিয়ে?'

'পাখি দেখি।'

'পাখি দেখেন? কেন?'

'আর কিছু করবার নেই বলে।'

'তার মানে?'

'তার মানে আমি বেকার। কেরানীগিরি করবার সুযোগ পাইনি।'

ছোঁড়াটা হেসে বলল—'আমিও—'

'কি করেন আপনি?'

'রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই আর ভিক্ষে করি।'

দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর সেই লোকটা বলল—'চলুন তাহলে যাওয়া যাক—'

চলতে লাগল দুজনে। হঠাৎ দাড়িওলা বলল, 'আমি হিন্দু।'

'কোথা যাচ্ছি আমরা?'

'বিশেষ কোনো ঠিকানা নেই। বিনুর কথায় এখানে ভুল জায়গায় এসে পড়ছিলাম। সে বলে দিল এই পার্কে নাকি কুলো পাখি দেখা যাবে। কিন্তু এখানে এসেই বুঝলাম যাবে না। এ তো তকমা-আঁটা সভ্য-ভব্য পাড়া, এখানে কি ওই গেঁয়ো পাখি থাকতে পারে? তিনতলায় জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলাম কে একজন খাঁচায় কয়েকটা মুনিয়া পুষেছে। আহা মুনিয়ার ঝাঁক একবার দেখেছিলাম ভাগলপুরে স্যানাডিস কম্পাউন্ডে। মাঠের খানিকটা হঠাৎ যেন উড়ে গেল আকাশে। এখানকার মাঠে জোড়া জোড়া ঘুঘু বসে আছে, মানে প্রেমিক ঘুঘু। দূরে নানা রঙের "নিয়ন" আলো জ্বলছে, আর মোটরের হর্ন শোনা যাচ্ছে। রাবিশ্, আসুন, এই ট্রামটায় ওঠা যাক—'

ছোঁড়াটা বললে— "আমার পয়সা নেই—"

'আপনি আসুন না। আমিই আপনার টিকিট কাটব। উঠে পড়ুন।'

উঠে পাশাপাশি একটা বেঞ্চে বসে দাড়িওলা ছেলেটা বললে— 'সিগারেট খান?'

'না—'

'আমি কিন্তু খাই। কিন্তু ট্রামে খেলে আপত্তি করবে সবাই। তাই এখন খাব না। এইটে মুখে ফেলে দিই। এসপ্ল্যানেডে নেবে সিগারেট ধরাব।'

একটা বড়ি মুখে ফেলে দিলে ছোকরা।

'কি খেলেন ওটা—'

'নেশার বড়ি। খাবেন?'

'না। খেতেই পাই না, নেশা করার পয়সা পাব কোথা—

'কোনো নেশা নেই আপনার।'

'আছে। কবিতা লিখি মাঝে মাঝে—'

'ও তাই নাকি। তাহলে তো আপনি গুণী লোক মশাই। চলুন আমার বাড়ি—বাড়ি মানে হোটেল। আপাতত একটা হোটেলে থাকি। বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে। পাক সেনার অত্যাচারে পালিয়ে এসেছি। বিনোদ আমাকে এই হোটেলটা ঠিক করে দিয়েছে। বিনোদ আমার সহপাঠী। দুজনেই আমরা প্রেসিডেন্সিতে পড়েছি। ঢাকায় আমাদের বাড়ি। পরীক্ষা পাস করে সেখানেই গিয়েছিলাম চাকরির চেষ্টায়। এমন সময় যুদ্ধ বেধে গেল। আমার বাবা-মাকে মেরে ফেললে ওরা, সে দানবীয় অত্যাচার বর্ণনা করা যায় না। গা শিউরে ওঠে। কিন্তু সব মুসলমানরাই খারাপ নয়। কাশেম বলে এক মুসলমানের সাহায্যে আমি আর আমার বোন তামা পালাতে পেরেছিলাম। কাশেম আমাদের বাড়ির সহিস ছিল। ঘোড়া ছিল আমাদের। সেই ঘোড়া করে মাঠামাঠি ঘুরপথ দিয়ে কাশেম আমাদের পার করে দিয়েছিল। এখন হোটেলে আছি—'

ছোঁড়াটা বললে—'হোটেলে থাকতে তো পয়সা লাগে—'

'আমার পয়সা আছে আপাতত। আমার বাবা একটা ভালো কাজ করেছিলেন। কিছুদিন আগে তিনি এখানকার একটা ব্যাংকে আমার নামে অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন। তাঁর ভয় হয়েছিল ওদেশে হয়তো আর থাকা যাবে না। বাড়িটা বিক্রি করতে পারেননি। নগদ টাকা সব তুলে এনে জমা করেছিলেন আমার নামে। ভাগ্যে আমার নামে করেছিলেন তা না হলে'—হঠাৎ চুপ করে গেল সে। তারপর আর একটা বড়ি মুখে ফেলে চুপ করে বসে রইল। অন্যমনস্ক হয়ে গেল কেমন যেন। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।

'একটা চিল বসে আছে— দেখে আসি ওর ল্যাজটা—'

ছোঁড়াটাও নেবে পড়ল তার সঙ্গে।

গড়ের মাঠ। অনেক দূরে একটা ইলেকট্রিক থামের উপর বসে ছিল চিলটা।

'আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি দেখে আসি। আর আপনার যদি কৌতূহল থাকে আপনিও আসুন।'

'নাঃ, আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি, আপনি দেখে আসুন।'

একটা স্টলের কাছে দাঁড়িয়ে রইল সে। একটি কথাই মনে হতে লাগল—পাকসেনারা ওর বাবা ও মাকে হত্যা করেছে। ও এখন নেশা করবার জন্য কি একটা বড়ি চুষছে। আর পাখি দেখে বেড়াচ্ছে। চিলের ল্যাজ—তাতে দেখার কি আছে?

পাশে চেয়ে দেখল খবরের কাগজের স্টল একটা। নানা রকম রঙিন মলাটের পত্রিকা। আর প্রায় প্রত্যেক পত্রিকার উপরই নানা ভঙ্গীতে মেয়েমানুষের ছবি। লালসা-জাগানো ছবি। ওপাশে একটা লোক ফল বিক্রি করছে। চমৎকার কলা রয়েছে। কলা তার খুব প্রিয়। কত দিন যে কলা খাইনি—হঠাৎ মনে হল তার। হঠাৎ কয়েকজন বলিষ্ঠ পাঞ্জাবী ড্রাইভার হো হো করে হাসতে হাসতে ওপাশে দাঁড়ানো লরিগুলোর দিকে চলে গেল। একটা অর্ধ-উলঙ্গ ফিরিঙ্গি মেয়ে খট খট করে চলে গেল সামনে দিয়ে। চুল বব্ করা। পরনের স্কার্ট উরুর অর্ধেকও ঢাকতে পারেনি। খটখট করে একটা বাসে উঠল তারপর জানলা দিয়ে হাত নাড়তে লাগল। কাকে সম্ভাষণ করছে ভিড়ের মধ্যে ঠিক বোঝা গেল না। একটা দামী মোটর এসে দাঁড়াল। মোটরের জানলায় একটি তরুণীর মুখ। মনে হল যেন স্বয়ং লক্ষ্মী। সমস্ত দিন খাই নি মা—দয়া করে কিছু দিন। মেয়েটি ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা টাকা দিয়ে দিল তাকে। অবাক কাণ্ড।

হ্যাঁ সত্যি একটা টাকা। সঙ্গে সঙ্গে সে দুটো কলা কিনে ফেলল। ভালো মর্তমান কলা। দুটোর দাম নিল—তিরিশ নয়া। কলা খাওয়া শেষ করেছে এমন সময় সেই দাড়িওলা ছোকরা ফিরে এল।

'চিলের ল্যাজ দেখলেন?'

'না। উড়ে গেল। আশ্চর্য ওর ল্যাজ! মনে হয় কতকগুলো ছুরি যেন সাজানো আছে। যখন ওড়ে তখন সেগুলো দুদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মনে হয় ল্যাজটা বুঝি চেরা। ফিঙে পাখির ল্যাজে দুটো বাঁকা ছোরা আছে। চিলেরও অনেকগুলো। পাখির ল্যাজ একটা আশ্চর্য জিনিস। দোয়েল আর দর্জি পাখির ল্যাজ তোলা দেখে বোঝা যায় ওদের তেরিয়া ভাব, খঞ্জনের ল্যাজ দোলানো যেন ওদের সদা-চঞ্চল সদা-ব্যস্ত স্বভাবের পরিচয় দিচ্ছে, কাজল পাখি আস্তে আস্তে ল্যাজ দোলায়, মনে হয় যেন ও একটু হিসেবি, থিরথিরা পাখির ল্যাজ দোলানো চমৎকার, উপর-নীচ নয়, পাশাপাশি তার সঙ্গে একটু নমস্কার করার ভঙ্গীও আছে, বুলবুলির ল্যাজের তলায় আগুন—টকটকে লাল। ময়ূরের ল্যাজ তো দেখেছেন, তাকে আমরা পেখম বলি, কুলো পাখিও ওই রকম পেখম তুলে নাচে, যার খোঁজে আজ গিয়েছিলাম—কিন্তু—'

ছোকরা থেমে গেল হঠাৎ। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

'কিন্তু কি—'

'মাকে মনে পড়ছে। মায়ের একটি টিয়া ছিল। অদ্ভুত ছিল তার লেজ। সবুজে, নীলে হলুদের আভায় সে যেন একটা রঙের ঝর্ণা। মা পাখি ভালোবাসত। কাক চড়ুই শালিক সবাইকে খেতে দিত—'

আবার চুপ করে গেল। তারপর হঠাৎ আবার বলে উঠল— 'জানেন আমার সেই মাকে ওরা খুন করেছে। খুন করবার আগে সতীত্ব হরণ করেছে, তারপর গুলি করেছে—আমার মা কারও কোনো অনিষ্ট করেনি—ওরা—' হঠাৎ থেমে গেল আবার।

'চলুন যাই। হোটেল কাছেই—'

রাস্তা পার হওয়া সহজ নয়। মোটর গাড়ির সারি চলেছে। মানুষ অসংখ্য। সবাই ছুটছে। ছোঁড়াটার মনে হল কে যেন ওদের চাবুক নিয়ে তাড়া করছে। প্রাণভয়ে পালাচ্ছে সবাই। একটা ফেরিওয়ালা কিন্তু নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ধারে—হাতে একটা বাঁশ, তাতে অসংখ্য রঙিন বেলুন! ওপাশে সারি সারি রিক্‌শা। পরমুহূর্তেই হাঁ হাঁ করে উঠল সবাই—একটা ছোট ছেলে ছিটকে গিয়ে পড়েছে রাস্তার মাঝখানে। তার মা তাকে ধরবার জন্যে আলুথালু বেশে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভিড়ের ভিতর। দেখে মনে হল বিহারিণী। নাকে প্রকাণ্ড একটা নথ। মাথায় এক থ্যাবড়া সিঁদুর।

হোটেলটি অভিজাত হোটেল। তারই দোতলায় দুটি ঘর নিয়েছে দাড়িওয়ালা ছোকরা। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে দাড়িওয়ালা ছোকরা হঠাৎ জিগ্যেস করল— 'আপনার নামটা জিগ্যেস করা হয়নি। আমার নাম সাতকড়ি। আপনার?'

'আমার নাম সত্যেন। সত্যেন ভদ্র।'

'ডাক নাম সাতু কি?'

'হ্যাঁ—'

'আমারও ডাক নাম সাতু। অদ্ভুত মিল হয়ে গেল! বাঃ—'

ছোঁড়াটা অবাক হয়ে যাচ্ছিল। আরব্য উপন্যাসে আবু হোসেনের গল্প পড়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে

সেই গল্পেরই পুনরাবৃত্তি ঘটছে না কি! এমন একটা অভিজাত হোটেলে সে যে প্রবেশ করতে পারবে তা একটু আগেও কল্পনার অতীত ছিল।

হঠাৎ কপাটটা খুলে একটি শেমিজপরা মেয়ে দেখা দিয়েই অন্তর্ধান করল নিমেষে।

সাতকড়ি নিম্নকণ্ঠে বলল— 'তামা—'

তারপর চেঁচিয়ে বলিল—'ও তামাম্, নতুন বন্ধু পেয়েছি।'

ঘরে ঢুকে কাউকে দেখতে পেল না সে। সোফা-সেটি দিয়ে সাজানো ঘর। একপাশে একটা ছোট ডিভান রয়েছে। ডিভানের উপর অনেক বাংলা ইংরেজি বই। ডিভানের পাশেই একজোড়া লাল স্যান্ডাল।

'তামা কোথা গেলে, কে এসেছে দেখ—'

শেমিজের উপর একটি লম্বা কোট গায়ে দিয়ে একটি মেয়ে কপাট খুলে ঘরে ঢুকল। ঢুকে নমস্কার করল।

সাতকড়ি বললে—'এর সঙ্গে রাস্তায় হঠাৎ দেখা। কুলো পাখি খুঁজতে গিয়ে এঁকে পেলাম। এর দুটি মহৎ পরিচয়। প্রথম—ইনি আমাদের মত বেকার, দ্বিতীয় উনি কবি।'

তারপর ছোঁড়াটার দিকে ফিরে বলল—'এঁর নাম তামা। পুরো নাম নূরতামাম। আমি সেটা ছোট করে নিয়েছি। আমার বাবার বন্ধু জাফর আলির মেয়ে ও। ওর বাড়িরও কেউ বেঁচে নেই। ওর বাবাকে আমরা জেঠু বলতাম। সুতরাং তামা আমার বোন। আপনাকে আমরা কি বলে ডাকব? মিতা, না স্যাঙাৎ?'

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ছোঁড়াটা। তার মনে হচ্ছিল এদের বাড়ির সবাইকে খুন করেছে বর্বর পাক সেনারা। অথচ এরা কত সহজভাবে কথা বলছে।

'চুপ করে আছেন কেন? ভাব করুন তামার সঙ্গে। ও খুব সাহিত্য-রসিক। বাংলায় অনার্স নিয়ে বি-এ পাস করেছে। কবিতা খুব ভালোবাসে—'

ছোঁড়াটা চেয়ে দেখল তামার চোখ দুটো প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। নাকের ডগাটা ঈষৎ কাঁপছে যেন। হঠাৎ সে আশ্চর্য হয়ে গেল তার গায়ের রং দেখে। রংটাও যেন তামার মতো। লালচে অথচ উজ্জ্বল। মনে হল কি একটা বইয়ে যেন রেড ইন্ডিয়ান যুবতীর ছবি দেখেছিল অনেকদিন আগে, তার গায়ের রং আর তামার গায়ের রং যেন এক। উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ। কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়ল সে।

অপ্রত্যাশিতভাবে তামা কথা বলল।

'আপনাকে আমরা অতিথি বলে ডাকব। কখনও সেটা হবে "অতি" কখনও "তিথি"। নতুন রকম হল। রাজি?"

ছোঁড়াটা তবুও নির্বাক হয়ে রইল। কোনো কথাই সরছিল না তার মুখ দিয়ে। তার কেবলই মনে হচ্ছিল এদের জন্যে আমি কিছুই করিনি তো।

তামা আবার ভিতরে চলে গেল।

'বসুন দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? চটপট ঘরের লোক হয়ে যান। তামা, খিদে পেয়েছে।'

তামা আবার বেরিয়ে এল।

বললে—'সন্দেশ কিন্তু একটি আছে। সেটি অতিথিকে দেব। ডিম আছে, ডিমের অমলেট বানিয়ে দিচ্ছি। চা খাবেন, না কফি—'

ছোঁড়াটা তখন বলল— 'যা দেবেন তাই খাব, খুব ক্ষিধে পেয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে—আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করবার আগে আমার পরিচয় আপনাদের জানানো উচিত—'

হো হো করে হেসে উঠল সাতকড়ি। তামার চোখে-মুখেও একটা হাসির আভা ঝলমল করতে লাগল।

ছোঁড়াটা বলল—'আমি ভিখারি। রাস্তার সাধারণ নগণ্য ভিখারি আমি—'

তামা বলল—'আমরাও ভিখারি—ভিখারি তো কি হয়েছে? যতক্ষণ সাতুর ব্যাংক ব্যালান্স "নিল" না হবে ততক্ষণ আমরা চালিয়ে যাব। আসুন ও-ঘরে। ইলেকট্রিক স্টোভ আছে তারই পাশে বসবেন। মেজেতে বসেই খাওয়া-দাওয়া করি আমরা। আসুন—'

খেতে খেতে সাতু বলল, 'খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমরা দুজনেই কিন্তু বেরিয়ে যাব। দুজনেরই ইনটারভিউ আছে দু জায়গায়। আপনি কি থাকবেন এখানে?'

অবাক হয়ে গেল সত্যেন।

বলল—'আমাকে তো আপনারা চেনেন না। আমাকে বিশ্বাস করে বাড়িতে রেখে যাবেন?'

তামা একগাল হেসে বলল—'যাব। আপনি যদি আমাদের জিনিসপত্তর চুরি করে নিয়ে যান, তাহলে কি যে মজা হবে! সাতু আবার সব নতুন জিনিস কিনে দেবে। দেবে না সাতু?'

'নিশ্চয় দেব। কিন্তু উনি জিনিস চুরি করে পালাবেন না।'

দু'কাপ চা, চার টুকরো মাখন দেওয়া পাঁউরুটি, দুটি ডিমের অমলেট এবং একটি সন্দেশ খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়েছিল সত্যেনের। তখনি সে যেন বুঝতে পেরেছিল এ কয়দিন সে প্রায় অনাহারেই ছিল। খেয়ে ঘুম পাচ্ছিল তার। বলল—'আমার ঘুম পাচ্ছে। আমি এখানে একটু ঘুমুই। আপনারা এলে তারপর চলে যাব।'

'চলে যাবেন কেন?'

সাতু জিগ্যেস করল।

চুপ করে রইল সত্যেন। তারপর বলল, 'আপনাদের কাছে থাকবার দাবি অর্জন করিনি তো।' তারপর হঠাৎ বলল—'পথে পথে ঘুরে বেড়াতেই আমার ভালো লাগে বেশি। আমি নিজেকেই খুঁজছি যেন। মামার বাড়িতে তাই থাকতে পারিনি।'

তামা বলল— 'বেশ না থাকেন, না থাকবেন। আমরা তো আপনার নিজের লোক নই যে জোর করব আপনার উপর। কিন্তু একটা ফরমাস আছে। ফিরে এসে একটা কবিতা যেন দেখতে পাই। টেবিলের উপর কাগজ কলম সব আছে।'

সাতু বলল—'আর একটা কথা। আমাদের এখানে আপনার একটা পার্মানেন্ট নিমন্ত্রণ রইল। যখন খুশি আসবেন। এতে রাজি তো?'

সত্যেন মুখে হাসি ফুটিয়ে চুপ করে রইল।

তামা বলে উঠল—'নতুন ধরনের উপমা দিতে হবে কবিতায়। আমরা নূতনত্বের পক্ষপাতী কিন্তু।'

সত্যেন হেসে বলল—'তা তো দেখতে পাচ্ছি। লম্বা কোট পরা মেয়ে এর আগে দেখিনি। এ কোট আপনি করিয়েছেন?'

'না। এটা সাতুদার। আমাদের আরও নতুনত্ব আছে, শুনবেন? সাতুদা রোজ নামাজ করে আর আমি গায়ত্রী জপ করি—'

সাতু গম্ভীরভাবে বলল—'অথচ আমরা পরস্পরের প্রেমে পড়িনি।'
কলকণ্ঠে হেসে উঠল দুজনেই।

বিকেলবেলা তামা ফিরে এসে দেখল প্যাডে একটি কবিতা লেখা রয়েছে।

পাকিস্তানের জঙ্গী বর্বররা
বাংলাদেশের মা বোনদের উপর যখন
অকথ্য অত্যাচার করছিল,
জ্বালাচ্ছিল ঘর বাড়ি
চালাচ্ছিল ছোরা ছুরি বেওনেট-বোমা
যখন বাংলাদেশের জীবন্ত আত্মা
জীবন্ত কই মাছের মতো
ছটফট করছিল নৃশংসতার তপ্ত কটাহে,
দেশের বীরত্বসৌরভ যখন
সদ্য-ভাজা ইলিশ মাছের গন্ধের মতো
বিচ্ছুরিত হচ্ছিল দিগদিগন্তে,
তখন আমি কি করছিলাম?
কিছুই করিনি।
এক ফোঁটা জলও পড়েনি চোখ দিয়ে।
হাহাকারের সাইরেন বাজছিল
বাংলাদেশ জুড়ে
সেই সাইরেন আমি শুনেছিলাম
কিন্তু ছুটে যাইনি পাগলের মতো
সীমান্ত পার হয়ে,
মহাভারতের পাণ্ডব হয়ে গিয়েছিলাম যেন
দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দেখছিলাম মনে মনে
নিষ্ক্রিয় সঙের মতো!
আমাদের সেনারা গিয়েছিল সত্য
কিন্তু আমি যাইনি
আমি নিটোল ছিলাম, অটুট ছিলাম
আমার বুকে ভেঙে যায়নি।
কিছুই করিনি আমি।
একেবারে কিছুই করিনি কি?
করেছিলাম, করেছিলাম, মনে পড়েছে—
নপুংসকদের আড্ডাখানায়
টেবিল চাপড়ে তর্ক করেছিলাম

আর চা কফি উড়িয়েছিলাম
কাপের পর কাপ।
তামা, সাতু,
আজ বুঝলাম
তোমরা আমার কেউ নও, অথচ সব।
আজ চোখ ফেটে জল পড়ছে তাই।
থাকতে পারলাম না—তবু
তোমরা আমার নাগালের বাইরে।
চললাম।
আমি তোমাদের কাছে থাকবার অযোগ্য।

॥ ৩ ॥

এই কলকাতা শহরেই মাঝে মাঝে অদ্ভুত গলি দেখা যায় এক একটা। ট্রাম লাইন থেকে দূরে, একে বেঁকে চলে গেছে এ-বাড়ি ও-বাড়ির পাশ দিয়ে। দুপুরে অদ্ভুত নির্জন নিঃশব্দ হয়ে যায় গলিটা। বাড়ির কপাট জানালা সব বন্ধ। পুরুষেরা কাজে বেরিয়ে গেছে, মেয়েরাও হয়তো। যারা কাজে বেরোয় না তারাই বসে আছে ঘরে খিল দিয়ে। ঘুমুচ্ছে বোধ হয়। রেডিওর শব্দ পর্যন্ত নেই।

একজনের বাড়ির ভিতর থেকে একটা নিমগাছ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে গলিটার ওপর। গলিতে ছায়া হয়েছে খানিকটা। সেই ছায়াতেই বসেছিল সত্যেন। পাশে ছিল তার নতুন বন্ধু টোটো। রাস্তার কুকুর একটা। তার সঙ্গে ভাব হয়েছে। একদিন সে যখন জিলিপি কিনে খাচ্ছিল তখন লোলুপ এই কুকুরটাকে দিয়েছিল একখানা জিলিপি। সেই থেকে সে সঙ্গে সঙ্গে আছে। সে ভিক্ষে করে যা পায় তার অংশীদার হয়েছে টোটো। টোটো নামকরণ সত্যেনই করেছে। টোটোর যৌবন নেই। বুড়ো হয়ে গেছে। কাল যখন সে পাঁউরুটির টুকরো ছুঁড়ে দিয়েছিল তখন টোটোর মুখে একটা অদ্ভুত প্রশ্নাকুল দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল। মনে হয় তার নিজের মনোভাবই যেন প্রতিফলিত হয়েছে টোটোর চোখের দৃষ্টিতে। মনে কবিতা জেগেছিল সে দৃষ্টি দেখে। সাধারণত সে কবিতার নামকরণ করে না। কিন্তু এ কবিতাটার নাম দিয়েছিল—সত্যেনের প্রতি টোটো।

সকালে ঘণ্টা-দুই ভিক্ষে করলে আজকাল প্রায় এক টাকা পেয়ে যায় সে। প্রায় ছাতু কিনেই খায়। অনেকক্ষণ ক্ষিদে পায় না। যখন কবিতাটা মনে জেগেছিল তখন ছিল সে পার্ক স্ট্রীটে। মহাসভ্য স্ট্রীট। আগে সাহেবরা এ পাড়ায় থাকত। এখানে ছাতু পাওয়া গেল না। পাঁউরুটি কিনেছিল একটা। টোটো পাঁউরুটি খেয়েছিল সেদিন। কবিতাটা লিখেছিল কিন্তু গড়ের মাঠে গিয়ে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়েলের ছায়ায় বসে।

সত্যেনের প্রতি টোটো

চলে গেছে যৌবন কলা দেখিয়ে।
কলাটা পেলাম না
তাই মিথ্যে কলা নিয়ে

মানে, ছলা-কলা নিয়ে আছি।
তুমি কিন্তু বলছ যা
আমি তা মানব না।
আকাশে মেঘগুলো
ছড়ানো-ছড়ানো
পেঁজা-পেঁজা
স্তূপ স্তর—নানা রকম।
এখনও কলের ভোঁ বাজেনি
এখনও আমি ডিউটি করছি
গোটাই আছি
ছিন্নভিন্ন হইনি।
নতুন বকলস দেখাচ্ছ আমাকে?
বকলস?
বকলস—হায় হায়—বকলস—
কিন্তু তবু বকলসের লোভ
কাবু করেনি আমায়।
কিন্তু কান খাড়া হয়ে উঠল
তোমার ভদ্রতার আড়-বাঁশিতে
ফুঁ দিলে যখন।
আমার অবশ চেতনার যেন
সাড় হল
চাড় হল
দুদ্দাড় করে ছুটে গিয়ে কামড়ে ধরলাম
তোমার ছুঁড়ে-দেওয়া পাঁউরুটির টুকরোটাকে।
কিন্তু হায়-হায়
শেষ পর্যন্ত—হায় হায়—
ভুলে যাই
আমি কুকুর—শুধু কুকুর।

কবিতাটি মৃদুকণ্ঠে পড়ল সে আবার। পাশে চেয়ে দেখল কেউ নেই। কেউ মানে, প্রিয়া। আগেই বলেছি সে প্রতিদিন কল্পনা করে একটি প্রিয়াকে। আজ কল্পনা করছিল নীলাম্বরী একটি শ্যামলী যেন ঝুঁকে দেখছে তার কবিতাটি। ফিরে দেখল কেউ নেই। টোটো কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে শুয়ে আছে। টোটোর হলদে রং। এখনও হলদে আছে, কিন্তু রংয়ের জলুস নেই। গায়ে ঘা হয়েছে মাঝে মাঝে। বুড়ো হয়ে গেছে টোটো।

ছোঁড়াটা ভাবতে লাগল—আমি যাকে খুঁজছি তাকে পাচ্ছি না কেন? সে তো যুগে যুগে এসেছে। কাব্যে এসেছে, ইতিহাসে এসেছে, অনেকের জীবনেও এসেছে, আমারও মনের অন্তরীক্ষে এসেছে

কতবার রঙিন আভাসে। কিন্তু মূর্তি ধরে আসেনি। একবারও আসেনি। বড় রাস্তায় দলে দলে মেয়ের সারি দেখছে সে। কিন্তু তাদের মধ্যে একজনকেও দেখেনি যে তার প্রিয়া হবার যোগ্য। কতগুলো কাপড়ের আলনা যেন হেঁটে চলেছে, কতকগুলো মাংসের স্তূপ। প্রিয়া নয় কেউ। কারো আয়তনয়নে লজ্জিত সুরুচি নেই। সব যেন উদ্ধত কাঠখোট্টা। সে আসেনি। খাতা বার করে আর একটা কবিতা শুরু করল সে—।

নান্নুরের কবি-কণ্ঠ হয়েছিল যবে উদ্বেলিত
সে আহ্বানে এসেছিলে তুমি।
বেথেলহাম-কুটীর-প্রাঙ্গণে
এলেন দেবতা যবে
তুমি এসেছিলে।
শীর্ণ-গঙ্গার অঙ্গ হল যবে শিহরিত
কোশী-নদ-আলিঙ্গনে
তুমি এসেছিলে।
উদ্দাম পিয়ানো-মঞ্চে
বিটোফেন-ভাগনার যবে
আলিঙ্গন-বদ্ধ হল
তুমি এসেছিলে।
এসেছিলে গোলাঘরে জ্যোৎস্না বিলাসেতে,
এসেছিলে
যূথিকার চুপি অভিসারে
সন্ধ্যার গন্ধান্বিত অন্ধকার পথে।
কিন্তু হায় এলে না তো
যবে আমি
অখ্যাত পথের ধারে
বসে আছি কন্থা-সম্বল
তপ্ত পীচের পরে
আর্ত প্রত্যাশায়—
এলে না তো।
আর্ত প্রত্যাশার অগ্নি জ্বলে
হুহু-চুল্লী সম,
মন মোর জ্বালামুখি যবে
স্নিগ্ধ বারি সম তুমি এলে না তো।
ঘামাচি-বিক্ষত-পৃষ্ঠে
তোমার পেলব বাহুলতা
ক্ষণ-স্পর্শ দিল না তো।

এলে না—এলে না
মধ্যাহ্নের সূর্য সাক্ষী
হে মোহিনী, হে অবর্ণনীয়া,
মোর কাছে একবারও আসনি ভুলিয়া।

কবিতা লেখা শেষ না হতেই নির্জন গলিটা সহসা কার আর্তরবে যেন মুখরিত হয়ে উঠল। একটু পরেই দেখা গেল চোং-প্যান্ট-পরা একটা ষণ্ডা জুলফিদার ছেলে একটা দশ-বারো বছরের ছেলেকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। ছেলেটার আর্তরবে ভরে উঠল গলিটা। উপরের একটা ঘরের জানলা খুলে গেল। ষণ্ডা ছেলেটা বলল—বাড়ি চল, জুতিয়ে তোমাকে লম্বা করব।

টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। অদৃশ্য হয়ে গেল গলির বাঁকে। টোটোর ঘুম কিন্তু ভাঙেনি। সে যেমন কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছিল তেমনি ঘুমুতে লাগল। সে নির্বিকার।

একটু পরেই আবার নিঃশব্দ হয়ে গেল নির্জন গলিটা। কিন্তু বেশিক্ষণ নিঃশব্দ রইল না। নিমগাছটার উপর বুলবুলি ডেকে উঠল একটা। সে ডাক অবর্ণনীয়। কাকে যেন খুঁজছে। পরক্ষণেই উড়ে গেল। সত্যেনের মনে হল তার মনটাই বুঝি বুলবুলি হয়ে গাছে গাছে খুঁজছে তাঁর সঙ্গিনীকে।

মনের ভিতর থেকে আর একজন কে বলে উঠল—শুধু সঙ্গিনী পেলেই কি খুশি হবে? সঙ্গিনীর আনুষঙ্গিক যে সব জিনিস অপরিহার্য তা যোগাড় করবার সামর্থ্য তো নেই তোমার? তুমি অসমর্থ, তুমি গরিব, বিজ্ঞানের ভাষায় 'আনফিট'। সঙ্গিনীকে ঘিরে আদর্শ সংসার না গড়লে অকস্মাৎ তোমার সমস্ত শরবৎ চিরতার চেয়ে তেতো হয়ে যাবে এ জ্ঞান তোমার অবচেতনলোকে টনটন করছে। আর সেই টনটনানির জ্বালায় তুমি যে সব কবিতা লিখেছিলে তাতে বিদ্রূপ করেছিলে নিজেকেই। কবির স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে তুমি সত্যকেই দেখেছিলে, দেখেছিলে নিজের অন্তঃসারশূন্যতাকে। লিখেছিলে—অশ্বত্থ বটকে অস্বীকার করছে ব্যাঙের ছাতারা / সারপেনটাইন লেনে বিরাট জনসভার আয়োজন তাই / ঘেঁটু-পন্থী ধুরন্ধরেরা কচু-কাটা করছেন কাল-কাসিন্দা-পন্থীদের / বলছেন—সাবধান, সাবধান / এসব খবর কাগজে বেরোয় না / কিন্তু দিলমহলের গোপন কপাট খুলে দেখ, / দেখবে সেখানে লেখা আছে / আলকাতরার যুগ এসেছে / সূর্য চন্দ্র নিবে যাবে, / জয় হবে কেরোসিনের ডিববির। /তার সঙ্গে সমঝোতায় যদি আসতে পার /আর আমাদের ফাণ্ডে যদি টাকা দাও / মাখন-মাখানো টোস্ট মিললেও মিলতে পারে / হয়তো দু একটা আণ্ডাও। / নচেৎ নয় নচেৎ নয়। / মনে রেখো, যদিও আমাদের পা-জামাটা নোংরা হয়ে যায় বারবার / তবু আমরা বীর। / আমরা বিদ্রোহী। / অসম্ভবকে সম্ভব আমরা করবই।। এ কবিতা তুমি লিখেছিলে আত্মধিক্কারে। মনের মধ্যে দুর্মুখ বিবেকটা বসে আছে। তাকে নিস্তব্ধ করা যায় না। কারণ সে সত্যবাদী।

সত্যেন কেমন যেন বিহ্বল হয়ে বসে রইল। সে সত্যি ভালো হয়ে থাকতে চায় কিন্তু পরিবেশ এমন হয়েছে যে কিছুতেই তা থাকা যাচ্ছে না।

দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে রইল সে। মনে একটা অদ্ভুত আকুলতা জাগছিল। মনে হচ্ছিল যত কষ্টই হোক যত দুঃখই পথ আঁধার করে আসুক আমাকে উঠতে হবে, ফুটতে হবে, জ্বলতে হবে। বাঙালির উত্তরাধিকার বহন করছি আমি, সে উত্তরাধিকারের মান আমি রাখবই। হঠাৎ মনে পড়ল নেতাজির কথা। মনে হল তিনি পাঠানদের দেশে আত্মগোপন করে বসে ছিলেন এক বোবা কাবুলী সেজে। তার আগে জেল খেটেছিলেন বহুবার। বেণীমাধব দাস উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তাঁকে দেশের

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে। বিবেকানন্দ করেছিলেন দেশের মানুষের দিকে, গান্ধীজীর বাণী যখন দেশের সমস্ত মানুষের কানে গিয়ে পৌঁছল তখন—হঠাৎ নেতাজী যেন গাঢ় অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে গেলেন আর সেই অন্ধকার ভেদ করে বেরিয়ে এল এক অপরূপ যুবতী। সালোয়ার পরা, মুখের সামনে ওড়না আর সমস্ত মুখে লজ্জা। সে যে কী শালীনতা কী রূপ তা সত্যিই অবর্ণনীয়। মনে হল সন্ধ্যা যেন আরও নিবিড় হয়ে এসেছে। কেউ প্রদীপ জ্বালেনি—সে কিন্তু জ্যোতির্ময়ী। নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। তার লজ্জার আবরণ যেন ঘন থেকে ঘনতর হয়ে উঠছে, তবু কিন্তু ঢাকতে পারছে না তাকে। স্বয়ম্প্রভ সপ্রতিভ দাঁড়িয়ে আছে সেই পাঠানী মেয়ে। মনে হল কাবুলের পাঠানদের ভদ্রতা যেন মূর্ত হয়েছে মেয়েটির মধ্যে। ওই ভদ্রতাই যেন নেতাজীকে আগলে ছিল। সত্যেন মনে মনে একদৃষ্টে চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর মনে মনেই কবিতা রচনা করতে লাগল। খাতা বার করে আর লেখবার সাহস হল না। ভয় হল চোখ খুললেই চলে যাবে সে।

...নিষ্প্রদীপ সন্ধ্যায় নৈষ্কর্ম্যের কাঁথা গায়ে দিয়ে / রোমন্থন করছিলাম নিজের দুর্দশার সঙ্গে রাজনৈতিক খবর। / এমন সময় তুমি এসে অপরূপ যে খবরটা দিলে / তা রাজনৈতিক নয় লাজনৈতিক। / তোমার লজ্জা হয়তো তোমার ভূষণ / কিন্তু আমার কাছে তা দুর্ভেদ্য বাধা। / সে বাধা অতিক্রম করি /এমন শক্তি আমার নেই। /আমি সীমিতবিক্রম। / আমার কল্পনার এরোপ্লেনও আমার ছোট আকাশ ছাড়িয়ে যেতে পারল না। / আমার ট্যাঙ্কের ঘর্ঘর বকুল-বীথির মর্মর হয়ে গেল / আমার বোমা ফাটল আমারই বুকে / রক্তাক্ত হয়ে গেল আমার সত্তা। / আমার যুদ্ধ -বাহিনী মুগ্ধ হয়ে প্রণত হল তোমার পদ-প্রান্তে। / তোমার ওই ময়ূরকণ্ঠী পাখতুনী সালোয়ারের পাটে পাটে যে রূপের হাট বসেছে, / সেখানে পশরা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেবে কি?/ খেলনার পশরা নয়, / নিয়ে যাব প্রণামের পশরা। / তুমি আমাদের নেতাজীকে রক্ষা করেছিলে একদিন।.../

দুম করে একটা শব্দ হল।

চমকে জেগে উঠল টোটো। সত্যেনও হাঁটুর ভিতর থেকে মুণ্ড বার করে দেখলে কয়েকটা ছেলে ছুটে পালাচ্ছে। গলির বাঁকে একটা ধূমায়িত পটকা। ওরাই কি পটকা ফাটিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে? কেন? এই নিদারুণ গ্রীষ্মে পটকা ফাটাচ্ছে কেন? নিদারুণ গ্রীষ্মের বিরুদ্ধেই কি বিদ্রোহ করেছে ওরা? আগুনের দিকে আগুন ছুঁড়ছে? হঠাৎ মনে হল ওরা বোধ হয় পিপাসার্ত। ওরা বর্ষা-বিলাসী ডাহুকের দল গ্রীষ্মের পাল্লায় পড়েছে। তাই পটকা ফাটিয়ে বিদ্রোহ করছে। কিন্তু পারছে না। ছুটে পালাতে হল। প্রায় অসম্ভব বেগে উড়ে চলে গেল ডাহুকের দল।

কবিতা জাগল মনে। কিন্তু আর খাতা বার করলে না। মনে মনেই কবিতা মূর্ত হল তার মনে। সে ঠিক করলে আর খাতায় কবিতা লিখব না। খাতার পাতা গেছে ফুরিয়ে, পেন্সিল ভোঁতা হয়ে গেছে। চোখ বুজে ভাবতে লাগল। যে ছেলেগুলো ছুটে পালাল তারা সবাই হাফপ্যান্ট পরা। কিন্তু তবু ওর মনে হল ওরা মানুষ নয় ডাহুক।

প্রায় অসম্ভব বেগে হাফ-প্যান্ট পরা ডাহুকের দল উড়ে গেল। উড়ে গেল সেই ঝাউবনে যে বনের ঘনিষ্ঠ আঁধারে জল থই-থই। পৃথুলা হংসীরা হয়তো সেখানে আছে। আর আছে আঁধার কুহক-গুহা কুম্ভক-গম্ভীর বন। আর আছে চিরশ্রাবণের চিরনিবিড়তা। মানুষের বেশে ছিল যারা গ্রীষ্মনিপীড়িত, ডাহুকের বেশে উড়ে গেল তারা শীতল-শীকর-স্নিগ্ধ কাজ্জলিত কাজরীর দেশে। বেদনার দীর্ঘশ্বাস মেঘ-রূপ ধরেছে যেখানে—হঠাৎ চমকে উঠল সত্যেন। তার গালের উপর কার নিশ্বাস পড়ল যেন।

চোখ খুলে দেখে টোটো তার কানে কি যেন বলবার চেষ্টা করছে। টোটোর চোখে উৎসুক দৃষ্টি। চল এবার ওঠা যাক এখান থেকে।

সত্যেন উঠে আবার চলতে লাগল। টোটোও চলতে লাগল পিছু পিছু। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখলে গোটা দুই বিস্কুট আছে। একটা টোটোকে দিয়ে আর একটা নিজের মুখে পুরল, তারপর মনে হল— তেষ্টা পেয়েছে। এই দুপুরে রাস্তার কলে কি জল পাওয়া যাবে? হাঁটতে লাগল।

॥ ৪ ॥

একটা বড় রাস্তার ধারে ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়েছিল সত্যেন। তার ডান পাশে একটা তরকারির দোকান, বাঁ পাশে ফলের। পিছনে একদল, প্যান্ট-পরা ছেলে দাঁড়িয়ে হল্লা হাসাহাসি করছে, পাশেই একটা পানের দোকান, সেখানে গাঁক গাঁক করে রেডিও বাজছে একটা। রাস্তায় একদল ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ট্রাম বাসের আশায়। তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে একটা গরুর গাড়ি। গরু দুটোর শিং প্রকাণ্ড, তার পিছনে একটা ঠেলা, তার পিছনে ইলেকট্রিক হর্ন দিচ্ছে একটা মোটর, তার পিছনে সারি সারি মোটর। এরই মধ্যে একটা কুলী একটা খরমুজা খাচ্ছে ফুটপাথে বসে। সামনের দেওয়ালে প্রকাণ্ড একটা মেয়ের ছবি। প্রায়-উলঙ্গিনী একটি মেয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে। ঠিক তার নীচেই একদল ভিখারি গৃহস্থালি পেতে বসেছে। হ্যাঁ, রীতিমত গৃহস্থালি। একটা হাঁড়িতে ছোট্ট উনুনে রান্না চড়েছে তাদের। পাশেই ফুটপাথে শুয়ে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে একটা কচি ছেলে, কেউ দেখছে না তাকে। তার পাশে বিড়ি খাচ্ছে একটা বিশ্রী বুড়ো। তার ডান দিকে বসে আছে ঘাগরা পরা একটা সোমত্ত মেয়ে। রাস্তার দিকে চেয়ে আছে আর দুহাত দিয়ে মাথা চুলকোচ্ছে নাক-মুখ কুঁচকে। বুকের আবরণ যে সরে গেছে সেদিকে লক্ষ্য নেই। তার নিরাবরণ বুকের উপর লক্ষ্য পড়েছে অনেকের। প্যান্টপরা ছোঁড়াগুলো সম্ভবত ওই জন্যেই দাঁড়িয়ে আছে তার পিছনে। একটু দূরে রাস্তার উপর ঝাঁকা নামিয়ে বসে আছে জনকয়েক ঝাঁকা-মুটে। সবাই অবাঙালি। দুজন ছাতু খাচ্ছে মনে হল।

সত্যেনও কিছু ছাতু কিনতে চায়। অনেকক্ষণ থেকে খুঁজছে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না ছাতুর দোকান। একটা ঝাঁকার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—ভাইয়া ছাতু কাঁহা মিলবে?

বিহারী ঝাঁকাটি উত্তর দিলে তার স্বকীয় বাংলায়—'ওই সামনেহর গল্লী দেখছেন ওইখানে চলিয়ে যান। পুছ করুন—সুরপতিয়ার দোকান কোথা। পাত্তা মিলে যাবে। সিংজির বড়া মকান আছে, সেই মকানের নীচে সুরপতিয়া থাকে। বঁঢ়িয়া সাততু মিলবে।'

সত্যেন এদিকে ওদিকে চেয়ে দেখল টোটো নেই। কোথা গেল সে? কাছে-পিঠে নেই সে। হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে এল তার। আবার সে সচেতন হল সে নিজেকে খুঁজছে। খুঁজছে তার উত্তরাধিকার। কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে সে উত্তরাধিকার কি খুঁজে পাবে সে? খুঁজে যদি পায়ও তাহলেই বা কি চতুর্বর্গ লাভ হবে তার? জনতার স্রোত বয়ে চলেছে, এর মধ্যে বাঙালি কারা? হাতকাটা জামা আর চোং-প্যান্ট ছাড়া আর তো কিছু দেখা যায় না। অনেকের পেটে বোমা মারলে হয়তো বাঙালি ডাল ভাত চচ্চড়ি বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু বাইরেটা বদলে ফেলেছে সবাই। সব একরঙা হয়ে গেছে। কিন্তু বাঙালিত্ব কি শুধু পোশাকে? বিদ্যাসাগর বাঙালি ছিলেন, কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসও বাঙালি ছিলেন। বাঙালি ছিলেন রামমোহন রায়, বাঙালি ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বাঙালি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। পোশাক

তো এক নয়। সব যেন গুলিয়ে গেল।

রাস্তা পার হচ্ছিল সে। ভিড়ের গুঁতো খেয়ে মোটরের পাশ দিয়ে ঠেলাগুলো বাঁচিয়ে রিকশাকে পাশ কাটিয়ে আস্তে আস্তে এগোচ্ছিল সে গলিটার দিকে। এমন সময় একটা প্রকাণ্ড অদ্ভুত গাড়ি পথরোধ করে দাঁড়াল। গাড়ির উপর মই একটা আরও কত কি। একজন বলল—ট্রাম-লাইন সারাবার গাড়ি। তার উপরও প্যান্ট-পরা হাতকাটা-জামা-গায়ে কয়েকটা লোক। বাঙালি ওরা কি? বোঝা যায় না।

সন্তর্পণে বড় রাস্তাটা পার হয়ে ওপারের ফুটপাথে গিয়ে উঠল। ফুটপাথে পা রাখবার জায়গা নেই। একজন বসে আছে অনেক ছুরি কাঁচি চাবির রিং আর তালা নিয়ে। তার পাশেই চানাচুরওয়ালা মাথায় রঙিন পাগড়ি, পরনে রঙিন ফতুয়া গোঁফ, সূচ্যগ্র। হঠাৎ সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল—বাদাম কাজু মট্‌ট্‌র মুং। বাঙালি নয় অবাঙালি। বোধহয় উত্তর প্রদেশের লোক। এ কিন্তু প্যান্ট পরেনি। পরনে মালকোচা-মারা কাপড়। মুখের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখল—চোখে সুর্মা পরেছে। না, বাঙালি নয়। হঠাৎ তার মনে হল এরা কেউ মানুষই নয়। সব স্বার্থসন্ধানী বকের দল। এই কলকাতা শহরটা বিরাট একটা জলা, সেখানে লক্ষ লক্ষ মৎস্যসন্ধানী বক ঘোরাফেরা করছে। মোটর রিকশা ঠেলা ট্রাম বাস—সব বক।

গলির মুখে একটা ফাঁকা বারান্দা পেল। সেইখানেই বসে পড়ল। কাছেই একটা ছোঁড়া মুখে হাত পুরে 'সিটি' দিলে একটা। তারপর ছুটে চলে গেল। সত্যেন ভুলে গেল ছাতু কিনতে হবে। বসে বসে রাস্তার দৃশ্য দেখতে লাগল সে। এ দৃশ্যে সূর্য নেই চন্দ্র নেই নক্ষত্র নেই সন্ধ্যা নেই উষা নেই। আছে খালি মানুষ, মানুষ আর মানুষ। আর নানারকম যানবাহন আর নানারকম চিৎকার। সিনেমার উন্নত বক্ষ মেয়েটার ছবিও দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে এই জনতার দিকে। মুখে মুচকি হাসি। হঠাৎ এ দৃশ্যও লুপ্ত হয়ে গেল সত্যেনের চোখ থেকে, ফুটে উঠল বিরাট একটা জলার ছবি। কবিতা জাগল মনে।

সম্মুখে বিস্তৃত জলা। তার উপরে লক্ষ লক্ষ
বক। মুনাফা-সন্ধানী বণিকের মতো সন্তর্পণে
সঞ্চরিছে। বৈপ্লবিক বুদ্ধি এক জাগিছে মগজে
জলাটারে জমাইয়া বরফ করিয়া ফেলি যদি,
বকেরা পালাবে। আসিবে হয়তো লক্ষ লক্ষ
পেঙ্গুইন পাখি, মোটাসোটা হৃষ্টপুষ্ট তুলতুলে
চর্বিদার জীব সব। কি হয় তাহলে?
নিঃসন্দেহে অভিনব হয় কিছু। কিন্তু হায়
কিছুই হল না, কল্পনা ফুরায়ে গেল।
হঠাৎ এ কি এ! বকবকম করিছে বকেরা।
বকেরা হয়েছে পায়রা। পায়রাও তুলতুলে,
পায়রাও সুখাদ্য অতীব, পায়রার নানা রং,
পায়রার নানা গুণ—

'এই হটো হিঁয়াসে—'

ঘরের ভিতর থেকে বলিষ্ঠ একজন লোক শতরঞ্জি পাততে লাগল বারান্দার উপর। শতরঞ্জির উপর চেয়ার রাখা হল। তারপর এল একটা গড়গড়া। তারপর এলেন নগ্নগাত্র কুচকুচে কালো থলথলে মোটা একটি লোক। তাঁর বাঁ হাতে প্রকাণ্ড একটা সোনার তাবিজ। ভড়াক ভড়াক করে তামাক খেতে লাগলেন। পিছনে একজন চাকর দাঁড়িয়ে হাওয়া করতে লাগল তাঁকে।

সত্যেন গলির ভিতর ঢুকে পড়ল।

টোটো—টোটো—চিৎকার করলে দুবার। টোটোর দেখা নেই। কোথায় গেল সে? একটু এগিয়েই সে দেখতে পেল সুরপতিয়ার দোকান। দোকানের সামনেই বসে আছে সুরপতিয়া। চেহারাটা কিন্তু বেসুরো। প্রকাণ্ড গোল মুখ, মাথার সামনের দিকে টাক, ফরসা রং, বেজায় মোটা, দুহাতে প্রচুর উল্‌কি, দুপায়ে গোদ।

'ছাতু পাওয়া যায় এখানে?'

পরিষ্কার বাংলায় উত্তর দিল সুরপতিয়া। 'যায় বইকি। একটু দাঁড়াও বাবা, এটা ঘেঁটে দিই একটু—'

ফুটপাথের উপরেই একটি উনুনে কি যেন ফুটছিল একটা হাঁড়িতে। সেইটেতে কাঠের হাতার মত জিনিস ঢুকিয়ে নেড়ে দিলে সুরপতিয়া।

'কিসের ছাতু চাই?'

'অর্ধেক বুট আর অর্ধেক যবের।'

'কত?'

'চার আনার।'

'চার আনার ছাতুতে আগে পেট ভরত। এখন ভরবে না। তুমি খাবে?'

'আমি আর টোটো—'

'দুজনের পেট চার আনাতে ভরবে না।' সুরপতিয়া উঠে ঘরের ভিতর গেল। ধনীর প্রাসাদের বারান্দার নীচে ছোট্ট একখানি ঘর। ঘর না বলে তাকে গুহা বলা উচিত। একটি ছোট দরজা ছাড়া আর কিছু নেই। সেই দরজার ভিতর হেঁট হয়ে ঢুকে গেল সুরপতিয়া। একটু পরে বেরিয়ে এল আবার হামাগুড়ি দিয়ে। হাতে একটা কাগজের ঠোঙায় ছাতু। সত্যেন আগেও ছাতু কিনেছে। দেখল সুরপতিয়া যত ছাতু এনেছে তার দাম এ বাজারে চার আনার অনেক বেশি।

'অত ছাতু আনলে যে। আমি তো মাত্র চার আনা দেব।'

'চার আনাই দাও। তুমি কোথায় কাজ কর?'

সত্যেন চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল—'আমি কাজ করি না। ভিক্ষে করি—'

'ভিক্ষে কর! ছিয়া ছিয়া ছিয়া। কাজ কর না কেন বাবা। আমার ছেলে মিলে কাজ করে, আমার ছেলের বউ ঝি-গিরি করে, তার একটা মেয়ে আছে সেও ঘোষবাবুর ছোট ছেলেকে নিয়ে দুবেলা বেড়াতে যায় গাড়ি ঠেলে ঠেলে।'

সত্যেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করল—'তোমার বাড়ি কোথায়—'

'ভাগলপুর জেলায় কহলগাঁও।'

'সেখান থেকে এখানে এসেছ কেন?'

'রোজগারের ধান্দায়। ঘরে আমার বুড়ো শ্বশুর আছেন, শাশুড়ী আছেন। তাদের প্রতি মাসে টাকা পাঠাতে হয়। কহলগাঁয়ে বেশি রোজগার করবার উপায় নেই।'

'উনুনে কি হচ্ছে, ভাত?'

'না। মকাইয়ের ঘাঁটা। ভাত খাবার মতো পয়সা নেই। মকাইয়ের ঘাঁটা খায় ওরা। ভাতের সঙ্গে তরকারি চাই, ডাল চাই—সব মাগ্‌গি।'

'কত রোজগার হয় তোমাদের?'

'সবাই মিলে প্রায় চারশ টাকা রোজগার করি আমরা।'

'আমি এত ছাতু নেব না। তুমি চার আনার ছাতুই দাও আমাকে—'

সুরপতিয়া স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সত্যেনের দিকে কয়েক মুহূর্ত।

'বেশ।'

আবার সে ছাতুর ঠোঙা নিয়ে ঢুকল গুহার মধ্যে। আধ ঠোঙা ছাতু নিয়ে বেরিয়ে এল আবার।

'নাও।'

'একটু জল দিয়ে মেখে দেবে না?'

'তুমি যখন আমার সঙ্গে দোকানদারী করলে আমিও করব। জল দিয়ে মেখে দিতে হলে দু পয়সা বেশি দিতে হবে।'

সুরপতিয়া ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সহাস্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সত্যেনের দিকে।

সত্যেনের কাছে আরও পয়সা ছিল।

বার করে দিল সে আরও দু নয়া।

'ঢের হয়েছে ঢের হয়েছে। তুমি তো ভিখ-মাংগা নও তুমি তো নবাব—দাও—' আবার ছাতুর ঠোঙ্গা নিয়ে ঢুকল সে ঘরের ভিতর। ছাতু মেখে নিয়ে এল এক দলা। সত্যেনের মনে হল দলাটা বেশ বড়।

'আবার বেশি দিয়েছ মনে হচ্ছে।'

'ফের যদি কচকচ কর আমি ছাতু দেব না।'

অদ্ভুত একটা মাতৃমূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সুরপতিয়াকে ঘিরে।

সত্যেন অবাক হয়ে গেল। এই অহেতুক স্নেহের কারণ কি বুঝতে পারল না সে। জিগ্যেস করবার সাহসও হল না। অবাঙালিদের সম্বন্ধে একটা বিতৃষ্ণাই তার ছিল এতদিন। সুরপতিয়ার স্পর্শে এসে সব মধুর হয়ে গেল যেন। মনে হল চিরন্তনী মা সব দেশে সব জাতের মধ্যে আছে। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল 'মা আমাকে মাপ কর। আমি চললাম।'

সুরপতিয়া বললে— 'আমি ভিখ মাংগার মা হই না, আমি নবাবের মা হই না, আমি গরিব ভদ্রলোকের মা—'

সত্যেন তার সামনে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। হাতজোড় করে প্রণাম করে চলে গেল তাড়াতাড়ি।

যেতে যেতে একটা কথা মনে পড়ল তার। আজকাল অনেকে বলছেন কলকাতায় অবাঙালিদের এই আধিপত্য সহ্য করা উচিত নয়। কিন্তু এই অবাঙালিরা যদি কলকাতা ছেড়ে চলে যায় তাহলে তাদের কাজ বাঙালি ছেলেরা করতে পারবে কি? কুলী হতে পারবে? রিকশ টানতে পারবে? ফেরিওয়ালা হতে পারবে? মেহনতের কোন কাজটা করতে পারবে তারা? তারা তো মোড়ে মোড়ে চোংপ্যান্ট আর হাফ শার্ট পরে জটলা করে রাজা উজির মারে, ক্রিকেট আর ফুটবল খেলার মাঠে

ভিড় জমায়, সিনেমার টিকিট কেনবার জন্যে 'কিউ' দেয়। আর করে স্ট্রাইক, করে সভা—

হঠাৎ তার চিন্তাধারা বিঘ্নিত হল। টোটো কোথায়! এদিক ওদিক চেয়ে দেখল কোথাও টোটো নেই। গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এল, সেখানেও নেই। বাঁ ধারে চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই পার্ক পাওয়া গেল একটা। তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পার্ক নয়, চারিদিকে রেলিং দিয়ে ঘেরা ফাঁকা জায়গা খানিকটা। তার গেটও আছে একটা। সত্যেন সবিস্ময়ে দেখল সেই পার্কের ভিতর টোটো প্রেম করছে। কুকুরীটা পাঁশুটে রঙের। টোটোর প্রেমলীলায় বাধা দিতে ইচ্ছে হল না তার। রাস্তার কলে জল ছিল। সেইখানে গিয়ে অর্ধেকটা ছাতু খেয়ে ফেললে সে। তারপর জল খেল অনেকটা। টোটোর জন্যে রেখে দিলে খানিকটা ছাতু। তারপর গিয়ে বসল সামনের বাড়ির রকে। মনে হল ভাগ্যে আগেকার বাবুরা রক বানিয়েছিলেন, তাই আমরা বসে বাঁচছি। দেখা গেল নায়িকা আমোল দিচ্ছে না টোটোকে। খ্যাঁক খ্যাঁক করে ধমকাচ্ছে। টোটো কিন্তু না-ছোড়। খ্যাঁকানি খেয়েও ঘুরে বেড়াচ্ছে কুত্তীটার পিছু পিছু। হঠাৎ সত্যেনের ভাবান্তর হল। সে যেন নিজেকেই প্রত্যক্ষ করল টোটোর মধ্যে। মনে হল টোটো যা নির্লজ্জের মত সবার সামনে করছে সে-ও কি তাই করছে না কবিতার আড়ালে? কবিতা জাগল মনে।

উৎপল-প্রসন্ন আঁখি নয়তো উহার। সাদামাটা
কুতকুতে চোখ। কান খাড়া খাড়া, ল্যাজটি
জিলিপি। ইহাতেই মুগ্ধ টোটো। আমিও কি নই?
স-লোম নির্লোম কান-খাড়া
কান-ঝোলা বিপুচ্ছ শ্রীপুচ্ছ ছাই-রঙ্গা
নাক-বোঁচা যাহোক একটা
যোষিৎ হলেই হল।
দেখা হইলেই বাড়ায়ে দুবাহু
আকুতি-আকুল-কণ্ঠে উঠিব ডাকিয়া—
আতুত, আতুত। ছাতে জানালায়
রাজপথে অলিতে গলিতে
সার বেঁধে চলিয়াছে শত শত
পিঠ-কাটা-ব্লাউসধারিণী।
বংশবনে অন্ধ ডোম সম খাইতেছি ঘুরপাক
হস্তে লয়ে ভোঁতা কাটারিটি।

প্রণয়-রণে ভঙ্গ দিয়ে হঠাৎ টোটো ছুটে বেরিয়ে এল পার্ক থেকে, আরও দুটো ষণ্ডা কুকুর তাড়া করেছে তাকে। মরি-বাঁচি ছুট দিয়ে রাস্তার ভিড়ের মধ্যে এসে পড়ল সে। ক্যাঁচ করে একটা মোটর ব্রেক কষল। একটা ঠেলার তলা দিয়ে এসে হাজির হল সত্যেনের কাছে। এসে ল্যাজ নাড়তে লাগল, যেন কিছুই হয়নি। সত্যেন ছাতুর দলাটা দিল তাকে। গপ করে খেয়ে ফেলল। কয়েকটা কশাই একপাল গরু নিয়ে যাচ্ছে। তার পিছনের একজনের মাথায় এক ঝাঁক মুরগি। হর্ন দিতে দিতে এগিয়ে এল প্রকাণ্ড একটা লরি। লরিতে বস্তাবন্দী হাড়। একটা হাড় বেরিয়ে আছে। ফুটপাথে একটা ফলওয়ালী একটু পিছন ফিরে বসে স্তন্যদান করছে তার শিশুকে...সবাই চলেছে কিন্তু কারো প্রতি কারো ভ্রূক্ষেপ

নেই, পাশাপাশি চলেছে কিন্তু চেনে না কেউ কাউকে, চিনতে চায় না। একটা অতি বৃদ্ধা কুঁজো লাঠি ঠক ঠক করতে করতে বেশ দ্রুতবেগে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে বলল— কিছু দেবে বাবা? সত্যি বড্ড গরিব আমি।

সত্যেন এক নয়া পয়সা দিলে তাকে। তার পরই উঠে পড়ল।

'টোটো চল এখান থেকে—'

মনে পড়ল পঞ্চার সেই উপদেশটা। পঞ্চা বলেছিল—কোলকাতার রাস্তায় কোথাও দাঁড়াসনি। ভিক্ষে চাইবে ধাক্কা মারবে, ঠিকানা খুঁজে দিতে বলবে, মাথায় আবর্জনা ফেলবে, পকেট কাটবে। কোলকাতায় রাস্তায় দাঁড়াতে নেই। চলতে হয় ছুটতে হয়।

সত্যেন হন্ হন্ করে ছুটতে লাগল

টোটোও চলেছে তার পিছু পিছু।

কিন্তু কোথা যাবে তারা?

যাবার জায়গা কোথাও নেই। কলেজ স্ট্রীট পাড়াটাকে সে এড়িয়ে চলছিল। মনে হত—তার বিগত জীবনটা, যে জীবনে সে মামার পয়সায় পড়াশোনা করত, মামার পয়সায় রেস্তোরাঁয় বসে চপ কাটলেট খেত, কফি-হাউসে গিয়ে রাজনীতির তর্ক করত—সেই জীবনটা এখনও বোধহয় ওত্ পেতে বসে আছে সেখানে। সেখানে গেলেই হয়তো খপ করে তাকে চেপে ধরবে। দেখা হয়ে যাবে কোনো চেনা বন্ধুর সঙ্গে বা প্রফেসরের সঙ্গে বা সেই চায়ের দোকানের মালিকের সঙ্গে যার কাছে এখনও হয়তো কিছু দেনা আছে তার। কিম্বা মির্জাপুর স্ট্রীটের দ্বিতল বাড়ির জানলায় যে মেয়েটি একদা তার মনোহরণ করেছিল, কিন্তু যার সঙ্গে সে বাক্যালাপ করবার সুযোগ পায়নি—এরা হয়তো এখনও আছে সেখানে। তাদের কাছে ভিখারির বেশে সে যাবে কি করে? না, কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় সে যেত না। কোলকাতায় স্ট্রীটের অভাব নেই গলির অভাব নেই, কলেজ স্ট্রীটকে সে এড়িয়ে চলত। প্রায়ই কিন্তু তার মনে হত এর জন্য কে দায়ী? এই যে জঘন্য চোরের মত ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে, ভিক্ষে করে খেতে হচ্ছে—এর জন্যে কে দায়ী? সে নয়। তার মামা তাকে স্কুলে ঢুকিয়েছিলেন, সে একটার পর একটা পরীক্ষা পাস করে গেছে। কোনো কোনো পরীক্ষায় বেশ ভালোই করেছে কিন্তু যেই লেখা-পড়া শেষ হয়ে গেল অমনি তাকে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হল কেন? কারণ সে চাকরি করা ছাড়া আর কিছু করতে পারে না।

সে নোটবুক থেকে মুখস্থ বলতে পারে চন্দ্রগুপ্ত কজন ছিল। রোম কখন গ্রীসকে আক্রমণ করেছিল। এলিজাবেথের স্প্যানিশ আর্মাডার প্রেরণা কে ছিল, বৈদিক সভ্যতা আর ঔপনিষদিক সভ্যতার তফাৎ কি? এই সব তার কণ্ঠস্থ আছে কারণ সে ইতিহাসের বই অনেক পড়েছিল। কণ্ঠস্থ ছিল কারণ ভেবেছিল কণ্ঠস্থ করলে ডিগ্রী পাওয়া যাবে আর ডিগ্রী পেলে চাকরি। কিন্তু গোলামখানার গেটে লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ের ভিড়। সবাই চাকরি চায়। ঘুষ, তদ্বির, নেপটিজম্, দালালির নানা খেলা চলছে সেখানে। চাকরি পাওয়া যাবে না। কিন্তু চাকরি না পেলে সে করবে কি? নোটবুক মুখস্থ করা বিদ্যে ছাড়া আর তো তার কোনো সম্বল নেই। সে জুতো সেলাই করতে জানে না, দর্জিগিরি জানে না, ছুতোরগিরি জানে না, ফিরি করতে পারে না, মোট বইতে পারে না, ছাত পিটতে পারে না—রাঁধতে পারে না, যারা ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, যারা প্লাম্বার তাদের দলেও নয় সে। দম্ভভরে সে ওদের নাম

দিয়েছে 'ছোটলোক'। ভুলে গেছে যে আসল ভদ্রলোক ওরাই, ওরা নিজের গতর খাটিয়ে নিজের জোরে মাথা উঁচু করে বেঁচে আছে। ওরাই স্বাধীন, কারও দ্বারে হাত পাতে না, কারো কাছে মানসম্ভ্রম মনুষ্যত্ব বিক্রি করে চাকরি করে না। বুঝতে পারে না সবচেয়ে অসহায় সে নিজে। সবচেয়ে কৃপাপাত্র। নোট মুখস্থ করা বিদ্যা ছাড়া ইতিহাসের কতটুকু আয়ত্ত করেছে সে? কিছুই না। কেরানীগিরি করা ছাড়া আর কি করতে পারে সে? কিছুই না। কিন্তু তার দোষ কি! তাকে ছেলেবেলা থেকে যেমন করে গড়া হয়েছে তেমনি হয়ে উঠেছে সে। এখন কি করবে...কি করবে... মামার স্কন্ধে আর বেশিদিন থাকতে পারছিল না সে, মামা-মামীর নীরবতাই যেন তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, তাই সে পালিয়ে এসেছে। মনে হয় মামা-মামী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছেন।

কিন্তু এখন কি করবে? ক'দিন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। টোটোও ঘুরছে তার সঙ্গে সঙ্গে। এটা বুঝেছে ভিক্ষে করে পেটটা চালিয়ে নেওয়া যায়। কিছু উদ্বৃত্তও থাকে। সেদিন একটা গেঞ্জি কিনেছে। কিন্তু মনের ভিতর আগুন জ্বলছে। হাহাকারের আগুন, জিজ্ঞাসার আগুন, উচ্চাশার আগুন। সে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছে কলকাতার বাইরে। এখানে নতুন নতুন বাড়ি উঠছে। মাঝে মাঝে মাঠও আছে। গাছও আছে দু একটা। একটা গাছের তলাতেই বসেছিল সে। টোটো একটু দূরে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছিল। যখনই সে বিশ্রাম নেয় কোথাও, টোটো ঘুমোয়। হঠাৎ সামনের গাছে একটি পাখি এসে বসল। লেজটি উৎক্ষিপ্ত করে উড়ে গেল আবার। সাদায় কালোয় চমৎকার চেহারা। ওটা যে দোয়েল পাখি তা সে চিনত না। একটু পরেই কিন্তু মনে পড়ল সাতকড়ির কথা। সে যেন এই পাখিরই বর্ণনা দিয়েছিল। এই কি দোয়েল? তারপর হঠাৎ অপূর্ব সুর ভেসে এল তার কানে। দেখলে সামনের বাড়ির ছাদে একটা বাঁশ রয়েছে, বোধহয় রেডিওর এরিয়েল, সেই বাঁশের উপর বসে গান গাইছে দোয়েল। অপূর্ব সে গান। অবর্ণনীয়। মনে হল সমস্ত পাড়াটা যেন স্বপ্ন দেখছে। সত্যেন এক দৃষ্টে চেয়েছিল পাখিটার দিকে। তার এই একাগ্র দৃষ্টির আঘাত সহ্য করতে পারল না সে, উড়ে গেল। সত্যেন মুগ্ধ হয়ে বসে রইল। আশ্চর্য জিনিস একটা মনে হল তার। মনে হল—গুরু পেয়েছি। কবিতা জাগল মনে।

পথ আছে কোটি কোটি।
গুরুও অনেক।
সূর্য তো আকাশভরা।
পথহারা ফিরি তবু আমি।
যে গুরু দেখাবে পথ তার দেখা পেলাম না আজও।
একটিও সূর্য নাই আমার আকাশে,
ধ্রুব-তারা অস্তমিত।
সহসা দোয়েল পাখি বসিল আসিয়া
সামনের গাছটিতে
হয়তো দোয়েল,
আগে তো দেখিনি।
গাহিল অপূর্ব গান।
দোয়েলের ভাষা শিখিনি জীবনে।

তবু মনে হল বুঝিলাম মর্মবাণী তার।
সে যেন বলিয়া গেল,
যাই হোক, গান গেয়ে যাও।
গানই পথ, গানই গুরু।
গানই তো আলো
আরও বলে গেল—
গান গাই বলে বেকার নহি তো আমি।
গোলামি করি না কারও।
অনলস চেষ্টায় জাগ্রত করিয়া রাখি নিজের শক্তিকে।
উপার্জন করি নিজে,
নিজের সামর্থ্যে উড়ি নিজের ডানায়...

গাছে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল সত্যেন। হঠাৎ চমকে উঠে পড়ল। কানের পিছনে কি একটা কামড়ে দিয়েছে। তারপর ঘাড়েও কামড়াল। হাত দিয়ে দেখল লাল পিঁপড়ে। গাছে লাল পিঁপড়ে অনেক। কানে আর ঘাড়ে হাত বুলুতে বুলুতে দেখতে পেল পাশের বাড়ির জানলায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেশ ডাগর-ডোগর লাল-শাড়ি-পরা কিশোরী একটি। তাকে দেখেই জানলা বন্ধ করে দিল সে। সত্যেনের হঠাৎ মনে হল বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। অনেকক্ষণ থেকে তেষ্টা পেয়েছে। ওই বাড়িতে জল চাইলে দেবে কি? সজ্ঞান মনে জলের তাগিদ ছিল, কিন্তু নির্জ্ঞান মনে ছিল ওই কিশোরীটি। উঠে পড়ল।

বাড়ির সামনে গিয়ে কড়া নাড়তে লাগল। ভিতর থেকে সাড়া এল কাংস্যকণ্ঠে—অনেকক্ষণ কড়া নাড়বার পর।

'কে গো—কি চাই—'

'বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। জল দেবেন একটু?'

খানিকক্ষণ কোনো সাড়া-শব্দ নাই।

তারপর বারান্দার জানলাটা খুলল। জানলার সামনে এসে দাঁড়াল বাড়ির ঝিই বোধ হয়। মাথার চুল পাকা, গাছকোমর বাঁধা। হাতে একগ্লাস জল।

'ভদ্দরলোকের বাড়িতে কড়া নেড়ে কেউ জল চায় না কি। বেপাড়ার লোক এখানে এয়েছ কেন। তোমাকে তো দেখিনি কখনও।'

সত্যেন উত্তর দিল না, ঢক্‌ঢক্‌ করে খেয়ে ফেলল জলটা।

'এ পাড়ায় কি করছ।'

'আমি ভিক্ষে করে বেড়াই। নানা জায়গায় ঘুরতে হয়।'

'এখন তোমাকে ভিক্ষে দেবে কে। বাড়িতে কেউ নেই। সব আপিস গেছে। কপাট খুলতে মানা—চোর-ডাকাতের উপদ্রব—যাও তুমি—'

বাড়ির ঝি গেলাসটা নিয়ে দড়াম করে বন্ধ করে দিল জানলাটা। বন্ধ জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রইল সত্যেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে টোটোও উঠে এসেছে তার সঙ্গে সঙ্গে। বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছে। সে-ও বারান্দা থেকে নেমে যাবে ভাবছিল এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে জানলাটা খুলে গেল

একটু, তারপর একটা বিশ নয়া টক করে এসে পড়ল বারান্দায়। জানলার কপাট আবার বন্ধ হয়ে গেল।

সত্যেনের চোখে জল এসে পড়ল।

জল এল কেন? জানে না কেন।

আবার একটু দূরে গিয়ে আর একটা গাছের তলায় বসেছিল। মনে হচ্ছিল সঙ্গোপনে তার জীবনে অনেক পরীই এসেছে, সঙ্গোপনেই চলে গেছে তারা। আজ একজন শুধু তার মূল্য নির্ধারণ করে দিয়ে গেল—বিশ নয়া। কবিতার ফুল ফুটতে লাগল মনে।

অতি সঙ্গোপনে আসে যে পরীরা
তাদের দেখিনি কভু। কেবল দেখেছি সেই চিহ্নগুলি
যেগুলি তাহারা রেখে গেছে, ফেলে গেছে—
সবুজ পাতায়—ফুলের পাপড়িতে—
কিম্বা কোনো সন্ধ্যায় স্বপনে।
চিহ্নের নিরিখে তাহাদের পাই।
আজিকার চিহ্ন বিশ নয়া।
বিশ নয়া বলিতেছে বাখানিয়া—
ভিখারি ভিখারি তুমি—পয়সার ভিখারি,
আর কিছু নও।
ওগো নবপরী, তোমার এ রায় মানিয়া নিলাম।
সন্তুষ্ট রব তাই নিয়ে।
এ জীবনে সমগ্রের স্বাদ পাইনি কখনও।
খুব কাছে আছে যারা
তারাও তো পরীর মতন
রহস্যের কুয়াশায় ঢাকা।
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চিহ্নগুলি দিয়ে
সৃষ্টি করি তাহাদেরও।
আমার জীবন তাই পরী-সমাকীর্ণ
অপরূপ রূপকথা-লোক।
অপেক্ষা করিয়া আছি
সত্যের স্বরূপ রূপকথা ভেদ করি
দেখা দিবে কবে...

আবার উঠে হাঁটতে লাগল।

পিছনে টোটো।

একটি গলি থেকে বেরিয়েই সে একটা ভিড়ের মধ্যে পড়ে গেল। মেলা বসেছে। হ্যাঁ, ফুটপাথেই মেলা বসেছে, তরকারির দোকান, খাবারের দোকান, শরবতের দোকান, আর পুতুলের দোকান। নানা রকম পুতুল চতুর্দিকে। দূরে একটা নাগরদোলা ঘুরপাক খাচ্ছে। তাতে অনেক ছেলেমেয়ে। বাঁদরের নাচ দেখানো হচ্ছে এক জায়গায়। প্রচুর ভিড় সেখানে। বাঁদর কি করে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে তাই দেখে

পুলকিত হয়ে উঠেছে একদল লোক। সিনেমার গান বাজাচ্ছে একটা পানওয়ালা লাউড স্পীকার দিয়ে। আর পুতুল। নানা রংয়ের— নানা মাপের—নানা রকম পুতুলকে ঘিরে নানা রকম লোকের ভিড়। ছেলে মেয়ে তো আছেই, বুড়োরাও আছে। পুতুলদেরও নানান ভঙ্গী। নানা চেহারা। লক্ষ্মী সরস্বতী শিব গণেশ তো আছেনই তার সঙ্গে আছেন প্যাঁচা, আরশোলা, টিকটিকি, চিনেবাদাম। মাটির পুতুল কিন্তু সব যেন জীবন্ত। নিঃশব্দও যেন শব্দ করছে। নিস্তরঙ্গের বুকেও যেন তরঙ্গ উঠেছে। যারা গোলমাল করছে চারদিকে—তাদের চেয়েও এরা যেন বেশি মুখর। মনে কবিতা জাগল। ভিড়ের মধ্যে সে একটা পুতুলের দোকানের পাশে বসে পড়ল ফুটপাথে।

...নিঃশব্দও শব্দ করে ভাই।
বুঝিলাম আজ—তারও আছে ছন্দ-তাল।
আছে রাগ, রাগিণীও আছে।
অনুমান-শ্রবণ-মঞ্চেতে শোনা যায় সে নিঃশব্দে।
দিন যবে শেষ হয় সন্ধ্যার আঁধারে,
ক্লান্ত বীণা নীরব যখন,
মুখর বাঙ্ময় যবে মৌন অবাক,
নির্নিমেষ নয়নও যখন দেখিতে পায় না কিছু,
সু-উচ্চ কণ্ঠও যবে পায় না কোনো প্রকাশের ভাষা,
তখন নিঃশব্দ হয়ে আসে নিঃশব্দ-চরণে,
নিস্তব্ধ অন্ধকারে।
তার ছন্দ-লয়-তাল—তার রাগ-রাগিণী-মহিমা,
লক্ষ লক্ষ জোনাকির নিঃশব্দ দীপ্তিতে হয় মূর্ত
অতীন্দ্রিয় অকর্ণগোচরে—
বর্ণনীয় নয় যাহা বাক্য-বন্দী কাব্যের ঝঙ্কারে...

মুগ্ধ হয়ে চেয়ে ছিল সে পুতুলগুলোর দিকে। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে টিকলুকে দেখতে পেল। পুতুল কিনছে। হাতে একটা থলি, তাতে পুতুল কিনে কিনে রাখছে। পাশে একটি রূপসী যুবতী মেয়ে, তারই ফরমাশ মত পুতুল কিনছে টিকলু। টিকলু বিয়ে করেছে না কি? যদিও সে এতদিন আত্মগোপন করে চলছিল, কলেজ স্ট্রীটের ধার দিয়েও যায়নি, তবু টিকলুকে দেখে সে যেন মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিস দেখতে পেল। টিকলু প্রাণের বন্ধু ছিল তার। ভালো ছেলে ছিল না, পরীক্ষা দিতে বসে প্রায়ই টুক্‌ত, তবু পাশ করতে পারত না। টুকতেও পারত না ভালো করে। দুবার বি-এ ফেল করেছিল। তবু ওকে ভালোবাসত সত্যেন। ওর মধ্যে এমন একটা বলিষ্ঠ সপ্রতিভতা এমন একটা সরল আন্তরিকতা ছিল যে, ওকে ভালো না বেসে উপায় ছিল না। সবাই ভালোবাসত ওকে।

ডাক শুনে টিকলু সবিস্ময়ে চেয়ে রইল সত্যেনের দিকে। চিনতে পারল না। সত্যেনের সারা মুখে গোঁফদাড়ি, মাথায় রুক্ষ চুল লম্বা লম্বা, মুখ শুকনো, চোখ কোটরগত। কলেজের সত্যেনের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই।

'আমাকে ডাকছেন?'

'হ্যাঁ। আমি সত্যেন, সতু—'

'সতু! সে কি—'

এক লাফে টিকলু এসে দাঁড়াল তার পাশে।

'তোর ব্যাপার কি বল দেখি। তোর মামার কাছে গিয়েছিলাম একদিন তোর খোঁজে। তিনি বললেন সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। কোথায় আছিস এখন?'

'সর্বত্র। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। ভিক্ষে করি।'

'বলিস কি!'

দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রইল। কারো মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুল না কয়েক মুহূর্ত।

সত্যেন পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল এবার।

'ভিক্ষা করি আর কবিতা লিখি!'

'কবিতা লিখিস?'

'হ্যাঁ। একটা খাতা ফুরিয়ে গেছে। আর খাতা কিনিনি। মনে মনেই লিখি।'

'তুই তো আধুনিক কবিতা লিখতিস আমাদের কলেজের ম্যাগাজিনে। আমি বুঝতে পারতাম না সব। এখনও সেই রকম কবিতা লিখিস—?'

সত্যেন কবিতার খাতাটা বের করে দিলে তাকে।

'নিয়ে যা। পড়ে দেখিস। আমার সঙ্গে দেখা হবে কি না কে জানে। আমার স্মৃতি একটা থাকুক তোর কাছে—আমি চললাম—'

'থাম থাম। তোর নাগাল যখন পেয়েছি তখন তোকে ছাড়ছি না।'

টিকলু মেয়েটির কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল—'তুমি পুতুলগুলো নিয়ে চলে যাও। আমি আসছি একটু পরে। টাকা আছে তো?'

'টাকা তো আপনার কাছে। ব্যাগটা আপনাকে দিয়েছিলাম।'

'ও আই সি।'

পকেট থেকে একটা ব্যাগ বার করে দুটো দশ টাকার নোট দিলে সে মেয়েটিকে।

'তুমি পুতুলগুলো নিয়ে চলে যাও। আমি আসছি একটু পরে।'

তারপর সত্যেনের দিকে ফিরে বলল— 'চল আমরা একটা চায়ের দোকানে বসি।'

একটা চায়ের দোকানে একটা কোণের টেবিল অধিকার করে বসেছিল তারা। টিকলু চা টোস্ট কেক ওমলেট অর্ডার দিয়ে বললে—'তুই তো চপ ভালোবাসতিস, চপ খাবি? চপ পাওয়া যাবে এখন?

দোকানী উত্তর দিলে—'একটু দেরি আছে। আধঘণ্টা পরে পাবেন। চপ গড়া হচ্ছে।'

'বেশ আমরা বসছি। বস--'

কোণের টেবিলে দুটো চেয়ারই ছিল। দুজনে দুটো চেয়ারে বসল। বেয়ারা টেবিলে চা টোস্ট কেক দিয়ে গেল। কেকটা নিয়ে উঠে পড়ল সত্যেন।

'এটা টোটোকে দিয়ে আসি—'

'টোটো কে?'

'আমার বন্ধু।'

টোটো বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল উদ্গ্রীব হয়ে।

কেকটা ছুঁড়ে দিতেই গপ করে ধরে ফেলল সেটাকে।

সত্যেন ফিরে এসে দেখল টিকলু তার খাতার প্রথম পাতাটা খুলে ভুরু কুঁচকে বসে আছে।

'এ কবিতা তুই রাস্তা চলতে চলতে লিখেছিস? এ তো সাংঘাতিক কবিতা দেখছি। এর মানে কি?'

'ও কবিতাটা বাড়িতেই লিখেছিলাম। শেষের দিকের কবিতাগুলো রাস্তায় লেখা—'

'কিন্তু এ কবিতার অর্থ কি।'

এই বলে টিকলু পড়তে লাগল—

'দ্বৈত-অদ্বৈতের দ্বন্দ্বে
শতভিষা-স্বাতী মেতেছিল মহানন্দে।
স্থবির ফানুসে আর নবীন বুদ্বুদে
বাধিল বিবাদ কালো কালো লঘু মেঘে
শ্রাবণের গোধূলিতে সহসা একদা।
তারপর তুমি এলে,
আমি তো ছিলামই।
তোমার চোখের ভাষা
আমার বুকের শ্লেটে যে গান লিখিল
তাহার উত্তর আমার দৃষ্টির প্লেন
কতবার গাহিল সখি লো,
তব যুগ্ম গিরিশিখরের উন্মুখ চূড়ায়,
ঘুরিয়া ফিরিয়া।
দ্বৈত-অদ্বৈতের সত্য
সমাধান হল না তো তবু—'

কবিতা পড়া শেষ করে টিকলু হাসি মুখে বললে—'এর উত্তরে আমারও কবিতায় বলতে ইচ্ছে করছে—

কিন্তু সবসুদ্ধ মিল এ কি হল দুর্বোধ্য হেঁয়ালি কহ কবিবর। দ্বৈত-অদ্বৈত সহ শতভিষা-স্বাতী, বুদ্বুদ, ফানুস, শ্লেট, প্লেন গিরিশিখরের লেংগি শ্রাবণের গোধূলিতে কালো কালো মেঘ—এ কি এ দুষ্পাচ্য ছ্যাঁচড়া বানাইলে হে আজব চেফ্। হজম করিবে এরে যে ভীম ভবানী, তিনি তো সেকেলে দুর্গে বন্দী আজও, লয়ে তার ভস্ম কীটটিরে। কাহার গুষ্টির পিণ্ডি চটকাইলে তুমি কহ কবিবর—'

বলেই হো হো করে হেসে উঠল সে। তারপর বলল—'নে খা। আর একটা অমলেট দিতে বলব?'

'না। তুই একটা কথা ভুলে যাচ্ছিস। যে কাঁচের গ্লাসটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে তারই ভাঙা কাঁচগুলোর মধ্যে খুঁজেছিস তুই আগেকার গ্লাসটা। সেটা নেই, আছে টুকরোগুলো—either you accept them or reject them—আসল গ্লাস আর নেই।'

'আহা চটছিস কেন? এই আর একটা করে অমলেট আর কেক দাও—'

গব্ গব্ করে খেতে লাগল সত্যেন। খাওয়া শেষ করে বলল—'আমি কিন্তু ভাঙা গ্লাস থাকব না।

সাবেক গ্রাস হব। যে মন্ত্রবলে সেটা হবে তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি রাস্তায় রাস্তায়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষ্যাপা যেমন পরশ পাথর খুঁজে বেড়িয়েছিল।'

টিকলু তার মুখের দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে চেয়ে বসে ছিল। কোনো উত্তর দিলে না।

'অমন করে চেয়ে আছিস কেন?'

'তোর রোগটা কি ধরতে পেরেছি। আমাকেও ওই রোগে ধরেছিল—'

'রোগ? মানে?'

'ব্যাধি। আমরা কেউ নর্মাল নই। খেতে পাই না, ভোগ করতে পাই না, আমরা বঞ্চিত বুভুক্ষু পরশ্রীকাতর।'

'আমি ভিক্ষে করি বটে। কিন্তু খেতে পাই।'

'তোর চোখের দৃষ্টিতে লেখা রয়েছে তুই বুভুক্ষু। তোর কবিতা প্রমাণ করছে তুই রিরংসার ঘোরে প্রলাপ বকছিস। তোকে দোষ দিচ্ছি না, দেহের ক্ষুধা না মিটলে সবারই ওরকম হয়। যাদের হয় না, তারাই মহাপুরুষ। তারাই মহামানব, তারা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দলের। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষেরা তা পারি কি? পারি না। কাবু হয়ে পড়ি, কেতরে যাই। আমাদের ক্ষিধের সময় খাবার চাই, তা না পেলেই বখেড়া। আমিও বখেড়ায় ভুগেছি। আমি তোর মতন কবিতা লিখতাম না, রাস্তায় মেয়েমানুষ দেখে বেড়াতাম। কিন্তু আমি এখন সামলে গেছি, ক্ষিধে মিটিয়ে নিয়েছি। তুইও আয় আমার সঙ্গে তোর ক্ষিদে মিটিয়ে দেব—'

সত্যেন অবাক হয়ে চেয়ে ছিল টিকলুর মুখের দিকে।

'তুই চাকরি পেয়েছিস বুঝি। তোর বউ তো বেশ সুন্দরী দেখলাম—'

'রং! আমি চাকরিও পাইনি, ও আমার বউও নয়।'

'কি করিস তাহলে—'

'দালালি করি। মেয়েমানুষের দালালি। অনেক হোমরা-চোমরা ধনী লোক লম্পট প্রকৃতির। কিন্তু বাইরে তাঁরা সচ্চরিত্র সেজে থাকতে চান। গোপন জায়গায় তাঁদের জন্য আমি ভালো ভালো মেয়েমানুষ যোগাড় করে দি। বেশ্যারাও ভালো খদ্দের পাওয়ার জন্যে উন্মুখ। তাই দুদিক থেকেই আমি বেশ মোটা কমিশন পাই। চৌরঙ্গীতে গ্র্যান্ড হোটেলে থাকি। তুইও আমার কাছে আয়। তোর সব ক্ষিধে মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দেব আমি।'

'আমি লম্পট নই টিকলু। আমার প্রিয়া বেশ্যা নয়।'

'মেয়েমানুষ তো?'

'তা যে কি তা তোমাকে বোঝানো যাবে না। তা বোঝবার বুদ্ধিও তোমার নেই।'

'মানছি, তোমার কবিতা বোঝবার বুদ্ধি আমার নেই কিন্তু কবিতার পিছনে কি আছে, কি তোমাকে নাচাচ্ছে তা আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি। আমার কাছে থাকবি চল দিনকতক, সব ঠিক হয়ে যাবে—আমার সন্ধানে ভালো ভালো মেয়ে আছে—উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, ক্লিওপেট্রা, তিলোত্তমা—নানারকম—'

'যে মেয়েটি তোমার সঙ্গে ছিল সে পুতুল কিনছিল কেন? তার ছেলেপিলে আছে না-কি।'

'না। কিনছিল ওর ভাই-বোনদের জন্যে। একগাদা ভাই-বোন আছে ওর। বিরাট সংসার। ও-ই তাদের পালন করে। ওর বাবুটি বেশ বড়লোক—'

সত্যেন সবিস্ময়ে চেয়ে রইল টিক্‌লুর মুখের দিকে।

টিক্‌লু বলতে লাগল—'অমন হাঁ করে আছিস কেন। যা বলছি তা ফ্যাক্ট। তুমি ফিক্‌শনের জগতে বাস করছ! যদি বাঁচতে চাও ফ্যাক্‌টের সঙ্গে মুখোমুখি হও।'

'ফ্যাক্‌ট মানে কি নোংরামি?'

'নোংরামি কিনা জানি না। ফ্যাক্‌ট হচ্ছে আমরা সবাই পশু। আমাদের নানারকম ক্ষিদে আছে। সেগুলো আগে মেটানো দরকার। সেটা মিটলে তবে অ-পশুসুলভ মহত্ত্বের কথা ভাবতে পারবি, তার আগে নয়। আগে ক্ষিধে-তেষ্টাগুলো মিটুক।'

'ননসেন্স। তোমার থিয়োরি নিয়ে তুমি থাক, আমি চললুম—'

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল সত্যেন। তার কেমন যেন ভয় করতে লাগল। মনে হল হঠাৎ সে যেন একটা ভাঙ্গনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। পালিয়ে না গেলে এখনই তলিয়ে যাবে।...

'কোথা যাবি।'

টিকলু হাত চেপে ধরল তার। এতে আবও ভয় পেয়ে গেল সত্যেন। তার অন্তরবাসী আর একটা সত্তা যেন বলতে লাগল— টিকলু যা বলছে, তা ঠিক। তুমি রাজি হয়ে যাও।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে।

টিকলু আবার বলল—'পাগলামি করিস না। চল আমার সঙ্গে। আমার ঘরটা বেশ বড়। সেইখানে তুই থাকবি—'

'কারো স্কন্ধে আমি থাকতে চাই না। আমি চললাম। হাত ছেড়ে দে—'

'স্কন্ধে থাকবি কেন, পেইং গেস্ট হয়ে থাকবি। তোকে একটা চাকরি যোগাড় করে দেব আমি। অনেক হোমরা-চোমরা লোকের 'টাচ'-এ আমাকে আসতে হয়। সেদিনই তো একজন বলেছিলেন—ভালো একটা প্রাইভেট সেক্রেটারি রাখতে চান—দুশো টাকা মাইনে দেবেন। সেটা আমি যোগাড় করে দেব তোকে। চল—'

'কি করতে হবে আমাকে?'

'তা আমি ঠিক জানি না। চিঠি-পত্তর লিখতে হবে। তাঁর বক্তৃতাও লিখে দিতে হবে হয়তো। অনেক জায়গায় বক্তৃতা দেন তিনি। একটা হাত-নুড়কুৎ সঙ্গী হতে হবে আর কি। সর্বোপরি তাঁকে খুশি রাখতে হবে।'

সত্যেনের মনে হল একটা অদৃশ্য জাল যেন ক্রমশ ঘিরে ধরছে তাকে। এতদিন সে চাকরিই তো খুঁজছিল। কত জায়গায় কত দরখাস্ত করেছিল। এখন তার হঠাৎ মনে হল, না, আমি কারও দাসত্ব করতে পারব না। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে আমি যে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছি তা অপূর্ব। যে পথের জনতা এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছে আমাকে অথচ আমার স্বাধীনতা হরণ করবার চেষ্টা করেনি সে পথকে আমি ত্যাগ করব না। ওই পথের স্রোতেই ভেসে বেড়াব। ঐ পথই হয়তো আমাকে কোনোদিন স্বাধীন কাজ দেবে।

'না ভাই' ওসব আমার পোষাবে না। আমি চললাম—'

দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল সত্যেন। টোটো বাইরে কান খাড়া করে অপেক্ষা করছিল। সত্যেন রাস্তায় নামতেই তার পিছু পিছু চলতে লাগল।

'সতু, শোন শোন—'

টিকলুর গলা শোনা গেল। কিন্তু সত্যেন আর ফিরল না। ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে গেল। কিছু দূর গিয়ে দেখল মোটরের সারি। ট্রাফিক পুলিস আটকেছে। একটা মোটরের জানালায় একটা মেয়ের মুখ দেখা গেল। বৃদ্ধা। কিন্তু এককালে রূপসী ছিলেন মনে হয়। ধপধপ করছে রং, টানা টানা চোখ, মাথার সাদা চুলে সিঁদুর।

মা—

হাত পেতে তার কাছে দাঁড়াল সত্যেন। মহিলাটি একটি রেশমের থলি খুলে পঁচিশ নয়া দিলেন তাকে।

প্রণাম করে চলে গেল সত্যেন। খুঁজতে লাগল মোটরের সারির মধ্যে আর কোনো মহিলার মুখ দেখতে পাওয়া যায় কিনা। সে বুঝেছে মেয়েরাই পয়সা দেয়। পুরুষেরা দেয় না। পুরুষদের মধ্যে কেউ উপদেশ দেয়, কেউ কোনো কথাই বলে না। মেয়েরাই এই মেয়েরই, ভিখারিদের বাঁচিয়ে রেখেছে। হঠাৎ রাস্তার আলো নিবে গেল। মোটরের সারি অবলুপ্ত হল। লোড-শেডিং হচ্ছে আজকাল। অন্ধকারের মধ্যে সব যেন কিলবিল করতে লাগল পোকার মতো। ধীরে ধীরে সে-ও মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। রাতটা কোথায় কাটাবে? কাছাকাছি পার্ক আছে কি কোনো? কিম্বা কারও বাড়ির বারান্দা?

শুধু আলোই নিবে যায়নি। বৃষ্টিও হয়েছিল। দুটো প্রকাণ্ড বাড়ির মধ্যে একটা সঙ্কীর্ণ গলি ছিল, তারই ভিতর আশ্রয় নিয়েছিল সত্যেন। টোটোও বসেছিল গলির মুখটাতে। সমস্ত রাত ভিজেছিল দুজনে। সত্যেন ভিজতে ভিজতে ঘুমিয়েছিল। সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছিল, গলিটা দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছিল, তবু ঘুমিয়েছিল সে। চোখ বুজে শুয়েছিল এক ধারে, পাশ দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছিল, বৃষ্টির ছাট গায়ে লাগছিল, তবু ঘুমিয়েছিল সে। সমস্ত দিন ক্লান্ত ছিল, অত অসুবিধার মধ্যেও নিদ্রাদেবী কৃপা করেছিলেন তাকে।

সকালে রোদ উঠল। সত্যেন ঘুম থেকে উঠে দেখে রোদে চারদিক ঝলমল করছে। বেরিয়ে এসে রোদে বসল সে। গায়ের জামা-কাপড় ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে। রাস্তা দিয়ে লোক আসছে যাচ্ছে। আসা-যাওয়ার বিরাম নেই কারো। একটা আপাদ-মস্তক ভিজে অদ্ভুত মানুষ যে ফুটপাথে বসে আছে তা দেখে কৌতূহল জাগছে না কারো। সবাই তাকে দেখে দেখে চলে যাচ্ছে, কিন্তু থামছে না কেউ। সকলেই যেন গা বাঁচাতে চায়। সকলেরই ভাবটা যেন—কি কাজ বাবা ওকে ঘাঁটিয়ে? কি ফ্যাসাদে পড়ে যাবে কে জানে। হঠাৎ একটা চার-পাঁচ বছরের মেয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার পরনে লালপাড় শাড়ি। বার বার খুলে যাচ্ছে শাড়িটা, বাঁ-হাত দিয়ে সামলাচ্ছে শাড়িটা, ডানহাতে একটা আধখানা খাওয়া পেয়ারা।

'আমার ছেলের বিয়েতে তুমি বরযাত্রী যাবে?'

পুলকিত হয়ে উঠল সত্যেন। তার দেহমনের সুপ্ত আনন্দ যেন জেগে উঠল সহসা।

'নিশ্চয় যাব। কত দূর যেতে হবে—'

'ওই তো পাশের বাড়ি। বাবা, দাদা, ছট্টু, কমল কেউ যেতে চাইছে না। সবাই বলছে কাজ আছে। বাবার আপিস, দাদার কলেজ, কমলের বাসন মাজা বাকি। কিন্তু আমার ছেলের বিয়েটি কি করে হয় তাহলে বল—। বরের সঙ্গে বরযাত্রী না গেলে কি বিয়ে হয়—'

'বেশ চল, আমি যাই। কখন যেতে হবে—'

'এখনই। দাঁড়াও, আমি বরকে নিয়ে আসি তাহলে।'

এক ছুটে চলে গেল সে সামনের বাড়িটায়। সোৎসুকে চেয়ে রইল সত্যেন। টোটো ঘুমুচ্ছিল, সে-ও উঠে বসল। সে-ও যেন টের পেয়েছিল নতুন রকম কিছু একটা হচ্ছে। একটু পরেই উলুধ্বনি শোনা গেল। তারপর দুটি মেয়ে ছোট্ট একটি কাঠের পালকি নিয়ে বেরিয়ে এল। পালকির ভিতর বর বসে আছে সাজ-সজ্জা করে। কাগজের ছোট্ট টোপরও আছে একটি তার মাথায়।

'বরযাত্রী, তুমি বরের সঙ্গে সঙ্গে এস—'

সত্যেন গেল তাদের পিছু পিছু। টোটোও গেল।

বেশিদূর নয়। পাশের বাড়ি। সেখানে যেতেই আবার উলুধ্বনি শোনা গেল। শাঁখ বাজাতে বাজাতে একটি হাসি-খুশি মেয়ে এসে কপাট খুলে দিল।

মুগ্ধ হয়ে গেল সত্যেন তাকে দেখে। রং ফরসা নয়, কিন্তু কি অপরূপ লালিত্য ফুটে উঠেছে মেয়েটিকে ঘিরে! মনে হল যেন মহাভারতের কৃষ্ণা।

'বরযাত্রী, তুমি বারান্দায় বস। তোমার খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি—'

যে মেয়েটি শাঁখ বাজাচ্ছিল সে হেসে বললে—'মা গো মা। এই বুঝি তোমার বরযাত্রী। কোথা থেকে জোটালে একে।'

'বাবা দাদা কমল কেউ আসতে রাজি হল না। ও আমাদের বাড়ির সামনে বসেছিল। ওকে বলতেই ও রাজি হয়ে গেল। খুব ভালো লোক। ওকে খেতে দাও—'

বাড়ির কপাট বন্ধ হয়ে গেল।

একটু পরেই শালপাতা নিয়ে প্রবেশ করল একটা চাকর।

'আরে এ যে একটা ভিকিরি দেখছি—'

পিছনে খাবার নিয়ে আর একজন দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল—'ভিকিরি হোক আর যাই হোক, ও বরযাত্রী এখন। দিদিমণি ওকেই খাবার দিতে বলেছে। পাতাটা পেতে দাও তুমি। এক গ্লাস জল নিয়ে এস—'

পাতার উপর ফুলকো লুচি, আলুর ছোকা, মাছের কালিয়া, ফিস্ ফ্রাই, চাটনি, দই, পায়েস, সন্দেশ আসতে লাগল একে একে।

টোটোও উদ্গ্রীব উন্মুখ হয়ে বসেছিল সামনেই। তাকে মাঝে মাঝে খাবার ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিল সত্যেন। প্রচুর খাওয়া হল।

ছোট্ট মেয়েটি বেরিয়ে এল।

'পেট ভরে খেয়েছ তো?'

'খেয়েছি। বিয়ে কখন হবে?'

'বিয়ে রাত্রে। লগ্ন সাতটার পর। এই নাও পান দু খিলি।'

পানও এনে দিল সে।

'সন্ধের পর বিয়ে। তুমি এসো। আসবে?'

সত্যেনের ইচ্ছে হল বলে আসবে। কিন্তু ওই কালো মেয়েটিকে দেখবার পর থেকেই তার মনে যে অপূর্ব স্বপ্নলোক মূর্ত হয়ে উঠেছিল তার ভয় হতে লাগল। বেশি ঘনিষ্ঠতা করলে তা হয়তো ভেঙে যাবে। প্রতিমার ভিতর থেকে মাটি-খড় বেরিয়ে পড়বে হয়তো। এখানে না থাকাই ভালো।

'না, আমাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে। আমি আসতে পারব না বিয়েতে।'

'দাঁড়াও তোমাকে আর একটা জিনিস এনে দিচ্ছি।' মেয়েটি ছুটে গিয়ে দুটো লজেন্‌স নিয়ে এল। তারপর ফিস ফিস করে বললে— 'মেয়ের মা হাড়কিপটে। লজেন্‌স দিয়ে তত্ত্ব করেছে।'

সত্যেন স্বর্গলোক থেকে বিদায় নিয়ে আনমনে চলেছিল রাস্তা দিয়ে। এই কলকাতা শহরে এরকম স্বর্গলোকও আছে তাহলে। হঠাৎ তার মনে হল নদীর উপরে যে সব ময়লা ভাসছে তাই দেখে আমরা ভুলে যাই নদীর গভীরে নির্মল স্বচ্ছ জল আছে। তার কেমন যেন বিশ্বাস হয়ে গেল—এ জাত মরবে না। তাকে বাঁচিয়ে তোলবার জন্য সঙ্গোপনে সঞ্জীবনী সুধা সঞ্চিত হয়ে আছে ঘরে ঘরে।

কিছুদূর গিয়ে দেখল গরুর গাড়ির সারি চলেছে। হঠাৎ একটা গাড়ির গাড়োয়ান চেঁচিয়ে উঠল।

'আরে সত্তুবাবু নাকি। মোচ-দাড়ি রেখেও ছিপাতে পারলেন না হামার কাছে।'

সত্যেন অবাক হয়ে চেয়ে রইল তার দিকে।

'আরে হামি ভিকু আছে। আপনাদের কালেজে নোকর ছিলাম। আর নোকরি করি না, নিজের গাড়ি চালাই—'

দুহাতে রাশ টেনে সে থামিয়ে দিলে তার বড় বড় বয়েল দুটোকে।

'আইয়ে বৈট যাইয়ে—'

উঠে বসল সত্যেন। কিন্তু তার ভারি লজ্জা করতে লাগল। যার চক্ষে সে একদিন বাবু ছিল তার চক্ষে আজ সে এ কি দীনবেশে হাজির হল। গাড়ি চলতে লাগল। টোটো আসতে লাগল গাড়ির পিছু পিছু। সত্যেন কিছু না বলে চুপ করে বসে রইল।

ভিকু কিন্তু নীরব থাকবার লোক নয়।

'সত্তুবাবু, আপকা চেহারা কুছ দমক গিয়া। ক্যা বাত হ্যায়—'

মিছে কথা বলল সত্যেন।

'অসুখ করেছিল কিছুদিন আগে—এখনও তাই দুবলা আছি—'

'আচ্ছা করকে খানাপিনা কিজিয়ে, আউর ডনড বৈঠক। সব ঠিক হো যায়গা—'

চুপ করে বসে রইল সত্যেন।

'আপ কিধার যাইয়ে গা—'

সত্যেনের অস্বস্তি হচ্ছিল। বলল—'আমি চৌমাথাতেই নেমে যাচ্ছি। তুমি কোথা যাবে—'

'হাওড়া টিশন। মাল গোদাম—'

'আমি শ্যামবাজারে যাব। এইখানেই বাস পাব—' মিথ্যা ভাষণ করে একটু অস্বস্তি হতে লাগল। শেষে নেমে পড়ল সত্যেন। বলিষ্ঠ সরল লোকটার কাছে বসতে লজ্জা হল। গরুর গাড়ির সারি চলে গেল।

হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে সে আবার জায়গা পেয়ে গেল একটা। তিনকোণা জায়গাটা রেলিং দিয়ে ঘেরা। রেলিংয়ের ভিতর একটা সমাধি বোধহয়। বুঝতে পারল না ঠিক কি। এক জায়গায় কিছু ফুল আর মালা রয়েছে দেখল। রেলিংয়ের ধারের চারপাশ সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। সেখান দিয়ে লোক চলছে না। সেখানে গিয়ে বসল সত্যেন। রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে বসল। বসে আবিষ্কার করল সেই কৃষ্ণা মেয়েটি এখনও তার মনের অলিন্দে যেন দাঁড়িয়ে আছে। নাগালের বাইরে। কিন্তু মনে হতে লাগল তার দিকেই চেয়ে আছে সে। যে মেয়েকে ভালো লাগে সে যেন মন থেকে যেতে চায় না। রিরংসা?

না, না টিকলুর কথা সে মোটেই মানবে না। রিরংসা হয়তো আছে নেপথ্যে, কিন্তু রিরংসাই সব নয়। যে অবর্ণনীয় মাধুরী পুষ্পিত হয়েছে ওর সর্বাঙ্গে তা কেবল মাংস নয়, তা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, কিন্তু অলীকও নয়। তা ওর মনের দীপ্তি, তা ওর ব্যক্তিত্ব, তা অবাস্তব অথচ বাস্তব। হঠাৎ মনে হল সত্যিই ও যদি কাছে আসে? ওই অসীমাকে সে কি ধরতে পারবে? খুব যদি ছোট হয়ে আসে? না, তাহলেও পারবে না। তাহলে?

কবিতা জাগতে লাগল মনে।

অসীম হোয়ো না তুমি। নাগাল পাব না। অতিশয় সীমাবদ্ধ অতি ক্ষুদ্র হয়ে যাও যদি, তাহলেও পাব না তোমাকে। বেশি বাড়াবাড়ি হলে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। আমার চেতনালোক নয় ভূমা সম। নয় অতি বড়, অত্যন্ত ছোটও নয়, নয় তাহা আণুবীক্ষণিক। আকাশ প্রান্তর নদী পুষ্পিত বনানী আছে সেথা, এমন কি সমুদ্র পর্বতও আছে কিছু কিছু। লেক আছে, ঝরনা ঝরে। মরুভূমি আলোড়িত করি লু-রাক্ষসী মাঝে মাঝে প্রতপ্ত তাণ্ডব তোলে। মধ্যবিত্ত আমার চেতনালোক। ময়ূরপঙ্খীতে চেপে আসিবে কি সেথা তুমি? আস যদি মোর নদনদী, আকাশ-সমুদ্র তোমার সে ময়ূরপঙ্খীরে সমাদরে করিবে বরণ। আমি কিন্তু রব না সেথায়। আমার খুশির ঝড়ে আমি উড়ে যাব সেই স্বপ্নলোকে—যেথা তব মাতৃভূমি, পিতৃভূমি, আদিভূমি, জন্মভূমি—যেথা তুমি ছিলে, কিন্তু নাই। খুঁজিব তোমাকে সেথা, কেবল খুঁজিব।

কবিতাটাই আচ্ছন্ন করে রাখল তাকে অনেকক্ষণ। হঠাৎ কিন্তু ভেঙে গেল সব। সে যেন তাকে চুলের মুঠি ধরে আছড়ে ফেলে দিল কোলকাতার রাস্তার উপর।

'আমাদের দাবি মানতে হবে—আমাদে দাবি মানতে হবে'—

বিরাট মিছিল চলেছে। এক হাতে পতাকা—আর এক হাত মুষ্টিবদ্ধ।

কে ওরা?

কোথায় চলেছে?

যে ওদের দাবি মানবে সে কোথায়? সে কি ওই ভোট-ভিখারি মন্ত্রীরা? না পুঁজিপতি কোনো বিরাট ধনী? ওরা কি আমাদের দাবি মেটাতে পারবে? আমার দাবি আমি ছাড়া আর কেউ কি মেটাতে পারে? হঠাৎ এই অসম্ভব অবাস্তব কথাটা ঘুরপাক খেতে লাগল তাঁর মনে। মনে হল আমরা সব যেন সেই আলিবাবা নাটকের মর্জিনা। নাচবার জন্যে—জঞ্জাল খুঁজছি। জঞ্জাল না পেলে 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল' গান গেয়ে নাচ দেখানো যায় না। এ দাবি কি মানুষ হবার দাবি? আদর্শ বাঙালি হবার দাবি? টিকলুর কথাটা আবার মনে পড়ল, ক্ষিধে না মিটলে মানুষ হওয়া যায় না। ক্ষুধার্ত মানুষরাই কেবল কি ছট্‌ফট্ করছে তাহলে চারদিকে? ক্ষুধার আগুনে আদর্শ, মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব, সব পুড়ে গেল? মনে হল ওরা যেন বলছে—

ছি ছি এত্তা জঞ্জাল বলেছিল নর্তকী মর্জিনা। সে মর্জিনা নাই আজ। নূতন যুগের মোরা নূতন মর্জিনা। ছন্দে তালে সর্বাঙ্গ দুলায়ে কহিতেছি—দাও, দাও কোথায় জঞ্জাল। জঞ্জাল না পেলে মোরা সবাই বেকার। জঞ্জালের মঞ্চে মোরা চাহি যে নাচিতে, জঞ্জালে অঞ্জলি ভরি চাহি যে পূজিতে জঞ্জাল-সম্রাটে। পরিচ্ছন্ন, সুপবিত্র তোমরা যাদের বল—তারা সব পৌরাণিক রূপকথা, চিরশিশু চিরমুগ্ধ অবাস্তব জীব। মোরা শিশু নই, বৃদ্ধ নই, যীশু নই। ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত মোরা। জঞ্জালেরই মাঝে

খুঁজি খাদ্য, খুঁজি তৃপ্তি, খুঁজি মুক্তি, খুঁজি উন্মাদনা। আমাদের দাবি জঞ্জালের মাঝে মোরা খুঁজে পাব মোক্ষ-মণি। অকস্মাৎ মৃত আলিবাবা দেখা দিবে চাকরি-দাতারূপে, চাকরির লক্ষ মোহর ছুঁড়ে দিবে চারিদিকে, 'নাও নাও চাকরি নাও' এ সব চিচিং ফাঁক খুলে দিক পাষাণ-কপাট চাকরি-গুহার। প্রেক্ষাগৃহ হাততালি মুখরিত হোক...

সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সত্যেন। তার চোখের সামনে এক নূতন মিছিল চলছিল। ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকী সূর্য সেন বাঘা যতীন অরবিন্দ ব্রহ্মবান্ধব বিবেকানন্দ প্রফুল্লচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ—আরও কত লোক। সবাইকে চেনে না সে—জ্যোতিষ্কের মিছিল একটা—চারিদিক আলোয় আলো—ওই যে ভিড়ের মধ্যে রয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্র, তর্ক করছেন যেন কার সঙ্গে—বঙ্কিমচন্দ্রও চলেছেন এক ধার দিয়ে দৃঢ়পদে কোনো দিকে না চেয়ে। তন্ময় হয়ে বসে রইল সত্যেন। মনে হল সে যেন অন্য জগতে চলে গেছে।

কিন্তু কলকাতা শহর কাউকে বেশিক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে থাকতে দেয় না। গগন-বিদারী গর্জন করে একটা লরি এসে থামল। লরিতে বন্দুকধারী মিলিটারি রয়েছে। প্রত্যেকের পরনে খাকি পোশাক, হাতে বন্দুক। লরির পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে একটা অচল মোটরকার। কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ, ড্রাইভার সেলফ দিয়ে চলছে অবিরত, গাড়ি চলছে না। দুপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে জনতা। রাস্তা খুব চওড়া নয়। মোটর লরি এগুতে পারছে না। রাস্তার দুপাশে পশরা বিছিয়ে নির্বিকার বসে আছে হকারের দল। একটা লোক মাঝে মাঝে চেঁচাচ্ছে, ছে ছে পয়সা দু দু আনা। নানা রকম প্ল্যাসটিকের ছোট ছোট পুতুল, থালা, হাঁড়ি, গ্লাস, চামচে, পেয়ালা, ডিস স্তূপীকৃত রয়েছে তার সামনে। দুটো রিকশাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। একটাতে বসে আছে এক মাড়োয়ারী স্থূলকায়া বৃদ্ধা, অন্যটিতে চোং প্যান্ট পরা ছেলে একটি...

মিলিটারি লরি হর্ন দিয়ে চলেছে, অচল মোটরকারের ড্রাইভার নেবে হ্যান্ডেল মারছে গাড়িতে, কিন্তু গাড়ি চলছে না। লরির পিছনে দাঁড়িয়ে গেছে মোটরের সারি, মাঝে মাঝে—ছে ছে পয়সা দু দু আনা—বিকট গর্জন করে একটা প্লেনও উড়ে গেল। টোটো কিন্তু ভিড়ের মধ্যে যায়নি। দূরে সিমেন্টের উপর কান-খাড়া করে বসে আছে চুপ করে। হঠাৎ কয়েকজন মিলিটারি জোয়ান লরি থেকে নেবে গেল। অচল মোটরকারটাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে রাস্তা থেকে। দেখতে দেখতে রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল। মেঘ কেটে বেরিয়ে পড়ল যেন নীল আকাশ।

সামনের ফুটপাথের উপর একটা শুকনো গাছের ডালে দুটি শালিক পাশাপাশি বসে আছে তাদের দেখা গেল। ভিড়ের গোলমালে এতক্ষণ ওদের দেখা যায়নি। বেশ নির্বিকার ভাবে বসে আছে ওরা। সত্যেনের মনে হল—আহা মানুষ না হয়ে যদি পাখি হতাম! ফুরফুরে হাওয়া বইতে লাগল। 'ছে ছে পয়সা দু দু আনা' বলে যে ছোঁড়াটা চেঁচাচ্ছিল দেখা গেল সে-ও বিড়ি ধরিয়ে তার সঙ্গিনীর সঙ্গে হেসে হেসে গল্প জুড়ে দিয়েছে। তার পাশে যে একটি সঙ্গিনী ছিল এতক্ষণ দেখা যায়নি। সে ওই ভিড়ের মধ্যে কুঁকড়ে শুয়ে ছিল ফুটপাথেরই উপর। দু দিকে বেণী ঝোলানো ডগমগে ছিটের জামা পরা মেয়েটি ভারি সপ্রতিভ বলে মনে হল।

তারপরই ছুটতে ছুটতে এল একটা ছেলে, এসেই একটা বাড়ির পাঁচিল টপকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। তার পিছু পিছু যারা ছুটে আসছিল তারা ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল। শোনা গেল খুন হয়েছে। এক পার্টির লোক আর এক পার্টির লোককে গুলি করেছে।

বাজারের থলি হাতে করে দুজন ফতুয়াপরা ভদ্রলোক সত্যেনের পাশে এসে দাঁড়ালেন। একজন বেঁটে একজন লম্বা। দুজনেরই মাথায় টাক।—'বুঝলে গঙ্গা, সব পাগল হয়ে গেছে। একটা পাগল আর একটা পাগলকে খুন করছে।'

গঙ্গা বললেন—'পাগল হতে যাবে কেন! নেতায় নেতায় যুদ্ধ হচ্ছে, ছোঁড়াগুলো ওদের সোলজার। একদল মনে করছে বিপক্ষ দলকে যদি কাত করতে পারি তাহলে আমরা হু হু করে চাকরি পেয়ে যাব। উজির নাজির হয়ে যাব, চলতি বাংলায় একে বলে খেওখেয়ি।'

'না না, বুঝতে পারছ না, ওরা পাগলই হয়ে গেছে। ক্ষিধেয় পাগল। শুধু ক্ষিদে নয়। নানা অভাব পাগল করেছে ওদের। ওরা চাকরি পায়নি, বল পায়নি, শিক্ষা পায়নি, কিছু পায়নি। ওরা খালি কিলবিল করছে আর যখন তাও অসহ্য হয়ে উঠছে তখন হত্যা করছে পরস্পরকে। এতগুলো পাগলাকে কি কোনো গভর্নমেন্ট সামলাতে পারে? পারবে না, সুতরাং এ চলবেই। এই গণ-আত্মহত্যা করে করেই সমাজ হয়তো হালকা হবে একদিন।'

গঙ্গা বললেন—'আরে তোমার বাজে ফিলজফি ছাড়, ওসব পার্টি পলিটিকস। এবার চল। আমাকে মেয়ের কাছে শ্যামবাজারে যেতে হবে— চল চল।'

ওঁরা চলে গেলেন।

বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল সত্যেন। সামনে একটা মোটর এসে দাঁড়িয়েছিল। সে মোটরের জানলায় যে মহিলাটি বসে ছিলেন তাঁর কাছে ভিক্ষে চাইলে ভিক্ষে পাওয়া যেত। তাঁকে দেখে মনে হয় উনি প্রত্যাখ্যান করবেন না। কিছু-না-কিছু দেবেনই। লোকের মুখ দেখে তার চরিত্র কি তা বোঝবার ক্ষমতা হয়েছিল সত্যেনের। কিন্তু হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল না। পকেটে পয়সা ছিল। পেটও ভরা। মোটর চলে গেল।

কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত রাস্তাটা আবার ফাঁকা হয়ে গেল।

ছে ছে পয়সা দু দু আনাও উঠে গিয়ে সামনের দোকানে চা খাচ্ছে। তার সঙ্গিনীটি দোকান আগলে বসে আছে। কি যেন খাচ্ছে মেয়েটিও, টোটো'ও তার পাশে গিয়ে বসেছে। মেয়েটির কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। একটি মা তার ছোট ছেলের হাত ধরে আস্তে আস্তে যাচ্ছে ওধারের ফুটপাত দিয়ে। ছেলেটির বেশ একটু ভব্যিযুক্ত ভাব। মা একটা তেলেভাজার দোকানে দাঁড়িয়ে কিছু তেলেভাজা কিনলেন। ঠোঙাটি ডান হাতে ধরে এগিয়ে গেলেন। একটু আগেই এখানে যে এত হই-চই হয়ে গেল তার চিহ্নমাত্র নেই। ক্লিন শ্লেট।

সত্যেনের মন কিন্তু নিষ্ক্রিয় ছিল না। তার মনে হচ্ছিল, একটু আগে সে যে জ্যোতিষ্কদের মিছিল দেখল—সেই মিছিল কোন্ দিকে গেল—কোথা থেকে এল। যাদের সে দেখল তারা কেউ তো এপারে নেই, সবাই তো ওপারে। এপারে ওপারে আনাগোনা আছে নাকি তাহলে? সে শুনেছে আছে। যতীনের মৃত মা তার কাছে আসত বার বার। যতীন মরেই গেল শেষে একদিন। সবাই বলল তার মা তাকে নিয়ে গেছে। এপারে ওপারে আনাগোনা আছে এর প্রমাণ অনেক বিদ্বান লোকও নাকি পেয়েছেন। কিন্তু কোথায় সে ওপার?

এপারে ওপারে আনাগোনা হয় শুনিয়াছি বহুকাল ধরে। সকলেই শুনিয়াছে। ওপার কোথায়? দিকচক্রবাল রেখা ঘন বন সমাচ্ছন্ন। কখনও দেখায় মেঘ, কখনও কুয়াশা, কখনও পর্বতমালা, সন্ধ্যা

উষা কখনও কখনও। অন্ধকার আলো দেখেছি ওপারে, দেখেছি নৌকাও। কিন্তু সে নৌকায় যে ওপারে যায় না তো, যাওয়া যে-ওপার ঠিকানাবিহীন, যাহার ইশারা ভেসে আসে মাঝে মাঝে অনির্দিষ্ট পথ বেয়ে, সে-ওপার হয়তো বা আছে এপারেই, কিন্তু তবু অদৃশ্য যা, স্বতন্ত্র রহস্যলোকে অস্তিত্ব যাহার। শুধু জানি এপারে ওপারে আনাগোনা হতেছে সর্বদা...

আর একটা অবর্ণনীয় ভাব মনে জাগছিল, তাকে সে ভাষা দিতে পারলে না। তারপর হঠাৎ চমকে উঠল। ঢাক বাজাতে বাজাতে একদল লোক হাজির হল কোথা থেকে। কোনো দিকে না চেয়ে ঢাক বাজাতে বাজাতে চলে গেল তারা। তাদের পিছু পিছু এল একটি ইহুদী মেয়ে সাইকেল চড়ে। খুব রোগা, নীল রঙের ফ্রকপরা, কালো চুল কালো চোখ। চোখের দৃষ্টি কিন্তু বুদ্ধিশাণিত। সে-ও কোনো দিকে না চেয়ে চলে গেল। তারপর এল একটা মোটর, তার পিছু পিছু আর একটা, তারপর আর একটা, আর একটা—মোটরের সারি জমে গেল আবার।

হঠাৎ সত্যেনের মনে হল আমি ওদের কেউ নই। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সেই কাঙালিনীর মত সে-ও যেন ধনীর দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে।

'বাজিতেছে উৎসবের বাঁশি, কানে তাই পশিতেছে আসি, ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে, দুরাশার সুখের স্বপন...'

খুব জোরে ইলেকট্রিক হর্ন দিয়ে এল একটা সবুজ রঙের ট্রাক, তার উপর বসে আছে একদল নগ্নগাত্র কুলি—কারও হাতে কোদাল, কারও হাতে গাঁইতি। কোথাও কাজ করতে যাচ্ছে ওরা। চলে গেল। সত্যেনের মনে হল আমি ওদের দলেও অপাঙক্তেয়, আমি কোদাল গাঁইতি চালাতে পারি না, আমি স্বপ্নসম্বল অপদার্থ জীব একটা। কিন্তু তাই কি ভ্রূ কুঞ্চিত করে সে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ সামনের ডাস্টবিনটার দিকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই টোটোর আর্তনাদ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। দেখল একটা বলিষ্ঠ কুকুর কামড়ে ধরেছে তাকে। আর সেই 'ছে ছে পয়সা দু দু আনা' লোকটা লাঠি নিয়ে মারছে ওকে। তাড়াতাড়ি ছুটে গেল সত্যেন। যখন গিয়ে পৌঁছল তখন বলিষ্ঠ কুকুরটাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে লোকটা। তবু সেটা দূরে দাঁড়িয়ে গজরাচ্ছে। আর টোটোর কান দিয়ে রক্ত পড়ছে, পিছনের পা দুটো থর থর করে কাঁপছে, তার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে তার লজ্জিত ল্যাজটা—

'টোটো, চল এখান থেকে যাই আমরা। আয়—' টোটোকে ধরে ধরে নিয়ে গেল সত্যেন।

হো হো করে হেসে উঠল সেই 'ছে ছে পয়সা দু দু আনা'।

'আয়া হে অব তেরা দোস্ত, খিলায়েগা রোটি গোস্ত—'

অপমানের চাবুকটা খেয়ে অপমানিত হল সত্যেন। পকেটে যদি যথেষ্ট পয়সা থাকত তাহলে সে সত্যিই গোস্ত রোটি কিনে এনে খাওয়াতো টোটোকে। কিন্তু পকেটে মাত্র চার আনা পয়সা আছে। কিছুদূর গিয়ে একটা ওষুধের দোকান দেখতে পেল।

'আমার কুকুরটার কানে আর একটা কুকুর কামড়ে দিয়েছে, রক্ত পড়ছে। একটু টিঞ্চার আয়োডিন লাগিয়ে দেবেন?'

'কতখানি নেবেন—'

জিগ্যেস করলে বাঙালি ছোকরাটি। কাউন্টারের এক কোণে বসে বসে সিনেমা-কাগজ পড়ছিল একটা। উঠবার ইচ্ছে ছিল না তার।

সত্যেন বলল— 'তুলোয় একটু লাগিয়ে দিন না।'

'তুলোয়? তুলোয় লাগিয়ে আমরা বিক্রি করি না।'

এর পরে চলে যাওয়াই উচিত ছিল কিন্তু সত্যেনের মধ্যে কে একটা যেন ক্ষেপে উঠল।

বলল—'যতক্ষণ না দিচ্ছেন, ততক্ষণ আমি কুকুর নিয়ে আপনার ডিসপেনসারিতে বসে থাকব। আপনার ডাক্তারবাবু কখন আসবেন?

'সন্ধের পর।'

'ততক্ষণ অপেক্ষা করব। আয় টোটো—'

টোটোকে নিয়ে ঢুকে পড়ল সে ডিসপেনাসারির ভিতর।

'এ তো আপনার আচ্ছা জবরদস্তি মশায়।'

সত্যেন কোনো উত্তর না দিয়ে বসে পড়ল। টোটোও বসল তার পাশে।

'খুচরো তুলো বাইরে নেই। আমি কি নতুন প্যাকেট ছিঁড়ব আপনার জন্যে? দাম দিন, ছোট প্যাকেট তুলো দিচ্ছি একটা। আয়োডিন নিয়ে যান—এক ড্রাম—'

'পয়সা বেশি নেই আমার। মাত্র চার আনা আছে, ওতে হবে কি?'

'না—'

'তাহলে আমার এই কাপড় থেকে ছিঁড়ে দিচ্ছি খানিকটা। তাতে আয়োডিন ভিজিয়ে দিন একটু। সেইটেই লাগিয়ে দিই।'

'তা কি হয়, আপনি পাগলের মত কথা বলছেন যে। যান এখান থেকে—'

'যাব না। ডাক্তারবাবু আসুন, তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাব।'

'এ তো মহাবিপদ দেখছি!'

তারপর গলাটা চড়িয়ে বললে—'আপনি যাবেন না? পুলিস ডাকব নাকি?'

'ডাকুন।'

ঠিক এই সময় খাকি হাফ্ প্যান্ট-গেঞ্জি পরা একটি ছেলে ডিসপেনসারির সামনে এসে দাঁড়াল!

'কি হয়েছে মানিকদা—'

'একটা বদমাইশ লোকের পাল্লায় পড়েছি—'

'কি হয়েছে—আরে একটা কুকুর রয়েছে এখানে দেখছি। কান দিয়ে রক্ত পড়ছে কেন?'

সত্যেনই তাকে সব কথা খুলে বললে।

'আমি গরিব মানুষ। আমার কাছে পয়সা নেই। ওঁকে বলছি একটু টিঞ্চার আয়োডিন তুলো দিয়ে লাগিয়ে দিন, আমি চার আনা পয়সা দেব। তা উনি দিচ্ছেন না, তাই বসে আছি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করব বলে।'

'ও, এর জন্যে আর ভাবনা কি। আমি এখনই এনে দিচ্ছি। আমাদের বাড়িতে তুলো, আইডিন, ব্যাণ্ডেজ সব আছে—'

এক ছুটে চলে গেল ছেলেটি।

তারপর ছুটতে ছুটতে ফিরে এল আবার।

'আপনি আমার বাড়িতে আসুন। দিদি কুকুরটা দেখতে চাইছে। দিদি কুকুর বড় ভালোবাসে। আসুন না—'

গেল সত্যেন ছেলেটির পিছু পিছু। পাশেই বাড়িটা। সেখানে গিয়ে দেখল একটা সুঁটকো লম্বা হাড়-গিল-মার্কা মেয়ে পিঠকাটা ব্লাউজ পরে দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা লম্বাগোছের, কোনো লালিত্য নেই। টোটোকে দেখে সে মুখ বেঁকিয়ে বলে উঠল—'ওমা, এই রাস্তার নেড়ি কুত্তার জন্যে টিঞ্চার আয়োডিন চাই—'

বলেই সে এক ঝটকায় ভেতরে ঢুকে গেল। ছেলেটাও ঢুকে পড়ল তার পিছু পিছু। একটু পরেই টিঞ্চার আয়োডিনে তুলো ভিজিয়ে বেরিয়ে এল সে।

টোটো কিন্তু টিঞ্চার আয়োডিনে আপত্তি জানাল। একবার লাগাতেই ঘেউ ঘেউ করে উঠল। তারপর দূরে সরে গেল।

সত্যেনের মনে হল টোটোর আত্মসম্মানবোধ আমার চেয়ে বেশি সজাগ। অবজ্ঞার দান ও নেবে না। বেশ একটু দূরে গিয়ে সে উবু হয়ে বসেছিল আবার। ঘাড় ফিরিয়ে দেখছিল সত্যেন আসছে কিনা। সত্যেন দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল তার পাশে। টোটোকে সম্বোধন করে বললে—'ওষুধ লাগালি না, ঘা-টা যদি সেপ্‌টিক হয়ে যায়—'

টোটো ল্যাজ নাড়তে লাগল।

'চল এবার খাওয়ার ব্যবস্থা করা যাক্। কি খাবি?'

টোটো ল্যাজ নাড়তে লাগল।

'রোক্‌কে—রোক্‌কে—রোক্‌কে।'

একটা ট্যাকসি এসে দাঁড়াল। ট্যাকসি থেকে নামলেন এক শীর্ণ ভদ্রলোক, এক স্থূলকায়া মহিলা আর পাঁচটি ছেলেমেয়ে। কেরিয়ার থেকে জিনিসও নামাল নানারকম। একটি সুটকেস, একটি পুঁটলি, একটি ব্রিফকেস, টিফিন কেরিয়ার, একটা ঝোলা, তাছাড়া আরও অনেক টুকিটাকি। ট্যাক্সিকে ভাড়া দেবার সময় ভদ্রলোক বললেন—'এই গলির ভিতর আমার বাড়ি, নিয়ে চল না। বাবা গাড়িটা—'

গাঁউ গাঁউ করে পাঞ্জাবী ড্রাইভার সর্দারজি বললেন—'ই চোট্টা ডাকুকা মহল্লা হ্যায়, গলি-ওলি মে নেহি যায়েঙ্গে—'

শীর্ণ ভদ্রলোক আর পীড়াপীড়ি করতে সাহস করলেন না। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। ট্যাক্সি চলে গেল।

শীর্ণ ভদ্রলোক অসহায় ভাবে চারদিকে চেয়ে বললেন,'মুশকিলে পড়া গেল। এতগুলো জিনিস এখন নিয়ে যায় কে। ঘরে তো তালা দিয়ে বেরিয়েছিলাম, ঝি-মাগী এখনও আসেনি নিশ্চয়। এখানে কুলিও তো দেখছি না একটাও—'

সহসা সত্যেন এগিয়ে এল।

'আমি নিয়ে যাচ্ছি আপনার জিনিসগুলো। তবে সবগুলো একসঙ্গে পারব না। একে একে নিয়ে যাব। কতদূর আপনার বাড়ি—'

'এই গলিতে ঢুকেই অল্প দূর।'

'আমি এই সুটকেসটা আগে পৌছে দিয়ে আসি। আপনারা একজন এখানে দাঁড়ান। আর বাকি সবাই চলুন আমার সঙ্গে— বাড়িটা দেখিয়ে দিন।'

দেখা গেল স্থূলকায়া গৃহিণীটির দেহ স্থূল বটে, কিন্তু বুদ্ধিটা সূক্ষ্ম।

'তুমি বাপু কত নেবে সেইটি বল আগে।'

'যা দেবেন তাই নেব।'

'চার আনার বেশি দিতে পারব না।'

'বেশ তাই দেবেন।'

ভদ্রলোক জিনিস পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সত্যেন সুটকেসটা মাথায় তুলে নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। ভদ্রলোকই সাহায্য করে সেটি মাথায় তুলে দিলেন। সত্যেন বুঝতে পারল বেশ ভারী সুটকেসটি। ভিতরে পাথর আছে নাকি। ঘাড়টা থরথর করতে লাগল তার। তবু অতিকষ্টে আস্তে আস্তে সে অনুসরণ করল তাদের, সুটকেসটাকে দুহাতে চেপে ধরে।

অনেক দূর যেতে হল গলির ভিতর। ছোট একতলা বাড়ি। তার কপাট খুলতেই বেশ দেরি করলেন ভদ্রমহিলা। সত্যেনের ঘাড়টা থরথর করে কাঁপছে। কপাট খুলে ঘরের ভিতর ঢুকে ভদ্রমহিলা বললেন—'নিয়ে এস ভেতরে। ওই বেঞ্চির উপর রেখে দাও।'

একদিকে একটা বেঞ্চি ছিল।

'আপনি একটু ধরুন। আমি নামাতে পারব না—'

'আবার ধরতে হবে নাকি! দাঁড়াও দাঁড়াও, ফেলে দেবে দেখছি—'

ভদ্রমহিলা তাড়াতাড়ি গিয়ে ধরলেন সুটকেসটা। কোনো ক্রমে নাবানো হল।

'যাও বাকি জিনিসগুলো নিয়ে এস এবার। উঃ, ঘরে যা ধুলো জমেছে। ঝিটা কখন যে আসবে কে জানে।'

সত্যেন বেরিয়েই দেখে টোটো দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছে।

'কি রে তুইও এসেছিস? চল।'

বারচারেক যাতায়াত করে সব জিনিসগুলো নিয়ে এল সত্যেন। টোটোও প্রতিবার তার সঙ্গে গেল আর এল।

শীর্ণকান্তি ভদ্রলোক পকেট থেকে ব্যাগ বার করে বললেন— 'কত দিতে হবে তোমাকে—'

থলথল করে এগিয়ে এলেন তার গৃহিণী।

'সে আমি আগেই ঠিক করে নিয়েছি। চার আনা দিয়ে দাও—'

চার আনা!

শীর্ণ ভদ্রলোক, নিজেই কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন প্রস্তাবটা শুনে।

চার আনা! চার আনা মজুরি আজকাল আছে নাকি!

গিন্নীর দিকে আড়চোখে চেয়ে একটা টাকা দিলেন সত্যেনকে।

'তোমার সবতাতেই বাহাদুরি। দাও যথাসর্বস্ব দিয়ে দাও ওকে—'

গৃহিণী দুই হাতে যথাসর্বস্ব দেবার ভঙ্গী করে এবং হাতভরতি সোনার চুড়িতে ঝনৎকার তুলে ভিতরের দিকে চলে গেলেন।

ভদ্রলোকও গেলেন ভিতরে। সত্যেন এগিয়ে গিয়ে গলির মোড়ে দাঁড়াল আবার। ভাবছিল কোন্ দিকে যাবে।

'ওহে, শোন শোন—'

শীর্ণ ভদ্রলোক তার দিকেই এগিয়ে আসছেন হন্‌হন্ করে।

'ওহে শোন, তুমি আমার ঘরদোরগুলো ঝাড়ু দিয়ে দেবে? আমরা কাশ্মীর গিয়েছিলাম কিনা, বাড়িতে ঝাড়ু পড়েনি অনেকদিন। টিফিন কেরিয়ারের বাটি চারটেও মেজে দিতে হবে। পারবে তুমি?'

'পারব। কত মজুরি দেবেন?'

'কত নেবে বল না—'

'আরও দু'টাকা দিতে হবে—'

যদিও সত্যেন এর আগে এসব করেনি কখনও, তবুও অপটু হস্তে সে সবই করে ফেলতে পারল শেষ পর্যন্ত। একটা অদ্ভুত আনন্দ হচ্ছিল তার। সে যে অকর্মণ্য নয়, সে যে কাজ করে রোজগার করতে পারে এই অনুভূতিটা সুরার মত সঞ্চরণ করে বেড়াচ্ছিল তার দেহেমনে। স্থূলকায়া ভদ্রমহিলা যদিও বকছিলেন তাকে তার অপটুতা দেখে, তবু তাঁর বকুনির মধ্যেও একটা মমতার সুর বেজে উঠছিল যেন মাঝে মাঝে।

'কাজের ছিরি দেখ না! আরে ধুলোগুলো ওইদিকে নিয়ে যাচ্ছ কেন—কপাটের দিকে নিয়ে এস। বাইরে ফেলতে হবে তো। বোকারাম একটি। কি করে ঘর ঝাড়ু দিতে হয় জান না?'

'আমি এ কাজ আগে কখনও করিনি মা। বাবু বললেন তাই করে দিচ্ছি। ঠিক করে দেব সব, দেখুন না—'

'আর তুমি করেছো!'

'ঠিক করে দেব দেখুন—'

পাশের ঘরে ছেলেমেয়েগুলো চ্যাঁ-ভ্যাঁ শুরু করছিল ক্ষিধের জ্বালায়। গিন্নী গেলেন সেদিকে। তারপর এসে বললেন—'তুমি দেখ তো বাবা, উনি কোথায় খাবার আনতে গেলেন। যেখানে যাবেন সেইখানেই তো বাঘের মাসি হয়ে যাবেন। খাবারওলার সঙ্গে হয়তো গল্প জুড়েছেন—তুমি একবার দেখ তো—ছেলেমেয়েগুলো ক্ষিধেয় আন্‌চান করছে।'

সত্যেন বেরিয়েই দেখল শীর্ণকান্তি ভদ্রলোক একঝুড়ি খাবার নিয়ে আসছেন।

সত্যেন কাজকর্ম সেরে দুটি টাকা নিয়ে চলে যাবার উপক্রম করছে তখন স্থূলকায়া মহিলাটি এলেন আবার।

'নাও তুমিও একটু খাও। তোমার মুখটিও শুকিয়ে গেছে।'

একটি কচুরি এবং আধখানি জিলিপি তাকে দিলেন। টোটো বাইরে রাস্তায় বসেছিল, সত্যেন তার দিকে আধখানা জিলিপি ছুঁড়ে দিয়ে কচুরিটা মুখে পুরে ফেললে।

'ওকি, ছুঁড়ে ফেলে দিলে কেন জিলিপি?'

'আমার বন্ধু একটি কুকুর বাইরে বসে আছে, তাকে দিলাম।'

ভদ্রমহিলা গালে হাত দিয়ে বললেন—'ওমা কি কাণ্ড! আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে—এ যে সেই বৃত্তান্ত দেখছি—'

'চললাম আমি—'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। খেয়ে যাও একটা জিলিপি।'

এবার একটা গোটা জিলিপিই এনে দিলেন তিনি।

'খাও। আমার সামনে দাঁড়িয়ে খাও। তোমার যে রকম মতিগতি দেখছি তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার মনে হচ্ছে—'

মুচকি হেসে সত্যেন বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় যেতে যেতে তার মনে হতে লাগল, তার ভিতরে কার যেন আবির্ভাব হয়েছে। কার?

বুঝতে পারছে না ঠিক। মনের ভিতর অন্ধকারও প্রচুর। দেখা যাচ্ছে না তাকে। হঠাৎ অস্ফুটকণ্ঠে সে বলে উঠল একবার— 'কে তুমি—কে—কে।' তারপর থেমে যেতে হল। একদল বাঁকওয়ালা তার পথরোধ করেছে। বাঁকের দুধারে বড় বড় ড্রাম ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে একদল বলিষ্ঠ লোক। ড্রামে কি আছে?—দুধ? একজনকে জিগ্যেস করলে—সে জবাব দিলে না কিছু। কলকাতার রাস্তায় সবাই পাশাপাশি চলেছে, কেউ কারো বিষয়ে কিচ্ছু জানে না। পরস্পর পরস্পরের দিকে যে দৃষ্টিতে চাইছে তাতে ফুটে উঠেছে অবিশ্বাস, সন্দেহ, ভয় আর হিংসা।

দাঁড়িয়ে রইল সত্যেন। টোটোও তার পাশে এসে দাঁড়াল। ল্যাজ নাড়তে লাগল। টোটো কারণে-অকারণে ল্যাজ নাড়ে।

বাঁকীরা চলে গেল। তারপর গান করতে করতে চলে এল একদল মাড়োয়ারি মহিলা। তাদের মুখ ঢাকা, কিন্তু কণ্ঠস্বরে চতুর্দিক নিনাদিত।

দাঁড়িয়ে রইল সত্যেন।

উদ্বেলিত হয়ে উঠল মনে একটা কবিতা।

তার মনের অন্ধকারে সেই বিরাট আবির্ভাব তখনও অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অন্ধকার যবনিকা-পারে কে তুমি দাঁড়ালে এসে? ডাকিলাম সাড়া তো দিলে না। মনে হয় আমাকেই ডাকিতেছ তুমি নীরব ভাষায়।

মর্মস্পর্শী সুতীক্ষ্ণ সে ভাষা, মূর্তিমতী বেদনার নিস্তব্ধ বিলাপ। সে-ডাকে দিতেই হল সাড়া।

> বাহিরিনু অন্ধকারে কপাট খুলিয়া।
> দেখিলাম অন্য কেহ নাই।
> আমিই দাঁড়ায়ে আছি।
> সেই আমি, যে-আমি বাহিরে সূচীভেদ্য অন্ধকারে
> চির-প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি,
> ভিতরের আমির লাগিয়া।
> বাহিরের 'আমি' নিঃশব্দে নিরন্তর ডাকিতেছে
> ভিতরের আমিটারে।
> অথচ দু-জনে দেখা হল না এখনও।
> আজ দেখা হল যদি, দুজনের মাঝে দুলিতেছে
> আঁধারের কালো যবনিকা।
> কেন—কেন—কেন—!

অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল সত্যেন।

'এই শুয়োরকা বাচ্চা, মরতে চাও নাকি—'

ক্যাঁচ করে একটা প্রকাণ্ড মোটর ব্রেক কষল।

প্রকাণ্ড জুলফিদার হামদো-মুখো ড্রাইভার একবার তার দিকে অগ্নি-দৃষ্টিতে চেয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল আবার। সত্যেন বেঁচে গেল। অপ্রস্তুত মুখে ওপারের ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াল সে।

টোটোও এল এবং উৎসুক দৃষ্টিতে চাইল তার দিকে। মনে হল টোটো একটু যেন চিন্তিত হয়েছে তার জন্যে।

গালাগালি খেয়ে কবিতার ঘোরটা কেটে গিয়েছিল তার। তবু মনের মধ্যে কেমন যেন একটা আনন্দ হচ্ছিল। পরিশ্রম করে সে আজ তিন টাকা রোজগার করেছে। এই আনন্দে তার সমস্ত মনটা যেন বিভোর হয়ে গিয়েছিল।

নাঃ—আর ভিক্ষে করব না। রোজগার করব। যেমন করেই হোক করব। হঠাৎ প্রতিজ্ঞা করে ফেলল।

রাস্তা দিয়ে আবার বাস, ট্রাক, টেমপো, মোটর, রিকশা, ঠেলার সারি চলতে শুরু করেছিল। আবার দু'পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে বিচিত্র জনস্রোত। এর মধ্যে সে কর্মী বাঙালি একজনকেও দেখতে পেলে না। যারা কাজ করছে তারা প্রায় অবাঙালি। সমস্ত বাঙালি জাতটা হয় বন্দী হয়ে আছে আপিসে আপিসে, না হয় বেকার হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। কিম্বা নাচ গান খেলা আড্ডা নিয়ে, না হয় পলিটিকাল পার্টিতে ঢুকে খুনোখুনি করছে। ওরা অসহায়, ওরা জানে না ওরা কি করছে; জানে না যে নানারকম পরাধীনতার গ্লানিতে আষ্টেপৃষ্ঠে ওরা বাঁধা তাই ছট্‌ফট করছে, তাই নানারকম পোশাক পরে, নানা ধাঁচের চুল-দাড়ি-গোঁফ জুলফির বাহার দেখিয়ে নিজেদের ভুলিয়ে রাখতে চাইছে ওরা। ওরা অসহায়। বড্ড অসহায়। ওদের বাঁচাতে হবে। কে বাঁচাবে? আমি। আমি আগে নিজে বাঁচব, তারপর ওদের বাঁচাব।

হঠাৎ সব অবলুপ্ত হয়ে গেল। আলোকিত হয়ে উঠল চতুর্দিক। সত্যেন দেখলে সেই জ্যোতিষ্কদের মিছিল আবার আসছে। তার দিকেই আসছে। সামনেই রয়েছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। তাঁর দুপাশে দুটো সায়েব। চিনতে পারল সত্যেন—ছবি দেখেছিল। একজন এডিসন, একজন ফোর্ড। সকলেই উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তার দিকে। তারপর হঠাৎ একটা গুঁতো লাগল পিছন দিকে।

ঘেউ ঘেউ করে উঠল টোটো। সত্যেন ঘাড় ফিরিয়ে দেখল প্রকাণ্ড একটা ষাঁড় তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে।

নির্বিকার নন্দী মহারাজ একটি। সরে গেল সত্যেন। তারপর হনহন করে হাঁটতে লাগল।

অনেক দূর হেঁটে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল সে। সামনে দেখতে পেল একটা দোকানে গরুর মাংস টাঙানো রয়েছে। টোটো কই? দেখল টোটো ঠিক পিছনেই রয়েছে।

'গোস্ত রোটি খাবি টোটো? আজ তোকে গোস্ত রোটিই খাওয়াব। পকেটে পয়সা আছে। ও লোকটা তখন ঠাট্টা করেছিল, ভেবেছিল গোস্ত রোটি খাওয়াতে পারি না তোকে। আয় খাওয়াব। চল—'

এক টাকায় বেশ খানিকটা মাংস পাওয়া গেল। পাশের দোকানে রুটিও পাওয়া গেল একটা। টোটো মহানন্দে খেতে লাগল।

॥ ৫ ॥

সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে বেড়াল সত্যেন। অনেক করুণাময়ী রমণীর মুখ দেখতে পেল সে মোটরের জানালায়। ভিক্ষা চাইলে ভিক্ষা পেত। কিন্তু হাত বাড়ায়নি সে একবারও। প্রতিজ্ঞা করেছে আর ভিক্ষা করবে না। ক্ষিদেয় কিন্তু পেট জ্বলছে।

টোটো পিছনে পিছনে ঘুরছে শুষ্কমুখে।

মানিকতলা বাজারের উত্তরদিকে দাঁড়িয়েছিল সে। সামনেই বাজারে ঢোকবার গেট।

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঢুকতে হয়, সোজা ঢোকা যায় না।

সামনেই ফলওলা বসেছিল একটা। লেবু আর কলা নিয়ে। তার পাশে তরকারিওয়ালি একজন। তার পাশে ছুরি-কাঁচি। তার পাশে জটলা করছে কতকগুলো চোং-প্যান্ট-পরা ছেলে, হাসাহাসি করছে; অঙ্গ-ভঙ্গী করছে—উপলক্ষ্য একটি কিশোরী মেয়ে, সে একটু দূরে একটা দোকানে কি যেন কিনছে। তার পাশে বসে রয়েছে কতকগুলো ঝাঁকামুটে। কতকগুলো কদর্য চেহারার লোক মাথার পাগড়ি খুলে তাই দিয়েই হাওয়া করছে নিজেদের। দরদর করে ঘাম ঝরে পড়ছে কপাল থেকে, ঘাড় থেকে।

তাদেরই কাছে গেল সত্যেন। একজনকে বললে—'এ ভেইয়া, হামরা একটো উবকার করনে শেকে গা?'

'ক্যা, কহিয়ে।'

'হাম মোটিয়া হোনে মাংতে হেঁ।'

'সেকিয়ে গা?'

'তব একটো ঝাঁকা খরিদকে বৈঠ যাইয়ে হিঁয়া। কি বাজারকা ভিতর ঘুস যাইয়ে। কুছ না কুছ মিল যায় গা—'

'ঝাঁকা তো নেহি ন্যায়। কাঁহা মিলে গা?'

'শিয়ালদ।'

'দাম কেতনা লেগা?'

'আচ্ছা ঝাঁকা চার পাঁচ রূপেয়া লাগ যায় গা—'

'ওতনা পয়সা তো নেহি হ্যায়।'

আর একটা ছোকরাগোছের ঝাঁকাওলা হেসে বলল— 'তব রাস্তা মে টহলিয়ে—'

প্রথম ঝাঁকাওলাটি কিন্তু একটু আগ্রহান্বিত হল ওর সম্বন্ধে।

'পহলে আপ কেয়া কাম করতে থে।'

'কুছ নেই। কলেজ মে পড়তে থে। নোকরি নেহি মিলা। আব ঠিক কিয়া হায় মুটিয়াগিরিমে লগ যায়েঙ্গে—'

'ঘর মে কোই নেহি হ্যায়? বাপ মাই, মামা চাচা—'

'মামা হ্যায়। মগর হুঁয়া সে হাম ভাগকে চলা আয়া। নোকরি নেহি মিলা, বড়া লাজ লাগতা থা—'

স-সম্ভ্রমে বলে উঠল ঝাঁকা-ওলা—'কালিজ মে পড়তে থে? মোটিয়া হোনে মাংতে হেঁ।'

'হরজা কিয়া। ফির আচ্ছা কুছ মিল যায়গা তো করেঙ্গে—'

সেই ছোকরাটা বললে—'ঝাঁকা লাইয়ে পহলে—'

সত্যেন হেসে বললে—'ঝাঁকা কিননে কা পয়সা ভি রোজগার করনে পড়ে গা ভাই।'

প্রথম ঝাঁকাওলাটি ধমকে দিলে ছোকরা ঝাঁকাকে।

'বইঠো বাবু।'

একটু সরে বসল সে।

'হমকো বাবু নেই কহিয়ে। হম তুমহারা ভাই হ্যায়। ছোটা ভাই। কুছ উপায় কর দিজিয়ে।'

'বৈঠিয়ে—'

তারপর সে পাশের লোকটাকে বলল— 'নাগিনা তো বেমার বা। ওকরা ঝাঁকা কাঁহা?'

'হমারা পাশ—'

উত্তর দিলে একটা রোগা-গোছের লোক।

'দে—দে উঠো বাবুয়া কো—'

'আগর লেকে ভাগে—'

'নেহি ভাগে গা। হম জামিন রহা— লাও ঝাঁকা—'

একটু পরেই ঝাঁকা এসে গেল একটা।

'অব চলিয়ে বাজার কা ভিতর—'

নিজেও উঠে দাঁড়াল সে। প্রৌঢ় বলিষ্ঠ ব্যক্তি। পা দুটো ফাটা ফাটা। কাঁচা-পাকা গোঁফ। ঘাড়টা একদিকে একটু কাত-করা।

মাথায় পাগড়িটা বেঁধে নিল।

'চলিয়ে—'

তার পিছু পিছু মানিকতলা বাজারে ঢুকে পড়ল সত্যেন। টোটোও ঢুকতে যাচ্ছিল। মানা করল তাকে সত্যেন।

'তুই এইখানে বসে থাক।'

গেটের সামনে বসে পড়ল টোটো।

'আপকা কুত্তা হ্যয় বাবু?'

'রাস্তাকা কুত্তা। হমারা সাথ দোস্তি হো গিয়া—'

'বহুত আচ্ছা।'

হো হো করে হেসে উঠল সে।

'আপকা নাম কিয়া, ভেইয়া—'

'রামেশ্বর। রামু—রামু কহতা হ্যয় সব কোই।'

'ঝাঁকা—ঝাঁকা—এই ঝাঁকা—'

একটি ভদ্রমহিলার কণ্ঠ শোনা গেল। অনেক তরকারিপাতি কিনেছেন, আকুলভাবে ঝাঁকা খুঁজছেন।

'আপ চলা যাইয়ে—'

রামু চুপি চুপি বলল।

সত্যেন এগিয়ে যেতেই ভদ্রমহিলা বললেন—'একটা ট্যাক্‌সিতে এগুলো তুলে দিতে হবে। কত নেবে?'

রামুই জবাব দিল—'আট আনা মাইজি—'

'ওতনা লেগা? কিছু কম কর বাবা।'

'নেহি মাইজি। আট আনা সে এক পয়সা কম হোবে না।'

মহিলা হয়তো আর একটু দরদস্তুর করতেন। কিন্তু ঠিক সেই সময় একটা লোক ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা সাফ করতে শুরু করে দিলে। মহিলার ভয় হল তাঁর শাড়িটা নষ্ট হয়ে যাবে।

'চল চল। একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে হবে কিন্তু—'

রামুকে আর একজন ডাকাডাকি করছিল। রামু কিন্তু গেল না। জিনিসগুলি সত্যেনের ঝাঁকায় গুছিয়ে তুলে দিল।

'অব উঠাইয়ে—'

ঝাঁকাটা তুলে দিল তার মাথায়।

'চলিয়ে। ধীরে ধীরে—'

'এই ঝাঁকা—'

রামু সেদিকে কর্ণপাত করল না। সত্যেনকে ভিড় বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে নিয়ে এল বিবেকানন্দ রোডের উপর।

'অব ট্যাকসি বোলাইয়ে—'

ঝাঁকাটা নামিয়ে দিল সে মাথা থেকে। তারপর চলে গেল। অনেক ছোটাছুটি করে একটা ট্যাক্সি যোগাড় করলে সত্যেন।

তারপর মালপত্র গাড়িতে উঠিয়েও দিল। মহিলা কিন্তু তাকে শেষ পর্যন্ত আট আনা দিলেন না। ছ'আনা দিয়ে বললেন— 'ওই বহুৎ হুয়া।'

চলে গেল ট্যাক্সি।

সত্যেনের মনে হল—এরাই সত্যিকারের দরিদ্র। বাইরের শাড়ি ব্লাউজের জলুস, ভিতরটা একেবারে অন্ধকার।

তখনই মনে হল—এদের বলছি কাদের?

আমরাই তো এরা!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকা-ভরতি মোট নিয়ে বেরিয়ে এল রামু।

'ভিতর যাইয়ে। বহুত লোক ঝাঁকা খোঁজতা হায়— আজ লগন হ্যায়।'

সত্যেন আবার ভিতরে ঢুকে গেল।

নূতন জীবন আরম্ভ হয়ে গেল তার।

একবেলায় সে প্রায় তিন টাকা রোজগার করে ফেলল।

বেরিয়ে দেখল টোটো বসে আছে তার অপেক্ষায়। তাকে দেখে ঘন-ঘন ল্যাজ নাড়তে লাগল সে। একটা পাঁউরুটি কিনে দিলে তাকে। নিজেও খেল একটা। তারপর ঝাঁকা আর বাকি পয়সা সে রামুকে দিয়ে বললে—'আপকা পাশ রাখ দিজিয়ে। ঝাঁকা কাল মিলেগা তো ফির কুছ রোজগার হোগা—'

'নাগিনা ঘর চলা গিয়া। ওহি ঝাঁকা সে কাম চলাইয়ে আভি। আপনা পাশ রাখ দিজিয়ে। আপ রাতমে কাঁহা শোয়ে গা?'

'ফুটপাথমে।'

'তব ঝাঁকা হামরা জিম্মা মে দে দিজিয়ে। আপ শো-যাইয়ে গা, কই শালা চোরা লেগা—বহোত্ চোর হ্যায় চারো তরফ।'

বাজারের ভিতর শুয়েছিল সত্যেন আলুওলার দোকানের নীচে। টোটোও এসে শুয়েছিল তার কাছে গুটিসুটি হয়ে। সত্যেনের মনে হল—কুকুর কখনও অকুকুর হয় না। মানুষই অমানুষ হয়, ওইখানেই মানুষের বিশেষত্ব। মানুষই ভোল বদলায়, কোল বদলায়, ঝোলের দিকেই তার কেবল লক্ষ্য। এই ভোল বদলাবার বাহাদুরিই তার সভ্যতার ইতিহাস। মনে মনে এই পযন্ত কবিতা লিখে সে ভাবছিল আর কি লিখবে। এমন সময় তার মনে হঠাৎ ছবি ভেসে উঠল একটা। একটি তরুণী যেন ভ্রূ-ভঙ্গী করে চেয়ে আছে তার দিকে আর বলছে—'বুদ্ধ, যীশু, শঙ্কর, শ্রীরামকৃষ্ণ এঁরা?'

সত্যেন চোখ বুজে মনে মনেই উত্তর দিলে— 'ওঁরাও ভোল বদলেছেন। কিন্তু সে বদলানোটা আমাদের মনোমত হয়েছে বলেই আমরা ওঁদের বাহবা দিচ্ছি, ওঁদের ছবি ঘরে টাঙাচ্ছি। কিন্তু ওকথা থাক আমি বড় ক্লান্ত, আমাকে একটু চা করে দেবে?'

চোখ খুলে দেখল কেউ কোথাও নেই।

টোটো গোল হয়ে ঘুমুচ্ছে।

সত্যেনও ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল—আইনস্টাইন তাকে বলছেন, থিয়োরি অব রিলেটিভিটি তুমি তো পড়েছ। তবে ঘাবড়াচ্ছে কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর স্বপ্ন দেখল, কলেজ স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে সে যেন বক্তৃতা করছে। বলছে, বাঙালি জাতকে বাঁচতে হবে। বাঁচতে হবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে। বাঁচতে হবে শ্রমজীবী হয়ে। চাকুরিজীবী হয়ে নয়। ইংরেজরা সমস্ত বাঙালি জাতটাকে কেরানীর জাত করে দিয়ে গেছে, নূতন স্লেভ ডাইনাস্টি সৃষ্টি করেছে মেধাবী বাঙালিদের দিয়ে। আমরা সবাই কেরানী—কেরানী হবার জন্যেই আমাদের পড়াশোনা—জ্ঞানলাভ করবার জন্যে নয়। আমরা যেন-তেন-প্রকারেণ পরীক্ষা পাস করতে শিখেছি, আর কিছু শিখিনি। আমরা মূর্খ প্রভুপদলেহী দাস, আর কিছু নই। আমাদের কোট-প্যান্ট, সুট-বুট মোটর রুম-কুলার দাসত্বের ভূষণ। চাকরি গেলেই আমরা ফতুর। কিন্তু সত্যিই কি আমরা অত নির্বীর্য, অত হীন? না, না, নিশ্চয় নয়। আমরা মোহগ্রস্ত। এই মোহের ছলনায় আমরা প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতার কুৎসিত কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করছি। আমি যখন মোট বইতাম, তখন রামু ছিল আমার ভাইয়া, রমজান ছিল আমার চাচা, ফলওয়ালী ছিল আমার দিদি। আমি চিরকাল মোট বইনি, ব্যবসা করেছি, ব্যবসায়ে উন্নতি করেছি, অনেক টাকা রোজগার করেছি, তোমাদের প্রকৃত শিক্ষার জন্যে বিদ্যালয় করেছি—তোমরা সব এস, প্রকৃত মানুষ হও, চাকরি করবার জন্যে লেখাপড়া শিখবে না, মানুষ হবার জন্য লেখাপড়া শিখতে হবে। উপার্জন কর শ্রম দিয়ে। পেশীর শ্রম দিয়ে, মস্তিষ্কের শ্রম দিয়ে, স্বাধীনভাবে, মাথা উঁচু রেখে। ভেবে দেখেছ কি কতকগুলো অসাধু লোকের পায়ে তেল দিয়ে দিয়ে কী অমানুষ হয়ে গেছ তোমরা? তোমাদের মানুষ হতে হবে। মানুষের মতো মানুষ, যে মানুষ পৃথিবীর গর্ব হবে। বাঙালির ছেলেরা কি না পারে। তোমরাও পারবে, নিশ্চয় পারবে—

'আরে এখানে শুয়ে আছে কে হে। ওঠ, ওঠ। আলুর বস্তা নামাব।'
'কে তুমি—'
'আমি ঝাঁকামুটে।'
'এত বেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্ছ?'
সত্যেন উঠে বাইরে চলে গেল। লজ্জা হল তার।

সেই দিনই বেলা পাঁচটার পর।

রাস্তায় খুব ভিড়। তারই ভিতর দিয়ে চলেছিল সত্যেন ঝাঁকা মাথায় নিয়ে। ঝাঁকায় অনেক জিনিস। চাল ডাল তরকারি মসলা একটা তরমুজ একটিন তেল। বেশ ভারী। ঝাঁকাটা দুহাত দিয়ে ধরে টলতে টলতে যাচ্ছিল সত্যেন। সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি গাড়ি পার্ক করেছিলেন একটু ফাঁকা জায়গায়। বেশ দূর সেটা। হয়তো সত্যেন সেখানে পৌঁছে যেত, কিন্তু পারলে না। একটা লরি এসে ধাক্কা মারল তাকে। পড়ে গেল সে। তারপর কি হল—তার মনে নেই। কিন্তু মন তার নিষ্ক্রিয় ছিল না। ছবি আঁকছিল।... দলে দলে ছেলে ঘিরে ধরেছে তাকে। তার বিদ্যালয়ে ঢুকতে চায়—তার মানুষ হবার বিদ্যালয়ে—সেখানে পরীক্ষা নেই, ডিগ্রি নেই—একটি সুন্দরী তরুণী অভ্যর্থনা করছে তাদের। বলছে—তোমরা বস, কিছু খেয়ে যাও, সব্বাইকে ভরতি করব আমরা, কেউ ফিরে যাবে না—বিরাট একটা ময়ূরপঙ্খী ভেসে চলেছে সমুদ্রে—নূতন যুগের চাঁদ সদাগর সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছে...প্রকাণ্ড ল্যাবরেটরিতে মাইক্রোসকোপে চোখ লাগিয়ে বসে আছে বিজ্ঞানীর দল—হ্যাঁ তারই ছাত্র সব—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ঘুরে ঘুরে দেখছেন, বলছেন তুই-ই আমার স্বপ্ন সফল করলি শেষ পর্যন্ত। আদর করে পিঠে একটা ঘুঁষি মারলেন।...বয়েল গাড়ির গাড়োয়ান ভিকুও এগিয়ে এল, সে তার নাইট স্কুলে রোজ পড়াশোনা করে, গানও করে তুলসীদাসের রামায়ণ। টিকলুও এসেছে। বলছে—আমার দেহের ক্ষিধে মিটে গেছে। মনের ক্ষিধে মেটেনি কিন্তু। তুই তার ব্যবস্থা করে দে। রামায়ণ মহাভারত? না, আমি পড়িনি। তাই পড়ব? বেশ। হঠাৎ তামা এসে বলল, আমিই আপনাকে পড়াব। আসুন না। সাতকড়ি দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে। বলছে অনেক পাখির ছবি যোগাড় করেছি আমি। আমাদের দেশের সব পাখিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব তোমাদের। শুধু ছবি দেখলে চলবে না কিন্তু, আমার সঙ্গে মাঠে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হবে। দলে দলে ছেলে আসছে...দলে দলে মেয়ে...

বাঙালি জাত জেগে উঠেছে...বাঙালি জাত জেগে উঠেছে...আরও কি সব হিজিবিজি... দূরে যেন তার মামী দাঁড়িয়ে রয়েছেন, চোখ দিয়ে জল পড়ছে তাঁর। মামা বড্ড বুড়ো হয়ে গেছেন। কপালের ওপর হাত রেখে দেখছেন অবাক হয়ে। ওদিকে ও কে? সেই ছাতুওলিটা হাসছে আর বলছে—আমি সুরপতিয়া। ছাতু এনেছি। আমাকে ভুলে গেলে?...ছবির পর ছবি আসছে আর যাচ্ছে...ছবির পর ছবি...রাস্তায় ভিড়... অনেকগুলো মোটর হর্ন দিচ্ছে...

তার যখন জ্ঞান হল তখন দেখলে মাথায় হাতে পায়ে সর্বাঙ্গে ব্যান্ডেজ বাঁধা। একটি কোট-প্যান্ট পরা ভদ্রলোক তার নাড়ি দেখছেন।
'আমি কোথায় আছি?'
'হাসপাতালে।'

'আপনি কি ডাক্তারবাবু?'

'হ্যাঁ—'

সত্যেন হঠাৎ আকুল কণ্ঠে বলে উঠল—'আমি বাঁচব তো ডাক্তারবাবু! আমি না বাঁচলে যে বাঙালি জাতকে বাঁচাতে পারব না। বলুন, আমি বাঁচব তো?'

'নিশ্চয় বাঁচবে, ভয় কি! একটা ইনজেকশন দিয়ে যাচ্ছি—ঘুমোও এখন।'

ইনজেকশন দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন।

'আমার টোটো কোথায় বলতে পারেন?'

'টোটো কে?'

'আমার কুকুরটা।'

'জানি না তো—'

টোটো হাসপাতালের সিঁড়ির কাছে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে ছিল।

ली

।। এক ।।

লী শব্দটির মানে, মিলন। মিলনের কথাই লিখব আজ। নতুন করে মিলন,—যে মিলনে দেহের স্থান নেই—সেই মিলন।

ফাটা বুক থেকে ফিনিক্ দিয়ে রক্ত পড়ে, ফাটা মেঘ থেকে ফিনিক্ দিয়ে আলো বেরোয়, ফাটা স্মৃতি থেকে যা বেরুচ্ছে তাই দিয়ে তাকে নূতন করে সৃষ্টি করবার প্রয়াস করছি। পারব কি?

মনের ভিতর থেকে নীরবে সে উত্তর দিল—'পারবে না। আমাকে যতদিন পার মনে রেখো।'

'মনে তো রাখবই। আপনি মনে থাকবে, তার জন্যে চেষ্টা করতে হবে না। কিন্তু যাকে মনে রেখেছি, সে তুমি তো আর নেই। তোমাকে নূতন করে সৃষ্টি করতে হবে। সে সৃষ্টিকে যম কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না, তা আমার সঙ্গে সহমরণে যাবে।'

তার কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রইলাম। তবু এল না কোনও সাড়া।

চুপ করে বসেই রইলাম। খোলা ছাতে আকাশের দিকে চেয়ে। একটা কাক ডাকছে। অনেকক্ষণ থেকে ডাকছে। কাকে ডাকছে? ওরও সঙ্গিনী হারিয়ে গেছে নাকি? আমার চিন্তাধারা বাধা পেল সহসা। এল একটা হলদে প্রজাপতি। বসল না কোথাও, উড়তে উড়তে চলে গেল। মনের মধ্যে রেখে গেল কিন্তু তার বাসন্তী রংটা। আর তার সঙ্গে একটা শাড়ি আর নরেন মুখুজ্যেকে, যাঁর পত্রিকায় লেখার জন্য দক্ষিণা পেয়েছিলাম বলেই শাড়িটা কেনা সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু ওরা কেউ এখন নেই।

না, নেই।

কেউ থাকবে না।

তবু থাকবে।

তাদের সৌরভ ঘুরে বেড়াবে আকাশে বাতাসে। চেনা লোকদের মনের স্মৃতির সৌরভ ছড়াবে। অচেনা লোকেরাও সে সৌরভে হঠাৎ পুলকিত হয়ে উঠবে। বুঝতে পারবে না কেন এ পুলক।

নরেনবাবুর একটা কথা মনে পড়ছে।

'তোমার এ বইটা যদি আগে লিখতে তাহলে আমার খুব সুবিধে হত। স্ত্রীকে চিঠি লেখার জন্য অত গলদঘর্ম হতে হত না। তোমার চিঠিগুলিই একটু অদলবদল করে টুকে দিতাম।'

যাকে ওই চিঠিগুলি লিখেছিলাম সে আজ নেই।

হঠাৎ বাঁ হাতটা সুড়সুড় করে উঠল। চেয়ে দেখি— এ কি কাণ্ড! এ কখন নীরবে এসে বসে আছে আমার হাতের উপর। সর্বাঙ্গে সবুজ মখমল। তার উপর দু'পাশে কালো বড় বড় ফুটকি। ফুটকি নয়, যেন চোখ। সর্বাঙ্গ দিয়ে দেখছে যেন আমাকে। কখন চুপি চুপি আমার গায়ে উঠে বসে আছে, জানতেও পারি নি। গুটিপোকা? গুটিপোকার গায়ে এত রূপ? এ যেন একটা অপূর্ব কবিতা। শুনেছি গুটিপোকারা গাছে থাকে, গাছের পাতা খায়। আমার কাছে এসেছে কিসের আশায়? মনে হল

একটা মূক প্রত্যাশা যেন মূর্ত হয়ে প্রতীক্ষা করছে—সহসা মনে হল তাহলে কি—শিউরে উঠল সর্বাঙ্গ। ইচ্ছে হল গুটিপোকাটাকে বুকে আঁকড়ে ধরি। হাত তুলতেই পড়ে গেল নীচে, সঙ্গে সঙ্গে একটা কাক ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল তাকে। সামনের একটা গাছের ডালে বসে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। অমন একটা সুন্দর কবিতাকে ছিন্নভিন্ন করতে লাগল আমার চোখের সামনে। ও কতটুকু সময় আমার হাতের ওপর ছিল, তবু খুব কষ্ট হতে লাগল। তাকে মনে পড়ল। তাকে খাট থেকে নামিয়ে বার করে নিয়ে গিয়েছিল যখন, তখন যে রকম কষ্ট হয়েছিল অনেকটা সেই রকম কষ্টই ভোগ করছি এখন। মনে হচ্ছে আমার জীবনে আর একটা সবুজ স্বপ্ন যেন ভেঙে গেল। ওর সঙ্গে তার কোথায় যেন মিল ছিল একটা।

কাকটা উড়ে গেল।

চুপ করে বসে আছি আকাশের দিকে চেয়ে। একটা স্তূপ মেঘ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। ছিল পাহাড়ের মতো, এখন হয়েছে বিরাট একটা মুখ। নাথানিয়াল হথর্নের The Great Mountain Face গল্পটা মনে পড়ছে! সে-ই গল্পটা পড়িয়েছিল আমাকে। যেখানে যা ভালো তার চোখে পড়ত আমাকে দেখাত সেটা। আমি বই কিনতাম অনেক। পেতামও। সব কিন্তু পড়া সম্ভব হত না আমার পক্ষে। সে কিন্তু সব পড়ত। ভালো লাগলে আমাকে পড়তে বলত। স্তূপ মেঘের ওই বিরাট মুখটা তার স্মৃতিকে সজীব করে তুলেছে আমার মনে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল।

পাশের ঘরে দেখি আলো জ্বলছে।

"তুমি এখনও পড়ছ?"

'এই যে হয়ে গেল, যাচ্ছি—'

খানিকক্ষণ পরে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরল।

আজ কোথায় তোমার সেই হাত? চিতায় পুড়ে গেছে? বিশ্বাস হয় না। পক্ষাঘাত হয়েছিল তোমার? বিশ্বাস হয় না। তোমার মৃণাল বাহুর সে স্পর্শ এখনও যে আমায় বেষ্টন করে আছে।

...বিরাট মুখ আর নেই। বিরাট সমুদ্রে পরিণত হয়েছে, তরঙ্গসমাকুল বিশাল সাগর।

আকাশের নীল মিশেছে মেঘের ফ্যানার সঙ্গে। মনে হচ্ছে যেন দূর থেকে বসে পুরীর সমুদ্র দেখছি। হ্যাঁ, পুরীর সমুদ্রই মূর্তি পরিগ্রহ করেছে চোখের সামনে। মূর্ত হয়ে উঠল আর একটা ছবি মানসপটে। অতীতের যবনিকা কে যেন সরিয়ে দিলে...পুরীর সমুদ্রের ধারে সরকারি যে ডাক-বাংলোটা আছে তারই বারান্দায় বসে আছি। তখন উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নবকৃষ্ণ চৌধুরী। তিনি আমাদের উড়িষ্যা ভ্রমণের জন্য একটা বাস দিয়েছিলেন। তাঁর স্টেনো সস্ত্রীক ছিলেন আমাদের সঙ্গে।

সমুদ্রে জেলেরা মাছ ধরছিল। অনেক জেলে নৌকা ভিড়িয়ে মাছ বিক্রিও করছিল।

চল, আমরাও গিয়ে মাছ দেখি—'

ভালো মাছ প্রলুব্ধ করেছে বরাবর।

'চল।'

সে-ও উৎসাহে উঠে পড়ল।

ঘুরে ঘুরে কয়েক রকম সামুদ্রিক মাছ কিনলাম।

মাছ নিয়ে ফিরলাম যখন, তখন স্টেনো বললেন, 'এত মাছ কিনলেন কেন?'

'সবাই মিলে খাওয়া যাবে। সঙ্গে তো বেশ ভালো রাঁধুনি আছে—'

স্টেনো গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর আড়ালে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে এসে বললেন, 'পুরীতে এসে আগে জগন্নাথদেবের প্রসাদ খেতে হয়। আমি ফোনে আমাদের সকলের জন্য 'কণিকা' প্রসাদ বুক করেছি। এখনি গিয়ে নিয়ে আসছি।'

মোটর নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। আমাদের রাঁধুনি বুদ্ধ বলল, 'এখুনি রান্না করে খেলে এ মাছের যে স্বাদ পেতেন, ও বেলায় তা আর পাবেন না।'

আমি মনে মনে ক্ষুব্ধ হলাম। সে কিন্তু বলল, 'না, আগে ঠাকুরের ভোগ খাব। যেখানকার যা নিয়ম তা মানতে হবে—'

আবার আমরা সমুদ্রতীরে গিয়ে ঝিনুক কুড়োতে লাগলাম দুজনে মিলে। তার কোঁচড় আর আমার পকেট ভরে গেল। তার সে কি উৎসাহ!

বহু ঝিনুক নিয়ে আমরা যখন ফিরলাম তখন দেড়টা বাজে। স্টেনো কিন্তু তখনও ফেরেননি। ক্ষিধেও পেয়েছে খুব। তিনি ফিরলেন আরও একঘণ্টা পরে। ভোগ নিয়ে নয়। বাজার করে। বললেন, একজন অচ্ছুত নাকি ভোগ দেখে ফেলেছিল, সে ভোগ আর জগন্নাথদেবকে দেওয়া যাবে না। আবার ভোগ চড়ানো হচ্ছে। তা নামতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে, তারপর তা জগন্নাথকে দেওয়া হবে।

সে বললে, 'আমি উপবাস করে থাকতে পারব। দ্বিতীয়বার ভোগ হোক, তখন খাব—'

আমি বললাম, 'আমার কিন্তু খুব ক্ষিধে পেয়েছে। আমি পারব না।'

স্টেনো বললেন, 'আমিও পারব না!' আবার তিনি আড়ালে গিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে এসে বললেন, 'উনি বলছেন, ভোগ যখন নষ্ট হয়ে গেছে তখন জগন্নাথদেবের ইচ্ছে নয় যে আমরা ও ভোগ খাই। মন্দির থেকে জগন্নাথদেবের প্রসাদী কোনো মিষ্টান্ন এনে আমরা খাই। তারপর এখানে রান্না হোক।' তাই হল। বুদ্ধ মহা উৎসাহে রান্না করতে লেগে পড়ল। একটু পরেই আমরা মাছ-ভাজা আর মাছের ঝাল দিয়ে পরিতৃপ্ত সহকারে ভাত খেলাম। মনে মনে প্রণাম করলাম জগন্নাথদেবকে আমার মতো লোভীর মনের কথা তিনি শুনেছেন বলে।

সে কিন্তু খেতে চায় নি। বলেছিল, 'দ্বিতীয়বার ভোগ রান্না হোক, তারপর খাব। কয়েক ঘণ্টা উপোষ করে থাকা কি এমন শক্ত।'

স্টেনো বললেন, 'ভোগ দিতে আজ অনেক রাত্রি হয়ে যাবে। আমি জগন্নাথদেবের প্রসাদী পেঁড়া তো এনেছি—'

সে রাজি হল, কিন্তু খুঁত খুঁত করতে লাগল মনে মনে। তার মুখ দেখে বুঝতে পারলাম সেটা। বলল—'আপত্তি করছ কেন?

'হয়তো অমঙ্গল হবে।'

'কি অমঙ্গল?'

'তা তো জানা নেই। তাই অস্বস্তিটা বেশি।'

তার মুখ দেখে বুঝতে পারলাম এই অনির্দিষ্ট অস্বস্তিটা একটা আশঙ্কাকে ঘিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে

তার মনে। এই তার স্বভাব ছিল। একটা অজানা ভয়, অজানা দুশ্চিন্তা সর্বদা তার মনকে আকুল করে রাখত। সে শনিবার দিন কাউকে কোথাও যেতে দিত না, বৃহস্পতিবারের বারবেলাতেও না। তার মন সর্বক্ষণ সকলকে যেন আগলে আগলে বেড়াত।

হঠাৎ আমার মনটা কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আর সেই কুয়াশার ভিতর থেকে উঠতে লাগল একটা আর্ত জিজ্ঞাসা—তুমি এখন কোথায় আছ, তুমি এখন কোথায় আছ, তুমি এখন কোথায় আছ, তুমি এখন কোথায় আছ, কোথায় কোথায় কোথায়?

কুয়াশায় ঢেকে গেল সব।

চুপ করে বসে রইলাম।

লোকের যেমন ফিট হয়, তার মৃত্যুর পর থেকে আমি মাঝে মাঝে এই রকম কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। আর সেই কুয়াশার ভিতর থেকে একটা প্রশ্নই কে যেন বার বার করতে থাকে যে প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই, যে প্রশ্ন অসহায় হৃদয়ের অতল থেকে উৎসের মত আকাশের দিকে যেতে চায়, কিন্তু যেতে পারে না, হারিয়ে যায় ওই কুয়াশায়। ওই কুয়াশা আমার অতি সীমিত বুদ্ধি র কুয়াশা। কিন্তু প্রশ্নটা হারিয়ে যাবার আগে যেন মূর্তি ধরে ছটফট করে বাণ-বিদ্ধ পাখির মত। আর সেটা যেন আমি দেখি! না, ঠিক আমি নই, আমার আর একটা সত্তা যেন।

আকাশে সাদা মেঘের স্তূপ আর নেই। বিরাট একটা চাদর কে যেন আকাশে বিছিয়ে দিয়েছে। সাদা চাদর নয়, সোনালি চাদর তার থেকে সোনালি আভা বেরুচ্ছে। দূরে একটা ঘুঘু ডাকছে। ডুকরে ডুকরে কাঁদছে যেন। তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত পরিবেশটা আতরের গন্ধে ভরে উঠল। চারিদিকে কে যেন খস্ আতর ছড়িয়ে দিলে।

বুঝলাম ইলোরা এসেছে। ইলোরা এলে খস্ আতরের গন্ধ ছাড়ে। এদের সঙ্গে আমার পরিচয়ের কাহিনীটা অদ্ভুত।

সে যখন চলে গেল তখন আমার মনের অবস্থা যা হয়েছিল তা অবর্ণনীয়। মনে হচ্ছিল না আমি নিঃস্ব হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছিল যে ভূমির উপর আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম তা যেন পায়ের তলা থেকে সরে গেছে, আমি যেন কোন অতলে তলিয়ে যাচ্ছি। একদিন রাত্রে কিন্তু হঠাৎ একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল। আমি জেগে ছিলাম না তন্দ্রার ঘোরে ছিলাম তা জানি না। দেখলাম দুটি অপরূপ সুন্দরী আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

'আপনারা কে—'

'আমাদের নাম নেই। পূর্বজন্মে আপনার স্ত্রীর বন্ধু ছিলাম। এখন আমরা আকাশে আকাশে ঘুরে বেড়াই। আপনাদের কিন্তু সব খবর রাখি আমরা—'

'আপনাদের তো আগে কখনও দেখিনি।'

'আমাদের দেখা যায় না। আমরা অশরীরী। আপনাকে দেখা দেব বলেই শরীর ধারণ করেছি। শরীর ধারণ করে থাকতে কষ্ট হয়।'

'কি করেন আপনারা?'

'যেখানে যা কিছু সুন্দর জিনিস পাই তা সংগ্রহ করি। যেখানে যত শিল্পী আছেন তাঁরা মনে মনে যা সৃষ্টি করেন কিন্তু প্রকাশ করতে পারেন না, তাঁদের সেই অপ্রকাশিত সৃষ্টিও সংগ্রহ করি আমরা। এ

সংগ্রহ পৃথিবীর কোনও সংগ্রহশালায় নেই, আমাদের কাছে আছে। আপনি একটু আগে চমৎকার একটা সৃষ্টি করেছেন। মনে মনে করেছেন, বাইরে সে ছবি কোথাও নেই। দেখবেন?' সঙ্গে সঙ্গে অবলুপ্ত হয়ে গেল তারা। দেখলাম অন্ধকারের ভিতর দিয়ে একটা দুর্দান্ত বলিষ্ঠ কালো লোক জোর করে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে চীৎকার করছে—আমি যাব না, যাব না, আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি এদের ছেড়ে যেতে পারব না—

আর দূর থেকে ভেসে আসছে শ্রীশ্রীদুর্গা, তারক-ব্রহ্মনারায়ণ, নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে—

আমি যাব না—যাব না, যাব না—যাব না।

কিন্তু লোকটা নিয়ে চলে গেল তাকে। ছবি লুপ্ত হয়ে গেল।

আবার এসে দাঁড়াল মেয়ে দুটি।

'এ ছবি আপনি সৃষ্টি করেছেন—আমরা সংগ্রহ করে রেখেছি।'

'আপনারা কোথা থাকেন—'

'আমাদের 'তুমি' বলুন। আমরা আপনার স্ত্রীর পূর্বজন্মের বান্ধবী ছিলাম। আমরা ওদের বাগানে প্রজাপতি ধরতে যেতাম। মৃত্যু আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, আমরা কিন্তু ওকে ভুলিনি। আমরা কোথা থাকি বলছেন? আমরা সর্বত্র থাকি। আমরা ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াই। শিল্পীর মনের আকাশেও থাকি। তাদের অপ্রকাশিত সৃষ্টিগুলি কুড়িয়ে রাখি—'

চেয়ে দেখলাম আবার মেয়ে দুটির দিকে। দুজনের মুখ একরকম। দুজনেই আশ্চর্য রূপসী। মনে হয় যেন রক্ত-মাংসের দেহ নয়, স্বচ্ছ রঙের অপূর্ব সমন্বয় যেন ওরা।

তোমরা দুজন কিন্তু একরকম দেখতে—'

'আমরা দুজন যমজ ছিলাম। একসঙ্গেই আমাদের মৃত্যু হয়—'

'আমার কাছে হঠাৎ এলে যে—'

'প্রায়ই আসি আমরা। শিল্পীর মনের ভিতর যেতে ভারি ভালো লাগে। আমাদের বান্ধবী যখন বেঁচেছিল তখনও আসতাম। আজই প্রথম আত্মপ্রকাশ করলাম। কিন্তু দেহ ধারণ করে থাকতে বড় কষ্ট হয়। আমরা এবার যখন আসব, গন্ধ হয়ে আসব।'

'কিন্তু আমি বুঝব কি করে কে এসেছে?'

'আপনি আমাদের নামকরণ করুন। আমরা বলে দিচ্ছি—আমরা কে কোন গন্ধ হয়ে আসব।'

'বেশ, তোমার নাম থাক অজন্তা আর এর নাম ইলোরা'

'বাঃ, চমৎকার নাম হয়েছে। ইলোরা হবে খস্ আর আমি গোলাপী আতর।'

তারা অন্তর্ধান করবার পর আমি বিছানায় উঠে বসলাম। মনে হল—এ স্বপ্ন মায়া, না মতিভ্রম?

তারপর তারা আর আসেনি, আজ এই সোনালি আলো খসের গন্ধে মম করছে। ইলোরাই এসেছে কি?

'ইলোরা?'

আমার মনের মধ্যেই উত্তর পেলাম।

'হ্যাঁ আমি ইলোরা। ঠিক চিনেছেন। এটি অপূর্ব সৃষ্টি আপনি করেছেন। সম্ভবত অজ্ঞাতসারেই করেছেন। আমি কিন্তু সেটি কুড়িয়ে রেখেছি। জগন্নাথদেবকে আপনারা যখন প্রণাম করছিলেন তখন তার মনটি দেখতে পেয়েছিলেন আপনি। কল্পনায় তার মনের কথাগুলিও শুনেছিলেন। এই দেখুন।'

চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠল একটি ছবি।

সে প্রণাম করছে জগন্নাথদেবকে। আর মনে মনে বলছে, 'তোমার প্রসাদ আগে না খেয়ে আমি অন্যায় করেছি ঠাকুর। কিন্তু ওদের সবার অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। আর মনে হল ওঁর যদি পাপ হয়ে থাকে, আমারও হোক। ওঁর যদি এ জন্য শাস্তি হয়, আমারও হোক—'

তার মনের এই কথাগুলো আলো-ছায়ায় আঁকা আলপনার মত ভাসছে তরল জ্যোৎস্নার উপর। মনে হচ্ছে যেন একটি অপরূপ রোদন মূর্তি ধরেছে।

'আর একটি ছবি দেখবেন?'

'দেখব—'

দেখলাম একটা হালকা মেঘ বায়ু-তাড়িত হয়ে ছোটাছুটি করছে। তারপর দেখলাম একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে প্লাটফর্মে আর সে একটা কামরার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতি প্যাসেঞ্জারকে ডেকে ডেকে বলছে, 'বাবা আমার ছেলেরা কলকাতায় যাচ্ছে। আপনারা একটু দেখবেন ওদের। বড্ড ছেলে মানুষ তো—'

প্যাসেঞ্জাররা মুচকি হেসে আশ্বাস দিচ্ছে, 'কুছ্ ডরিয়ে নেহি মাইজি। হাম লোগ দেখ্-ভাল করেঙ্গে। আপ নিশ্চিন্ত্ রহিয়ে—'

খস্ আতরের গন্ধ মিলিয়ে গেল। একা নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম ছাতে। অনেকক্ষণ বসে রইলাম। তারপর অনুভব করলাম অন্ধকার হয়ে গেছে চারিদিক। শুক্রগ্রহ জ্বল জ্বল করছে আকাশে।

মনে পড়ল আমরা দুজনে আকাশ-চর্চা করতাম রাত জেগে জেগে। তখন বই পড়ে জেনেছিলাম শুক্র একটি রহস্যময় গ্রহ। অত উজ্জ্বল কিন্তু টেলিস্কোপ দিয়েও ওর ভিতরের খবর পাওয়া যায় না। একটা উজ্জ্বল বাষ্পের আবরণে ও নিজেকে ঢেকে রেখেছে। হঠাৎ মনে পড়ল একবার একটা ধূমকেতু দেখবার জন্য রাত্রি দুটোর সময় ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে উঠেছিলাম। কোথায় গেল সে সব দিন? কোথায় গেল। কোথায় গেল, কোথায় গেল, কেন গেল—আবার কুয়াশা ঘনিয়ে এল মনের মধ্যে। কুয়াশার মধ্যে চীৎকার করতে লাগল প্রশ্নগুলো।'

'ঘরে যাও, ঠাণ্ডা লাগবে—'

ঠিক তার গলা।

কিন্তু সে নেই।

কেউ নেই।

।। দুই ।।

তোমাকে আবার সৃষ্টি করব এই আমার পণ। কিন্তু সৃষ্টি করতে বসে একটা কথা বার বার মনে হচ্ছে। উপকরণ কই? কি দিয়ে সৃষ্টি করব তোমাকে। তোমার সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই, সাদৃশ্য নেই, এমন কিছু আমাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারছে না। তোমার স্মৃতি, তোমার সম্বন্ধে আমার মোহ—এই তো আমার সম্বল।

আমার বাগানের শেষ প্রান্তে পেয়ারা গাছের সারিতে জোনাকির ঝাঁক যে নীরব উৎসব করছে,

সেইদিকে চেয়ে বসে আছি। তোমার সঙ্গে ওর মিল আছে। মৃত্যুর অন্ধকার তোমাকে গ্রাস করতে পারেনি। সহস্র স্মৃতির উজ্জ্বল বিন্দু টিপ্ টিপ্ করে জ্বলছে। অন্ধকার মিথ্যা হয়ে যায় নি, পটভূমিকা হয়েছে ওই উজ্জ্বল আলোকবিন্দুগুলির। কিন্তু আমি অন্ধকারকে দেখছি না, দেখছি ওই আলোকবিন্দুগুলিকে। স্মৃতির আনন্দ-বিন্দু। অজস্র। আভাগুলো গাছকে ঢেকে ফেলেছে। আলোর ঐক্যতান হচ্ছে যেন।

'খা না। তোর জন্যে আলাদা করে মেটে-চচ্চড়ি করেছি।'

'না, তুমি আর খেও না। দুটো রসগোল্লা তো খেলে। সুগার একটু কমুক না।'

'আমি কি মানুষ নই, বেলা বারোটার সময় একগাদা মাছ কিনে নিয়ে এলে—'

বেলা দুটোর সময় খেয়েছিলাম বড় বড় পাবদা মাছের ঝাল দিয়ে গরম কাতারনি চালের ভাত। তার মুখে রাগ ও অনুরাগের অপূর্ব শোভা।

আব্দুল দর্জি এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

'কি আব্দুল—'

'মাইজি বোলায়ঁ হ্যাঁয়।'

সে বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে।

'বাবুর জন্যে একটা গরম লং কোট করাব। মাপ নাও—'

আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

'আমার লং কোট? হঠাৎ?'

'লেখার জন্যে যে পঞ্চাশ টাকা এসেছে তা দিয়ে তোমার গরম লং কোট করিয়ে দিই। ও টাকা সংসারে খরচ করব না।'

'আমার লং কোটের দরকার কি এখন—'

'তোমার না থাকে আমার কাছে। মাপ দিয়ে দাও ওকে। আমি ডাল চড়িয়ে এসেছি—আব্দুল ভালো করে মাপ নাও—'

আব্দুল মাপ নিয়ে বলে গেল কাপড় সিংগ্‌ল বহর হলে কত লাগবে, ডবল বহর হলে কত লাগবে।

তখনও ভালো বিলাতী গরম কাপড় পাওয়া যেত। চমৎকার কালো কোট হয়েছিল একটা। কোটটি এখনও আছে।

সে নেই।

একটা গাছের জোনাকিগুলো যেন ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল। একটা ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হল সেখানে। তারপর জ্বলে উঠল গাছটা। সমস্ত গাছগুলো জ্বলতে লাগল। যেখানে জোনাকির উৎসব হচ্ছিল সেখানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে লাগল।

এই তো হয়। এইটেই স্বাভাবিক। চিতা প্রত্যেকের জন্যই অপেক্ষা করে আছে।

মনের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল—আমি তাকে সৃষ্টি করব। সৃষ্টি করবই।

তারপরই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল একটা। আগুনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক প্রদীপ্ত ঋষি। মনে হল আগুনেরই খানিকটা যেন মনুষ্যমূর্তি ধরে দাঁড়ালেন আমার সামনে।

'কে আপনি—'

'আমি গীতার লেখক।'

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম।

'বসুন, বসুন, দাঁড়ালেন কেন?'

'আপনি বসুন আগে।'

'আমি এইখানে বসছি।'

একটা জ্বলন্ত গাছের নীচে বসে পড়লেন তিনি। আমি একটু দূরে মাটিতেই বসলাম। গীতা অনেকবার পড়েছি, তবু আমি আগুনের মধ্যে গিয়ে বসতে পারলাম না।

গীতার লেখক মৃদু হেসে বললেন, 'মনে হচ্ছে আপনি আপনার স্ত্রীকে ভালোবাসতেন না।'

'কি করে বুঝলেন?'

'ভালোবাসলে এই আগুনের মধ্যেই এসে বসতেন। আপনারা তো আগুনের মধ্যেই তাঁকে তুলে দিয়েছিলেন।'

'কিন্তু এ-ও জানি তিনি আগুনের মধ্যে এখন নেই।'

'বাঃ, ঠিক বলেছেন। পঞ্চভূতে মিশিয়ে গেছেন।'

'আপনি যখন গীতা লিখেছিলেন তখন ভূত মাত্র পাঁচটি ছিল। এখন তারা লক্ষ লক্ষ। এখন তাদের নাম প্রোটন, ইলেক্‌ট্রন, নিউট্রন, পজিট্রন ইত্যাদি। সবাই বিদ্যুৎকণা। কেউ পজিটিভ, কেউ নেগেটিভ, কেউ নিউট্রাল। আমার স্ত্রীর দেহ এই রকম বহু বিদ্যুৎকণায় রূপান্তরিত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে এটা হয়তো বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু ওই সত্যকে ধ্যান করে সুখ নেই। তাই আমি আবার তাকে সৃষ্টি করতে চাই। হয়তো সে সৃষ্টির নাগাল কোনও দিন পাব না, কিন্তু সৃষ্টি করার যে আনন্দ তা পাব। তাকে দূর থেকে দেখেও আনন্দ পাব আমি। আমি স্মৃতির উপাদান দিয়েই সৃষ্টি করছি তাকে। এখন ধরবার ছোঁবার মত আর তো কিছু নেই। আপনি কেন এলেন বুঝতে পারছি না।'

'আপনি লেখক, আমিও লেখক। আপনি কষ্ট পাচ্ছেন তাই আপনার কাছে এলাম। আমি গীতা নামে যে বইটি লিখেছি তাতে আমি চেষ্টা করেছি মৃত্যু-কবলিত মানুষকে সান্ত্বনা দিতে। তাদের বলেছি যে আমরা মরি না, আমরা অমর। দেহটা আমাদের সাময়িক বাসস্থান। সে গৃহ যখন জীর্ণ হয়ে যায় বা অন্য কোনও কারণে অকস্মাৎ ভেঙে যায় তখন অমর আত্মা সে ভগ্ন গৃহে থাকতে পারে না, সে গৃহ ত্যাগ করে চলে যায়—'

'আপনার গীতা আমি একাধিকবার পড়েছি। বইটি অতি চমৎকার। কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। গীতা পড়ে কেউ সান্ত্বনা পায়নি। শোকাতুর লক্ষ লক্ষ মানুষ রোজ কাঁদছে। লক্ষ লক্ষ কপি গীতা বিক্রি হয়েছে, এখনও হচ্ছে, শোক কিন্তু বিদূরিত হয়নি। আমরা দিব্যজ্ঞান লাভ করিনি, আমরা অসহায়ের মতো কাঁদছি। আচ্ছা, আপনি যখন এসেছেন তখন আপনাকে যদি দু একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি রাগ করবেন কি?'

'না, রাগ করব কেন? ভগবান রাগ করেন না। গীতায় আমি ভগবানের ভূমিকা গ্রহণ করেছি, সুতরাং রাগ আমি করব না। নির্বিকার থাকব। কি প্রশ্ন আপনার বলুন।'

'আপনি যে আত্মাকে অমর বলেছেন, সে আত্মা কি শরীরের একটা অংশ? কোথায় সে থাকে? মস্তিষ্কে? হৃদয়ে?'

'সে শরীরের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু সে শরীরের অংশ নয়। সুর একটা যন্ত্রকে অবলম্বন

করে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়, কিন্তু সে যন্ত্রের অংশ নয়। লক্ষ লক্ষ যন্ত্র রোজ ভেঙে যাচ্ছে, সুর কিন্তু অমর। এটা একটা উপমা দিলাম। উপমাটা অবশ্য খুব লাগসই হল না। কারণ সুর সীমিত, আত্মা অসীম। সেই অসীম আত্মা কখন যে কোন যন্ত্রকে অবলম্বন করে কি রূপে প্রকাশিত হবেন তা কেউ জানে না। নিখিল বিশ্বের দিকে চেয়ে দেখুন কত নিত্য-নতুন সৃষ্টি, দুটো এক রকম নয়। আবার নিত্য-নতুন মৃত্যু। তারাও এক নয়, প্রত্যেক মৃত্যু আলাদা ছন্দে।'

'এ সব কি আপনি কল্পনা করেছেন? শুনতে ভারি ভালো লাগছে—'

'কল্পনাও করেছি, দেখেওছি। আপনি তো লেখেন, আপনি নিশ্চয় জানেন যা আমরা কল্পনা করি তাকে মনে মনে প্রত্যক্ষও করি। তাই তাকে অমন জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলতে পারি। আর কোনও প্রশ্ন আছে আপনার?'

'আছে। আত্মা যে অমর একথা আপনি ভাবলেন কেন? আমাদের দেহ মরে যায় এ তো আমরা দেখতে পাই—'

'একবার নয় বার বার মরে যায়। সে মৃত্যু আমাদের চোখের সামনেই ঘটে তবু আমরা দেখতে পাই না। ছেলেবেলার আপনি আর এখনকার আপনি দুই বিভিন্ন দেহী। আপনি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছেন আপনার অজ্ঞাতসারে আপনার জীবনশক্তির কৌশলে। কিন্তু সে কৌশলের একটা সীমা আছে। তাই দেহের মৃত্যু ঘটবেই। একদিন দেহের সব যন্ত্রই অকেজো হয়ে যাবে। থাকবে শুধু আপনার আমিত্ব বোধটা, যে বোধটা আপনার জন্ম থেকে আছে, মৃত্যুর পরও থাকবে, কারণ সেটা কোনো ক্ষয়শীল বস্তু নয়—তা একটা বোধ—'

'তার মানে আপনি বলছেন অহঙ্কারই আত্মা—'

'ধন মান রূপ ঐশ্বর্য নিয়ে যে আস্ফালন তা আত্মা নয়। 'আমি আছি'—এই বোধই আত্মা'

'এ বোধ কি মস্তিষ্কে থাকে?'

'থাকে অথচ এ মস্তিষ্কের অংশ নয়। সুর যেমন বীণার অংশ নয়, কিন্তু বীণাকে আশ্রয় করেই তা বাজে। সে বোধ দেহাতীত, তা অমর।'

'একি এখনও চা খাওনি? চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

আমার চাকর বান্দা এসে হাজির হল।

...সব ভেঙে গেল।

গীতার লেখক অন্তর্ধান করলেন। পেয়ারা গাছগুলো আবার মূর্ত হল। সেখানে একটি জোনাকি নেই।

'ঘরে চল, আবার চা করে দি। ঠাণ্ডা পড়েছে সোয়েটারও তো গায়ে দাওনি। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। চল ঘরে চল—'

বান্দার পিছু পিছু ঘরে ঢুকলাম। বান্দা আমার অতি পুরাতন ভৃত্য। বাবার আমলের। আমাকে নাম ধরে ডাকে।

'বৌমা সতীলক্ষ্মী পুণ্যবতী ছিলেন। মাথায় সিঁদুর নিয়ে রাজরাজেশ্বরীর মত চলে গেছেন তিনি—ভরা সংসার রেখে। তুমি ও নিয়ে দিনরাত মন গুমরে আছ কেন? সোয়েটারটা গায়ে দাও। আমি গরম চা নিয়ে অসি—'

বান্দা চলে গেল।

আমি সোফার উপর বসলাম। লীলারই কেনা সোফা। ঘরের পরদাগুলোও সেই কিনেছিল। যে জামাটা পরে আছি সেটাও তো সে-ই তৈরি করিয়ে দিয়েছিল। আমার সব জামা-কাপড়, এমন কি আমার কলম-কাগজ—সব সে-ই কিনত। ঘরের চারিদিকে যে ছবি টাঙানো—ওই নারায়ণের ছবি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সারদা মা-র ছবি, শিল্পী অরবিন্দ দত্তের আঁকা উত্তরা-অভিমন্যুর ছবি, কলসী-কাঁখে রাধিকা যমুনার দিকে চলেছেন— এ সবই তার পছন্দ-করা ছবি—চারদিকে তার ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনীদের ফটো—তার অ্যালসেশিয়ান কুকুরের ছবি। তার প্রিয় কুকুর 'রকেট' মারা যায়, তারই স্মৃতি ওই ছবিটা—চারিদিকে তার স্মৃতি—শুধু সে নেই, সে নেই! আমি তাকে সৃষ্টি করব আবার। করব, নিশ্চয় করব।

বান্দা গরম চা নিয়ে এল।

'গরম গরম খেয়ে নাও এটা—'

আমি নীরবে খেতে লাগলাম।

বান্দা বললে, 'আগে তো কত পড়তে। আজকাল পড়া ছেড়ে দিয়েছ। কি ভাবছ এত? লেখাপড়ায় মন দাও।'

ছেলেরা বিদেশে, মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি। বান্দা আর তার স্ত্রী বিন্দি আমার গার্জেন। বান্দা আমাকে উপদেশ দিয়ে চলে গেল। তারপর ফিরল খানিকটা হালুয়া নিয়ে।

'এটাও খাও। বিন্দি বলছে আজ খেতে রাত হবে। গ্যাস ফুরিয়ে গেছে। স্টোভে রাঁধছে—'

আমি নীরবে খেতে লাগলাম।

'তুমি চুপচাপ হয়ে গেছ কেন বল দিকিন?'

আমি চুপ করেই রইলাম। বান্দাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম না যে আমি তাকে সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছি। বললে সে ভাববে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ছেলে-মেয়েদের খবর দেবে, ডাক্তার ডাকবে।

খাওয়া শেষ করে বললাম, 'হালুয়া চমৎকার হয়েছে।'

'একগাদা চিনি আর কিশমিশ দিয়েছে, তোমার তো ভালো লাগবেই। কিন্তু ডাক্তার তোমাকে চিনি কম খেতে বলেছে—'

আমার খুব ছেলেবেলায় বান্দা যখন সস্ত্রীক আমাদের বাড়িতে বহাল হয়েছিল তখন বান্দার নাম ছিল বন্ধন-গোপাল আর তার স্ত্রীর নাম বিন্দুবাসিনী। বাবা নাম বদলে সংক্ষেপ করে দিয়েছিলেন বান্দা আর বিন্দি। বিন্দি বাঁজা। আমিই ওর ছেলে। বান্দা খালি বাসনপত্র নিয়ে চলে গেল। আমি আর কোনো উত্তর দিলাম না।

বিন্দি কেন বেশি কিশমিশ দিয়েছে তা আমি জানি। লীলা বেশি কিশমিশ দিত। তার কাছ থেকে অনেক রান্না শিখেছে ও। ধনেপাতা দিয়ে কি একটা চমৎকার চাট্নিও শিখেছিল তার কাছে। মাঝে মাঝে তৈরি করে সেটা। সব রান্নাই লীলার কাছে শিখেছে ও। লীলা ওকে—

সহসা সব ঢেকে গেল কুয়াশায়। আচ্ছন্ন হয়ে গেল সমস্ত মন। কুয়াশার ভিতর থেকে আর্তনাদ উঠতে লাগল—কোথায় চলে গেছ তুমি, কত দূরে চলে গেছ, কত দূরে, কত দূরে—

সোফায় ঠেস দিয়ে চোখ বুজে বসে রইলাম। চোখের সামনে ফুটে উঠল তার মূর্তিটা। সেই যৌবনকালের মূর্তিটা, যখন সে অপরূপ রূপসী ছিল। আমার আকুলতা যেন সে ছবিটাকে স্পর্শ

করতে চাইল। কিন্তু পারল না। দূরে দূরে সরে যেতে লাগল ছবিটা। ছবি নয়, যেন আলেয়া। অসহায় হয়ে যখন ভাবছি কি করব তখন গোলাপী আতরের গন্ধে ভরে উঠল চারিদিক। মন যেন অবলম্বন পেল একটা।

'অজন্তা নাকি?'

অশরীরী অজন্তার উত্তর পেলাম মনের মধ্যে। সে উত্তর ভাষাহীন, কিন্তু সুবোধ্য।

'হ্যাঁ। আপনারই আঁকা আর একটি ছবি ওই দেখুন রয়েছে আপনার মনের নেপথ্যলোকে। আপনিই আপনার অজ্ঞাতসারে এঁকে রেখেছিলেন ওটি। আমি অনেক আগেই লক্ষ্য করেছি ওটি। আপনি দেখতে পাচ্ছেন না কেন? ওই দেখুন—'

দেখলাম আকাশপটে প্রকাণ্ড একটি ফ্রেম। ফ্রেম অসংখ্য নক্ষত্র দিয়ে প্রস্তুত। ফ্রেমের মাঝখানে নীলাভ অন্ধকার। তার মাঝখানে আবছা একটি মুখ। আবছা হলেও তাকে চেনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে তার চোখ দুটি ছল ছল করছে।

'ও ছবিকে ধরতে পারবেন? অথচ ও ছবি তো আপনার মনের মধ্যেই আছে। যে ছবিকে ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, তা বড় স্থূল। সূক্ষ্ম রূপের মাধুরী সে ছবিতে নেই। সে ছবি নশ্বর, ক্ষণভঙ্গুর। তারা মলিন হয়, পুড়ে যায়। যা অধরা, যা চিরদূরবাসিনী, তাই চিরন্তন। তাকে ধরতে যাবেন না, ধরতে পারবেন না। আপনি যাকে সৃষ্টি করতে চাইছেন সে আছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে—'

আতরের গন্ধ মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে। অজন্তা চলে গেল। তার কথাগুলো মনের মধ্যে বাজতে লাগল, 'সে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।'

সেই ছবিটি কিন্তু মনের আকাশে ফুটে রইল অনেকক্ষণ। নির্নিমেষ চেয়ে রইলাম তার দিকে। ওকে আমি সৃষ্টি করেছি। কখন?

তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম।

দিনের পর রাত্রি আসে।

জাগরণের পর ঘুম।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন আসে মাঝে মাঝে। সেদিন স্বপ্নে সে এসেছিল।

জীবন-গ্রন্থের অনেক পাতাই ছিঁড়ে উড়ে গেছে কোথায়। তারা আর ফিরবে না। সেদিন স্বপ্নে একটা পাতা জীবন্ত হয়ে এসেছিল।

পূর্ণিমা রাত্রি। সে, আমি আর আমার ছোট ভাই রাত একটার সময় চুপি চুপি খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। যাব আমাদের আমবাগানে। সেখানে একটা ছোট ঘরও আছে। তার গানের গলা ছিল চমৎকার। কিন্তু বাড়িতে সবার সামনে গান গাওয়ার রেওয়াজ ছিল না তখন। নতুন বউদের মাথায় ঘোমটা দিয়ে ঘোরাফেরা করতে হত। আমরা রাত্রে তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম আমবাগানে। সেখানে ছোট ঘরটির বারান্দায় শতরঞ্জি পেতে বসতাম। সে বিনা হার্মোনিয়মে গান গাইতে পারত, গান মুখস্থ থাকত তার। সামনে বই বা খাতা খুলে গান গাইত না সে কখনও। আমাদের প্রকাণ্ড বাগান জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। আমগাছগুলো কালো কালো স্তূপের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তারাও যেন শ্রোতা। বাড়ির বড় বউয়ের গান শুনবে বলে যেন প্রতীক্ষা করছে।

সে গাইল, 'দূর দেশী এক রাখাল ছেলে—।' তারপর গাইল 'শেষ পারানির কড়ি কণ্ঠে নিলাম গান।' তারপর গাইল, 'জানি বন্ধু জানি তোমার আছে তো হাতখানি।'

ঘুম ভেঙে গেল।

কোথায় সেই রাখাল ছেলে, সে যে বাঁশিটা ফেলে গিয়েছিল কোথায় সেই বাঁশিটা?

তোমার শেষ পারানির তরিতে তুমি কি গান কণ্ঠে ভরে নিয়ে গিয়েছিলে— তোমার তো বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল। কোন নিবিড় অন্ধকারে কার হাত ধরে তুমি দাঁড়িয়ে আছ?

বিছানায় উঠে চুপ করে বসে রইলাম। প্রতীক্ষা করতে লাগলাম যদি অসম্ভব সম্ভব হয়, যদি সে আসে। অনেকক্ষণ বসে রইলাম। এল না।

একটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়লাম আবার।

আবার স্বপ্ন দেখলাম।

সে যেন বলছে, 'তুমিই তো সেই রাখাল ছেলে। আমার বাটে বটের ছায়ায় খেলা করেছিলে। যে বাঁশিটি ফেলে গিয়েছিলে সেইটিই তো আমি সারা জীবন বাজিয়েছি। তারপর শুভদৃষ্টির সময় বুঝতে পারলাম সেই রাখালই নূতন রূপে ফিরে এসেছে।'

মুচকি হেসে মিলিয়ে গেল সে। তারপর দেখলাম একটা বিশাল নদীর বাঁকে নৌকোর উপর বসে আছে। বলছে, 'শেষ পারানির নৌকোতে আমি গানই কণ্ঠে ভরে নিয়েছিলাম। সে গানে কথা ছিল না, শুধু কান্না ছিল। বিরামহীন কান্না। বুঝতে পেরেছিলাম তোমাদের ছেড়ে যেতে হবে এবার। তাই নির্বাক হয়ে শুধু কেঁদেছিলাম। তুমি বুঝতে পারনি?'

নৌকোটা নদীর বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সমস্ত ঢেকে গেল অন্ধকারে। একা দাঁড়িয়ে রইলাম সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। সহসা অনুভব করলাম কে যেন আমার বাঁ হাতটা চেপে ধরেছে। কী শীতল স্পর্শ!

কে তুমি?

কোনো উত্তর দিলে না।

কে তুমি?

এবারও কোনো উত্তর এল না। শুধু মৃদু কণ্ঠে কে যেন বলল, 'চল—'

সেই নিবিড় অন্ধকারে হাত-ধরাধরি করে চলতে লাগলাম দুজনে। আর সন্দেহ রইল না সে কে।

।। তিন ।।

মন তাকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে দিন-রাত। তাকে মানে, তার দেহকে। দেহহীন তার অস্তিত্ব কল্পনা করবার চেষ্টা করছি, পারছি না। রূপহীন কিছু কল্পনা করা শক্ত। তাই সর্বদেশেই অরূপ ভগবানেরও নানা-রূপ সৃষ্টি করেছে মানুষ। মানুষ রূপের জগতে বাস করে। তার অবচেতনা সবই রূপময়।

তার যে দেহটাকে আমি চিনতাম তাকে পুড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু সেই দেহের স্মৃতিটা পোড়েনি। মনের মণিকোঠায় শতরূপে তা ঝলমল করছে। কিন্তু তার ভিতরে যে মন ছিল, সেই মনের যে রূপ ছিল, তার সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানি? সে আমার বহুদিনের সঙ্গিনী, সে আমার সমস্ত সংসারের গৃহিণী, সে আমার পুত্রকন্যাদের জননী ছিল। কিন্তু এসব ছাড়াও সে আর-একটা-কি ছিল যার প্রতি

মনোযোগ দিইনি আমি। দিইনি কারণ তা আমার সাংসারিক প্রয়োজনের বাইরের জিনিস ছিল। তা সৌরভের মত, রঙের মত, জ্যোতির মত, সুরের মত, যা সাংসারিক থোড়-বড়ি-খাড়ার বাইরে, যা মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরা যায় না। তার মনের এই রূপ আমি সবটা দেখিনি। যা দেখেছি তা আভাসে, কখনও বা অপ্রত্যাশিত বিস্ময়কর ঝলকে। হঠাৎ মনে হয়েছে এ লোককে আমি চিনি না। এ কে?

সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে উধাও হয়ে চলে যাওয়ার সাহস ছিল তার। চলেও গিয়েছিল একবার। হরিদ্বারে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে।

বাড়ির কারো সামান্য অসুখ করলে সে অস্থির হয়ে পড়ত, বিদেশ থেকে ছেলেদের চিঠি না এলে যার ঘুম হত না রাত্রে, সংসারের সামান্যতম ত্রুটিও যে সহ্য করতে পারত না—হঠাৎ সে সব ফেলে চলে গিয়েছিল, চলে যেতে পেরেছিল। বেলা এগারোটার সময় আমি যখন দু-তিন রকম মাছ কিনে নিয়ে বাড়িতে ঢুকলাম, তখন সে হঠাৎ বলে উঠল, আমি আর পারছি না, আমি চললাম। একটা পাতলা র‍্যাপার গায়ে দিয়ে একবস্ত্রে বাড়ি থেকে চলে গেল। ভাবলাম পাড়ার কারো বাড়িতে গেছে বোধহয়। ঘণ্টাখানেক কেটে গেল, ফিরল না। তখন মোটর নিয়ে বেরুলাম খুঁজতে। চেনা-শোনা সকলের বাড়িতেই খুঁজলাম। কোথাও নেই। আবাক কাণ্ড! কোথায় গেল! আর কাউকে খবর দিলাম না। অপেক্ষা করতে লাগলাম। জানতাম সে ফিরে আসবেই। ফিরে এসেছিল আট-দশ দিন পরে। গিয়েছিল হরিদ্বারে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে, বলেছিল আর সংসার ভালো লাগছে না, আপনাদের কাছেই থাকব। ছেলেবেলায় মায়ের কাছে ছিলাম। বাকী জীবনটাও তাঁর কাছে থাকব। আশ্রমের স্বামীজি অনেক বুঝিয়ে তাকে ফেরত পাঠিয়েছেন। সেই স্বামীজির কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তিনি তাকে যত্ন করেছিলেন। আসবার সময় একটি ভালো গরম কম্বলও দিয়েছিলেন পথে গায়ে দেবার জন্য। তখন শীতকাল। আসবার ভাড়াও দিয়েছিলেন। সবই ফেরত পাঠিয়েছিলাম স্বামীজিকে, কিন্তু তাঁর স্নেহের ঋণ আজও শোধ করা হয়নি। তাঁর সঙ্গে দেখাই হয়নি আমার।

লীলা হঠাৎ চলে গিয়েছিল, হঠাৎ আবার ফিরে এল। মনে মনে হয়তো একটু অপ্রস্তুত, বাইরে কিন্তু সপ্রতিভ। যেন কিছুই হয়নি, আবার লেগে পড়ল সংসারের কাজে।

আমি কিন্তু বুঝতে পারতাম সে মনে মনে লজ্জিত হয়ে আছে, বাইরে যদিও সপ্রতিভ থাকবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তার মনের অপ্রস্তুত ভাবটা বুঝতে পেরেছিলাম। বুঝতে পারিনি কেন সে এমন করলে।

'আপনি আপনার অবচেতনলোকে এর দুটো চমৎকার ছবিও এঁকেছিলেন, দেখবেন?'

আতরের গন্ধে ভরে উঠল চারিদিকে। খস্ না গোলাপ ঠিক বুঝতে পারলাম না।

'কে এলে? ইলোরা না অজন্তা?'

'আমরা দুজনেই এসেছি। আমাদের দুজনের কাছেই ছবি আছে।'

ঘরের ছবি মুছে গেল। ফুটে উঠল আর একটা ছবি। দিগন্তবিস্তৃত মাঠ একটা। তার উপর দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে বন্য হরিণী একটা। ছুটতে ছুটতে পালিয়ে গেল সেটা কিছু দূর। তারপর থমকে দাঁড়াল। এ ছবিটা মিলিয়ে গেল। তারপর ফুটে উঠল আর একটা ছবি। একেবারে অন্যরকম ছবি। একটা পাখি যেন সসঙ্কোচে এসে খাঁচায় ঢুকছে।

'এ দুটো ছবি আপনার অজ্ঞাতসারে এঁকেছিলেন আপনি। আমরা কুড়িয়ে রেখেছিলাম।'

'তার আর কি কি ছবি আছে তোমাদের কাছে? থাকে তো দেখাও না—'

'অনেক ছবি আছে, কিন্তু কোন ছবি কোথায় আছে তা আমাদের মনে থাকে না। আপনি যখন তার কথা ভাবেন তখন আপনার ভাববার ধাক্কায় আমাদের মনে পড়ে যায় কোন ছবি কোথায় আছে। কোন স্বপ্নের গহনে তাদের লুকিয়ে রেখেছি। এখন চলি, আবার আসব আমরা। আপনার ভাবনাই টেনে আনছে আমাদের।'

'আপনাদের পূর্বজন্মের বান্ধবীর সঙ্গে কি দেখা হয়েছে?'

'না, এখনও হয়নি। হয়ে যাবে একদিন। সে-ও তো আকাশলোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে মনোময় দেহ ধারণ করে। তাকে যে রূপে চিনতাম সে রূপে তো সে নেই এখন। আচ্ছা, চললাম আমরা।' আতরের গন্ধ মিলিয়ে গেল।

নিস্তব্ধ হয়ে তার ছবিটার দিকে চেয়ে বসেছিলাম। এখন ওই ছবির ভিতর দিয়েই তার নাগাল পাবার চেষ্টা করি।

হঠাৎ মনে হল ছবিটা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যদিও তার চোখের পাতা নড়ছে না, তবু মনে হল ওটা যেন নির্জীব কাগজ মাত্র নয়। মুখের মুচকি হাসিটা যেন একটু বেশি প্রখর হয়ে উঠেছে। চোখের দৃষ্টিতে ফুটেছে ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা। মনে হল সে যেন নীরব ভাষায় বলছে, 'এটা কি ঠিক হচ্ছে? আমাকে নিয়ে এত সব লিখছ কেন? একটু অশোভন হচ্ছে না? আমি তো তোমারই। আমার এত প্রশংসা করা কি আত্মপ্রশংসা নয়? তুমি তো চিরকাল আত্মবিজ্ঞাপনের বিরোধী। এ তুমি করছ কি? তার চেয়ে গল্প লেখো।'

আমিও নীরবে উত্তর দিলাম।

'এখন তুমি আমার সমস্ত মন জুড়ে বসে আছ। তোমার দেহ আমার চোখের সামনে নেই। তাই তোমাকে সৃষ্টি করতে চাই আবার। করতে চাই, কিন্তু কি করে করব জানি না। করবার চেষ্টা করছি। যদি পারি তাহলে তা তোমার ফটোগ্রাফ হবে না। তোমার পিঠে শিরদাঁড়ার দুপাশে যে দুটি তিল ছিল, তোমার ছোট ছোট পা দুটির যে অপরূপ গড়ন ছিল, তোমার মুখ-টেপা হাসির যে মাধুর্য ছিল, তোমাকে ঘিরে স্নেহ-ভালোবাসার যে অপূর্ব উদ্যান ছিল—সে সব থাকবে না আমার সৃষ্টিতে। তা অন্যরকম হবে, অথচ তুমি তাতে থাকবে—'

'আমার বড্ড লজ্জা করছে কিন্তু। আমি বাঙালি ঘরের অতি সাধারণ মেয়ে, তার বেশি কিছু নই।'

'তুমি আমার চোখে যে কি ছিলে তা তুমি জান না।'

এই নীরব আলাপ কিন্তু বেশিক্ষণ চলল না। ঝন ঝন করে কি যেন পড়ে গেল কোথায়। শিউরে উঠল চারিদিক। মনে হল একটা কাঁসার বাসন পড়ে গিয়ে ঝনৎকার তুলে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি পড়ে গেল?'

বান্দা এসে বলল, 'কই কিছু পড়েনি তো? তুমি বসে বসে স্বপ্ন দেখছ নাকি?'

বান্দা চলে গেল।

তাহলে কি শব্দটা আমার মনের ভেতর থেকে উঠল?

তার ছবি ঠিক তেমনি হাসছে। হাসির সঙ্গে মিশেছে একটু কৌতুক। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে

গেল। অনেকদিন আগে আমি খেতে খেতে রাগারাগি করে ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। কি একটা রান্না আমার মনোমতো হয়নি বলে। সেই শব্দটা এখনও বেঁচে আছে। সে যেন আমাকে মনে করিয়ে দিয়ে গেল—এখন যাকে নিয়ে এত কবিত্ব করছ, একদিন তাকে কত কষ্ট দিয়েছিলে। সে সেদিন কিছু খায়নি, মনে আছে? সব মনে আছে, এ-ও মনে আছে ইলিশমাছের সব পেটিগুলি সে আমাকেই দিয়েছিল, নিজে নিয়েছিল মুড়োটা। ঝালটা তেমন ওতরায় নি। কাঁচালঙ্কা কম দিয়েছিল ডাক্তারের বারণ অনুসারে। একজন হিতৈষী ডাক্তার তার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল ঝাল বেশি খেলে লিভার খারাপ হবে। তাকে বললাম— রান্না ভালো হয়নি। সব পেটিগুলো আমি খাব না, তুমি নাও। বারবার বলা সত্ত্বেও যখন নিল না—হঠাৎ ক্রোধান্ধ হয়ে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম থালাটা।

ছবির দিকে চেয়ে দেখলাম তেমনি মুচকি মুচকি হাসছে। অপরাধীর মত বসে আছি ছবিটার সামনে। সত্যিই তো কষ্ট দিয়েছি তাকে। আনন্দ দিতে পারিনি? একবারও না?...ঘরের ভিতর একটা ভোমরা ঢুকে গুনগুন করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। গুনগুন গুনগুন। মনে হল যেন বলছে, মনে নেই? মনে নেই? মনে নেই?

হঠাৎ মনে পড়ল।

আমার প্রথম চাকরি। মাইনে মাসে আশি টাকা। ছোট একটি ঘর ভাড়া করেছি। কিনেছি সাধারণ একটি চৌকি। দুটি টিনের চেয়ার, ছোট একটি কাঠের টেবিল। ও প্রথম আসছে তার নিজের সংসারে। ওর জন্যে কিনে রেখেছি একটি হাত-আয়না, একটা চিরুনি, একশিশি সুগন্ধি মাথার তেল, আর কয়েক গজ কালো ফিতে, চুল বাঁধবার জন্য। তাছাড়া পাউডার আর ক্রীম। এসব বিষয়ে আমার নিজের কোনও অভিজ্ঞতা নেই, দোকানদার যা ভালো বলে দিয়েছে তাই নিয়েছি। আশঙ্কা ছিল ওর পছন্দ হবে কিনা।

...ছোট আয়নাটি তুলে নিয়ে ওর মুখে যে হাসিটি ফুটেছিল তাতে ছিল অকৃত্রিম আনন্দ, লজ্জা আর গর্ব। আমার সমস্ত সংসার ওর হাতে তুলে দিয়ে যে অলিখিত দলিলটি ওকে দিয়েছিলাম তাতে-ও পড়েছিল সেই আনন্দের উজ্জ্বল আভা। তা আজও আমার সংসারে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সে নেই, কিন্তু তার সেই হাসির আভায় আমার সংসার ঝলমল করছে আজও।

ঝগড়াঝাটি হয়েছে, কিন্তু আনন্দের ফল্গু বয়েছে চিরকাল। তা কখনও লোক-দেখানো বন্যা-রূপ ধারণ করেনি। তা চিরকালই অন্তঃসলিলা। এখনও তাই। আশা আছে সেই অন্তঃসলিলা ফল্গু বেয়েই আমি তার কাছে পৌঁছব একদিন।...

হঠাৎ সব যেন হারিয়ে গেল আবার। কুয়াশায় ঢেকে গেল সব। কুয়াশার ভিতর থেকে উঠতে লাগল সেই আর্তরব— কোথা আছে সে? যদি দেখা হয় চিনতে পারব কি তাকে? তার যে রূপ আমার বুকে আঁকা আছে সে রূপ আছে কি তার? আমারও এ রূপ কি থাকবে? হয়তো দু'জন পাশাপাশি বসে থাকব কেউ কাউকে চিনতে পারব না। হয়তো চিরকালের মত হারিয়ে গেছে। কোথায়— কোথায়—?

'আমি তোমার পাশেই আছি।'

চমকে উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখলাম। কেউ নেই। তাহলে দরজার বাইরে থেকে কি কেউ বললে? উঠে গিয়ে কপাট খুলে দেখলাম। কেউ নেই। সামনে দেওয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি।

নিষ্পলক নেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ আমার দিকে চেয়ে আছেন। চোখের কোণে মৃদু কৌতুকের হাসি চিকমিক করছে। শ্রীরামকৃষ্ণকে বড় ভক্তি করত সে। শ্রীমাকেও। নিবেদিতা স্কুলে যখন পড়ত তখন মা বেঁচেছিলেন। ও খুব ছোট ছিল বলে মা ওকে নিজের ঘরে নিয়ে শুতেন। ও সকালে উঠে খাবে বলে ওর জন্য লুচি-সন্দেশ রেখে দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আর সারদা মা-র ছবি এখনও শোবার ঘরে টাঙানো আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির দিকে চেয়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হতে লাগল উনি আমায় কিছু বলবেন বুঝি। ছবিরা অনেক সময় নীরবে কথা কয়। সে সুযোগ কিন্তু হল না। বাধা পড়ল। নীচে ইলেকট্রিক বেলটা বেজে উঠল এবং একটু পরে আমার পূর্ব-পরিচিত হিতৈষী নরেনবাবু প্রবেশ করলেন।

প্রথমেই বললেন, 'আপনি আজকাল কোথাও বেরুচ্ছেন না। লিখছেনও না। তাই মনে হল আপনার খবরটা নিয়ে আসি। কেমন আছেন?'

'ভালোই আছি। কিছু করতে আর ভালো লাগে না। সে চলে গেছে। মনে হচ্ছে আমিও ফুরিয়ে গেছি।'

'আরে না, না, এসব চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন। জীবনে শোক-দুঃখ আসবেই, কিন্তু সেটাকে বরাবর আঁকড়ে সারাজীবন পড়ে থাকাটা সুস্থ মনের লক্ষণ নয়। ওটা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি ভালো নয়। ও একরকম মরবিডিটি। ঘা লেগেছে, ঘা সেরে যাবে, বড়জোর একটা দাগ থাকবে।'

আমি বললাম, 'আপনি যা বলছেন আমি তা জানি। যিনি শোক দেন তিনিই শোক ভুলিয়ে দেন, এসব কথাও শুনেছি। তার দেহটা যে এখন লক্ষ লক্ষ ইলেকট্রন, প্রোটন, পজিট্রন, নিউট্রনে পরিণত হয়েছে, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, সে কথাও আমার অবিদিত নেই। কিন্তু আমার মনে যে কি হচ্ছে তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। সেটা ঠিক শোক নয়। সেটা কেমন যেন একটা শূন্যতা, শূন্যতা ছাড়াও আরও কিছু ঠিক বোঝাতে পারব না। আমি শোকে হু হু করে কাঁদছি না। আমি সেই শূন্যতাটাকে পূর্ণ করতে চাইছি। কি করে করব জানি না—'

নরেনবাবু একটু সবিস্ময়ে চাইলেন আমার দিকে।

'আবার বিয়ে করবেন ভাবছেন? বেশি বয়সে অবশ্য অনেকেই বিয়ে করে। এই দেখুন না হরিশবাবু সত্তর বছর বয়সে—'

আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে বলে উঠলাম—'হরিশবাবু বড়লোক, তিনি একটা কেন তিনটে 'রাখনি' রাখতে পারে। ওসব কি বিয়ে? বিয়ে একবারই হয়। সব দেশেই বড়লোকেরা কামের তাড়নায় ওসব করেন। পশুদের সঙ্গে ওদের বেশি তফাত নেই। ওরা সারাজীবন জামা-কাপড় মোজা গেঞ্জির মতো বউও বদলায়। বিবাহ একটা পবিত্র জিনিস, যা অনেকের জীবনে একবারও হয় না। তা ভগবানের মতই একমেবাদ্বিতীয়ম্। আমি হয়তো আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না। কিন্তু আপনি জেনে রাখুন তার স্থান আর একটি নারী দিয়ে পূর্ণ হবে না।

নরেনবাবু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন একটু, বললেন, 'মাফ করবেন, আমি সাধারণ লোক, আপনাকেও সাধারণের পর্যায়ে ফেলেছিলাম। আপনি যা বললেন তা তো খুব উঁচুদরের কথা। ঠিকই বলছেন, প্রকৃত বিবাহ একবারই হয়। আপনি মুষড়ে পড়েছেন, কোথাও বেরচ্ছেন না, তাই আপনার খোঁজখবর করতে এসেছিলাম। আচ্ছা, নমস্কার চলি এখন।'

চলে গেলেন ভদ্রলোক।

তারপরই এল সীতারাম জেলে। সে এসেই আমার পায়ের উপর মাথা রেখে হু হু করে কাঁদতে লাগল। আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল না। কোনো কথা বলল না, খালি কাঁদতে লাগল।

দুজনে চুপ করে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। কেমন যেন তন্ময় হয়ে গেলাম। চোখ বুজে বসে রইলাম। সীতারামের শোক-সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ আমাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। একটু পরে চোখ খুলে দেখলাম—একা বসে আছি। সীতারাম নেই।

।। চার ।।

এতক্ষণ যা লিখলাম, তা গল্পের পটভূমিকা। যে গল্পটা বলব এবার, সেটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য গল্প মনে হবে না হয়তো এ যুগের বাস্তববাদী পাঠক-পাঠিকার কাছে। এটাকে গল্প না বলে ভ্রমণ-কাহিনী বললেও তাঁদের সন্তুষ্ট করতে পারতাম না ঠিক। কারণ রেলে মোটরে প্লেনে চড়িনি। কোনও যানেই চড়িনি আমি। হেঁটেও যাইনি কোথাও। তবু ভ্রমণ করেছি কোটি কোটি মাইল। স্বপ্নে কি! তাও তো জানি না। অজন্তা ইলোরা ছিল আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে। আতরের গন্ধে সেটা বুঝতে পারছিলাম। আর ছিল শীতল স্পর্শ। কে যেন আমার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কোনো হাত ছিল না, ছিল শুধু শীতল স্পর্শ। তার স্পর্শ।...

সবই হয়তো আমার কল্পনা। কিন্তু যা অনুভব করছি তাই লিখছি। সে চিরকাল আমার সব আকাঙক্ষা পূর্ণ করেছে, আমার নানা উদ্ভট খেয়ালকে রূপ দেবার জন্য অনেক দুঃখ পেয়েছে সে। 'তাকে আমি সৃষ্টি করব আবার'—আমার এই অসম্ভব বাসনা পূর্ণ করবার বুদ্ধি সে-ই দিয়েছিল আমাকে।

অনেক রাত হয়েছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়েছি। হঠাৎ ছাতের উপর চোখ পড়ল। নেটের মশারির ভিতর দিয়ে ছাত স্পষ্ট দেখা যায়। দেখলাম ছাতের উপর একটি মুখ যেন একদৃষ্টে চেয়ে আছে আমার দিকে। আমিও সবিস্ময়ে চেয়ে রইলাম। নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম। তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল মুখটা। তবু আমি চেয়ে রইলাম।

একটু পরে আবার ফুটে উঠল মুখটা। অবিকল তার মুখ। আবার মিলিয়ে গেল। একটু পরেই আবার ফুটে উঠল। আবার মিলিয়ে গেল। মনে হল ছবিটা যেন বার বার নিজেকে ফুটিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

শেষে মিলিয়ে গেল, আর ফুটল না। অনেকক্ষণ চেয়ে শুয়ে রইলাম, কিন্তু সে ছবি আর এল না। আলোটা জ্বেলে রাখলাম।

বিস্ময়, আগ্রহ,কৌতূহল, আকুলতায় কতক্ষণ যে বিনিদ্র ছিলাম জানি না। হঠাৎ কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সে-ই কি ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল? জানি না। শুধু জানি, স্বপ্নে সে সশরীরে দেখা দিয়েছিল। তার যেন সব অসুখ সেরে গেছে, মুখে সেই আগেকার মত হাসি।

বলল, 'তুমি অত ছটফট করছ কেন? পৃথিবীর কোটি কোটি লোক রোজ মরছে, আমিও মরেছি। তোমার কষ্ট হচ্ছে, আমারও হচ্ছে, কিন্তু এ অমোঘ নিয়ম সহ্য করতে হবে। একে তো ওলটানো যাবে না।'

'তুমি কেমন আছ, কোথায় আছ?'

'কোথায় আছি জানি না। কিন্তু ভালো আছি। দেহের কষ্ট আর নেই। কারণ দেহ তো নেই— যা দেখছ তা তোমার স্মৃতির ছবি। অনেক চেষ্টা করলে দেহের একটা আবছা রূপ ধরতে পারি। কিন্তু সেটা রাখতে পারি না। একটু পরেই সেটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়। আমি তোমার কাছে কাছেই আছি। অত কাতর হয়ো না।'

'তোমার আশেপাশে আর কেউ নেই?'

'অনেক বড় বড় লোক আছেন। দেহ কারো নেই। একজন বড় বিজ্ঞানীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তিনি বাঙালি। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের ছাত্র। বললেন, আমাদের দেহটা ইলেকট্রন, পজিট্রন, নিউট্রন প্রভৃতি বিদ্যুৎকণার বিবিধ সমন্বয়। মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের একত্র করে একটা নূতন সৃষ্টি করা সম্ভব। আমরা নানারকম নূতন ধাতু সৃষ্টি করেছি। সেই নতুন সৃষ্টির তপস্যাই করছি আমি। তুমি তো অহরহ চিন্তা করছ আমাকে নূতন করে সৃষ্টি করবে। তাঁকে বলেছিলাম তোমার কথা। তিনি বললেন—তা সম্ভব।'

'সম্ভব? মহাশূন্যে কি ল্যাবরেটরি আছে নাকি! ল্যাবরেটরি না থাকলে তো বিজ্ঞানীরা কিছু করতে পারেন না। মনোলোকে বস্তু থাকবে কি করে?'

'আমি জানি না। তাঁকে জিগ্যেস করব।'

সে মিলিয়ে গেল।

তারপরই হাজির হল অজন্তা আর ইলোরা।

ইলোরা বললে, 'আপনি সেই গ্রীক উপকথাটা জানেন না? এক গ্রীক ভাস্কর তার নিজের তৈরি পাথরের মূর্তিকে ভালোবেসে ফেলেছিল। আর সেই ভালোবাসার জোরে দেবতা এসে সেই প্রস্তর-প্রতিমাকে মানবী করে দিয়েছিল। এর জন্যে কোনও ল্যাবরেটরির দরকার হয়নি।'

অজন্তা বলল, 'দস্যু রত্নাকরকে কবি বাল্মিকী করেছিল কোন ল্যাবরেটরি?'

বললাম, 'ওসব তো কবি-কল্পনা।'

'কল্পনাই তো বাস্তবে রূপ নেয়। বিজ্ঞানীরা প্রথমে কল্পনাই করেন, তারপর সেটাকে বাস্তবে রূপ দেন। মানুষ আগে কল্পনায় আকাশে উড়েছিল। তারপর বাস্তবে আকাশে উড়েছে। যাঁরা মর্ত্যের বিজ্ঞানী তাঁরা বস্তু নিয়ে কারবার করেন, মর্ত্যের বিজ্ঞানীরা—যাঁরা মনোলোকে বাস করেন—তাঁদের বস্তুর দরকার না-ও হতে পারে। ভালোবাসা, ভক্তি, আগ্রহ, ধ্যান এদের ক্ষমতা কি কম? দেখুনই না, তিনি কি করতে পারেন। আমরা কিন্তু এখন আপনার কাছে এসেছি দুটো ছবি নিয়ে। আপনাদেরই ছবি, কিন্তু আপনার মনে নেই। এই দেখুন—'

দেখলাম সে আর আমি মাঠে বেড়াচ্ছি। মাঠ নির্জন। হু হু করে হাওয়া বইছে। তার মাথার কাপড় গায়ের শাড়ি বিস্রস্ত হয়ে যাচ্ছে বার বার। হঠাৎ সে চোখে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কি হল?'

'বাঁ চোখে কি একটা পড়ল।'

'মুখটা তোল। দেখি—'

তার ডান চোখটার চেয়ে বাঁ চোখটা একটু ছোট ছিল। ওই চোখটাকেই বেশি ভালোবাসতাম আমি। সে মুখ উঁচু করে দাঁড়াল। আমি তার চোখের নীচের পাতাটা উপরের পাতার নীচে ঢুকিয়ে আবার বার করে নিলাম। বালিটা বেরিয়ে গেল।

'আর কর কর করছে?'

'না।'

তখন আমি তাকে জড়িয়ে তার বাঁ চোখে চুমু দিলাম একটা। সে হাত দিয়ে আমাকে ঠেলে দিলে। কিন্তু তার মুখে যে লজ্জার অরুণিমা ফুটে উঠল তার তুলনা নেই। আধ-ফুটন্ত লা ফ্রান্স গোলাপটার কথা মনে হয়েছিল। আর মনে হয়েছিল শিল্পী অরবিন্দ দত্তের আঁকা উত্তরা-অভিমন্যু ছবিটা।

ইলোরা বললে, 'ওই ছবিটা আপনার মনের বিস্মৃতি-লোকে পড়েছিল, আমি কুড়িয়ে রেখেছি।'

অজন্তা বলল, 'আমিও রেখেছি একটা। এই দেখুন—'

দেখলাম।

লছমনঝোলার ঘাটে উদাস হয়ে বসে আছে সে, আকাশের দিকে চেয়ে। যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। অজন্তা বলল, 'আপনার মনে হয়েছিল—কে এ? এ উন্মনাকে তো চিনি না—'

সত্যিই তাই মনে হয়েছিল। লছমনঝোলার ধ্রুবঘাটে একটা উঁচু পাথরের উপর নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল সে। মনে হচ্ছিল তার অন্তর বুঝি ভূমাকে স্পর্শ করতে চাইছে। অনেক অনেক দূরে চলে গেছে তার মন।

অজন্তা আবার বলল, 'আপনি এক মুক্তপক্ষ আকাশচারী পাখিকে দেখছিলেন। সে কথা আজ আপনার মনে নেই। আমি এ ছবিটি কুড়িয়ে রেখেছি—'

ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, বেশ বেলা হয়ে গেছে। পাশ ফিরতেই তার ফটোটা চোখে পড়ল। মুচকি মুচকি হাসছে। উঠে বাইরে গেলাম। দেখলাম ছাতে টবে তার প্রিয় গোলাপ 'কন্‌ফিডেন্স' ফুটেছে। তার মুখেও মুচকি হাসি।

তারপর সমস্ত বিশ্ব যেন আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একদল কাক ডাকতে লাগল। হর্ন দিতে দিতে বেরিয়ে গেল একটা মোটর। জিন্দাবাদ দিতে দিতে বেরিয়ে গেল একটা মিছিল।

বান্দা এসে খবর দিলে বাইরের ঘরে কয়েকজন লোক এসে অপেক্ষা করছে দেখা করবে বলে। বিন্দি নীচে খাবার ঘরে আমার জন্যে খাবার ঠিক করছে, আমি যেন খেয়ে তবে বাইরের ঘরে যাই।

বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছিলেন ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার। একজন সহকারী সম্পাদক এসেছেন লেখা নিতে। ইন্টারভিউ নেবার জন্যে এসেছেন এক সংবাদপত্রের রিপোর্টার। তিনটি যুবক এসেছে তাদের পাড়ার সংস্কৃতি-সভায় প্রধান অতিথি হতে হবে। গেটের বাইরে দুটো কুকুর ঝগড়া করছে আর একজন ভিখারী গান গাইছে হার্মোনিয়াম বাজিয়ে। তারপর ভীষণ গর্জন করে দাঁড়াল একটা ট্রাক। তাতে ইঁট বোঝাই। কাছেই বাড়ি করছেন এক ভদ্রলোক।

সে হারিয়ে গেল।

যে সমাজকে আমি সারাজীবন দেখেছি অথচ চিনি না, সেই সমাজের মুখোমুখি বসলাম আবার।

একটু পরেই দেখলাম সে হারিয়ে যায়নি। আমারই আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না তাকে, আমি কিন্তু অনুভব করছি সে আমার পাশে বা পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ঠিক দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু অনুভব করছি তার অস্তিত্ব। হঠাৎ মনে হল যে হয়তো সে কখনও আমাকে ছেড়ে দূরে চলে যায়নি। সর্বদাই আমার আশেপাশে আছে। আমি কখনও বুঝতে পারি, কখনও পারি

না। আমার অনুভূতি যখন স্থূল বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত থাকে তখন সে হারিয়ে যায়। সে এমন স্থূল দেহ নয় সূক্ষ্ম স্বপ্ন। তবু সর্বদা আমার কাছে কাছে আছে সে। সে আছে—সে আছে—সে আছে—সর্বদাই আছে—এটা মনে হওয়া মাত্র সমস্ত চেতনাটা যেন উথলে উঠল। দু'হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম মনে মনে। কিন্তু সে এল না। আমার বাহুবন্ধনে ধরা প'ড়ল না।

একা ঘরে তার ছবিটার দিকে চেয়ে বসেছিলাম। এটা তার যৌবনের ছবি। ও ছবিতে যে মূর্তি আঁকা আছে তা তো আমার চোখের সামনেই ধীরে ধীরে মরে গেছে। পাশেই আর একটা যে ছবি আছে সেটা যে ওই তন্বী যুবতীরই ছবি তা না বলে দিলে কি বিশ্বাস হয়? এ ছবিটাও সুন্দর। তন্বী যুবতী নয়, ঈষৎ স্থূলাঙ্গিনী মাতৃমূর্তি। দুই-ই এক, অথচ এক নয়। তার এর পরের যে ছবিটা আছে, তা বৃদ্ধার ছবি। চোখের আশেপাশে বলিরেখা পড়েছে।

চোখের দৃষ্টিতে সে উজ্জ্বলতা, সে কমনীয়তা নেই। কিন্তু তার শেষ ছবিটার ফটো নেই। গাল তুবড়ে গেছে, মুখের চারপাশে বলিরেখা। সমস্ত দেহটা যেন শুকিয়ে গেছে, কথা বলতে পারছে না, কেবল কাঁদছে, নীরবে কেঁদে যাচ্ছে কেবল। সে বুঝতে পেরেছিল এই তার শেষ ব্যাধি। এ রোগ আর সারবে না। এবার সবাইকে ছেড়ে যেতে হবে। বুক ভেঙে যাচ্ছিল তার। তারপর যখন সব শেষ হয়ে গেল তখন তার মুখের কি প্রসন্ন ভাব। হঠাৎ যেন কমে গেল তার বয়সটা। তার যৌবনের সেই মুখশ্রী আবার যেন ফিরে এল। শুভদৃষ্টির সময় তার যে মুখ দেখেছিলাম—এ যেন সেই মুখ। আর কি পবিত্র ভাব সে মুখে! সে কি তার সারদা মা-কে দেখতে পেয়েছিল? তার চেহারার কথাই ভাবছি। তার সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ বছর একসঙ্গে ছিলাম। আশ্চর্য হচ্ছি তার সব চেহারা আমার মনে নেই। আমার প্রথম সন্তান যখন হয়েছিল তখন কেমন চেহারা ছিল তার? মনে নেই। তখন ফটো তোলানো হয়নি। তাই সে চেহারাটা হারিয়ে গেছে। এর অনেক বছর পরে আমার ছোটছেলের বয়স তেরো-চৌদ্দ বছর তখন আমার এক বন্ধু তার একটা ফটো তুলেছিল। সে ছবিতে তার চোখের দৃষ্টি অদ্ভুত। উদাসীন দৃষ্টি মেলে কোন সুদুরের দিকে যেন চেয়ে আছে। এই দৃষ্টিই বহুদিন পূর্বে দেখেছিলাম ধ্রুবঘাটে।

...তার চেহারার কথাই ভাবছি অনবরত, যে চেহারা সতত পরিবর্তনশীল, যে চেহারা ভঙ্গুর, অথচ যে চেহারা ছাড়া আমার মনের অবলম্বন আর কিছু নেই। তার মনের চেহারার পূর্ণ পরিচয় জানি না হঠাৎ পেয়ে গেলাম সেটা। হঠাৎ আমার ঘরের সামনের দেওয়ালে ফুটে উঠল—ঝুনু, জিম্টু, জুলু, ভুটান, জাম্বু, বাচ্চা, রকেট—আমার কুকুরগুলোর ছবি। আমার দিকে চেয়ে সবাই লেজ নাড়তে লাগল ধীরে ধীরে—যেন আমাকে বলতে লাগল, তুমি দেখনি তার মনের চেহারা? আমরা দেখছি।... তাদের ছবি মিলিয়ে গেল। ফুটে উঠল সুরভি, পিঙ্গলা, মঙ্গলা, কাজলী, লালীর ছবি। আমার গাইগুলো। সমস্বরে হাম্বা-রব করে ওর জানিয়ে দিল আমাকে— 'মাকে আমরা তো চিনতাম, তুমি চিনতে না? আশ্চর্য?'

তারপর কলরব করে উড়ে এল একপাল মুরগী, হাঁস আর দুটো গিনি-ফাউল। তাদের পিছনে পিছনে ভেড়াটা, তার পিছনে পিছনে কয়েকটা খরগোশ আর গিনিপিগ। গিনি-ফাউলটা কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করে সকলের মুখপাত্র হয়ে জানিয়ে দিলে—'আমাদের মাকে আমরা চিনতাম। মা-ও চিনত আমাদের। তুমি তো নিজেকে নিয়েই থাকতে, মাকে চেনবার চেষ্টা করেছিলে কখনও?'

মিলিয়ে গেল ওরা। তারপর এল দাইয়ের নানা বয়সের নাতি-নাতনীরা, আর পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা। তারা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল আমার দিকে। তারা যেন আমার পাশে মাঈজিকে না দেখে অবাক হয়ে গেছে।

সে ওদের সকলের মা ছিল, অনেক আবদার শুনত, অনেক ঝঞ্ঝাট পোয়াতো ওদের জন্য। ওরা ওর মনের চেহারা চিনত। ওদের ছবিও মিলিয়ে গেল। তারপর এলেন ওয়াই চৌধুরী। আমার একজন পাঞ্জাবী বন্ধু। হাতে এক বালতি দুধ। এসে প্রশ্ন করলেন, 'মাতাজি ভালো আছেন তো?'

'তোমার হাতে এক বালতি দুধ কেন?'

'মাতাজির জন্যে এনেছি। তিনি একবার চমৎকার পায়েস খাইয়েছিলেন আমাকে। আবার তাঁর হাতের পায়েস খাব।'

'তোমার মাতাজি আর নেই চৌধুরী। তিনি চলে গেছেন।'

বিস্ফারিত চক্ষে সে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপর টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। ওয়াই. চৌধুরীর সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি। অনেকদিন তার কোনও খবর পাইনি। ও বেঁচে আছে কি না, তা-ও জানি না। ও এখন এল কেন? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে ওই বিরাটদেহ পাঞ্জাবী পুত্র তার। তার মাতাজিকে সত্যিই মায়ের মতো ভক্তি করত সে। ধীরে ধীরে সে-ও মিলিয়ে গেল। আমার কুকুর, গরু, মুরগি ও হাঁসের দল, ভেড়া, খরগোশ, গিনিপিগ কেউ আর বেঁচে নেই। দাইয়ের নাতি-নাতনীরাও অনেকে বেঁচে নেই। কিছুদিন আগেই রুকমিনিয়ার মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছি। তাহলে কি ওয়াই. চৌধুরীও বেঁচে নেই? যাদের দেখলাম তারা কি প্রেতাত্মা? তারা কি আমাকে বুঝিয়ে দিতে এসেছিল তার মনের চেহারাটা কি রকম ছিল? এরা সবাই এল, সে কেন এল না? সে কোথায়?

আবার আমার সমস্ত মন কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তার ভিতর থেকে কে যেন আর্তনাদ করতে লাগল—আমার সমস্ত অন্তরাত্মাকে মথিত করে কার আকুল রোদনে যেন ছেয়ে গেল চারিদিকে—কোথায় আছ, কোথায় আছ, কোথায় আছ তুমি—!

চোখ বুজে বসে রইলাম। বসে বসে শুনতে লাগলাম সেই নিদারুণ ক্রন্দন। সেই হাহাকারের আবর্তে যখন আমি তলিয়ে গেছি তখন হঠাৎ থেমে গেল সব। আমার মনের চারদিকে কে যেন একটা ঢাকনা পরিয়ে দিলে। স্তব্ধ হয়ে গেল সমস্ত আর্তনাদ। মনে হল আমার মনকে কে যেন জড়িয়ে ধরেছে। ক্রন্দনরত শিশুকে মা যেমন জড়িয়ে ধরে, তেমনি করে, আমার মনে হল—কেন মনে হল জানি না—কিন্তু মনে হল, সে এসেছে। সে, যে এখন দেহ-হীন, কিন্তু মনোময়।

।। পাঁচ ।।

সেদিনে রাত্রে স্বপ্নে আবার দেখলাম তাকে। দেখলাম তার প্রথম যৌবনের চেহারায়, যখন তার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল, যখন সে বিজন দস্তিদারের কাছে গান শিখত। তার যে ছবিটা আমার কাছে টাঙানো আছে, তাতে সে পরে আছে একখানা ঢাকাই শাড়ি। স্বপ্নে দেখলাম সে পরেছে অপরূপ একখানা নীলাম্বরী শাড়ি। চমৎকার রুপোলি পাড় আর সর্বাঙ্গে ছোট ছোট রুপোলি বুটি। মনে হল যেন এক-টুকরো নক্ষত্র-খচিত আকাশ গায়ে দিয়ে এসেছে সে। মৃদু হেসে নীরবে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল আমার দিকে।

তারপর বলল, 'আমি যে আর বাঁচব না, এ তুমি অনেক আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলে। আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য আমার পাশে শুয়ে যে গানগুলি মুখে মুখে তৈরি করে গাইতে আমি তার থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম, তুমি আমার আশা ছেড়ে দিয়েছ, আমিও বুঝেছিলাম আমি আর বাঁচব না। তোমার গানগুলি কিন্তু আমার বড় ভালো লাগত। সেগুলো আমি ভুলি নি।'

'তাই নাকি?'

'গেয়ে শুনিয়ে দেব?'

অনবদ্য সুরে সে গুন গুন করে গাইতে লাগল।

ভালো হবে, হবে ভালো
রাত পোহাবে আঁধার যাবে
আসবে আলো আসবে আলো।
অন্ধকারেও যাহার ভুবন আলোয় ভরা।
জ্বলছে কোটি সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা
সেহ ভুবনে কেমন করে
চিরটা কাল থাকবে কালো
আসবে আলো, আসবে আলো।
বীণা তোমার উঠবে বেজে
আসবে সে যে আসবে সে যে
তাহার লাগি আসন পাতো
তাহার লাগি মালা গাঁথো
তাহার লাগি প্রদীপ জ্বালো
আসবে আলো, আসবে আলো।

একটা সুরলোক মূর্ত হয়ে উঠল আমার চারপাশে। গানটা যখন শেষ হয়ে গেল তখনও আমি অভিভূত হয়ে বসে রইলাম।

সে বলল 'সত্যিই রাত পুইয়েছে, আলো এসেছে। তা সূর্যের আলো নয়, তা অদ্ভুত রকম স্নিগ্ধ আলো। আমি খুব ভালো আছি। তবু তোমাদের জন্য মন কেমন করে। তোমাদের কথা ভুলতে পারি না। তোমার গানগুলো সত্যিই বড় ভালো লেগেছিল আমার। একটাও ভুলিনি। মাঝে মাঝে স্বপ্নে এসে শুনিয়ে যাব তোমাকে। আজ কিন্তু তোমায় একটা দরকারী কথা বলতে এসেছি। সেই বিজ্ঞানীর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল আমার। যিনি বলেছিলেন ইলেকট্রন্ প্রোটন নিউট্রন—এইসব দিয়ে আবার নতুন সৃষ্টি করা সম্ভব। তুমি অহরহ ভাবছ আমাকে নূতন করে সৃষ্টি করবে। তোমার এই পাগলামির কথা বলেছিলাম তাঁকে। তিনি বললেন, সৃষ্টি করা সম্ভব। আপনার স্বামী যদি আমার কাছে এসে আপনার বর্ণনা করতে পারেন তাহলে আমিই সৃষ্টি করে ফেলতে পারি আপনাকে। আপনার দেহ তো আমি দেখিনি, দেখছি মনোময় রূপ। আপনার দেহের বর্ণনা আপনার চরিত্রের বর্ণনা, এগুলো চাই। আমি আজকাল ধ্রুবলোকে বসে ব্রহ্মার তপস্যা করি। তিনিই সৃষ্টি-কর্তা। তিনিই সৃষ্টির প্রেরণা দেন। আশা করি আপনার স্বামীর বাসনা আমি চরিতার্থ করতে পারব। কিন্তু তাঁকে আসতে হবে আমার কাছে। তাঁকে মানে, তাঁর মনকে—'

বিস্মিত হয়ে গেলাম।

বললাম, 'আমার মনকে তুমি নিয়ে যাবে কেমন করে?'

'তোমার মন তো সর্বদাই আমার কাছে রয়েছে। আমিও তোমার কাছে সর্বদাই আছি। আমার দেহ নেই বলে আমাকে দেখতে পাও না। আমিও দেখতে পাই না তোমাকে, কারণ চোখ তো নেই। কিন্তু আর একটা নূতন ধরনের চোখ পেয়েছি, সেটা অনুভূতির চোখ, সেটা দিয়ে অনুভব করি। দেহটাই প্রধান বাধা—তাই তুমি আমার সান্নিধ্য অনুভবও করতে পার না। ওই স্থূল দেহটা থেকে তুমি যদি বেরিয়ে আসতে পার তাহলে আমি নিয়ে যেতে পারব তোমাকে সেই বিজ্ঞানীর কাছে। তুমি সত্যি যদি আমার সঙ্গে যেতে চাও, তোমাকে বেরিয়ে আসতে হবে দেহ থেকে। চেষ্টা করলেই দেহ থেকে বেরিয়ে আসা যায়।'

'যায়? কি করে চেষ্টা করব?'

'প্রবল ভাবে ইচ্ছা করতে হবে। মানুষের প্রবল ইচ্ছায় সবই সম্ভব। তুমি চেষ্টা কর, নিশ্চয় পারবে?'

'যদি পারি, বুঝব কি করে যে পারলাম—'

'আমি তখনই তোমায় স্পর্শ করব। তুমি বুঝতে পারবে, আমি তোমার হাত ধরেছি—'

'কিন্তু তোমার তো দেহ নেই।'

'মনোময় দেহ একটা আছে। সে দেহ দিয়ে আর একটা মনোময় দেহকে স্পর্শ করা যাবে।'

'যাবে?'

'হ্যাঁ তুমি চেষ্টা কর। বইয়ে পড়নি মুনি-ঋষিরা দেহ থেকে বেরিয়ে গিয়ে কত জায়গা ঘুরে আসতেন? জ্যাক লন্ডনের 'জ্যাকেট' বইটার কথা মনে নেই? তাতেও একজন বন্দি জেল থেকে রোজ ওইভাবে বেরিয়ে যেতেন। পড়ে থাকত তাঁর অচেতন দেহটা। তুমিও পারবে, চেষ্টা কর।'

ফোনটা বেজে উঠল।

ঘুম ভেঙে গেল।

'হ্যালো— কে—,

'আমি অবনী। অনেকদিন আগে আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। চিনতে পারছেন?

'না, ঠিক মনে পড়ছে না।'

'আমি লন্ডনে ছিলাম অনেকদিন। কিন্তু তার আগে আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম আপনার সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে। সে আলোচনার কথা মনে নেই। কিন্তু একটি জিনিস আমি ভুলিনি। ভুলিনি বৌদিকে, ভুলিনি তাঁর আন্তরিক সেবা যত্ন, ভুলিনি তাঁর হাতের রান্না। কেমন আছেন তিনি?'

'তিনি নেই। কয়েক মাস আগে মারা গেছেন।'

'সে কি! ভেবেছিলাম আজ একবার গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে আসব।'

'আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন?'

'পাটনা থেকে। দেখি যদি ছুটি পাই যাব একবার আপনার কাছে। তাঁর ছবিকে প্রণাম করে আসব। নমস্কার।—'

ফোনটা হঠাৎ ছেড়ে দিলেন তিনি। কে এই অবনী ঘোষ? মনে করতে পারলাম না। আমার স্মৃতিশক্তি কমে গেছে আজকাল। সে যদি থাকত মনে করিয়ে দিত। সব মনে থাকত তার। অবনী ঘোষও হারিয়ে গেছে।

ইচ্ছে হল আবার শুয়ে পড়ি। আবার স্বপ্নে যদি সে আসে। শুয়ে পড়লাম। চোখ বুজে রইলাম অনেকক্ষণ। কিন্তু আর ঘুম এল না। মনে নামল আবার সেই কুয়াশা। আর কুয়াশার ভিতর থেকে উঠতে লাগল সেই আকুল প্রশ্ন—কোথা আছ তুমি, কোথা আছ তুমি, কত দূরে—কত দূরে—

সত্যি যেতে পারব কি তোমার কাছে? সত্যি পারব? না, স্তোক দিয়ে গেলে শুধু—

বান্দা এসে বলল, 'বাইরে দুজন লোক বসে আছে। আমি বললাম এখন ঘুমুচ্ছেন দেখা হবে না। ওরা বলল, আমরা অপেক্ষা করব—'

বান্দা চলে গেল।

বাইরে গেলাম। দেখলাম একজন তরুণ লেখক একটি মোটা খাতা নিয়ে বসে আছেন। আমাকে তাঁর লেখা কবিতা শোনাতে চান। আর একজন এসেছেন এক সংস্কৃতি-সভার নিমন্ত্রণ জানাতে। তারপর আমার লেখার প্রুফ নিয়ে এল একজন। মিউনিসিপালিটির ট্যাক্স কালেকটার এলেন। পিওন এল, বিন্দি এসে বলল বাজারে সরষের তেল পাওয়া যাচ্ছে না, গর্জন করতে করতে ট্রাক চলে গেল একটা। যে পৃথিবীতে সে নেই, সেই পৃথিবী আবার ঘিরে ধরল আমাকে।

।। ছয় ।।

সারাদিন অনুভব করতাম সে আমার আশেপাশে ঘুরছে। অনেক লোকের ভীড়ের মধ্যেও অনুভব করতাম সে আমার কাছেই যেন দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো এটা আমার কল্পনা। ভীড়ের মধ্যে তার নীরব ভাষা আমার মনে পৌঁছত না। পৌঁছত যখন একা থাকতাম।

সেদিন ছাতে একা আমার লেখার টেবিলের সামনে চুপ করে বসেছিলাম। মনে হচ্ছিল সে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

'আমি মরে যাওয়ার পর তুমি নাকি অনেক কবিতা লিখেছ? শোনাও না আমাকে—'

সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। টেবিলের ড্রয়ার থেকে কবিতার খাতা বের করে পড়তে লাগলাম।

তুমি চলে গেছ।
অনেকের মৃত্যু নিয়ে
অনেক কবিতা লিখেছি
তোমার মৃত্যু নিয়ে পারব কি?
দীর্ঘ জীবনের সঙ্গিনী আমার,
তোমার মধ্যে এতদিন ডুবে ছিলাম,
তোমাকে সর্বাঙ্গ দিয়ে
সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে
উপভোগ করেছি,
তোমাকে চিনতে পারিনি।
তুমি আমার সব ছিলে
সর্বস্ব ছিলে

তবু পারিনি।
তুমি-ময় হয়েছিলাম
তাই পারিনি বোধ হয়।
চিনতে হলে
যে দূরত্ব থাকা দরকার
তা ছিল না।

এখন তুমি নেই,
এখন মনে হচ্ছে
অপূর্ব একটি মালা ছিলে তুমি,
রত্নের মালা।
প্রত্যেকটি রত্ন আলাদা জাতের।
ভালোবাসা, কলহ,
মান-অভিমান,
আশা, আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা,
ধর্ম, ভগবান
পুত্র-কন্যা নাতি-নাতনী
আত্মীয় পরিজন
প্রসাধন, রন্ধন, শিশু-বোধ
আত্ম-মর্যাদা
বিরাট-মালার
প্রতিটি রত্ন বিভিন্ন।
কেউ হীরে, কেউ পান্না, কেউ চুনী,
কেউ মুক্তো, কেউ বৈদূর্য,
কেউ নীলকান্ত,
আরও কত যে—নাম জানি না।
যে সুতো দিয়ে
এ মালা গাঁথা ছিল
তার স্বরূপ জানতাম না।
সবাই যখন তোমায়
চিতায় তুলে দিলে
বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল রত্নগুলো
দেখতে পেলাম সুতোটা।
সামান্য সুতো নয়
তা আলোর রেখা

জ্যোতির্ময় প্রাণ-তন্ত্রী তোমার
মিলিয়ে গেল সেটা চিতার শিখায়
চলে গেল আকাশে
সূর্য-তারার দেশে।
নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধতায় বসে এই সব লিখছি।
গান থেমে গেছে।
গানের রেশ কানে বাজছে এখনও
মনে হচ্ছে আর পাব না তোমাকে
গানের রেশও থেমে যাবে একটু পরে।
এমন সময় কানের কাছে কে যেন বলে উঠল—
'বুঝলে—'
ইচ্ছে হল চীৎকার করে বলি
বুঝেছি—বুঝেছি—সব বুঝেছি—
কিন্তু বলতে পারলাম না কিছু।
মহাকালের সামনে নির্বাক হয়ে রইলাম।

কবিতাটি পড়ে চুপ করে বসে রইলাম কয়েক মুহূর্ত। একটু পরেই শোনা গেল তার ভাষাহীন সমালোচনা।

'কবিতা ভালোই হয়েছে। কিন্তু আমার সম্বন্ধে একটু বাড়াবাড়ি করেছ। তাছাড়া তোমার নিজের দুঃখের কথাই লিখেছ, আমি যে ওই করাল রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছি সে কথা তো কিছু লেখোনি। নিজের চোখেই তো দেখেছ সব। আরও কবিতা লিখেছ নাকি—'

'অনেক লিখেছি।'

'আরও শোনাও দু-একটা।'

খাতার পাতা ওলটাতে লাগলাম। দেখলাম প্রতিদিনই একটা লিখেছি।

'আমার মৃত্যুর ক'দিন পরে লিখেছিলে কবিতাটা?'

'তিনদিন পরে। তারপর প্রতিদিনই প্রায় লিখেছি—'

'একমাস পরে যে কবিতাটা লিখেছিলে সেটা পড় তো।'

'সেটা শুনতে চাইছ কেন?'

'দেখি একমাস পরে তোমার মনটা শান্ত হয়েছে কি না—'

পড়লাম।

বিসর্জনের বাজনা আজ
বাজছে বাতাসে
আজকে তুমি চলে গেছ
আজকে সাতাশে
জাদুকরি, কত কিছু
আমায় দেখালে।

জীবনটা যে মধুর কত
আমায় শেখালে।
অবশেষে চিতার পরে
বাজি পোড়ালে
নীল আকাশের রাঙা মেঘে
ওড়না ওড়ালে।

'জাদুকরী আমি নই, জাদুকর তুমি। আমার মত সামান্য একটা মেয়েকে নিয়ে কি কাণ্ডই যে করছ! শোক মানুষের আর কতদিন থাকে—'

'আমার শোক শেষ হবে না। শেষ হতে দেব না। প্রতিমুহূর্তে মনে করব তুমি নেই, তুমি নেই। শোক না থাকলে আমি তোমায় ভুলে যাব। এ নিয়েও কবিতা লিখেছি একটা—'

'পড় তো—'

আসছে চিঠি গাদা গাদা—
আসছে নানা লোক
বলছে সবাই নানা সুরে
শোক শান্ত হোক।
শোক করার মাঝে কিন্তু
আছে আনন্দ
চিত্ত ভরি সঞ্চারিছে—
সেই সুগন্ধ।
যে গন্ধ কোথাও নেই।
এই বিশ্বে আর
শোকের অন্ধকারে যার
গোপন অভিসার।
যত দিন শোক আছে
করছি তাকে স্মরণ
শোক ফুরুলেই সব শেষ
সত্যি তখন মরণ।
সত্যি তখন হবে সেই
দারুণ পরিণাম
যেদিন তুমি হয়ে যাবে
একটি শুধু নাম।
নামও শেষে ভুলে যাবে
ভাবী বংশধর
স্তরের উপর স্তর পড়বে
বিস্মৃতির স্তর।

ওগো, বন্ধু লোক
বল বল শোক তব
চিরস্থায়ী হোক্।

হঠাৎ অনুভব করলাম অতি শীতল কি যেন আমায় জড়িয়ে ধরল। আমি চেয়ার থেকে উঠে পড়লাম।

'ভয় পাচ্ছ নাকি? আমার দেহ নেই, তবু আমার মন নিয়ে তোমাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হল। তুমি কিছু বুঝতে পারলে?'

'মনে হল খুব ঠাণ্ডা কি একটা যেন জড়িয়ে ধরল আমাকে—'

'আমার মন বরফের মতো হয়ে গেছে।'

'কেন—'

'আমার মনে হয়—শোকে। আমার দেহ নেই, চোখের জল ফেলতে পারি না, বুক চাপড়াতে পারি না, তোমার মত কবিতা লিখতে পারি না। নিদারুণ শোকে আমি ঠাণ্ডা হয়ে গেছি। তোমাদের আর কখনও কাছে পাব না, তোমাদের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক থাকবে না, এই চিন্তা আমার মনের উত্তাপ হরণ করেছে। তুমি যদি তোমার মনকে দেহ থেকে বার করতে পার, তাহলে আবার আকাশলোকে মিলন হবে আমাদের। আমি বড় আশা করে আছি। তুমি চেষ্টা করছ?'

'করছি। কিন্তু কিছু হচ্ছে না।'

'হবে। চেষ্টা করতে করতেই হবে।'

আকাশে মেঘ করেছিল। বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি খাতা নিয়ে ঘরের ভিতর চলে গেলাম।

সে এল কি?

'তুমি এসেছ? তোমার ওই বিছানায় বস না—'

কোনও সাড়া পেলাম না।

খুব জোরে বৃষ্টি এল বাইরে। মনে হল ওকি ছাতে দাঁড়িয়ে ভিজছে? সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল ভুলটা। ওর তো দেহ নেই। মন তো বৃষ্টিতে ভেজে না। মন তো চিতার আগুনে পোড়েনি। তবু কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলাম ছাতের দিকে। তারপরই চোখে পড়ল ওর ছবিটা। মুচকি মুচকি হাসছে। চোখে সেই স্নেহভরা দৃষ্টি। জীবন্ত নয়, স্থির। চোখের পলক পড়ছে না। নিষ্প্রাণ ছবি শুধু। তবু ওই নিষ্প্রাণ ছবিতে কি যে জাদু আছে জানি না, চোখের দৃষ্টি ফেরাতে পারলাম না সেদিক থেকে। মনে হল ওটা শুধু ক্যামেরার কৃতিত্ব নয়, ওতে যেন আরও কি একটা আছে। সে নেই? কোথাও নেই? এতক্ষণ যা করলাম তা কি শুধু কল্পনা-বিলাস? সে এসে আমার কবিতা শুনে গেল, আমাকে গান শুনিয়ে গেল এ কি মিথ্যা? এ কি অসম্ভব? আমার যুক্তিবাদী মন বলে উঠল—হ্যাঁ অসম্ভব। ইংরেজিতে যাকে বলে wishful thinking, এ তাই। আমার অন্তরাত্মা কিন্তু যুক্তিকে আঁকড়ে তৃপ্তি পেল না, বলল, তোমার বুদ্ধির দৌড় বেশি দূর নয়—সে কোথাও নেই এ আমি মানব না।

সমস্ত মনটা হায় হায় করতে লাগল, দুহাতে মুখ ঢেকে চেয়ারটায় বসে পড়লাম। বাইরে অঝোরে ঝরে বৃষ্টি পড়ছে। প্রকৃতিও যেন কাঁদছে আমার সঙ্গে।

খানিকক্ষণ পরে প্রচণ্ড বজ্রাঘাত হল একটা। হাওয়ায় ঘরের একটা জানলা দড়াম করে বন্ধ হয়ে

গেল। উঠে জানলার ছিটকিনিটা লাগিয়ে দিলাম। সমস্ত মেঝে জলে ভিজে গেছে। সোফাটাও ভিজে গেছে। এমন সময় বিন্দি এসে ঘরে ঢুকল।

'ইস্ চারিদিকে জলে জলময় হয়ে গেছে দেখছি—

আবার বেরিয়ে গেল। একটা শুকনো কাপড় দিয়ে ঘর মুছতে লাগল।

আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আবার ছবিটার দিকে চেয়ে দেখলাম। মুচকি মুচকি হাসছে। এবার হাসিটা জীবন্ত মনে হল। যেন আমাকে আশ্বাস দিলে, বললে, তুমিও এস না।

ঘুমিয়েছি না জেগে আছি বুঝতে পারছি না। চারিদিকে গোলাপী আতরের গন্ধ ভুর ভুর করছে। ঘরের মধ্যে অদ্ভুত একটা নীল আলো। অজন্তা কথা বলছে।

'কোনটা কল্পনা, কোনটা সত্য তা নির্ণয় করা সত্যিই শক্ত। তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। যা দেখছেন, যা শুনছেন, যা অনুভব করছেন তা উপভোগ করুন। তা নিয়ে তর্ক করবেন না, চিন্তাও করবেন না। ওইটেই আপনাদের মুদ্রা দোষ। ওই জন্যই আপনারা সুখী নন। সত্যকে পান না, স্বপ্নকে মিথ্যা বলে অবজ্ঞা করেন। আমি যা বলছি তা বিশ্বাস করুন। এই যে রঙিন ছোট্ট খাতাটি আমি এনেছি, এটা আপনিই একদিন লিখেছিলেন রাত জেগে। এই মোটা সবুজ কাগজটা একটা বিলাতী বিজ্ঞাপনের বই থেকে কেটে এর মলাট করেছিলেন। সেই মলাটের উপর লাল রঙের কালী দিয়ে নাম লিখেছিলেন—'প্রথম ফাগুন'। এই লতা-পাতাগুলোও আপনার আঁকা। কবিতাটা আপনার কবিতার বইয়ে ছাপা আছে। প্রথমটা পড়ছি—

এই তো এলো প্রথম ফাগুন
তোমায় পাওয়ার পরে
এবার কি গো পিকের গানে
নূতন কিছু ফুটবে মানে
নূতন ভাষা উঠবে জেগে
দক্ষিণ হাওয়ার স্বরে?

কিন্তু সেই সুন্দর খাতাটা কোথায়? আপনারা দুজনেই বড় অগোছালো অন্যমনস্ক ছিলেন। তাই আপনাদের কত চিঠি হারিয়ে গেছে। আমি এই খাতাটি কুড়িয়ে পেয়েছি। চিনতে পারছেন?

একটা ময়লা সবুজ খাতা সে তুলে দেখাল আমাকে। খাতার উপর যে 'প্রথম ফাগুন' লেখা ছিল সেটা ভালো করে পড়া যাচ্ছে না।

'কোথা পেলেন এটা?'

'পৃথিবীর সব হারানো জিনিস যে মহাশ্মশানে থাকে সেখান থেকে। সেখানে যাওয়া যায় না। সেখান থেকে মাঝে মাঝে এক-একটা জিনিস উড়ে আসে। হঠাৎ পাওয়া যায়। আমি আজ পেলাম এটা। ভাবলাম আপনাকে দেখিয়ে আসি—'

'ইলোরা কোথায়?'

'এখন কোথা আছে জানি না। আমরা তো ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াই। মাঝে মাঝে দেখা হয়ে যায়। আপনার বা আপনার স্ত্রীর কোনও ছবি পেলেই সে আসবে আপনার কাছে।'

'আপনারা বলেছিলেন আমার স্ত্রী নাকি পূর্বজন্মে আপনাদের বান্ধবী ছিলেন। তার সঙ্গে দেখা হয় আপনাদের?'

'মাঝে মাঝে হয়। পূর্বজন্মের স্মৃতি তার আর নেই। আমাদের চিনতে পারে না। আপনি তার শোকে খুব কাতর হয়েছেন বলে এসেছিলাম আপনার কাছে। আবার আসব।'

আমি চুপ করে রইলাম। যে কথাটা জিগ্যেস করব কিনা ভাবছিলাম অজন্তাই নিজে সেটা বলল।

'আপনি ভাবছেন আমরাও বোধহয় আপনার কল্পনা। আমাদে[illegible] আছে কি নেই তা নিয়ে আমি তর্ক করব না। আমি তর্ক করি না। আমি যদি আপনার কল্পনাই হই তাতে ক্ষতি কি। আমাকে নিয়ে খানিকটা সময় তো কাটল। আপনার সেই হারিয়ে যাওয়া সবুজ খাতাটার খবরটা তো পেলেন। এবার যাই আমি।'

গোলাপী আতরের গন্ধ মিলিয়ে গেল। চলে গেল অজন্তা। সঙ্গে সঙ্গে একটা সত্য জ্বলে উঠল আমার মনে। আমি নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলাম আমি একটা বিশেষ শক্তি লাভ করেছি। সেই শক্তিবলেই এদের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি। সে সংস্পর্শ দেহের সংস্পর্শ নয় এরা যে ভাষায় কথা বলছে তা শব্দময় ভাষা নয়। এদের কথা নীরবে আমার মনে সঞ্চারিত হয়। ইলোরা অজন্তা যখন আসে, চারিদিক আতরের গন্ধে ভরে যায়। আমি সে গন্ধ টের পাই। সে যখন আসে আমার সারা বুকটা ভরে ওঠে, মনে হয় একটা অবর্ণনীয় আনন্দে আমার সমস্ত সত্তা যেন বিকশিত হয়ে উঠল। তার ভাষাও শব্দময় নয়, নীরব, নিঃশব্দ। কিন্তু আমি তা বুঝতে পারি। কেমন করে পারি? নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো শক্তি লাভ করেছি আমি।

হঠাৎ চমকে উঠলাম।

টিক্ টিক্ টিক্ টিক্—

ডেকে উঠল একটা টিকটিকি। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম তার ছবির পিছন থেকেই একটা টিকটিকি মুখ বার করে চেয়ে আছে আমার দিকে। নীরবে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল তারপর আবার মুখটা টেনে নিলে ছবির পিছনে। ওর নিঃশব্দ চাহনি যেন আমাকে বলে গেল—তুমি পারবে। চেষ্টা কর।

আমার সমস্ত অন্তর যেন গান গেয়ে উঠল—পারব, পারব, পারব, পারতেই হবে।

।। সাত ।।

কোনও কাজে সিদ্ধিলাভ করতে হলে সাধনা করতে হয়। কিন্তু মনকে দেহ থেকে বার করবার সাধনা কি করে করতে হয় তা তো জানি না। এ বিষয়ে উপদেশ দিতে পারেন এমন গুরু কোথায় আছেন তা-ও তো অজ্ঞাত। তাঁর ঠিকানা পেলেও তাঁর কাছে যেতাম না আমি। মনের এ গোপন বাসনা গোপনই রাখব আমি। আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত এ তপস্যা আমাকে একাই করতে হবে। আমার এই অতি-গোপন অতি-নিগূঢ় ব্যাপারের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রবেশ করলেই তার পবিত্রতা, তার মাধুর্য যেন নষ্ট হয়ে যাবে। আমাকে একাই সব করতে হবে।

'একাই চেষ্টা করতাম গভীর রাত্রে। খুব একাগ্রভাবে ইচ্ছা করতাম মনটা আমার শরীর থেকে বেরিয়ে যাক। আমার মনের অবস্থা অনেক সময় তন্ময় করে দিত আমাকে। কখনও কখনও ঘুমিয়ে পড়তাম, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতাম আমি যেন বেরিয়ে গেছি, তারপর হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেত। দেখতাম কিছুই হয়নি। গভীর রাত্রি থম-থম করছে চারিদিকে আমার মন দেহের মধ্যেই বন্দি হয়ে আছে।

রোজই হতাশায় ভরে যেত বুকটা। গভীর রাত্রে ট্রেনের যে হুইশল্‌টা শোনা যায়, রোজই শুনতে পেতাম সেটা! বুঝতাম মন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। যে পাহারাদাররা রোজ হুইশ্‌ল্‌ বাজিয়ে আমাদের পাড়ায় পাহারা দেয় তাদের হুইশ্‌ল্‌ রোজই শুনতে পেতাম। বুঝতাম আমার মন আমার দেহের মধ্যেই আছে। তারপর হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়তাম, সকালে বান্দার ডাকে ঘুম ভেঙে যেত। বুঝতাম দেহ ছেড়ে মন কোথাও যায়নি।

একদিন মনে হল বেরিয়ে কোথায় যাব তা তো ঠিক করিনি। লক্ষ্য স্থির হলে যাব কোথায়?

একদিন হঠাৎ লক্ষ্য স্থির হয়ে গেল।

ছাতে ইজিচেয়ারে শুয়েছিলাম সন্ধ্যার পর। চোখে পড়ল পুনর্বসু নক্ষত্রটা উঠেছে। আমরা দুজনেই একদা আকাশ-চর্চা করেছিলাম। মিথুন রাশিতে জন্ম হয়েছিল তার। পুনর্বসু নক্ষত্রও মিথুন। তাই তার প্রিয় ছিল পুনর্বসু নক্ষত্র। ঠিক করলাম ওই পুনর্বসু নক্ষত্রেই মনকেই নিবদ্ধ করব। ওইটাই হবে আমার মনের লক্ষ্য। বইয়ে লেখা আছে পুনর্বসু নক্ষত্র তীরাকৃতি। কয়েকটি তারা দিয়ে গঠিত নক্ষত্রটি। তীরটা কিন্তু সোজা নয়। ঈষৎ বক্র। তাই যিনি আমাকে প্রথমে আকাশ-বিদ্যায় হাতে-খড়ি দিয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন পুনর্বসু ধনুকের মত দেখতে। মনকে একটা সূক্ষ্ম আলোর রেখা করে যদি পাঠাই পুনর্বসুর দিকে, তা কি পৌঁছবে না সেখানে? আমার মন কি মুক্তি পাবে না? অনেকক্ষণ চোখ বুজে বসে রইলাম। সূক্ষ্ম সূচের মত পথে মনকে পাঠাবার চেষ্টা করলাম আকাশে। কিন্তু কিছু হল না। রাস্তার গোলমাল, মোটরের হর্ন—সব শোনা যাচ্ছে। মন দেহেই বন্দি আছে।

...হঠাৎ মনে হল সে তো আর আসেনি... কেন আসেনি... কেন আসেনি... কোথা গেল... আর কি আসবে না?

হতাশার কুয়াশায় ঢেকে গেল মনটা। কোথা গেল, কোথা গেল, আর কি আসবে না... একটা নিঃশব্দ রোদনে অবলুপ্ত হয়ে গেল সব।

সেদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম। তাকে নয়। পুনর্বসু নক্ষত্রের তিনটি উজ্জ্বল তারাকে। জ্যোতির্ময় মনুষ্য-মূর্তি ধরে এসেছে। তাঁরা নিজেরাই আত্ম-পরিচয় দিলেন।

একজন বললেন, আমরা পুনর্বসু নক্ষত্রের তিনটি প্রধান তারা।'

আমার মনে হল তাহলে এঁদেরই কি Procyon, Pollux আর Castor বলে জানতাম?

তাঁরা আরও বললেন, 'আমরা আসতাম না, কিন্তু আপনি আমাদের সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা করে রেখেছেন, সেইটে সংশোধন করে দিতে এলাম। আপনি আমাদের ধনুকাকৃতি ভেবেছেন, সেটা ভুল। তীরের সঙ্গেই আমাদের বেশি সাদৃশ্য। কাল ভালো করে চেয়ে দেখবেন। কাল আপনি আমাদের কাছে আসবার যে ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন মনে মনে তা আমাদের কাছে পৌঁচেছে—খুব আনন্দিত হয়েছি আমরা। চেষ্টা করুন, ঠিক পারবেন। মানুষ চেষ্টা করলে সব পারে। কিন্তু জানতে ইচ্ছে করে আপনার এ অদ্ভুত শখ কেন?'

বললাম, 'এক বিজ্ঞানী সাধক ধ্রুবলোকে আছেন। তাঁর কাছে যাবার ইচ্ছা—'

'বেশ তো আসুন। আমাদের কাছেও কয়েকজন বসু এবং দেবতারা আছেন। তাঁদের কৃপা হলে নিশ্চয় ধ্রুবলোকে যেতে পারবেন—'

আমি বললাম, 'যৌবনে আকাশ-চর্চা করেছিলাম। তখন আপনাদের নাম ইংরেজিতে পড়েছিলাম—'

'আমাদের সকলেরই এক নাম—অগ্নি। আমরা সবাই জ্বলছি। আমাদের যে আত্মীয়টি আপনাদের সবচেয়ে কাছে আছেন তার আপনারা নাম দিয়েছেন সূর্য। আকাশের সব তারাই সূর্য—সবাই আমরা অগ্নিরই নানা রূপ দাউ দাউ করে জ্বলছি। অনেক দূরে আছি বলে আমাদের আপনারা ছোট ছোট বিন্দুর মত দেখেন। ধ্রুবলোক বহু দূরে। সেখানে সত্যিই অনেক তপস্বী, অনেক স্রষ্টা, অনেক বিজ্ঞানী আছেন। কেন যাচ্ছেন আপনি সেখানে?'

'আমিও সৃষ্টি করতে চাই।'

'কাকে?'

'যে আমার জীবন-সঙ্গিনী ছিল। আমার সমস্ত ভালোবাসা যাকে কেন্দ্র করে শতরূপে বিকশিত হয়েছিল, যে আমার জীবন অন্ধকার করে দিয়ে মরণের মহা-তমসায় হারিয়ে গেছে, তাকেই আবার আমি সৃষ্টি করব। ধ্রুবলোকবাসী এক বিজ্ঞানী আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি আমাকে সাহায্য করবেন—'

'সাধু, সাধু। কিন্তু স্থূল দেহ নিয়ে যাবেন কি করে সেখানে?'

'আমার দেহ যাবে না, আমার মন যাবে। আপনাদের লক্ষ্য করে আমি আমার মনকে দেহ থেকে বার করবার চেষ্টা করছি। আপনাদের তীরের ফলার ডগায় আমার মনকে নিয়ে যাব এই আমার প্রতিজ্ঞা।'

'তারপর কি করবেন?'

'আপনাদের লক্ষ্য করেই মন আমার দেহ ছেড়ে যাবে। মন দেহ ছেড়ে গেলেই তার স্পর্শ আমি পাব। তারপর কি হবে আমি জানি না।'

'আমাদের লক্ষ্য করার উদ্দেশ্য কি?'

'মনে হল মনকে দেহ থেকে বার করে নিয়ে কোথায় যাব? একটা লক্ষ্য চাই তো। কাল সন্ধেবেলা আপনাদের দেখতে পেলাম আকাশে। ঠিক করলাম আপনাদের উদ্দেশ্যেই মনকে চালিত করব।'

শুনে খুব খুশি হলেন তাঁরা।

'বেশ আমরাও চেষ্টা করব আপনার মনকে আমাদের দিকে আকর্ষণ করতে।'

এই বলেই অন্তর্হিত হলেন তাঁরা। অন্ধকার হয়ে গেল চারিদিক। মনে হল অন্ধকার সমুদ্রে ছপ ছপ করে একটা নৌকো যেন এগিয়ে আসছে আমার দিকে। এর পরই ঘুমটা ভেঙে গেল। বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। আলো জ্বাললাম। চোখে পড়ল একটা বিচিত্র-বর্ণ 'মথ' নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে দেওয়ালে। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম চোখ বুজে। আশা করতে লাগলাম যদি ঘুমিয়ে পড়ি আবার স্বপ্ন আসবে। বাস্তব জগৎ থেকে মন পালাতে চাইছিল। অনেকক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে রইলাম, ঘুম এল না। মনে করলাম আলোটা জ্বেলে একটু পড়ি। আমার মাথায় শিয়রে কিছু বই রাখা থাকে এই জন্য। আলোটা জ্বালব জ্বালব করছি—চোখের পাতা তখনও পুরো খুলিনি—এমন সময় দেখি একটা আলোকিত রঙের ঝলক ফুটে উঠেছে চোখের সামনে। আলোকিত সবুজ আর সোনালি রঙের স্বচ্ছ কি একটা যেন কাঁপছে চোখের সামনে। মনে হল এটা কি অবগুণ্ঠন? তারপরই দেখতে পেলাম তার চোখ দুটি, নাকের খানিকটা আর মুখের খানিকটা। মুচকি হাসিটাও। কি অদ্ভুত সুন্দরই

যে লাগল! কথা কইতে যাব এমন সময় মিলিয়ে গেল সেটা। সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বেলে ফেললাম। কেউ নেই।

মনের ভিতর শুনতে পেলাম, 'একজন দেবীর সহায়তায় কিছুক্ষণের জন্য মূর্তি ধরতে পেরেছিলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না। বড় কষ্ট হয়। তবে তোমার মনকে দেহ থেকে বার করে নিয়ে এস। তুমি চেষ্টা করছ জানি, সেটা বুঝতে পারি। আমি সর্বদাই তোমার কাছে কাছে আছি। চেষ্টা করে যাও, ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমি আমার মনকে পুনর্বসু নক্ষত্রে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি।'

'কেন?'

'কোনও একটা লক্ষ্য না থাকলে জোর পাই না। একটু আগে স্বপ্নে ওই নক্ষত্রের তিনটি উজ্জ্বল তারা আমাকে দেখা দিয়েছিলেন। তুমি তো তাঁদের চেনো। আমাদের একটা ভুল ধারণা ছিল। আমরা ভাবতাম পুনর্বসু নক্ষত্র বুঝি ধনুকের মত। ওঁরা বললেন, না আমরা তীরের মত—'

'আমার কাছে এখন সবই সমান। আমি দেখতে পাই না। অনুভূতির জগতে বাস করি আমি। তোমার কাছাকাছি সর্বদা আছি। তোমার মন দেহ থেকে বেরিয়ে এলেই স্পর্শ পাবে। আমিও অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করছি তোমার জন্য।'

এর পরই নীরব আলাপ বন্ধ হয়ে গেল। সে কোথাও চলে গেল হয়তো। আমার সমস্ত বুকটা ভরে ছিল এতক্ষণ। খালি হয়ে গেল।...হঠাৎ মনে হল আমি পাগল হয়ে যাইনি তো? যা ভাবছি, যা দেখছি, তা সত্য না মানসিক কল্পনা? সমস্ত মনটা আবার আগের মত কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেল। অসহায় মন কেবল চীৎকার করতে লাগল— তুমি কোথা? তুমি কোথা? তুমি কোথা? কত দূরে আছ তুমি?

গভীর রাত্রে একা মশারির ভিতর নিস্তব্ধ হয়ে বসে নিজেরই মনের আর্তনাদ শুনতে লাগলাম।

।। আট ।।

এমনি ভাবেই চলতে লাগল কয়েকদিন। তারপর হঠাৎ একদিন বেরিয়ে পড়লাম দেহ থেকে। এখন গভীর রাত্রি। দেখলাম আমি মশারির বাইরে দাঁড়িয়ে আমার অচেতন দেহটাকে দেখছি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আমার বাঁ হাতের কবজিটা কে যেন চেপে ধরেছে।

'তুমি?'

'হ্যাঁ। চল।'

নীরব ভাষায় কথা হল।

কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম না তার মনোময় দেহ কি করে আমার মনোময় দেহের হাত চেপে ধরেছে। আমাদের কারোরই তো হাত নেই।

প্রশ্ন করলাম তাকে মনে মনে, 'তোমারও হাত নেই, আমারও হাত নেই। কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি আমার হাত চেপে ধরেছ। ধরেছ নাকি?'

'ধরেছি। ওটা আমার হাতের স্পর্শ নয়, আমার ইচ্ছার স্পর্শ। তুমিও মনে মনে কামনা করছ আমার স্পর্শকে। তোমার কামনা এবং আমার ইচ্ছা মিলে এটা হয়েছে। ইচ্ছার জোরে সব হয়। আমি মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছি।'

'কোন মায়ের?'

'সারদা মায়ের—'

অবাক হয়ে গেলাম।

'চল—'

পরমুহূর্তেই আমরা দুজন বেরিয়ে পড়লাম মহাকাশে। পৃথিবীর এলাকা ছাড়িয়ে গেলাম নিমেষে।

শূন্য থেকে দেখলাম সূর্য তখন আমেরিকাকে আলো দিচ্ছে। আমাদের দিকটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে দেখতে পেলাম শুক্র বৃষরাশিতে আর শনি মকররাশিতে রয়েছে। শুক্রকে বেশ বড় আর উজ্জ্বল মনে হচ্ছে, যেন একটা ধবধবে সাদা ফুটবল।

'চিনতে পারছেন শুক্রকে? ওকে প্রথম দেখেছিলেন আপনাদের বাড়ির কদম গাছের মাথায় ভোরবেলায়।'

চারিদিক আতরের গন্ধে ভরে উঠল।

'ইলোরা অজন্তা নাকি?'

'হ্যাঁ, আমরাও চলেছি আপনাদের সঙ্গে। আমরাও মাঝে মাঝে আকাশ-বিহার করি। তবে আকাশ এত বিরাট এত বিপুল যে বেশি দূর যেতে পারি না। একবার আমরা কৃত্তিকা-মণ্ডলে ঢুকে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। আপনারা পৃথিবী থেকে কৃত্তিকাতে ছটি সাতটি তারা দেখতে পান। কিন্তু সেখানে তারার মেলা। ধূমন্তী বলেছিল চারশোর বেশি তারা আছে নাকি কৃত্তিকা-মণ্ডলে—'

'ধূমন্তী কে?'

'ধূমন্তী নাম আমরা দিয়েছি। ও একটা ধূমকেতু থেকে ছিটকে পড়ে গিয়েছিল, তারপর থেকে সারা আকাশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে সমস্ত আকাশের খবর রাখে, পথও চেনে। সে-ই আমাদের পথ দেখিয়ে কৃত্তিকা-মণ্ডল থেকে পৃথিবীর কাছে পৌঁছে দেয়। তার দেখা যদি পেয়ে যাই আমাদের খুব সুবিধা হবে। আপনারা ধ্রুব-মণ্ডলে যাবেন তো—'

'তুমি কি করে জানলে? আমরা প্রথম কবে শুক্রকে কোথায় দেখেছি, তা-ও দেখছি তোমাদের অজানা নয়—'

'আমরা যে সব দেখতে পাচ্ছি। আপনারা এখন স্বচ্ছ হয়ে গেছেন। আপনাদের আশা আকাঙ্ক্ষা অতীত বর্তমানের সব চিন্তা-ভাবনা দেখতে পাচ্ছি আমরা। এখন ধূমন্তীর দেখা পেলে নিশ্চিন্ত হই—'

'তাকে খুঁজে পাবেন কি করে?'

'আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না? মনোময় দেহের নূতন দৃষ্টিশক্তি হয়—'

'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। সর্বাঙ্গ দিয়ে দেখছি—'

'তাহলে ভালো করে লক্ষ্য করুন। ধূমন্তী একটা বড় জোনাকীর মত। কেবল রঙ বদলায়। এখনি লাল আছে, পরমুহূর্তেই সবুজ হবে, তারপর নীল, তারপর হলুদ, তারপর বেগুনী। মেজাজও খামখেয়ালী।'

সে এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। এইবার বলল, 'আমি তাকে দেখেছি। দেখলেই চিনতে পারব। তার নাম কি ধূমন্তী?'

'এ নাম আমরাই দিয়েছি। এখানে কারো নাম নেই। আমরাই ওদের নামকরণ করি। এখানে খালি

ছোট বড় তারা, নক্ষত্র, নক্ষত্রপুঞ্জ, নীহারিকা, কোটি কোটি মাইল বিস্তৃত জ্যোতির্বাষ্প, বহু যুগল-নক্ষত্র।'

'যুগল-নক্ষত্র কি?'

'দুটি নক্ষত্র খুব কাছাকাছি পরস্পরকে ঘিরে ঘুরছে। দূর থেকে মনে হয় একটি নক্ষত্র। দূরবিন দিয়ে দেখলে বোঝা যায়, খুব কাছে গেলেও বোঝা যায়। সপ্তর্ষিমণ্ডলে বশিষ্ঠ নক্ষত্রের পাশে অরুন্ধতীকে দেখা যায়, কিন্তু বশিষ্ঠকে ঘিরে আর একটি নক্ষত্র ঘুরছে। লুব্ধক নক্ষত্রকেও ঘিরে একটি নক্ষত্র ঘুরছে। তাদের খালি চোখে দেখা যায় না। আমরা যাকে ছায়াপথ বা আকাশ-গঙ্গা বলি তার মধ্যে অসংখ্য যুগল-নক্ষত্র।'

'আমরা যখন আকাশ-চর্চা করেছিলাম তখন আমরাও পড়েছিলাম। এসব আপনারা জানলেন কি করে?'

'আমরা তো প্রায়ই আকাশে ঘুরে বেড়াই। ধূমন্তীর কাছেও অনেক খবর জেনেছি।'

'ধূমন্তী আমাদের কথা বুঝতে পারবে?'

'মনের কথা বুঝবে। মনের তো আলাদা আলাদা ভাষা নেই। মনের কথাই আকাশের ভাষা। সেই ভাষায় উত্তর দেবে সে। সে উত্তর আপনারা বুঝতে পারবেন।

'পারব?'

'নিশ্চয়ই পারবেন। আমরা তো কোনো ভাষাতেই কথা কইছি না, অথচ আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারছি। ধূমন্তীকেও পারবেন। এখন চলুন তাকে খুঁজে বার করি।'

আমরা মহাকাশে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। চারিদিকে তারার মেলা। অথচ ভিড় বলে মনে হচ্ছে না। মাঝে মাঝে ফাঁকও অনেক। কিছুক্ষণ পরে টকটকে লাল একটি গোলক দেখা গেল।

ইলোরা বললে—'ওটা বৃশ্চিকরাশির জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র। চলুন আমরা দ্রুতবেগে ধনুরাশির দিকে চলে যাই। সেখানে আকাশ-গঙ্গা খুব গভীর ও স্পষ্ট। ধূমন্তীর ওটি খুব প্রিয় স্থান। ওখানে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে—'

সে একটি কথাও বলেনি। আমার হাতও ছাড়েনি এক মুহূর্তের জন্য।

ধনুরাশির নীচেই যে প্রদীপ্ত আকাশ-গঙ্গা আছে—তার দ্যুতি আমরা সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করছিলাম।

'চল যাই—চল—'

নিমেষের মধ্যে আমরা ধনুরাশির নক্ষত্র-মণ্ডলে গিয়ে হাজির হলাম। মনে হল বিরাট একটা জ্যোতির সমুদ্রে এসে হাজির হয়েছি। পৃথিবী থেকে যাকে মেঘের মতো মনে হত— দেখলাম তা একটা বিরাট মহাসাগর, আলোর মহাসাগর। অসংখ্য ছোট-বড় নক্ষত্র যেন সাঁতার কাটছে তার মধ্যে। অধিকাংশই যুগল-নক্ষত্র।

সে বলে উঠল— 'ওই ধূমন্তী—'

দেখলাম দূরে একটা বেশ বড় লাল জোনাকি ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখতে দেখতে সেটা সবুজ হয়ে গেল, তারপর হলদে, তারপর গোলাপী, তারপর বেগুনী।

'হ্যাঁ, ওই তো ধূমন্তী—'

এগিয়ে গেলাম আমরা তার দিকে। ইলোরা বা অজন্তা কেউ বোধহয় মনে মনে ডাক দিল তাকে। সে আমাদের দিকে ঘুরে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল। যখন কাছে এল, আমি বললাম,

'আমরা ধ্রুবলোক যাব বলে আকাশে এসেছি। এসে কিন্তু পথ হারিয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনি যদি দয়া করে পথ দেখিয়ে দেন আমাদের, খুবই উপকৃত হব আমরা। কৃতজ্ঞ থাকব আপনার কাছে—'

ধূমন্তী কোনও উত্তর দিলেন না। আমাদের প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন কেবল। প্রকাণ্ড একটা আলোক-শিখা ক্ষণে ক্ষণে নানাবর্ণে রূপান্তরিত হয়ে নৃত্য করতে লাগল আমাদের ঘিরে। তারপর হঠাৎ আমার মনের ভিতর দপ করে জ্বলে উঠল তার উত্তরটা।

'সামনেই পথ। এস আমার সঙ্গে।'

উড়তে লাগল ধূমন্তী। আমরা তার অনুসরণ করতে লাগলাম।

অনন্ত আকাশ যে অন্তহীন তা এতদিন আন্দাজে অনুভব করেছি। এখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হল। আত্মহারা হয়ে গেলাম, অভিভূত হয়ে পড়লাম। রাত্রে যখন পৃথিবী থেকে আকাশ দেখেছি মনে হয়েছে নক্ষত্রের ভিড়ে চারিদিক যেন গিজ গিজ করছে। এখন মনে হল এত ফাঁকা জায়গা আগে আর কোথাও দেখিনি। যে নক্ষত্রগুলোকে ঘেঁষাঘেঁষি দেখেছি—তারা মোটেই পাশাপাশি নেই। দুটি নক্ষত্রের মধ্যে বিরাট দূরত্ব।

ধ্রুব নক্ষত্র উত্তর দিকে আছে। আমরা ধনুরাশি থেকে উত্তর দিকে যাচ্ছিলাম অনেক উঁচু দিয়ে। দেখতে পাচ্ছিলাম বৃশ্চিক রাশিকে। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র একটা বিরাট অঙ্গারপিণ্ডের মত জ্বলছিল। তুলারাশিকে এবং অনেক দূরে কন্যারাশির চিত্রা এবং স্বাতীকেও দেখতে পেলাম।

তারপরই ধূমন্তী বলে উঠলেন, 'ডান দিকে সরে যাও, ধূমকেতু আসছে একটা—'

ধূমন্তী ডান দিকে সরে যেতেই আমরাও তার অনুসরণ করলাম। একটু পরেই দেখলাম প্রকাণ্ড একটা জ্যোতির্ময় অরণ্য। যেন ভীমবেগে ছুটে আসছে আমার দিকে। অরণ্যের শেষ দিকটা যেন স্বচ্ছ। সামনের দিকটা ঘনীভূত জ্যোৎস্নালোকের মত। একটু পরেই বেঁকে অন্যদিকে চলে গেল সেটা।

ধূমন্তী বললেন— 'ও বোধহয় স্বাতী নক্ষত্রের দিকে গেল।'

সেই বিরাটকায় ধূমকেতু দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল। খুব ছেলেবেলায় হ্যালির ধূমকেতু দেখেছিলাম। মনে পড়ল তার কথা।

'বাঁ দিকে ফের এবার—'

আবার ধূমন্তীর অনুসরণ করতে লাগলাম আমরা। মনে হল পায়ের নীচে 'হারকিউলিস্' আর 'বুটেশ' নক্ষত্র-মণ্ডল রয়েছে। আগে পৃথিবী থেকে ওদের দেখেছিলাম, এখন আকাশের উপর থেকে দেখছি। অদ্ভুত মনে হচ্ছে। তারপর হঠাৎ একটা আলোকিত প্রদেশে এসে পড়লাম। মনে হল সেখানে যেন একাধিক মহাসূর্য উদিত হয়েছেন। সে আলোয় আমার মনোময় দেহের চেতনাকে যেন উদ্ভাসিত করে দিল। মনে হল যেন সে দিব্য জ্যোতিতে ডুবে গেলাম।

সে বলল, 'আমরা এবার সপ্তর্ষিলোকের কাছে এসে পড়েছি। যে বিজ্ঞানীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল তিনি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন একদিন। আমাদের সূর্যের চেয়ে বহুগুণ বড় সাতটি সূর্য এখানে জ্বলছে। তাই এখানে এত আলো। ওই দূরে দেখতে পাচ্ছি ধ্রুব মাতৃমণ্ডলকে যাকে পাশ্চাত্য জ্যোতিষ্ক-বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন ড্র্যাগন বা ড্রেকো। ওরা মায়ের মত ধ্রুবমণ্ডলকে বেষ্টন

করে আছে। বিজ্ঞানী আমাকে বলেছিলেন ওই মাতৃমণ্ডল প্রণাম করে ধ্রুবমণ্ডলে প্রবেশ করবার অনুমতি নিতে হবে।

ধূমন্তী বললেন, 'তোমরা তাহলে তাই কর। আমি ওই ধূমকেতুটার পিছু পিছু যাব।

ধূমন্তী নানারঙের আলো বিকিরণ করতে করতে ঘুরে বেড়াল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

অজন্তা বলল, 'এই ড্রেকো নক্ষত্রমণ্ডলকে আপনারা যেদিন প্রথম দেখেছিলেন ভাগলপুরের রেস-কোর্স মাঠে দাঁড়িয়ে, সেদিন একটি ঘটনা ঘটেছিল। তা আপনাদের মনে নেই। ওঁর দুলে ছোট ছোট মুক্তোর ঝালর ছিল, সেই ঝালর থেকে ছোট্ট একটি মুক্তো খসে পড়েছিল সেই মাঠে। উনি জানতেও পারেননি। আমি সেটি কুড়িয়ে রেখেছি। আপনি যখন বাড়িতে ফিরে যাবেন আপনাকে দিয়ে আসব একদিন।'

ইলোরা বলল, 'সে সব পরে হবে। এখন এস আমরা প্রার্থনা করি।'

আমরা চারজনই প্রার্থনা করতে লাগলাম। ওরা কি প্রার্থনা করেছিল জানি না। আমি একই কথা বার বার বলছিলাম—

'হে ধ্রুব-মাতৃমণ্ডলীর অধিষ্ঠাত্রী জননী, আমি ধ্রুবমণ্ডলে এক তপস্বী বিজ্ঞানীর সন্ধানে এসেছি। আপনি দয়া করে আমাকে ধ্রুবমণ্ডলে প্রবেশের অনুমতি দিন। আমি বহু দূর থেকে, বহু কষ্ট করে, বহু তপস্যার ফলে, আপনাদের সমীপবর্তী হয়েছি। দয়া করে আমাকে আর আমার স্ত্রীকে ধ্রুবমণ্ডলে প্রবেশের অনুমতি দিন—'

কতক্ষণ প্রার্থনা করেছিলাম মনে নেই। মনে হচ্ছিল যুগ যুগান্তর পার হয়ে যাচ্ছে।

সহসা একটি জ্যোতির্ময়ী মূর্তি আবির্ভূত হলেন আমার সামনে। প্রশ্ন করলেন, 'সেই তপস্বী বিজ্ঞানীর সঙ্গে দেখা করবেন কেন?'

'আমার স্ত্রী কিছুদিন আগে মারা গেছেন। যে বিজ্ঞান আমরা পড়েছি, সেই বিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে কোনও জিনিস এ পৃথিবীতে নষ্ট হয় না, রূপান্তরিত হয়। আমি বিশ্বাস করি, আমার স্ত্রীর দেহের অণুপরমাণুগুলি মহাকাশে ছড়িয়ে আছে। আমার স্ত্রীর মনোময় দেহের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেই বিজ্ঞানীর। তিনি বলেছেন যে সেই অণুপরমাণুগুলি থেকে আমার স্ত্রীকে আবার সৃষ্টি করা সম্ভব। তিনি আমার স্ত্রীকে আরও বলেছেন, আপনার স্বামী আমার কাছে এসে আপনার যথাযথ বর্ণনা যদি আমাকে দেন, মনে হয় আমি আপনাকে আবার সৃষ্টি করতে পারব। আমার স্ত্রী মর্ত্যে গিয়ে এই খবরটি আমাকে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন তুমি তোমার মনকে যদি দেহ থেকে বাইরে নিয়ে আসতে পার, তাহলে আমি তোমাকে সেই বিজ্ঞানীর কাছে নিয়ে যাব। আমি অনেক চেষ্টার পর আমার মনকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে এখানে এসেছি। আমাকে কৃপা করুন, অনুমতি দিন আমরা দুজনে ধ্রুবলোকে গিয়ে সেই বিজ্ঞানীর সন্ধান করি। আপনি কৃপা না করলে আমার এত শ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

'আপনার পাশেই যে দীপ্তিময়ী প্রভা দাঁড়িয়ে আছেন, উনিই কি আপনার স্ত্রী?'

'উনি দীপ্তিময়ী কিনা জানি না। কিন্তু উনি আমার হাত ধরে আছেন সেটা অনুভব করছি—'

'নিজের পুণ্যবলে দীপ্তিময়ী উনি। ধ্রুবলোকে প্রবেশ করবার অধিকার উনি বহু পূর্বেই অর্জন করেছেন। ওঁর জন্য আমাদের অনুমতির প্রয়োজন নেই। আপনাকেও ওঁর সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি

দিলাম। যে বিজ্ঞানীকে আপনি খুঁজছেন, তিনি ধ্রুবতারার খুব নিকটেই আছেন। তাঁর তপস্যার জ্যোতির মধ্যে ডুবে আছেন তিনি। আসুন আমার সঙ্গে, আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব, কোথায় তিনি আছেন। এঁরা দুজন কে?'

'এঁরা আমাদের বান্ধবী। এঁরাও আকাশচারিণী। এঁরা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন।'

'ওঁরা এখান থেকেই ফিরে যান। ধ্রুবলোকে বেশি লোককে আমরা প্রবেশ করতে দিই না। আপনাদের পথ দেখাবার আর প্রয়োজন নেই।'

।। নয় ।।

যদিও আমার দেহ ছিল না, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কোনও ইন্দ্রিয়ই ছিল না, কেবল অনুভূতির ভিতর দিয়েই সব বুঝতে পারছিলাম এতক্ষণ। ভাষাহীন কথাও বলতে পারছিলাম, ধ্রুবলোকে প্রবেশ করেই কিন্তু বুঝতে পারলাম আমার মনোময় সূক্ষ্ম দেহে একটা পরিবর্তন এসেছে। আমি দেখতে পাচ্ছি। আমার চোখ দিয়ে যেমন দেখতে পেতাম, ঠিক তেমনি দেখতে পাচ্ছি। ধ্রুব মাতৃমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাকে দীপ্তিময়ী প্রভা বলেছিলেন সে প্রভা আমি আগে দেখতে পাই নি। এখন পেলাম। আমার যেন নূতন একটা দৃষ্টি খুলে গেল। দেখলাম ধ্রুবমণ্ডল রৌদ্রময়, কিন্তু সে রৌদ্র স্নিগ্ধ রৌদ্র,তাতে উত্তাপ নেই। তা জ্যোৎস্নার মতও নয়, তা জ্যোৎস্নার চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল, আর জ্যোৎস্নার চেয়ে অনেক বেশি ঠাণ্ডা। দেখলাম শতসূর্যের চেয়ে বেশি প্রদীপ্ত একটি বালক বসে আছে নিস্তব্ধ হয়ে একটি নক্ষত্রের নীচে। তার বাহ্যজ্ঞান নেই, মনে হচ্ছে তার সর্বাঙ্গ থেকে যে আলো বেরুচ্ছে তাতেই সমস্ত ধ্রুবলোক সমুজ্জ্বল। সেই আলোয় দেখলাম আরও অনেক জ্যোতির্ময় পুরুষ ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছেন চতুর্দিকে। সেই বিরাট জ্যোতি-সমুদ্রে অভিভূত হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। সমুদ্র বলছি বটে, কিন্তু তা ঠিক সমুদ্র নয়, সেখানে কোনও তরঙ্গ নেই। সমস্তই ধীর, স্থির, নিবাত, নিষ্কম্প, নীরব, নিঃশব্দ। তা অবর্ণনীয়, অপরূপ।

সে বলল, 'চল এবার বিজ্ঞানীর কাছে। দেবী যে জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন, চল সেখানে যাই।'

'সেখানে তো সাদা একটা মেঘের মত দেখা যাচ্ছে—

'ওটা একটা নীহারিকা। ওরই মধ্যে বিজ্ঞানী আছেন। চল—'

সে আমার হাত মুহূর্তের জন্য ছাড়েনি। আমাকে নিয়ে চলল সেই নীহারিকার দিকে। ধ্রুবলোকে কোনো নীহারিকার কথা পড়েছি বলে মনে পড়ল না। কাছে গিয়ে দেখলাম সেটা জ্যোতির্বাষ্পে নির্মিত বিরাট প্রাসাদ একটা। এটা আকাশ-বিজ্ঞানীদের দূরবিনে এখনও ধরা পড়েনি। ধরা পড়েনি অনেক কিছুই। আকাশময় কোটি কোটি নীহারিকা ছড়ানো আছে যাদের খবর আমরা জানি না।

সে বিরাট প্রাসাদে কোনও দরজা নেই। আমরা সোজা ভিতরে ঢুকে পড়লাম। ঢুকেই দেখতে পেলাম একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ বসে আছেন। সে বলল, 'আমি আমার স্বামীকে নিয়ে এসেছি আপনার কাছে।'

তিনি তন্ময় হয়ে কি একটা ভাবছিলেন। তার কথা শুনে চাইলেন আমাদের দিকে।

'ও, আপনি এসেছেন? ইনিই আপনার স্বামী? বাঃ, খুব খুশি হলাম। আপনি আপনার স্ত্রীকে আবার সৃষ্টি করতে চান? তা করা সম্ভব। অসংখ্য ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি ছড়িয়ে আছে মহাকাশে। সেগুলো সংগ্রহ করে নূতন সৃষ্টি করা অসম্ভব নয়। এই যে প্রাসাদ দেখছেন—এটা আমি তৈরি করেছি। এটা আমার ল্যাবরেটরি। এখানে বসে আমি নানারকম জিনিস তৈরি করি। সেদিন একটা পরী সৃষ্টি করেছি—আলোর পরী—ওই দেখুন উড়ে বেড়াচ্ছে।'

সত্যিই দেখলাম একটি চমৎকার পরী উড়ে বেড়াচ্ছে চারিদিকে। তার সর্বাঙ্গ নানা রঙের, ডানা দুটি চমৎকার রামধনু রঙের।

মনে মনে প্রশ্ন করলাম (আমাদের সমস্ত আলাপই মনে মনে হচ্ছিল)—'এই রঙীন পরীটির পরিণাম কি হবে?'

'তা ভগবানই জানেন, তিনিই মহাস্রষ্টা। আমি যা কিছু সৃষ্টি করি তাঁর প্রেরণাতেই করি। সৃষ্টি হয়ে গেলে তাঁরই কাছে সমর্পণ করি সেটা। ওর পরিণাম কি হবে তা তিনিই জানেন। সৃষ্টি করে আমি যে আনন্দ পাই, সেই আনন্দই ভগবান, মনে তাঁর স্পর্শ লাভ করে ধন্য হয়ে যাই।'

রঙীন আলোর পরী দেখতে দেখতে দূরে চলে গেল—শেষে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

'আপনার পরী তো মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল।'

'যাক না, ওর সম্বন্ধে আমার কোনো মোহ নেই। ও এখন আমার নয়, মহাস্রষ্টার।'

'এখন কি আপনি আর কোনও সৃষ্টির কথা ভাবছেন?'

'হ্যাঁ, এখনই ভাবছিলাম। নূতন ধরনের একটা বজ্র-সৃষ্টির কথা!'

'বজ্র? কি রকম বজ্র?'

'পৃথিবীর অনেক মানুষ ক্রমশ দানব হয়ে যাচ্ছে। তাদের অত্যাচারে হাহাকার করছে কোটি কোটি দুর্বল লোক। সেই হাহাকারের স্পন্দন ভেসে আসছে এখানেও। আমার মন বিচলিত হচ্ছে মাঝে মাঝে। তাই ভাবছিলাম এমন একটা বজ্র তৈরি করা সম্ভব কি না যে পাপীরা পাপ করবামাত্র সঙ্গে সঙ্গেই মারা যাবে সেই বজ্রাঘাতে। তাদের পাপ থেকেই তৈরি হবে সেই বৈদ্যুতিক মারণাস্ত্র সঙ্গে সঙ্গে এবং তাদের মৃত্যু ঘটাবে।'

'এ রকম হওয়া কি সম্ভব?'

'ভগবান ইচ্ছে করলে সবই সম্ভব। তিনিই দধীচির অস্থি থেকে বজ্র করেছিলেন, স্তম্ভ বিদীর্ণ করে তিনিই আবির্ভূত হয়েছিলেন নৃসিংহ রূপে—'

'এই বিরাট মহাকাশে কোটি কোটি সূর্য মহাশূন্যকে উদ্ভাসিত করে রেখেছে—এটা যদি সম্ভব হয়ে থাকে—তাহলে সবই সম্ভব। তবে সে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন মহাস্রষ্টা ভগবানই। অসত্য অশিব অসুন্দর আচরণ করবামাত্রই মৃত্যু হবে—ভগবান ইচ্ছা করলে তাও হতে পারে। আমার মনে সে বজ্র-সৃষ্টির প্রেরণা এখনও আসেনি। তার উপায় উদ্ভাবন করতে পারিনি এখনও। হয়তো ভগবানের সে ইচ্ছা হয়নি এখনও। হলে কোনো না কোনো বিজ্ঞানীর মনে সে বজ্র তৈরি করবার প্রতিভা তিনি দেবেন। আমি কিছু পাইনি এখনও। আসুন, তাহলে আপনার স্ত্রীকেই আবার নূতন করে সৃষ্টি করা যাক। আপনি আপনার স্ত্রীর কথা আমাকে বলুন। আমি মন দিয়ে শুনি।'

'প্রথমে কি বলব—'

'তাঁর চেহারাটা কি রকম ছিল বলুন আগে। আমি তাঁর মনোময় রূপ দেখেছি। দেখেছি সে রূপ আভাময়। তার থেকে বুঝেছি তিনি পুণ্যবতী। আপনি তাঁর সম্বন্ধে আরও বিশদ করে বলুন। প্রথমে তাঁর চেহারাটা বর্ণনা করুন।'

মুশকিলে পড়ে গেলাম। যে আমার সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ বছর ছিল, যার চেহারার খুঁটিনাটি সবই আমার জানা আছে, সহসা এখন অনুভব করলাম, তা বর্ণনা করে বিজ্ঞানীকে বোঝাতে পারব না সে দেখতে কেমন ছিল। চেহারার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বোঝানো যায় না। প্রত্যেক মানুষের চেহারা আলাদা। আমরা চোখ দিয়ে সেটা মনে এঁকে রাখি, ক্যামেরা দিয়ে তার ক্ষণিকের ছবি তুলে রাখি, কিন্তু বর্ণনা করে তা অপরকে বোঝানো অসম্ভব।

বললাম, 'শুধু আমার চোখেই নয়, অনেকের চোখেই সুন্দরী ছিল সে। আমার মনে যে চিত্র আঁকা আছে তা অপরূপ। কিন্তু আপনার মনে সে চিত্র কথা দিয়ে কি করে আঁকব বুঝতে পারছি না। তবু বর্ণনায় যতটুকু বলা যায় বলছি। সে নাতিস্থূলাঙ্গী, নাতিদীর্ঘ, গোধূমবর্ণা ছিল। প্রায় সর্বদাই একটা মৃদু হাসি ফুটে থাকত তার মুখে, চোখের ভাষা ছিল অনুপম, তার মুখে প্রসন্নতার সঙ্গে এমন একটা আনন্দের শ্রী ফুটে থাকত—'

'থাক, আর চেহারার বর্ণনা করবেন না। যতটুকু বললেন তার থেকেই আমি কিছু একটা সৃষ্টি করতে পারব। এইবার তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলুন।'

এবারেও মুশকিলে পড়লাম। বর্ণনা করে কি কারও চরিত্র বোঝানো যায়? যায় না। চরিত্র কেবল কতকগুলি গুণাবলী এবং দোষাবলীর তালিকামাত্র নয়। তার মধ্যে যে সজীব প্রাণবন্ততা থাকে সেইটেই তার রূপ। কিন্তু সেটা তো অবর্ণনীয়। তবু বলতে লাগলাম।

'ওর সঙ্গে যদিও আমার অনেক সময় মতের মিল হয়নি, ছোট-বড় নানা বিষয়ে নিয়ে আমরা ঝগড়া করেছি, কিন্তু আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অনুভব করছি, ও যদি আমার জীবনে না আসত তাহলে আমি যা হয়েছি তা হতে পারতাম না। সংসারের সমস্ত ঝঞ্ঝাট ও-ই সামলেছে, আমাকে অবসর দিয়েছে সাহিত্য-সাধনা করবার।'

সে হঠাৎ বলে উঠল, 'ও বাড়িয়ে বলছে—'

বিজ্ঞানী বললেন, 'ওঁকে বলতে দিন, বাধা দেবেন না।'

সে চুপ করে গেল।

আমি আবার বলতে শুরু করলাম।

'কিছু বাড়িয়ে বলিনি। সংসার ওর ছিল, আমি সে সংসারে সম্মানিত অতিথির মত কাটিয়েছি। যা উপার্জন করতাম তা ওর হাতে তুলে দিতাম।' আর কিছু করিনি। অসময়ে নিজের খেয়ালখুশি মত বাজার করে এনে মাঝে মাঝে ওকে বিব্রত করেছি কেবল। আমাদের বড় পরিবারে ও-ই ছিল বড় বউ। বড় বউয়ের বৃহত্ত্ব ও বজায় রেখেছে বরাবর। ওর শ্বশুর, শাশুড়ি, জা, দেওর সবাই ভালোবাসত ওকে। আত্মীয় পরিজন অতিথিদের ভিড়ও ছিল প্রচুর। শুধু মানুষ নয়, জানোয়ারও ছিল নানারকম—গরু, কুকুর, ভেড়া, খরগোশ, মুরগি, হাঁস, গিনি ফাউল—এদের সমস্ত ঝঞ্ঝাট ও-ই পোয়াত। চারটে গরুর দুধ নিজে দুইতো। এর মধ্যে ছেলেমেয়েদের পড়াত, আমার সমস্ত পাণ্ডুলিপি পড়ত এবং যেখানটা ভালো লাগত না আমাকে দিয়ে আবার লেখাত। ও যখন আই-এ ক্লাসের ছাত্রী তখন ওর সঙ্গে বিয়ে

হয়েছিল আমার। তারপর বাড়িতে পড়ে ও বি-এ পাশ করেছিল। বাংলা এবং ইংরেজি সাহিত্যের বহু বই পড়েছিল। উঠত ভোর পাঁচটায়, রাত্রি বারোটার আগে শুতে আসত না। শিল্পের দিকেও ঝোঁক ছিল খুব। ভালো গান গাইতে পারত, ভালো গানের রেকর্ড কিনত। ভালো ছবি, ভালো সাহিত্য, ভালো অভিনয়, ভালো সিনেমা খুব প্রিয় ছিল ওর। অসুখে পড়েও সিনেমা, থিয়েটার দেখে এসেছে—'

আবার বাধা দিল সে।

'এসব কথা বলার কোনো মানে হয়—'

বিজ্ঞানী বললেন, 'আবার আপনি বাধা দিচ্ছেন কেন? আমি ওর মধ্যে থেকে আমার সৃষ্টির উপাদান বেছে নেব। ওঁকে বলতে দিন।'

আমি আবার বলতে শুরু করলাম।

'ওর আর একটা বৈশিষ্ট্য ও ঠাকুর-দেবতা মহাপুরুষদের ভক্তি করত খুব। ওর ছেলেবেলা নিবেদিতা স্কুলে শ্রীশ্রীসারদা মায়ের কাছে কেটেছে। সে প্রভাব ধন্য করেছে ওর জীবনকে। ওর শোওয়ার ঘরে বিছানার শিয়রের দিকে টাঙানো আছে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা মায়ের আর স্বামী বিবেকানন্দের ছবি। ওর ঠাকুরঘরে অনেক ঠাকুরের পট, লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তি, তাদের জন্য খাট-মশারি, তাদের ভোগ দেবার জন্য ছোট ছোট বাসন। পুজোর ঘরে অনেকক্ষণ বসে থাকত রোজ। কুসংস্কারও ছিল নানারকম। বৃহস্পতিবারের বারবেলা মানত, শনিবারে বাড়ি থেকে যেতে দিত না কাউকে। কাককে রোজ খেতে দিত। কারো অসুখ হলে সিন্নি মানত করত নানা দেবতার কাছে। মণিহারীর পীরবাবার উপর বিশ্বাস ছিল খুব। প্রায়ই সিন্নি মানত পীরবাবাকে। কুষ্ঠি মানত। প্রায়ই জানতে চাইত সে সধবা মরবে কি না। বুদ্ধিমতী ছিল খুব, দূরদর্শিনীও ছিল, কিন্তু মনের জোর একেবারে ছিল না। বাড়িতে কোনো বিপদ-আপদ হলে একেবারে ভেঙে পড়ত। কারো অসুখ হলে বা কারো অসুখের খবর পেলে রাত্রে ঘুম হত না। ছেলেরা যখন বিদেশে পড়াশোনা করত তখন চিঠি পেতে দেরি হলে ব্যাকুল হয়ে উঠত। চিঠি এসেছে কি না জানবার জন্য নিজে পোস্টাফিসে পর্যন্ত চলে যেত। বিদেশে ছেলেদের অসুখের খবর পেলে নিজে সেখানে চলে গেছে অনেকবার। শুধু নিজের ছেলেদের নয়, অপরের ছেলেদের অসুখও অস্থির করে তুলত তাকে। ঝি-চাকরের ছেলে-মেয়েদের অসুখ হলেও সেই একই ব্যাপার। যতক্ষণ না তারা সুস্থ হচ্ছে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হত আমাকে। প্রতি বছর পাড়ার সমস্ত ছেলেমেয়ের টিকে দেবার ব্যবস্থা করত সে। টিকেদারকে খবর পাঠিয়ে নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে টিকে দেওয়াত সবাইকে। কারো কষ্টের খবর পেলে—তা সে আত্মীয় অনাত্মীয় যে-ই হোক—সেটা মোচন করবার চেষ্টা করত। অনেক গরিবকে সাহায্য তো করতই, তাতে কেউ বাধা দিলে চটে যেত খুব। কোনোরকম নীচতা সহ্য করতে পারত না। তার এই উদারতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, দয়া-দাক্ষিণ্য, তার রস-বোধ, শিল্প-প্রীতি, ঠাকুর-দেবতার প্রতি ভক্তি—এসব তো ছিলই—অনেকেরই থাকে—কিন্তু এ ছাড়াও ওর চরিত্রে আরও দুটো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি—যা অসাধারণ। মাঝে মাঝে সে অন্যমনস্ক হয়ে যেত। দেখতাম জানলার ধারে চুপ করে বসে আছে আকাশের দিকে চেয়ে। মনে হত সে যেন পৃথিবীতে নেই, আর কোথাও চলে গেছে। আমি পাশে গিয়ে দাঁড়ালেও সে বুঝতে পারত না আমি এসেছি। নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত মহাশূন্যের দিকে। যদি প্রশ্ন করতাম, এখানে বসে কি দেখছ? সে চমকে উঠত। তারপর একটু হেসে বলত, আমরা সবাই একদিন ছবি হয়ে যাব, সেই কথাই ভাবছিলাম।

'এই বৈরাগ্যের সুর ছাড়া আর একটা সুরও লক্ষ্য করেছি তার চরিত্রে। উপমা দিয়ে বলতে হলে বলতে হয়—সেটা অগ্নির সুর, যে অগ্নি পাবক, যে অগ্নি উজ্জ্বল। সেই অগ্নির সুর। কোনও হীনতা, কোনও নীচতা, কোনও পাপ, কোনও মিথ্যা, কোনও অনাচার, কোনও অভব্যতার সঙ্গে কখনও সে আপস করেনি।। তার চারিত্রিক এই অগ্নি পুড়িয়ে ফেলত সমস্ত অপবিত্র জঞ্জালকে। কারও মধ্যে কোনও মালিন্য সহ্য করতে পারত না সে। তাই অনেকে তাকে ভয়ও করত, ভালোও বাসত। আমাদের চাকর-বাকর, মেছো গোয়ালা সকলেরই ভালোবাসা আকর্ষণ করেছিল ও। আমার সাহিত্যিক বন্ধুরা—বাঙালি, বিহারি, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, মুসলমান, ইয়োরোপীয়, এমন কি জাপানি—যাঁরা আমার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন—তাঁরা সকলেই প্রিয়জন ছিল ওর। সে কারও বৌদি, কারও ভাবী, কারও মাতাজি ছিল। আর আমার জন্যে সে না করেছে কি। আমার অসুখে কি ব্যস্তই যে হত। ভালো না হওয়া পর্যন্ত শান্তি থাকত না ওর মনে। আমার ডায়াবিটিশ আছে। তাই আমার খাওয়া-দাওয়ার উপর কড়া নজর রাখত। বেশি মিষ্টি যেন না খেয়ে ফেলি। অথচ আমার জন্যে সে কত রকম রান্নাই শিখেছিল। যখন ওর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তখন ও বেথুন কলেজে পড়ত, বরাবর বোর্ডিংয়ে মানুষ, কোনো রকম রান্নাই জানত না। কিন্তু বিয়ের পর যখন ও আবিষ্কার করল আমি খাদ্যরসিক, ভোজনবিলাসী, তখন রান্না শিখতে লাগল, কত রকম রান্নাই যে শিখেছিল। কখনও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারত না। আমি যেখানে যত সাহিত্য-সভায় গেছি, ও আমার সঙ্গে গেছে, কিন্তু সভায় কখনও আমার পাশে বসত না। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যায়, এমন কি রেঙ্গুনেও গিয়েছিল আমার সঙ্গে। সারা দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করেছি ওকে নিয়ে। রামেশ্বর, কন্যাকুমারিকা, ধনুষ্কোটি সর্বত্র ও আমার সহচরী ছিল। আমাকে ছেড়ে থাকতে পারত না। আমার যখন গল্-ব্লাডার (Gall-bladder) অপারেশন হল ও আমাকে একা নার্সিং হোমে যেতে দিল না। শেষে আমার কেবিনে ওর জন্যেও একটা খাটের ব্যবস্থা করতে হল। তিন সপ্তাহ নার্সিং হোমে ছিলাম। আমার জন্যে 'ডে নার্স' 'নাইট নার্স' ছিল। ও কিন্তু দিবারাত্রি জেগে বসে থাকত অতন্দ্র প্রহরীর মত। অপারেশনের পর আমার অবস্থা একদিন খুব খারাপ হয়েছিল—ও কিন্তু বিচলিত হয়নি। ওর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আমি ভালো হয়ে উঠবই। যম তার কাছ থেকে আমাকে কিছুতেই কেড়ে নিতে পারবে না। সাবিত্রীর কথা মনে পড়ে। ও আমাকে বার বার বলত—আমি তোমার আগে যাব। তুমি থাকবে না, আমি থাকব—এ হতেই পারে না। ভগবান এ শাস্তি আমায় কেন দেবেন, আমি তো কোনও পাপ করিনি। ভগবান তার ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন। আমি কিন্তু বড় একা হয়ে গেছি—'

আমি চুপ করলাম।

বিজ্ঞানী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'উনি আপনার যে বর্ণনা দিলেন সেটা ঠিক হয়েছে তো?

'বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলেছেন।'

বিজ্ঞানী বললেন, 'আমার সৃষ্টির উপকরণ আমি পেয়ে গেছি— এবার আমি সৃষ্টি করব। আপনাদের কিন্তু এখান থেকে সরে যেতে হবে। কেউ কাছে থাকলে আমি সৃষ্টি করতে পারি না।'

'কি সৃষ্টি করবেন আপনি? মূর্তি?'

'না, ছবি। জীবন্ত ছবি—'

'কোথায় ছবি আঁকবেন?'

'মহাকাশে। আপনারা কাছে থাকলে কিন্তু পারব না।'

'আমরা কোথায় যাব?'

বিজ্ঞানী চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, 'আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিছু?'

'আগে পাচ্ছিলাম না, এখন পাচ্ছি। মনে হচ্ছে একটা স্নিগ্ধ কিন্তু উজ্জ্বল আলোর মধ্যে রয়েছি।'

'ধ্রুবলোকে এলে মনে হয় দেহ সহস্র ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি অর্জন করে। আপনার স্ত্রী তা অর্জন করেছেন, কারণ কিছুদিন আগে তিনি ধ্রুবলোকে এসেছিলেন। আপনারা সামনের দিকে চেয়ে দেখুন তো একটা কালো মত কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি?

'হাঁ একটা ছোট কালো মেঘের মত কি যেন দেখা যাচ্ছে—'

ওটা মেঘ নয়। ওটা কালো দেখাচ্ছে, কারণ ওখানে কোনও নক্ষত্র নেই। নক্ষত্রের আলোও ওখানে পৌঁছয় না। কয়েক কোটি মাইল বিস্তৃত স্থান ওটা। ইচ্ছে করলেই ওর মধ্যে যাওয়া যায়। আমি একবার গিয়েছিলাম। কয়েক কোটি মাইল অন্ধকার পার হয়ে দেখতে পেয়েছিলাম এক আশ্চর্য নক্ষত্রপুঞ্জ। বহু বর্ণের বহু নক্ষত্র পুঞ্জীভূত হয়ে স্থির হয়ে আছে সেখানে। জিগ্যেস করেছিলাম, 'কে আপনারা?' উত্তর পেয়েছিলাম, 'আমাদের নাম পুরাণ। আমাদের ভুলে গেছ তোমরা। আমরা ক্রমশ অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাচ্ছি।' অনেক অদ্ভুত গল্প শুনিয়েছিলেন আমাকে। আপনারা সেইখানে চলে যান, গল্প করে অনেকক্ষণ সময় কেটে যাবে। আপনারা মনোময় দেহ ধারণ করে আছেন, আপনারা ইচ্ছে করলেই ওর মধ্যে ঢুকে পড়তে পারবেন। ওই পুরাণপুঞ্জের কাছে পৌঁছতেও বেশি সময় লাগবে না। কেউ ওদের কাছে গেলে ওঁরা খুব খুশি হন!'

সে বলল, 'চল—'

সে বরাবর আমার হাত ধরেই ছিল। এক মুহূর্তের জন্য ছাড়েনি।

তার মনোময় দেহের নিবিড় স্পর্শের ভিতর দিয়ে অনুভব করছিলাম তার আকুলতা। সে যেন সর্বদা সোৎসুকে প্রতীক্ষা করছিল—এর পর কি হয়। আমার বাঁ হাতের কব্জিটা দৃঢ়ভাবে ধরেছিল সে। আমার মনোময় সূক্ষ্ম দেহ থেকে কি করে হাত বের হল, তা আমি বুঝতে পারছিলাম না। সে যা বলেছিল তাই মেনে নিয়েছিলাম। প্রবল ইচ্ছায় সবই হওয়া সম্ভব।

'চল, আর দেরি করছ কেন।'

আমি তখন বিজ্ঞানীকে জিগ্যেস করলাম, 'কি করে বুঝব যে আপনার সৃষ্টি শেষ হয়েছে?'

'আমি খবর পাঠাব। একটা আলোর রেখা গিয়ে আপনাদের চোখের সামনে দাঁড়াবে। পুরাণ নক্ষত্রপুঞ্জকেও আমি খবর পাঠাচ্ছি। তাঁরা আপনাদের জন্য অপেক্ষা করবেন।

আমরা আর কালবিলম্ব না করে যাত্রা করলাম সেই কালো স্থানটার উদ্দেশে। মহাশূন্যে ধ্রুবলোকে পার হয়ে সে যাত্রা যে কি অপরূপ, কি বিস্ময়কর, তা বর্ণনা করা যাবে না। ডাইনে, বাঁয়ে, মাথার উপর, পায়ের নীচে অগণিত নক্ষত্র। দূরে দূরে দ্বীপের মত অসংখ্য নীহারিকা। ধ্রুবনক্ষত্রের কাছে থুবান (Thuban) নক্ষত্রটিকে দেখতে পেলাম। পৃথিবী থেকে খুব ছোট দেখাত, এখন দেখলাম খুব প্রকাণ্ড নক্ষত্র সেটি। মনে হল আমরা যেন, জ্যোতির্ময় নক্ষত্রের অরণ্য পার হচ্ছি। চারিদিকে যেন অগ্নির মহোৎসব চলছে। কিছুক্ষণ পরে সেই অন্ধকার স্থানটায় এসে উপস্থিত হলাম। দূর থেকে যেটাকে ছোট কালো মেঘ বলে মনে হচ্ছিল, কাছে এসে দেখলাম অতি বিশাল গুহার মুখ একটা। সে মুখের পরিধি তা আন্দাজ করাও শক্ত। হয়তো কয়েক কোটি মাইল। আদি অন্তহীন নিবিড় অন্ধকার-লোকের সামনে স্তম্ভিত হয়ে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম ক্ষণকাল। তারপর মনে হল সেই

অন্ধকার-লোক থেকে নীরব একটা বাণী যেন সঞ্চারিত হচ্ছে আমাদের মনের ভিতর। অদ্ভুত সে বাণী। আমাদের ভাষায় তা অনুবাদ করি যদি, অর্থহীন মনে হবে। মনে হল সেই অন্ধকার যেন ক্রমাগত জপ করে যাচ্ছে—'কিছু নেই সব আছে, কিছু নেই সব আছে, কিছু নেই সব আছে, কিছু নেই সব আছে—'

আমরা ভিতরে ঢুকে পড়লাম।

।। দশ ।।

চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার, আর সেই অন্ধকারে অবিরাম সেই বাণী—কিছু নেই সব আছে, কিছু নেই সব আছে। মাঝে মাঝে, চাপা কান্না, চাপা হাসিও শুনতে পাচ্ছিলাম। আমাদের মনোময় দেহ খুব দ্রুতবেগেই যাচ্ছিল তবু মনে হচ্ছিল যেন যুগযুগান্ত পার হয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে একটি জ্যোতির্ময়ী মূর্তির সঙ্গে দেখা হল। তিনি ফিরছিলেন। আমাদের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়াতে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। মনে হল ইনি মানবী নন, দেবী। মনে মনে প্রণাম করে প্রশ্ন করলাম—'আপনি কে? আমরা পুরাণ নক্ষত্রপুঞ্জের কাছে যেতে চাই, আর কতদূর যেতে হবে বলতে পারেন? আগে বলুন আপনি কে? মনে হচ্ছে স্বর্গের দেবী আপনি।'

'না আমি স্বর্গের কেউ নই। আমি মর্ত্যের। আমার নাম সাবিত্রী। বহুকাল আগে আর্যাবর্তে আমার বাড়ি ছিল—'

'ও, আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনি সতীকুলশিরোমণি। ছেলেবেলায় আপনার গল্প পুরাণে পড়েছি। আপনি যমের কবল থেকে আপনার স্বামী সত্যবানকে উদ্ধার করেছিলেন—'

'ওটা ভুল গল্প। যম আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দেননি। যম মানে নিয়ম। যম ইচ্ছা করলেও নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন না। তবে তিনি আমার আকুলতা দেখে খুব বিচলিত হয়েছিলেন। আমাকে হঠাৎ তিনি বর দিয়ে ফেললেন, 'তুমি ফিরে যাও, তুমি শত-পুত্রের জননী হবে।' আমি তখন বললাম, 'আমার স্বামীকে আপনি নিয়ে যাচ্ছেন, শত-পুত্রের জননী হব কি করে?' যম স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, 'তোমার স্বামীর আয়ু নিঃশেষ হয়েছে। তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার সাধ্য আমার নেই। তোমার স্বামীর দেহ এখনও পড়ে আছে, আমি বর দিচ্ছি তোমার স্বামীকে তুমি আবার সৃষ্টি করতে পারবে। তোমার প্রবল আকুলতাই তোমার স্বামীর মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করতে পারবে।' আমি তাই করেছিলাম। কিন্তু আমরা যে নীহারিকায় বাস করি, কাল সেখানে একজন সতী রমণী এসেছেন আর্যাবর্ত থেকে। তাঁর মুখে শুনলাম তিনিও নাকি পুরাণে পড়েছেন যে যম নাকি আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তাই আজ আমি ওই অন্ধকার-লোকে এসেছিলাম পুরাণ নক্ষত্রপুঞ্জের কাছে। অতীতের প্রাচীন পুরাণকাররা নক্ষত্রপুঞ্জ হয়ে আছেন এখানে। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম তাঁদের পুরাণে এ ভুল কেন এবং তা এখন সংশোধন করা যাবে কিনা। তাঁরা বললেন, আমরা ঠিকই লিখেছিলাম, কিন্তু মানুষরা কালক্রমে গল্পটাকে নিজেদের খুশি মত বদলে নিয়েছে। আমরা লিখেছিলাম হাতে, এখন ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হচ্ছে সব। ভূর্জপত্র থেকে নকল করবার সময় ভুল-ভ্রান্তি ঘটেছে। অনেকে নিজেদের খুশি মত অনেক কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছে এর মধ্যে। আর সে সব কাহিনী বহু লোকের মনে গাঁথা হয়ে গেছে বহুদিন ধরে। ও আর সংশোধন করা

যাবে না। এই উত্তর নিয়ে ফিরে যাচ্ছি।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'জীবন্ত মানুষ সৃষ্টি করা তাহলে সম্ভব?'

'প্রবল আকুলতা, অদম্য ইচ্ছা, আর নির্মল নিষ্ঠা থাকলে সবই সম্ভব। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে সৃষ্টিকর্তা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছেন তিনি তখন উদ্বুদ্ধ হন। তিনিই সৃষ্টি করেন। আপনারা পুরাণ নক্ষত্র-পুঞ্জের কাছে যাচ্ছেন কেন?'

'কিছু সময় কাটাবার জন্য। একজন বিজ্ঞানী ধ্রুবলোকে আছেন। আমার স্ত্রী কিছুদিন আগে মারা গেছেন। আমার পাশেই মনোময় দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি—'

'দেখতে পেয়েছি। ওঁর শরীরের আভা থেকে বুঝতে পারছি উনি পুণ্যবতী। আপনি কি করে এখানে এলেন?'

'বহু চেষ্টার পর আমি আমার মনকে আমার দেহ থেকে বার করে আনতে পেরেছি। সেই বিজ্ঞানীর কাছে গিয়ে আমার স্ত্রীর বিবরণ দিয়েছি তাঁকে। তিনি বললেন, যে উপকরণ তিনি পেয়েছেন তার থেকে কিছু একটা সৃষ্টি করতে পারবেন। তিনি এখন সেই সৃষ্টিকার্যে ব্যাপৃত আছেন। তাই আমরা তাঁর আদেশে তাঁর কাছ থেকে সরে এসেছি। তিনিই বললেন, আপনারা পুরাণ-নক্ষত্রপুঞ্জের কাছে যান, নানারকম গল্প শোনাবেন তাঁরা, আপনাদের সময় বেশ ভালোভাবেই কেটে যাবে।'

সাবিত্রী বললেন, 'তা যাবে। কিন্তু বিজ্ঞানীর কি প্রয়োজন ছিল? আপনিইতো সৃষ্টি করতে পারতেন আপনার স্ত্রীকে! কিন্তু তাকে আর মর্ত্যে ফিরে পাবেন না, কারণ তার দেহ দাহ করা হয়ে গেছে। আমার স্বামীর দেহ ছিল তাই তাকে আমি দেহসুদ্ধ পেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি তাকে মনোলোকে সৃষ্টি করতে পারবেন। দেখুন বিজ্ঞানী কি করেন। আমি চললাম—'

'আপনি কোথায় থাকেন?'

'আমি থাকি ছোট্ট একটা নীহারিকার মধ্যে। মর্ত্যের বিজ্ঞানীর দূরবিন দিয়েও এর নাগাল পায়নি এখনও।

'একা থাকেন সেখানে?'

'না। আমার সঙ্গে আছেন সীতা, সতী, দয়মন্তী। আজ আর একজন এসেছেন। আপনাদের সঙ্গে গল্প করতে পারছি না। চলে যাচ্ছি তাই।'

'আপনারা যেখানে থাকেন সেখানে আমরা যেতে পারি কি?'

'তা তো জানি না আমি। কে কোথায় থাকবে তা ঠিক করেন কে তা তো জানি না। মৃত্যুর পর সারা আকাশে ঘুরে বেড়াতে হয়—আপনার স্ত্রী যেমন বেড়াচ্ছেন, তারপর পুনর্জন্ম যদি না হয়, তিনি ক্রমশ একটি বিশেষ নীহারিকা-লোকের অধিবাসী হয়ে যাবেন। কি করে যাবেন তা জানি না। এখানে কিছু স্পষ্ট, কিছু রহস্যময়। আচ্ছা, এবার যাই আমি—'

অপরূপ দ্যুতি বিকিরণ করতে করতে চলে গেলেন সাবিত্রী। একটা চলমান জ্যোতি যেন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

'চল—'

'চল।—তুমি একেবারে চুপ করে আছ যে?'

সে কোনও উত্তর দিল না। আমার হাতটা আরও জোরে চেপে ধরল শুধু।

অবশেষে পৌঁছলাম পুরাণ-নক্ষত্রপুঞ্জের কাছে। মনে হল একটা বিশাল মৌচাক যেন শূন্য থেকে নেমে এসেছে সেই তিমির-লোকে। সেই মৌচাকে নানাবর্ণের অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলছে। মৌচাকের উপর যেমন অসংখ্য মৌমাছিরা বসে থাকে, এখানে তেমনি আছে নানাবর্ণের জ্যোতিষ্ক। তারা এত ঘন-সন্নিবিষ্ট যে মনে হয় তারা যেন জমে গেছে, পরস্পর পরস্পরের অঙ্গীভূত হয়ে একটা পরমাশ্চর্য দৃশ্য সৃষ্টি করেছে। আমরা নিকটবর্তী হতে সেই নক্ষত্রপুঞ্জই সম্বোধন করলেন আমাদের।

'বিজ্ঞানী তপস্বী বুঝি আপনাদের পাঠিয়েছেন? আসুন, আসুন, স্বাগত—'

ওই বহুবর্ণ নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে কে যে আমাদের স্বাগত জানালেন বুঝতে পারলাম না। সমস্ত নক্ষত্রপুঞ্জটাই যেন প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। মনে হল আমাদের আগমনে আনন্দিত হয়েছেন ওঁরা। ব্যক্তও করলেন সেটা।

'অতীতের অন্ধকারে হারিয়ে গেছি আমরা। বদলেও গেছি। আগে ছিলাম ইতিহাস, এখন হয়েছি রূপকথা। সে রূপকথাও শুনতে আসে না কেউ। শ্মশানে শৈব্যার হাহাকার আমরাই শুনি, আমরাই কেবল দেখি রাজা শিবি নিজের দেহের মাংস শ্যেনপক্ষীকে দান করেছেন, মহারাজা কর্ণ ছদ্মবেশী ভগবানকে আতিথেয়তায় তুষ্ট করছেন নিজের পুত্র বৃষকেতুকে বলিদান দিয়ে। আমরাই শুধু দেখতে পাচ্ছি মহর্ষি দধীচি বজ্র নির্মাণের জন্য নিজের অস্থি দান করেছেন। আমরাই শুধু দেখছি এসব। আর কেউ দেখে না, দেখতে চায় না। যে সভ্যতার হর্ম্য আজ তারা নির্মাণ করছে, তার ভিত্তি যে কোথায় তা জানবার আগ্রহ তাদের নেই। বসুন, আপনারা এসেছেন, এতে ভারি খুশি হয়েছি আমরা।'

বললাম, 'আমরা তো শূন্যে রয়েছি, কোথায় বসব?'

'আসন আছে। অন্ধকার জমে গিয়ে শক্ত হয়ে গেছে আমাদের চারিদিকে। সেখানেই বসুন আপনারা। মনোময় দেহেরও ক্লান্তি আসে। আপনারা বসুন। তা বসলে গল্প জমবে না। বসুন।'

যদিও আমাদের দেহ ছিল না, তবু উপবেশন করবার প্রয়াস করলাম। একটু আরামও পেলাম যেন। মনে হল একটা পাথরের চাঙড়ের উপর বসেছি।

এখানেও মন হল সেই, 'সব আছে, কিছু নেই', শব্দটা ফিস ফিস করে কে যেন বলছে।

প্রশ্ন করলাম নক্ষত্রপুঞ্জকে।

'এখানে যে কেন ফিস ফিস করে সর্বদা বলছে, সব আছে, কিছু নেই, সব আছে, কিছু নেই। আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন?'

'পাচ্ছি। সর্বদা পাচ্ছি। বহু প্রাচীনকালের কোনও দার্শনিক কবির জীবনের উপলব্ধি ওই বাণী-রূপ ধরে এই অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর সরল অর্থ—জগতে সবই পরিবর্তনশীল। আজ যে জগৎ আপনারা দেখছেন তা কিছুকাল পরে আর থাকবে না, কিন্তু লুপ্তও হবে না। অন্যরূপে থাকবে। যাকে আমরা মৃত্যু বলে মনে করি, তা বিলুপ্তি নয়, তা পরিবর্তন। পরিবর্তন না হলে সৃষ্টির লীলায় বৈচিত্র্য থাকত না। সব একঘেয়ে একরঙা হয়ে যেত। ওই মহাকবির বাণী তাই বলছে—সবই আছে, অথচ কিছুই নেই। সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মূল তত্ত্ব ওটা। আপনি ভাবছেন আপনার স্ত্রী মারা গেছেন, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছেন তার আভাময় আর একটি মনোময় রূপ। ওই বিজ্ঞানী হয়তো অণু-পরমাণু দিয়ে ওঁর আর একটা রূপ তৈরি করবেন, কিন্তু আপনি তাঁকে যেভাবে পেয়েছিলেন সে ভাবে পাবেন না আর। ঠিক একরকম সৃষ্টি দুবার হয় না। এক গাছের দুটি পাতা ঠিক একরকম নয়—'

তার হাতের স্পর্শ দৃঢ়তর হল এ কথা শুনে। কিন্তু সে কিছু বলল না।

পুরাণ-নক্ষত্রপুঞ্জ বলতে লাগলেন, 'ওই বিজ্ঞানী কিন্তু একজন মেধাবী তপস্বী। সম্প্রতি উনি একটা আলোর পরী তৈরি করেছেন। পরীটা ফাজিল, মাঝে মাঝে আমাদের কাছে এসে ভয় দেখায়। বলে, আপনাদের তপোভঙ্গ করব। আমরা বলি, কর না। করলে তো বেঁচে যাই। কিন্তু আমাদের তপ আর নেই। আমরা এখন শুধু। আমরা স্থাণু, আমরা জীবন্মৃত, আমাদের অস্তিত্ব জমে গেছে। মহাকালের হাতুড়ি ছাড়া, আর কিছু দিয়ে তা ভাঙা যাবে না। পরীটা হাসতে হাসতে পালিয়ে যায়। বিজ্ঞানীর এ সৃষ্টিটি অপরূপ হয়েছে। এই বিরাট মহাকাশে একটি উজ্জ্বল কণিকার মত ভেসে বেড়াচ্ছে। যখন আমাদের কাছে আসে খুব ভালো লাগে—'

থেমে গেলেন নক্ষত্রপুঞ্জ। ওদের মধ্যে কে যে কথা কইছেন তা বুঝতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল ওই বিরাট মৌচাকটাই যেন উত্তর দিচ্ছে আমার প্রশ্নের।

আমি আবার প্রশ্ন করলাম, 'এই যে বিরাট মহাসৃষ্টি এ কি করে হল সে সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা আছে কিছু—'

'সৃষ্টি যখন হয়েছিল তখন প্রত্যক্ষদর্শী কেউ ছিল না। আমাদের যে ধারণা আছে তার ভিত্তি হচ্ছে আমাদের পূর্ববর্তী মহর্ষিদের উক্তি। সে উক্তির সত্যতা যাচাই করবার উপায় নেই। আমরা তাঁদের উক্তি বিশ্বাস করেছি। কারণ তাঁরা সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ ছিলেন বলেই আমাদের ধারণা। তাঁরা যা বলেছেন তাই শুনুন। এ সৃষ্টি যখন শুরু হয় তার বহু কোটি বৎসর পরে জন্ম হয় প্রাণীদের। এ সৃষ্টির আদিলীলা কেউ দেখেনি। নানারকম ঋষি নানারকম অনুমান করেছেন। তবে সবাই এটা স্বীকার করেছেন যে সৃষ্টি যখন হয়েছে তখন স্রষ্টাও আছেন। তবে সে স্রষ্টা আমাদের মত মানুষ নন। তিনি নিরাকার মহাশক্তি। তিনি স্বয়ম্ভু। আমাদের পূর্ববর্তী তপস্বীরা তার নাম দিয়েছিলেন ব্রহ্ম। তিনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, নিরাকার, নির্বিকার। এই নিরাকার নির্বিকার মহাশক্তির ইচ্ছা হল—আমি বহু হব। সেই ইচ্ছাই নাকি রূপ ধারণ করেছে মহাবিশ্বে। কি করে এ মহাবিশ্ব হল তা কেউ জানে না। একজন কবি এ বিষয়ে অদ্ভুত একটা কল্পনা করেছিলেন। সেটা আমাদের বলেছিলেন তিনি। সেটা শুনুন। তাঁর মতে ব্রহ্মের এই ইচ্ছা প্রথম রূপ ধারণ করেছিল তেজরূপে। সেই তেজ ক্রমশ অগ্নিরূপে আত্মপ্রকাশ করল। তাঁর মতে সমস্ত আকাশ জুড়ে সেই অগ্নির শিখা কোটি কোটি বছর ধরে দাউ দাউ করে জ্বলেছিল। তারপর সেটা কোটি কোটি বছর ধরে ঠাণ্ডা হল এবং অবশেষে কঠিন হয়ে গেল। সমস্ত আকাশটা তখন বিরাট দিগদিগন্তব্যাপী উত্তপ্ত মাঠের মত রইল কিছুদিন।

কিছুদিন মানে—কোটি কোটি বৎসর। তারপর বিপুল একটা বিস্ফোরণে ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। কত দিকে তার ঠিক নেই। মাত্র সেই ফাটা টুকরোগুলোই নক্ষত্র নীহারিকার আদি রূপ। তারা পরস্পরের আকর্ষণে বহুকাল ঘুরেছে। তারপর তাদের বর্তমান রূপ হয়েছে। অধিকাংশ নক্ষত্র জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড। তবে আসল কথাটা তো আগেই বলেছি—সত্য কি তা কেউ জানে না। এক একজন ঋষি নিজেদের ধ্যানে বা নিজেদের মেধাবলে যা উপলব্ধি করেছেন তাই বলেছেন। সকলের মত একরকম নয়। নানা মুনির নানা মত। আপনার যেটা খুশি মানতে পারেন। ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই। তবে এটা মানতে হবে, যে মহাবিশ্ব আমরা দেখছি সেটা বিস্ময়কর এবং আরও বিস্ময়কর যে সেটা একটা বাঁধা নিয়মে চলছে। আমি তো এই বিরাট বিশ্বকেই ভগবান বলে মানি। যাক, আপনাদের দেখে খুব খুশি হলাম। বিজ্ঞানীর কাছে আপনাদের গভীর প্রেমের কাহিনীও শুনলাম। খুব ভালো লাগল। আপনার বাহাদুরি আছে, দেহ থেকে মনটাকে

বার করে এত দূরে চলে এসেছেন—'

বললাম, 'ওর জোরেই এসেছি। বড় একগুঁয়ে। যেটা ধরে সেটা করে তবে ছাড়ে—'

সে এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এইবার কথা বলল।

'একগুঁয়ে আমি, না তুমি? ক্রমাগত আমাকে ডাকছিল কে? মরবার পরও শান্তি দাওনি। সর্বদা তোমার পাশে থাকতে হয়েছে—ক্রমাগত বলছ তোমাকে আমি আবার সৃষ্টি করব। শেষে বিজ্ঞানীর সঙ্গে দেখা হল একদিন—'

পুরাণ নক্ষত্রপুঞ্জ বললেন, 'জানি জানি জানি, সব জানি। সব খবর পেয়েছি বিজ্ঞানীর কাছ থেকে। আমরা আরও খুশি হয়েছি আপনারা আর্যাবর্তের লোক বলে। আর্যাবর্তের কাব্যে প্রেমের মহিমা যেভাবে চিত্রিত, অন্য দেশের কাব্যে তেমন ভাবে নেই। আছে, কিন্তু অত উজ্জ্বল নয়। গ্রীক কাব্যে তো খালি কাম, প্রতিহিংসা আর হত্যার তাণ্ডব। আকাশের নক্ষত্রেও প্রেমের কাহিনী ছড়ানো আছে। আর ওই একই নক্ষত্রমণ্ডলের নাম আর তাদের ঘিরে যে-সব গল্প আছে তার থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার তফাতও বোঝা যায়। ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করে ওই যে প্রকাণ্ড নক্ষত্রমণ্ডলটা ঘুরছে আমরা তার নাম দিয়েছি সপ্তর্ষিমণ্ডল, আর পাশ্চাত্ত্য দেশে ওর নাম বড় ভালুক। পাশ্চাত্ত্য দেশে ও নিয়ে যে কাহিনী প্রচলিত সেটাও খুব উঁচুদরের কাহিনী নয়। গ্রীক দেবতাদের রাজার নাম জিউস আর তাঁর পত্নীর নাম জুনো। জুনোর এক সহচরী ছিল যার নাম কালিস্টো। জুনোর চেয়ে ঢের বেশি রূপবতী ছিল সে। হিংসুকে জুনো এটা সহ্য করতে পারছিল না। জিউসের দুর্বলতা ছিল মেয়েটির প্রতি। জুনো তাই কালিস্টোকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করছিল। জিউস তখন কালিস্টোকে বাঁচাবার জন্য তাকে প্রকাণ্ড এক ভালুকে রূপান্তরিত করে আকাশে পাঠিয়ে দিলেন। আমাদের সপ্তর্ষিমণ্ডলের গল্পেও প্রেমের ছোঁয়াচ আছে একটু। সপ্তর্ষির সাতটি ঋষির নাম—ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, মরীচি। এঁদের সাত পত্নী ছিলেন পরম রূপবতী। স্বয়ং অগ্নি এঁদের প্রেমে পড়ে গেলেন। অগ্নির আর একটি প্রণয়িনী ছিলেন। তাঁর নাম স্বাহা। তিনি তাঁর দয়িতের জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত। তিনি যখন দেখলেন অগ্নি ওই ঋষি-পত্নীদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন কিন্তু কিছুতেই তাঁদের পাচ্ছেন না, তখন স্বাহা এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। প্রত্যহ একটি ঋষি-পত্নীর রূপ ধারণ করে অগ্নির সঙ্গে মিলিত হতে লাগলেন তিনি। কিন্তু বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতী এত বেশি সতী ছিলেন যে স্বাহা কিছুতেই তাঁর রূপ ধারণ করতে পারলেন না। বাকী ছজন ঋষি-পত্নীর নামে নানারকম কুৎসা ওঠাতে ছ'জন ঋষি তাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ কর্তন করে দিলেন। তারা কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ হয়ে আকাশে আলাদা হয়ে আছেন। অরুন্ধতী কিন্তু এখনও আছেন বশিষ্ঠের পাশে। সপ্তর্ষিমণ্ডলকে নিয়ে দু দেশের দু রকম গল্প। এই দুটো গল্প থেকে দু দেশের চরিত্র বোঝা যায়।

পাশ্চাত্ত্য দেশের লোকেরা শিকার-প্রিয় তাই তাদের নক্ষত্রের নামও বড় বড় শিকারী বা বীরের নাম। আমরা যাকে কালপুরুষ বলি, ওদের চোখে সে একজন শিকারী মাত্র। আমাদের কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলে আছে—ব্রহ্ম তারা, দুর্গা তারা, রুদ্র তারা, অগ্নি তারা, বৃহস্পতি তারা, অদিতি তারা, কার্তিক তারা, ধর্ম তারা, গণেশ তারা, যমুনা তারা, অনন্ত তারা। ওদের শিকারী 'ওরায়ন' মণ্ডলে শিকারীর কোমরবন্ধ, সেখান থেকে তলোয়ার ঝুলছে, হাতে ধনুক, পিছনে কুকুর, সামনে ষাঁড়। আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলের নামকরণে আমরা স্থান দিয়েছি দেবতাদের আর ঋষিদের। ওদের খালি শিকারী আর জানোয়ার নিয়ে কারবার। আমাদের পুরাণেও বড় বড় বীরের নাম আছে—অর্জুন, ভীম—কিন্তু

আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলে ভীম মণ্ডল বা অর্জুন মণ্ডল নেই। ওদের আছে—পারসিউস, হারকিউলিস। ওদের জন্তু-জানোয়ার অনেক বেশি। আমাদের রাশিচক্রেও অবশ্য জন্তু-জানোয়ার আছে। ওটা বোধহয় আমরা নিয়েছি বিদেশ থেকে। রাশিচক্রে মিথুন, কন্যা, ধনু, তুলা আর কুম্ভ ছাড়া সবই জন্তু-জানোয়ারদের নাম। রাশিচক্রের নক্ষত্রগুলিতে আমরা ওদের নকল করেছি। জ্যোতিষ্ক-চর্চার সঙ্গে ফলিত জ্যোতিষ-চর্চা মিশে গেছে। আমরা ছায়াপথকে বলি আকাশগঙ্গা, ওরা বলে দুগ্ধের পথ। এসব থেকে মনে হয় আর্যাবর্তের লোকেরা বেশি ধর্মপ্রবণ—'

আমি বললাম, 'আর্যাবর্ত বলে কোনও দেশ আর নেই। সে দেশের লোকেদের মতি-গতিও বদলে গেছে। অধিকাংশ লোকই অধার্মিক—'

'আর্যাবর্ত বলে কোনো দেশ নেই আর?'

'না। ভারত, হিন্দুস্থান আর ইন্ডিয়া এই তিনটি নামেই পরিচিত এখন আমাদের দেশ।'

'তা হোক। সুবর্ণের নাম কনক, স্বর্ণ, সোনা। কিন্তু বস্তুটির রূপ গুণ বদলায়নি। অন্তরের অন্তস্থলে খোঁজ করে দেখুন, দেখবেন সনাতন আর্যাবর্ত বেঁচে আছে, যার জীবনের মূল লক্ষ্য ধর্ম, প্রধান আনন্দ ধর্মে। অধার্মিক লোক সব যুগেই ছিল। রাবণ কংসেরা সব যুগেই জন্মায় আর সব যুগেই মারা যায়। তাদের মারেন যম, যার অপর নাম ধর্ম। আপনাদের মন ধর্ম-মুখী, তা প্রেমের সুরে বাঁধা। আপনি যে কাণ্ডটা করেছেন তার মূলে আছে ধর্ম-বিশ্বাস, পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় আস্থা। আপনি বিশ্বাস করেন যে আপনার ধর্মপত্নী আপনার জন্ম-জন্মান্তরের সঙ্গিনী। আপনি বিশ্বাস করেন যে মৃত্যুর পর তিনি অবলুপ্ত হননি, মনোময় দেহ ধারণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মহাকাশে। এ বিশ্বাস আছে বলেই আপনি এত কষ্ট করে এসেছেন এত দূরে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, আপনি তাঁকে সৃষ্টি করতে চাইছেন কেন?'

আমি বললাম, 'আমার কল্পনা কৌতূহল আর বিরহ আমাকে একাজে প্রবৃত্ত করেছে। আমার মধ্যে যে স্রষ্টা ঈশ্বর আছেন তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন—'

'ঈশ্বর সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি রকম? তিনি আপনার ফরমাস মত আপনার স্ত্রীকে সৃষ্টি করে দেবেন?'

'স্বয়ং ঈশ্বরকেই তো আমরা সৃষ্টি করেছি। নানা লোকের কাছে তাঁর নানা রূপ। তাই আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতা। সকলকেই আমরা সৃষ্টি করেছি আমাদের কল্পনায় আর বিশ্বাসে। কারো কাছে ঈশ্বর মা, কারো কাছে পিতা, কারো কাছে নিরাকার ব্রহ্ম, কারো কাছে সুবিরাট শক্তিপুঞ্জ। এ সৃষ্টি করে আমরা তৃপ্তি পেয়েছি। আমার কাছে তিনি সর্বশক্তিমান খেয়ালী শিল্পী। নিয়ত ভাঙছেন আর গড়ছেন। আর আমার বিশ্বাস আমার মধ্যে তিনি আছেন। সকলের মধ্যেই আছেন। বিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে যে, কোনও বস্তুই অবলুপ্ত হয় না। তার শেষ পরিণতি অতি ক্ষুদ্র বিদ্যুৎকণায়। সেই বিদ্যুৎকণারাই আবার নূতন বস্তু সৃষ্টি করে। ওই বিজ্ঞানী বলেছেন তিনি আমার স্ত্রীকে সৃষ্টি করে দেবেন। আমি তাঁর কথায় বিশ্বাস করেছি—'

'খুব আনন্দ হচ্ছে আপনার কথা শুনে। আপনি যা বললেন তার সঙ্গে আমাদের মতের মিল আছে। বিদ্যুৎকণা থেকেই স্রষ্টা আবার সৃষ্টি করবেন। কিন্তু বিজ্ঞানীর মনের মধ্যে যে স্রষ্টা আছেন তাঁর সৃষ্টি আপনার মনের মতো না-ও হতে পারে। যদি না হয় তখন আপনি কি করবেন?'

'তখন আমি নিজেই চেষ্টা করব। নিজেই তপস্যা করব।'

'বাঃ বাঃ! খুব খুশি হলাম আপনার কথা শুনে। কিন্তু সৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করতে হলে ধ্রুবলোকে আপনাকে তপস্যা করতে হবে। ধ্রুববিশ্বাস না থাকলে তপস্যা সফল হয় না। ধ্রুবলোকে তপস্যা করলে সে বিশ্বাসও আপনি পাবেন। ধ্রুবলোকে অনেক বসু আছেন। বসুরা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার তেজ ও জ্যোতি। তাঁদের কাছ থেকে আপনি সৃষ্টির প্রেরণা পাবেন। ওই বিজ্ঞানী বহুকাল তপস্যা করেছেন ধ্রুবলোকে।'

সে এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি। এইবার বলে উঠল, 'আমিও কিন্তু যাব তোমার সঙ্গে।'

পুরাণ-নক্ষত্রপুঞ্জ বললেন, 'নিশ্চয় যাবেন।'

আমি বললাম, 'স্ত্রীকে পাশে বসিয়ে কি তপস্যা হয়?'

'কেন হবে না।'

ঠিক এই সময় একটি জ্যোতির্ময় আলোকরেখা আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়াল।

বুঝলাম বিজ্ঞানী আমাদের ডাকছেন।

।। এগারো ।।

আমরা চলমান রেখাটির অনুসরণ করে সেই বিরাট অন্ধকার-লোক পার হয়ে বিজ্ঞানীর কাছে এসে পৌঁছলাম।

'ওই দেখুন—'

মনোময় দেহের দৃষ্টিশক্তি দিয়ে যা দেখলাম তা সত্যিই একটি বিরাট সৃষ্টি। মানুষ নয়, একটা দেশ। আকাশপটে রাঙানো রয়েছে অপূর্ব একটা দেশের ছবি। আ-দিগন্ত সবুজ চারিদিকে। বহুদূরে যেন সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের উপর উড়ছে সিন্ধু-শকুনরা, মাঝে মাঝে ফেন-মুকুটিত উত্তাল তরঙ্গ দেখা যাচ্ছে দু একটা। আর একদিকে নীল রঙের একটি পাহাড়। সেই পাহাড় থেকে ঝরনা ঝাঁপিয়ে পড়েছে সবুজ মাঠের মধ্যে। সৃষ্টি করেছে ছোট একটি নদী। সে নদী বয়ে চলেছে সাগরের দিকে। নদীর দুই তীরে ফুল ফুটে রয়েছে অসংখ্য। নানারঙের ফুল। মনে হচ্ছে নদীর দুই তীরে যেন পাড় বুনে দিয়েছে কোনও নিপুণ শিল্পী আর চারিদিকে একটা মৃদু সুর গুঞ্জন করে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে সমস্ত দেশটাই যেন করুণ সুর আলাপ করছে একটা। ফিকে কমলা রং আবৃত করে আছে চতুর্দিকে। তা রোদের মত তীব্র নয়, জ্যোৎস্নার মত নিবিড় নয়, তা স্বচ্ছ, সুন্দর ও মৃদু। তা অপরূপ। আকাশ আলোর ঝালর দিয়ে ঢাকা। সে আলোও তীব্র নয়, মৃদু। এই স্বপ্নময় পুরীর একধারে সবুজ মাঠের মধ্যে একটি মর্মর মন্দির রয়েছে। মন্দিরের চারিপাশে বিস্তৃত বারান্দা। মন্দিরের সামনে একটি উৎস এবং উৎসকে ঘিরে জলাশয় একটি। উৎসর উর্ধ্বমুখী জলধারা নীলাভ, জলাশয়ের জল নীল। সেই জলাশয়ের উপর কয়েকটি শ্বেত রাজহংস ভাসছে। মন্দিরের আর এক পাশে একসারি গাছ, প্রত্যেক গাছে ফুল, নানারকম ফুল। শুধু গন্ধ নয়, বর্ণ-বৈচিত্র্যেও অভিনব। প্রতি গাছে পাখিও অনেক রকম, তাদের গানে চতুর্দিক পরিপূর্ণ। সবুজ মাঠের ভিতর দিয়ে দুটি হরিণ ছুটতে ছুটতে এল। মন্দিরের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর আবার ছুটে চলে গেল। মন্দিরের কপাট খুলে বেরিয়ে এলেন একটি অপরূপ রূপসী। তার পিছু পিছু দেবশিশুর মতো কয়েকটি ছেলেমেয়ে। আর এলো কয়েকটি সাদা খরগোস। মেয়েটি রূপসী, খুবই রূপসী, মুখের ভাব অনেকটা ম্যাডোনার

মত। পরিধানে গাউন। পরক্ষণেই একটি দাসী প্রকাণ্ড একটি ঝুড়ি নিয়ে প্রবেশ করল এবং ঝুড়িটি রেখে চলে গেল আবার ভিতরে। মহিলাটি আপেল বার করে দিলেন ছেলেমেয়েদের। আর কপিপাতা বের করে দিলেন খরগোশদের। তারপর মুঠো মুঠো শস্য ছড়াতে লাগলেন বারান্দার চারিপাশে। উড়ে এল ময়ূরের দল, উড়ে এল অনেক পায়রা, উড়ে এল আরও নানারকম পাখি।

বিজ্ঞানী প্রশ্ন করলেন, 'আপনার মনোমতো হয়েছে তো?'

বললাম, 'সৃষ্টিটি আপনার অতি চমৎকার হয়েছে। কিন্তু আমি যা চাইছি তা হয়নি। ওই রূপসী মহিলার সঙ্গে আমার স্ত্রীর কিছুমাত্র সাদৃশ্য নেই।'

'নেই?'

'না। আপনি যাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি স্বর্গের দেবী। আমার স্ত্রী নন।'

'না হওয়াই সম্ভব। কারণ তাঁকে আমি দেখিনি। তাঁর মনোময় রূপটাই দেখেছি। মনে হয়েছে তিনি দেবীই। একজন দেবীর উপযুক্ত পরিবেশও সৃষ্টি করবার প্রয়াস পেয়েছি। আপনার পছন্দ হল না? এজন্য আমি খুব দুঃখিত। বিশ্বাস করুন, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—'

'আপনার কাছে আমি যে এজন্য কত কৃতজ্ঞ তা ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। এ ছবিটা তাহলে কি হবে?'

'এটা আমি মুছে ফেলছি এখনি।'

'মুছে ফেলবেন? কি করে?'

'যে শক্তিবলে অসংখ্য বিদ্যুৎকণাকে একত্রিত করে এটা সৃষ্টি করেছিলাম সেই শক্তিবলেই এদের আবার বিচ্ছিন্ন করে ছড়িয়ে দেব মহাকাশে। দেখুন না—'

বিজ্ঞানীর মনোময় দেহ থেকে একটা অদ্ভুত জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে লাগল। সবিস্ময়ে দেখলাম মুছে যাচ্ছে ছবিটা। আকাশের পটভূমিকায় আবার ফুটে উঠছে নক্ষত্ররা।

বিজ্ঞানী বললেন, 'আপনার মনোমতো সৃষ্টি আপনি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না।'

'এসব অসম্ভব গল্প কি সত্য?'

'কেন পারবেন না। কিন্তু আপনাকে তপস্যা করতে হবে ধ্রুবলোকে। কোনও বসুর যদি কৃপা লাভ করতে পারেন তাহলে আপনার ধ্যানের প্রতিমাকে বিদ্যুৎকণা দিয়ে মূর্তিমতী করতে পারবেন আপনি। তপস্যা মানেই আগ্রহময় আকুলতা। তার অসীম শক্তি। গ্রীক পুরাণে শিল্পী পিগ্‌ম্যালিয়ন তাঁর স্বহস্ত-নির্মিত প্রস্তর-প্রতিমাকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন এবং তপস্যার জোরে জীবন্তও করেছিলেন তাঁকে—'

'এসব অসম্ভব গল্প কি সত্য?'

'আপনি গণিতের প্রমাণ দিয়ে যদি মাপেন তাহলে এটাকে সত্য বলা শক্ত। কিন্তু গণিতের প্রমাণ দিয়ে সব জিনিস মাপা যায় না। অনুভূতির মাপকাঠিতে তা মাপতে হয়। আপনি আপনার স্ত্রীকে যে ভালোবাসেন এটা কি অঙ্ক কষে প্রমাণ করা যাবে? তা অনুভব করতে হবে। মানুষ আজ লোহাকে সোনা করতে পারে, পাথরই বা মানুষে রূপান্তরিত হবে না কেন? আপনাদের পুরাণে পাষাণী অহল্যা রামের পদস্পর্শে আবার মানুষ হয়েছিল। আপনার প্রবল আগ্রহই বা জীবন্ত করবে না কেন আপনার মানস-প্রতিমাকে? আপনার কল্পনাকে আপনি রূপ দিতে পারবেন। তপস্যা করুন—নিশ্চয় পারবেন। ধ্রুব নক্ষত্রের যতই কাছাকাছি যেতে পারবেন ততই ভালো। ধ্রুব নক্ষত্র থেকে বেরিয়েছে আর একটি

ছোট সপ্তর্ষিমণ্ডল, এই মণ্ডলে বসুরা থাকেন। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলেই আপনি সৃষ্টি করবার ক্ষমতা লাভ করবেন।' বিজ্ঞানী চুপ করলেন। মনে হল আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন তিনি।

'আমি কিন্তু তোমাকে একা যেতে দেব না।'

সে আমার বাঁ হাত এক মুহূর্তের জন্যে ছাড়েনি।

'বেশ, চল।'

এগিয়ে যেতে লাগলাম আমরা ধ্রুব নক্ষত্রের দিকে। আমরা ধ্রুবমণ্ডলেই ছিলাম কিন্তু চারিদিকে ছোট-বড় এত নক্ষত্র, যে কোনটি ধ্রুব তা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। একটি জ্যোতির্ময় শিশুমূর্তি দেখেছিলাম—সে-ই কি ধ্রুব? কে বলে দেবে আমাদের? চারিদিকে আলোয়-আলোময়, কিন্তু কোনও উত্তাপ নেই। আমাদের স্পর্শশক্তিও ছিল না। ছিল কেবল দৃষ্টিশক্তি। সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন দেখছিলাম। শব্দের সাহায্য না নিয়েও কথাবার্তাও বলছিলাম মনে মনে। কিন্তু কাকে প্রশ্ন করব? কাছে-পিঠে কেউ নেই—শুধু আলো আর আলো। আর সেআলোর মধ্যে প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধ আলোর সমুদ্রে ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগলাম। ধ্রুবকে জানবার ইচ্ছা প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছিল। সেই প্রবল ইচ্ছাই বোধহয় আলোক-সমুদ্রে একটি স্রোতের সৃষ্টি করল। সেই স্রোতে ভেসে যেতে লাগলাম আমরা। ভেসেই চলেছিলাম, এমন সময় সামনের আকাশে অত্যুজ্জ্বল কি একটা দেখা গেল। দেখলাম সেটা আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। কাছে আসতে দেখলাম সেটা গোল নয় দীর্ঘাকার, অনেকটা ছোট একটা এরোপ্লেনের মত—কিন্তু ঠিক এরোপ্লেনও নয়। তার উপরে একজন দিব্যকান্তি যুবক বসে আছেন।

আমাদের কাছে এসে বললেন, 'মনে হচ্ছে আপনি মর্তবাসী?'

বললাম, 'হ্যাঁ আমি এখনও মর্ত্যেই আছি। আমার মনটাকে বার করে এনেছি এই আকাশলোকে—'

'আপনার পাশে যে জ্যোতির্ময় দেবীকে দেখছি, উনি কে—'

'উনি আমার মৃতা সহধর্মিনী।'

তারপর তাঁকে আমার সব বিবরণ বললাম। শুনে খুব খুশি হলেন।

বললেন, 'মানুষই তো স্রষ্টা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তেত্রিশ কোটি দেবতা, এমন কি আমাকেও সৃষ্টি করেছে মানুষ।'

'আপনি কে?'

'আমি নারদ। ব্রহ্মার মানসপুত্র। কিন্তু তাঁর হুকুম পালন করতে রাজি হইনি বলে তিনি আমাকে গন্ধর্ব আর মানুষের খিচুড়ি করে দিয়েছেন। অবশ্য আমার কোনও খেদ নেই তাতে। এই বাহনটি নিয়ে আমি ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াই। ত্রেতা যুগে মর্ত্যেও যেতাম। আড্ডা দিয়ে বেড়াই, ঘোঁট করি, আর হরিনাম করি। এই আমার কাজ। আপনাদের মধ্যে আজকাল কিন্তু রসিকের সংখ্যা কমে গেছে। সেদিন অশরীরী রূপ ধারণ করে বাংলাদেশে যাত্রা শুনতে গিয়েছিলাম। খবর পেয়েছিলাম যাত্রায় নাকি আমার চরিত্র আছে। দেখে আমি দমে গেলাম। লম্বা পাকা দাড়ি-ওলা যে লোকটা বাঁ-হাতে কমণ্ডলু আর ডান হাতে চিমটে চেপে দাঁড়িয়ে আছে সে-ই নাকি নারদ। আমার নাম নাকি ঢেঁকিবাহন। এই চমৎকার জ্যোতির্ময় বাহনটা কি ঢেঁকির মতো দেখতে? এর কোনও চালক নেই। আমি যেখানে

বলি সেইখানেই নিয়ে যায় আমাকে। শব্দ করে না, বকবক করে না। খুব খুশি হলাম আপনাদের দেখে। তপস্যা করুন, ঠিক সৃষ্টি করতে পারবেন। মানুষের অসাধ্য কাজ নেই—'

'আমরা ধ্রুব নক্ষত্রকে খুঁজে পাচ্ছি না। একবার অপরূপ দেবশিশুর মত একটি বালককে যেন দেখেছিলাম, কিন্তু বুঝতে পারছি না সে-ই ধ্রুব কি না। নক্ষত্রের ভিড়ে হারিয়ে ফেলেছি তাকে।'

'সে-ই ধ্রুব। ওই যে প্রকাণ্ড নক্ষত্রটা দেখা যাচ্ছে ওরই আড়ালে তন্ময় হয়ে বসে আছে সে—'

'আপনি ধ্রুবকে চেনেন?'

'সে আমার শিষ্য। বহুকাল আগে একা একা যখন বনে ঘরছিল তখন আমিই ওকে দীক্ষা দিয়েছিলাম। ধ্রুবর কাহিনী আপনারা জানেন নিশ্চয়?

'ছেলেবেলায় পড়েছিলাম। এখন ভালো মনে নেই সবটা।'

যে বৃহৎ নক্ষত্রটা নারদ আমাদের দেখালেন সেই দিকেই অগ্রসর হচ্ছিলাম আমরা। হঠাৎ সে বলে উঠল—'আমি দেখতে পেয়েছি। কি সুন্দর—'

দেখলাম আলোর সমুদ্রের মধ্যে আলোর শিশু বসে আছে একটি। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে আছে মহাকাশের দিকে।

নারদ বললেন, 'ওই ধ্রুব। ওকে আমি রোজ একবার করে দেখতে আসি। ওর শিশুরূপও ঘুচল না, ওর তন্ময়তাও ঘুচল না। ও তন্ময় হয়ে সত্যকেই দেখছে যুগ-যুগান্ত ধরে। দেখে যেন ওর আশ মিটছে না।'

আমরা সবিস্ময়ে চেয়েছিলাম। নারদ বললেন, 'ও রাজার ছেলে। কিন্তু সৎমার তাড়নায় বনে পালাতে হয়েছিল ওকে। ওর আপন মা ওকে বলেছিল, তুমি সর্বদা হরিকে ডেকো। তিনিই তোমাকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। বনে একা বসে ও হরিকে ডাকছিল, এমন সময় আমি গিয়ে পড়ি। সেই সময়ই ওকে দীক্ষা দি আমি। সেই বনে বসে হরির তপস্যা করে হরির কৃপা লাভ করল। কৃপাধন্য ধ্রুবর প্রতি তার সৎমাও শেষে সন্তুষ্ট হল। তার বিয়ে দিয়ে তাকে সিংহাসনে বসাল। ধ্রুবর ছেলেও হয়েছিল। ধ্রুব কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও হরিকে ভোলেনি। মৃত্যুর পর ভগবান যখন তাঁকে ধ্রুবলোকে স্থাপন করলেন তখন দেখা গেল ধ্রুব সেই শিশুই আছে যে শিশু তপস্যা করে হরির সাক্ষাৎ পেয়েছেন। সে হরিকে দেখার সাধ এখনও মেটেনি—এখনও ও হরির দিকেই চেয়ে আছে নির্নিমেষে—এখনও জানে না যে ওকে ঘিরে প্রকাণ্ড এক ধ্রুবলোক গড়ে উঠেছে। ও এক হরি ছাড়া আর কোনো বিষয়ে সচেতন নয়। হরিই সত্য। সত্যের অনন্ত রূপ দেখছে ও।'

'হরি আর সত্য কি এক?'

'আমি তাই জানি। তবে নামে কিছু এসে যায় না। আপনি ইচ্ছা করলে তাকে অন্য নাম দিতে পারেন। কিন্তু মুশকিল কি জানেন? কোনো নাম দিয়েই তাকে সম্পূর্ণ বর্ণনা করা যায় না। আমি তাই বীণার সুরে তাঁকে ছোঁবার চেষ্টা করি। তবু পাই না। আমার কাছে ছোট্ট একটি বীণা আছে, এইটি বাজিয়ে হরিকে ছোঁবার চেষ্টা করি—'

তিনি তাঁর সেই জ্যোতির্ময় যানের ভিতর থেকে ছোট একটি অপরূপ বীণা বার করে দেখালেন আমাদের। তারপর হেসে বললেন, 'আপনি তপস্যা আরম্ভ করুন। আমি বন্ধুদের বলে দিয়ে যাচ্ছি তাঁরা আপনাকে সাহায্য করবে। আপনার এ তপস্যা নূতন ধরনের তপস্যা। এ ধরনের তপস্যা আগে কেউ করেছেন কি না জানি না। শুরু করে দিন আপনি। আমি চললাম—'

নারদ বীণা বাজাতে বাজাতে চলে গেলেন। কিছুক্ষণের জন্য চারিদিক পূর্ণ হয়ে গেল এক অপূর্ব সুরে। তারপর থেমে গেল সব।

আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে অন্তরের দিকে চাইলাম। চেষ্টা করলাম মনকে সর্বতোভাবে অন্তর্মুখী করতে। মনে হল একটা অশ্রুর সাগর আমার মনের মধ্যে তোলপাড় করছে। সে তোলপাড়ের আলোড়ন কতক্ষণ ছিল জানি না। ক্রমশ আমি যেন তলিয়ে গেলাম। তারপর বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে গেলাম আস্তে আস্তে। সে যে আমার পাশে হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে এ বোধও আমার রইল না। আমি সমাধিস্থ হয়ে গেলাম।

।। বারো ।।

মনে হচ্ছিল কত অজাত ভ্রূণ আমার কাছে মিনতি করছে—আমাকে রূপ দাও, রূপ দাও, সৃষ্টি কর...

মনে হচ্ছিল কত অগীত সঙ্গীত যেন প্রার্থনা করছে, আমাকে সুর দাও, আমাকে সুর দাও। হে কবি বাজাও আমাকে...

ভেসে আসছিল কত অসৃষ্টের সৃষ্টি কামনা, কত অপ্রকাশিতের প্রকাশ আগ্রহ...

মনে হচ্ছিল কোটি কোটি অপ্রস্ফুটিত কুসুমের স্বপ্ন যেন বার বার বলছিল—ফোটাও আমাকে ফোটাও। সৃষ্টি কর আমাদের নূতন রূপ, নূতন গন্ধ।...

মনে হচ্ছিল দূরে দেবরাজ ইন্দ্র সুবর্ণরথে আসছেন। তিনিও কাছে এসে বললেন, 'হে কবি, আমাকেও সৃষ্টি কর তুমি। আমি এখনও কল্পনায় আছি, আমাকে রূপ দাও তুমি। আর রূপ দাও আমার এই সহচরদের। এরাও এখনও কল্পনা-বিহারী। হে স্রষ্টা আমাদের সাহায্যে নূতন জগৎ সৃষ্টি কর তুমি। মানুষের কল্পনাই সৃষ্টি করেছিল আমাদের, মানুষের কল্পনাই আমাদের নিয়ে কত রূপকথা রচনা করেছে, কিন্তু আমরা এখনও সম্পূর্ণ রূপায়িত হই নি। আমাদের সম্পূর্ণ কর তুমি।...

দেখলাম তাঁর পিছু পিছু অনেক দেবতা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন। সকলের মুখে ওই এক কথা— 'আমাদের সম্পূর্ণ কর।'

সহসা আমার চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার নেমে এল। লুপ্ত হয়ে গেল সব। নিঃশব্দ হয়ে গেল সব। শুধু সামনে দাঁড়িয়ে রইল সে আর তাকে ঘিরে একটা জ্যোতির্ময় পরিমণ্ডল। সমস্ত মন-প্রাণ সেদিকে নিবদ্ধ করে বসে রইলাম। কতক্ষণ বসেছিলাম? তা জানি না। মনে হচ্ছিল অনন্তকাল বসে আছি। তার ছবিটাও মিলিয়ে গেল শেষে। তারপর অচেতন হয়ে পড়লাম। বিরাট ধ্রুবমণ্ডলের ছবি মুছে গেল মন থেকে। কোন গভীরে যে আমি ডুবে গেলাম, কতক্ষণ যে সেখানে ছিলাম—কিছুই জানি না।

হঠাৎ সে বলে উঠল, অতি চমৎকার, অতি চমৎকার, দেখ দেখ—'

মনে হল সে আমার হাতে ঝাঁকুনি দিচ্ছে।

সংবিৎ ফিরে পেলাম।

সামনের আকাশে দেখলাম ফুটে উঠেছে একটি ছবি।

বিরাট সমুদ্র টলমল করছে। সমুদ্রের মাঝখান থেকে উঠেছে প্রকাণ্ড একটি শতদল। শতদলকে

ভেদ করে উঠেছে মরকতের একটি দীপাধার। তার উপর জ্বলছে সুপ্রশস্ত একটি সুবর্ণ-প্রদীপ। প্রদীপের শিখা যেন আকাশ স্পর্শ করেছে। আর সেই শিখার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সে। আমার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। আবার ভালো করে দেখলাম—হ্যাঁ সে-ই তো। কিন্তু সে তো তার মনোময় দেহ নিয়ে আমার পাশে আমার হাত ধরে বসে আছে। আকাশের ওই ছবির সঙ্গে তাহলে ওর কোনও সম্পর্ক নেই। যাকে আমি হারিয়েছি, যে আমার সংসারের কর্ত্রী ছিল, আমার ছেলেমেয়ের মা ছিল, আমার সঙ্গিনী ছিল, যে আমার অসুখে সেবা করত, যে আমার প্রতি লেখাটি পড়ত সে কি ওই? আবার ভালো করে চেয়ে দেখলাম—হ্যাঁ দেখতে ঠিক সেই রকমই—কিন্তু—

সে বলল, 'চল, এবার তোমায় বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি—'

নির্বাক হয়ে বসে রইলাম।

'চল। তোমার ছবিটি চমৎকার হয়েছে—'

'ওটা তুমি নও?

'আমি তো তোমার পাশে বসে আছি। ওটা তোমার সৃষ্টি। নূতন সৃষ্টি। চমৎকার হয়েছে—কিন্তু ওটা আমি নই। ওটা তোমার কল্পনা। ভগবানের ইচ্ছা হলে আমি তোমার কাছে একদিন যাবই যাব। এখন বাড়ি চল—অপেক্ষা কর।

আকাশপথে দ্রুতবেগে আসছিলাম। সমস্ত মন হতাশায়া পরিপূর্ণ। পারলাম না, পারলাম না, আমার লীলাকে সৃষ্টি করতে পারলাম না। ভগবানের সৃষ্টিকে মানুষ পুনরায় সৃষ্টি করতে পারে না। তার নকল করতে পারে আর কিছু পারে না।

সে আর একটি কথা বলে নি। মনে হল সে যেন কাঁদছে—সেও যেন মনে মনে আশা করেছিল আমি সত্যিই তাকে সৃষ্টি করে সঙ্গে নিয়ে যাব।

হল না, কিছুই হল না।

বাড়িতে পৌঁছে দেখলাম আমার অচেতন দেহ বিছানায় পড়ে আছে। বাড়ির কেউ কিছু জানতে পারেনি। সবে ভোর হচ্ছে। আমি আমার দেহে প্রবেশ করলাম। বান্দা একটু পরে চা দিয়ে গেল। উঠে বসতেই তার ছবিখানি চোখে পড়ল, দেখলাম আমার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

সাত সমুদ্র তেরো নদী

।। এক ।।

অদ্ভুত একটা যোগাযোগ হয়েছে এ গল্পটাতে। এই গল্পে যাঁরা প্রধান অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে সাতজন পুরুষ আর তেরো জন নারী। পুরুষদের নাম—সব সমুদ্রের নাম আর নারীদের নাম সব নদীর। কেন এরকম হল তা কল্পনা দেবীই বলতে পারেন—তাঁর খামখেয়ালির তো আদি অন্ত নাই।

যে গল্পটা মনে ঘুরপাক খাচ্ছে সেটাও কেমন যেন জট পাকানো। কোথা থেকে আরম্ভ করি ভাবছি। গল্পটা শুরু কোথায় হয়েছে তা জানি না। কম্পজ্বরের মত সেটা যেদিন আত্মপ্রকাশ করল সেই দিন থেকেই শুরু করি। আগেই একটা কথা বলে রাখছি গল্পটা ঠিক আধুনিক যুগের গল্প নয়। পৌরাণিক গন্ধ আছে। তবে পৌরাণিক গন্ধ থাকলেও এ যুগের সঙ্গে মিলও আছে প্রচুর। যুগে যুগে মানুষের বাইরের চেহারাটাই বদলায়—ভিতরটা বিশেষ বদলায় না। সেকালের রাগী মানুষ আর একালের রাগী মানুষে বিশেষ তফাত নেই। সেকালের দিলদরিয়া ভদ্রলোক একালের দিলদরিয়া ভদ্রলোকের মতই। তারা কি ভাষায় কথা বলতেন ঠিক জানি না। তাই আমাদের ভাষাই তাদের মুখে দিচ্ছি। বেমানান হবে না, কারণ আগেই বলেছি, যে ভাবকে ভাষার দ্বারা আমরা প্রকাশ করি, সে ভাব আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। মানুষের মন বদলায়নি। এবার গল্পটা শুরু করি।

সেদিন রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—যে লক্ষ্মীপেঁচাটা রোজ রত্নাকরের বাগানে ডেকে ওঠে—সে ডেকে সেদিন চলে গেছে। রত্নাকরের স্ত্রী তাপ্তি রত্নাকরের পাশে শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। রত্নাকর হঠাৎ তাকে উঠিয়ে দিলে ধাক্কা দিয়ে। ঘুম ভেঙে গেল তাপ্তির।

"কি বলছ?"

"গন্ধ পাচ্ছ?"

"কিসের গন্ধ?"

"কলার?"

"কলার?"

আগুনের ফুলকি ছুটল তাপ্তির চোখ থেকে।

"ফল্গু তার বাগান থেকে যে কলার কাঁদিটা পাঠিয়েছিল সেটা তো পাশের ঘরে টাঙিয়ে রেখেছে। সেটা পাকল বোধহয়। ফল্গু বলেছিল পাকলেই গন্ধ ছাড়বে। আর সঙ্গে সঙ্গেই খেয়ে দেখো। তখন যে স্বাদ পাবে, অন্য সময় পাবে না। নিয়ে এসো না কয়েকটা—"

মিনতির সুর ফুটল রত্নাকরের কণ্ঠে।

"তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি।" উঠে বসল তাপ্তি। রত্নাকরের মুখে মৃদু হাসি।

"ফল্গুকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে পাকবামাত্র খাব। আমার কথার খেলাপ কখনও হয় না। তুমি যদি না এনে দাও আমি উঠছি—"

রত্নাকর উঠে বসল।

অপূর্ব সুন্দর চেহারা তার। গোঁফ না থাকলে মেয়েমানুষ বলে ভ্রম হয়।

হ্যাঁ, আর একটা কথা বলতে ভুলেছি। এখানেই বলে রাখি। এ গল্পের নায়ক-নায়িকারা যদিও সবাই যুবক-যুবতি কিন্তু কারও ছেলেপিলে নেই। নায়িকাদের মধ্যে কুমারী বিধবা সধবা সব রকমই আছে। আর যে রাজ্যে তারা বাস করে তার নাম বাংলা, বিহার, আসাম বা উড়িষ্যা নয়। দেবতার নাম। ওদের দেশের নাম ছিল মহেশ্বর। সে দেশে প্রত্যেক গ্রামে নগরে মহেশ্বরের মন্দির। প্রত্যেক লোক মহেশ্বরের কাছেই নিজের দুঃখ বেদনা কামনা বাসনা নিবেদন করে। মহেশ্বরের দ্বারে ধর্না দেয় অনেকে। প্রত্যাদেশও পায়। প্রতিদিনই কোনোও না কোনো সময়ে সবাই মন্দিরে গিয়ে গোপনে জানায় তাদের প্রার্থনা। হ্যাঁ, কি বলছিলাম, অপূর্ব সুন্দর চেহারা রত্নাকরের। খুব বড় লোকও সে। দেশ-বিদেশে নানা রকম ব্যবসা করে। চাল, চিনি, মশলা, সোনা, রুপো, হীরে, জহরতের। আরও কত কি। মনও তার খুব উঁচু। তাপ্তি তাকে পুজো করে মনে মনে।

রত্নাকরের জেদ দেখে তাপ্তি তার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল।

"এত রাত্রে কলা খেতেই হবে?"

"হ্যাঁ, ফল্গুকে কথা দিয়েছি। পুরুষের কথা আর হাতির দাঁত অনড়।"

"বাবা বাবা বাবা। কি জেদি লোক—" তাপ্তি উঠে পড়ল।

"কটা আনব? একটু আগেই তো ভাত খেয়েছ—"

"এক ছড়া আন না, দুজনে মিলে খাওয়া যাক।"

"আমি খাব না।"

মুচকি হাসল রত্নাকর। বলল— "তোমাকে যখন বিয়ে করেছিলাম, তখন তুমি ছিলে তন্বী শ্যামা। এখন মোটা হয়ে যাচ্ছ। তাই খাওয়া কমাতে চাইছ নাকি? খাওয়া কমিয়ে কিছু হবে না, পুকুর থেকে ঘড়া ঘড়া জল নিয়ে এসো, বাসন মাজো, ঘর মোছো। খাওয়া কমিয়ে কেউ রোগা হয় না। দুর্বল হয়। দেখ না, ও পাড়ার বাচ্চুকে, বেচারি কিছু খায় না। অথচ হু হু করে মুটিয়ে যাচ্ছে—"

"যত বক্তৃতাই দাও, আমি তোমার ফল্গুর কলা খাব না—"

তাপ্তি বেরিয়ে গেল। একটু পরে তিন ছড়া পাকা কলা নিয়ে ফিরে এল সে।

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রত্নাকরের মুখ। "কলার কি রূপ দেখেছ! যেন সোনা দিয়ে তৈরি।"

"সবগুলো খাবে না কি।"

"রাখ তো আগে—"

একটি ছোট সুদৃশ্য ঝুড়ি করে কলা এনেছিল তাপ্তি। সেটি বিছানার উপর রেখে পাশের ঘরে চলে গেল সে।

রত্নাকর একটি কলা ছাড়িয়ে কামড় দিয়ে বলে উঠল— "বাঃ, এ যে জমানো ক্ষীর দেখছি—"

একে একে সমস্ত কলাগুলিই খেয়ে ফেলল সে। খেতে খেতে ফল্গুর কথা মনে পড়ল তার। ছিপছিপে রোগা আশ্চর্য মেয়ে ফল্গু। কথাবার্তা বেশি বলে না। কিন্তু তার চোখ দুটি দেখে মনে হয়, সর্বদা সে যেন অন্তঃসলিলা বইছে। ভ্রূর সামান্য ভঙ্গিতে, চোখের পাতার সামান্য কম্পনে, মুখের মৃদু হাসিতে সে নিজেকে প্রকাশ করে। রত্নাকরের বন্ধু সুবলীশঙ্কর ব্যবসায় উপলক্ষে যখন বালী সুমাত্রা গিয়েছিল তখন কিনে এনেছিল মাতৃপিতৃহীনা বালিকা ফল্গুকে কোথাকার এক হাট থেকে। নিঃসন্তান

সুবলী ওকে কন্যাবৎ পালনও করেছে, তার বিশাল সম্পত্তির অধিকারিণীও করে গেছে ফল্গুকে। ফল্গু বিয়ে করেনি। তার বাগানের শখ। কত রকম গাছই যে লাগিয়েছে সে তার বাগানে। লবঙ্গর গাছ, গোলমরিচের গাছ, চন্দনের গাছ এসব তো আছেই তার বাগানে, নানা রকম নামহীন বন্য গাছগাছড়াও আছে। একটা গাছ আছে দিনের বেলা তাতে সোনালি ফুল ফোটে। সেই ফুলই রাতের বেলা রূপোলি হয়ে যায়। জ্যোৎস্নার ছোঁয়া লাগলে আতরের গন্ধ বেরোয়। ঝাঁপড়ালো অনেক গাছে সে ছোট ছোট ঘর বানিয়েছে গাছের উপর। মাঝে মাঝে শোয় সেখানে। বাগানে কখন যে কোথায় থাকে তা ভিন্টু ছাড়া আর কেউ জানে না। ভিন্টুও জানে না অনেক সময়। ভিন্টু বিশাল-কায়া, অনেকটা রাক্ষসীর মত দেখতে। গায়ে জোরও খুব। সেই ফল্গুকে রক্ষণাবেক্ষণ করে। প্রবল প্রতাপ তার। ফল্গু খেতে আপত্তি করলে জোর করে তার ঘাড় ধরে মুখে ভাত গুঁজে দেয়। প্রাযই দেখা যায় ফল্গু হরিণীর মত ছুটে পলাচ্ছে আর ভিন্টু তার পিছু পিছু ছুটছে। কিন্তু রাত্রে ভিন্টুর কোলে মাথা রেখে না শুলে ঘুম আসে না ফল্গুর। ভিন্টু দিনেও ফল্গুকে সর্বদা আগলে রাখতে চায়, কিন্তু পারে না। মেয়েটার এমন স্বভাব, কেমন যেন ফস্‌কে ফস্‌কে পালিয়ে যায়! বিরাট বাগানের গাছপালার মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে যায়! বাগানের মালীরা সংখ্যায় অনেক—তারাও বলতে পারে না ফল্গু বাগানের কোনখানে আছে। কিংবা বাগানে আছে কি না। তবে ভিন্টু জানে রাত্রে সে ফিরে আসবেই। তার কোলে মাথা না রাখলে ঘুম আসবে না তার। ছোট খুকির মত গান গেয়ে মাথা চাপড়ে ঘুম পাড়াতে হয় তাকে। তবু ভিন্টুর ওকে নিয়ে স্বস্তি নেই। মেয়েটা কোথায় যেন চলে যায় মনে মনে—কি যে ভাবে সর্বদা—কোন আকাশে যে ভেসে বেড়ায় তা ধরতে পারে না সে। এ সব রত্নাকর ভিন্টুর মুখেই শুনেছে। সুবলীশঙ্কর যখন বিদেশে যেতেন, যখন ফল্গুকে বিদেশের হাট থেকে কিনে আনেন, তখন রত্নাকরের বয়স পঁচিশ। ফল্গুর বয়স তখন দশ। মেয়েটা লতার মত তরতর করে বেড়ে উঠল তার চোখের সামনে। সুবলী মারা যাওয়ার পর যখন সে বিষয়ের মালিক হল তখন সে বৈষয়িক সব কাগজ-পত্র নিয়ে হাজির হয়েছিল তার কাছে। বলেছিল—"আপনি বাবার বন্ধু ছিলেন। আপনিই এগুলো রেখে দিন। আমার যখন যা দরকার হবে আপনার কাছ থেকে চেয়ে নেব।" সে কিন্তু কোনোদিন টাকা চাইতে আসেনি। ভিন্টুটা মাঝে মাঝে এসে টাকা-কড়ি নিয়ে যায়। সুবলীর ব্যবসা এখন রত্নাকরই দেখে। যা লাভ হয় ফল্গুর নামে জমা করে দেয়। ফল্গুর ব্যবসার দিকে মন নেই। কোনও খবরও নেয় না। মাঝে মাঝে মেঘের মত হঠাৎ আসে, ঘুরে ফিরে আবার চলে যায়। বাগানে ভালো ফল বা ফুল হলে নিয়ে আসে। ফল্গুর কথা ভাবতে ভাবতে রত্নাকরের মনে হল—তাপ্তি এখনও আসছে না কেন? উঠে পাশের ঘরে গেল। গিয়ে দেখল, তাপ্তি বিছানার উপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। রত্নাকর হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে একটি হাত-পাখা নিয়ে এসে তাপ্তির মাথার শিয়রে বসে হাওয়া করতে লাগল তাকে।

ফল হল। তাপ্তি হঠাৎ তার হাত থেকে পাখাটা কেড়ে নিয়ে ঝাঁকিয়ে উঠল— "আর সোহাগ জানাতে হবে না। পুরুষ জাতটাই নিষ্ঠুর—"

রত্নাকর কোনও জবাব দিল না এর। আত্মপক্ষ সমর্থন করল না। একটু পরে বলল— "দূর দেশে এবার সমুদ্রযাত্রা করব। একটা ভিন্ন মহাদেশে যাব। সেখানে অনেক গজদন্তের সন্ধান পেয়েছি। সে দেশে প্রচুর হাতি। ফিরতে অনেকদিন লেগে যাবে। তাই ভাবছি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। আমাদের

জাহাজ নৌকো তো অনেক থাকবে, তার সঙ্গে আমাদের ময়ূরপংখীটাও নিয়ে যাব। আমরা আলাদা থাকব তাতে।"

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল তাপ্তি।

"সত্যি?"

"সত্যি।"

তাপ্তির চোখে-মুখে এমন একটা ভাব ফুটল যা অবর্ণনীয়। সে বলতে লাগল "সত্যি, চল আমরা এখান থেকে দূরে চলে যাই। ওই ফল্গু, নর্মদা, গঙ্গা, যমুনা, মন্দাকিনী, বিতস্তা, ইরাবতী, ভোগবতী, ব্রাহ্মণীরা দিনরাত তোমার কাছে আসা যাওয়া করে—ভালো লাগে না আমার। অথচ ওদের বলা যায় না কিছু। পালাই চল এখান থেকে—"

"বেশ তাই চল— অম্বুধিকে একটা শুভ দিন দেখতে বলি।"

"অম্বুধিকে বোলো না যেন কোথা যাবে। আমরা ময়ূরপংখী নিয়ে যাচ্ছি শুনলেই অম্বুর বউ ইরাবতী আর ধিঙ্গী শালী কাবেরী যেতে চাইবে—"

"না, না, কোথা যাচ্ছি কিছু বলব না। শুধু বলব একটা শুভ দিন দেখে দাও—। চল, এখন শোবে চল।"

দুজনে গিয়ে শুয়ে পড়ল আবার। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যা ঘটল তাতে পণ্ড হয়ে গেল সব। পেট ব্যথা করতে লাগল রত্নাকরের। প্রথমে একটু একটু ;তারপর ভয়ানক। তাপ্তি বলল—"কলা পেটে গিয়ে ছুরির ফলা হয়েছে। দাঁড়াও একটু সেঁক দিয়ে দি—।"

অত রাত্রে উনুন জ্বেলে জল গরম করে অনেক কাণ্ড করলে সে। কোনোও ফল হল না। ব্যথার চোটে চিৎকার করতে লাগল রত্নাকর।

তাপ্তিও হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। বাড়ির চাকরানি পদ্মাও এসে কাঁদতে বসে গেল বিছানার কাছে এসে। কাঁদতে কাঁদতে বলল— "মা কালীর মন্ত্র-পড়া তেল আছে, সেটা মালিশ করে দেবো?" তাপ্তি বলল— "নিয়ে আয় আমি মালিশ করে দিচ্ছি—"

পদ্মা বলল— "আমি ছাড়া আর কেউ মালিশ করলে ফল ফলবে না—"

"তোকে মালিশ করতে হবে না। তুই কবরেজ মশাইকে খবর দে। উমাচরণকে বল গাড়ি নিয়ে যাক—"

পদ্মা উঠে গেল। পদ্মা তাপ্তির বাপের বাড়ির ঝি। যদিও কালো, তবু কিন্তু রূপসী সে। এবং যুবতীও। কালো পাথরে কোঁদা অজন্তার মূর্তি যেন একটি। তাপ্তি তাকে রত্নাকরের কাছে ঘেঁষতে দেয় না। পদ্মা কিন্তু কোনো-না-কোনো ছুতোয় আসার চেষ্টা করে।

।। দুই ।।

জলধি কবিরাজ লম্বা শুঁটকো, তিরিক্ষি মেজাজের লোক। তার বৈশিষ্ট্য কেউ তাকে ডাকতে এলেই বলে, যাব না। যারা তার বাড়িতে চিকিৎসার জন্য আসে, তাদেরও গালাগালি দিয়ে বলে— "তোরা পাপী, তোদের মা-বাবারাও পাপী— তাই অসুখে পড়েছিস। আমি কি করব। যা পালা এখান থেকে।"

জলধি কবিরাজ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কিন্তু সত্যিই পারঙ্গম পণ্ডিত ব্যক্তি। চিকিৎসা করে টাকা নেয় না, ওষুধও বিনামূল্যে দেয়। তার সংসার চলে চাষ থেকে। প্রচুর জমির মালিক জলধি শর্মা। কবিরাজি গাছগাছড়ারও প্রকাণ্ড বাগান আছে। নানা রকম দুর্লভ গাছগাছড়া লাগিয়েছে সেখানে। এই সব গাছগাছড়া সংগ্রহের জন্য অনেক সময় বিদেশেও গিয়েছে। আসল শিলাজতু সংগ্রহের জন্য হিমালয়েও গিয়েছিল। রত্নাকরের বাণিজ্যপোতে চড়ে অনেক দ্বীপেও ভ্রমণ করেছে সে। প্রকৃতই পণ্ডিত লোক জলধি। কিন্তু অত্যন্ত খিটখিটে। সমস্তক্ষণ আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র আর ওষুধের খুঁটিনাটি নিয়েই ব্যস্ত। বাধা পড়লেই ক্ষেপে যায়। সে সুশ্রুতের একটা গ্রন্থ মনোনিবেশ সহকারে পড়ছিল, এমন সময় তার স্ত্রী নর্মদা এসে প্রবেশ করল। তার কাপড় গাছ-কোমর করে পরা, নাকের উপরও একটা গামছা বাঁধা। হাতে একটি মুষল। সে পাশের ঘরে উদুখলে গোলমরিচ কুটছিল। জলধির বিশ্বাস স্ত্রীলোকদের সর্বদা কাজে নিযুক্ত না রাখলে তাদের মন উড়ু উড়ু করে এবং শেষকালে তারা যা করে তা কাজ নয়, অকাজ। জলধি নিজে বাড়িতে ওষুধ তৈরি করে এবং নর্মদাকে সেই সব ব্যাপারে নিযুক্ত রাখে। একালের মেয়ে হলে বিদ্রোহ করত, পালিয়ে যেত, কিন্তু সেকালের মেয়েরা ভাবতেও পারত না এসব। নর্মদা এসে বলল—"রত্নাকরের খুব অসুখ করেছে। গাড়ি এসেছে তার বাড়ি থেকে। আর পদ্মাও এসেছে। সে কান্নাকাটি করছে খুব। রত্নাকর নাকি খুব কষ্ট পাচ্ছে। তুমি গিয়ে দেখে এসো একবার—।"

জলধি বলল— "বলে দাও যাব না। রত্নাকরের অসুখ তো হবেই। ওর পিছু পিছু পাল পাল মেয়ে মানুষ ঘুরছে সর্বদা। মহাপাপী ও—।"

নর্মদারও দুর্বলতা ছিল রত্নাকর সম্বন্ধে। কান দুটো লাল হয়ে উঠল। সে বলল— "পাপী তো তোমার চোখে সব্বাই। ওর মত উপকারী বন্ধু আমাদের কিন্তু আর কেউ নেই। তোমার ওষুধ দেশ-বিদেশ থেকে ওই এনে দেয়। ওর নৌকোয় চড়ে তুমিও কত জায়গায় গেছ—"

হঠাৎ তাকে থামিয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন জলধি—"যাব যাব যাব যাব যাব—তুমি একটু থামো দিকি।"

রত্নাকরের বাড়িতে গিয়ে জলধি দেখল তার শোবার ঘরে একগাদা মেয়ে মানুষ কিলবিল করছে। কাঁদছে অনেকে, কান্নার ভান করছে কেউ কেউ। তাপ্তি স্বামীর মাথা কোলে করে বসে আছে বিছানায়। তার চোখে ধারা নেমেছে। আপাদমস্তক জ্বলে উঠল জলধির। বলে উঠল— "কি কাণ্ড। এত ভিড় কেন? হাটের মধ্যে কি রুগী দেখা যায়। এ ঘর থেকে বেরিয়ে যাও সবাই।"

একে একে সবাই বেরিয়ে গেল।

তাপ্তি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল— "আমিও যাব কি?"

"তুমিও যাও।"

তাপ্তি বেরিয়ে গেল। রত্নাকর চোখ বুজে শুয়েছিল। সবাই চলে যাবার পর সে চাইলে জলধির দিকে।

"তোমার পেটের কোনখানটায় ব্যথা?"

রত্নাকর বাঁদিকে বুকের একটু নীচে হাত দিয়ে দেখালে।

"যে জায়গাটা দেখাচ্ছ সেটা তো হৃদয়ের স্থান। হৃদয়-বেদনায় ভুগছ নাকি?"

মৃদু হাসল রত্নাকর। উত্তর দিল না।

"জিভ দেখাও।"

রত্নাকর জিভ দেখাল।

"জিভ তো পরিষ্কার। দাও নাড়ীটা দেখি—।"

নাড়ী ধরে চোখ বুজে একটা ঘন্টা বসে রইল জলধি। ভ্রূ কখনও কুঞ্চিত হচ্ছে, কখনও মসৃণ হয়ে আসছে। নাসারন্ধ্র কখনও বিস্ফারিত হচ্ছে, কখনও হচ্ছে না।

এক ঘন্টা পরে নাড়ী ছেড়ে দিয়ে তিনি বললেন— "ও ব্যথা কলার নয়, কলা তোমার হজম হয়ে গেছে। কিন্তু নাড়ী থেকে বুঝলাম তোমার বায়ু প্রকুপিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পাগলও হয়ে যেতে পারো। তোমার ও ব্যথা বায়ুর ব্যথা—"

"ওষুধ দেবে?"

"দেব না। ওর ওষুধ নেই আমাদের ভাণ্ডারে। ওর ওষুধ মহেশ্বর। মন্দিরে গিয়েছিলে?"

"গিয়েছিলাম। রোজ যাই।"

"ওঁকেই প্রার্থনা কর। মদন-দমন উনিই। আমার মনে হচ্ছে মদনকে কেন্দ্র করেই তোমার মনে কোনও মতলব জেগেছে। তাই বায়ু প্রকুপিত। এর কোনোও ওষুধ নেই। একটা তেল পাঠিয়ে দিচ্ছি পেটে মালিশ কর, কিছুটা উপশম হবে কিন্তু সারবে না।"

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে নর্মদা ঘরে ঢুকল। জলধি লক্ষ্য করলেন বর্মা থেকে অদ্ভুত যে দুলজোড়া রত্নাকর এনে নর্মদাকে দিয়েছিল সেই দুলজোড়া পরেই এসেছে সে। সে এসেই জলধিকে বলল— "তুমি শীগ্‌গির বাড়ি যাও। অব্ধি আর ভোগবতী আবার মারামারি করে রক্তারক্তি কাণ্ড করেছে। ভোগবতী অব্ধির গালে কামড়ে দিয়েছে। আর অব্ধি ঘুষি মেরেছে তার চোয়ালে—যাও শীগ্‌গির তুমি—"

জলধি চেঁচিয়ে উঠল—"ওরা মরুক। আমি যাব না—।"

"ওরা মরবে না। ওরা অমর। ভোগবতী সাতাশটা সতীনকে তাড়িয়েছে। ও একাই ভোগ করবে স্বামীকে। আর অব্ধি কিছুতেই ওর দিকে মন দেবে না—নিজের মন্ত্র তন্ত্র নিয়ে দিনরাত আছে। ভোগবতী কাছে এলেই চুলের ঝুঁটি ধরে হিঁড়হিড় করে বের করে দেয় ঘর থেকে। দুজনের গায়েই অসুরের মত শক্তি।"

জলধি চেঁচিয়ে উঠল— "ওসব পুরোনো কাসুন্দী ঘাঁটছ কেন? ওসব তো আমি জানি। পৃথিবীতে কেউ অমর নেই। রাবণ বীরবাহুরাও মারা গেছে—। ওরাও মরবে। আমি বলছি, প্রার্থনা করছি— শীগ্‌গির মরুক।"

"কিন্তু অব্ধির মত গুণী যদি মরে যায় তোমার যে ডান হাত ভেঙে যাবে। গাছ, পালা, শিকড়, বাকড়, ফুল, ফল, তামা, পারদ, লোহা কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তা এক নজরে দেখে বলে দেবার মত লোক আর আছে কি এদেশে? আর ভোগবতী না বাঁচলে অব্ধি দেশান্তরী হবে, ওরা মারপিট করে বটে, কিন্তু ওরা পরস্পরকে ভালোবাসে খুব। একদণ্ড কেউ কারও চোখের আড়াল হতে চায় না। তুমি যাও।"

জলধি মুখ গোঁজ করে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর উঠে চলে গেল।

।। তিন ।।

জলধি বাড়ি ফিরে দেখল অব্ধি ভোগবতী চলে গেছে। তার চাকর কৈলাস বলল— "তারা খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে একটা বনতুলসীর গাছ উপড়ে নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন।"

"তাই নাকি।"

হাঁ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জলধি। তারপর জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলে যে বনতুলসী গাছটা সে বাড়ির উঠোনেই লাগিয়েছিল সেইটেই তুলে নিয়ে গেছে। জলধির হাঁ বন্ধ হয়ে গেল। দাঁত কিড়মিড় করে উঠল। বলল— "পাপ পাপ পাপ।" তারপর হন হন করে বেরিয়ে গেল সে। অব্ধির বাড়ির দিকেই গেল। অব্ধির বাড়ি বেশি দূর নয়—পাশেই। সেখানে গিয়ে অবাক হয়ে গেল জলধি। দেখল অব্ধি আর ভোগবতী দুজনেই মাথায় মুখে ন্যাকড়ার ফেট্টি বেঁধে পাশাপাশি বসে চুমুক দিয়ে গরম দুধ খাচ্ছে। দুজনেরই মুখে হাসি। জলধিকে দেখে অব্ধি বলে উঠল—"আমরা আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। আপনাকে পেলাম না। উঠোনে দেখলাম একটা বনতুলসী গাছ রয়েছে। সেইটি উপড়ে নিয়ে এলাম। তার পাতা কয়েকটা চিবিয়ে লাগিয়ে দিলাম ভোগলুর ঘায়ে। তারপর ভোগলু কয়েকটা পাতা চিবিয়ে আমার গালে লাগিয়ে দিলে। তারপর পুরোনো ন্যাকড়া ছিঁড়ে আমি ওকে ফেট্টি বেঁধে দিলাম, ও আমাকে ফেট্টি বেঁধে দিলে। ঠিক করিনি? হ্যাঁ, আপনাকে দুটো দরকারি কথা বলতে হবে। আপনার ঘরে ঢুকেই অনুভব করলাম ঘরে একটা গোখরো সাপ ঢুকেছে। তার গায়ের গন্ধ পেলাম। কিন্তু দেখতে পেলাম না কোথাও। কোনোও গর্তে টর্তে ঢুকে আছে বোধহয়। ঘরে গিয়ে খুব ধুনো জ্বালাবেন, পালাবে। সসর্পে গৃহে বাস ঠিক নয়। ঘরের কোণে একটা বড় খল দেখলাম। নতুন কিনেছেন নাকি?"

"হ্যাঁ",— জলধি বলল— "খলে তোমার নজর পড়ল কেন?"

"কেন তা যদি বলি তাহলে ওটাকে আর খল রূপে ব্যবহার করবেন না আপনি। ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলবেন—।"

"তার মানে—?"

"যেই শুনবেন ওর তলায় একটা দামী হীরে আছে অমনি আপনি ওটা ভেঙে হীরেটা বার করে নেবেন। নেওয়া উচিত। খলটা দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল, তারপর ছুঁয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছি। ছোট একটা হীরে আছে ওর তলার দিকে—"

"ওখানে হীরে কি করে আসবে?"

"আসবার অনেক পথ আছে। কোন পথে এসেছে তা ভোগলু হয়তো বলতে পারবে। ও খড়ি পেতে গুনতে পারে—।"

ভোগবতী গুম করে একটা কিল বসিয়ে দিলে অব্ধির পিঠে।

"তুমি সবাই-এর সামনে আমাকে ভোগলু বলে ডাকবে না—।"

"ভোগবতী নামটা বড্ড বড়—।"

"আমিও তাহলে তোমাকে বলব অবু। অবু,অবু, অবাই—" বলে মুখ ভেংচে পালিয়ে গেল ভোগবতী।

"কি রকম পাজি দেখেছেন? সাধে ওকে মারি?"

তারপর গলার স্বর নাবিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললে— "আর একটা গোপন কথা আপনাকে বলছি। আমাদের মন্দিরে দেবতারা গোপনে আনাগোনা শুরু করেছেন। একদিন ইন্দ্রকে দেখলাম, আর একদিন পবনকে। দৈত্যরাও আসছে। ওদের আকৃতি দেখেই বোঝা যায়। একদিন দেখলাম প্রকাণ্ড একটা দৈত্য হামাগুড়ি দিয়ে আমাদের মন্দিরে ঢুকছে—।"

"তুমি দেখলে?"

"হ্যাঁ।"

"কখন?"

"রাত্রে। ব্রাহ্মমুহূর্তে—"

"তখন তুমি জেগে থাকো নাকি—?"

"তখনই তো জেগে থাকি। আমি আর ভোগলু দুজনেই তখন জেগে থাকি।"

"কি কর?"

"হা হা করে হেসে উঠল অব্ধি।

"সেটি বলব না। যা করি তার জোরেই তো বলতে পারলাম আপনার ঘরে সাপ ঢুকেছে, আপনার খলের ভিতর হীরে আছে—আপনি এবার বাড়ি যান—বনতুলসীর পাতাতেই আমাদের ঘা সেরে যাবে—যদি না সারে আবার যাব আপনার কাছে। দেখি ভোগলু কোথা গেল। আমি চললুম। ওকে ধরে আনি—।"

জলধি বলল— "তোমাকে আমি আর ওষুধ দেব না।"— বলেই হনহন করে চলে গেল জলধি! চিৎকার করে জবাব দিল অব্ধি— "দেবেন, দেবেন আমি জানি নিশ্চয়ই দেবেন।"

অব্ধি লোকটা যে কি তা কেউ জানে না। কেউ বলে যাদুকর, কেউ বলে পিশাচ-সিদ্ধ। আবার কেউ বলে ও নাকি তান্ত্রিক আর ভোগবতী নাকি ওর উত্তরসাধিকা। ভোগবতী আসার আগে সাতাশটি যুবতীকে একে একে বিয়ে করেছিল নাকি অব্ধি। কিন্তু কেউ ওর মনোমত উত্তরসাধিকা হয়নি। তারপর ভোগবতীকে বিয়ে করল। ভোগবতী পাহাড়ী জংলি মেয়ে, দুর্দাম উদ্দাম। কিন্তু উত্তরসাধিকা হিসাবে নাকি প্রথম শ্রেণীর। অব্ধির জীবনে ভোগবতীই এখন একেশ্বরী। ওর আগেকার সাতাশটি স্ত্রী ওর প্রতাপ সহ্য করতে না পেরে চলে গেছে।

।। চার ।।

রত্নাকর এখনও পেটের ব্যথায় কাতর। জলধি কবিরাজের তেল মালিশ করে কিছু হল না। মহা দুশ্চিন্তায় পড়ল তাপ্তি। তার সন্দেহ হল ফল্গুর বাগানের কলা, হয়তো কলার ভিতর দিয়ে কোনোও রকম গুণটুন করেছে মেয়েটা। কথা কয় না, মাঝে মাঝে আসে আর মুচকি হাসে, কি যে ওর মনে আছে ভগবানই জানেন। তাপ্তি ঠিক করলে অব্ধিও তো একজন গুণী লোক, তাকে কলাগুলো দেখাবে। সে হয়ত বলে দিতে পারবে কলার ভিতর কোনোও মন্ত্রতন্ত্র পড়ে দিয়েছে কিনা। তাপ্তির ধারণা নিশ্চয় মন্ত্র আছে। কারণ রত্নাকর কলা খাওয়ার পর থেকেই বার বার ফল্গুর কথা বলছে। ফল্গু কিন্তু আসেনি। তাকে রত্নাকর ডাকতেও পাঠিয়েছিল একবার—তবু আসেনি। দেখা পায়নি তার। তাপ্তির ভয়, দূর থেকে মেয়েটা কি যে করছে—ধরবার উপায় নেই।

কলার কাঁদিটা প্রকাণ্ড। সব কলাই প্রায় পেকে গেছে। গন্ধে চারদিকে ম ম করছে। তাপ্তির নিজের মনটাও কেমন যেন লোভাতুর হয়ে উঠেছে। তবুও সে একটা কলাও খায়নি। কিন্তু চিন্তা হচ্ছে খুব। যে কলার এমন মনমাতানো গন্ধ, সে কলা খেলে না জানি কি হবে। কবিরাজমশাই বলেছেন— শরীরে কোনো ব্যাধি নেই। ব্যাধি মনে। বায়ু প্রকুপিত। এসব শুনে খুবই ঘাবড়ে গেছে তাপ্তি। এক ছড়া কলা নিয়ে সে হাজির হল অব্ধির বাড়ি। বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল কপাট বন্ধ। মনে হল বাড়িতে কেউ নেই। অনেক ডাকাডাকি করতে তাদের চাকর আমন বেরিয়ে এল।

"মা বাড়িতে আছেন?"

"আছেন। আসুন আপনি—"

"বাবা?"

"বাবাও আছেন। আসুন আপনি—" আমন তাপ্তিকে ভিতরে নিয়ে গেল।

আমন তাপ্তিকে বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বললে— "আপনি বসুন এখানে। আমি মাকে খবর দি—" তাপ্তি বসল না, ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখতে লাগল। কোথাও নানা রঙের পাথরের নুড়ি, কোথাও বা শিকড়, কোথাও হাড়। নানারকম জানোয়ারের খুলিও রয়েছে এক জায়গায়। মানুষের খুলিটা ভয়ঙ্কর। খালি চোখ দুটো যেন গিলতে আসছে। আর এক জায়গায় সাপের খোলস টাঙানো রয়েছে। ভয় করতে লাগল তাপ্তির। কিন্তু বেশিক্ষণ তাকে সে ঘরে থাকতে হল না। আমন ফিরে এসে বলল, "চলুন, মা আপনাকে ভিতরে যেতে বললেন—"

ভিতরে গিয়ে তাপ্তি দেখল ভোগবতী গায়ে মুখে ছাই মাখছে।

"একি! কি মাখছ?"

"ছাই মাখছি, মড়ার ছাই।" তাপ্তি অবাক হয়ে চেয়ে রইল তার দিকে।

ভোগবতী বলল— "তোমার গা ঘিন ঘিন করছে না? আমি যে নাটকে অভিনয় করি সে নাটকে এই সবই বেশভূষা। কখনও কখনও উলঙ্গিনীও হতে হয়। তোমার হাতে কলা কেন?"

"এই কলা ফল্গু আমাদের পাঠিয়েছিল তার বাগান থেকে। উনি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। পেটে ভীষণ ব্যথা। এখনও সারেনি। কবরেজমশাই বললেন—কলা হজম হয়ে গেছে। তাই এঁকে দেখাতে এনেছি কলায় কোনোও দোষ নেই তো—উনিই সবচেয়ে ভালো বলতে পারবেন—"

"উনি এখন পাশের ঘরে শীর্ষাসন করছেন। কলাটা রেখে যাও। ওঁর মতামত ওঁকে দিয়ে একটা কাগজে লিখিয়ে পাঠিয়ে দেব।"

বলেই হো হো করে হেসে উঠল ভোগবতী। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল— "শোন তাপ্তি— স্বামীকে আগলে আগলে রাখা যায় না। ওরা হাওয়ার মত। স্ত্রীর চারদিকেও ঘুরবে, পরস্ত্রীর চারদিকেও ঘুরবে। তারপর সব তো এই হবে—।"

এই বলে এক মুঠো ছাই নিয়ে আবার সে গায়ে মাখতে শুরু করল।

তাপ্তির সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। সে কিন্তু মুচকি হেসে বলল— "এখন চলি তাহলে। খবরটা পাঠিয়ে দিও। ওঁকে একলা রেখে এসেছি।" তাপ্তি চলে গেল।

পাশের ঘরে শীর্ষাসন করে উলঙ্গ অব্ধি সূর্যের তপস্যা করছিল। তার মনশ্চক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলে প্রদীপ্ত দিবাকর। তাঁকে উদ্দেশ্য করে সে মনে মনে বলছিল— "সমস্ত জ্ঞানের আকর হে জবাকুসুম-সঙ্কাশ, হে জ্যোতির্ময় দেবতা, তুমি আমাদের দেহকে পোষণ কর, মনকে উদ্দীপ্ত কর,

অজ্ঞানের অন্ধকার তোমার স্পর্শে বিলুপ্ত হয়, হে মহাজ্যোতিষ্ক শতকোটি প্রণাম তোমাকে। আমার মধ্যে তুমি প্রতিফলিত হও। তোমার কৃপায় যা রহস্যাচ্ছন্ন, যা অস্পষ্ট, যা তমসাবৃত তা আমার কাছে স্বচ্ছ হোক, স্পষ্ট হোক, আত্মপ্রকাশ করুক—তুমি কৃপা কর, কৃপা কর, কৃপা কর।"

অব্ধির এ তপস্যার কথা অব্ধি ছাড়া আর কেউ জানে না। কেবল জানেন মহেশ্বর। তাঁর কাছে প্রত্যহ আর একটি প্রার্থনাও সে করে কিন্তু সে কথা পরে হবে।

তাপ্তি চলে যাবার পরও ভোগবতী কিছুক্ষণ ছাই মাখল। তারপর হাঁক দিল— "আমন শ্বেত পাথরের কলসীটা আর দুটো বাটি নিয়ে আয়।" তারপর উঠোনে বেরিয়ে দেখল সূর্য মধ্যাকাশে উঠেছে কিনা। সূর্য মধ্যাকাশে উঠলেই অব্দির ধ্যানভঙ্গ হয়। তারপর সে আর অব্ধি খাওয়া-দাওয়া করে। খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরিয়ে যায় শ্মশান-মহেশ্বরের উদ্দেশ্যে। প্রায় এক ক্রোশ হাঁটতে হয়। সেখানে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়। রাত্রিটা ওখানেই কাটায় তারা। খুব ভোরে আবার বাড়ির দিকে যাত্রা করে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ব্যাড়ি ফেরে। বাড়ি ফিরে স্নান করে তারা নিজেদের পুকুরে। হুড়োহুড়ি করে সাঁতার কাটে দুজনে। তারপর শীর্ষাসন করে অব্ধি ধ্যান শুরু করে। আর মনে মনে মন্ত্র জপতে জপতে ভোগবতী সাজ-সজ্জা করে। কোনোদিন ছাই মাখে, কোনোদিন হাড়ের গয়না পরে। কোনোদিন কিছুই পরে না, শুয়ে ঘুমোয়।

উঠোন থেকে ফিরে এসে ভোগবতী দেখলে আমন শ্বেত পাথরের কলসী আর দুটি শ্বেত পাথরের বাটি এনেছে। তার পিছনে পিছনে তাদের রাঁধুনী মিশরি ঢুকল দুটি প্রকাণ্ড থালা নিয়ে। শ্বেত পাথরের কলসীটি অনেকটা বোতলের মত দেখতে।

মিশরি প্রকাণ্ড থালা দুটি রেখে—আবার একটা বড় বাটি নিয়ে এল। বেশ বড় জামবাটি একটা। ভোগবতী প্রশ্ন করল— "আজ কি খাবার করেছিস আমাদের জন্য?"

"একটা বড় চিতল মাছ, তার পেটিগুলো ভেজেছি আপনাদের জন্য। আর ব্যাধ ভৈরব চারটে কালো তিত্তির পাখি দিয়ে গিয়েছিল, সেগুলো মশলা মাখিয়ে আগুনে ঝলসেছি। তাছাড়া ক্ষীরও আছে একবাটি।" এই সময় অব্ধি এসে ঘরে ঢুকল।

"বাঃ, প্রচুর খাবার দেখছি আজ। ভৈরব তিত্তির দিয়ে গেছে বুঝি। ওকে একটা লোহার টুকরো দিয়েছিলাম। বলেছিলাম এটা দিয়ে তীরের ফলা তৈরি করিয়ে নিস। যাকে লক্ষ্য করবি অব্যর্থ লাগবে। ভৈরব বলেছিল এ দিয়ে যা মারব আপনাকে তার ভাগ দেব—তিত্তিরগুলো বেশ বড় বড় দেখছি—"

ভোগবতী বলল— "তাছাড়া কলা আছে।"

"কলা কোথা থেকে এল?"

"তাপ্তি দিয়ে গেছে।"

"কেন?"

তখন ভোগবতী সব খুলে বললে অব্ধিকে। অব্ধি কলাগুলো নিয়ে শুঁকল। তারপর খেল একটা।

"বাঃ, এ তো চমৎকার।"

আর একটা খেল।

ফোঁস করে উঠল ভোগবতী, "বা রে—তুমি একাই সব খাবে নাকি? আমাকে দাও—।"

কলা নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে লাগল দুজনে। হয়তো এ নিয়ে মারামারি হত কিন্তু বাইরে কবি পারাবারের গলা শোনা গেল। সে গাইতে গাইতে আসছে—

"ডাকলে তুমি দাও, না সাড়া
ধরা পড়েও দাও না ধরা
ও মোর মিতা অপরাজিতা
ওগো কৃষ্ণা নীলাম্বরা।
প্রজাপতির পাখায় নাচো
আকাশ ভরে ছড়িয়ে আছ
নীল-লোহিতের কণ্ঠ-শোভা
ওগো নীলা স্বয়ম্বরা।"

পারাবার এসে ঘরে ঢুকল এবং কবিতায় সম্বোধন করল ভোগবতীকে।

"আজি অসময়ে অতি
ওগো দেবি ভোগবতী,
এসেছি তোমার কাছে ছুটিয়া,
ব্রাহ্মণী রুদ্যমানা
কপালে দিতেছে হানা
শাঁখাটি গিয়াছে তার টুটিয়া।
ছুটিয়া এলাম তব দ্বারে
আর একটি শাঁখা দাও তারে।"

হো হো করে হেসে উঠল অব্ধি আর ভোগবতী দুজনেই। তারপর বলল—"সাগর শঙ্খ, মুক্তা শঙ্খ, সাদা শঙ্খ, সহজ শঙ্খ,—সব আছে। যেটা ইচ্ছে নিয়ে যাও। কিন্তু তার আগে খাও বঁধু হে, খাও কিছু—"

পারাবারকে ঘিরে ঘিরে নাচতে লাগল তারা দুহাত তুলে।

পারাবারের বয়স কত বলা শক্ত। চেহারাটি বালকের মত। চোখ দুটি স্বপ্নময়। মুখে সর্বদাই একটা অপ্রস্তুত ভাব, যেন সে এমন একটা কিছু করে ফেলেছে যা করা অনুচিত। অপ্রস্তুত মুখেই সে কলা খেয়ে ফেলল একটা। তারপর বলল—মনে হচ্ছে এ কলা চৌষট্টি কলার উপর টেক্কা দিয়েছে। কোথা পেলে এ অপূর্ব কলা—?

"ফল্গুর বাগানের কলা,—"

"ফল্গুর? তাই এত চমৎকার। ফল্গু তো মানুষ নয়। ও একটা সুর।"

"কিসের সুর?"

"তা জানি না। সেতারে, এস্রাজে, বীণায়, বেণুতে, তানপুরায় ও বাজতে পারত। কিন্তু কোনো ওস্তাদ আজ পর্যন্ত ওকে কোনোও যন্ত্রে ধরতে পারেনি। তাই ও আকাশে বাজে। তোমার সঙ্গে আলাপ আছে?"

"না, ও কারো সঙ্গে আলাপ করে না। ওর বাপের বন্ধু রত্নাকরের বাড়িতে মাঝে মাঝে যায়—।"

"আমি ওকে একদিন একটা কদম গাছের উপরে দেখেছিলাম। দেখলাম একটা ডালে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসে আছে, আর ওকে ঘিরে আছে রাশি রাশি রোমাঞ্চিত কদম ফুল। দূর থেকে দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম একটা কবিতা লিখব। অনেক কাগজ নষ্ট করেছি, পারিনি। ওকে কবিতাতেও ধরা যায় না—"

ভোগবতী বলল— "এখনি যে একটা গান গাইতে গাইতে আসছিলেন—কি গান সেটা?"

"আজ আমাকে নীল রংয়ে পেয়েছে। নীল রং মোহের নীলাঞ্জন পরিয়ে দিয়েছে আমার কল্পনার চোখে। নীলকে নিয়েই গান গাইছি আজ। আর দেরি করব না কিন্তু। শাঁখা দাও আমাকে। ব্রাহ্মণী ক্রমাগত কেঁদে যাচ্ছে। তার ভয় হয়েছে শাঁখা ভেঙে গেলে আমার বুঝি কোনোও অমঙ্গল হবে—"

ভোগবতী প্রকাণ্ড একটি কাড়ির ঝাঁপি এনে দিল পারাবারকে। "আমার সব শাঁখা ব্রাহ্মণীকেই দিলাম। আমি আজকাল শাঁখা পরি না। হাড়ের গয়না পরি। ব্রাহ্মণী খুব ধর্মভীরু, না?"

"খুব। অর্ণবের কাছে মন্ত্র নিয়েছে। দিনরাত জপ পুজো নিয়েই আছে। আর ত্রিবেণী সঙ্গমে যায় রোজ।"

"ত্রিবেণী সঙ্গম? সে আবার কি?"

"গঙ্গা যমুনা আর সরস্বতী নামে তিনটি মহিলা একটি আশ্রম মতো করেছে। সেখানে কেবল ধর্মচর্চা হয়। ব্রাহ্মণী রোজ যায় সেখানে। ওখানে অর্ণব রোজ বক্তৃতা দেয়। ওরা সবাই অর্ণবকেই মনুষ্যরূপী মহেশ্বর মনে করে।—হ্যাঁ, মহেশ্বরের কথায় আর একটা কথা মনে পড়ল। কাল রাত্রে আমি যখন মহেশ্বরের মন্দিরে প্রার্থনা করতে যাচ্ছি তখন দেখলাম দুজন দিব্যকান্তি যুবক মহেশ্বরের মন্দির থেকে বেরিয়ে এল, আর দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল কোথা—।"

"তুমি বোধহয় অশ্বিনীকুমারদের দেখেছ। আমি একদিন ইন্দ্রকে দেখেছি। দেবতারা কেন জানি না মহেশ্বরের মন্দিরে যাতায়াত করছেন। দৈত্যরাও করছেন। আমি একদিন দৈত্যও দেখেছি একটা।"

"তাই না কি?"

"হ্যাঁ। নেপথ্যে কিছু একটা হচ্ছে বোধ হয়।"

ভোগবতী বলল— "ব্রাহ্মণীর জন্যে দুটো কলা নিয়ে যাও।"

"ফল্গুর বাগানের কলা শুনলে খাবে না। ওরা ফল্গুর উপর ভয়ানক চটা।"

"কেন?"

"ত্রিবেণী সঙ্গমের সবাই ফল্গুর উপর চটা। কারণ ফল্গু রত্নাকরের কাছে যায়।"

"গেলেই বা—"

"ত্রিবেণী সঙ্গমের তিনটি বেণী এবং আমার ব্রাহ্মণী সকলেই রত্নাকরের কৃপাপ্রার্থিনী। ওই আশ্রম রত্নাকরই করিয়ে দিয়েছে। তাঁদের আশা রত্নাকরই তার নৌকোয় চড়িয়ে তাদের কন্যাকুমারিকা তীর্থে নিয়ে যাবে। ফল্গু ওর বাড়িতে আসা যাওয়া করে, এটা ওরা সহ্য করতে পারে না—" ভোগবতী বলল—"আমারও খুব ভালো লাগে রত্নাকরকে। দিলদরিয়া লোক। আমাদেরও ও লঙ্কায় নিয়ে যাবে বলেছে। ওর বউ তাপ্তি কিন্তু ভারি হিংসুটে। খালি সন্দেহ কে ওর স্বামীকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে। ফল্গু এই কলা রত্নাকরকে পাঠিয়েছিল, ওর সন্দেহ ফল্গু বুঝি কলার ভিতর কোনো মন্ত্রতন্ত্র পড়ে দিয়েছে—।"

পারাবার বলল— "তাপ্তিকে আমি দোষ দিই না। রত্নাকরের মত স্বামী যার সে তো সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকবেই। শুধু ওর চেহারাই অপূর্ব নয়, মনও অসাধারণ। অগাধ টাকার মালিক কিন্তু কোনোরকম স্থূলতা নেই। রসিক লোক রত্নাকর। গানের সমজদার, ছবির সমজদার। অর্ণব শর্মা দিনরাত ধর্ম-শাস্ত্র নিয়ে আছে। কিন্তু রোজগার নেই। ওর সংসার চালায় কে জানো? ওই রত্নাকর। পঁচিশ বিঘে নিষ্কর জমি কিনে দিয়েছে ওকে। তাছাড়া মন্দাকিনী প্রায়ই গিয়ে টাকাকড়ি নিয়ে আসে। অম্বধি বলেছিল মন্দাকিনীর নাকি মঙ্গল বিরূপ। ভালো প্রবাল পরা দরকার। রত্নাকর চমৎকার একটা প্রবালের মালা

উপহার দিয়েছে ওকে। প্রত্যেকটি প্রবাল পায়রার ডিমের মত। রত্নাকর সত্যিই মহৎ লোক। সবাই ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুতরাং তাপ্তির ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। ইস্ বড্ড দেরি হয়ে গেল। চললুম। পরে দেখা হবে।"

কড়ির ঝাঁপিটি নিয়ে বেরিয়ে গেল পারাবার।

।। পাঁচ ।।

আমন অব্দির চিঠি দিয়ে গেছে। পড়ে আরও চিন্তিত হয়ে পড়ল তাপ্তি। হলদে ভূর্জপত্রে গোটা গোটা অক্ষরে অব্ধি লিখেছে— "উৎকৃষ্ট মর্তমান কলা। নির্দোষ এবং নির্মল।" তাপ্তির আশা ছিল কলায় যদি কোনো দোষ পাওয়া যায় তাহলে তিন্তিড়ীকে দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করাবে। তিন্তিড়ী ঝাড়-ফুঁকে খুব ওস্তাদ। তার ব্যবসা সিদ্ধির আর গাঁজার, কিন্তু অনেক রকম মন্ত্রতন্ত্র জানে সে। বশিষ্ঠ পণ্ডিতের বউকে ভূতে ধরেছিল। দিনরাত গোঁ গোঁ করত। তিন্তিড়ীই তাঁকে সারিয়েছে। অদ্ভুত কাণ্ড করেছিল তিন্তিড়ী। একটা কালো ষাঁড়ের গোবর শুকিয়ে প্রচুর ঘুঁটে তৈরি করল প্রথমে। তারপর প্রকাণ্ড একটা কালো রঙের মালসা নিয়ে এল মিঠু কুমোরের কাছ থেকে। কালো গাইয়ের দুধ জমিয়ে ঘি তৈরি করল কালো কড়াইয়ে তমাল কাঠের আগুনে জ্বাল দিয়ে। রান্নাঘরের কালো ঝুল মেশাল তার সঙ্গে। তারপর সেই ঘি দিয়ে কালো মালসায় ঘুঁটেগুলো ধরিয়ে ফেললে আর সেই আগুনে ফেলতে লাগল কালো জিরে, মেথি, গোলমরিচ, কালো বিছে তিনটে, আর কালো গুব্‌রে পোকা। আর মন্ত্র আওড়াতে লাগল জোরে জোরে। তিন্তিড়ীর ঘাড়টা যদিও বেঁকা কিন্তু গলায় জোর খুব। গাঁজা খায় কিনা, বেশ ভরাট গলা। মন্ত্র পড়তে পড়তে ঝামর দিয়ে ঝাড়তে লাগল বশিষ্ঠর বউকে। ভূত ছট্‌ফটিয়ে পালিয়ে গেল।

কিন্তু কলাতে যখন দোষ নেই তখন তিন্তিড়ীর কাছে গিয়ে কি হবে।

হঠাৎ তাপ্তির মনে হল—অম্বুধি তো ভালো জ্যোতিষী। সে হয়তো শুনে বলতে পারবে ব্যাপারটা কি। ও না হয় এসে রত্নাকরের হাতটা দেখুক। কিন্তু আবার একটু দ্বিধাও হল। অম্বুধিকে খবর দিলেই ইরাবতী আর তার বিধবা বোন কাবেরী ছুটে আসবে আগে। দুটো মেয়েই ঢলানী। রত্নাকরকে ঘিরে এমন সব কাণ্ড করবে যে বাধা দেওয়াও শক্ত, সহ্য করাও শক্ত। ইরাবতীও স্বামীর কাছে গুণতে শিখেছে একটু-আধটু। আর কাবেরী মেয়েটা ফক্কোড়। মুখে মুখে ছড়া বানায় আর হি-হি করে হাসে। লজ্জা শরম কিছু নেই। বুকের কাপড় বার বার খুলে যায়, হুঁশ নেই সেদিকে। কিন্তু কি করা যাবে? দুনিয়াটাই এই রকম। রাস্তায় ধুলো আছে বলে তো পথ হাঁটা বন্ধ করা যায় না। তাছাড়া গরজ বড় বালাই। রত্নাকরকে যেমন করে হোক ভালো করতেই হবে। তাপ্তির রাতে ঘুম হচ্ছে না। সারারাত পাখা হাতে করে বসে থাকে। রত্নাকর যদিও বার বার বলে— "তুমি শুয়ে পড়, ঘুমোও।" কিন্তু ঘুমোও বললেই কি ঘুমোনো যায়? যে মানুষ একটু আগে বলল—এবার আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ময়ূরপংখীতে চড়ে সমুদ্রযাত্রা করব গজদন্তের সন্ধানে—সেই মানুষ কিনা পেটের ব্যথায় ছটফট করছে। আর সব চেয়ে মুশকিল, কি হয়েছে কেউ ধরতে পারছে না। এতবড় নামী কবিরাজ জলধি, অমন নামজাদা গুণী অব্ধি—এরা বলছে কলায় কোনো দোষ নেই। তবে পেট ব্যথা করছে কেন?

কলা খাওয়ার পরই তো ব্যথা হল। জলধি বলছেন—বায়ু প্রকুপিত হয়েছে। তার মানে বুঝতে পারছে না তাপ্তি। তাই সে অবশেষে ঠিক করে ফেলল ওই জ্যোতিষী অম্বুধিকেই সে ডাকবে। কিন্তু তাকে ডাকতে হলে সাগরের খোশামোদ করতে হবে। সাগর যেখানে যেতে বলে সেখানেই যায় অম্বুধি। কারণও আছে। অম্বুধির পায়ে বাত, খুব আস্তে আস্তে হাঁটে, কানে শোনেও কম। যেখানে যায় সাগর তাকে কাঁধে করে নিয়ে যায়। অপরের কথা তার কানে চেঁচিয়ে বলে শুনিয়ে দেয়। সাগর একজন মল্লবীর। তার গায়ে প্রচুর শক্তি। ডন বৈঠক কুস্তি এইসব নিয়েই দিনরাত থাকে সে। খুব ভক্তি করে সে অম্বুধিকে। তার কোথাও যাবার দরকার হলেই কাঁধে করে নিয়ে যায় তাকে। সুতরাং অম্বুধিকে আনতে হলে আগে সাগরকে বলতে হবে। সাগরের কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল তার স্ত্রী বিতস্তাকে। অদ্ভুত মেয়ে ওই বিতস্তাও। লিকলিকে রোগা শ্যামবর্ণ ওই মেয়েটা তার ওই পালোয়ান স্বামীকে যেন হাতের মুঠোর মধ্যে রেখেছে। বিতস্তার কথায় সাগর ওঠে বসে। যদিও কালো তবু সুন্দর একটি শ্রী আছে মেয়েটির। রাঁধেও খুব ভালো। সাগরও খাদ্যরসিক লোক। খাইয়েই বশ করেছে ওকে বিতস্তা। মেয়েটি সত্যিই রাঁধতে পারে ভালো। রত্নাকরকে এ-অঞ্চলে ভালোবাসে সবাই। রত্নাকর যখন বাণিজ্যের জন্য নৌকো করে বিদেশে যায় তখন প্রত্যেকের জন্য কিছু না কিছু উপহার নিয়ে আসে। সাগরকে একজোড়া চন্দন কাঠের মুগুর এনে দিয়েছে, আর বিতস্তাকে দিয়েছে একটি রুপোর শতকৌটো। একশটা কৌটো একটার ভিতর আর একটা ঢোকানো। সেই কৌটোয় ভরে ক্ষীর পায়েস নানা রকম মিষ্টান্ন, নানারকম ব্যঞ্জন, নানা রকম ডাল, নানাবিধ পলান্ন খিচুড়ি রেঁধে পাঠিয়েছিল বিতস্তা। রত্নাকরের খুব ভালো লেগেছিল। রত্নাকরের তো সব ভালো লাগে। সবাইকে ভালো লাগে। কিন্তু এসব ভালো লাগালাগি ভালো লাগে না তাপ্তির। আগুন আর ঘিয়ের উপমাটা মিছে নয়। তাপ্তি পারতপক্ষে কাউকে আসতে দেয় না কাছে। কিন্তু এখন দিতেই হবে। অন্য উপায় নেই। যেতেই হল সাগরের কাছে।

গিয়ে দেখে সাগর মাথায় একজন, ঘাড়ে একজন, দুই প্রসারিত বাহুর উপর দুজনকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাপ্তিকে দেখে সবাই নেমে পড়ল। সাগর বলল— "তাপ্তি দেবী যে, কি খবর? শুনেছিলাম রত্নাকর অসুস্থ। কেমন আছে সে?"

"সেইজন্যেই তো আসা। পেট ব্যথা হয়েছে ফল্গুর বাগানের কলা খেয়ে। জলধি কবিরাজ বলেছেন বায়ু প্রকুপিত। আর গুণী অব্ধি বলেছেন কলায় কোনো দোষ নেই—বুঝতে পারছি না কি হয়েছে। তাই ভাবছি জ্যোতিষী অম্বুধিকে দিয়ে ওর হাতটা দেখাই একবার। তুমি একটা ব্যবস্থা করে দাও ভাই। বিতস্তা কোথায়?"

"বিতস্তা রান্নাঘরে। রান্নাঘরের ভিতর গাছ-কোমর বেঁধে মহা ব্যস্ত সে এখন। মাথার চুল ঝুঁটি করে বেঁধেছে। চারদিকে তরকারি, মাছ মাংস। দুটো শিলে বাটনা বাটছে দুটি চাকর, তরকারি কুটতে কুটতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে দুটো ঝি। তাদের মাঝখানে রাজলক্ষ্মীর মত বসে আছে বিতস্তা। চল—"

"রান্না করছে, সেখানে এখন না-ই গেলাম—"

"রান্নাঘরই তো ওর বৈঠকখানা। তুমি এসে দেখা না করে চলে গেছ শুনলে তুলকালাম করবে। কচি বেতের ডগার তরকারি করছে আজ। তোমাকে হয়তো খেতে হবে—চল—"

যেতে হল তাপ্তিকে। রান্নাঘরে গিয়ে দেখে এলাহি রান্নার আয়োজন। বিতস্তা গাওয়া ঘি-এ হরিণের মাংস ভাজছে মশলা দিয়ে। অপূর্ব গন্ধ বেরিয়েছে। তাপ্তিকে দেখেই সে তার মিষ্টি হাসিটি হাসল।

"ওমা, কি আমার ভাগ্যি। রত্নাকরের হৃদয়-রত্ন গরিবের ঘরে। ওলো সাবি, তুই মাংসটা ভাজ একটু। আমি কথা কই তাপ্তির সঙ্গে—"

প্রকাণ্ড রান্নাঘর। তারই একপাশে একটা মোড়া পেতে দিলে সে তাপ্তির জন্য।

"কি ব্যাপার কি, বল তো। হঠাৎ এ সময়ে এলে যে—"

"বলছি সব—"

সাগর বাইরে চলে গেল। তাপ্তি সব বললে বিতস্তাকে, বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। ছলছল করতে লাগল বিতস্তার চোখও। বলল— "কাল অম্বুধিকে নিয়ে যাব আমরা।"

তাপ্তি শঙ্কিত হয়ে পড়ল মনে মনে। অম্বুধির সঙ্গে ইরাবতী কাবেরী তো যাবেই, তার সঙ্গে এ-ও যদি যায় তাহলে তো ত্র্যহস্পর্শ হবে।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করবার জন্য তাপ্তি বলল—"তুমি এত রাঁধছ, বাড়িতে খাবার লোক তো দুজন।"

বিতস্তা বলল— "বিশজন। ওঁর আখড়ার সব চেলারা এখানে খায়।"

"ও তাই বুঝি! তোমার কর্তাও খুব খাইয়ে শুনেছি।"

"খাইয়ে মোটেই নয়। একটা জিনিসের বেশি খায় না কিছু। কোনোদিন বা মাংস খেলে, কোনোদিন বা পায়েস। আমার রাঁধবার বাতিক বলে নানা রকম রাঁধি। রুটি, পরোটা, ভাত, ডাল-তরকারি রাঁধবার আলাদা লোক আছে। আমি শৌখিন রান্না রাঁধি। আজ কচি বেতের ডগার ডালনা করেছি। চেখে দেখবে একটু? নুনটা দিয়েছি কিনা মনে পড়ছে না। একটু চেখে দেখ।"

"বেতের ডগা শক্ত হবে না?"

"কাল থেকে মাখনে ডুবিয়ে রেখেছি। খুব নরম হয়েছে—।"

তাপ্তিকে খেতেই হল একটু। খেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল সে। কি চমৎকার স্বাদ। বেতের ডগা? মনে হল যেন ছানার টুকরো।

বিতস্তা বলল— "কাল তোমার কর্তার জন্যেও নিয়ে যাব কিছু রেঁধে। আমার রান্না খুব ভালোবাসেন তিনি—"

"এখন পেটে ব্যথা, এখন কিছু নিয়ে যেও না ভাই।"

"বাতাবী লেবুর মিষ্টি আচার বানিয়েছি আনারসের রস দিয়ে। খুব হজমি। ওতে কোনো অসুখ করবে না। অসুখ ভালোও হয়ে যেতে পারে।"

তাপ্তির মোটেই ভালো লাগছিল না এসব প্রস্তাব। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারল না। অম্বুধি গণককে ওরাই নিয়ে যাবে। ওদের চটানো যায় কি? বিতস্তা লোকও খারাপ নয়। কিন্তু রত্নাকরের উপর সকলেরই একটু না একটু দুর্বলতা। সে যে কি করবে ভেবে পায় না।

।। ছয় ।।

তার পরদিন সাগর অম্বুধির বাড়ি গিয়ে দেখে অম্বুধি গাঁজা খেয়ে ভম্ হয়ে বসে আছে মহেশ্বরের মন্দিরের ভিতর। সে কোথাও যেতে পারে না বলে উঠোনেই মহেশ্বরের একটি ছোটো মন্দির

করিয়েছে। সাগর গিয়ে দেখল তার ভিতর ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে বসে আছে অম্বুধি। তিন্তিড়ী আজকাল যে গাঁজা সরবরাহ করছে তা নাকি অত্যন্ত কড়া।

ইরাবতী আর কাবেরী ব্যস্ত ছিল গুড়ের নাগরি নিয়ে। ওরা আখ কিনে গুড় তৈরি করে চালান দেয়। আজ নৌকো যাবে বিদ্যানগরে। রত্নাকরেরই নৌকো। ওতে ওরা গুড় পাঠাবে। রত্নাকরের বিরাট ব্যবসা। রোজই কোথাও না কোথাও মাল পাঠানো হয়। আজ বিদ্যানগরে মাল যাচ্ছে। সেখানে গুড়ের বাজার ভালো।

সাগর গিয়ে বলল—"রত্নাকরের পেটে ব্যথা। কাল তাপ্তি এসেছিল। জলধি আর অব্ধি রোগ ধরতে পারছে না। তাপ্তির ইচ্ছে অম্বুধিকে দিয়ে ওর হাতটা দেখাবে—।"

"কিন্তু দেখাবে কাকে দিয়ে। ও তো সকাল থেকে শিবনেত্র হয়ে বসে আছে। তাছাড়া ওকে নিয়ে গেলে আমাকেও যেতে হয়—।"

কাবেরী সঙ্গে সঙ্গে বলল— "আমিও যাব।"

সাগর বলল— "তোমাদের যাওয়ার দরকার কি—"

"বাঃ, রত্নাকর অসুস্থ এ খবর পেয়ে কি না গিয়ে থাকতে পারি?"

কাবেরী হেসে ছড়া কাটল— "সম্ভব নয় যা, বলছ কেন তা। তুমি এখন জামাইবাবুর ভাঙাও দেখি ধ্যান, ফেরাও দেখি জ্ঞান—"

সাগর বলল— "দু' কলসি ঠাণ্ডা জল মাথায় ঢেলে দিলেই জ্ঞান ফিরে আসবে। দাঁড়াও আমি ওকে মন্দির থেকে বার করি আগে—।"

অম্বুধি ছোটখাটো মানুষ। তাকে সাগর পাঁজা-কোলা করে তুলে নিয়ে এল মন্দিরের ভিতর থেকে। উঠোনের মাঝখানে একটা বড় পিঁড়ের উপর বসানো হল তাকে। ঘরে মাটির কলসিতে পুকুরের ঠাণ্ডা জল ছিল। সাগর সেই জল হুড় হুড় করে ঢালতে লাগল তার মাথায়। দু কলসি ঢালবার পর জ্ঞান ফিরল অম্বুধির। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। তারপর— "বাবা এ কি করছ মহেশ্বর। সব গরম যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল—।"

সাগর তখন কানের কাছে চেঁচিয়ে বলল—"মহেশ্বর নয়, আমি জল ঢালছি। রত্নাকরের কাছে যেতে হবে। তার পেট ব্যথা। তার হাত দেখে শুনে বলতে হবে কি হয়েছে?"

গুম হয়ে রইল অম্বুধি। ইরাবতী একটা গামছা দিয়ে তার মাথা গা মুছিয়ে দিয়ে বলল—"ওঠ শুকনো কাপড় পর একটা।"

অম্বুধি শুকনো কাপড় পরে হঠাৎ বলে উঠল— "গুরুদেব মানা করেছেন, আমি আর হাত দেখব না কারো—"

"গুরুদেব? তিনি হঠাৎ মানা করলেন কেন?"

"গুরুদেব বললেন—কপালে যা আছে তা ঘটবেই। যাকে রোধ করা যাবে না তখন আগে থাকতে তা জেনে কোনো লাভ নেই। লোকের মনে আশা বা হতাশা জাগিয়ে শুধু তাকে অকারণ অশান্ত করা হয়। যা ঘটবার তা ঘটবেই। তাছাড়া আমার মনে একটা সন্দেহ জেগেছে আজকাল। আমরা নবগ্রহ, বারোটা রাশি, আর সাতাশটা নক্ষত্র নিয়ে গণনা করি। আকাশে কিন্তু কোটি কোটি নক্ষত্র। তাদের কি কোনো প্রভাব নেই আমাদের উপর? জ্যেষ্ঠা বা শ্রবণা যদি আমাদের প্রভাবিত

করতে পারে, অগস্ত্য বা লুব্ধক কেন পারবে না? সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটা বড় জ্যোতিষ্করা ছোট নয়। কেন তারা আমাদের ভাগ্য নির্দেশে সহায়ক হবে না। গুরুদেবকে এসব কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন—ওসব আকাশ-কুসুম নিয়ে চিন্তা কোরো না। বাইরের আকাশ থেকে দৃষ্টিকে মনের আকাশের দিকে নিয়ে যাও। সেইখানেই সত্য নিহিত আছে। সেইটে উপলব্ধি কর। লোকের হাত দেখে বেড়ানো শুধু সময় নষ্ট।"

সাগর বলল—"তিনি যদি তোমাকে বলেন তাহলে তুমি দেখবে তো? অন্য লোক হলে পীড়াপীড়ি করতাম না। কিন্তু রত্নাকরের অসুখে আমরা উদাসীন থাকতে পারি না। তার মত লোক এ অঞ্চলে নেই। তাছাড়া তার সঙ্গে আমরা কোনো না কোনো বন্ধনে জড়িত। তোমার গুরু অর্ণবের আশ্রম তিনিই করিয়ে দিয়েছেন। সে আশ্রমের ব্যয়ভারও তিনি বহন করেন। সুতরাং তার হাত দেখব না একথা বলা উচিত নয়। তোমার গুড় তার নৌকোতেই বিদেশের হাটে যায়। চল তোমার গুরুদেব অর্ণবের কাছেই যাওয়া যাক—"

ইরাবতী বললেন—"তোমরা তা হলে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করে এস। আমি আর কাবেরী নাগরিগুলোতে মা-লক্ষ্মীর সিঁদুর মাখিয়ে দিই। ওরে বহু, তুই তুলসী পাতা এনেছিস? সবু কোথা? তাকে সিঁদুর গোলাটা আনতে বল—"

সর্বরূপ আর বহুরূপ দুই ভাই। তাদের মা অম্বুধির বাড়িতে কাজ করত। সে মারা গেছে, তার দুটি ছেলে এখন তার জায়গায় কাজ করে। তারা চাকরের কাজই করে, কিন্তু তারা চাকর নয়, বাড়ির পরিজন। গুড়ের ব্যবসার সব হাঙ্গামা তাদেরই উপর।

তাদের নিয়ে ইরাবতী আর কাবেরী গুড়ের নাগরী সাজাতে বসল। সাগর অম্বুধিকে কাঁধে করে চলে গেল অর্ণবের কাছে।

।। সাত ।।

অর্ণব খুব ফরসা, খুব লম্বা আর খুব রোগা। দাড়ি চুল গোঁফ কালো নয়, সোনালী। চোখের তারা নীল। হাঁটে মাথা উঁচু করে। বসে পিঠ সোজা করে। খুব স্বল্প-ভাষী। আশ্রমে তার শাসন খুব কড়া। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী তার তিনজন শিষ্যাকে রোজ শাস্ত্রপাঠ করতে হয় এবং পড়া দিতে হয়। পড়া না পারলে খাওয়া বন্ধ। কবি পারাবারের স্ত্রী ব্রাহ্মণীও অর্ণবের ভক্ত একজন। অর্ণবের কঠোর দিকটা মুগ্ধ করেছে তাকে। অর্ণব রোজ যখন নদীর ধারে গিয়ে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে সূর্যের দিকে চেয়ে করজোড়ে তপস্যা করে তখন ব্রাহ্মণীর মনে হয়—অর্ণব নিজেই বুঝি সূর্য। ব্রাহ্মণীকে অর্ণব বলেছে—তুমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না। প্রত্যহ সহস্রবার হরিনাম জপ কর। তারপর একে একে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, উপনিষদ এইগুলো পড়ে ফেল। যেখানে বুঝতে পারবে না, আমার কাছে এসো বুঝিয়ে দেব। প্রয়োজন না হলে আমার কাছে আসবে না। আর এটা জেনে রাখো তোমার স্বামী পারাবারকে সুখী রাখাই তোমার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।

এ শুনে ব্রাহ্মণীর ভক্তি আরও বেড়ে গিয়েছিল। গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর ত্রিবেণী নাম অর্ণবই রেখেছিল। ওরা হঠাৎ একদিন হাটতে হাঁটতে এসে হাজির হয়েছিল তার কাছে। এসে বলল—"আমাদের আশ্রয় দিন।"

"তোমরা কে?"

গঙ্গা বলল—"আমি পথিক।"

যমুনা বলল—"আমি পথ খুঁজছি।"

সরস্বতী বলল—"আমি পথ হারিয়েছি।"

উত্তর শুনে খুশি হয়েছিল অর্ণব। বলল—"আমি সন্ন্যাসী। আমার স্ত্রী আছে। আমি একাহারী, ফল খেয়ে থাকি। আমার স্ত্রী মাঠে কাজ করে। তোমাদের তিনজনকে আশ্রয় দেবার আর্থিক সামর্থ্য নেই আমার। তবে তোমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি যাতে হয় তার চেষ্টা আমি করব। কিন্তু তোমরা থাকবে কোথায়?"

"আধ্যাত্মিক উন্নতিই আমরা চাই।" গঙ্গা বলল।

যমুনা বলল— "কিন্তু মনোমত গুরু পাচ্ছি না। অনেক জায়গায় ঘুরেছি।"

সরস্বতী বলল— "নিষ্পাপ লোক দেখতে পাইনি। সবার চোখের দৃষ্টিতেই কাম আর কলুষ। আপনাকে দেখে আমাদের ভক্তি হয়েছে।"

"কিন্তু তোমরা থাকবে কোথায়?"

"আপনার এই কুটিরের বাইরে শুয়ে থাকব রাত্রে। আর দিনে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে মাঠে কাজ করব। মাঠ এখান থেকে কতদূর?"

"আমার চারপাশে যে মাঠ দেখছ এসবই আমার বন্ধু রত্নাকর আমাকে কিনে দিয়েছেন। আমার স্ত্রী মন্দাকিনী জন-মজুর নিয়ে কাজ করে এই মাঠে। ওই যে সব ফসল দেখছ, সব আমাদের।"

গঙ্গা বলল— "তাহলে আমরাও এই মাঠে কাজ করব।"

"কিন্তু রাত্রে শোবে কোথায়?"

"ওই গাছটার তলায় পাশাপাশি তিনজন শুয়ে থাকব।"

"সেটা কি ভালো দেখায়? আচ্ছা আমি রত্নাকরকে বলছি সে যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারে।"

রত্নাকর ওদের আশ্রয় করে দিয়েছিল। এই হল ত্রিবেণী আশ্রমের ইতিহাস। অর্ণব এদের তিনজনকেই মন্ত্র দিয়েছিল আর তিনজনকেই খুব কড়া শাসনে রাখত। ব্রাহ্মণীকে সে উপদেশ দিত। মন্ত্র দেয়নি। বলেছিল, তোমার স্বামীই তোমার গুরু, মন্ত্র যদি নিতে চাও তার কাছেই নাও। রত্নাকরও মন্ত্র নিতে চেয়েছিল তার কাছে। তাকেও মন্ত্র দেয়নি অর্ণব। বলেছিল—খোঁড়া লোকই ঘোড়া চড়ে, তুমি তো খোঁড়া নও। মন্ত্রের ঘোড়া নিয়ে কি করবে তুমি? তুমি পদস্থ স্বাধীন লোক। যেমন আছ থাকো। জ্যোতিষী অম্বুধি কিন্তু ছাড়েনি। অর্ণবের অনন্য রূপ, অদম্য উৎসাহ, অটল সংযম দেখে অম্বুধির ধারণা হয়েছিল ইনি যদি আমাকে মন্ত্র দেন আমার হিল্লে হয়ে যায়। অর্ণবকে গিয়ে ধরল একদিন।

"আপনি মহাপুরুষ। আমি মূর্খ। সামান্য জ্যোতিষ শিখেছিলাম—"

অর্ণব বলল— "অসামান্য অসাধারণ জ্যোতিষী তুমি। আমার কাছে কি দরকার?"

"আমাকে শিষ্য করুন।"

"মহেশ্বরের মন্দিরে রোজ প্রার্থনা কর তো—"

"করি। কিন্তু কেমন যেন আবোল-তাবোল হয়ে যায়। আমার প্রার্থনার ভাষাটা আপনি ঠিক করে দিন। আমি কানে কম শুনি, ভালো করে হাঁটতে পারি না। আমার অনেক দুঃখ—হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল অম্বুধি। শেষকালে লুটিয়ে পড়ল অর্ণবের পায়ে। নিতান্ত বিব্রত হয়ে অর্ণব শেষকালে

রাজি হলেন মন্ত্র দিতে। বলল— "তোমার প্রার্থনাটা আমি লিখে দেব। সেইটে মুখস্থ করে রোজ একাগ্রচিত্তে মহেশ্বরকে সেটা নিবেদন করবে। একাগ্রতাটাই আসল। তুমি মহেশ্বরের কাছে কি চাও—"

"কষ্ট থেকে মুক্তি—।"

"তাহলে সেইটেই সহজ ভাষায় বলো মহেশ্বরকে। তিনি কীটের ভাষাও বুঝতে পারেন। তোমার ভাষাও বুঝবেন।"

অম্বুধি কিন্তু অনড়। বলল, "আমায় মন্ত্র দিন।"

"মন্ত্র! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এদের কারো একটা নাম বারবার জপ কর। ওরা তিনই এক, একই তিন। ওদের প্রত্যেকেরই অনেক নাম আছে। তুমি যে কোনো একটা নাম জপ কর। আলাদা মন্ত্র নেবার দরকার কি—"

"আপনাকে কিন্তু আমি গুরুপদে বরণ করতে চাই। আমি চলতে পারি না, শুনতে পাই না। আপনি আমার সহায় হোন।"

"বেশ। কিন্তু আমাকে বিনা প্রয়োজনে এসে বিরক্ত করবে না।"

"করব না। যখন আমার মনে কোনো প্রশ্ন জাগবে তখন আসব খালি—"

"বেশ—"

অর্ণবের আর শিষ্য নেই। অর্ণব যখন এখানে এসেছিল সস্ত্রীকই এসেছিল। তার স্ত্রী মন্দাকিনী অপরূপ সুন্দরী। অর্ণবের কোথায় জন্ম, কোথায় সে তপস্যা করেছিল, কেউ তা জানে না। হঠাৎ সে মন্দাকিনীকে নিয়ে এসে বসেছিল ওই মাঠের মাঝখানে বিশাল শিরীষ গাছটার তলায়। গাঁয়ের একটি মেয়ে তাদের দেখে ভেবেছিল—বুঝি ওরা দেবতা। সে তার অন্ধ স্বামীকে হাত ধরে নিয়ে এসেছিল নাকি তাদের কাছে। বলেছিল—দেবতা, আমার স্বামীর দৃষ্টি ফিরিয়ে দাও। অর্ণব তার চোখে হাত বুলিয়ে দিতেই ফিরে পেল সে দৃষ্টি। তারপর শত শত আর্ত আতুরের ভিড় লেগে গেল। অর্ণব আর মন্দাকিনী পালিয়ে গেল একটা বনের মধ্যে। রত্নাকর খবর পেয়ে খুঁজে বার করল তাদের। অর্ণব বলল— "আমি জনপদে যাব না। মানুষের রোগ সারানো আমার কাজ নয়। দৃষ্টিহীন ভগবানের দয়ায় দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। ওতে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই।" রত্নাকর বলল— "আপনাকে কেউ বিরক্ত করবে না। আমি রাজার সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ করব তাঁকে। তিনি যেন ঘোষণা করে দেন রোগ সারাবার জন্য কেউ যেন আপনার কাছে না আসে। রাজ-ঘোষণা হয়ে গেলে আপনি নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে পারবেন। কারণ এদেশে রাজ-ঘোষণার বিরুদ্ধাচরণ করলে প্রাণদণ্ড হয়।"

মহেশ্বর অঞ্চলের রাজা ছিলেন পৃথ্বীপতি শঙ্কর দাস। রত্নাকরকে খুব খ্যতির করতেন তিনি। তিনি ঘোষণা করলেন অর্ণবের কাছে ব্যাধি সারাবার দাবি বা প্রার্থনা নিয়ে যে যাবে তার প্রাণদণ্ড হবে। তাঁকে যেন বিরক্ত না করা হয়। রত্নাকরের অনুরোধেই রাজা তাঁকে পঁচিশ বিঘে নিষ্কর জমি দান করতে চাইলেন। অর্ণব বলল—কারো দান আমি নেব না। তখন রত্নাকর রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তাঁকে দিয়ে একটা যজ্ঞ করালেন এবং সেই পাঁচশ বিঘে জমি কিনে দক্ষিণাস্বরূপ দিলেন তাঁকে। এতে আপত্তি করেনি অর্ণব।

এসব অনেকদিন আগেকার কথা। অর্ণব আর মন্দাকিনীর সত্য ইতিহাস কেউ জানে না। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে নানারকম অদ্ভুত গুজব প্রচলিত আছে। তিন্তিড়ী একটা আশ্চর্য গল্প বলে। তার বিখ্যাত গাঁজার জন্য অনেক লোক গাঁজা কিনতে আসে সেখানে। লবঙ্গ দেশের একটি লোক তাকে নাকি

বলেছিল যে মন্দাকিনী লোহিত দেশের রাজকন্যা। লোহিত রাজার একমাত্র সন্তানও সে। অপরূপ সুন্দরী এই রাজকন্যাই যে ভবিষ্যতে সিংহাসনে আরোহণ করবে এই কথা সবাই জানত। কিন্তু নিয়তির বিধানে হয়ে গেল অন্যরকম। রাজকন্যার বয়স যখন বারো বছর তখন হঠাৎ একদিন সর্পাঘাতে মৃত্যু হল তাঁর। রাজপুরী শোকে সমাচ্ছন্ন হল। লোহিতরাজ গণপতি শোকে উন্মত্ত হয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলেন। তখন মন্ত্রী বললেন— "মহারাজ স্লেচ্ছ দেশ থেকে একজন তপস্বী এসেছেন, তিনি বলেছেন, রাজকন্যাকে বাঁচিয়ে দেবেন। কিন্তু তাঁর একটি শর্ত আছে। তাঁকে ডাকব?" মহারাজ বললেন "ডাক ডাক এক্ষুণি ডাক।" অর্ণব এসে বললেন—"উনি রাজকন্যারূপে বাঁচবেন না, সন্ন্যাসিনীরূপে বাঁচবেন। রাজকন্যার আয়ু ফুরিয়েছে। উনি যে মুহূর্তে পুনর্জীবন লাভ করবেন সেই মুহূর্তে উনি যদি কোনো সন্ন্যাসীকে পতিত্বে বরণ করেন তাহলে দীর্ঘজীবন লাভ করবেন।" রাজা বললেন—"সন্ন্যাসী পাত্র আমি কোথা পাব? আপনি তো সন্ন্যাসী, আপনি ওকে বিয়ে করবেন?" অর্ণব উত্তর দিলেন— "করতে পারি। আমারও একজন জীবন-সঙ্গিনীর প্রয়োজন। কিন্তু ওঁকে বিয়ে করবা মাত্রই আমি ওঁকে নিয়ে এদেশ ত্যাগ করে চলে যাব।"

রাজা বললেন— "মন্দাকিনী আমার উত্তরাধিকারিণী। আপনি ওকে বিয়ে করে এ রাজত্বের ভার নিন—"

"সন্ন্যাসী কখনও বিষয়ে লিপ্ত হয় না। যে মুহূর্তে আমি বিষয়ের বিষ পান করব, সেই মুহূর্তে সন্ন্যাসীর মৃত্যু হবে এবং সেই মুহূর্তে আপনার কন্যা মন্দাকিনীও দেহ ত্যাগ করবে। কারণ ও তখন আর সন্ন্যাসিনী থাকবে না—"

রাজা মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন। শেষে যখন দেখলেন আর গত্যন্তর নেই তখন রাজি হলেন তিনি। অর্ণব স্পর্শ করবামাত্র বেঁচে উঠল মন্দাকিনী। সেইদিনই তাকে বিয়ে করে লোহিত রাজ্য ত্যাগ করল সে। লোকে বলে লোহিতরাজ নাকি একজন চর নিযুক্ত করেছেন ওদের অনুসরণ করবার জন্য। সে চর নাকি গোপনে মন্দাকিনীকে টাকাকড়ি দিয়ে আসে। মন্দাকিনী যদিও মাঠে জন মজুরের সঙ্গে কাজ করে, গেরুয়াও পরে, কিন্তু সন্ন্যাসিনী বলতে যা বোঝায় সে ঠিক তা নয়। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী যেমন মন্দিরে মন্দিরে পুজো করে, গান করে, ভাগবত পাঠ করে, ব্রত উপবাস করে, রোজ নদীতে স্নান করে, সূর্যের দিকে তাকিয়ে উপাসনা করে, মন্দাকিনী কিন্তু কিছু করে না। নির্বাক হয়ে সে মাঠে কাজ করে কেবল। কারো সঙ্গে মেশে না। ভ্রূকুটি ঈষৎ কুঞ্চিত করে কাজ করে যায় খালি। সে কাউকে ধরা ছোঁয়া দেয় না বলে তাকে নিয়ে নানারকম গুজব রটায় লোকে। কিন্তু তার কাছে যেতে সাহস করে না কেউ। অর্ণবের প্রতি তার সত্য মনোভাব কি তা কেউ জানে না। সে যে রোজ অর্ণবের পাদোদক পান করে এ-ও কারও জানা নেই। কারণ একটা বড় হাঁড়িতে জল ভরে অর্ণবকে তাতে পা ডোবাতে বলে সে মাঝে মাঝে। সেই জল খুব ভোরে সে খায় রোজ একটু করে। এক হাঁড়ি জল চলে অনেকদিন। এটা তার পাগলামি না ভক্তির লক্ষণ তা ঠিক করে বলা শক্ত। অর্ণব তার কোনো কাজেই বাধা দেয় না। যখনই সে জলের হাঁড়িতে পা ডোবাতে বলে তখনই হাসিমুখে ডান-পা-টা ডুবিয়ে দেয়। অর্ণব বোধহয় ভুলতে পারে না যে সে একদিন রাজকন্যা ছিল। তাই তার কোনো আচরণে বাধা দেয় না সে। লোহিত রাজ্যে মহাদেব নীললোহিত নামে পূজিত হন। মন্দাকিনীর বাবা গণপতির বাড়ির সামনে বিরাট মণিমাণিক্যখচিত নীললোহিতের মন্দির ছিল একটি। সে মন্দিরে

মন্দাকিনী রোজ মহাদেবকে পুজো করত। অর্ণবের মাঝে মাঝে মনে হয় সেই নীললোহিতই গঙ্গা যমুনা সরস্বতীকে তার কাছে পাঠিয়েছেন মন্দাকিনীর সেবা করবার জন্য। সত্যিই তারা মন্দাকিনীকে পরিচারিকার মতো সেবা করে। কুটোটি নাড়তে দেয় না তাকে। রান্নাবান্না, কাপড় কাচা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, সব তারাই করে। জমির কাজও করে মন্দাকিনীর সঙ্গে। অর্ণবের মনে হয় নীললোহিতের ইচ্ছাতেই এসব হচ্ছে। মন্দাকিনী এখানেও মহেশ্বরের মন্দিরে রোজ যায়। গভীর রাত্রে যায়। এখানে সকলেই একা মহেশ্বরের মন্দিরে যায়। সে যে সময় মহেশ্বরকে প্রার্থনা করে, সে সময় তার কাছে কেউ থাকে না। সে যখন সময় পায় যায়। মহেশ্বর অঞ্চলে মহেশ্বরের অনেক মন্দির। অনেকে নিজের বাড়ির সামনে নিজের জন্যে মন্দির করিয়ে নিয়েছে। রত্নাকরের নিজের মন্দির আছে। অম্বুধির নিজের মন্দির আছে। আরও অনেকের আছে। শ্মশানের মাঝখানে যে মন্দিরটা আছে সেখানেই মন্দাকিনী যায়। সেখানে গিয়ে সে প্রার্থনা করে, হে মহেশ্বর, হে নীললোহিত, তুমি রত্নাকরের মঙ্গল কর। রত্নাকর আমাদের আশ্রয় দিয়েছে। রত্নাকর আমাদের জমি দিয়েছে, সেই জমিতে কাজ করে আমি নিজের শক্তিকে প্রত্যক্ষ করি, জমি কর্ষণ করে, তাতে বীজ বপন করে আমি শত শত শস্যের শিশু অঙ্কুরকে লালন করি। আমার বন্ধ্যা হৃদয় এতে অপরিসীম তৃপ্তি লাভ করে। এসবই সম্ভব হয়েছে রত্নাকরের জন্য। হে বিশ্বেশ্বর, তুমি তার মঙ্গল কর। নিজের জন্য বা অর্ণবের জন্য কোনো প্রার্থনাই সে করে না। তার এ প্রার্থনার খবর আমরা তিন্তিড়ীর কাছে পেয়েছি। সে বিবরণ পরে দেব। মন্দাকিনীর এ প্রার্থনা থেকে যদি কারো মনে হয় মন্দাকিনী রত্নাকরের প্রেমে পড়েছিল, তাহলে আমি তাকে মনে করিয়ে দেব গভীর শ্রদ্ধা আর গভীর প্রেমে খুব তফাত নেই। শ্রদ্ধাই বোধহয় প্রেমের শুদ্ধতম রূপ।

আসল গল্প থেকে কিন্তু কথায় কথায় অনেক দূর সরে এসেছি। মল্লবীর সাগর সেদিন যখন জ্যোতিষী অম্বুধিকে নিয়ে অর্ণবের কাছে এসে হাজির হল তখন অর্ণব নদীর ধারে একপায়ে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে চেয়ে তপস্যা করছিল। সাগরের সঙ্গে ছিল দশজন চাকর। প্রত্যেকের মাথায় এক নাগরী গুড়। ইরাবতী ত্রিবেণী সঙ্গম আশ্রমের জন্য গুড় পাঠিয়েছে। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী ছুটে এল। তিন জনে তিনটে হাত পাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগল সাগরকে আর অম্বুধিকে। মন্দাকিনী কিছু নাড়ু বার করে এনে খেতে দিল ওদের। বলল— "উনি এখুনি আসবেন। ওঁর খাওয়ার সময় হয়েছে—"

বলে সেও একটা পাখা নিয়ে নীরবে হাওয়া করতে লাগল ওদের।

একটু পরেই এসে পড়ল অর্ণব।

"কি ব্যাপার, তোমরা হঠাৎ এসে পড়লে কেন?"

সাগর বলল— "রত্নাকর অসুস্থ। তাপ্তির ইচ্ছে অম্বুধি গণনা করে বলে দিক তার কি হয়েছে। ভালো হবে কি না। কিন্তু অম্বুধি বলছে আপনি তাকে না কি জ্যোতিষ চর্চা করতে মানা করেছেন। তাই আমরা আপনার অনুমতি নিতে এসেছি অম্বুধি রত্নাকরের হাত দেখবে কি না—" অর্ণব হেসে বলল— "জ্যোতিষচর্চা করা পাপ নয়। সুতরাং করবে না কেন? আমি ওকে মানা করেছিলাম কারণ ওতে সময় নষ্ট হয়। অনিবার্যকে নিবারণ করবার সাধ্য যখন কারো নেই তখন তা নিয়ে মাথা ঘামানো বৃথা। যা হবার তা তো হবেই। রত্নাকরের বা তাপ্তির সেটা জানবার যখন কৌতূহল হয়েছে, আর তুমি সেটা যখন বলে দিতে পারো, দাও। আমি আপত্তি করব কেন। রত্নাকর আমাদের সকলের প্রিয়, সকলের হিতৈষী। সে যখন চাইছে, তখন দাও না তার হাত দেখে। এর জন্য আমার অনুমতি নেবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। মনে রেখো, শিষ্য গুরুর ক্রীতদাস নয়। কোনো গুরু শিষ্যের স্বাধীনতা

হরণ করে না। ভগবানের প্রধান গুণ তিনি সর্বতোভাবে স্বাধীন। গুরুর কাজ সেই ভগবানের স্বরূপ শিষ্যের কাছে প্রকাশ করা। শিষ্যকে দাসমনোভাবাপন্ন করা নয়।"

অম্বুধি হাত জোড় করে বসে রইল। কোনো উত্তর দিল না। অর্ণব আরও বলল—"আমি এই জন্যেই কারুকে শিষ্য করতে চাই না। শিষ্যরা প্রায়ই নিজেদের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। তাতে মহাক্ষতি—।"

অম্বুধি হাত জোড় করে বসেই রইল। কোনো উত্তর দিল না। অর্ণব কুটিরের ভিতর চলে গেল। সাগর তখন চেঁচিয়ে অম্বুধিকে বলল— "তোমার গুরু তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন। এবার চল রত্নাকরের বাড়ি যাই।"

।। আট ।।

তাপ্তি সকালে ঘরের জানালা খুলেই চমকে উঠল। ফল্গু আসছে। তার পিছনে একটা চাকর। তার মাথায় প্রকাণ্ড একটা ঝুড়িতে বড় বড় আনারস। তাপ্তির মনে হল ফল্গু যেন উন্মনা হয়ে উড়তে উড়তে আসছে। তার মাথায় ঘোমটা নেই। পেছনে বেণী দুলছে। বেণীর শেষ প্রান্তে দুলছে টকটকে লাল একটা ফুল। পরনের শাড়ির রং লাল আর সোনালীতে মেশানো। মনে হচ্ছে সন্ধ্যার একটুকরো মেঘ যেন জড়িয়ে আছে ওর সর্বাঙ্গে। তাপ্তির বুকটা কেঁপে উঠল। ও মেয়েকে তো কিছুই বলা যাবে না। এখনই এসে গলা জড়িয়ে ধরবে।

"কাকীমা কপাট খোল—"

কপাট খুলে দিতেই ফল্গু সত্যই গলা জড়িয়ে ধরল তার।

"কাকুর নাকি অসুখ করেছে। তুমি তো আমাকে খবর পাঠাওনি—কি হয়েছে কাকুর—"

"তোমার কলা খাওয়ার পর থেকে সেই যে পেট ব্যথা শুরু হল তা আজও সারেনি। জলধি, অব্ধি কেউ ধরতে পারছে না কি হয়েছে। সাগব আজ অম্বুধিকে নিয়ে আসবে। অম্বুধি বড় জ্যোতিষী, সে হয়ত কিছু বলতে পারবে—"

"কাকুকে আমি আনারসের রস খাওয়াব। তাহলেই ভালো হয়ে যাবেন উনি। আমি নিজে হাতে রস করে দেব। আমাকে বাটি আর খল নোড়া দাও—"

তাপ্তির অন্তরাত্মা শিউরে উঠল। যে ফল্গুর কলা খেয়ে রত্নাকর পেটের ব্যথায় ভুগছে সেই ফল্গুই আবার তাকে আনারস খাওয়াতে এসেছে। কি সর্বনাশ। কিন্তু সে জানে ফল্গু কারো বারণ শুনবে না। তবু সে ক্ষীণকণ্ঠে বললে— "এখন আনারস খাওয়াবে? পেটের ব্যথা সারেনি এখনও।"

"কাকু কি খাচ্ছেন এখন—"

"মৌরলা মাছের ঝোল আর পুরোনো চালের ভাত—"

"দুধ খান না?"

"দুধও খান।"

"কাকু তো ক্ষীর খেতেন রোজ—"

"দুধ একটু ঘন করে দি—"

"তাহলে আনারসের রস খেলে কিছু হবে না। এ সিঙ্গাপুরের ভালো আনারস। হজমী—" আনারসের

ঝুড়ি নিয়ে ভিতরে চলে গেল ফল্গু। তাপ্তি গেল পিছনে পিছনে। গিয়ে দেখল রত্নাকর বিছানায় বসে খাতাপত্র দেখছেন।

"এ কি কাকু, শুনলাম তোমার অসুখ করেছে। কিন্তু তোমাকে দেখে তা তো মনে হচ্ছে না। কোথায় ব্যথা—"

"পেটের কাছটায় একটু ব্যথা করে।"

"আনারসের রস করে দিচ্ছি খাও। সব সেরে যাবে—।"

"দাও—।"

তাপ্তি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ফল্গু রস করবার জন্য চলে গেল ভিতরে।

একটু পরে একটি স্ফটিকের থালার উপর তিনটি স্ফটিকের বাটিতে আনারসের রস নিয়ে যখন ফল্গু এল তখন তাপ্তি বলে উঠল—"তিন বাটি রস খাওয়াবে?" উচ্ছ্বসিত কলহাস্যে হেসে উঠল ফল্গু।

"এক বাটি তোমার সামনে আমি খাব। আর এক বাটি তুমি, আর এক বাটি কাকু খাবে—। মরি তো তিনজনে একসঙ্গে মরব।" এরপরই ভিনটির গলা শোনা গেল।

"ফলি এখানে এসেছিস—"

"এসেছি। আমি কাকুর কাছে থাকব এখন, যাব না—"

সে হয়ত থেকেই যেত, কিন্তু এর পর অম্বুধিকে কাঁধে করে সাগর এসে পড়ল। শরবতটা খেয়ে সুট করে সরে পড়ল ফল্গু। ভিড় সে ভালোবাসে না।

অম্বুধি এসে যা বলল তার জন্য প্রস্তুত ছিল না তাপ্তি।

সে বলল— "আমি রত্নাকরকে উলঙ্গ করে তার সমস্ত শরীরটা পরীক্ষা করতে চাই। শুধু হাত দেখে সব কথা বলা যাবে না। আমি যে বিদ্যা জানি তার নাম দশাঙ্গ বিদ্যা। রত্নাকর কি আমার সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াতে রাজি আছে?"

রত্নাকর বলল— "রাজি আছি। কিন্তু সেখানে আর কেউ থাকবে না—" তাপ্তি সন্তুষ্ট হল না এ প্রস্তাবে। কিন্তু রাজি হতে হল তাকে। অম্বুধি রত্নাকরের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। সবাইকে সে ঘর থেকে বার করে দিয়ে খিল বন্ধ করে দিল রত্নাকর। প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে খিল খুলল। অম্বুধি বলল— "এ পেটের ব্যথার সঙ্গে মনের যোগ আছে। রাজবৈদ্যের ওষুধ খেলে এবং রাজদর্শন করলে ভালো হয়ে যাবে। মহেশ্বর অঞ্চলের রাজা পৃথ্বীপতি শঙ্কর দাস রত্নাকরের বন্ধু। তার রাজধানী হিরণ্ময়ী নদীর উপর। রত্নাকর নিজের ময়ূরপংখী করে সেখানে চলে যাক।" অম্বুধি জোর দিয়ে আবার বলল— "আমার বিশ্বাস এতে অসুখ সেরে যাবে।"

অম্বুধি চলে যাওয়ার পর তাপ্তি বলল— "আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাব।"

"সে কথা তো বলাই বাহুল্য।"

হেসে জবাব দিল রত্নাকর।

"ঠিক তো?"

"ঠিক। কিন্তু তুমি ময়ূরপংখীতে থাকবে। রাজার বাড়ি যাবে না।"

"বেশ। তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে তো?"

"আসব।"

।। নয় ।।

পরদিনই রত্নাকরের প্রধান সহচর পরিচয় পাহাড়ী রাজাকে খবর দেবার জন্য একটি পত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ল নৌকো করে। সেকালেও বিনা খবরে এবং বিনা অনুমতিতে রাজার কাছে যাওয়া যেত না। বন্ধুবান্ধবেরাও যেতে পারত না। চিঠি লেখারও একটা কেতাদুরস্ত কায়দা ছিল। সেই কায়দা অনুসারেই রত্নাকর লিখল—

মহামহিম মহিমার্ণব
শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা পৃথ্বীপতি
প্রবল প্রতাপেষু,
সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে নিবেদন,
পত্রলেখক আপনার দর্শন-প্রার্থী।
অনুমতি দিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিবেন। নিতান্ত প্রয়োজন।
শতকোটি প্রণাম।

সেবক
শ্রীরত্নাকর বণিক।

রাজার জন্য নানারকম উপঢৌকন নিয়ে প্রকাণ্ড একটা বজরা করে যাচ্ছিল পরিচয় পাহাড়ী হিরণ্ময়ী নদীর উপর দিয়ে। হিরণ্ময়ী নদী মহেশ্বর অঞ্চলের শ্মশানের পাশ দিয়ে বয়ে চলে গেছে রাজভবনের দিকে।

বজরার মাঝিরা গান গাইছিল, দাঁড় টানছিল যদিও তখন রাত দুপুর। ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার চারদিকে। অভিজ্ঞ নাবিক পরিচয় পাহাড়ী বসেছিল হাল ধরে। হাওয়ায় ফুলে উঠেছিল চারখানা পাল। বজরা বেশ জোরেই চলছিল কিন্তু শ্মশানের কাছে এসে থেমে গেল হঠাৎ। পাল চুপসে গেল। মাঝিরা বলল, দাঁড় নড়ছে না, প্রত্যেকটি দাঁড় পাথরের মত ভারি হয়ে গেছে। পরিচয় পাহাড়ী বড় বড় নদী পার হয়েছে, সমুদ্র পার হয়েছে। নানারকম নৌকোয় নানা দেশ ঘুরেছে সে, তার চুল পেকে গেছে, কিন্তু এরকম অভিজ্ঞতা তার জীবনে কখনও হয়নি। সিঁড়ি বেয়ে বজরা থেকে নেমে পড়ল সে। নেমেই বুঝতে পারল শ্মশানের ধার দিয়ে যাচ্ছে তারা। শ্মশান নিস্তব্ধ। খানিকক্ষণ হাঁটার পর অনেক দূরে সে আলো দেখতে পেল। মনে হল চিতা জ্বলছে বোধ হয়। কাছে গিয়ে দেখল চিতা নয়। চারদিকে ধুনী জ্বালিয়ে উলঙ্গিনী ভোগবতী বসে আছে সর্বাঙ্গে ছাই মেখে। পরিচয় বুঝল ভোগবতীই কিছু করেছে। অঘ্নি আর ভোগবতীকে এ অঞ্চলে সবাই চেনে, সবাই ভয় করে। অসাধ্য সাধন করতে পারে তারা। সে হাত জোড় করে প্রণাম করল ভোগবতীকে।

"ঠাকরুণ আমাদের নৌকো কি আপনিই থামিয়ে দিয়েছেন?"

"তোমার নৌকো থেকেই কি অত শব্দ হচ্ছিল নাকি? গান গাইছিল কারা?"

"মাঝিরা—"

"ছপাৎ ছপ শব্দ হচ্ছিল কিসের?"

"দাঁড়ের...।"

"এখন কোনো শব্দ করা চলবে না। অব্ধি শবাসনে ধ্যান করছে। শব্দ করলে ধ্যান ভেঙে যাবে। আর তাহলেই মহা মুশকিল—"

"কেন কি হয়েছে—"

"কাল রাত্রে প্রকাণ্ড একটা হাঁস এসে বসেছিল মন্দিরের উপর। ব্রহ্মার হাঁস। আজ দেখছি মহেশ্বর মন্দির থেকে অন্তর্ধান করেছেন। অব্ধি শবাসনে বসে ধ্যানে জানতে চাইছে কেন এরকম হল। এখন গোলমাল করা চলবে না।"

পরিচয় বলল—"আমি রত্নাকরের একটা জরুরি চিঠি নিয়ে মহারাজ পৃথ্বীপতির কাছে যাচ্ছি। আমার বজরাটাকে ছেড়ে দিন। আমরা নিঃশব্দে পার হয়ে যাব। শুধু পালের জোরেই পেরিয়ে যাব, আপনি হাওয়াটাকে একটু ছেড়ে দিন।"

পরিচয় পাহাড়ীর বয়স যদিও ষাট পেরিয়েছে, পাক ধরেছে চুলে তবুও এখনও সে শক্তিমান। উলঙ্গিনী ভোগবতীকে দেখে তার মনে একটু রিরংসার ভাব জাগল।

ভোগবতী হেসে বলল— "চোখ দুটো কানা করে দেব এখুনি। শিগগির পালা। বোকা পাঁঠা কোথাকার—"

পরিচয় সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"হাওয়া ছেড়ে দিচ্ছি। গোলমাল না করে বিদেয় হ—"

হনহন করে চলে গেল পাহাড়ী। বজরায় উঠে দেখল হাওয়া বেশ জোরে উঠেছে। ফুলে উঠেছে পাল চারটে। নিঃশব্দ গতিতে এগিয়ে চলল তার বজরা রাজপুরীর দিকে।

চারদিকে ধুনী জ্বালিয়ে ভোগবতীও তপস্যা করছিল। সে তপস্যা করছিল কবে কি করে সে পাতালে যাবে। আলোর স্বচ্ছতা আর ভালো লাগছে না তার। স্পষ্টতা বিরক্তিকর হয়ে উঠছে তার কাছে। অন্ধকারের অনিশ্চয়তার মধ্যে, অতল কালোর রহস্যের মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে চায় সে। কিন্তু অব্ধিকে যে ছেড়ে যেতে পারছে না। অব্ধি বড় নিষ্ঠুর, কিন্তু নিষ্ঠুর বলেই মনোহর। তার প্রহারে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় সে। কিন্তু সে প্রহারে কি যে আনন্দ তা বলে বোঝানো যায় না। সে-ও যখন অব্ধিকে আঘাত করে অব্ধিও রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে পুলকে। সে অব্ধিকে যত আনন্দ দিতে পেরেছে তার সাতাশটা বউ তা দিতে পারেনি। তারা সব ছিল পানসে, জোলো, নিষ্প্রাণ মাংসপিণ্ড সব। বাঘের সঙ্গিনী বাঘিনী, সর্পের সঙ্গিনী সর্পিনী হতে পারেনি। অব্ধি বাঘ, অব্ধি সাপ। ওরা সবাই বেমানান হয়েছিল, তাই একে একে পালিয়ে গেছে। ভোগবতীর মনও পালিয়ে গেছে পাতালের দিকে। কিন্তু অব্ধিকে ছেড়ে সে যাবে কেমন করে। যখনই সে অবসর পায় তখনই তাই সে তপস্যা করে ভগবান, অব্ধির মোহ থেকে মুক্ত কর আমাকে। আমি পাতালের রহস্যে বিলীন হতে চাই। অব্ধির ক্ষমতার উৎস মহাকাল মহেশ্বর। কিন্তু ভোগবতী জানে ভোগবতীর সাহায্য ব্যতীত সে উৎসে অব্ধি পৌঁছতে পারবে না। ভোগবতী অব্ধিকে বহন করে নিয়ে যায় সেখানে, কিন্তু কেমন করে নিয়ে যায়, তার চোখের দৃষ্টিতে, তার দেহের ভঙ্গিমায় তার আলিঙ্গনের মদিরায়—কোথায় সে রহস্য লুকিয়ে আছে তা ভোগবতীও জানে না। শুধু এইটুকু জানে অব্ধি যখন তপস্যা করে তখন তাকে কাছে বসে থাকতে হয়। ভোগবতীর সান্নিধ্য অব্ধির প্রয়োজন।

ভোগবতী বসে বসে তপস্যা করতে লাগল।—আমাকে অব্ধির মোহপাশ থেকে মুক্ত কর। হে

মহেশ্বর, আমাকে পাতালে নিয়ে চল। আলোর স্পষ্টতায় তোমাকে আমি পাই না, অন্ধকারের নিবিড়তায় তোমাকে আমি পাব। অন্ধকারের দেবতা তুমি, তোমাকে আলোয় পাওয়া যায় না।

হঠাৎ তার মাথার উপর পাখা মেলে বিরাট একটা সাদা পেঁচা উড়তে লাগল। উড়তে উড়তে বলতে লাগল—আমি অন্ধকারের প্রাণী তাই বোধহয় জানি—অন্ধকার অস্পষ্ট নয়, অন্ধকারেও দেখতে পাওয়া যায়। দেখতে পাওয়া না গেলে আমরা বাঁচতাম না। তুমি আলোর প্রাণী তুমি অন্ধকারে আসতে চাইছ কেন? তুমি বলছ আলো বড় বেশি স্বচ্ছ? আমার কাছে আলো তো স্বচ্ছ নয়। তোমাকে বারণ করছি ভোগবতী অন্ধকারের রাজত্বে তুমি এসো না। অন্ধকার রাজ্যে অন্ধকারের প্রাণীরা গিজ-গিজ করছে, বাইরের লোকের সেখানে স্থান নেই। তুমি এসো না।

চিৎকার করে উঠল ভোগবতী— "তুই দূর হ, দূর হ, দূর হ"—ধুনীর একটা জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে দিল তার দিকে।

চলে গেল পেঁচাটা।

হঠাৎ অব্ধি এসে হাজির হল। বলল— "মহেশ্বর সুমেরু পর্বতে গেছেন। দেবতাদের আর দৈত্যদের সভা হচ্ছে। সেখানে সভা শেষ হয়ে গেছে। মহেশ্বর এখনই ফিরবেন।"

"কিসের সভা?"

"তা মহেশ্বর জানেন। আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। কি খাই বল তো?"

"জানতাম তোমার ক্ষিদে পাবে। চাঁদুর ভাঁটিতে খবর দিয়েছি মাংস আর কারণ রাখতে। চল তাহলে সেখানেই যাই—"

হঠাৎ অব্ধি গালটা টিপে দিলে ভোগবতীর।

"মাংস, মাংস, মাংস— কেবল মাংসের লোভ—।"

অব্ধির বুকে একটা ঘুসি মেরে সরিয়ে দিলে তাকে ভোগবতী তারপর ছুটতে লাগল। অব্ধিও ছুটতে লাগল তার পিছু পিছু।

শ্মশানের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল দুজনে।

।। দশ ।।

আকাশ মেঘ-মেদুর সেদিন। গুরু গুরু শব্দ হচ্ছে। এলোমেলো হাওয়া বইছে একটা। তাপ্তির পরিচারিকা পদ্মা কাপড় পাট করছে। তার অন্তরও গুরুগুরু করছে। সে জানে সে বুঝতে পারে রত্নাকর তাকে ভালোবাসে। রত্নাকর কিছু বলেনি, কিন্তু সে জানে, সে জানে, সে জানে।

আকাশের মেঘ কেটে গেল, বৃষ্টি হয়ে গেল এক পশলা। চারদিক ভিজে ভিজে। মেঘের ফাঁক থেকে সূর্য উঠছে সোনালি আলো ছড়িয়ে, সেই সোনা চকচক করছে সর্বত্র। জলে, স্থলে, গাছের পাতায়, ফুলের পাপড়িতে, আকাশের নীলে, মেঘের স্তূপে। জলধি কবিরাজের স্ত্রী নর্মদার মনেও। রত্নাকরের কথা ভাবছে সে। রত্নাকর যে দুল-জোড়া এনে দিয়েছিল তাকে, চকচক করছে সে দুটোও। সে চ্যবনপ্রাশ তৈরির আয়োজন করছিল। মনটা কিন্তু পড়েছিল রত্নাকরের কাছে। তার বিদ্বান স্বামীকে সে ভক্তি করে, তার সব আদেশ পালন করে, কিন্তু রত্নাকরকে সে ভুলতে পারে না। ওর হাসিতে,

চাহনিতে, ব্যবহারে কি যে একটা আছে যা আর কোথাও নেই। রত্নাকর মুখে কিছু বলেনি, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি যা বলেছে, তা শুনেছে নর্মদা। তার বদ্ধ ঘরের জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, আকাশের একটা টুকরো। নর্মদার মনে হচ্ছিল রত্নাকর তার বদ্ধ জীবনে ওই আকাশের টুকরোর মত। অসীমের ইঙ্গিত বহন করে আনে, উন্মনা করে দেয়, কিন্তু নাগালের বাইরে।

সূর্য অস্ত গেছে মেঘের স্বর্ণস্তূপের মাঝে। স্বর্ণস্তূপকে ঘিরে কমলা রঙের উৎসব হচ্ছে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে অপরূপ একটা আলো। ত্রিবেণী সঙ্গমের মন্দিরে পুজো করছিল ব্রাহ্মণী। পুজো সেরে বেরিয়ে এসেই সে এই আলো দেখে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সহসা তার একজনকে মনে পড়ল। গুরুদেব অর্ণবকে নয়, স্বামী পারাবারকে নয়, মনে পড়ল রত্নাকরকে। রত্নাকরের উপহার বস্ত্রটি পরেই সে রোজ পূজা করে। এখনও করছিল। এই অপরূপ আলোয় সে কাষায় বস্ত্রেও যেন একটা নূতন রং লাগল। ব্রাহ্মণী রূপসী। মনে হল আলোর-বসন-পরা এক অপ্সরী যেন আকাশের দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে আছে। সে তার স্বামী পারাবারকে ভালোবাসে। সে তার প্রেমিক। সে কবি। রোজই তাকে নিয়ে কবিতা লেখে। কাল লিখেছে—

তোমার মিষ্টি হাসির চমক
দীপক রাগের গানের গমক
তোমার চলার ভঙ্গিতে যে
খঞ্জনদের চলার চমক।

সে গুরুদেব অর্ণবকেও ভক্তি করে। অর্ণব সত্যিই ভক্তিভাজন।

কিন্তু তবু অপরূপ আলোয় তার মনে পড়ল রত্নাকরকে। রত্নাকর গুরু নয়, রত্নকার কবি নয়, রত্নাকর এই আলোর আভা।

থমথম করছে অন্ধকার রাত্রি। জ্যোতিষী অম্বুধি বসে আছে উঠোনে আকাশের দিকে চেয়ে। চেষ্টা করছে পুষ্যা নক্ষত্রটাকে দেখতে। পুষ্যা নক্ষত্র বড় অস্পষ্ট। একটা ছোট্ট ধোঁয়ার কুণ্ডলী অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। মনে হয় কি যেন একটা রহস্য আছে ওর মধ্যে। রোহিণী বা আর্দ্রার মত স্পষ্ট নয়। পুষ্যা তার জন্ম নক্ষত্র। কোষ্ঠি থেকে মনে হয় তার অপঘাতে মৃত্যু হবে। সেই মৃত্যুটাকে সে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করে ওই রহস্যময় কুণ্ডলীর মধ্যে।

ইরাবতী ঘরে একা বিছানায় শুয়ে কাঁদছে। রোজই সে একা শোয়। অম্বুধি তার কাছে শোয় না। অম্বুধি অসমর্থ। কিন্তু এই অসমর্থ স্বামীকে ইরাবতী ছেড়ে যায়নি। দেহে সে অসমর্থ, কিন্তু কি বিরাট তার প্রতিভা। অথচ একেবারে শিশুর মত। ইরাবতী তাকে খাইয়ে দেয়, নাইয়ে দেয়। ইরাবতী অম্বুধির মা। সন্তানকে ছেড়ে সে যাবে কি করে? অম্বুধি তার প্রাণ। কিন্তু মানুষের মনের ক্ষুধা এক রকম নয়। নারী মা হতে চায়। প্রিয়াও হতে চায়। যে ইরাবতী প্রিয়া হতে চায় সে কিন্তু আজও একাকিনী। শুধু একাকিনী নয়, মনে মনে সে গভীর অন্ধকারে চির-অভিসারিকা। অন্ধকারে সে মনে মনে হাঁটছে, কেবল হাঁটছে। পার হচ্ছে প্রান্তর মরু নদী পর্বত। কিন্তু সে জানে তার প্রেমাস্পদকে সে কোনোদিন পাবে না। রত্নাকর লুব্ধক নক্ষত্র। প্রোজ্জ্বল, প্রদীপ্ত— কিন্তু বহু দূরের। তাপ্তিও তাকে পায়নি। ইরাবতী জানে সে-ও তাকে পাবে না। কিন্তু সে তার দিকেই চলেছে। মনে মনে। অন্ধকার রাত্রে একা ঘরে এসে সে যখন শোয় তখন সে অসম্ভবকেই প্রত্যাশা করে। কিন্তু অসম্ভব কখনও সম্ভব হয় না।

রত্নাকর কোনো দিন আসে না। ইরাবতী কিন্তু লুব্ধকের উদ্দেশ্যে হেঁটেই চলেছে, হেঁটেই চলেছে, ক্রমাগত হেঁটে চলেছে...।

পাশের ঘরে শুয়ে তার বিধবা ভগ্নী কাবেরী কিন্তু ভাবছিল অন্যরকম। তার ধারণা তাপ্তি রত্নাকরকে আগলে আগলে রেখেছে বলে সে রত্নাকরের নাগাল পাচ্ছে না। একবার নাগাল পেলেই—ব্যস। পুরুষ জাতকে সে চেনে। পুরুষদের সম্বন্ধে একটা ছড়াও বানিয়েছে সে—

বাইরে সবাই হোমরা চোমরা
হোঁৎকা পুরুষ জাত
মেয়েদের নয়ন বাণে
সক্কলে হয় কাৎ।

রত্নাকর একবার বলেছিল সে যখন নৌবহর নিয়ে বাণিজ্য বেরুবে তখন আমাদের নিয়ে যাবে। তখন কত বন্দরে ওঠা-নামা হবে, তাপ্তি কি তখন সব সময় আগলে রাখতে পারবে তাকে? পারবে না। সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছে কাবেরী।

রত্নাকরের অসুখটা ভালো হলেই সে বাণিজ্য করতে বেরুবে। তখন...আর ভাবতে পারে না সে।

অন্ধকার ক্রমশ কমে যাচ্ছে। পূর্বদিকে দেখা দিয়েছে ঊষার আভাস। ফিঙ্গে পাখি অনেক আগেই ঘোষণা করেছে রাত পোহালো। দু-একটা কাকের ডাক শোনা যাচ্ছে। মন্দাকিনী তার স্বামীর পাদোদক খেয়ে বেরিয়ে পড়ল। স্নান করবে নদীতে গিয়ে। একাই গিয়ে স্নান করে রোজ। হিরণ্ময়ী নদীতে গলা ডুবিয়ে বসে থাকে অনেকক্ষণ। মনে পড়ে পূর্ব জীবনের কথা। সে যে একদিন রাজকন্যা ছিল তা সে ভুলতে পারেনি এখনও। ভোরের আধো অন্ধকারে হিরণ্ময়ী নদীতে গলা ডুবিয়ে সে দেখে পূর্ব জীবনের অনেক স্মৃতি, অনেক স্বপ্ন। মনে পড়ে তার বাবার কথা, সহচরীদের কথা, তার বাগানটিকে। কত ফুল ছিল সেখানে। হিরণ্ময়ীর তরঙ্গমালা তার কানে কানে যেন বলে তুমি রাজকন্যা, তুমি সন্ন্যাসিনী নও। মন্দাকিনীর মনে হয় হিরণ্ময়ী বলছে। কিন্তু হিরণ্ময়ী বলে না, বলে তার মনেরই একটা অংশ। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা অংশ প্রতিবাদ করে—আমি হয়তো সত্যি সন্ন্যাসিনী হতে পারিনি। কিন্তু আর আমি রাজকন্যা নই। রাজকন্যার মৃত্যু হয়েছে সর্পাঘাতে। অর্ণব আমাকে বাঁচিয়েছে। অর্ণব আমার প্রাণদাতা, আমি অর্ণবের কাছে কৃতজ্ঞ। হিরণ্ময়ীর তরঙ্গমালা প্রত্যুত্তর দেয়—তা জানি। কিন্তু তুমি সন্ন্যাসিনী নও। অর্ণবের সহধর্মিণীও নও। সে তোমাকে মন্ত্র দেয়নি, তুমি তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তপস্যা কর না। অর্ণবের পত্নীও নও, কারণ অর্ণব ঊর্ধ্বরেতা তপস্বী। সে তোমার ঘরে শোয় না, রাত্রেও সে তপস্যায় মগ্ন থাকে একা দ্বীপের উপরে। অর্ণব জানে তুমি তপস্যা করতে পারবে না, তাই সে তোমাকে নিজের খুশি মতো চলতে দিয়েছে। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী—হিমালয়ের তিন কন্যা—অর্ণবের অনুরোধে মহাদেবের আদেশে এসেছে এখানে তোমার সেবা করবার জন্যে তা কি বুঝতে পার না? ওরা কি সাধারণ চাকরানির মত? ওরা যে সুরে কীর্তন গায় সে সুর কি মানবীর কণ্ঠে সম্ভব? ওরা তোমার সঙ্গে যখন মাঠে কাজ করে তখন লক্ষ করেছ কি কত তাড়াতাড়ি কত নিপুণভাবে কাজ করে ওরা? ওরা যদি সাধারণ জন-মজুর হত তাহলে এমন পারত কি? মাঠের প্রসঙ্গ উঠলেই রত্নাকরকে মনে পড়ে। সে যদি অতখানি জমি না দিত কি করত মন্দাকিনী? রত্নাকরের কাছেও মন্দাকিনী কৃতজ্ঞ। রত্নাকরের প্রতি কৃতজ্ঞতা আর অর্ণবের প্রতি কৃতজ্ঞতা—এই দুই কৃতজ্ঞতার কি কোনো তফাত নেই? আছে। কিন্তু

মন্দাকিনী সেটা নিজের কাছেও স্পষ্ট করে বিশদ করতে চায় না। তফাত রঙের। অর্ণবের প্রতি কৃতজ্ঞতার রং ধপধপে সাদা, আর রত্নাকরের প্রতি কৃতজ্ঞতাটা গোলাপি রঙের। কিন্তু সেটা মন্দাকিনী নিজে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়। স্নান করে সে যখন মহেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করে তখন বার বার বলে—আমি কিছু চাই না। আমি কিছু চাই না, আমি তাকে স্পর্শও করতে চাই না, তাকে দেখতেও চাই না, তুমি শুধু তার মঙ্গল কর, তার যেন কোনো বিপদ না হয়। প্রার্থনায় পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে সে ঢেকে দিতে চায় ওই গোলাপি রং-টাকে। সেটা ঢাকা পড়ে, কিন্তু লুপ্ত হয় না।

গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী—অপরূপা কন্যা তিন জন। তারা প্রায়ই রত্নাকরকে কীর্তন শোনাতে যায়। রত্নাকরকে ঘিরে তাদের মন যেন ঝর্নার মত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। তারা ঝর্নার মতই নির্বিকারও। তারা তিনজনই যেন এক প্রকৃতির। কোথাও আটকে পড়ে না, কাউকে আঁকড়ে ধরে না। তারা জলের মতই তরল, কিন্তু তারা ডোবার জল নয়। রত্নাকর তাদের খুব প্রিয়। কিন্তু রত্নাকরের অভাবে তাদের জীবন শূন্য হয় না, ব্যর্থ হয় না, থেমে যায় না। তারা সদা-প্রবাহিনী। তারা যখন রত্নাকরের কাছে যায় তখন তাপ্তির মুখে মেঘ ঘনিয়ে আসে। সে মুখে যদিও ভদ্রতা করে কিন্তু তার মনে মনে অস্বস্তি। তার বাইরে ভদ্রতা আর ভিতরে অস্বস্তির কথা টের পায় তারা। টের পেয়ে কৌতুক বোধ করে। রত্নাকরকে সে একা ভোগ করবে? যা সুন্দর তাকে কি একা ভোগ করতে পারে কেউ? আকাশ কি কারো একার সম্পত্তি হতে পারে? গঙ্গা যখন শিবের জটাজালে ছিল তখন কি উমা আপত্তি করেছিল? যমুনা যে যমুনোত্রীর আশ্চর্য প্রকাশ সে যমুনোত্রী কি যমুনার একার? সে তো হিমালয়ের অংশ। কত মেঘ, কত তুষার, কত আলো, কত বর্ণ অলঙ্কৃত করেছে তাকে। যমুনা জানে যমুনোত্রী তার একার নয়, সকলের। ব্রহ্মার মানসী সরস্বতীও যে ব্রহ্মা তার একার নয়। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার দিকে কোটি কোটি লোকের মুগ্ধ দৃষ্টি বহুবর্ণ আলোর মত অহরহ পড়ছে। তাকে ঘিরেও কত ঋষির, কত গুণীর, কত কবির স্তব গুঞ্জিত হচ্ছে অহরহ। সে-ও কারো একার নয়।

কৌতূহলী মন্দাকিনী বার বার তাদের প্রশ্ন করে—তোমরা কে? তারা তাকে বলে আমরা হিমালয়ের কন্যা। এর বেশি আর কিছু বলেনি। মন্দাকিনীর মনে সত্যটা ধরা পড়েছে কিন্তু। সে বুঝতে পেরেছে তার জন্যই অর্ণব আনিয়েছে এদের। অর্ণবের অনুরোধেই মহেশ্বর এদের পাঠিয়েছেন। কেন মহেশ্বরকে অনুরোধ করেছে অর্ণব? কেন সে তাকে সন্ন্যাসের কৃচ্ছ্রসাধন করতে দেয়নি? কেন সে তাকে অনুকম্পা করছে? এসব প্রশ্নের উত্তর সে পায়নি। অর্ণবকে জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হয়নি। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী কিন্তু মন্দাকিনীর মনের সব খবর জানে। এমন কি সেই গোলাপি রং-এর খবরটাও জানে। জানবেই তো। তারা যে দেবকন্যা। তারা সব জানে। কিন্তু কিছু বলে না।

দিগন্ত রেখায় কিছু মেঘ অনেকক্ষণ থেকেই ছিল। স্বপ্ন দেখছিল তারা। ক্রমশ তাদের স্বপ্ন যেন রূপায়িত হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে কে যেন লাল আবীর বর্ষণ করতে লাগল তাদের উপর। রক্তিম হয়ে গেল মেঘমালা। কালো, সাদা, পাঁশুটে সকলেরই সর্বাঙ্গে ফুটল এক অপরূপ রক্তিম জ্যোতি। মনে হল কে যেন আসছে, তারই নীরব জয়ধ্বনি উঠেছে মেঘে-মেঘে। তারপর অলক্ষ থেকে রাশি রাশি স্বর্ণরেণু যেন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই রক্তিমার উপর। শুধু ঝাঁপিয়ে পড়ল না, সঙ্গে সঙ্গে বিগলিত হয়ে গেল, পরিণত হল রক্তাভ স্বর্ণ-সমুদ্রে। তারপর সেই সমুদ্রে জাগল কত রঙের, কত আকারের দ্বীপ। বর্ণময় একটা মহাকাশ যেন, স্বপ্নের দেশ। তারপর সহসা সমস্তটা ফেটে গেল। সূর্যোদয় হল। জবাকুসুমসঙ্কাশ ধ্বন্তারি সূর্যদেব আলোর প্রপাতে যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন সব।

বিতস্তা নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। রোজই দেখে। রোজই ভিন্ন ছবি দেখে। কিন্তু রোজই দেখে সূর্য উঠছে। মনে পড়ে আর একজনের কথা। এই দেখার মধ্য দিয়েই রোজ সে অর্ঘ্য পাঠায় তাকে। সে তার স্বামী সাগর নয়, তার স্বামীর বন্ধু রত্নাকর। রত্নাকর প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন নয়, রত্নাকর প্রভাতের উদীয়মান তপন, বর্ণবিভূষিত স্বর্ণকমল। সে দিগন্তের ওপারে থাকে। সে বহুদূরের। সাগর কাছের। সাগর বলবান। রত্নাকর রূপবান। সাগরের শক্তিতে সে বিস্মিত হয়, কিন্তু মুগ্ধ হয় রত্নাকরের রূপ দেখে। সাগরের উত্তুঙ্গ শক্তি শিখরের উপর দাঁড়িয়ে সে চেয়ে থাকে রত্নাকরের দিকে। সাগর এ কথা জানে। রাগ করে না, কারণ সে-ও মুগ্ধ। রত্নাকরের অনিবার্য আকর্ষণ সে স্বীকার করে। তাই সে রাগ করে না। সে শক্তির আধার, শক্তির উপাসক, তাই তার ঈর্ষা নেই। যারা ক্ষুদ্র, যারা দুর্বল, যারা নীচ তারাই ঈর্ষা-ক্লিষ্ট হয়। শক্তিমান সাগর শক্তির মহিমায় মহিমান্বিত। শক্তির তুঙ্গলোকে তার আকাঙ্ক্ষা নিবদ্ধ। ঈর্ষা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। বিতস্তা সাগরের বৃহত্ত্বকে আজও আয়ত্ত করতে পারেনি। পর্বতারোহীর মত সে কেবল উঠেই চলেছে। সমস্ত পর্বতটা সে দেখতে পায়নি এখনও।

গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহর। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা চতুর্দিকে। রত্নাকরের বাড়ির পাশে প্রকাণ্ড যে শিরীষ গাছটা আছে তারই উপর উঠে বসে আছে ফল্গু। সেখান থেকে রত্নাকরের শোবার ঘরটা দেখা যায়। সেখান থেকে সে দেখছে রত্নাকর শুয়ে আছে। আর তাপ্তি হাওয়া করছে তাকে। সে বুঝতে পেরেছে তাপ্তি তাকে সহ্য করতে পারে না। তাই সে আজকাল আর যায় না রত্নাকরের কাছে। কিন্তু সে তাকে না দেখে থাকতে পারে না। সে যে তার কাকাবাবু। শুধু কাকাবাবু নয়, সে তার জীবনে একমাত্র পুরুষ। সে অনেক পুরুষ দেখেছে কিন্তু এমন নির্মল, নিষ্কলুষ সুন্দর পুরুষ আর দেখেনি। তার মনে হয় একটা স্বপ্ন যেন বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। তাপ্তি তার যাওয়াটা পছন্দ করে না, কিন্তু দেখাটা বন্ধ করতে পারেনি। শিরীষ গাছের ডালপালার আড়ালে বসে ফল্গু গুনগুন করে গান গাইছে, আর দেখছে, কেবল দেখছে। তার সমস্ত সত্তা যেন তার দৃষ্টির মধ্য দিয়ে গিয়ে স্পর্শ করছে রত্নাকরকে। আর সেই স্পর্শের আনন্দ ভাষা পাচ্ছে তার গানে।

"ফলি তুই কোথা—"

ভিনটির আকুল কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

চুপটি করে বসে আছে ফল্গু। বসে আছে স্বপ্নলোকে, যেখানে ভিন্টিরা পৌঁছতে পারে না।

তাপ্তি ঘরের মধ্যে খিল দিয়ে বসে আছে। সে ঠিক করেছে আর কোনো মেয়েকে রত্নাকরের কাছে যেতে দেবে না। রত্নাকর শুয়ে আছে পাশের ঘরে। তাপ্তির ঘর না পেরিয়ে রত্নাকরের ঘরে যাওয়া যায় না।

গ্রীষ্মের অপরাহ্ন। রত্নাকর ঘুমুচ্ছে। অপরাহ্নের পড়ন্ত রোদের রক্তিমাভা ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে। ঘুমন্ত রত্নাকরের মুখে একটা প্রসন্ন মৃদু হাসি। মনে হচ্ছে না তার কোনো অসুখ করেছে।

পাশের ঘরে তাপ্তি পাহারা দিচ্ছে খিল দিয়ে। কাউকে ঢুকতে দেবে না সে। বেশি ভয় পদ্মাকে। কপাট খোলা পেলেই কোনো না কোনো ছুতোয় ঢুকবে এসে।

বিকেলের লাল আলোয় তারও ঘরটা ভরে উঠেছে। মনে হচ্ছে এটা আলো নয়, যেন আরো কিছু। এমন আলো তো আর কোনো দিন দেখেনি সে। মনে হল কার অন্তরের কামনা যেন রূপ ধরেছে।

হঠাৎ ভোগবতী এসে দাঁড়াল। উলঙ্গিনী। চমকে উঠল তাপ্তি।

"ঘরে খিল লাগিয়েও আমাকে আটকাতে পারনি। আমি এসে গেছি—।"

তারপর খিলখিল করে হেসে উঠল সে। তার স্তন যুগল, তার মাংসল নিতম্ব, তার সমস্ত যৌবন যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

"কি করে এলে তুমি"—সভয়ে চিৎকার করে উঠল তাপ্তি।

"কি করে তা তোমার মাথায় ঢুকবে না। আমি এসেছি তোমার রত্নাকরকে গ্রাস করব বলে সন্দেশের মত টপ করে মুখে ফেলে দেব বলে।"

"দোহাই তোমার, ও-ঘরে যেও না। ও-ঘরে যেওনা—ও ঘুমুচ্ছে—" দুটো ঘরের মাঝখানে যে কপাট ছিল তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল তাপ্তি দু-হাত বিস্তার করে। ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল সে। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

তার দিকে চেয়ে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ভোগবতী। তারপর সেও হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে বলল— "তাপ্তি তোর দুঃখ আমি বুঝেছি। তুই কিন্তু আমার দুঃখ বুঝলি না। আমি তোকে বলতে এসেছিলাম ঘরে খিল এঁটে তুই রত্নাকরকে রক্ষে করতে পারবি না। রত্নাকর নিজেই নিজেকে রক্ষা করবে। আমি তোকে ভয় দেখাতে এসেছিলাম। আমার খুব লোভ আছে ওর প্রতি। কিন্তু ওকে আমি ভালোবাসি না। আমি ভালোবাসি অন্ধকারকে। রত্নাকর আলো। ওকে পাবার যোগ্যতা আমার নেই। আমি পাতালে যাব।"

সহসা অন্তর্ধান করল সে।

।। এগারো ।।

রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। তিন্তিড়ীর বিখ্যাত গাঁজার দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় প্রহরের শেষে শেয়ালরা যখন ডেকে ওঠে তখন তিন্তিড়ী এক ছিলিম গাঁজা খেয়ে দোকান বন্ধ করে দেয়। গাঁজা খেয়ে ধ্যানে বসে সে। মহাভক্ত লোক তিন্তিড়ী কুম্ভকার। তার পূর্বপুরুষরা সকলেই কুম্ভকার ছিলেন। তিন্তিড়ী কিন্তু একজন শৈব সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র নিয়ে শিব-ভক্ত হয়েছে। গুরুর পরামর্শেই তিন্তিড়ী কৌলিক বৃত্তি পরিত্যাগ করে গাঁজার আর সিদ্ধির দোকান করেছে। গুরুর কৃপায় ব্যবসা ভালোই চলছে। রত্নাকর তার ব্যবসাতে খুব সাহায্য করে। যেখানে ভালো গাঁজা, ভালো সিদ্ধি পায় কিনে নিয়ে আসে তার জন্যে। একবার কোন এক দ্বীপ থেকে শিবের জটার মত যে গাঁজা এনেছিল তার অপূর্ব। সেই গাঁজা এনে এখানেও চাষ করছে সে।

সেদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর যখন সে ধ্যানে মগ্ন, তখন তার দুয়ারে টোকা পড়তে লাগল। সবাই জানে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর তার দোকান খোলা থাকে না,—তবু টোকা দিচ্ছে কে? বিরক্ত হল মনে মনে, তবু উঠে কপাট খুলে দিলে সে। দিয়ে চমকে উঠল। যিনি দুয়ারের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি তো সাধারণ মানুষ নন। তাঁর গা দিয়ে আলোর আভা বেরোচ্ছে—মাথার পিছনে একটা জ্যোতির্মণ্ডল। এক হাতে প্রকাণ্ড কমণ্ডলু। অন্য হাতে ত্রিশূল। তাকে তিন্তিড়ী স্বয়ং মহেশ্বর বলেই মনে করত, কিন্তু তার কুচকুচে কালো রং আর চাপ চাপ দাড়ি গোঁফ দেখে ভড়কে গেল সে। মহেশ্বরের চেহারা তো এরকম হতে পারে না। তবু তিন্তিড়ী ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল তাঁকে।

লোকটি তখন বলল— "আমার গাঁজার কলকেটি পড়ে গেছে। এক ছিলিম গাঁজা খাওয়াতে

পারবে আমাকে? আপনার সমস্ত পরিচয় আমি জানি, আপনি শুধু গঞ্জিকা বণিক নন, আপনি মস্ত একজন শিবভক্ত, সে কথা আমি জানি। রোজই আপনাকে আমি দেখি। এতদিন আত্মপ্রকাশ করবার প্রয়োজন হয়নি। আজ হয়েছে। এক ছিলিম গাঁজা খাওয়ান আমাকে—।"

তিন্তিড়ী অবাক হয়ে গেল একটু। ইনি রোজ দেখেন আমাকে? আশ্চর্য। সে কিছু না বলে গাঁজা সাজতে বসল।

"আপনি ভিতরে এসে বসুন।"

লোকটি ভিতরে এসে একটি আসনে উপবেশন করলেন।

গাঁজার ছিলিমটি তার হাতে দিয়ে তিন্তিড়ী বলল— "আপনার পরিচয় কি?"

"পরিচয়? পরিচয় জেনে কি করবে? ভয় পাবে।"

"আমার কোনো ভয় নেই!"

"ভয় নেই? কেন?"

"আমি কোনও পাপ করিনি।"

লোকটি গাঁজায় একটা টান দিয়ে ভম্ হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

ধোঁয়া ছেড়ে প্রসন্ন মুখে চেয়ে রইল লোকটি তিন্তিড়ীর দিকে।

"না, তোমার গাঁজায় কোনো ভেজাল নেই। তুমি পাপী নও।"

"আপনার পরিচয়টা দিন।"

"আমি ভৃঙ্গী।"

ভৃঙ্গী? মহেশ্বরের প্রধান অনুচর? সাষ্টাঙ্গে আবার প্রণাম করল তিন্তিড়ী।

"আমি ধন্য। আমার কুটির আজ ধন্য। আপনি এখানে কেন এসেছেন?"

"আমি রোজ আসি।"

"কেন?"

"আপনারা যখন মহেশ্বরের মন্দিরে প্রার্থনা করতে যান, আমি তখন সে মন্দিরে অদৃশ্যভাবে থাকি। আপনারা কে কি প্রার্থনা করেন তা শুনি। তারপর লিপিবদ্ধ করে রাখি এই কমণ্ডলুর মধ্যে। তারপর মহাদেবকে সেগুলি শোনাই—।"

"মহাদেব নিজে শোনেন না?"

"তিনি সর্বদাই সমাধিস্থ হয়ে থাকেন। তখন তিনি কিছু শোনেন না। সমাধি ভঙ্গ হলে কৈলাসে চলে যান তিনি। তখন আমি তাঁকে আপনাদের প্রার্থনা শোনাই—"

"তাই না কি।"

"হ্যাঁ, আমার কাজই তো আপনাদের প্রার্থনা তাঁর কানে পৌঁছে দেওয়া।"

"আশ্চর্য! এ তো কল্পনা করিনি কখনও।"

ভৃঙ্গী হাসি মুখে চুপ করে রইলেন।

"আমাদের প্রার্থনার কোনো বৈশিষ্ট্য দেখেছেন কি?"

"প্রচুর। অধিকাংশ লোকের প্রার্থনা দুদিন এক রকম হয় না। আজ বলছে আমার অসুখ সারিয়ে দাও, কাল বলছে আমার জমিতে যেন বেশি ধান হয়, তার পরদিন বলছে, রাজদ্বারে একটা মকোর্দমায়

পড়েছি আমাকে জিতিয়ে দাও। তবে এ অঞ্চলের সাতজন লোক একই প্রার্থনা রোজ করে না।"

"কে তাঁরা?"

"তা এখন বলব না। আচ্ছা উঠি এখন।"

ভৃঙ্গী অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তিন্তিড়ী সবিস্ময়ে দেখল তার মাটির কলকেটা সোনার হয়ে গেছে।

।। বারো ।।

পরিচয় পাহাড়ী মহারাজ পৃথ্বীপতির উত্তর নিয়ে ফিরে এসেছে। পৃথ্বীপতি সুগন্ধী ভূর্জপত্রে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছেন।

বিবিধগুণ-মণ্ডিত বন্ধু শ্রীযুক্ত রত্নাকর বণিক মহাশয়,

আপনি আগামী পূর্ণিমায় আমার এখানে আসুন। আপনাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিব। আশীর্বাদ গ্রহণ করুন।

শুভাকাঙ্ক্ষী
পৃথ্বীপতি

চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হল রত্নাকর। পরিচয় পাহাড়ীকে বজরা সাজাতে বলল।

"তোমার মা-ও আমার সঙ্গে যাবেন। ময়ূরপংখীতে তাঁর থাকবার জন্যেও যেন সব ব্যবস্থা থাকে।"

তাপ্তিকে বলল—"তোমায় কিন্তু ময়ূরপংখীতে থাকতে হবে। রাজা আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন, তোমাকে করেননি।"

"তুমি রাজার কাছে কতক্ষণ থাকবে? আমি বেশিক্ষণ তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না কিন্তু।"

"কতক্ষণ থাকতে হবে তা তো জানি না। রাজবৈদ্য আমাকে দেখবেন। কতক্ষণ লাগবে কি করে বলব। তবে ইচ্ছে করে দেরি করব না। কাজ শেষ হলেই চলে আসব।"

পূর্ণিমার দিন সকালে রত্নাকরের সুসজ্জিত ময়ূরপংখী ভিড়ল রাজভবনের ঘাটে। দেখা গেল—ঘাট থেকে রাজভবন পর্যন্ত বিরাট একটা মখমলের গালিচা পাতা রয়েছে। গালিচার দুপাশে মঙ্গলঘট মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুসজ্জিত যুবতীরা। স্বয়ং মন্ত্রীমশাই এসেছেন রত্নাকরকে অভ্যর্থনা করবার জন্য। রত্নাকর অবতরণ করবামাত্র তূর্যধ্বনি হল রাজপ্রসাদ থেকে, অনেক শাঁখ বেজে উঠল।

মন্ত্রীমশাই বজরায় উঠে অভিবাদন করে বললেন— "আপনার জন্য পালকি এনেছি—।"

ঘাটের কাছে একটি অলঙ্কৃত পালকি অপেক্ষা করছিল।

রত্নাকর তাপ্তির ঘরে ঢুকে বললেন— "আমি ঘুরে আসছি তাহলে—।"

মন্ত্রীমশাই প্রশ্ন করলেন— "আর কেউ আছেন না কি আপনার সঙ্গে?"

"হ্যাঁ, আমার স্ত্রী এসেছেন।"

"ও তাই না কি। আসুন আপনি।"

রত্নাকর পালকি চড়ে চলে গেলেন। একটু পরেই আর একটি সুসজ্জিত পালকি এল তাতে এলেন স্বয়ং রাজরানি। তিনি সমাদরে নিয়ে গেলেন তাপ্তিকে। তাপ্তি চলে গেল একেবারে রাজঅন্তঃপুরে। সেখানে তাকে ঘিরে যে আদর-আপ্যায়নের আতিশয্য শুরু হল তাতে অভিভূত হয়ে পড়ল সে। তবু তার মনে শঙ্কা জাগছিল রত্নাকর কোথা গেল কোন ঘরে সে আছে। তার খাওয়ার

কি ব্যবস্থা করেছে এরা। গুরুপাক খাবার তার পেটে তো সইবে না। জিগ্যেসই করে ফেলল শেষে—"উনি কোন ঘরে আছেন?"

"উনি আছেন রাজার কাছে। কেন?"

"ওঁর খাওয়াটা যেন গুরুপাক না হয়। পেটে ব্যথা কি না—।"

"সব ব্যবস্থা হবে, চিন্তা করবেন না।"

তবু চিন্তিত হয়ে বসে রইল তাপ্তি।

রাজার নিভৃত কক্ষে রত্নাকর বসেছিলেন রাজার সঙ্গে। সেখানে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না কেউ।

মহারাজ প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, "তোমার বিশেষ প্রয়োজনটা কি? কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ?"

"এসেছি অম্বুধি জ্যোতিষীর পরামর্শে। সে আমাকে রাজদর্শন করতে বলেছে, আর রাজবৈদ্যের ওষুধ খেতে বলেছে।"

"তোমার কোনো অসুখ করেছে না কি—" রত্নাকর কোনো উত্তর না দিয়ে হাসি মুখে চেয়ে রইল মহারাজের দিকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন— "এটা প্রচারিত হয়েছে যে আমি পেটের ব্যথায় ভুগছি। কোনো ওষুধ খেয়ে সারছে না—।"

"প্রচারিত হয়েছে মানে?"

"আমিই প্রচার করেছি।"

"কথাটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে। তোমার পেটের ব্যথা হয়েছিল নিশ্চয়—।"

"হয়নি।"

"হয়নি, অথচ প্রচার করেছ হয়েছে—এ কি রকম?"

"মহারাজ আমার আসল রোগ দুটি। প্রথমত আমি স্ত্রৈণ, দ্বিতীয়ত আমার চক্ষুলজ্জা খুব প্রবল। আমি কারও অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারি না—"

"এ তো রোগ নয়। দুটিই মহৎ গুণ—"

"এই দুটি গুণই আমাকে মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য করেছে—"

"কি রকম?"

"গোড়া থেকেই শুনুন তাহলে। আমার বন্ধুর মেয়ে ফল্গু তার বাগান থেকে এক কাঁদি চমৎকার কলা পাঠিয়েছিল। বলেছিল, এ কলা পাকলেই গন্ধে চারদিক ভরে যাবে। আর তখনই এটা খাবেন। তাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম খাব। ফল্গু যুবতী, এবং সুন্দরী। আমাকে সে কাকা বলে ডাকে। কিন্তু আমার স্ত্রী তাপ্তির সন্দেহ অন্যরকম। ফল্গু কদাচিৎ আমার বাড়িতে আসে, কিন্তু এলেই তাপ্তির মুখ অন্ধকার হয়ে যায়। ফল্গুর কলা পাকল রাত দুপুরে—চারদিক গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। তাপ্তিকে ওঠালাম। বললাম—কলা নিয়ে এসো, এখনি খাব; ফল্গুকে কথা দিয়েছি। তাপ্তির মুখের ভাব যা হল তা অবর্ণনীয়। কিন্তু সে উঠে কলা এনে দিলে আমাকে। তিন-ছড়া কলা। বললাম এসো দুজনে মিলে খাই। সে বলল—আমি খাব না। রেগে পাশের ঘরে চলে গেল। আমি খেয়ে ফেললাম, চমৎকার কলা। একটি একটি করে আমি তিন ছড়া কলাই শেষ করে ফেললাম। তাপ্তি আসছে না দেখে পাশের ঘরে গেলাম। গিয়ে দেখি বিছানায় সে উপুড় হয়ে কাঁদছে। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম।

তারপর একটা পাখা নিয়ে তার মাথার শিয়রে বসে হাওয়া করতে লাগলাম। রেগে আমার হাত থেকে পাখা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে সে। বুঝলাম খোশামোদ করে তার রাগ ভাঙানো যাবে না। হঠাৎ মনে পড়ল কিছুদিন আগে আমার নাবিক পরিচয় পাহাড়ী খবর এনেছিল যে কোনো এক বন্য মহাদেশে না কি প্রচুর গজদন্ত সস্তায় পাওয়া যায়। ঠিক করে ফেললাম নৌ-বহর নিয়ে সেই মহাদেশের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ব। তার সঙ্গে থাকবে আমার ময়ূরপংখী আর তাতে থাকবে আমার স্ত্রী। কথাটা প্রকাশ করে বলতেই সে হাসি-মুখে উঠে বসল। বলল—সঙ্গে কিন্তু আর কাউকে নিতে পারবে না। থাকব কেবল আমি আর তুমি। বললাম—নিশ্চয। কিন্তু তখনই মনে পড়ল আর কেউ যদি যেতে চায় তাকে আমি 'না' বলতে পারব কি? পারব না। অম্বুধির স্ত্রী ইরাবতী, জলধির স্ত্রী নর্মদা, অব্ধির স্ত্রী ভোগবতী, পারাবারের স্ত্রী ব্রাহ্মণী, অর্ণবের স্ত্রী মন্দাকিনী, সাগরের স্ত্রী বিতস্তা, ত্রিবেণী সঙ্গমের গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী বন্ধুকন্যা ফল্গু—এরা যদি এসে বলে আমরাও তোমার সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করব— তাহলে তাদের আমি তো 'না' বলতে পারব না। তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই মধুর। শুধু মধুরই নয়, অতি পবিত্র। তাদের আমি ভালোবাসি, ভক্তি করি, স্নেহ করি। তাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করা যাবে না। ইতিপূর্বে তাদের অনেককে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছি যে এবার যখন বড় কোনো সমুদ্রযাত্রায় বের হব তাদেরও নিয়ে যাব। তাপ্তি কিন্তু তাহলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করবে। তাই সমুদ্রযাত্রা স্থগিত রাখার জন্য পেট-ব্যথার ভান করলুম। এখনও সেই ভান চলছে। তাপ্তি, বৈদ্য, অবধূত, গণৎকার নিয়ে মেতে আছে। আপনি বিজ্ঞ বুদ্ধিমান লোক, এখন কি করে দুকূল রক্ষা হয় তার একটা উপদেশ দিন আমাকে। মহারাজ হেসে বললেন— "জটটি বেশ পাকিয়েছ দেখছি—" তারপর ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

"শ্রীমতী তাপ্তি দেবী তোমার সঙ্গে যাবেনই এবং একা যাবেন—এই তো—?"

"হ্যাঁ, আমি কিন্তু কারো অপ্রিয় ভাজন হতে চাই না—।"

মহারাজ চিন্তিত মুখে দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন। তারপর হাসলেন একটু। উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলেন রত্নাকর তাঁর দিকে।

মহারাজ আর একটু হেসে বললেন—"হয়েছে। এইবার রাজবৈদ্যকে খবর দেওয়া যাক। তোমাকে চুপি চুপি একটা কথা বলছি, উনি যদি কোনো ওষুধ দেন, খেও না। ওঁর স্মৃতিশক্তি বেশ প্রবল, চিকিৎসা কি করে করতে হয় উনি জানেন না। আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র মুখস্থ করে আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী হয়েছেন, আর আমার মন্ত্রীকে ঘুষ দিয়ে রাজবৈদ্য পদটি বাগিয়েছেন। আমি ওঁর ওষুধ খাই না। তুমিও খেও না। তবু ওঁকে ডেকে দেখা যাক উনি কি বলেন—।"

"বেশ।"

মহারাজা দৌবারিককে আদেশ দিলেন বৈদ্য মহাশয়কে ডেকে আনতে। একটু পরেই রাজবৈদ্য এসে অভিবাদন করলেন মহারাজকে। তাঁর গায়ে নামাবলী, পরিধানে পট্টবস্ত্র, মাথার টিকিতে ফুল; কপালে তিলক।

"কবিরাজ মশাই, আমার বন্ধু রত্নাকরের হাতটা দেখুন তো কি হয়েছে।"

কবিরাজ চোখ-বুজে নাড়ী ধরে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেন—"অসুখের তো কোনো লক্ষণ দেখছি না। তবে নাড়ী দুর্বল। আপনি কি খান?"

"মৌরলার ঝোল আর ভাত। তার সঙ্গে একটু দুধ—।"

"কেন?"

"আমার পেটে ব্যথা হয়—।"

মহারাজ বললেন— "একটু করে মৃতসঞ্জীবনী সুধা খেলে কেমন হয়—।"

"তা-ও খেতে পারেন।"

"তাই খানিকটা পাঠিয়ে দিন তাহলে।"

"যে আজ্ঞে।"

রাজবৈদ্য বিদায় নিলেন।

একটু পরেই একজন ভৃত্য একটি স্ফটিক-ভৃঙ্গারে মৃত সঞ্জীবনী সুধা একটি সোনার ছোট গেলাস আর একটি রৌপ্য ভৃঙ্গারে জল নিয়ে এল।

পৃথ্বীপতি বললেন— "আর একটা পানপাত্র নিয়ে আয়। আমিও খাব—।"

ভৃত্য চলে গেল।

পৃথ্বীপতি রত্নাকরের দিকে চেয়ে আর একবার হাসলেন।

।। তেরো ।।

সেদিন শনিবার। অমাবস্যা রাত্রি। শ্মশান-কালীর পূজা করছিল সেদিন ভোগবতী। একাই সব করছিল। এমন কি পাঁঠা বলিদান পর্যন্ত। একটি কালো পাঁঠা স্বহস্তে বলি দিয়ে সে তার চামড়া ছাড়াচ্ছিল একটা আশ্স্যাওড়া গাছের ডালে টাঙিয়ে। সামনেই কিছু দূরে স্তূপীকৃত কাঠে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল। ভোগবতী পাঁঠাটা ছাড়িয়ে গোটাই ঝলসাবে সেটাকে। অদ্ধি দু-ক্রোশ দূরে চন্দন-মোহিনী শ্মশানে শবাসনে বসে তপস্যা করছে। সেখানকার ধূর্জটি মন্দির থেকে নাকি মহেশ্বর অন্তর্ধান করেছেন। অদ্ধি গেছে কারণ নির্ণয় করতে। কখন ফিরবে ঠিক নেই। এসেই খেতে চাইবে। তার জন্যে এক কলসি তাল-রস এনে রেখেছে এবং এখন ঝলসানো মাংস প্রস্তুত করে রাখছে। একাই সব করছে। কারণ শ্মশান-কালীর মন্দিরে বসে সে একাগ্রচিত্তে মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করছিল— "হে দেবাদিবের মহাকাল, আমাকে মহা-অন্ধকারে যাবার শক্তি দাও। আলো আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আমাকে অপমান করেছে। আমি তার প্রতিশোধ নিতে চাই। তুমি আমাকে শক্তি দাও।"

ভোগবতীর আশা ছিল, দেবতা আত্মপ্রকাশ করে তাকে বর দেবেন। তাই সে কাউকে সঙ্গে করে আনেনি। একাই সব করছিল। পাঁঠার নাড়ী-ভুঁড়িগুলো বার করে সে ছুঁড়ে দিল অন্ধকারের ভিতর। একদল শৃগাল এসে সেগুলো কাড়াকাড়ি করে খেতে লাগল অন্ধকারের ভিতর। একটা অদ্ভুত উপমা জাগল ভোগবতীর মনে। মনে হল—রত্নাকর যেন ওই নাড়িভুঁড়িগুলো—আর তারা যেন সব ওই হ্যাংলা শেয়ালের দল। তাকে নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি করছে। তাপ্তি তো কামড়ে ধরে আছে, কিছুতে ছাড়বে না।

'দূর হ-দূর হ- দূর হ সব—"

একটা জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে দিলে সে অন্ধকারের দিকে। পালিয়ে গেল শেয়ালগুলো। একটু দূরে অন্ধকারের ভিতর আবার শোনা যেতে লাগল তাদের কোলাহল। তারপর ভোগবতী পাঁঠার রাং

চারটে আলাদা করে ফেললে—শেষে মুণ্ডটাকেও ভালো করে পরিষ্কার করে দিয়ে এল মা-কালীর মূর্তির সামনে। তারপর সে মা কালীর সামনে মাথা কুটতে কুটতে নিজস্ব মন্ত্রটি বার বার বলতে লাগল—

ওগো উলঙ্গিনী শিব-শক্তি
শিবকে তুমি হুকুম দাও
নইলে আমার মাথা খাও
মাথা খাও—মাথা খাও।

হঠাৎ আবার শেয়ালদের খ্যাঁক্-খ্যাঁক্ শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল শিয়ালগুলো আবার ফিরে এসেছে। একটা রাং ধরে টানাটানি করছে একটা শিয়াল। সঙ্গে সঙ্গে তাড়া করে গেল ভোগবতী। তারপর রাং চারটে আর বুক পিঠের মাংস নিবন্ত আংরার উপর লোহার একটা প্রকাণ্ড ঝাঁঝরি বসিয়ে তার উপর রাখলে সে। পাশেই একটা বাটিতে ঘি ছিল। পলা দিয়ে তুলে সেই ঘি একটু একটু ছিটিয়ে দিতে লাগল সে মাংসের উপর। মাঝে মাঝে উলটেও দিতে লাগল মাংসের টুকরোগুলো। এই রকম ভাজা-মাংস অব্ধির খুব প্রিয় খাদ্য। এটি তৈরি করতে অনেকক্ষণ সময় লাগে। ফোঁটা-ফোঁটা ঘি দিয়ে অনেকবার ওলটাতে পালটাতে হয়। পুড়ে গেলে অব্ধি খাবে না, ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কাঁচা থাকলেও মুশকিল। মার-পিট করবে। যদিও অব্ধির হাতে মার খেতে তার খুব ভালোই লাগে। তবু আজ তাকে রাগিয়ে দিতে ইচ্ছে করল না ভোগবতীর। কাল থেকে নিরম্বু উপবাস করে শব সাধনা করছে বেচারি। আজ তার খাবারটা ভালো করে করতে হবে। নিবিষ্টচিত্তে মাংসটা ভাজছিল সে। হঠাৎ চারদিকে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ভোগবতী চোখ তুলে দেখল—দিব্যকান্তি দুটি পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। দুজনেরই মাথায় মণি-মাণিক্য খচিত মুকুট।

একজন বললেন— "আমি ইন্দ্র।"

আর একজন বললেন— "আমিই বরুণ।"

ভোগবতী বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর উঠে গিয়ে প্রণাম করল তাদের।

"এখানে এই শ্মশানে কি দিয়ে আপনাদের সম্বর্ধনা করি—।"

ইন্দ্র বললেন— "এক টুকরো করে মাংস দাও। বেড়ে গন্ধ ছেড়েছে। কি হে বরুণ, তোমার আপত্তি নেই তো?"

"না বিন্দুমাত্র না। সমুদ্রের তলায় থাকি সেখানে মাছ ছাড়া আর তো কিছু পাওয়া যায় না।"

ভোগবতী বলল—"এটা আমার স্বামীর জন্য রেঁধেছি, তাঁকে আগে না দিয়ে তো আর কাউকে দিতে পারব না। মহাদেবকে দুটো বেল দিয়েছি আজ। সে দুটো আপনারা নিয়ে যান।"

ভোগবতী ছুটে গিয়ে মন্দির থেকে বড় বড় দুটো বেল নিয়ে এল।

"এই বেলে চিনি নেই, আঠা নেই—।"

ইন্দ্র বললেন— "খুশি হলাম।"

বরুণ বললেন— "আমিও।"

তারপর দুজনেই সমস্বরে বললেন—"কিন্তু সব চেয়ে খুশি হলাম তোমার স্বামীভক্তি দেখে।"

ভোগবতী ঠোঁট উলটে বলল— "স্বামীকে আমি ভক্তি করি না। ভোগ করি।"

ইন্দ্র বললেন— "আরও খুশি হলাম তোমার সরলতার জন্য।"

ভোগবতী প্রশ্ন করল— "আসল কথাই তো জিগ্যেস করিনি এখনও। আপনারা আমার কাছে এসেছেন কেন?"

"দেবাদিদেব আমাদের পাঠিয়েছেন তোমাকে বর দিতে—।"

ভোগবতী বলল— "মা তাহলে আমার প্রার্থনা শুনেছেন। পবনদেব আমাকে বায়ুর উপর আধিপত্য দিয়েছেন—আমি হাওয়া থামিয়ে দিতে পারি, আমি ঝড় তুলতে পারি। আপনি মেঘবাহন ইন্দ্র, আপনি আমাকে মেঘের উপর আধিপত্য দিন। আমি যখন যেখানে চাইব মেঘেরা যেন সেখানে আসে বজ্র-বিদ্যুৎ নিয়ে। আর আপনি বরুণদেব— আপনি সমুদ্রের অধীশ্বর। আপনি আমাকে সমুদ্রের উপর আধিপত্য দিন। যেন আমি যখন খুশি সমুদ্রে তুফান তুলতে পারি। যখন খুশি সমুদ্রকে শান্ত করতে পারি—"

উভয়েই বললেন— তথাস্তু।

ইন্দ্র তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন—"জানতে ইচ্ছে করছে আপনি এসব ক্ষমতা চাইছেন কেন?"

"সংক্ষেপে বললে বলতে হয় শত্রুদমন করবার জন্য।"

"ও।"

বরুণ বললেন—"আপনার একটি কথা শুনে আমার কৌতূহল হচ্ছে। মনে হচ্ছে আপনি রাগী মানুষ তাই জিগ্যেস করতে সাহস হচ্ছে না।"

ভোগবতী হেসে বলল— "ঠিক বলেছেন। সত্যি আমি খুব রাগী। তা আপনি কি জানতে চান বলুন। রাগ করব না।"

"আপনি এখনি বললেন স্বামীকে আপনি ভক্তি করেন না, ভোগ করেন। আপনার ভক্তিভাজন কেউ নেই?"

"আছে বই কি। উলঙ্গিনী কালী আর উলঙ্গ শঙ্কর।"

"এদের ভক্তি করেন কেন?"

"কারণ এরা নগ্ন। এদের কোনো কৃত্রিম আবরণ নেই। কোনো ভণ্ডামি নেই। তাই এদের আমি ভক্তি করি।"

"এদের কাছে আপনার প্রার্থনা কি?"

"আমাকে অন্ধকারে নিয়ে চল।"

ইন্দ্র এবং বরুণ দুজনেই নমস্কার করলেন ভোগবতীকে। তারপর অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

চতুর্দিক আবার গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

একটু পরেই অন্ধকার অট্টহাস্যে কাঁপতে লাগল। অন্ধি আসছে। অন্ধি এসেই ভোগবতীকে স্কন্ধে তুলে নৃত্য করতে লাগল।

"ছাড় আমার উরুতে লাগছে—"

"লাগুক।"

"মাংসটা পুড়ে যাবে। ওটা নাবিয়েনি—।"

কাঁধের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ল ভোগবতী। মাংসটা নাবিয়ে নিল আগুনের উপর থেকে।

"ধূর্জটি মন্দিরের মহাদেবের খবর পেলে?"

"তিনি গেছেন অনন্তনাগের সঙ্গে দেখা করতে।"

"কেন?"

"তা বোঝা গেল না। দাও খাই কিছু।"

একটা রাং তুলে নিয়ে সে কামড়ে কামড়ে খেতে লাগল। কষ বেয়ে রক্ত পড়তে লাগল তার। মাংসটা কম ভাজা হয়েছিল। ভোগবতী বললে— "কারণ কিন্তু পাইনি। তালরস এনে রেখেছি—।"

অদ্ধি কলসিটা তুলে চোঁ চোঁ খেয়ে ফেললে খানিকটা।

কাণ্ড দেখে খিলখিল করে হাসতে লাগল ভোগবতী।

।। চোদ্দ ।।

দেখতে দেখতে সুসংবাদটি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। রত্নাকর সুস্থ হয়েছে। এইবার সে সমুদ্র-যাত্রায় বের হবে। সাজ সাজ পড়ে গেছে চারিদিকে। বিরাট ময়ূরপংখী সাজানো হচ্ছে, তাছাড়া সঙ্গে যাচ্ছে পাঁচশো নৌকার নৌবহর। পরিচয় পাহাড়ী প্রায় হাজার খানেক দক্ষ নাবিক সংগ্রহ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। মহারাজা পৃথ্বীপতি দুই শত বড় বড় বজরা দিয়েছেন, তাতে সশস্ত্র সৈন্য থাকবে। পরিচয় পাহাড়ীও অনেক সৈন্য সঙ্গে নিচ্ছে। সমুদ্রযাত্রায় জল-দস্যুর খুব ভয়।

বাড়িতে ক্রমাগত লোক আসছে। কেউ সঙ্গে যেতে চায়, কেউ কোনো জিনিস বিদেশ থেকে আনবার জন্য অনুরোধ করে। দশ বারোজন মুহুরী খাতা নিয়ে বসে আছে তাদের ফরমাস টোকবার জন্য।

রত্নাকর কাউকে 'না' বলতে পারে না। যারাই তার সঙ্গে যেতে চায় রত্নাকর আপত্তি করে না। বহু পুরুষ তো যাচ্ছেই অনেক মেয়েও যেতে চায়। রত্নাকর বলে, বেশ তো, বেশ তো যাবে।

একদিন ফল্গু এসে হাজির হল। পরনে আগুন-রঙের কাপড়। খোঁপায় অশোক ফুলের গুচ্ছ। হাতে চুড়ি নেই, চুড়ির বদলে লাল কুন্দ-ফুলের মালা জড়ানো, গলায় রক্ত করবীর মালা। এসে সটান বাড়ির ভিতর চলে গেল সে। রত্নাকর বিছানায় বসেছিল, তার পাশে গিয়ে বসল।

"কাকু, তুমি শুনলাম সমুদ্রযাত্রায় বের হচ্ছে?"

"হ্যাঁ, তুমি যাচ্ছ নাকি?"

"না, আমি যাব না। তুমি যখন থাকবে না, তখন একা একা আমি তোমার বাগানে ঘুরে বেড়াব, তোমার শোবার ঘরে ঢুকব। তোমার বসবার ঘরে বসব। তোমাকে আমি ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে ফেলি। তুমি যখন কাছে থাকবে না, তখনই তোমাকে সব চেয়ে কাছে পাই আমি। আমি যাব না তোমার সঙ্গে। তুমি যখন থাকবে না, তোমার চাকররা যেন তোমার বাগানে ঘরে ঢুকতে দেয় আমাকে। আর আমাকে যখন তুমি মনে করবে—এই পোশাকে মনে কোরো। যে আগুন আমার মনে জ্বলছে, যা আমি জীবনে কখনও প্রকাশ করতে পারব না তারই কিছুটা আভাস আমার এই পোশাকে আছে। কাকীমা কোথায়?"

"সে পুজোর ঘরে আছে।"

"বাইরে আমার চাকর একঝুড়ি আঙুর এনেছে, খেও। নতুন ধরনের আঙুর। গোলাপি রঙের। আমি আর বেশিক্ষণ বসব না। চললুম—।"

প্রণাম করে বেরিয়ে গেল ফল্গু।

একটু পরে তাপ্তি এসে ঘরে ঢুকল।

"ফল্গু এসেছিল বুঝি।"

"হ্যাঁ।"

"নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে যেতে চাইছে।"

"না। সে যাবে না। বললে, আমরা যখন থাকব না সে একলা আমাদের বাড়িতে বাগানে ঘুরে বেড়াবে।"

"মেয়েটা পাগল। আজ আবার কি ফল এনেছে। খেও না যেন—।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি চাকর একটি লাল রেশমের থলিতে আঙুর নিয়ে এল।

"কি আছে ওতে?"

চাকর একটি রুপোর থালায় আঙুরগুলি ঢালতেই চমকে উঠল দুজনেই। আঙুরের ভিতর থেকে গোলাপি মেঘের আভা ফুটে বেরুচ্ছে যেন।

"কি ফল এগুলো" ভ্রূকুঞ্চিত হল তাপ্তির। রত্নাকর বললে— "আঙুর। এ খেলে কিছু হবে না।" বলেই সে কয়েকটা আঙুর মুখে ফেলে দিলে।

"অপূর্ব। খেয়ে দেখ তুমি—"

"আমি খাব না। তুমি যত খুশি খাও।"

রেগে বেরিয়ে গেল তাপ্তি।

রত্নাকর একটু মুচকি হেসে আরও দু-চারটি আঙুর তুলে নিল।

তাপ্তি ঘর থেকে বেরিয়েই দেখতে পেল পদ্মা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সন্দেহ হল বোধহয় আড়ি পাতছিল।

"তুই এখানে কি করছিলি?"

"পরিচয় পাহাড়ী এসেছেন। তিনি জানতে চাইছেন ময়ূরপংখীতে মেয়েদের জন্য কটা ঘর রাখতে হবে? আমি বললুম আমি মায়ের সঙ্গে থাকব। আর কে যাবে আমি জানি না।"

"আমি যতদূর জানি আমি ছাড়া আর কেউ যাবে না।"

পদ্মা ঠোঁট টিপে একটু হেসে বলল—"আমি না গেলে পান সাজবে কে? আমার হাতের পান ছাড়া আর কারো হাতের পান বাবুর পছন্দ হয় কি? তোমার মত অবশ্য আমি সাজতে পারি না, কিন্তু তুমি কি ওখানে গিয়ে পান সাজবে খালি? কর্তার যে মুহুর্মুহু পান চাই—"

"তা নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।"

"পরিচয় পাহাড়ীকে কি বলব?"

"তুই পরিচয়কে বাবুর কাছে ডেকে দে। আমি ভিতরে যাচ্ছি।"

তাপ্তি ভিতরে চলে গেল। পদ্মা বাইরে গিয়ে পাহাড়ীকে বলল— 'পরিচয়দা তুমি ভিতরে গিয়ে কর্তা মহাশয়ের সঙ্গে কথা বল।" তারপর একটু নীচু গলায় বললে— "আমার জন্যে একটু জায়গা রেখো। পরিচয়দা, লক্ষ্মীটি—"

পদ্মার সম্বন্ধে পরিচয়ের দুর্বলতা ছিল। হেসে বলল— "নিশ্চয় নিশ্চয়, অন্য ঘর না পাই আমার ঘর তো আছেই—"

"দুষ্টু কোথাকার—।"

একটি কোপ কটাক্ষ হেনে পদ্মা বলল, "চল, এখন কর্তা মশায়ের কাছে চল।"

কয়েকটি আঙুর খেয়ে খোশ মেজাজে বসেছিল রত্নাকর।

"কি খবর তোমার পরিচয়?"

"আমি জানতে এসেছি ময়ূরপংখীতে মেয়েদের জন্যে কটা ঘর প্রস্তুত রাখব?"

"বড় ময়ূরপংখীতে কটা ঘর আছে?"

"পঁচিশ-টা।"

"পঁচিশটাই প্রস্তুত করে রাখ। কে কে যেতে চাইবে জানি না তো। কাউকে তো না বলতে পারব না।"

"যে আজ্ঞে।"

খবর পেয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠল নর্মদা। রত্নাকর সমুদ্রযাত্রায় বেরুবে? সঙ্গে ময়ূরপংখী আর অনেক নৌকো? মনটা নেচে উঠল তার। রোজ সেই খাওয়া শোয়া আর কবিরাজি ওষুধ তৈরি ভালো লাগে না আর। রোজ ওষুধ কোটা, ওষুধ বাছা, ওষুধ বাটা, ওষুধ পাক দেওয়া। কোনোটা তিন পাক, কোনোটা সাত পাক। আর কি বিশ্রী গন্ধ, কি ঝাঁজ। স্বামী দিনরাত লেখা পড়া নিয়ে ব্যস্ত। রোগী এলে দেখতে চায় না।

খবরটা শুনে সে জলধির ঘরে উঁকি মেরে দেখল। তন্ময় হয়ে পড়ছে সে।

"ওগো, শুনছ?"

জলধি তন্ময় হয়ে পড়ে চলেছে। শুনতে পেল না।

"ওগো শুনছ?"

ঘাড় ফেরাল জলধি।

"রত্নাকর সমুদ্রযাত্রায় বেরুচ্ছে। তোমার তো অনেক ওষুধ ফুরিয়েছে। ভালো গোল মরিচ, লবঙ্গ, চন্দন, শুশুকের তেল, গণ্ডারের খড়্গ—সব তো বাড়ন্ত।"

"তাই নাকি। তাহলে তো রত্নাকরের সঙ্গে যেতে হয়। ওসব জিনিস তো এদেশে মেলে না—"

"চল তাহলে রত্নাকরকে বলি গিয়ে। আমিও যাব।"

"তুমি? তুমি গিয়ে কি করবে? ঘর বাড়ি কে দেখবে?"

"আমার কি সাধ-আহ্লাদ থাকতে নেই?"

"বাড়িতেই সাধ-আহ্লাদ কর না। তোমাদের সাধ-আহ্লাদ তো পরচর্চা আর ঘোঁট। পাড়ার মেয়েদের ডেকে এনে যত ইচ্ছে ঘোঁট করতে পার। আমি তো থাকব না। আর আমার গাছ-গাছড়ার বাগান দেখবে কে?"

"মালীরা দেখবে। আমি যাবই। আমি সমুদ্র কখনও দেখিনি।"

"সমুদ্র দেখে কি দশটা হাত গজাবে?"

নর্মদা আবদারের সুরে বলল—"না, আমি যাব—।"

"আমাকে কি রত্নাকরের মত স্ত্রৈণ পেয়েছ, যে স্ত্রীর কথায় ওঠা-বসা করব?"

এরপর নর্মদা সটান শুয়ে পড়ল জলধির পায়ের উপর।

"দোহাই তোমার। আমাকে বাধা দিও না। আমি যাবই। যদি না যেতে দাও, আত্মহত্যা করব।"

জলধি খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর বলল— "এ তো এক মহাসমস্যায় ফেললে তুমি। আমারই যাবার ঠাঁই হবে কি না ঠিক নেই। আমি আবার শঙ্করাকে নিয়ে যাব কোন আক্কেলে—।"

"আমি জানি রত্নাকর আমার অনুরোধ উপেক্ষা করবে না। সে আমাকে ভালোবাসে—।"

নর্মদার মনে পাপ থাকলে সে এ কথা বলতে পারত না। জলধি একথা শুনে বিচলিত হল না। তার স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে তার কোনো সন্দেহ নেই। অনাবশ্যক উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল— "পা ছাড়, পা ছাড়। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লে কেন? যাবে তো ওঠ। কি বিপদ—।" নর্মদা উঠে বসল।

অর্ণব দিনরাত তপস্যা নিয়েই থাকত। হিরণ্ময়ী নদীর মধ্যে ছোট একটি দ্বীপের মতো ছিল— সেইখানেই অধিকাংশ সময় কাটত তার। সেইখানেই সে তার ভগবানকে নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকত। সমাজের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ছিল না তার। একটি ছোট নৌকো ছিল ত্রিবেণী সঙ্গমে। সেই নৌকো করে গঙ্গা যমুনা, সরস্বতী মন্দাকিনী প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে একবার যেত তার কাছে খাবার নিয়ে। খাবারটা রেখেই চলে আসত তারা। অর্ণবের তাই নির্দেশ ছিল। সেদিন গঙ্গা কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

"আমাকে কিছু বলবে?"

"রত্নাকর সমুদ্রযাত্রা করছেন। প্রকাণ্ড নৌবহর সজ্জিত হয়েছে। তাছাড়া তাঁর ময়ূরপংখীও সঙ্গে যাচ্ছে। তিনি কুমারিকা অন্তরীপ ঘুরে আরও দূর দেশে যাবেন। আমাদের চারজনেরই কন্যাকুমারী দর্শন করবার খুব ইচ্ছে—"

অর্ণব একটু হেসে বলল— "এ ইচ্ছে হল কেন?"

উত্তর দিল সরস্বতী— "হবে না? নারী জীবনের পৰম গৌরব ও চরম হতাশা যার মধ্যে মূর্ত হয়েছে, যিনি মহাদেবকে স্বামীরূপে পেয়েছিলেন, কিন্তু দেবতাদের ষড়যন্ত্রে তাঁর গলায় মালা দিতে পারেননি, কিন্তু তবু যিনি ভেঙে পড়েননি, আজও মালা হাতে করে হিমালয়ের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকে দেখব না? তাঁর মধ্যে যে নারীত্বের গৌরব, দুঃখ এবং বিশ্বাস মূর্ত হয়েছে— তাঁকে দেখবার ইচ্ছে হবে না?"

অর্ণব বলে উঠলেন— "বাঃ, চল এখুনি রত্নাকরের কাছে যাই। আমাকেও একবার লঙ্কায় যেতে হবে।"

"লঙ্কা? কেন?"

"আমি আজকাল রাবণ জননী নিকষার হাহাকার শুনতে পাচ্ছি। তিনি এখনও লঙ্কার শ্মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর বলছেন—রাবণের মৃত্যুর কারণ রাম নন, মৃত্যুর কারণ তার প্রবল প্রতাপ ও প্রচুর ঐশ্বর্য। তিনি আমাকে বলেছেন আমি এখনও প্রেতিনী হয়ে এখানে আছি। তুমি এসে আমাকে প্রেতলোক থেকে উদ্ধার কর। আর আমার এই বিশ্বাস প্রচার করে যে রাবণের মৃত্যুর কারণ তার প্রতাপ, তার অহঙ্কার, তার ঐশ্বর্য। রোজই এই স্বপ্ন দেখি। তাই ভাবছি লঙ্কায় যাব একবার। রত্নাকরের সঙ্গেই যাব।"

মন্দাকিনী কিছু বলল না। তার সর্বাঙ্গে একটা শিহরন বয়ে গেল শুধু।

অর্ণব তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল।

"চল এখনই যাই। শুভস্য শীঘ্রম। রত্নাকর আমাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু তোমাদের সকলকে নিয়ে

যাবার মত স্থান তার ময়ূরপংখীতে বা অন্য কোনও নৌকায় হবে কি না জানি না। তবে তোমরা যেতে চাইলে সে একটা ব্যবস্থা করবেই। চল, বেরিয়ে পড়া যাক—"

রত্নাকরের বাড়ি পৌঁছে দেখে হৈ-হৈ ব্যাপার, রৈ-রৈ কাণ্ড। অম্বুধিকে কাঁধে নিয়ে সাগর দাঁড়িয়ে আছে। সাগরের স্ত্রী বিতস্তা মূর্ছিতা। সে রত্নাকরের জন্য ক্ষীর শসা এনেছিল—তা চারদিকে ছড়ানো পড়ে আছে। সাগরের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে অম্বুধির স্ত্রী ইরাবতী এবং তার বিধবা বোন কাবেরী। রত্নাকর বারান্দায় হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে অপ্রস্তুত মুখে। ইরাবতীর উন্মুখ উৎসুক দৃষ্টি তার মুখের উপর নিবদ্ধ। তার সমস্ত কামনা যেন বিদ্যুৎরেখার মত স্পর্শ করছে রত্নাকরের সর্বাঙ্গ। কাবেরীরও আলুলায়িত বেশ। তার পীন পয়োধরের খানিকটা অনাবৃত। চোখের কটাক্ষে লালসা, মুখের মৃদু হাসিতে সাগ্রহ নিমন্ত্রণ। সে যেন মূর্তিমতী রতি। রত্নাকর করজোড়ে বলল— "আমার স্ত্রীর অসৌজন্যের জন্যে আমি লজ্জিত। আমি বিতস্তা দেবীর কাছে ক্ষমা চাইছি। তিনি যে খাবার এনেছেন তা আমি খাব। আর এ প্রতিশ্রুতিও আমি দিচ্ছি আমার সঙ্গে সমুদ্রযাত্রায় যাঁরা যেতে চান, সকলকেই আমি নিয়ে যাব। আমার ময়ূরপংখীতে ও নৌবহরে স্থানাভাব ঘটবে না।"

হঠাৎ তাপ্তি বেরিয়ে এল গলবস্ত্রে। বলল— "এসো, এসো, সবাই এসো। আমাকে ক্ষমা কর। আমি নাকখৎ দিচ্ছি। আমার ঘাট হয়েছে—"

এই বলে সত্যিই সে নাকখৎ দিতে উদ্যত হল। রত্নাকর তাকে ধরে ভিতরে নিয়ে গেল আস্তে আস্তে। মন্দাকিনী মৃদুকণ্ঠে অর্ণবকে বলল— "আমরা রত্নাকরের সঙ্গে যাব না। মনে হচ্ছে আমরা সঙ্গে গেলে তাপ্তি অসন্তুষ্ট হবেন।"

অর্ণব বলল— "আমারও তাই মনে হচ্ছে। আমরা বাড়ি ফিরে যাই চল। তবে রত্নাকরকে সেটা বলে যাই—।"

রত্নাকর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। এসেই সে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল অর্ণবকে। তারপর বলল— "চলুন, ভেতরে চলুন—"

"না, এখন আর যাব না। তুমি সমুদ্রযাত্রা করছ শুনে তোমার কাছে এসে ছিলাম। আমার লঙ্কায় যেতে হবে একবার। এরাও কন্যাকুমারিকা দেখতে চায়। ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে যাব। কিন্তু তোমার এখানে এসে যা দেখলাম—তাতে মনে হয় তোমার সঙ্গে যাওয়াটা সঙ্গত হবে না। তাপ্তি দেবী বোধহয় বেশি ভিড় পছন্দ করছেন না। আমি একটা আলাদা নৌকোর ব্যবস্থা করি। তোমাদের পিছু-পিছুই যাব।"

রত্নাকর বলল— "এ অঞ্চলের সব নৌকো পাহাড়ী ভাড়া করেছে। আপনি নৌকো পাবেন না।"

"এত নৌকো নিয়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"দেশটার নাম নাকি উপরিকা। প্রকাণ্ড অরণ্য সমাকুল মহাদেশ সেটা। সেখানে গজদন্ত আর গজ-অস্থি নাকি খুব সস্তায় পাওয়া যায়। আমি পাঁচশো নৌকো নিয়ে যাচ্ছি সেখানে। পথেও যে সব নৌকো পাব ভাড়া করব—।"

"এত গজদন্ত আর গজ-অস্থি তুমি পাবে কোথায়?"

"যিনি এ খবর নিয়ে এসেছেন তিনি বলেছেন যে সে দেশে হাতিরা মৃত্যুর আগে গভীর বনের মধ্যে একটি নির্জন স্থানে গিয়ে অন্নজল ত্যাগ করে বসে থাকে। বার্ধক্যে তারা স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে। এইরকম কয়েকটি হাতির শ্মশান আবিষ্কার করেছেন তিনি। সেখানে প্রচুর গজদন্ত ও গজ-অস্থি

ছড়ানো আছে। আমি তার সাহায্যে সেগুলো সংগ্রহ করব বলে যাচ্ছি।"

অর্ণব বললেন—"তাহলে তুমি ঘুরে এস। আমি পরে যাব।"

"আপনি আমার একটা নৌকো নিয়ে যান না—।"

"যেতে আপত্তি নেই। কিন্তু নৌকোর ভাড়াটা তোমায় নিতে হবে। না নিলে মন্দাকিনীর আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হবে। সে তাপ্তি দেবীর অস্বস্তির কারণ হতে চায় না।"

রত্নাকর চুপ করে রইল ক্ষণকাল। তারপর বলল— "বেশ তাই হবে। আপনার আদেশ অমান্য করবার সাহস আমার নেই। যা বলবেন তাই হবে। আপনাকে কিন্তু আমার সঙ্গেই যেতে হবে। আপনাকে সঙ্গীরূপে পেলে আমি ধন্য হব।"

অর্ণব মন্দাকিনীর দিকে ফিরে বলল—"এতে তোমার মত আছে তো?"

মন্দাকিনী আশা আকাঙ্ক্ষায় কাঁপছিল। মাথা নেড়ে জানাল—মত আছে।

কবি পারাবার তাঁর ধানের ক্ষেতে মাচার উপর বসেছিল। চারদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত সবুজের সমুদ্র। সে কিন্তু বসেছিল স্বপ্নের সমুদ্রের মধ্যে। অধিকাংশ সময়ই সে তার এই ছোট মাচাটির উপর বসে থাকে। মাচার পাশেই ছোট্ট একটি মাটির ঘর আছে। তাতে আছে লেখবার সরঞ্জাম। পারাবার মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে সেখানে কবিতা লেখে। পারাবার একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। তার সংসার চলে তার চাষের আয় থেকে। বেশ ধনী লোক সে। বিদেশের হাটে সে ফসল পাঠায় রত্নাকরের নৌকোয়। এসব ব্যবস্থা করবার জন্য তার বিশ্বাসী চাকর আছে অনেক। তারাই সব করে। পারাবার কবিতা লেখে শুধু, আর নির্জন মাঠের মধ্যে তন্ময় হয়ে বসে থাকে। তার আর একটি কাজ আছে। সে অন্য পণ্ডিত বা কবির লেখা সুন্দর করে লিখে দেয় তাল পাতায়। মুক্তোর মত হাতের লেখা তার। এর জন্যে সে পারিশ্রমিক নেয়। কিন্তু পারিশ্রমিক দিলেই সে লেখে না। যে লেখা পড়ে তার ভালো লাগে তাই সে সুন্দর করে লিখে দেয়। ব্রাহ্মণী তার জন্যে রোজ দুপুরে খাবার নিয়ে আসে। সেদিন পারাবার লক্ষ্য করল ব্রাহ্মণী বেশ দ্রুত বেগে আসছে। তার পিঠের বেণী আর বাঁ হাতটা যেন বেশি জোরে দুলছে। ব্রাহ্মণী অপরূপ সুন্দরী। যেন একটি অর্ধ-বিকশিত শ্বেত-পদ্ম। শুধু সৌন্দর্য নয়, পবিত্রতাও বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন। সে অর্ণবের শিষ্যা, পারাবারের পত্নী। তার নিষ্ঠায় কোনো খুঁত নেই, তার স্বামীভক্তিও নিখুঁত, কিন্তু রত্নাকরকে সে ভালোবাসে। সে ভালোবাসার কথা পারাবারকেও বলেছিল একদিন। তা শুনে পারাবার রাগ করেনি, খুশি হয়েছিল। বলেছিল—"তাহলে তো তুমি একজন বড় শিল্পী দেখছি। শিল্পীরাই সৌন্দর্যকে ভালোবাসে। রত্নাকর সুন্দর, রূপে সুন্দর, গুণে সুন্দর, তাকে তো ভালোবাসাই উচিত। তোমার শিল্পবোধের পরিচয় পেয়ে খুশি হলাম।"

ব্রাহ্মণী মুচকি হেসে বলেছিল— "সত্যি কথা বলছ, না কবিত্ব করছ?"

"সত্যি কথা বলছি কিনা জানি না। কারণ সত্য কি তাই জানি না। পৃথিবীর সব জিনিসই বদলায়। সত্যও বদলায়। সাদা স্তূপ মেঘটা কুমিরের মত ছিল একটু আগে, এখন অপ্সরীর মত দেখাচ্ছে। দুটোই সত্য, দুটোই সুন্দর। ওই প্রজাপতিটা দেখ, কি চমৎকার। একটু আগে ওটা গুটিপোকা ছিল। দুটোই চমৎকার। আমি সুন্দরের উপাসক, তাই রত্নাকরকে ভালোবাসি, তুমিও রত্নাকরকে ভালোবাস জেনে খুশি হয়েছি। রাগ করব কেন? এ-ও আমি জানি এই ভালোবাসা কালক্রমে হয়তো প্রণয়ে রূপান্তরিত হতে পারে। যদি হয় হোক না—যদি সত্যি সেটা সুন্দর হয়। আমি তোমার প্রণয়ী তাই

জানি, প্রণয় বড় সুন্দর। তুমি যদি ভালোবেসে ফেল, সে তো ভারি মজা হবে। আমার হিংসা হবে না। কারণ তোমার সুখেই আমার সুখ। আমার হিংসে হবে না, যে সাদা মেঘকে আমি ভালোবাসি সে যখন চাঁদকে জড়িয়ে ধরে আমার খুব ভালো লাগে, একটু রাগ হয় না। বরং মনে হয়, আহা, আমি যদি ওদের জড়িয়ে ধরতে পারতাম। কিন্তু পারি না। আমার এই না পারাটা স্বপ্ন হয়ে যায়। কবিতা লিখি।—"

এইসব কথা বহুদিন আগে পারাবার বলেছিল ব্রাহ্মণীকে। ব্রাহ্মণী মুচকি হেসে উত্তর দিয়েছিল— "আমি রত্নাকরকে ভালোবাসি, তুমি আমাদের নিয়ে একটা মহাকাব্য লিখে ফেল।"

"প্রণয় এখনও জমেনি। জমলেই লিখে ফেলব। তবে তোমাকে বাহাদুরি দিই, তোমার মাত্র দুটো পা, কিন্তু তিন নৌকোয় পা রেখে অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছ। অথচ তোমার গায়ে কাদা লাগেনি।"

"তিন নৌকো মানে?"

"এক নৌকো আমি। আর এক নৌকো অর্ণব, তৃতীয় নৌকো রত্নাকর—। অথচ তোমার চরিত্র স্ফটিক-শুভ্র আছে। তোমার ব্রাহ্মণী নাম সার্থক।"

পারাবার নির্নিমেষে চেয়ে রইল ব্রাহ্মণীর দিকে। এত হনহন করে আসছে কেন?

ব্রাহ্মণী হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির হল শেষে।

"খবর শুনেছ?"

"কি?"

"রত্নাকর সমুদ্র-যাত্রা করছে ময়ূরপংখী নিয়ে। সঙ্গে অনেক নৌকো আছে। এ অঞ্চলের সব নৌকো ভাড়া করেছে সে। সাগর, অম্বুধি, মন্দাকিনী, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী সবাই গিয়েছিল রত্নাকরের কাছে। রত্নাকর বলেছে সবাইকে নিয়ে যাবে। চল, আমরাও যাই। গুরুদেবও সঙ্গে যাবেন।"

"আমি স্বপ্নের সমুদ্রে সর্বদা ডুবে থাকি, কিন্তু আসল সমুদ্র কখনও দেখিনি। রত্নাকর কি আমাদের নিয়ে যাবে?"

"তুমি বললে নিশ্চয় যাবে। সে খুব খাতির করে তোমাকে। খেয়ে নাও, তারপর চল যাই তার কাছে—"

"তুমি যাও না। আমার হাঁটাহাঁটি করলে মাথা গোলমাল হয়ে যায়। অতদূর গিয়ে হয়তো কি বলতে গিয়ে কি বলে ফেলব। হয়তো বলে বসব—

হে রত্নাকর কোর না ভাবনা
তোমার সঙ্গে যাব না যাব না
এতদূর হেঁটে এসেছি কেবল
নেহারিতে তব বদন কমল।
একটু হাসিয়া চাহ একবার
এর বেশি কিছু চাহিনাক আর।

তুমি যাও, তুমি গেলেই কাজ হবে।

"আমি তার সামনে একটি কথাও বলতে পারব না।"

"তাহলে ব্যাপার বেশ ঘনীভূত হয়েছে বল?"

ব্রাহ্মণী ধমকের সুরে বলল—"বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছ কেন? তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও—।"

পারাবার এবার হেসে ফেললে। এবারও কিন্তু কবিতায় উত্তর দিল—

"লো রূপসী ব্রাহ্মণী
কঙ্কন কন-কনি
কণ্ঠে তুলি কোমল নিখাদ
আদেশ করিলে যাহা
অবশ্য পালিব তাহা
নিশ্চয় পুরাব তব সাধ।"

পারাবার খেতে বসল।

ব্রাহ্মণী তার সামনে বসে ছোট একটা হাত-পাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগল তাকে। সে সঙ্গে একটা ছোট পাখাও এনেছিল। রোজ আনে।

অদ্ধি আর ভোগবতীও গিয়েছিল রত্নাকরের কাছে। রত্নাকার বলেছে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যাবে। অদ্ধি ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছিল। ভোগবতীর চোখে কিন্তু ঘুম নেই। সে জানলার ধারে অন্ধকারের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল চুপ করে। অন্ধকারের ভিতরই সে যেন দেখতে চাইছিল তার ভবিষ্যতকে। সেদিন কিন্তু সম্পূর্ণ অন্ধকার ছিল না। কৃষ্ণা-অষ্টমীর চাঁদ উঠেছিল। দূর আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়েছিল সে নিস্তব্ধ হয়ে। রত্নাকরের মুখটা মনে পড়ছিল মাঝে মাঝে। পরিচয় পাহাড়ীকে সে বলে এসেছে রত্নাকরের পাশের ঘরটাই যেন তাকে দেওয়া হয়। পাহাড়ী লোভী পশু একটা। সে যে তাকে অনুরোধ করেছে, এতেই কৃতার্থ হয়ে গেছে সে। বার বার বলেছে নিশ্চয় রত্নাকরের পাশের ঘরটাই সে রাখবে তাদের জন্য। রত্নাকর আদেশ দিয়েছে যে পুরুষরা সব আলাদা আলাদা নৌকায় থাকবে আর মেয়েরা থাকবে তার ময়ূরপংখীতে। এ সংবাদ শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছে ভোগবতী।

হঠাৎ চমকে উঠল সে। বিরাট একটা পাহাড়ের মত কি যেন এগিয়ে আসছে তাদের বাড়ির দিকে। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে ওঠালে অদ্ধিকে।

"ওঠ, ওঠ, একটা পাহাড় চলে আসছে আমাদের বাড়ির দিকে—।"

অদ্ধি ধড়মড় করে দাঁড়াল গিয়ে জানলার ধারে। দাঁড়িয়েই নমস্কার করতে করতে বলল— "উনি মহেশ্বরের নন্দী। শাঁখ বাজাও।"

ভোগবতীর মহাশঙ্খ ছিল একটা। সে সেইটে তুলে নিয়ে বাজাতে লাগল। অদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে বসে গেল ধ্যানে। পাহাড়টা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। তারপর দিক পরিবর্তন করে চলে গেল অন্য দিকে।

সে যখন দৃষ্টির বাইরে চলে গেল তখন ভোগবতী বলল— "নন্দী অন্যদিকে চলে গেলেন—।"

অদ্ধি তখন ধ্যানে মগ্ন। একেবারে সমাধিস্থ। অদ্ধির কোনো জবাব না পেয়ে ভোগবতী বেরিয়ে গেল বাইরে। ঘুরে বেড়াতে লাগল অন্ধকারে। শেষে হাজির হল শ্মশানে এসে। নির্জন শ্মশানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। চাঁদটাও ঢেকে গেল একটা মেঘে। সূচীভেদ্য অন্ধকারে আবৃত হয়ে গেল সব। ভোগবতীর সর্বাঙ্গে শিহরন জাগল একটা। সে জাপটে ধরতে চেষ্টা করল অন্ধকারকে। কিন্তু অন্ধকারকে বুকে জাপটে ধরা যায় না। জেদ চেপে গেল ভোগবতীর, অন্ধকারকে সে বুকে চেপে ধরবেই। সারা শ্মশানময় সে দুহাত বাড়িয়ে ছুটে ছুটে বেড়াতে লাগল। আর বার বার বলতে লাগল—

"অন্ধকার, তুমি আমাকে নাও। অব্ধি আমাকে ভালোবাসে না। আমি তার সাধনায় উত্তরসাধিকা মাত্র। আমি তার প্রয়োজনের যন্ত্র। আমি তার প্রেয়সী নই।"

হঠাৎ তার মনে হল মহেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে, মহেশ্বরের কাছে গিয়ে সে নালিশ জানাবে। তাঁকে বলবে—হে উমানাথ, তোমার ভক্ত আমাকে কেন ভালোবাসে না। উন্মাদিনীর মত শ্মশানেশ্বর শিব-মন্দিরের দিকে ছুটতে লাগল সে। গিয়ে কিন্তু দেখল মন্দিরের কপাট খোলা, মন্দিরে মহাদেব নেই।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর বেরিয়ে এল মন্দির থেকে। তার কেমন যেন একটা আতঙ্ক হল। ছুটতে লাগল বাড়ির দিকে। বাড়ি গিয়ে দেখল—অব্ধির ধ্যানভঙ্গ হয়েছে। সে গম্ভীর হয়ে বসে আছে।

"শ্মশানেশ্বরের মন্দিরে মহেশ্বর নেই।"

"তিনি নন্দীর পিঠে চড়ে মহাকুর্মের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন।"

"মহাকুর্ম কে?"

"যিনি পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ করে আছেন।"

"তাঁর কাছে গেছেন কেন?"

"সেটা ধ্যানে ধরতে পারলাম না। আন্দাজ করছি নেপথ্যে কিছু একটা ঘটছে। আমি স্বচক্ষে দেব-দৈত্যদের ঢুকতে দেখেছি মহেশ্বরের মন্দিরে। পারাবারও দেখেছে। একটা বিপ্লব বোধহয় আসন্ন।"

"রত্নাকরের সমুদ্রযাত্রার দেরি কত? আমরা তো তার সঙ্গে যাচ্ছি। আমাদের ভয় কি।"

অব্ধির মুখে হাসি ফুটল। রহস্যময় হাসি। সে কোনো জবাব দিল না। কেবল হাসিমুখে চেয়ে রইল সে ভোগবতীর দিকে।

।। পনেরো ।।

ময়ূরপংখী সাজানো হয়ে গেছে। তার মাথার উপর মহেশ্বরের পতাকা উড়ছে নানা রকম। কোনোটা ধ্যানমগ্ন মহাদেব, কোনোটা সতীর শব স্কন্ধে মহাদেব, কেউ উমানাথ, কেউ নটরাজ, কেউ মদন ভস্ম করছেন। মহাদেবের পতাকা সব নৌকোতেই উড়ছে। মহেশ্বর অঞ্চলের বহু নরনারী সমুদ্র যাত্রায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। সবাই আনন্দিত। আনন্দ নেই কেবল তাপ্তির মনে। ময়ূরপংখীতে একপাল মেয়ে নিয়ে তার সমুদ্রযাত্রা করবার মোটেই ইচ্ছে নেই। অথচ রত্নাকরকে ছেড়েও সে একদণ্ড কোথাও থাকতে পারে না। সুতরাং তার মনেই কেবল তুষানল জ্বলছে। তার এই অতি ভদ্র, ধনী, অতিশয় রূপবান স্বামীকে নিয়ে সে অতি বিব্রত। সবাই তাকে নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি করছে। বেহায়ার দল সব। কদিন থেকে সে রোজই রত্নাকরকে বলছে—"তুমি একাই ঘুরে এস। আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। আমি ওই ভিড়ের মধ্যে যেতে পারব না। বিয়ের পর থেকে তোমাকে ছেড়ে কোনো দিন থাকিনি। চেষ্টা করে দেখি পারি কি-না।"

রত্নাকর মৃদু হেসে উত্তর দেয়—"দেখই না কি হয় শেষ পর্যন্ত। সবাই হয় তো যাবে না।"

"যাবে না আবার। মেয়েগুলো তো পা বাড়িয়ে বসে আছে।"

"দেখো, শেষ পর্যন্ত কেউ যাবে না।"

"ময়ূরপংখীর পঁচিশটা ঘরে জিনিস-পত্র এনে রাখতে শুরু করেছে। আমাকে তুমি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

"থাকতে পারবে?"

"হয়তো পারব না। হয়তো মরে যাব। তবু আমি ওই হাটের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করতে পারব না। তোমার পেয়ারের লোকদের নিয়ে তুমি বেড়িয়ে এসো।"

রত্নাকর হাসিমুখে চেয়ে রইল। কোনো উত্তর দিল না।

তার পরদিন যা ঘটল তা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত অপ্রত্যাশিত। মহারাজ পৃথ্বীপতি দামামা বাজিয়ে ঘোষণা করলেন—তাঁর রাজ্যের কোনো নারী সমুদ্রযাত্রা করতে পারবে না। নিতান্ত প্রয়োজনে যদি কেউ যেতে চান তাঁকে মহারাজের নিকট থেকে বিশেষ অনুমতি নিতে হবে। এ আদেশ অমান্য করলে প্রাণদণ্ড হবে। সেই দিনই একজন বিশেষ রাজদূত একটি সুরঞ্জিত তালপত্রে নিম্নলিখিত পত্রটি দিয়ে গেল রত্নাকরকে। পত্রটি তাপ্তির নামে।

আয়ুষ্মতি রত্নাকর জায়া
শ্রীমতী তাপ্তি দাসী সমীপেষু,
কল্যাণীয়া বন্ধুজায়া,

আপনার স্বামী শুনিলাম বাণিজ্যব্যপদেশে বহুদিনের জন্য সমুদ্রযাত্রা করিতেছেন। আমি সম্প্রতি বিশেষ কারণে নারীদের সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করিয়াছি। কিন্তু আপনাকে স্বামীর সহিত যাইবার জন্য বিশেষ অনুমতি দিলাম। মহেশ্বরের কৃপায় আপনাদের সমুদ্রযাত্রা নির্বিঘ্ন হোক। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ গ্রহণ করুন।

ইতি
শুভানুধ্যায়ী
শ্রী পৃথ্বীপতি শঙ্কর সেবক

হৈ-হৈ কাণ্ড পড়ে গেল চতুর্দিকে। অর্ণব মন্দাকিনীকে বলল— "রাজার আজ্ঞা অমান্য করা অনুচিত। আমাকে নিকষা কিন্তু রোজই স্বপ্নে দেখা দিচ্ছেন। আমাকে লঙ্কা যেতেই হবে তোমরা থাকো। রাজা পৃথ্বীপতি কেন এ আদেশ ঘোষণা করেছেন বুঝতে পারলাম না। তবে মনে হয় নিশ্চয় কোনো নিগূঢ় কারণ আছে।"

ওরা চারজনই চুপ করে রইল। পদ্মা রাজা পৃথ্বীপতির উদ্দেশ্যে যে ভাষায় গালাগাল শুরু করল তা অশ্রাব্য। তাপ্তি তাকে আলাদা একটা ঘরে পুরে তালা লাগিয়ে দিল। খবরটা শুনে ইরাবতী মূর্ছা গেল। আর কাবেরী চলে গেল পরিচয় পাহাড়ীর কাছে। উদ্দেশ্য, যদি তাকে হাব-ভাবে ভুলিয়ে ময়ূরপংখীতে গোপনে উঠে পড়তে পারে। পাহাড়ী বলল— "তা আমি পারব না। ধরা পড়লে তোমারও মৃত্যুদণ্ড হবে, আমারও হবে। ও আমি পারব না।" মাথায় কয়েক বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে ইরাবতীর মূর্ছা ভাঙানো হল। সে কিন্তু হু হু করে কাঁদতে লাগল। স্ত্রীর কাণ্ড দেখে অম্বুধি বলল— "আমিও যাব না। যদিও আমার ইচ্ছা ছিল দ্রাবিড় দেশে গিয়ে সেখানকার বড় বড় জ্যোতিষীদের সঙ্গে আলাপ করব। কিন্তু তুমি যখন এত কাতর হয়ে পড়েছ, আমি আর যাব না।"

এ খবর পেয়ে রত্নাকর তাঁকে অনুরোধ করে পাঠালেন—"আপনাকে যেতেই হবে। আমরা সুদূর

সমুদ্রযাত্রায় যাচ্ছি। আপনার মত একজন প্রবীণ পণ্ডিত জ্যোতিষী সঙ্গে থাকলে আমরা অনেকটা নির্ভয় হব।"

"আমার স্ত্রী, আমার শালী না থাকলে আমার দেখাশোনা করবে কে? আমি নিজে তো কিছু করতে পারি না।"

রত্নাকর খবর পাঠালেন আপনার দেখাশুনো করবার জন্য দুজন ভৃত্য নিয়োগ করা হয়েছে। আপনাকে যেতেই হবে। তাছাড়া মল্লবীর সাগরও আমার সঙ্গে যাচ্ছেন। তিনি সর্বদা আপনার নিকট থাকবেন বলেছেন। সুতরাং আপনার পরিচর্যার কোনো ত্রুটি হবে না।

অম্বুধি রাজি হয়ে গেল। ইরাবতী কাবেরীকে মহারাজ পৃথ্বীপতির দরবারে পাঠিয়েছিল মহারাজের বিশেষ অনুমতি আনবার জন্য। কিন্তু কাবেরী সেখানে কোনো পাত্তাই পায়নি। দ্বারপালরা তাকে ঢুকতেই দেয়নি।

বিতস্তাকে নিয়েও মুশকিলে পড়ল সাগর। মহারাজের আদেশ শুনে বিতস্তা মূর্ছা যায়নি, কান্নাকাটিও করেনি। সে সাগরকে বলল, "তুমি পরিচয় পাহাড়ীকে বলো, আমি পুরুষ বেশে রত্নাকরের রাঁধুনি হয়ে যাব। এর জন্য সে যদি কিছু টাকা চায় আমি দেব—।"

"সে রাজি হবে না। ধরা পড়লে তাঁর প্রাণদণ্ড হবে।"

"তাহলে তুমি যেও না—"

"আমাকে যেতেই হবে। 'উপরিকা' দেশের হাতিকে প্রণাম করতে যাচ্ছি আমি। হাতি জানোয়ারটিকে আমি বড় ভক্তি করি। তুমি এখানেই থাকো না। এখানে তো তোমার প্রচুর কাজ।"

"প্রচুর কাজ সারাজীবন করেছি বলেই ছুটি চাই।"

"বাপের বাড়ি যাও।"

"সেখানে আমার বৌদি মারা গেছে। এক ঘর ছেলেমেয়ে। সেখানে গেলে বিশ্রাম হবে না। তাছাড়া বিশ্রাম মানেই তো ছুটি নয়। বিছানায় শুয়ে থাকলেও বিশ্রাম হয়, কিন্তু ছুটি হয় না। ছুটি একটা বিশেষ আনন্দ। সে আনন্দের সীমা থাকে না যদি রত্নাকর সঙ্গে থাকে।"

"কিন্তু তুমি যদি পুরুষ বেশে যাও, গোঁফ পরতে হবে। রত্নাকর কি চিনতে পারবে তোমায়?"

"আমার রান্না খেলেই চিনতে পারবে। আখরোটের টুকরো দিয়ে বুটের ডাল হলেই বুঝবেন, বিতস্তা এসেছে—।" সাগর ভ্রূকুঞ্চিত করে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল বিতস্তার দিকে। তারপর বলল—"স্বামী হিসেবে আমার এখন উচিত তোমার চুল ধরে বোঁ বোঁ করে ঘুরিয়ে একটি আছাড় মারা। কিন্তু তা করতে ইচ্ছে করছে না। বরং মনে হচ্ছে তুমি গেলেই ভালো হত। কেন বল তো—।"

"কারণ আমার মনে পাপ নেই।"

হো হো করে হেসে উঠল সাগর।

"তোমার মনের খবর ষোল আনা জানি না। কিন্তু নিজের মনের খবর রাখি। তুমি সঙ্গে থাকলে আমার খুব ভালো লাগত।"

দুজনেই হেসে উঠল এক সঙ্গে। সাগর বলল—"কিন্তু রাজ-আজ্ঞা রদ করা যাবে না। তোমাকে থাকতেই হবে এখানে।"

"কিন্তু মন আমার তোমাদের পিছু পিছু যাবে।"

"সাগর আছ?" বাইরে অব্ধির ডাক শোনা গেল।

"এসো, এসো, ভিতরে চলে এসো।"

অব্ধির হাতে একটি চমৎকার চকচকে ছোট কৌটো ছিল। "রাজার ঘোষণা শুনেছ তো? মেয়েরা কেউ যেতে পাবে না। ভোগলু তো রেগে টং হয়ে বসে আছে। আমি তাকে এই অষ্টধাতুর মন্ত্রপূত কৌটোটা দিয়ে বললাম তোমার দেহটা যখন যেতে পাবে না, তোমার মনটাই এই কৌটোর ভিতর পুরে দাও। আমি সেটা রত্নাকরকে দিয়ে দেব। সে সর্বদা তোমাকে মনে করবে। ভোগলু কৌটোটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে। আমি ভাবলাম বিতস্তারও তো এই দশা তাই কৌটোটা কুড়িয়ে নিয়ে তোমাদের কাছে এলাম। বিতস্তা যদি চায় তার মনটা এর ভিতর পুরে দিতে পারি।"

"পার নাকি? কি করে?"

"এই কৌটোটা দুহাত দিয়ে বুকে চেপে ধরে বসে থাকো খানিকক্ষণ। একটু পরেই কৌটোর ভিতর থেকে ভোমরার গুঞ্জন শোনা যাবে। তখনই বুঝবে তোমার মন কৌটোর ভিতর বন্দী হয়ে গেছে। সেই কৌটো আমরা রত্নাকরকে দেব। রত্নাকর প্রতি মুহূর্তে তোমাকে স্মরণ করবে।"

বিতস্তা স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে রইল কযেক মুহূর্ত।

তারপর বলল—"দিন।"

সাগর বলল—"তুমি না হয় না-ই গেলে। ভোগবতী রেগে গিয়ে কি যে করে ফেলবে তার ঠিক নেই। তার মাথায় গোলমাল তো—।"

অব্ধি বললে—"তার মাথার ভিতর একটা আগ্নেয়গিরি আছে। কিন্তু তোমাকে 'উপরিকা' দেশে যেতেই হবে। যে লোকটি রত্নাকরকে হাতির খবর দিয়েছে, সেই আমাকে বলেছে যে সে দেশে চামরী, ভামরী, ঝামরী আছে, উগ্রচণ্ডা দেবী আছে। গভীর অরণ্যে তারা থাকে। তাদের বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ, তারা উলঙ্গিনী, তারা অদ্ভুত নাচে, অদ্ভুত সুরে অদ্ভুত ভাষায় গান করে। তারা নাকি হারানো জিনিস খুঁজে আনতে পারে— আমি তাদের কাছে এই বিদ্যেটা শিখে নিতে চাই। আমার সাতাশটা বউ আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, তাদের আমি ফিরিয়ে আনতে চাই। আমাকে রত্নাকরের সঙ্গে 'উপরিকা' দেশে যেতেই হবে—।"

বিতস্তা কৌটোটা নিয়ে ভিতরে চলে গিয়েছিল। সে ফিরে এসে অব্ধির হাতে দিল সেটা।

"নিন।"

অব্ধি কৌটোটা কানের কাছে নিয়ে শুনল একটু।

"বাঃ, চমৎকার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয় দেব রত্নাকরকে।"

বিতস্তা চলে গেল ভেতরে। তারপর বিছানায় শুয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল সে। মনটা সত্যি হালকা হয়ে গেছে।

জলধি কবিরাজের স্ত্রী নর্মদা যা করল তা অন্য কেউ পারত না। সে হনহন করে হেঁটে চলে গেল রাজবৈদ্যের বাড়ি। জলধি ও অঞ্চলের নামজাদা কবিরাজ। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য অগাধ। রাজবৈদ্য তাঁকে খাতির করেন খুব। জলধির বাড়িতে তিনি এসেছেনও কয়েকবার। নর্মদার অভ্যর্থনায় এবং সেবা যত্নে মুগ্ধ হয়ে গেছেন প্রত্যেক বারই। তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হল নর্মদা। বলল— "আপনি মহারাজকে বলে আমার জন্য একটা বিশেষ অনুমতি-পত্র জোগাড় করে দিন।"

রাজবৈদ্য একটু বিব্রতবোধ করলেন। কিন্তু রূপসী তরুণীদের প্রতি তাঁর বিশেষ একটু দুর্বলতা আছে। তাছাড়া জলধি কবিরাজের পত্নীর অনুরোধ উপেক্ষা করবার মত মনের জোরও পেলেন না

তিনি। তিনি মহারাজকে গিয়ে অনুরোধ করলেন।

মহারাজ বললেন—"তাঁকে নিয়ে আসুন আমার কাছে।"

নর্মদা গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বসল মহারাজের সামনে।

মহারাজ প্রশ্ন করলেন—"আপনি সমুদ্রযাত্রা করতে চাইছেন কেন?"

"আমার স্বামীর সমস্ত ওষুধ আমিই স্বহস্তে তৈরি করি। অনেক জিনিস পিষতে হয়, কুটতে হয়, গুঁড়ো করতে হয়। আমার স্বামী দিনরাত পড়াশোনা করেন। আমার একটু বিশ্রাম নেই, জীবনে আনন্দ নেই। রত্নাকর সমুদ্রযাত্রা করছেন। আমার স্বামীও যাবেন তাঁর সঙ্গে। সেই সঙ্গে আমিও যেতে চাই। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে অনুমতি দিন।" মহারাজ বললেন—"সমুদ্রযাত্রার অনুমতি দিতে পারব না। তবে আপনার জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমার একটা ছোট ময়ূরপংখী আছে। সেটা নিয়ে আপনি জলপথে যত খুশি ঘুরে বেড়ান। আমাদের দেশে বড় বড় নদ নদী আছে।। আপনার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে নদী পথে আমাদের দেশটা দেখে আসুন আপনি। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—"

নর্মদা মনে মনে হতাশ হল। বাইরে কিন্তু তাকে বলতে হল—"তা হলে তো খুবই ভালো হয়। আমার কিন্তু একটু সঙ্কোচ হচ্ছে, আমার জন্যে এত হাঙ্গামা নাই বা করলেন—।"

মহারাজ বললেন—"মহারাজ হলে প্রজাদের জন্য হাঙ্গামা পোয়াতেই হয়। আর এতে কোনো হাঙ্গামাই নেই। অনেকগুলো মাঝি-মল্লা বেকার বসে মাইনে নিচ্ছে। তারা একটু কাজ করুক না। খাওয়া-দাওয়ার সব ব্যবস্থা আছে ময়ূরপংখীতে। বিছানাও আছে। আপনাদের সঙ্গে কয়েকজন গায়িকাও দিচ্ছি। আনন্দে সময় কাটবে।"

নর্মদা আর কিছু বলতে পারল না। বলল—"বেশ তাই হবে।" বলে প্রণাম করে বেরিয়ে এল। ফিরতে হল তাঁকে মহারাজের নৌকোতে। মহারানি তার সঙ্গে অনেক উপঢৌকন দিলেন।

।। ষোলো ।।

রত্নাকরের ময়ূরপংখী চলে গেছে সমুদ্রযাত্রায়। তার সঙ্গে গেছে অর্ণব, জলধি, অব্ধি, সাগর, অম্বুধি আর পারাবার। এদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা নৌকোর ব্যবস্থা করেছে রত্নাকর। প্রকাণ্ড ময়ূরপংখীতে আছে কেবল তাপ্তি। তাপ্তি আনন্দে ডগমগ। সে যে কি করবে, কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। তার মুখের শোভা যেন বিকশিত হয়েছে পদ্মের মত। ময়ূরপংখীর বিস্তৃত খোলা বারান্দায় সে বসে আছে রত্নাকরের পাশে। হু হু করে সমুদ্রের হাওয়া বইছে। সিন্ধু শকুনরা দলে দলে উড়ছে; তাপ্তি রত্নাকরের পাশে বসে পান সাজছে। আর মাঝে মাঝে বলছে "এত হাওয়ায় বসে থাকা ঠিক নয়, চল ঘরের ভেতর যাই।"

"চল যাই।" অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেয় রত্নাকর। তার মনে পড়ছে বিতস্তাকে। তার ছোট কৌটোটা তার পিরানের বুক পকেটে রয়েছে। সমানে গুঞ্জন করে চলেছে সেটা। বিতস্তার সঙ্গে মনে পড়ছে ইরাবতীকে, কাবেরীকে, নর্মদাকে, ভোগবতীকে, ব্রাহ্মণীকে, মন্দাকিনীকে। তাদের উৎসুক, উন্মুখ মনগুলি যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মনের আশে-পাশে। মনে পড়ছে ফল্গুকে। সে হয়তো তার খালি বাড়ির বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে একা একা। এদের জন্য মন কেমন করছে তার। ওরা সবাই

তাকে ভালোবাসে। কিন্তু কেন বাসে? ও তো তাদের সঙ্গে মেশেনি, তাদের প্রশ্রয় দেয়নি। বন্ধুপত্নীদের সঙ্গে যতটুকু ভদ্রতা করা শোভন তাই করেছে শুধু। ওরা কিন্তু সবাই উতলা। চুম্বকের টানে লৌহকণা যেমন আকৃষ্ট হয়, ওরাও তেমনি হয়েছে। ভদ্রতাটা কি চুম্বক? তার মনে হচ্ছে পুরুষ না হয়ে সে যদি নারী হত তাহলে কি ওরা আকৃষ্ট হত? হত না। তাপ্তিকেই সে ভালোবাসে। তাদের ভালোবাসা এর মধ্যে এসে জুটে গেছে। কারণ সে রূপবান পুরুষ এবং ভদ্রলোক।

মহারাজা পৃথ্বীপতি এ কৌশল না করলে তার সমুদ্রযাত্রা জটিল সমস্যা হয়ে উঠত। তাপ্তি খুব খুশি হয়েছে। রত্নাকরের কিন্তু মন কেমন করছে ওদের জন্য। বিচিত্র মানুষের মন।

ময়ূরপংখীতে ছোট একটি মহেশ্বরের মন্দির ছিল। রত্নাকর সেই মন্দিরে ঢুকে পড়ল। তাপ্তির ইচ্ছে ছিল ঘরে গিয়ে বিছানার উপর বসে রত্নাকরের সঙ্গে পাশা খেলবে। কিন্তু তা আর হল না। রত্নাকর মহেশ্বরের মন্দিরে ঢুকে পড়ল। তাপ্তির মনে হল—রত্নাকর কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে আছে। কেন? এই প্রশ্নের পিছু পিছু তার মনে যে ছবি ফুটে উঠল তাতে তার দুঃখও হল, আনন্দও হল। সে বুঝল ওই বেহায়া মেয়েগুলোর জন্যেই তার স্বামীর মন কেমন করছে। দুঃখে ভরে গেল মনটা। কিন্তু তারপরই মনে হল ওদের সে কাছে ঘেঁসতে দেয়নি। কিছুদিন দেখতে না পেলেই ভুলে যাবে ওদের। মহারাজা পৃথ্বীপতিকে মনে মনে প্রণাম করল বার বার। তারপর সহসা তার মনটা খুশিতে ভরে উঠল। ঘরে গিয়ে করতাল বাজিয়ে সে গান ধরে দিল—মোহন মতির মালা কেবল আমার গলায় দুলবে। তাপ্তি খুব ভালো গায়িকা। সহসা তার সমস্ত মনটা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

।। সতেরো ।।

মহাশ্মশানে চারদিকে ধুনী জ্বালিয়ে ভোগবতী বসে আছে একা। ধ্যান করছে চোখ বুজে, তার গলায় হাড়ের মালা। কোলের উপর খুলি। সে মাঝে মাঝে খুলিটাকে তুলে চুমু খাচ্ছে। তার মাথার ভিতর থেকে একটা লাল রঙের শিখা বেরুচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন একটা রক্ত-গোক্ষুর লকলক করে ফণা বিস্তার করছে। সহসা একটা ঝাঁকড়া চুল-ওলা রোমশ বলিষ্ঠ লোক আবির্ভূত হল শূন্য থেকে। তার চোখ দুটো জ্বলছে। অগ্নিগোলকের মতো। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত। ধুনীর থেকে কিছু দূরে দুটো বাঘ থাবা পেতে বসে আছে নিস্পন্দ হয়ে।

ভোগবতী বাহ্যজ্ঞানশূন্য। সে মাঝে মাঝে কেবল মড়ার খুলিটাকে চুম খাচ্ছে। যে লোকটি শূন্য থেকে নেমে এসেছে, তার সম্বন্ধেও সে উদাসীন। তখন সেই লোকটির ভিতর থেকে শোঁ-শোঁ শব্দ বেরুতে লাগল। তখন ভোগবতী তার দিকে চেয়ে দেখল।

"কে তুমি?"

"আমি মহাঝঞ্ঝা। বরুণ দেবের আদেশে আপনার কাছে এসেছি। আপনি যা বলবেন, তাই আমি করব।"

"আমি প্রতিশোধ নিতে চাই। রত্নাকর, অব্ধি আর তাপ্তি আমাকে অপমান করেছে। আমাকে না নিয়ে ময়ূরপংখী ভাসিয়ে প্রকাণ্ড নৌবহর নিয়ে সমুদ্রযাত্রা করেছে তারা। তুমি বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড় তাদের উপর। তাদের নিশ্চিহ্ন করে দাও। তারা বুঝুক যে ভোগবতীকে উপেক্ষা করা যায় না।"

লোকটি বলল— "বেশ তাই হবে।" বলেই সে অন্তর্ধান করল। তারপরেই আবির্ভূত হল আর

একজন। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মূর্তি তার। অমাবস্যার অন্ধকারের সঙ্গে তার দেহটা যেন একাকার হয়ে গেছে। চোখ মুখ দেখা যাচ্ছে না। তার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎস্ফুরণ হচ্ছে মাঝে মাঝে।

"তুমি কে?"

"আমি মহামেঘ। আমাকে দেবরাজ ইন্দ্র আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি আমাকে যা আদেশ করবেন—আমি তাই করব। আপনি মহাঝঞ্ঝা দেবকে এখুনি যে আদেশ দিলেন তা আমি শুনেছি। আমাকেও কি তাই করতে হবে?"

"হ্যাঁ, তাই করতে হবে। ময়ূরপংখী আর নৌবহর আমি ধ্বংস করতে চাই। তুমি মহাঝঞ্ঝা দেবের সহকারী হও—।"

"আপনার আদেশ বর্ণে বর্ণে পালিত হবে।"

মহামেঘ অন্তর্ধান করল।

ভোগবতী অট্টহাস্য করে উঠল। তারপর চিৎকার করে বলতে লাগল— "রক্তদশনা মহাকালী এবার আমাকে ধ্বংস কর। আমার এই যৌবন, আমার এই রূপ, আমার এই হাস্য-লাস্য, অন্ধিকে বাঁধতে পারেনি। রত্নাকরকে মুগ্ধ করেনি। এ সব ধ্বংস কর, ধ্বংস কর।" তার মাথায় যে রক্ত গোক্ষুর ফণা তুলে বসেছিল সে দংশন করল ভোগবতীকে। আর সেই নিস্তব্ধ বাঘ দুটো লাফিয়ে পড়ল তার উপর। ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তার দেহ। তারপর ভীষণ একটা শব্দ হল। শ্মশানের খানিকটা ফেটে গেল। ফেটে গিয়ে বসে গেল সেটা, ভোগবতী পাতালে চলে গেল।

।। আঠারো ।।

তিন্তিড়ী বিমর্ষ হয়ে বসেছিল নিজের ঘরে। সমুদ্রের উপর যে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে তার ঝাপটা এ অঞ্চলেও এসেছে। সমুদ্রের উপর ঝড়-বৃষ্টির যে তুমুল তাণ্ডব হয়ে গেছে সে খবরও পেয়েছে তিন্তিড়ী। রত্নাকর তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তার জন্যে উৎকৃষ্ট গাঁজা সে নিয়ে আসবে। কিন্তু সমুদ্রের উপর দিয়ে যে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে তার কবল থেকে রত্নাকরের নৌবহর রক্ষা পেয়েছে কি? এ অঞ্চলের অনেক লোক গেছে রত্নাকরের সঙ্গে। সকলের বাড়িতে কান্নার রোল উঠেছে। অবশ্য সঠিক খবর কেউ পায়নি। সেকালে খবরের কাগজ ছিল না। তবে সকলেই ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। তিন্তিড়ীর আর একটা অসুবিধা হয়েছে।। গাঁজার খদ্দের অনেক কমে গেছে। অনেক গাঁজাখোর চলে গেছে রত্নাকরের সঙ্গে। তার ভাণ্ডারে গাঁজাও বাড়ন্ত। এমন লোক পাওয়া যাচ্ছে না যে রাখম্‌পুরের বাজার থেকে গাঁজা এনে দেয়। খুব ভালো গাঁজা অবশ্য খানিকটা আছে, কিন্তু সে গাঁজার দাম এত বেশি যে তার চাহিদা বেশি হয় না। গাঁজাটা কড়াও খুব। অনেকে সহ্য করতে পারে না। ঝানু গাঁজাখোর হরিশচন্দ্র দ্বিবেদী একটান খেয়ে তিনদিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। তিন্তিড়ী ঘরে বসে এইসব ভাবছিল। এমন সময় হুম, হুম, হুম করে ডেকে উঠল পেঁচাটা। তিন্তিড়ী বুঝল রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ভাবল এবার কপাট বন্ধ করে শুয়ে পড়া যাক। যদিও শুলে এখন ঘুম আসবে না, কিন্তু তবু শুয়ে পড়াই ভালো। চোখ বুজে মহেশ্বরের ধ্যান করতে করতে ঘুম এসে যাবে একটু পরে। কপাট বন্ধ করতে গিয়ে দেখে কপাটের সামনে কমণ্ডলু হাতে ভৃঙ্গী দাঁড়িয়ে আছে। কুচকুচে কালো রং। তিন্তিড়ীকে দেখে ভৃঙ্গী আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি হাসলেন। মনে হল একটা

কুচকুচে কালো বড় মুক্তকেশী বেগুনের পেটটা কেটে কি যেন ফাঁক করে দিল সেটা।

"কি তিন্তিড়ী আমাকে চিনতে পারছ?"

তিন্তিড়ী তৎক্ষণাৎ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল তাঁকে।

"আপনাকে কি ভুলতে পারি। আপনাকে গঞ্জিকা সেবন করিয়ে কৃতার্থ হয়েছিলাম একদিন।"

"আজও খাওয়াও। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। অনেক জায়গায় ঘুরতে হয়েছে মহেশ্বরের আদেশে। প্রথমে গেলাম মন্দর পর্বতের সম্মতি নিতে। অনেক ইতস্তত করে তিনি সম্মতি দিলেন। তারপর গেলাম অনন্তনাগের কাছে। অনন্তনাগের সম্মতি পেয়ে গেলাম সহজে। তারপর গেলাম মহাকুর্মের কাছে। তিনিও সম্মতি দিলেন। এখন যেতে হবে সুমেরু পর্বতে। সেখানে মহেশ্বর, বিষ্ণু, আর ব্রহ্মা আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তাদের খবর দিতে হবে—যে এঁরা তিনজনই অবশেষে সম্মত হয়েছেন। প্রথমে রাজি হচ্ছিলেন না—।"

"ব্যাপার কি, বুঝতে পারছি না।"

"সমুদ্র-মন্থন হবে।"

"সমুদ্র-মন্থন? কেন?"

"দেব এবং দৈত্যেরা মহাদেবকে গিয়ে ধরেছিলেন—আমরা সুধাপান করে অমর হতে চাই, আপনি তার ব্যবস্থা করুন। মহাদেব বললেন, প্রত্যেক জিনিসই নিজের বীর্যবলে অর্জন করতে হয়। সুধা আছে সমুদ্রের তলায়। সমুদ্র-মন্থন করো, সুধা পাবে। দেবতারা দৈত্যরা একথা শুনে হকচকিয়ে গেল। বলল—সমুদ্রকে মন্থন করব কি করে? মহাদেব বললেন, আচ্ছা, ভেবে বলছি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সুমেরু পর্বতে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগলেন কি করে এ দুরূহ কাজ সম্ভব করা যায়। সভার পর সভা বসতে লাগল। ভালো কথা, তুমি আগে এক কলকে সাজো দেখি। বড় ক্লান্ত লাগছে। এক টান দিয়ে তারপর বাকিটা বলব।—"

ভৃঙ্গী ঘরের ভিতর ঢুকে তিন্তিড়ীর খাটের উপর বসলেন। তিন্তিড়ী তখন লক্ষ্য করল ভৃঙ্গীর সর্বাঙ্গে বড় বড় লোম রয়েছে। গোঁফ দাড়ি তো আছেই। তিন্তিড়ী তাড়াতাড়ি একটা বড় কলকে নিয়ে সাজতে বসে গেল।

প্রকাণ্ড একটা টান দিয়ে দম বন্ধ করে বসে রইলেন ভৃঙ্গী। তারপর আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন নাক দিয়ে। সব ধোঁয়া যখন বেরিয়ে গেল তখন তিন্তিড়ীর পিঠ চাপড়ে বললেন— "বাঃ, খাসা মাল রেখেছ তুমি। এক টানেই চাঙ্গা করে দিয়েছে আমাকে। আমার গাঁজা একদম ফুরিয়ে গেছে। দীর্ঘজীবী হও।"

"আপনার গল্পটা এবার বলুন।"

"গল্প কি হে, এ সত্যি কথা। শোন তবে। ওঁরা তিনজনে মিলে শেষে ঠিক করলেন যে মন্দর পর্বত ছাড়া আর কেউ মন্থন-দণ্ড হতে পারবে না। মন্দর পর্বত এগারো হাজার যোজন উঁচু, আর মাটির নীচেও পোঁতা আছে এগারো হাজার যোজন। কিন্তু এ পর্বতকে তুলে সমুদ্রের ধারে আনবে কে? আর মন্থন-রজ্জুই বা কোথা পাওয়া যাবে?"

বিষ্ণু বললেন—পরম ভক্ত অনন্তনাগ মহাতপস্বী এবং মহাশক্তিশালী। সে যদি রাজি হয় মন্দর পর্বতকে উপড়েও আনতে পারবে। মন্থন রজ্জুও হতে পারবে। মহেশ্বর যদি অনুরোধ করেন তাহলে সে সম্ভবত রাজি হয়ে যাবে। ব্রহ্মা এইবার বাগড়া লাগালেন। বললেন, সমুদ্র মন্থন করলে কত প্রাণী

হত্যা হবে তা হিসেব করেছ? এরা সুধা খেয়ে অমর হবে বলে আমার সৃষ্টিটা কি তোমরা তছনছ করে দেবে? সমুদ্র মন্থন করলে তো মহাপ্রলয় হবে। সমুদ্রের ভিতর যে সব অপূর্ব প্রাণী আমি সৃষ্টি করেছি একটাও বাঁচবে না। আর একটা কথা তোমরা ভেবে দেখছ না। আমার চোখে দেবতা আর দৈত্য দুইই সমান। অদিতি এবং দিতির বংশধর এরা। কিন্তু দৈত্যরা বেশি বলবান। তারা যদি সুধা পান করে অমর হয় তাহলে তো দেবতাদের মেরে ছাতু করে দেবে। তারা মরবে না, ছাতুর স্তুপ হয়ে থাকবে। সেটা কি বাঞ্ছনীয়? ভালো করে ভেবে দেখ তোমরা।

মহেশ্বর বললেন—বেশ ভেবে দেখা যাক। কিন্তু এর আর একটা দিক আছে। দেবতাদের মধ্যে এবং দৈত্যদের মধ্যে অনেকে আমাদের পরম ভক্ত। অনেককে আমি খুব ভালোবাসি। তাদের একটা আবদার যদি রক্ষা করতে না পারি তাহলে দেবাদিদেব হয়েছি কেন? শূন্যকুম্ভ হয়ে পূর্ণকুম্ভের অভিনয় আমি করতে পারব না। আমার আত্মসম্মান রক্ষা করবার জন্য আমি একটা কেন দশটা মহাপ্রলয় করতেও পিছুপা নই। বিষ্ণু বললেন—আচ্ছা ভেবে দেখা যাক। এইভাবে সভার পর সভা হতে লাগল। কিন্তু কোনো মীমাংসা হয় না। ব্রহ্মা শেষে বললেন— আমরা মহেশ্বরের উপর ভার দিয়ে দিচ্ছি, সেই যা ভালো মনে করে করুক। একটা সৃষ্টি ধ্বংস করে ফেললে আর একটা অভিনব সৃষ্টি আমি করতে পারব। কিন্তু আর সভার পর সভা আমি করতে পারব না। আমি চললাম। ব্রহ্মা চলে যাবার পর বিষ্ণু বললেন—আপনি যা ঠিক করবেন তা আমিও মেনে নেব। মহাদেব চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন—আচ্ছা ভেবে দেখি। এই নিয়ে ভাবাভাবি দিন কয়েক চলল। মহাদেব হঠাৎ কাল আমায় আদেশ দিলেন—তুমি গিয়ে ভালো করে জেনে এস মন্দর পর্বত, অনন্তনাগ আর মহাকূর্ম ঠিক রাজি আছে কিনা।

"মহাকূর্ম কি করবে?"

"মহাকূর্ম বিরাট বিশাল কাছিম একটা। সে সমুদ্রের ভিতর নেবে যাবে। তারপর অনন্তনাগ মন্দর পর্বতকে তার উপর বসিয়ে জাপটে ধরবে তাকে। তারপর মুখের দিকে দৈত্যরা আর ল্যাজের দিকে দেবতারা ধরে মন্থন করবে সমুদ্রকে। আমি আজ ওদের তিনজনের কাছে গিয়েছিলাম। ওরা সম্মত হয়েছে। এই খবরটি মহাদেবকে দিতে যাচ্ছি। তুমি আর এক কলকে সাজ।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, দিচ্ছি। এতবড় একটা কাণ্ড হবে, আমি দেখতে পাব না?"

"তুমি দেখতে চাও, তোমাকে দেখাব। নিয়ে যাব তোমাকে সুমেরু পর্বতে। সেখানে বসে সব দেখতে পাবে তুমি। তবে কবে যে মন্থন শুরু হবে তা তো জানি না। মহেশ্বর যেদিন ঠিক করবেন সেইদিনই হবে। সেইদিন তোমাকে সুমেরু পর্বতে নিয়ে যাব।"

"আমি কি যেতে পারব?"

"আমার অনেক চেলা আছে। তারা তোমাকে কাঁধে করে নিয়ে যাবে। তুমি ভেবো না। তাড়াতাড়ি সেজে ফেল আর এক কলকে। আমাকে এখন কৈলাসে যেতে হবে। মহেশ্বর সেখানে আমার অপেক্ষায় বসে আছেন।"

তিন্তিড়ী তাড়াতাড়ি আর এক দলা গাঁজা হাতে নিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে দলতে লাগল।

।। উনিশ ।।

ব্রাহ্মণী নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল তার ঘরে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অন্ধকার নেমেছে চারদিকে। তার মনে যে বিপ্লব চলছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা শক্ত। মাটিতে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে তার কপাল রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। নিজের দাঁত দিয়ে দুহাত কামড়ে কামড়ে হাত দুটোকেও ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছিল। নিজেকে শাস্তি দিচ্ছিল সে। সে এখন নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছিল সে অসতী। পারাবারের মত দেবচরিত্র লোকের স্ত্রী হবার যোগ্যতা তার নেই। সে সারাজীবন স্বামীর সঙ্গে ভণ্ডামি করে এসেছে। যদিও রত্নাকর কোনো দিন তার অঙ্গ স্পর্শ করেনি, তবু মনে মনে সে তাকে অহরহ কামনা করছে। সে মনে মনে অসতী। হঠাৎ সে নিজের গালে ঠাস্ ঠাস্ করে চড় মারতে লাগল। ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল তার দুচোখ দিয়ে। কপালের রক্ত আর চোখের জল মিশে সমস্ত মুখটা বীভৎস হয়ে উঠল।

হঠাৎ সে দেখতে পেল পারাবার তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অশরীরী স্বচ্ছ পারাবার। চিৎকার করে উঠল ব্রাহ্মণী—"তুমি ছুঁয়ো না আমাকে। আমি অসতী, আমি ছাগী, আমি কুক্কুরী। আমি পাপীয়সী। আমাকে স্পর্শ কোর না। তুমি কবি, তুমি সুন্দরের উপাসক, তুমি স্রষ্টা, আমি তোমার যোগ্য সহধর্মিণী হতে পারিনি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর—" ক্রমাগত মাথা কুটতে লাগল সে। তারপর অজ্ঞান হয়ে গেল।

পরদিন সকালে সবাই দেখল ব্রাহ্মণী আত্মহত্যা করেছে। ঘরের আড়কাটা থেকে তার উলঙ্গ দেহটা ঝুলছে। নিজের শাড়ি পাকিয়ে গলায় দড়ি দিয়েছে সে।

জলধির স্ত্রী নর্মদা তার স্বামীর ওষুধগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখছিল।

সে-ই দিবারাত্রি খেটে এসব তৈরি করেছিল। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রতি তার অনুরাগ আছে বলেই নয়, করেছিল সে স্বামীকে ভালোবাসে বলেই। তার খামখেয়ালী স্বামী যে কত বড় প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, কত বড় পণ্ডিত, কত রকম নূতন ওষুধের স্রষ্টা তা সে জানত। আদা, নিম, মধু, আর গোলমরিচ দিয়ে সে যে অদ্ভুত বড়ি তৈরি করেছিল তাতে বহু রোগী দুরারোগ্য অজীর্ণ রোগ থেকে মুক্ত হয়েছে— তা এ অঞ্চলের সবাই জানে। কত রকম অদ্ভুত অদ্ভুত ওষুধ সে আবিষ্কার করেছে। আবিষ্কার করবার জন্য দিবারাত্রি কত পড়াশোনা করেছে তা নর্মদার থেকে আর বেশি কে জানে। লেখাপড়ায় ব্যস্ত স্বামীকে দেখলে তার মনে হত ও সাধারণ লোক নয়—ও তপস্বী। চিকিৎসা জগতের দুর্গম অরণ্যে তন্ময় হয়ে বিচরণ করতে দেখেছে তাকে নর্মদা। জোর করে তাকে নাওয়াতে হত, খাওয়াতে হত। এই একনিষ্ঠ সত্য-সন্ধী দেবতাকে সত্যিই ভক্তি করত নর্মদা। তাঁর আদেশে তাই সে অনেক কটুগন্ধ ভেষজ বেটেছে, কুটেছে, সিদ্ধ করেছে—তার কষ্ট হত খুব, তবু সে করেছে স্বামীকে ভক্তি করত বলে, ভালোবাসত বলে।

রত্নাকরকেও সে ভালোবাসত। সে ভালোবাসায় কোনো লুকোচুরি ছিল না, গ্লানি ছিল না। রত্নাকরের রূপে, গুণে, ভদ্রতায় সে মুগ্ধ হয়েছিল। তার সান্নিধ্য তার ভালো লাগত। তার কাছে গেলে মনে হত কোনো সুগন্ধ ফুলবাগানে সে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতে দোষ কি? মহারাজা এরকম একটা আদেশ দিলেন কেন? তাপ্তিকে বিশেষ অনুমতি দিয়েছেন, আর কাউকে দেননি কেন? এছাড়া তিনি মহারাজা হয়েছেন বলে কি আমাদের স্বাধীনতা হরণ করবেন? আমরা কি তার বাঁদী? মানব না তাঁর এ আদেশ। সমুদ্রযাত্রা তিনি করতে দেবেন না? আমি সমুদ্রের ধার দিয়ে পায়ে হেঁটে যাব। দিবারাত্রি হাঁটব।

মহেশ্বরের রাজত্ব পার হয়ে গিয়ে নৌকো ভাড়া করব। সেই নৌকো করে আমি রত্নাকরের নৌবহরকে ধরবই।

"ফাগুন—"

ডাক শুনে তাদের বাগানের মালী ফাগুন এসে দাঁড়াল। বলিষ্ঠকায় প্রৌঢ় শবর একজন।

"তুমি এই বাড়ি নিয়ে থাকো। আমাদের জমি থেকে যা আয় হয় তা তোমরাই নিও। আমি কিছুদিনের জন্য ভ্রমণে বেরুচ্ছি—।"

"যে আজ্ঞে। আমি ভার নিলাম। আপনি কিসে যাবেন?"

"আমি হেঁটে যাব। তোমার কাছে টাকাকড়ি আছে তো?"

"আছে—।"

"গাছপালাগুলোতে সার জল দিও। আকন্দ গাছে অনেক ফুল হয়েছে। সেগুলো তুলে শুকিয়ে রেখে দিও।"

"রাখব।"

ফাগুন চলে গেল। নর্মদা পেটিকা থেকে কিছু অর্থ বার করে এক বস্ত্রে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। হন হন করে হাঁটতে লাগল হিরণ্ময়ী নদীর দিকে। হিরণ্ময়ী সাগরে গিয়ে মিশেছে।

অম্বুধির স্ত্রীর ইরাবতী এবং তার বিধবা বোন হঠাৎ যেন বেকার হয়ে পড়েছে। তাদের দুজনেরই মনে হল মস্ত বড় একটা দাঁও ফসকে গেল যেন। রত্নাকরের মত ধনী দিলদরিয়া রূপবান লোকের সঙ্গে তার ময়ূরপংখীতে চেপে দীর্ঘকাল সমুদ্রের উপর ভাসতে ভাসতে যে মজা তারা লুটবে ভেবেছিল তা হঠাৎ নাগালের বাইরে চলে গেল। কাবেরীর মনোভাব মৎস্যশিকারীর মত। সে মনে মনে কল্পনা করছিল যে একটা বড় রুইমাছ তার বঁড়শি গিলেছে, আস্তে আস্তে এবার খেলিয়ে তুলতে হবে। হঠাৎ মাছটা যে এক ঝটকায় সুতো ছিঁড়ে পালাবে এ সে ভাবতেও পারেনি। রত্নাকরের নৌবহর যখন চলে গেল তখন ইরাবতী বুক চাপড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। কাবেরী কাঁদল না। ঠোঁটের উপর ঠোঁট চেপে বসে রইল নীরব হয়ে। চোখের দৃষ্টি থেকে আগুনের হলকা বেরুতে লাগল। সে ঠিক করে ফেলল এখানে আর থাকবে না। নিজের শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবে। সেখানে তার এক বিপত্নীক দেওর আছে। আছে যদু পুরোহিতের ছেলে মাধব। আছে জমিদার নায়েব কান্তি-শশাঙ্ক। এদের অতি মনোযোগের ধাক্কাতেই সে পালিয়ে এসেছিল তার দিদির কাছে। এসে দেখেছিল রত্নাকরকে। দেখে মজেছিল। কিন্তু রত্নাকর ফসকে গেল। এখন শ্বশুরবাড়িতেই ফিরে যাওয়া যাক। যৌবন তো চিরকাল থাকবে না। দেহ বুভুক্ষিত, মন পিপাসিত। এখানে থেকে লাভ কি।

সে ইরাবতীকে বলল— "দিদি, আমি রঙ্গনপুরে ফিরে যাচ্ছি। এখানে আর ভালো লাগছে না।"

ইরাবতী চুপ করে রইল। তারপর বলল— "যেতে চাও, যাও। আমি তোমাকে বারণ করব না। তুমি নিজেই এসেছিলে, নিজেই চলে যাচ্ছ। আমার বলবার কিছু নেই।"

"তুমি কি করবে?"

"আমি স্বামীর ভিটে আঁকড়ে পড়ে থাকব। আমাদের এত জমি, এত বড় গুড়ের ব্যবসা—তাই নিয়েই থাকব আমি।"

কাবেরী যখন চলে গেল, তখন চুপ করে বসে রইল ইরাবতী। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তার অসমর্থ অসহায় স্বামীকে সে তার পাণ্ডিত্যের জন্য খুব শ্রদ্ধা করত। শুধু জ্যোতিষ শাস্ত্রেই নয়,

সংস্কৃত সাহিত্যেও বিরাট পণ্ডিত অম্বুধি। বিবাহের পর ইরাবতীকে সংস্কৃত পড়িয়েছিলেন, জ্যোতিষশাস্ত্রও শিখিয়েছিলেন কিছু কিছু। ইরাবতী তাঁর পত্নীই নয় কেবল, শিষ্যাও ছিল। ইরাবতী সত্যিই শ্রদ্ধা করত তাঁকে। সে তার প্রণয়িনী হতে পারেনি। সে তাকে ভালোবাসত, কিন্তু সে ভালোবাসায় প্রণয়ের উন্মাদনা ছিল না, ছিল জননীর স্নেহের স্নিগ্ধতা। ওই পঙ্গু অসহায় বিদগ্ধ লোকটিকে ঘিরে তার মাতৃত্বই যেন সদাজাগ্রত ছিল। রত্নাকরকে প্রথম যেদিন সে দেখে সেদিনই সে প্রথম বুঝতে পেরেছিল প্রেম কি। স্পর্শমণির স্পর্শে লোহা যেমন নিমেষে সোনা হয়ে যায়, অনেকটা তেমনি হল যেন তার। তাকে ঘিরে সে কত সোনার স্বপ্নই যে রচনা করেছে। আশা ছিল এই সমুদ্র যাত্রায় সে তার আর একটু কাছে আসতে পারবে। হয়ত তার হৃদয়ও জয় করতে পারবে। রাজার আদেশে হঠাৎ নাগালের বাইরে চলে গেল সব। রত্নাকর আবার কবে ফিরবে, তার স্বামীর সঙ্গে আর দেখা হবে কিনা এ সবই কেমন যেন অনিশ্চিতের অন্ধকারে আবৃত হয়ে গেল। শোনা যাচ্ছে সমুদ্রে নাকি ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেছে। রত্নাকরের নৌবহর সে ঝড়ে ছিন্ন-ভিন্ন হয়েছে কি না কে জানে। ইরাবতীর মন যেন দিশাহারা হয়ে পড়ল। যার জন্যে এত আশা করে বসে আছি সে কি আর আসবে না? সহসা জয়দেবের গীতগোবিন্দের কথা মনে পড়ল—

পততি গতত্রে বিচলিত পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপযাণং
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং
পশ্যতি তব পন্থানম্।

এই শ্লোকটি মনের মধ্যে গুঞ্জরন করে উঠল সহসা। তন্ময় হয়ে আবৃত্তি করতে লাগল সে কবিতাটি। তার মনে হল তার দয়িতকে সে ওই কবিতার মধ্যেই যেন পেয়েছে। রত্নাকরই যেন বনমালী, তার অপেক্ষায় যমুনাতীরে নির্জন কুঞ্জবনে শয্যা রচনা করে অপেক্ষা করছে। তার মানস লোকের সেই যমুনাতীরে সে মনে মনে চলে গেল, দেখতে লাগল রত্নাকর তার অপেক্ষায় বসে আছে। তার জন্যে শয্যা রচনা করেছে—। কাব্যের ভিতর দিয়ে রত্নাকরের নিবিড় সান্নিধ্য পেয়ে অভিভূত হয়ে গেল ইরাবতী। তারপর সহসা একটা পথও পেয়ে গেল সে। কাব্যের ভিতর দিয়েই সে রত্নাকরকে স্পর্শ করবে। খুঁজে খুঁজে বের করল গীতগোবিন্দ, মেঘদূত, আর অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, স্বপ্নবাসবদত্তা। ঠিক করল এদের ভিতর দিয়েই মিলিত হব রত্নাকরের সঙ্গে। কোনো রাজার আদেশ সে মিলনে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। সে মেঘদূত খুলে বসল।

বিতস্তাও হতাশ হয়েছিল। কিন্তু তার বেশি মন কেমন করছিল তার মল্লবীর স্বামীর জন্যে। বিতস্তাকে নিয়ে লোফালুফি করত সে। যখন বুকে চেপে ধরত—মনে হত পিষে ফেলবে বুঝি। দম বন্ধ হয়ে যেত। তার জীবনের সাধনা ছিল শক্তি। সে মনে করত যার শক্তি নেই, সে অমানুষ, সে কৃপার পাত্র। সে বার বার বলত—শক্তির উপরই মহত্ত্বের আসন। শক্তিই পৃথিবীতে সমস্ত মহত্ত্বের ভিত্তি। শক্তিই পৃথিবীতে একমাত্র কাম্য। বিতস্তাকে মাঝে মাঝে বলত— তোমার বিতস্তা নামটা খারাপ নয়, কিন্তু একটু শৌখীন গোছের। তোমার নাম কালী, দুর্গা বা জগদ্ধাত্রী হলে আমি আরও খুশি হতাম। সারাজীবন শক্তির চর্চাই করেছে সে। তার এই বীর শক্তিমান স্বামীকে সে নিত্য নূতন রকম রান্না করে খাওয়াত। সাগর একটি জিনিস খেত রোজ। কোনোদিন ডাল, কোনোদিন পায়েস,

কোনোদিন ছানার ডালনা— রোজ নূতন কিছু হওয়া চাই। তার একটি প্রকাণ্ড রুপোর গামলা ছিল। সেই গামলায় এক গামলা খাবার দিতে হত তাকে। যেদিন মাংস খেত সেদিন তার জন্য আলাদা একটি ছাগ-শিশু বলি দিতে হত মা-কালীর মন্দিরে। পুরোটাই খেয়ে ফেলত সে। তার এই স্বামীর জন্যেই বেশি কষ্ট হতে লাগল তার।

বিতস্তা শ্যামবর্ণা, ছিপছিপে গড়ন, অপরূপ মুখশ্রী, এক পিঠ চুল। হাসিটি সুন্দর, দাঁতগুলি মুক্তোর মত। চোখের দৃষ্টি স্বপ্নময়। সে শিল্পী। কি করে তার স্বামীকে নিত্যনূতন খাবার খাওয়াবে এই চিন্তাই তার একমাত্র চিন্তা ছিল এতদিন। কিন্তু সে রত্নাকরকেও ভালোবেসেছিল। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের মধ্যে সে দেখত রত্নাকরকে। শুধু দেখত না, পুজো করত মনে মনে। সে পুজোর মধ্যে কাম বা লালসা হয়তো প্রচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু সেইটাই তাকে অভিভূত করেনি। অজ্ঞাতসারে সে সব কথা তার মনেও হয়নি কখনও। মনে মনে সে সবিস্ময়ে চেয়ে থাকত—ওই সূর্যেরই দিকে। মনে মনে বলত— তুমি সুন্দর, তুমি উজ্জ্বল, তুমি মহৎ, তুমি বৃহৎ, তুমি জ্যোতির উৎস। তুমি বর্ণের জন্মদাতা। তোমার কাছে আসতে পেরেছি, তোমাকে রেঁধে খাইয়েছি, তুমি আমাকে বন্ধুপত্নীরূপে সমাদর করেছ, এতেই আমি ধন্য। তুমি আমাকে তোমার ময়ূরপংখীতে নিয়ে সমুদ্রযাত্রা করবে বলেছিলে—যা আমার সুদূরতম কল্পনার অতীত ছিল, সেই সম্ভাবনার আশ্বাস দিয়েছিলে তুমি। আনন্দে আত্মহারা করেছিলে আমাকে। হঠাৎ সব ভেঙে গেল। এই সব কথাই সে ভাবছিল বসে বসে। এমন সময় বান্ধবী উল্‌কি এল।

"আজ রান্নাঘরে যাওনি যে—"

"কার জন্যে রাঁধব বল। যার জন্যে রোজ রান্নাঘরে যেতাম সে তো আমাকে ফেলে চলে গেছে।"

উল্‌কি তার পাশে এসে বসল। চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। সে কুম্ভকারকন্যা। কুমারী এবং শিল্পী। পুতুল গড়ে, প্রতিমা গড়ে, মূর্তি গড়ে। এই জন্যেই বিতস্তার সঙ্গে তার ভাব। বিতস্তার শিল্পীমন মুগ্ধ হয়েছিল উল্‌কির শিল্প-প্রতিভা দেখে। গরিবের মেয়ে উল্‌কি। বিতস্তার কাছেই সে খায় দু-বেলা। রাত্রে শোয় তার পিসেমশায়ের বাড়িতে। পিসেমশাই বিশ্বম্ভর মাটির বাসন তৈরি করে নানারকম। তার বাবাও বিতস্তার বাড়িতে খায়। অনেক লোক খায় সাগরের বাড়িতে। তাদের জন্য আলাদা রন্ধন-শালা আছে, আলাদা রাঁধুনি আছে।

উল্‌কি হঠাৎ বলল— "তুমি এতদিন আমাকে রেঁধে দিয়েছ। আজ আমি তোমাকে রেঁধে খাওয়াই। কেমন?"

"খাওয়াও। আমার নিজের কিছুই করতে ইচ্ছে করছে না। কি রাঁধবি তুই?"

"আমি তো তোমার মত রাঁধতে পারব না। মটরশুঁটি দিয়ে মুগের ডালের খিচুড়ি রাঁধি। আর তার সঙ্গে ব্যাসন দিয়ে বেগুনি। তোমাদের রান্নাঘরে মৌরলা মাছ এসেছে দেখলাম। সেখান থেকে তাই নিয়ে আসি কিছু। খিচুড়ির সঙ্গে মৌরলা মাছ ভাজা—।"

"উনি না ফেরা পর্যন্ত মাছ আমি খাব না। তবে তোর যদি খেতে ইচ্ছে হয় নিয়ে এসে ভাজ

"তুমি সধবা মানুষ, মাছ খাওয়া ছেড়ে দেবে? স্বামীর অমঙ্গল হবে যে তাতে।"

"আমার কেন যেন মনে হচ্ছে উনি আর বেঁচে নেই। রত্নাকরের নৌ-বহর ঝড়ে ডুবে গেছে। রত্নাকরও বেঁচে নেই। তাঁকেও ভালোবাসতাম দেবতার মত। আমার স্বামীকে আগে খাইয়ে তবে

আমি খেতাম। ভালো খাবার করলেই পাঠিয়ে দিতাম রত্নাকরকে। তাঁদের জন্যেই রান্না করতাম। ওঁরা ভালো বললে আমার কি আনন্দ যে হত তা তোকে বোঝাব কি করে? আমার নিজের জন্যে কোনো ভালো রান্না আমি আর করব না এজীবনে। কারণ আমার মনে হচ্ছে তাঁরা আর ফিরবেন না।"

উল্‌কি বলল— "আমার গুরু-ঠাকুর বলেন মানুষের দেহটাই মরে যায়। আত্মার মৃত্যু নেই। তিনি একদিন বলছিলেন আমরা মাটির ঠাকুরের ভিতর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করি ভক্তির জোরে। ভালোবাসার টানে দেবতা যদি আসতে পারেন মানুষও পারবে না কেন?"

উৎসুক হয়ে উঠল বিতস্তা। বলল—"দেবতারা মাটির প্রতিমায় আসেন এটা কি সত্যি?"

"সত্যি! আমি দেখেছি আমার ঠাকুরমশাই যখন তাঁর ইষ্টদেবতা নারায়ণকে প্রণাম করেন তখন নারায়ণ ঝুঁকে আশীর্বাদ করেন তাঁর মাথায় হাত দিয়ে। আমি আড়াল থেকে দেখেছি একদিন।"

"সত্যি?"

"সত্যি। আমি তোমার স্বামীর মূর্তি গড়ব। তুমি তাঁর সামনে বসে ধ্যান কর। আমার বিশ্বাস তিনি আসবেন আমার মূর্তির ভিতর। তখন তুমি তাঁকে রান্না করে ভোগ দিও তারপর তাঁর প্রসাদ পাব আমরা দুজনে।"

"তুই পারবি মূর্তি গড়তে?"

"নিশ্চয় পারব।"

"রত্নাকরের মূর্তি?"

"তা-ও পারব।"

"তাহলে দুটো মূর্তি গড়। রত্নাকরকেও আমি ভালোবাসি তাঁকেও রান্না করে খাইয়েছি। তাঁর জন্যেও মন কেমন করছে—।"

"বেশ, দুজনেরই মূর্তি গড়ে দেব আমি। তুমি তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কর।"

"মূর্তি করতে তো সময় লাগবে।"

"তা লাগবে বই কি—।"

"তা হলে আজ থেকেই শুরু কর। যতদিন না মূর্তি তৈরি হচ্ছে ততদিন আমি দুধ আর ফল খেয়ে থাকব। মূর্তি তৈরি হলে রান্নাঘরে ঢুকব। তুই কি খাবি? আমি রাঁধুনিকে ডেকে পাঠাই—।"

"আমিও দুধফল খাব।"

"চল তাহলে তোর বাড়িতে যাই। দুজনেই আরম্ভ করে দিই।"

"মূর্তি তোমার বাড়িতেই গড়ব। আগে মাটি তৈরি করতে হবে। আমি মাটি নিয়ে আসি। একটা চাকর বরং দাও আমার সঙ্গে। দু-ঝুড়ি মাটি আনতে হবে। আমি এক ঝুড়ি আনব। আর—"

"আর এক ঝুড়ি আমি। চল আর দেরি করিসনি। আজই আরম্ভ করতে হবে।"

দুজনেই বেরিয়ে পড়ল। সাগরের ঘরের বারান্দায় সেইদিনই শুরু হয়ে গেল মূর্তি তৈরি। উল্‌কির নির্দেশমত বিতস্তাও সাহায্য করতে লাগল তাকে। বিতস্তার সমস্ত মন শুধু একাগ্র নয়, পুষ্পিত হয়ে উঠল যেন। তারপর মূর্তি দুটি যখন আস্তে আস্তে মূর্ত হতে লাগল, বিতস্তা দুরুদুরু-বক্ষে নির্নিমেষে চেয়ে রইল তাদের দিকে। আসবে কি সত্যি ওরা?

মন্দাকিনী স্বল্পভাষিণী। সে একেবারে নির্বাক হয়ে গেল। আশ্রমের সঙ্গিনী তিনজন—গঙ্গা, যমুনা,

সরস্বতী—হতাশ হয়েছিল, কিন্তু অতটা মুষড়ে পড়েনি। তারা আশ্রমের কাজকর্ম বন্ধ করেনি। রান্নাবাড়া করছিল, আশ্রম পরিষ্কার রাখছিল, মাঠে যাওয়া বন্ধ করেনি। মন্দাকিনী একেবারে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। সে ফুরিয়ে গিয়েছিল। যন্ত্রচালিতবৎ স্নানাহার করছিল সে। চোখ বুজে শুয়েও থাকত সে অনেকক্ষণ, ঘুমোত না কিন্তু। কথা বলছিল না একেবারে। সে ভাবছিল এবার তার কি করা উচিত। সে একদিন রাজকন্যা ছিল। একটা বিষাক্ত সাপের দংশনে নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিল তার জীবন। সন্ন্যাসী অর্ণব তাকে বাঁচালেন, বিবাহ করলেন, সন্ন্যাসিনী জীবনে দীক্ষিত করলেন, তার বাবাকে বললেন—রাজকন্যারূপে আপনার কন্যার আয়ু নিঃশেষ হয়ে গেছে। সন্ন্যাসিনীরূপে সে এখন বেঁচে থাকতে পারে।

লোহিতরাজ্য থেকে নিয়ে এলেন তাকে এখানে। তারপর যা ঘটল তা আশ্চর্য। তা অলৌকিক। তাকে সেবা করবার জন্য হিমালয়কন্যারা নেমে এলেন। তার ভরণপোষণের জন্য পরম গুণবান, পরম রূপবান রত্নাকর প্রচুর জমি দান করলেন তাঁকে, আশ্রম বানিয়ে দিলেন। মহাতপস্বী অর্ণবের নাগাল পাওয়ার জন্য সে দিবারাত্রি কৃচ্ছ্র-সাধন করতে লাগল। চিরকাল আদরে লালিত রাজকন্যা ভূমিশয্যায় শুয়েছে, একবেলা আহার করেছে, পরিধান করেছে এমন বস্ত্র যা তাদের বাড়ির দাসীরাও পরে না। তার বাবা গোপনে দুজন ভৃত্যকে পাঠিয়েছিলেন তার খবর রাখবার জন্য, পাঠিয়েছিলেন অর্থ। কিন্তু সে গ্রহণ করেনি কিছু। ফিরিয়ে দিয়েছে চাকরদের। কেন? কারণ সে আশা করেছিল অর্ণবের নাগাল পাবে। কিন্তু কিছুদিন পরেই সে বুঝতে পারল অর্ণব মহাকাশ, সে সামান্য ঘুড়ি। আকাশকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়ার সাধ্য তার নেই। কোনো কালে হবে না। কিছুদিন আগে লোহিতরাজ্য থেকে আবার দুজন ভৃত্য এসেছিল। তখনও তাদের ফিরিয়ে দিয়েছিল সে। তখন রত্নাকরের মহত্ত্বে তার মন অভিভূত। সহসা আজ তার জীবনের সূর্য-চন্দ্র দুই-ই নিবে গেল। এখন সে কি করবে? নির্বাক হয়ে এই কথাই ভাবছিল সে। অনেক ভেবে ঠিক করলে বাবার কাছে লোহিত রাজ্যেই ফিরে যাবে। সেখানে গিয়ে রাজকন্যার জীবনই যাপন করবে। অর্ণব বলেছিলেন তাহলেই তার মৃত্যু হবে। তাই হোক। এখন আর বেঁচে লাভ কি। হঠাৎ একদিন সে গঙ্গাকে বলল—"আমাকে তোমরা লোহিতরাজ্যে নিয়ে চল। এখানে আমি আর থাকব না?"

"কেন?"

"এখানে আর ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে এখানে থাকার আর সার্থকতা নেই। আমি বাবার কাছে ফিরে যাই।" যমুনা আর সরস্বতীও সেখানে ছিল। একটু রহস্যময়ভাবে তারা তিনজনই চেয়ে রইল তার দিকে। মনে হল কি যেন একটা গোপন করতে চাইছে।

"লোহিতরাজ্যে কোনদিক দিয়ে যেতে হয় তা তোমরা জান কি?"

যমুনা তখন বলল—"জানি। তোমাকে সেখানে পৌঁছে দিতেও পারতাম। কিন্তু লোহিতরাজ্যে গিয়ে এখন লাভ হবে না।"

"কেন? সেখানে আমার বাবা আছেন। সে দেশের রাজা তিনি—'

"কয়েকদিন আগে লোহিতরাজ্য থেকে তোমাদের একটি চাকর এসেছিল। তাকে আমরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে দিইনি—"

"কেন?"

"সে দুঃসংবাদ এনেছিল একটি।"

"কি দুঃসংবাদ?"

"গঙ্গারাঢ়িরা তাদের বিপুল হস্তী-বাহিনী নিয়ে লোহিতরাজ্য আক্রমণ করেছিল। তোমার বাবাকে তারা হত্যা করেছে। লোহিতরাজ্য এখন তাদের দখলে।"

এ খবর শুনে বজ্রাহতবৎ বসে রইল মন্দাকিনী। তারপর করুণ কণ্ঠে বলল— "কি করি এখন, কি করি এখন, কি করি এখন।"

হাত বাড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে করুণ কণ্ঠে বলতে লাগল—"কি করি এখন, কি করি এখন, কি করি এখন—।"

তারপর আশ্চর্য একটা কাণ্ড হল। হঠাৎ সে পাখি হয়ে গেল। পাখি আকাশের মহাশূন্যে উড়ে গেল আর উড়তে উড়তে ক্রমাগত বলতে লাগল—'কি করি এখন, কি করি এখন, কি করি এখন–।"

গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী হিমালয়ে ফিরে গেল।

রত্নাকরের প্রকাণ্ড ফুল-বাগানে একা-একা রোজ ঘুরে বেড়াত ফল্গু। অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ানোর পর নানারকম ফুল তুলত একমনে। মালা গাঁথত গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে। মালাটা গাঁথা হয়ে গেলে সেটা টাঙিয়ে দিত একটা গাছের ডালে। তারপর একটু দূরে সরে গিয়ে দেখত সেটা। মুখে ফুটত ছোট্ট একটু হাসির আভাস।

।। কুড়ি ।।

আবার একদিন গভীর রাত্রে তিন্তিড়ীর গাঁজার দোকানে হাজির হলেন ভৃঙ্গী। তিন্তিড়ী দ্বার খুলতেই তিনি ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন।

"সমুদ্র মন্থন দেখতে চাও যদি এক্ষুনি আমার সঙ্গে সুমেরু পর্বতে যেতে হবে। সেখান থেকে বেশ ভালো দেখতে পাবে। আগে এক ছিলিম সাজ। চাঙ্গা হয়েনি। দুটো সিংহ আর একটা সাপ হিমসিম খাইয়ে দিয়েছে আমাকে। তোমার সেই ভালো গাঁজা আছে তো?"

"আছে, প্রচুর আছে। ও গাঁজা তো বেশি বিক্রি হয় না।"

"যা আছে সেটা সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। সুমেরু পর্বতে কন্‌কনে ঠাণ্ডা। সেখানে ঘন ঘন গাঁজা খেতে হবে। এখন এক কলকে সাজ।"

তিন্তিড়ী গাঁজা সাজতে বসল। বলল— "ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। সিংহ সাপের পাল্লায় পড়লেন কি করে?"

মহেশ্বর সমুদ্রমন্থন করবেন কি না একটু ইতস্তত করছিলেন। দেবতাদের আর দৈত্যদের ডেকে একদিন বললেন— "তোমরা অমর হতে চাইছ? বায়না ধরেছ সুধা খাবে। কিন্তু তার আগে একটি কথা জেনে রাখ। সুধা খেলে অমর হবে বটে কিন্তু ষড়-রিপুর কবল থেকে মুক্ত হবে না। সুতরাং জীবনে নানারকম দুর্গতি ভোগ করতে হবে। যারা অমর নয়, মৃত্যু তাদের মুক্তি দেয়। কিন্তু তোমরা যদি অমর হও তাহলে অমরত্বের বেড়াজালে ঘেরে ষড়-রিপু অসীম যন্ত্রণা দেবে তোমাদের। ভেবে দেখ জিনিসটা ভালো করে। দেব-দৈত্য তোমরা কেউ ষড়-রিপু মুক্ত নও। সুতরাং ভেবে দেখ ভালো করে।"

দেবতারা আর দৈত্যরা কিন্তু না-ছোড়। তারা অমরত্বই চাইতে লাগল। মহেশ্বর তবু ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু ভয়ঙ্কর ঝড়ে রত্নাকরের নৌবহর সব ডুবে গেল। সে নৌবহরে মহাদেবের সাতজন

ভক্ত ছিলেন। রত্নাকর, অম্বুধি, জলধি, অব্ধি, পারাবার, সাগর আর অর্ণব। এরা যখন সমুদ্রে তলিয়ে গেল তখন মহাদেব বিচলিত হয়ে উঠলেন। সমুদ্রকে খবর পাঠালেন আমার সাতজন ভক্তকে অবিলম্বে তীরে উঠিয়ে দাও। ওরা আমার পরম ভক্ত। সমুদ্র উত্তর দিলেন—দেবাদিদেব তা আমার সাধ্যাতীত। কে কোথায় তলিয়ে গেছে আমার পক্ষে তা নির্ণয় করা সহজ নয়। এই উত্তর শুনে ক্ষেপে উঠলেন মহেশ্বর। বললেন—তোমাকে আমি মন্থন করব। ওদের আমি তুলবই। সুতরাং সমুদ্র-মন্থন হবে এবার। গাঁজার কলকেটি ভৃঙ্গীর হাতে দিয়ে তিন্তিড়ী বললেন— "যাদের নাম করলেন তারা তো আমাদের অঞ্চলের লোক। সবাইকে আমি চিনি—।"

ভৃঙ্গী বলল— "তা তো চিনবেই। ওদের আর একটি বৈশিষ্ট্য আমি জানি। ওরা একই প্রার্থনা রোজ করছে। আমি তোমাকে বলেছিলাম আমি প্রত্যেকের প্রার্থনা রোজ সংগ্রহ করি। ওদের প্রার্থনা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। একই প্রার্থনা দিনের পর দিন করছে ওরা। দেখাব তোমাকে সব।"

কলকেতে সুদীর্ঘ টান দিলেন ভৃঙ্গী। দমবন্ধ করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর ধোঁয়াটি ছাড়লেন ধীরে ধীরে।

তিন্তিড়ী বলল— "সিংহ আর সাপের কথা বলছিলেন যে—।"

"ও হ্যাঁ, মন্দর পর্বতে মহাদেবের অতি প্রিয় একটি সাপ আর দুর্গার অতি প্রিয় আদরের দুটি সিংহ থাকে। মহাদেব আমাকে বললেন, ওদের ওখান থেকে নাবিয়ে আন। মন্দর পর্বত মন্থন-দণ্ড হবে, ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে হবে তাকে। সেখানে দুর্গার দুটি প্রিয় সিংহ আছে আর আমার প্রিয় সাপ আছে একটি। তাদের তুমি ওখান থেকে নাবিয়ে নিয়ে এস। ওখানে থাকলে বাঁচবে না ওরা। ওদের পিছনেই ছুটোছুটি করছিলাম। অতি কষ্টে নাবিয়েছি একটু আগে। অনেক দেরি হয়ে গেল। গাঁজাগুলো গুছিয়ে নাও। আর দেরি করা চলবে না। চল বেরিয়ে পড়ি।"

"আমি যাব কি করে?"

"দশাঙ্গীকে এনেছি। তার মাথার উপর বসবে। সে তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।"

"দশাঙ্গী? সে কে?"

"প্রেত। তাঁর প্রত্যেক অঙ্গই দশগুণ বড়। মাথাটা একটা প্রকাণ্ড ঝুড়ির মত। হাত দুটো প্রকাণ্ড ডানা। নাকটা ঠোঁটের মত। দেখতে ভয়ঙ্কর। কিন্তু ভারি ভালো মানুষ। তোমার ঘরে ঢুকতে পারবে না সে। মাঠে বসে আছে। চল যাই—।"

মাঠে বিরাটকায় দশাঙ্গী বসেছিল। সত্যিই ভয়ঙ্কর দেখতে।

ভৃঙ্গী বললেন—"দশাঙ্গী হেঁট হও। ইনি তোমার পিঠ বেয়ে মাথায় চড়বেন। তুমি এঁকে সোজা সুমেরু পর্বতে নিয়ে যাও। আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।" তিন্তিড়ী দশাঙ্গীর পিঠ বেয়ে মাথার উপর উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সোঁ করে আকাশে উড়ল দশাঙ্গী। ভৃঙ্গীও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান করলেন। মনে হল শূন্যে মিলিয়ে গেলেন যেন।

।। একুশ ।।

সুমেরু পর্বতের এক গুহার ভিতর বসেছিল তিন্তিড়ী আর ভৃঙ্গী। সেখান থেকে বিরাট সমুদ্র দেখা

যাচ্ছিল। আর দেখা যাচ্ছিল সমুদ্রতীরে সমবেত দেবতাদের আর দৈত্যদের। কত কোটি যে তার ঠিক নেই। কিলবিল করছিল যেন। মন্দর পর্বত স্থাপিত হয়েছিল সমুদ্রের ভিতর। বিরাট অনন্তনাগ জড়িয়ে রয়েছেন নভশ্চুম্বী মন্দর পর্বতকে। তখনও মন্থন আরম্ভ হয়নি। ভৃঙ্গী বললেন, এই ফাঁকে রত্নাকর, অম্বুধি, জলধি, সাগর, পারাবার, অব্ধি আর অর্ণবের প্রার্থনাগুলো তোমাকে শুনিয়ে দিই। মহেশ্বর ওদের প্রার্থনা শুনবেন কি না জানি না। কিন্তু প্রার্থনাগুলো বড় অদ্ভুত। আর এই এক প্রার্থনাই ওরা রোজ করেছে, বছরের পর বছর।

প্রকাণ্ড কমণ্ডলু থেকে ভৃঙ্গী প্রার্থনার অনুলিপিগুলি বার করতে লাগলেন।

রত্নাকরের প্রার্থনা শোন।

"হে দেবাদিদেব মহেশ্বর, আমার শতকোটি প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনার কৃপায় আমি সচ্ছল অবস্থায় আছি। আমার ব্যবসা বিশ্বব্যাপী হয়েছে। আমার পত্নী তাপ্তি সতী সাধ্বী পতিব্রতা। সে আমার হিতাকাঙ্ক্ষিনী। সে আমাকে একদণ্ড ছেড়ে থাকতে পারে না। আমার কাছে অন্য কোনো রমণীর সান্নিধ্যও সহ্য করতে পারে না সে। কিন্তু ভগবান আমাকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে মেয়েরা স্বতঃই আমার দিকে আকৃষ্ট হয়। আমি ভদ্রতাবশত তাদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করতে পারি না। চক্ষুলজ্জাবশত তাদের কোনো অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারি না। আপনি জানেন তাদের কারো সম্বন্ধে আমার কোনো মোহ নেই। আমি কেবল তাদের সঙ্গে ভদ্রোচিত ব্যবহার করি। তাপ্তি কিন্তু এতে বড় কষ্ট পায়। তাই আপনার নিকট আমার প্রার্থনা পরজন্মে আপনি আমাকে নারী করে সৃষ্টি করুন। আমার নারী দেহে তাপ্তির রূপ যেন মূর্ত হয়। তাপ্তিকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। আমাদের দুজনকে আপনি অবিচ্ছেদ্যরূপে মিলিত করে দিন। এই আপনার কাছে আমার প্রার্থনা। রত্নাকর এই প্রার্থনা প্রত্যহ করেছে।"

তারপর তিনি কমণ্ডলু হাতড়াতে লাগলেন আবার।

"বহু লোকের প্রার্থনা টুকেছি তো রোজ। সব হোল্ডল-মল্ড ল হয়ে গেছে। দাঁড়াও ওদেরগুলো খুঁজে বার করি।

"হ্যাঁ, এই হচ্ছে অব্ধির। এটা শুনে নাও। অদ্ভুত প্রার্থনা।

"হে মহেশ্বর; আমার অসংখ্য প্রণতি গ্রহণ করুন। আমি পিশাচ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করব বলে অনেক রকম সাধনা করেছি। অনেক রকম সিদ্ধিলাভও করেছি। এই সাধনার জন্য অনেক সময় উত্তরসাধিকার প্রয়োজন হয়। আমি একে একে সাতাশজন নারীকে বিবাহ করেছিলাম এই জন্য। তারা সকলেই আমাকে ভালোবাসত খুব। কিন্তু উত্তরসাধিকা রূপে তারা একজনও যোগ্য ছিল না। তারপর হঠাৎ পেয়ে যাই ভোগবতীকে। সে নিজে পিশাচসিদ্ধ। কিন্তু ভয়ঙ্কর প্রকৃতির স্ত্রীলোক। তাকে আমি যখন বিয়ে করলাম তার অত্যাচারে আমার সাতাশজন পত্নীই আমাকে ছেড়ে গেল। তাদের আর কোনো খবর পাইনি এতদিন। সম্প্রতি মা কালী একদিন আমাকে বললেন—তারা মরে গেছে এবং দক্ষ রাজার সাতাশ কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছে। ভোগবতী শক্তিময়ী। কিন্তু উন্মাদিনী। আমার সঙ্গে রোজ তার হাতাহাতি হয়। মনে হয় সেও আমাকে ছেড়ে যাবে। হে মহেশ্বর। আপনার কাছে আমার প্রার্থনা, আমার সেই সাতাশ পত্নীকে আপনি আবার ফিরিয়ে দিন। তারা আমাকে ভালোবাসত। আমি তাদের এখনও ভালোবাসি। আপনি আমাদের পুনর্মিলন ঘটিয়ে দিন প্রভু। আমি আর কিছু চাই না। আমি সারাজীবন আপনার সেবক, আপনি আমাকে যদি কোনো বর না দেন

তাহলেও আমি আপনার সেবক থাকব। শুধু আমার অন্তরের গোপন কামনাটুকু আপনাকে নিবেদন করলাম।"

এটি পাঠ করে ভৃঙ্গী বললেন, "বাবাকে ভালো মানুষ পেয়ে এদের স্পর্ধা কত বেড়ে গেছে দেখ। যার যা খুশি তাই আবদার করছে। এই অদ্ভুত প্রার্থনা রোজ করে যাচ্ছে লোকটা—।"

ভৃঙ্গী আবার কমণ্ডলুর ভিতর হাত ঢোকালেন এবং খানিকক্ষণ পরে খুঁজে পেলেন পারাবারের প্রার্থনা।

"পারাবারের প্রার্থনা পেয়েছি। শোন। এ যে কি চায় তা বোঝাই যায় না। মনে হয় একটা হেঁয়ালী। শোন।"—"হে মহেশ্বর, হে সঙ্গীত-শাস্ত্রের উৎস, হে সর্বজ্ঞানের আকর, হে মহানন্দ স্বরূপ, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। সারাজীবন আপনার তপস্যা করছি, আপনার মহিমার সীমা নির্ণয় করতে পারিনি। আমি কবিতার প্রেরণা হয়ে আপনার মধ্যে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছি, রোজই করি, কিন্তু কিছুদূর গিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ি। শুনেছি সেবকদের আপনি বর দান করেন। আমার কাম্য ধন, মান, রূপ, আয়ু বা সামর্থ্য নয়। যদি আপনি অনুগ্রহ করে কখনও কিছু আমাকে দেন, সেই ক্ষমতা দিন যার দ্বারা আমি সকলকে উদ্দীপ্ত করতে পারি, আবিষ্ট করতে পারি, আনন্দলোকে নিয়ে যেতে পারি। আমি কবি, আমার কবিত্ব যেন অপরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে কিছুক্ষণের জন্যেও তাঁকে কবি করে তোলে।"

পড়া শেষ করে ভৃঙ্গী বললেন— "এর মানে কিছু বুঝলেন?"

তিন্তিড়ী বললে—"না পারলাম না—।"

"আমিও পারিনি।"

আবার কমণ্ডলুতে হাত ঢোকালেন। বার করলেন এক গাদা প্রার্থনা-পত্র (অবশ্য ভূর্জপত্র)। তার ভিতর পাওয়া গেল অম্বুধি আর অর্ণবের প্রার্থনা।

"অম্বুধির প্রার্থনাটাই আগে শোন। এও এক অদ্ভুত প্রার্থনা করেছে। রোজই করে। শোন— "হে মহাদেব, হে আশুতোষ আমি জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা করি। আপনার মহিমার কিয়দংশ আমি ওই জ্যোতিষ শাস্ত্রের মধ্যেই অনুভব করছি। কিন্তু আমি পঙ্গু চলতে পারি না। দৃষ্টির জ্যোতিও ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। আমি সম্পূর্ণভাবে পর-নির্ভর হয়ে পড়েছি। আমার দুর্দশার অন্ত নেই। হে সর্বশক্তির আধার, হে দেবাদিদেব, আমাকে শক্তি দান করুন। আমাকে বলবান অশ্বের মত তেজোদীপ্ত বলশালী করুন। হে উমাপতি, আমি আর কিছু চাই না।"

পড়া শেষ করে ভৃঙ্গী বললেন—"আশ্চর্য, মানুষ ঘোড়া হতে চাইছে। এইবার অর্ণবেরটা শোন। সে খুব সংক্ষেপে রোজ একই কথা বলে। "হে মহেশ্বর, আমি নারায়ণের বক্ষলগ্ন হয়ে থাকতে চাই। আর কিছু চাই না, আর কিছু চাই না। আপনি কৃপা করুন, আপনার কৃপাতে অসম্ভব সম্ভব হয়।"

ভৃঙ্গী আবার কমণ্ডলুর ভিতর হাত ঢোকালেন। প্রার্থনার অনুলিপি বার করলেন অনেকগুলি।

হরিশ্চন্দ্র, কালীসেবক, লৌহ মিত্র, ঈশ্বর দাস—জলধি দেবশর্মা।

জলধিরটা পাওয়া গেছে। শোন এটা।

"হে পরম পিতা, হে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের আদি প্রবক্তা, আমি আপনার দীন দাসানুদাস। আপনার নির্দেশ অনুসরণ করে আমি সারাজীবন আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসা করেছি। কখনও রোগী বাঁচে, কখনও বাঁচে না। যখনই কোনো রোগীর মৃত্যু হয় তখনই আমি হতাশ হয়ে পড়ি। প্রকৃতির কাছে এই পরাজয় স্বীকার করতে অপমানে আমার মাথা কাটা যায়। মনে হয় যতদিন আমরা মানুষকে অমরত্ব দান না

করতে পারব ততদিন আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে। আমি সারাজীবন এটা নিয়ে গবেষণা করেছি, কিন্তু এখনও কৃতকার্য হতে পারিনি। আপনার কৃপা ভিন্ন তা পারবও না। আমার প্রার্থনা, হে মহেশ্বর, আমি যেন সকলকে অমরত্ব দান করতে পারি। আমাকে আপনি সেই বর দিন। এ ছাড়া আমার আর কিছু কাম্য নেই।"

ভৃঙ্গী বললেন— "এর সাহসটা দেখ। সব মানুষ যদি অমর হয় কি কাণ্ডটা হবে ভেবে দেখ দিকি—।"

আবার কমণ্ডলুতে হাত ঢোকালেন ভৃঙ্গী। এবার বেশি খুঁজতে হল না। মল্লবীর সাগরের প্রার্থনা পত্র বেরিয়ে পড়ল।

ভৃঙ্গী বললেন "এর প্রার্থনা সংক্ষিপ্ত।" শোন। "হে শিব, হে শঙ্কর, আমি সারাজীবন শক্তির সাধনা করেছি। ফল যা হয়েছে তাতে আমি সন্তুষ্ট নই। আমি মাতঙ্গের মত বলশালী হতে চাই। আপনি আমাকে সেই বর দিন। আর কিছু আমি চাই না।" এই সাতজনই মহাদেবের প্রিয় ভক্ত। কিন্তু এদের অদ্ভুত আবদার শুনে আমি তো অবাক হয়ে গেছি। ওহে, দেখ, দেখ, সমুদ্র-মন্থন শুরু হয়েছে। তিন্তিড়ী চেয়ে দেখল মন্দর পর্বত ঘুরতে আরম্ভ করেছে। অনন্তনাগের মুখের দিকে দৈত্যরা আর পুচ্ছের দিকে দেবতারা ধরে মন্থন শুরু করছেন। তুমুল একটা শব্দ হচ্ছে। মন্দর পর্বতের উপর যে সব পাখি ছিল সেগুলি উড়ে আকাশ প্রায় ছেয়ে ফেলেছে। শব্দও করছে তারা নানারকম। মন্দর পর্বতের উপর যে সব বন্য-জন্তু ছিল তারা ভীত ত্রস্ত হয়ে চারদিকে ছুটোছুটি করছে। তাদের হুঙ্কার এবং গর্জনে চতুর্দিক প্রকম্পিত হচ্ছে। তারা অনেকেই ব্যাকুল হয়ে সমুদ্রের মধ্যে লাফিয়ে পড়ছে। সাঁতরে পালাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। সমুদ্রের ঘূর্ণাবর্তে বারম্বার আবর্তিত হচ্ছে কেবল। মন্দর পর্বতের মন্থন-আবর্তে শত শত জলচর প্রাণীও ধর্ষিত হতে লাগল। বড় বড় হাঙ্গর, কুমির, তিমি, তিমিঙ্গিলও এই ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত থেকে পালাবার জন্য নিজেদের শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করে যা করতে লাগল তা যুগপৎ করুণ ও ভয়ঙ্কর। সেই ঘূর্ণাবর্তে আবার পড়ে গিয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তারা। বড় সামুদ্রিক সর্পরা মন্দরকে আঁকড়ে ধরে রইল কিছুক্ষণ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না। সেই বিরাট ঘূর্ণাবর্ত তাদেরও গ্রাস করে ফেলল। একটা অবর্ণনীয় গর্জনে, চিৎকারে, আর্তনাদে, সমুদ্রের কল্লোলে, চারদিক যেন কাঁপতে লাগল। নভশ্চুম্বী মন্দর পর্বতের উপর অসংখ্য বৃক্ষ, অসংখ্য লতা, অসংখ্য গুল্ম। ঘূর্ণনের বেগে তারাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল।

গাছে গাছে ঠোকাঠুকি হয়ে অনেক গাছের শাখা ভেঙে গেল, কোনো গাছ সমূলে উৎপাটিত হল, প্রবল ঘর্ষণের জন্য অনেক গাছের ছাল উঠে গিয়ে রস গড়িয়ে পড়তে লাগল। মন্দর সবেগে ঘুরতে লাগল। কয়েকটি কিন্নরও ছিটকে পড়ে মারা গেল এবং সমুদ্রের ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হতে লাগল। ক্রমশ বড় বড় পাথরও বিক্ষিপ্ত হতে লাগল মন্দর পর্বতের গা থেকে। যেন মনে হতে লাগল ছোট ছোট এক একটা পাহাড় খসে পড়ছে। অনেক গাছে গাছে ঘষাঘষি হয়ে আগুন লেগে গেল। দাবানল সৃষ্টি হল মন্দর পর্বতের উপর। মন্দর তবুও সবেগে ঘুরে যাচ্ছে। দেবতারা আর দৈত্যরা অক্লান্ত। ক্রমাগত টেনে যাচ্ছেন তারা মন্থন-রজ্জু। অনন্তনাগের খুব কষ্ট হচ্ছে, তবু তিনি নিজের বিষ সম্বরণ করে মহাদেবের আদেশ পালন করে যাচ্ছেন। মন্দর পর্বতের উপর দাবানলের ধূমে সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন হল। আগুনের লকলকে শিখা আকাশ স্পর্শ করল। শেষ কালে ইন্দ্রদেব মেঘদের আহ্বান করলেন। আদেশ দিলেন তোমরা বারি বর্ষণ করে এ আগুন নেবাও। প্রচুর বৃষ্টি হতে লাগল। তারপর

দেখা গেল বহু মৃত পশুপক্ষীর অর্ধদগ্ধ দেহ ছিটকে ছিটকে পড়ছে মন্দরের শরীর থেকে। নদীর স্রোতের মত নেবে আসছে বহু ওষধি আর বনস্পতির নির্যাস। মন্দর কিন্তু একদণ্ড থামছে না। ঘুরে চলেছে।

হঠাৎ ভৃঙ্গী বলে উঠলেন—"আর পারছি না। কানে তুলো দিয়ে চোখ বুজে বসে থাকি। তুমি এক কলকে সাজো দেখি।"

তিন্তিড়ীও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বসেছিল।

সে বলল— "আমাকেও একটু তুলো দিন প্রভু। এত শব্দ আর শুনতে পারছি না। দু'কলকে সাজছি। আমিও ঠাণ্ডা মেরে গেছি।"

তিন্তিড়ী দুটো বড় বড় কলকে বার করে গাঁজা সাজতে বসল। সব সাজ-সরঞ্জাম সে সঙ্গে এনেছিল। চকমকি পর্যন্ত।

ভৃঙ্গী বললেন— "দেবতা এবার বোধ হয় সংহারমূর্তি ধরেছেন। প্রলয় করে ছাড়বেন। দেব দৈত্য নর বানর ভূত প্রেত কেউ আর রক্ষে পাবে না—। তুরীয় মার্গে চড়ে বসে থাকি। তারপর যা অদৃষ্টে আছে, হবে।"

তিন্তিড়ী চটপট দুকলকে গাঁজা সেজে ফেললে। তারপর দুজনেই গাঁজায় টান দিয়ে চোখ বুজে বসে রইল কানে তুলো দিয়ে।

গাঁজার নেশায় বিভোর হয়ে বসে রইল তারা কিছুক্ষণ। কিন্তু নেশা বেশিক্ষণ থাকে না। একটু পরে ভেঙে গেল। আবার চোখ খুলতে হল। চোখ খুলে যা দেখল তাতে আবার অবাক হয়ে গেল দুজনেই। নীর সমুদ্র ক্ষীর সমুদ্রে পরিণত হয়েছে। যতদূর দৃষ্টি চলে খালি ক্ষীর আর ক্ষীর। আর সেই ক্ষীর সমুদ্রে মন্থন করে চলেছে মন্দর। দেব দৈত্য অনন্তনাগ কেউ ক্লান্ত হননি এখনও। মহাদেব সুমেরু পর্বতের আর একটি সু-উচ্চ শিখরের উপরে বসে আছেন বিরাট হিমাদ্রির মত। মাঝে মাঝে বলছেন—"মন্থন থামিও না। আমার সাতটি প্রিয় ভক্তকে আমি উদ্ধার করবই। এর জন্য সমুদ্রকে যদি শুকিয়ে ফেলতে হয়, শুকিয়ে ফেলব। সুধা উঠুক বা না-ই উঠুক—অব্ধি, রত্নাকর, পারাবার, অম্বুধি, অর্ণব, জলধি, সাগরকে আমি চাই। এদের প্রার্থনা আমি পূর্ণ করেছি। এদের সেই মূর্তি আমি দেখতে চাই। তারা মরেনি। তারা সমুদ্রের ভিতরেই আছে। সমুদ্র তাদের ফিরিয়ে দিক। যতক্ষণ না দিচ্ছে ততক্ষণ মন্থন চলবে—।"

মহাদেব নাসা বিস্ফারিত করে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলেন।

মন্থন চলতে লাগল।

এর পরই কিন্তু একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। ক্ষীর ক্রমশ গলতে লাগল। তারপর অপরূপ একটা গন্ধ ছাড়ল। উৎকৃষ্ট ঘিয়ের গন্ধ। ক্ষীর সমুদ্রমন্থনের ঘূর্ণাবেগে ঘৃত সমুদ্রে পরিণত হল। ঈষৎ স্বর্ণাভ সেই ঘৃত-সমুদ্রে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হওয়াতে অপরূপ দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল চারদিক। মনে হল এইবার বুঝি অসম্ভব সম্ভব হবে।

হলও।

খানিকক্ষণ মন্থনের পর অপরূপ শোভায় চাঁদ উৎক্ষিপ্ত হলেন স্বর্ণ-সান্নিভ ঘৃত সমুদ্র থেকে। হর্ষধ্বনি করে উঠল দেব-দৈত্য সকলেই। শীতাংশু চন্দ্রের অপরূপ কান্তি দেখে ভৃঙ্গী বললেন— "এ যে অভূতপূর্ব হে।" তারপরই মহাদেবের গম্ভীর কণ্ঠরব শোনা গেল।

"বৎস অব্ধি, তোমার তপস্যায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। তুমি যা চেয়েছিলে তাই তোমায় দিলাম।

তোমার সাতাশ পত্নী মহাকাশে তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তুমি মহাকাশে চলে যাও। তুমি আমার পরমাত্মীয় হলে কারণ তোমার সাতাশ পত্নীর দিদি ছিলেন সতী। তুমি আমার শিরোভূষণ হয়ে থাকবে।"

চাঁদ মহাকাশে চলে গেলেন। আবার মন্থন চলতে লাগল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠলেন, লক্ষ্মী। তিনি শ্বেতপদ্মের উপর উপবিষ্টা। গৌরবর্ণা, সুরূপা, স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিতা, ডানহাতে পদ্ম, বাঁ-হাতে রত্নময় একটি ঝাঁপি। মনে হল একটি আশ্চর্য জীবন্ত অনন্য প্রতিমা যেন মূর্ত হল মহাশূন্যে। তিন্তিড়ী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল লক্ষ্মীর মুখের আদল ঠিক যেন তাপ্তি দেবীর মুখের মত। মহাদেব মন্দ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"বৎস রত্নাকর, তোমাকে দেখে বড় আনন্দ হচ্ছে। তুমি আমার প্রিয় ভক্ত। ভয় হয়েছিল সমুদ্র বুঝি তোমাকে গ্রাস করল। তোমার প্রার্থনা আমি পূর্ণ করেছি। তোমার মহিমা, তোমার সৌন্দর্য স্ত্রীরূপে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তোমার পত্নী তাপ্তী তোমার সর্বাঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছেন। তুমি বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ কর। "বিষ্ণু নিকটেই ধ্যানস্থ হয়ে বসেছিলেন। লক্ষ্মী তাঁর বাঁ-পাশে গিয়ে উপবেশন করলেন।

সমুদ্রমন্থন চলতে লাগল।

তারপর হঠাৎ সমুদ্র থেকে যা উৎক্ষিপ্ত হল তা জীবন্ত একটি অগ্নিশিখা। সেটি মহাকাশে সঞ্চরণ করতে লাগল। শুধু তাই নয়, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হতে লাগল তার বর্ণ। আরও মনে হতে লাগল একটা নীরব উদ্দীপনাময় সঙ্গীত যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেই যাদুকরী শিখার সর্বাঙ্গ থেকে। সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করে একটা আনন্দঘন মদিরতা যেন আবিষ্ট করে ফেলল চরাচরকে। তার কখনও মৃদু, কখনও উদাত্ত, কখনও গম্ভীর, কখনও চটুল প্রভাবে উন্মত্ত হয়ে উঠল দেবদৈত্যরা। মহাদেব ঘোষণা করলেন— "কবি পারাবার, তুমি যা প্রার্থনা করেছ তা আমি দিতে পেরেছি কিনা জানি না। তুমি অনন্য প্রতিভাবান স্রষ্টা, তুমি কবি, তুমি সুরের জনক, তাই তোমাকে আমি সুরা রূপে সৃষ্টি করলাম। তুমি যার সংস্পর্শে আসবে তাকে উদ্দীপ্ত করবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কল্পনার তুঙ্গলোকে। ভুলিয়ে দেবে তার পার্থিব সুখ-দুঃখ। সে-ও ক্ষণিকের জন্য কবি হয়ে যাবে। কিন্তু তোমার প্রতিভা পাবক স্বরূপ। তুমি ছাড়া আর কেউ তা সহ্য করতে পারবে না। অধিকাংশ লোকই পুড়ে যাবে। তুমি স্বর্গ-মর্ত্য পাতাল যেখানে ইচ্ছে সঞ্চরণ করতে পার।"

সুরা বিচিত্র লীলায় লীলায়িত হয়ে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেল। মহাদেব আদেশ দিলেন—মন্থন চলুক। সুরার প্রভাবেই সম্ভবত দেব এবং দৈত্যরা খুব উৎসাহিত হয়েছিলেন। তারা সবেগে আবার মন্থন করতে লাগলেন। একটু পরেই বিপুল হ্রেষারব করতে করতে সমুদ্র থেকে লাফিয়ে উঠল বিরাট একটি অশ্ব। তার গ্রীবাভঙ্গি, তার পেশল জঙ্ঘা, বিস্তৃত বক্ষ, তার ভাষাময় প্রদীপ্ত চক্ষু, তার বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, তার সমস্ত অঙ্গের ক্ষিপ্র সতেজ ভঙ্গিমা—সমস্ত আকাশকেই যেন চঞ্চল করে তুলল। মহাদেব ঘোষণা করলেন—বৎস, অম্বুধি, নবরূপে, তোমাকে কেউ চিনতে পারবে না। তুমি যা চেয়েছিলে আমি তাই তোমাকে করেছি। তুমি আর পঙ্গু পরনির্ভর অম্বুধি নও, তুমি আজ থেকে হলে রাজ উচ্চৈঃশ্রবা। মহাকাশে পরিভ্রমণ করে তুমি জ্যোতিষ্কদের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ কর। স্বয়ং ইন্দ্রদেব তোমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। উচ্চৈঃশ্রবা মহাশূন্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মহাদেব ঘোষণা করলেন—মন্থন চলুক।

আবার মন্থন শুরু হল। অনেকক্ষণ মন্থন করবার পরও কিন্তু আর কিছু সমুদ্র থেকে উঠল না।

ভৃঙ্গী বলল— "তিন্তিড়ী আর এক কলকে সাজ। এ কাণ্ড কতক্ষণ চলবে কে জানে।"

তিন্তিড়ী পুনরায় গাঁজা সাজতে বসল।

দেব-দৈত্যরা সমস্বরে চিৎকার করতে লাগল—"সুধা কই, সুধা কই।"

মহাদেব উত্তর দিলেন— "মন্থন করে যাও, সুধা উঠবে।"

মন্থন চলতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে চতুর্দিকে আলোকিত করে সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত উদিত হলেন একটি মণি।

মহাদেব ঘোষণা করলেন— "পরম তপস্বী অর্ণব, এতক্ষণ তোমাকে দেখতে না পেয়ে আমি চিন্তিত হয়েছিলাম। তুমি নারায়ণের বক্ষলগ্ন হতে চেয়েছিলে, তাই তোমাকে মণি-রূপে সৃষ্টি করলাম। আজ থেকে মণি-শ্রেষ্ঠ কৌস্তুভ মণিরূপে বিখ্যাত হবে।"

কৌস্তুভ মণি উত্তর দিলেন— "প্রভু, আমি যদি আপনার বক্ষলগ্ন হই, আপনি কি আপত্তি করবেন?"

"করব। আমার অঙ্গে কোনো ভালো জিনিস নেই। আমি সর্বাঙ্গে ভস্ম মাখি, হস্তী-চর্ম পরিধান করি। আমার গলার হার সাপ। পৃথিবীতে সবাই যা পরিহার করে আমি তাই গ্রহণ করি। তুমি নারায়ণের বুকে যাও। সেখানেই তোমাকে মানাবে ভালো।"

নারায়ণ নিকটেই ধ্যানস্থ হয়ে বসেছিলেন। কৌস্তুভ তার বক্ষে গিয়ে শোভমান হলেন।

দেবতা এবং দৈত্যরা আবার চিৎকার করে উঠলেন— "সুধা কই, সুধা কই—"

মহাদেব সেই একই উত্তর দিলেন—"মন্থন কর, আরও মন্থন কর।"

আবার মন্থন চলতে লাগল।

এরপর সমুদ্র থেকে উঠলেন এক সৌম্যকান্তি পরম রূপবান দেবতুল্য ঋষি। তাঁর হাতে একটি বৃহৎ কমণ্ডলু।

মহাদেব ঘোষণা করলেন—"বৎস জলধি, তোমার প্রার্থনা আমি পূর্ণ করেছি। তোমার হাতে যে কমণ্ডলু আছে তা সুধায় পরিপূর্ণ। এ সুধা যে পান করবে সেই অমর হবে। তুমি অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানী একজন। তাই তোমার হাতেই সুধা বিতরণের ভার দিলাম। আজ থেকে তোমার নামকরণ হল ধন্বন্তরী। তুমি যাকে খুশি অমরত্ব দান কর—।"

ধন্বন্তরী সুধার কমণ্ডলু হাতে নিয়ে দেবতাদের দিকে চলে গেলেন। মহাদেব ঘোষণা করলেন— "আরও মন্থন কর। সমুদ্র এখনও অনেক জিনিস লুকিয়ে রেখেছে।"

আবার শুরু হল মন্থন। প্রবল বেগে শুরু হল। ঘৃত-সমুদ্র ফেনায়িত হয়ে উঠল। মনে হল যেন আর্তনাদ করছে। মন্থন-রজ্জু অনন্তনাগও আর যেন নিজেকে সম্বরণ করতে পারছিলেন না।

হঠাৎ সমুদ্রের ভিতর থেকে বিরাট একটি স্তম্ভ নির্গত হল। তারপরই বিশালকায় এক শ্বেতহস্তী উল্লম্ফন দিয়ে বেরিয়ে এল সাগরের ভিতর থেকে। তাঁর গগন-বিদারী বৃংহতি, তার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চারটি দাঁত, তার নভশ্চুম্বী বিরাট শুঁড়, তার শ্বেত চন্দনের মত শুভ্র বর্ণ, তার রত্নোজ্জ্বল রক্তাভ চক্ষু যুগল, তার বলিষ্ঠ বিশাল স্তম্ভাকৃতি পদচতুষ্টয় দেখে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল খানিকক্ষণের জন্য। মহাদেব ঘোষণা করলেন— "আমার প্রিয় ভক্ত মল্লবীর সাগর, তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ তো? তুমি যা প্রার্থনা করেছিলে তাই দিয়েছি আমি। জানি না দেব দৈত্য কে তোমাকে পালন করবে। তোমার নতুন নামকরণ করেছি। আজ থেকে তুমি ঐরাবত বলে খ্যাত হবে—।"

দেবরাজ ইন্দ্র এগিয়ে এলেন। বললেন—"মহামাতঙ্গ ঐরাবত, আমি তোমাকে পালন করব। আমি দেবরাজ ইন্দ্র।"

ঐরাবত হাঁটু গেড়ে বসল এবং শুঁড়টি বেঁকিয়ে তুলে ধরল। ইন্দ্র সেই শুঁড়ে পা রেখে ঐরাবতের পৃষ্ঠে আরোহণ করে চলে গেলেন। এর পরই বিষ উঠল। অনন্তনাগ বিষ বমন করতে লাগলেন। চতুর্দিক কটুগন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

ভৃঙ্গী-তিন্তিড়ী দুজনেই মূর্ছা গেলেন। দৈত্যদের মধ্যেও মারা গেল কয়েকজন। বিরাট ঘৃত-সমুদ্র বিষ-সমুদ্রে পরিণত হয়ে গেল। আকাশ নীল কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করল।

ব্রহ্মা এতক্ষণ নীরবে বসেছিলেন। তিনি বললেন—"মহেশ, তুমি কি আমার সৃষ্টিটি একেবারে লোপ করে দিতে চাও?"

এরপর মহাদেব একটি অত্যাশ্চর্য কাণ্ড করলেন। এক চুমুকে সমস্ত বিষ পান করে ফেললেন। তার কণ্ঠ নীলবর্ণ হয়ে গেল।

সমুদ্র আবার শান্ত হল। মহাদেব আবার সমুদ্র-মন্থন করেছিলেন। ধর্মা, পারিজাত প্রভৃতি আরও অনেক দ্রব্য উঠেছিল সমুদ্র থেকে। কিন্তু সে কাহিনী আমার গল্পের অন্তর্গত নয়। অব্ধি, রত্নাকর, পারাবার, অম্বুধি, অর্ণব, জলধি, আর সাগরের কাহিনীই আমি বলতে শুরু করেছিলাম, সে কাহিনী এখানেই শেষ হল।

।। বাইশ ।।

এরপর হাজার হাজার বছর কেটে গেছে। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, নর্মদা, ইরাবতী, ব্রাহ্মণী, কাবেরী, বিতস্তা, পদ্মা, ফল্গু, এরা সবাই সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। মন্দাকিনীও উড়তে উড়তে স্বর্গে গিয়ে পৌঁছেছিল। ইন্দ্রাণী শচী দেবী তার কষ্ট দেখে তাকে মন্দাকিনী নদী করে দিয়েছিলেন এবং মর্ত্যের গঙ্গার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন তাকে। সেও সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। ভোগবতী পাতালে গিয়ে পাতাল-গঙ্গা হয়েছিল। তারও সমুদ্রের সঙ্গে মিলন ঘটেছে। সমুদ্রের আর এক নাম রত্নাকর। তারা যে রত্নাকরকে ভালোবেসেছিল, তাকে পেলে তারা যে আনন্দ পেত সে আনন্দ কি তারা সমুদ্রে গিয়ে পেয়েছে? জানি না।

আকাশবাসী

।। এক ।।

আকাশবাসী গভীর রাত্রে ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়। এমন অদ্ভুত ভয়াবহ স্বপ্ন সে দেখল কেন? ঘরে একটা দেওয়াল ঘড়ি ছিল। সে বলে চলেছে—ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্। আলো জ্বেলে দেখল একটা বেজেছে। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। এমন স্বপ্ন দেখবার কল্পনাও সে করেনি কখনও। দেখল আকাশে এক জ্যোতির্ময় মূর্তি—গায়ের রং টকটকে লাল—জবাফুলের মত। তার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে আছে।

"আপনি কে—"

সভয়ে জিজ্ঞাসা করল আকাশ।

"আমি সূর্যের উপাসক। যে সূর্যকে প্রত্যহ তুমি এই মন্ত্র পাঠ করে বন্দনা কর—জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং, ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোইস্মি দিবাকরং—সেই সূর্যের আমিও উপাসক। আমি তোমার প্রপিতামহের প্রপিতামহ অনন্তনারায়ণ দেবশর্মা। আমরা সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। আমাদের জন্মকালে প্রসবগৃহে যে অগ্নি আমাদের অভ্যর্থনা করতেন, সেই অগ্নিকে আমরা সারাজীবন রক্ষা করতাম, সেই অগ্নিতেই আমাদের হবিষ্যান্ন প্রস্তুত হত, সেই অগ্নিকেই আমরা প্রত্যহ পূজা করতাম, অবশেষে সেই অগ্নি দিয়ে চিতা জ্বেলে তাতেই আমাদের নশ্বর মরদেহ দাহ করা হত। সে অগ্নি তখন অগ্নির চিরন্তন উৎস সূর্যে লীন হয়ে যেত। এ প্রথা কিন্তু এখন আমাদের বংশে আর প্রচলিত নেই। সে অগ্নি নির্বাপিত হয়েছে। দেশে আর ব্রাহ্মণ নেই, ক্ষত্রিয় নেই, বৈশ্যও নেই—সব শূদ্র। সব দাস। তোমার বাবা কবি ছিলেন তাই তোমার নাম রেখেছেন আকাশবাসী। আমি লক্ষ্য করলাম তোমার মনের ভিতর সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বংশের অগ্নি ধীরে ধীরে জ্বলছে। তোমার মন আদর্শ খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু পাচ্ছে না। চারিদিকে মনুষ্যবেশী পশুর দল দেখে তুমি দিশেহারা হয়ে পড়ছ। আমি আজ তোমাকে বলতে এসেছি তোমার আদর্শ প্রত্যহ তোমার চোখের সম্মুখে উদিত হচ্ছে, ওই জবাকুসুম সঙ্কাশং সূর্যই ব্রাহ্মণের আদর্শ। তিনি আলোর উৎস, জ্ঞানের উৎস, সর্বপ্রকার মঙ্গলের উৎস। তাঁরই ধ্যান আমি জন্মজন্মান্তর করছি, তুমিও কর।"

আকাশ প্রশ্ন করল— "আপনার গায়ের রং জবাফুলের মত লাল কেন?"

"লাল নাকি? আমার গায়ের রং কেমন তা আমি দেখতে পাচ্ছি না। বহুকাল সূর্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে আমি তপস্যা করেছি তাঁর। তাই আমার চোখের দৃষ্টি নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আমি অনুভূতি দিয়ে দেখি। আমার দেহও বারবার বিলুপ্ত হয়েছে। বিলুপ্ত হয়নি কেবল আমার সূর্য তপস্যা। সেই জবাকুসুম-সঙ্কাশ জ্যোতির্ময় সর্বপাপঘ্ন সূর্যকেই আমি অহরহ ধ্যান করছি, তাই আমি এখন যে দেহ ধারণ করে আছি তাতে তাঁর বর্ণের ছাপ পড়েছে, হয়তো আমি তাঁর সমীপবর্তী হয়েছি।"

"আপনি তপস্যায় এখনও সিদ্ধি-লাভ করেননি?"

"না। যেদিন সিদ্ধিলাভ করব সেদিন সূর্যে লীন হয়ে যাব। সূর্যের বাইরে আর আমার অস্তিত্ব থাকবে না।"

বলেই সহসা তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আকাশ চুপ করে বসে রইল বিছানায় রোমাঞ্চিত হয়ে। এ রকম অদ্ভুত স্বপ্ন সে দেখল কেন? তার প্রপিতামহের প্রপিতামহ কে ছিলেন সে জানত না। সে পিতামহের নাম পর্যন্ত জানে, পিতামহের বাবার নামও জানা নেই তার। তাদের বংশ-তালিকাও নেই বাড়িতে। এসব কথা ভাবেওনি কোনোদিন। তবে সে তার বাবার মুখে শুনেছিল যে তারা সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। যদিও জন্মদিনের অগ্নিকে আমৃত্যু রক্ষা করার প্রথা বহুদিন আগেই উঠে গিয়েছে। তার বাবা কবি ছিলেন। তিনি 'সূর্য সন্ধানে' বলে একটি কাব্যও লিখেছিলেন। সে কাব্যে তিনি সূর্যের পত্নী সংজ্ঞা এবং পরিচারিকা ছায়াকে নিয়ে যে কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন তা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে গেছে, কারণ তিনি লিখতেই ভালোবাসতেন কিন্তু তা প্রচার করবার দিকে তাঁর মোটেই আগ্রহ ছিল না। দু'চারজন রসিক বন্ধুকে তা পড়ে শুনিয়েই তৃপ্ত থাকতেন তিনি। অনেকদিন আগেই তাঁর লেখায় পাণ্ডুলিপিগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রের নাম রেখেছিলেন আকাশবাসী, কাব্য লিখেছিলেন সূর্যকে নিয়ে। আজ তার প্রপিতামহের প্রপিতামহ স্বপ্নে দেখা দিয়ে—তাকে বলে গেলেন আমি আজও সূর্যের তপস্যা করছি। এ কি অদ্ভুত যোগাযোগ! তারপর তার মনে হল আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করি, সামান্য একটা স্বপ্ন নিয়ে এত বিচলিত হওয়া কি ঠিক হচ্ছে? দেওয়ালের ঘড়ি সঙ্গে সঙ্গে যেন উত্তর দিল—ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্। ঘড়িটার দিকে চাইল একবার। তারপর আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল আকাশ। ঘুম কিন্তু এল না। চোখ বুজে শুয়ে রইল। হঠাৎ মনে পড়ল কারেন্টের কথা। তার বান্ধবী এবং সহকর্মিনী স্রোতস্বিনীকে সে 'কারেন্ট' বলে ডাকে। প্রথম যেদিন সে দিল্লী থেকে এসে তার সহকারিণী হিসাবে কাজে যোগ দিয়েছিল সেই দিনই আকাশ তাকে বলেছিল— "দেখুন, প্রথমেই একটা কথা বলতে চাই। আপনার নাম স্রোতস্বিনী আচার্য—ইংরেজিতে সেটা হয়ে গেছে আচারিয়া। এই নামে আপনাকে সর্বদা ডাকতে আমার ইচ্ছে করছে না। আপনাকে ছোট্ট একটা নাম দিতে চাই—কারেন্ট। আপনার আপত্তি আছে?"

স্রোতস্বিনী আপত্তি করেনি। খুশি হয়েছিল। কিন্তু ওই নামে আকাশই তাকে ডাকে। আর সবাই তাকে মিস আচারিয়া বলেই ডাকে। স্রোতস্বিনী রূপসী নয়। কিন্তু অনেক পুরুষই তাকে দেখে আকৃষ্ট হয়। একদিন এক কাণ্ড হল। একজন অধ্যাপক একটু বাড়াবাড়ি রকম ঘনিষ্ঠতা করতে গিয়েছিল তার সঙ্গে। হাত ধরে টেনেছিল নাকি। স্রোতস্বিনী তার গালে ঠাস করে একটা চড় মেরে ছাড়িয়ে দিয়েছিল হাতটা। এ নিয়ে কোনো হই-চই করেনি সে। আকাশকেই শুধু সে বলেছিল কথাটা। খুব খুশি হয়েছিল আকাশ। হেসে বলেছিল "দেখছি তুমি জলের কারেন্ট নও। ইলেকট্রিক কারেন্ট।"

আকাশ নিজে নির্মল চরিত্র। কিন্তু সে লক্ষ্য করত আজকাল অনেক অধ্যাপক অধ্যাপিকা চরিত্রহীন। অনেকে মদ্যপ, অনেকে ঘুষখোর। টাকা নিয়ে প্রশ্নপত্র বলে দেন। ছেলেদের ভালো করে পড়ান না। বস্তুত শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সততা যেন অবলুপ্ত হচ্ছে। তার স্থান নিয়েছে ষড়রিপু। ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র গঠনই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল এদেশে। আজকাল হয়েছে যেন-তেন-প্রকারেণ ডিগ্রী লাভ। তাই সমাজের প্রতি স্তরে দুর্নীতি। স্বাধীনতার পর সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এ দুর্নীতি প্রবেশ করেছে। চারিদিকেই পাপ।

পাপ যেন একটা বিরাট ময়াল সাপের মত আমাদের সমাজদেহকে জড়িয়ে ধরেছে। নিষ্পিষ্ট করছে, তারপর গিলে ফেলবে। অথচ কোথাও কোনো প্রতিবাদ নেই। সে নিজেও তো এই গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে চলেছে। মনে পড়ল অনুশীলন সমিতির কথা। তারা প্রাণ দিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল, কাঁপিয়ে দিয়েছিল অতবড় বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি। তার এক দূরসম্পর্কের কাকা সেই অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। তাঁর মুখে সেই বীর যুবকদের অনেক কাহিনী শুনেছে সে। তিনি এখনও বেঁচে আছেন। হুগলী জেলার এক গ্রামের বাড়িতে থাকেন। আজন্ম ব্রহ্মচারী তিনি। তাঁর কেউ নেই। গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় আসতে চান না। আকাশই তাঁর খরচ পত্র চালায়। তাঁর কাছে থাকে তাঁর এক বিধবা বোনঝি শৈল। আর পুরাতন ভৃত্য মাধব। পূর্বপুরুষের বিঘে পাঁচেক জমি আছে। মাধবই সেটা ভোগ করে। আকাশ মাঝে মাঝে যায় তার কাকার কাছে। তাঁর বয়স নব্বই। কিন্তু এখনও তিনি সমর্থ আছেন। রোজ হেঁটে গঙ্গাস্নান করে আসেন। বাড়ির কাছেই গঙ্গা। দিনে ঘুমোন না। সমস্ত দুপুর বসে থাকেন চোখ বুজে। চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়ে। শৈল বলে দিনরাত কি যে ভাবেন জানি না। কারো সঙ্গে মিশতে চান না। রাতে এক বাটি দুধ খেয়েই শুয়ে পড়েন। মনে হয় রাতেও ঘুমোন না।

খুব ভোরে উঠে গঙ্গাস্নান করতে যান। চোখে এখনও দেখতে পান বেশ। স্মৃতিশক্তিও বেশ আছে। সমস্ত গীতা মুখস্থ। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা থেকে আবৃত্তি করতে পারেন। সমস্ত স্বদেশী গান মুখস্থ। মুকুন্দ দাস, গোবিন্দ দাস, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং আরো অনেক অবিখ্যাত কবির গান গড়গড় করে বলে দিতে পারেন তিনি। একবার আকাশ তাঁকে বলেছিল—"শৈল বলেছিল আপনি রোজ কাঁদেন। কাঁদেন কেন?"

"কাঁদা ছাড়া আর কি করবার আছে। কাঁদি শুধু হেরে গেছি বলে নয়, কাঁদি আমাদের দেশের লোকরা আমাদের বিরোধিতা করেছিল টাকার লোভে। তখন স্বদেশপ্রেমিকদের চেয়ে স্পাই বেশি ছিল। আমাদের দলের লোকেরাই স্পাই হয়ে গিয়েছিল অনেকে। নরেন গোঁসাই অনেক ছিল। অরবিন্দ সেইজন্য ও পথ ছেড়ে দিয়ে ধর্ম-পথে চলে গেলেন। বুঝেছিলেন এই সব অর্থলোলুপ কাপুরুষদের দিয়ে বিদ্রোহীদের দল গড়া যায় না। তা সত্ত্বেও অগ্নিযুগের অগ্নি নিবে যায়নি। অনেক বীর যুবক আশ্চর্য বীরত্ব দেখিয়ে চমকে দিয়েছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যকে। কিন্তু প্রতিবারই এই স্পাইদের জন্যেই তারা ধরা পড়েছে। রাসবিহারী ঘোষ জাপানে পালিয়ে গিয়ে জাপানী বিয়ে করে বেঁচে ছিলেন কিছুদিন। এবং তিনিই পরে আর একজন বিদ্রোহী পলাতক সুভাষচন্দ্র বসুকে আই. এন. এ. বাহিনীর নেতা করেছিলেন। সেই নেতাজী যুদ্ধ করে প্রথম ভারতবর্ষের একটুকরো জমি দখল করে সর্বপ্রথম ভারতের স্বাধীনতা-পতাকা উড়িয়েছিলেন। জাপানীদের সাহায্য পাননি বলে শেষ পর্যন্ত হেরে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ওই আই. এন. এ বাহিনীর ধাক্কা যখন ভারতবর্ষের সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ জাগাল তখন ইংরেজ বুঝলেন এ দেশ আর শাসন করা যাবে না। তখন ঠিক করলেন এবং আমাদের নেতাদের জানালেন যে তাঁরা আমাদের স্বাধীনতা দান করবেন। তার আগেই তাঁরা হাত করেছিলেন কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সেক্রেটারি মহম্মদ জিন্নাকে এবং তার পূর্বে কবি মহম্মদ ইকবালকে। মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো নিষিদ্ধ হল, শুক্রবার দিন মুসলমানদের নমাজ করবার জন্য বিশেষ ছুটি দেওয়া হতে লাগল। চাকরিতে মুসলমানদের বেশি সুবিধা দেওয়া হতে লাগল। মুসলমানরা যাতে বেশি সংখ্যায় কাউনসিলে ঢুকতে পারে তার জন্য আলাদা ব্যবস্থা হল, প্রকাশ্য স্থানে গরু কাটা ?

লাগল, হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠল। তারপর প্রচার করা হতে লাগল মুসলমান আলাদা একটা 'নেশন'। তার প্রতিবাদ করে আমাদের হিন্দু নেতারা বড় বড় বই লিখলেন। পরে যিনি আমাদের প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেন সেই রাজেন্দ্র প্রসাদও বড় বই লিখেছিলেন একটা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না। মাউন্ট-ব্যাটেন যখন স্বাধীনতা দান করতে এলেন তখন তিনি ভারতবর্ষকে ভাগ করে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান করে দিয়ে গেলেন। ভারতে বাঙালিরা আর পাঞ্জাবিরা ছিল ইংরেজের শত্রু। তাদের সর্বনাশ করে দিয়ে গেলেন তিনি। আর আমাদের নেতারা— এমন কি মহাত্মা গান্ধি পর্যন্ত মেনে নিলেন সেটা। রক্তের স্রোত বইতে লাগল দেশে। পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দু বাঙালিরা পালিয়ে এল মুসলমানদের অকথ্য অত্যাচারে। এখনও বহু উদ্বাস্তু গৃহহারা। জওহরলাল নেহেরু পাঞ্জাবিদের জন্য সুব্যবস্থা করলেন, কিন্তু বাঙালিদের জন্য করলেন না। মনে হয় তাঁর বন্ধু মাউন্টব্যাটেন তাঁর কানে কানে বলেছিলেন বাঙালি আমাদের শত্রু। ওদের নিশ্চিহ্ন করে দাও। স্বাধীনতার পর থেকে বাঙালি-নিধন যজ্ঞ চলছে। কাঁদব না তো কি করব? আর তো কিছু করবার নেই। স্বাধীনতার পর যে বাঙালি জাত সৃষ্টি হয়েছে তারা অধিকাংশই অমানুষ। খোশামুদে, ভিক্ষুক। তাদের কাছে মহৎ কিছু, বৃহৎ কিছু প্রত্যাশা করি না। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, কিছু করবার সামর্থ্য নেই। তাই বসে বসে কাঁদি...

দেওয়ালের ঘড়িটা বলতে লাগল "ঠিক ঠিক ঠিক ঠিক—"

উঠে পড়ল আকাশ।

বিছানার উপর বসে হাত জোড় করে চোখ বুজে বলতে লাগল—

ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং
কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং
প্রণতোঽস্মি দিবাকরং।

তারপর বিছানা থেকে উঠে বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল সে। তারপর ছাতে এসে বসল আসন পেতে পূর্ব দিকে মুখ করে।

আকাশের চারতলা প্রকাণ্ড বাড়ি। ধনী পিতার একমাত্র পুত্র সে, একমাত্র উত্তরাধিকারী। আকাশের পিতা তাঁর পিতার বিপুল ঐশ্বর্য পেয়েছিলেন। তিনি সারাজীবন গান বাজনা, সাহিত্য কাব্য নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন। আকাশকে প্রসব করবার কিছুদিন পরে তার মা মারা যান। আকাশের বাবা দ্বিজোত্তম আর বিবাহ করেননি। আকাশকে মানুষ করবার ভার নিয়েছিলেন তাঁর গুরুপত্নী পুণ্যবতী। তাঁর গুরুদেবের নাম ছিল বাল্মীকি ওঝা। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। কিন্তু তাঁর একটি ছোট টোল ছিল এবং সেখানে দুটি ছেলে সর্বদা থাকত। সবাই গরিবের ছেলে। তাদের ভরণ-পোষণ শিক্ষা সমস্তরই ভার নিয়েছিলেন তিনি। তাঁর কিছু ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি ছিল তাই থেকে কোনো রকমে ব্যয় নির্বাহ হয়ে যেত। তিনি দরিদ্র ছিলেন কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্যের ঐশ্বর্য এবং ব্রাহ্মণত্বের মহিমা তাঁকে সর্বজনশ্রদ্ধেয় করেছিল। ওই অঞ্চলে দ্বিজোত্তমবাবুর কিছু বিষয় ছিল। বাল্মীকি পণ্ডিতের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি। তাঁকে কিছু জমি দান করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যখন তখন বাল্মীকি পণ্ডিত বললেন— "আমি কারো দান গ্রহণ করি না। আমার পৈতৃক যে সম্পত্তি আছে তাতেই আমার কুলিয়ে যায়। আর জমি নিয়ে কি করব?"

দ্বিজোত্তম আরও খুশি হলেন। ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল। ক্রমশ তিনি বুঝতে পারলেন বাল্মীকি

ঠাকুর একজন তপস্বী। তাঁর ইচ্ছে হল তাঁর কাছে মন্ত্র নেবেন। বাল্মীকি ঠাকুর কিন্তু মন্ত্র দেননি। বলেছিলেন—"ভগবান তোমার চারদিকেই আছেন। তোমার ভগবানকে তুমি খুঁজে নাও। আমিও খুঁজছি। আমি তোমাকে কি মন্ত্র দেব? ব্যাকুল ভাবে খোঁজাটাই আসল মন্ত্র।"

দ্বিজোত্তম কিন্তু মনে মনে বাল্মীকিকে গুরুপদে বরণ করেছিল। গরিব ঘরের ছোট ছেলেদের তিনি নিজের পাঠশালায় ভরতি করতেন। তাদের নিজের বাড়িতে রাখতেন এবং পড়াতেন। ছ'বছর বয়সের অধিক-বয়স্ক শিশু নিতেন না তিনি। দশ বছর পর্যন্ত তাদের নিজের বাড়িতে রাখতেন। তারপর তাদের শিক্ষা সমাপ্ত হলে আর দুটি ছেলে নিতেন। বাংলা, ইংরেজি এবং মোটামুটি অঙ্ক শেখাতেন তাদের। রোজ সন্ধ্যাবেলা রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণ থেকে গল্প শোনাতেন তাদের। খুব ভোরে তাদের সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাস্নান করতে যেতেন। তাদের সাঁতার শেখাতেন। তাদের স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা দিতেন। বলতেন, নিজের কাজ নিজের হাতে করতে হবে। তাঁর লক্ষ্য ছিল ছেলে দুটি যাতে স্বাস্থ্যবান এবং সচ্চরিত্র হয়। বিকেলে তিনি আর পাড়ার অন্য ছেলেরা নানা রকম দেশি খেলাও করতেন ছুটোছুটি করে। পাড়ার সব ছোট ছেলেদেরই আড্ডা ছিল তাঁর বাড়িতে। সন্ধ্যাবেলায় গল্প শোনার লোভে অনেক ছেলে আসত। বয়স্ক লোকও আসতেন দু'একজন। চমৎকার গল্প বলতে পারতেন বাল্মীকি পণ্ডিত। আকাশের বয়স যখন চার বছর তখন তার মা মারা গেল। দ্বিজোত্তম গেলেন বাল্মীকি পণ্ডিতের কাছে। তাকে গিয়ে বললেন— "আমি গান বাজনা আর সাহিত্য নিয়ে থাকি। আমি আর বিবাহ করব না। কিন্তু ভাবছি ছেলেটিকে কি করে মানুষ করব। বাড়িতে চাকরবাকর আত্মীয়পরিজন অনেক আছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে স্নেহময়ী জননীর স্থান পূর্ণ করতে পারে এমন লোক আমার বাড়িতে নেই। আমার ভয় হচ্ছে আমার বাড়িতে যারা আছে তাদের সংসর্গে থাকলে আকাশ অমানুষ হয়ে যাবে। তাই আমি একটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি, কিন্তু বলতে সাহস পাচ্ছি না।"

"কি প্রস্তাব?"

"আমি আকাশকে আপনার কাছে রেখে দিতে চাই। মায়ের কোলে ও যদি মানুষ হয় তাহলে আমি নির্ভয় থাকব।"

"তোমার মাকে জিগ্যেস কর। সে যদি রাজি হয় আমার আপত্তি নেই। সব ঝঞ্ঝাট তো তাকেই পোয়াতে হবে। আর একটা কথা বলছি, সেটা ভেবে দেখ। তুমি বড়লোক। তোমার ছেলেকে কিন্তু আমার ঘরে গরিবের মত থাকতে হবে। কোনো রকম বিলাসিতা চলবে না।"

"না, না, আপনি যা বলবেন তাই হবে।"

"আমি তোমার কাছে কোনো অর্থ নেব না।"

তারপর হেসে বললেন—"বিদ্যা বিক্রয়ং ন করোমি।"

"আপনি যা আদেশ করবেন তাই হবে।"

পুণ্যবতী সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন আকাশকে। আকাশ বাল্যকালে দশ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর কাছে ছিল। দ্বিজোত্তমবাবু অনেক অনুনয় করে বাল্মীকি পণ্ডিতকে একটি উপহার নিতে সম্মত করতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আপনি যদি অনুমতি দেন আমি একটা ভালো দুগ্ধবতী গাভী ছেলেদের দুধ খাবার জন্য উপহার দেব এবং তার ব্যয়ভার আমি বহন করব।" বাল্মীকি পণ্ডিত হেসে বলেছিলেন— "এদেশের অধিকাংশ ছেলেরাই মাতৃদুগ্ধ ছাড়া অন্য দুগ্ধ পায় না। অনেকেরই গরু পোষবার সামর্থ্য নেই। আমরাই বা দুধ খাব কেন?"

"শুনেছি দুধটা পুষ্টিকর খাদ্য। বিশেষ করে ছেলেদের পক্ষে খুব উপকারী। আমি ছেলেদের জন্যই গাইটি দেব। সের পাঁচেক দুধ হবে। আপনি সেটা পাড়ার অন্য ছেলেদেরও দিতে পারেন।"

"আমি ওসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যেতে চাই না। তোমার মাকে জিজ্ঞাসা কর।"

পুণ্যবতী গাভীটি নিতে রাজি হয়েছিলেন। বলেছিলেন— "উনি তো ভাতে ভাত আর ঘি খান। আমরা সবাই তাই খাই। তবে আমি ছেলেদের জন্য ছোট মাছ কিনি। যখন যা জোটে খায় ওরা। বাড়িতে পেয়ারা গাছ, আম গাছ আর নারকেল গাছ আছে। তা তুমি গাই দিতে চাইছ দিয়ে যাও। দুধটা ছেলেদের পক্ষে সত্যি ভালো। তবে উনি দুধটুধ খাবেন না।"

দ্বিজোত্তম তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেছিলেন। বাল্মীকির বাড়ির কাছে তাঁর নিজের জমি ছিল। সেইখানে একটা পাকা গোয়াল ঘর বানিয়ে একটি বড় গাভী এবং গোয়ালা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেখানে। সে গাভীর দুধ যখন বন্ধ হয়ে যেত তখন সেটিকে নিজের জমিদারিতে পাঠিয়ে আর একটি সদ্‌গুণ সবৎসা গাভী পাঠাতেন সেখানে। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন এই ব্যবস্থা বহাল ছিল। দশ বছর বয়সে যখন আকাশ কলিকাতায় ইংরেজি স্কুলে ভরতি হল তখনও প্রতি বছর বাল্মীকি পণ্ডিতের পাঠশালায় গাভী পাঠাতেন দ্বিজোত্তম। বাল্মীকি পণ্ডিত মারা যাবার পর তাঁর টোল উঠে যায়। বাল্মীকির মৃত্যুর পর পুণ্যবতী কাশীবাসিনী হন। তখনও দ্বিজোত্তম জীবিত ছিলেন। তাঁর কাশীতেও ছোট বাড়ি ছিল একটা। পুণ্যবতী সেই বাড়িতে গিয়ে রইলেন এবং দ্বিজোত্তম আকাশকেও পাঠিয়ে দিলেন সেখানে। আকাশ সেখান থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করে। সেই সময় দ্বিজোত্তম মারা যান এবং তার কিছুদিন পরে পুণ্যবতীও। আকাশই তাঁর মুখাগ্নি করেছিল এবং শ্রাদ্ধাদিও করেছিল মহাসমারোহ। বাড়িটি সে গরিব বিধবাদের কাশীবাস করবার জন্য দান করেছে।

এসব অনেকদিন আগেকার কথা। তারপর আকাশ কেমিস্ট্রি ও ফিজিক্সে এম. এ. পাস করেছে। কেম্‌ব্রিজ, অক্সফোর্ড, হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে এসেছে। এখন অধ্যাপনা করে। বয়স পঁয়ত্রিশ বছর। বিবাহ করেনি। করবার ইচ্ছেও নেই। তার প্রকাণ্ড চারতলা বাড়িতে সে একা থাকে। চারতলায় তার শোয়ার ঘর, পুজোর ঘর, আর প্রকাণ্ড একটা দক্ষিণমুখো ছাত। পাঁচতলায় চারদিক খোলা একটা ছাত আছে। তিনতলায় তার লাইব্রেরী, দোতলায় ল্যাবরেটরি। এক তলায় সে চারজন দরিদ্র ছাত্রকে থাকতে দিয়েছে। নীচে আলাদা রান্নাঘর এবং খাবার ঘর আছে। এ ছাড়া একতলায় একটি বৈঠকখানা আছে এবং তার পাশে আছে আরও দুখানি ঘর। সেখানে দাস থাকে। পুরা নাম দাসানুদাস। সে-ই এ বাড়ির কর্তা। বাল্মীকি পণ্ডিতের টোলে সে ছিল আকাশের সহপাঠী। বাল্মীকি পণ্ডিত মারা যাওয়ার কিছুদিন পরেই কলেরায় দাসের বাবা-মা এবং বোনটি মারা গেল। তখন পুণ্যবতী বললেন—"তুই থাক আমার কাছে।" তারপর পুণ্যবতী যখন কাশী গেলেন তখন দাসও গেল তাঁর সঙ্গে। আকাশও গেল। সেখানেও দুজনে হাইস্কুলে ভরতি হল। কিছুদূর পড়ে হঠাৎ সে একদিন আকাশকে বলল— "তুই পড়, আমি আর পড়ব না। আমি মায়ের কাছে থাকব। মা আজকাল চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছেন না। ওঁর জন্যে যে ঝিটাকে বহাল করেছিস সে ওঁর ভালো করে সেবা করে না। সর্বদা কাছেও থাকে না। কাল মা হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। তাই আমি ঠিক করে ফেলেছি আমি আর স্কুলে যাব না। মায়ের কাছেই থাকব সর্বদা। আমার ইস্কুলের পড়া ভালোও লাগে না। আমি মাকে ভালো ভালো গল্পের বই পড়ে শোনাব। তুই পড়, আমি বাড়িতে থাকব—"

দাস আর পড়াশোনা করেনি। বাড়িতেই সে বাংলা বই অনেক পড়েছিল। ইংরেজিও মোটামুটি জানত।

পুণ্যবতীর মৃত্যুর পর তারা কাশী ছেড়ে চলে আসে। আকাশ যখন কলকাতায় এসে কলেজে ভরতি হল তখন সে বেশ কিছুদিন হস্টেলে কাটিয়েছিল। কারণ বাড়িতে বৃদ্ধা পিসিমা ছিলেন একজন তখন। আর তাঁর ছেলেমেয়ে নাতি নাতনিরা ছিল। আকাশ তাদের বলল— "আমি এখন হস্টেলে যাচ্ছি। আমাদের বেনেপুকুরে যে বাড়িটা আছে সেটাতে ভাড়াটে আছে। তারা উঠে গেলে আপনারা সে বাড়িতে থাকবেন। এ বাড়িতে বাবার লাইব্রেরী আছে। আমারও একটা ল্যাবরেটরি করবার ইচ্ছা আছে।"

তবু পিসিমার গুষ্টিবর্গকে ওঠাতে অনেক সময় লেগেছিল। সে যে বছর এম. এস. সি. পাস করল সেই বছর সে বাড়িটা পুরোপুরি নিজের দখলের মধ্যে পেল। দাস কিন্তু গোড়া থেকেই নীচের ঘর দুটি দখল করেছিল। সে ঘর দুটিতে একজন দারোয়ান থাকত। আকাশ দারোয়ানকে বলল— "তুমি আমার লক্ষ্মীগঞ্জের যে জমি আছে সেখানে চলে যাও। এ বাড়িতে দাস থাকবে।" দাসকে সে আবার একটি স্কুলে ভরতি করে দিয়েছিল। সে একটা মেসে খেত। আর রোজ গিয়ে দেখা করত আকাশের সঙ্গে। দাসের সঙ্গে আকাশের সম্পর্ক একদিনের জন্যও ছিন্ন হয়নি। দ্বিজোত্তমবাবু যখন মারা যান তখন আকাশ নাবালক। দ্বিজোত্তমবাবুর জমিজমা কয়েকটি বাড়ি তো ছিলই, ব্যাঙ্কেও প্রচুর টাকা ছিল। তার সুদই আসত মাসে দু হাজার টাকা করে। এ টাকা ও বিষয় দ্বিজোত্তম পেয়েছিলেন তাঁর পিতা সর্বোত্তমের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে। সর্বোত্তম ছিলেন বড় ব্যবসায়ী একজন। দ্বিজোত্তম তাঁর সব বিষয় আকাশকেই দিয়ে গিয়েছিলেন এবং উইলে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর সময় আকাশ যদি নাবালক থাকে তাহলে তাকে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তিনজন অভিভাবকের অধীনে থাকতে হবে। তাঁর তিন বন্ধুকে তিনি অভিভাবক নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। একজন বড় ওস্তাদ, একজন অধ্যাপক এবং আর একজন উকিল। তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছিলেন যে আকাশ যতদূর পড়তে চাইবে, সে পড়ার খরচ তাকে দিতে হবে এবং এ ছাড়াও প্রতি মাসে তাকে একশ টাকা করে হাত খরচ দিতে হবে। এই টাকার অধিকাংশই আকাশ দাসকে দিত। এখানে এম. এস. সি. পাস করেই সে সাবালক হল এবং বিষয়ের সম্পূর্ণ অধিকারও পেল। বিধবা পিসি এবং তাঁর পবিরাববর্গ চলে গেলেন বেনেটোলার বাড়িতে। দাসই সম্পূর্ণ বাড়িটা দখল করে রইল আকাশ বিলেত যাবার পর। দাস ততদিনে বি. এ. পাস করেছে। দু'তিনটে টিউশানি যোগাড় করে নিয়ে স্বাবলম্বীও হয়েছে সে। তবু আকাশ বিলেত যাবার আগে তার নামে পাঁচ হাজার টাকার একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করে দিয়েছিল একটা। বিলেত থেকে পাঁচ বছর পরে ফিরে এসে দেখল দাস নিজের জন্যে এক পয়সাও খরচ করেনি তার থেকে। সে প্রায় হাজার খানেক টাকা খরচ করে বাড়িটির জীর্ণ সংস্কার করিয়েছে। রং করিয়েছে সমস্ত বাড়িটা।

বিলেত থেকে ফিরে এসে সে আশা করেছিল দেশে ভালো একটা চাকরি পাবে। দেশ স্বাধীন হয়েছে— তার গুণের উপযুক্ত মূল্য পাবে সে। কিন্তু পেল না। দেখল ঘুষ, ধরাধরি, খোশামোদ এই তিনটেই এদেশে চাকরি পাওয়ার সেরা পন্থা। গুণ এদেশে আদৃত নয়। এদেশে রাজনীতিও দেশের উন্নতির বাধা। কারণ যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন তাঁদের দলের লোকেরাই ভালো চাকরি পায়। যোগ্য লোকেরা প্রায়ই ভালো চাকরি পায় না। এই রাজনীতির বিষ প্রতি বিভাগকেই

মৃতপ্রায় করে এনেছে। কোনো বিভাগেই ঠিকমত কাজ হয় না। শিক্ষা-বিভাগে তো যথেচ্ছাচার চলছে। আকাশ কোনো নামজাদা কলেজে চাকরি পেল না। সে একটা সাধারণ কলেজেই অধ্যাপনার চাকরি নিল। তার উদ্দেশ্য ছিল পঠন-পাঠন নিয়ে থাকা এবং ছাত্রদের সঙ্গে মেশা। তাদের ভালো করে পড়ানো এবং তাদের সচ্চরিত্র করে তোলা। ছাত্রদের সঙ্গে না মিশলে তাদের পূর্ণ-পরিচয় পাওয়া যাবে না। সে তাদের সঙ্গে বন্ধুর মত মিশত। সে বুঝতে পেরেছিল সব ছেলেই ভালো ছেলে, সবাই আদর্শবাদী, সবাই বড় হতে চায়, কিন্তু নানা কারণে তা পারে না। প্রধান কারণ অবশ্য দারিদ্র্যের আর একটা কারণ রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে, দলাদলি, হিংসা এবং নানা রকম নোংরামি। সরকারের আস্কারা পেয়েই ছাত্ররা অবাধ্য হচ্ছে, শিক্ষকদের অপমান করছে, প্রকাশ্যে টোকাটুকি করে পরীক্ষা পাস করছে। সরকার ইচ্ছে করলেই এ সব শাসন করতে পারেন, করেন না ভবিষ্যতে ভোট যদি না পান এই ভয়ে।

আকাশকে কিন্তু ছেলেরা খুব শ্রদ্ধা করে। সে পরীক্ষক হতে চায় না। তাদের অনেককে সে অর্থ সাহায্য করত, বই কিনে দিত। চারটি ছেলেকে নিজের বাড়িতে থাকতে দিয়েছে। বীরেন, বিষ্ণু, কুন্দনলাল, আর জাপানী—যে চারটি ছেলে এখন আকাশের বাড়িতে থাকে তারা সবাই বিজ্ঞানের ছাত্র নয়, সবাই বাঙালিও নয়। কুন্দনলাল উত্তর প্রদেশবাসী ক্ষত্রিয়। সকলেই আকাশের ভক্ত। তবে আকাশ গুরুদেবের উচ্চমঞ্চে আরোহণ করে বসে থাকতে চায় না। তাদের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করে। তাদের সঙ্গে তাস খেলে, দাবা খেলে, সিনেমা দেখতে যায়, পড়াশোনাও করে। তাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খায়। বীরেন ভালো ছেলে, এবার এম. এস. সি. দেবে ফিজিক্সে। সম্ভবত ফার্স্ট ক্লাস পাবে। বিষ্ণু আর্টের ছাত্র, বি. এ. পাস করেছে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে। সংস্কৃতে এম. এ. পড়ছে। জাপানী দ্বিজোত্তমের বাড়ির পুরাতন চাকরানির নাতি। অর্থাভাবে পড়াশোনা হচ্ছিল না। ঠাকুমা অনেকদিন আগে মারা গেছে। মা বাবাও নেই। দ্বিজোত্তম তাকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। সে এক দিদির কাছে থাকত। থার্ড ডিভিশনে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে মস্তানি করে বেড়াচ্ছিল। তার চেহারাটায় মঙ্গোলীয় ছাপ ছিল বলে দ্বিজোত্তম তাকে জাপানী নাম দিয়েছিলেন। স্কুলে ভরতি করেছিলেন জপেশ্বর নামে। কিন্তু বাড়িতে সবাই তাকে জাপানী বলেই ডাকে। সে এখন আকাশের কাছে থেকে বি. এ. পড়ে। পড়াশোনায় খুব ভালো ছেলে নয়, কিন্তু দুঃসাধ্য কাজ করতে মজবুত। আকাশ প্রায়ই তাকে দুষ্প্রাপ্য পুরাতন বই কেনবার ভার দেয়। সে খুঁজে খুঁজে ঠিক কিনে আনে। চোরাবাজারের অনেক লোক তার বন্ধু। যারা পুরাতন বই বিক্রি করে তারা অনেকেই তার বন্ধু। গুণ্ডাজগতের নানা লোকের সঙ্গে আলাপ তার। অনেক ট্যাক্সিওলার সঙ্গেও মাখামাখি আছে তার। অনেকের ঠিকানা সে জানে। জাপানীর গায়ে জোরও খুব। জাপানী যখন মস্তানী করত তখন রোজ উঠবোস ডন করত। যুযুৎসুও জানে। প্রকৃতিটা গুণ্ডা-গোছের। পৃথিবীতে একমাত্র আকাশকেই সে ভয় করে। ভয় করে কারণ আকাশকে ভালোবাসে সে। তার জন্যে সে পরাণ তুচ্ছ করে যে কোনও বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

কুন্দনলাল আকাশের সহপাঠী চন্দনলালের একমাত্র ছেলে। কাশীতে চন্দনলাল তার সঙ্গে পড়ত। চন্দনলালের বাবা মোহনলাল ছিল একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার। ট্যাক্সি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। তখন চন্দনের বয়স দশ এগারো বছর। সেই বয়সেই সে একটি মোটর-কারখানায় অল্প মাইনেতে ঢোকবার সুযোগ পায়। পরে সে ভালো একজন মোটর-মিস্ত্রি হয় এবং নিজে ছোট একটা গারাজ করে ভালো

রোজগার করতে লাগল। সেই সময় সে বিয়ে করে এবং তার কিছুদিন পরেই কুন্দনলালের জন্ম হয়। কিন্তু বেশিদিন সে গারাজ চালাতে পারেনি অর্থাভাবে। তখন সোহনলাল (মোহনলালের ভাই) বললেন— "তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, লেখাপড়া শেখ। মিস্ত্রিগিরি তুমি পারবে না—" তিনিই তাকে স্কুলে ভর্তি করে দেন। মোটরের মিস্ত্রি চন্দনলাল কুড়ি বছর বয়সে এসে ফোর্থ ক্লাসে ভরতি হল আকাশের সঙ্গে। আকাশের চেয়ে সে বয়সে পাঁচ ছ'বছর বড় ছিল। আকাশ যখন ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় চলে এল তখন চন্দনের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল অনেকদিনের জন্য। যখন কাশীতে ছিল তখন সে শিশু কুন্দনকে দেখেছিল। চন্দনের বউ দীয়া দেবীকেও দেখেছিল দূর হতে। একটা মধুর অস্পষ্ট স্মৃতি আঁকা ছিল তার মনে।

সে যখন এম. এস. সি. পাস করে বিষয়ের পুরো মালিক হল তখন হঠাৎ একদিন একটি চিঠি এল। অপরিচিত হস্তে লেখা।

শ্রীচরণেষু,

অসংখ্য প্রণামান্তে নিবেদন,

আমি আপনার সহপাঠী বন্ধু চন্দনলালের স্ত্রী দীয়া। আমার স্বামীর অনেকদিন পূর্বে মৃত্যু হইয়াছে। আমি তাহার পুত্র কুন্দনকে লইয়া অতিকষ্টে দিনযাপন করিতেছি। পরের বাড়িতে রাঁধুনিগিরি করিতে হয়। আমার ছেলেকে স্কুলে ভরতি করিবার সামর্থ্য নাই। আমার স্বামী মৃত্যুর পূর্বে বলিয়া গিয়াছিলেন যে আমি যদি কষ্টে পড়ি, আপনাকে যেন খবর দিই। আপনার লেখা একটি পত্রও তিনি আমাকে দিয়াছিলেন, তাহাতে আপনার ঠিকানা ছিল। এই চিঠি আমি একটি বাঙালিবাবুকে দিয়া লিখাইতেছি। আমি লেখাপড়া কিছু জানি না। আমার চিন্তা কুন্দনের জন্য। আপনি দয়া করিয়া তাহার ভার গ্রহণ করুন এই অনুরোধ জানাইয়া আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। আমার স্বামী বলিয়া গিয়াছেন যে আপনাকে জানাইলে আপনি নিশ্চয় কোনো ব্যবস্থা করিবেন তাই এই পত্র লিখিলাম। যদি অপরাধ করিয়া থাকি ক্ষমা করিবেন। আমার সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করুন।

ইতি

সেবিকা দীয়া

এই চিঠি পেয়েই আকাশ দাসকে কাশী পাঠিয়ে দিয়েছিল। দিন কয়েক পরে দাস দীয়া আর কুন্দনকে সঙ্গে নিয়ে চলে এল। বলল, দীয়ার এক মামাতো ভাই ছাড়া আর কেউ নেই। কিন্তু সে লোকটি নাকি অতি পাজি। দীয়া তার সংসারে থাকতে চায় না। দীয়া যুবতী, দেখতেও ভালো। তার পিছনে কাশীর গুণ্ডা লেগেছিল। দীয়া বলল, "আমি কাশী থাকতে পারব না। কলকাতায় গিয়ে রোজগার করে খাব। কুন্দনের বয়স তখন আট বছর। তার একটা ব্যবস্থা আপনারা করে দিন। তাই মা ছেলে দুজনকেই নিয়ে এসেছি। যা করবার তুই কর এখন।"

আকাশ বলল—"কুন্দনকে স্কুলে ভরতি করে দাও। ওর মাও লেখাপড়া শিখুক বাড়িতে। একজন মাস্টারনী বহাল কর। তার কাছে ও লেখাপড়া শিখুক।"

"ওরা থাকবে কোথায়?"

"এই বাড়িতে থাক আপাতত।"

দাস বললে— "লোকে কিন্তু নিন্দে করবে।"

"করুক। আমি নিজে যদি ঠিক থাকি লোকে কি বলবে তা আমি গ্রাহ্য করব কেন?"

দাস বললে— "সমাজে বাস করতে গেলে করতে হয়।"

"আমি ওকে মা বলে ডাকব—"

"মা বাবা যা খুশি বলে ডাকতে পার, লোকের মুখ বন্ধ করতে পারবে না। তুমি ধনী লোক, কাউকে খোশামোদ কর না, এই জন্যেই একদল লোক তোমার উপর অসন্তুষ্ট। পরশ্রীকাতর দেশে শ্রী থাকলেই শত্রু সৃষ্টি হয়। কুন্দনের মাকে যদি এ বাড়িতে রাখ তাহলে সবাই একটা ছুতো পাবে। ওরা এখন হোটেলে থাক। তারপর আমি একটা ব্যবস্থা করছি।"

দীয়া কুন্দনকে নিয়ে প্রথমে আকাশের বাড়িতেই উঠেছিল।

আকাশ দীয়াকে আশ্বাস দিয়েছিল— "তোমাকেও লেখাপড়া শিখতে হবে। রাঁধুনিগিরি করা চলবে না। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।"

দীয়া নতমুখে চুপ করে রইল।

"তুমি কুন্দনকে নিয়ে এই বাড়িতেই থাকো। রাত্রে আমার লাইব্রেরী ঘরে শুতে পারবে।"

দীয়া তবু কোনো উত্তর দিল না।

"তুমি বাংলা জানো?"

তখন সে বাংলাতেই উত্তর দিল— "জানি। আমি বরাবর বাঙালি বাড়িতেই কাজ করেছি। এ বাড়িতে কি আপনার স্ত্রী থাকেন?"

"না, আমি বিয়ে করিনি। এ বাড়িতে আমি আর দাস থাকি। আমি কিছুদিন পরে বিলেতে চলে যাব। তখন দাস আর দারোয়ান রামভুজ থাকবে—"

দীয়া তখন বলল— "না, আমি এ বাড়িতে থাকব না।" আকাশ শুনে খুব খুশি হল মনে মনে।

"বেশ, তাহলে অন্য ব্যবস্থা করে দেব। সব ঠিক হয়ে যাবে, তুমি কিছু ভেবো না। তুমি কিছু লেখাপড়া শিখে ফেল। বাংলা ইংরেজি অঙ্ক—"

"এসব শিখে কি লাভ হবে কোনো। আর এ বয়সে কোথায় পড়ব আমি!"

"লেখাপড়া শিখলে অনেক জিনিস জানতে পারবে, একটা নতুন জগতের সন্ধান পাবে। আমি তোমার জন্যে একটি মাস্টারনী বহাল করে দেব। সে তোমাকে এসে রোজ পড়িয়ে যাবে। আর কুন্দনকে ভরতি করে দেব স্কুলে।"

দীয়া চুপ করে রইল। তারপর আবার বলল— "আমি এই বয়সে লেখাপড়া শিখে কি করব? আপনি আমার জন্য কেন বেফয়দা পয়সা বরবাদ করবেন—"

"জ্ঞান হচ্ছে আলোর মতো জিনিস। তুমি অন্ধকারে আছ। আমি চাই না যে আমার দোস্তের স্ত্রী অন্ধকারে থাকুক। আরম্ভ করে দাও লেখাপড়া। টাকাকড়ির চিন্তা তোমাকে করতে হবে না।"

দীয়া আর কুন্দন কয়েকদিন হোটেলেই রইল। কয়েকদিন খোঁজাখুঁজির পর দাস একটা সুব্যবস্থা করে ফেলল। একজন রিটায়ার্ড শিক্ষয়িত্রী সুনন্দা সেনের নাগাল পেল সে। সুনন্দা সেন বিয়ে করেননি। সারাজীবন নানা জায়গায় চাকরি করে বেড়িয়েছেন। হঠাৎ বৃদ্ধ বয়সে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে ছোট একটি বাড়ি পেয়ে গেছেন তাঁর নিঃসন্তান এক মাতুলের কাছ থেকে। সেই বাড়ির নীচের দুটি ঘর ভাড়া দেবেন বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। দাস তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলল— "একটি অবাঙালি মেয়ে তার ছেলেকে নিয়ে নীচে থাকবে। মেয়েটি লেখাপড়া কিছু জানে না, সে বাংলা ইংরেজি এবং

অঙ্ক শিখতে চায়। আপনি যদি তাকে পড়িয়ে দেন তাহলে সে আপনাকে আলাদা পারিশ্রমিক দেবে।"

সুনন্দা সেন প্রশ্ন করলেন— "ওর পরিচয় দিন।"

"মেয়েটি বিধবা। আমার বন্ধু আকাশ শর্মা ওর স্বামীর সহপাঠী ছিল। মেয়েটির একটি ছেলে আছে। স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়েটি নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। তখন সে আকাশকে চিঠি লেখে যে 'আমার স্বামী আমাকে বলে গিয়েছিলেন যে আমি যদি কোনোদিন বিপদে পড়ি আপনাকে যেন চিঠি লিখি।' এই চিঠি পেয়ে আকাশ ওকে আর ওর ছেলেকে এখানে আনিয়ে নিয়েছে। আকাশেরই ইচ্ছে ওকে একটু লেখাপড়া শেখানো হোক।"

"আকাশবাবু কি করেন?"

"কেমিস্ট্রি আর ফিজিক্সে এম. এস. সি. পাস করেছে। এবার বিলেতে যাবে। তাই মেয়েটির ব্যবস্থা করে যেতে চাইছে। ওর নিজের প্রকাণ্ড বাড়ি আছে, সেখানে কিন্তু কোনো স্ত্রীলোক নেই। তাই এই ব্যবস্থা করেছে সে। নীচের ঘর দুটির কত ভাড়া নেবেন আপনি?"

"ঘর দুটি ছোট ছোট। তবু একশো টাকা চাই আমি।"

"বেশ তাই দেব আমরা। আর ওকে যদি পড়াবার ভার নেন, তাহলে আরও একশো করে দেব আমরা—"

"বেশ আপত্তি নেই। কাল আকাশবাবুর সঙ্গে দেখা করে তবে কথাটা পাকা করব। মেয়েটিকেও আগে একবার দেখতে চাই। সে কোথায় আছে?"

"একটা হোটেলে। বেশ কালই আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে আসব। নিয়ে যাব আপনাকে।"

"বেশ। কাল দশটার সময় আসবেন। আমি প্রস্তুত হয়ে থাকব।"

পরদিন আকাশ এবং দীয়ার সঙ্গে দেখা করে খুব খুশি হলেন সুনন্দা সেন।

তার পরদিনই দীয়া আর কুন্দন সুনন্দা সেনের বাড়ির নীচের ঘর দুটিতে এসে হাজির হল। দাস তার হাত-খরচের জন্য নগদ একশ টাকা দিয়ে এল। বলল—"কাছেই একটা ছোট হোটেল আছে। আমি তোমাদের টিফিন-কেরিয়ার কিনে দিয়ে যাচ্ছি। হোটেলের ঠাকুরকে বলে দিয়ে যাচ্ছি সে তোমাদের খাবার বাড়িতে দিয়ে যাবে। হোটেলটা খুব কাছেই। চল তোমাকে দেখিয়ে দিই। সুনন্দা সেন কোথায় খান?"

"তিনি কুকারে রান্না করে খান। তাঁর একটি ঝি আছে, সেই তাঁর সব কাজ করে দেয়— আমি সব ঠিক করে নেব, আপনি কিছু ভাববেন না।"

কুন্দনকে তার পরদিনই একটা স্কুলে ভরতি করে দিল দাস। সুনন্দা সেন তাঁর একটি পরিচিত স্কুলে ব্যবস্থা করে দিলেন সব। মনে মনে কিন্তু উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিলেন তিনি। সাধারণ মাপকাঠি দিয়ে আকাশকে মাপতে গিয়ে থই পাচ্ছিলেন না। বিনা স্বার্থে বন্ধুর বিধবা স্ত্রী ও ছেলের জন্য কেউ যে এতটা করতে পারে তিনি স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতেন না। স্বচক্ষে দেখেও পারছিলেন না। তাঁর মনে হচ্ছিল ভিতরে কিছু একটা নিশ্চয় আছে, যা তিনি ধরতে পারছেন না। তাঁর বাড়িতে দীয়াকে দেখবার জন্য আকাশ একদিনও আসেনি। দাস এসে মাঝে মাঝে বাইরে থেকে খোঁজ-খবর নেয়।

মাস খানেক পরে ভাড়া দিতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল দাস। দেখল দীয়াই বাড়ির কর্ত্রী হয়েছে। ঝিকে ছাড়িয়ে দিয়েছে সে, সুনন্দা সেনের রান্না, বাজার, ঘরের সব কাজ সেই করে। বৃদ্ধা সুনন্দা

সেনকে নানাভাবে সেবা করছে সে। তাঁর গা হাত পা টিপে দেয়, তেল মাখিয়ে দেয়। দাস কুন্দনকে একটি হস্টেলে ভরতি করে দিয়েছে। নীচের ঘরে এখন রান্না-ভাঁড়ার আর উপরের ঘর দুটিতে দীয়া আর সুনন্দা সেন থাকেন। তিনি দাসকে দীয়ার সম্বন্ধে যা বললেন তা তিনি জীবনে বোধহয় কারো সম্বন্ধে বলেননি। তিনি সহজে কারো প্রশংসা করেন না। তাঁর জীবনে তিনি নানা জায়গায় ধাক্কা খেয়েছেন, ঠকেছেন। তাঁর ধারণা অধিকাংশ লোকই খারাপ এবং বিশ্বাসযোগ্য নয়। দীয়ার সম্বন্ধে তিনি কিন্তু বললেন, "এমন চমৎকার মেয়ে আমি দেখিনি। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। খুব বুদ্ধিমতী। এর মধ্যেই বাংলা, ইংরেজি অক্ষর পরিচয় হয়ে গেছে। এক দুই একশ পর্যন্ত বলতে পারে। ও দেখবেন খুব তাড়াতাড়ি সব শিখে ফেলবে। আমি ওকে কি কি বই পড়াব বলুন তো?"

"তা আপনি ঠিক করবেন। আপনি প্রবীণা শিক্ষয়িত্রী, আপনি যা ভালো মনে করবেন তাই। ওকে তো কোনো পরীক্ষায় পাস করতে হবে না। আকাশের ইচ্ছা বাড়িতে বসে যতটা শিক্ষা লাভ করা সম্ভব ততটা ও লাভ করুক। কি কি বই পড়াতে হবে আপনিই ঠিক করুন সেটা।"

"আমি সেকেলে বই ভালোবাসি। আজকালকার শিক্ষায় ভড়ং বেশি, শিক্ষা কম। আজকালকার বইতে অনেক ভুলও থাকে। আমি বর্ণ-পরিচয়, বোধোদয়, কথামালা এইসব দিয়েই শুরু করব।"

"আপনি বইয়ের 'লিস্ট' দিয়ে দেবেন আমাকে। আমি কিনে আনব। ওসব বই আজকাল বাজারে পাওয়াও শক্ত।"

"যা বলেছেন। না পান তো বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলী কিনে ফেলুন।"

"আপনি যা বলবেন তাই করব।"

আকাশ বিলেতে চলে যাওয়ার পূর্বেই দীয়ার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল দাস। এসব ঘটনার মাস তিনেক পরে আকাশ বিলেতে চলে যায়। যাওয়ার আগে সে একবার দীয়ার সঙ্গে দেখা করেছিল। বলেছিল— "আমি এখন বেশ কিছুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি। দাসের উপর সব ভার দিয়ে যাচ্ছি। সে তোমাদের দেখাশোনা করবে। মন দিয়ে লেখাপড়া কর। আমি ফিরে এসে দেখতে চাই তোমার লেখাপড়া অনেক দূর এগিয়ে গেছে।"

চুপ করে রইল দীয়া।

সুনন্দা সেন বললেন— "ও খুব ভালো মেয়ে। খুব তাড়াতাড়ি সব শিখে ফেলবে। আপনি অনেকদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছেন, দাসবাবু ঠিক নিয়মিত এসে আমাদের টাকা যদি না দিয়ে যান তাহলে আমরা কি করব?"

"দাস যেমন আসছিল তেমন আসবে। এখানে একজন আমার সহপাঠী পুলিস অফিসার আছেন। তাঁকেও আমি আপনাদের নাম ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি। সে-ও মাঝে মাঝে এসে আপনাদের খোঁজ করবে। তার নাম ঠিকানা আপনাদেরও দিয়ে যাচ্ছি। দরকার হলে তাকে খবর দেবেন। আর টাকার ব্যবস্থা আমি ব্যাঙ্কেই করেছি, তাদের নির্দেশ দিয়েছি প্রতিমাসে প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তারা দীয়ার নামে ৩০০ টাকা মনি-অর্ডার করে পাঠিয়ে দেবেন। ওর মধ্যে দুশো টাকা আপনি নেবেন, আর একশো টাকা দীয়ার জন্য। দীয়া শুনেছি আপনার সঙ্গে খায়। তার জন্যে যা খরচ পড়ে সেটা কত তা ঠিক জানি না। দাসকে বলে যাচ্ছি সে সেটা প্রতিমাসে এসে খোঁজে করে দিয়ে যাবে। দীয়ার কাপড়-জামাও সে কিনে দেবে। দাস খুব ভালো ছেলে। ওকে আমি খুব বিশ্বাস করি। আমিও বিলেতে গিয়ে আমার ঠিকানা আপনাকে পাঠাব। প্রয়োজন হলে আমাকেও চিঠি লিখবেন।"

পাঁচ বছর পরে বিলেত থেকে ফিরে অবাক হয়ে গেল সে দীয়াকে দেখে। দেখল দীয়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' পড়ছে। ইংরেজি 'গ্রিম্‌স ফেয়ারি টেলস' পড়তে পারে। অঙ্ক, পাটিগণিত, জ্যামিতি এবং অ্যালজাব্রা শিখেছে। হিন্দিও শিখেছে। তুলসীদাসের রামায়ণ রোজ সুনন্দা দেবীকে পড়ে শোনায়। কুন্দনলাল ক্লাস নাইনে পড়ছে। সে-ও পড়াশোনায় ভালো। রোজ বিকেলে মায়ের কাছে আসে। কিন্তু যা দেখে আকাশ সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হল তা হচ্ছে দীয়ার অপরূপ শ্রী। সে তো রূপসী ছিলই। কিন্তু বুদ্ধির দীপ্তি এবং চরিত্রের শুচিতা তার মুখভাবে এমন একটা পবিত্র সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল যা সাধারণত দেখা যায় না। জীবন্ত দেবী মূর্তি যেন। হিন্দী দীয়া কথাটির মানে প্রদীপ। আকাশের মনে হল সত্যিই যেন একটি পবিত্র দীপশিখা জ্বলছে। আকাশ আরও বিস্মিত হল তাদের পুরোনো দারোয়ান রামভুজকে দেখে। সে এসে দীয়ার বাড়ির নীচের তলায় বসবাস করেছে। সে তো তার জমিজমা দেখছিল লক্ষ্মীগঞ্জে। এখানে এল কেন? বিলেত থেকে ফিরে আর দাসের সঙ্গে দেখা হয়নি। দাস তারই রাঁচির বাড়ির ব্যবস্থা করবার জন্য রাঁচি গিয়েছিল। বাড়িতে ছিল নূতন একটা চাকর বল্লভ। সুতরাং রামভুজ কেন যে এখানে এল তা সে জানতেই পারেনি।

"রামভুজ তুমি এখানে কেন?"

"দাসবাবু আমাকে লক্ষ্মীগঞ্জ সে বোলিয়ে আনলেন। তারপর বললেন তুমি এখানে কড়া পাহাড়া দাও। উপরে দুজন জেনানী আছে। তুমি বাড়িতে আলতুফালতু লোককে ঘুষতে দিও না।"

রামভুজের ভাষা বাংলা আর হিন্দীর খিচুড়ি। তবে বুঝতে কষ্ট হয় না।

"আলতুফালতু ছোকরা এখানে আসে না কি?"

"আসে মাঝে মাঝে। বুরি মাইজিকে সোভায় নিয়ে যাবে বলে এসেছিল কয়েকজন লৌণ্ডা। দীয়া দিদির সঙ্গে মোলাকাত করবার জন্য এসেছিল সিনেমার একবাবু মোটর হাঁকিয়ে। হাম্ কিসি কো ঘুষনে নেহি দিয়া। বললাম, চিঠ্ঠি দিজিয়ে উপর সে ভেশ দেতা হুঁ। ওঁরা যদি মুলাকাৎ করতে চান মুলাকাৎ হবে। ওরা কারো সাথে দেখা করতে মাঙে না। আমিও কাউকে ঘুষতে দিই না। রাস্তামে বহুত বেকার ছোকরা ঘুর ফির করে। আমি আমার ডান্‌ডা নিয়ে দরয়োজাতে বসে থাকি। দীয়া বেটা কুন্দনকে ছাড়া আমি আর কাউকে ঘুষতে দিই না।"

"হ্যাঁ, ঠিক কর।"

আর একটা খবর দিল রামভুজ। "কুন্দনলালকে বোর্ডিং থেকে নিয়ে আপনার কাছে রাখুন। বোর্ডিংয়ের চেটিয়ারা ভালো নয়। ভালো সঙ্গতে না মিশলে ছেলে বিগড়ে যায়। আমি একদিন কুন্দনকে বিড়ি পিতে দেখেছি। কুন্দন ছেলে খুব ভালো। লিকিন বদ সঙ্গতে খারাপ হয়ে যাবে। ওকে নিজের কাছে রাখুন।"

"বিড়ি খাচ্ছে না কি?"

"জি হাঁ।"

"আচ্ছা দেখি দাস ফিরে আসুক। ওকে বোর্ডিংয়ে রাখা চলবে না। দেখছি তাহলে—"

"হারগিজ রাখবেন না।"

"দাস আসুক।"

দাস ফিরে আসার পর কুন্দনকে সে বোর্ডিং থেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। সে নিজেই

কুন্দনকে পড়াতো। যতদিন সে কলেজে চাকরি পায়নি ততদিন কুন্দনই ছিল তার একমাত্র অবলম্বন। চাকরি পাওয়ার পর সে আরও তিনজনকে বাড়িতে থাকতে দেয়। এদের কিছু পরিচয় আগে দিয়েছি।

চাকরি পাওয়ার কিছুদিন পরে আর এক সমস্যায় পড়তে হল আকাশকে। সুনন্দা সেন বৃদ্ধা হয়েছিলেন। হঠাৎ একদিন হার্টফেল করে মারা গেলেন তিনি। তিনি বাড়ি থেকে বড় একটা বেরুতেন না। কিন্তু মৃত্যুর মাসখানেক আগে তিনি গাড়ি করে বেরিয়ে এক উকিলের বাড়ি গিয়েছিলেন। উকিল ভদ্রলোক তাঁর পূর্ব-পরিচিত। সেখানে এর আর একজন ডাক্তারকে সাক্ষী রেখে ছোট একটি উইল করেন। ছোট উইল—তার সারমর্ম, আমার কেউ নেই। কুন্দনের মা দীয়া শেষ জীবনে আমাকে সেবা করেছে নিজের মেয়ের মতো। আমার ছোট বাড়িটি তাকেই আমি দিয়ে গেলাম। এ উইলের কথা কাউকে তিনি বলেননি। দীয়াকেও না। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরে তাঁর বাক্সের ভিতর থেকে এই উইল পাওয়া গেল। তাঁর আত্মীয় স্বজন কেউ কোথাও আছে কি না তাই খোঁজবার জন্য আকাশ তাঁর ট্রাঙ্কের তালা তার পুলিস অফিসার বন্ধুটির সামনে একজন তালার মিস্ত্রির সাহায্যে খোলে। বাক্সে কিছু কাপড় জামা এবং ওই উইলটি ছিল। নগদ আড়াইশো টাকাও ছিল ওই বাক্সে। সব জিনিসের একটি ফর্দ করা হয় এবং পুলিস অফিসারটি তার নীচে মন্তব্য লিখে দেন যে সুনন্দা সেনের মৃত্যুর পর তাঁর সামনে এই বাক্স ভাঙা হয়। ফর্দে-লিখিত জিনিসগুলি বাক্সের মধ্যে ছিল। এই লিখে তাঁর নাম ও ঠিকানা লিখে দেন। উইলের প্রোবেট নিতে অবশ্য বেশ কিছু সময় লেগেছিল। কিন্তু দীয়া ওই বাড়িতেই থাকতে লাগল। সেই সময় কুন্দনও কিছুদিন ছিল দীয়ার কাছে। রামভুজই তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করত। দীয়াকে খুব শ্রদ্ধা করত সে। 'মাতাজি' বলে ডাকত। সুনন্দা সেন মারা যাওয়াতে দীয়ার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি সেকালের এম. এ. ছিলেন। দীয়াকে অনেক শিখিয়েছিলেন। তাকে সংস্কৃত পড়াতে আরম্ভ করেছিলেন। ইচ্ছে ছিল ওকে ফরাসি ভাষাও শেখাবেন, কিন্তু হল না। মারা গেলেন তিনি। কিছুদিন পরে কিন্তু লোক পাওয়া গিয়েছিল আর একজন। খুব ভালো লোক।

স্রোতস্বিনী দেবীর কথা আগে বলেছি— আকাশ যার নাম দিয়েছিল— কারেন্ট। যিনি একজন ছোকরা অধ্যাপকের অশিষ্ট আচরণের জন্য তার গালে এক চড় মেরেছিলেন। চড় খেয়েও কিন্তু প্রফেসারটির চৈতন্য হয়নি, সুযোগ পেলেই সে বিরক্ত করত স্রোতস্বিনীকে। গোপনে নানারকম অশ্লীল ভঙ্গি করত। আকাশ তাকে পরামর্শ দিয়েছিল, "ওসব নিয়ে হই-চই কোর না, উপেক্ষা কর। ভান কর যেন তুমি কিছু দেখতে পাওনি।" কারেন্ট বলল, "তা তো আমি করছি। ওর দিকে চাই না কখনও। একটা ছোরা কিনেছি, সেটা সর্বদা সঙ্গে রাখি। যদি ও আমার গায়ে হাত দেয় ছোরা মারব।"

।। দুই ।।

কোনো মানুষের নিজের ইচ্ছেমত জীবন চলে না। জীবন তার নিজের ইচ্ছেমতই চলে। মানুষ শুধু সংগ্রাম করে, মানুষ শুধু লড়াই করে।

ইতিহাসও তাই। ইতিহাস পরোয়াই করে না কাউকে। ইতিহাসই নিজের প্রয়োজন সিদ্ধি করার জন্যে একজন জুলিয়াস সীজার তৈরি করে, কিম্বা তৈরি করে একজন নেপোলিয়ানকে। তাদের সকলকে সৃষ্টি করে আবার তাদের একদিন ধ্বংস করেই ইতিহাসের কৌতুক।

আকাশ লেখা-পড়া জানা ছেলে। শুধু লেখা-পড়া জানাটাই বড় কথা নয়, লেখা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি আবার টাকার সংযোগ ঘটে তাহলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা একটা বিস্ফোরণ ঘটায়।

বিদেশ থেকে ফিরে আকাশ যখন আবার দেশে এসে পৌঁছল, তখন চারদিকের অবস্থা দেখে সে বিস্মিত হয়ে গেল। এত সমস্যা, এত পাপ তার চার পাশে। আগেও এ-সব ছিল এখানে, কিন্তু পরিমাণে কম!

সেদিন কলেজ থেকে বাড়ি এসে আকাশের শরীরটা একটু খারাপ হল। রাতে আর কিছু খেল না সে।

তারপরে আর কিছুই তার মনে ছিল না। কোথা দিয়ে যে রাত কেটে গেল তার আর খেয়াল রইল না।

পাঁচ বছর সে বিদেশে কাটিয়েছিল। পাঁচটা বছর কম নয়। কত অনিয়ম সে সেখানে করেছে, কত অখাদ্য-কুখাদ্য তাকে খেতে হয়েছে সেখানে বাধ্য হয়ে। তবুও কিছু ক্ষতি হয়নি তার।

আর তারও আগে?

তারও আগে যখন সে কাশীতে ছিল তখনও অনেকদিন সে কত অনিয়ম করেছে। তবু তো সে কখনও অসুস্থ বোধ করেনি!

এও বোধহয় বয়েসের ধর্ম। তাহলে সে কি এই ক'বছরের মধ্যেই বৃদ্ধ হয়ে গেল।

সমস্ত রাত যেন কী এক স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থায় কাটল। আকাশের একবার মনে হল সে যেন লন্ডনের রাস্তায় একলা-একলা হাঁটছে। চমৎকার রোদ উঠেছে অনেক দিন পরে। সবারই খুব খুশি খুশি মুখ।

হঠাৎ একটা চেনা মুখ দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছে।

—এ কী? তুমি?

আশ্চর্য! দীয়া লন্ডনে এল কী করে?

দীয়াও অবাক হয়ে গেছে আকাশকে দেখে। বললে—আপনি?

আকাশ বললে—আমি তো এক বছর আগেই এখানে এসেছি। আসবার সময়ে তোমাকে যে আমি বলে এলাম আমি লন্ডনে যাচ্ছি। তোমার মনে নেই?

দীয়া বললে—কই, আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না—

আকাশ বললে—আশ্চর্য তো। তা তুমি যে চলে এলে, কুন্দনকে কোথায় রেখে এলে?

দীয়া বললে—কুন্দন নেই!

—নেই মানে?

দীয়া বললে— সে বখে গেছে!

কেন, তাকে তুমি দেখতে না বুঝি? বোর্ডিং-এ থেকে সে তো খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশে মিশে খারাপ হয়ে গিয়েছিল বলে দাস তাকে বোর্ডিং থেকে আমার বাড়িতে রেখে দিয়েছিল—

দীয়া বললে—বাড়িতে রাখলে কী হবে? যে খারাপ হবেই তাকে ভালো করতে চাইলেও সে কিছুতেই ভালো হবে না—

আকাশ জিজ্ঞেস করলে— শেষ পর্যন্ত কী হল তার—

দীয়া বললে— সে বোর্ডিং-এ থাকবার সময় যেমন গুণ্ডা বদমায়েশদের সঙ্গে মিশত, বাড়িতে এসেও তাদের সঙ্গে মেলা-মেশা বন্ধ হল না। শেষকালে...

—শেষকালে কী?

—শেষকালে পুলিসের হাতে একদিন ধরা পড়ল।

আকাশ জিজ্ঞেস করলে—কেন ধরা পড়ল সে?

দীয়া বললে—কখন যে সে কোথায় থাকত, কী করত তা আমরা কেউই জানতাম না। ঠিক সময়ে বাড়িতে আসত না। যখন বাড়িতে আসত তখন এক-একদিন এমন হত যে সমস্ত দিনই ঘুমোত।

—তারপর?

—তারপর একদিন হঠাৎ টের পেলাম যে সে নেশা করে।

—নেশা? কীসের নেশা? মদের?

—না। মদের নেশা নয়। ওষুধের নেশা।

আমি তবু কিছু বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম— ওষুধের আবার নেশা হয় নাকি?

দীয়া বললে— হ্যাঁ, আজকাল অমন অনেক রকম ওষুধ বেরিয়েছে, যা খেলে মদের চেয়েও বেশি নেশা হয়।

—সে সব ওষুধের নাম কী?

দীয়া বললে—তা জানি না—সে-সব ওষুধ আমি কখনও খাইওনি, সে-সব ওষুধের নামও আমি কখনও শুনিনি—পুলিসের মুখ থেকেই প্রথম তার নাম শুনলুম। তারা বললে—তার নাম ম্যান্‌ড্রেক্স না কী যেন...

—তারপর?

—তারপর একদিন হঠাৎ ভোরবেলা পুলিস কুন্দনকে ধরে নিয়ে এল আমার বাড়িতে, দেখি তার হাতে হাত-কড়া লাগানো। কী করেছিল সে? না কোথায় নাকি বোমা তৈরি করছিল। তাদের আড্ডায় নাকি অনেক বোমাও তৈরি হচ্ছিল তখন। সেই সব বোমা নাকি তারা মোটা দামে গুণ্ডাদের কাছে বিক্রি করত—

আকাশ জিজ্ঞেস করলে—তারপর কী হল?

—তারপর সে এখন ইন্ডিয়ায় জেল খাটছে, মানুষ খুন করবার অপরাধে তিন বছরের জেল হয়েছে তার। এ-সব কাণ্ড দেখে জীবনের ওপর আমার ঘেন্না হয়ে গেছে। তাই আমি লন্ডনে চলে এসেছি আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে—

আকাশ অবাক হয়ে গেল দীয়ার কথা শুনে।

বললে—আমার সঙ্গে দেখা করে তোমার কী লাভ হবে?

দীয়া বললে—আপনি কলকাতায় থাকলে আমার এমন বিপদ হত না। কলকাতাতে আর থাকতে ইচ্ছে করে না আমার—

আকাশ জিজ্ঞেস করলে—তা এত দূরে কী করে এলে? কার সঙ্গে এলে? কে নিয়ে এল তোমাকে?

—আপনার বন্ধু দাসানুদাস। দাস—

এতক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল।

আকাশ জিজ্ঞেস করলে—দাস কোথায়?

দীয়া বলল—সে আমাকে এখানে পৌঁছিয়ে দিয়ে কোথায় পালিয়ে গেছে।

—পালিয়ে গেছে মানে? পালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য কী?"

দীয়া বললে—আমাকে যে জন্যে এখানে নিয়ে এসেছিল সে, কলকাতায় থাকলে আমি তা জানতে পারতুম। নিজের উদ্দেশ্যটা সিদ্ধি করবার জন্যেই সে আমাকে ভুল বুঝিয়ে এখানে নিয়ে এসেছিল—

দীয়ার কথাগুলো আকাশের কাছে কেমন যেন হেঁয়ালির মত লাগল। শেষকালে কি সেই দাসও তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে! অথচ আকাশই তো ওই দাসকে কত রকমে সাহায্য করে মানুষ করে তুলেছিল! মানুষ কি এত অকৃতজ্ঞ হতে পারে? তাহলে কি বুঝতে হবে সংসারে ভালো হওয়াও একটা পাপ!

হঠাৎ একটা গাড়ির হর্নের শব্দে আকাশের ঘুম ভেঙে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব জগতে ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচল আকাশ।

চোখ মেলতেই দেখলে সামনে দীয়া তার দিকেই চেয়ে আছে।

দীয়ার চেহারা এ কী হয়েছে! এত রোগা হয়ে গেছে কেন?

দীয়া জিজ্ঞেস করলে—এখন কোনো কষ্ট হচ্ছে?

আকাশ খুব নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলে—আমার কী হয়েছিল?

দীয়া বললে— আপনি কথা বলবেন না। চুপ করে থাকুন। ডাক্তারবাবু কথা বলতে বারণ করে দিয়ে গেছেন।

বলে বিছানার পাশ থেকে উঠে গেল।

তারপর পাশের টেবিল থেকে কী একটা শিশি থেকে লাল রং-এর খানিকটা ওষুধ গেলাসে ঢেলে নিয়ে আবার সামনে এসে দাঁড়াল।

বললে—এই ওষুধটা খেয়ে নিন। হাঁ করুন—

আকাশ জিজ্ঞেস করলে—তুমি কি লন্ডনে গিয়েছিলে?

দীয়া তো হতবাক। লন্ডনে? আবার কি প্রলাপ বকছেন নাকি আকাশবাবু!

আকাশ বললে—আমার মনে হচ্ছে আমি বোধহয় স্বপ্ন দেখছিলুম।

—স্বপ্ন?

আকাশ বললে—হ্যাঁ, স্বপ্নে তোমাকে দেখছিলুম...

দীয়া বললে—আপনি আগে ওষুধটা খেয়ে নিন। হাঁ করুন—

বলে আকাশের মুখটা বাঁ হাত দিয়ে ধরে ডান হাতটা দিয়ে পুরো ওষুধটা মুখের ভেতরে ঢেলে দিলে।

তারপর খালি গেলাসটা টেবিলের ওপর রেখে এসে বললে—আপনি আর কথা বলবেন না। আপনার বিশ্রামের দরকার এখন—

আকাশ তবু জিজ্ঞেস করলে—আমার কী হয়েছিল বলো না—

দীয়া বললে—আপনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। দুদিন আপনার জ্ঞান ছিল না—

—দু'দিন!

—হ্যাঁ। আমরা সবাই খুব ভাবছিলাম আপনার জন্যে!

আকাশ জিজ্ঞেস করলে—তুমি কি দু'দিন ধরেই এখানে আছ?

—শুধু আমি নই, আমরা সবাই—।

—আমি কিছুই টের পাইনি। আর কারেন্ট? সেই স্রোতস্বিনী?

দীয়া বললে—হ্যাঁ, তিনিও ছিলেন।

আকাশ জিজ্ঞেস করলে—তোমার ছেলে কুন্দন ভালো আছে?

দীয়া কোনও উত্তর দিলে না সে-কথার।

আকাশ আবার জিজ্ঞেস করলে—কথা বলছ না যে! কুন্দনের কী হল?

তবু দীয়া কিছু বললে না।

আকাশ বললে—স্বপ্নে তুমি তার কথাও বলেছিলে—

—কী বলেছিলুম?

আকাশ বললে—স্বপ্ন তো মিথ্যে! স্বপ্নের কথা কি সত্যি হয়, তুমিই বলো?

দীয়া বললে—এখন ও-সব কথা না-ই বা বললেন। এখুনি ডাক্তারবাবু এসে যদি দেখতে পান যে আপনি এত কথা বলেছেন, তাহলে তিনি আমার ওপরেই রাগ করবেন। আপনি দয়া করে চুপ করুন—

আকাশ বললে—কিন্তু তুমি শুধু একবারটি বলো কুন্দন কোথায়?

দীয়া যেন কী একটা কথা বলতে গিয়েও থেমে গেল। তারপর বললে—কুন্দনের কথা না-ই বা শুনলেন। এখন আপনার শরীর খারাপ, আপনি এখন নিজের শরীরের কথা ছাড়া আর কিছু ভাববেন না—

আকাশ আর থাকতে পারলে না। দীয়ার একটা হাত ধরে বললে—তুমি শুধু একবার বলো কুন্দন সম্বন্ধে আমি যা স্বপ্নে দেখেছি, তা কি সত্যি?

—আপনি স্বপ্নে কী শুনেছেন বা কী বলেছেন তা আমি কী করে জানবো?

আকাশ বললে—তুমি বলবে না তো?

দীয়া বললে—আপনার পায়ে পড়ছি, আমার ছেলের সম্বন্ধে আপনি কিছু প্রশ্ন করবেন না—

আকাশ বললে—ঠিক আছে, শুধু একটা কথার উত্তর দাও তো, কুন্দন ভালো আছে তো?

দীয়া হয়তো এ-প্রশ্নের কিছু উত্তর দিত, কিন্তু তার আগেই ডাক্তারবাবু ঘরে ঢুকলেন। ডাক্তার মুখার্জি আকাশের চেনা। পাড়াতেই থাকেন। আকাশের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন—আকাশবাবু, আপনি তো আমাদের ভাবিয়ে তুলেছিলেন—

তারপর আকাশের একটা হাত নিজের একটা হাতে ধরে কী বোধহয় দেখতে লাগলেন। বোধহয় নাড়ির গতি পরীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর স্টেথিস্‌কোপ্‌টা বার করলেন আকাশবাবুর হার্ট পরীক্ষা করবার জন্যে।

আকাশবাবু হাসি মুখে বললেন—হার্টের আর আমার কী দেখবেন ডাক্তার মুখার্জি, আমার তো হার্টই নেই—

ডাক্তার হাসতে হাসতে বললেন— আপনি কি তাহলে হার্টলেস?

আকাশের মুখেও তখন একটা ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল। বললে—কথাটা মিথ্যে বলেননি।

ডাক্তারবাবু কী দেখলেন কে জানে। স্টেথিস্‌কোপ্‌টা বাক্সে ঢুকিয়ে রাখলেন। দীয়া ডাক্তারবাবুর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু বললেন—ডায়েট্ কী দিচ্ছেন?

দীয়া বললে—আজকেই তো প্রথম ওঁর জ্ঞান হল।

ডাক্তারবাবু বললেন— কেবল লিকুইড্ খেতে দেওয়াই ভালো। পাত্‌লা ঘোল, আর মিছ্‌রির জল দিতে পারেন। যদি খাওয়ার ইচ্ছে ওঁর থাকে। এখন সলিড্ ফুড্ কিছুই দেওয়া চলবে না—।

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—আপনিও তো কদিন ওর বিছানা ছেড়ে ওঠেননি! আপনি অসুখে পড়ে গেলে কে দেখবে?

দীয়া বললে—আমার কথা ছেড়ে দিন, আমরা মেয়েরা সহজে মরি না—

বলে ডাক্তারবাবুর দিকে কয়েকটা নোট এগিয়ে দিতে গেল। কিন্তু ডাক্তারবাবু বললেন—ওটা থাক্—

বলে টাকা না নিয়ে চলে গেলেন। দীয়া কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে আবার চলে এল আকাশের ঘরে।

আকাশ তখন চোখ বুঁজে আগেকার মতই শুয়ে ছিল। দীয়া সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অনেকক্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল।

পেছন থেকে হঠাৎ কানে এল বল্লভের গলা—মা—

দীয়া বল্লভের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললে—অত চেঁচাচ্ছ কেন?

ঘরের বাইরে গিয়ে আবার বললে— দেখছ বাবু এখন ঘুমোচ্ছেন, এ সময়ে কি চেঁচাতে আছে?

বল্লভ গলাটা আরো নিচু করে বললে—কিন্তু মা, আপনি চা খাবেন না?

দীয়া বললে—তোমার আক্কেলটা কী বলো তো বল্লভ, তোমার বাবু দু'দিন ধরে মুখে কুটোটি নাড়ছেন না, আর আমি চা খাব?

বল্লভ বললে—কিছু না খেলে আপনার শরীর টিকবে কি করে? আর কেউ না জানুক আমি তো জানি এই দুদ্দিন ধরে আপনি বাবুর কত সেবা করছেন—

দীয়া সে-কথায় কান না দিয়ে বললে— তুমি একটা কাজ করবে?

—কী কাজ, বলুন না মা—

—দুটো ডাব কিনে আনতে পারবে বাজার থেকে?

—কেন পারব না?

দীয়া বললে—আরো একটা কথা, আর আড়াই শো দইও কিনে আনতে হবে ওই সঙ্গে—

—ঠিক আছে—

বলে বল্লভ চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু দীয়া তাকে আবার ডাকলে। বললে—তুমি চলে যাচ্ছ যে? টাকা নেবে না?

শেষ পর্যন্ত পাঁচ টাকার একটা নোট বল্লভের হাতে দিয়ে বললে— বেশি দেরি কোর না, বুঝলে? পরে আবার বাবুর জন্যে তোমাকে দোকান থেকে ওষুধ কিনে নিয়ে আসতে হবে—

—তাহলে সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যান, নইলে কে কখন ভেতরে ঢুকে পড়বে—

বলে বল্লভ চলে গেল।

সেদিন বাড়ির একতলার সামনে ভোর রাত্রে সদর দরজায় ধাক্কা পড়ল। রামভুজের ভোরবেলাতেই রোজ ঘুম ভাঙে। কিন্তু সেদিন কী হয়েছিল কে জানে তখনও তার ঘুম ভাঙেনি।

সদর দরজায় বার কয়েক ধাক্কার শব্দতেই সে যথারীতি বললে—কৌন্ হ্যায়?

বাইরে থেকে কে যেন কী জবাব দিলে তা স্পষ্ট বোঝা গেল না। তাড়াতাড়ি তার খাটিয়া থেকে উঠে সে দরজাটা খুলে দিতেই একেবারে আকাশ থেকে পড়ল। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন পুলিস কন্‌স্টেবল্ আর বোধহয় তাদের দারোগা।

রামভুজ জিজ্ঞেস করলে—ক্যা মাঙ্‌তা হুজুর?

পুলিসের দারোগা ততক্ষণে সদলবলে ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

রামভুজ বললে—মা'জী কোঠিমে নেহি হ্যায়—

—কেন? কোথায় গেছে?

—আমার সাহেবের বাড়িতে।

—কে তোমার সাহেব?

রামভুজ বললে—আকাশবাবু।

—কেন, তোমার মাজী সেখানে গেছে কেন?

রামভুজ বললে—আকাশবাবুর বেমার হয়েছে—

—সেখানে কতদিন গেছে?

—আজ সাতদিন হল সেখানে গেছে—

পুলিস-দারোগা জিজ্ঞেস করলে—তাহলে তুমি কী করছ এ বাড়িতে?

রামভুজ বললে—আমি তো নৌকর আছি হুজুর!

—বাড়িতে তাহলে আর কেউ নেই?

—না, হুজুর।

পুলিস-দারোগা বললে— তবু আমরা বাড়ি সার্চ করব—

রামভুজ বললে—কিন্তু সব ঘরে যে তালা-চাবি বন্ধ হুজুর। আপনারা ঘরে তো ঢুকতে পারবেন না—

তখন কে আর রামভুজের কথা শোনে। পুলিস বলে কথা। তারা রামভুজের কথা না শুনেই ভেতরে ঢুকতে গেল।

প্রথমে একতলা। একতলায় রান্নাঘর। ঘরটার দরজায় শেকল দেওয়া ছিল। পুলিস শেকলটা খুলে ভেতরে ঢুকল। যেখানে যা পেলে সব উল্‌টে-পাল্‌টে ফেলে দিলে।

রামভুজ মনে মনে রাগলেও কোনো বাধা দিতে পারলে না।

পুলিস একতলা শেষ করে দোতলায় উঠল। দোতলার সব ঘরে দরজাতেই তালা-চাবি বন্ধ করা ছিল। সে সব তালা চাবি ভেঙে তারা ঘর-আসবাবপত্র তচ্‌নচ্ করে দিলে।

তারপরে দীয়ার শোওয়ার ঘর। আগে ওই ঘরে সেই সুনন্দা সেন থাকত। সে-ঘরের চারদিকে শুধু বই আর বই। সুনন্দা আগে ওই সব বই পড়ত। তারপর দীয়াকেও ওই সব বই পড়তে শিখিয়েছিল সে।

দেয়ালের গায়ে মাত্র একটা ছবি টাঙানো ছিল। একজন পুরুষ মানুষের ছবি।

পুলিসের দারোগা জিজ্ঞেস করলে—ও ছবিটা কার?

রামভুজ বললে—ওটা হামার মাজীর ছবি—

—মা'জীর ছবি? ও তো পুরুষ মানুষের ছবি।

—ছবিটা হামার বাবুর।

—বাবু কে? তোমার বাবু কে?

রামভুজ বললে—আমার বাবুর নাম আকাশবাবু।

রামভুজের কথা শুনে পুলিসের দারোগা কী বুঝল কে জানে, কিছু মন্তব্য করলে না। যেমন ঘরের আসবাবপত্র তচ্-নচ্ করছিল, তেমনিই করতে লাগল। মা'জীর ঘরের পাশে দাদাবাবুর শোবার ঘর।

সেই ঘরটার ওপরেই যেন পুলিসের বেশি আক্রোশ। দাদাবাবুর বিছানা থেকে আরম্ভ করে খাটের তলা, আলমারি, সুটকেস—সমস্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজে কী সব চিঠি-পত্র দেখতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে, রামভুজ তা বুঝতে পারলে না।

তারপর বাথরুম। চান করবার ঘর।

বাথরুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।

পুলিস জিজ্ঞেস করলে—ভেতরে কে আছে?

রামভুজ বললে—ভেতরে কোই নেই হুজুর—

—তা হলে দরজা খুলছে না কেন?

পুলিস অনেক বার ধাক্কা মারতে লাগল তবু কোনো উত্তর নেই। তখন পুলিসের সন্দেহ হল। ভেতরে নিশ্চয়ই কেউ আছে। বার-বার ধাক্কা দিয়েও যখন দরজা খুলল না, তখন পুলিস রামভুজকে একটা শাবল দিতে বললে। শাবল না থাকে তো অন্য কোনো রকমের ভারি ধারাল অস্ত্র।

রামভুজ ভয় পেয়ে গেছে। বললে—হামার কাছে তো কুছ্ ওইসা চিজ্ নেই হুজুর—

সত্যিই কোনো ভারি অস্ত্র তার কাছে ছিল না।

পুলিসের দারোগা তখন কোমর থেকে তার রিভলবারটা বার করলে। সেটা বাথরুমের দিকে তাগ্ করে রেখে একজন কন্‌স্টেবলকে খুব ভারি কোনো হাতুড়ি জাতীয় জিনিস আনতে বলে দিলে থানা থেকে।

কন্‌স্টেবল দারোগা সাহেবের হুকুম পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ল থানার দিকে।

পাহাড়ি রাস্তা যেমন অসমতল, মানুষের জীবনও তেমনি বোধহয় সমতল রাস্তায় চলতে অস্বীকার করে। সোজা চলতে চলতে সে বোধহয় ভাবে তার পথের দিশা ভুল হয়ে গেল। তাই সে নিজের রাস্তা ছেড়ে আরো সোজা রাস্তায় চলবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে।

আর তখনই হয় গোলমাল। যতবার সে সোজা সরল পথে চলতে চেষ্টা করে ততবার সে পরকে প্রবঞ্চনা করে, নিজেকেও করে বিড়ম্বিত।

এই সহজ পথে চলতে গিয়েই আকাশ নিজেকে বিড়ম্বিত করে তুলল।

ওই স্রোতস্বিনীর কথাই ধরা যাক। সে চেয়েছিল লেখা-পড়া নিয়েই সারা জীবনটা স্বস্তিতে কাটিয়ে দেবে। কিন্তু তা করতে গিয়ে তার কী পরিণতি হল সেটা আজও আকাশের মনে আছে।

স্রোতস্বিনীর চেহারা আর স্বভাবের মধ্যেও কী একটা যাদু ছিল যার জন্যে তাকে পদে পদে বিড়ম্বিত হতে হত। রাস্তা দিয়ে ভব্য ভদ্রভাবে চললেও অন্য লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত কিছু বৈশিষ্ট্য তার চরিত্রে ছিলই। কেন তার দিকে লোকে অমন লোভনীয় দৃষ্টি দিয়ে দেখে? সে কি তার যৌবন, না কি তার রূপ। সে যত নিজেকে আড়াল করতে চাইত ততই সে পুরুষদের চোখে আকর্ষণীয় হয়ে উঠত।

সেই কথা ভেবেই বোধহয় আকাশ তার একটা ডাক-নাম দিয়েছিল—কারেন্ট।

কিন্তু কারেন্ট তো শুধু আকর্ষণ করে না, বিকর্ষণও করে। কখনও সে টানে আবার কখনও সে ছাড়েও।

কারেন্ট থাকতো একটা লেডিজ-হোস্টেলে। কিন্তু কাজকর্মের ফিকিরে সবাইকেই যেমন বাইরে বেরোতে হয়, তেমনি কারেন্টকেও বাড়ির বাইরে বেরোতে হত। তখনই কারেন্ট দেখত যে রাস্তার লোকেরা যেন তাকে গিলছে। যেন তাকে মুখে পুরে চিবিয়ে গিলে ফেলতে পারলে তাদের আশা-পূরণ হয়।

অথচ রাস্তা দিয়ে সে একলাই শুধু যে হেঁটে যায়, তা তো নয়। তার মত আরো অনেক মেয়েই যায়। কিন্তু সবাইকে ছেড়ে দিয়ে মানুষ কেবল তার দিকেই বা অমন লোভাতুর দৃষ্টি দিয়ে দেখে কেন?

এই জন্যে তাকে অনেকবার অনেক ঘটনারও মুখোমুখি হতে হয়েছে। অনেকবার পুলিসের থানায় গিয়ে অনেক অভিযোগও দায়ের করতে হয়েছে।

কিন্তু তাতে কোনো প্রতিকার হয়নি কোনো দিক থেকে।

আজকালকার মানুষের সমাজ এমনই এক স্তরে এসে পৌঁছিয়েছে যে একা পুলিসের পক্ষে কোনও অভিযোগেরই প্রতিকার করা সম্ভব হচ্ছে না। হয় পুলিস কর্তব্যভ্রষ্ট হচ্ছে, আর নয়তো সব অভিযোগের প্রতিকার করা পুলিসের কাম্য নয়। কিম্বা দৈনন্দিন জীবন-যাপনের অতি-প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য-বৃদ্ধি এমন এক স্তরে গিয়ে পৌঁছিয়েছে যে বাঁধাধরা মাস-মাইনেতে তাদের সংসার-যাত্রা নির্বাহ করা দুঃসাধ্য বলে তাদের বাঁ-হাতের গোপনীয় এবং সহজ উপার্জনের আশ্রয় খুঁজে নিতে হয়েছে।

এতে পুলিসকেও দোষ দেওয়া চলে না।

কারণ অভিজ্ঞতায় এটা জানা হয়ে গিয়েছে যে আজ যদি তুমি সোজা এবং সৎ রাস্তায় চলো তাহলে তোমার অনেক শত্রু গজাবে। আর সেই শত্রুরা তোমার জীবন-সংশয় করলেও তোমাকে রক্ষা করবার কেউ থাকবে না। আর যদি তুমি অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে চলো তো তোমার অনেক বন্ধু মিলবে, মিলবে অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী।

কিন্তু মজা এই যে এমন হওয়া সত্ত্বেও কিছু সৎ লোক চিরকালই পৃথিবীতে আছে এবং থাকবে। তারাই আকাশের এই পৃথিবীর গতিকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সেদিন এমনি একটা ঘটনাই ঘটল।

কারেন্ট তার কাছে সব সময়ে একটা ধারাল ইস্পাতের ছোরা সঙ্গে রেখে দিত। কারেন্ট কখনও ভাবেনি যে তাকে সেটা কোনও দিন ব্যবহার করতে হবে।

কিন্তু একদিন তাকে সত্যিই ব্যবহার করতে হল।

তখন দিনের আলো নিঃশেষ হয়ে গেছে। সেই আলো-অন্ধকারের ভেতরে যখন স্রোতস্বিনী হোস্টেলের দিকে ফিরছিল তখন কোথা থেকে কে একজন অজ্ঞাত মূর্তি তাকে আচমকা আক্রমণ করে বসল।

বোধহয় সব মিলিয়ে এক মিনিটের ঘটনা।

সমস্ত ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে ফেলার আগেই অজ্ঞাত ব্যক্তিটা নিজের কার্য সিদ্ধি করে

অন্ধকারের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। লোকটা তার হাতের ঘড়িটা হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে। নিজের কাছে লুকোনো ছোরাটা ব্যবহার করবার অবকাশও দিলে না সে।

কিন্তু আশ্চর্য, ছেলেটা পালাবার সময়ে তার এক পাটি জুতো রাস্তার ওপর ফেলে দিয়েছিল। কারেন্ট সহজে হেরে যাওয়ার পাত্রী নয়। সে সেই জুতোটা কুড়িয়ে নিয়ে সোজা থানায় চলে গেল।

থানার বড়বাবু তখন দফ্‌তরে ছিল না।

ছোটবাবু? ছোটবাবু আছে?

না, তাও নেই। সবাই কাজে বেরিয়েছে।

তবু কারেন্ট দমবার পাত্রী নয়। সে বললে—আজ যতক্ষণ বড়বাবু থানায় না আসে ততক্ষণ আমি এখানে বসে থাকলুম—

বলে থানার সামনের বেঞ্চের ওপরেই বসে রইল।

প্রায় যখন এক ঘণ্টা সময় কেটে গেছে তখন বড়বাবু বুটের শব্দ করতে করতে এলেন। কারেন্ট উঠে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলে—স্যার, আপনিই এ থানার ও-সি?

বড় দারোগাবাবু চলতে চলতে বললেন—হ্যাঁ, আসুন—

বলতে বলতে থানার বড়বাবু নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। স্রোতোস্বিনীও ঢুকল।

বড়বাবু বললেন—বসুন—বলুন, কী আপনার আর্জি?

কারেন্ট বললে—আমি অনেকদিন থেকেই আপনার কাছে আসব আসব করছিলুম কিন্তু ভেবেছিলুম অযথা আপনাকে বিরক্ত করে কী হবে! কিন্তু এবার আর না এসে পারলুম না। আপনার মূল্যবান সময় একটু নষ্ট করছি—

বড়বাবু বললেন—না, না, আপনি বলুন কী আপনার অভিযোগ?

স্রোতোস্বিনী বললে—দেখুন, আমি এখানকার লেডিজ্ হোস্টেলে থাকি। কাজ করি একটা কলেজে। সেই কাজের সূত্রে আমাকে রাস্তায় বেরোতে হয়। বাসে ট্রামে উঠতে হয়। কিন্তু এ পাড়ার কিছু গুণ্ডা গোছের ছেলে আমাকে খুব উত্ত্যক্ত করে নানাভাবে,—

—কী করে তারা?

—আমাকে দেখলে তারা শিস দেয়, মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কোনো হিন্দী সিনেমার গান গায়। তারপর কখনও কখনও আমার পেছনে পেছনে আসে। যতক্ষণ না আমি বাসে-ট্রামে উঠি ততক্ষণ তারাও পেছনে পেছনে আসে। তারপর যখন আবার কলেজ থেকে ফিরি তখন আমার পেছনে লাগে। আমি এতদিন কিছু বলিনি। এই দেখুন, আজ কী করেছে—

বলে কারেন্ট তার হাতটা বাড়িয়ে দেখালে। বললে—এই দেখুন, আজকে আমার সামনে একটা বোমা ফাটাতেই আমি ভয়ে চম্‌কে উঠেছি, আর সেই ফাঁকে তারা আমার হাত-ঘড়িটা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে—

দারোগবাবু সব শুনলেন। বললেন—তাদের মুখ দেখলে আপনি চিনতে পারবেন!

—হ্যাঁ।

—তাদের সকলের নাম বলতে পারবেন?

কারেন্ট বললে—হ্যাঁ—

—বলুন তো কী নাম?

—সকলের নাম বলতে পারব না। দুজনকে চিনি। একজন হচ্ছে কুন্দন আর একজন হচ্ছে জাপানী...

দারোগাবাবু নামগুলো তাঁর নোটবইতে লিখে নিলেন।

—ঠিকানা?

কারেন্ট বললে—ঠিকানা বলতে পারব না। তবে তাদের আরো কীর্তি-কলাপের কথা কিছু-কিছু জানি।

—কী রকম?

কারেন্ট বললে—যদি এ পাড়ায় কিছু নতুন ভাড়াটে কেউ আসে তাহলে তারা বাড়িওয়ালার কাছে পাঁচ ছ'হাজার টাকা দাবি করবে। কিম্বা আবার যদি কোনো ভাড়াটে বাড়ি খালি করে দিয়ে চলে যায় তাহলে ওই একই রেট। পাঁচ ছ'হাজার টাকা দিতে হবে বাড়িওয়ালাকে—

বড়বাবু বললেন—কিন্তু কোনও ল্যান্ড্‌লর্ড তো আমাদের কাছে আগে কখনও কম্‌প্লেন করেনি—

কারেন্ট বললে—করবে কেন?

বড়বাবু বললেন— কেন করবে না?

কারেন্ট বললে—তারা জানে যে পুলিশের কাছে কম্‌প্লেন করলে কোনো ফল হবে না।

—কে বললে?

কারেন্ট বললে—কে আবার বলবে? সবাই জানে সে-কথা। আপনার স্টাফরাও জানে। কারণ তারাও সে টাকার ভাগ পায় যে! আপনার স্টাফরা জানে কারা বোমা তৈরি করে। সবই তাদের জানা। কিন্তু তবু গুণ্ডারা ধরা পড়ে না কেন?

বড়বাবু এ-কথার কোনো জবাব দিলে না।

কারেন্ট বললে—আমি অপ্রিয় কথা বলছি বলে আপনি যেন কিছু মনে করবেন না—

বড়বাবু বললেন—ঠিক আছে, আপনি এখন যান। আমি দেখি আমার স্টাফ্ কোনো স্টেপ্ নেয় কি না—

বলে টেবিলের ওপর কলিং-বেলের সুইচ্‌টা টিপলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে একজন কন্‌স্টেবল ঘরে ঢুকেই বললে—হুজৌর—

স্রোতোস্বিনী তখন উঠে দাঁড়িয়েছিল।

বললে—আমি তা হলে যাচ্ছি স্যার—

বলে আবার বাইরে বেরিয়ে গেল।

সত্যিই মানুষের জীবনও পাহাড়ি রাস্তার মত অসমতল। সে বরাবর সমতল রাস্তায় চলতে অস্বীকার করে। যাত্রা সরল আর সহজ করবার জন্যে সে যতবার সোজা পথ বেছে নেয় ততবার সে ঘুর পথে ঘুরে ঘুরে মরে। আজ তারপর ঘুর পথ ধরে ঘুরতে ঘুরতে কখন তার ভুল ভাঙে আর কখন সে আবার তার যাত্রাপথের শুরুতে পৌঁছিয়ে আবার একবার শুরু থেকে শুরু করবার চেষ্টা করে। কিন্তু তখন তাকে মাঝপথেই যাত্রার বিরতি ঘটিয়ে জীবন থেকে হঠাৎ বিদায় নিতে হয়।

এই-ই হল মানুষের জীবন। আবহমান কাল থেকে মানুষ এমনি করেই যাত্রা করে এসেছে আর এমনি করেই জীবনের মাঝপথে ক্ষান্তি দিয়ে যাত্রার বিরতি ঘটাতে হয়েছে।

আকাশবাসীও তাই। কোথায় বাল্মীকি পণ্ডিতের কাছে তার যাত্রার আরম্ভ হয়েছিল, আর এখন সে। সে আরম্ভ করেছিল প্রজ্ঞা দিয়ে আর শেষ হতে চলেছে বিজ্ঞান দিয়ে।

আসলে প্রজ্ঞাই তো সকলের জীবনের শেষ পর্যায় হওয়া উচিত।

কিন্তু আকাশবাসীর বেলাতেই বা এমন বৈপরীত্য ঘটল কেন?

বল্লভ রোজকার মত রোজই ওষুধ কিনে আনে। ডাক্তারবাবুও রোজই একবার করে আসেন। দরকার হলে তিনি ওষুধ বদলে দিয়ে যান, কিন্তু বেশির ভাগ দিনই ওষুধ বদলানোর দরকার হয় না।

যাবার সময়ে বলে যান—আগের থেকে আপনি অনেক অনেক ভালো আছেন।

আকাশ বলে—আর ভালো থাকতে চাই না ডাক্তারবাবু...

রোগীর কথা শুনে ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে যান। বলেন—ও কথা বলছেন কেন? এত কম বয়েসে মনে এত বৈরাগ্য এল কেন? আপনি তো বুড়ো-মানুষদের মত কথা বলছেন—

আকাশ বলে—বয়েসের দিক থেকে বুড়ো না হলেও মনের দিক থেকে আমি প্রবীণই হয়ে গেছি ডাক্তারবাবু। স্বামী বিবেকানন্দ তো অল্প বয়েসেই মারা গিয়েছিলেন, বয়েসের দিক থেকে তো তিনি মোটেই বুড়ো হননি, কিন্তু মনের দিক দিয়ে? মনের দিক দিয়ে কি তিনি আশি বছর বয়েসের জ্ঞান-বৃদ্ধ হননি?

সাধারণত ডাক্তারবাবুর এ-সব কথা শোনার সময় থাকে না। তিনি তাঁর রোগী আর ব্যবসা নিয়েই সারা দিন ব্যস্ত থাকেন। এ-সব কথা বেশি শুনতে গেলে তাঁর চলে না।

ডাক্তারবাবু চলে যাওয়ার পর দীয়া বললে—শুনলেন তো ডাক্তারবাবুর কথা? ও-সব কথা আর ভাববেন না—

আকাশ বললে—ও-সব কথা আর না-ভেবে কি পারি? দেশের অবস্থা আর দেশের মানুষের দুর্দশা দেখলে কি কোনো সুস্থ লোকের বেঁচে থাকার ইচ্ছে হয়?

দীয়া বললে—যখন আপনি তার কোনো প্রতিকার করতে পারবেন না তখন মিছিমিছি তা ভেবে শরীর খারাপ করবেন কেন?

আকাশ বললে—তুমি যে কথাটা বলছ তার মধ্যে কোনো যুক্তি নেই। মানুষ কি শুধু নিজেকে নিয়েই সুখী হতে পারে? মানুষেরও তো একটা দেশ আছে, একটা সমাজ আছে। তাদের সকলকে নিয়েই তো সেই মানুষটা। মানুষটা তো সমস্ত মানুষ-সমাজেরই একটা অংশ মাত্র। মানুষটার সমস্ত অঙ্গ পঙ্গু হয়ে গিয়ে যদি একটা অঙ্গ মাত্র সচল থাকে তাহলেই কি মানুষটা বাঁচতে পারে?

তারপরে একটু থেমে আবার বললে—এই দেখ না, সকাল বেলা খবরের কাগজটাতে চোখ বোলাতেই মনটা কেমন খারাপ হয়ে যায়। যখন দেখি কোথাও কোনো ছেলে বোমা ফাটিয়ে অনেক লোকের চোখ অন্ধ করে দিয়েছে, কোথাও কোনও সামান্য অপরাধে মানুষ একটা বাসে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, কিম্বা একটা ছেলে চাকরি না পেয়ে আত্মহত্যা করেছে গলায় দড়ি দিয়ে, কিম্বা বাপের কাছ থেকে ঠিক মত যৌতুক আনতে পারেনি বলে বউকে পুড়িয়ে মেরেছে, এ-সব কথা পড়লে মানুষ কি সুস্থ থাকতে পারে।

দীয়া বললে—খবরের কাগজের হকারকে বলে খবরের কাগজ দিতে বন্ধ করতে বলে দিলেই দেখছি ভালো হয়—

আকাশ বললে—তার চেয়ে বলো না তুমি আমার চোখ দুটো অন্ধ করে দিতে চাও। শরীরের

কোথাও যদি পচন ধরে তা হলে চোখ বন্ধ করে থাকলে কি সে পচন সেরে যাবে?

দীয়া বললে—সমস্ত পৃথিবীর লোক যেমন বেঁচে রয়েছে, সহ্য করছে, আপনিও তেমনি করে বেঁচে থাকুন না—

আকাশ বললে—তুমি তো বেশ বললে দীয়া। পাশের বাড়িতে আগুন লাগলে কেউ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে?

দীয়া বললে—আপনার শরীর খারাপ বলেই আমি তাই ও-কথা বলেছি—

আকাশ বললে—আমি জানি আমার ওপর অনেক লোকের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে, যেমন ধরো ওই বীরেন, বিষ্ণু, জপেশ্বর আর তোমার ছেলে কুন্দন। আমার নিজের কথা ভাবি আর না ভাবি, ওদের কথা আমাকে ভাবতেই হবে। আমি একদিন থাকব না।

কেউই পৃথিবীতে চিরকাল থাকতে আসেনি। কিন্তু দেশের যে অবস্থা তাতে যদি ওরা ভালো করে মানুষ না হতে পারে, সে কথা ভাবাও কি অন্যায়? বীরেনের তো সামনেই পরীক্ষা, সে পরীক্ষা দিলে কিনা, কবে তার পরীক্ষা, কিছুই জানতে পারছি না ঘরে শুয়ে শুয়ে। কী যে করব, কিছুই বুঝতে পারছি না—তুমি কিছু জানো? ওরা কেউ এসেছে আমার খোঁজে?

দীয়া কী আর বলবে, মিথ্যে কথাই বললে—হ্যাঁ—

—তারা কী করছে এখন তা কি তোমায় বলেছে?

দীয়া এবারও মিথ্যে কথা বলল—হ্যাঁ, তারা ভালো আছে—

—আর আমার কলেজ থেকে কেউ কিছু খবর নিতে এসেছিল?

দীয়া বললে—হ্যাঁ, এসেছিল। আমি তাদের বলেছি আপনার অসুখ, তাই কলেজে যেতে পারছেন না। বলেছি শরীর ভালো হলেই কলেজে যাবেন। শুনে তাঁরা চলে গেছেন—

আকাশ সব শুনে বললে—তুমি তাহলে আর কতদিন এ বাড়িতে থাকবে? আমি তো এখন ভালোই আছি—তুমি এবার তোমার বাড়ি চলে যাও। এখন কলকাতায় বাড়ি খালি রাখা উচিত নয়—

দীয়া বললে—বাড়ি খালি নেই, সেখানে রামভুজ আছে। সে দেখাশোনা করছে ঠিক মত।

—আর দাস? আমাদের সেই দাসানুদাস?

দীয়া বললে—আমি দাসবাবুকে রাঁচিতে পাঠিয়েছি—

—কেন?

দীয়া বললে—সেই রাঁচি থেকে একজন ভদ্রলোক চিঠি লিখেছিলেন যে তিনি বাড়িটা ভাড়া নিতে চান। তখন আপনার খুব অসুখ, তাই তাঁকে বললাম যে আকাশবাবুর তো এখন অসুখ, আপনি সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে আসুন, আর কী রকম লোক তিনি তাও জেনে আসুন। আর যদি বোঝেন যে তিনি লোক ভালো তাহলে তাকেই বাড়িটা ভাড়া দিয়ে আসুন। ভাড়ার ব্যাপারে যা বাজারদর তাই দিলেই চলবে—

—তাহলে দাসের ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন? কবে গেছে দাস?

দীয়া বললে—তা পাঁচ ছ'দিন হয়ে গেছে। এখনও কেন ফিরে আসছে না, বুঝতে পারছি না।

আকাশ বললে— তারও আমার মত অসুখবিসুখ হল নাকি?

দীয়া বললে—আমি তো তাই ভাবছি—

দাস সত্যিই দাসানুদাস। সে জীবনে কখনও কারো সঙ্গে কড়া কথা বলেনি। যে ভদ্রলোক বাড়িটা ভাড়া নেবেন তার ঠিকানা খুঁজে বার করতেই প্রথম দিনটা কেটে গেল। শেষকালে যখন তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল তখন দাস শুনল ভদ্রলোক দু'দিনের জন্যে বাইরে গেছেন নিজের কাজে।

ভদ্রলোকের নাম বিনয় বিহারী চট্টোপাধ্যায়। তাঁর চিঠিতে তিনি সেই নামই লিখেছিলেন।

দাস জিজ্ঞেস করলে—তিনি কবে ফিরবেন?

উত্তর এল—কালও ফিরতে পারেন কিম্বা পরশুও ফিরতে পারেন। কোনো ঠিক নেই—

তারপর জিজ্ঞেস করলে—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

দাস বললে— আমি আসছি কলকাতা থেকে। কলকাতার আকাশবাসীবাবুকে বিনয়বিহারীবাবু একটা চিঠি লিখেছিলেন—তাতে তিনি লিখেছিলেন যে তিনি আকাশবাবুর রাঁচির বাড়িটা ভাড়া নিতে চান। আকাশবাবুর শরীর এখন খারাপ, তিনি অসুস্থ। তাই তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেই সম্বন্ধে কথা বলতে।

মেয়েটি কী বলবে বুঝতে পারল না।

দাস বললে—আমি কি আরো কিছুদিন অপেক্ষা করবো?

মেয়েটি বললে—আপনার যদি অসুবিধে না হয় তো অপেক্ষা করতে পারেন—

দাস চলে এল। বাড়ির চাবি তার কাছে ছিল। তাই খুব যে অসুবিধে হল, তা নয়। হোটেল থেকে রাত্রের খাওয়া খেয়ে নিয়ে বাড়ির একটা ঘরে রাতটা কাটাল। তারপর সকালে উঠেই আবার হোটেলে গিয়ে জল-খাবার খাওয়া। সেখান থেকে বাড়িতে এসে স্নান করা, দাড়ি কামানো। জামা-কাপড় বদলানো। অনেক কাজ সেরে আবার সেই বিনয়বাবুর বাড়িতে যাওয়া।

সেদিনও যথাসময়ে সেই বাড়ির সদর দরজায় গিয়ে কড়া নাড়া।

সেদিনও সেই একই মেয়েটি এসে দরজা খুলে দিল।

দাসকে বললে—আজও বাবা আসেননি।

দাস জিজ্ঞেস করলে—তাঁর কোনো চিঠিপত্র পেয়েছেন?

মেয়েটি ঘাড় নাড়লে। অর্থাৎ—না—

দাস বললে—আর কতদিন তাহলে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করব? আমারও তো কাজকর্ম আছে—

তারপর দাস একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করলে—আপনার বাবা বাড়ি ভাড়া নিতে চাইছেন কী জন্যে?

মেয়েটি বললে—এই বাড়ির বাড়িওয়ালা আমাদের বিরুদ্ধে মামলা করে আমাদের উঠিয়ে দিতে চাইছেন। এবাড়ি ছেড়ে দিলে আমরা কোথায় যাব। সেই জন্যেই আপনাদের বাড়িটা ভাড়া নিতে চাইছিলেন।

দাস জিজ্ঞেস করলে—আপনাদের বাড়িতে আর কে আছেন? আর কারো সঙ্গে কথা বলতে পারি?

মেয়েটি বললে—এ-বাড়িতে আমার মা আছেন—

দাস জিজ্ঞেস করলে—আমি আপনার মার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

মেয়েটি বললে—মার খুব অসুখ, মা শুয়ে পড়ে আছে—

হঠাৎ ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় কার আওয়াজ এল— ও চন্দ্রা, কার সঙ্গে কথা বলছিস রে!

—ওই মা ডাকছে—

বলে চন্দ্রা ভেতরে চলে গেল। দাস তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে কী করবে। একটু পরেই চন্দ্রা বেরিয়ে এসে বললে—আপনি মার সঙ্গে কথা বলবেন?

দাস বললে—হ্যাঁ, তা কথা বলতে পারি—

চন্দ্রা দাসকে ভেতরে নিয়ে গেল সঙ্গে করে।

দাস দেখলে বাড়িটা ছোট। মাত্র দেড়খানা ঘর। ওই দেড়খানা ঘরের মধ্যেই বিনয়বাবুর সংসার। একখানা ঘরের এক পাশে একটা তক্তপোশ। তার ওপর একজন মহিলা শুয়ে আছেন। বিছানার তোশক ছেঁড়া, চাদরটা ময়লা। ঘরের সব দিকেই সংসারের দরকারি অদরকারি জিনিসপত্র ছড়ানো। কোথাও কোনো শৃঙ্খলার বালাই নেই। দারিদ্র্যের চিহ্ন সর্বত্র সুস্পষ্ট।

মহিলাটি শুয়ে শুয়েই মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন— ওরে চন্দ্রা, টুলটা এগিয়ে দে মা—

কিন্তু চন্দ্রার টুল এগিয়ে দেবার আগেই দাস টুলের ওপর বসে পড়ল।

বললে—আমি কলকাতার আকাশবাবুর বাড়ি থেকে আসছি। আপনার স্বামী বিনয়বাবু আকাশবাবুকে তাঁর এখানকার বাড়িটা ভাড়া নিতে চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন। সেই কারণেই আমার এখানে আসা। কিন্তু বিনয়বাবু তো এখানে নেই। আমি তাঁর দেখাই পেলুম না। আমি দুদিন ধরে এখানে রয়েছি। কতদিন আমাকে এখানে থাকতে হবে বুঝতে পারছি না...

মহিলাটি বললেন—আমাদের এখন খুবই বিপদ চলছে।

—বিপদ!

মহিলাটি বললেন—একে তো এই বাড়ির বাড়িওয়ালা আমাদের উঠিয়ে দেবার জন্যে মামলা করছে, তার ওপর এই সময়েই আমি অসুখে পড়েছি আর তার ওপর...

মহিলাটি কথা বলতে গিয়ে হাঁফাচ্ছিলেন। তিনি একবার দম নিলেন।

বললেন—আবার তার ওপর ওই আমার মেয়ে, ওই চন্দ্রার জন্যে একটা পাত্রের খোঁজে গেছেন পাটনাতে—

এ কথার পর দাসের আর কীইবা বলবার থাকতে পারে।

মহিলাটি নিজেই আবার বলতে লাগলেন—ওঁরও তো শরীরটা ভালো যাচ্ছে না আজকাল। উনি একলা মানুষ, কটা দিকেই বা দেখবেন। একে বাড়ির সমস্যা, তার ওপর ওই মেয়েটার বয়েস দিন দিন বাড়ছে—

এ কথারই বা কী জবাব দেবে তা বুঝতে পারলেন না দাস।

মহিলাটি আবার বললেন—আপনি নিজে দয়া করে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন আর তিনিই নেই, এসবই আমাদের কপাল!

দাস বললে—বিনয়বাবুর চিঠি না পেলে তো আমি আসতুমই না। তাই দয়া করার কথাই ওঠে না। আপনারা যদি বলেন যে আপনারা ও বাড়িটা ভাড়া নেবেন, তাহলে আমি আকাশবাবুকে গিয়ে সেই কথাই বলব। কত ভাড়া আপনারা দিতে পারবেন তা যদি বলেন তো তাও আমি আকাশবাবুকে গিয়ে বলতে পারি।

মহিলাটি বললেন—ভাড়ার কথা আমি কী করে বলব? তিনি এলে তাঁর মুখ থেকেই শুনবেন আপনি—

দাস বললে—তিনি কবে আসবেন তার যখন কিছু ঠিক নেই তখন তাঁর জন্যে আমি আর কতদিন অপেক্ষা করব? তার চেয়ে আমি কলকাতায় ফিরে যাই, তিনি কত ভাড়া দিতে পারবেন সেটা যেন তিনি চিঠি লিখেই আমাদের জানান—

বলে দাস ঘরের বাইরে চলে আসছিল, কিন্তু তার আগেই মহিলাটি বললেন—আর একটা কথা শুনুন—

দাস ফিরে দাঁড়াল। বললে—কী, বলুন?

মহিলা বললেন—আমার একটা উপকার করতে পারবেন?

—বলুন কী উপকার?

—আপনি তো কলকাতায় থাকেন। কলকাতার অনেক ভালো ভালো বাঙালি পাত্র আছে। আমার এই চন্দ্রার জন্যে একটা ভালো পাত্র দেখে দিন না। এমন পাত্র দেখবেন যার নিজের বা পৈতৃক একটা বাড়ি আছে। যেন ভাড়াটে না হয়। ভাড়াটে হওয়ার অনেক জ্বালা। আমাকে যে জ্বালায় জ্বলতে হচ্ছে আমার মেয়েকে যেন সে জ্বালায় জ্বলতে না হয়। মেয়ের বিয়েতে আমরা কিছু দিতে-থুতে পারব না, এটা আগে থেকেই আপনাকে বলে রাখা ভালো। আমরা চ্যাটার্জি, আমাদের সঙ্গে গাঙ্গুলি, মুখার্জি, ব্যানার্জি সকলের সঙ্গেই কাজ হয়। আর তা না পেলে বামুন হলে চলবে। আমার মেয়েকে তো দেখছেন, মেয়েকে সুন্দরীই বলা যায়। চন্দ্রা দুবছর হল বি এ পাশ করে বাড়িতে বসে আছে—কথা বলতে মহিলার খুবই কষ্ট হচ্ছিল।

দাস বললে—আপনাকে আর বেশি বলতে হবে না। আমি চেষ্টা করব দেখব। যদি খবর পাই তো বিনয়বাবুকে চিঠি লিখে জানাব। আমি এখন যাই—বলে দাস বেরিয়ে এল।

সামনের ঘুপচি গলিটা পেরিয়েই চওড়া রাস্তা।

দাস বাড়িটা পেরোতেই পেছন থেকে চন্দ্রা ডাকলে— একটু দাঁড়ান।

দাস পেছন ফিরে চন্দ্রার দিকে মুখ করে দাঁড়াল।

বললে—আমাকে ডাকছেন?

চন্দ্রা তখন সদর দরজা ছেড়ে গলিতে নেমে এসে দাসের কাছাকাছি দাঁড়াল। বললে—আপনি মার কথা শুনবেন না, আমার বিয়ের পাত্র খুঁজতে হবে না আপনাকে।

দাস হতবাক হয়ে চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করলে—কেন?

চন্দ্রা বললে—আমার বিয়ের পাত্র ঠিক হয়ে গেছে, আমার বিয়ের জন্যে আপনাকে মিছিমিছি আর কষ্ট করতে হবে না—

কথাটা বলেই চন্দ্রা যেমন এসেছিল তেমনি আবার সেই পথ দিয়েই নিজেদের বাড়ির ভেতরে ঢুকে দরজায় খিল বন্ধ করে দিলে।

আকাশ এখন একটু সুস্থতা বোধ করছে। সামনের টেবিলে দীয়া তার খাবারের ব্যবস্থা করছে। সব ব্যবস্থা শেষ করে দীয়া বললে—এবার খান—

আকাশ জিজ্ঞেস করলে—তুমি খাবে না?

—আমি পরে খাবোখন—

আকাশ বললে—তুমি তোমার বাড়ি ছেড়ে আর কতদিন এখানে পড়ে থাকবে? তোমার ছেলে রয়েছে সেখানে।

দীয়া বললে—সেখানে তো রামভুজ রয়েছে, সে থাকতে আর আমার কোনো ভাবনা নেই।

আকাশ জিজ্ঞেস করলে—রামভুজ এখানে আসে?

দীয়া বললে—আসবার সময় রামভুজকে অনেক টাকা দিয়ে এসেছি। যদি ইলেকট্রিকের বিলটিল কিছু আসে তো সেই টাকা থেকেই সে তা মিটিয়ে দিতে পারবে।

এরপর খানিকক্ষণ আর কোনো কথা বললে না আকাশ।

আকাশ বললে—এ মাসে বল্লভের মাইনে দেওয়া হয়নি আর রামভুজেরও মাইনে দেওয়া হয়নি।

দীয়া বললে— ওদের মাইনে আমি দিয়ে দিয়েছি—

—তুমি দিয়ে দিয়েছ? কেন?

—ওরা গরিব লোক, ওরা টাকা না পেলে ওদের খুব কষ্ট হবে তাই।

আকাশ বললে—তুমি আমাকে সব দিক থেকে ঋণী করে রাখলে দীয়া, আমি নিজের একটা জীবনে তোমার এত ধার শোধ করব কী করে বুঝতে পারছি না।

দীয়া বলল—আপনি চুপ করুন, সবে সেরে উঠেছেন, এখনই এত কথা বললে আপনার অসুখ আবার বাড়বে—

আকাশ বললে—কথা না হয় না-ই বললুম, কিন্তু আমার মন? আমার মনটাকে কি তুমি চুপ করাতে পারবে? আমি এতদিন তো বিছানায় চুপ করে শুয়েই ছিলুম, কিন্তু তাতে আমার শরীরটাই শুধু শুয়ে ছিল। কিন্তু মন তো কথা বলত! মনের সঙ্গে আমি যে কথা বলেছি তা যদি তোমরা শুনতে পেতে!

দীয়া বললে—আপনি অত ভাবেন কেন?

—ভাবি কেন?

বলে খেতে খেতে আকাশ একটু হাস্‌ল। বলতে লাগল—তুমি আমাকে না ভাবতে বলছ, কিন্তু আমি না ভাবতে পারলেই তো বেঁচে যেতুম।

দীয়া বললে—আপনার ভাবনার দরকার কী? আপনার টাকা আছে, আপনার যৌবন আছে, আপনার কীসের অভাব? সে সব যার নেই সে বেশি ভাববে, আপনি কেন ভাববেন?

আকাশ বলল—শুধু টাকা আর শুধু যৌবন থাকলেই কি সব থাকা হল দীয়া? মানুষ কি শুধু নিজেকে নিয়েই বাঁচতে পারে? তার কি দেশ নেই, তার কি সমাজ নেই, তার কি বিরাট বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড নেই?

বলে একটু থেমে নিয়ে আবার বলতে লাগল—সবাই সুখী হলে তবে তো আমার সুখ। তাই সব সময়ে তোমার কুন্দনের কথা মনে পড়ে, দাসের কথা মনে পড়ে, রামভুজের কথা মনে পড়ে। ওই বীরেন, বিষ্ণু, জাপানীর কথাও মনে পড়ে, আর শুধু কি তাই? আমার আগে যে মানুষরা জন্মেছে তাদের কথা মনে পড়ে, আমার মরার পরেও যারা জন্মাবে তাদেরও কথা আমার মনে পড়ে। আমি কাউকে ভুলতে পারি না। আর তারপরে আছ তুমি। এই দেখ না, কোথায় তুমি জন্মেছিলে, কোথায় কার সঙ্গে একদিন তোমার বিয়েও হয়েছিল। তারপর হঠাৎ কী হতে গিয়ে তুমি কী হয়ে গেলে। তুমি কার ঘরণী ছিলে। আবার হঠাৎ কোথায় এখানে এসে কার সেবা করছ, বড় বিচিত্র নয় এ-সংসার?

দীয়া এ-কথার কোনো উত্তর দিলে না, চুপ করে রইল।

আকাশ আবার বলতে লাগল—একটু আগেই তুমি বললে যে আমি এত ভাবি কেন? কেন ভাবি জানো? ভাবি মানুষের জন্যেই। হাজার-হাজার বছর ধরে মানুষ তার নিজের পছন্দ অনুযায়ী এমন গভর্মেন্ট চেয়েছে, যে সেই গভর্মেন্ট মানুষের ওপর সুবিচার করবে। কিন্তু মানুষের সমাজ কি গভর্মেন্ট পেয়েছে? সেই ইমপিরিয়ালিজম্ সেই সোশ্যালিজম, সেই কমিউনিজম—কত রকম চেষ্টাই তো হল। কারোর চেষ্টা কি সফল হয়েছে? আসলে যে ধরনের গভর্মেন্টেই হোক গভর্মেন্ট মানেই হচ্ছে Conspiracy of the few against many, whatever form it takes. এই জন্যেই এত কাল পরে মানুষের কোনো উন্নতি হচ্ছে না। মানুষের কোনো উন্নতি হবে না।

কথার মাঝখানেই বাধা পড়ল। বল্লভ এসে বললে—দাসবাবু এসেছেন—

তার পেছন-পেছন সত্যি-সত্যি দাস এসে ঘরে ঢুকল।

আকাশ বললে— সে কী রে, তুই? এত দেরি হল আসতে?

দাস টেবিলের ওপর ওষুধের সরঞ্জাম দেখে অবাক হয়ে গেল।

বললে—এত ওষুধের শিশি কার রে?

আকাশের বদলে দীয়াই প্রশ্নটার উত্তর দিলে। বললে—আপনি চলে যাওয়ার পরেই উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কয়েক দিন তো ওঁর জ্ঞানই হয়নি। আমি খুবই ভয় পেয়েছিলাম। আপনি কলকাতায় নেই, বল্লভ গিয়ে আমাকে খবর দিলে তাই চলে এসেছি। সেই তখন থেকে আমি এখানেই রয়েছি—

দাস জিজ্ঞেস করলে—তাহলে আপানর বাড়ি কে দেখছে?

দীয়া বললে—রামভুজ আছে, সে একাই একশো।

দাস বললে—তা বটে!

তারপরে আকাশের দিকে চেয়ে বললে—হঠাৎ এমন হলই বা কেন তোর? কী হয়েছিল?

আকাশ বললে—জানি না কী হয়েছিল। সেদিনও কলেজে গিয়েছি। ছেলে-মেয়েদের পড়িয়েছি। কলেজ থেকে ফিরে মনে হয়েছিল খুব ক্লান্ত। বল্লভকে বললাম—আজ আমি আর কিছু খাব না, আমি সকাল-সকাল শুয়ে পড়ব। তারপর রাত্তিরে কী হল জানি না, আর কিছু মনে নেই। ক'দিন ধরে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেছি—

—স্বপ্ন?

—হ্যাঁ, বিচিত্র সব স্বপ্ন। মনে হচ্ছিল আমি যেন লন্ডনে গিয়েছি। সেখানে গিয়ে দেখি রাস্তায় দীয়া হাঁটছে। কী সব অদ্ভুত স্বপ্ন। সে-সব স্বপ্নের মাথা নেই মুণ্ডু নেই। তখন ডাক্তার মুখার্জি এসেছেন, কী ওষুধ দিয়েছেন, কিছুরই জ্ঞান নেই। এই রকম করে অজ্ঞান হয়ে কত দিন যে শুয়ে পড়েছিলাম, তারও খেয়াল নেই আমার। তারপর একদিন চোখ খুলতেই দেখলাম সামনে দীয়ার মুখ—

দাস বললে—এরকম কেন হয়েছিল? ডাক্তার কিছু বলেছে?

দীয়া বললে—ডাক্তারবাবু বললেন এও নাকি এক রকমের মূর্ছা যাওয়া, নার্ভের ওপর বেশি চাপ পড়লেও নাকি এইরকম হয়।

দাস জিজ্ঞেস করলে—তোর নার্ভের ওপর খুব বেশি চাপ পড়েছিল নাকি?

আকাশ বললে—যে যুগ পড়েছে তাতে নার্ভের ওপর যে চাপ পড়বে এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে। চারদিকে যেসব কাণ্ড চলছে তাতে অজান্তেই আমাদের নার্ভ অনবরত অকেজো হয়ে পড়ছে—

তারপরে একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে—তা রাঁচিতে গিয়ে কী হল? বাড়িটা ভাড়া নেবে?

দাস বললে— সে অনেক কাণ্ড, পরে বলব। আমি ট্রেন থেকে নেমে সোজা চলে এসেছি—এখনও তৈরি হয়ে নিতে পারিনি—

দীয়া বললে—তা আপনি এখানেই তৈরি হয়ে নিন না—আমি বল্লভকে আপনার জলযোগের ব্যবস্থা করতে বলছি।

বলে ভেতরে চলে গেছে।

স্রোতস্বিনী যেদিন পুলিশের থানায় গিয়ে তার এজাহার দিয়ে এসেছিল তার পরদিন থেকেই থানার ইন্সপেক্টর সাব-ইন্সপেক্টার কনস্টেবল সকলকেই হুকুম দেওয়া হয়ে গিয়েছিল যে পরশুদিন যেন ভোর চারটের সময়েই সবাই তৈরি থাকে। কারণ সেদিন একটা বাড়িতে তল্লাশি হবে। তাতে তাদের সকলকে অংশ নিতে হবে।

কোথায় তল্লাশি হবে, কেন তল্লাশি হবে, কোন ঠিকানায় তল্লাশি হবে, কাদের তল্লাশি করা হবে, তা কাউকেই জানানো হল না। পুলিসের নিয়ম-কানুন অনুযায়ী তা আগে-ভাগে জানানো হয়ও না।

কিন্তু দেখা গেল তা জানাজানি হয়ে গেছে একটু আগেই। অর্থাৎ আর একটু দেরি হলেই সব কিছু পণ্ড শ্রম হয়ে যেত। তবু মাঠবাগানের বস্তির সমস্ত লোক সেদিন বন্দুকের শব্দে হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠেছে। সবাই যে-যেদিকে পারে পালাতে চেষ্টা করেছে।

কিন্তু কোথায় পালাবে?

যেদিকেই লোক যেতে চায় সেদিকেই পুলিস। পুলিস সমস্ত বস্তিটা অতর্কিতে ঘিরে ফেলেছে। একদল পুলিস তখন লাঠি রিভলবার তুলে সকলকে লক্ষ্য করে উঁচু করে ধরেছে। বেশি এগোলেই সকলকে আমরা গুলি করে মারব, সকলকে আমরা খুন করে ফেলব। দু-হাত মাথার ওপর উঁচু করে তুলে দাঁড়িয়ে থাকো সবাই। তাহলে আমরা কিছু বলব না—

বস্তির সমস্ত লোক তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থর-থর করে কাঁপছে। সকলেরই দু-হাত উঁচু করে তোলা। কেউ নড়ছে না, চড়ছে না, শুধু পুলিশ দলের সামনে কাতর কণ্ঠে নিজেদের প্রাণ-ভিক্ষে চাইছে।

সামনে ছিল পুলিসের অফিসার-ইন-চার্জ। হঠাৎ কোথা থেকে একটা আওয়াজ হল। আর সঙ্গে সঙ্গে ও সি আকাশ লক্ষ্য করে ফায়ার করলেন।

তখন সব চুপ। একেবারে শ্মশানের নিস্তব্ধতা চারদিকে।

তখন আর দেরি নয়। ইনফরমার যেমন যেমন খবর দিয়েছিল তেমনি তেমনি নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দেখা গেল আশ্চর্য কাণ্ড। যেন একটা আর্মারী। যেন একটা অস্ত্রাগার।

খানিক পরে এলাকার ডি.সিও সদলবলে এসে হাজির। সামনে পেছনে সশস্ত্র পুলিস। তারা সবাই রিভলবার উঁচু করে ডি-সিকে পাহারা দিয়ে সামনের দিকে এগোল।

সবসুদ্ধ পাওয়া গেল একচল্লিশটা বুলেট, দুটি পাইপ-গান, একটা রাইফেল, রাইফেল-চার্জার, মিলিটারি দফতরের একটা এইচ-৩৫ গ্রেনেড, দুটো পিস্তল, বাইশটা বোমা। আর শুধু তাই নয়। সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর যে জিনিসটা পাওয়া গেল সেটা হচ্ছে সাত কেজি পটাশিয়াম ক্লোরাইড আর আরসেনিক সালফাইড—যা দিয়ে কম করেও প্রায় এক হাজারের ওপর মারাত্মক বোমা তৈরি করা

যায়। আর পাওয়া গেল এমন এক ধরনের সাতটা গুলি যা পুলিস আর মিলিটারির লোকরা ব্যবহার করে।

সবাই দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল এমন সব জিনিস এই বস্তির ভেতরে এলো কি করে?

কিন্তু যারা এখানে থাকে, যারা এই সব বোমা তৈরি করে, যারা রাস্তায় বাড়িতে বোমা ফেলে, যারা মেয়েদের ছিনতাই করে, তারা গেল কোথায়? তারা কি তবে আগে থেকে খবর পেয়ে গিয়েছিল?

হঠাৎ ইনফরমার ডি সির কাছে এসে কানে কানে বললে—স্যার, তারা কোথায় গেছে আমি জানি—

—কোথায় গেছে?

তারপর ডি সির কানে কানে কী বললে সে, তা কেউ শুনতে পেলে না, সঙ্গে সঙ্গে একজন কনস্টেবল নিয়ে ডি সি জিপ নিয়ে কোথায় কত দূরে চলে গেল তা দলের অন্য কেউই জানতে পারলে না।

দীয়ার বাড়ির সদর দরজায় রামভুজের কাছে সব খবর নিয়ে পুলিস সদলবলে ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। সব ঘরের তালা ভেঙেও যখন কারো কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না, কোনো আপত্তিকর কিছুও পাওয়া গেল না, তখন বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দেওয়া হল।

যখন কিছুতেই দরজা খোলে না তখন পুলিস থানা থেকে হাতুড়ি এনে ধাক্কা দিতেই এক আজব ঘটনা ঘটল। হঠাৎ বাথরুমের ভেতর থেকেই বোমা ফাটার বিকট একটা শব্দ হল। আর শুধু একবার নয় দুবার তিনবার বোমা ফাটল।

পুলিসও বাইরে থেকে গুলি চালাল।

আর সঙ্গে সঙ্গে বাথরুমের দরজাটা ভেঙে ভেতরে পড়ে গেল। দেখা গেল চারজন নয়, দুজন ছেলে বাথরুমের ভেতরেই মরে পড়ে আছে ঃ দেখে বোঝা গেল তারা টাটকা মরেছে। তাদের নাক-মুখ সর্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে বাথরুমের মেঝে ভেসে যাচ্ছে।

পুলিসের গাড়ি দেখে আশে-পাশের পাড়ার লোকজন সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। এবার বোমা-গুলির আওয়াজ পেয়ে আরও লোকজন এসে ভিড় করেছে তখন।

একজন লোক এসে সব কিছু দেখে আর একজনকে জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে মশাই? এখানে পুলিসের গাড়ি কেন?

কিন্তু কেউ তা জানে না কী জন্যে পুলিসের গাড়ি এসেছে, তাই কেউই কারণটা বলতে পারলে না।

ততক্ষণে কোথা থেকে একটা অ্যামবুলেন্সের গাড়ি এল। পুলিসরা সবাই মিলে ধরাধরি করে দুটো মৃতদেহ তাতে তুলে নিয়ে হাসপাতালে চলে গেল। রামভুজকেও তাদের সঙ্গে নিয়ে গেল তারা।

পুলিস রামভুজকে জিজ্ঞেস করলে—বাড়ির মালিক কোথায়?

রামভুজ তখন ভয়ে মনে মনে রাম-নাম করছে। এতদিন রামভুজ কলকাতায় আছে কিন্তু এমন ঘটনার মুখোমুখি সে আগে কখনও হয়নি।

বললে—দিদিমণি আকাশবাবুর বাড়িতে গেছেন—

—কেন?

—আকাশবাবুর বেমার হয়েছে, তাই তাঁকে দেখতে গেছেন—

পুলিস জিজ্ঞেস করলে—কতদিন ধরে তিনি সেখানে গেছেন?

—আজ দশ বারো দিন ধরে তিনি সেখানেই আছেন। আকাশবাবুর বাড়িতে তাঁকে দেখবার কেউ নেই বলে তিনি আসতে পারছেন না।

রাস্তায় গাড়িতে যেতে যেতেই এই সব কথা হচ্ছিল। গাড়িটা একটা হাসপাতালের কাছে আসতেই অ্যাম্বুলেন্স থেকে দুটো ছেলের মৃতদেহ নামিয়ে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল।

রামভুজ তখনও গাড়িতে বসে বসে সব দেখছে আর ভাবছে। দিদিমণি তাকে পাহারা দেওয়ার জন্যেই বাড়িতে রেখে দিয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনার পর যদি দিদিমণি তাকে দোষ দেয়, যদি বলে—তোমাকে বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্যেই এখানে রেখে দিয়ে গিয়েছিলুম, তুমি দেখতে পাওনি কারা বাড়িতে ঢুকছে কারা বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে, তাহলে তোমাকে রেখে আমাদের কী লাভ হল?

খানিক পরে থানার বড়বাবু এসে গাড়িতে উঠে বসল। ড্রাইভার গাড়ি চালাতে আরম্ভ করল।

রামভুজ তখনও ভয়ে কাঁপছে।

পুলিসের বড়বাবু হঠাৎ বললে—আকাশবাবুর বাড়ি চেনো তো তুমি?

রামভুজ বললে—হাঁ হুজুর চিনি—

—আমরা সেখানেই যাব, তোমার মালিকের সঙ্গে আমি দেখা করব। ড্রাইভারকে বলে দাও কোন রাস্তা দিয়ে যেতে হবে—

রামভুজ রাস্তাটা বাতলে দিলে। তারপর আকাশবাবুর বাড়ির সামনে আসতেই বলল—এই, এই বাড়িটা আকাশবাবুর, এখানেই আমার দিদিমণি আছেন—

তার নির্দেশ মত গাড়িটা সেখানেই থামল? রামভুজকে দুজন কনস্টেবল ঘিরে ধরে বাড়ির দিকে চলল। বাড়ির সদর দরজার কলিং বেলটা টিপল বড়বাবু।

দরজা খুলতেই বল্লভ রামভুজকে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু পুলিসকে দেখে ভয় পেয়ে গেছে বল্লভ। সে কিছু বলবার আগেই বড়বাবু জিজ্ঞেস করলে—এ বাড়িতে আকাশবাবু নামে কেউ আছে?

বল্লভের মুখ দিয়ে তখন কোনো কথা বেরোচ্ছে না। কোনো রকমে বললে—হ্যাঁ, হুজুর—

—চলো, ভেতরে চলো—

বলে বল্লভের সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের দলেরও সবাই ভেতরে ঢুকল। তাদের সঙ্গে ঢুকল রামভুজও।

সামনে সামনে বল্লভ চলতে লাগল, আর তার পেছন পেছন পুলিসের দল। আর তাদের সঙ্গে রামভুজ। একতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেই ডান দিকে একটা বসবার ঘর। সেখানে আকাশ দীয়া দাস তিনজনেই তখন বসে আছে। হঠাৎ বল্লভের সঙ্গে পুলিস অফিসার দুজন কনস্টেবল আর রামভুজকে দেখে তিনজনেই অবাক হয়ে গেছে।

—কার নাম আকাশবাবু?

আকাশ উঠে দাঁড়াল? বললে—আমিই। আপনারা কোথা থেকে?

—দীয়া দেবী কে?

দীয়াও ভয়ে চমকে উঠেছে। বললে—আমি। আমার নাম দীয়া—

—আপনার ছেলের নাম কী কুন্দনলাল?

দীয়া বললে—হ্যাঁ—

বড়বাবু বললে—আপনার সেই ছেলে কুন্দনলাল মারা গেছে। আর তার সঙ্গে মারা গেছে জপেশ্বর বা জাপানী নামে আর একটা ছেলে। তাদের ডেড বডি মর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইচ্ছে করলে আপনারা মর্গে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। আর তাদের পার্টির দুজন বীরেন আর বিষ্ণু ফেরার।

—তারা কী করেছিল?

—স্রোতস্বিনী নামের এক মহিলার রিস্ট-ওয়াচ তারা ছিনতাই করেছিল।

কলেজ থেকে কোনো তাড়া আসেনি। আসার কথাও নয়। আকাশের বাড়াবাড়ি অসুখ এটা তার কর্মস্থানে রটে গিয়েছিল। কলেজে আকাশের বিশেষ একটা সম্ভ্রম ছিল। সে পেশাদারী মাস্টার নয়। নিয়মরক্ষার জন্যে কলেজে আসে না, মাসান্তে বিদ্যাবিক্রয়ের মজুরি নিতেও নয়। এমন মানুষকে সম্ভ্রম করার লোক তো থাকবেই। আবার সম্ভ্রমের গায়ে গায়ে জড়িয়ে থাকে শত্রুতা। আকাশকে অপছন্দ করার মতনও মানুষও কিছু ছিল বইকি! আকাশ কেন তার বৃত্তিকে ব্যবসায়িক করে তোলেনি—বোধহয় এই কারণেই তারা বিরক্ত ও অসহিষ্ণু ছিল আকাশের ওপর। হিংসে করত। আকাশ কেন স্বতন্ত্রভাবে সম্ভ্রম ও মর্যাদার আসন পাবে এটা তারা বুঝতে চাইত না। এদের ধারণা ছিল, কলেজের ছেলে-মেয়েদের কাছে, কিছু সহকর্মীর কাছে আকাশ যে সম্ভ্রম আদায় করছে—সেটা তার প্রাপ্য নয়। এরা অনেকেই আকাশের হাঁড়ির খবর রাখত। রাখত বলেই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, পেছনে টাকার পাহাড় থাকলে সবই হয় হে। বাপের টাকায় অক্সফোর্ড কে না যেতে পারে? আর আদর্শ শিক্ষক কাকে বলতে চাও? পেটের ডাল-ভাত জোটাতে যেখানে কালঘাম ছুটে যায়—সেখানে তুমি হবে 'ডেডিকেটেড টিচার'? থাকত বাপের টাকা তো আমরাও আদর্শটা দেখিয়ে দিতাম। নলিন বলে একজন হাল আমলের লেকচারার ছিল যে কথায়-বার্তায় ঘোরতর উগ্র। সে বলত: 'আপনারা আর আদর্শের বড়াই করবেন না, স্যার। আপনাদের আগের জেনারেশানের গুণগান শুনতে শুনতে কানের পরদা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। একটা কথা বলি স্যার, আপনাদের আগের জেনারেশানে এতই যদি আদর্শের ছড়াছড়ি থেকে থাকে, তবে তো বলতে হবে আজকের এই ফসল তাঁরাই ফলিয়েছেন। সাধারণ জ্ঞান কী বলে স্যার? বলে নিমের চারা পুঁতলে নিমগাছই হয়, গোলাপখাস পুঁতলে গোলাপখাস? আপনারাই ভেবে দেখুন কোন চারা আপনাদের আগের জেনারেশন পুঁতে গেছেন!

নলিন ছেলেটা উগ্র হলেও সে নিন্দুক দলের সদস্য ছিল না। সে বিন্দুমাত্র হিংসে করত না আকাশকে। কিন্তু আকাশের অনুরাগী সে ছিল না। বরং আকাশকে সে উপেক্ষা করত। মনে মনে ভাবত: ভদ্রলোকের সঙ্গে যদি লড়তে হয়, একাই লড়ব, এই সব কলেজ পলিটিক্স আর ইউনিয়নবাজি করা লোকগুলোর সঙ্গে নয়।

আকাশের বিরোধী দল আকাশকে জব্দ করার জন্যে তক্কে তক্কে থাকত। তাকে হটিয়ে রেখেছিল টিচার্স কাউন্সিল থেকে। ছেলে-মেয়েদের কাছে কৌশলে এমন সব কথা তুলত যাতে আকাশের মানসম্ভ্রমে ঘা লাগে।

আকাশের এ সব জানা ছিল। ষোলো আনা না হলেও দশ আনা তো নিশ্চয়। মাথা ঘামাত না আকাশ। অন্যদের যেখানে উৎসাহ, আনন্দ—তার সেখানে কোনো উৎসাহ নেই। নোংরামির মধ্যে সে নেই। কোনোদিন থাকেনি।

কলেজ থেকে তাড়া না এলেও মোটামুটি সুস্থ হবার পর আকাশ কলেজ যাওয়া শুরু করল। ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষা এগিয়ে এসেছে—এখন আর কলেজ কামাই করা উচিত নয়।

কলেজে যারা আকাশের ঘনিষ্ঠ তারা একটা জিনিস লক্ষ্য করছিল। লক্ষ্য করছিল, আকাশের মধ্যে কেমন যেন একটা অবসাদ এসেছে। তার সেই সপ্রাণ তৎপরতার ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। আগের মতন উদ্যম যেন হারিয়ে ফেলেছে সে। বড় অসুখের পর এটা হতে পারে। খুবই স্বাভাবিক। শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি হয়ত-এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি পুরোপুরি।

একদিন স্রোতস্বিনী বলল, 'আপনি আরও কিছুদিন বিশ্রাম নিলে পারতেন।'

'কেন বলো তো?'

'আপনাকে ক্লান্ত দেখায়।'

আকাশ একটু হাসল। কথাটা এড়িয়ে যাবার জন্যে বলল, 'কই! আমি তো বুঝতে পারি না। তবে অসুখ-বিসুখের পর সব মানুষকেই ওই রকম মনে হয়।'

স্রোতস্বিনী তর্কে গেল না। কিন্তু বলল, 'আপনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন।' বলে সে পড়াশোনার ব্যাপারে দু-একটা কথা বলল।

আকাশ আর অস্বীকার করতে পারল না। বলল, 'এই ধরনের ভুল আমার করা উচিত ছিল না। তুমি ঠিকই বলেছ বোধ হয়। আমি আজকাল বড় অন্যমনস্ক হয়ে যাই।'

'কেন?'

'কেন! কী জানি!' ম্লান করে হাসল আকাশ।

'একটা কথা বলব?'

'বলো?'

'আপনি আরও কিছুদিন ছুটি নিন।'

'তাই কি হয় নাকি!...এমনিতেই তো আমাদের ছুটির শেষ নেই, আবার ছুটি!... তুমি ভেবো না, সামলে নেব।'

'তা হলে অন্তত একটা কাজ করুন। কাজের চাপ কিছু কমিয়ে নিন—আমরা চালিয়ে নেব। পরে আবার আপনি—'

মাথা নাড়ল আকাশ। বলল, 'না, ওটা হয় না। তুমি আমাদের কলেজের হালচাল বোঝ না? যেদিন আমি আমার দায়িত্ব, কাজকর্মের ভার অন্যদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেব—সেদিন থেকেই কথা উঠবে।'

স্রোতস্বিনী অখুশি হল। কিছু বলতে পারল না। আকাশকে সে কম চেনেনি। পরিচয় যত ঘনিষ্ঠই হোক, আকাশ এক জায়গায় সেই ঘনিষ্ঠতার সীমানা বেঁধে রেখেছে। মহিলা বলে কী? খানিকটা হয়ত তাই, বাকিটা নয়। আকাশ বরাবরই, স্রোতস্বিনী লক্ষ্য করেছে, সংযত। এক ধরনের দূরত্ব গাম্ভীর্য সে রক্ষা করে। অথচ তার ব্যবহার আন্তরিক, সস্নেহ। বন্ধুর মতনই কথা বলে। মাঝে মাঝে দু-একটা হাসি-তামাশাও না করে এমন নয়। সব করেও আকাশ কোনোদিন নিজের সীমানা থেকে বেরিয়ে আসেনি।

স্রোতস্বিনী হয়তো আরও কিছু বলতে পারত। বলল না।

আকাশই বলল, 'তুমি ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। কাজ যদি কমিয়ে দি সময় কাটবে কেমন করে? আরও পাঁচটা চিন্তা এসে মনকে অস্থির করবে।'

'বেশ। মনকে আপনি স্থির করুন।' বলে স্রোতস্বিনী উঠে গেল।

আকাশ বুঝতে পারল, স্রোতস্বিনী রাগ করেছে।

অনেক কথা আছে যা অন্যকে বলা যায় না। বা যে-ভাবে বললে বলা হয়—তেমন করে বলা সম্ভব হয় না। আকাশ নির্বোধ নয়। কয়েক দিনের অসুখ মানুষকে পালটাতে পারে না। মানুষ মাত্রেরই অসুখ করে। প্লাবন-মরণ সংশয় দেখা দেয়। কখনও কখনও সেই অসুখের ধাক্কা সামলাতে সময় লাগে। কিন্তু সামলে নেওয়া যায়। আকাশের যা ঘটেছে এটা শরীরের অসুখ নয়। মনের মধ্যে যেন ফাটল ধরেছে আকাশের।

মানুষের অস্তিত্বটা হল পুকুরের মতন। তার বাইরের চেহারাটা সর্বজনের দৃশ্যগোচর। ভেতরের চেহারাটা নয়। আপাতদৃষ্টিতে পুকুরের যে চেহারা দেখা যায় পুকুরপাড়, ঘাট, দু পাঁচটা গাছপালা, শ্যাওলা, কালচে জল—এই চেহারা দেখেই বাইরের লোকের কাজ মিটে যায়। ভেতরের চেহারা ভেতরেই থাকে, জলের তলায়।

আকাশের চারপাশে যারা আছে, এমনকি তার অতিঘনিষ্ঠ যারা তারাও বুঝতে পারবে না কেন আজ সে এত ক্লান্ত, বিষণ্ণ, অন্যমনস্ক। বা বুঝলেও সামান্য মাত্র বুঝবে।

আজকাল আকাশ যেন কেমন এক সংশয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এই সংশয় তার অস্তিত্বের ভেতরের দিক, গভীর দিক। আকাশ ছেলেমানুষ নয়, বোধবুদ্ধিহীন নয়। সে জানে—এই জগৎ নিতান্তই স্থূল জলের সমষ্টি নয়, তা সহজ ও সরল নয়। জগৎ নয়, জীবনও নয়। কোনো সন্দেহ নেই এই জগতের নানা দিকে অনেক নোঙরা, আবর্জনা ছড়িয়ে আছে। জীবনেও রয়েছে অজস্র জটিলতা। সহজ করে তাদের ব্যাখা করাও যায় না। করলে সেটা স্কুলপাঠ্য কেতাবের ব্যাখ্যা হয়। হ্যাঁ—সবই আছে। কিন্তু আকাশ বিশ্বাস করত, যা মন্দ নোঙরা যা আবর্জনা—তার অংশ মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে সামান্যমাত্র। যদি তার ভাগ বেশি হত—সভ্যতা অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত। জগৎ বল, সভ্যতা বল, মানুষ বল—সবই টিকে আছে নিজের জোরে। আর সেই জোর হল—আমরা আশা করতে জানি, ভরসা করতে জানি, স্বপ্ন দেখতে পারি। মানুষের আদর্শ থাকবে না, ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ বোধ থাকবে না—এ কেমন করে হয়?

সেদিন দক্ষিণের খোলা ছাদে অন্যমনস্কভাবে পায়চারি করছিল আকাশ। তার চোখ শূন্যে। অসংখ্য তারা ফুটেছে আকাশে। অন্ধকার ছড়িয়ে আছে আকাশের তলায়। উত্তর না পশ্চিম কোন দিক দিয়ে যে এক এক দমক হাওয়া আসছিল বুঝতে পারছিল না।

ছাদে এসেছিল দাস। খানিকক্ষণ দেখল আকাশকে। তারপর বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা ছিল।'

আকাশ খানিকটা চমকে উঠেছিল। মুখ ফিরিয়ে দেখল, দাস।

'কী হয়েছে তোমার? আমার গলা শুনেও চমকে উঠছ?'

'কিছু হয়নি। কী খবর বল?'

'তুমি আমায় লুকোচ্ছ আকাশ!... আমার গলার স্বর তোমাকে কখনও চমকে দিয়েছে বলে তো মনে পড়ছে না।'

আকাশ হালকাভাবে কিছু বলতে যাচ্ছিল, পারল না। বলল, 'সত্যি, আমি এখন চমকে যাচ্ছি। তোর ডাকেও চমকে উঠছি।'

'কেন?'

'তুই বল, কেন?'

'ভয়ে।'

'ভয়ে?'

'মানুষ তো ভয়ে চমকায়।'

'তুই বুড়ো হলি দাস, কিছু শিখলি না। আঘাতে মানুষ চমকায় না?'

দাস বলল, 'হ্যাঁ। আমার মনে পড়েনি।'

আকাশ কিছু বলল না।

দাস বলল, 'আকাশ, আমি তোর চামড়ার তলায় কী আছে দেখতে পাই। তুই পর পর অনেক আঘাত পেলি। যাদের তুই হাতের আঙুলের মতন নিজের করে রাখতে গিয়েছিলি যাদের তুই লালন- পালনের ভার নিয়েছিলি, যাদের তুই বিশ্বাস করেছিলি তারা তোকে প্রচণ্ড ঘা দিয়ে গেছে। এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'এখন আর তোর বিশ্বাস থাকছে না মানুষের ওপর?'

'থাকা কি উচিত?'

দাস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তুই বিদ্বান লোক। তুই ভালো বুঝবি থাকা উচিত কি উচিত নয়। আমার জ্ঞান কম—আমি শুধু বলব—সংসারে চোর থাকে সাধুও থাকে। চোর দেখে যদি ধরে নিস সংসারের সব কটাই চোর তাহলে ভুল হবে।'

'তা যদি ভাবব, তবে তুই সাধু আছিস কেন সংসারে।' আকাশ হেসে উঠল।

দাস কী ভেবে বলল, 'ও-সব কথা থাক। যা বলতে এসেছিলাম। দীয়াকে তার বাড়িতে দেখতে গিয়েছিলাম। ওকে কিছুদিন কোথাও পাঠিয়ে দেব?'

'কেন?'

'দেখ আকাশ, ছেলে গুণ্ডা বদমাশ বোমাবাজ যাই হোক, তবু সে ছেলে। দীয়া তার ছেলেকে কেমন করে ভুলবে? সময় লাগবে।'

আকাশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ও কি কোথাও যাবে বলেছে?'

'না আমি ভাবছি। তুই যদি বলিস ওর সঙ্গে কথা বলি।'

আকাশ যেন কিছু ভাবল। বলল, 'দাঁড়া, একটু ভাবি।'

'আমি যাচ্ছি—' দাস চলে গেল।

আকাশ অন্যমনস্কভাবে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

দীয়া আর এ-বাড়িতে নেই। আকাশ মোটামুটি সুস্থ বোধ করতেই সে চলে গিয়েছে।

মানুষের সম্পর্ক বড় অদ্ভুত। দীয়া চলে যাবার সময় আকাশের যা মনে হয়েছিল সে জানে। দীয়ার কী মনে হচ্ছিল আকাশ জানে না। তবে আকাশ বুঝতে পেরেছিল, সন্তানের অমন মর্মান্তিক মৃত্যু তাকে নিঃস্ব করে গেছে। শুধু নিঃস্ব নয়, কুণ্ঠিত, লজ্জিত। কুন্দনের গায়ে যে গ্লানি জড়িয়ে ছিল যেন দীয়াও তার ভাগিদার।

'তোমার ছেলের পাপ তোমার নয়, দীয়া। মনকে শক্ত করো।'

'করব।'

'তোমাকে আর একটা কথা বলি। আমি ভাগ্য, বিশ্বাস করি না। কিন্তু অনেক সময় সান্ত্বনা পাবার জন্যে ভাগ্য মেনে নেওয়া ভালো।'

দীয়া কোনো কথা বলল না।

আজ এই অন্ধকারে ছাদের তলায় দাঁড়িয়ে আকাশের মনে হল, দীয়ার একার কেন, হয়ত তার ভাগ্যও এই রকম। চেয়েছিল এক, হল অন্য।

সেদিন কলেজ থেকে ফিরছিল আকাশ ট্যাক্সি করেই। বেশ খানিকটা আসতেই চোখে পড়ল, নলিন বুড়ো মতন একজনকে ধরে রিকশায় তুলছে। বুড়োর জামা ছিঁড়ে গেছে খানিকটা, একটা হাত সে বুকের কাছে তুলে ধরেছে, হাত দিয়ে রক্ত পড়ছে, কপালের কাছেও রক্ত। অ্যাকসিডেন্ট। রাস্তার কয়েকজন দাঁড়িয়ে পড়েছে রিকশার কাছে।

আকাশ ট্যাক্সি থামিয়ে নেমে পড়ল। এগিয়ে গেল নলিনের কাছে। 'আমার সঙ্গে ট্যাক্সি রয়েছে নলিন, তুমি ওকে নিয়ে এসো। হাসপাতালে পৌঁছে দেব।'

নলিন রিকশায় উঠছিল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল আকাশকে। বলল, 'মেডিকেল কলেজ কাছেই, রিকশা করে পৌঁছতে পাঁচ সাত মিনিট লাগবে।'

'কী আশ্চর্য। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে—।'

'আপনি যান। রিকশায় আমাদের মতন মানুষের অসুবিধে হয় না।'

অপমানে আকাশের মুখ লাল হয়ে গেল। খারাপ লাগল তার। কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা কাটাকাটি করার সময় এটা নয়। নলিন রিকশা নিয়ে চলে গেল। আকাশ ফিরে এল ট্যাক্সিতে।

সারাটা বিকেল সন্ধে মন তার অপ্রসন্ন থাকল। নলিন সম্পর্কে আকাশের কোনো বিদ্বেষ নেই। বরং এই ছেলেটির কোনো কোনো কথা কানে এলে সে কেমন অবাক হয়ে যায়। ছেলেটির গলার স্বর ততটা রুক্ষ নয় যতটা তিক্ত তার মন্তব্য। চমক আছে, নাটকীয়তা আছে। কিন্তু সত্য আছে কী?

আকাশ কোনোদিন নলিনের সঙ্গে সদ্ভাবের সম্পর্ক পাতাতে চায়নি, আবার অসদ্ভাবেরও নয়। নলিন নিজেও সাধারণ আলাপের বাইরে আকাশকে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। ছেলেটা অদ্ভুত। শোনা যায় গোড়ার দিকে ভালো ছাত্র ছিল, পরে রাজনীতি নিয়ে মেতে ওঠে। কিছুদিন অজ্ঞাতবাস করেছে। শেষ পরীক্ষায় ফল ভালো করতে পারেনি। তবু এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র বলে তার একটা চাকরি জুটে গিয়েছে। কার কাছে আকাশ যেন শুনেছিল নলিন এক সময় কবিতা লিখত, রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে নাটক করত।

নলিনকে আকাশ মন্দ চোখে দেখেনি কখনো। তবে মূল্যও দেয়নি তেমন। নলিনও আকাশকে দেয়নি।

এসব অন্য ব্যাপার। কিন্তু নলিন তাকে অকারণে অপমান করল, রূঢ়ভাবে।

পরের দিন আকাশ টিচার্স রুমে একসময় নিরিবিলিতে পেয়ে গেল নলিনকে। নিরিবিলিতে পেলেও ঘর একেবারে শূন্য ছিল না।

'নলিন, একটু প্যাসেজে আসবে?'

'চলুন।'

প্যাসেজে দাঁড়িয়ে নলিন একটা সিগারেট ধরাল। এই কলেজেরই ছাত্র ছিল বলে তাকে একটু আড়ালে আবডালে সিগারেট খেতে হয়। অনেক সিনিয়াররা তার মাস্টারমশাই ছিলেন।

আকাশের মনে হল, যদিও সে নলিনের মাস্টার ছিল না—তবু এই সিগারেট ধরানোর মধ্যে নলিনের যেন কেমন একটা উপেক্ষার ভাব রয়েছে তার প্রতি।

আকাশ বলল, 'তুমি কাল অমন করলে কেন? আমি তো কোনো অন্যায় করিনি। আমার খুব খারাপ লেগেছে।'

নলিন যেন ঠোঁট চেপে হাসল। বলল, 'দেখুন, কত ব্যাপারেই কত লোকের খারাপ লাগে, তার কী করা যাবে! আপনি ট্যাক্সি করে বুড়ো মানুষটিকে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পারতেন না। পুরো কলেজ স্ট্রিট জ্যাম ছিল।

ট্যাক্সি করে হাসপাতালে যাওয়ার শোভাটা বাড়ত, কিন্তু বুড়ো লোকটার হাসপাতালে পৌঁছতে ঘণ্টা দুই লেগে যেত। রিকশায় অলিগলি দিয়ে চলে গেলাম। ভিড়ের জায়গায় লোকে রাস্তাও করে দিল অ্যাকসিডেন্ট কেস্ বলে।'

আকাশ যেন বোকা হয়ে গেল। 'আমি জানতাম না।'

'এখন জানতে পারলেন।'

'তুমি কি ঘুরিয়ে কথা বলতে পছন্দ করো?'

'না। আমি সত্যি কথাটা মুখের ওপর বলতে পছন্দ করি।'

'আমার তো মনে হয় না।'

'না হোক! আমার কী যায় আসে!'

'তুমি রাগ করছ কেন!...আচ্ছা নলিন, আমার অসুখের সময় তুমি একদিন আমায় দেখতে গিয়েছিলে না মদনবাবুদের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'ভদ্রতা। সামাজিক কর্তব্য।

'তুমি এ-সব মানো?'

'সব মানি না। কিছু মানি।'

'নলিন, তুমি একদিন আমার বাড়িতে আসবে? কিছু কথা বলব?'

'কী কথা?'

'শুনতে চাও?'

'বলুন?'

'তোমার সঙ্গে তর্ক করব। আমি জানতে চাই—আমাদের সঙ্গে তোমাদের তফাতটা কোথায়?'

নলিন হাসল। বলল, 'তর্ক করে কি সব জিনিসের নিষ্পত্তি হয়। তবে বলছেন যখন, যাব একদিন।'

'কবে যাবে? কাল—পরশু?'

'পরশু।'

বাড়ি ফিরে আকাশ দেখল তার চিঠিপত্রের মধ্যে ধ্রুবজ্যোতিদার এক চিঠি রয়েছে। ধ্রুবজ্যোতিদার

সঙ্গে আকাশের আলাপ এবং ঘনিষ্ঠতা বিলেতে থাকতে। আকাশ তখন ছাত্র, ধ্রুবজ্যোতি ডাক্তার। ছোট একটা হাসপাতালে কাজ করত ধ্রুবজ্যোতি, শহুরে হাসপাতাল নয়, গ্রাম্য হাসপাতাল। কিন্তু সে গ্রাম্য হাসপাতাল এখানকার মফস্বলী হাসপাতাল নয়।

ধ্রুবজ্যোতিকে আকাশরা ডাকত, 'ধ্রুবদা' বলে। বয়েসে কিছু বড় ছিল ধ্রুবজ্যোতি, চুলগুলোকে সাদা করে ফেলেছিল, মাথায় অতিরিক্ত লম্বা, গায়ের রঙ কালো, শরীরে মেদ বলে কিছু নেই। হাড়-হাড় চেহারা।

সেই ধ্রুবদা চিঠি লিখেছে। চিঠির সারকথা হল, ধ্রুবদা অনেকদিন পরে একবার দেশে আসছে, নিতান্তই বেড়াতে। দিল্লিতে থাকবে কিছুদিন—তারপর আসবে কলকাতায়। কলকাতা এসে আকাশলালের ঘাড়ে ভর করবে।

চিঠি পেয়ে আকাশের ভালো লাগল। ধ্রুবদা মানুষটা সঙ্গী হিসেবে অসামান্য। তার কথা বলার মধ্যে সব সময় একটা মজার ভাব আছে। দারুণ বৈঠকী। আকাশকে বরাবর 'আকাশলাল' বলে ডেকে এসেছে।

কবে আসবে ধ্রুবদা? অক্টোবরে। দেরি আছে। আসুক। কাল পরশুর মধ্যে চিঠির জবাব দিয়ে দেবে আকাশ। 'তুমি আমার বাড়িতে এসে উঠবে, এর চেয়ে আনন্দের খবর কী থাকতে পারে। চলে এসো। তোমার অপেক্ষায় থাকলাম।'

ধ্রুবদাকে নিয়ে সমস্যা মাত্র একটি। মদটদ খায় ধ্রুবদা। মাতাল হবার জন্যে খায় না। ওটা তার অভ্যেস। এ-বাড়িতে থাকার সময় যে ধ্রুবদা মদ স্পর্শ করবে না—এমন হতে পারে না। সে তার মাত্রা মতন মদ্যপান করবে। আকাশের আপত্তি করা উচিত নয়। কেননা সে জানে, ধ্রুবদা মদ্যপ নয়, স্বাভাবিক এক নেশা, বা অভ্যাস। কিন্তু দাস? দাস না হইচই শুরু করে দেয়!

ব্যাপারটা নিয়ে এখন ভেবে কোনো লাভ নেই। দাসকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করিয়ে নেবে আকাশ।

হঠাৎ আকাশের মনে হল, ধ্রুবদা কি দিল্লিতে অকারণেই আসছে? দিল্লিতে, আকাশ শুনেছে, ধ্রুবদার সামান্য বিষয়সম্পত্তি আছে। মনে হয়, ওই সম্পত্তি বেচাকেনার একটা ব্যবস্থা করতে আসছে ধ্রুবদা। এক সময়, যখন ধ্রুবদার স্ত্রী জীবিত ছিল তখন এসব চিন্তা তার মাথায় আসেনি। এখন স্ত্রী নেই, সন্তানাদিও নেই, ধ্রুবদার কোনো ব্যাপারেই আর টান নেই।

দাস এল। বলল, 'তুমি কাল একবার কাকাকে দেখতে যাবে নাকি?'

'কাকা! কেন—তিনি—

'মাধব দুপুরে এসেছিল। বলল, যে কোনো সময়ে উনি—।'

বাকিটা বলতে হল না দাসকে, আকাশ বুঝতে পারল। নব্বই বছরের পর আয়ুকে টিকিয়ে রাখাও বোধ হয় অর্থহীন। কাকা তা হলে এবার বিদায় নেবার জন্যে পা বাড়িয়েছেন, আর তাঁকে আটকানো যাবে না।

আকাশ বলল, 'যাব। তুই আমার সঙ্গে যাবি?'

'যাওয়া দরকার। তোমার তো শরীর ভালো নয়।'

'তা হলে কাল সকালেই আমরা যাব।'

'তোমার কলেজ?'

'যাওয়া হবে না।'

দাস বলল, 'আমি নিজে গিয়েও ঘুরে আসতে পারি।'

মাথা নাড়ল আকাশ। বলল, 'নারে, আমি যাব। আজকের দিনে মানুষ অনেক দেখা যায়। কিন্তু কাকার মতন মানুষ তো চোখে পড়ে না। অমন মানুষকে শেষবারের মতন দেখা আমার পুণ্য আমি হারাতে চাই না।'

দাস বলল, 'তবে কাল সকালেই বেরিয়ে পড়ব। তবে একটা কথা আমি বলেনি। আমরা গিয়ে কী দেখব জানি না। যদি দেখি—উনি আর নেই, তুমি ওঁকে শেষ দেখা দেখে ফিরে আসবে। বাকি ব্যবস্থা আমি করে নেব।'

'কেন?'

'তোমার এখনকার শরীরে শ্মশানের ধকল সইবে না।'

'ঠিক আছে। আগে তো যাই।

রাত্রে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে কাকাকে দেখল আকাশ। একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। দেখছেন আকাশকে।

আকাশ যেন কিছু বলতে চাইছিল, পারছিল না।

কাকা বললেন, আমি আসি আকাশ। যে দুঃখ নিয়ে এতকাল বেঁচেছিলাম সেই দুঃখের আজ শেষ হল। মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতম্।

কাকা যেন আশীর্বাদ করার মতন করে ডান হাতটা তুললেন। 'সংশয় ও দ্বিধা থেকে মানুষের মুক্তি নেই। আমি আজ মুক্ত হলাম।'

ঘুম ভেঙে গেল আকাশের। আর এই মুহূর্তে সে বুঝতে পারল—কাকা আর নেই।

দুটো দিন আর কলেজ যেতে পারেনি আকাশ। পরের দিন কলেজে গিয়ে নলিনের খোঁজ করল। নলিনের ছুটি। সে আসেনি।

কলেজে যে কেন আসতে পারেনি আকাশ সেটা নলিনকে জানানো হয়নি। অবশ্য নলিনও আকাশকে কলেজে না দেখে কিছু অনুমান করে নিয়েছিল। আকাশের বাড়ি যায়নি।

পরের দিন দেখা পাওয়া গেল নলিনের।

আকাশ বলল, 'আমার এক দূরসম্পর্কের কাকা মারা গেলেন। অনেক বয়েস হয়েছিল তাঁর। সে যুগের স্বদেশী করা মানুষ। আমি আমার কথা রাখতে পারিনি।'

নলিন বলল, 'আজ আমার সময় হবে, আপনার যদি হয়—?'

'কেন হবে না। আজই তুমি চলো।'

'আমি সন্ধের মুখে যাব।'

'এসো, আমি অপেক্ষা করব।'

'অপেক্ষা করবেন না,' বলে নলিন একটু হাসল, 'যাব বলেও হয়ত শেষ পর্যন্ত পারলাম না। তবে ধরে নিন যাব।'

ছাদেই বসার ব্যবস্থা করে রেখেছিল আকাশ নলিন এল সন্ধের গোড়ায়। আকাশে তারা ফুটে গিয়েছে, এলোমেলো বাতাস ছিল আজ, যেন চৈত্রের হাওয়া।

নলিন হেসে বলল, 'আপনার বাড়ির এই ছাদটি চমৎকার। গানের জলসা বসিয়ে দেওয়া যায়।'

আকাশ বলল, 'তুমি কি গান-বাজনার চর্চা করো নাকি?'

'আজ্ঞে না। তেমন অবসর হল কোথায়?...আমার মা একসময় গায়িকা হিসেবে সামান্য খ্যাতি পেয়েছিলেন। দু চারটে রেকর্ড ছিল তাঁর।'

আকাশ নাম জিজ্ঞেস করল।

নলিন তার মায়ের নাম বলল।

আকাশ চিনতে পারল না। চেনার কথাও নয়। সংগীত সম্পর্কে তার যথেষ্ট অজ্ঞতা। আকাশ বলল, 'নলিন, আমার বাবা গান-বাজনা আর সাহিত্যের সমঝদার ছিলেন। সেটাই ছিল তাঁর জীবন। আমি ওদিক থেকে একেবারেই নিরেস।'

নলিন কিছু বলল না।

কিছুক্ষণ সাধারণ কথাবার্তার পর আকাশ বলল, 'নলিন, আগে আমি তোমার কথা শুনতে চাই।... দাঁড়াও, বল্লভ এসে গেছে। একটু চা জলখাবার খেয়ে নাও।'

বল্লভ চা জল খাবার নামিয়ে রাখল।

'আপনি?'

'শুধু একটু চা খাব।'

নলিন খেতে খেতে বলল, 'কলেজে আপনার বন্ধু আর শত্রুর দুটো দল আছে। আপনি এই দলের লোকদের না ডেকে আমায় ডাকলেন কেন?'

আকাশ বলল, 'কলেজের দল নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।'

'জানি। কিন্তু আপনি জানেন না—আপনার শত্রুর দল আপনাকে নিয়ে বেশি রকম মাথা ঘামায়।

'তাদের বোধ হয় আর কিছু করার নেই।'

'আপনি ওদের চেনেন না। উদ্দেশ্য ছাড়া ওরা কোনো কাজ করে না।... ধরুন এমন যদি হয়, আপনার দুর্নাম রটিয়ে, আপনাকে অপদস্থ করে, ছেলেমেয়েদের সামনে আপনার মুখে চুনকালি মাখিয়ে আপনাকে কলেজ থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করে ওরা—আপনি কী করবেন?'

আকাশ যেন অবাক হয়ে নলিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। পরে বলল, 'আমি কিছুটা জানি— এতটা তো জানি না, নলিন।'

'আপনি নামে আকাশ, হাঁটেনও আকাশের দিকে মুখ করে।'

'হয়তো হাঁটি। জানি না। কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

'ব্যাপারটা সরল। আপনার শত্রু-পক্ষ আপনাকে আর বরদাস্ত করতে পারছে না। আপনার ডিপার্টমেন্টের ওপর অন্য কারও নজর রয়েছে।

আকাশ সামান্য চুপ করে থাকল। 'আমাকে অপদস্থ করার জন্যে ওরা কী আদা জল খেয়ে লেগেছে?'

নলিন চায়ের কাপ মুখে তুলে বলল, 'আপনি কিছু গুন্ডা বদমাশ পোষেন নাকি।'

আকাশ চমকে গেল। 'আমি গুণ্ডা পুষি?'

'পোষেন না?...ওরা তো বলে পোষেন।...দুটো ছেলে—কী নাম—যারা, বোমা ফেটে মারা গেছে—

'কুন্দন—'

'হ্যাঁ কুন্দন! আর একটার কি নাম জপা—? এরা আপনার পোষা?'

আকাশ বোবা হয়ে বসে থাকল।

নলিন বলল, 'আপনি মনে করবেন না, ওরা আপনার হাঁড়ির খবর না রাখে! কারা কারা আপনার পোষ্য, কে কে আপনার বাড়িতে আসা যাওয়া করে, কারা থাকে, কে কে ফেরার—সবই ওদের জানা। গুণ্ডা বদমাশকে আপনি লালনপালন করেন, ফেরারী আসামীকে কাছে রাখেন—এ-সব কী কোনো কলেজ টিচারের উপযুক্ত কাজ?'

আকাশ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। নলিনকে দেখছিল। মনে হল, ও যেন আকাশকে শুধু সতর্ক করে দিচ্ছে না, সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়ে দিচ্ছে— আকাশের বিরুদ্ধে যে জঘন্য ষড়যন্ত্র গড়ে উঠেছে তার পরিণতি কী হতে পারে!

আকাশ বলল, 'নলিন, আমি এত টা ভাবিনি।'

'অনেকেই হয়তো ভাবে না আজকাল,' নলিন বলল। 'কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলি। আজকাল রাজনীতিতে গুণ্ডা পোষাক দাগী আসামী পোষা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে গেছে। গুণ্ডা না পুষলে রাজনীতি করা যায় না। আমাদের কলেজেও দু একজন আছেন যাঁরা রাজনীতি বোঝেন। সাঙ্গপাঙ্গও সঙ্গে রাখেন। আপনি...।"

আকাশ হাত তুলে থামিয়ে দিল নলিনকে। আমি বুঝেছি। কলেজের কথা থাক। আমি তোমার কথা নিয়ে পরে ভাবব।'

নলিন চা শেষ করল। করে সিগারেট ধরল।

সামান্য চুপচাপ থাকল আকাশ।

'নলিন?... নিজের সম্পর্কে কিছু বলা আমি পছন্দ করি না। তবু তোমার কাছে খোলাখুলি কটা কথা বলি।... যে ছেলে দুটির কথা তুমি শুনেছ—তারা আমার পোষা গুণ্ডা ছিল না। আমি তাদের কেমন করে প্রতিপালন করতে চেয়েছি বাইরের লোক জানে না। আমি যা চেয়েছিলাম—তারা তা হয়নি আমার দুর্ভাগ্য!'

নলিন যেন হাসল। বলল, 'আমি সামান্য জানি।'

'জানো?'

'যে চারজনকে আপনি মানুষ করতে চেয়েছিলেন তারা মানুষ না হয়ে অমানুষ হয়ে গেল। এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের দেশে এখনও অনেকে মনে করে, মঠ মন্দিরে কিছু দান ধ্যান করলে পরম পুণ্য হয়।' নলিন হাসল।

'তুমি আমায় ঠাট্টা করছ?'

'না, ঠাট্টা করিনি,' নলিন বলল, 'আপনার ধারণার সঙ্গে আমার ধারণার অনেক তফাত। আপনি দু একজনকে নিয়েই বোধ হয় বেশি ভাবেন। আপনার অর্থ আছে, সামর্থ্য আছে, দু চারজনকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করা, তাদের খয়রাতি করা আপনার কাছে কিছুই নয়। কিন্তু তাতে এ-দেশের কোটি কোটি লোকের কোন উপকার হবে?'

আকাশ একটু ভাবল। বলল, 'তোমার কথা বুঝেছি। কিন্তু নলিন, আমি তো নেতা নই, দেশের ভালো করার দায় আমার ঘাড়ে নেই।'

নলিন বলল, 'কিছু মনে করবেন না। দায় এবং দায়িত্ব যদি অস্বীকার করেন, আপনার এই অনুশোচনা ব্যক্তিগত। কাকে আপনি কী করেছেন, সে চোর হয়েছে না গুণ্ডা হয়েছে—সে কথা শুনে অন্যের কী লাভ! আপনার ব্যক্তিগত দুঃখ আপনার।

আকাশ আহত হল। 'তুমি কি রাজনীতি কর?'

'আমাদের কথা থাক। আপনি বুঝবেন না।'

'তোমার আপত্তি রয়েছে।... বেশ, একটা কথা বলো, আমাদের কী কোনো ব্যক্তিগত আদর্শ থাকবে না?'

'কেন নয়।'

'তা হলে।'

'আপনি হৃদয়বান। শুনেছি, আপনি অনেক বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। আমি শুধু একটা কথা বলতে পারি। ওই আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখুন। কত যোজন দূরে ওই নক্ষত্র। তার আলো এসে আপনার আমার চোখে লেগেছে। লাগুক। কিন্তু ওই তারার আলোয় আমাদের ঘরের কোন্ কাজটা হয় বলতে পারেন।'

আকাশ যেন স্পষ্ট বুঝল না। তাকিয়ে থাকল।

নলিন বলল, 'যা বাস্তব আর যা প্রয়োজনীয়—এই দুটোই আমাদের কাছে জরুরি। আকাশের তারা দিয়ে আমাদের কাজ মেটে না, আকাশবাবু, তার চেয়ে একটা প্রদীপ কিংবা মোমবাতি আমাদের বাস্তব প্রয়োজন মেটায়। আপনি যতটা কল্পনা নিয়ে বেঁচে থাকেন ততটা রিয়ালিটির মধ্যে থাকেন না। আমরা সামান্য মানুষ, আমাদের চোখ আকাশের দিকে নয়, মাটির দিকে।'

আকাশ চুপ করে থাকল।

আরও খানিকটা বসে থেকে নলিন বলল, 'আজ তা হলে আমি উঠি?' অন্যমনস্ক ছিল আকাশ। খেয়াল হল যখন, দেখল নলিন উঠে দাঁড়িয়েছে। আকাশও উঠে দাঁড়াল। 'তুমি কোন দিকে থাকো?'

'গড়পারের দিকে।'

আকাশ নলিনকে এগিয়ে দিতে যাচ্ছিল। বলল, 'বাড়িতে তোমার কে কে আছেন?'

'বিধবা দিদি আর আমি। জামাইবাবু আলিপুর জেলে ছিল। জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিল। পারেনি। জেলেই মারা গেছে।'

আকাশ যেন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখছিল নলিনকে।

নলিন কোনো কথা বলল না আর।

শেষ রাতে আকাশের ঘুম ভেঙে গেল।

সে কি স্বপ্ন দেখছিল? আশ্চর্য! এমন স্বপ্ন দেখার কারণ কী? আকাশ এখনও যেন স্বপ্নের শেষটুকু দেখতে পাচ্ছে। কোথায় যেন আগুন লেগেছে। আকাশ প্রথমটায় বুঝতে পারেনি। পরে বুঝল, আগুনটা তার বাড়িতে লেগেছে। বাড়ি ঘরদোরে ছড়িয়ে পড়ছে। অথচ সে আর দাস ছাড়া অন্য কেউ কাছে নেই। দু'জনেই যেন স্তম্ভিত। বুঝতে পারছে না কী করা যায়? এই আগুন তারা

কেমন করে নিভিয়ে ফেলবে? তাদের সাধ্য নেই।

দাস ছটফট করছিল। দমকলকে খবর দেওয়া সত্ত্বেও তারা আসছে না কেন?

হঠাৎ দাস ছুটে আগুনের দিকে চলে যাচ্ছে দেখে আকাশ তাকে ধরে ফেলল।

দাস আকাশকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেল। মাটিতে পড়ে থাকল আকাশ। আগুন যেন ক্রমশই আকাশের কাছাকাছি চলে এল।

আর সেই আগুনের মধ্যে থেকে ও কে সামনে এসে দাঁড়াল? কে?

কয়েক পলক একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর আকাশ বুঝতে পারল— এই সেই জ্যোতির্ময় মূর্তি, আকাশের প্রপিতামহের প্রপিতামহ অনন্ত নারায়ণ দেবশর্মা।

আকাশ চমকে উঠে বলল, 'আপনি?'

'হ্যাঁ, আমি।'

'আপনি এখানে কেন?'

'তোমার জন্যে।'

'আমি—। আমি বোধ হয় মনে মনে আপনাকেই চাইছিলাম।'

'জানি।'

'কেন বলুন তো?'

'তুমি দুর্বল হয়ে পড়েছ। তোমার চিত্ত স্থির নেই। তুমি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছ।'

'হ্যাঁ। আপনি ঠিক বলেছেন। আমি যেন সমস্ত কিছু হারিয়ে ফেলেছি। বিশ্বাস, আদর্শ, কর্তব্য...।

'তুমি কি সেই জন্যে আত্মঘাতী হবে ভেবেছিলে?'

'না হয়ে উপায় কী! এই জীবনের কোথাও যদি সান্ত্বনা না থাকে তা হলে বেঁচে থেকে কী লাভ।'

'তুমি আত্মঘাতী হয়ে কাকে ফাঁকি দিতে চাও! নিজেকে... তুমি মূর্খ।'

'মূর্খ?'

'মানুষের জীবন কোনো দিনই সংশয়মুক্ত নয়। তুমি মহাভারত পড়োনি? গীতা পড়োনি? সংশয় মানুষকে বিচলিত করে, বিভ্রান্ত করে, কিন্তু এই সংশয় সত্যকে খুঁজে পাবার প্রেরণা দেয়।'

আকাশ নীরব।

জ্যোতির্ময় পুরুষ বললেন, 'তুমি যদি পরাজয় স্বীকার কর— তোমার বিনাশ হবে। তুমি যদি পরাজয় স্বীকার না করো— তোমার মনুষ্যত্ব রক্ষা হবে। মানুষ দেবতার কাছেও পরাজয় স্বীকার করতে চায় না। নিয়তি সত্য, সংগ্রাম আরও অধিক সত্য। আকাশ, তুমি পরাজয় স্বীকার করো না।

আকাশ আর সেই পুরুষকে দেখল না। স্বপ্ন ভেঙে গেল। দেখল—ঘরবাড়ির কোথাও আগুন লাগেনি।

বিছানা ছেড়ে ছাদে এসে দাঁড়াল আকাশ। অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। তারা রয়েছে আকাশে। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছিল।

ধ্যানস্থের মতন আকাশ, অন্ধকার, নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে আকাশের চোখে জল এসে গেল।

আঘাত ও বেদনায় বিক্ষত হয়েও যে যুদ্ধ করে সেই মানুষ। আকাশ পরাজয় স্বীকার করবে না।